প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪২শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন-চিত্র

একবর্ণ চিত্র

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

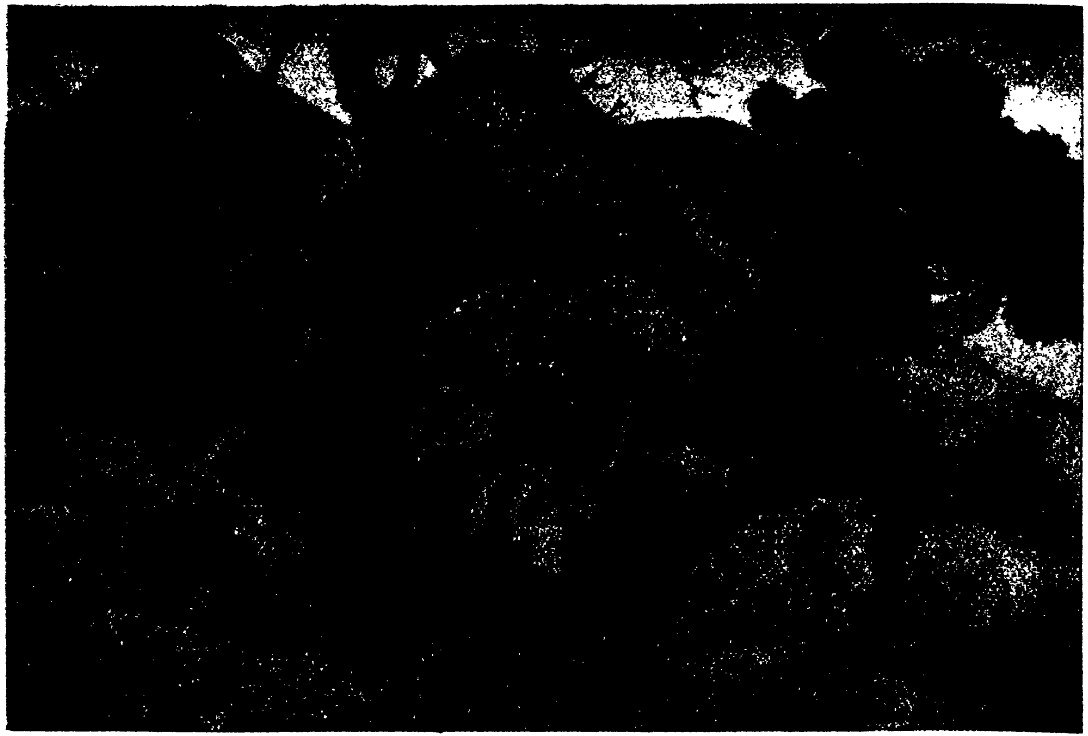

শিশু ও জননী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৯

১ম সংখ্যা

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

সেঁজুতি

বিকেল বেলায় দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পূর্ব গগনের দিগন্তে কি
জাগায় সোনার বোধ?
লক্ষ কোটি আলো বছর পারে
সৃষ্টি সভার যে বেদনা
মাতায় বিভাবরী
হয়তো তারি কেন্দ্র মাঝে
যাত্রা আমার হবে,
অস্ত বেলার আলোকে কি
আভাস কিছু রবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২/৯/৩৮

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার-এ্যাট্-ল-কে লিখিত পত্র]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০২ সনের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি "সাধনা" পত্রিকার ভিতর দিয়া প্রকাশ হয়। "সাধনা" বন্ধ হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর প্রথম "কাব্য-গ্রন্থ" প্রকাশ (১৫ আশ্বিন, ১৩০৩)। পদ্যে এ যুগে পাই 'চিত্রা' ও 'চৈতালি' এবং গদ্যে তাঁর অনবদ্য ছোট গল্প : "প্রায়শ্চিত্ত", "বিচারক", "নিশীথে", "মেঘ ও রৌদ্র", "ক্ষুধিত পাষাণ" প্রভৃতি। এই যুগের কোন এক সময়ে দেখি প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে কবির এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সমজদাররূপে। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যে সব চিঠি কবির কাছে আদায় করিয়াছিলেন, তা'র মধ্যে দুইখানি মাত্র আমার হাতে পৌছায়। ভবানীপুর সম্মিলন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ৺শ্রীশচন্দ্র দে মহাশয় চিঠি দুইখানি আমাকে উপহার দেন। আজ বৈশাখের প্রবাসীতে চিঠিগুলি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। শ্রীশবাবুর মতন নীরব কবিভক্ত কমই দেখিয়াছি ; তাঁহার সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে শ্রীশবাবু রবীন্দ্রনাথের এই লিপিগুলি পান। কবিগুরুর ৫০ জন্মোৎসবে যোগ দিতে আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করি ; সে সব গল্প তরুণ ভক্তির আবেগে শ্রীশবাবুকে শোনাই এবং তিনি খুশী হইয়া বহুযত্নসঞ্চিত এই অপূর্ব্ব চিঠি দুইখানি সস্নেহে আমাকে 'প্রাইজ' দেন। তাঁর ছোট ঘরে আমাদের রবীন্দ্র-পাঠচক্র বহুকাল চলিত। "ছিন্ন পত্র" যুগের এই দুইখানি অচ্ছিন্ন পত্র ত্রিশ বৎসরের উপর রক্ষা করিয়া আজ প্রবাসীর মারফৎ কবিভক্তদের উপহার দিলাম।—শ্রীকালিদাস নাগ। ১ চৈত্র, ১৩৪৮]

পতিসর।
আত্রাই ষ্টেসন
এন্, বি, রেলওয়ে

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বহুকাল তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নি—কিন্তু সেজন্যে একা আমি দোষী নই—তোমারও দোষ আছে—তুমি তোমার শেষ পত্রে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়াছ তাহার রীতিমত উত্তর দিতে হইলে বহুল পরিমাণে আলস্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। অথচ সম্প্রতি সাধনা ছাড়িয়া দিয়া আমি বহুকাল পরে আমার চিরবন্ধু আলস্যের প্রিয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি—তাই রোজ মনে করি একটু সময় পাইলেই চিঠির উত্তর দিব। অবশেষে সম্প্রতি মফস্বলে আসিয়া বিষয়কার্য্য উপলক্ষ্যে আমার বন্ধুটিকে বিদায় দিয়া কতকটা অবকাশ পাইয়াছি।

রাজা ও রাণী যে এক মাসের অনধিক কালে সোলাপুরে রচিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে আপনার বন্ধু বীরেশ্বর বাবু প্রকৃত সংবাদই দিয়াছেন—এবং তিনি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে উক্ত সংবাদটি পাইয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে আমিই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এই খবরটি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বটি আমি যেরূপ বুঝি তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রেই ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার উপদেশ আছে। তিনি পিতা আমি পুত্র অতএব তিনি আরাধ্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ আমি সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম অতএব তিনি আমার উপাস্য। তিনি মঙ্গল সাধন করিতেছেন আমি মঙ্গল গ্রহণ করিতেছি অতএব তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। ধর্ম্মবুদ্ধির আরও নিম্নতন অবস্থায় তিনি ভীষণ আমি ভীত, তিনি যথেচ্ছাচারী দাতা, আমি স্তুতিবাদক প্রার্থী।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত একটি অহেতুকী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। আমি তাঁহাকে কেন চাহি তাহা আমি জানি না, তাঁহাকে নহিলে আমার চলে না—পৃথিবীতে আর কিছুতেই আমার চরম পরিতৃপ্তি নাই।

অতএব পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্ব্বকৃত কোন সম্বন্ধ বন্ধন জড়িত নাই—এমন কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে যায় বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শ রূপক স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা পৃথিবীর সহস্র বন্ধনে বিচিত্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি তবু এই পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে আমাদের সুখ নাই সন্তোষ নাই—তবু, মাঝে মাঝে যখন বাঁশি বাজিয়া উঠে তখন আমাদের সংসারগত চিত্ত উতলা হইয়া উদ্দাম হইয়া পরিপূর্ণ প্রেম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া গৃহ ত্যাগ করিতে চাহে।

এই যে অকারণ আকুলতা, এই যে অন্তর্নিহিত অনন্ত অসন্তোষ, এ কে আনয়ন করিল? ইহার কি আবশ্যক ছিল?

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলে ইহার মধ্যে আবশ্যকতার কোন কথাই নাই। ইহার মূল কথাটা এই, আমি যেমন তাঁহাকে চাই, তিনি তেমনি আমাকে চান—আমাকে নহিলে তাঁহার চলে না। সেই জন্য তিনি আমাকে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। সেই জন্যই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র তাঁহার বাঁশি আমার নাম ধরিয়া বাজিতেছে। সেই জন্যই আকাশ এমন নীল, শরতের চন্দ্র এমন সুন্দর, বসন্তের পুষ্পবন এমন মোহকর—সেই জন্যই প্রিয়ার মুখে আমরা স্বর্গের আভাস দেখি, শিশুর হাস্যে আমাদের স্নেহপ্রস্রবণ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। সমস্ত সুন্দর জিনিষই আমাকে আমার কাছ হইতে টানিতেছে—আমাকে যেখানে লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিতেছে সেইখানেই আমার সেই পরমবন্ধু হাস্যমুখে বসিয়া আছেন। আমি যাহাকেই ভাল বাসি না কেন, তাঁহাকেই ভালবাসি। সর্ব্বপ্রকার ভালবাসা এবং ভালবাসার অর্থ ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা। যখন একটা সুস্বাদু ফল খাই তখন ফলের মধ্যে চকিতের মত তাঁহাকে স্পর্শ করি—ফল তাহার বস্তু-ধর্ম্ম লইয়া আমার উদরের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারে মাত্র কিন্তু ফলের সাধ্য কি আমাকে লেশমাত্র আনন্দ দেয়—আনন্দ তিনি ছাড়া আর কোথাও নাই; তিনিই একমাত্র আনন্দ জলে স্থলে আকাশে, ফলে ফুলে শস্যে, পিতা পুত্রে ভ্রাতায়, পত্নী কন্যা মাতায় বিরাজ করিতেছেন। জগতে যাহা আমার পরম প্রিয় তাহাই আমার পরমেশ্বর—মন্দিরে গিয়া শাস্ত্রমতে মন্ত্র পড়িয়া যাহার পূজা করিয়া আসি সে জড় পুত্তলিকামাত্র। মোট কথা এই, জগতে আমার পক্ষে যাহা কিছু প্রিয় যাহা কিছু সুন্দর সেইখানে বসিয়া আমার ঈশ্বর আমাকে ডাকিতেছেন—সেইখানেই তাঁহাতে আমাতে মিলন।

যেখানে তিনি অসীম, আমি সসীম, যেখানে তিনি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, তিনি ঈশ্বর আমি দীন—সেখানে তাঁহাতে আমাতে অনন্ত ব্যবধান—সেখানে কিছুতেই তাঁহার নাগাল পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যেখানে তিনি আমারই জন্য সুন্দর হইয়া প্রিয় হইয়া আমার পুত্র হইয়া বন্ধু হইয়া প্রেমিক হইয়া দেখা দিয়াছেন—সেইখানেই তিনি আমার সমান হইয়া আমার প্রেমপাশে আপনাকে ধরা দিয়াছেন। সেইখানেই তিনি মথুরার রাজত্ব ছাড়িয়া বৃন্দাবনের রাখাল বালকের দলে বাঁশি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তুমি যদি আমাদের ক্ষুদ্র সমাজনিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া বৈষ্ণবকাব্য পড়িতে প্রবৃত্ত হও তবে পদে পদে ধিক্কার জন্মিবে—যদি অনন্ত দেশকালের ক্ষেত্রে মানুষের ঘরগড়া সমস্ত কৃত্রিমতা বিস্মৃত হইয়া নবীন শিশুর মত সরল ভাবে পড়িয়া যাও তবে উহার অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর অর্থ উপলব্ধি করিয়া নিবিড় আনন্দে নিমগ্ন হইবে—এবং জগতের সমস্ত সুখ সৌন্দর্য্য প্রেম স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইয়া উঠিবে।

সব কথা বুঝানো হইল না—তর্কের বিষয় অনেক রহিয়া গেল—এবং সকল তর্কের মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভব নহে—যাহা হউক, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আমি যে সার সংকলন করিয়াছি তাহা মোটামুটি শেষ করা গেল। ইতি। ৯ অগ্রহায়ণ। ১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

"প্রেমের অভিষেক", "পূর্ণিমা," "উর্ব্বশী", "জীবনদেবতা", "সিন্ধুপারে"

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার. এ্যাট. ল-কে লিখিত পত্র]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহ।
কুমারখালি

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সোনার তরী যখন দুই সংস্করণ বাহির হইয়া গেল, তখন আমার এক বন্ধু দেখাইয়া দিলেন সুখ কবিতাটি বাদ পড়িয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের মনে স্বভাবতই দুঃখ উপস্থিত হইল—এইবার সুযোগ পাইয়া সে দুঃখ দূর করিলাম।

মোড়কে যে লেখাটি দেখিয়াছ তাহার ইতিহাস আছে। সখা ও সাথীর কর্ত্তৃপক্ষেরা দিনকতক তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। অনেক ব্যর্থ অনুরোধের পর অবশেষে রফা হয় যে আমার একটি কোন পুরাতন গল্প সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা ছাপাইবেন। ছুটি গল্পটি নির্ব্বাচিত হইলে পর তাহার পুনর্লিখনের ভার তাঁহাদেরই হাতে দিই। সেই রচনাটির ছিন্নাংশ তোমার হস্তগত হইয়াছে। এ বেচারার ভাগ্যে ছাপাখানার মসী-অভিষেক জোটে নাই—কারণ অবশেষে আমি একটি নূতন ছোট গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় perturbed spiritকে শান্তি দান করিয়াছিলাম।

প্রেমের অভিষেক কবিতাটি চিত্রা কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা যায় না—কারণ, ইহাই উহার আদিম রূপ। সাধনায় যখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তখন কাহারও কাহারও মনে এতই আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধু বিচ্ছেদ হইবার যো হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন, কোনও আপিস বিশেষের কেরানী বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণ ভাবে, আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধ ভাবে দেখানো হয়— সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানীর মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিক-মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়—উহার সহজ স্বতপ্রবাহিত সর্ব্ববিস্মৃত কবিত্ব রসটি থাকে না—মনে হয়, সে মুখে যতই বড়াই করুক্ না কেন আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যে ভাবে লিখিয়াছিলাম, সেই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছি।

"পূর্ণিমা" কবিতাটা সত্যঘটনামূলক। একদিন বোটে বসিয়া বাতি জ্বালাইয়া সন্ধ্যাবেলা ডাউডেন্ সাহেবের সমালোচনা পড়িতে পড়িতে রাত অনেক হইল এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল—অবশেষে দিক্ হইয়া বইটা ধপ্ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম অমনি চারিদিকের মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্ত্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা আমার বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দ উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক—পৃথিবীর প্রান্তে একটা বোটের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মানবের এই অদ্ভুত আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এত বড় একটা সুমিষ্ট পরিহাস অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠে আসিয়া সস্নেহ আঘাত করিল ইহাতে আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। চন্দ্রলোক হইতে পৃথ্বীলোক পর্য্যন্ত কতখানি জ্যোৎস্না অথচ টেবিলের উপরে একটি বাতির শিখা সমস্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্য্যন্ত কি পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন্ সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বস্তর নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ণিমা সন্ধ্যার এই মহৎ ঘটনাটি প্রথমে একটুখানি সাজাইয়া

লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মূল কথাটা মাটি হইয়াছিল—তাহার পর বই ছাপাইবার সময় যথাযথ যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিখিয়া দিলাম, এখন কেহ বুঝুন বা না বুঝুন আমার দায় কাটিয়া গেল।

তুমি যে লিখিয়াছ, "উর্ব্বশী বহুকাল পরে একটা কবি-কম্‌প্লিমেণ্ট্ পাইয়াছেন" সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পৌরাণিক উর্ব্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট্ দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige Weibliche, আমি তাহাকে উর্ব্বশীমূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে মাতা নহে কন্যা নহে, সে রমণী,—সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে—অর্জ্জুন তাহার সহিত পূর্ব্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জ্জুনের ভ্রম—তাহার সহিত কাহারও কোন বন্ধন নাই; যে আদিম রহস্য-সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্য্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে এবং আমাদের বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The beautiful এক ভাগে The good পড়ে। উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে—স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জীবন-দেবতা, মেটাফিজিক্যাল জীবন-দেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বন ক'রে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুল্‌চেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করচি আমাকে আশ্রয় করে হে স্বামিন্ তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ? যা হতে চেয়েছিলে যা করতে চেয়েছিলে তা কি সব সম্পন্ন হয়েছে? আমার দ্বারা যা কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিত মাত্রে আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই জীর্ণতা অসারতা ভেঙ্গে চুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নূতন প্রাণ দাও নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদি কালের চিরপুরাতন বিবাহ-বন্ধন নবীকৃত করে দাও।

মৃত্যুর পরে "সিন্ধুপারে" এই জীবন-দেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন—আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম, মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবন লীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মত ছুটি লইলেন, আর এক জন কোন্ অচেনা লোক আমাদের পূর্ব্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে—কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল। যিনি "আমি" নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোকলোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইয়া অনাদি কালের ঘাট হইতে অনন্ত কালের ঘাটের দিকে কি মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সৌন্দর্য্যে আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্ত ভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীর ভাবে আনন্দ, "চিত্রা" গ্রন্থে আমি তাহাকেই বিচিত্র ভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই—যিনি বিশেষ রূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎসংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে। আমি তাঁহারই কাছে আবেদন করিয়াছি যে, তোমার কাছে নানা লোক নানা বড় বড় পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনটা চাই না, আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব—আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্য্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব—এক কথায় আমি কবিতা লিখিব, আমি বিশ্বহিতের জন্য সম্পাদকী করিতে পারিব না; কবিতা লিখিয়াও তোমার কাজ করা হইবে—হিতকার্য্য না করিতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব। ইতি। ৬ চৈত্র। ১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

হাঁা, ওদের মধ্যে থেকে এবার বিদায় লইতে হইবে।

রাঁচির এই পার্টিতে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—মীরা আমাদের উভয়ের ব্যবধানটা ভুলিতে পারে নাই। ওর দোষ দিই না, ভোলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ধরা যাক্, আজ অনিলা যেমন কৌশলে উহার পাশে আমায় বসাইয়া দিল সেইরূপ যদি ব্যারিষ্টার নীরেশ লাহিড়ীকে, কিম্বা রণেনকে, কিম্বা এমন কি নিশীথকেও বসাইয়া দিত, তাহা হইলে অবস্থাটা কি রকম হইত?—মীরা লজ্জিত হইত, কিন্তু বিপর্য্যস্ত হইত না। অনিলাকে ধন্যবাদ দিই, একটা আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া সে আমার চোখ খুলিয়া দিল।

আজ অবশ্য ওর সেই নাসিকার ঈষৎ কুঞ্চন ফুটে নাই; না, ফুটে নাই; আমি অনেক লক্ষ্য করিয়াছিলাম। হয় মীরা তাহার সেই মুদ্রাদোষটা একেবারেই দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে, না হয় সত্যই ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। এত কটুতার মধ্যেও সে কথা ভাবিতে সুখ।—মীরা বোধ হয় সত্যই আমায় ভালবাসে, ব্যক্তিগত ভাবে, জীবনের সেই নিভৃতে যেখানে ও একা। নিশ্চয় ভালবাসে মীরা, ডায়মণ্ড হারবার রোডের সেই সন্ধ্যা তাহার সাক্ষী। কিন্তু সমাজগত ভাবে—যেখানে ও রাজার দৌহিত্রী, ব্যারিষ্টারের কন্যা, যে আসরে নবীন ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ডেপুটি, (অপদার্থ হইলেও) নিশীথের মত রাজরক্তের অধিকারী তাহার পাণিপ্রার্থী—সেখানে মীরা আমাকে লইয়া বিপর্য্যস্ত।…ডেপুটি আর নিশীথের কথায় মনে পড়িয়া গেল—রাঁচি-প্রবাসে টের পাইলাম—কতক এদিক ওদিক হইতে আর কতক নিজেই লক্ষ্য করিয়া, যে মীরা বেশ গা ঢালিয়া দিয়াই নিশীথের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছে,—গল্পসল্প, বেড়ান, পার্টি। অবশ্য নিশীথের যা উগ্র আরাধনা, উপায়ও নাই বেচারির;—একেবারে পরের জাহাজেই গ্ল্যাস্‌গো যাওয়া বন্ধ করিয়া ধর্না দিয়া পড়িয়া আছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ডেপুটি রণেন যথাসাধ্য মীরার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে। মীরার মনের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য আমি যতটুকু ছিলাম সে যেন চেষ্টা করিয়াই আমায় দেখাইতে লাগিল যে রণেন তাহার কাছে উৎসাহ পাইতেছে; কিন্তু সেটা কিছু প্রমাণ নয়। আমার ঈর্ষা উদ্রেক করিয়া আমায় সতর্ক করাটাও তাহার একটা কারণ হইতে পারে। সত্যই যদি চাহিয়া থাকে মীরা আমার তো এইটেই সম্ভব। এইটেই সম্ভব নিশ্চয়,—মীরাকে কি এতই কম জানি যে একথাটুকুও জোর করিয়া বলিতে পারি না?

মীরাকে কিন্তু আমি জানাইয়া দিলাম যে ভাঙন ধরিয়াছে। মীরা বোধ হয় নিজেই টের পাইল—যখনই আমি পাশে বসিতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বুঝিল যে আমি তাহার সঙ্কোচের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও আমি বুঝাইয়া দিলাম। পরদিন সন্ধ্যায়ই তরুকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। হুড্রু, জোন্‌হা প্রপাত, রাঁচি-হাজারীবাগ রোড, জগন্নাথপুরের মন্দির—সবই রহিল পড়িয়া। অপর্ণা দেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; চলিয়া আসিলাম বলিয়া নয়, চলিয়া আসার মূলে যে রহস্য থাকা সম্ভব তাহারই আশঙ্কায়।

সে রাত্রিটা গাড়িতে যে কি ভাবে কাটিয়াছিল অন্তর্যামীই জানেন। সেকেণ্ড ক্লাসে দুইটি মানুষ, তরু আর আমি। তরু বিমর্ষ, তবুও একটা কথা চালাইবার চেষ্টা করিল। উত্তরের মধ্যে আমার মনের সন্ধান না পাইয়া চুপ করিয়া গেল। একটু পরে নিদ্রিতও হইয়া পড়িল। জাগিয়া রহিলাম আমি আর আমার চিন্তা। সমস্ত বুকটা যেন হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে। কি করিয়া বসিলাম! কেন হঠাৎ চলিয়া আসিলাম? এর দ্বারা জীবনে যে সবচেয়ে প্রিয় তাহাকে যে কি গুরু আঘাত দিয়া আসিলাম তাহা একবারও ভাবিলাম না?…দূরত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা বক্ষের পিঞ্জরে ততই যেন আছাড় খাইতে লাগিল—নিজের অসহায়তায়। কাল রাত্রের

পর থেকেই মীরার মুখ বিষণ্ণ, যখনই জোর করিয়া প্রফুল্ল করিতে গেছে, আরও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।···এর ওপর আরও নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে আঘাত দিয়াছি। আজকের কালের কথা মনে পড়ে। মীরা যেন অনেক সঙ্কোচ কাটাইয়া কালকের রাত্রের কথাটা পাড়িল একবার, ইচ্ছা ছিল যদি সম্ভব হয় তো কালকের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিবে আমাদের জীবন হইতে। বলিল—"কাল শৈলেনবাবু নীথ বাবুকে খুব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; নেমন্তন্নয় ডেকে অন্যায় ওঁর···"

আমি একটুও না চিন্তা করিয়াই বলিলাম, "কি করব বলুন? নিজের মর্য্যাদার ওপর চারিদিক থেকে আঘাত পেয়ে আমায় অতিথি-ধর্ম্মের কথা ভুলে নিজেই ব্যবস্থা করতে হ'ল। আশা ছিল আমার তরফে একজনও উকিল পাব, তা···"

মীরার মুখের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে উবিয়া গেল। একটাও কথা আর বলিতে পারিল না সে। তাহার সেই নিষ্প্রভ মুখটাই শুধু মনে পড়িতেছে; কত বার তাহার মুখখানি হাসিতে, কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে-মুখ মনে আনিতে পারিতেছি না। মীরা তাহার পর আর আমায় উৎকণ্ঠিত, উল্লসিত হইয়া কিছু বলে নাই। ও আমায় পাল্টা আঘাত করে নাই, ভালবাসিয়া বোধ হয় ও সে-ক্ষমতা হারাইয়াছে, অন্তত এখনকার মত হারাইয়াছে। ও নীরবে সহিয়া গেল, শুধু নিজের মর্য্যাদাকে আর আহত হইতে দিল না। সমস্ত দিনে আমাদের হাসিয়া কথাও হইয়াছে; তরুর আবদারে সকলে মোরাবাদী পাহাড়ে বেড়াইয়াও আসিলাম, মীরাও গেল, শুধু ও নিজে আর কোথাও যাইতে বলিল না—হাজারীবাগ রোড, জোন্‌হা-প্রপাত—কোথাও না। থাকিতে বলিল না, আসিয়াই চলিয়া যাইতেছি কেন প্রশ্ন করিল না একবারও। সবই বুঝিল, কিন্তু একবার আঘাত খাইয়া ও সমস্ত দিন যেন নিজের আহত মর্য্যাদাকে পক্ষাবৃত করিয়া বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া চলিল।

না, এত বড় অন্যায় করা চলিবে না মীরার ওপর। গিয়াই পত্র দিব মীরাকে—যে আঘাতটুকু দিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া। আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; কাজ নাই আমার কলেজের পার্সেণ্টেজে, পরীক্ষার কৃতিত্বে। এত সাধনায় যে-ধন লাভ করিলাম, এমনি করিয়া হেলায় হারাইব? থাক্ না মীরার একটু অবজ্ঞা, সব সহিয়া যদি ভালবাসিতে না পারিলাম তবে আমার ভালবাসা কিসের? মীরার রক্তের মধ্যে রহিয়াছে সাধারণের জন্য অবজ্ঞা, কি করিবে ও?—নিতান্ত নিরুপায় যে মীরা ওখানে। অপর্ণা দেবীর কথা মনে পড়িল—"ও মেয়ে ভাল শৈলেন··· তোমাদের যেখানে সৌন্দর্য্য, যেখানে মহত্ত্ব—সেখানে ওর চোখ গিয়ে পড়ে, কিন্তু ওর মায়ের বংশের কোন্ যুগের রাজামহারাজরা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে···"

আমি ভালবাসিয়াও যদি ওর এ নিরুপায় দুর্ব্বলতার কথা না বুঝি তো কে বুঝিবে? ভালবাসায় যদি অপরিসীম ক্ষমা রহিল না সরমার মত, যদি অন্ধতা রহিল না ইমানুলের মত, যদি উদ্দাম আবেগ রহিল না ভুটানীর ছেলের মত, তবে কিসের সে ভালবাসা?···হাসি পায়—আমি ইমানুলের প্রেমকে আমার গল্পে অভিনন্দিত করিয়াছি!—অপদার্থ সাহিত্যিক, জীবনে প্রেমকে করি পদে পদে অবমাননা, সাহিত্যে তাহাকে পরাই রাজমুকুট!

গাড়ির গতিবেগে বাতাসে একটা একটানা হু হু শব্দ। জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। অনুভব করিতেছি—প্রতি মুহূর্ত্তেই মীরা হইয়া যাইতেছে সুদূর।···এ-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নাই? ধর' যদি মীরার অভিমান না ঘোচে! মীরাকে যদি আর ফিরিয়া পাওয়া না-ই যায়! তাহার পরেও তো দিনের পর দিন জুড়িয়া কাটাইতে হইবে এই জীবনটাকে···

বাসায় আসিয়াই তরুকে মিষ্টার রায়ের নিকট লইয়া গেলাম। তরু তাঁহাকে উৎফুল্লভাবে জড়াইয়া বলিল, "কি চমৎকার জায়গা বাবা, কি বলব তোমায়! আমি কিন্তু শীগ্‌গিরই আবার চলে যাব বাবা, তা ব'লে দিচ্ছি···কি রোগা হ'য়ে গেছ বাবা তুমি!"

মিস্টার রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভেবেছিলাম এইবার মোটা হব, মা এসেছে। তা তুমি তো আবার চলেই যাচ্ছ।"

তরু হাসিয়া বলিল, "তোমায় আবার মোটা ক'রে দিয়ে তবে যাব।"

মিস্টার রায়ও হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম, তাহ'লে বেশ দেরি ক'রে মোটা হব'খন, না হওয়া পর্য্যন্ত তো আর যেতে পারবে না?"

আমায় বলিলেন, "তুমি হঠাৎ ফিরে এলে শৈলেন?"

উত্তর করিলাম, "ভাবলাম মিছিমিছি পার্সেণ্টেজ নষ্ট ক'রে···"

মিস্টার রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "Well I clean forgot it (একেবারেই ভুলে বসে আছি)

তোমার এক বন্ধু এসেছিল কাল। Let me see, ক্লীনারের হাতে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় রেখেছি দেখি দাঁড়াও।"

চিঠিটা বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার যাও তোমরা। আর তরু এবার তুমি একটু জোর ক'রে লাগো; you must soon decide whether it should be Loreto or লক্ষ্মীপাঠশালা (লরেটোতে পড়বে কি লক্ষ্মীপাঠশালায়, শীঘ্রই এবার ঠিক ক'রে ফেলতে হবে)।

ওদের বাপে মেয়েতে ইংরেজী চলে মাঝে মাঝে। তরু যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, "I have already decided daddy, if you come to that (যদি তাই-ই বলেন তো আমি মনস্থির ক'রেই ফেলেছি বাবা)।

মিষ্টার রায় কৌতূহলের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, "Well?" (অর্থাৎ?)

তরু হাসিয়াই বলিল—I would prefer লক্ষ্মীপাঠশালা (লক্ষ্মীপাঠশালাই পছন্দ আমার)।

মিস্টার রায় বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মুখটা লম্বা করিয়া লইলেন, বলিলেন, 'As much as to say you prefer your mummy to your poor old dad? (তার মানেই তুমি বুড়ো বাপ-বেচারির চেয়ে মাকেই চাও বেশি?) না, কখনই তোমার হাতে আর আমি মোটা হ'তে চাইব না, আড়ি, তোমার সঙ্গে।"

পিঠে দুইটা আদরের চাপড় মারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "Go and have a bath, look sharp, I will have it out of your mother (শীঘ্র গিয়ে এবার হাত-পা ধুয়ে ফেল, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করব)।

ঘরে আসিয়া চিঠিটা খুলিলাম। অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—

"নিতান্ত জরুরি কাজ ব'লে ছুটে এসেছিলাম। চিঠিতে লেখবার নয় ব'লে কোন ইঙ্গিতও দিলাম না। রাঁচি থেকে এসেই চলে আসবি একবার; নিশ্চয়।

অনিল।

তখনই গিয়া মিস্টার রায়ের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আসিলাম।

১০

আমি যখন পৌঁছিলাম সন্ধ্যা হব-হব হইয়াছে। বাড়ীতে কাহারও সাড়া নাই, ভিতরে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চিবুকটা চাপিয়া অনিল রকের উপর পায়চারি করিতেছে। আমায় দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "শৈল বুঝি? আয়।"

কাছে আসিলে আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "রাঁচি থেকে একটু বেশী তাড়াতাড়ি চলে এসেছিস।"

বোধ হয় একটু জড়িত কণ্ঠেই বলিয়া থাকিব, "মিছিমিছি পার্সেণ্টেজটা নষ্ট করা···"

কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না, স্থির-দৃষ্টিতে আরও কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "এখানে অনেক ব্যাপার···ঘটেছে এবং ঘটবে।"

আমার দৃষ্টিটা উৎসুক হইয়া উঠিল। অনিল বলিল, "এক নম্বর,—বাড়ীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়ীটা হয়ে গেছে খালি।"

শঙ্কিত ভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল বলিল, "অবশ্য অম্বুরী এণ্ড কোম্পানী কথকতা শুনতে গেছে, আটটা আন্দাজ ফিরবে; আমি বলছিলাম মা'র কথা।—বুঝতে পারছি একা যদি মা না থাকে তো বাড়ী খালি হ'য়ে গেছে বেশ বলা চলে।"

আমি আরও শঙ্কিত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া ওর মুখের পানে বিমূঢ় ভাবে চাহিতেই বলিল, "না, অত দূর নয়,—মা কাশীবাসিনী হয়েছেন। মামার একমাত্র ছেলে গেল মারা; বৈরাগ্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে কাশীবাসী হলেন। মার একমাত্র ছেলে রয়েছে বেঁচে, আতঙ্কে কাশীবাসিনী হলেন। অনেক বোঝালাম, কিন্তু ভাইপোর কীর্তিতে কি যে একটা অবিশ্বাস আমার ওপর হ'য়ে উঠল, কিছুতেই শুনলেন না। "তোরা সব পারিস, দাদার মত আমারও বুড়ো বয়সে দগ্ধাবার জন্যে আর বেঁধে রাখিস নি, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শরণ নিচ্ছি, আর বাধা দিস্ নি"—ব'লে জীবিত ছেলের শোকে চোখ মুছতে মুছতে ভাই আর ভাজের সঙ্গ নিলেন।···বাঙালী-মায়ের প্রাণের একটা নতুন দিক দেখলাম, অদ্ভুত! কত গভীর স্নেহ হ'লে এ রকম আতঙ্ক হয় ভেবে দেখ দিকিন!···যাক্, ভালই হয়েছে।"

বলিলাম, "বড় কষ্ট হবে, এই যা···"

অনিল বলিল, "বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হবার পর থেকে নিজের শরীর ব'লে আলাদা কিছু থাকে না, সন্তান হবার পর একেবারেই না; সুতরাং শরীরের কষ্ট ওদের কষ্টই

নয়। বাঙালী জাতটা বোধ হয় অনেক বিষয়েই আর অনেক সবার চেয়ে ছোট, কিন্তু এদের স্ত্রী আর মা আর সব জাতের স্ত্রী আর মায়ের ওপরে। জাতটা এই জন্যেই বেঁচে আছে এখনও।"

একটু চুপ করিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে আরও কয়েক বার পায়চারি করিয়া অনিল বলিল, "দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে সদু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "আত্মহত্যা!—কেন?"

"কেন!" বলিয়া অনিল একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "তুই দাঁড়িয়েই আছিস।" ভিতর থেকে একটা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দিয়া বলিল, "এই হ'ল যা ঘটেছে। যা ঘটবে তা এই যে সদুকে আমি আমার নিজের বাড়ীতে এনে রাখব ঠিক করেছি।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। না বলিয়া পারিলাম না, "তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনিল?"

আমি বসি নাই, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম। অনিল ঠিক আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, কতকটা ব্যঙ্গের হাসির সহিত বলিল, "আমি জানতাম ঠিক এই ভাবে এই প্রশ্ন করবি। তুই হচ্ছিস আমাদের সমাজের প্রতীক শৈলেন; সমাজের নিজের মাথার ঠিক নেই, যদি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কেউ একটা সমস্যার সমাধান করে তো উলটে বলবে তারই মাথা খারাপ হয়েছে। সদু মরতে বসেছে চারিদিক দিয়ে, সমাজ ভ্রূক্ষেপও করলে না; এখন আমি তাকে চারিদিক থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি—বলবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমায় একঘরে করে, আমার ধোবানাপিত বন্ধ ক'রে আমার চিকিৎসা করবে। এ এক চমৎকার ব্যাপার, যতই ভাবি ততই আশ্চর্য ব'লে মনে হয় আমার। আইন, যেটাকে আমরা প্রাণহীন যন্ত্রের সামিল ব'লে ধ'রে নিই সেটা পর্যন্ত সদুর মত হতভাগিনীকে মরতে দিতে রাজি নয়, মরতে চেষ্টা করছে খবর পেতেই দারোগা এসে তদন্ত ক'রে গেল, একটু লেখালেখি হাঁটাহাঁটি প'ড়ে গেল, বেশ টের পাওয়া গেল তার যান্ত্রিক বুকে একটা আঘাত লেগেছে। আর সমাজ, যাকে আমরা প্রাণবন্ত ব'লে মনে করি সে রইল একেবারে নির্বিকার। একবার কেউ ফিরেও দেখলে না।…ওরই মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল, তোকে না ব'লে থাকতে পারলাম না। তার পর দিন ছিল সাতকড়ি চাটুজ্যের ছেলের পৈতের নেমন্তন্ন। আমি যে-সারিটাতে বসেছি তার পেছনের সারিতে, আমার সঙ্গে প্রায় পিঠোপিঠি হয়ে বসেছে সনাতন চক্রবর্তী আর পুরুষোত্তম সার্বভৌম। দ্বিতীয় বার মাছ পরিবেশন করতে এসেছে। শুনছি সার্বভৌম কি একটা চিবোতে চিবোতে বলছে—'মাছ তো পাতে রয়েছে প্রচুর, মুড়ো থাকে তো দিতে পার একটা, একটার বেশী নয়, পরিপাকশক্তি আর সে-রকম নেই কি না।' চক্রবর্তী বললে, 'কাল দেখলে তো ব্যাপারটা পুরুষোত্তম?— একেবারে আত্মহত্যা!'… পুরুষোত্তম ঘেন্নায় আতঙ্কে এমন শিউরে উঠল যে আমার পিঠটাতে পর্যন্ত একটা ধাক্কা লেগে গেল। বললে, 'নারায়ণ! নারায়ণ!—তুমি এ রকম একটা অশুচি প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আর অবসর পেলে না সনাতন? শাস্ত্র বলেছেন আত্মহত্যার কথায় শ্রুতি পর্যন্ত কলুষিত হয়ে যায়। শিব শিব! নারায়ণ নারায়ণ!'…এদের পাশে যে ব'সে আছি এতে আমার সমস্ত শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠল। মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এল। সার্বভৌম যেই 'নারায়ণ নারায়ণ!' ক'রে উঠেছে, আমি, আগে যেন কিছুই শুনি নি এই ভাবে 'কি হ'ল! কি হ'ল!'—ব'লে একেবারে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। একটা হৈ হৈ প'ড়ে গেল, আর এ-অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে, আরও কয়েক জন আতঙ্কের মাথায় উঠে দাঁড়াল। সার্বভৌম মুড়াটা তুলতে যাচ্ছিল মুখে, হাঁ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে ব'ললে, "কি হ'ল?" সেরকম নৈরাশ্য আর নিষ্ফল ক্রোধের মূর্তি আর কখনও দেখি নি শৈল। কি আনন্দ যে হ'ল! বললাম, 'আপনি হঠাৎ 'নারায়ণ নারায়ণ!' ক'রে উঠলেন, ভাবলাম মস্তবড় একটা ছোঁয়াছুতের ব্যাপার হ'য়ে গেছে বা অন্য রকম কিছু বিঘ্ন হ'য়েছে; পেছন ফিরে আছি, দেখতে তো পাই নি, ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি; আর বসাটা শাস্ত্র-সঙ্গত হবে না বোধ হয়?'…সবারই খাওয়া গেল, কষ্ট হ'ল, একটা গোলযোগও হ'ল খুব; কিন্তু একা সার্বভৌমের হাতের মুড়ো যে মুখে উঠতে পেল না সেই আনন্দে আমি আর কিছু গ্রাহের মধ্যে আনলাম না; মনে হ'ল সদুর অপমানের তবুও টাটকা-টাটকি একটা প্রতিশোধ নিতে পারলাম। কিন্তু ও একটা সাময়িক ফুর্তি; নেহাৎ একটা সুবিধে হাতের কাছে এল, ছাড়লাম না। ওতে তো সদুকে বাঁচাতে পারা যাবে না। একটা উপায় ছিল তোর হাতে; কিন্তু তোর যা চিঠি দেখলাম, তার পর আমার দ্বিতীয় চিঠির পরে তুই যেমন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলি তাতে বুঝলাম ও গুড়ে বালি। তখন নিরুপায় হয়ে ভেবে ভেবে

এই উপায় ঠাওরালাম, মানে সত্নকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসা। অম্বুরীকে পর্যন্ত রাজি করলাম, অবশ্য খুব সহজেই হ'ল, কেন-না যে-ব্যাপারে আমি রয়েছি তাতে অম্বুরীর নিজস্ব একটা মত থাকতে পারে, কিন্তু অমত নেই। অর্থাৎ কি ভাল কি মন্দ সে খুবই জানে, কিন্তু সবার ওপরে জানে স্বামী-দেবতার কথা।

এখন তুই প্রশ্ন করবি, সবই যখন ঠিক তখন তোর কাছে আবার কি করতে ছুটেছিলাম। ছুটেছিলাম এই জন্যে যে সমস্যাটার যখন প্রায় জোট খুলে এনেছি মনে করলাম, তখন হঠাৎ দেখি সেটা আরও সাংঘাতিক রকম জটিল।...তুই দাঁড়িয়ে রইলি শৈল, ব'স।"

অনিল নিজেও মাদুরটাতে বসিল। আমি বসিলে বলিল, "অম্বুরীর মত পাওয়ার পর, কিংবা অম্বুরীর মুখে আমার মতের প্রতিধ্বনিটা শোনবার পর বাকি রইল খোদ সৌদামিনীর মত নেওয়া। তার সঙ্গে দেখা করলাম। কোথায়, কবে, কখন—সেকথা থাক; এ ত আর কাব্য হচ্ছে না। সত্নকে সব কথা বললাম। বললে, 'এটা তোমার সম্ভব ব'লে মনে হ'ল অনিলদা?'...বললাম, 'অসম্ভব কিসে?'...বললে, 'ভাগবত-কাকা ছাড়বে কেন? একটা কুকুরকে দু-মুঠো ভাত দিলে তার ওপর অধিকার জন্মে যায়।' ..আমি বললাম, 'কিন্তু মানুষের ওপর জন্মায় না; তুমি সাবালিকা।'...সত্ন বললে, 'ও ত আইনের কথা; একই গ্রামে রয়েছি, ভাগবত-কাকার কাছ থেকে আইন কত দিন বাঁচাবে? সমাজের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ, সবার টিকি ভাগবত-কাকার কাছে বাঁধা, টিকতে পারবে?'...বললাম, 'সে ঠিক করেছি; না পারি বাড়িঘরদোর বেচে চুঁচড়োয় গিয়ে থাকব।'...সত্ন কাতর-ভাবে বললে, 'অনিল-দা, আমার সবচেয়ে ভাবনার কথা কি জান?—ওরা আমায় মরতে দেবে না। অথবা এই রকম তুষানলে দগ্ধ হয়ে আর মরতে পারি না। আমার মাথার একেবারেই ঠিক নেই; এই দশা হয়ে পর্যন্ত শুধু একটি দিন আমার মাথার ঠিক ছিল—যেদিন বিষ খাই। অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দেখলাম এ পৃথিবী থেকে যাওয়াই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু হ'ল না। তার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে দেখবার ক্ষমতা হারিয়েছি। এ অবস্থায় আমায় আর লোভ দেখিও না অনিল-দা। তোমার বাড়ী আমার স্বর্গ, যে নরক-যন্ত্রণায় ভুগছে তাকে যদি স্বর্গে ডাকা যায় সে কি বিচার ক'রে দেখতে পারে? তবে মোটামুটি বুঝছি কাজটা ভাল হবে না।'

আমি অনেক ক'রে বোঝালাম; বললাম, 'বিপদ যদি থাকে ত আমারই, তা আমরা দু-জনে যখন তার জন্যে তোয়ের রয়েছি সত্ন অমত করে কেন? তার কলঙ্ক আছেই কপালে, আমার বাড়ীতে থাকলেও, ভাগবতের বাড়ীতে থাকলেও; তবে সে নিজে যদি এই দুই জায়গার অপবাদের মধ্যে কোন রকম তফাৎ না দেখে, আমায় যদি এতই অবিশ্বাস করে ত আমার কথাটা তোলাই ভুল হয়েছে।'

অবিশ্বাসের কথায় সত্ন একটা কাণ্ড ক'রে বসল। দু-হাতে আমার হাত দুটো খপ্ করে ধরে নিলে। বললে, 'সেই সত্নই আছে তোমাদের; ঈশ্বর সাক্ষী। ছেলেবেলায় তোমাদের হুকুম করতাম, সেই অপরাধের এই রকম করেই শোধ নেওয়ালেন ভগবান,—মেনে নিচ্ছি তোমার এ মোক্ষম হুকুম অনিল-দা। কবে আসতে বল্ছ, বল। সত্যিই ভাগবত-কাকার নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছে না।'

সত্ন একেবারে ভেঙে পড়ল। আমার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে, আমার হাত দুটো নিজের মাথায় চেপে ফুলে ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলে। আমি কিছু বললাম না। মনটা হাল্‌কা হ'লে উঠে দাঁড়াল, আমার হাত দুটো ধ'রেই আছে। মিনতির স্বরে বললে, 'শুধু একটা কথা রেখ অনিল-দা।'...জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা?'...সত্নর চোখে আবার জল উপ্‌ছে উঠল, বললে, 'অবিশ্বাসের কথা নয়, ধর্ম সাক্ষী। কিন্তু সতীর জীবনে কখনও দুঃখের অভাব হয় নি, হবেও না। তাই, যদি কখনও এমনই হয় যে পোড়া প্রাণটাকে হিঁচড়ে বের ক'রে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় না থাকে ত বাধা দিও না, এখন থেকেই মিনতি ক'রে রাখলাম।'

সত্ন আর এক চোট ভেঙে পড়ল।

অনিল চুপ করিল। আলো জ্বালা হয় নাই, বাড়ীতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল বলিয়া উঠিল, "কি বলিস? সমস্যা নয়?" বলিলাম, "সমস্যা বই কি; মরণ যেন ওর জন্যে ওৎ পেতে ব'সে আছে।"

অনিল বলিল, "অথচ এই মরণের হাত থেকে ওকে বাঁচান যায়; অব্যর্থ।"

আমার মনটা মথিত হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবে সত্ন ওর একারই চিন্তা? পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি? ওর একা সত্ন, আমার সত্ন আর মীরা—কর্তব্য আর ভালবাসা। আমার যন্ত্রণা অনিল

বুঝিবে না, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন। আমি নীরব আছি দেখিয়া অনিল বলিল, "তাই তোর কাছে গেছলাম তাড়াতাড়ি শৈল। তোকে এক সময় বলেছিলাম চিঠি পেয়ে এবং না পেয়ে তোর মনের ভাব বুঝেছি, আর যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু দেখলাম সদুর সমস্যা আরও জটিল, আমি তাকে বাড়ীতে ঠাঁই দিলেই মিটবে না। তাই ভাবলাম আর একবার ব'লে দেখি শৈলকে। অবশ্য সদুকে বলি নি এখনও, কিন্তু আমি ওর মন জানি। ইদানী সদুর সঙ্গে কথাবার্তায় একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি শৈল, এ-সময় বলাটা ঠিক হবে না, ভাববি আমি তোর মন ঘোরাবার জন্যে মিথ্যা রচনা ক'রে বলছি; কিন্তু তবুও বলি—সদু আমায় কখনও ভালবাসত না শৈল। যখন টের পেলাম, মনে একটা ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম ঐটেই ঠিক স্বাভাবিক। আমি সদুকে ভালবাসতাম, তুই ছিলি উদাসীন; সব মেয়েরই উমার অংশে জন্ম—উদাসীনের জন্যই তাদের তপস্যা।"

আমার মনে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এ তত্ত্বটা আমিও টের পাইয়াছিলাম—অর্থাৎ আমার প্রতি সৌদামিনীর মনের ভাবটা। অনিলের উপর ওর সব-ঢালা নির্ভর আর অপরিসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু অনিল যাহা আশা করিয়াছিল সদু তাহা দিতে পারে নাই, সে-জিনিসটা সদু আমায়ই দিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হইয়াছিল।

কিন্তু আমার নিজের কথা?...মনে পড়িতেছে মীরার মুখখানি। বেশ বুঝিতেছি ঐ একখানি মুখ জীবনে ভালবাসিয়াছি, কামনা করিয়াছি, স্বপ্নমণ্ডিত করিয়াছি। আঘাত দিয়া আসিয়াছি; ষ্টেশনের প্লাটফরমে অপলক দৃষ্টিতে অপসৃয়মান গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে মীরা। কি কঠিন, সমস্ত চিত্ত উদাস-করা বিদায়!

অপর দিকে ঐ ভালবাসার সামনে—চিত্তের ঐ বিলাসের তুলনায় সৌদামিনীর ব্যর্থ, বিপন্ন জীবন—রূঢ়, কঠোর বাস্তব!

কি করি আমি? এ কি অসহ্য অবস্থা!

আমি ব্যথিত ভাবে অনিলের পানে চাহিয়া রহিলাম—"অনিল, আমি পারব না। উপায় নেই; কিন্তু তবুও বলছি আমায় সাতটা দিন সময় দে। পরন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে যাতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যদি পারি ত জীবনে আর আমি হঠাৎ কিছু ক'রে বসব না। কিন্তু আমি করছি চেষ্টা। বোধ হয় তোর কথা রাখতে পারব না অনিল, এই রকম ভাবেই মনটাকে তোয়ের রাখিস। সঠিক উত্তর এই সাতটা দিন পরে দোব।"

অন্য দিন হইলে বোধ হয় অনিলকে কথা দিয়াই দিতাম, ওরই প্রস্তাবে সায় দিতাম, সদুর মৃত্যুর সম্ভাবনাও ত কম ব্যাপার নয় একটা। কিন্তু মীরাকে আঘাত দিয়া আসিয়া বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অম্বুরী আসিল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলিল, "জ্বালো নি ত আলো ঘরে? কি আলসে কুড়ে মানুষ বাপু! কোথাও গিয়ে যে একটু নিশ্চিন্দি..."

দু-জন দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, "অন্য কেউ নয়, শৈল এসেছে। তুমি যত মিষ্টি মিষ্টি শোনাবার শুনিয়ে যেতে পার, তোমার পতিভক্তির আসল রূপ জানা আছে ওর।"

ক্রমশঃ

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকণা

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি পরে দিনরাতি
লেখে নানামতো আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরানে মিলায়ে রেখার ফাঁকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

[শ্রীযুক্ত মনোভিরাম বড় রায় স্বাক্ষর-পুস্তক হইতে]

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক সুন্দর পরিমলে
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য মধুরসে ভরা ফলে।

[শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর-পুস্তক হইতে]

মংপুতে

দ্বিতীয় পর্ব্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

১

পুরী থেকে সংবাদ এল ১৪ই মে মংপু পৌছবেন। ষ্টেশনে জনারণ্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে, একবার একটুক্ষণের জন্ত তাঁকে দেখবে। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁরাও তাঁকে দেখেছেন,—বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা তাঁর তাঁকে ত গোপনে রাখে নি। কিন্তু কাব্যশরীরে যে রূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছেন, সেই রকমেই এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় স্পর্শ ছিল প্রত্যক্ষদেহধারী রবীন্দ্রনাথের দর্শনে। কত হৃদয়কে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, কত মূককে তিনি ভাষা দিয়েছেন, কত অকথিত কথা তিনি বলেছেন সে কারুই অজানা নয়; কিন্তু কেবল মাত্র তাঁর শরীরী উপস্থিতি, তাঁর ক্ষণিকের দর্শনও মানুষের মনে যে আনন্দ উদ্বেলিত করত তা বহু লোকের জানবার সৌভাগ্য হ'ল না।

সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

মানুষের হৃদয়ে তিনি ফুল ফোটাতে পারতেন। মূক জড় মৃত্তিকার মধ্যে যেমন ফুল ফুটে ওঠে।

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে
পাতার পাখা মেলে দিয়ে হাওয়ায় থাকে লোটাতে।

এ-কথা বার-বার অনুভব করেছি আমরা।

সাড়ে ন'টার সময় নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ঢুকল শিলিগুড়ি প্ল্যাটফর্মে। উৎসুক জনতা পথ ক'রে দিল। কোনো-মতে চেয়ার নিয়ে গাড়ীর সামনে উপস্থিত হলাম। একটা "কুপে"র মধ্যে চকোলেট রঙের জোব্বা প'রে বসে ছিলেন। "আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার সাজগোজ কিছু হয় নি; কোথায় লিপ্‌ষ্টিক, কোথায় রুজ! একেবারে ফস্ ক'রে ঢুকে পড়লে" "সুধাকান্তবাবু আসেন নি?" "আহা সুধাকান্ত বাবু না এলে ত কোনো মজাই নেই জীবনে! তাহলে ত ফিরে গিয়ে এখন তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হ'ত। বাবাঃ কী একখানা টেলিগ্রাফ করলে—Sudhakanta babu's letter read clear!" আমি বলি বলডুইনকে,* "এত মস্ত পত্রলেখক লিপিকুশল হয়ে উঠলি কবে থেকে? একেবারে যে read clear! আমরাও ত মাঝে মাঝে চিঠি লেখবার চেষ্টা ক'রে থাকি কিন্তু সে ত এত পরিষ্কার হয় না। অন্তত আজ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফে জবাব পাই নি Rabindranath's letter read clear!"

"আহা, আপনি যদি টেলিগ্রাফ না পড়তে পারেন, ত, আমি কি করব? আমি লিখেছিলুম, Sudhakanta babu's letter; তার পরে stop, তার পরে road clear এখানকার পথ বন্ধ আছে কী খোলা আছে তা জানাতে হবে না?"

"সে আমি জানি নে, স্পষ্ট দেখলুম, রেড্ ক্লিয়ার—বলডুইন ত বিপদে পড়ে গেল, টাক ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল—রেড্ ক্লিয়ার;—এ ত সোজা কথা নয়!"

"আপনি না এসে পৌছন পর্য্যন্ত বিশ্বাস হয় না যে আসবেন, কখন মত বদলায় সেই ভয় সর্ব্বদা থাকে।" "তা ত হতেই পারে। আমাদের বংশগত সংস্কার—Babu changes his mind—সে জান ত?" (শুনেছি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইয়োরোপ প্রবাসের সময় অনেক বার ভ্রমণ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন ঘট্‌ত। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এক সহচর কোনো চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমাদের শীঘ্রই অন্যত্র যাবার কথা আছে কিন্তু স্থির বলা যায় না কারণ Babu changes his mind so often!) সে কথা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। কারণ মত পরিবর্ত্তন করতে, বিশেষত ভ্রমণের প্ল্যান পরিবর্ত্তন করতে, উনিও সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বলতেন, "জানই ত ওটা আমাদের বংশানুক্রমিক।"

"তুমি কি কলকাতায় ফোন্ করেছিলে না কি? এক-একবার যে ফিরে দৌড় দেবার ইচ্ছে হয় নি তা নয়,

* সুধাকান্তবাবুর মাথায় টাক থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "Bald-win" বলতেন।

তার পর ভাবলাম এ কন্যাটিকে আর দুঃখ দেব না।" "সেই জন্যই এবার আপনাকে চিঠিও লিখি নি, আসবার কথাও লিখি নি—এখানে সবাই বলছিলেন, আসল ব্যক্তিকে কিছু না লিখে অন্য সকলকে লেখার মানে কি? আমি বললুম, তার অর্থ অতি গূঢ়—এবার আমি যাবও না আনতে, লিখবও না কিছু, কোনো রকম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করব না। আমার দাবী তাহলেই মিটবে যদি ধৈর্য্য ধরে নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকি।" "ঠিকই ধরেছ, ঠিকই ধরেছ। তুমি দেখছি মস্ত সাইকোলজিষ্ট হয়ে উঠলে—যে আড়ালে থাকে সেই বেশী সামনে আসে, যে নীরবে থাকে সেই বলে বেশী। যদি কলকাতায় যেতে হয়ত বুঝিয়ে দিতুম এখন আর যাওয়ার হাঙ্গামা না করাই ভালো, কিন্তু হঠাৎ একটা টেলিগ্রাফ পাঠান unavoidably detained cann't come, সে হয় না, সে বড় কঠোর হয়ে পড়ে।" "সেই জন্যই ত যাই নি এবার আনতে। সেবার পূজার সময় যা কাণ্ড করলেন কলকাতা পর্য্যন্ত এসে"—"ওঃ সেবার? আঃ তোমার স্মৃতিশক্তি এত প্রখরা কেন? ভুলে যাও ভুলে যাও, এবারে ত একেবারে নির্দ্দিষ্ট দিনে এসে উপস্থিত হয়েছি—তোমাদের দিন গণনা শেষ হয়েছে।"

যখন মংপু পৌঁছলাম, দুপুর বেজে গেছে। "ওরে আলু, আমার সেই পুরীর টাকার থলিটা সাবধানে রাখিস্, এখানে আবার—বলতে নেই—সকলের স্বভাব তেমন সুবিধে নয়। আলুর নামের উৎপত্তি জান ত? ওর একটা মজবুত রকম সংস্কৃত নাম ছিল, কিন্তু সে এখন আর কেউ জানে না—যেদিন শুনলুম ও পটলের ভাই, সেই দিন থেকে ও আলু—আজকাল আবার দিশী আলুতে কুলচ্ছে না তাই বলি পটেটো আমার এক দিকে বলডুইন এক দিকে পটেটো।"

"পুরীর টাকার থলিটা কি?" "ওই দেখ ঠিক দৃষ্টি পড়েছে—যার যা স্বভাব। পুরীতে আমায় পার্স উপহার দিয়েছিল। ওর মধ্যে আছে ১৯ টাকা আট আনা—আজকাল আর আমার সেদিন নেই, হাতে আছে তাজা ১৯ টাকা আট আনা। তা যে জায়গায় এসেছি এখন সামলে রাখতে পারলে হয়। একবার ত এক জায়গায় জুতোর এক পাটি গেল হারিয়ে। আরে সরাতে হয় ত দু-পাটিই সরাও, তা নয়—স্ত্রীবুদ্ধি বলে একে।"

"তোমার এই বাঁশের পুষ্পাধারটি ত ভারি সুন্দর, এই রকম জিনিসেই ফুল ভালো মানায়। সৌখিন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজাতে চায়—একটু বেশী রকম বাড়াবাড়ি সেটা, আমি তাই মাটির পাত্রে ফুল রাখতে চাই, এ তোমার আরও ভাল। কি এই নীল ফুলের রং? ফুলের নীল রংটাই আমার ভালো লাগে বেশী, ভাল দেখতে পাই। কে এ বিদেশিনী?"

"নাম শুনলে অশ্রদ্ধা হয়ে যাবে আপনার। এর নাম "জ্যাকারান্ডা।"

"ও কিও, এমন সুকুমার রূপে এমন দন্তবিমর্দ্দিনী নাম! তোমরা হ'লে শিক্ষিত মালিনী, তোমাদের এ-সব নাম মনে থাকে—আমি একেবারে মনে করতে পারি না, একটা জানি, 'কার্নেশেন'। তোমার কন্যা যে এই ফুলের দেশে প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ হচ্ছে—এ খুব স্বাস্থ্যকর। শহরে মানুষের চাপে ইস্কুলের অত্যাচারে সে এক প্রাণ-বের-করা আবহাওয়া। আমাদের ওখানেও—খোলা মাঠের মধ্যে খোওয়াইয়ের উপর ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি নামলেই দল বেঁধে ভিজতে বেরোয়, কী আনন্দ তাদের। খুশী হবার সুযোগ পায় তারা। সেদিন তোমার কন্যে একটা পোকা ধরে এনে অনেক প্রাণিতত্ব বোঝালে আমাকে; কি বললে কিছুই শুনতে পাই নি, যদিও তাতে কিছু এসে গেল না, উৎসাহ কিছুই কমল না। এ রকম উৎসাহ বাড়তে থাকলে এ রাজ্যের পোকাদের নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে হবে।"

সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের গায় একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত, এইটি ওঁর ভারি ভালো লাগত দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে, একাকার হয়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়, শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্ত্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্ত্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে ওখানেও মানুষের জীবনযাত্রা চলেছে, এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর, কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবনযাত্রা কিছুই জানি নে! শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলো, প্রাণের আলো! "ওকি ও অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমাদের মহামান্য পটেটো আর ডাক্তার কি করছেন? আলু যখন আছে তখন মনে হচ্ছে আজ একটা কাণ্ড ঘটবে।" "সামনের পাহাড়ে চিত্রিতারা আছে, তারা আলো দিয়ে এখুনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, আমাদের নিজেদের কোড্ আছে তাই ওঁরা আলো নিয়ে তৈরি হচ্ছেন।" "ওঃ বাবা! এ ত ব্যাপার কম নয়। সচিত্রা দেবী বিরহিণী, বসে আছেন, আর এখান থেকে তাঁর ভগ্নীপতি আলোর দূত পাঠাবেন। ও হে ডাক্তার, এ যে মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গেল। তুমি এতটা সহ্য কর কি ক'রে? আবার হাসে, অত হাসি কেন? বার-বার বলেছি

আমার কথায় কখনো হেসো না তোমরা। আমি ত ঠাট্টা করতে পারি নে। হিউমারের বোধ নেই আমার তা প্রমাণ হয়ে গেছে জান না? একজন প্রফেসার প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন লিরিক কবিদের হিউমারের বোধ থাকে না, অকাট্য তাঁর সব যুক্তি। কাজেই হয় মানতে হয় আমার মধ্যে হিউমারের বোধ নেই, নয় স্বীকার করতে হয় আমি কবি নয়, এত কষ্টের কবিখ্যাতিটি খোয়া যাবে? কাজ কী, তার চেয়ে আমার কথায় তোমরা আর হেসো না।" "এ আবার কে লিখলে?" "একজন অধ্যাপক গো, অধ্যাপক, তা না হ'লে আর এত বিশ্লেষণ-বুদ্ধি হয়, এত অকাট্য যুক্তিই বা আর কে পাবে? নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা যাঁদের?"

"এখানে সন্ধ্যেবেলা তোমরা কি কর? তাস খেল না আজকাল যে ওই এক খেলা হয়েছে ব্রীজ?" "না, ওসব আমার একেবারে আসে না।" "আমারও না, তবে এক সময়ে একটু একটু খেলেছি বটে দায়ে পড়ে। আমাদের সময়ে সব অন্য রকম খেলা ছিল—গ্রাবু খেলা হ'ত খুব।" "আজ তাস খেলবেন সন্ধ্যেবেলায়?" "মন্দ কি! কিন্তু এসোসিয়েটেড্ প্রেসে খবর দিও না যেন! আমার আবার ওই এক গেরো সঙ্গে আছেন এসোসিয়েটেড প্রেস। তার পর থেকে বোঝা বোঝা তাস আসতে থাকবে সার্টিফিকেট লেখ কোন্ তাসে কি গুণ, তাসখেলায় কি উপকার, কাদের তৈরি তাস উৎকৃষ্ট। সার্টিফিকেটের জ্বালায় আর নামকরণের ঠেলায় পেরে উঠি নে। যত লোকের নাম দিয়েছি আজ পর্য্যন্ত, প্রশান্তকে বলতে হবে তার ষ্টাটিস্‌টিক্ করে দেখবে তার মধ্যে কে কি হয়েছে, কটা খুনী কটা বা চোর ডাকাত। আর আশীর্ব্বাদেরও একটা হিসেব নেওয়া দরকার, তাহলে আমার আশীর্ব্বাদের যে কী মূল্য হাতে হাতে তার একটা প্রমাণ হয়ে যায়।"

সন্ধ্যেবেলা তাস সাজিয়ে সবাই মিলে বসেছি, ভারি মজা লাগছিল আমাদের তাঁর সঙ্গে তাস খেলা, এসোসিয়েটেড্ প্রেসে দেবার মতই এ ঘটনা। "কৈ তোমাদের সম্বল কি? টাকা বের করো, বিনি পয়সায় তাস খেলবে তা হবে না, এবার আমার সচ্ছল অবস্থা—সাড়ে উনিশ টাকা থলি ভর্ত্তি তা জান? অবশ্য এখনও আছে কি না জানি নে!" সুধাকান্ত বাবু ধরে ফেললেন, "এ কি কাণ্ড! নিশ্চয় তাস বদল করছিলেন আপনারা!" হেসে হাতের তাস ফেলে দিলেন; নাঃ এ রকম মোটাবুদ্ধি পার্টনার নিয়ে আর যাই হোক তাসখেলা চলে না। কতক্ষণ থেকে ইসারা করছি বোকার মত চেয়ে আছে। তার চেয়ে কবিতা পড়া যাক্। এ রকম স্থূলবুদ্ধির পক্ষে তাসের চেয়ে কবিতাই ভালো।"

ভোরবেলা অল্প রোদ এসে পড়েছে কাঁচের ঘরে। কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে দুটো প্রকাণ্ড হলিহক ফুটে রয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা ভ্রমর কাঁচের আবরণ বুঝতে পারে না বারে বারে ফুলের উপর পড়তে চায়। "এসো হে কমলিনী দ্বার উন্মোচন কর, মুক্তি দাও আবদ্ধ ভ্রমরকে। অনেকক্ষণ থেকে বেচারার দুঃখ চলেছে, আমি গাইছিলুম 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে' ওর দুর্দ্দশা দেখে থামতে হ'ল। তোমার এই হলদে রঙের ফুলের সারিটি কিন্তু অতি-অপরূপ হয়েছে—আমি এতক্ষণ বসে বসে দেখছিই দেখছিই। কি ফুল এ? কোনো অভিজাত-বংশীয়া নিশ্চয়?"

"মোটেই নয়, ও বন্য লিলি—একেবারে বন্য।" "এ কিন্তু ফুলের রাজ্য, ফুলের দেশ।" "কিন্তু এখন মোটেই ফুলের সময় নয়—মার্চ্চ এপ্রিলে এখানে ফুল দেখবার মত হয়, এখন ত শূন্য বাগান।" "এই যা আছে এর জন্যই I am grateful madam, I am grateful to you। শুধু যদি দয়া ক'রে তোমার চাকরদের বুঝিয়ে দাও এমন ক'রে একটা পাত্রে এত ফুল না গুঁজে দেয়। এই দেখ না মহাদেব এইমাত্র ফুলগুলো রেখে গেল, অতগুলোকে একসঙ্গে গুঁজে দিলে ওদের প্রত্যেকের জাত মারা হয়—ওতে সকলেরই বিশিষ্টতা নষ্ট হয়, আর সব মিলিয়েও এমন কিছু সার্থক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। জাপানীদের ফুল সাজান এত সুন্দর কারণ সে ভারি simple। ওরা একটা পাত্রে একটিমাত্র ফুল রাখে। তাই সেটিকে দেখা যায় পরিপূর্ণ রূপে, সেই একটিই যথেষ্ট হয়ে ওঠে।"

সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল একেবারে হঠাৎ। সমস্ত দরজা জানালা যেন ভেঙে নিতে চায়। ওঁর ঘরের স্কাইলাইটগুলো খোলা ছিল, ভাবনায় পড়লুম আমরা, যা হোক, আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকা গেল, তখন রাত্রি গভীর, অন্ধকারে যত দূর মনে হ'ল ঘুমিয়ে আছেন। গায়ে একটিমাত্র বালাপোষ, আমরা জানালা বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে গায়ের উপর কম্বল দিয়ে চলে এলাম। পরদিন সকালে উঠেই বলছেন, "কাল তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কি কাণ্ডই করলে! সে এক সমারোহ ব্যাপার, আমি চুপ ক'রে দেখছি কি দুর্ঘটনা ঘটে।" "আপনি জেগে ছিলেন? কিছু ত বুঝতে পারি নি?" "বুঝতে না দিলেই বোঝা যায় না। রাত দুপুরে এসে জানালা বন্ধ করছেন পাছে ভূমিকম্প ঢুকে পড়ে। দু-জনে দিব্যি আমার দুটো জামা চুরি ক'রে—

"আহা আপনার জামা চুরি করব কেন ?" "আবার বলে কেন চুরি করব, ওই রকমই স্বভাব বলে। স্পষ্ট দেখলুম আমার মত জামা।" "ও-ত ড্রেসিংগাউন।" "ফস্‌ ক'রে একটা ইংরেজী নাম ব'লে দিলেই হ'ল। যাক, যা হবার তা হবে, একলা চলেছি এ ভবে, জামা যার লবার সে লবে। এখন তোমার কর্তৃকারককে বলো আজকের খবরটা শুনুন। এ চীন দেশের কাহিনী আর শুনতে পারি নে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি, কিন্তু না শুনেও ত পারি নে, চোখ বুজে ত বেদনার অন্ত করা যায় না, এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য এই, যত দুঃখই পাও, যতই শুভ ইচ্ছা কর, এতটুকুও শুভ ঘটাতে পার না—শুভ কামনার, কল্যাণ বুদ্ধির কোনো ফল নেই। বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর, এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ মানুষের বুকে বার বার নিষ্ঠুর ছুরি উদ্যত করছে। এ নৃশংসতা আর কত দেখব ?"

"তোমাদের মেয়েদের এই বড় দোষ একটা যদি কিছু হ'ল সে আর মন থেকে তাড়াতে পার না, কে কি বলেছে আর বলে নি, কি এসে যায় তাতে ? আমায় ত যত নিন্দে করে তত গায় জোর পাই, টনিকের কাজ করে। অতএব বাজে কথা না ভেবে আমার সুপরামর্শ শোন। এস কাব্যালোচনা করা যাক্‌। তুমি একটা কবিতা পড়, আমি অবহিত হয়ে শ্রবণ করি।" "ভাল লাগছে না এখন।" "ওই ত দোষ। যখন খুব ভালো লাগা উচিত ঠিক তখুনি ভালো লাগে না। শোন আমার কথা, আজকাল কী লেখ নিয়ে এসো দেখব।" "সে অসম্ভব। হতেই পারে না।" "অবশ্য হবে এখুনি হবে, যাও আর লজ্জায় কাজ নেই, সেই যে-কবিতাটা আমায় পাঠিয়েছিলে সেইটে আন। এখন পড়, লক্ষ্মী হয়ে—এতে আপত্তির কি আছে ? কবিতা পড়াটা ত দুষ্কর্ম্ম নয়।"

কুন্ঠিত কৈশোর যবে আপনারে আপনি না জানে,
কখন দাঁড়ালে এসে কম্পিত মর্ম্মের মাঝখানে,
কত সে নিস্তব্ধ রাতে জাগি দীর্ঘ তামসী রজনী
হৃদয়ে শুনেছি নিত্য অশ্রুত তোমার কণ্ঠধ্বনি।
অলস মধ্যাহ্নে কত বাদলের সন্ধ্যায় সজল
অপূর্ব্ব বেদনা আনে গীত স্নিগ্ধ ছন্দ অবিরল
অদৃশ্য মুরতি জাগে ভরি মোর মুদিত নয়ন
প্রত্যহের বন্ধ হতে ছুটে যায় উড়ে যায় মন
তুচ্ছ হয় দুঃখ সুখ গ্লানি যত ঢাকা পড়ে যায়—
নিভৃত মন্দিরে মম স্বপ্নাচ্ছন্ন মুগ্ধ চেতনায়।
শুধু তব কাব্য নহে, নহে শুধু সুর সত্তার
সমস্ত ছাড়ায়ে তুমি দাঁড়ায়েছ হৃদয়ে আমার।
জীবন প্রত্যুষ হতে সে স্পর্শ গভীর মর্ম্মে লিখা
আমারে জ্বালায়ে তোলে অকম্পিত ঊর্দ্ধমুখী শিখা।
তবু কি যে খুঁজে ফিরি জানি না কি জাগে মনে আশা
অর্থহীন কী বেদনা নিত্য চায় প্রকাশের ভাষা।
গোপনে সঞ্চিত অর্ঘ্যে ম্লান পুষ্প সিক্ত অশ্রুজলে
স্খলিয়া পড়িতে চায় সরম কুণ্ঠিত চিত্ততলে।
কেন এ আকাঙ্ক্ষা জাগে কোনো তার পাই না উত্তর।
ধূম্রলীন প্রদীপের কেন এ আরতি নিত্য মোর।
কেন এ দুর্ব্বল সাধ কম্পমান হয় ক্ষুদ্র বুকে—
মলিন অবতলী মম আনি তব নয়ন সম্মুখে।
শক্তিহীন এ আরতি দৃষ্টির প্রসাদ নাহি চায়
আপন অন্তরে মরে প্রকাশের দুঃসহ লজ্জায়।
কোনো তার মূল্য নাই, নাই কোনো তুচ্ছতম দাম
সমস্ত জীবন ভরে এ আমার নিঃশব্দ প্রণাম।

"এ ত ভালোই হয়েছে যা সত্যি মনে হয়। সত্যি কথা, লিখলেই ভালো হয়—বানিয়ে বানিয়ে লিখলে তা হবার নয়। যত কবিত্বই কর ততই সে গাঁজিয়ে ওঠে। কিন্তু তোমরা মেয়েরা বড় কম লেখ।" "আপনি এর যা উত্তর দিয়েছিলেন আপনার নিশ্চয় মনে নেই, বলি শুনুন :—

ফাল্গুনের সূর্য্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন
দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগ যুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে।
ব্যথায় ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া
বেড়াল যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল সাথে,
অবশেষে রজনী প্রভাতে
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিঃশ্বাসে তার এতটুকু মল্লিকার কলি,
উদ্বারিল গন্ধ তার
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার,
এই বার্ত্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।"

(এই কবিতাটি পরে "সানাই"তে প্রকাশিত হয়েছে)

"তোমার ত মুখস্থ থাকে মন্দ নয়—এটা কি আমার কাছে নেই ?" "বোধ হয় না, আমি প্রবাসীতে পাঠিয়ে আবার ফেরত এনেছিলাম—প্রকাশিত হয় নি।" "তাহলে লিখে দিও আমার খাতায়, লেখার জন্য যা তাগাদা আসতে থাকে, নানা স্থান থেকে, পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কোথাও।"

পরের দিন তাস খেলতে বসে একটু পরেই বললেন, "তোমার সেই কবিতাটা তোমার বন্ধুকে শোনাও না। এতে আর লজ্জার কী আছে ? কবিতা লেখা ত লজ্জার

বিষয় বলে আমিও মনে করি নে, সুধাকান্তও করে না; তাহলে প্রবাসীর উপকার করা হ'ত।" পড়তেই হ'ল আবার। "আমার এর একটা উত্তর আছে— সেই কালো মলাটের খাতাটা নিয়ে আয় ত, উত্তরটা পড়ি। পুরীতে লেখা জন্মদিন কবিতাটা যাতে আছে।"

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে ত চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী—
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা
বিধাতার সৃষ্টি সীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।
কাল সমুদ্রের তীরে বিরলে রচেন মূর্ত্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে,
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসার খেলার কক্ষে তাঁর
যে খেলেনা রচিলেন মূর্ত্তিকার,
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে—
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেক তরে অমরের ভান,
সহসা মুহূর্ত্তে দেয় ফাঁকি
মুঠি কয় ধূলি রয় বাকি—
আর থাকে কাল রাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলা।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে,
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে?
এ কথা কল্পনা করো যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখি কোণে
সে কথাই ভাবি আজি মনে।

আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হয়ত তাই সত্য সে ক্ষণভঙ্গুর, কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভেঙে হবে চুর। কিন্তু মন তা মানে না, সব ফাঁকি হয়ে যাবে মুঠি কয় ধূলি রবে বাকি? বিরাট্ সেই রূপসৃষ্টি হারাবে কায়া, হারাবে রূপ, তবু কিছুই কি বাকি রবে না যা চির-সত্য হয়ে এই লুব্ধ বিরাট্ ধূলিরে এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে? জানি মহাকবি অনাগত দীর্ঘ কালের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে সত্য হয়ে থাকবেন। কিন্তু মন শুধু তাতে খুশী হয় না। এই শরীরী মানুষ; লৌকিক দেহধারী অলৌকিক মানুষ, যাঁকে রূপকার সৃষ্টি করেছেন অতি অপরূপ ক'রে, সেই মানুষ কোথায় যাবেন? কাব্যের অমরতা সে ক্ষতিকে পূরণ ত করতে পারে না। সেদিন আজকের কথা মনে করতেই পারি নি—"আর রবে কাল রাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলা।"

বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
বড় ঘৃণা মোর সেই অভাগার পরে
প্রাণ বেরোলেও তোমাদের কাছে তবু
তাইত ক্লান্তি প্রকাশ করি নে কভু।

এ কথা যে তাঁর জীবনে কত সত্য তা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন সকলেই অনুভব করেছেন। আশি বছর বয়সেও নব যৌবনের প্রতীক কবি। শারীরিক কোনো দুর্ব্বলতা, রোগের ক্লান্তি কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। যখন তিনি আমাদের সঙ্গে সহাস্য পরিহাসে কৌতুকে আনন্দে চারিদিক উজ্জ্বল ক'রে রাখতেন, সন্ধ্যে বেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে শোনাতেন, তখনও তাঁর শরীরের ভিতরে ভিতরে রোগের বেদনা মূল প্রসারিত ক'রে চলেছিল। প্রায়ই জ্বর হ'ত কিন্তু সে-সব গ্রাহ্যই করতেন না—অন্যরাও তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে বা বেশী ব্যস্ততা প্রকাশ করলে পছন্দ করতেন না। গত বারের বড় অসুখের পর থেকেই শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিল—কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু হাসিমুখে কবিতার ঝর্ণায়, সুরের প্রবাহে, সহাস্য কৌতুকে শরীরের সমস্ত দুঃখ গোপন করেছেন। কাউকে এতটুকু উদ্বিগ্ন করা দূরের কথা আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন চার পাশের আবহাওয়া। মানুষের জীবন কত আনন্দোজ্জ্বল কত প্রাণরসে পরিপূর্ণ কৌতুকে সুস্নিগ্ধ হ'তে পারে তা তাঁকে না দেখলে আমরা কখনো কল্পনা করতে পারতাম না। যে ক'টা দিন জীবনে তাঁর কাছে থাকবার সুযোগ পেয়েছি তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত আমরা উপভোগ করেছি শুধু নয়, আমরা বেঁচেছি বাঁচার মত ক'রে। আমাদের যে বয়স অল্প তা তাঁর কাছে না এলে এমন ক'রে কখনো জানতুম না। "প্রাণ বেরোলেও তোমাদের কাছে তবু তাই ত ক্লান্তি প্রকাশ করি নে কভু"—এ কথা প্রত্যক্ষ করেছি প্রতি দিন। শত কষ্টেও অম্লান আনন্দময় মুখচ্ছবি। কালিম্পঙে ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন

তার পর প্রায় এক বৎসর দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কিন্তু তাঁর রোগ-শয্যাও উজ্জ্বল ক'রে রাখতেন হাসিতে কৌতুকে, রুগীর ঘর বলে সে ঘরের আবহাওয়া নিরানন্দ ছিল না। যাঁরা কাছাকাছি থাকতেন তাঁদের রোজই নূতন নূতন নামকরণ চলত। তাঁর রোগ-শয্যার পাশে যাঁদের থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা তাই রুগীর ঘরে বন্ধ হয়ে অবসাদগ্রস্ত হন নাই। পরমানন্দে তাঁর সঙ্গসুখ লাভ করেছেন, সে সঙ্গে সুখ ছিল, ছিল গভীর আনন্দ, ছিল জীবনের উজ্জ্বলতা, রোগক্লান্ত রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আনন্দ-স্বরূপ কবি, শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয়।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল, কালিম্পঙে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাবার পর প্রথম কলকাতার রাস্তায় এম্ব্যুলান্স গাড়ীর মধ্যে স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরে এলো, চোখ মেলে একটুক্ষণ দেখে বললেন, "কোথায় পুরেছ আমায়, এ যে একটা খাঁচা? খাঁচার বাইরে যে কী আছে আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" জ্যোতিবাবু* বসেছিলেন মাথার কাছে, বললেন আমরাও ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, শুধু আপনাকে ছাড়া। উনি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "সেই যথেষ্ট কী বল?" অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমাখা ছিল মুখ—এই আমাদের আনন্দ যে আমরা বিলম্বে এসেছি ব'লে কিছুমাত্র বঞ্চিত হই নি। চির-পুরাতন কবি শেষ পর্য্যন্ত চিরনবীন ছিলেন, জরা তাঁকে স্পর্শ করে নি।

আজ সকালের দিকে শরীর একেবারে ভালো ছিল না, ভোরবেলা যখন প্রণাম করতে গেলুম বারান্দায় চৌকিতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে বসেছিলেন। মেঘ কুয়াশার আড়াল থেকে ম্লান রদ্দুর গায়ের উপর এসে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম ডাক্তার আনাবার বন্দোবস্ত করব, "ননসেন্স ডাক্তার! ডাক্তার আমার কী করবে? আমি কি ডাক্তারের ওষুধ খাই? তা ছাড়া এ আমার হার্টের কষ্ট—আমি জানি এইটেই আমার দরজা, প্রত্যেকেরই একটা না একটা দরজা থাকে। আমার মৃত্যুবাণ এইখানেই আছে, হঠাৎ একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে, সে মন্দ নয়। দেখ—না কি বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে যে উনি মৃত্যুকে ভয় করেন বড় বেশী সেই জন্যেই সর্ব্বত্র লেখেন ভয় করি নে ভয় করি নে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়, একেবারে সত্য নয়—জীবন সম্বন্ধে আর আমার স্পৃহা নেই। কেবল একটি কথা মনে হয় কি জান এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্ত্তমানে এর আর মূল্য কিছুই থাকবে না। এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তা ত জান না। কী দুঃখের যে সে-সব দিন গেছে, যখন ছোট বৌর গহনা পর্য্যন্ত নিতে হয়েছে, চারি দিকে ঋণ বেড়ে চলেছে। ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করছি। কেউ ছেলে ত দেবেই না গাড়ী ভাড়া ক'রে অন্যকে বারণ ক'রে আসবে। এই রকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যুশোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকে জানে উনি সৌখিন বড়লোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোট বৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না। কিন্তু এত বাধা যদি দেশের লোকের কাছ থেকে না পেতুম তাহলে শুধু অর্থাভাবে এত কষ্ট পেতে হ'ত না, সাহায্য পাই নি সে সামান্য কথা, কিন্তু কী বাধা! যাক সে যা হবার তা হয়েছে, এখন এত ক'রে যা গড়ে তুলেছি আমার অবর্ত্তমানে যদি তার মূল্য ক্ষয় হয় তাহলে এত দিনের এত পরিশ্রম সব যে ব্যর্থ হবে, আর রথীরাই বা বাঁচবে কি নিয়ে? তাদের চার পাশে যে একটা মহত্তর আবেষ্টন বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে উঠেছে সেটা ভেঙে গেলে ওরা যে বড় অসহায় হয়ে পড়বে। মৃত্যু সম্বন্ধে এই একটি মাত্র বাধা আমার মনে হয়—সে আমার বিশ্বভারতী আর কিছুই নয়।"

"কী তুমি যে চুপচাপ বসে আছ প্রস্তুত হও নি, এখন নাইবে না?" "এইবারে যাব, কুড়েমি লাগছে।" "কুড়েমি লাগছে? সে ত অতি উত্তম, ঠিক আমার মত অবস্থা, আমারও ঐ রকম মাঝে মাঝে কুড়েমি লাগে, চুপ ক'রে বসে থাকি চৌকিতে, একটা কাক কা-কা ক'রে উড়ে যায় দুপুরের রোদ্দুরে, ফেরিওয়ালা হাঁকে—চাই তপসি মাছ, বাসনওয়ালা চলে যায় ঝম্‌ঝমিয়ে, গলির মোড়ে মোড়ে হাঁক শোনা যায় বেলোয়ারী চুড়ি চাই, দূরে বেজে যায় দুপুরের ঘণ্টা। বনমালী এসে বলে এইবারে উঠুন নাইবার জল দিয়েছে, মা-ঠাকরুণ ভাতের থালা নিয়ে বসে আছেন যে। আমি বলি যা বল গে এখন বড় ব্যস্ত আছি। ব্যস্ত কি বাবামশায় আপনি ত চুপ করে বসে আছেন। ঐ চুপ করে থাকাই ত কাজ, ঐ কাজ না-থাকার কাজেই ত ব্যস্ত আছি। তোর মা-ঠাকরুণকে বল গে, তোর চেয়ে বুদ্ধি আছে বুঝতে পারবেন। এমন সময় মা-ঠাকরুণের প্রবেশ—'কি আজ কি আর ওঠা হবে না, সব যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।' 'আরে, একটু

* ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ সরকার।

থাম না, ব্যস্ত আছি যে, কাজ না-থাকার কাজে ব্যস্ত, বিষম ব্যস্ত।' 'ঐ রকম করেই ত শরীর গেল সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই।' 'নিশ্চয় নিশ্চয় কাজ না-করার কাজে শরীর একেবারে পাত হয়ে যাচ্ছে—কাজ না-করা কি সোজা কাজ, সে যে বিষম কাজ।' 'না বাপু থাক তবে বসে, আমার আবার নেমন্তন্ন আছে, এখনি যেতে হবে।' 'সে আবার কোথায়?' 'কেন বীণার ওখানে নেমন্তন্ন সুরেশবাবুর গান শোনবার।' 'ও বাবা তাহলে ত কাজ না-করার কাজ ফেলে এখনি উঠতে হ'ল, সেখানে গেলে কি আর আজ ফিরবে'।" এই পর্য্যন্ত একসঙ্গে ব'লে গিয়ে হেসে তাকালেন, "কেমন শোনাল? একেই বলে স্বগত উক্তি। কথাবার্ত্তাগুলো ঠিক হয়েছে ত? কিন্তু তোমার ত আর কাজ না-করার কাজ নেই—এবার তাহলে নেয়ে ফেল!" ক্রমশঃ

তুমি চল

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে অনুবাদ)

[ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব হরিশ্চন্দ্রকে বরুণ করলেন আক্রমণ; উদরী রোগে তিনি শয্যাশায়ী হ'লেন। বনচারী রোহিত লোকমুখে শুনতে পেলেন পিতার রোগের সংবাদ। অসুস্থ পিতাকে দেখবার জন্য রোহিত বন ছেড়ে চললেন লোকালয়ের দিকে। পথের মাঝে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন রোহিতকে বললেন—]

হে রোহিত, বহু পর্য্যটনে যে মানুষ পরিশ্রান্ত
তারই কণ্ঠে দোলে লক্ষ্মীর বরণমালা;
ব'সে থাকে যে মানুষ—হাজার গুণে গুণী হ'লেও
নরসমাজে স্থান তার অনাদরের ধূলায়;
যে মানুষ চলে—ইন্দ্র তার সহায়;
অতএব তুমি চল।

[ব্রাহ্মণ আমাকে চলতে বলেছেন—এই ভেবে রোহিত দ্বিতীয় বৎসরও অরণ্যে বিচরণ করলেন। বৎসরান্তে বন থেকে গ্রামে ফেরার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে রোহিতের পুনরায় দেখা। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন রোহিতকে বললেন—]

যে ব্যক্তি বিচরণ করে তার জঙ্ঘাদ্বয় হয়
পুষ্পিত পাদপের মতো সুন্দর, দেহের
মধ্যভাগ ধরে ফলবান বনস্পতির রূপ;
পথে চলার পরিশ্রমে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হ'য়ে
ধূলিশয্যা লাভ করে;
অতএব তুমি চল।

[ব্রাহ্মণ আমাকে চলতে বলেছেন—এই ভেবে রোহিত তৃতীয় বৎসরও অরণ্যে বিচরণ করলেন। বৎসরান্তে বন থেকে গ্রামে ফেরার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে রোহিতের পুনরায় দেখা। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন রোহিতকে বললেন—]

যে মানুষ ব'সে থাকে তার ভাগ্যও ব'সে থাকে,
দাঁড়ায় যে মানুষ তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়,
যে মানুষ নিদ্রিত তার ভাগ্যও নিদ্রা যায়,
যে মানুষ চলমান তার ভাগ্যও আগিয়ে চলে;
অতএব তুমি চল।

[ব্রাহ্মণ আমাকে চলতে বলেছেন—এই ভেবে রোহিত চতুর্থ বৎসরও অরণ্যে বিচরণ করলেন। বৎসরান্তে বন থেকে গ্রামে ফেরার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে রোহিতের পুনরায় দেখা। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন রোহিতকে বললেন—]

কলি নিদ্রা যায়,
দ্বাপর নিদ্রা ছেড়ে বসে,
ত্রেতা উঠে দাঁড়ায়,
সত্য চলে।
অতএব তুমি চল।

[ব্রাহ্মণ আমাকে চলতে বলেছেন—এই ভেবে রোহিত পঞ্চম বৎসরও অরণ্যে বিচরণ করলেন। বৎসরান্তে বন থেকে গ্রামে ফেরার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে রোহিতের পুনরায় দেখা। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন রোহিতকে বললেন—]

বিচরণ যে করে তার ভাগ্যে জোটে মধু,
সে পায় সুস্বাদু উদুম্বর ফল,
দেখো আকাশচারী সূর্য্যের মহিমাকে, সারাক্ষণ
সে বিচরণ করে তবু চোখে তার ঘুম নেই।
অতএব তুমি চল।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২

সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নের মত বোধ হয়। ভয়ে, লজ্জায়, আত্ম-অনুশোচনায় নরম কাদার তালটির মত যোগমায়া ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী ক্রোধ করিয়া অনেক কথা শুনাইলেন। অবিশ্রান্ত অনর্গল সে প্রবাহে দগ্ধ হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রামজীবন ফিরিয়া গেলেন।

শাশুড়ী যেন একবার রাগ করিয়া ঝাঁজালো স্বরে বলিয়াছিলেন, মেয়েকে ছোট্টটি থেকে মানুষ করেছেন—আর চারটি ভাত দিতে পারবেন না, বেয়াই।

রামজীবন উত্তর দিয়াছিলেন, ভাত দিতে পারি বেয়ান, কিন্তু সে ভাত ওর গৌরবের নয়। আপনার পায়ের তলায় ওকে ফেলে দিলাম, পায়ে রাখুন বা ঠেলুন যা আপনার ইচ্ছা। কনকাঞ্জলির সময় মা যে আমার সব দেনা শোধ করে এসেছে, বেয়ান, আর মাকে ঋণী করবো না।

পিতা চলিয়া গেলে শাশুড়ী বলিলেন, মেয়েমানুষের দর্প ভাল নয়। বলে, বেঁচে থাক্ আমার চুড়ো বাঁশী—হাজার হাজার মিলবে দাসী। এই ফাল্গুনেই রামের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে তুলব না, দেখি তোর তেজ থাকে কোথায়!

বহুক্ষণ বকিয়া তিনি শ্রান্ত বা শান্ত হইলেন। পিতলের ঘড়াটা কাঁকে করিয়া পিসিমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, বউ রইলেন, অভিমানী রাজকন্যে—দেখো ঠাকুরঝি। এসেছেন—আমার মাথা রক্ষে করেছেন—আবার পিণ্ডি গেলার উদ্যুগ করতে হবে তো।

পিসিমা আসিয়া যোগমায়ার মাথায় হাত বুলাইতেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, পিসিমা।

পিসিমার চোখের দৃষ্টিও জলধারায় ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল। শীর্ণ হাত দিয়া যোগমায়ার মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, তুমি আমার মা-লক্ষ্মী। আমার দুর্গা বেঁচে থাকলে ঠিক এমনটিই হতো—মা।

পিসিমা সম্পর্কে শাশুড়ী, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্কে মা। হয়ত তাঁহার বহুদিনের হারানো মেয়ে দুর্গাকে তিনি যোগমায়ার মধ্যে দেখিয়াছেন—তাই রুদ্ধ উৎসমুখ হইতে শোকের পাথরখানি সরিয়া স্নেহের ধারা উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

মনে একটুও সোয়াস্তি ছিল না, মা। কেবল ভাবতাম, বউমার আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল—তবে কেন করলে এমন কাজ। দিনরাত ডাকতাম, হে হরি—ওর সুমতি দাও। হরিঠাকুর আমার কথা শুনেছেন, মা। আঁচলে চোখ মুছিয়া তিনি উঠিলেন এবং বলিলেন, হাতমুখ ধোও, পায়ে জল দেও। আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। একটা নাড়কোল নাড়ু এনে দিচ্ছি—একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

হাতমুখ ধুইয়া যোগমায়ার শ্রান্তি দূর হইল। উদ্বেগ অনেকখানি কমিয়া যাওয়াতে সে সুস্থবোধ করিল। পিসিমার স্নেহের মধ্য দিয়া আবার যেন সে পূর্ব্ব অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্বশুরবাড়িতে আবার সে সম্রাজ্ঞী হইয়া বসিবে। আঃ, এই সঙ্কীর্ণ ভাঙ্গা রোয়াক, উইদষ্ট জীর্ণপ্রায় কড়ি-বরগায় ছাদের পাতলা ইটগুলিকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না—অবাধ্য ছেলের মত কতকগুলি ইট বরগার ফাঁকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়াছে, ঘরের দেওয়ালে চূণ-বালির পলস্তারা নাই, কীটদষ্ট ছবিগুলি তেমনই মাকড়সার ঝুলে ভরিয়া আছে—তবু সুন্দর এ গৃহ। এখানে চোখ বুঝিলে এখনি বুঝি ঘুম আসিবে, এখানে চোখ মেলিলে সাতরাজার ধন মাণিক না মিলুক—মর্য্যাদা-ভরা আকাশের টুকরা চোখের সামনে হাসিয়া উঠিবে। এখানে চলিবার কালে সঙ্কোচব্রীড়ার সঙ্গে সম্ভ্রম-মর্য্যাদা নুপুরের তালে তালে বাজিবে, এখানে কথা কহিবার সময় বুক ভরিয়া স্বস্তির বাণীই বাহির হইবে। এখানে লজ্জা করিয়া অল্প খাইয়াও তৃপ্তি, এখানে দুপুরে কোন পরিচিতার সঙ্গে গল্প করিতে না-করিতে দুপুর ফুরাইয়া যায়। নাই বা আসিল রামচন্দ্র? যোগমায়ার মনের প্রান্ত হইতে যে রজ্জু প্রসারিত হইয়া এই সংসারের মায়াজালের ফাঁস

বুনিতে বুনিতে সেই অজানা দেশটিতে চলিয়া গিয়াছে—সেই মায়াজালের আর একটি প্রান্ত রামচন্দ্রের মন হইতে উঠিয়া কি এই সংসারের কেন্দ্রাভিমুখে যোগমায়ার হৃদয়োত্থিত মায়াজালের বুনুনির সঙ্গে এক হইয়া যায় নাই? রামচন্দ্রের পরিশ্রম আর যোগমায়ার সংগ্রহ, রামচন্দ্রের আয়োজন ও যোগমায়ার রচনা—এই লইয়াই তো সংসারের নৈবেদ্য সাজানো হইতেছে। জীবনদেবতা মনের মন্দিরে আসিয়া পূজা লইবেন যে শুভ মুহূর্ত্তে সেই শুভক্ষণের প্রতিটি পল গনিয়া—এই উপচার থরে থরে জমিয়া উঠিতেছে। এমন মধুর রচনা! আবেগে যোগমায়ার নিমীলিত নয়নের কোল দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অ-বউমা—বউমা, ঘুমুলে নাকি? পিসিমার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ হইল সে ঘুমাইয়াছে। না জানি শাশুড়ী কত রাগ করিবেন।

ফাল্গুনের রোদ চড়া হইয়াছে—শীতের মত সুখস্পর্শ আর নাই।

এসো, তুই মায়েঝিয়ে খেয়ে নিই গে। তোমার শাশুড়ী আজ খাবেন না, মঙ্গলবার কিনা, সিদ্ধেশ্বরী তলায় 'পালুনি' করবেন।

চমৎকার সজনে ফুলের চচ্চড়ি হয়েছে, পিসিমা।

আর একটু দেব, মা? দিই। গাছের ফুল—পড়ে উঠোন আলো করেছে; ভাবলাম, কুড়িয়ে বাটি-চচ্চড়ি করি। কতকাল যে রাঁধিনি মা, নুন তেলের আন্দাজ পাই নে।

আরও চারিটি ভাত যোগমায়া লইল—আরও একটুখানি তরকারি। শ্বশুরবাড়ির সঙ্কোচ কাটাইয়া সে যেন পিত্রালয়ের হৃদ্যতার মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আহারান্তে পিসিমা চরকা লইয়া বসিলেন, যোগমায়া পাশে গিয়া বসিল।

জান মা, বউ তো ঝোঁক ধরলেন, এই ফাল্গুনেই ছেলের বিয়ে দেবেন। কত জায়গা থেকে যে সম্বন্ধ এলো! গণ মেলে তো পণ মেলে না, পণ মেলে তো মেয়ে হতকুচ্ছিত। শেষে বাগাঁচড়ায় রায়েদের বাড়ি প্রতিমা বলে মেয়েটিকে তোমার শাশুড়ী পছন্দ করলেন। মিথ্যে বলব না, মেয়ে সুন্দরী, কুষ্টি মিললো—দেনা-পাওনাও মিললো।

তাহলে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল?

না মা, তোমার শাশুড়ী আশীর্ব্বাদের দিন স্থির ক'রে রামকে পত্তর লিখলেন।

যোগমায়ার প্রাণ কণ্ঠাগ্রে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কি বলিল—রামচন্দ্র?

পিসিমা বলিতে লাগিলেন, রাম কি আমার সেই ছেলে! লিখলে, মা, অন্যায় অনুরোধ আমায় করো না। বিনি দোষে স্ত্রী ত্যাগ করে কেউ কখনও সুখী হয় নি—অমন যে রাজা রামচন্দ্র তিনিও নয়। ওদের দিক থেকে সম্মতি পেলে বিয়ে আমি করব—তা নইলে নয়। আমার সোনা ছেলে!

যোগমায়া মাথা নীচু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দুঃখে নহে—অসহ্য আনন্দে।

পিসিমা বলিলেন, কি উত্তর দেবেন বউ ভাবছিলেন, এমন সময় তোমরা এলে। খুব সময়ে এসে পড়েছ, মা।

শাশুড়ী শয়ন করিলে যোগমায়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পা টিপিতে লাগিল। শাশুড়ী পা গুটাইতে গেলে সে জোর করিয়া সেই পা চাপিয়া ধরিল। চোখের জলে পা তাঁহার ভিজিয়া গেল। একটা চীৎকার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল, কণ্ঠের মধ্যে সেই চীৎকারকে পুরিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, রাত হয়েছে, যাও শোও গে। এখন আবার পা টেপাটিপি কেন?

অস্ফুট স্বরে যোগমায়া বলিল, আমার ওপর রাগ করবেন না, মা।

শাশুড়ী পা গুটাইয়া বলিলেন, না, রাগ করি নি। সর, আমরা গরিব মানুষ—সাত দিকে সাতটা দাসী বাঁদী তো নেই—পা টেপাইও নি কখনো।

অভিমানে তখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত। যোগমায়া সেই অভিমানকে ভাঙ্গিবার জন্য আর জিদ্ করিতে সাহস করিল না। সত্য বলিতে কি, এই বাষ্পরুদ্ধ অভিমানাহত কণ্ঠস্বর তাহার ভালই লাগিতেছিল।

সে রাত্রি জাগিয়াই যোগমায়ার কাটিয়া গেল।

নূতন প্রভাত—এ বাড়িতে নূতন জীবন আনিয়া দিল।

ভোর রাত্রিতে উঠিয়া শাশুড়ী পোঁটলা বাঁধিতেছিলেন। ছোট ছোট ন্যাকড়ায় কোনটায় সেরটাক মুগের ডাল, কোনটায় এক কাঠা (আড়াই সের) মুড়ির চাল, কোনটায় বা পাতি লেবু, কুল শুকনা ইত্যাদি। সকাল হইলে ও-বাড়ির ছাইগাদা হইতে একটা বড় মানকচু তুলিলেন, লাউয়ের ডাঁটাও গাছকতক বাঁধিয়া পিসিমাকে বলিলেন, কুঞ্জ ঘোষ এলেই আমি জিরেট যাব। কমলির গহনা কখানা বেয়াই কাল দিয়ে গেছেন, যার ধন তারে বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হই। যে দিনকাল—চোর-ছ্যাঁচড়ের অভাব তো নেই।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে ফিরবে?

কাল একাদশী, পরশু দোয়াদশীর দিন কি আর আসতে দেবে? তরশুই ফিরব মনে করছি। আর দেখ, বাজার-পত্তর সব করে রেখেই গেলাম। আলু ঘরে রইলো, দু'-সের বেগুন, মটর শুটি, সিম, ও-বাড়িতে পালং শাক আছে তুলো, হ'ল বা এক দিন সজনে ফুলের চচ্চড়ি করলে—।

সে আমরা চালিয়ে নেব'খন, তুমি দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়।

হাঁ—যাই। কালনা থেকে ইষ্টিমার ছাড়বে—দশটার কম কি আর শান্তিপুরে আসবে?

পিসিমা বলিলেন, শান্তিপুরের ইষ্টিমারের ঘাট কি এখানে? সেই বয়ড়া যেতে হবে তো।

না, আজকাল নাকি ঘোড়ালের ঘাটে লাগছে। কুঞ্জর আর হয় না, নড়তে-চড়তেই ওর বছর কেটে যায়।

এমন সময়ে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া ডাকিল, কৈ গো—মা-ঠাকরোণ, হ'লো?

কখন হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। দেখ দেখি কুঞ্জ, মানকচুটা নেব, না রেখে যাব?

না, মা-ঠাকরোণ, তেনাদের নাম করে তুলেছ, রেখে যাবে কি দুঃখে! খাসা মানকচু, পুবে বুঝি?

হাঁ, ওই ময়রারা চাঁদপুর থেকে এনেছিল সেবার। পারবি তো নিয়ে যেতে?

খুব খুব। দেখতে আমি ডিগ্‌ডিগে বটে, আপনাদের আশীব্বেদে তিরিশ সের জিনিস নিয়ে দুবার ইষ্টিমারের ঘাট যেতে আসতে পারি। এস মা-ঠাকরোণ, দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—

দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—সিদ্ধিদাতা গণেশ। ঠাকুরঝি, সংসার রইলো, দেখো ক্ষেতি-অপচো না হয়। তেল বুঝে সুজে খরচ করো, চাল এক কুনকে বরং কম কম নিয়ো—ভাত না ফেলা যায়। আর—

পিসিমা পিছনে পিছনে গেলেন। সদর দরজার বাহির হইয়াও শাশুড়ী সংসার সম্বন্ধে তাঁহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন।

পিসিমা ফিরিয়া আসিলে যোগমায়া বলিল, পিসিমা, আজ আমি রাঁধব।

তুমি! পারবে তো?

কেন পারব না, বাবার অসুখ হ'লে আমি তো কত দিন রেঁধেছি ওখানে। শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, ডালনা, চচ্চড়ি, ঝোল—সব রাঁধতে পারি।

বাঃ রে—আমার রাঁধুনির মেয়ে! মা পাকা রাঁধিয়ে কি না। তা চল, কুটনো কুটে দিই গে। কি রাঁধবে আজ?

সজনে ফুলের চচ্চড়ি—আপনি দেখিয়ে দেবেন কিন্তু।

আচ্ছা। দু-রকম ভাত রাঁধা—অত কি পেরে উঠবে, মা?

তা কেন, আমিও না হয় আলোচালের ভাত খাব আজ।

না মা, আলোচালের ভাত রাঁধা শক্ত। এক দিন না দেখিয়ে দিলে তুমি পারবে না।

সহসা কি মনে পড়িয়া যাওয়াতে যোগমায়া কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, না না, আপনিই রাঁধুন।

পিসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন, তরকারি না হয় তুমি রেঁধো।

না, আপনিই রাঁধুন।

কেন বল দেখি, মা? রাগ হ'লো?

হাসিয়া যোগমায়া বলিল, বাঃ রে, রাগ হবে কেন? আমি রাঁধলে আপনি তো খেতে পারবেন না।

কে বললে তোমায়?

আমি বুঝি জানি নে। মা বলেন, মন্তর না নিলে হাতের জল শুদ্ধু হয় না। হাতের জল শুদ্ধু না হ'লে—আপনি কি ক'রে আমার হাতে খাবেন?

এই কথা! পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিকই বলেছ, বউমা। পাড়া-পড়সীর হাতের জল শুদ্ধ না হ'লে—আচার-বিচেরওয়ালা না হ'লে—যার তার হাতে খেতে নেই। কিন্তু আজ যদি আমার অসুখ হয়, ঘরে যদি মেয়ে থাকে, সে যদি ইষ্টিমন্তর না নেয় তো তার হাতেও না খেয়ে শুকিয়ে মরব নাকি?

মেয়ের হাতে খেতে তো দোষ নেই।

বউয়ের হাতেও না। মেয়ে আর বউ কি আলাদা? তোমার শাশুড়ী বেশি বাচবিচার করেন—উনি না খেতে পারেন, আমি অতটা পালতে পারি নে, মা।

অত্যন্ত খুশী হইয়া ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, তা হ'লে চলুন—আপনি কুটনোটা কুটে দিন—আমি দু-ঘড়া জল তুলে নেয়ে নিই।

স্বল্পভাষিণী পিসিমা আজ সারাক্ষণই গল্প করিতেছেন। কোথায় একখানা মেঘ প্রতিদিন এ-বাড়ির মাথায় চাপিয়া থাকে, মেঘের অন্ধকারে এ-বাড়ির লোকগুলিও ভাল করিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না। আজ মেঘ সরিয়া গিয়া এখানকার বায়ুস্তর ফাল্গুনী-হাওয়ার মতই গা-জুড়ানো ও

পাতলা হইয়া উঠিতেছে। সে দাক্ষিণ্যে মানুষ যে মন মেলিবে—সে আর এমন বিচিত্র কি!

দুপুরে পিসিমা নিত্য প্রথামত চরকা কাটিতে বসিলেন। যোগমায়া ঘর-দুয়ার গুছাইতে লাগিল। সত্যই—মাকড়সারা সংখ্যায় বাড়িয়া নিজেদের কারুকার্য্যে মানুষের কারুকার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। কুলুঙ্গির মাথায়, বাক্সে, সিন্দুকে, আলনার কাঁথা কম্বলে, কাপড়ে ধুলাই কি কম জমিয়াছে? ঘরের মেঝেয় খোয়া উঠিতেছে, আড়া হইতে উইয়ের ও সুরকির ধুলাই যে কত এদিক-ওদিকে ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

বাঁশের আগালিতে মুড়া ঝাঁটা বাঁধিয়া যোগমায়া প্রথমে ঝুল পরিষ্কার করিল; তার পর কাপড়, কাঁথা, বালিশ বিছানা ঝাড়িয়া সিন্দুকের উপর ও আলনায় পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিল। তার পর কুলুঙ্গির সংস্কারসাধনে যত্নবতী হইল।

যত রাজ্যের শিশি, বোতল, সিঁদুর-চুপড়ি, আলতা, কাঠের পুতুল, ভাঙা লোহা, জাঁতি, ঔষধ মারিবার খল, হামনদিস্তা, ছেঁড়া কাগজ ও রঙীন ন্যাকড়া কুলুঙ্গি হইতে বাহির হইল। ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া রাখিতে দুপুর প্রায় শেষ হইয়া গেল। কাগজের গোছার মধ্যে একখানা আস্ত খাম পাওয়া গেল। যোগমায়ার মন নাচিয়া উঠিল। রামচন্দ্রের চিঠি নাকি? নাকের কাছে সে চিঠিখানা ধরিল। না, কোন গন্ধ নাই। খামখানা তেমন রঙীনও নহে, সাদাই। কিন্তু এক রামচন্দ্র ছাড়া আর কেহ খামে করিয়া তাহাকে চিঠি দিয়াছে সে কথা তো কই মনে পড়ে না!

এই তো চিঠির উপর তাহারই নাম লেখা: শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। ঠিকানাটা ইংরেজীতে লেখা। সম্ভবত এই বাড়ির ঠিকানা।

সমস্ত গুছাইয়া সে চিঠিখানি খুলিল, এবং খুলিয়াই আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সই? রাধারাণী তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে? বুক তাহার দুরু দুরু করিয়া উঠিল। বার তিনেক সম্বোধনটা পড়ে—আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। সই যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সম্বোধন পাঠ শেষ করিয়া যতই সে অগ্রসর হইল—ততই মুখের হাসি মিলাইয়া আসিতে লাগিল।

রাধারাণী লিখিয়াছে:

ভাই সই, অনেক দিন তোদের কোন খবর পাই নি, কেমন আছিস? উনি কয়বারই এখানে এলেন—জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতে পারেন না। পারিবেনই বা কোথা হইতে। যে আপনভোলা মানুষ! তা ছাড়া তোকে খবরও দিই নি ইচ্ছা করিয়া। কোন্ মুখে—আর কি খবরই বা দিব? যে আসিয়াছিল—হতভাগীর কোল পূর্ণ করিতে—সে অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছে। রাক্ষসী আমি তাহাকে রাখিতে পারি নাই। তোর কথাই সত্যি হইয়াছিল। কিন্তু সই, সে যদি আসিল তো চলিয়া গেল কেন? রাজপুত্রের মত ছেলে। হাসিলে আমার বুকের মাঝে মুক্তো ঝরিত, কাঁদিলে সেখানটা তোলপাড় করিয়া উঠিত। যেমন টক্‌টকে রং, তেমনই টানা টানা চোখ, তেমনই নাদুস-নুদুস। হয়ত আমি আবাগীর চোখ লাগিয়াছিল। তাই সে স্বর্গের ধন স্বর্গে চলিয়া গেল। 'নত্তা'র আগের আগের দিন হইতে সেই যে কান্না সুরু করিল—সে কান্না আর থামে নাই। কত মাদুলি, তুক্‌-তাক্, জলপড়া, মন্তর কিছুতেই কিছু হইল না, সই। ছেলে মাই টানিল না। দুধ জমিয়া মাই টন্ টন্ করিয়া ওঠে, দুধ গালিয়া ফেলিয়া দিই, কিন্তু সোনার খোকা আমার রাক্ষসী মার বুকের এক ফোঁটা দুধ খাইল না। কেন খায় নাই, সই। উঃ, আর যে পারি না ভাই। অনেক আশার প্রথম ফল—কার চোখের দৃষ্টি লাগিয়া যে নষ্ট হইয়া গেল! বুক আমার সদাই হু-হু করে। মা বলেন, লোকের নজর লাগিয়া এমন হইয়াছে। কত লোক তো আঁতুড়ে খোকাকে দেখিয়া গিয়াছে, সবাই তো ছেলের মা, সবাই তো জানাশোনা। তবে তারা কেন চোখ দিতে আসিবে? ডাইনে খাইলে নাকি ছেলে বাঁচে না। কেমন করিয়া বলিব, এত আত্মীয় প্রতিবেশীর মধ্যে কার মনে কি ছিল? যার মনে যাই থাক ভাই, আমার বুক যে দিনরাত হু-হু করিয়া জলিয়া যায়। ন'টি দিন তো ছিল—কিন্তু ন' বছরের মায়া আমার রক্ত হইতে সে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন শত্রু! এঁরা সবাই বলেন, শত্রু। নহিলে এমন দাগা সে দিবে কেন? কিন্তু মন আমার বলে, না না, শত্রু সে নয়। আমি ধরিয়া রাখিতে পারি নাই—আমারই তো দোষ। যেখানে বেশি যত্ন—বেশি আদর পায়, ওরা স্বর্গের জিনিস, তাদের কাছেই তো যাইবে। সই রে, এ ব্যথা বোঝাবার নয়। এঁরা বলেন, আমার শরীর নাকি ভাঙিয়া গিয়াছে। কই ভাই, খোকা যেখানে গিয়াছে—আমাকে কেন সেখানে লইয়া যায় না। এত দিন গেল—এক দিনও তো স্বপ্নে তাহাকে দেখিলাম না। এখন যদি মরণ আসে, বাঁচিয়া যাই। কিন্তু মরিতে সাহস হয় না—তোর সয়ার জন্য। অমন আমুদে মানুষ—কি হইয়া গিয়াছেন। সে

দেহ নাই—সে হাসি নাই। বলেন, খোকার জন্য আমি দুঃখ করি না, তুমি যে শরীর মাটি করিতে বসিয়াছ? তুমি না সারিয়া উঠিলে—আমার মুখে হাসি ফুটিবে না। শুনিলে তো কথা! ছেলে পেটে পুরিয়া আমি যদি সারিয়া না উঠি তো কে সারিয়া উঠিবে! ভাল আমি হইবই। উনি বলেন, তুমি মরিলে—আমার গৃহও শ্মশান হইবে। আমি সন্ন্যাসী হইব। তা পারে ভাই। বিয়ের পর কখনও ছাড়াছাড়ি হই নি। তুই তো জানিস, আমাদের ভালবাসার কথা। দু'টি দেহে—একটিই প্রাণ। ওর মুখে হাসি না দেখিলে—আমি ভাবিয়া মরি। কিন্তু খোকার জন্য প্রাণ এমন হু-হু করে যে ওর মুখও কোথায় ভাসিয়া যায়। কেন এমন হয়, সই? তবে কি ওর চেয়ে আমার খোকাই বড় হইল? কে জানে। অনেক কথা লিখিলাম, আর তোর মন খারাপ করিয়া দিব না। তোকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে এক বার। কবে যে ওখানে যাইব! ভগবানই জানেন। ভালবাসা নিস। পত্র লিখিতে অসুবিধা না হইলে পত্র দিস। ইতি

অভাগিনী সই।

পত্রখানি যোগমায়া বার তিনেক পড়িল, তার পর আর পড়িতে পারিল না। মনে হইল, চোখের জলে ঝাপ্‌সা হইয়া সব লেখা একাকার হইয়া গিয়াছে।

ও-ঘর হইতে পিসিমা ডাকিয়া বলিলেন, সলতে পাকানো আছে তো, বউমা? পিদীমটা জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে দুয়োরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।

তাড়াতাড়ি যোগমায়া উঠিয়া পড়িল। সন্ধ্যাই হইয়াছে হয়ত, চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয় নাই লেখাগুলি।

সন্ধ্যা দেখাইয়া সে পিসিমার কাছে গিয়া বসিল।

আচ্ছা পিসিমা, আঁতুড়ে ছেলেপিলে হয়ে মরে যায় কেন?

অনাচার, লোকের দৃষ্টি, পেঁচোয় পাওয়া—এই সব।

কিসে অনাচার হয়?

কিসে যে কি হয় তা কেমন ক'রে বলব, মা। হয়ত এড়া কাপড়ে মাই দিলে, বাইরে এসে ভর সন্ধ্যেবেলায় মাথার চুল এলো করলে, ছেলেকে এক কোণে ফেলে রাখলে—এই সব আর কি।

পেঁচোয় পাওয়া কি?

ওপর দৃষ্টি পড়লে পেঁচোয় পায়।

ভূত বুঝি?

পিসিমা শিহরিয়া ত্রস্তস্বরে বলিলেন, ও কথা বলতে নেই মা। ওঁরা দেবতা, সব পারেন। আর ভর সন্ধ্যে-বেলায় ওসব কথা বলতে নেই। তুমি বরঞ্চ রামায়ণখানা এনে পড়, একটু শুনি।

আপনি তো আজ ও ঘরে শোবেন?

তা শোব বৈকি। ও ঘরে সিন্দুক আছে—আগলাতে হবে।

রাত্তিরে আপনি কি খাবেন?

কি আবার! একটু বাতাসা মুখে দিয়ে এক ঢোঁক জল।

না, পিসিমা, আজ দশমীর দিন—একটু ছানা আনালেও তো পারেন।

তুমিও যেমন মা, বারোমেসে দশমীর আবার ছানা সন্দেশ! গুড়ই ভাল।

না, ছানা আনান।

দূর পাগল মেয়ে, বিকেলে ছানা বেচতে আসে, এখন কোথায় পাব?

তবে দু'খানা তেলের লুচি ভেজে দিই।

পাগল মেয়ে—আচমনী আমি খাই রাত্তিরে! কলা থাকে তো একটা দিস বরঞ্চ।

ঠিক হয়েছে, শাঁকালু আছে, রাঙালুও আছে—গুড় দিয়ে খেতে বেশ লাগবে। আর দুধও আছে জ্বাল দেওয়া।

তোমার দুধটুকু বুড়ো মাগী আমি খাব? পিসিমা হাসিলেন।

খাবেনই তো। নইলে আর কিসের মেয়ে আমি!

পিসিমা আনন্দে গলিয়া গিয়া বলিলেন, আমার সোনা বউ। এমন বউকে ফেলে যারা মেয়ে খোঁজে, তারা:

কিসের গরব করে?
তারা আগুনে পুড়ে না কেন মরে।

একটুখানি নয়—সব ছড়াটা বলুন।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন:

ধন—ধন—ধন
বাড়িতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।
তারা কিসের গরব করে?
তারা আগুনে পুড়ে না কেন মরে।

সইয়ের কথাই মনে হইল। ধরা গলায় যোগমায়া বলিল—এ ঘরে কুলুপ লাগিয়ে ও ঘরে যাই চলুন।

ক্রমশঃ

আমি ছুতার

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের প্রান্তে স্বচ্ছ সলিলা নদীর তীর—
সেথায় সবুজ ঘাসের উপরে বেঁধেছি নীড়।
নাহি সহরের কল-কোলাহল, ধূলি ও ধোঁয়া,
নাহি উদ্ধত প্রাসাদের ভীড় আকাশ-ছোঁয়া;
নীল-নির্ম্মল স্নিগ্ধ আকাশ উপরে হাসে,
কি যে কোমলতা শিশিরে সজল সবুজ ঘাসে!
হেনার গন্ধে মদির স্নিগ্ধ অন্ধকার,
আকাশের মাঠে তারার ফুল কি চমৎকার!
সান্ধ্য মেঘের বর্ণ-শোভায় উতলা মন,
ফাল্গুনে সাজে রক্ত-বসনে পলাশ-বন,
চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত নদী কি সুন্দর!
প্রভাত-রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে বালুর চর;
স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের তলায় মাণিক জ্বলে,
সাদা পাল তুলে দূর-দূরান্তে নৌকা চলে,
পানকৌড়ীরা ডুবে ডুবে খেলে ডুব-সাঁতার,
মাছের উপরে কেবল নজর মাছ-রাঙার।

ঘরের পিছনে মেহগিনী গাছ—ছায়ায় তার
হাতিয়ার লয়ে কাজ ক'রে চলি—আমি ছুতার।
অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠি, প্রভাতী তারা
আকাশে তখন যাই-যাই করে—সঙ্গীহারা।
বাসায় বাসায় পাখীরা ধরেছে মিষ্টি গান
ভোরের বাতাস দেহে মনে আনে নূতন প্রাণ।
ঘণ্টাখানেক চুপ্ চাপ্ করি অধ্যয়ন,
তার পর কাজে করি আপনারে সমর্পণ।

খস্ খস্ ক'রে ঘিস্কাপ চলে, চলে করাত—
বড়ো বড়ো গুঁড়ি বিদীর্ণ হ'য়ে ভূমিতে কাত্।
চলে তুর্‌পুন্ ক্ষিপ্র গতিতে, চলে কুঠার,
বাঁকা-চোরা কাঠ দেখিতে দেখিতে পায় আকার।
খট্ খট্ খট্ নিপুণ হাতের হাতুড়ি-ঘায়
বাটালির মুখে কাঠেরা নানান মূর্ত্তি পায়।

বাবলার ডালে বানাই লাঙল, চাকার ধুরো,
গড়ি পিল্‌সুজ্, হুঁকোর নৈচে, খাটের খুরো,
বহু মেহনতে বাঁকায়ে কাষ্ঠ নৌকা গড়ি,
জানালা-দরজা, কড়ি ও বরগা তৈরী করি;
কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক গড়ি, গড়ি পুতুল,
চেয়ার-টেবিল, আল্‌না, দেরাজ, বেঞ্চি, টুল,
জলচৌকী ও ব্র্যাকেট্ বানাই, বানাই পিঁড়ি,
বানাই চরকা, ডেস্ক, বাক্স, কাঠের সিঁড়ি।

দেখা দেয় ক্রমে পাড়া-পড়্‌শীরা—আশু ঘোষাল,
দানেজ মোল্লা, হরিহর খুড়ো, নিতাই পাল,
ফটিক কাঁসারী, গোবিন্দ মালো, নিমু গোঁসাই,
গোপী বিশ্বাস, হীরু সর্দ্দার, ভোলা গরাই।
কেহ চলে যায়, ব'সে ব'সে কেহ তামাক খায়—
কথায় কথায় বেলা অবশেষে বাড়িয়া যায়।

সবল দেহের শিরায় শিরায় বহিয়া যায়
উষ্ণ রক্ত, ঘর্ম্ম ঝরিছে সকল গায়;
হাতিয়ার রেখে বিশ্রাম করি ঘাসের 'পরে,
নদীর বাতাসে তপ্ত শরীর স্নিগ্ধ করে।
উদরে জ্বলিছে ক্ষুধার আগুন—বেলা দুপুর।
হেন কালে আসে টাট্‌কা মুড়ি ও ইক্ষুগুড়
আর কচি শসা—গাছের তলায় আরামে খাই।
দুনিয়া—স্বর্গ, অন্তরে যেন বাজে শানাই।
চাকুরি যাবার শঙ্কা করে না আয়ু ক্ষয়,
বড়ো সাহেবের কোপে পড়িবার নাহিকো ভয়,
নাকে মুখে গুঁজে আফিসের পানে ছুট্ দেবার
তাড়া নেই কোনো, আমি নহি ডেলি-প্যাসেঞ্জার
সবল বাহুর শক্তিতে করি উপার্জ্জন,
শিগার-মোটর-শ্যাম্পেনে কভু যায় না মন,
রোজকার আয়ে রোজ চলে যায়—ভাবনা নেই;
টাকায় শান্তি—এ কথা ভাবে যে, পাগল সে-ই।

ইন্দোচীন। আঙ্কোরভাট-মন্দিরের প্রাঙ্গণে রামায়ণ-নৃত্য

সম্মুখে— রাম। সীতা। রাবণ।

ইন্দোচীন। হুয়ে অঞ্চলে রাজসমাধির দৃশ্য। আনাম প্রদেশ

ইন্দোচীন। আনাম প্রদেশের ডংবা খালের দৃশ্য

ইন্দোচীনের আনাম প্রদেশের দৃশ্য। দূরে প্রাচীন যোদ্ধারাজ জিয়ালঙের সমাধি

ইন্দোচীন। টঙ্কিন উপসাগরে কাট্‌বা দ্বীপ

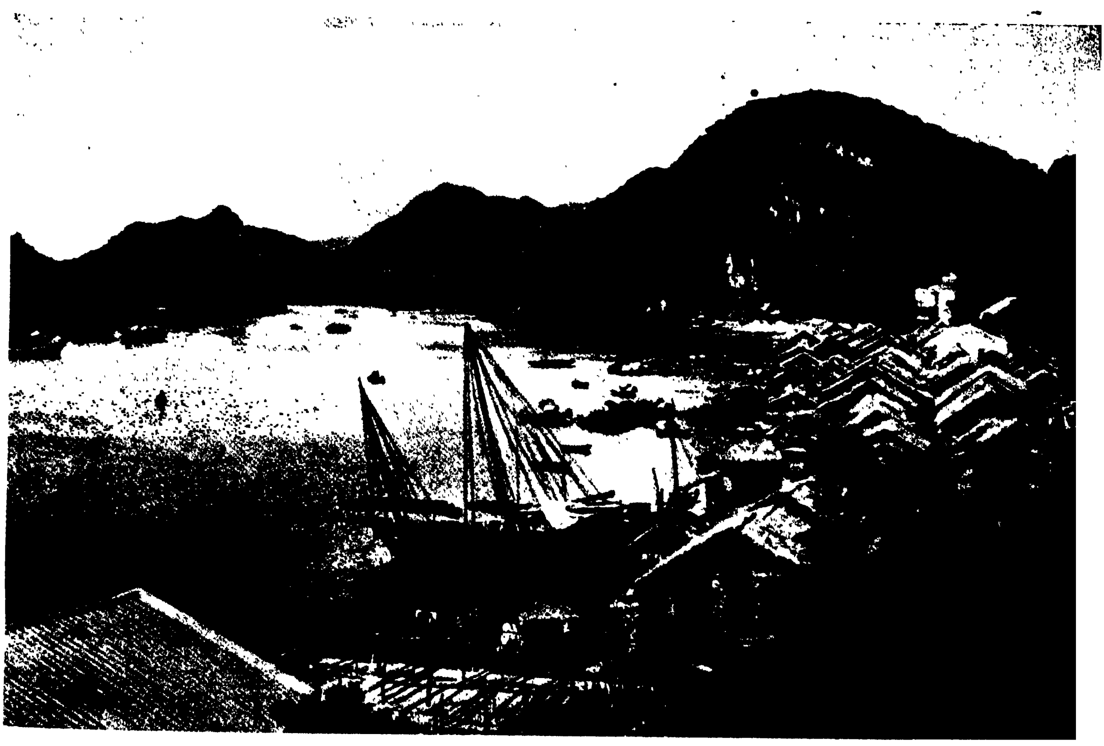

ইন্দোচীন। আলোং খাড়ির দৃশ্য। টঙ্কিন প্রদেশ

অক্ষশক্তি-অধিকৃত আলবানিয়ার রাজধানী টিরানার প্রধান মসজিদ চত্বর

অক্ষশক্তি-অধিকৃত বলকান। টিরানা ও কোরিট্সার মধ্যপথে স্বস্তি

নাম ও যশের নহিকো কাঙাল। বাহিরে সুখ
—এ কথা বলে যে, জেনো সে একটা আহাম্মুক।
দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর গিয়ে লাভ কি ভাই?
হেথা নদীতীরে স্বর্গ দু'বেলা দেখিতে পাই।
পরের নারীরে গৃহিণীর চেয়ে রূপসী ভাবা—
এই মূঢ়তারে প্রশ্রয় দেবে যে জন হাবা।
ভালোবেসে যারে নিয়ে আসো ঘরে—নারী সে জন।
কালো তার চুল, কণ্ঠে বাঁশরী, চোখে স্বপন!
বছর না যেতে নেই আর সেই স্বপ্ন-সাথী!
পালিয়ে গেছে সে মধু-যামিনীর নিভায়ে বাতি!
নারীর আসন নিয়েছে গৃহিণী আড়াই মুনে।
রক্তে বাজে না কিঙ্কিণী তার কণ্ঠ শুনে;
পরশে আসে না শিহরণ আর আগের মত;
মুখে মুখ দিয়ে কূজনের রাত হয়েছে গত।
ডাল নেই ঘরে, চাল বাড়ন্ত—দেয় খবর;
বিরস বদনে কখনো জানায়, নেই কাপড়।
বিয়ে যে করেছে—সবার ভাগ্যে একই ফল;
রূপের গিল্‌টি উঠে গিয়ে শেষে জাগে পিতল;
প্রিয়া হ'য়ে যায় নাক আর কান অথবা আঁখি—
অতি প্রিয় তারা, তবু তাহাদের ভুলিয়া থাকি।
শুনেছি কবিরা ভারি অনুরাগী পরকীয়ার—
এইখানে আছে মূল তত্ত্বটী নিহিত তার।
রূপসী নারীতে নেই তাই লোভ, পেয়েছি যারে—
এবারের মতো ভাগ্য বলিয়া নিয়েছি তারে।
সুখ—সে রয়েছে নিতান্ত কাছে—বর্ত্তমানে;
এখানে তারে যে পেলো না—পাবে না অন্যখানে।
অন্তরে যার সুন্দর এসে নিলো আসন—
বিশ্ব তাহার নয়নে সুরভি কমল-বন।
নোংরামি আর ক্ষুদ্রতা যার মনের পুঁজি—
এই জগতের কোন্‌খানে ভালো পাবে সে খুঁজি?
বিজ্ঞেরা তাই বলিয়া থাকেন সমস্বরে—
আনন্দ কোথা খুঁজিয়া বেড়াও? সে অন্দরে।

কারও ঘাড়ে ব'সে খাইনে অন্ন। পরগাছার
ঘৃণ্য জীবন নহে মানুষের—ছারপোকার।
খায় ব'সে ব'সে, সমাজেরে কিছু করে না দান—
শাস্ত্র তাহারে দিয়েছে চোরের অসম্মান।
হাতে কাজ নেই, অনন্ত ছুটি—সর্ব্বনাশ!
বার্ণার্ড শ' তো এরই নাম দিলো নরকবাস।

এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করি নি কাজ না ক'রে,
যোগাড় করেছি অন্ন নিজেরই শ্রমের জোরে—
এই চেতনায় কি যে আনন্দ—রোজ যখন
ঘুমাইতে যাই আমি পাই তার আস্বাদন।
কাল্‌কের কথা আজ ভাবি নাকো—এইতো বেশ!
ভবিষ্যতের চিন্তা কেবল পাকায় কেশ।

কাজ শেষ হ'লে বেশ ক'রে মাখি তৈল খাঁটি,
তার পর জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সাঁতার কাটি।
আনন্দে করি 'জলঙ্গী'-জলে অবগাহন,
শীতল সলিলে জুড়াইয়া যায় শরীর-মন।

আউষ ধানের রাঙা-রাঙা ভাত কলার পাতে,
তার সাথে খাঁটি গব্য ঘৃত ও উচ্ছে ভাতে,
সজ্‌নে ডাঁটার চচ্চড়ী আর ঝালের ঝোল,
বিউলির ডাল, তেঁতুলের টক্‌, ঘরের ঘোল,
নয় তো দুগ্ধে ফেলে দিয়ে দুটো মর্ত্তমান
দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রে নিয়ে চিবাই পান।
আমিষ খাদ্যে রক্তের দাগ; অরুচি তাই
মৎসে মাংসে; নিরামিষ খেয়ে তৃপ্তি পাই।

বটের ছায়ায় বাঁশের মাচায় করি শয়ন,
পাতার আড়ালে কপোত-কপোতী করে কূজন,
শুনিতে শুনিতে কখন যে চোখে নিদ্রা আসে,
জেগে দেখি আছে 'পত্রিকা'খানা পড়িয়া পাশে।
দুনিয়া কোথায়—জানিতে কাগজে বুলাই চোখ,
বই পড়িবারও একটু-আধটু রয়েছে ঝোঁক।
পড়িতে পড়িতে বেলা একেবারে পড়িয়া যায়;
দূর দিগন্তে রক্ত সূর্য্য অস্ত-প্রায়।
স্নান ক'রে এসে আরাম-চেয়ারে লই আসন,
পায়ের তলায় ঘাসের কোমল আস্তরণ।
আবির-মাখানো বনস্পতির উচ্চ শির,
সন্ধ্যা-মেঘের ছায়ায় রঙীন নদীর নীর।
ছেলে মেয়ে দুটো বালুচরে দেয় দৌড় ও ঝাঁপ,
হেন কালে প্রিয়া রাখেন সাম্‌নে চায়ের কাপ।
ধব্‌ধবে সাদা বাটীতে সোনালি চায়ে চুমুক—
সন্দেহ নেই—জীবনে একটা পরম সুখ।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসে জলে স্থলে,
এক একটি ক'রে আকাশে তারার প্রদীপ জ্বলে।

গ্রামোফোনে এসে বেটোফেন শেষে হয় হাজির,
সাঁজের গগনে জমে ওঠে ক্রমে সুরের ভীড়।
বিচিত্র সুর ডানা মেলে দিয়ে শূন্যে ধায়,
হৃদয়ের যতো গোপন বেদনা মুক্তি পায়
অশ্রু ধারায়; কাঁদি চুপ ক'রে অন্ধকারে।
সংখ্যাবিহীন সৌরজগত আকাশ-পারে
বন্ বন্ ক'রে ঘুরে ঘুরে চলে সারাক্ষণ—
ওদের পিছনে রয়েছে কি কোন বিরাট্ মন?
অর্থহীন কি আমাদের এই কান্না হাসি?
অজানা হইতে কোন্ অজানায় চলেছি ভাসি!

শিখাটি মেলিয়া প্রাণপণে, হায়, জ্বলিতে চাই—
দম্‌কা বাতাসে হঠাৎ কখন্ নিভিয়া যাই!
ভালোবাসি যারে—কোথায় সহসা যায় সে চ'লে!
প্রেম ও মৃত্যু—কোন্‌টা সত্য? কে দেবে ব'লে?

গান থেমে যায়, খেয়ে দেয়ে শুই, নিদ্রা আসে;
এক ঘুমে হয় রাত্রি কাবার। তখন হাসে
সুদূর আকাশে প্রভাতী তারার দীপ্ত আঁখি,
বাসায় বাসায় কলরব তুলে জাগিছে পাখী।
কর্ম্ম-জীবন সুরু হ'য়ে যায় পুনর্ব্বার,
ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘিস্কাপ চলে—আমি ছুতার।

পুণ্য-স্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

ইহার পর আসিল "সবুজ পত্রে"র যুগ। নূতন লেখা হইলে প্রায়ই তিনি কলিকাতায় আসিয়া শুনাইয়া যাইতেন। "হালদার গোষ্ঠী," "হৈমন্তী" এবং "বলাকা"র কয়েকটি কবিতা এই ভাবে শুনিয়াছিলাম। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে "ফাল্গুনী" নাটক রচিত হয়। কিছু দিন পরেই, ইষ্টারের ছুটিতে উহা শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইল। প্রথম প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে যাইতাম, তখন বাহিরের মহিলা অতিথির সংখ্যা কমই দেখিতাম, এখন ক্রমেই তাহা বাড়িতেছিল। "ফাল্গুনী" দেখিতে যেবার গেলাম, সেবার মহিলা, তরুণী ও বালিকা মিলিয়া এমন একটি দল উপস্থিত হইলাম যে থাকার জায়গারই টানাটানি পড়িয়া গেল। গ্রীষ্মের দিন বলিয়া গাড়ীবারান্দার ছাদ প্রভৃতি স্থানগুলিকেও শুইবার জায়গারূপে ব্যবহার করা হইতে লাগিল। পুরুষ-অতিথিও অনেক আসিয়াছিলেন। এত জনসমাগমে কবিকেও কিঞ্চিৎ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তবু ইহারই ভিতর সময় করিয়া আমাদের নূতন গান শুনাইয়া গেলেন।

তখন শুক্লপক্ষ ছিল, বাহিরে জ্যোৎস্নার জোয়ার। চন্দ্রালোকে এক দিন খোলা আকাশের তলায় ছোট একটি ইংরাজী নাটিকা অভিনয় হইল। নাটিকাটি আইরিশ্ কবি এ. ই. লিখিত, নাম বোধ হয় "The King"। অভিনয় যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। এণ্ড্রুস্ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব, সন্তোষবাবু ও কালীমোহন বাবুর নাম অভিনেতাদিগের ভিতর মনে পড়িতেছে। King সাজিয়াছিল একটি অল্পবয়স্ক সিন্ধুদেশীয় বালক, নাম যত দূর মনে পড়ে গিরিধারীলাল কৃপালানী। বালকটির গলা অতি মিষ্ট। প্রায় মন্দিরের পাশেই এক জায়গায় একটি পুকুর কাটান হইয়াছিল। খানিকটা মাটি তোলার পরই উহা পরিত্যক্ত হয়, ঐ আধকাটা পুকুরটির ধারেই অভিনয় হয়। আইরিশ গানগুলি দুর্ব্বোধ্য ছিল, চন্দ্রালোকিত দৃশ্যগুলি এখন স্বপ্নলোকের ছবির মত মনে পড়ে।

"ফাল্গুনী" অভিনয় জমিয়াছিল খুব। রঙ্গমঞ্চ ত ফুলে পাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা। "ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া" গানটি যখন হইল, তখন দুইটি ছোট ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া মহানন্দে দোল খাইতে খাইতে গান আরম্ভ করিল। সঙ্গী তাহাদের অনেকগুলিই ছিল, তাহারা ষ্টেজে দাঁড়াইয়াই গান করিতেছিল। ঐ ছেলে দুইটির ভিতর একটি সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়, ডাকনাম "বুনী," আর একটি ছেলের নাম সমরেশ। পাখীর কাকলীতে যেমন বনস্থল প্রতিধ্বনিত হয়, বালকদের গানেও তেমনই নাট্যঘরখানি

প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল সাজিয়াছিলেন। "ঘরছাড়ার দলে" ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষবাবু, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি। জগদানন্দবাবু "দাদা" সাজিয়া যা চৌপদী আওড়াইয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে।

"অন্ধ বাউলের" গান এখনও যেন কানে বাজিতেছে, "ধীরে বন্ধু গো, ধীরে ধীরে" ও "চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে"।

এই বিপুল অতিথি-সমাগমের ভিতরেও কবি রোজ দুই বেলা আসিয়া আমাদের খবর লইয়া যাইতেন, গান শোনান কবিতা পড়িয়া শোনানও বাদ যায় নাই।

এই বৎসর রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন। পুরাতন সিটি কলেজ গৃহের সেই তিনতলায় সভা হয়। সেই বিষম জনতা, ঠেলাঠেলি, প্রায় মারামারি, সবেরই পুনরভিনয় হইয়া গেল।

অন্যান্য বৎসরের মত ১৩২২এর মাঘোৎসবেও রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিলেন। মাঘোৎসবের পরেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বিস্তৃত ঠাকুরদালানে আবার "ফাল্গুনী"র অভিনয় হইল। বাঁকুড়ায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, তাহারই সাহায্যকল্পে এই অভিনয় হইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অভিনয় করা লইয়া কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল, পরে তাহা থামিয়াও গেল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় "বৈরাগ্য সাধন" নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া তাহা "ফাল্গুনী"র গোড়ায় জুড়িয়া দেন, দুইটি একসঙ্গেই কলিকাতায় অভিনয় হয়।

"বৈরাগ্য সাধনে" রাজসভার দৃশ্যটি হইয়াছিল অপরূপ। যেন কালিদাসের কাব্য হইতে একটি দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুই ভ্রাতাকে যশস্বী চিত্রকর বলিয়াই এত দিন জানিতাম, তাঁহারা যে আবার এত ভাল অভিনয় করেন, তাহা কোনোদিন শুনি নাই। অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিভূষণের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কোনোদিনও ভুলিতে পারিবেন না। প্রহরীর ভূমিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা যে আসরে নামিতেছেন, তাহা জানিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিশেখর সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন তখন দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। কোন্ মন্ত্রবলে যে তিনি নিজের বয়স হইতে ত্রিশটা বৎসর খসাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। এলাহাবাদে তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি যেন তাহারও চেয়ে নবীন। চিরদিন তাঁহাকে গৈরিক বা শাদা পোষাকেই দেখিয়াছি, বিচিত্র মহার্ঘ্য সজ্জায় সজ্জিত কবিশেখরের ভিতর আমাদের সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। দর্শকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন।

"বৈরাগ্য সাধন" অবশ্য চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দিল, কর্ণকেও পুলকিত করিল কম নহে; কিন্তু "ফাল্গুনী"র অভিনয় শান্তিনিকেতনে যেমন দেখিয়াছিলাম, এখানে তেমন যেন দেখিলাম না। বালকেরা আর তত প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে পারিল না। দোলনাও তেমন সতেজে দুলিল না। রবীন্দ্রনাথ এখানেও "অন্ধ বাউল" সাজিয়া গান গাহিয়া গেলেন।

ইহার পর আবার কবির জাপানযাত্রার একটা কথা উঠিল। কবে যাইবেন, কোথায় কোথায় যাইবেন, সঙ্গে কে কে যাইবে, তাহা লইয়া পূর্ব্বের মত নানা জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

১লা মে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রা করিলেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় আসিলেন যাত্রার আয়োজন করিতে। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ী ২৮শে কি ২৭শে এপ্রিল কবিকে লইয়া একটি গানের আসর হয়। সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। কয়েকটি গান হইল, "বলাকা"র কবিতাও কয়েকটি পড়া হইল।

তাহার পরদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গেলাম। গিয়া দেখি ফোটো তোলার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা নিজেরা সাজিতে এবং ছোটদের সাজাইতে ব্যস্ত, রথীন্দ্রনাথ নিজের একটি ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক ছাত্রকে 'সিটিং' দিতেছেন। খানিক পরে তিনি উঠিয়া আসিলেন। একটি ছবিতে তিনি বসিলেন, চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার নাতি নাতনী ও নাতবৌয়ের দল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি শিশুকন্যা কবির কোলে গিয়া বসিল। আর একটি ছবিতে তাঁহার পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূও যোগ দিলেন। ছবি তোলা শেষ হইবামাত্র খবর আসিল যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কবি নাতনীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি তা হ'লে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তোমরা একটু বসতে পারবে কি?"

আমরা সেইখানেই বসিলাম, তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। খানিক পরে সেইখানেই আমাদের আহ্বান আসিল। সেখানে গিয়াও কিছুক্ষণ বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ এবারেও তাঁহার সহিত জাপান যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার জাপানযাত্রার আগে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না।

জাপান এবং আমেরিকা ঘুরিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭-র মার্চ্চ মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। চিঠিপত্রে প্রায়ই খবর পাওয়া যাইত। জাপানে কবি অনেক বিচিত্র ও সুন্দর উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আগেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সেগুলি অনেক দিন সাজান ছিল, আমরা কয়েকবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই রব উঠিয়া গেল যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। মহা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল যথার্থ খবরের জন্য; তাহার পর শুনা গেল যে তিনি আসিয়া পড়েন নাই বটে, তবে অতি শীঘ্রই আসিতেছেন। ১৩ই মার্চ্চ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠিক খবরটা জানা না থাকাতে Outram ঘাটে ভীড়টা কিছু কমই হইয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহার ভিতর অধিকাংশই তাঁহার আত্মীয়ের দল; অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের ভিতর যাঁহারা খাঁটি খবর বাহির করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্য আসিয়াছিলেন।

ঘাটের উপরে দোতলায় যেখানে বসিবার ও চা খাইবার স্থান, সেইখানেই বসিয়া আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজ আর আসেই না, অনেক পরে দূরে একটি জাহাজ দেখা গেল। অনেকে আশ্বাস দিলেন ঐটিই ঠিক জাহাজ। সামনে একটি পাইলট বোট খুব দ্রুতগতিতে আসিতেছিল। জাহাজটির নাম 'বাঙ্গালা'। দূর হইতেই জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কে একজন দুই-এক বার রুমাল নাড়িলেন। অপেক্ষাকারীদের ভিতর মহা কোলাহল সুরু হইল। তাঁহারাও ছাতা, লাঠি, রুমাল, টুপি প্রভৃতি নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। এক দিকে গেরুয়া ধরণের রঙের পোষাক-পরা কাহাকে যেন দেখা গেল; দুই-চারি জন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ গুরুদেব!" কিন্তু জাহাজ আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেখা গেল যে মূর্ত্তিটি গুরুদেবের নয়, একটি খাকি পোষাকপরা গোরার। আরও কিছু নিকটে আসিলে, জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ ও মুকুলচন্দ্র দে-কে দেখা গেল। দ্বিতীয় *ভদ্রলোকের সমবয়স্ক বন্ধু যাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুকুলচন্দ্রের পোষাক-পরিচ্ছদ, মাথার টুপি, লম্বা চুল প্রভৃতি সব কিছুরই সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তীরে দণ্ডায়মান জনতাকে* লক্ষ্য করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

তরুণের দল "Three cheers for Mukul San, hip hip, hurrah!" করিয়া এক চীৎকার দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া মুকুলচন্দ্রের মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

জাহাজ ঘাটে লাগিবামাত্র মহা ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি লাগিয়া গেল। আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিতে ভরসা না করিয়া দোতলায় বসিয়াই রহিলাম। নীচে তাকাইয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য ফুলের মালায় ভূষিত করা হইতেছে। ছবি তুলিবার চেষ্টাও মন্দ হইতেছে না। মেয়েরা ভীড়ের ভয়ে নীচে নামিতে পারিতেছে না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ এবারে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই যে এসেছ দেখছি, আমি ভেবেছিলুম কাউকে জানতে না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসব।"

একটি উৎসাহী যুবক এখানেও ক্যামেরা-হস্তে উপস্থিত দেখিয়া তিনি ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "দূর, ও আবার কি!" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ছবি উঠিয়াছিল কি না জানি না।

অতঃপর সকলে মিলিয়া Outram ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম।

১৪ই মার্চ্চ বোধ হয় বিচিত্রা ভবনে তাঁহার ফিরিয়া আসা উপলক্ষ্যে ছোটখাট একটি সভা হয়। ৫টার সময় যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল, তখন গিয়া দেখিলাম কেহই বিশেষ আসেন নাই। যাহা হউক আগে গিয়া ঠকি নাই, দুইটি বালক-বালিকা আমাদের সারা বাড়ী কেমন সাজান হইয়াছে তাহা দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল এবং পাখীর কাকলির মত অনর্গল কথা বলিয়া চলিল। বালিকাটি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা, বালকটি মীরা দেবীর পুত্র নীতু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানী জিনিস আসিয়াছিল অসংখ্য, সেগুলিও তাঁহার বসিবার ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। এই সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিছু পরে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে "বিচিত্রা"র উপরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। নিমন্ত্রিতের দল ক্রমে ক্রমে

[আ]সিয়া জুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেজদিদিকে এই সভায় [দে]খিয়াছিলাম। তাঁহার তখন বয়স অনেক হইয়াছিল, [কিন্তু] দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল অসাধারণ।

গান অনেকগুলি হইয়াছিল। প্রথমে মেয়েরা অনেকে গান করিলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে দুইটি গান করিলেন। প্রোগ্রাম হিসাবে আর তেমন কিছু ছিল না, তবে গল্পস্বল্প অনেক হইল। ভোজনের আয়োজন প্রচুর ছিল, অতিথিরা তাহারও সদ্ব্যবহার করিলেন মন্দ নয়। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। ইহার দুই-তিন দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

বর্ষশেষে ও নববর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে ইহার কয়দিন পরেই শান্তিনিকেতনে গেলাম। এবারের দলটি নেহাৎ ছোট, পুরুষ যদি বা দুই-চার জন ছিলেন, মেয়ে আমরা দুই বোন বাদে আর একজন মাত্র ছিলেন। তিনি প্রশান্তচন্দ্রের ভগিনী নীলিমা। গাড়ীতে ভীড় খুব বেশী ছিল না। বেলা চারটার সময় বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা যে যাইতেছি সে খবর সঠিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, সুতরাং আমাদের লইতে কেহ স্টেশনে আসে নাই। যাহা হউক, দিনের বেলা, ইহাতে কিছু অসুবিধা হইল না। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া যাত্রা করা গেল, ছেলের দল হাঁটিয়াই চলিল। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন নামটা গাড়োয়ানদের কাছে পরিচিত ছিল না, তাহাদের বলিতে হইত "কাঁচবাংলা"। শান্তিনিকেতনের মন্দিরটিকে তাহারা এই নাম দিয়াছিল। গাড়ীতে বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম আমাদের দেখিয়া সকলে কি রকম অবাক হইয়া যাইবেন, থাকিবার স্থান কোথায় জুটিবে ইত্যাদি। শেষ সমস্যার উত্তর গাড়োয়ানই স্বয়ং সমাধান করিয়া দিল। তাহাকে রাস্তার উপর গাড়ী দাঁড় করাইতে বলা সত্ত্বেও সে গাড়ী হাঁকাইয়া সোজা রবীন্দ্রনাথের তখনকার ছোট বাড়ীটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি বোধ হয় তখন চা খাইতেছিলেন, গাড়ীর চাকার শব্দে কেহ আসিয়াছে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীও বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। রবীন্দ্রনাথকে কিছু অসুস্থ দেখিলাম; গালে ও কানের কাছে eczema-র মত কি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেই চিরপ্রফুল্ল মূর্ত্তিকে কোনো রোগে ম্লান করিত না। আমাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি বড়মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বউমা, তুমি এঁদের ফলটল কিছু খাইয়ে দাও," বলিয়া নিজের খাইবার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অগত্যা খাইতে বসিতে হইল, কারণ তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করা যায় না। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা পদব্রজে আসিতেছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দলটিকেও নিজের খাইবার ঘরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। আমরা এই সুযোগে বাহির হইয়া বারান্দায় বসিলাম। অতিথিদল জলযোগ সারিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন নেপালবাবুকে সেই স্থানে দেখা গেল। তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন ত মশায়, আপনি কি কাণ্ড করেন! লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে তার পর আর আপনার দেখাই নেই। ভাগ্যে আমি ছিলুম, তাই এখনকার মত কোনো রকমে ফলমূল দিয়ে অতিথিসৎকার করলুম।" অন্যান্য নানা কথার পর নেপালবাবু আমাদের বলিলেন, "চল, তোমাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে আসি।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "জায়গা ওদের বেশ ভাল করেই চেনা আছে।"

অতিথিশালার বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। সন্ধ্যার সময় বর্ষশেষের উপাসনা হইবে শুনিলাম। সুতরাং তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া, স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম উপাসনা আরম্ভ হইতে তখনও কিছু দেরি আছে। এই সময়টা অধ্যাপকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখাসাক্ষাৎ সারিয়া আসিলাম। নেপালবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ শালবীথিকার ভিতর দিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। আরও দুই-চারজন সঙ্গিনী আসিয়া পড়াতে আমাদের গতি একটু মন্থর হইয়া গেল, কবি চোখের অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। মন্দিরে পৌঁছিয়া আমরা আচার্য্যের আসনের পিছনে যে বারান্দাটি, সেইখানে গিয়া বসিলাম। গায়কেরা যেখানে বসেন, সেইখানে একটু মৃদু মোমবাতির আলো, আর কোথাও আলো নাই। শিক্ষকরা, ছাত্রের দল, এবং স্বল্পসংখ্যক অতিথি, একে একে সকলেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ আচার্য্যের আসনে আসিয়া বসিলেন।

প্রথম গান হইল, "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার"। দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী মিলিয়া গানটি করিলেন। উপাসনার সমস্ত

কাজ একলা রবীন্দ্রনাথই করিলেন। মানবজীবনে দুঃখের যথার্থ স্থান কি সেই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পৃথিবী হইতে দুঃখকে দূর ত করা যায় না। তাহাকে নমস্কার করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে, কারণ সে শুধু আঘাতই করে না, সে অমৃতলোকের বাণীও বহন করিয়া আনে।

শেষেও দুইটি গান হইল। একটি দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী করিলেন, দ্বিতীয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা করিল।

উপাসনার পর একজন ভদ্রলোক আলো দেখাইয়া আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। তিন জনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। মীরা দেবী আসিয়া খানিক পরে আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। "দেহলী"র দোতলার অতি ছোট ঘরখানিতে তখন কবি বাস করিতেন। লিখিবার স্থান ছিল তাহার পাশের একটি খুপ্‌রিতে। বসিবার ঘরের কাজ করিত সরু বারান্দা ও ছাদ। নীচে তখন মীরা দেবী সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপরে ডাকিতেছেন শুনিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ছাদও তখন অন্ধকার, কিন্তু আলোর অভাব কেহই অনুভব করিতেছিলেন না। অতিথিদের ভিতর অনেকেই আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম, আমরাও এক কোণে বসিয়া গেলাম। শুনিলাম Cult of Nationalism বিষয়ে কথা হইতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি তখন সদ্য ফিরিয়াছেন, সে দেশের যাহা কিছু তাঁহার ভাল লাগে নাই, তাহার উল্লেখ করিলেন। Collectivism ও Individualism সম্বন্ধে খানিক আলোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মাঝে মাঝে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন।

গানও একটি শুনিবার সৌভাগ্য হইল। তখনকার দিনে যখনই যে কারণেই রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সভা বসুক, অন্ততঃ একটি গান না শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতেন না। "হৃদয় মাঝে বিছাও আনি, তোমার ভুবনজোড়া আসন খানি," গানটি সেদিন প্রথম শুনিলাম। আশ্রমের ছেলের দল তখন গানের সুরে দিনের কাজ আরম্ভ করিত, গানেই শেষ করিত। তাহারাও এই সময় নীচে গান গাহিয়া চলিয়া গেল।

এই সময় খাওয়ার ডাক আসাতে আমরা বাধ্য হইয়া নামিয়া গেলাম। খাওয়া হইতেছিল দিনুবাবুর বাড়ী, শ্রীমতী কমলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। নামিয়া দেখি পুরুষ-অতিথির দল আহারে বসিয়া গিয়াছেন। আমরা অন্য দিকের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাদের সভা ভঙ্গ করিয়া এই সময় নামিয়া আসিলেন। আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি গো তোমরা বুঝি পরের দলে? মেয়ে হওয়ার ঐ ত মজা, সকলকে পরিবেশন ক'রে পরে যা থাকে তাই খেতে হয়।" কিন্তু মেয়েরা যে পরে খাইবে ইহা তাঁহার ভালও লাগিল না। কমলা দেবীর কাছে গিয়া বলিলেন, "জায়গা ত অনেক রয়েছে, মেয়েদের এই সঙ্গে বসিয়ে দিলে ক্ষতি কি?" কমলা সেইরূপই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার এত বক্তৃতা মাটি হয়ে গেল।" বক্তৃতা মাটি করার ব্যবস্থাটা অবশ্য নিজেই করিলেন।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর নেপালবাবুর সঙ্গে আমাদের আড্ডায় ফেরা গেল। শুনিলাম ভোর সাড়ে চারটায় নববর্ষের উপাসনা হইবে। পাছে সময়মত না উঠিতে পারি এই চিন্তায় খানিকটা এবং গরমেও খানিকটা, রাত্রে ঘুমই হইল না। অতিথিশালার চারি দিকে তখন বড় বড় গাছ ছিল, এখন কিছু কিছু কাটিয়া ফেলা হইয়াছে মনে হয়। ভোর হইতে-না-হইতেই এইখান হইতে অসংখ্য পাখীর বৈতালিক কাকলী শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম, এবং তাহার কয়েক মিনিট পরেই ছাত্রদের প্রভাতী গান কানে ভাসিয়া আসিল, "আমারে দিই তোমার হাতে, নূতন করে নূতন প্রাতে"।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখি তারার আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের আভাস।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেই ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। এটি যে নূতন ঘণ্টা তাহা শব্দেই বুঝিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখিলাম উহা জাপানী গং। কবি ওটি জাপান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

"পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে," গানটি নববর্ষের উৎসবে হইয়াছিল মনে আছে। গান অনেকগুলি হইল, আশ্রমের ছেলের দলই বেশীর ভাগ গান করিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ একটু দ্রুতপদেই মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাইয়া আমরা অনেকেই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলাম।

সকালের জলযোগ সারিয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেখিলাম কবি পুরুষ-অতিথির দলকে লইয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। শৈলবালা অসুস্থ ছিলেন শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম।

"পুণ্য-স্মৃতি" এ পর্য্যন্ত যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় দ্বিগুণ প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। অতঃপর তাহা মাসে মাসে বাহির না হইয়া, সমগ্র রচনাটি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইবে।—"প্রবাসী"র সম্পাদক।

আশ্রয়

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

সকালবেলা জমিদার আনন্দমোহন নিজের হাতে এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া একটানা টানিয়া যাইতেছিলেন। পৌষ মাসের সকাল, সামনের আমগাছের ফাঁক দিয়া এক ফালি রৌদ্র আসিয়া বারান্দার যেখানটায় পড়িয়াছিল সেইখানে একখানি জলচৌকি টানিয়া লইয়া তিনি বসিয়া পড়িয়াছেন। দালানের আলিসার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য পায়রা বক্ বক্ কুম্ কুম্ শব্দে মাতাইয়া তুলিয়াছে—হুঁকার শব্দে আর পায়রার ডাকে দিব্যি ঐকতান হইয়া গিয়াছে। আনন্দমোহন একমনে ভাবিতেছেন—"দীনু মণ্ডল সেরেস্তায় পাঁচ টাকা তের আনা নয় পাই খাজনা রাখে—আজ পর-পর চারটি বৎসর একটি পয়সা দেবার নাম করে নাই—তাগাদা করিলে বলে খেতে পাই নে—ছেলেপুলে নিয়ে ভিটেয় পড়ে মরি খাজনা দেই কোত্থেকে। ক্ষেত্রদা কাল দাখিলাপত্র বগলে করিয়া তাহার বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সে একেবারে রাগিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে, সব হারামজাদার চালাকি—কেবল ফাঁকি দেবার মতলব—এবার নিশ্চয় হারামজাদার নামে দেব নালিশ ঠুকে—বুঝবে তখন মজাটা।" আনন্দমোহন শিহরিয়া উঠিলেন—নালিশ? বলে কি ক্ষেত্রদা?

সে এই তো গত মঙ্গলবারে দেখিয়া আসিয়াছে দীনুর স্ত্রী চাল নাই বলিয়া রাত্রে পাক চড়ায় নাই।... কিন্তু খাজনা না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া? তাহার পর আনন্দমোহন ভাবিতে লাগিলেন—আচ্ছা দীনুর এত অভাব বার মাসই লাগিয়া আছে কেন? মনে মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন বছর-তিনেক আগে দীনুর হালের একটা বলদ হঠাৎ মরিয়া যায়, তার পর আর ভাল গরু সে কিনিতে পারে নাই—একটা কিনিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা যেমনি রোগা তেমনি দুর্ব্বল, ঘণ্টাখানেক চাষ করিলেই হাঁপাইয়া উঠে।

গত তিন বৎসর সে তাই আখের চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে, কাজেই গুড় বেচিয়া সবাই যখন বেশ দু-পয়সা পায় সে তখন কিছুই রোজগার করিতে পারে না। সুতরাং দীনুর একটা ভাল বলদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা না হইলে সে খাজনাই বা দিবে কেমন করিয়া, খাইবেই বা কি? আনন্দমোহন ঠিক করিলেন তাহাকে এবার যেমন করিয়াই হোক একটা ভাল বলদ কিনিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রদা হয়ত শুনিয়া রাগ করিবে, কিন্তু রাগ করিলেই সব হইত যদি? জমিদার হইয়া যদি ইহার একটা ব্যবস্থা না করিতে পারিল, তবে আর—।

হঠাৎ আনন্দমোহনের চিন্তা বাধা পাইল—মাথার উপর হইতে খানিকটা চূণ বালি খসিয়া একেবারে জলচৌকির উপরে পড়িল—আনন্দমোহন সেদিকে খানিকক্ষণ করুণ নয়নে তাকাইয়া আবিষ্কার করিলেন একটা বটের শিকড় সাপের ল্যাজের মতো উপর হইতে নীচের দিকে খানিকটা নামিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—সেইখান হইতেই খানিকটা চূণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে। সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনন্দমোহন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন আজ ত্রিশ বছর চূণ বালির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই—হইবে না? মোটা মোটা কড়িগুলার দুই পাশ খাইয়া বসিয়া গিয়াছে—কোন্ সময় হুড়মুড় করিয়া না পড়িয়া যায়। গত ভূমিকম্পের সময় চিলেকোঠার পাশটায় এমন একটা ফাটল হইয়াছে যে সেদিকে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কিছুক্ষণ এমনি ভাবিয়া হঠাৎ হাতের হুঁকা নামাইয়া ভাবিলেন—যাক গে ছাই—আর কয়টা দিন; কি হইবে দালান-কোঠা বাড়ীঘর দিয়া। বাহির হইতে গজ গজ করিতে করিতে ক্ষেত্রনাথ বাড়ীর ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। আনন্দমোহনকে সম্মুখে দেখিয়াই একেবারে পাড়া মাথায় করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আচ্ছা, তোমার আক্কেল কি বল তো দাদাবাবু? ক্ষেত্রনাথের মূর্ত্তি দেখিয়াই আনন্দমোহনের মুখ এতটুকু হইয়া গেল, অত্যন্ত ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া বলিলেন—অত রাগ করছ কেন, হ'ল কি ক্ষেত্র-দা!

—হ'ল কি। বয়স যত বাড়ছে তত ছেলেমানুষ হচ্ছ দিন দিন। আপনার বুঝ পাগলেও বোঝে—তুমি কোন দিনই বুঝবে না।

আনন্দমোহন যেন কিছুই জানেন না এমনি মুখ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

—বলি মতি মাঝির যে চার বছরের খাজনা মাপ করে দিয়ে এলে এখন সদর খাজনা দেবে কি দিয়ে শুনি?

—সে এক রকম ক'রে জুটে যাবে ক্ষেত্র-দা।

ক্ষেত্রনাথ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল—এক রকম ক'রে জুটে যাবে—কে জুটিয়ে আনবে শুনি?

—আহা তুমি যে রেগেই অস্থির। বেচারার সোমত্ত ছেলেটা গেল মারা, কি ক'রে এখন সংসার চালায় বল দিকি? কেঁদেকেটে আমার হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরলো—"না" বলতে পারলাম না ক্ষেত্র-দা। আর তোমরা জমিদার মানুষ, তোমরা যদি গরীব বচারাদের দিকে একটু না তাকাও ত ওরা বাঁচে কি ক'রে?

ক্ষেত্রনাথ একটুও স্বর নামাইল না—তেমনি করিয়া বলিয়া উঠিল—ইস্ কি আমার জমিদার রে—বার্ষিক দু-শ তিন টাকা সাত আনা আদায়—আর চল্লিশ বিঘে খামার জমি। বলি এখনও যে জমিদারী ফলাও তোমার লজ্জা করে না?

প্রত্যুত্তরে আনন্দমোহন শুধু হাসিতে থাকেন। ক্ষেত্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া গজ গজ করিতে থাকে—সেই ফাঁকে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া আনন্দমোহন রাস্তায় নামিয়া পড়েন—ক্ষেত্রনাথ মুখ বাড়াইয়া বলে—আবার চললে বুঝি পাড়ায়—একটু সকাল সকাল ফিরো—বেলা তিনটে যেন না বাজে।

আনন্দমোহন জবাব করেন—এই এলাম ব'লে ক্ষেত্র-দা।

সত্যই জমিদার-বাড়ী। চকমিলান দালান, পুকুর, বাগান, কিন্তু হইলে কি হইবে—দালান খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, পুকুর উঠিয়াছে পানা শ্যাওলায় ভরিয়া, বাগানের আগাছা বাগান ছাড়াইয়া এখন উঠান পর্য্যন্ত আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। বছর ত্রিশ আগে কিন্তু এমন ছিল না—পুকুরের জল ছিল কাকচক্ষুর মত, দালানের ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও নষ্ট হয় নাই। ছোট জমিদারী—বার্ষিক আয় ছিল হাজার-সাতেক টাকা। আনন্দমোহনের পিতা হরিমোহন দান-খয়রাত করিয়া মৃত্যুকালে পাঁচ-সাত হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পুত্র আনন্দমোহন কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক—তিনি জমিদারী শাসন জানেন, আর নাই জানেন, পিতার দানের স্বভাবটা পাইলেন ষোল আনার উপরে—উপরি আরও কিছু। পিতার মৃত্যুর বৎসর-দুই পরে সে-বার বর্ষায় এ অঞ্চলে এক ভীষণ বন্যা হইয়া গেল—ক্ষেতের ফসল গেল, লোকের ঘরবাড়ী ভাসিয়া গেল—কত গরুবাছুর, মানুষ ডুবিয়া মরিল। সদর খাজনার জন্য যে টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহা এবং ধারকর্জ্জ করিয়া আরও কিছু জোটাইয়া আনন্দমোহন সাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন; ফলে সদর খাজনা দেওয়া হইল না, জমিদারী উঠিল নিলামে, পাওনাদারে ডাকিয়া কিনিয়া লইল। জমিদারী সেই হইতে শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু জমিদার নামটা রহিল বাঁচিয়া। আনন্দমোহন নিজেও মাঝে মাঝে ভুলিয়া যান, যে জমিদারী তাঁহার নিলাম হইয়া গিয়াছে—হাতটা তাঁহার এখনও তেমনি দরাজ—দানে একেবারে কল্পতরু—কুবেরের ভাণ্ডার—পাইলেও এত দিনে তাহা ফুঁকিয়া দিতে পারিতেন।

ক্ষেত্রনাথ 'পুরাতন ভৃত্য'। ভৃত্য বলিলে ভুল হইবে, বিপদে সহায় সম্পদে বন্ধু। আনন্দমোহন চিরটা কাল নাবালক, এক কথায় ক্ষেত্রনাথ তাঁহার অভিভাবক।

আনন্দমোহন ক্ষেত্রনাথকে ভালবাসেন—ভয় করেন। পিতা হরিমোহন পুত্রকে গৃহী করিয়া রাখিয়া যান—কয়েক বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তানও হয়, কিন্তু জমিদারী যাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও পুত্র এক প্রকার অচিকিৎসাতেই একে একে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া যায়—সেই হইতে আনন্দমোহন গৃহের মায়া কাটাইয়াছেন, আর গৃহী হন নাই।

২

পথের পাশে একটা টক-কুলের গাছ—এই গাছের কুল সকলের আগে পাকে তাই পৌষ মাস পড়িতে না পড়িতেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের গাছটির তলায় আনাগোনা চলিতে থাকে। আনন্দমোহন পথ চলিতে চলিতে শুক্‌না পাতার উপরে পায়ের শব্দ হইতেই কুল-গাছটার তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—কে রে, কে ওখানে?

আনন্দমোহনের দিকে পিছন ফিরিয়া একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আনন্দমোহন পুনরায় হাঁকিয়া বলিলেন—কে রে নিধে না? এদিকে আয় হারামজাদা।

সুতরাং নিধিরামের সকল চেষ্টা বিফল হইল—অগত্যা ভয়ে ভয়ে আনন্দমোহনের দিকে আগাইয়া আসিল।

—পাজি ছেলে, এই না কাল জ্বর থেকে উঠে সবে অন্ন পথ্যি করেছিস—আর এরই মধ্যে ছুটে এসেছিস কুল খেতে। খেয়েছিস কুল?

নিধিরাম মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, খায় নাই।

—দেখি, হাঁ কর্ ত? কয়েক বার ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে নিধিরাম হাঁ করিলে দেখা গেল, গালের এক পাশে দুই-তিনটি কুলের আঁটি লুকাইয়া রাখিয়াছে।

—ফেল, ফেল হারামজাদা—মিথ্যেবাদী? বলা বাহুল্য যে আঁটিগুলি এতক্ষণ নিধিরাম ঠোঁট ও দাঁতের মধ্যে সঙ্গোপনে রাখিয়া—মাঝে মাঝে জিহ্বার উপরে টানিয়া আনিয়া অম্লরসটুকু পরম সুখে মুখ বাঁকাইয়া চোখ বুজিয়া এক এক বার উপভোগ করিয়া লইতেছিল—সেগুলি বাধ্য হইয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইল।

—বল্ আর কুল খেতে আস্‌বি নে?

নিধিরাম মাথা নাড়িয়া জানাইল—আসিবে না। আনন্দমোহন হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—কোন দিনই না?

—না।

—ইস্—সত্যির জাহাজ! আচ্ছা আসছে সোমবারের আগে আস্‌বি না—এ কয় দিনে শরীরটা একটু ভাল হোক্ —কেমন?

নিধিরাম সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

পরে নিধিরামকে কোলের মধ্যে টানিয়া চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিলেন—নিধু আমার খুব লক্ষ্মী-ছেলে—নে একটা পয়সা নে—নিতাই পালের দোকানে গিয়ে এক পয়সার বিস্কুট কিনে খাস্—বুঝলি?

নিধিরাম পয়সাটি হাত বাড়াইয়া লইয়া বলিল—এখনই যাই।

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন—যা।

নিধিরাম ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বার-তের বৎসরের একটি মেয়ে কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল, আনন্দমোহন ডাকিয়া বলিলেন—কে রে বাতাসী না? মেয়েটি ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দমোহন কাছে আসিয়া বলিলেন—তোর বাপের পিঠের ব্যথা কেমন আছে রে।

—তা ত জানি নে—বাবা তো বাড়ী নাই!

—কোথায় গেছে রে?

—নৌকা নিয়ে হাটে গেছে।

—কাল যে বললে—দাদাঠাকুর পিঠের বেদনায় নড়তে পারছি না—আর আজই গেল নৌকা নিয়ে!

—না গিয়ে করে কি খুড়োঠাকুর—ঘরে যে চাল নেই।

—তাই নাকি! কিন্তু বুড়োমানুষ পিঠের ব্যথা নিয়ে কেমন ক'রে নৌকা বাইবে বল তো?

কিছুক্ষণ পরে বাতাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—হাঁ রে বাতাসী খেয়েছিস আজ?

বাতাসী কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কাল রাত্রে খেয়েছিলি—না চাল ছিল না।

বাতাসী কোন কথারই জবাব দিল না, কিন্তু হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—এক কাজ কর্ বাতাসী—পুকুরঘাটে একটুখানি অপেক্ষা করিস—আমি এই এলাম ব'লে—আমি না এলে যাস নে কিন্তু লক্ষ্মীটি।

একটু দূরেই নিতাই পালের দোকান। আনন্দমোহন দোকানে ঢুকিয়া বলিলেন—সের দুই চাল দে ত নিতাই।

নিতাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনন্দমোহন ধমক দিয়া বলিলেন—কি রে ভাবছিস কি?

—সে পাঁচ সিকের পয়সা কিন্তু এখনও পাই নি দাদা-ঠাকুর—ক্ষেত্তর-দার কাছে চাইতেই সে ত রেগে আগুন, বলে চেয়ে নিগে তোদের দাদাঠাকুরের কাছ থেকে।

—ভয় নাই, পাবি রে পাবি—আসছে সোমবারে আমি নিজে হিসেব করে চুকিয়ে দেব।

অপ্রসন্ন মুখে চাল মাপিয়া দিতে দিতে নিতাই বলিল—আজ আবার কার বাড়ীর চাল বাড়ন্ত দাদাঠাকুর?

আনন্দমোহন কথার জবাব না দিয়া চাল লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই বার ভাল ক'রে একটু তামাক খাওয়া দেখি নিতাই। হুঁকোটায় একটু জল ফিরিয়ে নিস।

তিন-চার ছিলিম তামাক খাইয়া—আড্ডা দিয়া আনন্দমোহন যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বেলা প্রায় গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখেন উনানের উপরে ভাত কখন সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উনানের আগুন গিয়াছে নিবিয়া—ঘরের এক পাশে ক্ষেত্রনাথ বসিয়া ঝিমাইতেছে। সাড়া পাইয়া ক্ষেত্রনাথ চোখ মেলিয়া তাকাইল—এতক্ষণে তোমার সময় হ'ল? বেলা কি আর আছে? শীগ্‌গির উনান থেকে ভাত নামিয়ে নিয়ে মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দাও।

—আর আমাকে কেন ক্ষেত্রদা—তুমিই চড়িয়ে দাও মাছটা।

—বামুন হয়ে শুদ্দুরের হাতের ভাত খেতে তোমার যেন বাধে না, কিন্তু গাঁয়ে আরও ত লোক আছে, সমাজ আছে, তারা দেখলে বলবে কি? একঘরে ক'রে রাখবে না!

—রাখুক গে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে কাপড় গামছা লইয়া, মাথায় খানিকটা তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলেন।

—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্—হঠাৎ আনন্দমোহনের সূর্য্যস্তব বন্ধ হইয়া গেল। ঘাটের ঠিক উপর দিয়া রাস্তা, সেখানে কে যেন অন্য একজনকে কহিতেছে—আচ্ছা গ্রাম যা হোক, সারাটা দুপুর ঘুরলাম—কারু বাড়ীতে চাট্টি খেতে দিলে না? ভদ্দর লোকের গ্রাম হ'লে হবে কি—সব বেটার ছোট নজর।

তাড়াতাড়ি মন্ত্র সারিয়া উপরে উঠিয়া আনন্দমোহন ডাকিয়া বলিলেন—কে মশায় আপনারা একটু দাঁড়াবেন?

ডাক শুনিয়া পথিক দুই জন ফিরিয়া দাঁড়াইল। আনন্দমোহন কাছে আসিয়া বলিলেন—কোথা থেকে আপনাদের আসা হচ্ছে।

—যশোর থেকে?

—যাবেন কোথায়?

—নলডাঙ্গায়।

আনন্দমোহন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন—বেলা থাক্‌তে পৌঁছতে পারবেন না। এক কাজ করুন, আজকের বেলাটুকু এখানে কাটিয়ে দিয়ে কাল ভোরে উঠে যাবেন।

এই অযাচিত আমন্ত্রণে পথিক দুই জন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, অথচ এই গ্রামেরই আরও কয়েক বাড়ীতে তাহারা চাট্টি আহারের জন্য ঘুরিয়া বিফলমনোরথ হইয়া আসিয়াছে।

—কিছু মনে করবেন না—পরে হাত তুলিয়া নিজের বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন—এটা জমিদার-বাড়ী, এখান থেকে কোন দিন কেউ অভুক্ত যায় নি—আজও আপনাদের যেতে দেব না।

বাড়ীর দিকে তাকাইয়া পথিক দুই জন হয়ত বিশেষ ভরসা পাইতেছিল না, কিন্তু আনন্দমোহনের আন্তরিকতায় তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

—আপনারা?

—আমরা কায়স্থ।

—আপনি।

—আমি ব্রাহ্মণ।

পথিক দুই জন নীচু হইয়া প্রণাম করিল। আনন্দমোহন স্মিত হাসি হাসিয়া বলিলেন, আসুন আমার সঙ্গে। যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—জমিদারী আর নাই বুঝলেন না, তবু দুটো খুদ-কুঁড়ো তো আমরাও মুখে তুলি।

পথিক দুই জনের মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

—এই যে বসুন আপনারা এখানে, তেল এনে দিচ্ছি স্নান করুন।

—ক্ষেত্রনাথ শুনিয়া মুখ ভার করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, আনন্দমোহন বাধা দিয়া বলিলেন—চুপ কর ক্ষেত্র-দা ওরা শুনতে পাবে—অতিথি নারায়ণ!

আহার সারিয়া শেষ বেলায় আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পথিক দুই জন বিদায় লইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনরায় রান্না করিয়া আনন্দমোহন ও ক্ষেত্রনাথ আহারে বসিল।

৩

বর্ত্তমানে শ্রীপতি চাটুজ্যে গ্রামের জমিদার। আনন্দমোহনের জমিদারী যখন নিলাম হয় তখন শ্রীপতি চাটুজ্যের পিতা অম্বিকা চাটুজ্যে তাহা কিনিয়া লন। শ্রীপতি চাটুজ্যে গ্রামে থাকিয়া নায়েব গোমস্তার সাহায্যে জমিদারী তদারক করেন। চাটুজ্যেদের বাড়ীর পাশে লোকনাথ দাসের বিধবা তাহার মেয়ে সুন্দরীকে লইয়া বাস করে। তাহাদের দেখাশুনা করিবার, ভরণপোষণ করিবার কেহই নাই। সুন্দরীর বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী নয়, সুন্দরী সত্যই সুন্দরী। বার-তের বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের বৎসরখানেক পরেই সুন্দরী বিধবা হইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই হইতে সুন্দরী মায়ের নিকটে এখানেই থাকে। শ্বশুরকুলেও তাহার বড়-একটা কেহ নাই। সুন্দরী ও তাহার মা শ্রীপতি চাটুজ্যের বাড়ীতেই কাজকর্ম্ম করিয়া দিন চালাইত। মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র ভাল বলিয়া গ্রামে সুনাম আছে। কয় দিন হইতে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় কি যেন একটা কথা কানাকানি চলিতেছিল। আনন্দমোহন কখনও কোন দলাদলিতে, পরচর্চ্চা পরনিন্দায় থাকিতেন না, কাজেই কাহারও গোপনীয় কিছু শুনিবারও তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। সেদিন সকালবেলা নিতাই পালের দোকানে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। দোকানে আর কেহ ছিল না। নিতাই তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—একটা কথা শুনেছেন দাদাঠাকুর! হুঁকা টানিতে টানিতে আনন্দমোহন বলিলেন—কি কথা?

—লোকনাথ দাসের মেয়ে সুন্দরী আজ কয় মাস হ'ল অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

আনন্দমোহনের হুঁকার টান বন্ধ হইয়া গেল।

—তুই বলিস কি নিতাই? মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে নয় দাদাঠাকুর—একেবারে পাড়াময় রাষ্ট্র গেছে।

—সে কেমন ক'রে হয়—সুন্দরী—অমন ভাল স্বভাবের মেয়ে যে গ্রামে খুব কম আছে নিতাই!

—আমরাও ত তাই মনে করতাম দা-ঠাকুর। কিন্তু কথাটা সত্যি—কাল সুন্দরীর মা মেয়েকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দোষী কে তা এখনও জানা যায় নাই—তবে অনেকে সন্দেহ ক'রে যে চাটুজ্যে-মশায় নিজেই নাকি—

—চুপ—চুপ কর নিতাই—নারায়ণ! নারায়ণ!

আনন্দমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—কথাটা যেন কারু কাছে প্রকাশ করবেন না দাদা-ঠাকুর। আনন্দমোহন অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন—না রে। আনন্দমোহন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত মন একেবারে গ্লানিতে ভরিয়া গেল। এও কি সম্ভব—এমন মেয়ে সুন্দরী—তাহার এই পরিণাম? এ অসম্ভব—সে কিছুতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আর চাটুজ্যে প্রবীণ বুদ্ধিমান্ গ্রামের বড়লোক সে—তাঁরই কিনা—না, নিতাই ভুল শুনিয়াছে নিশ্চয়। সোজা পথ ছাড়িয়া তিনি চাটুজ্যেপাড়ার পথ ধরিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। রাস্তার ধারেই লোকনাথ দাসের বাড়ী, সেখানে আসিয়া হঠাৎ আনন্দমোহন থামিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে লোকনাথ দাসের স্ত্রীর গলা শুনা যাইতেছে—তুই মর—গলায় দড়ি দিয়ে মর—আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা। আনন্দমোহনের সারা অন্তর শিহরিয়া উঠিল—তাই ত তবে কি নিতাইয়ের কথাই ঠিক? সারাটা দিন আনন্দমোহনের মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া রহিল—বিকালে আর কোথাও বাহির হন নাই, বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সুন্দরীর চিন্তাই তাঁহার মনকে চাপিয়া ধরিতেছিল। শেষটায় সন্ধ্যাবেলা জোর করিয়া মন হইতে সকল চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মনে করিলেন একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ের কথা শুধু শুধু ভাবিয়া মন খারাপ করা কেন?

সন্ধ্যার পরে তাঁহাকে একবার পাশের গ্রামের ডাক্তারের নিকট যাইতে হইবে শ্যামাচরণ-দার ছেলেমেয়ের জন্য ঔষধ আনিতে।

শ্যামাচরণের বাড়ী ঔষধ দিয়া আনন্দমোহন যখন ফিরিতেছিলেন তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, লোকনাথ দাসের বাড়ীর নিকটে আসিয়া আনন্দমোহন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের পাশে একটি আমগাছ, তাহারই তলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে মনে হইল। আনন্দমোহন আরও একটু আগাইয়া গেলেন—সেখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন গাছের নীচে সুন্দরী দাঁড়াইয়া। আমগাছের একটি নীচু ডালে এক গাছি দড়ি বাঁধা—তাহারই এক প্রান্ত সুন্দরী নিজের গলায় জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়াই আনন্দমোহন একেবারে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন—কি করিবেন—কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া একেবারে সুন্দরীর নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। সুন্দরীর উত্তেজিত স্নায়ু-মণ্ডলী আর সহ্য করিতে পারিল না—এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া আনন্দ-মোহনের দুই বাহুর মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। চীৎকার শুনিয়া সুন্দরীর মা ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সুন্দরীর মা একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আনন্দমোহন অতি সন্তর্পণে সুন্দরীকে নিজের কোলের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন—চুপ, চুপ কর সুন্দরীর মা—গলায় দড়ি দিতে পারে নাই—আমি দেখে ফেলেছি—ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তার পর সুন্দরীকে ঘরের দাওয়ায় উঠাইয়া আনন্দ-মোহন ও সুন্দরীর মা মিলিয়া কতক্ষণ ধরিয়া মাথায় জল বাতাস দিয়া সুন্দরীর সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন।

রাত্রি তখন গভীর হইয়া গিয়াছে। আনন্দমোহন বলিলেন—সুন্দরীর মা, আমি এখন যাই।

হঠাৎ সুন্দরীর মা পুনরায় কাঁদিয়া আনন্দমোহনের দুই পা জড়াইয়া ধরিল।

—আমি কি করব দাদাঠাকুর—ও অভাগিনীরই বা কি হবে—আপনি না দেখলে আজই তো সব শেষ হয়ে যেত—যত অপরাধই করুক তবু ত আমার পেটের সন্তান—কি করব দাদাঠাকুর। চাটুজ্যে-মশাই বলেছেন ভিটে ছেড়ে চলে যেতে—না গেলে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবেন। আমরা কোথায় যাব দাদাঠাকুর।

আনন্দমোহনের চোখে জল আসিয়া পড়িল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—আমাকে একটু ভাবতে দাও সুন্দরীর মা—দেখি কি করতে পারি।

সুন্দরী এতক্ষণে উঠিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়াছিল—আনন্দমোহন তাহার নিকটে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—ছিঃ মা, ও কাজ কি করতে আছে, তোর কোন ভয় নাই—যা হয়েছে হয়েছে। সুন্দরী একেবারে কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িল—আমাকে তুমি কেন বাঁচালে খুড়োঠাকুর—কেন আমার এমন শত্রুতা করলে? কে দেবে আমায়

আশ্রয়—কেউ যে আমার মুখ দেখবে না। সুন্দরী যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। আনন্দমোহনের দুর্ব্বল মন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না—চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন—তোর কোন ভয় নাই মা—দিলাম আমি তোকে আশ্রয়—তোর যত বিপদ আপদ সব আমিই মাথা পেতে নেব।

আনন্দমোহন বাড়ী ফিরিয়া দেখেন ক্ষেত্রনাথ শুইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে আর ডাকিয়া তুলিলেন না—সে রাত্রে আহারের কথাও আর মনে রহিল না। সারা রাত্রি শুইয়া শুইয়া কেবল ভাবিলেন—অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলেন—এ তিনি ঠিকই করিয়াছেন—খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। আহা অমন কচি মেয়েটি, গুরুতর অপরাধ সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সকলে মিলিয়া কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। নিরাশ্রয়কে উৎপীড়িতকে, আশ্রয় দেওয়াই ত শক্তিমানের কাজ—সে তাহাকে আশ্রয় দিবে—সমস্ত বিপদে রক্ষা করিবে। আনন্দমোহনের অন্তর যেন বলশালী হইয়া উঠিল।

৪

সুন্দরীর সহিত চাটুজ্যের নামের ইঙ্গিত যে কেহ কেহ করিতেছে একথা চাটুজ্যের কানেও গিয়াছিল, তাই তিনি উঠিয়াছিলেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া। সুন্দরীর মাও সুন্দরীকে তাঁহার বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিলেন না এবং গ্রামের সবাইকে নিষেধ করিয়া দিলেন কেহ যেন এই দুশ্চরিত্রা মেয়েদের তাহাদের বাড়ীতে না ডাকে বা তাহাদের দিয়া কোন কাজ করাইয়া না লয়। সুন্দরীর মা ও সুন্দরী চাটুজ্যে-মশায় ও অন্যান্য কয়েক জনের বাড়ী কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চাটুজ্যের ভয়ে আজকাল আর কেহই তাহাদিগকে ডাকিতে সাহস করিল না। দেনার দায়ে নিজেদের বসতবাটী বিক্রয় হইয়া যাইবার পর সুন্দরীর মা কয়েক বছর হইতে চাটুজ্যে-দেরই জায়গায় কোন প্রকারে খান-দুই ঘর তুলিয়া বাস করিতেছিল। এক দিন সকালবেলা দেখা গেল—চাটুজ্যের লোকজন রাতারাতি সুন্দরীদের ঘর ভাঙিয়া সরাইয়া ফেলিয়াছে—নিজেদের জিনিসপত্র লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সুন্দরীর মা ও সুন্দরী চোখের জল ফেলিতেছে। খবর পাইয়া আনন্দমোহন ছুটিয়া আসিলেন—সুন্দরীর মাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, বলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি লাভ হবে বল ত সুন্দরীর মা? জিনিসপত্তর-গুলো সব কি সারাদিন এখানেই পড়ে থাকবে?

সুন্দরীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রশ্ন করিল—কোথায় নিয়ে রাখব দাদাঠাকুর।—কেন এতক্ষণ আমার বাড়ীতে নিয়ে রাখতে পার নি? নাও, যা যা পার কিছু কিছু ক'রে নিতে আরম্ভ কর, নে সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকিস নে মা—বলিয়া নিজে একটা ছোট কাঠের বাক্স কাঁধে তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। চাটুজ্যে মুখ বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি ভাল হ'ল আনন্দমোহন?

আনন্দমোহন জিজ্ঞাসু মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিসের?

—ঐ ভ্রষ্টা মেয়ে দুটোকে আশ্রয় দেওয়া?

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন—ভ্রষ্টা ব'লেই ত আমার উপরে ভার পড়েছে চাটুজ্যে—ভালর জন্যে ত তোমরাই আছ। বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছিলেন।

কিন্তু দরদ যখন এত, তখন যে-ব্যাপারটা ঘটেছে তার সঙ্গে তোমারই যে কোন সম্বন্ধ নাই তাই বা কে বলবে?

আনন্দমোহনের দুই চক্ষু একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব করিলেন—তোমার মত কাণ্ডজ্ঞান যাদের কম তারা ও কথা বলতে পারবে কিন্তু আর সকলে জানে চাটুজ্যের মত মানুষকেও হয়ত ওর ভিতরে টানা যায়—কিন্তু আনন্দমোহনকে নয়। বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চাটুজ্যে শুধু সেই দিকে কিছুক্ষণ বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্ষেত্রনাথ কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিল। আনন্দমোহনের অনেক অনুরোধেও সে সুন্দরীদের এ বাড়ীতে থাকা অনুমোদন করিতে পারিল না। আনন্দমোহন ক্ষেত্রনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন—তুই অমত করিস নে ক্ষেত্র-দা, ওদের যে কেউ নেই—আমরা আশ্রয় না দিলে ওরা যে পথে পড়ে মরবে।

—মরুক গিয়ে, যেমন কাজ তেমনি ফলভোগ করবে ত। আমার কথা শোন দাদাবাবু, চাটুজ্যেকে চটিও না—বার টাকার জোতটা যে ওরই কাছে কটকবলায় আবদ্ধ—তার পর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে হয়ত আমাদের একঘরে ক'রে রাখবে। কি করবে তুমি?

আনন্দমোহন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি বল কি ক্ষেত্র-দা—চাটুজ্যেকে ভয় করব আমি?

—কিন্তু নিজের স্বার্থটাও ত দেখতে হবে?

—তুমি নতুন হচ্ছ ক্ষেত্র-দা—নিজের স্বার্থ এ বংশে কেউ দেখে নি—তা দেখলে আজ আর জমিদারী এমনি ক'রে যেত না। কোন দিন কেউ এ বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে ফিরে যায় নি। এ বাড়ীর প্রত্যেকখানা ইট

পর্য্যন্ত তার সাক্ষী, আর তোমার যে বয়স এই সত্তরের কাছে গেল, তুমি নিজে জান না? কত ঘর ত খালি পড়ে আছে—পায়রা চামচিকেয় নষ্ট করছে—থাক্ না ওরা একটা কোণে পড়ে।

কিন্তু কিছুতেই ক্ষেত্রনাথকে বুঝান গেল না—অবশেষে তিন-চারি দিন ধরিয়া রাগারাগির পর সে রাগ করিয়াই একদিন নিজের বাড়ী চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে আনন্দমোহন নিজে গিয়া ক্ষেত্রনাথকে কত সাধিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের এক কথা—সুন্দরীদের বাড়ী হইতে না তাড়াইলে সে আসিবে না। আজ প্রায় মাসখানেক হইল, ক্ষেত্রনাথ চলিয়া গিয়াছে।

শৈশবে ক্ষেত্রনাথের কোলে চড়িয়া মানুষ হইয়াছেন, তার পর যখন নিতান্ত দুঃসময়ে আপনার বলিতে যাহারা একে একে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখনও এই ক্ষেত্রনাথই তাঁহার পাশে নিতান্ত আপনার মত শোক-দুঃখ সম-অংশে ভাগ করিয়া লইয়া আগলাইয়া লইয়া ফিরিয়াছে—রোগে সেবা করিয়াছে—সমস্ত রকম বিপদ নিজের মাথায় লইয়া যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, আজ তাহারই বিচ্ছেদে আনন্দমোহনের সারা অন্তর বারে বারে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। ক্ষেত্র-দা যে তাঁহাকে কোন দিন ছাড়িয়া যাইতে পারে এ ধারণাই তিনি কোন দিন করিতে পারেন নাই।

সেদিন নিবারণ চক্কোত্তির বাড়ী তাহার পুত্রের বিবাহের বৌভাতের নিমন্ত্রণ। আহারের জায়গা হইয়াছে—লোকজন কতক বসিয়া পড়িয়াছে—হঠাৎ আনন্দমোহন আসিয়া বসিতেই চাটুজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল—আনন্দমোহনের সহিত কেহ খাইবে না। কথাটা পূর্ব্বেই যুক্তি করিয়া চাটুজ্যে পাকা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আনন্দমোহন এতক্ষণ ছিলেন না—কাজেই তাঁহাকে জানান হয় নাই। আনন্দমোহন সত্যই অবাক হইয়া গেলেন—

চাটুজ্যে হয়ত উঠিতে পারে—কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহারা তাঁহার সহিত খাইবে না বলিয়া উঠিল ইহাদের কত জনের যে কত বিপদের দিনে কত উপকার তিনি করিয়াছেন তাহার সীমাসংখ্যা নাই—অর্থ দিয়া, নিজে গায়ে খাটিয়া যত প্রকারে সম্ভব। আনন্দমোহন ধীরে ধীরে নিজের আসন হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পথে নামিতেই নিবারণ আসিয়া তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার অপরাধ কি আনন্দ-দা। দুটো মুখে দিয়ে না গেলে যে অকল্যাণ হবে।

আনন্দমোহন ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কোন দোষ নাই ভাই—যদি পারি সন্ধ্যার পর এসে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যাব।

সত্যই রাত্রে একটু মিষ্টি মুখে দিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া আনন্দমোহন চলিয়া আসিয়াছেন—নিবারণ পীড়াপিড়ি করিয়াও তাঁহাকে কিছু খাওয়াইতে পারে নাই।

আনন্দমোহন দরজা ভেজাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন—রাত্রে আহারের আর কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। ঘরের এক পাশে একটি তেলের প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সুন্দরী অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—বাবা!

আনন্দমোহন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—কে সুন্দরী—কেন মা?

সুন্দরীর মুখে এই পিতৃসম্বোধন তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া দিল—কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—কিছু বলতে চাস্ মা?

সুন্দরী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও রেখে আসুন বাবা, আমাদের জন্যে সবাই মিলে আপনার উপরে অত্যাচার করবে, আপনাকে অপমান করবে—

আনন্দমোহন বাধা দিয়া বলিলেন—আমার কথা ভাবি নে মা। অত্যাচার অপমান কেউ আমাকে করতে পারে নি—পারবে না। শুধু ভাবছি আমি তোদের কথা—এ গ্রামে আর সত্যই হয়ত থাকা চলবে না। আজকের রাতটা আমায় ভাবতে দে সুন্দরী।

সুন্দরী তথাপি যাইবার কোন উদ্যোগই করিল না দেখিয়া আনন্দমোহন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—আর কি মা?

—আপনার যে আজ সারাদিন খাওয়া হয় নি?

—তা না হোক, তবু আজ আর খেতে আমার কোন প্রবৃত্তিই নাই মা। তুমি শুতে যাও।

পরের দিন সকালে উঠিয়া আনন্দমোহন নিতাই পালের দোকানে গিয়া নিতাইকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন—কিছু জমি বিক্রি করব—তুই নিবি নিতাই?

নিতাই সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—কোন্ জমি দাদাঠাকুর?

—আমার কুড়ি টাকা জমার পনর বিঘে খামার জমি—লক্ষ্মীবিলের মাঠে।

—সত্যিই বিক্রি করবেন ত দাদাঠাকুর?

—হাঁ রে, হাঁ।

—বেশ আজ রাত্রে যাব আমি আপনার ওখানে। আপনি এখন যান—এখানে আর থাকবেন না—চাটুজ্যে

দেখতে পেলে আবার আমাকে ছাড়বে না—জানেন ত কি জেদী লোক।

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন—আর দুই-একটা দিন রে, তার পর আর তোদের কোন ভয় থাকবে না। হাঁ, দেখ নিতাই, দাম দরে বাধবে না—কিন্তু রেজেষ্টারীটা দুই-এক দিনের মধ্যে হওয়া চাই—আর ঐ সঙ্গে ক্ষেত্র-দা'র নামে বাকী দশ বিঘে খামার আর ভিটেটা দানপত্র ক'রে দেব, বুঝলি?

—আপনি কি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন দাদাঠাকুর।

—কি জানি রে, বাবা বিশ্বনাথের মনে কি আছে তিনিই জানেন।

নিতাই আর বিলম্ব করিল না—দুই-তিন দিনের মধ্যে লেখাপড়া রেজেষ্টারী করিয়া লইল। ক্ষেত্রনাথের নামে একখানা দানপত্রও সেই সঙ্গে রেজেষ্টারী হইয়া গেল।

সেদিন সকালবেলা আনন্দমোহন সুন্দরী আর তাহার মাকে সমস্ত গোছাইয়া লইতে বলিলেন—কাল বেলা দশটার গাড়ীতে তাঁহারা কাশী যাইবেন।

সকালবেলা হারান সর্দ্দার গরুর গাড়ী লইয়া হাজির হইল। সমস্ত জিনিস গুছাইয়া লইয়া গাড়ীতে চাপিতে ৮৷৯টা বাজিয়া গেল। পথের দুই পাশের আগাছা ঠেলিয়া গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথের বাঁকে ভুবনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া আনন্দমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ও ভুবন দেখ, দেখ, ছেলেটা হাত কেটে ফেল্‌লে বুঝি—দা-খানা কেড়ে নে হাত থেকে!

চীৎকার শুনিয়া ভুবনের স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া বাহিরে আসিয়া ছোট ছেলেটির হাত হইতে দা-খানি কাড়িয়া লইল।

বাঁড়ুজ্যেদের পুকুরপাড়ে আসিয়া আনন্দমোহন বলিয়া উঠিলেন—গাড়ী থামা হারান, গরুটা যে ঠ্যাং ভেঙে ম'লো। বলিতে বলিতে আনন্দমোহন লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বাঁড়ুজ্যেদের গরুর পায়ের দড়ি খুলিতে লাগিয়া গেলেন। গরুটি ছাড়া পাইয়া বাড়ীর দিকে ছুট দিল।

—দেখ্‌তো কাণ্ড, গরু মাঠে দিয়ে—একবার কি তার খোঁজ নেয়—এখনই ঠ্যাং ভেঙে মরতো যে। নে তুই গাড়ী চালা হারান, এটুকু আমি হেঁটেই যাই—সুন্দরী একটু ভাল হয়ে বসিস মা, যে উঁচুনীচু পথ। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন আর কি, হঠাৎ দত্তবুড়ী আসিয়া একেবারে আনন্দমোহনের পায়ের উপরে উবু হইয়া পড়িল

—তুমি চলে গেলে দাদাঠাকুর আমাদের গরীবদের আর আপদবিপদে কে দেখবে।—বলিয়া দত্তবুড়ী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আনন্দমোহন তাহাকে কি যেন সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিলেন, কিন্তু হারান চেঁচাইয়া উঠিল—এমনি করলে গাড়ী ধরা যাবেক নি দাদাঠাকুর, শীগ্‌গিরি আসেন।

—এই যে যাচ্ছি হারান।

সামনের মাইলখানেক মাঠ—এই মাঠটা পাড়ি দিলেই ষ্টেশন। মাঠের ভিতরে পড়িয়া আনন্দমোহন একবার পিছন ফিরিয়া শেষ বারের মত গ্রামখানার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে দুই চোখ মুছিয়া লইয়া বলিলেন—গাড়ী ধরতে পারব ত রে হারান? হারান গরু দুইটার লেজ ধরিয়া মোচড় দিয়া জবাব দিল—নিশ্চয়।

দিবাস্বপ্ন মুছে যায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দিবাস্বপ্ন মুছে যায়, খরস্রোত তিমির-জোয়ার,
মুমূর্ষু জলের রেখা, আঁধারের নামিছে প্লাবন,
স্বর্ণমেঘ চালুচর লুপ্ত হ'ল, শীকর তারার
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ হ'তে বাষ্পাকুল করিছে গগন।

অন্ধকার-পারাবারে নিমগন পৃথিবী যেমন
সমগ্র চেতনা মম ডুবে যায় অসীম-সাগরে,
দিনের সহস্র স্মৃতি চাহে উঠি ঢাকিতে নয়ন,
নামে শান্তি-আবরণ জীবনের ফেনপুঞ্জ 'পরে।

জীবজন্তুর আকাশ-অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর মতে, প্রথমতঃ মানুষ সৃষ্টি করিবার পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহাদেরই প্রয়োজনানুযায়ী সৃষ্টিকর্ত্তা ক্রমশঃ অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দু পুরাণের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের কাহিনীকে কেহ কেহ রূপক ভাবে বর্ণিত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদেরই অনুরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা বা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তর্ক না তুলিয়াও অন্ততঃ এই একটি কথা অনায়াসে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, জীবজগৎ যেমন এক হইতে বহু হইয়াছে তেমনই এক রূপ হইতে বহু রূপেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সাধনা এবং অপূর্ব্ব গবেষণার ফলে যে সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদি জৈবপঙ্ক হইতে কোটি কোটি যুগের ক্রমবিকাশের ফলে এই বিরাট্, বিচিত্র জীব-জগৎ পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। একই জৈব পঙ্ক হইতে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ বিবর্ত্তিত হইলেও কেবলমাত্র জীবজগতের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায়—ভাইরাস্, ব্যক্টেরিয়া, এমিবা, প্রোটোজোয়া, প্রবাল, জেলীফিস্, কেঁচোকৃমি, কীটপতঙ্গ, ট্রিলোবাইট, মৎস্য, সরীসৃপ, খেচর ও জন্তুজানোয়ারের পর সর্ব্বশেষ মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। কোটি কোটি যুগব্যাপী জীবজগতের এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতীব বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। জীবন-সংগ্রাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং অন্যান্য কতকগুলি স্বাভাবিক জৈবধর্ম্মের প্রভাবে জীব জগতের এই বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহা বিবর্ত্তন-বাদের গোড়ার কথা। কিন্তু সেবিষয়ে এস্থলে আলোচনা করা আমদের উদ্দেশ্য নহে। প্রাণিজগতের অভিব্যক্তির ধারার এক অতি ক্ষুদ্র অধ্যায় অর্থাৎ তাহাদের আকাশ-অভিযানের ব্যর্থতা বা আংশিক সার্থকতার ইতিহাসে আজিও যে সকল চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

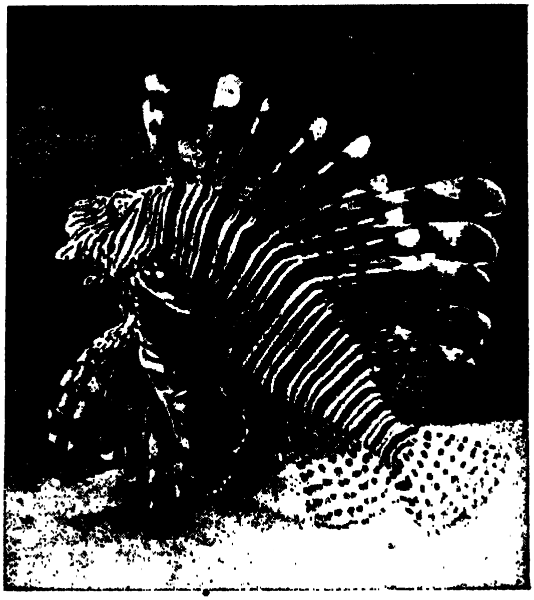

প্রবাল-সমুদ্রের প্রজাপতি কড নামক অদ্ভুত মৎস্য

আদিজীব জলেই আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া ক্রমবিকাশের ফলে এমিবা, প্রোটোজোয়া হইতে মৎস্য ও অন্যান্য বৃহদাকৃতি জলজন্তুসমূহ পৃথিবীর জলভাগ অধিকার করিয়া ফেলে। প্রবলতর শত্রু হইতে আত্মরক্ষা অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আহার্য্যানুসন্ধানে জলজন্তুরা পৃথিবীর স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তারে উদ্বুদ্ধ হয়। অবশ্য কেহ কেহ যে জল হইতে সোজা আকাশ-অভিযানেও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। তবে মোটের উপর স্থলভাগ হইতেই যে তাহারা আকাশ-অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নাই। যাহা হউক, জলচর প্রাণী হইতেই যে বিভিন্ন জাতীয় উভচর সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জলচর প্রাণীদের পক্ষে জলের উপরে নীচে, লম্বালম্বি বা পাশাপাশি যে কোন দিকে গতায়াত করার সুবিধা ছিল; কিন্তু ডাঙায় উঠিবার পর স্থলভাগ হইতে তাহাদের উপরে নীচে গতায়াত বন্ধ হইয়া গেল।

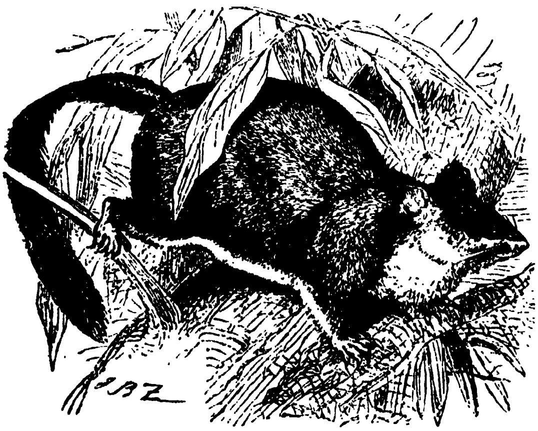

উড্ডয়নক্ষম অপোসাম ইঁদুর

উপরের দিকে যদিও একটা বিরাট্‌ বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে কিন্তু তাহা জল হইতে অসম্ভব রকমের হাল্কা। সেখানে জলের মত সাঁতার কাটা সম্ভব নয়। সম্ভব না হইলেও অতি ধীরে ধীরে যুগযুগান্তর ধরিয়া অবিচলিত ভাবে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই জীবন-প্রবাহের অপর এক ধারায় কীটপতঙ্গেরা আকাশ-অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এবিষয়ে উদ্ভিদ জগতের কৃতিত্বের কথাও অস্বীকার করা যায় না। নিষ্ক্রিয় পন্থা হইলেও বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদেরা বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে যে কৌশলে বায়ুপ্রবাহের সাহায্য লইয়াছে তাহাও অতীব বিস্ময়কর। প্যারাশুটিষ্ট মাকড়সারাও এই হিসাবে আকাশ-অভিযানের সফলতার গৌরবের অধিকারী মানুষ অবশ্য এবিষয়ে পূর্ণ গৌরব দাবি করিতে পারে; কিন্তু সে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে যান্ত্রিক কৌশলে। জৈব বিবর্ত্তনের দিক হইতে পাখীরাই যে আকাশ-অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, যাহারা মনে মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাহারা প্রায়ই আকাশে উড়িবার স্বপ্ন দেখে। আকাশে উড়িবার বাসনাটা যে একটা চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরিস্ফুট হইলেও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়তো জীবজগতের একটা মজ্জাগত সংস্কার। এই সংস্কারের বশেই হউক বা জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রচেষ্টার ফলেই হউক বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন উপায়ে আকাশ-অভিযানে অগ্রসর হইতে থাকে। সরীসৃপ-জীবনে স্থলভাগে বিচরণ করিবার সময় প্রবলতর শত্রু হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেহ কেহ চার পায়ের পরিবর্ত্তে পিছনের দুই পায়ে ভর করিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিবার কৌশল আয়ত্ত করে। অষ্ট্রেলিয়ায় আজিও গলায় পাতলা পর্দ্দার ঝালর ওয়ালা টিকটিকি জাতীয় এক প্রকার ভীষণাকার জানোয়ার দেখা যায়। ইহারা সাধারণ অবস্থায় চলাফেরা করে সাধারণ সরীসৃপের মতই চারপায়ে; কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পিছনের দুই পায়ের উপর খাড়া হইয়া দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকে। ইহারা হয়তো সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যবর্ত্তী সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরই বংশধর। তাহাদেরই এক শাখার কোন কোন প্রাণীর সম্মুখস্থ পদদ্বয় কালক্রমে ডানার আকার ধারণ করে এবং পক্ষিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়া তাহারা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রথম যখন সরীসৃপেরা আকাশ-অভিযানের চেষ্টা করে তখন পিছনের পা ও সম্মুখের বাহুর সহিত সংযুক্ত প্রশস্ত পর্দ্দার সাহায্যেই বাতাস কাটিয়া অগ্রসর হইত। ভূগর্ভস্থ প্রস্তরের ছাপ ও যে সকল প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় সেই যুগে টেরানোডন, র‍্যামফরহিঙ্কাস্, ডাইমরফোডন ও টেরোড্যাকটিল প্রভৃতি লম্বা লেজওয়ালা ও লেজশূন্য সরীসৃপসমূহ আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সরীসৃপ হইতেই আবার বিবর্ত্তনের অন্য এক ধারায় দন্তসমন্বিত ঠোঁটবিশিষ্ট আর্কিয়প্‌টেরিক্স ও হেস্‌পেরোনিস্‌ প্রভৃতি ডানাওয়ালা প্রাণী আবির্ভূত হয় এবং এই প্রাণীগুলি হইতেই কালক্রমে বর্ত্তমান যুগের পক্ষিকুলের উদ্ভব ঘটে। শত্রুর আক্রমণ এড়াইবার জন্য সরীসৃপের অপর এক শাখা বৃক্ষারোহণের কৌশল আয়ত্ত করে। শত্রুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই হউক অথবা দূরবর্ত্তী স্থলে দ্রুত গমনাগমনের জন্যই হউক, বৃক্ষচারী বিভিন্ন প্রাণীরা যে বিভিন্ন উপায়ে আকাশ-অভিযানে সচেষ্ট হইয়াছিল আজিও তাহার জীবন্ত প্রমাণের

ট্যাগুয়ান নামক উড্ডুক্ কাঠবিড়ালী

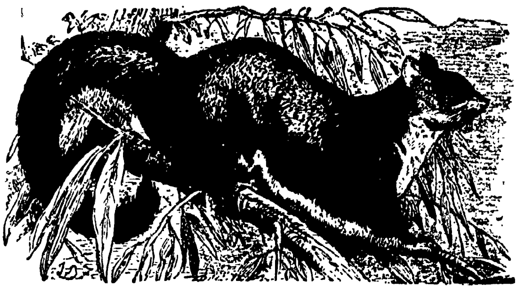

উড্ডুক্কু এরিয়েল

অভাব নাই। এরূপ কয়েকটি উড্ডুক্কু প্রাণীর কথাই এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বাদুড়ের কথাই ধরা যাউক। বাদুড় পক্ষী শ্রেণীভুক্ত না হইয়াও পাতলা চামড়ায় গঠিত বিস্তৃত ডানার সাহায্যে অবলীলাক্রমে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। প্রাগৈতিহাসিক ডাইমরফোডন, রামফরহিঙ্কাস্, টেরো-ড্যাক্‌টিল প্রভৃতি উড্ডুক্কু সরীসৃপেরা বাদুড়ের ডানার মত ডানার সাহায্যেই আকাশপথে বিচরণ করিত। যে-যুগে লেমুর জাতীয় প্রাণী হইতে বনমানুষ জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তির সূচনা হইতেছিল সে-যুগেই বাদুড় জাতীয় প্রাণীরা আকাশ-অভিযানে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করে। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বাদুড়েরা আকৃতি, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ফলে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহারও উড্ডয়ন-ক্ষমতার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে লেমুর নামক এক জাতীয় খর্ব্বাকৃতি জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। লেমুর দেখিতে অনেকটা মর্কটের মত। বড় বড় গোলাকার ড্যাবডেবে চোখ দুইটির জন্য ইহাদের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। হাত পায়ের আঙুলেও ইহাদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রায় সকল জাতীয় লেমুরের লেজই অতীব সুদৃশ্য হইয়া থাকে। সরল বৃক্ষকাণ্ড আরোহণে ইহাদের দক্ষতা অপরিসীম। গাছে গাছে বিচরণ করাই ইহাদের স্বভাব।

কিন্তু ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে গ্যালিওপিথেকাস্ জাতীয় কয়েক প্রকার লেমুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোলাগো নামে এক প্রকার লেমুরের আকৃতি, প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত। কোলাগো রাত্রিচর প্রাণী। বাদুড়ের মত পিছনের পা অথবা চার পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া সারাদিন নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলিয়া থাকে। সন্ধ্যা হইলেই আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের পা এবং লেজ বাদুড়ের ডানার মত পাতলা চামড়ার পর্দ্দায় পরস্পর সংযুক্ত। শরীরের চামড়াই প্রসারিত হইয়া এই অতিরিক্ত পর্দ্দা উৎপন্ন করিয়াছে। এই পর্দ্দার সাহায্যে বাতাসে ভর করিয়া ইহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশে বিচরণ করিতে পারে। এক গাছ হইতে দূরস্থিত অপর গাছে যাইতে হইলে ইহারা হাত পা প্রসারিত করিয়া লম্ফ প্রদান করে এবং প্রসারিত ছত্রিকার সাহায্যে বাতাস কাটিয়া অগ্রসর হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই-রূপে বাতাসে ভর করিয়া চলিবার সময় ইহারা ইচ্ছামত দিক পরিবর্ত্তনও করিতে পারে। আকাশ-অভিযানে ইহারা পাখীদের মত পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও কিয়ৎ পরিমাণ গৌরবের অধিকারী বটে।

অষ্ট্রেলিয়ার কাঙ্গারুদের মত অন্যান্য ছোটবড় আরও অনেক জানোয়ার থলির ভিতর বাচ্চা বহন করিয়া বেড়ায়। পিগমি পেটৌরিষ্ট নামক ইঁদুরের মত এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি জানোয়ার থলিতে বাচ্চা বহন করিয়া গাছে গাছে বিচরণ করিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা অপোসাম-ইঁদুর এবং কোন কোন অঞ্চলে উহারা উড্ডুক্কু ইঁদুর নামে পরিচিত। লেজসমেত এই জানোয়ারগুলি প্রায় ৬।৭ ইঞ্চির বেশীর বড় হয় না, ইহাদের সম্মুখ ও পিছনের পা ছত্রিকার মত পাতলা পর্দ্দার সাহায্যে পরস্পর-সংযুক্ত। এক গাছ হইতে দূরস্থিত অন্য গাছে যাইতে হইলে উড্ডুক্কু লেমুরের মতই ইহারা হাত পা ছড়াইয়া বাতাসে লাফাইয়া পড়ে এবং 'গ্লাইডারে'র মত বাতাসে ভাসিয়া ইপ্সিত স্থানে উপস্থিত হয়। ইহাদের লেজের লোমগুলি খুবই শক্ত এবং পাখীর পালকের মত মধ্য দণ্ডটির উভয় দিকে সজ্জিত। বাতাসে ভাসিয়া যাইবার সময় লেজটি হা'লের কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের রং লাল্‌চে ধূসর; কিন্তু শরীরের নিম্ন ভাগ এবং চর্ম্মছত্রিকার রং দুগ্ধধবল। এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য ইহাদিগকে খুবই সুন্দর দেখায়।

ড্রাকো নামক উড্ডুক্কু টিকটিকি

বাদুড় উড়িবার উপক্রম করিতেছে

ইহারা অবশ্য বাদুড়ের মত ডানা নাড়িয়া বাতাসে অগ্রসর হইতে পারে না এবং নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে যাইবার গতিবেগ শেষ হইয়া গেলে, বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার কালে নূতন করিয়া গতিবেগ অর্জ্জন করিতে পারে না; কিন্তু লেজের সাহায্যে এবং বিশেষ কৌশলে হস্তপদ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া যে কোন দিকে মোড় ফিরিয়া হাওয়ার মধ্যে অগ্রসর হইতে পারে।

অনেকটা বিড়ালের মত দেখিতে পেটৌরাস্ এরিয়েল নামে এক প্রকার বৃক্ষচারী জানোয়ারও উপরোক্ত জানোয়ারদের মত বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাদেরও সম্মুখের ও পিছনের পদদ্বয় পাতলা চামড়ার পর্দ্দায় পরস্পর-সংযুক্ত। শরীরের উপরিভাগের রং হাল্কা বাদামী, বর্দ্ধিত পর্দ্দার প্রান্তভাগের লোমগুলি সাদা। প্রান্তভাগের এই সাদা লোমগুলি বাঁকিয়া ভিতর দিকে চলিয়া গিয়াছে। শরীরের নিম্নভাগ ধবধবে সাদা। অষ্ট্রেলিয়ার অপোসামের মত এসিংটন বন্দরের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ইহারা ভাল্পাইন অপোসাম নামে পরিচিত। দিনের বেলায় ইহারা বৃক্ষকোটরে নিদ্রা যায় এবং সন্ধ্যা হইবামাত্রই আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহারা কীটপতঙ্গ, সাপ ব্যাং, পাখী, ডিম, ফলমূল প্রভৃতি সকল রকম জিনিষই উদরস্থ করিয়া থাকে। পাখীর মগজ এবং ডিমই ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। জ্যান্ত পাখী খাইতে দিলে প্রথমেই মস্তক চূর্ণ করিয়া মগজটাকে চিবাইয়া খায়; পরে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া উদরস্থ করে। এরিয়েল বিড়ালের মতই বড় হইয়া থাকে। এক গাছ হইতে অন্য গাছে যাইতে হইলে হাত পা ছড়াইয়া লম্ফ প্রদান করে এবং 'গ্লাইডারে'র মত বাতাসে ভর করিয়া অবলীলাক্রমে অপর গাছে উপস্থিত হয়। ভাসিয়া যাইবার সময় লেজটাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঠিক হালের মতই ব্যবহার করে।

কাঠবিড়ালী অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গাছে চড়িতে পারে। বেশীর ভাগ সময়ই ইহারা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং অল্প ব্যবধানে এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া যাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। গাছে গাছে ছুটাছুটি করিবার অভ্যাস হইতেই ইহাদের কেহ কেহ বাতাসে ভর করিয়া দূরতর স্থান অতিক্রম করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে। যে কয়েক প্রকার কাঠবিড়ালী এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে টাগুয়ান নামক কাঠবিড়ালীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারাও শরীরের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত পাতলা চামড়ার সাহায্যে বাতাসে ভাসিয়া যাইতে পারে। এই পর্দ্দাটি যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত এবং কাগজের মত পাতলা। গাছের ডালে চলাফেরা করিবার সময় পর্দ্দাটি শরীরের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে গুটাইয়া রাখে, দেখিলে মনে হয় যেন একটা 'ফার-কোট' জড়াইয়া আছে। লেজসমেত লম্বায়

উড়ন্ত লেমুর—কোলাগো

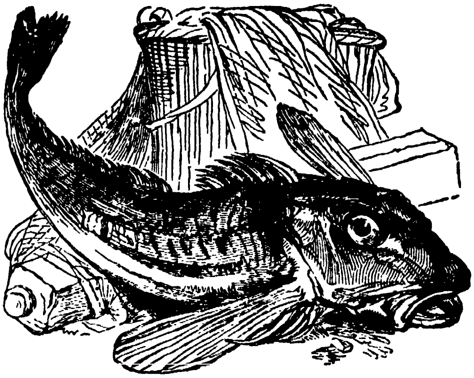

ট্রিগলা কিউকিউলাস নামক গার্নার্ড মৎস্য

ইহারা তিন ফিটেরও অধিক বড় হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং কালচে বাদামী কিন্তু নীচের দিকের রং প্রায় সাদা। প্রসারিত পর্দ্দাটি উপরে নীচে উভয় দিকেই রোমাবৃত। ইহাদিগকে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কাঠবিড়ালীরাও অনেক সময় উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িবার কালে হাত পা ও লেজটাকে যত দূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া দেয়। তাহার ফলে বাতাসের প্রতিবন্ধকতায় অতি ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করে।

কেবল জন্তুজানোয়ারই নহে, সাপ, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণীরাও যে আকাশ-অভিযানে উদ্বুদ্ধ হইয়া কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভে সক্ষম হইয়াছিল আজও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ড্র্যাকো নামে এক প্রকার অদ্ভুত টিকটিকি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সাধারণতঃ উড়ুক্কু ড্র্যাগন নামে পরিচিত। ইহাদের শরীরের উভয় পার্শ্বে ডানার মত প্রলম্বিত পাতলা পর্দ্দা গজাইয়া থাকে। ছাতার ডাঁশার মত এই পর্দ্দার দৃঢ়তা রক্ষার জন্য কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হাড়ও সুবিন্যস্ত থাকে। এক গাছ হইতে দূরস্থিত কোন গাছে যাইবার সময় ইহারা গলার নিম্নস্থিত থলিয়াটিকে বায়ুপূর্ণ করিয়া লয়। পরে ছত্রিকাটিকে ডানার মত প্রসারিত করিয়া বাতাসে লাফাইয়া পড়ে। বাতাসে ভাসিয়া যাইবার সময় ডানা দুইটিকে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া অগ্রসর হয়। এই সময় ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা শুষ্ক পত্র বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী,কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে।

গেছো-ব্যাং হয়তো অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা গাছের ডালে পাতায় পাতায় বিচরণ করে। এক গাছ হইতে অন্য গাছে যাইবার সময় এমন ভাবে লম্ফ প্রদান করে মনে হয় যেন উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে এমন এক জাতীয় গেছো-ব্যাং দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের পায়ের আঙুলগুলি বড় বড় এক এক খণ্ড চাকতির মত প্রায় গোলাকার পাতলা পর্দ্দায় পরস্পর সংযুক্ত। ইহারা এক গাছ হইতে লাফ দিয়া বহু দূরস্থিত অপর গাছে যাইবার সময় পায়ের পর্দ্দাগুলিকে ছত্রাকারে প্রসারিত করিয়া দেয়। ইহার ফলে বাতাসে ভর করিয়া অনেক দূর ভাসিয়া যাইতে পারে।

নিউ ইয়র্কের ষ্ট্যাটেন দ্বীপে 'ব্যারেট-জু' নামে একটি বিখ্যাত চিড়িয়াখানা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মালয় উপদ্বীপ হইতে একটি অদ্ভুত সর্প এই চিড়িয়াখানায় নীত হইয়াছিল। সাপটি এক স্থান হইতে লাফাইয়া বাতাসে ভাসিয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতে পারিত। শূন্য পথে চলিবার সময় সাপটি তাহার শরীরটাকে ফিতার মত চেপ্টা করিয়া দুই ধার নীচের দিকে বাঁকাইয়া রাখিত। এই জাতীয় উড়ন্ত সর্প অত্যন্ত বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। মালয় উপদ্বীপেই ইহাদিগকে এখনও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত স্থলচর প্রাণীদিগের আকাশ-অভিযান প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু জলচর প্রাণীদিগের আকাশ-অভিযান প্রচেষ্টার বিষয়ও কম বিস্ময়কর নহে। জলচর প্রাণীদের মধ্যে মাছেরাই বোধ হয় এবিষয়ে অগ্রণী এবং কিঞ্চিৎ কৃতিত্বেরও অধিকারী বটে। এক্সোসিটাস জাতীয় প্রায় ৩০ রকমের বিভিন্ন মৎস্যই আকাশ-অভিযানে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ফলে ইহাদের কানকোর সন্নিহিত পাখনা দুইটি ক্রমশঃ এরূপ সঞ্চালনক্ষম

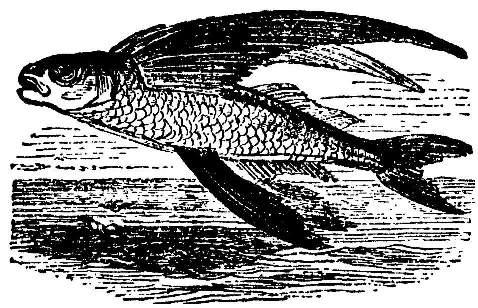

উড়ুক্কু মাছ—এক্সোসিটাস ভলিটান্‌স্

এবং বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহাদের সাহায্যে মাছগুলি কিছু কাল পর্য্যন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। ভূমধ্যসাগরেই ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য সমুদ্রেও অবশ্য মাঝে মাঝে এই উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতমহাসাগরের বিভিন্ন অংশে গার্ণাবৃড্ নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ উড়ুক্কু গার্ণার্ড বলা হয়। এই মাছগুলির কানকোর সন্নিহিত পাখনা দুইটি এত বড় যে সময় সময় ইহারা শত্রুর তাড়নায় জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বাতাসে ভর করিয়া তাহাদের সাহায্যে কিছু দূরে উড়িয়া যাইতে সমর্থ হয়। প্রবাল সমুদ্রের প্রজাপতি-কড্ নামক বিকটাকার মাছের পিঠ ও কানকোর সন্নিহিত পাখ্নাগুলি এত বড় এবং বিস্তৃত যে, ইহার সাহায্যে তাহারা কিয়দ্দূর আকাশ-ভ্রমণে সমর্থ হয়। পাখ্নাগুলিও সাধারণ মাছের পাখ্নার মত নহে। দেখিলে মনে হয়—ঠিক যেন পাখীর পালক। বর্ণ-বৈচিত্র্যে এবং পাখ্নার পালকসজ্জায় সহসা ইহাদিগকে মাছ বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে ইহা ধারণা করা অসম্ভব নহে যে, বিরাটাকার জন্তুজানোয়ার বাদে পৃথিবীর অন্যান্য বিবিধ প্রাণী বিভিন্ন উপায়ে আকাশ-অভিযানে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের সেই প্রচেষ্টার আজিও বিরাম নাই। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা ইহাদের প্রচেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

বৈদিক সংস্কারে কন্যা ঃ উপনয়ন

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন)

উপনয়ন শ্রেষ্ঠ বৈদিক সংস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা ব্যতীত বিদ্যারম্ভ হয় না, বিশেষতঃ বেদপাঠে অধিকার জন্মে না। এ বিশিষ্ট সংস্কারে নারীর অধিকার নেই—এ বিশ্বাস সর্বসাধারণের আছে। এ ধারণা ঠিক নয়।

সূত্রকারেরা নিয়ম করেছেন যে সপ্তম বা অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন আরো কিছু বেশী বয়সে হবে।[১] সূত্রের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি পুংলিঙ্গান্ত শব্দের এ মানে নয় যে কেবল ঐ ঐ জাতির পুরুষদের জন্য উপনয়নের বিধান করা হ'ল—মেয়েদের জন্য নয়। "স্বর্গকামো যজেত" বললে মেয়েরা যজ্ঞ থেকে বাদ পড়েন না, এ কথা ঋষিরা নিজেরাই বলে গেছেন।[২] "মরণধর্মা মানবঃ" বললে স্ত্রীলোক মরেন না, এমন কথা বলা হয় না। সূত্রকারদের রচনার পদ্ধতিই হচ্ছে যে পুংলিঙ্গের দ্বারা স্ত্রীদের সম্বন্ধেও বলা। সুতরাং উপনয়নের সম্পর্কে ঐ একই কথা খাটে।

মেয়েদের উপনয়নে যে অধিকার আছে, তার বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি প্রমাণ আমরা দিচ্ছি।

১। হারীত বলেছেন[৩] নারীদের ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ—এ দু' ভাগে ভাগ করা যায়। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, অগ্নিপ্রজ্বালন, বেদাধ্যয়ন ও নিজের বাড়ীতে ভিক্ষাচর্যার অধিকার আছে। সদ্যোবধূরা উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহে ব্রতী হবেন। কূর্ম-পুরাণে যম বলছেন[৪] যে পুরাকালে (যেমন), (তেমন বর্তমান কালেও) উপনয়নের অঙ্গীভূত মৌঞ্জীবন্ধন মেয়েরাও

১। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১.১৯.১, পৃঃ ৬৪, বৌম্বে সংস্করণ; কাঠকগৃহ্যসূত্র, ৪১.১; বারাহ-গৃহ্যসূত্র, ৫; গোভিল-গৃহ্যসূত্র ২.১০, খাদির, ২.৫.১; গোভিলগৃহ্যকর্মপ্রকাশিকা, ৮৪ পৃঃ; জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র, ১.১২; বোধায়নগৃহ্যসূত্র, ৫.২; ভারদ্বাজগৃহ্যসূত্র, ১.১; হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র, ১.১.১; আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ১০.১; পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ১১.২.১; শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র, ১১.১।

তুলনা করুন—আশ্বলায়নগৃহ্যকারিকা, ১৬.১; শৌনককারিকা, ইণ্ডিয়া অফিস পুঁথি, ৩১ক ফলিও; আশ্বলায়নযাজ্ঞিক পদ্ধতি, ইণ্ডিয়া অফিস পুঁথি Buhler ১৫, ফলিও ২৪খ, রেণুকার্য, ঐ, ফলিও ১২খ ইত্যাদি।

২। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ১.১.৭, স্ত্রী চাবিশেষাৎ; তদুপরি কর্কাচার্য ও যাজ্ঞিকদেবের টীকা। তুলনা করুন—জৈমিনীয় মীমাংসা, ৬.১.৬; জৈমিনীয় ন্যায়মালা, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সীরিজ, গ্রন্থাঙ্ক ২৪, পুনা, ১৮৯২, পৃঃ ৩০৩।

৩। সংস্কার-রত্নমালা, পুনা, ১৮৯৯, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫, ৬-৭ পংক্তি।

৪। পুরাকালে কুমারীণাং, ইত্যাদি।

করবেন ; বেদের অধ্যাপন, সাবিত্রীবাচন প্রভৃতিতেও তাঁদের অধিকার রয়েছে। কন্যা বাড়ীতেই পড়বেন, নিজের বাড়ীতেই ভিক্ষা চাইবেন এবং তাঁর শিক্ষক হবেন তাঁর পিতা, খুড়া, বা ভাই। ছেলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হবে এই—তিনি অজিন বা বল্কল পরিধান করবেন না এবং জটা ধারণও করবেন না।

২। উপনয়ন না হলে কেও বৈদিক মন্ত্র আওড়াতে পারেন না। কিন্তু গৃহ্য ও শ্রৌত বহু যজ্ঞে মেয়েদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে, এ বিধান রয়েছে। যথা, সাকমেধ যজ্ঞে কন্যা ত্র্যম্বক-মন্ত্র পড়েন।[৫] বেদ-দীপ টীকার লেখক মহীধরের[৬] মতে যজমানের অবিবাহিতা কন্যারা পুরুষদের সঙ্গে তিন বার আগুনের চার ধারে ঘুরবেন যাতে কুমারীদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হয়ে ত্র্যম্বক তাঁদের ভাল বর জুটিয়ে দেন। কুমারীরা হতে চান উর্বারুক অর্থাৎ কাঁকুড়ের মত ; ডাঁটার সঙ্গে অর্থাৎ বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে তাঁরা অরাজী নন, কিন্তু বেশীর ভাগ থাকতে চান মাটির উপর অর্থাৎ স্বামীর পরিবারে—যা তাঁদের বিশিষ্ট অবলম্বন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে[৭] উক্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে বাম উরুতে আঘাত করে করে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাবেন যজমান ও পুরোহিতেরা ; কুমারীরা যাবেন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—দক্ষিণ উরুতে আঘাত করতে করতে। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন,[৮] পদ্ধতিকার যাজ্ঞিকদেব[৯] (বচনাৎ কুমার্যা অপি মন্ত্র-পাঠঃ), সত্যাষাঢ়[১০] প্রভৃতি সকলেরই মতে কুমারী মন্ত্রপাঠ করতে করতেই উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করবেন[১১]।

বরুণপ্রঘাসস্ নামক দ্বিতীয় চাতুর্মাস্য যজ্ঞে উত্তর ও দক্ষিণ বেদীতে হবিঃ সংস্থাপনের পর প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীকে করম্ভপাত্র-হোম সম্পাদনের জন্য আনবার সময়ে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কোনও প্রেমিক আছেন কি না। উত্তর প্রদানের পর তিনি "প্রঘাসিনো হবামহে মরুতঃ"[১২] প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তার পর তিনি করম্ভপাত্রগুলো কুলোর উপরে নিয়ে মাথায় রেখে "যদ্ গ্রামে" প্রভৃতি মন্ত্র[১৩] পাঠ করে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ফিরবার পথে "অক্রং কর্ম" ইত্যাদি মন্ত্র[১৪] তিনি পাঠ করেন।

পত্নী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সাবিত্রী হোমের অবশিষ্ট ঘি সোমবাহক গাড়ীর শক্তুর উপরে মাখাতে মাখাতে "দেব শ্রুতৌ" প্রভৃতি মন্ত্র[১৫] পাঠ করেন। এ রকম আরও বহু যজ্ঞে পত্নী নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ও স্মৃতিতেও দেখা যায় পত্নীরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হন নি।

রামায়ণ[১৬] ও মহাভারতের[১৭] যুগে কৌশল্যা, সাবিত্রী, অম্বা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছেন।

স্কন্দ-পুরাণে কথিত আছে পত্নী যথাবিধি মন্ত্র সহ যজ্ঞ করবেন ; শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতিতেও তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার আছে।[১৮] ভট্ট নীলকণ্ঠের শ্রাদ্ধময়ূখে উদ্ধৃত কালাদর্শ মতে স্ত্রীরা মন্ত্র পাঠ না করে ভর্তার শ্রাদ্ধ করবেন।[১৯] কিন্তু এখানকার স্ত্রীর অর্থ সামান্যা রমণী, পত্নী নহেন। গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য স্বীয় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া-কৌমুদী নামক গ্রন্থে[২০] বলেছেন যে উক্ত কালাদর্শের মত অমূলক এবং সংগ্রহ গ্রন্থসমূহে ঐ পাঠ দেখাও যায় না, সুতরাং স্ত্রীরা মন্ত্র পাঠ না করে শ্রাদ্ধ করবেন, এ কথা অযৌক্তিক (স্ত্রীণামমন্ত্রকং শ্রাদ্ধমিতি ·· তন্মন্দম্)। ব্রহ্ম-পুরাণে[২১] স্পষ্টই বলা আছে যে স্ত্রীরা মন্ত্র উচ্চারণ করেই শ্রাদ্ধ করবেন।

শঙ্খ[২২] বলেছেন সংস্কারের পর কন্যা পুত্রের মত অশৌচ-পালন, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, পিণ্ডদান ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করবেন। পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনও ভেদদৃষ্টি বা মন্ত্রোচ্চারণাদিতে তারতম্যাদির কথা কিছুই তিনি বলেন নি।

নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদের "সাবিত্রীং প্রণবং যজুঃ স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি"[২৩] এবং শ্রাদ্ধতত্ত্ব-ধৃত বোধায়নের

৫। বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩.৬০খ।

৬। Webera শুক্ল যজুর্বেদ, ৯২ পৃঃ।

৭। ২.৬.২.১৩, Webera সংস্করণের ১৯৭ পৃঃ ; সায়ণভাষ্য, উক্ত সংস্করণ, ২১৮ পৃঃ।

৮। ৫.১০.১৭, Webera সংস্করণ, পৃঃ ৫৩৩। ৯। Webera শুক্ল যজুর্বেদ, ৫৩৬। ১০। শ্রৌতসূত্র, ৫.৫., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯। ১১। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মন্ত্রের পাঠ ভিন্ন : উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষিয় মা পতেঃ। ১২। বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩.৪৪।

১৩। বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩. ৪৫। ১৪। ঐ, ৩.৪৭। ১৫। বাজসনেয়ি সংহিতা, ৫. ১৭, মৈত্রায়নী-সংহিতা, ১.২.৯ ; কাঠক-সংহিতা, ১১, ১০ ; শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩. ৫. ৩, ১৩-১৪ ইত্যাদি। ১৬। ২. ২০. ১৪ প্রভৃতি। ১৭। ৩.২৯৬। ১৮। বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ২৩২৬ পৃঃ। ১৯। Gharpurea সং, পৃঃ ২২।

২০। বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, ১৯০৪, ৩৭৭ পৃঃ।

২১। স্ত্রীভিশ্চ···মন্ত্রবদ্বিধিপূর্বং তু বহ্নি-পাক-বিবর্জিতম্।

২২। দুহিতা পুত্রবৎ কুর্যাৎ, etc. শ্রাদ্ধ-ময়ূখ Gharpurea সংস্করণ, ২৩ পৃঃ। ২৩ আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সীরিজ, ৩০ গ্রন্থাঙ্ক, পৃঃ ১০।

"অমন্ত্রা হি স্ত্রিয়ো মতাঃ"[২৪]—এই উক্তি দুটিতে "নেচ্ছন্তি" এবং "মতাঃ" এই দুই শব্দ থেকে বোঝা যায়—এই মত গ্রন্থকারদের নিজেদের নয়। নিজেদের মত বলবার সময়, অন্যেরা এ মত অযৌক্তিক মনে করেন—তাঁদের এ রকম করে বলবার কোনও হেতু নেই। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদ্ যুগের গ্রন্থ নয়; বোধায়নের মত বলে যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তা' বোধায়নের সত্যিকার মত কি না বলা শক্ত; হলেও ঐ মত গ্রহণীয় নয়। কেন না, স্মৃতির কথা বেদবিরুদ্ধ হলে বেদের উক্তিই মেনে নিতে হবে—বেদব্যাস[২৫] বলে গেছেন। নারীদের অজস্র মন্ত্রোচ্চারণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদাদিতে সর্বত্র রয়েছে; কেবল নৃসিংহ-তাপনীয়োপনিষদ্ বা বোধায়নের মত নারীদের মন্ত্রোচ্চারণের বিরুদ্ধে হলেই বা কি এসে গেল?

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ[২৬] ও অন্যান্য শ্রাদ্ধের[২৭] মধ্যম পিণ্ডটী[২৮] পত্নীকে খেতে হয়। এ পিণ্ড খাওয়ার সময়েও তিনি যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ করেন।[২৯] সংস্কার-রত্নমালায়[৩০] বলা আছে যে পত্নীকে এ পিণ্ড খেতেই হবে, বিশেষতঃ তিনি যদি সন্তান কামনা করেন।[৩১]

আশ্বলায়ন[৩২] তাঁর গৃহ্যসূত্রে নিয়ম করেছেন যে বিবাহের সময় থেকে গৃহস্থ নিজে, তাঁর পত্নী, পুত্র, কুমারী কন্যা বা কোনও শিষ্য মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবেন। গার্গ্যনারায়ণ[৩৩], হরদত্ত[৩৪], খাদির,[৩৫] গোভিল,[৩৬] প্রয়োগরত্নকার নারায়ণ[৩৭], স্মৃত্যর্থসার-কার[৩৮] প্রভৃতি সকলেই বলেছেন পত্নী মন্ত্রোচ্চারণ করেই আহুতি প্রদান করবেন। সুতরাং এঁদের মতেও এ দাঁড়ালো যে ওঁ সহ মন্ত্রোচ্চারণ করে স্বামীর সমান অধিকার নিয়েই পত্নীকে যথারীতি ধর্মক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়, তাঁর সে বিষয়ে অধিকার সম্পূর্ণ রয়েছে।

পারস্কর[৩৯] বলেন, সন্তান-লাভের আশায় পত্নী উভয় সন্ধ্যায় অগ্নিতে প্রথম আহুতি প্রদান করবেন, সকালে মন্ত্রে বলবেন, "সূর্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" এবং প্রদোষে বলবেন, "অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা"। পত্নীই যে প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করবেন এ বিষয়ে কর্ক, জয়রাম, হরিহর, গদাধর প্রভৃতি সব ভাষ্যকারেরা[৪০] এক মত। এটি হোমমন্ত্র, অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করতে এবং প্রথমে ওঁ উচ্চারণ করতে হয়।[৪১] সুতরাং প্রণব ও স্বাহা সহ হোমমন্ত্র উচ্চারণ তিনি উপনয়ন ছাড়া কি করে করবেন?

উপরিলিখিত মাত্র কয়েকটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট দেখা গেল যে মেয়েরা বৈদিক মন্ত্র পাঠের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। এবং এও সর্ববাদিসম্মত সত্য যে উপনয়ন ছাড়া বৈদিক মন্ত্র পাঠে কাহারো অধিকার জন্মে না। এ সত্ত্বেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে কি ক'রে মেয়েদের উপনয়নে অধিকার নেই বললেন,—তা বুদ্ধির অগম্য।

৩। নামকরণ নামক সংস্কার-প্রসঙ্গে আশ্বলায়ন[৪২] নিয়ম করেছেন যে পুরুষদের নাম যুগ্মাক্ষর হবে; এবং মেয়েদের নাম হবে অযুগ্মাক্ষর। সন্তানের সাংব্যবহারিক নামের মত একটি অভিবাদনীয় নামও থাকবে। এ সাংব্যবহারিক নামে বিদ্যারম্ভ হয় না। উপনয়নের জন্য অভিবাদনীয় নাম প্রয়োজনীয়। এ নাম মা ও বাবা উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের কাছে অতি গোপনে রাখেন।[৪৩] উপনয়নের সময় এ নাম গুরুকে বলা হয়; নূতন ছাত্রের উপনয়নের সময় তিনি এ নাম ব্যবহার করেন। এ যে উপনয়নের জন্য বিহিত অভিবাদনীয় নাম—এর উপনয়ন ছাড়া কোনও সার্থকতা নেই। অথচ আশ্বলায়ন তো বলেছেন—মেয়েদেরও এ নাম রাখতে

২৪। হৃষীকেশ শাস্ত্রি-সম্পাদিত শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব, কলিকাতা-১৯০৯—১০, পৃঃ ৫১১, পংক্তি ৪। ২৫। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাং, প্রভৃতি; স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ, পুনা, ১৯০৫, পৃঃ ৩৫৭, পংক্তি ৭ (৪ নং কবিতা)।

২৬। সংস্কার-রত্নমালা, পুনা, ১৮৯৯, পৃঃ ৯৮৩। ২৭। শ্রাদ্ধ-মঞ্জরী, পুনা, ১৯০৯, পৃঃ ৩৭।

২৮। যদি ছয়টি থাকে, তৃতীয় ও চতুর্থ পিণ্ড তাঁকে খেতে হবে; শ্রাদ্ধমঞ্জরী, ৭৩ পৃঃ।

২৯। যদি ধর্মতঃ খাওয়া অনুচিত হয়, তা হলে তিনি পিণ্ড খাবেন না।

৩০। পুনা, ১৮৯৯, পৃঃ ৯৮৩, পংক্তি ১৩।

৩১। তুলনা করুন— শ্রাদ্ধ-ময়ূখ; দেবণ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা, শ্রাদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০২।

৩২। ১. ৯. ১। ৩৩। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, বোম্বে সংস্করণ, ৪৯০৯, ৩৩ পৃঃ।

৩৪। ত্রিবেণ্ড্রাম সংস্করণ; ১৯২৩, ৩৩ পৃ.। ৩৫। মহীশূর সংস্করণ ১. ৫. ১৭—১৮, পৃঃ ৪০। ৩৬। ১. ৩. ১৫। ৩৭। বোম্বে সংস্করণ।

৩৮। আনন্দাশ্রম সংস্করণ, এতৈরেব হুতং ইত্যাদি, পৃ. ৩৫।

৩৯। ১. ৯. ৩—৫, বোম্বে সংস্করণ, ১৯১৮, ১১০ পৃ.। ৪০। ঐ সংস্করণ, ১১০—১১৫ পৃ.। ৪১। তুলনা—উপোদ্ঘাত, পুনা, ১৯২৪, পৃ. ৪৭, সর্ব-মন্ত্রেষ্বাদাবন্তে চ প্রণবো বক্তব্যঃ।

৪২। ১. ১৫. ৪, প্রভৃতি পৃঃ ৫৫, বোম্বে, ২য় সংস্করণ; ১. ১৩. ৪, প্রভৃতি, পৃঃ ৬২, ত্রিবেণ্ড্রাম সংস্করণ।

৪৩। অভিবাদনীয়ঞ্চ সমীক্ষেত, তন্মাতাপিতরৌ বিদ্যোতাম্ আ উপনয়নাৎ। তুলনা করুন—কুমারিল ভট্ট, গৃহ্য-কারিকা, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের বোম্বে সংস্করণের ২৭৩ পৃঃ।

হবে। যদি মেয়েদের উপনয়নে অধিকার না থাকে, ঋষি আশ্বলায়নের বচনই ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪। গোভিল[৪৪] এও বলেছেন যে বিবাহের সময় বধূ বেদীতে যাওয়ার সময় "প্রাবৃতা" ও "যজ্ঞোপবীতিনী" হয়ে যাবেন। গোভিল ও কাত্যায়ন উভয়েই তাঁদের অধিকার-সূত্রে বলে দিয়েছেন যে যজ্ঞোপবীত ছাড়া ক্রিয়া হয় না। সুতরাং এখানকার "উপবীতিনী" দ্বারা গোভিল বলতে চান, বধূ বস্ত্র পরিবর্তনের সঙ্গে নূতন যজ্ঞোপবীতও পরিধান করবেন। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মশায় এ সূত্রের যে ব্যাখ্যা[৪৫]—নারীদের উপবীত পরিধানের বিরুদ্ধে বলতে গিয়েই তাঁকে এ ব্যাখ্যা করতে হয়েছে—করেছেন, তার তো অর্থসঙ্গতি হয় না। প্রাবৃতা অর্থে তিনি বলছেন—যিনি ভাল করে অধরীয় বসন পরিধান করেছেন; এবং যজ্ঞোপবীতিনীর মানে তিনি করছেন—যিনি উপরের কাপড় যজ্ঞোপবীতের মত পরিধান করবেন। যজ্ঞোপবীতের মত উপরের কাপড় পরলে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মত বধূর ভাল করে অঙ্গ আচ্ছাদিত হয় না।[৪৬]

বধূ যজ্ঞোপবীত পরিধান করবেন এতে আর মতদ্বৈধ হবার কি কারণ, যখন দেখি যে বিধবাও যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে[৪৭] স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি করছেন। তিনি বিধানানুযায়ী কখনও বা এ যজ্ঞোপবীত বাম কাঁধে, আর কখনও বা ডান কাঁধে পরেন। পুত্র বা কন্যার উদ্দেশ্যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করবার সময় সঙ্কল্প পর্যন্ত সমুদায় কাজ বিধবা জননী নিজে করেন, তার পর অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি পুরোহিতকে অনুরোধ করতে পারেন।[৪৮] যদি পুরোহিতকে অবশিষ্ট কার্য করতে অনুরোধ করেন, তা হ'লে পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যজ্ঞোপবীত ডান বা বাঁ কাঁধে রাখেন।[৪৯] যদি তিনি সমুদায় কাজ করেন, তখন পুরোহিতের যথারীতি ডান বা বাম কাঁধে যজ্ঞোপবীত পরিধান করে সমস্ত কৃত্য সমাধা করবেন—এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫। কাত্যায়ন তাঁর কর্মপ্রদীপ[৫০] নামক গ্রন্থে বলছেন যে এক স্বামীর বহু পত্নীদের মধ্যে উপেতানাঞ্চ অন্যতমা যিনি, অর্থাৎ উপনীতা ও শিক্ষিতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা যিনি—তিনিই সর্বপ্রথম আগুনে আহুতি দেবেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে জ্ঞাতি, কুল, সৌন্দর্য প্রভৃতি সব কিছুর থেকে উপনীতার সম্মানই সমাজে, পরিবারে সবচেয়ে বেশী।

৬। মদন-পারিজাতে[৫১] স্ত্রী-সংস্কার নামে একটা অধ্যায় আছে। এঅধ্যায়ে স্মার্ত মদনপাল কাত্যায়নের বাক্য বলে[৫২] প্রমাণ করছেন যে যদি কোনও কারণে মেয়েদের উপনয়নের সময় অতীত হয়ে যায়, তাঁদের ব্রাত্যস্তোম ও অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মেয়েদের উপনয়নেই যদি অধিকার না থাকে, তার ব্যাঘাতের জন্য ব্রাত্যস্তোম বা প্রায়শ্চিত্তের বিধানের কি প্রয়োজন?

৭। বৈদিক জ্ঞান, বৈদিক আলোচনা, বৈদিক মন্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি উপনয়ন ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের রমণীরা এসব বিষয়ে অধিকারিণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদে বহু ব্রহ্মবাদিনীরা আছেন যাঁরা বেদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বা নিজেরা ব্রহ্মবিষয়ক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে[৫৩] এ ব্রহ্মবাদিনীদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) ঋষি; (২) যাঁরা ঋষি ও দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন; (৩) যাঁরা আত্মার বিবর্তাদি বিষয়ে গান করেছেন। ঋক্ বা সূক্ত এঁদের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে এঁদেরও বেদের ঋষি বলা চলে। প্রথম বিভাগে আছেন—ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহূ, অগস্ত্য-ভগ্নী ও অদিতি। ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদী, যমী ও শাশ্বতী নারী দ্বিতীয় দলে। এবং তৃতীয় বিভাগের অন্তর্গতা হচ্ছেন শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাচ্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি ও সূর্যা সাবিত্রী। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৫৪] গার্গী বাচক্নবী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজের সভায় প্রশ্নে প্রশ্নে বহুবার জর্জরিত করেছেন।[৫৫] একবার তো যাজ্ঞবল্ক্য প্রায় হারবার মুখেই রেগে তাঁকে শাপ দিলেন যে বাচক্নবী

৪৪। ২. ১ ১৯।

৪৫। গোভিল, ১. ১. ২; কাত্যায়নের কর্মপ্রদীপ, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, গ্রন্থাঙ্ক ১৭৮, পৃঃ ১১।

৪৬। গোভিলগৃহ্যসূত্র, ব্রিবিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, ৩০৮ পৃঃ।

৪৭। যজ্ঞোপবীত পরিধানের নিয়ম, কর্ম-প্রদীপ ১. ২।

৪৮। বাপু মহাদেব কেলকার সম্পাদিত শ্রাদ্ধ-মঞ্জরী, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সীরিজ, ১১৭ পৃঃ।

৪৯। ঐ, ২০ পংক্তি, কশ্চিদ ব্রাহ্মণমৃত্বিকৃত্বেন পরিকল্প্য, ইত্যাদি।

৫০। ১. ৮. ৬ ও পরবর্তী; বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, সংস্করণ, ১১৪ পৃঃ।
বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, ৩৬২ পৃঃ।

৫২ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত উনবিংশতি সংহিতার অন্তর্গত কাত্যায়ন-সংহিতা, ৩৩০ পৃঃ।

৫৩ ১১. ৮৪; তুলনীয়—আর্ষানুক্রমণী, ১০. ১০২।

৫৪ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২. ৪. ১—১৪ এবং ৪. ৫. ১-১৫

৫৫ ঐ উপনিষৎ, ৩. ৮।

আর যদি তর্কযুদ্ধে তাঁকে হারাবার আরও চেষ্টা করেন, তা হ'লে তাঁর (বাচক্নবীর) মুণ্ডপাত হবে।[৫৬] পর-ব্রহ্ম সম্বন্ধে উমা হৈমবতীই অগ্নি ও বায়ুকে উপদেশ দিচ্ছেন।[৫৭] অথর্ববেদের মতে বৈদিক শিক্ষার প্রভাবেই নারীরা মনোমত বর প্রাপ্ত হন।[৫৮] শাঙ্খায়ন[৫৯] ও আশ্বলায়ন[৬০] গৃহ্যসূত্রে বৈদিক পণ্ডিতা গার্গী বাচক্নবী, বড়বা প্রাতিথেয়ী ও সুলভা মৈত্রেয়ীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে[৬১] একজন কুমারী গন্ধর্ব-গৃহীতার মত উদ্ধৃত আছে। তিনি বলছেন যে অগ্নিহোত্র আগেকার দিনে উভয় দিনে সম্পাদন করা হ'ত বটে, তবে উহা বর্তমানে পর পর দিনে করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ তাঁর মতে ঐ ক্রিয়া পর পরদিনে করা যেতে পারে। পটঞ্চল কাপ্যের কন্যা[৬২] ও স্ত্রীও[৬৩] গন্ধর্ব-গৃহীতা; তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রেরা পড়তে আসতো। কাপ্য নিজেও তাঁদের কাছে অনেক বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কাত্যায়ন তাঁর বার্তিক সূত্রে বলেছেন যে শিক্ষয়িত্রী অর্থে আচার্য ও উপাধ্যায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে আচার্যা এবং উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া[৬৪] পদ হবে। এ থেকেও বোঝা যায় যে নারীরা সে সময়ে শিক্ষাব্রতে ব্রতী ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় বৈদিক শিক্ষাও প্রদান করতেন এবং উপনয়নে অধিকারিণী ছিলেন। ভবভূতির চিত্রণে দেখা যায় আত্রেয়ীরা ছুটে যেতেন পদব্রজে উত্তর-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে, বেদান্ত বিদ্যা শিক্ষার জন্য।[৬৫]

বৈদিক ক্রিয়াকলাপেও যে সব সামবেদীয় সঙ্গীত ও বিভিন্ন যন্ত্রাদি বিশেষ উপযোগী ছিল, সে সবেও নারীরা বিশেষ পটু ছিলেন। কেবল সামবেদ অধ্যয়ন তাঁরা ভালবাসতেন, তা নয়, সামবেদের সঙ্গীতের উপযোগী বাদ্যাদিও তাঁদের প্রাণের জিনিষ ছিল। ব্রহ্মবাদীদের চেয়েও তাঁরা সঙ্গীতজ্ঞদের বেশী ভালবাসতেন।[৬৬] সঙ্গীতজ্ঞদের প্রেমমুগ্ধ হন নারীরা সহজে।[৬৭] মহাব্রত নামক কৃত্যে স্ত্রীরা নানাবিধ বাদ্যযোগে গান করেন। সত্যাষাঢ়ের মতে[৬৮] তাঁরা এ সময়ে অপঘাটলিকা, তালুক-বীণা, কাণ্ড-বীণা, পিচোরা, অলাবু-কপিশিস্র নামক বাদ্যযন্ত্র বাজান। শাঙ্খায়নের মতে[৬৯] তাঁরা ঘটকর্করী, অবঘাটরিকা, কাণ্ডবীণা, পিচোরা প্রভৃতি বাজান। লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও[৭০] নারীদের ব্যবহার্য এ জাতীয় কতকগুলি যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকেও[৭১] বাদ্যের বিষয়ে উল্লেখ আছে, যদিও যন্ত্রগুলির নাম বলা নেই। এ সম্পর্কে লাট্যায়ন[৭২] বিশেষ নিয়ম করেছেন যে পত্নী উদ্গাতার পশ্চিম দিকে বসে' বীণা বাজাবেন। তাঁকে সাবধান হ'তে হবে যাতে তিনি ঘাটরী ধীরে না বাজান। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যেক অঙ্গ অতি নিপুণভাবে, সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যজমান ও তাঁর পত্নীর অবশ্যকর্তব্য। উপরিলিখিত বাদ্যাদি পত্নীর ক্রিয়ার অঙ্গীভূত বলে তাঁকেই গীত-বাদ্যে সুপটু হতে হয়।

বারাহ-গৃহ্যসূত্রে[৭৩] বিবাহ-সংস্কারের অন্তর্গত প্রবাদন কর্ম নামে একটা আলাদা ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এই কৃত্য অনুসারে বধূর মুখে ঘি মাখানো হয় যাতে তিনি স্বামী, দেবর ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের প্রিয়পাত্রী হতে পারেন। তার পর তাঁকে কতকগুলি মন্ত্রপূত যন্ত্রাদি বাজাতে হয়। তিনি দুন্দুভি ও গোমুখ বাদ্যের কাছে প্রার্থনা জানান সন্তানের জন্য, বিশেষতঃ—ইন্দ্রাণীর স্নেহপাত্রী কন্যার জন্য—যাতে ছেলে ও মেয়ে খেলা করে করে তাঁর ঘরে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রবাদন সামবেদীয় গানের অঙ্গীভূত। গানে ও বাজনায় পটু হওয়া নারীর অবশ্যকর্তব্য। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে সামবেদাদি মেয়েদের শিক্ষণীয়—যা উপনয়ন ছাড়া পড়া চলে না।

উপরিলিখিত যুক্তি থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কন্যার উপনয়ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ ও প্রণব সহ মন্ত্রোচ্চারণাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

৫৬। ঐ উপনিষৎ, ৩. ৬।

৫৭। তলবকার উপনিষৎ, ৪. ১।

৫৮। ১১. ৫. ১৮।

৫৯। ৪. ১০।

৬০। ৩. ৪. ৪।

৬১। ঐতরেয়—৫. ২৯; কৌষীতকি—৩. ৩. ১।

৬২। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৩.৭.১। ৬৩। ৩.৩.১। ৬৪। বাল-মনোরমা, প্রথম খণ্ড, ৩৭৩—৩৮০ পৃঃ। ৬৫। উত্তর-চরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক, অস্মিন্নেবাগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে, ইত্যাদি।

৬৬। সরস্বত্যনুবাক, ২০, কাঠকগৃহ্যসূত্র, পৃঃ ৩০৩, লাহোর সংস্করণ। ৬৭। তৈত্তিরীয়-সংহিতা. ৬.১.৬.৫; মৈত্রায়ণী-সংহিতা, ৩.৭.৩; শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৩.২.৪.৬। ৬৮। ১৬.৬.২১, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৮২ পৃঃ। ৬৯। ১৭.৩.১২, পরবর্তী সূত্রগুলিতে বাজাবার পদ্ধতি দেওয়া আছে। লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র, ৪.৬, ইত্যাদি। ৭০। ৪.২.১-৮। ৭১। ৫.১.৫। ৭২। ৪.২.৫। ৭৩। সূত্র ১৭, লাহোর সংস্করণ, ৩৪ পৃঃ।

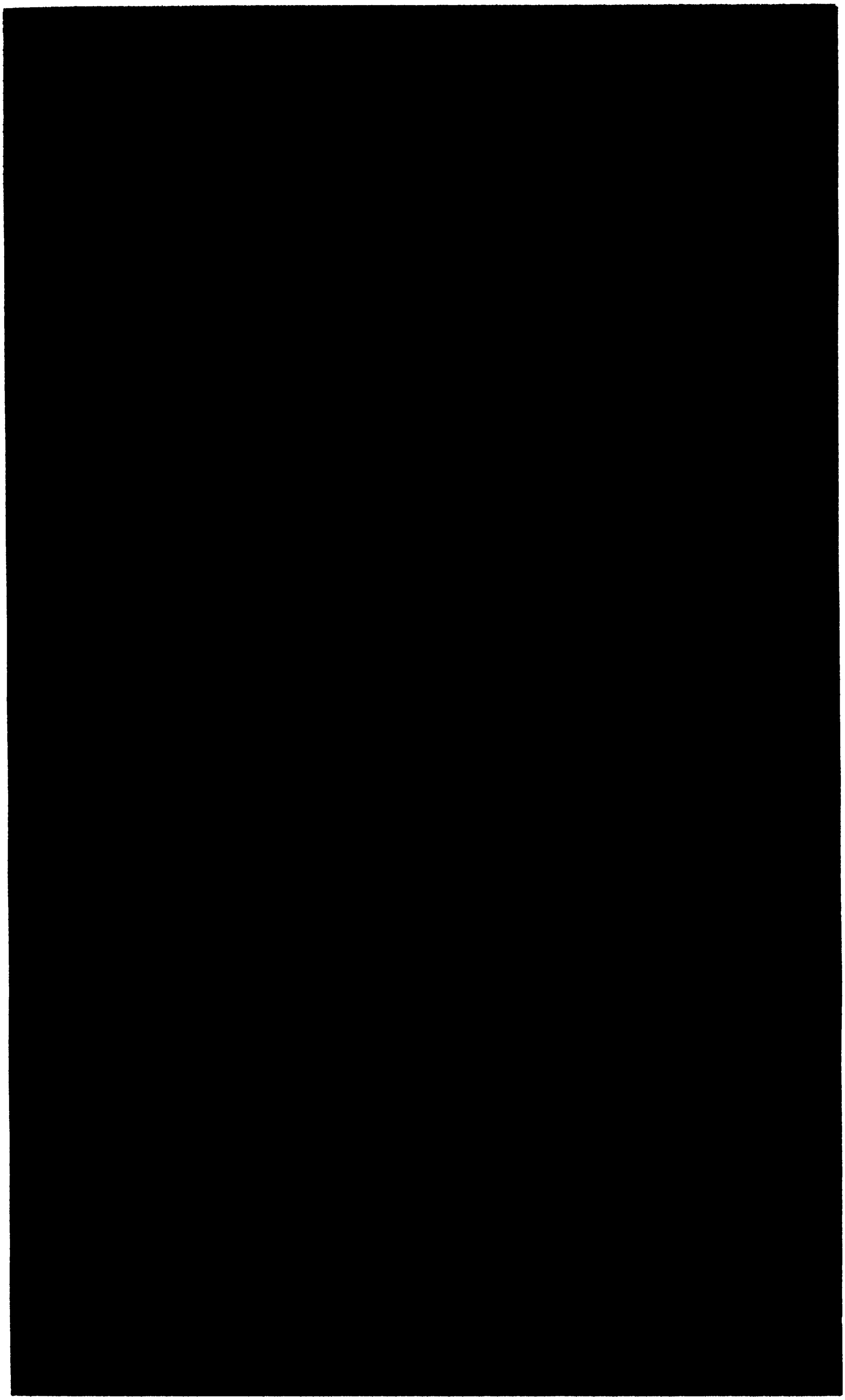

উনো-ধুনো দুই বোন

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হারানো দিনের কথা

শ্রীশান্তা দেবী

আমরা যখন শিশু, অতি শিশু তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের নামের আলো জ্ঞানসূর্য্যের প্রথম রেখাপাতের মত আমাদের মনকে আলোকিত করেছিল। রবিহীন পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। বয়সের দিক দিয়ে থাকবার কথা নয়, কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়েও ছিল না। আমাদের "জীবন ব্যাপিয়া ভুবন ছাপিয়া, যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া" যেন তিনি ছিলেন।

মনে পড়ে শিশু বয়সে শোনা প্রথম গানগুলি। আমাদের মা উচ্চ মধুর কণ্ঠে গাইতেন,

"বেলা যে চলে যায় ডুবিল রবি,
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী,"
"ও ভাই দেখে যা কত ফুল ফুটেছে,
তুই আয় রে কাছে আয় আমি তোরে সাজিয়ে দি
তোর হাতে মৃণাল বালা, তোর কাণে চাঁপার দুল
তোর মাথায় বেলের সিঁথি দেব খোঁপায় বকুল ফুল।"

পরে শুনেছিলাম এগুলি 'কালমৃগয়ার' গান। ছায়ায় ঢাকা ঘন অটবীর ছবি তখনই মনকে কোন্ কল্পরাজ্যে নিয়ে যেত।

তার পর যখন সবে পড়তে শিখেছি, সেই সময় বাবা দাদাকে একটি ছোট বই কিনে দিলেন। হাল্কা নীল রঙের কাগজের তার মলাট, নাম 'নদী'। আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্বরে পড়তাম,

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে উঠে কেন এত ঢেউ
তারা দিবস রজনী নাচে
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।"

আমাদের মনে 'চল্ চল্ ছল্ ছল্' করিয়া নদীর গান সর্ব্বদাই কে গাহিয়া চলিত। ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ এক দিন 'নদী'র কবি আমাদের মাটির ঘরের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। শিশুমনে কল্পনা করতাম হিমালয়ের চূড়ায় যেখানে "পাহাড় বসে আছে মহামুনি" সেইখানে আর এক মহামুনির মত এই 'ভগীরথ'ও হয়ত বসে থাকেন, আমাদের মর্ত্ত্যবাসীদের জন্য 'নদী'কে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম এ'ত 'মহামুনি'র মূর্ত্তি নয়, এ রাজচক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি। সে ছবি মনে আঁকা রইল।

তার পর এল আমাদের বই পড়ার যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'নদী'র পর ঠিক কোন্ বইটি পড়েছিলাম স্পষ্ট মনে নাই। বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে কাড়াকাড়ি চল্‌ত এটা এখনও যেন ছবির মত দেখ্‌তে পাই। আমাদের পিতৃবন্ধু নেপালচন্দ্র রায় তখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। সেই বাড়ীতেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন সোহিনী-দিদি বলে আমাদের এক দিদি। বাড়ীতে তখন নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন আসত। মাসের গোড়াতেই মা, নেপালবাবু আর সোহিনী-দিদি উৎসুক হয়ে থাকতেন পিয়নের হাত থেকে কে প্রথম বঙ্গদর্শনখানি গ্রহণ করবেন এবং আগে পড়ে ফেলবেন। নেপালবাবুই প্রায় জয়লাভ করতেন এবং মা ও সোহিনী-দিদি কাগজখানি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেবার জন্য মহা জেদাজিদি করতেন। হপ্তা-খানেক ধরে বাড়ীতে বড়দের মধ্যে 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' ছাড়া কথা থাকত না। আমরা 'হেমনলিনী', 'বিনোদিনী', 'রমেশ' এই নামগুলি খালি বুঝতাম, বঙ্গদর্শন ছোঁবার অধিকার আমাদের ছিল না।

'হিতবাদী'র প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' সোহিনী-দিদির এক কপি ছিল। আমার আট কিংবা নয় বৎসর বয়সে সেই বইখানি হস্তগত করতে পেরেছিলাম। সমস্ত বইখানির রস গ্রহণ করবার ক্ষমতা তখন ছিল না, কাজেই 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'গুলি পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ করতাম। রবীন্দ্রনাথের ভুল করে সহযাত্রিণী মেমসাহেবের কামরায় ঢুকে পড়া, বাক্সের উপর তাঁহাদের দুই সহযাত্রীর 'নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য', অনাহারে শীতের রাত্রে বেহাগ রাগিণীতে গান প্রভৃতি আমাদের অফুরন্ত হাস্যের খোরাক জোগাত।

মাঝে মাঝে 'নিশীথে' গল্পের "ও কে, ও কে গো" ডাক শুনে যেমন চমকে উঠতাম, 'মণিহারা' গল্পের সর্ব্বালঙ্কারধারিণী কঙ্কাল মূর্ত্তির ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে সিঁড়ি দিয়ে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়ার চিত্র অন্ধকার রাত্রে চোখের সম্মুখে যেন ভেসে উঠ্‌ত।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথকে দেখি নি, কিন্তু তাঁর প্রেরিত 'রাখীর রাঙা সুতো' বাবার কাছে এসেছিল মনে

পড়ছে। সেই সময় এলাহাবাদে বোধ হয় বাঙালী সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের জন্য বাবা কলকাতা থেকে একটি ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন, তার রেকর্ডগুলি গোল গোল গেলাসের মত দেখতে। আমরা সেই রেকর্ডে শুনেছিলাম,

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"
"অয়ি ভুবন মন মোহিনী"
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—"

তখন 'কথা ও কাহিনী'র যুগ ছিল বালকবালিকাদের। কোথাও কবিতা আবৃত্তির কথা হ'লেই 'কথা ও কাহিনী'র কোন্ কবিতা আবৃত্তি হবে তাই নিয়ে মহা আলোচনা আরম্ভ হ'ত। তখন স্বদেশীর দিন, কাজেই

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ"

এইটিই ছিল সর্ব্বজনপ্রিয়। এলাহাবাদে বাঙালীদের একটি বার্ষিক সম্মিলনী কয়েক বার হয়েছিল। বাবা ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। সেখানে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, তলোয়ার খেলা ঘোড়সওয়ারদের tent pegging প্রভৃতি বহু বীরোচিত খেলা হ'ত, তার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি, গান প্রভৃতিও ছিল। জীবনময় রায় তখন স্কুলের ছাত্র। একবার তিনি "পঞ্চনদীর তীরে" আবৃত্তি করেছিলেন। আমরা তখন মহা-উৎসাহী শ্রোতা। অকস্মাৎ সভার মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উঠে বললেন, "কবিতাটি আমি আবৃত্তি করে দেখাচ্ছি—প্রকৃত আবৃত্তি কি রকম হওয়া উচিত।"

উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে মঞ্চের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে এসে তিনি আবৃত্তি সুরু করলেন। বালক ও প্রবীণের মধ্যে রেষারেষি লেগে গেল।

এ কবিতাটি অবশ্য আমাদের খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু অনুপ্রাস, ছন্দ ও ছবির মায়ায় আমরা আকৃষ্ট হতাম

"বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাসে স্বচ্ছ সলিলা বরুণা
স্নানে চলেছেন শত সখী সাথে কাশীর মহিষী করুণা"
"পত্র দিল পাঠান কেশর খাঁরে।
কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রাণী।"
"শুধাল কে তুই ওরে দুর্ম্মতি
মরিবার তরে করিস আরতি
মধুর কণ্ঠে কহিল শ্রীমতী
'আমি বুদ্ধের দাসী।"

প্রভৃতি কবিতার দিকে।

বোধ হয় ১৩১২।১৩ সালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ নিয়ে এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে এসে ওঠেন। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা কাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে 'চয়নিকা' সঙ্কলন করা। কাজেই তিনি যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। আমরা তখন ছেলে-মানুষ, কাজেই ছেলেমানুষের মত তাঁর কাছেও গল্প শোনবার দরবার করতাম। তিনি বলতেন, "গল্প আমি লিখতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না।" বোধ হয় আমার ছোট বোন সীতা বলেছিলেন, "তবে আপনি কি বলতে পারেন?" তিনি বললেন, "কবিতা বলতে পারি।"

তাঁরই কাছে প্রথম আবৃত্তি শুনলাম,

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা"

আবার

"উর্ম্মিমুখর সাগরের পার
সেথায় কি আছে আলয় তোমার।"

চারুচন্দ্র আরও অনেক কবিতা মুখস্থ বলতেন, আমরা বিস্মিত হ'লে বলতেন, "আমি আর কতটুকু বলতে পারি, যতীন বাগচী সমস্ত কাব্যগ্রন্থাবলী কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন।"

চারুবাবুর অত্যন্ত প্রিয় কবিতা ছিল,

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"

এবং

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

গল্প ও উপন্যাস তখন বিশেষ পড়তাম না। আমাদের গুরু ছিলেন তখন স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়। তিনি ১২।১৩ বছর বয়সেই আমাকে অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পড়াতেন। অবসর কালে "কথা ও কাহিনী", কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস ছিল আমাদের খোরাক। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' তখন আমার একমাত্র পড়া উপন্যাস। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পও কিছু কিছু পড়েছিলাম। এই সময় গোরা ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ হ'ল 'প্রবাসী'তে। "গোরা"র প্রত্যেক instalment-এর আশায় কি আগ্রহে ও ঔৎসুক্যে আমরা দিন গুনতাম! গোরা যে সব বুঝতাম তা বলতে পারি না, তবে ললিতা সুচরিতা, বিনয় ও গোরার তুলনামূলক সমালোচনা করতে পিছপা হতাম না। এই সময়ই আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি। এসে দেখলাম তখনকার কিশোর বাংলায় পর্য্যন্ত 'গোরা' এক মহা বিপ্লব এনেছে। পনর-ষোল বছরের ছেলেরা সব নিজেদের গোরার সঙ্গে তুলনা করবার জন্য মহা ব্যস্ত। অনেকেরই ধারণা তারা সাক্ষাৎ এক

এক জন গোরা। বরদাসুন্দরী ও পানু বাবুকে তারা ঠিক চিনে বের করেছে এবং সুচরিতার আদর্শও তারা যে দেখে নি তা নয়।

এই সময় গীতাঞ্জলির গানে ব্রাহ্ম সমাজের পাড়া ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান দিয়ে বাংলা দেশের হৃদয়কে কেমন করে জয় করেছেন তা কলকাতায় এসে ভাল করে বুঝতে পারলাম। অবশ্য এলাহাবাদে যে তাঁর গান আমাদের অনুপ্রাণিত করে নি তা নয়। আমাদের বাল্যকালের গুরু ইন্দুভূষণ রায় সুগায়ক ছিলেন। তিনি এবং আমাদের মা আমাদের শিশুকাল থেকেই প্রায় রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেন। আমার মা গৃহকাজের মধ্যে মধ্যে ঘুরে ফিরে গাইতেন,

"শান্ত হ' রে মম চিত্ত নিরাকুল
শান্ত হ' রে ওরে দীন।"

কিংবা

"অন্ধ জনে দেহ আলো
মৃত জনে দেহ প্রাণ।"

এলাহাবাদ ব্রাহ্ম সমাজে গানের ভার অনেক সময় মায়ের উপর থাকত। তখন তাঁর উচ্চ মধুর কণ্ঠে—

"তোমার পতাকা যারে দাও"
"বল দাও মোরে বল দাও,"
'মুক্ত দ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে মোরে"

প্রভৃতি কত গান রবিবারে রবিবারে শুনেছি। কলকাতায় তখন

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে।"
"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—"

ইত্যাদি ঘরে ঘরে প্রত্যহ চলছে।

আমাদের বাল্যবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একখানি টালি এডিসনের কাব্যগ্রন্থাবলী ছিল। কলকাতায় তাঁদের ছাদের উপর মাঝে মাঝে এই বইটি নিয়ে আমাদের আলোচনা হ'ত, কিন্তু আমরা প্রধানত পড়তাম তখন 'খেয়া' আর 'চয়নিকা'।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দোলের সময় খবর পাওয়া গেল বোলপুরে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে "রাজা" অভিনয় হবে। আমরা ঠিক করলাম অভিনয় দেখ্‌তে যাব। কে আমাদের প্রথম এ বিষয়ে উৎসাহী করেছিলেন মনে নেই। বোধ হয় একটি বিবাহ-সভায় ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী ও আমি রাত্রে পরামর্শ করে ঠিক করলাম শান্তিনিকেতনে যেতেই হবে। শুধু অভিনয় দেখার উৎসাহেই যে পরামর্শ করেছিলাম তা নয়, অল্প বয়সে সেই সময় আশ্রমের আদর্শটা মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করত, তাই আদর্শের অনুসন্ধানেও উৎসাহ অনেকখানি বেড়েছিল। তখনকার আশ্রমের আতিথ্য, সেবাপরায়ণতা, শাল ও আমলকী বাগানের ভিতর খড়ো ঘরে ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলের অনাড়ম্বর জীবন এবং সর্ব্বোপরি আশ্রমপতির ব্যক্তিত্বের সহস্রমুখী প্রভা আমাদের কিশোর মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলেছিল। আজ মনে হয় আমরা অত ছোট বয়সে অতবড় মহাপুরুষের এত কাছে আস্‌তে পেরে-ছিলাম বলে মানুষের কাছে আমরা এখনও অনেক আশা রাখি এবং মানুষের ক্ষুদ্রতা আমাদের এতটা আঘাত করে। মানুষ বলতে ছেলেবেলা আমরা রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ দেখবার আশা করতাম; সাধারণ মানুষ যে কোন্ অতলে পড়ে আছে এবং আমরা নিজেরাও যে কতখানি অযোগ্য মানুষ তা বড় হয়ে বুঝেছি।

সেবার প্রথম 'রাজা' অভিনয় হয়। মাটির "নাট্য ঘরে" খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্য-তোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতসবাজির ফুলের মত ঝলমল ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল। আমাদের নূতন চোখে দেখা এই ছবির ছাপ মনে চিরদিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে আছে। দ্বিতীয় বার 'রাজা' অভিনয় মাসখানেক পরেই জন্মোৎসবে হয়েছিল।

প্রথম বার সুধীরঞ্জন দাস হয়েছিলেন 'সুদর্শনা' এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কাঞ্চীরাজ'। "বিরহ মধুর হ'ল আজি মধুরাতে," ও "পুষ্প ফোটে কোন্ কুঞ্জবনে" প্রভৃতি গান আমাদের কানে আজও বাজছে। গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে পারুলবনে, কিংবা দ্বিপ্রহরে অতিথিশালার উপরের ঘরে এই সব গান আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখে কতবার শুনেছি। একসঙ্গে পঞ্চাশটা গানও পরে পরে করতে তিনি আপত্তি করতেন না, ক্লান্ত হতেন না। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কণ্ঠমাধুর্য্য, তাঁর সৌন্দর্য্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। তিনি যেন ছিলেন কল্পতরু। তাঁর কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত; যা না চাওয়া যেত তাও যে কত তিনি দিয়েছেন বলা যায় না। কিশোর বয়সে মানুষের মনে দেবতা দর্শনের একটা ইচ্ছা অনেক সময় জাগে। আমরা যেন অকস্মাৎ মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন পেলাম। তাঁকে প্রণাম করে কখনও আশা মিটত না।

তখন থেকে কিছুকাল আমাদের জীবন যেন একটা উৎসব-লোকে ছিল। আমরা কলকাতায় ফিরে দিন গুন্‌তাম কবে আবার শান্তিনিকেতনে যাব আমাদের

উৎসব-পতির আমন্ত্রণে। 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'রাজা ও রাণী' ঋতুতে ঋতুতে একের পর এক স্রোতের মত চলেছিল। এক রাত্রির অভিনয়ের উপলক্ষ্য করে আমরা আস্‌তাম, কিন্তু যে কয়দিন থাক্‌তাম চলত যেন অহোরাত্রি উৎসব: গানে, গল্পে, পাঠে, ভ্রমণে মন্দিরের উপদেশবাণীতে কোথাও ফাঁক থাকৃত না।

এক দিকে তিনি যেমন শান্তিনিকেতনে আমাদের তীর্থক্ষেত্রের দেবতা ছিলেন, অন্য দিকে তিনি তেমনি ছিলেন যেন আমাদের ঘরের মানুষ। তিনি কলকাতায় এলেই জান্‌তাম যে আমাদের সমাজপাড়ার ছোট্ট বাড়ীতে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবেন। ঘরের মানুষের মতই আমাদের মা তাঁকে মিষ্টি মুখ করতে বলতেন এবং পাতে যেন কিছু না ফেলেন বলে অনুরোধ করতেন। তিনি সত্যই মা'র অনুরোধে সন্দেশের টুকরো পর্য্যন্ত ফেলতে পেতেন না।

আমাদের ছোট ভাই মুলুকে দুই বৎসর শান্তিনিকেতনে রেখে পড়ানো হয়েছিল। সেই সময় তাকে নিয়ে আমরাও শান্তিনিকেতনে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থাক্‌তেন 'দেহলী'র দোতলার ছোট্ট ঘরখানিতে। আমাদের খড়োঘর থেকে তাঁর ঘরখানি সোজা দেখা যেত। মাঝে ছিল একটি মাঠ ও পিয়ার্সন সাহেবের বাংলো। 'দেহলী'র সেই ছোট ঘরটিতে এতই কম জায়গা যে সেখানে রাত্রে বিছানা পাতলে চার পাশে একজনের হেঁটে বেড়ানোর বেশী জায়গা থাকৃত না। ঘরে পরদা থাকৃত না। রাত্রে দেখা যেত মেঝেয় পাতা বিছানার উপর একটি মশারি টাঙানো, কোণে একটি লণ্ঠন জলছে। কিন্তু সেই বিছানায় তাঁকে কখনও শুয়ে থাক্‌তে দেখি নি। আমরা যতক্ষণ জেগে থাকতাম দেখতাম হয় তিনি তাঁর ছাদে একটা ডেক-চেয়ারে বসে আছেন, নয় শালবীথির পথে ধীরে ধীরে পাইচারি করছেন।

সারাদিন তিনি কাজ করতেন হয় দেহলীর ফালির মত সরু বারাণ্ডায় বসে, নয় ছেলেদের ইংরাজী ক্লাসে কোনও গাছতলায়। সন্ধ্যাবেলা ছিল তাঁর ছাদে বিশ্রামের সময়। ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্ধকারে একটা mosquitol তেলের শিশি নিয়ে তিনি বসে থাকৃতেন, হাতে পায়ে মাঝে মাঝে মাখতেন। লেবুফুলের মত একটা মৃদুগন্ধ দূর থেকে পাওয়া যেত। এক এক করে দু-চার জন মানুষ সেই অন্ধকারেই ছাদে এসে জুট্‌তেন। আমরাই প্রায় প্রথমে আসতাম। চট্ করে তাঁর সামনে গিয়ে বস্‌তাম না যেদিন অন্য লোক থাক্‌তেন। তিনি তখনই হেসে বলতেন "আচ্ছা, মেয়েদের এই পিছনে বসার সাইকলজিটা কি তোমরা কেউ বলতে পার?"

তারপর সেখানে কত আলোচনা হ'ত, কখনও বা আমাদের শেলি পড়াতেন, কখনও সাধারণ ভাবে কাব্য বিষয়ে কত কথা বলে যেতেন, ছোট গল্প রচনায় উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন, "শেলি বায়রণ না পড়লে ইংরাজী সাহিত্যের আসল জিনিষই পড়া হয় না।" আবার বলতেন, "আমার ইচ্ছা করে তোমরা শাস্ত্রী-মশায়ের কাছে ভাল করে সংস্কৃত সাহিত্য পড়।" তখনও বিশ্বভারতীর সূত্রপাত হয় নি।

একদিন বললেন, "বল দেখি কোন্ কবির লেখা তোমার সব চেয়ে প্রিয়? বোলো না যেন হেমচন্দ্র।"

এই অন্ধকার আকাশের তলার সভায় মাঝে মাঝে অনেক হোমরা-চোমরা মানুষ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এসে জুট্‌তেন। তাঁরাও আমাদের মত আলসের উপর বসে পড়তেন যদিও আসন তাঁদের জন্য সর্ব্বদাই আনা হ'ত, কারণ অতিথিকে আসন দিতে ভৃত্যরা দেরি করলে তিনি সব চেয়ে বেশী চটে যেতেন।

নীচে ছেলেরা কোলাহল করতে করতে যেত, এক এক সময় উপর থেকেই তাদের কোনও কথার খেই ধরে তিনি সজোরে একটা জবাব দিতেন। ছেলেরা লজ্জিত হয়ে পলায়ন করত।

তিনি গাছপালা কত ভালবাসতেন একথা অনেকেই বলেছেন। আজ মনে পড়ছে আমাদের আশ্রমের বাড়ীর বারান্দার পাশের ছোট একটি পেয়ারা গাছকে। সেই গাছটি তখন উঁচুতে মাত্র দুই হাত হবে। কিন্তু সেই গাছ-টিরও খোঁজ তিনি যখন তখন করতেন। আমরা কলকাতা চলে গেলে গাছটি আরও কত বড় হ'ল তার খবর তিনিই সর্ব্বদা আমাদের দিতেন। সেই সময় 'দেহলী'র সামনে নিজে তদারক করে ছোট একটি গোলাপবাগান প্রথম করবার চেষ্টা তিনি করছিলেন।

এর কিছুকাল পরে আমি হঠাৎ ছবি আঁকবার চেষ্টা সুরু করেছিলাম। গগনবাবু আমাকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে যেতে উৎসাহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলতেন, "তুমি ত কম মেয়ে নও! এত দিন ছিলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, এখন আবার অবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টায় আছ!"

জীবনে তাঁর স্নেহের পরিচয় অনেক পেয়েছি। আমাদের বেদনায় তাঁর চোখে অশ্রুজল পর্য্যন্ত দেখেছি,

কিন্তু সে সব কথা কাগজে লেখবার নয়। আমরা তাঁকে নিজেদের কোনও বিশেষ আনন্দের সংবাদ দিতে ত্রুটি করলে তিনি কি গভীর অভিমান করতেন তারও পরিচয় পেয়েছি। দুঃখ হয় সে সব ত্রুটির কোনও প্রতিকার আজ আর করবার সাধ্য নেই।

বহুকাল পরে আবার সেই শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আমাদের যে শান্তিনিকেতনে পাকাবাড়ী ছিল না, বিজলী আলো ছিল না, কোন আয়োজনই ছিল না, কিন্তু যার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে তিনি ছিলেন, সে শান্তিনিকেতনকে মন খুঁজে বেড়ায়, পায় না। সেখানে শিশু সাহিত্যসভা থেকে আরম্ভ করে অধ্যক্ষ-সভায় পর্য্যন্ত তিনিই ছিলেন, স্নেহের পাত্রপাত্রীদের স্বহস্তে খাদ্য এনে তিনি খেতে দিতেন, রাত্রে গাড়ী ধরবার সময় লণ্ঠনহাতে করে এসে তিনি বিদায় দিতেন, রোগের সময় অন্য সকল কাজ ফেলে সারা দিন কাছে বসে 'জীবনস্মৃতি' শুনিয়েছেন। এখনও আড়ম্বরহীন জ্যোৎস্নারাত্রে মাধবী কুঞ্জে মাঝে মাঝে শিশুদের সভায় অকস্মাৎ যেন চমকিত হয়ে ফিরে দেখি, যেন মনে হয় তাঁর সাদা কালো ডোরা দেওয়া দীর্ঘ জোব্বা পরে জাপানী চটি পায়ে পিছনে দুটি হাত রেখে তিনি ধীরে সহাস্যে এসে দাঁড়ালেন, যেন নাম ধরে ডেকে উঠলেন। সে কি আমাদের বুভুক্ষিত মনের কল্পনা মাত্র?

বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

(১) জীবনের আনন্দ

বৈদিক আদর্শের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা জীবনকে পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সে গ্রহণ এত সহজ ও সতেজ যে, যাহারা ধর্ম্ম বলিতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও পরলোকে বিশ্বাস মনে করে, তাহারা বেদে বিশেষ কোনও নীতিই খুঁজিয়া পায় না। এ হিসাবে বেদ মধ্য-যুগীয় ধর্ম্মকল্পনার বহু দূরে অবস্থিত। তাহার ফলে এক দিক দিয়া যেমন তাহা সুপ্রাচীন, অপর দিক দিয়া তাহাকে কখন কখন অতি আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

ঋগ্বেদের ঋষি যখন বলিল,

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্

(ঋ. ৭।৬৬।১৬)

"আমরা যেন শতবর্ষ দেখি, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি",

তখন এমন একটা ভাবের অবতারণা করিল যাহা মধ্য-যুগীয় ধর্ম্মের কল্পনা অনুসারে প্রায় অধর্ম্মের সামিল। খৃষ্ট ধর্ম্ম বৈদিক আর্য্যের সগোত্র গ্রীক্‌দের মধ্যে সে রকম ভাব দেখিয়া তাহাকে "প্যাগান" (Pagan) আখ্যা দিয়াছে; ভারতীয় নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম দুঃখবাদ ও মায়াবাদের প্রভাবে ইহাকে "কর্ম্মকাণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

এ আদর্শ একবার নয়, বেদে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। যজুর্বেদ উপরোক্ত বাক্যকে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছে—

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র ব্রবাম শরদঃ শতম্
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।

(যজু ৩৬,২৪)

"আমরা যেন শতবর্ষ দেখি, শতবর্ষ বাঁচি, শতবর্ষ শুনি, শতবর্ষ বলি, শতবর্ষ সসম্মানে বাস করি। শতবর্ষাপেক্ষাও যেন বেশী বাস করি।"

অথর্ববেদও ঋগ্বেদের এ মন্ত্রকে বাড়াইয়া উদ্ধৃত করিয়াছে। (১৯,৬৭)

অপর এক মন্ত্রে অথর্ববেদ বলিয়াছে—

শতং জীবন্তঃ শরদঃ পুরূচী স্তিরো মৃত্যুং দধতা পর্বতেন।

(অ. ১২।২।২৩)

"দীর্ঘ এক শত বৎসর বাঁচিয়া মৃত্যুর সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা স্থাপন কর।"

যজুর্বেদেও এ মন্ত্র পাওয়া যায় (৩৫।১৫)

বেদ জীবনকে গ্রহণ করিবার আদর্শ দিয়াছে—

আরোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতিষ্ঠ—

(অ. ১২।২।২৪)

"জীবন (রথে) আরোহণ কর, জরাকে বরণ কর, যত আছ সকলে উদ্যমশীল হইয়া একের পর এক চলিতে থাক।"

উপরোক্ত মন্ত্রে শুধু দীর্ঘজীবন চাওয়া হয় নাই, গৌরব-ময় উদ্যমশীল জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হইয়াছে।

(২) শৌর্য্য, মন্যু

বেদে জীবনকে একটা কঠোর সংগ্রাম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সুতরাং জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ নীতি শৌর্য্য, বীরত্ব। জীবন বিঘ্নময়, বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইবে।

ঋগ্বেদ বলিয়াছে—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্॥

(ঋ. ১০।৫৩।৮)

"প্রস্তরসঙ্কুল (জীবন) নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ! সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও। উচ্চ শির হইয়া দাঁড়াও। (নদী) উত্তীর্ণ হও। যাহারা অকল্যাণপন্থী তাহাদিগকে এখানে ত্যাগ করিব। আমরা (নদী) উত্তীর্ণ হইয়া কল্যাণময়ী শক্তি লাভ করিব।"

যজুর্বেদে এ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে (৩৫।১০)

অথর্ববেদ এ মন্ত্রের ভাবকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছে—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং প্র তরতা সখায়ঃ।

(অ. ১২।২।২৬)

"প্রস্তরসঙ্কুল (জীবন) নদী বহিয়া চলিয়াছে।—বন্ধুগণ! সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মত চল। (এ নদী) উত্তীর্ণ হও।"

কথাটাকে পুনরুক্তি করিয়া আবার বলিয়াছে—

উত্তিষ্ঠতা প্রতরতা সখায়ো
অশ্মন্বতী নদী স্যন্দত ইয়ম্।

(অঃ ১২।২।২৭)

"ওই প্রস্তরসঙ্কুল (জীবন) নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ, উঠিয়া দাঁড়াও, উত্তীর্ণ হও।"

উপরের ভাবকে অন্যকথায় বলা হইয়াছে—

অতিক্রামন্তো দুরিতাং পদানি
শতং হিমাঃ সর্ববীরা মদেম

(অ. ১২।২।২৮)

"আমরা যেন সমস্ত ক্লেশকর স্থান অতিক্রম করিয়া শতবর্ষ আমাদের সমস্ত বীরগণের সহিত আনন্দে অতিবাহিত করি।"

যজুর্বেদে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে দৈব-শক্তি, শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য—

"তুমি তেজ স্বরূপ, আমাকে তেজ দাও,
তুমি বীর্য্য স্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দাও,
তুমি বল স্বরূপ, আমাকে বল দাও,
তুমি ওজঃ স্বরূপ, আমাকে ওজঃ দাও,
তুমি মন্যু স্বরূপ, আমাকে মন্যু দাও,
তুমি সাহস স্বরূপ, আমাকে সাহস দাও।"

(যজু. ১৯।৯)

অথর্ববেদেও এ মন্ত্র পরিবর্ত্তিতরূপে পাওয়া যায়।

(অ. ২।১৭)

বেদে মন্যু শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। "মন্যু"র অর্থ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষ। মন্যুর প্রেরণায় মনুষ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ঋগ্বেদে মন্যু-দেবতার উদ্দেশে সূক্ত রচিত হইয়াছে। এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"হে মরুৎ বেষ্টিত মন্যু! তোমার সঙ্গে রথস্থ হইয়া আমাদের উল্লসিত, বেগবান্, তীক্ষ্ণ বাণধারী, অস্ত্র শাণিতকারী অগ্নিরূপী নরেরা সম্মুখে অগ্রসর হোক।" (ঋ. ১০।৮৪।১)

বেদের মানব জয়িষ্ণু। বেদে "জিষ্ণু" (জয়াকাঙ্ক্ষী) ও অন্যান্য জয়বোধক শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ব-বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রে জয়ের আদর্শকে বিশেষ শক্তির সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে—

"আমি শূর। ভূতলে আমার নাম শ্রেষ্ঠ। আমি জেতা, আমি বিশ্বজেতা, আমি দিকে দিকে জয় লাভ করি।" (অ. ১২।১।৫৪)

(৩) পার্থিব গৌরব

বেদের কবি এই সংগ্রামময় শৌর্য্যপূর্ণ কঠোর সুন্দর পৃথিবীকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে—

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামা ক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ
সা নো ভূমিঃ প্র নুদতাং সপত্নান সপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু॥

(অ. ১২।১।৪১)

"যাহাতে মানবেরা কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে; যাহাতে (তাহারা) যুদ্ধ করে; যাহাতে রণগর্জ্জন হয়, দুন্দুভি বাজে;—সে ভূমি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া, আমাদিগকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুক।"

শৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর মৃত্তিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছে—

বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং
পৃথিবী মিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজিতো হতো অক্ষতো ধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্।

(অ. ১২।১।১১)

"বাদামী, কাল, লাল, সর্ব্ব রকমের ভূমির উপর—দেব সংরক্ষিত পৃথিবীর উপর—আমি অজিত অহত অক্ষত থাকিয়া দাঁড়াইয়াছি।"

পৃথিবী মাতা, মানুষ তাহার পুত্র—

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।

(অ. ১২।১।১২)

(৪) কল্যাণ, শিব-সংকল্প

বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই, এক দিকে যেমন জড়কে কাব্যরস দ্বারা আপ্লুত করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, অপর

দিকে চেতনাকে জাগ্রত করিয়া সে গ্রহণকে কল্যাণময় করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। এক দিকে যেমন শত বর্ষ দেখিবার বাঁচিবার শুনিবার বলিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হইয়াছে, অপর দিকে বলা হইয়াছে—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ (ঋ. ১।৮৯।৮)

"হে পূজ্য দেবগণ, আমরা যেন কান দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা শুনি; আমরা যেন চক্ষু দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি।"

সামবেদ ও যজুর্বেদ এ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। (সাম বেদের সর্ব্ব শেষ-পূর্ব্ব মন্ত্র; যজু. ২৫।২১)

জীবনের জন্য স্থির কল্যাণের পথ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—

স্বস্তি পন্থা মনু চরেম সূর্যাচন্দ্র মসাবিব। (ঋ. ৫।৫১।১৫)

"কল্যাণের পথে সূর্য্য চন্দ্রের মত চলিব।"

নীতির ভিত্তি চিত্তের শুভেচ্ছার উপর। মনের ইচ্ছা যাহাতে কল্যাণকর হয় সে জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (যজু. ৩৪।১-৬)

যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে
তন্মে মনঃ শিব সংকল্পমস্তু। (৩)

"যাহা ভিন্ন কোন কর্ম্ম করা যায় না, আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত হোক।"

যে উচ্চ বুদ্ধি বা ধী—শিবের, কল্যাণের পথ দেখায়, সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে সেই ধী শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(৫) ঋত, সত্য

বেদের মতে সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলে সত্য, ন্যায়। সত্য শাশ্বত। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা সত্যে—

সত্যে নো স্তভিতা ভূমিঃ (অ. ১৪।১।১)
"সত্য দ্বারা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা।" (ঋ. ১০।৮৫।১)

ঋগ্বেদ বলে সৃষ্টির প্রথমে সত্য ও ঋতের উদ্ভব হইয়াছে—

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধা ত্তপসো হধ্যজায়ত
(ঋ. ১০।১৯০।১)

সৃষ্টির প্রথমে "পরিপূর্ণ তপ হইতে ঋত ও সত্যের উদ্ভব হইয়াছিল।"

মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে থাকিয়া—

সত্যং বৃহৎ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম
যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং
পৃথিবী নঃ কৃণোতু।
(অ, ১২।১।১)

"সত্য, বৃহৎ ও কঠোর ন্যায়, দীক্ষা তপ, জ্ঞান, ত্যাগ—এসকল পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে। সেই ভূত ভবিষ্যতের স্বামিনী পৃথিবী আমাদের জন্য প্রচুর স্থান করুক।"

(৬) ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ

সত্য ও ঋতকে জীবনে নিয়মবদ্ধভাবে পালন করার নাম ব্রত। নিম্নের মন্ত্রে ব্রতের সংকল্প প্রকাশ করা হইয়াছে—

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং
তন্মে রাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি॥
(যজু. ১।৫)

"হে ব্রতপতি দেব! আমি ব্রত পালন করিব। তজ্জন্য আমাকে শক্তি দাও। সাফল্য দাও। আমি এখন অনৃত হইতে সত্যে যাইতেছি।"

বেদাধ্যয়নের অবস্থায় যে ব্রত গ্রহণ করা হইত, বেদে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মচর্য্য। ইহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা লাভ ও চরিত্র গঠনের উপায়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা উচ্চ স্তরের যোগ্যতা অর্জ্জন করা হয়। অথর্ব্ববেদ বহু মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মচারীর গৌরব ঘোষণা করিয়াছে (১১।৫)।

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি (১৭)
"ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারা রাজা রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে।"
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যু মপাঘ্নত। (১৯)
"ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যাদ্বারা দেবেরা অমর হইয়াছে।"

বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়ন শুধু পুরুষের জন্যই ছিল না, নারীর জন্যও ছিল—

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্ (১৮)
"ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা কন্যা যুবা পতি লাভ করে।"

অথর্ব্ববেদের ঋষি পৃথিবীর সৌরভের বিষয় বলিতে গিয়া কুমারীর জ্ঞানের জ্যোতির ("কন্যায়াং বর্চো যৎ") উল্লেখ করিয়াছে।

(অ ১২।১।২৫)

ব্রত দ্বারা কি ভাবে সত্য লাভ হয় যজুর্ব্বেদ তাহার একটা ক্রমিক বিবরণ দিয়াছে—

ব্রতেন দীক্ষা মাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥
(১৯।৩০)

"ব্রতদ্বারা দীক্ষালাভ হয়, দীক্ষাদ্বারা দক্ষিণা লাভ হয়, দক্ষিণাদ্বারা শ্রদ্ধা লাভ হয়, শ্রদ্ধাদ্বারা সত্য লাভ হয়।"

বেদে শুধু ব্রহ্মচর্য্যকেই ব্রত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই, গার্হস্থ্যকেও ব্রত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে একদিকে বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম গার্হস্থ্য-বিরোধী চির-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ দ্বারা বেদের বিরোধিতা করিয়াছে; অপর দিকে বৈষ্ণবাদি পন্থা পরকীয়া-প্রেম-সম্পর্কিত কল্পনাবাহুল্য দ্বারা বেদপন্থীর বিরাগভাজন হইয়াছে। সেরূপ "বাম" মার্গীরা সরল ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্যের সুনিয়ন্ত্রিত পন্থা ত্যাগ করিয়া অবৈদিক আখ্যা লাভ করিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে শুধু ভারতীয় পন্থাবিশেষের সঙ্গে বৈদিক আদর্শের বিরোধ লক্ষিত হয় তাহা নহে; আর্য্যেতর সেমিতিক (Semitic) সভ্যতার সঙ্গেও বিশেষ মতান্তর দৃষ্ট হয়। বৈদিক আর্য্য যেমন জগৎকে ও জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেরূপ জীবনের প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের নিয়মাধীন করিয়া পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু সেমিতিক সভ্যতা তাহা করে নাই। মানুষের যৌন জীবন সম্বন্ধে এ দুই সংস্কৃতিতে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেমিতিক খৃষ্টানের কাছে যৌন জীবন পাপের পর্য্যায়ভুক্ত। আর্য্য তাহাকে ব্রতের ও ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়াছে।

যৌন জীবনের প্রতি বেদের সরল নির্ম্মল ভাব প্রবল মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় দেয়। ঋগ্বেদে ঘোষা বিবাহের পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতেছে—

"আমি যেন স্বামীর প্রিয় হইয়া গৃহে যাইতে পারি।"

(ঋ. ১০।৪০।১২)

সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রার্থনা করিতেছে—

"আধত্তং রয়িং সহবীরং" (ঋ. ১০।৪০।১৩)

"বীর পুত্র সহ ঐশ্বর্য্য দাও।"

নববধূকে জ্যেষ্ঠেরা বীরপ্রসূ হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। (ঋ. ১০।৮৫।৪৪)

ঋগ্বেদে ইন্দ্রাণী ঋষি যখন প্রার্থনা করে—

"পতিং মে কেবলং কুরু" (ঋ. ১০।১৪৫।২)

"আমার পতিকে শুধু আমার কর।"

তখন আমরা সরল মনুষ্য হৃদয়ের স্পর্শ পাই।

ঋগ্বেদ দেবতাকে "অনবদ্যা পতিপ্রিয়া নারী"র সঙ্গে তুলনা করিয়া (ঋ. ১।৭৩।৩) "কন্যার প্রেমিক" "পত্নীর পতি" বলিয়া অভিহিত করিয়া (ঋ. ১।৬৬।৪) নারীপুরুষের সম্বন্ধকে ও গৃহস্থাশ্রমকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

অথর্ব্ব বেদের কবি বিবাহের অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছে—

"হে পৃথিবী, তোমার যে গন্ধ নীলোৎপলে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা সূর্য্যার বিবাহে সংগৃহীত হইয়াছিল—সেই অমর্ত্ত্য গন্ধ যাহা আদিতে বিদ্যমান ছিল—সে গন্ধ দ্বারা আমাকে সুরভি কর।"

(অ. ১২।১।২৪)

যজ্ঞ নীতির দিক দিয়া ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে। যজুর্ব্বেদ প্রার্থনা করিয়াছে—

"আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্...যজ্ঞোযজ্ঞেন কল্পতাম্" —"জীবন যজ্ঞ দ্বারা সাফল্য লাভ করুক...যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বারা সাফল্য লাভ করুক।" (৯।২১)

শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছে—

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর। (যজুঃ ৪০।১)

(৭) একতা, সমতা

বেদের নীতি শুধু ব্যক্তিমূলক নয়, সমষ্টিমূলক। নানা দিক দিয়া ঐক্যের মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রী ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছে—

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ (ঋ. ১০।৮৫।৪৭)

"দেবতা আমাদিগকে একতা বদ্ধ করুন, দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় এক করুন।"

পরিবারকে একতার মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে—

"আমি তোমাদিগের মধ্যে সমহৃদয়, সমচিত্ততা, অবিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে চাই। একে অন্যকে স্নেহ করিবে।"

"পুত্র পিতার অনুব্রত হইবে, মাতার সহিত একমনা হইবে, জায়া পতিকে মধুময় শান্তিপূর্ণ বাক্য বলিবে। ভাই ভাইকে বোন বোনকে দ্বেষ করিবে না। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া, সব্রত হইয়া, কল্যাণের সহিত বাক্য বলিবে।" (অ. ৩।৩০)

সমাজকে একতার মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে—

সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্

(ঋ. ১০।১৯১।২)

"একত্রিত হও, একত্র সম্ভাষণ কর, তোমাদের মনের ঐক্য হোক।"

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী (ঋ. ১০।১৯১।৩)

"তোমাদের এক মন্ত্র হোক, এক সমিতি হোক।"

বেদের আদর্শ মতে সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ হইবে। রাষ্ট্রের যথোচিত সংগঠন, পরিচালন ও সংরক্ষণ আবশ্যক। এ জন্য সমাজে পর্য্যাপ্ত ক্ষাত্র শক্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। সে শক্তি বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতি ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে কার্য্য করিবে। যজুর্ব্বেদে "জিষ্ণু রথেষ্ঠা ও সভেয় যুবা"— "বিজয়কামী রথী ও সভার উপযুক্ত যুবা"র জন্য—প্রার্থনা করা হইয়াছে যজু. ২২।২২)। অপর এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো (যজু ১৬।২৪)

"সভা সকলকে নমস্কার, তোমরা সভাপতিগণকে নমস্কার।"

ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে (১০।৭১।১০) বলা হইয়াছে—

"সকলে সভাবিজয়ী যশস্বী সখা দ্বারা আনন্দিত হয়।"

সর্ব্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।

ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য বাস করে না, সমষ্টির জন্য বাস করে; স্বার্থ পাপ—

কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী (ঋ. ১০।১১৭।৬)

"যে শুধু নিজে আহার করে সে শুধু পাপ অর্জ্জন করে।"

আর এক মন্ত্রে বলিয়াছে—

"যে সৎসঙ্গীকে ত্যাগ করে, তাহার বাক্যেও কল্যাণ নাই।"

(১০।৭১।৬)

শুধু নিজে সন্মার্গ অবলম্বন করিলে চলিবে না, অপরকেও অবলম্বন করাইতে হইবে। ঋগ্বেদের ঋষি প্রার্থনা করিয়াছে —"পবমান সোম" যেন "ঋতস্য ধারয়া", সত্যের ধারায়, চলিয়া যায়—

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

"সকলকে আর্য্য (সুসভ্য) করিতে করিতে,"

এবং যেখানে তাহা সম্ভব নয় সেখানে—

অপস্নন্তো অরাবঃ (ঋ. ৯।৬৩।৫)
"দুষ্টকে দমন করিতে করিতে।" *

বেদের কল্যাণময়ী বাণী বিশ্বের সকলের জন্য দেওয়া হইয়াছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ
স্বায় চ চারণায় চ। (যজু. ২৬।২)

"আমি এই কল্যাণময় বাক্য জনতাকে বলিতেছি—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে, শূদ্রকে, বৈশ্যকে, স্বজাতীয়কে বিজাতীয়কে।"

(৮) বিশ্বকল্যাণ, বিশ্বমৈত্রী

বেদের বহু মন্ত্র আছে যাহাদের প্রারম্ভ স্বস্তি (মঙ্গল) বা শম্ (কল্যাণ) দিয়া; সে সকল মন্ত্রে বিশ্ব চরাচরের কল্যাণ প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে রকম, "শান্তি" মন্ত্রদ্বারা জড়ে চেতনে বিরাট্ শান্তির কল্পনা করা হইয়াছে (যজু. ৩৬।১৭)। তাহা ছাড়া "শিব" (মঙ্গল), ভদ্র (কল্যাণ) প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নানাভাবে কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। নিম্নের মন্ত্রে সর্ব্বভূতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে—

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে। (যজু. ৩৬।১৮)

"সর্ব্বভূতে আমাকে মিত্রের চক্ষে দেখুক; আমি যেন মিত্রের চক্ষে সর্ব্বভূতকে দেখি। উভয়ে যেন পরস্পরকে মিত্রের চক্ষে দেখি।"*

মৈত্রী ভয়হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং যেখানে অভয় শুধু সেখানেই মৈত্রী হইতে পারে। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছে—

অভয়ং মিত্রা দভয় মমিত্রাদ ভয়ং জ্ঞাতাৎ
অভয়ং পুরো যঃ। অভয়ং নক্তং অভয়ং
দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

(অ. ১৯।১৫।৬)

"মিত্রকে যেন ভয় না করি, শত্রুকে যেন ভয় না করি। জ্ঞাতকে যেন ভয় না করি, যাহা সম্মুখে (ভবিষ্যতে) আছে তাহাকে যেন ভয় না করি। রাত্রি ভয়শূন্য হোক, দিবা ভয়শূন্য হোক। সমস্ত দিক আমার মিত্র হোক।"

(৯) দ্বিবিধ আদর্শ—জ্ঞানের ও শৌর্য্যের

স্থূলতঃ দেখা যায় বেদে দুই আদর্শের সমাবেশ হইয়াছে। এক শৌর্য্যের তেজের, অপর ব্রতের জ্ঞানের; এক সংগ্রামের, অপর শান্তির। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে, এক বীরের আদর্শ, অপর ঋষির আদর্শ; এক ক্ষত্রিয়ের, অপর ব্রাহ্মণের। বেদের মতে বর্চ্চস্বী ব্রাহ্মণ ও তেজস্বী ক্ষত্রিয় লইয়া সমাজ সংগঠিত হইবে—

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্, আরাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো হতিব্যাধী মহারথো জায়তাম (যজু. ২২।২২)

"হে ব্রহ্মন্, রাষ্ট্রে ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করুক, বাণনিপুণ বর্ষানিপুণ মহারথ বীর ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করুক।"

জ্ঞান ও শৌর্য্যের সমাবেশদ্বারা সমাজের শক্তি লাভ হয়।

"যেখানে ব্রহ্ম (জ্ঞান) ও ক্ষত্র (শৌর্য্য) ঐক্যের সহিত একত্র চলে, তাহা পুণ্যলোক।" (যজু. ২০।২৫)

বেদ এক দিকে স্বস্তি শান্তি শিবের পথে শান্ত অদ্বৈতে গিয়া পৌছিয়াছে—সেই পরম সত্তার সন্ধান পাইয়াছে—

যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্

(যজু. ৩২।৮)

"যাহাতে বিশ্ব এক নীড়ে পরিণত হয়;"

অথবা অথর্ব্ববেদের কথায়—

"ভবত্যেক রূপম্," একরূপ হইয়া যায়। (২।১।১)

অপর দিকে সংগ্রাম ও শৌর্য্যের পথে রণাঙ্গনের মন্যুময় বিজয়ী দেবতাকে ঘোষণা করিয়াছে ও তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য মনুষ্যকে আহ্বান করিয়াছে—

গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্ত মজ্ম
প্রমৃণন্ত মোজসা
ইমং সজাতা অনুবীরয়ধ্ব মিন্দ্রং সখায়ো
অনু সংরভধ্বম্॥

(ঋ. ১০।১০৩।৬)

"গোত্রভিদ্ গোবিদ্ বজ্রবাহু সেনাজয়ী, শৌর্য্যবলে সেনানাশী দেবের অনুসরণ করিয়া, হে বন্ধুগণ, বীরের মত চল, সমবেত শক্তিতে অগ্রসর হও।"

যজুর্বেদ (১৭।৩৮) ও সামবেদ (উত্তর, ৯।৩।২) এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। অথর্ববেদ (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপে এ মন্ত্রের করিয়াছে। (১৯।১৩।৬)

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া শুধু কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বেদের বাণী সংরক্ষিত হইয়াছিল। সে বাণীর মধ্যে নীতির দুই সুর—এক শান্তির, অপর শৌর্য্যের। যুগে যুগে একদিকে শান্তির স্বস্তির ভদ্রের শিবের শমের বাণী ধ্বনিত হইয়াছে; আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে উঠিয়াছে শৌর্য্যের শক্তির তেজের বাণী—

"উত্তিষ্ঠত," "বীরয়ধ্বম্," সংরভধ্বম্"—

"শির উন্নত করিয়া দাঁড়াও," "বীরের মত চল," "সমবেত শক্তিতে অগ্রসর হও।"

* গ্রিফিথ "তাড়াইয়া দেওয়া" অর্থ করিয়াছেন।

* বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই মৈত্রীর আদর্শ বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছে। বুদ্ধের জীবনে মৈত্রীর সঙ্গে অভয়ের আদর্শও পূর্ণরূপে স্থান পাইয়াছিল।

নিরুপমা

শ্রীমনোজ বসু

নিরুপমার কথা এক-এক দিন মনে পড়ে। যাবার দিনে চোখের জল ফেলেছিল। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তা হ'লে!

তখন শ্যামবাজারে এক গলির মধ্যে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই গলির একটা বিশেষ বাড়ির কাছাকাছি আমাদের দু-এক জনের থাকার দরকার। মাপ করো ভাই, আজকের এই গণ্ডগোলের দিনে এর বেশী কিছু বলতে পারব না। মোটের উপর সকাল-সন্ধ্যা খোঁজা-খুঁজির বিরাম ছিল না, কিন্তু গলির লোকগুলো অকস্মাৎ যেন বিষম বড়লোক হয়ে উঠেছে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার গরজ কারও নেই। ঘর পেলাম না, কিন্তু পেয়ে গেলাম নিরুপমাকে।

মেয়েটিকে এক নজর মাত্র দেখলাম। লম্বা-চওড়া গড়ন। তখন সন্ধ্যাবেলা, মই ঘাড়ে ক'রে মিউনিসিপ্যালিটির লোক গ্যাস জ্বেলে জ্বেলে বেড়াচ্ছিল। বটতলায় সিঁদুরমাখা অনেকগুলো পাথর—তারই সামনে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। বাড়ি ঢুকে কোন দিকে না চেয়ে সে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

মাথায় এক মতলব এসে গেল। মেয়েটিকে যদি দলে টানতে পারি, ঘর না পেলেও চলবে। পিছু নিলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। এক দিন কলেজ-ফেরতা সে গটমট ক'রে চলেছে, আমি খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে যাচ্ছি। গলিতে ঢুকে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে আমি মোড় ফিরে যেই ঢুকেছি—দেখি, একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চুপ ক'রে নিরুপমা দাঁড়িয়ে আছে আমারই অপেক্ষায়। একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি—রক্ষার মধ্যে হাতে কিছু নেই খান দুই-তিন মোটা বই ছাড়া।

—তুমি পিছু নিয়েছ কেন?

আমি বললাম—পথ কি কারও একলার?

—বল কি জন্যে—

—ভদ্রলোককে যেভাবে অনুরোধ করতে হয়, সেই ভাবে বলুন তবে জবাব দেব।

—আপনি ভদ্রলোক?

—কি রকম ফিটফাট জামা-কাপড় প'রে আছি, ভদ্রলোক মনে হয় না? দেখুন না—চেয়ে দেখুন একবার—

নিরুপমা মুখ একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক বারই সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে—দেখা বললে ঠিক হয় না, দৃষ্টি দিয়ে আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে—বাংলা দেশ কি না···আপনাদের তাই ভদ্রলোক বলে।

—সব দেশেই আমরা ভদ্রলোক। অসহায় মেয়েকে সঙ্গে ক'রে বাড়ি এগিয়ে দিচ্ছি, এ কাজ বীর ধর্ম্মের কোঠায় পড়ে, জানেন

—আমি অসহায়?

—নিশ্চয়। একলা চলেছেন, বিশেষ ত অস্ত্রশস্ত্র দেখছি নে। ধরুন, যদি কেউ আপনার একখানা হাত চেপে ধরে—

মুখ ফেরাল নিরুপমা। বলে—আমি চেঁচিয়ে উঠব। এ আমাদের পাড়া—এতটুকু বয়স থেকে এখানে মানুষ—

—তার আগে যদি মুখ বেঁধে ফেলে! হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলার এই চাদরটার মত একটা কিছু দিয়ে মুখ বাঁধা ত শক্ত কিছু নয়।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে যায়।—আপনার মতলব কি?

আমি হেসে বললাম—আর যাই হোক, মুখ বাঁধা কিংবা হাত ধরাধরির জন্য চারটে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম না।

তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলে—আসবেন?

—না।

—ভয় করছে?

আমি বললাম—ভয়ের নমুনা দেখলেন কিছু? রণে আর প্রেমে ভয় করলে চলে না।

এবার সে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। অসাধারণ

মেয়ে—এই প্রথম আলাপে টের পেলাম। বলে—ইস্, অবস্থা সাংঘাতিক ত!

—কিন্তু প্রেম নয়।

—তবে বুঝি রণ? কার সঙ্গে—আমারই সঙ্গে নাকি?

—প্রথম আলাপে না-ই শুনলেন সে কথা। কাল বিকালে আবার আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

পরদিন দেখা হ'ল। তার পর দিনও। মনে রাখবেন, সেটা পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি ঢের বেশী ছিল। এক ধরণের কাজ মেয়েদের দিয়ে ভাল হয়, আমাদের মধ্যে দুই-চারিটি মেয়ের দরকার, পথেঘাটে তাই ঐ রকম ওৎ পেতে থাকতে হ'ত। নিরুর বাড়ির সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে একেবারে আশাতীত। দুই ভাই আর বোনটি—তিন জন মাত্র। ছোট ভাই নাবালক, ধর্তব্যের মধ্যে নয়—আর বড় জন হলেন সরোজ পাকড়াশি—

—আমাদের সরোজ? কুন্তল-দা বললেন—সরোজের বোন, তাই বলো। অমন ইস্পাতের মেয়ে যেখানে সেখানে পেয়ে যাবে, আমি ত অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

—আপনার সরোজকে আমরা দেখি নি ত।

কুন্তল-দা বললেন—দেখবে কি ক'রে? ক'টা দিনই বা জেলের বাইরে থাকে!

একটু স্তব্ধ থেকে বলতে লাগলেন—হতভাগাটা বলে কি জান? ছটা মাস থাকতে দিক, তুড়ি মেরে দেশ স্বাধীন করব। তা কর্তারা ছ'টা দিনও তাকে বাইরে রেখে স্বস্তি পান না।...বেশ হয়েছে, ছোট ভাইটিকে তাহলে বোর্ডিঙে পাঠাতে বল—নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে লাগুক।

—কিন্তু মোটে আমাদের আমলই দেয় না, কুন্তল-দা—

বস্তুত নিরুপমা জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। বলে—মিথ্যা কথা, আপনাদের সব ধাপ্পাবাজি—আমি এক তিল বিশ্বাস করি নে

আমি বলি—এমন সব ঘনিষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করলে নিরু, এর মধ্যে এতখানি প্রত্যাশা করি নি।

নিরু কালো বড় বড় চোখ দুটি মেলে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে বলল—বেশ, নিয়ে আসুন এক দিন কুন্তল-দাকে। আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন রইল। তিনি নিজের মুখে বলবেন—

ঘাড় নেড়ে বলি—এখন তা হ'তে পারে না।

—কেন? কলকাতায় নেই? কোথায় তিনি?

—সরোজের বোনকে এটাও কি বোঝাবার দরকার, যে এ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই?

নিরুর উচ্ছ্বাস থেমে যায়। লজ্জিত হয়ে সে চুপ করল।

আমি বললাম—এত সহজে কুন্তল-দাকে দেখা যায় না।

—কি করতে হয়?

—সাধনা। দেখছ না, সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন।

—আমি ত সরকারের কেউ নই!

—অতএব এক দিন দেখা পাবে, নিশ্চয় পাবে। তাঁর কাজে লেগে যাও—

নিরু বলল—অন্তত এক ছত্র হুকুম চাই তাঁর হাতের।...মানে, তাঁকেই মানি, একমাত্র তাঁকে। আপনাদের কাউকে নয়।

কুন্তল-দা সেই সময়টায় শহরের প্রান্তে একতলার এক তুলার গুদামের পাশে বইয়ের গাদার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন। এক ধুনুরির গুদাম সেটা, ধুনুরি আমাদেরই এক জন। সে ঘরে যে মানুষ থাকে, বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিল না। এক দিন ক'জনে একত্র হয়েছিলাম। কুন্তল-দা বললেন—নেমন্তন্ন করেছে, তা যাই না কেন—এক দিন ভালমন্দ খেয়ে আসি।

সবাই প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ে। না—না—না—

তিনি হেসে বললেন—হিংসুটের দল তোমরা, আমার ভাল কি দেখতে পার?...দাও তবে, এক টুকরো কাগজই দাও—

এবং তৎক্ষণাৎ সুরু করলেন—শ্রীচরণাম্বুজেষু

আমরা হেসে উঠতে কুন্তল-দা কলম তুলে বলেন—কি হ'ল কি তোমাদের?

—ও কি লিখছেন? সতের-আঠার বছরের একরত্তি একটা মেয়ে যে নিরুপমা।

চিঠি নিরুপমার কাছে পৌঁছল। তার পর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। বলে—দেখুন যদু-দা, খাতিরটা দেখুন একবার। আমি হলাম শ্রদ্ধাস্পদা। কুন্তল-দার সার্টিফিকেট—অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা করবেন। বুঝলেন ত?

আবার বলে—আপনাদেরও এই রকম লেখেন নাকি?

আমি বললাম—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাই নি, সে ভাগ্য হবে কোত্থেকে?...বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে দেশ দেখেছেন ওঁরা—অনাত্মীয় মেয়ের ঐ একটি মাত্র মূর্তি ওঁদের কাছে।

মোটের উপর, যা চেয়েছিলাম—হ'ল। নিরুকে পাওয়া

হ'ল।···এখন সে বেঁচে নেই। আহা, যদি থাকত! তুমি আমি সকলে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছি, এ সমস্ত দেখে কত উৎসাহ হ'ত তার! তার নির্ভীকতা তখনকার দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মাস-আস্টেক পরে এক দিন আমাদের আস্তানায় সে যেন আকাশ ফুঁড়ে উদয় হ'ল। অনেক রাত্রি, ছাতের উপর অল্প অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কথাবার্ত্তা হচ্ছিল—সব বন্ধ হয়ে গেল। কোথা থেকে কি ক'রে জানল, কে-ই বা দুয়োর খুলে দিল! তার পর দেখি, নবীন পিছনে রয়েছে।

নিরু জুতো খুলতে খুলতে সকলকে এক নজর দেখল। তার পর কুন্তল-দা'র পায়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে—কেমন যদু-দা, চিনতে পেরেছি কি না বলুন—

আমি বললাম—আগে দেখেছিলে?

নিরু বলে—কক্ষনো নয়। সূর্য্যকে কি চিনে রাখতে হয়? হাজার লোকের মধ্যে ওঁকে বেছে নিতে এক মিনিটও লাগে না—

কুন্তল-দা বললেন—সর্ব্বনাশ, বল কি গো! ভয় ধরিয়ে দিলে।

নিরু বলে—আপনার ভয় আছে নাকি?

আমি বলি—ওঁর নেই, আমাদের আছে।···শুনে রাখলেন ত? অতএব ঘর থেকে আপনার মোটে বেরুনো চলবে না—এক পা-ও নয়—

কুন্তল-দা বললেন—কেন, বেরুলে হবে কি?

—ধরে নিয়ে জেলে আটকাবে।

—তোমরাই বা কি এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছ!··· নিরু, জানিস নে বোন—জীবনে এরা ঘেন্না ধরিয়ে দিল। কোন কাজ করতে দেবে না, কোথাও যেতে দেবে না—এ রকম বেঁচে লাভ কি?

নিরুপমা কুন্তল-দার পায়ের কাছে ব'সে পড়ল। আমরা এদিকে রাগে জ্বলছি। কুন্তল-দা না থাকলে সেইখানেই নবীনের টুঁটি চেপে ধরতাম। আমরা এত সাবধান ক'রে মরি, আর হতভাগা মেয়েটাকে এনে জোটাল এই জায়গায়! চোখ-ইসারায় নবীনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি, দেখি কুন্তল-দাও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—নবীনের দোষ কি?

—ওঃ, আপনি ব'লে দিয়েছিলেন?

কুন্তল-দা রাগত ভাবে ব'লে উঠলেন—না ব'লে উপায় ছিল? যত সব বদরাগী মানুষ নিয়ে দল গড়বে, দোষের বেলায় নবীন আর কুন্তল-দা।

নিরুপমার কানে যেতে সে মাথা নীচু করল। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি, ইতিমধ্যে কি এমন ঘটে গিয়েছে যার জন্য তাড়াতাড়ি কুন্তল-দা নবীনকে পাঠালেন, রাত্রিবেলা সবাই আসবে—সেটুকুও সবুর সইল না!

আবার ব'সে পড়ে তিনি নিরুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—দুঃখ পাচ্ছ কেন বোন, তোমার দোষ কি? তুমি কেবল থানা অবধি গিয়েছিলে, আমরা হ'লে মহানন্দটাকে শেষ ক'রে ফেলতাম।

নিরু জিজ্ঞাসা করে—আপনি মানুষ মারতে পারেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দার কানে ঢুকল না, তিনি ব'লে চলেছেন। আমি বলি—এ সব কথা কেন, নিরু? ছিঃ—

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে—উনি মোটে পারেনই না, আমি বলে দিচ্ছি। এত যাঁর স্নেহ—

কুন্তল-দা বললেন—তুমি পার?

—মানুষ পারি না, জানোয়ার পারি। অন্তত পারা উচিত।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিরুপমা বলতে লাগল—এক দিন এ দেশে জানোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। মা-বোনেরা স্নেহ দিয়ে পালন করেছিল তাদের। স্নেহ না দিয়ে মুখে বিষ তুলে দিলে ঠিক হ'ত। তা হলে আজকের এ রকম দিন আসত না। সেই রকম জানোয়ারের একটা হচ্ছে আপনাদের মহানন্দ—

কুন্তল-দা বললেন—মহানন্দ ত আমাদের নয়—

আমি বললাম—বিশ্বাস করতে চায় না কুন্তল-দা, আমার সঙ্গে কি তর্ক!

মহানন্দের সঙ্গে ইস্কুলে কিছু দিন পড়েছিলাম। সেই থেকে আমাদের দু-এক জনের সঙ্গে তার অল্প অল্প পরিচয়। তাই নিয়ে মহানন্দ গালগল্প ক'রে বেড়াত। নিরুদের সঙ্গে দূরসম্পর্কের কি রকম একটু আত্মীয়তা ছিল। সেই দিন সকালবেলা নিরু আমাকে খুব জেরা করছিল—আপনি যে বলেন, কুন্তল-দা এখানে নেই।

—ছিলেন না। এসেছেন ক'দিন হ'ল।

—মিথ্যে কথা। তিনি বরাবর রয়েছেন। মহানন্দ-কাকা বললেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি—সর্ব্বনাশ! ওর সঙ্গে এই সব কথা হয় নাকি? বাজে লোক।

নিরুপমা বলে—বাজে লোক হ'লে কুন্তল-দা নিয়েছেন ?

—কুন্তল-দা তাকে চেনেনই না।

—বল কি ? কুন্তল-দা গয়না চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে চিঠি পর্য্যন্ত রয়েছে—

—গায়ে পরবেন বলে ?

নিরু বিরক্ত হয়ে বলে—পরবেন কে বলেছে ? হয়ত কাজে লাগাবেন বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে—

—তালুক নিলাম হচ্ছে বুঝি কুন্তল-দার, মেয়েমানুষের গয়না বন্ধক দেবেন ?

—কিন্তু টাকার কি গরজ নেই ?

—আছে। সে সামান্য ব্যাপার। আমরা বন্যাত্রাণ-সমিতি গড়ি নি নিরু, যে তোমার কাছে দয়ার দান চাইতে যাব—

নিরু ক্ষণকাল যেন নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তার পর বলে—মহানন্দ-কাকা বলল, কুন্তল-দার সঙ্গে দেখাশোনা করিয়ে দেবে, তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবে—

—সাবধান নিরুপমা, কুন্তল-দার বাড়ি ব'লে তোমাকে থানায় নিয়ে তুলবে। খুব সাবধান—

থানায় মহানন্দ নিয়ে যায় নি, নিরু নিজে গিয়েছিল। বোকা মেয়ে! সেই যে কবে কুন্তল-দার দু-ছত্র লেখা দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। তার পর গয়না চুরির জন্য রাগের মাথায় ডায়েরি ক'রে এসেছে মহানন্দের নামে।

নিরু বলে—বেশ করেছি। দেশের কথা ব'লে আর সেই সঙ্গে যত বড়লোকের নাম জড়িয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, ওর শাস্তি হবে না ?

—ওর আগে হ'ত তোমারই। টের পেতে যদি ঠিক সময়ে খবরটা না পেতাম।

নিরু আশ্চর্য্য হয়ে কুন্তল-দার দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন—ডায়েরি ক'রে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলে। এনকোয়ারির সময় মহানন্দ ওদিকে সত্য-মিথ্যা একরাশ ব'লে মনের ঝাল ঝেড়েছে। ভাগ্যিস খবর এসে গেল, নবীনকে দিয়ে গ্রেপ্তার করে এনেছি। তোমার বাড়িতে এতক্ষণ তোলপাড় চলেছে।

আজ দিন-তিনেক কুন্তল-দা চৌকাঠ পার হন নি, অথচ খবর ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে। ইদানীং আমরা আর এতে আশ্চর্য্য হই না। তিনি বলতে লাগলেন—গ্রেপ্তার, বুঝলে ত নিরু ? হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি—তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

নিরু মৃদু কণ্ঠে বলে—সবে ভাইয়ের জন্য খাবার করতে বসেছিলাম। আজ ঠাকুর আসে নি—

—ও সব ভেবো না। সে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার কি বন্দোবস্ত করি বল ত ? বড্ড ভাবিয়ে তুললে।

নিরু রইল চিলেকোঠায়, আমরা ক'জনে দোতলায়। পরদিন নিরু জিজ্ঞাসা করে—কদ্দিন আটকে রাখবেন, কুন্তল-দা ?

কুন্তল-দা বললেন—দু-বছর, দশ বছর, হয়ত বা চিরকাল—

অধীর কণ্ঠে নিরু বলে—সে আমি পারবো না। ভাবছেন কেন, কোন চার্জ্জ ত নেই—আর আমার কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ ভূ-ভারতে জন্মায় নি।

কুন্তল-দা বললেন—তা পারবে না জানি।···কিন্তু কোন দিন যদি শুনি, তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি নে—কিছুতে না। তুমি বোঝ না, তোমার দাম অনেক।

আরও দিন-দশেক কেটেছে। ইতিমধ্যে ঐ বাড়িরও আস্তানা গুটাবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। কুন্তল-দা বলছিলেন—যত মুশকিল তোমাকে নিয়ে বোন। স্ত্রী হয়ে কারও অন্দরমহলে ঢুকে পড়ো দিকি। একেবারে নিরাপদ।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে—না।

—কেন ?

—এমন মানুষ কে আছে, যাকে স্বামী বলতে সরমে বাধে না ?

শোন একবার দাম্ভিক মেয়েটার কথা! আবার কুন্তল-দা তার কথাতেই সায় দিয়ে গেলেন।—তা সত্যি। কিন্তু সত্যিকার স্ত্রী হ'তে যাবে কেন ? সাজতে হবে—যেমন যাত্রা-থিয়েটারে ক'রে থাকে—

খিল খিল ক'রে হেসে নিরুপমা বলে—তাই বলুন, তা পারব, খুব পারব—বলেন ত এই যদু-দারই স্ত্রী হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসি।···দাঁড়ান যদু-দা, শুনুন, কথাটা শুনে যান—

—আঃ নিরু! সেই সময়টা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিরু হাসতে হাসতে পথ আটকাল, তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সমস্তটা দিন বড় খাটুনি গেল। সন্ধ্যার পর ফিরেই শুয়ে পড়েছি। নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ মাথা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

—কে ?

—বউ, আপনার বউ গো—

প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ঘোমটা টানা কি না—কথাও বলছে, ফিস ফিস ক'রে নববিবাহিতা লজ্জাবতী বউটির মত। শেষে চিনলাম। ঘুম এমন এঁটে এসেছে যে চোখ মেলতে পারি নে। বিরক্ত হয়ে বললাম—তা এ রাত্রে কেন ? না নিরু, বড্ড জ্বালাতন করো তুমি। বউ হও, যা হও—কাল দেখা যাবে। এখন যাও, বিরক্ত ক'রো না—

—কুন্তল-দার হুকুম, এক্ষুনি—

—সত্যি ?

—শুভস্য শীঘ্রম্। নইলে কালই হয়ত শুনবেন, দ্বীপান্তরে নিয়ে গেছে। তখন বউ পাবেন কোথায়··· হনুমান খুঁজে বেড়াতে হবে আন্দামানের সাগর বাঁধবার জন্য।

—খুঁজতে হবে না, সেত এই সামনেই। ঘুমন্ত মানুষ ব'লে করুণা নেই, রাত দুপুরে এসে খাঁচড়াতে লেগেছে।

অভিমানের স্বরে নিরু বলে—মুখের উপর এ রকম বললে দুঃখ হয় না বুঝি! সত্যি কি আমি হনুমানের মত দেখতে ? বলুন—

দেখে বলতে হ'লে চোখ মেলতে হয়। উপায় কি ? তা ছাড়া কুন্তল-দার নাম করছে। চেয়ে দেখি, সে তৈরি। বাইরে অপেক্ষমান কুন্তল-দা। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিলাম। আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ করছে। স্তিমিত গ্যাসের আলো। কুন্তল-দা খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে চলে এলেন। দু-জনে নিঃশব্দে চলেছি।

ভাল চাকরি হ'ল আমার! নিরুকে অন্দরবর্ত্তী ক'রে স্বামী-পরিচয়ে আছি, দূর-দূরান্তরে যাবার হুকুম নেই। এক দিন কুন্তল-দা এলেন, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম—মানুষের জেল হয়—দু-মাস হোক্, ছ-মাস হোক্, তার একটা মেয়াদ থাকে। আমার মুক্তি কবে হবে বলুন।

—হ'ল কত দিন ?

রাগ ক'রে বলি—দেখুন না হিসাব ক'রে, তিন মাস পুরে গেছে। টবের গাছ আগলে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না—স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি—

আমার ভাব দেখে কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসেন। বললেন—আচ্ছা, থাকো আর ক'টা দিন। দেখি আর কাউকে—

—কাউকে পাবেন না। আমার মত গাধা কি দুনিয়ায় আর একটা আছে ?

যেখানে থাকতাম, সেটা আজ শহরগোছের একটা জায়গা। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বড় ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে দরজার শিকল ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল। নিরু ডাকছে। কি ব্যাপার ? দরজা খুলে দেখি, তার হাতে হেরিকেনের আলো, কাঁখে ঝুড়ি। বলে—আমাদের পিছনের বাগানে বিস্তর আম পড়েছে যদু-দা, চলো কুড়িয়ে আনি।

রাগের সীমা রইল না। বললাম—হ্যাঁ, এই সমস্ত ক'রে বেড়াই। কাল থেকে তুমি কোমর বেঁধে কাঁচা আমের আমসি করতে লেগে যাও। আর বল ত গোয়াল বেঁধে দু-চারটে গরু পোষবার বন্দোবস্ত করি—

তার হাসিমুখ মুহূর্ত্তে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। হেরিকেনের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পায়ের নখে মেজেয় দাগ দিতে দিতে সে বলে—আমি কি করব বলুন। আমার কি দোষ ?

—দোষ কারও নয়। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো গে। কাটা ঘায়ে নূন দিতে এস না, এইটুকু দয়া কর। এ রকম থাকতে তোমার ফুর্ত্তি লাগছে, আমার কান্না পায়—

ঝুড়িটা ধপ ক'রে নামিয়ে রেখে নিরু ফিরে চলল। বলে—আপনি চলে যান, কালই—বুঝলেন ?

আমি বললাম—তোমার কথায় এখানে আসি নি নিরু, তোমার কথায় যেতেও পারি নে। যাঁর হুকুমের দরকার তাঁকে জানিয়েছি। ছাড়া পেলে এক মিনিটও দেরি করব না।

—তা হ'লে আমিই যাব কাল। আর একটা দিনও নয়। কুন্তল-দা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেও নয়।

দরজার সামনে গিয়ে সে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়। তার পর মুখ ফিরিয়ে বলে—ফুর্ত্তির কথা বলছিলেন, খুব ফুর্ত্তি দেখছেন! দেখবার চোখ কি আছে আপনাদের ? আমিই কি এ জীবন চেয়েছিলাম ? মনের ভুলে একটুখানি হেসে ফেলেছি, মাপ করবেন।

দড়াম ক'রে সে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুর কথাগুলো বার-বার মনে আসছে, তার বিষণ্ণ চেহারাটা যেন চোখে দেখছি। গৃহস্থ-ঘরের ভাবপ্রবণ মেয়ে—লেখাপড়া শিখছিল, তার পর দেশের কাজ করবে ব'লে সর্ব্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছে। এই নির্ব্বান্ধব পুরী তার বুকে পাথর হয়ে চেপে থাকে। সমস্ত দিন আর দশটা বউ-ঝির মত ঘরের কাজে নানা রকম ফাইফরমাশে মুখ বুঁজে খাটে। নিশুতি

রাতে অভিনয়ের খোলসটা একটু খুলতে চেয়েছিল, ছুটোছুটি ক'রে আম কুড়োত, হাসত, আবোল-তাবোল বকত খানিকটা· ·কি এমন অপরাধ যে এত কথা শুনিয়ে দিলাম, বেচারি মুখ চূণ করে চলে গেল।

শুয়ে থাকতে পারি নে, নিরুর ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া নেই। সাড়া পাওয়া যাবে না জানি। ঝুড়ি নিয়ে একলা বেরুলাম। সকালের রাগ পড়ে যাবে, ঝুড়ি-ভরতি আম দেখে খুশি হবে সেই সময়। তখন বাতাস থেমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আমার এক পিসতুত বোন জয়া-দিদির কথা মনে পড়ছিল। ছোটবেলায় পাঠশালা পালিয়ে তাঁর সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে আম কুড়োতাম। সে-সব দিন কোথায় চলে গেছে। আজ আমি যদুনাথ—কলেজি ছেলেদের অতি নমস্য যদু-দা—গভীর রাত্রে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এ দৃশ্য কেউ দেখলে কি রকম ব্যাপার হবে আন্দাজ কর ত!

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। নিরুর সামনে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় ছিলেন রাত্রে?

—কেন ঘরে। এই ত উঠে আসছি।

—সে হয়ত শেষ রাতে কখন এসে শুয়েছেন! আমি একবার উঠে দেখি, দুয়োর হা-হা করছে।

—হাঁ, তা বটে। কিন্তু বেশ ছিলাম, অত্যন্ত আরামে ···মানে, স্প্রিঙের খাটে শুয়েছ ত—যেন গিলে খায় একেবারে—

নিরু শান্তভাবে বলে—কোন্ জায়গায়?

চট্‌পট্ মিথ্যে বানিয়ে বলা অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু নিরুর সামনে কথা আটকে যায়। বললাম —ছিলাম গলির মোড়ের বাড়িটায়। করব কি···কাপড় ভিজে গেল, ওদের কাছ থেকে একটা শুক্‌নো কাপড় চেয়ে নিলাম।

—বাড়িটা কার, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রাগ ক'রে বলি—কার বাড়ি, কি বৃত্তান্ত, মুখস্থ ক'রে আসি নি। অতশত বলতে পারব না।

নিরুপমা বলে—আমি পারব। ছিলেন রান্নাঘরে। কাপড়ের ট্রাঙ্ক আমার ঘরে। তাই উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন করেছেন, ভিজে কাপড় বসে বসে গায়ে শুকিয়েছেন। আমাকে ডেকে কাপড় চাইলে কি অপমান হ'ত?

আবার বলে—সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া ক'রে রওনা হব। আপনি কি যাবেন কলকাতা অবধি?

আমি বললাম—যাওয়া যাওয়া করছ, কি এমন বলা হয়েছে শুনি? মন খারাপ হ'লে মানুষে কত কি বলে! এই নিয়ে কুন্তল-দার কাছে একশ-খানা ক'রে লাগাবে ত!

—কিছু বলব না কুন্তল-দাকে। আপনি না যান, একাই চলে যাব। তিলে তিলে আপনাকে এ রকম মেরে ফেলতে চাই নে—

আমি বললাম—তা বইকি। স্বাধীন হয়ে গিয়েছ, কুন্তল-দাকে বলবে কেন?···কিন্তু ঝগড়া পরে ক'রো। আমি দাঁড়াতে পারছি নে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। কুইনাইনের বড়ি থাকে ত শীগ্‌গির গোটা দুই বের ক'রে দাও—জ্বর আসতে পারে।

কুইনাইনে জ্বর ঠেকাল না। সেই যে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, আর অনেক দিনের খবর জানি নে। অসুখের মধ্যে এমন অসহায় মানুষ! মাসখানেক পরে এক দিন কেউ কোথাও নেই, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ্য দেওয়াল অবধি—ঐ দেওয়ালে যেখানে বালির জমাট উঠে অনেকটা মানুষের মুখাকৃতি হয়েছে, ঐ জায়গা আমি ছোঁব। ঠিক পারব।···পারছি, হাঁ হাঁটতে ত পারছি। ওঘরে পায়ের শব্দ। রুগ্নকণ্ঠ উল্লাসে জোরালো হয়ে ওঠে—নিরু, দেখ···দেখ নিরুপমা—

নিরু জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে।

—এই কাণ্ড আপনার?

হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। নিরু ছুটে এল। আমাদের দলের এক ছোক্‌রা ডাক্তারি পাস, তাকে এনে রাখা হয়েছিল, সে এল। একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। নিরু তখনও আছে। বড় কড়া শাসন তার আজকাল। বার-বার মিনতি ক'রে বলি—লক্ষ্মী নিরু, খেতে দাও একটা আম। কাঁচা আম কুড়োতে গিয়ে এই দশা। এখন পেকেছে, টুকটুকে আম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘরে রয়েছে,··· মিষ্টি দেখে বেছেগুছে একটা দাও—কিছু হবে না।

নিরু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—তা বইকি! ডাক্তার কি বলেছেন জানেন?

—কিছু বলে না। তোমার বানানো কথা। আমাকে না খেতে দেবার ষড়যন্ত্র।

নিরু তর্ক করে না। বলে—বেশ, তাই—

নির্ব্বিকার মুখে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ ক'রে শিকল পড়ল।

—দুয়োরে শিকল দিলে যে!

বাইরে থেকে নিরু বলে—এ ঘরের এত আম ত চট্ করে সরানো যাবে না। আপনাকে আটকে রাখাই সোজা।

—কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলে? তুমি কে? আমার আপনার কেউ নও—

নিরু জবাব দেয়—আমি আপনার কেউ, তা বলেছি কোন দিন?

—তুমি শত্রু, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব তোমার।

—বেশ, তাই। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন ত, আমি বার্লি চড়িয়ে আসি।

ঝগড়াঝাটির ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে পড়ে আছি। কুন্তল-দার গলা শুনতে পেলাম। তিনি আজ এসেছেন বুঝি? ও ঘরে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কুন্তল-দা বলছেন—ঢাকার ব্যাপারে আর দেরি করা চলে না বোন। যদু কাল অন্নপথ্য করছে, আর কি! দু'টি ছেলেকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তারা দেখাশুনো করবে।

—না না···আর কয়েকটা দিন ছুটি দিন আমাকে—এই দিন-দশেক। ভাত খেয়ে কেমন থাকেন, না দেখে যাই কি ক'রে!

—মুশকিল, এই ক'দিনের জন্য আবার এক জনকে পাঠাব?

—তাই করুন, দাদা। তার পর আমি গিয়ে পড়বো, সমস্ত ভার মাথায় তুলে নেবো—

—কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি নিরু, সাবধান! তুমি জান না বোন, তোমার কত দাম। তোমায় ছাড়তে পারব না, যদুর খাতিরেও না।

রাগ জল হয়ে গেল। মনে আনন্দের তুফান উঠছে। সত্যি, অসুখের মধ্যে মন এমন দুর্ব্বল হয়ে যায়! আধ-ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, যেন অনেক দূর থেকে মিষ্ট গান ভেসে আসছে। বিশ্বাস কর ভাই, বাড়িয়ে বলছি নে—সেদিন কত কি ভাবতে লাগলাম। যেন পৃথিবী থেকে দুঃখ-দৈন্য চলে গেছে, মানুষ অনন্ত শান্তিতে রয়েছে। সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি—সে যেন অতীত যুগের বিভীষিকা।

শিকল খুলে কুন্তল-দা দেখতে এলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

—দেখুন অত্যাচার। একেবারে কয়েদ ক'রে রেখেছে।

সামান্য দু-এক কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কুন্তল-দা উঠলেন। বড় ব্যস্ত। দুটো খেয়ে তখনই চলে যাবেন। বার্লির বাটি হাতে নিরুপমা এল। বললাম—নিরু, আমরা চেয়েছি, পৃথিবীকে ভাল ক'রে ভোগ করব—

নিরু বলে—বেশ ত, তাই করবেন।

—কাছে আসতে হাত ধরে ফেললাম নিরুপমার।

—দেখ, নাগা সন্ন্যাসী আমরা নই—নিবৃত্তির সাধনা আমাদের নয়—

আমার চোখে কি ছিল, এক মুহূর্ত্ত সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নিরু সায় দেয়—হুঁ, হুঁ—

—আমাদের দু-জনের বিয়ে হোক।

—বেশ।

—তা হ'লে কুন্তল-দা চলে যাবার আগে তাঁকে বলো।

—আচ্ছা। ব'লে নিরু চলে গেল। একটু পরেই ফিরল। হাতে আইস-ব্যাগ।

—কুন্তল-দা আসছেন। ডাক্তারকে খুঁজলাম। তিনি নেই।

—ডাক্তার?

নিরু বলে—শুয়ে পড়ুন দিকি। আপনার মাথায় আইস-ব্যাগ বসিয়ে দিই—

—কেন?

—মাথা ঠাণ্ডা হবে। মাথার ব্যারাম না হ'লে অমন আবোল-তাবোল কেউ বকে?

কুন্তল-দা আসতে নিরুপমা বলল—এ গাড়িতে যাওয়া হবে কি ক'রে? পরেরটায় যাব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে, 'ওঠ্' বললে মেয়েমানুষের যাওয়া কি ক'রে চলে?

—তুমি যাচ্ছ তা হ'লে?

—হাঁ। কালই ঢাকায় চলে যাই, তার পর আর যেখানে যেতে বলেন।

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম—আর ক'টা দিন থেকে যাও নিরু, আমার রোগ এখনও সারে নি—

নিরু বলে—আমি থাকলে বেড়েই চলবে।

—দেখ, যদি মরে যাই—

—বড্ড দুঃখ হবে। আহা, গালি দেবার আর ঝগড়া করবার এমন মানুষটাও চলে গেল!

—কাল আমি অন্নপথ্য করব। এই একটা দিনও থাকতে পার না?

—না।

যাবার আগে নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি, জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তা হ'লে!

ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির মধ্যে নিরু আর কুন্তল-দা সাম্‌নাসাম্‌নি ব'সে চলেছেন। তেঁতুলগাছের আড়ালে গাড়ি অদৃশ্য হ'ল। আওয়াজও আর কানে আসে না···

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

শ্রীহরিহর শেঠ

বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আকর্ষণ, তাহাকে দেখিবার বা তাহার কথা শুনিবার একটা আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই দেখা যায়, তাই কোথাও কিছু নূতন বা অস্বাভাবিকের উদ্ভব হইলে সংবাদপত্রে তাহার কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বৈচিত্র্য প্রাণিজগতে যেমন, উদ্ভিদ্ ও জড়-জগতেও তেমনই দেখা যায়। জীবের দৈহিক গঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীর মধ্যেও সময় সময় যে কত প্রকার দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনের অস্বাভাবিকতা অবশ্য মানবেতর জাতির—যাহারা বাক্যের দ্বারা ভাব বুঝাইতে পারে না—মধ্যে বুঝিবার সুযোগ সাধারণের নাই, কিন্তু মানবের

খর্ব্বাকৃতি কলাগাছ

মানসিক বা মস্তিষ্ক বিকারের বহু প্রকার দৃষ্টান্ত নিত্য দেখা যায়। উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে বিচিত্রতা তুলনায় অনেক বেশী হইলেও তাহারা গতিশীল নহে, সুতরাং লোকচক্ষুর সমক্ষে সকল সময় আসে না বা আসিলেও, সকলেই সে সকলের বৈশিষ্ট্যের প্রতি তেমন লক্ষ্যশীল থাকেন না। কাজেই সে প্রকার অনেক বস্তু অনেকেরই গোচরীভূত হয় না। এ বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা অনেক অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সময় সময় দেখিতে পান।

বহুদিবসাবধি আমার এই প্রকার বিচিত্র সামগ্রী সংগ্রহের একটু বাতিক আছে। যখনই এরূপ কিছু দেখিতে পাই, সম্ভব হইলে তাহা রক্ষা করিতে নচেৎ তাহার ফটোগ্রাফ রাখিতে চেষ্টা করি। বহু বৎসর হইতে নানা মাসিক পত্রে

তিন-থাক-বিশিষ্ট কলার ছড়া

এই সকল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অনেক ছবি প্রকাশ করিয়াছি। আমার এই বিষয় একটু সখ থাকায় শুধু বন্ধুবান্ধব নয়, স্থানীয় অনেক অপরিচিত ব্যক্তিও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এরূপ জিনিস উপহার দিয়া বা তাহার সন্ধান দিয়া থাকেন।* বিগত বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে যে অধিবেশন হয়

ডিম্বাভ্যন্তরে ডিম্ব

* এই প্রবন্ধে যে সকল বৈচিত্র্যের কথা বলা হইবে, তাহার মধ্যে যেগুলি অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত, বহু দিনের পর তাঁহাদের নাম স্মরণ না থাকায় উল্লেখ করিতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।

মনুষ্যাকৃতি সকরকন্দ আলু

তৎসহিত চন্দননগরের সাহিত্য, ইতিহাস ও শিল্পাদির একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে আমার এই সংগ্রহের মধ্য হইতে কেবল উদ্ভিদ্‌, ফলমূলের বহুসংখ্যক ফটোচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্মিলনের শিশুসাহিত্য-বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেই ফটোগুলি দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তাহা তাঁহার "শিশু-ভারতী"তে সযত্নে প্রকাশ করেন।* তাহার মধ্য হইতে কয়েকখানি এবং ইতিমধ্যে সংগৃহীত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বা প্রকৃতির খেয়ালের ফটোগ্রাফ এখানে দিলাম। যাহা স্বচক্ষে দেখি নাই এমন কিছু ইহার মধ্যে নাই।

একটু অনুসন্ধানের দৃষ্টি লইয়া থাকিলে ফলমূল, তরি-তরকারি ও উদ্ভিদাদিতে সর্ব্বদাই অনেক কিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক কদলী বৃক্ষ ও কদলীর মধ্যেই এরূপ বহুবিধ বৈচিত্র্য দেখিয়াছি। সচরাচর কলার ছড়ায় দুই থাক কলাই হইয়া থাকে, কিন্তু জনৈক ভদ্রলোক প্রদত্ত একবার তিন-থাকবিশিষ্ট এক ছড়া কাঁঠালি কলা আমি উপহার পাইয়াছিলাম। সাধারণতঃ এক ছড়া কলায় কুড়ি-পঁচিশটির অধিক কলা ফলিতে দেখা যায় না, একবার ৮৪টি স্বাভাবিক আকারের কদলীবিশিষ্ট এক ছড়া কলা পাইয়াছিলাম। যমজ কলা সর্ব্বদাই দেখা যায়, কিন্তু একত্রে ৪টি যমজ কলা এক সময় আমার হস্তগত হইয়াছিল। খুব ছোট জাতীয় কদলী বৃক্ষ যাহা এদেশে দেখা যায় তাহা কাবুলি মর্ত্তমান জাতীয়, কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি এক হাতের অনধিক উচ্চ গাছে কলা ফলিতে দেখিয়াছিলাম। একটি চিত্রে মোচাসমেত অনুচ্চ গাছে কলার কাঁধিটি দেখা যাইতেছে। একবার আমার বাগানে শাখাবিশিষ্ট একটি কলাগাছ জন্মিয়াছিল এবং এক ব্যক্তি একটি জোড়া কলাগাছের তেউড় দিয়াছিলেন। বহু দিন পূর্ব্বে আমার এক জামাতার বাগানে ১৫ ইঞ্চি লম্বা মর্ত্তমান জাতীয় কলা ফলিয়াছিল। এগুলির ফটো না থাকায় এখানে দিতে পারিলাম না। "শিশু-ভারতী"তে এগুলির ছবি আছে।

গঠনের বৈচিত্র্য মূলজ উদ্ভিদের মধ্যে খুব বেশীই দেখা যায় এবং সময় সময় কোন কোন জীবের দেহের সঙ্গে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য থাকে। বহু বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরের বাজারে একটি অতি অদ্ভুত আকারের সকরকন্দ আলু পাইয়াছিলাম, উহা দেখিতে কতকটা পাঁচ-আঙুলবিশিষ্ট মানুষের পায়ের মত। পাখী বা অন্য জন্তুর সাদৃশ্যবিশিষ্ট অনেক রাঙা-আলু ও শাঁক-আলু নজরে পড়িয়া থাকে। অনেক দিন হইল একবার "প্রবাসী"তে হংস ও অন্য জন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট শাঁক-আলুর ছবি প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ফলের মধ্যে সময় সময় বহু প্রকার বিচিত্র আকারের আম্র দেখা যায়। একবার কতকটা খরগোসের মত একটি আম পাইয়াছিলাম। পেঁপেও অনেক বিচিত্র আকারের দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় পেঁপের ভিতরে অপর একটি পেঁপে দেখা গিয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে উক্ত প্রকার কয়েকটি ছবি দিয়াছিলাম।

একবার একটি অদ্ভুত নারিকেল পাইয়াছিলাম। উহা

ফুলের ভিতর হইতে কোয়কের উদ্ভব

* "শিশু-ভারতী" ৭৮ ও ৭৯ সংখ্যা ২৯৯২, ৩০৭৭ ও ৩০৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাঙিলে দেখা গেল ভিতরে দুই স্থানে চক্রাকৃতি দুইটি নারিকেলখণ্ড নারিকেল-মালা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভিতরে রহিয়াছে। বহুশাখাবিশিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষের কথা ও চিত্র অনেক বার বিভিন্ন পত্রে দেখা গিয়াছে। এরূপ নারিকেল বা তাল গাছের কথা বড় শুনা যায় না। চন্দননগরের গোন্দলপাড়া পল্লীতে শাখাবিশিষ্ট একটি নারিকেল-গাছ আছে। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে রথের সময় নার্শারী হইতে দুইটি চারাবিশিষ্ট একটি নারিকেল পাইয়া-

খরগোসাকৃতি আম

হইয়াছিল। একটি গোলাপের মূল হইতে অন্য একটি কোরকের উদ্ভব, ইহাও প্রায় দেখা যায় না। স্যর ওয়াল্টার স্কট গোলাপের এইরূপ কুঁড়ি কখন কখন দেখা যায়।

একটি বিচিত্র গাঁইটবিশিষ্ট বংশখণ্ড পাইয়াছিলাম।

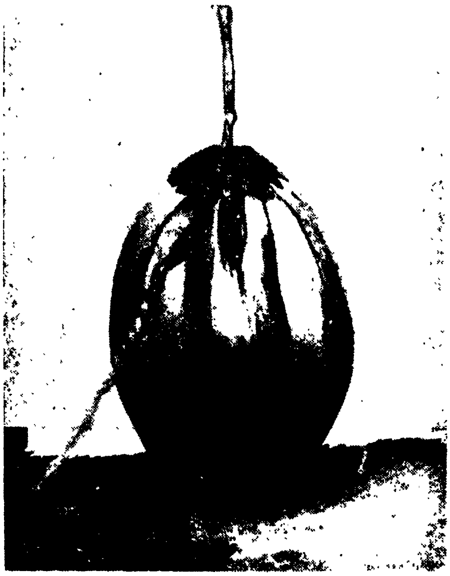

যমজ নারিকেল

ছিলাম। উহা রোপণ করা হইয়াছিল কিন্তু কয়েক মাস পরে একটি গাছ শুকাইয়া যায়। "মাসিক বসুমতী"তে ইহার একটি ছবি দিয়াছিলাম। একটির মধ্যে তিনটি নারিকেল—ইহা সুলভ নহে। এরূপ একটি আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে দিয়াছিলেন। এক শিষে তিনটি নারিকেল ইহাও কদাচিৎ দেখা যায়। আমাদের বাগানে এরূপ একটি পাইয়াছিলাম। আবার একটি নারিকেলের দুইটি শিষ এরূপও একটি পাইয়াছিলাম।

কলা, আম, জাম, কাঁঠাল এ সকল ফলের যমজ অনেক দেখা যায় কিন্তু পটল ও বেগুনের তত পাওয়া যায় না।

যশিডি ষ্টেশনের নিকট প্রায় দেড়শত-শাখাবিশিষ্ট একটি করবী ডাল পাইয়াছিলাম। বহুশাখাবিশিষ্ট একটি রজনীগন্ধা ফুলের গাছ আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে

শাখাবিশিষ্ট নারিকেল-গাছ

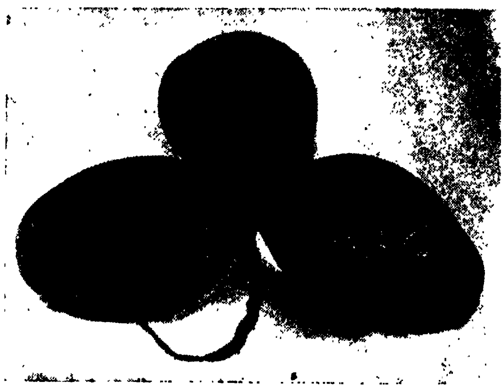

একটি শিষে তিনটি নারিকেল

ফলের ভিতর ফল, ফুলের ভিতর কোরক, ইহা কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু এইবার একটি অতি অদ্ভুত বৈচিত্র্যের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। একটি মুরগীর ডিমের মধ্যে আর একটি ডিম। ইহা আমি স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা কানাইলাল দত্তের অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। ডিমটির আকার একটি সাধারণ হংসডিম্বের অপেক্ষাও বড় এবং ভিতরেরটি মুরগীর ডিম অপেক্ষা সামান্য ছোট।

যে-সকল অস্বাভাবিক বিষয়ের কথা উল্লিখিত হইল, অথচ ছবি দিতে পারিলাম না, তাহার অনেকগুলি "শিশু-ভারতী"তে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নগেনের স্ত্রীকে ভূতে পাইয়াছে।

শ্বশুরবাড়ী আসিবার কয়েক দিন পরেই নূতন বধূর অস্বাভাবিক ব্যবহার সকলের চোখে ধরা পড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম দুই-এক দিন অন্তর ফিট্ হইত, আজকাল রোজই হইতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকে। প্রশ্ন করিলে ভাল করিয়া উত্তর দেয় না। নিজের খুশীমত একা একা বাড়ীর বাহির হইয়া যায়। লজ্জাসরম বলিয়া কিছু নাই। তাহার উপর অত্যন্ত লোভী। চুরি করিয়া খাবার খায়, কেহ শাসন করিলে তাহা মানে না।

পিসিমার ছেলেমেয়ে নাই। পিতৃমাতৃহীন ভাইপো নগেনকে তিনি নিজের বাড়ীতে আনিয়া মানুষ করিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বড় সাধ করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছেন। নববধূর কলকণ্ঠে তাহাদের নিরানন্দময় গৃহখানি আনন্দে মুখর হইয়া উঠিবে, তাহাদের সন্তানাদি লইয়া নিজের বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে কতকটা শান্তি পাইবেন, পিসিমা এই আশাই মনে পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমনি অদৃষ্ট তাঁহার যে বিবাহের কয়েক দিন পর হইতেই সকলের মন অশান্তিতে ভরিয়া গেল। বেচারী নগেনের মুখের দিকে তিনি আর তাকাইতে পারেন না।

ভবতারণবাবু বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন।

পিসিমা আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, বিটলে বামুন সেই হরিচরণ চক্রবর্তীকে ডেকে এনে তার বড় আদরের নাতনীর গুণপনা দেখাও একবার!

ভবতারণ তামাক রাখিয়া কহিলেন—হুঁ, তাই করতে হবে দেখছি। এসব চালাকি এখানে চলবে না।

পিসিমা বলিলেন—এসে তাদের মেয়ে নিয়ে যাক। নগেনের আমি আবার বিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিসিমা বলিলেন—আর আমাদেরও এ পোড়া চোখ কেন অন্ধ হয়ে গেল না! ফটো দেখেই সব ভুলে গেলাম, একবার ভাল ক'রে খোঁজ-খবরও নিলাম না।

ভবতারণ বলিলেন—দেখ, বিয়ের পর মেয়েদের অমন দু-একটা উপসর্গ এসে জোটে। পরে ছেলেমেয়ে হ'লে ওসব সেরেও ত যেতে পারে।

পিসিমা বলিলেন, তবেই হয়েছে। মেয়েদের কথা তুমি আর আমাকে শুনিয়ো না। ঐ, ঐ দেখ মেয়ের কাণ্ড, ছি ছি!

পথের পাশে সাপুড়ে সাপখেলা দেখাইতেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আসিয়া সেইখানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মাঝে গিয়া দাঁড়াইয়াছে নূতন বউ কমলা, মাথায় ঘোমটা নাই, পরনের কাপড় এলোমেলো।

পিসিমা বাহিরে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন, বউমা!

কমলা ফিরিয়াও চাহিল না।

পিসিমা তাহার নিকট গিয়া কহিলেন, তোমার কি লজ্জাসরম ব'লে কিছুই নাই? এস এদিকে বলছি!

কমলা আসিল না।

ঘরের মধ্যে বসিয়া নগেনও ব্যাপারটি দেখিয়াছিল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এস। সাপখেলা দেখা ওর বের ক'রে দিচ্ছি।

নগেন ফিলজফি লইয়া বি-এ পাস করিয়াছে। সম্প্রতি মনোবিদ্যার বই ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। কমলার চুলের মুঠি ধরিয়া সে-ই তাহাকে টানিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল।

ভবতারণবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিসিমার চোখের ইসারায় চুপ করিয়া গেলেন।

বাসুদেব লোকটি সাপখেলা দেখাইয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও বড় বুদ্ধি রাখে। ব্যাপারটি বুঝিয়া লইতে তাহার দেরি হইল না।

খেলা শেষ করিয়া চুপি চুপি সে ভবতারণের বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাকিল, গিন্নীমা আছেন নাকি!

পিসিমা বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কেন? এখানে ওসব চলবে না।

বাসুদেব বলিল, কেন চলবে না মা! সাপের মুখ থেকে বিষ তুলে তাকে যেমন আমরা শান্ত করতে পারি, তেমন পারি তোমার ঐ মেয়ের দেহ থেকে বিষ টেনে এনে ওকে সুস্থ ও শান্ত করতে। কোন ভয় নাই, আমাকে সব খুলে বল।

তাহার কথায় কেন জানি পিসিমার আস্থা আসিল। আড়ালে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া পিসিমা সমস্ত ঘটনাটি খুলিয়া বলিলেন।

সব শুনিয়া বাসুদেব কহিল, ওকে ভূতে পেয়েছে।

ভয় পাইয়া পিসিমা বলিলেন, ভূত!

বাসুদেব বলিল, হাঁ মা, অলক্ষী ভূত, বড় পাজী ভূত। সময়মত ওকে তাড়াতে না পাড়লে সংসারে অমঙ্গল ঢুকবে।

পিসিমা বলিলেন, আমি জানি এমনি করেই ও হতভাগী আমাদের সর্বনাশ করবে!

বাসুদেব বলিল, কোন ভয় নাই। সপ্তাহে দু-দিন এসে ঝেড়ে দিয়ে যাব। এক মাসেই মেয়ে তোমাদের ভাল হয়ে উঠবে।

পিসিমা গিয়া ভবতারণবাবুর মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্ত্রীর মতই তাঁহার মত। ভবতারণ বলিলেন, বেশ ত, যদি ভাল মনে কর তবে সে-ই চিকিৎসা করুক।

নগেন আসিয়া বলিল, যা ইচ্ছে তোমরা কর, এই ভূতপেত্নীর রাজ্যে আমার থাকা পোষাবে না!

সাপের ওঝা ভূতের ওঝার কাজে বহাল হইয়া গেল। গ্রামময় সকলে জানিল নগেনের বউকে ভূতে পাইয়াছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা দলে দলে মজা দেখিতে আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া গেল।

তাহার পর অমানুষিক এক পদ্ধতিতে কমলার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। শুক্‌নো লঙ্কা পোড়াইয়া নাকের ভিতর ধরা, বদ্ধঘরে ধোঁয়া দিয়া ঘরের মধ্যে আটক রাখা প্রভৃতি অদ্ভুত শারীরিক অত্যাচার।

সহ্য করিতে না পারিয়া কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবতারণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, আহা, থাক্ থাক্, আবার অন্য দিন হবে।

বাসুদেব মাথা নাড়িয়া বলিল, মেয়ে কি আর কাঁদছে বাবু, কাঁদছে পাজী সেই অলক্ষী ভূত।

পরে জলন্ত একটা লোহার শিক কমলার হাতের তালুতে ঠাসিয়া ধরিয়া বাসুদেব কড়া সুরে হুকুম দিল, বল্, এ বাড়ী ছেড়ে এক্ষুনি চলে যাবি, বল শীগ্‌গির!

কমলা চিঁ চিঁ করিয়া কহিল, যাব যাব, ওগো আর আমায় মের না, সত্যিই আমি চলে যাব।

বাসুদেব হাসিয়া বলিল, দেখছেন হুজুর, ভূত কথা বলছে।

কয়েক দিন পরেই এই অসাধারণ চিকিৎসার ফল ফলিল। এক দিন সকালে কমলাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ভবতারণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এখন কি করা যায়?

পিসিমা বলিলেন, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

ওর কি যাবার জায়গা আছে নাকি, এখুনি ফিরে আসবে!

ভবতারণ বলিলেন, আহা, নগেনকে বল না বেরিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আসুক।

নগেন আসিয়া বলিল, আমার এত সস্তা সময় নাই।

ভবতারণ বলিলেন, তবে আমি নিজেই যাচ্ছি।

পিসিমা বাধা দিয়া বলিলেন, অসুস্থ শরীরে তোমাকে আর বেরোতে হবে না। আমিই দেখছি।

কিন্তু কাহাকেও আর দেখিতে হইল না। পর-দিন ভোরে হরিচরণ কমলার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে ভবতারণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিচরণকে দেখিয়া ভবতারণ বোমার মত ফাটিয়া গিয়া বলিলেন, হরিচরণ, তুমি একটি আস্ত শয়তান!

তাহার কথার কোন জবাব না দিয়া হরিচরণ কমলাকে কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন হতভাগী? কথায় বলে শ্বশুরের ভিটে! যা, শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চা।

কমলা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খবর পাইয়া পিসিমা ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, মেয়ে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বেয়াই। নগেনের আবার আমরা বিয়ে দেব।

ভবতারণও বলিলেন, নিশ্চয়ই দেব, এক-শবার দেব। আমার সঙ্গে চালাকি!

অসহায়ের মত হরিচরণ বলিলেন, তবে ওকে নিয়ে কোথায় আমি যাব?

পিসিমা বলিলেন, ভূতে-পাওয়া নাতনীর বিয়ে দেবার আগে একথা মনে ছিল না? কোথায় যাবে তার আমরা কি জানি?

হরিচরণ বলিলেন, ভূতে ওকে পায় নি বেয়ান। ছেলেবেলায় টাইফয়েডে ভুগেছিল, সেই থেকেই অমনি স্বভাব হয়েছে। ভাল চিকিৎসা করলে ও সেরে যাবে।

পিসিমা রাগিয়া বলিলেন, তবে তুমি ভাল ক'রে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর নি কেন?

হরিচরণ বলিলেন, আমি গরীব লোক। কোথায় টাকা পাব বলুন!

পিসিমা বলিলেন, দেখ, মিথ্যের পরে মিথ্যে ব'লে পাপ আর বাড়িও না। মান থাকতে মেয়ে নিয়ে সরে পড়।

হরিচরণ বলিলেন, আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু কমলাকে নিয়ে কোথায় আমি যাব। এক রকম ভিক্ষে করে নিজের পেট চালাই। ওর বাবা মা বেঁচে থাকলে তারা একটা ব্যবস্থা করতে পারত কিন্তু আমি যে একেবারে অসহায় বেয়ান!

বাড়ীর ভিতর হইতে নগেন চীৎকার করিয়া ডাকিল, পিসিমা!

পিসিমা চলিয়া গেলেন।

হরিচরণ ইতস্ততঃ চাহিয়া হঠাৎ ভবতারণের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, মেয়েটার কপালে দুর্ভোগ আছে, খণ্ডাবে কে? ছেলের আবার বিয়ে দিতে চান দিন, কিন্তু ঐ হতভাগীকে শ্রীচরণে একটু স্থান দিন বাড়ুজ্যে মশাই, নইলে না খেতে পেয়েই ও সরে যাবে।

ভবতারণ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, মেয়ে রেখে যেতে চাও রাখ, কিন্তু তোমার মুখদর্শনও আর আমি করব না, তুমি পাষণ্ড!

জবাব পাইয়া হরিচরণ এক রকম দৌড় দিয়াই পলায়ন করিলেন।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, কই, কোথায় গেল সেই বিটলে বামুন?

ভবতারণবাবু বলিলেন, চলে গেছে।

পিসিমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, মেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল না যে বড়! একলা তাকে তুমি যেতে দিলে কেন?

ভবতারণ বলিলেন, বেশী দূর যেতে পারে নি এখনও, দাঁড়াও না ধরছি গিয়ে।

ধরিতে গিয়া ভবতারণ পড়িয়া গেলেন।

পিসিমা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ওরে ও নগেন, শীগ্‌গির এদিকে আয় বাবা! নাঃ, এমনি করেই এক দিন আমার সর্বনাশ হবে।

নগেন ছুটিয়া আসিল। আশপাশ হইতে আরও দুই-এক জন আসিল। সকলে ধরাধরি করিয়া ভবতারণকে বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল। সকলের পিছন পিছন কমলাও আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

শেষ পর্যন্ত কমলা এই বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

সেই দিন পড়িয়া গিয়া অবধি ভবতারণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। পিসিমাকে সকল সময় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে হয়। কমলার যত দোষই থাক্ তাহার স্বাস্থ্য ভাল। নদী হইতে বড় বড় কলসীতে করিয়া সে জল আনিতে পারে, ঢেঁকিতে চাউল, চিঁড়া তৈরি করিতে জানে, ঘর লেপিতে, উঠান ঝাঁট দিতে তাহার জুড়ি নাই। মোটের উপর নির্বিবাদে ভূতের মত সে খাটিতে পারে। তাহার উপর হরিচরণ এক প্রকার নিরুদ্দেশ। সুতরাং পিসিমা কমলাকে বাড়ীতে স্থান দিতে রাজী হইয়া গেলেন, কিন্তু নগেন বড় অপ্রসন্ন হইল।

দুপুর বেলায় খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া নগেন বাহিরে যাইতেছিল।

কমলা আসিয়া বলিল, আমাকে চুল বাঁধবার ফিতে একটা কিনে দাও।

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, ফিতে! হুঁ, সব সখই আছে দেখছি।

কমলা বলিল, দেবে না?

নগেন বলিল, না না, ভূতের অত সখ কেন?

নগেন বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ গোঁ গোঁ একটা শব্দ শুনিয়া পিসিমা আসিয়া দেখিলেন কমলা মাটিতে পড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া হাত-পা ছুড়িতেছে। চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, আর পারি নে বাপু, হতভাগী আমায় জ্বালিয়ে খাবে দেখছি। ওরে ও পদ্ম, এদিকে একটু আয় ত দিদি!

পাশের বাড়ীর মিত্রগৃহিণী আসিয়া পাখা লইয়া কমলার শিয়রে বসিলেন।

ভবতারণবাবু এখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইতে পারেন নাই। স্ত্রীকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বউমার কি কোন রকম চিকিৎসাই আজকাল হচ্ছে না?

উত্তরে পিসিমা বলিলেন, ও অসুখ সারবার নয়। মিথ্যে টাকা খরচ ক'রে লাভ কি?

ভবতারণবাবু কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

পিসিমা বলিলেন, তা ছাড়া নগেনেরও ইচ্ছা আবার বিয়ে করে।

ভবতারণ বাবু কোন উত্তর দিলেন না।

পিসিমা বলিলেন, কি, কথা বলছ না যে।

ভবতারণ বলিলেন, বেশ, করুক বিয়ে! আমার গায়ের উপর লেপটা চাপিয়ে দাও, বড্ড শীত করছে।

পিসিমা লেপটা গায়ের উপর টানিয়া দিলেন। তাঁহার আর কোন কথা বলা হইল না।

ভূতের ওঝা চিকিৎসায় সুবিধা না করিতে পারিয়া পূর্বেই বিদায় লইয়াছে। ভবতারণও সুস্থ শরীরে নাই যে এখান-ওখান হইতে ঔষধ আনিয়া দিবেন। সুতরাং কমলার চিকিৎসা ভগবানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

নগেনের বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ীতে ফিরিতে তাহার রাত্রি হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া সে দেখিল তাহার বিছানায় কমলা শুইয়া রহিয়াছে। নগেন তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, এ ঘরে তোমাকে আসতে কে বলেছে?

কমলা কোন কথা না বলিয়া শুইয়া রহিল।

নগেন বলিল, ওঠ বলছি, যাও এখান থেকে।

কমলা দুই হাতে বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যাব না।

নগেন তাহাকে টানিয়া খাট হইতে নামাইয়া দিল।

কমলা দুই হাত দিয়া দুয়ার আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, যাব না আমি।

নগেন সজোরে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া কহিল, তবে মর গিয়ে!

কমলা উঠানে গিয়া গড়াইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া পিসিমা বাহিরে আসিয়া কহিলেন, কি, হয়েছে কি?

নগেন চীৎকার করিয়া বলিল, আমাকে এ বাড়ীতে কি তোমরা থাকতে দেবে না!

কমলা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পিসিমা সবই বুঝিতে পারিলেন। রাগ করিয়া কমলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, এক-শ বার না বলেছি, ওর ঘরে তুমি ঢুকবে না। যাও, নিজের ঘরে যাও!

কমলা নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

পিসিমার দূরসম্পর্কের এক ভাই আসিয়াছেন। বাড়ীতে রান্নার বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। কমলা ভোরে উঠিয়া নদী হইতে জল আনিল, বাসন মাজিল, উনান ধরাইল।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, যাও, এবার নিজের ঘরে গিয়ে ব'স। ভদ্রলোকের সামনে আবার যেন বেহায়াপনা ক'রো না!

ভাই খাইতে বসিলে পিসিমা ক্ষীরের বাটি খুঁজিয়া পাইলেন না।

বাহিরের লোকের সামনে কমলাকে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন।

কিন্তু ভাই বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবা মাত্র কমলার দুর্দশার আর অন্ত রহিল না। নগেন আসিয়া কিল, চড় মারিল। পিসিমা রাগ করিয়া তাহার রাত্রের আহার বন্ধ করিয়া দিলেন।

বিছানায় শুইয়া ভবতারণবাবু সবই শুনিলেন। রাত্রি গভীর হইলে চুপি চুপি কয়েকটি ফল লইয়া কমলার ঘরে গিয়া দেখিলেন সে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া তুলিবার সাহস তাঁহার হইল না।

পাশের বাড়ীতে চুড়িওয়ালী আসিয়াছে। বাড়ীর

মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কমলা নিজের ঘর হইতে তাহা দেখিতে পাইল।

পিসিমা পূজায় বসিয়াছিলেন।

কমলা ত্রস্তে আসিয়া ডাকিল, পিসিমা!

পিসিমা পূজা রাখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, আবার তুমি আমার পূজার ঘরে ঢুকেছ! যাও এখান থেকে বলছি।

কমলার আর বলা হইল না। বাহিরে আসিয়া দেখিল নগেন ঘরে বসিয়া লিখিতেছে।

কমলা তাহার কাছে গিয়া নিজের নিরাভরণ হাত দুইটি দেখাইয়া কহিল, দেখ ত, একটা চুড়িও আমার নাই। দেবে কটা কিনে?

নগেন একমনে লিখিয়া চলিল।

কমলা তাহার পাশে বসিয়া বলিল, আর একটু আমসত্ত্ব আমায় কিনে দেবে? বড্ড ভালবাসি মিষ্টি আমের আমসত্ত্ব!

নগেন খাতা উঠাইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, দূর দূর, ছাই খেতে পার না!

বাহিরে আসিয়া পিসিমাকে বলিল, এ বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাব পিসিমা!

পিসিমা বলিলেন, তোকে আর চলে যেতে হবে না বাবা, আসছে মাসেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করছি।

এই বাড়ীতে কমলার সত্যকারের আপন জন কেহ নাই। সকলেই সামনে গেলে দূর, দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। মুখে দুইটি মিষ্ট কথাও কেহ তাহাকে বলে না। পিসেমশায় লোকটি ভাল, কিন্তু পিসিমার ভয়ে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নিজের ঘরে বসিয়া কমলা ভাবে সকলেরই ত মা, বাপ, ভাই বোন রহিয়াছে, তাহার বেলায় এমন হইল কেন? দাদু তাহাকে রাখিয়া এমন করিয়া পলাইল কেন? ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

পিসিমা যে নগেনের পুনরায় বিবাহ দিবেন, ইহা সকলেই জানে। ঐ ভূতে-পাওয়া অলক্ষ্মী মেয়ে লইয়া সংসার করা সম্ভব নহে। সুতরাং আত্মীয়-স্বজনেরা নগেনের জন্য মেয়ের খোঁজ আনিতে লাগিল।

পাশের গ্রামে একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পাইয়া পিসিমা নগেনকে লইয়া মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন।

কমলা আপন মনে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ভবতারণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, বউমা।

কমলা গিয়া তাহার পাশে বসিল।

ভবতারণ তাহার হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না।

পরে ভবতারণ কমলাকে বলিলেন, এমন ক'রে ওরা তোমাকে রেখেছে মা! ভাল একখানা কাপড়ও পরতে দেয় নি!

কমলা বলিল, না পিসেমশাই, কিছুই ওরা দেয় না। পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেয় না। চুলের ফিতে, কাঁচের চুড়ি, একটু আমসত্ত্ব, কি বা ওরা দিলে!

ভবতারণ বালিশের তলা হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, রেখে দাও, কাউকে দেখিও না যেন!

কমলা বিস্ময়ের সুরে বলিল, সবটাই আমাকে দিলেন?

ভবতারণ বলিল, হাঁ, আরও দেব।

কমলা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল, না, আর দেবেন না পিসেমশাই! টাকা দিয়ে কি করব আমি? জিনিস আমায় এনে দেবে কে?

কথাটি ভাবিবার বিষয় বটে! ধরা পড়িলে তাহার নিজের নিগ্রহও কম হইবে না! ভবতারণ বলিলেন, আমি সেরে উঠি, তার পরে সব তোমায় এনে দেব, কেমন?

কমলা বলিল, আপনি ছাড়া এ বাড়ীতে কেউ আমায় দেখতে পারে না পিসেমশাই!

ভবতারণ হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিসিমা স্বামীকে বলিলেন, চমৎকার মেয়ে! আসছে মাসেই দিন ঠিক করি, কি বল?

ভবতারণ বলিলেন, বেশ।

পিসিমা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া মেয়ের নানাবিধ গুণপনার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

ভবতারণ বলিলেন, ছেলের আগেও একবার বিয়ে হয়েছে এ কথা তাদের বলেছ ত?

পিসিমা বলিলেন, ওকে আবার বিয়ে বলে নাকি! সবই খুলে বলেছি, তাদের কোন অমত নেই।

ভবতারণ নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমলা সবই শুনিল, কিন্তু তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

নূতন বউ আসিতেই বাড়ীতে হৈচৈ পড়িয়া গেল! তাহার আদর-আপ্যায়ন, ঐশ্বর্য দেখিয়া কমলার ভাল

লাগিল না এই মেয়েটা এমন কি করিল যাহার জন্য এত হল্লা করিতে হইবে! নগেনেরও আজ আর পূর্বের মত তিরিক্ষি মেজাজ নাই। সুযোগ পাইলেই নূতন বউকে লইয়া সে হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করিয়াছে।

দূরে দাঁড়াইয়া কমলা সবই দেখিল কিন্তু কিছু বলিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে নূতন বউ মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে প্রশ্ন করিল, আমাকেও যদি ভূতে পায়?

নগেন হাসিয়া তাহাকে আদর করিয়া কহিল, তোমাকে যে-ভূতে পাবে সে ত এই সামনেই বসে রয়েছে।

নিজের রসিকতায় নগেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ ভয় পাইয়া নূতন বউ চীৎকার করিয়া উঠিল।

নগেন চাহিয়া দেখিল জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কমলা!

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দুয়ার খুলিয়া নগেন বাহির হইতেই কমলা ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। নূতন বউ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

নগেন সজোরে তাহার ঘাড় ধরিয়া প্রহার করিতে গেলে পিছন হইতে পিসিমা আসিয়া বলিলেন, থাক্, আজকার দিনে আর মারপিটে কাজ নাই! বউমা উঠে এস!

কমলা যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তাঁহার পিছন পিছন চলিয়া আসিল।

পিসিমা তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন।

অন্ধকার ঘরে একা বসিয়া কমলার মনে হইল তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এই বার বোধ হয় সে মরিয়া যাইবে। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, দাদু, দাদু গো!

কমলা ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

ভোরে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন চোখ দুইটি তাহার রক্তবর্ণ হইয়াছে, সর্বাঙ্গ জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে।

দুই দিনের মধ্যেই কমলা ভাল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু নূতন বউয়ের প্রতি তাহার আক্রোশ বাড়িয়া গেল। তাহাকে একা দেখিতে পাইলে সে কখন ভয় দেখায়, কখন বা মারিতে যায়।

নূতন বউ নগেনকে গিয়া বলে, ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। চল, আমরা অন্য কোথাও যাই।

নগেন সব শুনিয়া কমলাকে শাসন করিয়া আসে।

নূতন বউ প্রসাধন করিতেছিল।

চুপি চুপি পিছন হইতে আসিয়া কমলা বলিল, বড় যে একলা সেজেগুজে বেড়াচ্ছিস, আমি কি ভেসে এসেছি নাকি?

নূতন বউ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা বলিল, আমি কি করেছি যে কিছুই আমাকে দেবে না? তোর এত আদর কেন?

নূতন বউ বলিল, আমি কি জানি।

কমলা বলিল, না, জানিস না, ভারি দুষ্টু তুই।

পরে তাহার হাত ধরিয়া কমলা কহিল, বল্ আমায় শিখিয়ে দিবি নইলে মেরে তোকে ঠিক ক'রে দেব।

ভয় পাইয়া নূতন বউ পলাইয়া গেল।

এক দিন অকস্মাৎ ভবতারণবাবুর মৃত্যু হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল!

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, সংসার করবার সাধ আমার মিটেছে! আমাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা কর!

কয়েক দিন হইতে নগেনও এইরূপ একটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছিল। নূতন বউ কিছুতেই আর এই বাড়ীতে থাকিতে চাহিতেছে না। তাহার উপর সম্প্রতি খুলনা কোর্টে হঠাৎ তাহার চাকুরী হওয়াতে এই বাড়ী ছাড়িবার সুযোগও মিলিয়াছে।

পিসিমার ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া নগেন বলিল, তোমাকে কাশী পৌঁছে দিয়ে আমরাও খুলনায় বাসা করব।

পিসিমা বলিলেন, তাই করিস। কমলা থাকবে এই বাড়ীতে। ওকে ত আর ফেলে দেওয়া যাবে না। পদ্ম না হয় এই বাড়ীতেই এসে থাকবে। তুই মাসে মাসে ক'টা টাকা পাঠালে ওদের কোন অসুবিধা হবে না।

নগেন বলিল, বেশ, সেই রকম বন্দোবস্তই করব।

পিসিমাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে নগেন খুলনায় বাসা ঠিক করিয়া নূতন বউকে লইতে আসিল।

নূতন বউ বাক্স বিছানা গোছাইতেছিল।

কমলা আসিয়া বলিল, আমিও যাব।

নূতন বউ বলিল, আমরা আগে যাই, পরে তোমাকে এসে নিয়ে যাবে।

কমলা ভেংচি কাটিয়া কহিল, নিয়ে যাবে! তোকে কে এখানে আসতে বলেছে? ভারি ত দু-দিনেই বাড়ীর গিন্নী হয়ে গেছ, না?

নগেন আসিয়া কমলাকে তাড়া দিয়া কহিল, যাও, যাও, আর বকতে হবে না!

কমলা আর কিছু বলিল না।

নগেন নূতন বউকে লইয়া খুলনায় চলিয়া গিয়াছে।

সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। কমলা একা একা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভবতারণবাবুর ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে। আপন মনে বলে, পিসে-মশাই, আপনি গেলেন কোথায়? টাকা যে এখনও আমি রেখে দিয়েছি! আমার চুলের ফিতে, চুড়ি, আমসত্ত্ব কই?

মিত্র-গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, কি গো, তোমার নাওয়া-খাওয়া নাই? আর এমন বিশ্রী ময়লা কাপড় পর তুমি! যাও, কাপড় কেচে এস।

কমলা হাসিয়া বলিল, বাসায় গেলে নূতন বউ কেচে দেবে।

মিত্র-গৃহিণী রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, সেই আশাতেই থাক!

কয়েক মাস পরে নগেন হঠাৎ টাকা পাঠান বন্ধ করিল।

মিত্র-গৃহিণী কমলাকে বলিলেন, আমি গরীব মানুষ। তোমার খাবার ব্যবস্থা আমি কি ক'রে করব।

কমলা কোন কথা বলিল না।

মিত্র-গৃহিণী নগেনকে চিঠি লিখিয়াও উত্তর পাইলেন না। সুতরাং কমলাকে একা রাখিয়া তিনি নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিন কমলার একরূপ উপবাসেই কাটিল। একদিন হঠাৎ মিত্র-গৃহিণীর নিকট যাইয়া সে বলিল, কাল আমি খুলনায় যাব।

মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, তাই চলে যাও। এখানে থাকলে না খেয়ে মরবে। আমি সুরেশকে বলছি, সে তোমাকে পৌছে দিয়ে আসবে।

সুরেশ আসিয়া মিত্র-গৃহিণীকে বলিল, তুমি ক্ষেপেছ কাকীমা! আমি নিয়ে গেলে নগেনদা আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, বাসায় তোকে যেতে বলছে কে, শুধু দূর থেকে ওকে বাড়ীটা দেখিয়ে দিবি।

সুরেশ নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজী হইয়া গেল।

নূতন বউ রান্না করিতেছিল।

কমলা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি এসেছি।

তাহাকে দেখিয়া নূতন বউ চমকাইয়া উঠিল। বিস্মিত স্বরে বলিল, তুমি এখানে এলে কি করে?

কমলা বলিল, জান, কত দিন না খেয়ে আছি।

নূতন বউ বলিল, কেন বাড়ীতে টাকা পাঠায় না?

কমলা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, এইখানেই এখন আমি থাকব। কিছুতেই আর যাব না।

নগেন আসিয়া কমলাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল। কিন্তু নূতন বউ চোখের ইসারায় তাহাকে থামাইয়া দিল। পরে আড়ালে ডাকিয়া কহিল, তুমি এখন ওকে কিছু ব'লো না, তা না হ'লে ওকে সামলান যাবে না।

নগেন চুপ করিয়া গেল।

রাত্রে নূতন বউ আসিয়া নগেনকে বলিল, ওকে বাড়ীতে আর পাঠান যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

নগেন বলিল, যাবে আবার না! ঘাড় ধরে নিয়ে যাব।

নূতন বউ বলিল, তাহলে আবার ও ফিরে আসবে।

নগেন বিরক্তির স্বরে বলিল, আচ্ছা আপদ! কি করি তা হলে?

নূতন বউ বলিল, কার্তিক-ঠাকুরপোকে একবার খবর দাও। সে অনেক খোঁজখবর রাখে, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে।

কার্তিক নগেনের মামাত-ভাই। খবর পাইয়া সে আসিল। সব শুনিয়া বলিল, এমন জায়গাতে ওকে আটকে রাখা দরকার যেখান থেকে কিছুতেই ও আর ফিরে আসতে না পারে। কেমন, এই ত?

উৎসাহিত হইয়া নগেন বলিল, হাঁ হাঁ, নইলে আমার জীবন ও অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে!

কার্তিক একটু ভাবিয়া বলিল, ধাত্রীগ্রামে এই সব মেয়েদের জন্য একটা আশ্রম আছে। সেখানে তারা ওকে আটকে রাখবে বটে, কিন্তু মাসে মাসে তোমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।

নগেন বলিল, কত টাকা?

কার্তিক বলিল, একটা মেয়ের খাওয়া থাকার জন্য যেমন লাগে।

নগেন ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু নূতন বউ বলিল, বেশ তাই দেওয়া হবে। তুমি সব ঠিক ক'রে দাও ঠাকুরপো।

কার্তিক বলিল, ওখানকার সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি কালই চিঠি লিখে দিচ্ছি।

নূতন বউ বলিল, আর তোমাকেই কিন্তু ওকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে হবে।

কার্তিক রাজী হইয়া গেল।

নগেন বলিল, কিন্তু ও যদি না যেতে চায়?

নূতন বউ বলিল, সে ব্যবস্থা আমি করব।

নূতন বউ কমলাকে ডাকিয়া কহিল, উনি ধাত্রীগ্রামে বদলি হয়েছেন, শুনেছ?

কমলা বলিল, সে কোথায়?

নূতন বউ বলিল, অনেক দূরে, রেলগাড়ী ক'রে যেতে হয়।

কমলা বলিল, আমিও যাব।

নূতন বউ বলিল, তুমি ত যাবেই। কালই তোমাকে রওনা হতে হবে তুমি হবে বাড়ীর গিন্নী। সেখানে আগে গিয়ে আমাদের জন্য ঘরদোর ঠিক ক'রে রাখবে। চাকর, ঝি সব সেখানে আছে।

কমলা বলিল, সেখানে গেলে আমাকে দূর দূর করবে না?

নূতন বউ বলিল, না।

কমলা বলিল, আমাকে ভালবাসবে? চুলের ফিতে, চুড়ি, আমসত্ব কিনে দেবে?

নূতন বউ বলিল, নিশ্চয় দেবে।

কমলা বলিল, বিছানায় শুলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না?

নূতন বউ বলিল, না।

কমলা নগেনের সামনে গিয়া কহিল, এ সব সত্যি?

নগেন কহিল, সত্যি। তুমি কালই চলে যাও কমলা, আমরা দু-দিন পরেই যাচ্ছি।

নগেন তাহার সহিত এমন ভাবে কোন দিন কথা বলে নাই। আজ স্বামীর কথা শুনিয়া আনন্দে কমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বামীকে আজ সে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

পরে নূতন বউয়ের নিকট গিয়া তাহার কোলের শিশু-সন্তানটিকে দেখাইয়া কহিল, তবে ঐটে কে আমার কোলে দে।

নূতন বউ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছেলেকে তাহার কোলে তুলিয়া দিল।

কমলা বলিল, ওকে আমি নিয়ে যাব।

নূতন বউ বলিল, হায় রে আমার কপাল! ওর অসুখের জন্যেই ত আমরা কাল যেতে পারছি না। ও ছেলে ত তোমারই। ভাল হয়ে গেলে তোমার কাছে নিয়ে যাব।

কমলা ছেলের মুখে চুমা খাইয়া বলিল, অসুখ সেরে যাবে! তোমরা কিন্তু বেশী দেরি করবে না।

কমলা কার্তিকের সহিত রওনা হইয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিয়া কমলা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। এত আনন্দ তাহার আজ কোথা হইতে আসিল? সে যেন নূতন এক পৃথিবীতে চলিয়াছে।

ছোটখাটো সুন্দর সংসার। নগেন তাহাকে পাশে বসাইয়া কত গল্পই না শুনাইতেছে। কমলা বলিল, এত দিন আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিয়েছ কেন? আবার বিয়ে করেছ কেন?

নগেন বলিল, বিয়ে? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ না কি?

কমলা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাইত, স্বপ্নই ত! কোথায় নূতন বউ? এই বাড়ীতে সে ত একা। তবে তাহার বুকের মাঝে ঐ দস্যুটা কে? সস্নেহে দুই হাত দিয়া তাহার মুখটা ধরিয়া সে চোখের সামনে ধরিল। তাইত, এ ত নূতন বউয়ের ছেলে নয়। তবে এই দুষ্টুটা আসিল কোথা হইতে? অপূর্ব আনন্দের শিহরণে তাহার সর্ব দেহ-মনে রোমাঞ্চ খেলিয়া গেল।

কার্তিক আসিয়া কহিল, কমলা বৌঠান, শুনছ, শীগ্‌গির নেমে পড়। গাড়ী ছেড়ে দেবে যে!

ডাক শুনিয়া কমলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

কার্তিক তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসিল।

বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক ও রবীন্দ্রনাথ*

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাত-শ' বাইশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং কবির চারখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোর প্রতিলিপি সম্বলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই বিরাট্ খণ্ডটি বর্তমান যুদ্ধের দুর্মূল্যতার বাজারে প্রকাশকদের একটি সার্থক কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথের উনিশ-কুড়ি বছরের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গদ্য রচনা থেকে আরম্ভ করে তাঁর আশী বছর বয়সের কাজ, বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে রচিত, 'আদর্শ প্রশ্ন' পর্যন্ত কবির সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের লেখা এই খণ্ডে সংগ্রহ করা হয়েছে। 'অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডের 'বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩)' প্রবন্ধগুলি পড়া পাঠক সাধারণের অসম্পূর্ণ থাকবে যদি এই দ্বিতীয় খণ্ডের 'আলোচনা (১৮৮৫)' ও 'সমালোচনা (১৮৮৮)'গুলি তাঁরা না পড়েন। এই তিনখানি লুপ্ত গ্রন্থ একত্রে পড়লে কবির প্রথম যৌবনের অর্থাৎ উনিশ থেকে প্রায় তেইশ বছর বয়সের (১২৮৭—১২৯১) প্রবন্ধ রচনার একটি সুসঙ্গত ধারণা করা সম্ভব হয়। বাংলা সাহিত্যে সুখপাঠ্য প্রবন্ধের (ইংরাজি "এসে" ধরণের রচনার) শুভ জন্মলগ্নের অরুণবর্ণাভ এই সেই প্রথম প্রভাত।

এই খণ্ডের বৈশিষ্ট্য তার শেষাংশ, রবীন্দ্র-রচনার একটি নূতন জগৎ খুলে দেয় পাঠকের দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা যে অক্ষরে অক্ষরে 'সর্বতোমুখী' তার প্রমাণ পাই কবি কর্তৃক রচিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলীর বৈচিত্র্যে ও রচনা-পদ্ধতির সরস অভিনবত্বে। এই জাতীয় সব বইগুলি একত্রে পেয়ে শিক্ষা ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা বিশেষ উপকৃত হবেন। ঠিক্ 'অচলিত' আখ্যা না দেওয়া গেলেও এই গ্রন্থগুলির আশানুরূপ প্রচার আমাদের দেশে এখনো যে ঘটে নি সে কথা নিঃসংশয়ে বলব। 'মনোনীত' পাঠ্যপুস্তকের বিপুল বন্যার মধ্যেও তাই বাংলার ছাত্রেরা চিরতৃষ্ণার্ত। সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষার সুযোগ অতি অল্প; এ বিষয়ে প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন যাঁরা, ছাত্রদের নিকট-সম্পর্ক ত্যাগ করে তাঁদের অধিকাংশই অর্থের আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েন দপ্তরী কাগজপত্রের নির্জীব কীট। ছেলেদের সজীব মানসলোকের বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ দেবার মতো সূক্ষ্ম-বোধসম্পন্ন শিক্ষক দেশ থেকে যেন একেবারে লোপ পেতে চলেছে। প্রচলিত পাঠ্যবই আর ছেলেদের মন আজ তাই চলেছে যেন দ্বিধা-বিভক্ত ভিন্ন পথে। এমন দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথের রচিত এই পাঠ্যপুস্তকসংগ্রহ দেশের শিক্ষকদের বিবর্ণ অসাড় চোখে যদি নতুন দৃষ্টি নতুন আলোক এনে দেয় ত পরম সৌভাগ্য মনে করব। এ বইগুলির প্রত্যেকটি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে হাতে-কলমে নিজে প্রয়োগ করেছেন এবং পরম ধৈর্যসহকারে পরীক্ষা করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেছেন। ভূমিকা ইত্যাদিতে সেই অনুসারে মাঝে মাঝে বইগুলি ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশও তিনি দিতে ভোলেন নি।

ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব সুসম্পূর্ণ প্রণালী ছিল। প্রথমে ব্যাকরণ-কণ্টকিত প্রাচীন ভাষা শিক্ষার পরিচয় (Teaching of classical languages) পাই "সংস্কৃত শিক্ষা" বইটিতে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ বইটির প্রথম ভাগ আজও পাওয়া গেল না; এটির অন্বেষণে দেশবাসী সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। সংস্কৃত শিক্ষায় প্রথম থেকেই ছাত্রের মন ব্যাকরণের সূত্রজালে জর্জরিত করার তিনি যে বিরোধী ছিলেন, তাতে জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দেরই সগোত্র। তাঁর মতে "গোড়া হইতে প্রয়োগ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা", এই হ'ল সেরা ব্যবস্থা। এক কথায় তথাকথিত 'মৃত' ভাষাকে জীবন্ত ভাষারূপে শিক্ষা দিলে তবেই ছাত্রের অন্তরে তা প্রবেশ লাভ করবে।

সংস্কৃতের পর পাই ইংরাজি শিক্ষার প্রণালী। রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজি সোপানে'র প্রশংসা করতে গিয়ে মহামনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছিলেন—"ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Sauer প্রভৃতি ভাষাশিক্ষা পুস্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী-শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন।" অথচ বাংলা দেশের বিদ্যালয়ের অচলায়তনে এ বইগুলির আশানুরূপ প্রচলন কোনো দিনই হ'ল না। 'শ্রুতিশিক্ষা', 'সহজ শিক্ষা' ও 'অনুবাদচর্চা' ইংরাজি শিক্ষার এই তিনটি সোপানে অগ্রসর হবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশদভাবে করেছিলেন অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন পত্রে'র প্রথম বর্ষের কয়েকটি প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধগুলি "শিক্ষা" গ্রন্থে অনতিবিলম্বেই স্থান পাবে। সেখানে দেখা যায় 'শ্রুতিশিক্ষা'র পদ্ধতি নির্জলা ডায়রেক্ট মেথড-এর (Direct method) অনুসরণ মাত্র নয়। ওর মধ্যে বিশেষ একটি নতুন চিন্তা ছিল; কারণ রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, "ইংরেজি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থে Foreign Language (বা বিদেশী ভাষা) শিক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা ইংরেজের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না সে কথা মনে রাখা দরকার।" তাই তাঁর প্রণালীর শেষ ধাপ 'অনুবাদচর্চা'র কারণ—"আমরা মনে করি যত দূর সম্ভব মাতৃভাষার সঙ্গে বার বার তুলনা করিতে করিতে বাঙালীর ছেলেকে ইংরেজি শেখানো উচিত—অর্থাৎ যে ভাষা সে জানে সেই ভাষারই পটভূমিকার উপরে অন্য ভাষাটাকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলে তাহার চোখে অন্য ভাষাটা ক্রমশই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।"

এখানে বলা প্রয়োজন যে Selected Passages for Bengali Translation-এর উদ্ধৃত অংশগুলি মূল ইংরাজি থেকে চয়ন করা হয়েছে। ছাত্রেরা প্রথমে সেইগুলির বাংলা করবে ও 'অনুবাদচর্চা'র আদর্শ-বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিজেদের বাংলা মার্জিত করবে, তার পর নিজের চেষ্টায় সেই বাংলার আবার ইংরাজি অনুবাদ করে মিলিয়ে দেখবে ইংরাজি মূল বাক্যাবলীর সঙ্গে। 'অনুবাদচর্চা' ব্যবহারের এই হ'ল প্রকৃত প্রণালী। শান্তিনিকেতন পত্রেও উল্লেখ পাই রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায়: "ছেলেদের অল্প কিছুদূর ইংরেজি শিখাইবার পরই

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী: অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

তাহাদিগকে ইংরেজি হইতে বাংলা এবং সেই বাংলা হইতে ইংরেজিতে প্রত্যনুবাদের চর্চা করানো উচিত।"

'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বাংলায় অক্ষর পরিচয় থেকে সুরু করে যুক্তাক্ষরের পথ হয়ে ছাত্রদের নিয়ে যায় ছোটখাটো গল্প প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র ধরণের কবিতার রাজ্য পর্যন্ত। আমাদের সৌভাগ্যের কথা, এই দুটি বই দেশে তবু কিছু প্রচার লাভ করেছে। যে বয়সের প্রধান বাহন কল্পনা তার উপযোগী হয়েছে প্রত্যেকটি পাঠ। অক্ষরের ও ধ্বনির বিচিত্র লীলার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করে শিশুর মন।

'কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন করে।'

নানা তালে বাজতে থাকে কথাগুলি শিশুদের কানে যাদের সবেমাত্র হয়ত অক্ষর পরিচয় ঘটেছে। বর্ণপরিচয়ের কাঁটাবনে এমন বিচিত্র ছন্দের অজস্র ফুলফোটানো খেলা অবাক চোখে দেখি আর বই দুটিকে শিশুদের সঙ্গে নিজেরাও বার বার পড়ি।

সব শেষে সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের পাঠ্যতালিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত "আদর্শ-প্রশ্ন"। পরিশিষ্টে আছে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথকৃত প্রশ্নাবলী। প্রচলিত পরীক্ষারীতির চিরবিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকশিক্ষাসংসদের পরীক্ষায় তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শটিকে রূপ দেবার শেষ চেষ্টা করে গেছেন। এই প্রশ্নগুলিতে পেশাদার পরীক্ষকরা দেখতে পাবেন ছাত্রগণকে তাদের অজ্ঞতা সমঝিয়ে অযথা নাকাল না ক'রে তাদের প্রকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা কি ভাবে করা চলে। প্রশ্নপত্রে সাংকেতিক ভাষা প্রয়োগের একান্ত বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে প্রশ্ন দীর্ঘ হয় ক্ষতি নেই, অনভ্যস্ত পরীক্ষার্থীর পক্ষে প্রশ্নপত্র সহজবোধ্য হওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের এই দ্বিতীয় খণ্ডে শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ তথা সাধারণ শিক্ষকদের ব্যবহারের উপযোগী প্রচুর মালমশলা প্রকাশকেরা স্বল্পমূল্যে একত্রে প'রিবেশন করেছেন। কেদারায় শুয়ে এবই আর যাঁরাই পড়ুন শিক্ষাবিদ্‌রা নয়। তাঁরা বার বার পাঠ করবেন বইগুলির অন্তর্নিহিত প্রণালীর মূলসূত্রটি আবিষ্কারের প্রেরণায়; হয়ত উপযুক্ত ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে অদূর ভবিষ্যতে নূতনতর নানা তথ্যে তাঁরা ক্রমশঃ উপনীত হবেন। একথা নিশ্চয় জানি, অপরিসীম বিস্ময়ে তখন তাঁরা বারম্বার অনুভব করবেন স্বদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই উত্তর সাধক।

পথে ও ঘরে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমি ভালবাসি পথ, তুমি ভালবাস ঘর;—
তোমার আমার মাঝে দূরত্ব দুস্তর!
আমার পথের পাশে ছায়া কাঁদে, রোদ হাসে,
সম্মুখে নীলাকাশে দেখায় দিগন্তর,—
তাই চেয়ে পথ চলি—সেই মোর নির্ভর।

দু-জনের দুই দিক্, ললাটের বুঝি লেখা;
ঘরেরই দুয়ারে পথ, ক্ষণিকের তাই দেখা!
তোমার ঘরের মাঝে হেলায় লীলায় কাজে
যে কাঁকন দুটি বাজে নিয়ত নিরন্তর,—
তাহারই মায়ার ডোরে ভুলাতে চেয়ো না মোরে,
কে রাখিবে তারে ধরে, যেজন স্বতন্তর!
আমার সত্য পথ, তোমার সত্য ঘর।

ঘর চিরদিন ঘর—বাঁধা থাকে এক ঠাঁই;
পথ চিরদিন চলে—বিরাম তাহার নাই!
যদি কোনও শুভরাতে বিস্মিত দুটি হাতে
জানাতে ও অজানাতে অসীমের সীমা পাই,
সেই দিন দু-জনাতে দেখা পাব দু-জনাই!

ঘরে দেখা দিবে পথ, পথে দেখা দিবে ঘর;—
মিলনের মনোরথে ভরি দুটি অন্তর।

নাগপুরের পাহাড়-পর্ব্বতে

শ্রীসুষমা বিদ

প্রকৃতি তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে ছোটনাগপুরকে সাজিয়েছেন। এখানকার কঙ্করময় পথ-গুলি এমন সরল ও সুদূর-প্রসারী যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রাস্তাগুলির সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। পথের দুই পার্শ্বে আম জাম ও অশ্বত্থের যে অভিনব সমাবেশ, পশ্চিমাঞ্চলে তা দুরূহ না হলেও তেমন যে নয়নাভিরাম হয় না, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এখানে হয়ত মাঠে মাঠে সবুজ ধানের সুদৃশ্য নেই। প্রকৃতিকে তাঁর রাঙা :মাটির রুক্ষ বেশে, গেরুয়াবসনধারী সর্ব্বত্যাগী-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ; যেন কোন কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনে সমস্ত তনুমন পণ ক'রে আছেন। এখানে কানায় কানায় জলে- ভরা পুষ্করিণী হয়ত বেশী নেই, কলনাদিনী তটিনীর সাক্ষাৎও পদে পদে মেলে না। কিন্তু এর উদার অনন্ত আকাশে, বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে এবং ঘন পল্লব ছায়ায় যে মায়ার জাল বোনা আছে, তার আকর্ষণ সম্বরণ করা দুরূহ। এখানকার বাতাস তার দু-বাহু বাড়িয়ে আহ্বান করে, আর তার সেই আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

এখানকার মেঠো পথের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে পাহাড়, আর পাগাড়ের গায়ে গায়ে আছে ছোট ছোট চমৎকার জঙ্গল। সেগুলি এত পরিষ্কার, যেন মনে হয়, এই মাত্র তার তলাগুলি কে ঝাঁট দিয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আবার ঝর্ণা নেমেছে। কোথাও বা আছে জলপ্রপাত, আবার কোথাও বা সামান্য জল ও বালি নিয়ে প্রকৃতির ছেলেখেলা। ছোটনাগপুরের বাতাসে জলকণা এত সামান্য এবং মাটিতে বালির পরিমাণ এত অধিক যে বর্ষাধারা এখানে দধিকর্দ্দম সৃষ্টি করবার সুযোগ পায় না। জল অল্পক্ষণেই মাটিতে বসে যায়। তাই এখানকার নিবিড় অরণ্যেও যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি, তখন গাছের উপরের বহুবিধ বনবিহঙ্গের কূজনধ্বনি কানে এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু পথের উপর কর্দ্দমচিহ্ন দেখতে পাই নি। জ্যোৎস্নাপক্ষে এই আরণ্য বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে যখন চন্দ্রের উদয় হয়, তখন চোখের সামনে ভাসে এক অপূর্ব্ব মধুর স্বপ্ন। গিরিবেষ্টিত ছোটনাগপুরের নির্জ্জন পুরীতে তখন যে দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা ভারতবর্ষে অতুলনীয়।

রাঁচি সমুদ্রবক্ষ থেকে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র ফুট উচ্চে। এখানকার বাতাসে সঞ্জীবতার লক্ষণ আছে। প্রচণ্ড নিদাঘেও শরীর ঘর্ম্মাক্ত বা মন অবসাদক্লিষ্ট হয় না। দুই-ই এখানে অকারণে প্রফুল্ল থাকে। তাই এবার গ্রীষ্মে যখন কলকাতার গরম অসহ্য হয়ে উঠল, তখন খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট হ'তে লাগল, বিশেষ ক'রে আলিপুরের আবহাওয়ার সংবাদের দিকে। কিন্তু রাঁচির প্রখর উত্তাপ দেখে মন বিমর্ষ হয়ে যেত। তাই যেদিন সংবাদপত্র বর্ষার প্রথম বারিপাতের সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে এল, সেদিন আমার হৃদয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ময়ূরের মত নেচে উঠল। আর বিলম্ব না ক'রে মোটরযোগে আমরা রাঁচি উদ্দেশে রওনা হলাম। এ পথের বর্ণনা এত প্রকাশিত হয়েছে যে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে বরাকর নদীর পর থেকে বন্ধুর গিরি-বর্ত্মের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

রাস্তার দু-ধারে বিহারীদের পর্ণকুটীর ইতস্ততঃ দেখা যায়। মনে হয় এখানকার চাষীদের চাইতে আমাদের বাংলার চাষীর অবস্থা কিছু স্বচ্ছল, যদিচ সে স্বচ্ছলতা তার দু-বেলার অন্ন এবং পরিধানের বস্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে পাহাড় দেখা যায় আর পাহাড়ে নদী। সেখানে সামান্য জল ঝির ঝির ক'রে বয়ে যাচ্ছে, বালুরাশির উপরে উপল-প্রতিহত হয়ে। তার উপর সামান্য কখানা পাথর দিয়ে নির্ম্মাণ করা একটু সেতু। কিন্তু কত মজবুত। রাস্তার সব জায়গায় পিচ নেই ; কিন্তু বালি-কাঁকরের এই রাস্তা, কলকাতার পিচের রাস্তার চাইতে বেশী দিন স্থায়ী। গোবিন্দপুর থেকে আমরা বাঁ-দিকে ধানবাদের পথে অগ্রসর হলাম। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন ভাবে চলল—দিল্লী পেশওয়ারের উদ্দেশে।

অদূরে ট্রাঙ্ক রোডের উপর পরেশনাথের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জৈনদের পরমারাধ্য পরেশনাথদেবের মন্দির,

গিরিশৃঙ্গে মেঘের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কোথাও বা দুটি পাহাড়ের মাঝখানে, কোথাও বা অরণ্যভূমি পার হয়ে আমাদের রাস্তা এগিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে মনোরম শহর ধানবাদ পার হয়ে কয়লাখনির দেশ দিয়ে গাড়ী ছুটতে লাগল। বাঁয়ে ঝরিয়ার পথ, সামনে কাত্রাস। হঠাৎ একটা বৃহদাকার সেতুর উপর দিয়ে গাড়ী চলতে দেখে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। দেখি, দামোদর নদ, বর্ষার জলধারায় পুষ্ট হয়ে বিপুল স্রোতে দু-কূল ভাসিয়ে মহানন্দে চলেছে। এমনি নানা বৈচিত্র্যের মাঝ দিয়ে পুরুলিয়া রোড ধরে 'মুরি' এলাম। সেখান থেকে ক্রমাগত চড়াই উঠতে হ'ল। বর্ষার জলধারায় স্নাত তরুবীথি নানা বর্ণে রঞ্জিত ও বিবিধ পত্রে পুষ্পে শোভিত হয়ে, গিরিপথে কল্পনালোকের ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই রাঁচির নিকটবর্ত্তী টাটিশিলওয়াইতে পৌছলাম।

পথের ক্লান্তির পর এখানে আমাদের বাংলো স্বর্গপুরীর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যেন অভ্যর্থনা জানাল। অপরাহ্ণ-সূর্য্য পশ্চিম গগনে বিদায়-অভিবাদন জানাচ্ছেন।

বাস্তবিক এই নির্জ্জন পুরীতে যেন চিরশান্তি বিরাজ করছে। সামনে রেলওয়ে ষ্টেশন। সেখানকার কর্ম্মচারীদের বসতি ভিন্ন আশেপাশে আর লোকালয় নেই। রাস্তা দিয়ে ক্বচিৎ মুণ্ডা রমণী গান গেয়ে যায়। আধুনিক সভ্যতার বাহন মোটরবাস দু-একখানি যাতায়াত করে বটে, কিন্তু পক্ষীকূজন ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর কাছ থেকে এখানকার শান্তিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নেই। রেলগাড়ী আসে যায়, কিন্তু তা এত কম যে স্মৃতিপটে একটা ক্ষীণ রেখা এঁকে যায় মাত্র। এখানে সভ্যতার আনুষঙ্গিক কোন উপসর্গ নেই, জনকোলাহল নেই; আছে কেবল পরিপূর্ণ তৃপ্তি—শান্তি। কর্ম্মক্লান্ত মনকে অবসাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই যেন এই বিশ্রামকুঞ্জের রচনা। সময় পেলেই ছোটনাগপুরের নিরালা কুটীরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

এবার যখন এলাম, তখন দেখি বর্ষার কালো মেঘ আপনার ঘন বপু বিস্তার ক'রে সারা দিগঙ্গন ছেয়ে ফেলেছে। সৌদামিনীর ঘটারও অন্ত নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাই দূরে হাজারিবাগের পথ বেয়ে বৃষ্টি নাম্‌ছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমাদের বাংলো, বাগান, পুষ্করিণী ভাসিয়ে দিয়ে আবার চকিত চরণে দূরে হোরহাফের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তার ঝর ঝর শব্দ এবং চটুল চরণের চিরপলাতক দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য।

নেতারহাটে ঘাগড়াই জল-প্রপাতের উপর

বর্ষার ছোটনাগপুর যেন খেয়ালী প্রকৃতির বিশেষ সৃষ্টি।

কিছু দিন এমনি ক'রে কাট্‌ল, তার পরে ভাবলাম, বর্ষার ছোটনাগপুরের এই বিশেষ রূপটা ভাল ক'রে দেখতে হবে। রাঁচি থেকে হাজারিবাগ, চাইবাসা, গয়া প্রভৃতি যাবার পথগুলি সুন্দর কিন্তু পুরাতন। তাই ঠিক করলাম যাব নেতারহাটে। এটি বিহার-গবর্ণরের বিশ্রাম-নিকেতন, ফুরসৎ মতো তিনি এখানে আসেন। আমরা রাঁচি থেকে সরকারের অনুমতিপত্র নিয়ে মোটরযোগে বার হলাম। নেতারহাটে যাবার দ্বিতীয় কোনরূপ ব্যবস্থা নেই।

রাঁচি থেকে আট মাইল দূরে ছোটনাগপুরের মুণ্ডা রাজার (রাতুর রাজার) প্রাসাদ চোখে পড়ল। প্রাসাদের সামনে, রাস্তার পাশেই একটা প্রকাণ্ড দীঘি। আমাদের গাড়ী লোহারডাগার দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা পূর্ব্বের মতই সুন্দর। মাঝে মাঝে পাহাড়ে নদী আর নিকটে এবং দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পথে যথেষ্ট লোকসমাগম। মাঝে মাঝে ক্যাথলিকদের দু-একটি উপাসনা-মন্দির নজরে পড়ছে। অর্দ্ধপথে লোহারডাগা পার হওয়া গেল। এটি বেশ বড় শহর এবং রেলওয়ে

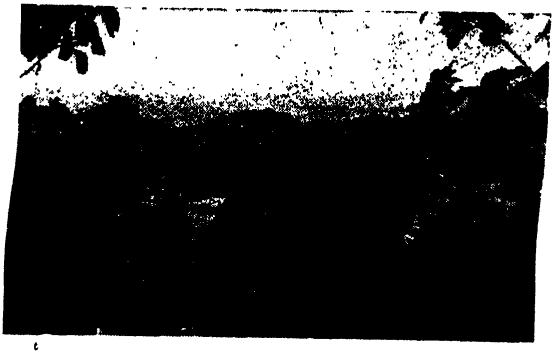

নেতারহাট হইতে একটি সমতল ভূমির দৃশ্য

টারমিনাস। নেতারহাটে যাবার পথে এখান থেকেই পেট্রোল শেষ কিনতে হয়, পরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা ভাল, ঐ জিনিসটি সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণেই নেওয়া উচিত, নইলে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই বাদ প'ড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। লোহারডাগা ব্যবসায়ের কেন্দ্র এবং এখানে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে।

আবার আমরা শহর ছাড়িয়ে চলেছি। দু-একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির কুটীর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন রাস্তা মাঝে মাঝে পাহাড় কেটে বার হয়ে গেছে। পথের ধারে দু-একটি ডাকবাংলা দেখা যায়। চলার পথে Seven Sisters নামক গিরিশ্রেণী হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাতটি ছোট ছোট পাহাড় সাতটি ছোট বোনের মত হাত-ধরাধরি ক'রে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। যেন হাসি-মুখ নিয়ে ক্লান্ত পথিকদের একটু প্রফুল্লতা দিতে যায়। সুন্দর উপভোগ্য দৃশ্য।

তার পরে পেলাম কোয়েল নদী। যাবার সময় দেখলাম আপনার ক্ষীণ দেহ নিয়ে সে কত কষ্টে এগিয়ে চলেছে। চেহারা দেখে মনে হয়, তার এই যাত্রা বুঝি শেষযাত্রায় পৌছবে। কিন্তু আসবার সময় দেখলাম কি তার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! বর্ষার উদ্দাম জলধারায় তার চেহারা পাল্টে গেছে, স্রোত বইছে ভীষণ বেগে আর তার কল্লোলধ্বনি শোনা যায় বহু দূর থেকে। নামসর্ব্বস্ব কোয়েল নদীকে আজ এই স্ফীতাবস্থায় যেন আর চেনাই যায় না।

তার পর আরও খানিকটা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে, প্রায় ৮৩ মাইলের মুখে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন পেলাম, বাঁ-দিকের পথটা নেতারহাটে গেছে। এইখান থেকে সত্যিকারের পাহাড়ে ওঠা সুরু হ'ল, যেমন হয় দার্জ্জিলিং কিংবা শিলঙের পথে। মাত্র তের মাইল পথ উঠতে হয়, কিন্তু তাতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। পাহাড়ের বুক কেটে কেটে এ পথ নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এর এক দিকে আছে উত্তুঙ্গ গিরি আর অপর দিকে অনন্ত খাদ। বহুবিধ পুষ্প নানা বর্ণে ফুটে আছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। অনেকগুলির সঙ্গেই পরিচয় নেই। মাঝে মাঝে নেমে এসেছে ঝর্ণা—মুখে তার চপল বালিকার কলহাস্য। খাদের দিকে কখনও দেখি কলার ঝাড়, কখনও বা বাঁশের। গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায় রাস্তায়। হিমকণা গায়ে মেখে পাহাড়ী বাতাস পুলক সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এই নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতি তাঁর আপন মহিমায় অসীম ঔদার্য্যে বিরাজ করছেন। তাঁর অনন্ত নীরবতা মনকে কোন্ রহস্যের সন্ধান দিয়ে যায়।

রাস্তায় দুটি হেয়ারপিন বাঁক (hairpin bend) চোখে পড়ল। এ জায়গায় খুবই সন্তর্পণের সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হয়। গাড়ী গরম হ'লে তাতে জল দেবার বন্দোবস্তও দু-জায়গায় আছে দেখলাম। আমরা আস্তে আস্তে চলেছি। পাশে টেলিগ্রাফের তার দেখা যাচ্ছে। রাস্তা অধিকাংশ স্থানেই ভাল। তবে বর্ষার জলধারায় কোথাও কোথাও হয়ত বা একটু খারাপ হয়ে গেছে। মেরামতের কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলছে দেখা গেল। প্রায় ন' মাইল এমনই ওঠবার পর 'ফগে'র দর্শন পাওয়া গেল। প্রথমে বৃক্ষের উপরে, পরে রাস্তার দু-ধারে এবং আরও পরে আমাদের পুরোভাগে, তার সঙ্গে নূতন করে আবার পরিচয় হ'ল। দৃশ্যটি বেশ ভালই লাগছিল, এ যেন স্বর্গরাজ্যে জলকন্যাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি।

পথের ধারে লোকের বসতি নেই, এমন কি তাদের মুখদর্শন হওয়াই দুরূহ। আরও খানিকটা যাবার পর দূর থেকে আমরা নেতারহাটের আভাস পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই আমরা এই ঘুমন্ত রাজপুরীতে প্রবেশ করলাম। এটা যে রাজপুরী তার কোন সন্দেহ নেই, আর যে বিশেষ ক'রেই ঘুমন্ত, সে বিষয়ে ত নিঃসন্দেহ। এটি পাহাড়ের বুকে এক সমতল ভূমি, দশ-বার মাইল লম্বা। বাঁশের প্রাধান্য এখানে, তার থেকেই নাম হয়েছে নেতারহাট। এই সমতল ভূমির চারি দিক ঘিরে আছে শাল আর পাইন বন। স্বর্গোদ্যানের মাঝখানে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর গড়েছেন শুধু এই নিদ্রিত স্বপ্নপুরী। এখানে লোক নেই, গ্রাম নেই, বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন জীব জানোয়ার পর্য্যন্ত নেই। না আছে খাবার জিনিস, দোকানপাট, না আছে ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য কোন প্রকারেরই জল। তবে

সান্ত্বনার মধ্যে এখানে যে চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তা বাস্তবিকই বিরল।

গবর্ণরের বাসভবনের নাম The Chalet. তার পথে একটি বিজয়-তোরণও আছে। সুরক্ষিত উদ্যানে গোলাপ, করবী আরও কত ফুল ফুটে আছে। অন্যান্য পারিষদদের জন্যে কতকগুলি বাংলোর বন্দোবস্ত আছে। সবগুলিই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। শয়নাগার, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা বেশ সন্তোষজনক। অদূরে গ্যারাজের ভাল ব্যবস্থা আছে। বহু অনুসন্ধানের পর চৌকিদারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তারই সাহায্যে এক নম্বরের বাংলোটি অধিকার করা গেল। এই বাংলোটি আবার সবগুলির মধ্যে সেরা। সবই ভাল, কিন্তু জল কোথায়? আকাশ ছিল মেঘাবৃত। আমাদের সকরুণ নীরব ও সরব প্রার্থনা ব্যর্থ হ'ল না। মুষল ধারায় বৃষ্টি নামল, আর আমাদের বাথটব, গামলা, ঘটি, বালতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভর্ত্তি হ'তে লাগল।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ভ্রমণে বার হলাম। সামান্য দূরেই পালামৌয়ের জেলা বোর্ডের বাংলো দেখা যাচ্ছে। সুন্দর বৃহৎ বাংলো, কিন্তু হায়, এক চৌকিদার ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তির দর্শন পেলাম না। কাঁকরের পথ বেয়ে, আরও প্রায় মাইল খানেক দূরে, 'ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস' দেখতে গেলাম। ফরেষ্টারদের থাকার জন্যে সেটি নির্ম্মিত হয়েছে। বেছে বেছে বেশ সুন্দর স্থানে এটা তৈরি করা হয়েছে।

খোলা বারান্দার থামে থামে অর্কিড ঝুলছে। লতা-পাতায় মিশে একটি প্রমোদোদ্যান বলেই ভুল হয়। চারি দিকেই পাইন ও অন্যান্য তরুরাজির অপূর্ব্ব সমারোহ। বাংলোর সামনে একটি চত্বরমণ্ডিত স্থান হ'তে সমতল ভূমি দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমরা আর সেদিন কোন সুযোগ পায় নি, যদিচ পরের দিন সে ক্ষতিপূরণ হয়েছিল। এই ফরেষ্ট বাংলোর চারি দিকে গোলাপ ও সিজন্ ফ্লাওয়ার ফুটে আছে। এই পথে আরও খানিকটা অগ্রসর হলে এখানকার একমাত্র জলাশয় দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই পথেই ঘাগড়ি জলপ্রপাতে যাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা উচিত এই ফরেষ্ট রেষ্ট বাংলো, পালামৌ বাংলো এবং ইনস্পেকশন বাংলোগুলিতে থাকার জন্যে রাঁচি অথবা পালামৌ থেকে বিশেষ বন্দোবস্ত ক'রে আসতে হয়, নইলে স্থানাভাবে বনে জঙ্গলে রাত কাটাবার আশঙ্কা আছে। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে

টাটিসিলওয়াইয়ের বাংলা

হবে যে, আহারাদি এবং পানীয় জল সঙ্গে আনাই বাঞ্ছনীয়। আশেপাশে খোঁজ করলে কিছু চাল ডাল হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; তার বেশী কিছু নয়।

যাই হোক, সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম। চাকরেরা আলো জ্বেলে রেখেছে, রান্নাঘর থেকে লোভনীয় গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরে সমান তালে বৃষ্টি পড়ছে। চেয়ার নিয়ে বসলাম। শীতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গায়ে গরম কাপড় চাপাবার প্রয়োজন হয়।

ভোরবেলায় উঠে দেখি, রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেই প্রকৃতি তাঁর রূপ পাল্টে ফেলেছেন। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু শালবনের মাথা থেকে 'ফগ' নেমে এসে সমস্ত উদ্যান ও কুটীর ভরিয়ে দিয়ে উল্লসিত চিত্তে ছুটাছুটি করছে। এখন জুন মাসের শেষাশেষি, ঠাণ্ডা ৭০ ডিগ্রির কাছাকাছি। যক্ষলোকে এই ক্ষণিকের অতিথির সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বন্ধু, ভাল আছ ত? সে হেসে, একটু মাথা নেড়ে সাড়া দিয়ে ক্ষণপরেই মিলিয়ে গেল, আর তার দর্শন পেলাম না।

সুপ্রভাত। আমরা নিদ্রিত পথে পাইচারি করতে লাগলাম। দূরে কোথাও রাখাল বালক গোপালনে ব্যস্ত, কোথাও বা শালশীর্ষে 'বৌ-কথা-কও' গাইছে। ফুলগুলি রূপে, রঙে মাতোয়ারা হয়ে হাত বাড়িয়ে আমাদের সুপ্রভাত জ্ঞাপন করছে। প্রভাতসূর্য্য আশীর্ব্বচন জানিয়ে যায়।

এমন সুন্দর জায়গাটি কেন যে স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে গড়ে ওঠে নি, সে কথা ভাবতে দুঃখ হয়। নেতারহাট প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। সূর্য্যের প্রখর তাপ নেই, বরং শৈত্যের আভাস মেলে। এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই। এ জায়গাটির কলোনী হিসাবে

নেতারহাটের পথে কোয়েল নদী

গড়ে ওঠবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা আছে ব'লে আমার মনে হয় না। একটু বেলা হতেই আমরা ঘাগড়ি জলপ্রপাতে স্নান সমাপন ক'রে এলাম। দুটি বিভিন্ন পথে পাচ এবং সাত মাইল ঘুরে, এই স্থানে পৌছান যায়। বর্ষার সময় রাস্তার শেষ দিকটা বিশেষ ক'রে খারাপ। শেষ পথটুকুতে গাড়ী চলে না। বর্ষায় রাস্তা ধ্বসে যাবার আশঙ্কায় ওটুকু পথ যানবাহনের পক্ষে এক রকম বন্ধ ক'রে দেওয়াই হয়েছে। তবে এই পথটা কষ্টে অতিক্রম করলে স্নানে অপার আনন্দ পাওয়া যায়।

অপরাহ্ণে আবার নেমে এল ছোটনাগপুরের উন্মত্ত বৃষ্টি। প্রচণ্ড তার বেগ, মুষল তার ধারা। বারান্দায় পাইচারি করি আর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টিধারার সেই প্রলয় নৃত্য দেখি। প্রশস্ত বারান্দায় তালের খুঁটি আর তাতে অর্কিডের মেলা। সামনে ক্রোটনের বেড়া-দেওয়া বাগান আর তাতে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল। হঠাৎ প্রচণ্ড দানবের মত অপার্থিব শব্দ ক'রে বৃষ্টিধারা নামে। মানুষের গড়া সৌন্দর্য্যকে উপহাস ক'রে তার উপর প্রকৃতি আপনার কঠিন হস্তের স্পর্শ রেখে যায়। শীতের রেণু গায়ে মেখে বাতাস বইছে। উপভোগ করছি বর্ষার আসা-যাওয়া, ঝড়-বাতাসের কান্না-হাসির পাগলামি।

বৃষ্টি থামার পরে দেখি, মেঘেরা দল বেঁধে পাহাড়তলায় বিশ্রাম করছে। প্রভাতসূর্য্যের প্রথম রশ্মিস্পর্শে তারা আলস্য ছেড়ে, ঝিলমিলিয়ে উঠে আবার দৈনন্দিন কাজে লাগবে, তার আগে নয়। এখন তাদের ছুটি ছুটি—ছুটি। আলো এবং অন্ধকারের লুকোচুরি বড় স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ছে। গোবৎস তার গলার কাঠের ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহে ফিরে গেল। দু-একটা পাখী শালবনে একমনে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বোধ হয় সঙ্গীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে। বনের গাম্ভীর্য্য উপচে প'ড়ে আমাদের কুটীর পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। আমাদের মনকে ভারী ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছে।

পরের দিন সকালবেলা আমরা 'রাজাডেরা' জলপ্রপাতের উদ্দেশে বার হ'লাম। রাজাডেরা এখানকার একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য জলপ্রপাত। নেতারহাটে ওঠবার পথ থেকে, বাঁ-দিকে এই রাস্তা বার হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে একটি পুলিস-ঘাঁটি আছে। তার পিছন থেকে মহোরদার উপত্যকা ও সিরজুগা পাহাড়ের অভিনব দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। খানিকটা আঁকাবাঁকা গিয়ে পথটি সমতল ভূমির উপর পড়েছে। এক দিকে তার পাহাড় ও উপত্যকা, অপর দিকে বিষ্ণুপুর এবং কোয়েল নদীর দৃশ্য ছবির মতই সুন্দর। ডুমারপাতে রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মমন্দির দেখতে পেলাম। প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রাজাডেরায় পৌছান গেল। রাস্তার শেষ দিকটা বড় সাবধানে যেতে হয়, কারণ বর্ষার হাত থেকে রাস্তা বাঁচাতে গিয়ে কাঠের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। নীচের দিকে শাঁখ নদীর দর্শন পাওয়া গেল। জলপ্রপাতটি আরও উচ্চে। স্নানের জন্য কয়েক জায়গায় বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আমরা মনের আনন্দে ঝর্ণার অনাবিল জলে মধ্যাহ্নস্নান সমাপন করলাম।

বড় চমৎকার দেখতে এই জলপ্রপাতটি। এর দর্শনে পথের সমস্ত কষ্টই দূরীভূত হয়। রাজাডেরার নিকট দুটি ডাকবাংলা আছে। একটি ছোটনাগপুররাজের, অপরটি পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টের। তবে এ সব বাংলায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এখানে আসতে হ'লে, সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য আনা উচিত, কারণ এখানে প্রায় কিছুই মেলে না। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর ওখান থেকে রওনা হয়ে আমরা সন্ধ্যার সময় আবার টাটিশিলওয়াইয়ে ফিরে এলাম।

এমনি ক'রে ছোটনাগপুরের পাহাড়-পর্ব্বতে এক পক্ষ কাল বেশ আনন্দেই কেটে গেল। এখানকার প্রদোষ ও গোধূলি, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী ও নিবিড়ান্ধকার কলকাতার বদ্ধ জীবের পক্ষে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কারণ। প্রকৃতির বিশ্রামাগারে যখন আমরা এমনি মনের সুখে দিনপাত করছি, তখন বাংলা দেশ থেকে খবর পেলাম, সেখানে বর্ষা নেমেছে; গ্রীষ্মের উত্তাপ আর অসহনীয় নয়। ধরণী সুশীতল হয়েছে। ছোটনাগপুরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পুরনো কলকাতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারত-সরকার সম্প্রতি তাঁদের নথিপত্র দেখবার নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্ত্তন করেছেন। অতঃপর ভারতীয় নথি-শালায় (ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সকল বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই নথি-শালা খবরের খনিবিশেষ। আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনার বহু মালমশলা এখান থেকে নানা উপলক্ষ্যে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ভাঁড়ারের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় সে যে কতটুকু এবং কত অনাবিষ্কৃত তথ্য যে এই সব পুরনো কাগজের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত আছে তার ব্যাখ্যা এক রকম অসম্ভব।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি কলকাতায় মহরমের মিছিল উপলক্ষ্যে এক অদ্ভুত ঘটনার উদ্ভব হয়। এই ঘটনায় শ্রীগৌর পোদ্দার ও শ্রীরাহু দত্ত নামক দুটি সাধারণ বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাভুক্ত হবার মতন না হ'লেও, তাদের ভাষণে সামাজিক অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা গণ-ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য্য।

কোন অজ্ঞাত লোক এক পরোয়ানা জারি করে যে, মহরমের সময়ে কলকাতা শহরে পাল্কী, গাড়ি চড়া নিষিদ্ধ এবং এই খবর শহরের চারিদিকে ঢেঁড়া পিটে প্রচার করা হয়। নিমতলা থেকে সুরু ক'রে মাণিকতলা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস পর্য্যন্ত কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে খবর প্রচার হয়। আসলে হুকুমনামা শহরতলীর উদ্দেশে জারি করা হয়েছিল কিন্তু হয় ভুলক্রমে, নয় স্বেচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে কলকাতা শহরে এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়। ফলে, যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তা সম্ভবতঃ কলকাতা কেন, বাংলা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। এই উপলক্ষ্যে শহরে দোকান-পাট লুঠ এবং মারপিঠ হয়। এবং এই আক্রমণ থেকে তখনকার কালের ইংরেজ বাসিন্দেরা বাদ পড়ে নি। সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে যে একখানা পরোয়ানা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু চারিদিকে পরস্পর-বিরোধী গুজব রটে। কোথাও শোনা যায় যে পুলিসের বড়কর্ত্তা এই পরোয়ানা জারি করেছেন, কোথাও বা শোনা যায় যে নবাব সাদাৎ আলি, আবার কোথাও বা শোনা যায় যে স্বয়ং শাসনকর্ত্তা ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এই আদেশ জারি করেছেন। অতএব সর্ব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শেষে গবর্ণর-জেনারেল খুব চটে যান এবং পুলিসকে কড়া হুকুম দেন এ সম্বন্ধে গভীর তদন্ত ক'রে আসল তথ্য তাঁর কাছে পেশ করবার জন্যে।

এই উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সামনে অনেককে জবানবন্দী দিতে হয়েছিল। তার মধ্যে গৌর পোদ্দার ও রাহু দত্তের বিবৃতির বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল। জবানবন্দী ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু উভয়ের বাংলায় নাম স্বাক্ষর আছে। গৌর পোদ্দারের জবানবন্দী এই রকম :—

সে শপথ গ্রহণ করে বলছে যে গত শুক্রবার ২৯শে জানুয়ারি ছিল এবং মুসলমান ছুটির শেষ দিন। সে সেদিন বৈঠকখানায় (বৈটক কোনা) তার দোকানে থাকায় দেখেছিল যে প্রায় পাঁচ-শ লোকের একটা প্রকাণ্ড দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা সবাই মুসলমান ছিল। তারা তার দোকানের কাছ দিয়ে যাওয়াতে সে দেখতে পেয়েছিল যে তাদের সঙ্গে একটি হাতী এবং একটি ঘাওরা অথবা হুসেনের শবাধারের অনুকৃতি ছিল। সে শুনেছে যে এই ঘাওরাটি গবর্ণর-জেনারেলের তাঁবে বহাল ভোলা জমাদারের।

সে আরো বলে যে তারা তার দোকানের কাছ দিয়ে ঘাওরা নিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোকদের (জেণ্ট্) মারধর করেছিল, যদিও ভদ্রলোকরা কোন রকম অন্যায় কাজ করেছিল বলে তার জানা নেই। এবং উক্ত মুসলমানরা ভদ্রলোকদের গলা থেকে হার (কবচ বা মাদুলি ?) খুলে নিয়ে চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই হার বাংলা দেশের ভদ্রলোকেরা ধর্মবিশ্বাসে পরে। সাক্ষীর চোখের সামনে তারা অনেক ভদ্রলোককে মেরেছিল, এবং অনেক দোকান লুঠ করেছিল। মুসলমানদের বলপ্রয়োগ দেখে সে দোকানে থাকতে ভয় পেয়েছিল এবং আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল। সে যখন তিন ঘণ্টা পরে আবার দোকানে ফিরে এসেছিল তখন তালা লাগানো বড় সিন্দুকটি নিরাপদে ছিল। কিন্তু তার হাতবাক্সটি থেকে ৭৫টি সিক্কা টাকা, ১টি আধা সিক্কা টাকা (আধুলি), একটি সিকি সিক্কা টাকা এবং ৫২টি আর্কট টাকা ও দু আনা, উপরন্তু সাড়ে পাঁচ সিকি ওজনের একটি সোনার হার, তার দাম হবে ৮৮ আর্কট টাকা, খোয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া, ২৭ আর্কট টাকা চোদ্দ আনা দামের ৪ থলি কড়ি, ২ আর্কট টাকা চার আনা দামের ১টি পিতলের ঘটি, জামা তৈরি করবার দু-টুকরো কাপড়, ১ আর্কট টাকা চোদ্দ আনা, একখানি দুলয় কাপড়, ৪ আর্কট টাকা আট আনা, একখানি গামছা, ৭ আর্কট আনা খোয়া গিয়েছিল। তার দোকান

থেকে টাকা, কড়ি ও জিনিসে সর্ব্বসমেত ৩০৬ টাকা ১ আনা ৬ পয়সা লোকসান ঘটে। সে শুনেছিল যে তার আশপাশের দোকানদারেরও যথেষ্ট লোকসান ঘটে। শহরের দূরবর্ত্তী অন্যান্য অংশেও গোলযোগের খবর সে শুনেছিল। কথিত ভোলা জমাদারকে সে চক্ষে দেখে নি, কাজেই সে বলতে পারে না যে ভোলা ঘাওয়ার সঙ্গে ছিল কি না। স্বাক্ষর—শ্রীগৌর পোদ্দার।*

গৌর ব্যবসায়ী লোক, কিন্তু কিসের দোকান তার তা বোঝা যায় না। সোনার হার, পেতলের ঘটি, টাকা, কাপড়, ছিট, গামছা, কড়ির খবর পাওয়া গেলেও তার বড় সিন্দুকটিতে কি ছিল তার সন্ধান মেলে না। কিন্তু যার মাত্র হাতবাক্স ও তার আশপাশ থেকে ৩০৬ টাকা দামের জিনিস পাওয়া যায়, তার সিন্দুকে অবশ্যই যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। গৌর যে দোকান ফেলে তিন ঘণ্টা পালিয়েছিল তাতে তার ভীরুতার প্রমাণ হয় না। কারণ আকস্মিক গোলযোগের ফলে শান্তিপ্রিয় লোকের মনে নানা রকম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং অজ্ঞাত আশঙ্কা বিরাট্ ভয়ে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজেরা লাভবান হবে ব'লে মুসলমানরা লুঠতরাজ করে নি। তা নইলে সোনার হার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেবে কেন এবং পোদ্দারের সিন্দুকই বা অটুট থাকবে কেন! তা ছাড়া গৌরের বর্ণনায় এমন কোন প্রমাণ নেই যে মারামারির ফলে রক্তপাত ঘটেছে। তা হ'লে গোলযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি একথা স্বভাবতই মনে আসে। কিন্তু এর কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

রাঘু দত্ত আদালতের বিচারপতিদের সামনে ২রা ফেব্রুয়ারি যে বিবরণ দেয় সেটি এই—

এই সাক্ষী যথারীতি শপথ গ্রহণ ক'রে বলছে যে সে শুক্রবার আদালতে উপস্থিত ছিল। কতকগুলি মুসলমান তাদের উৎসবের দিনে সেখানে ভীষণ দাঙ্গা (riot) করেছিল। জেলা কাছারির পিওনদের জমাদার শেখ পুনুজুকে এই উপলক্ষে খুব কর্মতৎপর দেখেছিল। আদালত-বাড়ীতে এবং যেসব লোক আদালতের আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকেও শেখ অনেক ইট ছুঁড়েছিল। তা ছাড়া, যেসব দাঙ্গাকারী ফিরে যাচ্ছিল তাদের এবং বিশেষ ক'রে ঢেঁড়াদারদের শেখ ডেকে ফিরিয়ে এনেছিল এবং আদালতের দরজার সামনে ঢেঁড়া পেটাবার হুকুম দিয়েছিল। শেখ পুনুজুকে ডেপুটি শেরিফ মিষ্টার ষ্টার্ককে অসভ্য ভাষায় গালাগালি করতে শুনেছিল। মিষ্টার ষ্টার্ককে লম্বা লোকটা ব'লে ডাক পেড়েছিল এবং বলেছিল যে মিষ্টার ষ্টার্ক তাকে ও তার দলের লোককে আদালতের সামনে গোল বন্ধ করে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিল ব'লে আমি তাকে খুন করব। স্বাক্ষর—শ্রীরাঘু দত্ত †

বৈঠকখানা ও আদালতের সামনে ঘটনার পার্থক্য অনেক। পোদ্দারের বর্ণনায় বিভীষিকার পরিচয় আছে, কিন্তু দত্তের ভাষণে প্রতিবাদ জানানর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈঠকখানায় লুঠপাট মারধর হয়েছে, কিন্তু আদালতের সামনে ঢিল ছোঁড়া, ঢেঁড়া-পেটানো এবং শেরিফকে গালিগালাজ করা হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত শেরিফকে খুন করা হবে ব'লে শাসানো হয়েছে—এই পর্য্যন্ত প্রমাণ হয়। বৈঠকখানায় আকস্মিকভাবে সবটা ঘটেছে কিন্তু আদালতের সামনে বারণ করবার পরে জোর প্রতিবাদ হয়েছে। অতএব স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে দুই জায়গায় একই দিনে ঘটনার বৈপরীত্য ঘটেছে।

তবে শেখ পুনুজু যে ভোলা জমাদারের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তি, শৌর্য্য ও বীর্য্যে উচ্চদরের লোক তা তার সূক্ষ্ম ধরণের কাজ দেখে অনুমান করা যায়। আদালতের আশপাশে যেসব লোক উপস্থিত ছিল, শেখ বা তার দলের লোক তাদের মারপিঠ করে নি, গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেয় নি এবং ইট ছোঁড়ার ফলে কেউ যে আহত হয়েছে তার প্রমাণ মেলে না। বস্তুতান্ত্রিক পোদ্দারের বর্ণনায় তার ঘটি গামছা, টাকাটা সিকেটার বিস্তৃত বিবরণ আছে কিন্তু দত্তের বর্ণনায় কয়েকটি মনোজ্ঞ ভাবের পরিচয় আছে। যেমন, গোলযোগের সময়ে শেখকে তিনি খুব কর্ম্মতৎপর দেখেছিলেন। কোন আকস্মিক ঘটনার মধ্যে কোন বিশেষ লোকের তৎপরতাকে লক্ষ্য করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি নয়। ঘটনা অতীত হ'লে যে-মন পূর্ব্বঘটনা যথাযথভাবে মনন ও প্রকাশ করতে পারে, এ বর্ণনাভঙ্গীতে রাঘু দত্তের সেই মনের পরিচয় মেলে। দত্তের ভাষণে আর একটি কথা আছে। শেখ শেরিফকে লম্বা লোক* বলে ডাক দিয়েছিল। বাঙালী দৈর্ঘ্যে কম বলেই কি তার এই বক্রোক্তি? না এটা শেখের রসজ্ঞানের পরিচয়? রসজ্ঞান জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। অতএব শেখ গৌর পোদ্দার বা ভোলা জমাদার জাতের লোক নয়। রাঘু দত্তের অপূর্ব্ব বর্ণনাভঙ্গীতে শেখের চরিত্রের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তাঁর নিজের রুচির ও সভ্যতা-জ্ঞানের আন্দাজ করা কঠিন নয়। তা নইলে শেখ অনেক অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল ব'লে শেষ করতেন না।

অতঃপর এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ এবং ঢেঁড়া-পেটার কাহিনী কলকাতার পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ চার্লস ষ্টাফোর্ড প্রেডেলের জবানবন্দীতে পাওয়া যায়।

২৭শে ফেব্রুয়ারি প্রেডেল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম

* Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. B. B.

† Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. C.C.

* লম্বু, ঢ্যাঙা, লম্বোদর প্রভৃতি ঠাট্টা এবং সময় সময়ে বিদ্রূপাত্মক।

আদালতে বলেন যে, ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি চিৎপুরের *ফৌজদার মীর কমলুদ্দী হোসেন* এবং *সেখানকার দারোগা শেখ মহম্মদ মকিমকে দুখানা চিঠি লিখে খবর পাঠান* যে তিনি তাদের সঙ্গে পরের দিন দেখা করবেন। কারণ তিনি গুজব শুনেছিলেন যে হোসেন অথবা মকিম অথবা নবাব সাদাৎ আলির হুকুমে কলকাতা শহরের মধ্যে এই ব'লে ঢেঁড়া পেটানো হয়েছিল যে মহরম মিছিলের সময়ে শহরে কি ইংরেজ কি হিন্দু কেউই পাল্কী চড়তে পারবে না। চিঠি পেয়েই হোসেন ও মকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং বলেছিল এই হুকুম তারা দেয় নি তবে নবাব দিয়েছেন কিনা তাও জানে না।

এমন সময়ে ৩রা ফেব্রুয়ারি গবর্ণর-জেনারেলের কাছ থেকে এ বিষয়ে কঠোর ভাবে অনুসন্ধান করবার জন্যে হুকুম এল। কারণ তখন গুজব রটেছে যে স্বয়ং গবর্ণর-জেনারল বা নবাব এই পরোয়ানা জারি করেছেন। কাজেই প্লেডেল সাহেব তাঁর তাঁবে পুলিসের কাজে নিযুক্ত পদস্থ কর্ম্মচারী গোপী নাজিরকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে নির্দ্দেশ দেন এবং সত্য আবিষ্কারের জন্য সব রকম পন্থা অবলম্বন করবার ক্ষমতা দেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি গোপী নাজিরের কাছ থেকে একখানা কাগজ পান, বিশ্বাস, সেখানা মীর কমলুদ্দী হোসেনের রচিত ফার্সি পরোয়ানার প্রতিলিপি। এর ইংরেজী অনুবাদ তিনি পেশ করেন।

এই পরোয়ানা হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে হোসেন প্লেডেল সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে স্বীকার করে যে এ পরোয়ানা জারি সেই নিজের মতলবে করেছে, নবাব এ বিষয়ে কোন আদেশ দেন নি। তবে এই হুকুমনামা কলকাতা শহরের বাইরে কেবল মাত্র পঞ্চবন গ্রাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল।

অতঃপর প্লেডেল সাহেব গোপী নাজিরকে এই ঢেঁড়া-পেটানো সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করবার আদেশ দেন। তার ফলে, তিল্লোকরাম শা, হরিকিষণ চৌধুরী, সীতারাম তেওয়ারী এবং উদয় সিং দয়াল নামক চার জন লোক পুলিস-কাছারিতে উপস্থিত হয়ে ঢেঁড়া-পেটা সম্বন্ধে বিবৃতি দেয়। এগুলি আদালতে পেশ করেন।

তার পর তিনি বলেন যে কলকাতায় যখনই ঢেঁড়া পিটে কোনো হুকুম জারির দরকার হ'ত তখন যথা-সময়ে পুলিসের কাছে দরখাস্ত ক'রে অনুমতি নিতে হ'ত। কিন্তু তিনি মহরম উপলক্ষে ভদ্রলোক এবং ইংরেজদের পাল্কী চড়া নিষিদ্ধ জ্ঞাপক কোন আবেদন পান নি। উপরন্তু কলকাতায় যে গুজব রটেছিল যে নবাব সাদাৎ আলির হুকুমে এবং প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটে, *প্লেডেল সাহেবের গভীর অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় তা* সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর বিশ্বাস নবাব *প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন নি।* এবং তিনি নিজে কিংবা তাঁর কোন কর্মচারী এ হুকুমনামা জারি করেন নি।

পরিশেষে প্লেডেল সাহেব বলেন যে তিনি ১৭৫৫ সাল থেকে কলকাতার অধিবাসী। ২৮ বছর বাংলা দেশে বাসের মধ্যে মাত্র ৬ বছর তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন। চার বছর আন্দাজ তিনি জমিদারি আদালতের হাকিম ছিলেন এবং ১৭৫৯ সাল থেকে কলকাতার পুলিস সুপারিন্টেন্-ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এত দিনে কলকাতাকে তিনি বেশ ভাল ভাবেই জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান হুকুমনামা কোন পদস্থ লোকের কাজ ব'লে তিনি মনে করেন না। *

এখন দেখা যাচ্ছে যে পরোয়ানার প্রতিলিপি হস্তগত হবার পরেই মীর কমলুদ্দী হোসেন প্লেডেল সাহেবের কাছে এসে স্বীকার করে যে পরোয়ানা তারই প্রস্তুত কিন্তু কলকাতার সীমানার বাইরে পঞ্চবন গ্রাম সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। কিন্তু যে কারণেই হোক্, পরোয়ানা পঞ্চবন গ্রামে জারি না হয়ে কলকাতায় হয়েছিল। যদি ভুলক্রমেই ঘটে থাকে তাহলে চিৎপুরের ফৌজদার এবং জমাদার উভয়েই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার কারণ কি? এবং প্রথম বারে যখন প্লেডেল সাহেব তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান, তখন তারা পরোয়ানা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, একথা বলার কারণ কি? পরিষ্কার না হ'লেও আন্দাজ করা যায় যে এরা দু-জনে পরামর্শ ক'রে এ কাজ সুরু করে থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কি? দুঃখের বিষয়, আদালতে এদের কোন জবানবন্দী নেই। থাকলে, অবশ্যই সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য হ'ত।

কিন্তু গোপী নাজিরের কেরামতি অপূর্ব্ব। গোপী সম্ভবতঃ তখনকার কালের গোয়েন্দা। সে যে পদস্থ ব্যক্তি তা প্লেডেলের ভাষণেই জানা যায় এবং শিক্ষিতও যে ছিল, সে বিষয়ে তার কার্য্যকলাপ বিচার করলে সন্দেহ থাকে না। তার ক্ষমতার ওপর প্লেডেলের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

যে পরোয়ানা নিয়ে এত গোলযোগ, অতঃপর *সেটি* বিচার করে দেখা যাক্। পঞ্চবন গ্রাম কোথায় ছিল, তার বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে।

* Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. F.

পরোয়ানার প্রতিলিপি*

পঞ্চবন গ্রাম পরগণার থানাদার মাস্তবর মির মুফিজউল্লা নিরাপদে থাকুন।

কলকাতা শহরের বাইরে পঞ্চবন গ্রামের অন্তর্গত ইটালী, শিয়ালদা, বেগমারি এবং শুঁড়া এবং বালিয়াঘাট এবং কুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহা ঘোষণা করা যাবে যে মহরম উপলক্ষে দশ দিনের শোকের সময়ের এই কটি দিন আরক (মদ্য) বিক্রেতারা তাদের দোকান বন্ধ রাখবে এবং বারবনিতারা কাকেও তাদের ঘরে আসতে দেবে না। এই ঘোষণার পর যদি কেউ মদ্য পান ও বিক্রি করে উপরন্তু বারবনিতারা এবং তাদের গৃহে যারা গতায়াত করে তাদেরও ধরে আনা হবে এবং শাস্তির দ্বারা সংশোধিত করবার জন্ত।

২০শে আষাঢ়ে মহরমের পবিত্র মাসের ষষ্ঠ দিনে লিখিত।

পরোয়ানার শিল—
"মির কমুল-উদ্-দিন্ হুসেন
চিৎপুরের ফৌজদার"

* Home Dept. Public Cons, 13 May 1779, No. F.

এই শহরতলীতে আগেও গোলযোগ ঘটে না থাকলে এ রকম পরোয়ানা জারির সার্থকতা কি? অসংযমের পরিণামে চিরকাল সর্ব্বত্রই গোলযোগ ঘটে থাকে এবং এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। দেড়-শ বছর আগে কলকাতায় বা শহরতলীতে মদ্য ও রূপ-ব্যবসা সচল ছিল। অনুমান করা যায়, অন্ততঃ শহরতলীতে শাসন-ব্যবস্থা ভালই ছিল। এই পরোয়ানা জারি করার ফলে ১৬২ বছর আগে কলকাতায় যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় তা অভিনব। এই উপলক্ষে শহরের হিন্দু অধিবাসীদের চেয়ে ইংরেজরা যে বেশী উৎপীড়িত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

গোধূলি

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

ভেবেছিনু কথা আছে; তাই কাছে
গিয়াছিনু যেচে,
শুনিতে চাহিলে যেই, দেখি সব
কথা ফুরায়েছে!
যে-কথা বলি নি কাল, কি করিয়া
বলি আজ তাই?
তোমারে বলার মতো কোনো কথা
মুখে আর নাই।
মোর স্বপ্ন-পসরার কেমনে বা
দিব পরিচয়,
আছে যাহা কল্পলোকে, মুখে সে ত
বলিবার নয়।
আর যত বাকী কথা-আবর্জনা
ছদ্ম ভাষণের,
শীতল অঙ্গাররাশি ধৌতচিতা
নিদগ্ধ প্রাণের।
জনহীন তেপান্তর, শ্রুতিহীন
পথের পাদপ—
এ সমাজে, এ সংসারে অবশিষ্ট
শ্রোতা মোর সব।

বলি যদি মর্ম্মবাণী উচ্চকণ্ঠে
বাতাসের কানে
হয়ত লাঘব হবে জমেছে যা
বেদনা পরাণে।
অন্তরঙ্গ যে-মিতালি সে এখন
রচিব কেমনে,
তুমি এলে হাসিমুখে, অশ্রুকণা
আমার নয়নে

অয়ি স্নিগ্ধ ইন্দুলেখা! জীবনের
গোধূলি-বেলায়
তব শুভদৃষ্টি হ'ল শেষ কড়ি
পারের ভেলায়।
রাঙা হ'ল অস্তাচল এ বিদায়-
বেদনা-শোণিতে,
তারায় তারায় মোর মর্ম্মকথা
রহিবে ধ্বনিতে।
তুমি তাহাদের সাথে দিবে যবে
নভাঙ্গন পাড়ি
শুনিবে করুণ রাগ,—জেনো তাহা
আকুতি আমারি॥

বিবিধ প্রসঙ্গ

"প্রবাসী"র নূতন বৎসর

একচল্লিশ বৎসর পূর্বে স্বর্গগতা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর পূর্ণ সহযোগিতায় প্রয়াগে "প্রবাসী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের কৃপায় ইহা এখনও বাঁচিয়া আছে এবং দ্বিচত্বারিংশত্তম বৎসরে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া নববর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

—

চলিষ্ণু ভারত

পাশ্চাত্য দেশের লোকদের একটা ধারণা ছিল যে, প্রাচ্য মহাদেশ স্থাণু অচলায়তন বিশেষ—সেখানে কোন পরিবর্তন হয় না। আশা করি, জাপানের আক্রমণে এবং চীনের তার প্রতিরোধে পাশ্চাত্য এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ কাউকে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু সেও স্থাণু নয়। তারও প্রাচীন উপদেশ চলিষ্ণুতারই উপদেশ, অগ্রগতিরই উপদেশ। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্"-এর একটি উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় "তুমি চল" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখেছেন, তা "প্রবাসী"র অন্যত্র দ্রষ্টব্য। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্" ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত। অধ্যাপক ডক্টর আর্থার বেরিডেল কীথ বলেছেন, এর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর চেয়ে আধুনিক নয়। এই শাস্ত্রে চলিষ্ণুতার যে উপদেশ আছে, তাই আমাদের দেশে কর্মিষ্ঠতার একমাত্র উপদেশ নয়। ভগবদ্গীতায় তার উপদেশ আছে। যোগবাশিষ্ঠেও আছে। জড়তা প্রকৃত সাত্ত্বিকতা নয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌরুষের যে জয়গান, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও তাই। ইহলোকের দাবীকে অগ্রাহ্য ক'রে পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি অত্যধিক আসক্তি কেন যে আমাদের চিত্তকে এমন ক'রে অধিকার করল ভাববার কথা। অথচ ভগবদ্গীতায় কর্মবাদের জয়ধ্বনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার উপদেশ। জাতীয় জীবনে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে অবসাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল আমাদের মন। পরাজিত ইহুদী জাতির মত আমাদেরও কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল, Vanity of Vanities, All is Vanity. "মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।" কোন্ দিন বেগুন খেতে হয় এবং কোন্ দিন হয় না—এই নিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক রইল ব্যস্ত। চলার বাণী গেলাম ভুলে, আচারের অচলায়তনের মাঝে আমাদের পৌরুষ লাভ করল পঙ্গুত্ব। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ থেকে কয়েকটা জায়গা এখানে তুলে দিলাম—সেখানেও 'চরৈবেতি'র সুর।

"যাহার পৌরুষ নাই, সে লোষ্ট্রবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া অতিকষ্টে কাল যাপন করে। পৌরুষ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, দৈব সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। পৌরুষ সাক্ষাৎ মুক্তি, দৈব সাক্ষাৎ বন্ধন। পৌরুষ সাক্ষাৎ আলোক, দৈব সাক্ষাৎ অন্ধকার। পৌরুষ সাক্ষাৎ স্বর্গ, দৈব সাক্ষাৎ নরক। যাহার পৌরুষ নাই, সে আপনার অপেক্ষা উন্নতিশালী পুরুষদিগের উন্নতিকে দৈবমূলক মনে করে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পৌরুষ সহায়ে ঐরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা তাহার বোধ হয় না। শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা যে যত্ন করে, উদ্যমহীন ব্যক্তিরা তাহাকেই আপনাদের নিয়ন্তা বা প্রভুদৈব বলিয়া থাকে। যেখানে যত্ন বা উদ্যোগ নাই, সেইখানেই প্রাক্তন কর্মের প্রবলতা ও তন্নিবন্ধন পরাজয় লক্ষিত হইয়া থাকে।"

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ : মুমুক্ষু প্রকরণ : ষষ্ঠ সর্গ)

"রাম, সংসারে মৃত ভিন্ন অন্য কাহাকেই স্পন্দনশূন্য দেখা যায় না এবং কার্য্য না করিলেও ফলপ্রাপ্তির কোনোই সম্ভাবনা নাই। লোকে অগ্রে হস্তপদাদি চালনা করিয়া আহার সংগ্রহ করে, তবে ভোজন করিতে পায়। ইহাই পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল। দৈবের ফল একেবারেই অসম্ভব। কেননা দৈব নিজে অক্ষম ও অপদার্থ। সেই জন্য অনর্থময় দৈব ত্যাগ করিয়া অর্থময় পুরুষকার আশ্রয় করাই সর্বথা শ্রেয়ঃ কল্প। কার্য্যের কারণ সকল বিদ্যমান থাকিলেও হস্তপদাদি চালনা করিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পুস্তক থাকিলেই বিদ্যা লাভ হয় না, উহা অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপ লেখনী থাকিলেই লেখা হয় না, হস্ত দ্বারা লিখিতে হয়। দৈবের উপর নির্ভর কর, ঐ সকল কখনই সম্পন্ন হইবে না। আমি এই বসিয়া আছি, দৈব আমার অন্যত্র বসাইয়া দিক্ দেখি। ফলতঃ আমি হস্তপদাদি চালনা পূর্ব্বক স্বয়ং গাত্রোত্থান না করিলে আমায় উঠাইয়া দেয়, দৈবের এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অতএব সকলেরই পুরুষকার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৈব কিছুই নহে এবং নিরাকার আকাশবৎ দৈবের সহিত কাহারই কোনো সম্পর্ক নাই। দৈব নামে কোনো পদার্থ থাকিলে অবশ্যই দেখা যাইত। সুতরাং দৈব শব্দমাত্র কোনো বস্তুই নহে।"

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ : মুমুক্ষু প্রকরণ : অষ্টম সর্গ)

"এইরূপ দৈব ও অদৃষ্ট নির্ভরতায় প্রতিদিন প্রতিপদে যে সর্ব্বনাশ ঘটনা হইতেছে তাহা ভাবিলেও শোক জন্মে! লোকে বিনাযত্নে কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য দেবতাদিগকে সময়ে সময়ে যে পূজাদি প্রদান করে তাহা ভাবিয়া দেখিলে পূজা নহে, জঘন্য উৎকোচ মাত্র। দেবতা কখনও এই উৎকোচে সন্তুষ্ট নহেন। বরং রুষ্টই হইয়া থাকেন। এই জন্য দেবোদ্দেশে পূজাদি প্রদান করিয়াও লোকের প্রকৃত ফল পাওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।

* * *

কর্ম্ম না করিলে পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোকশূন্য, অগ্নি তেজঃশূন্য, গ্রহগণ জ্যোতিঃশূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনী শূন্য এবং তজ্জন্য সমস্ত

ভুবন অস্তিত্বশূন্য হইত। তুমি, আমি, সে, কেহই থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি শূন্য হইত। মেঘ আর জল দিত না; পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না; নদী আর প্রবাহিত হইত না; সাগর আর সলিলের আধার হইত না; পৃথিবী আর বহন করিত না। ফলতঃ সকলই লোপ পাইত। অতএব কর্ম্মই জীবন ও অকর্ম্মই মৃত্যু ভাবিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মসাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।"

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ : উৎপত্তি প্রকরণ : ত্রিষষ্টিতম সর্গ)

—

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

নূতন বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আগতপ্রায়। বৎসরের প্রথম দিনে তাঁর স্বদেশবাসীরা যেমন তাঁর বাণী শুনে উদ্বুদ্ধ হ'ত, তেমনি তাঁর জন্মদিনেও গদ্যে ও পদ্যে তাঁর বাণী শুনতে তারা অভ্যস্ত হয়েছিল। আমরা এখন আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না, জন্মদিন সম্বন্ধে তিনি আর কবিতা লিখবেন না। তিনি যে-লোকে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর নবজন্ম হয়েছে। সে বিষয়ে তাঁর বাণী আমরা জান্‌তে পারব না।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ করবার কিছু নাই। তিনি বাংলা দেশকে, ভারতবর্ষকে, প্রাচ্য মহাদেশকে এবং সমগ্র পৃথিবীকে যা বলে গেছেন, আমরা তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি কিনা, যা সত্য ব'লে বুঝতে পেরেছি জীবনে তার অনুসরণ করেছি কিনা, তাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া উচিত। সত্য বটে, তিনি মর্ত্যলোকে বেঁচে থাকলে আরো কত অমূল্য ধন মানুষকে দিতেন। কিন্তু যা দিয়েছেন, তাকেই আত্মায় গ্রহণ ও জীবনে অনুসরণ যখন আমরা পর্য্যাপ্তরূপে করতে পারি নি তখন তিনি আরো দীর্ঘ কাল বেঁচে থেকে অমূল্য সম্পদ আরো অধিক পরিমাণে কেন আমাদিগকে দিলেন না—এরূপ দুঃখ করা বৃথা। যা দিয়ে গেছেন, তারই স্বাঙ্গীকরণ যাতে যথেষ্ট হ'তে পারে সেই চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য।

তাঁর মৃত্যুর পর শোকসভা কত যে হয়েছিল, বলা যায় না। এই সভাগুলি যে লোক-দেখান শোকসভা এমন মনে করি না—শোক সত্যই হয়েছিল। এই সকল সভায় এবং তার পরও কবির স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব অনেক হয়েছিল। তার মধ্যে নিখিল ভারতীয় রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা কমীটির প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কল্‌কাতার টাউন হলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীতে যে শোকসভা হয়, তাতে সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুকে সভাপতি ক'রে এই কমীটি গঠিত হয়েছিল। সভাস্থলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, কবির স্মৃতিরক্ষার জন্যে যা কিছু করা আবশ্যক তার বেশীর ভাগ বাঙালীদেরই করা উচিত ও করতে হবে। এই উক্তি যথার্থ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে যা দিয়েছেন ও যত দিয়েছেন আর কোন জা'তকে তা ও তত দেন নি, এবং বাঙালীরা তাঁকে নিজেদের লোক ব'লে যত গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করতে পারেন, আর কেউ তা পারেন না। এখন বাঙালীদের আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে, আমরা কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে কি করেছি।

কল্‌কাতার টাউন হলের স্মৃতিসভায় সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু যে বক্তৃতা করেন, তার কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করা বাঙালীদের কর্তব্য; আরো বলেছিলেন,তাঁর সমুদয় বাংলা রচনাবলীর প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করাও বাঙালীদের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ বিশ্বভারতীকর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজি রচনাবলীর অধিকাংশ কবির জীবদ্দশাতেই ম্যাকমিলান কোম্পানী ছেপেছিলেন; যা সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত বা পুস্তকের আকারে অপ্রকাশিত ছিল, বিশ্বভারতী তা পুস্তকের আকারে প্রকাশ করছেন—কবিতাগুলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইংরেজি গদ্য রচনাগুলিও প্রকাশিত হবে। তাঁর বাংলা রচনাগুলির যেমন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক—অর্থাৎ কি না যেগুলির অনুবাদ এখনও হয় নি,—সেই রকম তাঁর ইংরেজি রচনাগুলির মধ্যে যেগুলি বাংলার অনুবাদ নয়, সেগুলির বাংলা অনুবাদ হওয়াও উচিত। তা না হ'লে, যাঁরা শুধু বাংলা জানেন ও পড়েন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচয় হবে না।

সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর দ্বিতীয় প্রস্তাব, কবির সমুদয় বাংলা রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। কবির অল্প বয়সের সব রচনার অনুবাদ করা আবশ্যক বিবেচিত না হ'তে পারে। কিন্তু তার পরবর্তী কালের সব রচনাগুলির অনুবাদ প্রকাশ করাও সহজ কাজ নয়। অসাধ্য না হ'লেও তা যে দুঃসাধ্য তা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। যোগ্য যথেষ্টসংখ্যক অনুবাদক পাওয়া কঠিন। পাওয়া গেলেও তাঁরা এই কাজে কত সময় দিতে পারবেন, তা বিবেচ্য। তার পর প্রকাশব্যয়ের কথা আছে। কিন্তু এই কাজটির ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কবির স্মৃতিরক্ষার কথা উঠলে এই কথা সহজেই মনে

হয় যে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তিনি ত নিজেই ক'রে গেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সংস্কৃতি যত দিন থাকবে, বাঙালী তত দিন তাঁকে ভুলতে পারবে না। মানবজাতির সংস্কৃতি বা কৃষ্টি যত দিন থাকবে, তত দিন সভ্য কোন দেশের মানুষ তাঁকে ভুলতে পারবে না; কারণ, জগতের প্রধান প্রধান সভ্য ভাষায় তাঁর কোন-না-কোন রচনার অনুবাদ হয়েছে।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং ক'রে গিয়ে থাকলেও, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর স্বদেশবাসীদের ও অন্যদের কিছু করবার আছে। সামান্য কিছু কিছু করা হয়েছেও। বিলাতে ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারিতে তাঁর ছবি টাঙান হয়েছে এবং তাঁর নামে একটি অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দেশেও দু-এক জায়গায় তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যেমন বিষ্ণুপুরে।

কল্‌কাতার টাউন হলে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে করণীয় যে-যে বিষয়ের উল্লেখ হয়, তার মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধান প্রধান। প্রস্তাব এই হয়ে আছে যে, তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থ যত টাকা উঠবে, প্রথমতঃ তার দ্বারা, বিশ্বভারতী এখন যা-যা কাজ করছেন সেগুলিকে স্থায়ী করতে হবে; তার পর বিশ্বভারতীর কাজের সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে করণীয় এই দুটি কাজের জন্য বহু লক্ষ টাকা আবশ্যক। এখনও বোধ করি এক আধ লক্ষও উঠে নাই।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এই দুটি কাজ করা হয়ে গেলে, বাকী টাকায় কবির স্মৃতিরক্ষার্থ অন্য কোন কোন কাজ করা যেতে পারে।

বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধান ও তার কাজের সম্প্রসারণ শুধু বা প্রধানত তাঁর স্মৃতিরক্ষা বা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়। এর সঙ্গে তাঁর স্বদেশবাসীদের ও অন্য মানুষের উচ্চ স্বার্থও জড়িত আছে। বিশ্বভারতী তিনি কেন স্থাপন করেছিলেন, তা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। তিনি এর দ্বারা বঙ্গের, ভারতের, এশিয়ার ও সমগ্র মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন। তার সূত্রপাত তিনি ক'রে করণীয়ের পথে কতকটা অগ্রসরও তিনি হয়েছিলেন। তার চেয়ে বেশি দূরে অগ্রসর তিনি হ'তে পারেন নি কতকটা অর্থাভাবে কতকটা উপযুক্তসংখ্যক যোগ্য কর্মীর সহকর্মীর ও সহকর্মীর অভাবে, কতকটা বা বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত শক্তিহ্রাসপ্রযুক্ত। বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের আদর্শ অনুসারে স্থায়ী করতে পারলে ও তার কাজ সম্প্রসারিত করতে পারলে, বাঙালীর, ভারতীয়দের ও অন্যান্য জা'তের কল্যাণ। এই জন্যেই বলেছি যে, এই কাজটির সঙ্গে মানুষের উচ্চ স্বার্থ জড়িত। এটি সম্পন্ন করতে হ'লে প্রচুর অর্থ চাই। কিন্তু টাকা যে চাই, তা আমরা ভারতীয়েরা, বিশ্বভারতীর ভৌগোলিক অবস্থিতি যে-দেশে তথাকার লোকেরা, এখনও কার্যকরভাবে ততটা উপলব্ধি করি নি যতটা চীনের মহাপ্রাণ নেতা ও নেত্রী চিয়াং কাই-শেক উপলব্ধি করেছেন। মহানুভব চিয়াং কাই-শেক শান্তিনিকেতনে তাঁর ছোট বক্তৃতাটিতে ব'লেছিলেন বটে যে, তিনি আন্তরিক অনুরাগ ভিন্ন আর কোন উপহার আনেন নি, কিন্তু যাবার বেলা দিয়ে গেলেন আশী হাজার টাকা! এই দান সেই জাতির নেতার দান যে-দেশ পাঁচ বৎসর ধ'রে দুর্দ্ধর্ষ জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হারিয়েছে ও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হারিয়েছে এবং যাদের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত ও আক্রমণকারী শত্রুকে তাড়িয়ে দেবার নিমিত্ত প্রত্যেকটি পয়সার সদ্ব্যবহার আবশ্যক। এ কথা বলছি এই জন্যে যে, আমরা ভারতীয়েরা বলতে পারি, "যুদ্ধ ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছে বললেও হয়, এখন কি আর স্মৃতিরক্ষাটক্ষার কথা ভাবা যায়?" আমরা অবশ্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন আছি বটে; কিন্তু চৈনিকদের দুঃখ, সংগ্রাম ও উদ্বেগ অতীত প্রায় পাঁচ বৎসর, বর্ত্তমান কাল, এবং ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালব্যাপী। তাঁদের নেতা যদি এই সকলের মধ্যেও আশী হাজার টাকা দিতে পেরে থাকেন, তা হ'লে বাঙালীরা ও ভারতীয়েরা কখনই মনে করতে পারেন না যে, কবির সম্বন্ধে কবিতা লেখা, প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা করা, ইত্যাদিই যথেষ্ট।

কবির স্মারক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান যতগুলি এ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত হয়েছে, তার মধ্যে একটির প্রতি দৃষ্টি, বিলম্বে হ'লেও, আকর্ষণ করছি।

কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে ভাস্কর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এই প্রস্তাবটি করেছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পথে এসে প্রথম কল্‌কাতা ঢুকতেই একটি উপযুক্ত স্থানে একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভ নির্মিত হোক এবং তার শিরোদেশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্থাপিত হোক; তা হ'লে লোকে বুঝবে তারা রবীন্দ্রনগরী প্রবেশ করছে, এবং তাঁকে মনে পড়বে।

ক্ষিতীশবাবু একটি নক্সা দিয়ে এই প্রস্তাবটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রস্তাবটি আমাদের ভাল লেগেছিল। সদ্য সদ্য এইটি কার্যে পরিণত করা যাবে না—সময় ও অবস্থা প্রতিকূল। কিন্তু যুদ্ধান্তে সুদিন এলে প্রস্তাবিত স্তম্ভ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা সমীচীন হবে।

—

বঙ্গের সমুদ্রতটে স্বাস্থ্যপুরী নির্মাণ পরিকল্পনা

স্বাস্থ্যলাভের জন্যে এবং বিশ্রামের জন্যে বাঙালীরা বাংলার বাইরে নানা স্থানে গিয়ে থাকেন। জায়গাগুলি প্রায় সবই বাংলা দেশের বাইরে। কেউ যদি সমুদ্রতীরস্থ কোন স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে চান, তাঁদের পক্ষে পুরী সকলের চেয়ে নিকট; আরও দূরে কেউ কেউ ওয়ালটেয়ার যান, কেউ বা গোপালপুর যান। এই সমুদয় জায়গাই বাংলা দেশের বাইরে। অথচ খাস্ বাংলার সমুদ্রতট বহুশত মাইল ব্যাপী।

অনেক বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর জেলার কাঁথির নিকটবর্তী সমুদ্রতটে একটি স্বাস্থ্যপুরী নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনাটি ভালই ছিল। তদনুসারে কোন কাজ হয়েছিল কিনা, জানি না।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ থেকে কাঁথিরই নিকটস্থ সমুদ্রতীরে একটি স্বাস্থ্যপুরী নির্মাণের প্রস্তাব প্রকাশিত হ'য়েছে। মেদিনীপুরের অন্যতম ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের উপর পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার ও তদনুসারে কাজ করবার ভার পড়েছে। তিনি কর্মিষ্ঠ লোক। কিছু একটা গ'ড়ে তোলবার শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু এখন অবস্থা প্রতিকূল। যুদ্ধের আতঙ্কের ও যুদ্ধের অবসান না হ'লে এখন যে কেউ সমুদ্রতীরে জমী নিয়ে ঘরবাড়ী করবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন সুদিন আসবে, তখন নিশ্চয়ই কাঁথির নিকটস্থ সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যপুরীর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'তে পারবে।

—

হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান-পরিকল্পনা-বিরোধিতা

নয়াদিল্লী, ৩রা এপ্রিল

"আজ হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমীটি কর্ত্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে ও সকল প্রকার সম্ভব উপায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য সুস্পষ্ট সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে এই পরিকল্পনার ফলে হিন্দুদের মনে তাহাদের মাতৃভূমি ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা জন্মিবে। কমীটি বলেন যে, যদি ভারতের কোনও দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করায় উৎসাহ দেয় বা মৌন সম্মতি জানায় তা হ'লে যাঁরা হিন্দুস্থানের ঐক্য ও অখণ্ডতার সমর্থক, তাঁরা সকলে সেই দলকে দেশের শত্রু বলে গণ্য করবেন।"

উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে ভারত-ব্যবচ্ছেদের অর্থাৎ পাকিস্তানের ব্যবস্থা থাকায় হিন্দুমহাসভা ভারতমাতার সন্তানগণকে ওর বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট উপস্থিত করার জন্য আহ্বান জানান। যে-সকল দল আপোষহীনভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাসমন্বিত অতীব বিপজ্জনক এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য সাহসের সহিত সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছেন, সেই সকল দলকে, বিশেষ ক'রে শিখদলকে, হিন্দুমহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা ও শিরোমণি আকালী দলের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তদনুসারে কমীটি যত শীঘ্র সম্ভব উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে অমৃতসরে একটি সর্ব্বদল পাকিস্তানবিরোধী সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে ও মাষ্টার তারা সিং উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সম্মত হওয়ায় ওয়ার্কিং কমীটি তাঁদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামী ১০ই মে সমগ্র ভারতে পাকিস্তান বিরোধী দিবস পালন করা হবে।—এ. পি.

পাকিস্তান-বিরোধী দিবস

হিন্দুমহাসভা কর্ত্তৃক ১০ই এপ্রিল তারিখ ধার্য্য

নয়াদিল্লী ৪ঠা এপ্রিল

আগামী ১০ই এপ্রিল পাকিস্তানবিরোধী দিবস পালন করা হবে বলে হিন্দু মহাসভা স্থির করেছেন।—ইউ, পি,

শুধু হিন্দু ও শিখ নয়, ভারতবর্ষের অধিবাসী মাত্রেরই পাকিস্তান পরিকল্পনার কিংবা ভারতবর্ষকে দুই বা তার চেয়ে বেশি ভাগে বিভক্ত করবার অন্য পরিকল্পনার বিরোধিতা করা একান্ত কর্তব্য। এ রকম খণ্ডীকরণের সম্ভাবনারও বিরোধিতা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যত ঐক্যবদ্ধ হবে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, শ্রেণীর ও জা'তের (Caste-এর) লোকেরা ভেদ ভুলে গিয়ে যত সম্মিলিত হবে, ভারতবর্ষের শক্তি তত বাড়বে; ভেদ যত বাড়বে, শক্তি তত কমবে। ভারতবর্ষের বহু সহস্রাব্দব্যাপী ইতিহাসে তার পুনঃ পুনঃ পরাধীন হবার একটা প্রধান কারণ তার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত থাকা। এখন ভারতবর্ষ পরাধীন হ'লেও এই পরাধীন অবস্থাতে দেশটি যে এক, তা তার কতকটা শক্তিশালিতার একটি কারণ। এই একত্ব তার স্বাধীনতালাভকে সম্ভাবনার সীমায় এনেছে। এর খণ্ডিত হবার সম্ভাবনা যত বাড়বে, স্বাধীন হবার ও থাকবার সম্ভাবনা তত কমবে।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও দেশী রাজ্যগুলি যদি স্বাধীন বা স্বশাসক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তা হ'লে তাও চরম পরিণতি ব'লে গণ্য করা যাবে না। ভারতবর্ষের কয়েকটি

টুকরা এখনও পোর্তুগীজদের ও ফ্রেঞ্চদের অধীন আছে। পোর্তুগাল ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে সেই টুকরা-গুলিকেও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে। সন্ধিদ্বারা স্বাধীন নেপালকেও স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ করতে হবে। নেপালের ভাষা, নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম, এবং নেপালের সংস্কৃতি ভারতবর্ষীয়। সুতরাং নেপালের স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—

পাকিস্তান লাভে মিঃ জিন্নার দৃঢ় সংকল্প

এলাহাবাদ, ৩রা এপ্রিল

আজ রাত্রে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক সভার প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মিঃ এম এ জিন্না তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্রিপসের প্রস্তাবসম্পর্কে বলেন, "আমি সুস্পষ্ট ভাষায় একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই। নিশ্চিত জানবেন যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তান। কাজেই যেরূপ প্রস্তাবই হোক না কেন, যদি তাতে আমাদের পাকিস্তান লাভের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমরা তা কখনও মেনে নেব না।"

তিনি মেনে না নিতে পারেন; কিন্তু তিনি ও তাঁর অনুচর মুসলমানরা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি না দিলেই যে, অন্য মুসলমানদের, হিন্দুদের, শিখদের ও ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের আপত্তি সত্ত্বেও উক্ত গবর্ন্মেণ্ট পাকিস্তানের মত একটা কিছু ব্যবস্থা যদি করেন, তা হ'লেই তা টিকবে মনে করা ভুল। কিন্তু মিঃ জিন্নার উদ্দেশে কিছু বলা বৃথা। যে-দিন থেকে তিনি পাকিস্তানের 'দাবী' জানিয়েছেন, তার পর মুসলমান অমুসলমান কত লেখক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কত প্রবন্ধ লিখলেন, মুসলমান ও অন্য নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের কত বক্তা তার বিরুদ্ধে কত বক্তৃতা করলেন—'দাবী'টার অযৌক্তিকতা ও অনিষ্টকারিতা কত প্রকারে দেখান হ'ল; ওটা যে ইসলাম-বিরোধী তাও প্রমাণিত হ'ল; কিন্তু জনাব জিন্না সাহেব অনড়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানেন, পাকিস্তান-প্রস্তাব অনুসারে কাজ হ'লে ভারতবর্ষ দুর্বল থাকবে ও তাতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষা করা সহজ হবে; সেই জন্য তাঁরা জিন্না সাহেবকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন।

গত ৪ঠা এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে জিন্না সাহেব তাঁর 'দাবী'র পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এলাহাবাদ, ৪ঠা এপ্রিল

আজ প্রাতে নিঃ ভাঃ মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি মিঃ জিন্না তাঁহার অভিভাষণে সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস আনীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন,—"মুস্‌লিম জাতির অখণ্ডতা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হয় নি ব'লে মুসলমানরা খুবই নিরাশ হ'য়েছে। আসল বিষয়গুলি এড়িয়ে এবং প্রদেশগুলির ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করায় কোন লাভ হবে না। একথা বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষ কোনকালেই একটা দেশ বা জাতি ছিল না। ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত এরূপ বিচ্ছেদ রয়েছে যা গোপন করা চলবে না। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করতে হবে। মুস্‌লিম ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার যত দিন পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত ও কার্যকরী করা না হবে তত দিন পর্যন্ত মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবে না।

"বর্তমান ঘোষণাপত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবসমূহের কাঠামো দেওয়া হয়েছে। মাত্র এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বে তাকে আরও বিশদ করা প্রয়োজন। এটা অনেক বিষয়েও বিশেষ রূপে পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি ক'রেছে। পাকিস্তান পরিকল্পনা এতে কেবলমাত্র অস্পষ্টভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যাতে সুস্পষ্টরূপে তা মেনে নেওয়া হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আমি আশা করি, বর্তমানে যে আলাপ-আলোচনা চলছে তার ফলে ন্যায়সঙ্গত, সম্মানজনক ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন বন্দোবস্ত হবে।"

জনাব জিন্না সাহেবের মতে ভারতবর্ষ ব'লে কোন একটা দেশ কোন কালে ছিল না, এখনও নাই! তিনি যে কখনো বোম্বাই, কখনো মান্দ্রাজ, কখনো কল্‌কাতা, কখনো নয়া দিল্লী, কখনো বা এলাহাবাদে বিরাজ করেন, এই শহরগুলা কি তবে ভারতবর্ষে অবস্থিত নয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত? তাঁর মতে ভারতবর্ষ নামক কোন দেশ নাই, কিন্তু তিনি "মুসলিম ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার" চাচ্ছেন। তা হ'লে 'মুসলিম ভারত' ব'লে একটা দেশ আছে এবং সে দেশে পেশাওয়ার, করাচী, লাহোর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, কল্‌কাতা, নাগপুর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি শহর আছে। কিন্তু কেও যদি বলে সর্ব-সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ বা হিন্দু ভারতবর্ষ ব'লে একটা দেশ আছে এবং সেই দেশে করাচী, লাহোর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, পাটনা, কল্‌কাতা, নাগপুর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি শহর আছে, তা হ'লে জনাব জিন্না সাহেবের মতে সেটা একটা বাজে স্বপ্ন মাত্র!

—

সাপ্রু-জয়াকর স্মারকলিপি

সর্ তেজবাহাদুর সাপ্রু ও ডক্টর মুকুন্দরাম জয়াকর সর্ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের নিকট এক স্মারকলিপিতে বড়-লাটের শাসন-পরিষদে দেশরক্ষা সচিব পদে এক জন ভারতীয় নিয়োগের দাবী করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত স্মারকলিপিতে আরও বলা হ'য়েছে যে, ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রদেশ যোগদান করবে কি না তা নিম্নপক্ষে প্রাদেশিক পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের শতকরা ৬৫ জনের ভোট দ্বারা নির্ণীত হবে। এই উদ্দেশ্যে গণভোট গ্রহণের বিরোধিতা করে স্মারকলিপিতে বলা হ'য়েছে যে, প্রদেশসমূহে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত গবর্ণমেণ্টসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক।

উক্ত দু-জন নেতা বড়লাটের শাসন-পরিষদে দেশরক্ষা সচিবের পদে যোগ্য কোন ভারতীয়ের নিয়োগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ব'লেছেন :—

সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ব'লেছেন যুদ্ধের সময় ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা ন্যস্ত করলে মারাত্মক হবে এবং পরিকল্পনাটি গ্রহণের পূর্ব্বে ভারতীয় নেতারা যদি দেশরক্ষার পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করেন তা হ'লে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হবে। অবশ্য বর্ত্তমান সঙ্কটকালে যখন সামরিক নীতি পরিচালনায় সুষ্ঠু ঐক্য প্রয়োজন তখন দেশরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ হস্তান্তর ভারত বা ব্রিটেনের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। কিন্তু বড়লাটের শাসনপরিষদে এক জন ভারতীয়কে দেশরক্ষা-সচিব পদে নিয়োগ করলে কেন যে তা ব্যর্থ হবে, তা বুঝতে পারি না। আমরা অবশ্য এমন একজন ভারতীয়কে নিতে বলছি যিনি তাঁর দায়িত্ব সম্যকরূপ প্রতিপালন করবেন এবং সমর-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা ক'রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে চলবেন। এই নিয়োগের দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত ইচ্ছা জ্ঞাপিত হবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চান যে ভারতীয় জনসাধারণ বর্ত্তমান যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ ব'লে মনে করুক। আমরা অনুভব করছি যে, ব্রিটেন ও ভারত ভারতরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্য্য করছে বলে তাদের বিচার-বুদ্ধির নিকট আবেদন করতে পারলে তা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এই চেষ্টায় জনসাধারণের অনুভূতি উপেক্ষা করলে ভুল হবে।

বর্ত্তমান ভারতের জনসাধারণ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ততটা আগ্রহশীল নয়। বড়লাটের শাসনপরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের দ্বারা এই আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সৈন্যচলাচল প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতার সহিত এই দেশরক্ষা-সচিবের ক্ষমতার কোনরূপ সংঘর্ষ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে চাই। আমাদের মনে হয়, এই নিয়োগের ফলে ভারতের সামরিক পরিস্থিতির কোন ক্ষতি হবে না, এর রাজনৈতিক ফলাফল উত্তম হবে।

ভারতের জনবল অপরিসীম। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় দেশরক্ষা-সচিবের দ্বারাই এই জনবলকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করা যেতে পারে। চীন, রাশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে দেখা গেছে যে, দেশের জনসাধারণই শত্রুর অভিযান সাফল্যের সহিত প্রতিহত করতে পারে। কেবলমাত্র বেতনভোগী সৈন্য দ্বারা শত্রুর গতিরোধ করা যায় না। বর্ত্তমানে সঙ্কট দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই সময় ভারতীয়গণকে স্থায়ীভাবে নিরস্ত্র রাখবার ও তাদিগকে সন্দেহ করবার নীতি অবিলম্বে বিসর্জ্জন দিতে হবে।

এই সব কারণে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণার গুণাগুণ যাই হোক না কেন, বড়লাটের শাসন-পরিষদ দেশরক্ষা-সচিব পদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ না করলে সেটি ব্যর্থ হবে। প্রধান সেনাপতি ও দেশরক্ষা-সচিবের ক্ষমতার গণ্ডী যেরূপভাবে সীমাবদ্ধ করলে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ না হয়, সেইরূপ করলেই চলবে।

এ বিষয়ে নেতৃদ্বয় মোটের উপর ঠিক কথাই ব'লেছেন। কোন প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাক্‌বার যে অধিকার ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রণাসভার প্রস্তাবে আছে, সে সম্বন্ধে সর্ তেজবাহাদুর ও ডক্টর জয়াকর বলেন :—

কোন প্রদেশকে প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র নিয়ে অবস্থানের স্বাধীনতায় আমাদের কোন আপত্তি না থাকলেও অপর একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাযুক্ত ব্যবস্থায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছি। এইরূপ অপর একটি ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র প্রথমটির প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি শত্রুভাবাপন্ন, হ'তে পারে। এর ফলে ভারতের অখণ্ডতা বিনষ্ট হবে এবং স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

প্রস্তাবিত ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কোন প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা স্থির করবার ব্যবস্থা স্বরূপ প্রাদেশিক আইনসভার ভোটের আধিক্য কত সংখ্যক হবে তার সঠিক কোন উল্লেখ নাই। আমাদের মতে দু-এক ভোটের আধিক্যে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলবে না, এই ব্যাপারে ব্যবস্থা-পরিষদের কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্যদের কমপক্ষে ৬৫ ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্যদের ভোট গ্রহণের কথাই বলছি, কারণ এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সদস্যদের কোন স্বার্থ নাই। পরিষদে ভোট গ্রহণের পর প্রস্তাবিত গণভোটের কোন প্রয়োজন হবে না। অধিকন্তু এর দ্বারা দেশে অশান্তি আনয়ন করা হবে। সেই জন্য আমরা কতকগুলি প্রদেশকে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সমর্থন করতে পারি না

আমরা কোন প্রদেশকে বর্তমান শাসনতন্ত্র নিয়ে প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকবার অধিকার দেবার বিরোধী এবং কতকগুলি প্রদেশকে স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন অধিকার দেবারও বিরোধী। এ বিষয়ে আমাদের মত অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ডক্টর সাপ্রু ও জয়াকর বলেন :—

যুদ্ধাবসানে বৈরিতা সমাপ্তির পূর্ব্বেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনার প্রতি আমরা গুরুত্ব আরোপ করি। এই আপোষ-মীমাংসা দ্বারা সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে (ক) আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ (খ) ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ (গ) ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও বিবেক সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তীকালে বিবদমান দলসমূহ একই উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্য করতে করতে পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে ও পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিক্ষা করবে। সুতরাং দেশের অখণ্ডতা বজায় রেখেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের পূর্ণ স্বার্থরক্ষা করার ব্যবস্থা হবে। তবে যদি মধ্যবর্ত্তীকালে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কতকগুলি প্রদেশ অপর একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনে বদ্ধপরিকর হয়, এবং উপরে উল্লিখিত বিপদসমূহের আশঙ্কা দূরীভূত হয়, তা হ'লে প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণে কোন আপত্তি আমাদের থাকবে না।

তাঁদের স্মারকলিপির শেষ কথা এই :—

অবশেষে আমরা প্রদেশসমূহে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রস্তাবিত ঘোষণায় এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই, সম্ভবতঃ নূতন কেন্দ্রীয় গবর্ণ-

মন্টের উপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি যে বর্ত্তমানে প্রদেশসমূহে যে শাসন-ব্যবস্থা চলছে তা রহিত ক'রে অবিলম্বে পুনরায় প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেন্ট প্রবর্ত্তন করা হোক। সাফল্যের সহিত কার্য্য পরিচালনার জন্ম যদি কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট স্থাপন প্রয়োজন হয় তা হ'লে আমরা তা বরণ ক'রেই নেব।

অন্যান্য বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নাই। —এ. পি

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের পরীক্ষা

নিজের নিজের বাড়ীতে পড়াশুনা ক'রে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদের প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষা দেওয়া যায়। বাংলা ভাষার সাহায্যে পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১৩৪৯ সালের পরীক্ষা আগামী শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গৃহীত হবে। নিম্নঠিকানায় ও সংসদের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুদ্রিত আবেদনপত্র পাওয়া যায়। পাঠ্যতালিকা-সম্বলিত সংসদের বিশদ বিবরণী তিন আনার ডাকটিকিট পাঠালে পাঠানো হবে। সম্পাদক, লোকশিক্ষা-সংসদ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

যুদ্ধজনিত অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গের গবর্ণর

গত ২রা এপ্রিল ১৯শে চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের সভায় বাংলা দেশের গবর্ণর একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। যুদ্ধজনিত নানা অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, অভিভাষণটিতে তিনি তা বলেন। তার তাৎপর্য এই রকম :—

কয়েক শতাব্দীব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভোগের পর আজ বাংলা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। ঠিক এই সময়ে আপনারা নিজ নিজ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ফিরে যাচ্ছেন। এই পরিষদের পুনরায় অধিবেশন হবার পূর্বে রণক্ষেত্রে অনেক স্মরণীয় ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে। মালয় ও ব্রহ্মের সাম্প্রতিক ঘটনায় যুদ্ধ ভারতের, বিশেষভাবে এই প্রদেশের পূর্বাংশের, অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়েছে। এই অভিযানের ফলে জনসাধারণের মনে আতঙ্কের উদয় হওয়া আদপেই অস্বাভাবিক নয়। জনসাধারণের মনে পূর্বভারতে শত্রু আক্রমণ অথবা বিমান আক্রমণের আশঙ্কা সৃষ্টি হ'তে পারে।

বহু শতাব্দী না হোক, দীর্ঘ কাল বাংলা দেশে যুদ্ধ হয় নি সত্য কথা। কিন্তু আমরা যে তার ফলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করেছি, এমন বলা যায় না। অনেক অঞ্চলে "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা"র ফলে জনসাধারণ যে দুঃখ ও ক্ষতি বার-বার সহ্য ক'রেছে, তা যুদ্ধজনিত দুঃখ ও ক্ষতির চেয়ে কম নয়। সে যা হোক, দীর্ঘ কাল বঙ্গে যুদ্ধ না হওয়ায়, লোকেরা নিরস্ত্র থাকায় এবং সেনাদলে বাঙালীদিগকে সাধারণতঃ ভর্তি না করায় বাঙালীরা আত্মরক্ষায় অনভ্যস্ত হয়েছে; তাদের আতঙ্কের এটা একটা বড় কারণ।

অতঃপর লাটসাহেব বলেন :—

প্রথমে আমি শত্রুর বিমানাক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করব। আংশিকভাবে রাজকীয় বিমানবহরের সহায়তাতেই বিলাতে "ব্রিটেনের যুদ্ধে" জয়লাভ হয়েছে। তবে ঐ সময়ে বেসামরিক অধিবাসীরাও যেরূপ সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তা যুদ্ধজয়ের পক্ষে কোন অংশে উপেক্ষণীয় নয়। কোন শহরই লণ্ডনের চেয়ে অধিকতর সুরক্ষিত নয়। কিন্তু তা হ'লেও এই সমস্ত বেসামরিক অধিবাসীদের অনমনীয় দৃঢ়তার দরুনই লণ্ডনের যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভবপর হয়েছে। পুনঃ পুনঃ শত্রু-বিমানাক্রমণ সত্ত্বেও লণ্ডনের নাগরিকরা স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

একটি নগর রক্ষা করার পক্ষে তিনটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজন—কামান, বিমান ও নাগরিকদের সাহস। ইহার মধ্যে সব চাইতে বেশী দরকার সাহস।

অস্ত্র রাখা ও সিপাহী হওয়া সম্বন্ধে এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে বাঙালীর অবস্থা যদি লণ্ডনবাসীদের সমান হ'ত এবং কল্‌কাতা ও বাংলা দেশ লণ্ডন ও ব্রিটেনের মত যুদ্ধজাহাজ ও বিমান দ্বারা রক্ষিত হ'ত তা হ'লে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের লোকদিগকে লণ্ডনের দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন হ'ত না। একথা লিখে আমরা লণ্ডনবাসীদের প্রতি কিছুমাত্রও অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছি না। তাঁদের পৌরুষ পরম শ্রদ্ধার বিষয়।

নগরবাসীর রক্ষা ব্যবস্থা

আইন-সভার সদস্য হিসাবে আপনারা জানেন কলিকাতা ও বাঙ্গলার জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এতাবৎ কি আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের ফলে ইহা সত্য যে, অধিকাংশ দলই এই আয়োজনের জন্য দায়ী। নাগরিকগণের রক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, জনসাধারণের সহযোগিতায় তা সাফল্যলাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। নাগরিকদের রক্ষার জন্য আমরা ওয়ার্ডেনদের কাজ পাচ্ছি। হতাহত ও প্রাথমিক সাহায্যকারীদের কাজ, উদ্ধারব্রতীদের কাজ, অগ্নিনির্ব্বাপক দলের কাজ প্রভৃতি সব কিছু ব্যবস্থাই আমাদের আছে। এই সমস্ত কাজের যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে আছেন। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন হ'লেই তাঁরা সাহস ও দৃঢ়তার সহিত তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করবেন।

এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকর রকমের হয়েছে কিনা ও আছে কিনা, পুনঃ পুনঃ তার পরীক্ষা হওয়া দরকার।

বিমানাক্রমণকালে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

অসামরিক নাগরিকদের রক্ষার জন্য গড়খাই ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী আশ্রয়স্থলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং আমি পুনরায় এই কথাই উচ্চারণ করছি যে বিমানাক্রমণের সময় জনসাধারণের কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, তা যদি তারা ঠিক বুঝতে পারে এবং বিমানাক্রমণ কালে যদি তারা আশ্রয়স্থলের বাইরে না থাকে তা হ'লে বিপদ অনেক কমে যাবে। পক্ষান্তরে বিমানাক্রমণের সময় যদি কেহ

ঔৎসুক্যবশতঃ বাইরে এসে দাঁড়ায়, তা হ'লে তার অনিবার্য্য বিপদকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

যদি শহরে লুঠ-তরাজ আরম্ভ হয়

শত্রুতা আর অন্য কি আকারে হ'তে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলবার পূর্ব্বে শহরে যদি লুঠ-তরাজ আরম্ভ হয়, তবে কি করতে হবে, সেই বিষয়েই আমি কিছু বলতে চাই। এই ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তা হ'লে আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহরে সামরিক বাহিনীর বিপুল ব্যবস্থা করা ছাড়াও কলকাতার পুলিস-বাহিনীকেও ভয়ঙ্কররূপে শক্তিশালী করা হয়েছে। বিমান-আক্রমণের কালে যদি অগ্নি-সংযোগ বা লুঠ-তরাজের প্রকৃতই কোন চেষ্টা করা হয়, তা হ'লে তা অতি কঠোরতার সহিতই দমন করা হবে গবর্ণমেণ্টের কাজ। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে স্পেশাল কোর্টও ইতিমধ্যে স্থাপন করা হচ্ছে।

কল্‌কাতায় লুঠতরাজ ও লুণ্ঠন নিবারণ ও দমনের জন্যে যে ব্যবস্থা হয়েছে, মফঃসলে তা সর্বত্র হয়েছে কি না, তার তদন্ত সরকারী ও বে-সরকারী নির্ভরযোগ্য লোকদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ হওয়া আবশ্যক।

খাদ্য-সরবরাহ সমস্যা

গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-সরবাহ ও বিতরণের ব্যবস্থাও করেছেন। খাদ্য-সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন যে ভয়াবহ সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে তা অনুমান করে বহু মনিব তাঁদের কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের জন্যে ইতিমধ্যেই দোকানপাট খুলে দিয়েছেন। আমার মতে এইরূপ ব্যবস্থা সর্বত্রই হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

জরুরী অবস্থার সময় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ দরকারী। আমার বিশ্বাস আপনারাও এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবেন না।

স্থল ও জলপথে বাঙ্গলা আক্রমণের আশঙ্কা

বাঙ্গলায় স্থল ও জল পথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এইরূপ বিপদের সময় জনসাধারণকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, তা বলার পূর্বে কোন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে কি অবস্থার উদ্ভব হ'তে পারে, সেই বিষয়েই আমি কিছু বলতে চাই। এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস শত্রুপক্ষের হাতে যাতে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার মত এখানেও পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করবেন।

পোড়ামাটি নীতি

আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে আশ্বাস দিয়ে জানাতে চাই যে, বাঙ্গলায় এইরূপ 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বনের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই। পোড়ামাটি নীতি'—এই কথাটাই বর্জ্জন করা সমীচীন, কেন না এই কথা দ্বারা নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হয়ে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া, পল্লীবাসীদের ঘর হ'তে খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই—সেনাদলেরও নাই। কিন্তু আপনারা জানেন যে, এমন কোন কোন জেলা আছে—যেখানে সেই সমস্ত জেলার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান জন্মে থাকে। এই সমস্ত অতিরিক্ত শস্যই যদি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে, তা হলে নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে, এমন কি, যে সমস্ত জেলায় নিজেদের প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদিত হয় না, সেই সমস্ত জেলায় দুর্ভিক্ষও দেখা দিতে পারে। সুতরাং স্থির হয়েছে যে, যে-সমস্ত জেলায় অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হয়, সেই জেলা হ'তে ধান ও অপরাপর শস্যগুলি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য কোথায় কোথায় জন্মে ও আছে, তা অত্যন্ত সাবধানে ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য লোকদের দ্বারা করান আবশ্যক। যা স্থানান্তরিত হবে, তা যদি মালিকের সম্পত্তিই থাকে তবে তাকে রীতিমত রসীদ দিতে হবে; নতুবা তাকে উচিত মূল্য দিতে হবে।

গৃহস্থের দরকারী শস্য ও অন্যান্য খাদ্য তার কাছেই থাকা চাই। সেগুলি শত্রুর হাতে যাতে না-পড়ে, শত্রু লুটে না নেয়, তার কি উপায় করা হয়েছে?

শত্রুপক্ষের হাতে যাতে কোন যানবাহন পড়তে না পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, আপনারাও স্বীকার করবেন যে, মোটর গাড়ী, মজুদ পেট্রোল, বাইসিকেল, নৌকা ও অপরাপর কোন যানবাহন শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের বিশেষ সুবিধা হবে। মালয় ও ব্রহ্মের অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি। সুতরাং যানবাহন বা চলাচলের কোনরূপ সুবিধা যাতে শত্রুপক্ষ না পায়, গবর্ণমেণ্ট তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। যদি এমনও হয় যে, বাঙ্গলার কোন জেলায় আক্রমণের আশঙ্কা আসন্ন ব'লে দেখা যাচ্ছে, তা হ'লে জল অথবা স্থলপথে যাবার সমস্ত রকম যানবাহন এরূপ ভাবে নেওয়া হবে, তাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে গবর্ণমেণ্ট সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। হয়ত জনসাধারণের এতে অসুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের মতে সামরিক দিক হ'তে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রয়েছে।

সত্য কথা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় লোকের দৈনিক জীবিকা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যই যে-সব নৌকা দরকার, সেগুলি মালিকদের হাতে থাকতে দেওয়া উচিত।

মোটের উপর পোড়ামাটি নীতি সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, পল্লী ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহে বাঙ্গলার শিল্পসম্পদকে বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের মোটেই নাই।

এই কথায় মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত হ'তে পারবে।

পঞ্চম বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে সরকারী নীতি

পঞ্চম বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতি কি, তা আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। যুদ্ধকালেই কোন দেশ কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হ'তে চায় না। এই যুদ্ধের ইতিহাস হ'তে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিভিন্ন দেশে বিভীষণ-মনোবৃত্তির লোকজনের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে, এরূপ ক্ষতি অন্য কোন কারণে হয় নাই। শত্রুপক্ষের হাতে যারা নিজের দেশ বিক্রয় করতে চায়, এরূপ বিশ্বাসঘাতক লোক-জনের কর্ম্মতৎপরতার ফলে ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পতন সম্ভব হয়েছে। এদের কাজ হ'ল—জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যাহত করা। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়, এরা তা অগ্রাহ্য করে চলে, ফলে আতঙ্ক ও অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমি এবং আমার গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কার্য্যকলাপ দৃঢ় হস্তে দমন করব।

"পঞ্চমবাহিনী" এদেশে আছে ব'লে আমরা অবগত নই ; বিশ্বাসও করি না।

গুজব সৃষ্টি

এ ছাড়া গুজব সৃষ্টি করেও নানারূপ অনিষ্ট সাধন করা হয়। কারও হয়ত শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবার ইচ্ছা নাই; অথচ গুজবের ফলে তাও তারা ক'রে থাকে। গুজব যারা রটনা করে, তাদের যেরূপ অপরাধ, আবার গুজব যারা বিশ্বাস করে, তাদের অপরাধও তার চেয়ে কম নয়। জনসাধারণের উচিত এই সব গুজবের মূল উচ্ছেদ করা। কিন্তু তা না ক'রে যদি ভিত্তিহীন গুজবকে বিশ্বাস করা হয়, তাহা হ'লে তার ফলে জনসাধারণের মনের জোর ও সাহসই ভেঙে পড়বে। সুতরাং আমি জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন কোনরূপ গুজবে বিশ্বাস না করেন এবং সম্ভব হ'লে এই সমস্ত গুজবের মূল উৎপাটন করতে যত্নবান হন।

বক্তৃতা দান বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

আমি এর দ্বারা বুঝাতে চাই না যে, বক্তৃতা দানের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায়ই গবর্ণমেণ্ট পোষণ করেন। সংবাদপত্রসমূহের নিকট হ'তে আমরা প্রচুর সহযোগিতা লাভ করেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি এর প্রশংসাও করছি। আমি জানি, এই সমস্ত গুজব দমনের পক্ষে তাঁদের সহযোগিতা কত মূল্যবান।

বিমানাক্রমণকালে আমাদের কর্ত্তব্য

আমাদিগকে যদি বস্তুতই বিমান-আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়, তা হ'লে আমাদের কি করতে হবে, আমি পূর্ব্বে তা বহুবার বলেছি এবং এখনও তার পুনরুক্তি করছি। আমাদের সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ রাখতে হবে যে, জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রদেশ রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেখতে হবে যে, শত্রুবাহিনী যদি আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে অথবা স্থলপথে যদি তারা সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ফলে হয়ত তাদিগের পথে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হবে, তথাপি বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এই সময় আমাদের নাগরিক জীবনকে অব্যাহত রাখতে হবে, কোন রূপ গুজব বিশ্বাস না ক'রে আমাদিগকে সাহসের সহিত অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে। আমাদের কারখানাসমূহকে চালু রাখতে হবে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ-উৎপাদনের ব্যবস্থা পুরাদমে চালিয়ে যেতে হবে। আমরা আমাদের সৈন্য ও বিমানবাহিনীকে সর্ব্বতোরূপে সহায়তা করতে সচেষ্ট থাকব।

আশা করি, বাংলা দেশকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট যোদ্ধা-বিমানবাহিনী আছে, যথেষ্ট স্থলসৈন্য আছে, এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান যথেষ্ট রণতরীও বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছেছে।

সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রশ্ন

অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে আমি আইন-সভার প্রত্যেক দলের নেতাগণকে একটি সম্মেলনে আহ্বান করেছিলাম এবং সর্ব্বদলের প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে গঠিত গবর্ণমেণ্টের মারফতে একটি 'ওয়ার-ফ্রণ্ট' গঠনের প্রশ্নে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। সেই সময় কোন কোন দলপতি বলেছিলেন যে, নিখিল ভারতীয় সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় এইরূপ কোন সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভবপর নয়। আমার মতে নিজেদের মধ্যে যত রকম মতদ্বৈধতাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে তা বিসর্জ্জন দেওয়া সঙ্গত। আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সফল করার জন্য এই সমস্ত মতদ্বৈধতা আঁকড়ে থাকা প্রদেশের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

যাহোক, আগামী কল্যও আমি দলপতিদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করছি এবং এই সময় আপনাদের সহিত এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করব।

আমি আপনাদিগকে বড়লাটের সাম্প্রতিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি এই বাণীতে সকলকে ভেদাভেদ ভুলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি বড়লাটের এই বাণী স্মরণ করিয়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

—

সর্ ফিরোজ খাঁ নূনের আরো অনেক আবিষ্কার

সর্ ফিরোজ খাঁ নূন "ইণ্ডিয়া" নাম দিয়ে যে একটি ছোট সচিত্র বই লিখেছেন, তাতে তাঁর একটি ঐতিহাসিক আবিষ্ক্রিয়ার কথা চৈত্রের 'প্রবাসী'তে লিখেছি। তিনি লিখেছেন, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে ডুপ্লেক্সের সঙ্গে ক্লাইবের যুদ্ধ হয়। কিন্তু সে যুদ্ধটা হয়েছিল সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে, এবং ডুপ্লেক্স ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ছেড়ে ফ্রান্স চলে গিয়েছিলেন!

ঐ বইটিতে নূন সাহেবের ঐটাই একমাত্র আবিষ্কার বা ভুল নয়। তাঁর বানানেরও বাহাদুরি আছে। "মনু"কে তিনি লিখেছেন "মন্নু", "মহাভারত"কে লিখেছেন "মহাবরাট্টা", "ক্ষত্রিয়" হয়েছে "কাসাত্রিয়া" ইত্যাদি।

তাঁর সব ভুলগুলির ফর্দ দিতে পারা যাবে না। কয়েকটার উল্লেখ করছি।

১৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন :—

'The Hindus, unlike the Jews, Christians and Moslems, do not believe in a Day of Judgment or a next world ....."

"ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানরা যেমন শেষ বিচারের দিন অথবা পরলোকে বিশ্বাস করে, হিন্দুরা তা করে না।

হিন্দুরা শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু তারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, নূন সাহেব এই তথ্যটি কোথায় পেলেন? হিন্দুরা স্বর্গ ও নরক, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে, কারো মৃত্যু হ'লে স্বর্গীয় বা স্বর্গগত ব'লে তার উল্লেখ ক'রে তার পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ইত্যাদি তিনি কি কখনো শোনেন নি? ইহলোক পরলোক, ঐহিক পারত্রিক প্রভৃতি শব্দের সহিত তাঁর পরিচয় না থাকবারই কথা। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে একটু জেনে নিয়ে

সাবধানতার সহিত লেখা আবশ্যক। নূন সাহেবের সে জ্ঞান ও বিবেচনা নাই।

তিনি তাঁর বইটির আর এক জায়গায় লিখেছেন :—

"Throughout her history up to the time of her contact with European traders India knew only one form of government, and that was monarchical,......"

"য়ুরোপীয় বণিকদের সহিত সংস্পর্শের আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ তার ইতিহাসে কেবল এক রকম শাসনপ্রণালী জান্ত, তা হচ্ছে নৃপতি-তন্ত্র;......"

আর এক জায়গায় লিখছেন :—

"It is hardly possible to say whether representative and democratic institutions would ever have come into existence if India had continued to be ruled by her own monarchs" (page 14).

"যদি ভারতবর্ষ তার নিজের নৃপতিদের দ্বারা শাসিত হ'য়ে আসত, তা হ'লে, এটা বলা খুবই কঠিন যে, এ দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন হ'ত কিনা।"

ভারতবর্ষে যে সাধারণতন্ত্র ছিল, গণতন্ত্র ছিল, গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান এখনো আছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তা জানে, কিন্তু নূন সাহেব জানেন না।

২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন :—

"Under Islam punishment for sexual immorality has always been death."

"ইসলামে যৌন দুর্নীতির জন্য বরাবর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে।"

মুসলমানদের শাস্ত্রে এই বিধান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান ও অমুসলমান নারী হরণ খুব হয়, গ্রন্থকার সেই খবরটি দেন নি, এবং কেন তা হয়, তাও বলেন নি।

১৪ পৃষ্ঠায় নূন সাহেব বলেছেন,

"Out of a pastoral Indian civilization has arisen a new and vigorous modern India."

"পশুচারণমূলক ভারতীয় সভ্যতা হইতে নূতন ও শক্তিশালী আধুনিক ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হয়েছে।"

ইংরেজরা আস্‌বার আগে কি ভারতীয়রা প্রধানতঃ গোরু মহিষ ছাগল ও মেষ চরাত?

—

"জাতীয় সপ্তাহ"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়, তার রক্তাক্ত ও মসীলিপ্ত স্মৃতি প্রতি বৎসর "জাতীয় সপ্তাহ" ভারতীয়দের মনে জাগিয়ে তোলে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ভারতীয়দের বা ইংরেজদের কারো গৌরবের বিষয় নয়, সেই ভীষণ শ্মশানে একটি নারী তার স্বামীর মৃতদেহ আগ্‌লে বসেছিল, এইটি ঐ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত একমাত্র বীরত্ব কাহিনী ব'লে আমাদের এখন মনে পড়ছে। অমৃতসরের একটা রাস্তা দিয়ে দেশী পথিকগণকে কেঁচোর মত বুকে হাঁটতে বাধ্য করা হ'ত এবং তারা তাই করত, এই কাপুরুষতার কাহিনীও মনে পড়ে। আর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ও "সর্‌" উপাধি ত্যাগ।

প্রতি বৎসর জাতীয় সপ্তাহ পালন সার্থক হবে যদি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মত ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটা আমরা অসম্ভব ক'রে তুলতে পারি। যাঁরা "জাতীয় সপ্তাহে"র সমুদয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, দেশকে এমন অবস্থায় আন্‌বার চেষ্টা করবেন, যাতে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ অসম্ভব হয়।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি সরকারী কল্‌কাতা গেজেটের বিশেষ একটি সংখ্যায় গত ২৮শে মার্চ প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশও হয়ে গেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল থেকে এটি অনেক বিষয়ে ভিন্ন। সুতরাং এটি সম্বন্ধে লোকমত জানবার জন্যে এর প্রচার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এইরূপ প্রচারের প্রস্তাব আইন-সভায় উত্থাপিত হওয়ায় তা অগ্রাহ্য হয়ে গেছে এবং বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে, এই ব্যবস্থা ঠিক হয় নি।

এই আইনের খসড়া দেখবার সুযোগ আমাদের এখনও হয় নি। দৈনিক কাগজে যা দেখেছিলাম তার অক্ষর এত ছোট যে, বৃদ্ধ মনুষ্যের পক্ষে তা পড়া দুঃসাধ্য। খবরের কাগজে এর একটি বিশেষত্বের নিম্নমুদ্রিত বিবৃতি আছে :

A SPECIAL FEATURE

A special feature of the Bill is the constitution of five committees, called the (1) Islamic Secondary Education Committee, (2) Hindu Secondary Education Committee, (3) Girls' Secondary Education Committee, (4) Scheduled Castes Secondary Education Committee, and (5) Provisional Board of Anglo-Indian and European Education. The function of these committees will be to conduct education entirely related to the respective culture and religion."

এই কমীটিগুলি যাদের জন্য স্থাপিত তাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি (বা কৃষ্টি) অনুসারে তাদের শিক্ষাকার্য্য নির্বাহ করা হবে কমীটিগুলির কাজ। হিন্দুদের ও মুসলমানদের ধর্ম্ম আলাদা বুঝলাম। কিন্তু তপসিলভুক্ত জা'তদের ধর্ম কি হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা? তপসিলভুক্ত জা'তরা ত অহিন্দু নয়, তারাও হিন্দু। তাদের কৃষ্টি কি অন্য হিন্দু জা'তদের কৃষ্টি থেকে ভিন্ন? কৃষ্টির একটি প্রধান অঙ্গ সাহিত্য। বাঙালী 'উচ্চ' জা'তের হিন্দু ও তপসিলী জা'তের হিন্দু

এদের সাহিত্য কি আলাদা? গীতবাদ্য চিত্র-আদি ললিত-কলা কৃষ্টির আর একটি অঙ্গ। সব বাঙালী জা'তের গীতবাদ্যচিত্রকলা কি অভিন্ন নয়? সুতরাং বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে দুটা কমীটি ভেদবুদ্ধি জাত। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের শাস্ত্রীয় ধর্মমত ভিন্ন হ'লেও, তাদের কৃষ্টি, অর্থাৎ প্রধানতঃ সাহিত্য এবং গীতবাদ্য চিত্র প্রভৃতি ত এক। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের কৃষ্টিকে পৃথক্ ধরে নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থার কোন কারণ নাই।

বালিকাদের ধর্ম ও কৃষ্টি কি বালকদের থেকে ভিন্ন? তা হ'লে বালকদের জন্যে একটা কমীটি কেন হ'ল না? বালিকাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান ব্রাহ্ম প্রভৃতি আছে। তাদের সকলের ধর্ম ও কৃষ্টি কি এক?

শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য মানুষ গ'ড়ে তোলা। সব মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য, সদ্ভাব, সম্প্রীতি বাড়ে সেই রকম শিক্ষাই দেওয়া উচিত। কিন্তু বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীকে কতকগুলা টুকরায় ভাগ ক'রে, তাদের কৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ব'লে ধরে নিয়ে শিক্ষা দিলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে না। সকল বালক-বালিকাকে অসাম্প্রদায়িক লৌকিক শিক্ষা দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।

—

"আমরা যাহা বিশ্বাস করি"

"আমরা যাহা বিশ্বাস করি" পুস্তিকাটি সম্বন্ধে আমরা চৈত্রের প্রবাসীতে যা লিখেছিলাম, তার দ্বারা এই ভুল জন্মিতে পারে যে, গান্ধীজীর স্বরাজের পরিকল্পনায় মানসিক সম্পদের দিকে দৃষ্টি নাই। কিন্তু পুস্তিকাটির ৯ম পৃষ্ঠায় আছে—

"গান্ধীজীর স্বরাজেও দেখতে পাচ্ছি,—

—All can read and write, and their knowledge keeps growing from day to day," "সবাই লিখ্‌তে পড়তে পারে এবং তাদের জ্ঞান দিন দিন বাড়তে থাকে।"

—

ক্রিপ্স্ কর্তৃক আনীত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবাবলী

সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার যে প্রস্তাবগুলি এনেছেন সেগুলি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের গৃহীত প্রস্তাব নহে। সুতরাং সেগুলি যে আকারে এসেছে সেই আকারে কিংবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন দলের দ্বারা গৃহীত হ'লেও ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হবেন না। আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব লর্ডসে বিনা প্রতিবাদে ব্যক্ত এই মত উদ্ধৃত করেছি যে, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট কোন প্রধান মন্ত্রীর, বা অন্য মন্ত্রীর, কিংবা কোন রাজপ্রতিনিধির, এমন কি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরেরও, কোন প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নন যদি সেই প্রতিশ্রুতি পার্লেমেণ্টের বিচারিত সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়। তবে, পার্লেমেণ্ট মন্ত্রিসভার প্রস্তাবাবলী লঘুচিত্ততার সহিত অগ্রাহ্য করবেন, এমন অনুমান করা যায় না;—গ্রহণ করবেন বলেই মনে করা যেতে পারে।

সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ কর্তৃক আনীত প্রস্তাবাবলীর প্রথম কথা, যুদ্ধশেষে শত্রুতামূলক সব কাজের অবসানে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষকে অন্য ডোমীনিয়নগুলির সমান মর্য্যাদা ও ক্ষমতা দেওয়া হবে স্বরাষ্ট্রিক ও বৈদেশিক সব ব্যাপারে; ভারতবর্ষ ব্রিটেনের বা কোন ডোমীনিয়নের নিম্নস্থানীয় বা অধীন হবে না; তাকে কেবল ব্রিটেন ও ডোমীনিয়নগুলির মত ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

এই রকম প্রতিশ্রুতি নূতন নয়। যুদ্ধশেষে কত কালের—এক বৎসর দু-বৎসর পাঁচ বৎসর বা দীর্ঘতর কালের—মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি পালিত হবে, তা বলা হয় নি। এতে একটা খটকা বাধে। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন ও বৃহৎ, ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন সংস্কৃতিবিশিষ্ট, ও ভিন্ন জাতি দ্বারা অধ্যুষিত দেশ ক্ষুদ্রতর দেশের ডোমীনিয়ন হয়ে তার রাজার আনুগত্য চিরতরে স্বীকার করবে, এরূপ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ডোমীনিয়নগুলির ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষেরও তা থাকলে তার আপাততঃ ডোমীনিয়নত্ব স্বীকার করায় ক্ষতি নাই।

প্রস্তাবাবলীর সকলের চেয়ে বড় খুঁত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণবিষয়ক প্রস্তাবটির মধ্যে আছে। তাতে আছে যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে এবং দেশী রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রসংঘ (য়ুনিয়ন) গঠিত হবে; কিন্তু যদি কোন বা কোন-কোন প্রদেশ সেই সংঘে যোগ না দিয়ে তার বাইরে বর্ত্তমান ভারতশাসন বিধি নিয়ে থাকতে চায়, তা হ'লে তাকে বা তাদিগকে সেই ভাবে থাকতে দেওয়া হবে। পরে তারা রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিতে পারবে, কিংবা পূর্বোক্ত রাষ্ট্রসংঘেরই মত একটি আলাদা ডোমীনিয়ন গঠন করতে পারবে। এক বা একাধিক প্রদেশকে আলাদা হ'য়ে গিয়ে এই যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবার সুযোগ (দুর্যোগ?) দেবার প্রস্তাব, এটা অত্যন্ত সাংঘাতিক। ভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা করবার প্রস্তাব একমাত্র জিন্না ও জিন্নার দল ক'রেছে। সুতরাং ক্রিপ্স্-আনীত এই প্রস্তাব দ্বারা পাকিস্তান প্রকারান্তরে মঞ্জুর করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সমাজ, দেশী খ্রীষ্টিয়ান সমাজ এবং জিন্নার দল ছাড়া সমুদয় মুসলমান এর বিরোধী।

এই প্রস্তাব এরূপ সাংঘাতিক যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যদি বলেন, ভারতীয় নেতারা এই প্রস্তাবে রাজী হ'লে ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘকে আমরা যুদ্ধান্তে ডোমীনিয়নত্ব না দিয়ে এখনই পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি, তা'তেও সম্মত হওয়া উচিত হবে না। কারণ দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত ভারতবর্ষ কখনই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না। ভারতবর্ষের বার বার পরাধীন হবার একটা প্রধান কারণ এই যে, ভারত বহু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, সব সময় ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ছিল না। এখন পরাধীন হ'লেও যখন ভারতবর্ষ কার্যতঃ অখণ্ডত্ব লাভ করেছে, সে অখণ্ডত্ব নষ্ট হ'তে দেওয়া কখনও উচিত হবে না। বরং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ যখন স্বাধীন হবে, তখন ফরাসী ভারত ও পোর্তুগীজ ভারতকে তার মধ্যে আনতে হবে এবং স্বাধীন নেপালকে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের সমমর্যাদাবিশিষ্ট অংশীদার করতে হবে।

রাষ্ট্রের অখণ্ডতা তার ক্রমবর্ধমান শক্তি, সম্পদ, সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্য কত আবশ্যক বিবেচিত হয়, ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কানাডা বাদে আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ক'রে য়ুনাইটেড্ স্টেটস্ অব আমেরিকা (আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র) নাম নিয়ে নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, তার পর যখন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের আমলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি। (Southern States) পৃথক্ হয়ে আলাদা একটি রাষ্ট্রসংঘ গড়তে চায়, তখন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের এই খণ্ডীকরণ নিবারণের জন্তে সেখানে কয়েক বৎসরব্যাপী ভীষণ অন্তর্যুদ্ধ চলে এবং শেষে দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলি পরাজিত হয়। এই প্রকারে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব রক্ষিত হয়।

যে খণ্ডীকরণ নিবারণের জন্ত আমেরিকায় এমন ভীষণ সংগ্রাম হয়ে গেছে, ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রিসভা অম্লানবদনে তার সুযোগ (দুর্যোগ ?) দিতে চাচ্ছেন!

আয়ার্ল্যাণ্ডে আলস্টারকে ব্রিটেন আয়ার্ল্যাণ্ডের অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশ থেকে আলাদা থাকতে দিয়েছেন; কিন্তু রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা বরাবর চেষ্টা ক'রে আসছেন সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডকে একই রাষ্ট্রে পরিণত করতে।

কানাডাকে যখন স্বশাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন তার কাথলিক ধর্মাবলম্বী ফ্রেঞ্চভাষী অধিবাসী এবং প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী ইংরেজিভাষী অধিবাসিগণকে আলাদা-আলাদা রাষ্ট্র গড়বার অধিকার দেওয়া হয় নি। দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রসংঘ যখন গঠিত হয়, তখন তার ওলন্দাজ বংশজাত ডচ্‌ভাষী বুঅর (Boer) এবং ব্রিটিশ-বংশজাত ইংরেজিভাষী ব্রিটনগণকে আলাদা-আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়া হয় নি। অষ্ট্রেলিয়াতেও খণ্ডীকরণ নীতি অনুসৃত হয় নি। এই চমৎকার প্রস্তাবটা ভারতবর্ষের জন্তেই করা হয়েছে!

সোভিয়েট রাশিয়ায় মোটামুটি এক শত ন্যাশনালিটির (মহাজাতির) লোক আছে এবং মোটামুটি ২০০ ভাষা সেখানে কথিত হয়। পৃথিবীর সকল ধর্মের লোক সেখানে আছে। এশিয়ার সমগ্র উত্তর অংশ ব্যাপী সাইবীরিয়া এবং ইয়োরোপেরও এক অতি বৃহৎ অংশ সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত। কিন্তু এত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এরূপ বড় ভূখণ্ডকেও অখণ্ড করা ও রাখা হয়েছে তার শক্তিমত্তা সম্পদশালিতা ও সব রকম প্রগতির নিমিত্ত।

চীন অতি বৃহৎ দেশ এবং এর লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়েও বেশী। এতেও বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে। জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া এবং এর আরও কোন কোন অংশ দখল ক'রে এর অখণ্ডত্ব নষ্ট করেছে। কিন্তু চীনরাষ্ট্র সেইগুলিকে আবার নিজের অন্তর্ভূত করবার জন্ত পাঁচ বৎসর ধ'রে যুদ্ধ করছে; তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে এবং অগণিত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

দেশের অখণ্ডত্ব কিরূপ মূল্যবান বিবেচিত হয়, তার আর বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। দুই বা তার বেশী রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হ'লে ভারতবর্ষ শুধু যে দুর্বল হবে, তা নয়; অন্ত অনেক অনিষ্ট সম্ভাবনাও হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রসংঘের আলাদা সৈন্যদল থাকবে, সুতরাং তাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে। তা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘে রাষ্ট্রসংঘে বাণিজ্যিক যুদ্ধও চলবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রসংঘ অন্ত রাষ্ট্রসংঘে উৎপন্ন সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাবে। এই যুদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় হবে। ইত্যাদি।

ক্রিপ্স্-প্রস্তাবাবলী অনুসারে যুদ্ধান্তে সব প্রদেশে ব্যবস্থাপরিষদগুলির নূতন সদস্য নির্বাচন হবে। সমগ্র ভারতের এই নূতন নির্বাচিত সদস্তেরা আপনাদের সংখ্যার আনুমানিক এক-দশমাংশকে সদস্য নির্বাচন ক'রে শাসনতন্ত্র-রচয়িতা মণ্ডলী (constitution-making body) গড়বেন। দেশী রাজ্যের রাজারা তাঁদের অধিবাসীদের অনুপাতে তাঁদের প্রতিনিধি এই মণ্ডলীতে পাঠাবেন। এই মণ্ডলী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করবেন।

আগেই বলেছি, কোন প্রদেশ বা কোন কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রখণ্ডের বাইরে থাকতে পারবে। এতে কি কুফল হবে, তা আগেই বলেছি।

শাসনতন্ত্র-রচয়িতা মণ্ডলীতে বাংলা দেশ যত সদস্য পাঠাবে, তাতে বাংলার হিন্দুদের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকবে না। প্রথমতঃ বাংলা দেশটাকেই কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত ক'রে বাংলা প্রদেশ এমন ভাবে গঠিত হয়েছে যে, বঙ্গের অনেক অংশ আসামে ও বিহারে গিয়ে পড়ায় তথাকার হিন্দুরা প্রকৃত বাংলার আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা প্রদেশে যত হিন্দু আছে, তারা এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গুরুত্ববর্ধক কিছু বেশী প্রতিনিধি (weightage) ত পায়ই নাই, অধিকন্তু তাদের সংখ্যা অনুসারে তাদের যত প্রতিনিধি আইনসভায় পাওয়া উচিত ছিল তাও পায় নাই—কম পেয়েছে। সুতরাং শাসনতন্ত্র-রচয়িতা মণ্ডলীতে বাঙালী হিন্দুরা তাদের লোক-সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না।

শুধু বাঙালী হিন্দুদের প্রতিই যে এই অবিচার হবে, তা নয়; বঙ্গে অত্যন্ত বেশী বেশী হবে, কিন্তু যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে-সব প্রদেশেও হিন্দুদের প্রতি এই অবিচার হবে! কারণ সেই সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ব'লে গুরুত্ববর্ধক অতিরিক্ত প্রতিনিধি (weightage) পাওয়ায় হিন্দুরা তাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য প্রতিনিধির চেয়ে কম প্রতিনিধি পেয়েছে। সুতরাং শাসনতন্ত্র-রচয়িতা মণ্ডলীতেও তারা যথাযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না।

আমাদের মতে ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ থেকে পৃথক্ থাকবার অধিকার কোন প্রদেশকেই দেওয়া উচিত নয়, কোন দেশী রাজাকেও দেওয়া উচিত নয়। আমরা যত দূর দেখেছি, মিঃ জিন্নার দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দলই এই রকম অধিকারের বিরোধী। কিন্তু তাদের সকলের আপত্তি সত্ত্বেও যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ক্রিপ্স্-প্রস্তাবাবলী অনুসারে কাজ করেন ও এই অধিকার কায়েম রাখেন, তা হ'লে কোনো প্রদেশ পৃথক্ হ'তে পারবে কি না তা তার প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্ধেকের উপর ২।১ ভোটের দ্বারা—শতকরা ৫১।৫২টা ভোটের দ্বারা—স্থিরীকৃত হওয়া উচিত হবে না, যদি ন্যূনকল্পে শতকরা ৬৫জন প্রতিনিধি পৃথক্ থাকার পক্ষে হয়, তা হলেই তাকে পৃথক্ থাকতে দেওয়া যেতে পারবে। এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি সর্বজনভোটের (plebiscite-এর) দ্বারা করতে হয়, তা হলে তাও শতকরা ন্যূনকল্পে ৬০।৬৫ ভোট আলাদা থাকবার পক্ষে হ'লে তবে কোনো প্রদেশকে পৃথক্ থাকতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আবার বলি, পৃথক্ থাকতে দেবার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রস্তাবাবলীতে বলা হয়েছে যে, দেশী রাজ্যের নৃপতিরা তাঁদের প্রতিনিধি মনোনীত ক'রে শাসনতন্ত্ররচয়িতা মণ্ডলীতে পাঠাবেন। দেশী রাজ্যের প্রজাগণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে বলবৎ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনেও এই প্রকারে দেশী রাজ্যের প্রজাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। এই উপেক্ষা অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। ব্রিটিশ-ভারতের প্রজাদের মত দেশী রাজ্যের প্রজা-সমূহেরও রাষ্ট্রসংঘের শাসনতন্ত্ররচনাকার্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত।

এ-পর্য্যন্ত আমরা যা লিখলাম, তা যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে কি রকম রাজনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার কি প্রকারে দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে। কিন্তু ভবিষ্যতের এই সমস্যার সমাধানের চেয়ে সাম্প্রতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভ এখন অধিক আবশ্যক। জাপানীদের আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা সর্বাগ্রে দরকার। তার জন্যে খুব বেশী সৈন্য, খুব বেশী অস্ত্রশস্ত্র, বিমানবাহিনী, খাদ্য, যুদ্ধসম্ভার ইত্যাদি, এবং খুব বেশী টাকা চাই। এই সকল জোগাতে হ'লে দেশের সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে দেশরক্ষা-বিষয়ে খুব উৎসাহ জাগান আবশ্যক। মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে জাপানীদের হাত থেকে দেশ-রক্ষায় উৎসাহ না-থাকায় কি কুফল হয়েছে, তা সুবিদিত। ব্রহ্মদেশে ত তথাকার অনেক অধিবাসী জাপানীদের পক্ষই অবলম্বন করেছে। অন্য দিকে, ফিলিপাইন্সের অধিবাসীরা স্বশাসন-অধিকার অনেক আগে থেকেই পাওয়ায় ফিলিপিনোরা সেনাপতি জেনার‍্যাল ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে এমন যুদ্ধ করে আসছে, যে, ফিলিপাইন্সের যুদ্ধে ভূতপূর্ব জাপানী সেনাপতি ফিলিপিনোদিগকে পরাস্ত করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন।

কংগ্রেসের ও অন্যান্য ভারতীয় স্বাজাতিক দলের দাবী এই যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সমুদয় সদস্য বেসরকারী ভারতীয় নেতৃস্থানীয় লোক হওয়া চাই এবং ভারত-সরকারের সব দপ্তরের—মায় সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের—ভার ভারতীয় সদস্যের হাতে ন্যস্ত হওয়া চাই। ভারতশাসন-আইন অনুসারে বড়লাটের শাসন-পরিষদের তিন জন সদস্য অভিজ্ঞ সরকারী চাকর্যে হওয়া আবশ্যক। আইনের এই ধারা এক দিনের মধ্যেই বিলাতী পার্লেমেণ্টে সংশোধিত হ'তে পারে। ব্রিটিশ জাতির ও ব্রিটিশ

গবর্ন্মেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে এ বাধা অতিক্রম করা মোটেই কঠিন নয়।

ক্রিপ্স্-আনীত প্রস্তাবাবলী অনুসারে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সমর-সচিব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিই থাক্‌বেন। কিন্তু তা থাকলে দেশরক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও নিরক্ষর ধনী ও দরিদ্র সব লোকের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মিবে না—এই যুদ্ধটাকে নিজেদের যুদ্ধ ব'লে তাদের আন্তরিক বিশ্বাস উৎপন্ন হবে না। এইরূপ বিশ্বাসের অভাবের ফল মালয় ও ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সম্ভবতঃ মনে করেন, ভারতীয় নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি কখনও ত যুদ্ধ করেন নাই, সুতরাং অ-যোদ্ধা এমন কোন লোককে সমর-সচিব করা অসঙ্গত হবে এবং তাতে যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে। ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দলের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নাই, একথা সত্য না হইলেও একথা সত্য বটে যে, বড় বড় নেতাদের কেও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করেন নি। কিন্তু ইংলণ্ডে যাঁরা এ পর্য্যন্ত সমর-সচিব হয়েছেন, তাঁরা কি সবাই বা তাঁদের অধিকাংশ যোদ্ধা ছিলেন? ছিলেন না। অথবা তাঁদের কথাই বা তুলি কেন? যে গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড ও মিত্রপক্ষ জয়ী হয়েছিলেন, তাতে ইংলণ্ডের যুদ্ধের প্রধান পরিচালক ছিলেন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ। তিনি কোন কালেই সেনানায়ক ছিলেন না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার সভাপতি প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল। তিনিও কোন কালে সেনানায়ক ছিলেন না। সুতরাং অ-যোদ্ধা কোন ভারতীয় নেতাকে ভারতবর্ষের সমর-সচিব করা মোটেই অসঙ্গত হবে না। সমর-সচিবের ও প্রধান সেনাপতির (Commander-in-Chief-এর) কাজ এক নয়। সমর-সচিব যিনিই হোন তিনি রণক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযান-কৌশল রণকৌশল-আদিতে (strategyতে) হস্তক্ষেপ করবেন না; সে-ভার থাকবে সেই সেনাপতির উপর যিনি নিকটে থেকে যুদ্ধ চালাবেন।

ভারতবর্ষের সমর-সচিবের ভারতীয়ই হওয়া চাই, এটা শুধু আমাদের আত্মসম্মানের ব্যাপার নয়—যদিও এ বিষয়ে আত্মসম্মান রক্ষা ব্যতিরেকে দেশরক্ষা বিষয়ে সর্বসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ হবে না (যা আগেই বলেছি)। আমরা খবরের কাগজে ব্রিটিশ সরকার পক্ষেরই কথায় প'ড়ে আসছি যে, সিঙ্গাপুরে ও মালয়ের অন্যত্র ব্রিটিশ পরাজয়ের প্রধান কারণ, জাপানীদের সৈন্যসংখ্যার আধিক্য, এরোপ্লেনের আধিক্য, সমুদ্রে রণতরীর আধিক্য, ব্রিটিশ পক্ষের যুদ্ধসম্ভার ও খাদ্যাদির অ-যথেষ্ট সরবরাহ ইত্যাদি। প্রায় ৪০ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষের নিকটেই ব্রিটিশ পক্ষের চেয়ে জাপানীরা বহুদূর থেকে অধিকতর সৈন্য আমদানী করতে পারল, ভারতবর্ষের সমর-সচিব আগে থাকতে ভারতীয় কেও থাকলে এমন অবস্থা ঘটত না। বেতনভোগী সিপাহী এক কোটি না হোক, নাগরিক যোদ্ধা (citizen soldiers) এদেশে এক কোটি অনায়াসেই হ'তে পারে, যদি দেশ স্বশাসক হয় ও তার সমর-সচিব হন দেশেরই কোন লোক। এদেশে জাহাজ, মোটর-যান ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণে গবর্ন্মেণ্ট ইতিপূর্বে উৎসাহ দেন নি। দেশটা যদি স্বশাসক হ'ত, কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সব সদস্য যদি দেশী হ'ত এবং সমর-সচিবের পদ যদি কোন যোগ্য ভারতীয়কে দেওয়া থাকত, তা হ'লে রণতরী, এরোপ্লেন এবং সকল রকম যুদ্ধসম্ভার এদেশে প্রস্তুত করায় বাধা ত দেওয়া হ'তই না, বরং উৎসাহই দেওয়া হ'ত। এখনও সমর-সচিব যদি ভারতীয়কে করা হয়, তা হ'লে ঐ সকল যন্ত্র ও জিনিস যথেষ্ট প্রস্তুত করবার চেষ্টা হবে।

এই সকল কাজে অনেক টাকার দরকার। ইংলণ্ডের লোকে খুব বেশী ট্যাক্স দিতে আপত্তি করছে না, খুব বেশী সরকারী ঋণ (public debt) বৃদ্ধিতে আপত্তি করছে না, এই জন্যে যে তারা ধনী ও তারা জানে টাকাটা **তাদেরই** দেশরক্ষার জন্যে খরচ হবে **তাদেরই** প্রতিনিধিদের দ্বারা। ভারতবর্ষে ট্যাক্স বৃদ্ধিতে আপত্তি হচ্ছে এই জন্যে যে, ভারতীয়রা দরিদ্র এবং জানে যে টাকাটা ব্যয় হবে বিদেশীদের কর্ত্তৃত্বে এ রকম যুদ্ধের জন্যে যার উপর তাদের কোন হাত নাই। কিন্তু যুদ্ধটা তাদের দেশ ও তাদের মানইজ্জৎ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই, এ রকম বিশ্বাস দরিদ্র ভারতীয়দের হ'লে তারাও অধিকতর ট্যাক্স দিতে ও সরকারী ঋণবৃদ্ধিতে সম্মত হবে।

ক্রিপ্স-আনীত প্রস্তাবাবলীর পক্ষে বলা হয়েছে, যে, এই মহাযুদ্ধ মিত্রপক্ষের কোন একটা দেশ একা একা করছে না, যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা (war cabinet) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক কৌন্সিল (Pacific Council) মন্ত্রণাদ্বারা যা স্থির করেন, সেই অনুসারে অভিযান-সমূহ চলবে, এবং এই মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে এক জন ভারতীয় থাকবেন। তা ঠিক। কিন্তু এই সব মন্ত্রণার মধ্যে ব্রিটেনের, আমেরিকার, কানাডার ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকও ত আছে; সেই কারণে কি ঐ সকল দেশে সেই-সেই-দেশী সমর-সচিব নাই? ধরুন অষ্ট্রেলিয়ার কথা। তার

নিজের অষ্ট্রেলীয় সেনাপতি আছে (ভারতের ভারতীয় সেনাপতি নাই) এবং অষ্ট্রেলীয় সমর-সচিব আছে ; ভারতবর্ষের নিজের ভারতীয় সমর-সচিব কেন থাকতে পারে না ?

ক্রিপ্স্-আনীত প্রস্তাবাবলীতে আছে :—

(E) During the critical period which faces India and until the new Constitution can be framed, His Majesty's Government must inevitably bear the responsibility for and retain the control and direction of the defence of India as part of their world war effort, but the task of organizing to the full the military, moral and material resources of India must be the responsibility of the Government of India with the co-operation of the peoples of India.

তাৎপর্য। ভারতবর্ষের এই সঙ্কটকালে এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার আগে পর্যন্ত বিলাতী গবন্মেণ্ট তাদের পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধপ্রচেষ্টার অংশস্বরূপ ভারতবর্ষ রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে অবশ্যম্ভাবী রূপে রাখতে বাধ্য, কিন্তু ভারতের সমুদয় সামরিক, মানসিক ও সামগ্রীক বল দেশের লোকদের সহযোগিতায় পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের কাজে লাগাবার ভার ভারত-গবন্মেণ্টের হাতে থাকবে।

বিলাতী গবন্মেণ্ট যেমন ভারত-রক্ষার ভার নিচ্ছেন, মালয় ও ব্রহ্মের ভারও ত সেইরূপ তাঁদের ছিল। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতির ভার কি ঠিক্ সেই ভাবে নিয়েছেন ? ভারতরক্ষার দায়িত্ব বিলাতী গবন্মেণ্টের নেওয়া ও রাখার মানে কি এই যে, উক্ত গবন্মেণ্ট ঐ কাজ নিজের ব্যয়ে করবেন ? না, টাকা দেবে ভারতবর্ষের লোকেরা এবং ব্যয় ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরা করবেন ?

ভারত-গবন্মেণ্টের হাতে যে-দায়িত্ব আছে, সেই অনুসারে কাজ ভারত-গবন্মেণ্ট পূর্ণ মাত্রায় করতে পারছেন কি ? বোধ হয় পারছেন না। এদেশের মিলিটারি ও মেটীরিয়াল রিসোর্সেজ্ কাজে লাগান পূর্ণ মাত্রায় না হ'লেও অনেকটা হচ্ছে এবং আরো হ'তে পারে বটে, কিন্তু মর‍্যাল রিসোর্সেজ পূর্ণ মাত্রায় বা বেশী পরিমাণে কাজে লাগান গবন্মেণ্টের সাধ্যাতীত থাকবে তত দিন যত দিন কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট "জাতীয় গবন্মেণ্ট" (National Government) না হবে—যেরূপ গবন্মেণ্টের দাবী কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, উদারনৈতিক দল, বে-দল নেতারা ও অন্য কেও কেও ক'রেছেন।

আমরা ২৭শে চৈত্র এই সকল কথা লিখলাম, এখনও এরূপ কোন সংবাদ পাই নি যে, কংগ্রেস প্রভৃতি ক্রিপ্স-আনীত প্রস্তাবগুলি পরিবর্তিত আকারেও গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তাবগুলির অন্য সব বিষয়ের দশা যাই হোক, ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা যথাসম্ভব পূর্ণ মাত্রায় হওয়া একান্ত আবশ্যক, এবং হ'লে সুখের বিষয় হবে।

—

জাপানী আক্রমণের ঢং

ইংরেজরা মনে ক'রেছিলেন সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় করবেন, এবং ভেবেছিলেন তাকে সমুদ্রপথে আক্রমণ অসম্ভব বা দুঃসাধ্য করলেই সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু জাপানীরা সিঙ্গাপুর আক্রমণ ক'রল স্থলপথে জঙ্গল ও জলার মাঝখান দিয়ে এবং শহর ও বন্দরটি দখলও ক'রল।

জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার জন্যে আণ্ডামান দখল করবে, একথা বোধ হয় ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভাবেন নি। কিন্তু জাপানীরা তাই ক'রে বসেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাগ্রে আসাম ও বাংলা দেশই আক্রান্ত হবে এবং বন্দরের মধ্যে প্রথমেই চট্টগ্রাম ও কল্‌কাতার উপরই বোমা পড়বে, সবাই এই রকমই ভেবে রেখেছিল। কিন্তু বোমা পড়ল সর্বাগ্রে মান্দ্রাজ প্রদেশে ভিজাগাপাটমের ও কোকনাডা বন্দর দুটার উপর। এর মানে অবশ্য এ নয় যে, কল্‌কাতা বা চাটগাঁ বা অন্য কোন শহর রেহাই পেল—তাদের পালা পরে আসতে পারে ; এর মানে এই যে, যেখানে আক্রমণ প্রতিরোধ বা ব্যর্থ করবার বন্দোবস্ত থাকে, জাপানীরা আগেই সেদিকে যায় না।

—

সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে সংবাদ

রয়টার প্রথমে খবর রটালেন যে, জাপানের নিকট একটা বিমান-দুর্ঘটনায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। এক দিন পরে সেই রয়টারই আবার বললেন, সংবাদটা সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং সুভাষবাবুর মাতার সহিত সমবেদনা প্রকাশ ক'রেছিলেন। পরে সংবাদটা মিথ্যা ব'লে বুঝতে পেরে সুভাষবাবুর মাতাকে অভিনন্দিত ক'রেছেন সংবাদটা মিথ্যা হয়েছে ব'লে। মিথ্যা সংবাদটা রটার একটা ফল এই হয়েছে যে, যেসব নেতাকে লোকে সুভাষবাবুর বিরোধী বা প্রতিপক্ষীয় মনে করে তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেছেন।

বাংলা দেশে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, যাঁর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটে, তিনি দীর্ঘজীবী হন।

সুভাষবাবুর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটানর জন্যে জার্মানরা ইংরেজদিকে দোষ দিচ্ছে। সংবাদটা মিথ্যা বটে এবং

যে-রয়টার কোম্পানী তা রটিয়েছে তার মালিকরা ইংরেজ বটে; কিন্তু দুরভিসন্ধিপূর্বক এ রকম খবর রটিয়ে কোন লাভ নাই। সুতরাং রয়টারের ভুলটা আকস্মিক ব'লে মনে করাই ন্যায়সঙ্গত।

—

"রেশম শিল্প"

বঙ্গদেশের গবর্ন্মেণ্টের শিল্প-বিভাগ সরকারী রেশম-বিভাগের ডেপুটি-ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত "রেশম শিল্প" নামক বহিখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ক'রে যথাযোগ্য কাজ করেছেন। এতে রেশম শিল্পের গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত সব বিষয় ৮৪খানি ছবি দিয়ে বিশদভাবে বুঝান হয়েছে। যারা ইংরেজি জানে না, কেবল বাংলা পড়তে পারে, তারাও এই বই প'ড়ে এই শিল্পের দ্বারা রোজগার করতে পারবে, যারা বাংলা পড়তে পারে না, কিন্তু বুঝে, তাদিকে কেউ যদি এই বইটি পড়ে শুনান, তা হ'লে শ্রোতারা লেখকের পরামর্শ অনুসারে কাজ ক'রে লাভবান হবে। "ভদ্রলোক" শ্রেণীর বাঙালীরাও এই বইটির সাহায্যে রেশম শিল্পের কাজ করতে পারবেন।

লেখক অভিজ্ঞ কর্ম্মী। তাঁর মতে, "বাংলা দেশের রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক ত নহেই এবং প্রকৃত চেষ্টার দ্বারা ইহার পুনরুদ্ধার সম্ভব ত বটেই, তাহা ছাড়া গত শতাব্দীতে ইহার যে প্রসার ছিল, তাহা অপেক্ষাও বেশী প্রসার ও বৃদ্ধি সম্ভব।" বহিখানির দাম এক টাকা। কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে পাওয়া যায়।

—

পোড়া কয়লার মালগাড়ীর নূতন ব্যবস্থা

গত ১১ই চৈত্র তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পপ্রধান স্থানগুলির জন্য পোড়া কয়লার মাল-গাড়ীর প্রাধান্যমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সকলের চাহিদা মিটাইয়া সাধারণ সরবরাহের ভিতর দিয়া রন্ধনের কয়লা আনাইতে হইবে না। এই বন্দোবস্তে ফল কিছু ভাল হইবার কথা। মধ্যে কলিকাতায় পোড়া কয়লার মূল্য বারো আনা মণ হইয়াছিল, ২৮শে চৈত্র চৌদ্দ আনা মণ। বহু কারখানা যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী করিতেছে ও বাজারের কাজও করিতেছে। তাহারা যাহাতে যুদ্ধের কাজের মত মালগাড়ী আগে পায়, বাজারের কাজের জন্য কয়লা পর্য্যন্ত এই সুযোগে আগে না টানিয়া লয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল মাত্র কলিকাতায় ও আশেপাশে পোড়া কয়লার মালগাড়ীর বিশেষ ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, সাধারণ সময়ে ভারতের যে যে স্থানে পোড়া কয়লা যাইত সেই সকল স্থানের জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইবে। দরিদ্রের রন্ধনের উপকরণ পোড়া কয়লাকে, যুদ্ধের জিনিস তৈয়ারী করিতেছে না, এরূপ কলকারখানার কয়লা অপেক্ষা প্রাধান্য দিবার নীতির উপর আমরা সম্পূর্ণ জোর দিতে চাই। ইহাতে অপর এক দিকে উপকার হইবে। পোড়া কয়লা বিক্রয় ভারতীয়দিগের বহু খনির একমাত্র উপজীবিকা। সেগুলি মালগাড়ী পাইলে বাঁচিয়া যাইবে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, ৩১শে মার্চ্চ নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমীটি রেলওয়ে কোন্ কোন্ বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সরকারের পরিকল্পিত কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার ভিতর কলিকাতায় কয়লা-বণ্টন-নিয়ন্ত্রক (Controller of coal distribution) নামে এক কর্ম্মচারীনিয়োগের কথা আছে। যুদ্ধকালে কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। গত মহাযুদ্ধের সময়ে কয়লার মালগাড়ীর ব্যাপারে বহু অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারও যাহা যাহা হইতেছে তাহা আমরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। সাধারণ সময়ে যাহা করা সম্ভব হয় না, এই সব সময়ে যুদ্ধের অজুহাতে তাহা চলিয়া যায়। কিন্তু দেশবাসীর পক্ষে ফল সমানই মারাত্মক হয়। রাণীগঞ্জ-ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের কোনও এক স্থানে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ইংরেজদের খনির ও ভারতীয়দের খনির রেলওয়ে সাইডিংগুলির আলোকচিত্র লইলে দেখা যাইবে এক স্থানে মালগাড়ীর প্রাচুর্য্য ও অন্য স্থানে অত্যন্তাভাব। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিরা প্রতি সপ্তাহে ভারতীয়দের ও ইংরেজদের খনিগুলি নিজ নিজ ভিত্তি অনুসারে কে কত পরিমাণ মাল-গাড়ী পাইতেছে তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করুন। মাল-গাড়ী কাহাকে অগ্রে দেওয়া হইবে তাহার নিয়মগুলিও ব্যবস্থা-পরিষদে সুনির্দ্দিষ্ট হউক। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

স্বেচ্ছামূলক পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ

গত ১১ই চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কৃষককে পরামর্শ দেওয়া হইবে যেন অর্দ্ধেকের

অধিক জমীতে পাটচাষ না করা হয়, অর্থাৎ দশ আনা জমী পর্যন্ত চাষ করিলে সে আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে না। স্বেচ্ছামূলক ভাবে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অতীতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও বাংলা-সরকার করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কোনও ফল হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, লাইসেন্স দেওয়া হইয়া গিয়াছে ও নিম্নভূমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। আমরা মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে বলিয়াছিলাম, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিমণ্ডল যাইবার পূর্ব্বে পাটচাষ বাড়াইবার অনুমতি দিয়া যে অন্যায় কার্য্যটি করিয়া গেলেন, তাহার সংশোধন নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের আশু কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট আমরা অনেক কিছু আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন ব্যতীত অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। পাটের বিষয়টি আমরা চিরকাল নিরপেক্ষভাবে অর্থনীতির দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিতেছি। মণ্টফোর্ড আইনে যখন হস্তান্তরিত কৃষি-বিভাগ সর্ কে, জি, এম্, ফারোকীর অধীনে ছিল, তখনও আমরা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় বাংলা-সরকারের পাট-নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বাংলার অমূল্য সম্পদ পাটচাষী ইং ১৯২৫-২৬ সালে (যখন পাটের দর পঁচিশ টাকা মণ হইয়াছিল) ব্যতীত কখনও উপযুক্ত মূল্যে বেচিতে পারিল না। পারিলে প্রধানতঃ মুসলমান চাষীর হাতে টাকা আসিত ও সেই টাকার একটা অংশ হিন্দু জমীদার, ব্যবসায়ী, উকিল, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি পাইত ও সমগ্র বাংলার দারিদ্র্যের লাঘব হইত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষকের স্বার্থের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কে সরকারের পাটনীতি পরিচালনা করিবেন?

প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, ভারত-সরকার আমেরিকার চাহিদা সরবরাহ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন। গত ফসলের বহু পাট এখনও পল্লী অঞ্চলে পড়িয়া আছে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এবার পূর্ব্ব ফসলের মত এক-তৃতীয়াংশ জমীতে চাষ করিলে আমেরিকার চাহিদা মিটাইতে কোনও অসুবিধা হইত না, বরং পাট অতিরিক্ত থাকিয়া যাইত। যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যতটা বুঝা যায় তাহাতে পাট কাটিবার সময়ে পাট, চট বা থলিয়া আদৌ রপ্তানী করিতে পারা যাইবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এখনই ত কলিকাতা বন্দর হইতে কয়লা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং লক্ষ লক্ষ মণ অধিক পাট লইয়া কৃষক কি করিবে? বৎসরে মোটামুটি পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মণ চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে এখানে আসে। এই আমদানী বন্ধ হইয়াছে। এখন ধানচাষ বাড়াইবার সময়, পাট চাষ বাড়াইবার নহে।

মফঃসলের শহরে পল্লীগ্রামে কলিকাতা-প্রবাসী যাঁহাদের বাড়ী আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই 'প্রবাসী' তাঁহাদিগকে সেই সব বাড়ী ব্যবহারযোগ্য করিয়া রাখিতে বলিয়াছিল। এখন সে পরামর্শের মূল্য বুঝা যাইতেছে। বোমার ভয়ে অনেক শিক্ষিত লোক পল্লীগ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। যে পল্লীসংগঠনের কথা বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহু বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই, আজ তাহা আপনা আপনি কিছু হইয়া যাইতেছে। কলিকাতা হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরের গ্রামে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, যে-বাড়ীতে মালিক দশ বৎসরের মধ্যে পদার্পণ করেন নাই ও যাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা আজ সংস্কারান্তে হাস্যালাপমুখর হইয়াছে। দুগ্ধ ও তরীতরকারি যৎসামান্য মূল্যে বিক্রীত হইত; এখন গোয়ালা, চাষী দর পাইতেছে। গরীব দুঃখী লোক কাজ পাইত না, এখন রাঁধুনি, ঝি, চাকরের কাজ করিয়া দুই পয়সার মুখ দেখিতেছে। যে-পল্লী অসময়ে আশ্রয় দিয়াছে, উদ্যোগী হইয়া তাহার সেবা করা শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যদি পাটচাষীদিগকে পাটের ভবিষ্যৎ কিরূপ অন্ধকারময় তাহা বুঝাইয়া দেন ও অধিক জমীতে ধানচাষের পরামর্শ দেন, তাহা হইলে ১৩৪৯ সালের শেষ দিকে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা নিবারিত হইতে পারে। বহু রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামের অর্থনীতিক গঠন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলাম বলিয়া অতীতে আমরা কষ্ট পাই নাই। "মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি"।

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদি অবিলম্বে ঘোষণা করেন যে, অতিরিক্ত জমীতে উৎপন্ন পাট কৃষিবিভাগের লোক গিয়া বাঁধাইয়া প্রতি চাষীর ঘরে সরকারী শিলমোহর লাগাইয়া দিয়া আসিবে ও ইংরেজী ১৯৪৩ সালের শেষদিকে পাট কাটিবার সময়ের পূর্ব্বে উহা বেচিতে দিবে না, তাহা হইলে যে-সকল চাষী এখনও পাট বুনে নাই তাহারা অধিক জমী পাটে লাগাইবে না। গত ফসলের মত এক-তৃতীয়াংশ জমীতে চাষ করিবার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা ফল সন্তোষজনক হইতে পারে না। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

—

বর্ত্তমান বাংলার অর্থনীতি

কাপড় ও হাতের তাঁত

বোম্বাই শহরের বহু শ্রমিক শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে কাপড়ের কলের কাজে ব্যাঘাত ঘটিতেছে; যুদ্ধ যেরূপ ক্রমশঃ ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহাতে বড় বড় শহর হইতে আরও লোক চলিয়া যাইতে পারে, রেলওয়েগুলিও সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ বহনে ব্যস্ত থাকিতে পারে। বঙ্গদেশে আমরা যত কাপড় পরি, তাহার শতকরা আশী-নব্বই ভাগ বাহির হইতে আসে। এই আমদানী বন্ধ হইলে আমাদের এক অভূতপূর্ব্ব ভীষণ অবস্থা ঘটিতে পারে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বাংলার তন্তুবায়ের জিনিস কিনিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তোলা। এখনও বঙ্গদেশে দুই লক্ষ লোক তাঁত চালায়, তবে আমরা পারতপক্ষে তাহাদের জিনিস কিনি না বলিয়া তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা যদি ভাবী দুর্দ্দিনের কথা মনে করিয়া উহাদের কাপড় কিনিতে আরম্ভ করি, এখনই তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। হুগলী জেলার রাজবলহাটের তন্তুবায়েরা তাঁতে একরূপ মোটা সুতার কাপড় তৈয়ার করে, ইহা অষ্টপ্রহর পরা চলে। দাম জোড়া-প্রতি মিলের সমান-মোটা কাপড়ের অপেক্ষা কিছু বেশী বটে, কিন্তু সুতা পাট করা থাকে বলিয়া এমন অধিক দিন টিঁকে যাহাতে তাঁতের কাপড়ই শেষ অবধি সস্তা দাঁড়ায়। সকল তন্তুবায়প্রধান স্থানে এইরূপ মোটা কাপড় বুনাইতে হইবে।

তাঁতে এখন কলের সুতা বুনা হয়। এই সুতাও পাওয়া না যাইতে পারে। আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময়ে ট্রামে পর্য্যন্ত লোক তকলি চালাইয়াছিল। এখনও কি সর্ব্বত্র চরকা ও তকলি চলিতে পারে না? সেই সুতা তাঁতে বুনিয়া আগামী সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে তুলার চাষ করিতে হইবে। হাওড়া রামরাজাতলায়, দমদমের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর কলোনিতে আমরা তুলার চাষ সফল হইতে দেখিয়াছি। ঢাকেশ্বরী কটন মিল ঢাকায় তুলার চাষে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি দুই-একটি স্থান ব্যতীত বঙ্গদেশে তুলার চাষ হয় না এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে।

জুতার কল ও মুচি

জুতার কল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মুচিদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। অথচ লোক যদি ইহাদিগকে আমাদের সমাজদেহের অঙ্গ মনে করিয়া ইহাদের তৈয়ারী জিনিস কিনেন, তাহা হইলে বহু বাঙালীর অন্ন হয়। হাওড়ায় প্রথমে দুই-একখানি বাঙালী মুচির দোকান ছিল। স্থানীয় লোকেরা যাহাতে বাঙালীর জিনিস বাঙালী-ক্রেতার পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করে তাহার জন্য কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে এখন এই শহরে অন্ততঃ ত্রিশ-খানি বাঙালী মুচির দোকান ভাল চলিতেছে। বাংলার সর্ব্বত্র ইহা করা যায়। শহরের যে সকল লোক এখন পল্লী-গ্রামে গিয়াছেন তাঁহারা চুরি-ডাকাতির ভয়ে সশঙ্ক হইয়া আছেন। খাইতে না পাইলে ভাল লোকও চুরি-ডাকাতি করে। কাপড়, জুতা, বাসন, গন্ধদ্রব্য কিনিবার সময়ে আমরা যদি টাকা বাহিরে দিয়া আসি তাহা হইলে গ্রামের বুভুক্ষু তন্তুবায়, মুচি, কুম্ভকার, মালাকর প্রভৃতি নবাগত ভদ্রলোকদের বাড়ীতে চুরি-ডাকাতি করিলে দেশে এত পুলিস নাই যে তাহা নিবারণ করিতে পারে। বর্ত্তমানে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে আমাদের বিপদ ও অসুবিধা অনেক হ্রাস পাইবে।

সরিষা, রেড়ী ও করঞ্জার চাষ

কেরোসিন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, শীঘ্রই দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। রেড়ী ও করঞ্জার চাষ সর্ব্বত্র করিতে হইবে। আখের ও সরিষার চাষ বাড়াইতে হইবে। বোম্বাই-আমেদাবাদ বৎসরে অন্ততঃ বারো কোটি টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বিক্রয় করে, অথচ নিরুপায় না হইলে বাঙালীর খনির কয়লা কিনে না। কিনিলে প্রসিদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাবমত বিশ হাজার শিক্ষিত বাঙালীর কয়লাখনি-অঞ্চলে কাজ মিলিত। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চিনির কলগুলির প্রধান খরিদ্দার বাংলা। কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের বাসিন্দা বাঙালীরাও ঐ সকল কারখানাতে কাজ পান না। বিহারের সহস্র সহস্র লোক বাংলায় অর্থার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বাঙালী বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সহস্র সহস্র উড়িয়্যাবাসী বাংলায় পাচক, বাগানের মালী, মুটে প্রভৃতির কাজ করিতেছে। তাহার তুলনায় কয়জন বাঙালী উড়িষ্যায় জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন? বঙ্গদেশ হইতে এক বিরাট্ অর্থের স্রোত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে যাহার বিনিময়ে আমরা কিছুই পাই না। সর্ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার বঙ্গদেশকে Consumers' province অর্থাৎ ক্রেতার প্রদেশ এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বাংলায় বসিয়া যাঁহারা কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, সেই মাড়োয়ারীরাও তাঁহাদের

কলিকাতার অফিসগুলিতে বাঙালী কেরানী হটাইয়া দিয়া ইংরেজীশিক্ষিত স্বজাতীয়কে বসাইতেছেন। বিদেশীয় ও অবাঙালী ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক শোষণই বঙ্গদেশের দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যার একটি প্রধান কারণ। যুদ্ধের জন্য যে অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে অন্য প্রদেশের ক্ষতি হইলেও বাংলার আর্থিক লাভ হইবার কথা। কলিকাতার অনতিদূরে কোনও স্থানে সরকারী কাজে তিন হাজার কুলী মাটি কাটার কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে দুই শত অবাঙালী, বাকী সব বাঙালী। এই যে আটাশ শত লোক প্রত্যহ দশ আনা রোজগার করিতেছে, অন্য সময় হইলে কি তাহা হইতে পারিত? অন্য সময়ে এখানে সবই অবাঙালী কাজ করিত।

আমরা শিল্প স্থাপন করিতে পারি নাই। বাঙালীর সব কাপড়ের কল এক করিলে বোম্বাই-আমেদাবাদের একটা কলের অপেক্ষা কম হইবে। চিনি, সীমেণ্ট, কাগজের কল আমরা একটাও করিতে পারি নাই। কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এখন কলকারখানার গোলমাল হইতেছে, কৃষি অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে। সুতরাং বুঝিয়া চলিতে পারিলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অবস্থা এখনই উন্নত হয়। যে অভাব ও দৈন্য স্বাভাবিক সময়ে আমাদের চিরসাথী হইয়া গিয়াছিল, সঙ্কটকালে তাহা বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গুলো বোধ হয় অজ্ঞতাবশতঃ ঐ রকম সব কথা বলেছে। আমরা বন্ধুজনোচিত পরামর্শ সর্বদাই শুনতে প্রস্তুত, কিন্তু কারো মুরুব্বিয়ানা আমরা এ যাবৎ সহ্য করি নি, এখনও এবং পরেও করব না। আমরা ত আমেরিকার পরামর্শ চাই নি। কারো ধমকে ভয় পাই না। আমরা রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে প্রশংসমান চক্ষে দেখি। কিন্তু তাঁর মধ্যস্থতা আমরা চাই নি। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার ভার আমাদের। ২২ বৎসর শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বোঝা বয়েছি। পরেও বইব। কারো কাছে মাথা হেঁট করি নি। পরেও সোজা দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করব।

"লর্ড হ্যালিফ্যাক্স আমাদিগকে (কংগ্রেসকে) নগণ্য ও তুচ্ছ বলেছেন। তাই যদি হয়, তা হ'লে আমাদের জন্যে মাথা ঘামাবার বা আমাদের কাছে প্রস্তাবাবলী পাঠাবার কি দরকার ছিল? ভারতবর্ষে তাঁর স্বদেশবাসীরা যা করেছে, তাতে তিনি সন্তুষ্ট। এই সন্তোষ নিয়েই তিনি থাকুন না? আমাদের দুঃখ নিয়ে আমাদিগকে থাকতে দিন্। কিন্তু যাই ঘটুক, ভারতের স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টা আমরা ছাড়ব না। আমাদের আনুগত্য ভারতবাসীদের প্রতি, আর কারো প্রতি নয়। তাদের সেবা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা খাটব এবং, আবশ্যক হ'লে, মরব।"

বঙ্গোপসাগরে জাহাজডুবি

জাপানীরা বঙ্গোপসাগরে জাহাজ ডুবাতে আরম্ভ করেছে। নিমগ্ন জাহাজগুলির আরোহীদের মধ্যে উড়িষ্যার উপকূলে ৫০০ লোক অবতরণ করেছে।

জাপানীদের এই আক্রমণ প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা হয়েছে? (১০-৪-১৯৪২)

—

আমেরিকান্ কাগজগুলির উদ্দেশে জবাহরলাল

ব্রিটিশ প্রস্তাবাবলী ভারতবর্ষের লোকেরা গ্রহণ না করায় আমেরিকার অনেক কাগজ ভারতীয়দিগকে অনেক মুরুব্বিয়ানা উপদেশ পরামর্শ দিয়েছে, ধমকও দিয়েছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাদের সমুচিত জবাব দিয়েছেন। তিনি এই মর্মের কথা বলেছেন, "মার্কিন কাগজ-

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্

গত ৫ই এপ্রিল শান্তিনিকেতন-মন্দিরে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ মহোদয়ের প্রতি সাম্বৎসরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হয়। ডক্টর কালিদাস নাগ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

যুদ্ধে সকলে বিব্রত থাকা সত্ত্বেও এই মহানুভবের আত্মার প্রতি সর্বত্র শ্রদ্ধাশক্তি নিবেদিত হওয়া উচিত।

—

ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

প্রায় তিন সপ্তাহ আলোচনার পর কংগ্রেস সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে জানাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ওয়ার্কিং কমীটি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের শাসন ও রক্ষার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে তাহারা বাস্তবিকই স্বাধীন এবং

তাহাদের উপরেই সেই স্বাধীনতা রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহাই কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রথম এবং অপরিহার্য্য সর্ত্ত। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, দেশ-রক্ষার জন্য দেশবাসীর ঐকান্তিক সাড়া পাইতে হইলে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হইবে এবং দেশরক্ষার কর্ত্তৃত্ব তাহাদিগকে না দিলে সেই ঐকান্তিক উৎসাহের প্রত্যাশা করা যায় না। একমাত্র সেই অধিকার দিলে এই মহাসঙ্কটপূর্ণ শেষ মুহূর্ত্তেও ভারতবাসী সময়োচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। বর্ত্তমান ভারত-সরকার এবং তাঁহাদের প্রাদেশিক শাখাগুলির মধ্যে যে যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে এবং যথাযোগ্যভাবে ভারতবর্ষ রক্ষার গুরুভার বহনের সামর্থ্য যে তাহাদের নাই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই ভার উপযুক্তভাবে বহন করিতে পারে একমাত্র ভারতের লোকেরা তাহাদের জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের মারফৎ; কিন্তু তাহা করিতে হইলে এখনই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ণ ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসা চাই।

জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে নূতন গবর্ণমেণ্টে মন্ত্রিসভার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং বড়লাট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিভূ হিসাবে কাজ করিবেন। সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মূল ও সংশোধিত কোন প্রস্তাবেই নূতন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে খাঁটি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের রূপ দেওয়া হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বড়লাটের সমস্ত ক্ষমতা বজায় রাখিতে এবং নূতন গবর্ণমেণ্টকে সপরিষদ বড়লাটের গবর্ণমেণ্টই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। নূতন গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন গবর্ণমেণ্টরূপে পরিচালিত হইবে এবং নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করেন এই নূতন গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদেরও সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে—কংগ্রেস সর্ ষ্টাফোর্ডের নিকট এই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তরফ হইতে সর্ ষ্টাফোর্ড এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই।

দেশরক্ষা-বিভাগ হস্তান্তর সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাব ছিল এই যে, মোটামুটি নীতি হিসাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্টই দেশরক্ষা-সচিবের মারফৎ দেশরক্ষা-বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। প্রধান সেনাপতি সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষের সমরশিল্প সংগঠন এবং জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের ভার জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইত। দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের মধ্যে বর্ত্তমান সামরিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইবার ইচ্ছা কংগ্রেসের ছিল না বলিয়া কংগ্রেস দেশরক্ষা-ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি এবং দেশরক্ষা-সচিবের দ্বৈত শাসন মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছিলেন। আপোষ-মীমাংসার খাতিরে তাঁহারা দেশরক্ষা-সচিবের ন্যায্য ক্ষমতার অংশ কতকটা সঙ্কুচিত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। দে. ব.

প্রাচ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান ও সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিগত মাসে যুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে কোন প্রকারে সুফলদায়ক হয় নাই। অন্য দিকে জাপান তাহার প্রাথমিক লক্ষ্যের প্রায় সমস্তই লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। লিখিবার কালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অবস্থার কোনও স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় ঐ অঞ্চলে জাপানের অধিকার প্রায় নিষ্কণ্টক হইয়া গিয়াছে। করেগিডর দুর্গাবলী ও মিণ্ডানাও দ্বীপের কয়েকটি ঘাঁটিতে ফিলিপিনো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় যোদ্ধাগণ এখনও শত্রুর বল পরীক্ষায় ক্ষান্ত হয় নাই কিন্তু এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে জাপান ফিলিপাইনে তাহার সংগঠনের ব্যবস্থা অপ্রতিহত ভাবে করিতে সমর্থ হইবে মনে হয়। ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারতে জাপানের সৈন্যদল প্রায় সকল প্রধান দুর্গ ও বন্দরই নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ওলন্দাজ প্রতিনিধি ফান মুক্ (জাভার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট) বলেন যে জাভায় এখনও গিরিমালা ও অরণ্যপূর্ণ প্রদেশে যুদ্ধ চলিতেছে। যদি তাঁহার খবর সঠিক হয় তবে সেখানে আরো কিছুকাল মিত্রদলের যুদ্ধ সুযোগ থাকিবে, তবে সে সুযোগের ব্যবহার করার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা গঠনের এখনও উদ্যোগ-পর্ব্বই চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার উপর আক্রমণ এখনও স্থগিতই আছে। যত দিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে রসদ ও সৈন্য সরবরাহের পথ উন্মুক্ত থাকিবে তত দিন এই আক্রমণ আরম্ভ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। হাওয়াই হইতে নিউজিলাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে বিভিন্ন নৌ ও বিমানপোত ঘাঁটিগুলি আছে তাহার প্রায় সবই এখনও মিত্রদলের অধিকারে আছে, যদিও গত সপ্তাহে সলোমন দ্বীপের আক্রমণে মনে হয় যে জাপান এখন ঐ দিকে মনোযোগ করিয়াছে। নিউগিনি অঞ্চলে বৃষ্টি ও প্লাবনের ফলে জাপানের অগ্রগতি স্থগিত হইয়াছে শুনা যায়, তবে সে অঞ্চলের সঠিক খবরাখবর পাওয়া যায় নাই।

শ্যাম দেশ, মালয় ও দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশে জাপানের এখন পূর্ণ অধিকার। আন্দামান দ্বীপমালাও এখন জাপানের নৌবলের অধীন। সুতরাং প্রথম অভিযানে জাপান

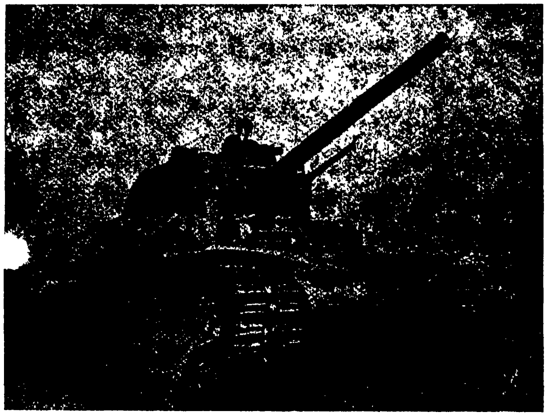

যুক্তরাষ্ট্রের ভারী ট্যাঙ্ক

প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে যে দুর্গমালা মিত্রশক্তি-পুঞ্জের অধীনে ছিল তাহা জয়ে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে মিত্রশক্তির অভিযান বিষম দুরূহ ও সমস্যাপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাপানের পক্ষে এখন ইন্দোচীনস্থ প্রদেশগুলি (যাহা পূর্ব্বে "ফরাসী" ইন্দোচীন নামে চলিত ছিল) শক্তিকেন্দ্র রূপে ব্যবহারের জন্য সকল রূপে নিরাপদ রহিয়াছে। ঐ অঞ্চলগুলি আক্রমণের কোনও পথ এখন মিত্রশক্তিদলের অধিকারে নাই। অন্য দিকে চীন দেশে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের পথও এখন প্রায় বন্ধ সুতরাং সে দিকেও জাপানের সহসা বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই।

এখন এশিয়ায় মিত্রশক্তিদলের একমাত্র আশা-ভরসা ভারতবর্ষ। অষ্ট্রেলিয়া হইতে অভিযান চালনের যে সকল কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছে তাহা সুদূরপরাহত এবং তাহা লণ্ডন ও ওয়াসিংটনের বাক্যবাগীশ সংবাদদাতাগণের উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। অষ্ট্রেলিয়াকে শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করিয়া তাহা হইতে যত দিনে অভিযান চালনা

সিঙ্গাপুর

সম্ভব হইবে তত দিনে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গমালায় পরিণত হইয়া যাইবে এবং সেখান হইতে জাপান কাঁচা রসদ সংগ্রহ ও রপ্তানীর ব্যবস্থাও তত দিনে করিয়া ফেলিবে। সুতরাং মিত্রশক্তির এখন একমাত্র উপায় ভারতবর্ষকে শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করিয়া এখান হইতে অভিযান চালনা। এখন প্রশ্ন এই যে জাপান মিত্রদলকে সেই অবসর দিবে কি না। ব্রিটিশ সমর-পরিষদের অদূরদর্শিতার ফলে ভারত মহাসাগরের যে অংশ ভারতবর্ষের নিকট তাহাতে জাপানের নৌ ও বিমানবল অপ্রতিহত রাজত্ব করিতেছে। নৌ ও বিমানযুদ্ধ ভিন্ন এই অবস্থাকে অবরোধে পরিণত হওয়াতে বাধা দিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং সমস্তই এখন মিত্রপক্ষের নৌবল ও বিমানযুদ্ধ বলের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন এবং তাহাতেও জাপান সম্প্রতি বিশেষ বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে। এসকল বিষয়ে কি ব্যবস্থা চলিতেছে তাহার কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই এবং হওয়া উচিতও নহে তবে অবস্থা যে এখন বিপদপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশের পরিস্থিতি সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত নহে, কেবলমাত্র এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে জাপান চীন সৈন্য-দলের ধ্বংসের আয়োজন এক দিকে এবং অন্য দিকে বর্ষা-কালীন যুদ্ধ স্থগিতির ব্যবস্থায় ব্যস্ত আছে।

ব্রহ্মদেশে জাপানের অগ্রগতি যে মালয় বা দ্বীপময় ভারতের ন্যায় দ্রুত হয় নাই তাহার প্রধান কারণ চীনা সৈন্যদলের শৌর্য্য ও বীর্য্য। টঙ্গুতে জাপান যে বাধা পাইয়াছে ইতিপূর্ব্বে তাহার অনুরূপ বাধা অন্য কোথাও দেওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে মালয় অঞ্চলে জাপানী সৈন্যদল ক্রমাগত জলপথে অগ্রসর হইয়া ও সৈন্য নামাইয়া মিত্রসৈন্যের পিছনে বিপদের সৃষ্টি করিতে সম[র্থ] হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অনুরূপ পন্থায় অভিযান ক[রা] একমাত্র ইরাবতীর দুই পাশে হইতে পারিত। এখন[ও] ব্রহ্মদেশের বঙ্গোপসাগরের কূলে সেইরূপ হওয়া অসম্ভ[ব] নহে। এইরূপে নৌযোগে সৈন্যচালনায় বাধা দেওয়া সম্ভব সাব্‌মেরিন যুদ্ধপোতের ব্যবহারে এবং প্রবল বিমান-যুদ্ধের অভিযানে।

ব্রহ্মদেশে বিমানযুদ্ধে মিত্রপক্ষ এখন ক্ষীণবল। তাহার কারণ কি তাহা আমাদের অজ্ঞাত, এবং কত দিনে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। আমরা এখন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিমানপোত নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা সম্বন্ধেই লম্বা লম্বা কথা শুনিয়াছি। ব্রিটিশদল তো সহজ ভাষায় বলিয়াই দিলেন যে তাঁহারা ইয়োরোপকেই প্রধান যুদ্ধকেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন ও করিবেন। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ার কঠোর সমালোচনায় এবং জাপানের নৌ-ও বিমান-শক্তির অপ্রতিহত প্রসারে ঐরূপ অভিমতের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রিটিশ যুদ্ধ-পরিষদ এতদিন যেরূপ বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতের কথা এখন বিচার না করাই ভাল। এইমাত্র বলা যায় যে ব্রহ্মদেশে বর্ষারম্ভের যে দেড় মাস কাল দেরী আছে, সেই সময় পর্য্যন্ত জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য বিমানযুদ্ধের শক্তি গঠনের ব্যবস্থা যদি শীঘ্রই না হয় তবে চীনা ও ব্রিটিশ সৈন্যদল বিশেষ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আসিতে পারে। জাপানীগণের উদ্দেশ্য এখন চীন ও ভারতের মধ্যে যে সংযোগসূত্র রহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন। তাহার পর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চলিতে পারে।

ভারতবর্ষে সামরিক শক্তি গঠনের সম্ভাবনা কি? সম্ভাবনা অতি বৃহৎ—কিন্তু সময়সাপেক্ষ। এত দিন এখানে সকল ব্যাপারেই "ঢিমে তেতালা" চলিয়াছে; এক অকর্ম্মণ্য লোক অন্য অকর্ম্মার প্রশংসা করিয়াছে এবং প্রত্যেক কার্য্যেই ভারতসচিব ও কাপ্তান মার্জ্জেসনের সার্কাসদল শতমুখে সাধুবাদ দিয়াছেন। কি হইতে পারে তাহার বিচার ও ব্যবস্থার বদলে ভারতবাসিগণ কি করিতে পারিবে না তাহার আদেশ ও নির্দ্দেশেই কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ বেশী দেখা গিয়াছে। যে সকল কার্য্যের ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও যে সকল কর্ণধার নিযুক্ত হইয়াছেন—ও এখনও নিযুক্ত হইতেছেন—তাঁহাদের ও তাঁহাদের উপদেশকারীদলের কার্য্যশক্তির বিচার করিয়াছেন মহামান্য

চীনা সেনাদল

চীনা গোলন্দাজ ও বৃহৎ কামান

উলান বাটোর। সোভিয়েট-প্রভাবিত মঙ্গোলিয়া

জিব্রাল্টার। এখানে বন্দী বদলের জন্য ইতালীয় জাহাজ গিয়াছে

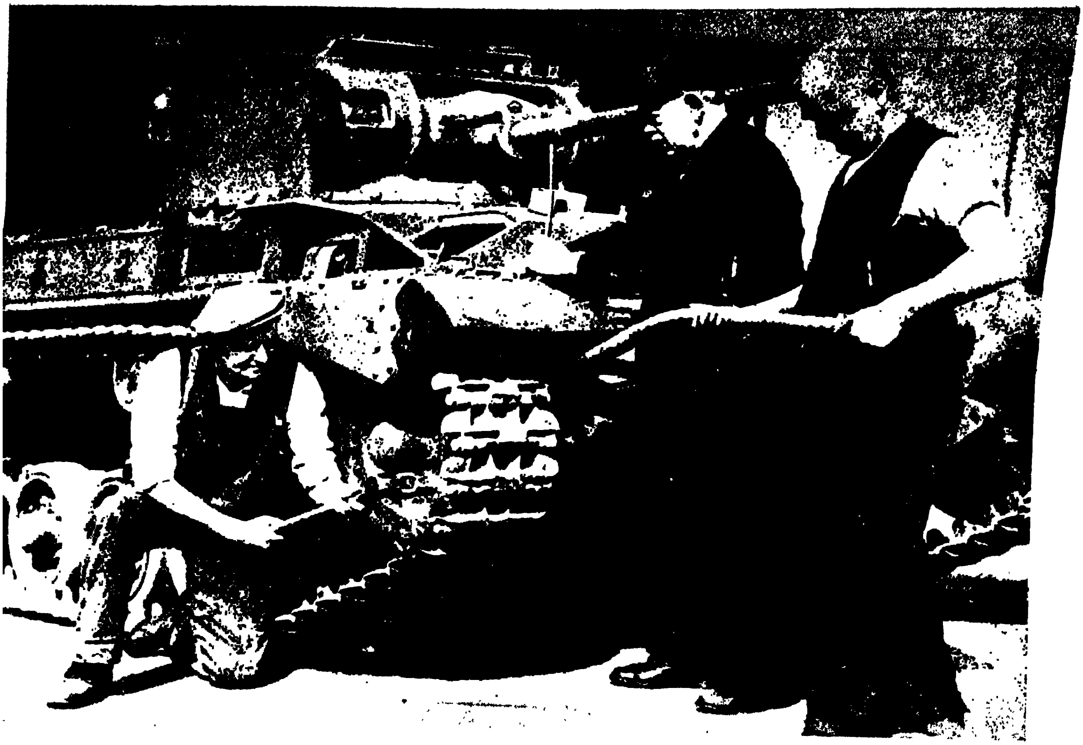

ব্রিটিশ কারখানায় ট্যাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে

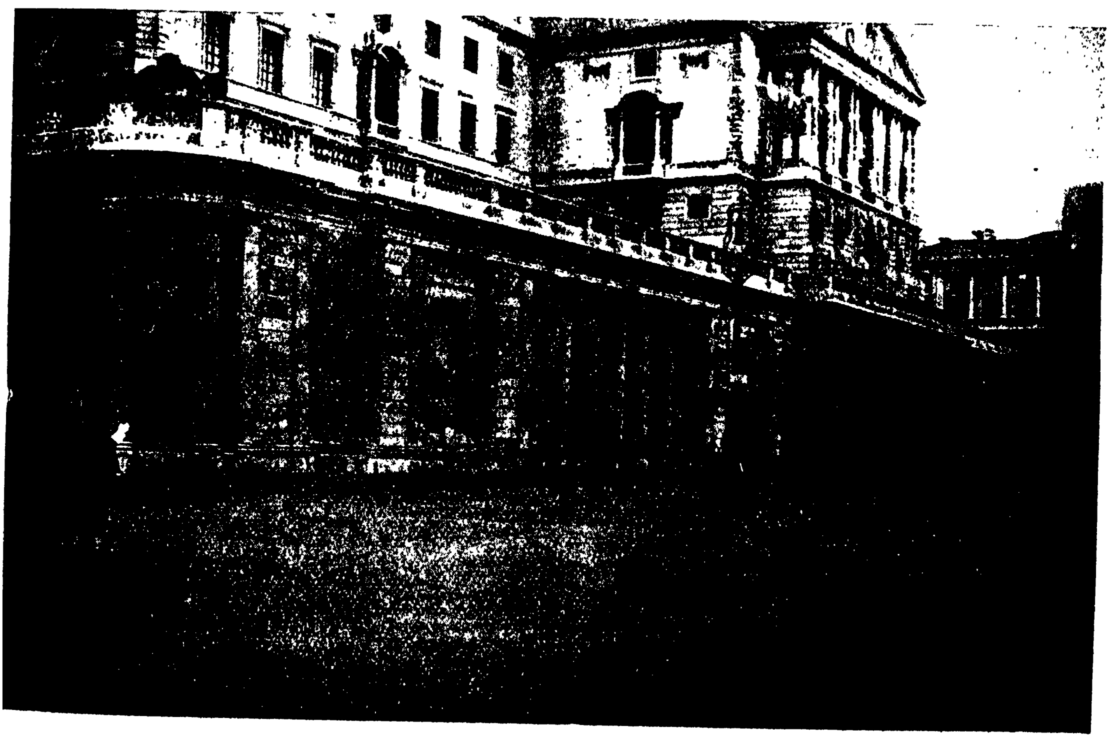

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড ভবন

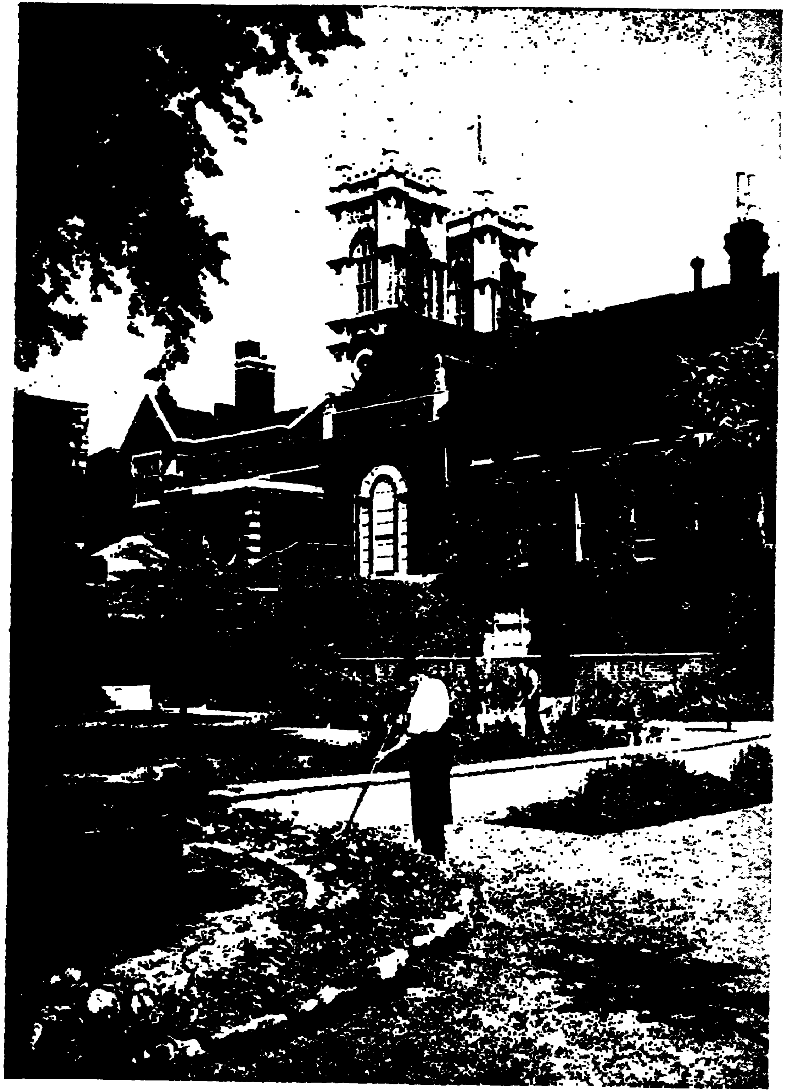

ওয়েষ্টমিনষ্টার আবির উদ্যান

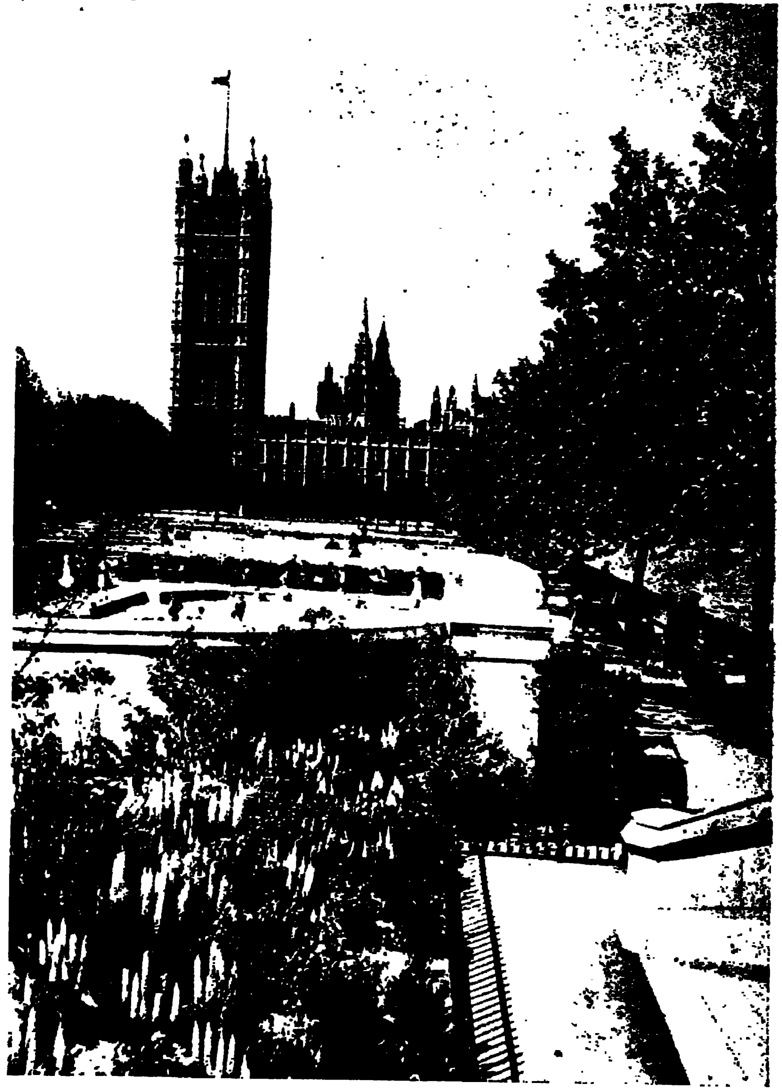

ভিক্টোরিয়া উদ্যান হইতে পার্লেমেণ্ট-ভবনের দৃশ্য

বড়লাট বাহাদুর। সুতরাং বর্ত্তমান যদি ভবিষ্যতের বিচারের কোনও সূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে তবে বলা উচিত যে বর্ত্তমান ব্যবস্থার আমূল খোল ও নলিচার পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার। একদল নিরাশা-বাদী আছেন যাঁহারা বলেন এখন কিছু করিতে যাওয়া বৃথা, তাঁহাদের উচিত বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ। কেননা নিকট ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক, ভারতবর্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ও রাষ্ট্র গঠন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এদেশবাসীকেই করিতে হইবে। জড়ভরতের পন্থা অবলম্বনে জড়ভারত মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু তাহা পরলোকে, ইহলোকে নয়। ইহলোকে আদিম মানবের ব্যবস্থা "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এখনও সচল আছে এবং আরও কয়েক যুগ সচল থাকিবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পথ যতই দুর্গম হউক না কেন এবং ভারতের ভাগ্যে যতই দুঃখকষ্ট আসুক না কেন, ঐ পথে আমাদের চলিতেই হইবে। সুবিধাবাদ অল্পদিন বা অল্প-ক্ষণের জন্য চলিতে পারে কিন্তু তাহার ফলে ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হইবেই। জাতীয় দলের সম্মুখে এখন সমস্যার অন্ত নাই এবং পরে সমস্যা বৃদ্ধিই হইবে, কমিবে না। এখন দেশে কে কি বিষয়ে জাতীয় সংগঠন ও সংরক্ষণে সাহায্য করিতে পারেন সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন।

* * *

পূর্ব্ব-ইয়োরোপে তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই অপেক্ষাকৃত অচল অবস্থায় থাকিতে বাধ্য। সোভিয়েটদল গত সাড়ে চার মাসের নিদারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া যে যুদ্ধচালনা করিয়াছে তাহার ফলাফল বিচারের সময় আসিতেছে। রুশযোদ্ধাদল অনেক অঘটন ঘটাইয়াছে কিন্তু অনেক কিছুই বাকীও রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আসন্ন বসন্ত-অভিযানের গতি ও পরিণতি বিচার অসম্ভব। উত্তর ও মধ্য অঞ্চলের সোভিয়েট সেনা এখন যেভাবে রহিয়াছে তাহাতে জার্ম্মানীর বসন্ত-অভিযান এ অঞ্চলে অসম্ভব না হইলেও বিশেষ দুঃসাধ্য হওয়ার কথা। জার্ম্মান রণনায়কগণ যে সকল ঘাঁটি দৃঢ় ভাবে রক্ষা করিয়া বসন্ত অভিযানে আক্রমণ কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলি রুশদলের হস্তগত হইয়াছে। তাহার ফলে প্রধান কেন্দ্রগুলির (যথা স্মলেন্স্ক) আশেপাশে রুশবাহিনী অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। এই তুষার গলার সময়ের মধ্যে সে সকল স্থানে যদি রুশদল বলসঞ্চয়ে

জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো

সমর্থ হয় তবে সে সকল স্থান হইতে অভিযান চালনের পূর্ব্বে অনেক খণ্ডযুদ্ধ ও অগ্রপশ্চাৎ সৈন্যচালনে নাৎসী দলের বলক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণে বসন্ত-অভিযান চালনের জন্য জার্ম্মানবাহিনীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু এখানে সোভিয়েট রণনেতাদিগের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক এবং বিরাট্ সেনাবাহিনীও আছে। সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে প্রায় ৯০ ডিভিসন রুশসৈন্য এখানে মোতায়েন আছে। বোধ হয় উহা ঠিক নহে। যদি প্রকৃতপক্ষে ৯০টি সম্পূর্ণ ডিভিসন ওখানে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে জার্ম্মান ও জার্ম্মানসহায়ক সেনাদলের সম্মুখে বহুকাল ব্যাপী বিরাট্ অভিযানের পরীক্ষা রহিয়াছে।

পূর্ব্ব-ইয়োরোপের যুদ্ধ-ফলের উপর সমস্ত পৃথিবীর ভাগ্য-ফল নির্ভর করিতেছে ইহা বলা বাহুল্য। এই যুদ্ধের ফলা-ফল নির্ভর করিতেছে ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধসম্ভার নির্ম্মাণ ও সরবরাহের ব্যবস্থার উপর। যুক্তরাষ্ট্র হইতে আশার বাণী প্রচারের কোনও অন্ত নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহার কতকটা ইতিমধ্যে ফলিত হইয়াছে—এবং অল্পদিনের মধ্যে হইবে—তাহার প্রমাণ অদূর ভবিষ্যতেই পাওয়া যাইবে।

আলোচনা

"ইতিহাসের খুঁটিনাটি"

শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন

শ্রীযুক্তা ভ্রমর ঘোষ মহাশয়া পৌষ মাসের প্রবাসীতে "ইতিহাসের খুঁটিনাটি" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"ভারতে প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ।" লেখিকা হিন্দুশাস্ত্রের নামটি করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে কি পাওয়া যায়—

১। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে লেখে আর্য্য জাতির আদি জন্মভূমি কোথায় তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। ছাত্রেরা ইহাই পাঠ করে অথচ তাহাদের ঘরের শাস্ত্রেই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আছে, "উত্তরমেরু আদি আর্য্য জন্মভূমি।" শাস্ত্র জ্ঞান না থাকায় ঐতিহাসিক মনগড়া কথা লিখেন, ছাত্র বাধ্য হইয়া পড়িয়া ভারতের স্কুলে এই জ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।*

২। উত্তরমেরু বাসযোগ্য ছিল। পরে ধ্বংস হইয়া সমুদ্র হইয়াছে; ইহার চাক্ষুষ সাক্ষী আছে। এখন আমরা সমুদ্র (দেখি। প্রাঃ ভাঃ, ২৫ পৃষ্ঠা)।

৩। উত্তরমেরু ধ্বংস হইয়া আর্য্যগণ সুমেরু (Mt. Altai) প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন (প্রাচীন ভারত, ২৫-৩০ পৃষ্ঠা)

৪। দেবাসুর যুদ্ধ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা (প্রাঃ ভাঃ, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

৫। মহাজলপ্লাবন ঋগ্বেদে নাই, ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা। কিন্তু আমরা পাইয়াছি (প্রাচীন ভারত, ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)।

৬। স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে আছে, "দ্রবিড়গণ উত্তর-ভারতে বাস করিত। আর্য্যগণ ২০০০ খ্রীঃ পূঃতে ভারতে আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।" একথা ঠিক্ নহে। বহু পূর্ব্বে আসিয়াছেন। উত্তর-ভারত তখন সমুদ্রজলে মগ্ন ছিল। ক্রমে দেশ জাগিয়াছে আর আর্য্যগণ ক্রমে তথায় আসিয়া বাস করিয়াছেন (প্রাচীন ভারত, ৬০-৮১ পৃষ্ঠা)

৭। মহেঞ্জোদারো দ্রবিড়গণের কীর্ত্তি, ছাত্রগণ স্কুলে এই শিক্ষা পায়। তাহা ঠিক নহে। ইহা আর্য্যগণের সুমেরু শাখার কীর্ত্তি। শাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা জানা যায় (প্রাচীন ভারত, ৮৬, ১২১, ১৩২, ১৫১-৫২ পৃষ্ঠা)।

৮। ভারত-যুদ্ধের সময় ১৯৩৭ খ্রীঃ পূঃ (প্রাচীন ভারত, ১৯১-২১০ পৃষ্ঠা)।

৯। বুদ্ধ-নির্ব্বাণের সময় ৪৮৩ খ্রীঃ পূঃ নহে। ৫৯২ খৃঃ পূঃ বটে (প্রাচীন ভারত ২১৩-১৪ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ বহু বিষয় আছে যাহার হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত অন্যত্র বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এই হিন্দুশাস্ত্র বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিত হইতেছে এবং সেই ভুল ইতিহাস স্কুলের পাঠ্য হইয়াছে। আশা করি শ্রীযুক্তা ঘোষ মহাশয়া বা অন্য কেহ এই সমস্ত কথা খণ্ডন করিবেন বা হিন্দুশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিবেন। অবশ্য অতি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে পরে কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা সযত্নে বাদ দিয়া ইতিহাস লিখিতে হইবে। অনেকের ধারণা হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিলেই তাহাকে প্রাচীনপন্থী, একদেশদর্শী ইত্যাদি বাক্য শুনিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। ভারতের ইতিহাস ভারত-সন্তানকেই লিখিতে হইবে, অন্যে পারিবে না।

*প্রাচীন ভারত—শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন পৃ. ৭-২৩।

"ইতিহাসের খুঁটিনাটি"

প্রত্যুত্তর

শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম. এ.

গত পৌষের প্রবাসীতে "ইতিহাসের খুঁটিনাটি" প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম 'ভারতের প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ।' হিন্দু-শাস্ত্রাদি বাদ দিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে লেখা অসম্ভব। তবে আমি এই অর্থেই উহা লিখিয়াছিলাম যে ঠিক ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেইরূপ ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লিখিবার মত উপকরণ আমাদের প্রাচীন বেদ, পুরাণাদিতে নাই।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশ সমন্বিতম্
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

'ইতিহ' শব্দের অর্থ পরম্পরাগত, প্রবহমান উপদেশাবলী। উপদেশ-নিচয় দ্বারা যাহা পরিব্যাপ্ত তাহার নাম 'ইতিহাস'। কল্হণের 'রাজ-তরঙ্গিণী' ব্যতীত এইরূপ একখানি গ্রন্থও আমাদের নাই। ঐতিহাসিক-গণের বহু পরিশ্রমের ফলে ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ প্রাচীন স্তম্ভ, মূর্ত্তি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, শিলালিপি, গৃহ ইত্যাদি ও বৈদেশিক গ্রন্থাদির সাহায্যে তাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সংগঠন করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণগুলির মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিগুলি ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

'হিন্দুস্থান' হিন্দুর দেশ। তাহার জলবায়ু, শাস্ত্রগ্রন্থ, চিন্তার অতি সূক্ষ্ম সূত্রটিও ভারতের ইতিহাস-সংগঠনের উপকরণ—ইহা সত্য। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, ইহা ভুল ধারণা। বেদরত্ন মহাশয় আশা করি আমার উক্তিটির যৌক্তিকতা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বর্ত্তমানে লেখকগণ "ঐতিহাসিক মনগড়া' কথা না লিখিয়া যথার্থ ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লিখিয়া থাকেন। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ডাঃ সুরেন সেন মহাশয়-দ্বয়কর্ত্তৃক লিখিত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" ও ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "স্বদেশ ও সভ্যতা" তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

দেশ-বিদেশের কথা

ডাক্তার শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়

এ. গুপ্ত, এম্-বি, বি-এস্

বাংলা দেশের বিবিধ দৈনিক ও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়, "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" শীর্ষক প্রবন্ধে বহু যশস্বী বাঙালীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হোমিও-প্যাথী চিকিৎসক হিসাবে তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশে পরিচিত। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া তিনি বাঁকীপুরে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রভূত চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পুরাতন যুগে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল্. এম্. এস্. পাস করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। পরে হোমিওপ্যাথী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আজ বিহারের উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট তিনি অতিশয় সম্মান-ভাজন। কলিকাতার সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার কর্ণেল কে. কে. চ্যাটাৰ্জ্জী মহাশয় ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। আমাদের মনে হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুবৃহৎ জগতে, পুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন মাত্র, কদাচ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরেশনাথ যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য মেহেরপুরের সমাজপতিদিগের নিকট হইতে প্রভূত নির্য্যাতনও সহ্য করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আজীবন উদার মত পোষণ করিয়াই আসিতেছেন।

বাঁকীপুরে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে হোমিওপ্যাথী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তাঁহারই প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার অন্ধ বিদ্যালয়ের জন্মকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তিনি উহার কার্য্যকরী সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। স্থানীয় নববিধান সমাজও তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে।

বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স একনবতি বৎসর। অশীতি বর্ষ অতিক্রম করার পরে, (সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সনে) তাঁহার দেহে দুই বার কঠিন অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য কতখানি অটুট রহিয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখনও তিনি নিয়মিতভাবে রোগী দেখেন ও অবসরকালে অধ্যয়নকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। উর্দ্ধ

ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে এবং ঐ ভাষায় কয়েকখানি চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। সমগ্র প্রদেশের চিকিৎসক সমাজে ঐগুলির আদরও হইয়াছে। বোধ করি, এই সব কারণে এই অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিটি আজও সহব্যবসায়ীদের ভিতর সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ১৯২৮ সালে সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুকালে তাঁহার পিতৃহৃদয় যে অবিচল ধৈর্য্য ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহা আধুনিক যুগে একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। বাঁকী-পুরের সর্ব্বসাধারণের নিকট যে তিনি শুধু পরিচিত তাহাই নহেন, পরন্তু অতিশয় সম্মানের পাত্র। আজিকার প্রাদেশিকতার আবরণে কুটিল স্বার্থপরতার মলিন আবহাওয়া সত্বেও এখানকার বাঙালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়া গিয়াছে। গত বৎসর স্থানীয় বি. এন্. কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডি. এন্. সেন মহাশয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বনলতা দেবীর ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নবতিতম জন্মদিনে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি এবং সেই মাসে সেই সৌম্য, দীর্ঘশ্মশ্রু, পলিতকেশ, জ্ঞান-বৃদ্ধের পাদবন্দনা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

মিরাট সাহিত্য পরিষৎ

মিরাট সাহিত্য পরিষৎ স্থানীয় বাঙালীদের একটি সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান, কলেজের অধ্যাপক, স্থানীয় ডাক্তার, উকীল এবং কন্‌ট্রোলার আপিসে যাঁহারা চাকরী করেন তাঁহাদের লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। পূর্ব্বে ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতার শাখা ছিল। এখন ইহা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত (Affiliated) হইয়াছে।

প্রতি মাসে এক বা একাধিকবার ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। কোন সদস্যের গৃহে কিংবা ৺দুর্গাবাড়ীতে ইহার বৈঠক বসে। রবীন্দ্র-

মিরাট সাহিত্য পরিষৎ। ১লা চৈত্র তারিখে ৺দুর্গাবাড়ীতে একটি বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত

নাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছয়টি স্মৃতিসভা হইয়াছিল। মিরাটের বাহিরে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যের মধ্যে গিয়া বনভোজন এবং নববর্ষ উৎসব ইহার একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এই সঙ্গে একটি আলোকচিত্র দেওয়া গেল। বর্ত্তমান বর্ষেও নববর্ষ উৎসবের এবং তদুপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

পুস্তক পরিচয়

কাব্য-জিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানি কাব্যের রসবিচার প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধের একত্র সংগ্রহ। প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধগুলি "কাব্য-জিজ্ঞাসা" নামে ১৩৩৩ সালের 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে "সাহিত্য" নামে নূতন একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

বইখানির প্রধান বিশেষত্ব,—এতে কাব্য-তত্ত্বের যে আলোচনা করা হ'য়েছে, তা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মত অবলম্বন ক'রে। অতুলবাবুর পূর্ব্বগামী কোনও সমালোচকই কাব্যালোচনার এ ধারা অনুসরণ করেন নি। ইংরেজী কাব্য-সমালোচকের বিশিষ্ট রীতিই বাঙালীর নিকট কাব্য-সমালোচনার চরম আদর্শ ব'লে গণ্য হ'ত। কেননা, আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনও খবরই রাখতেন না, এবং অপরিচয়ের ফলেই বোধ হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার ভাব ছিল। এই ভুল ধারণা বইখানি পড়লে সহজেই দূর হয়। শুধু তাই নয়, সেকালের আলঙ্কারিকদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ় রসানুভূতি পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ ক'রে তোলে।

কিন্তু এ কথা মনে করলে ভুল মনে করা হবে যে আলোচ্য গ্রন্থখানি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিচয় মাত্র। একালে যেমন, সেকালেও

তেমনি, কাব্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত ছিল। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে অতুলবাবু কেবলমাত্র সেইগুলিরই আলোচনা ক'রেছেন যেগুলি তাঁর মনঃপূত। এই প্রসঙ্গে তাঁকে অপর পক্ষের মতবাদেরও সময়ে সময়ে উল্লেখ করতে হ'য়েছে। বক্তব্য সুপরিস্ফুট করবার জন্য অনেক কাব্য থেকে উদাহরণ দিতে হ'য়েছে, শুধু সংস্কৃত কাব্য থেকে নয়, আধুনিক বাংলা কাব্য থেকে, এমন কি, ইংরেজী কাব্য থেকেও। বিষয়টি দুরূহ, সেজন্য মনে হয় ব্যাখ্যা বিস্তৃততর এবং উদাহরণ বহুলতর হ'লেও অতুলবাবু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ না হ'য়ে কৃতজ্ঞতারই ভাগী হ'তেন। সে যাই হোক্, আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সেকালের আলঙ্কারিকদের মীমাংসাগুলি বিশ্বজনীন সংস্কৃত কাব্যে কেন, সকল কাব্যেই তাদের প্রয়োগ হ'তে পারে।

অতুলবাবু যে কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধার ক'রেছেন তা নয়, আধুনিক পাঠক যাতে তার মর্য্যাদা বুঝতে পারেন, সে-বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রসগ্রাহী তাঁর মন, প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যে তাঁর অবাধ অধিকার, সুতরাং তাঁর এই আলোচনা যে পরম উপাদেয় হ'য়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। কাব্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে নিজের মত তিনি, বর্ত্তমান সংস্করণে নূতন যে প্রবন্ধ পরিশিষ্টরূপে যুক্ত হ'য়েছে, তাতে সবিস্তারে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। সেকালের সমালোচকের বোধ হয় এত ধৈর্য্য ছিল না, তিনি সেই কথাই সোজাসুজি ব'লেছিলেন,

"আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙমুখায়।"—দশরূপ, ১।৬

'আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও যাঁরা ইতিহাস প্রভৃতির মত সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি মাত্র বলেন, সেই সব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার। রসের আস্বাদ কি, তা তাঁরা জানেন না।'—কাব্য-জিজ্ঞাসা, পৃ. ৭৩।

শ্রীযতিনাথ ঘোষ

তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল।

বক্রেশ্বর, ফুল্লরা পীঠ, অট্টহাস ও বীরভূমের তারাপীঠ বাংলার এই কয়টি শাক্ত তীর্থে এবং পুরী ও ভুবনেশ্বরে ভ্রমণ প্রসঙ্গে লেখক কয়েক জন সাধু ও মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল মহাপুরুষদের সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের রহস্য সম্বন্ধে লেখকের যে-সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল তাহাদের যথাসম্ভব নিখুঁত বিবরণ দেওয়াই আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ জানিবার ও বুঝিবার মত বহু বিষয় এই পুস্তকের মধ্যে পাইবেন। শাক্ত তীর্থগুলির বিবরণের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ শাক্ত তন্ত্রের আচার ও অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে প্রচলিত শাস্ত্রের সহিত তাহাদের অনেকগুলির সামঞ্জস্যের অভাব বা স্পষ্টতঃ বিরোধ পরিদৃষ্ট হইলেও আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিকের মত হিসাবে সেগুলি সুধীজনের বিচারার্হ। এই প্রসঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও বিশেষ করিয়া বীরাচারের আদর্শ সম্বন্ধে বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার উক্তিগুলি (পৃ. ১৭৭ প্রভৃতি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বামাক্ষেপার বিবরণ ও তাঁহার সুললিত ষট্‌চক্রভেদবর্ণন প্রসঙ্গ (পৃ. ২৮১ প্রভৃতি) বিশেষ উপাদেয় এবং এই সাধকপ্রবরের জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনপ্রণালী লইয়া তাঁহার যে শিষ্যসম্প্রদায় আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের প্রণিধানযোগ্য। লেখকের রচনাশৈলী চিত্তকে আকৃষ্ট করে—তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির চিত্র গ্রন্থের রমণীয়তা বর্দ্ধিত করিয়াছে। তাই ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবে সাধারণ পাঠকও ইহার অনেকাংশ পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন। দুঃখের বিষয়, মাঝে মাঝে অনেক অনুপেক্ষণীয় বর্ণাশুদ্ধি এই সুন্দর গ্রন্থখানির কথঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্য সম্পাদন করিয়াছে। মনে হয়, পুস্তকের নামের মধ্যেও এই ক্রটিরই নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, দন্ত্যসকারযুক্ত 'অভিলাস' শব্দ প্রামাণিক অভিধানে দৃষ্ট হয় না। আর কোনওক্রমে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই শব্দ নিষ্পাদন করিয়া একটা অর্থ করা গেলেও তাহা এস্থলে সুসঙ্গত হয় না। বর্ণনীয় বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত সূচী থাকিলে পুস্তকখানি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা হইত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পরিব্রাজকের ডায়েরী শ্রীনির্ম্মল বসু। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"চারিদিকে জীবনের দৈন্য দেখিয়া মানুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহাদের সন্ধানও পাইয়াছিলাম।"…এই মহত্ত্বের সন্ধানে লেখক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খ্যাত অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র সব রকম মানুষেরই অন্তর খুঁজিয়া দেখিয়াছেন এবং যাহারই মধ্যে সে সন্ধান মিলিয়াছে তাহারই কথা শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া-

ছেন। শুধু মানুষের অন্তরই নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যও তাঁহার মনকে স্পর্শ করিয়া ক্ষুদ্রতা, সামান্যতা থেকে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং তিনি সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই সে কথা ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। কোলেদের দেশ, ধাওতাল উরাও, উড়িষ্যার কোন্‌ এক অজ্ঞাত সামন্ত রাজ্যের রাজকুমার, মহাত্মা গান্ধী, বীরভূমের দুর্ভিক্ষ—এই রকম ধরণের বিভিন্ন বিষয়ে সাতাশটি নিবন্ধিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি বেশ ঝরঝরে ভাষায় লেখা এবং নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ। এক আধটি বাদ দিয়া প্রায় সবগুলির বিষয়বস্তু সামান্য হইলেও লেখার দরদ এবং প্রত্যক্ষতার ছাপ থাকায় বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

তারা একদিন ভালবেসেছিল—শ্রীনবগোপাল দাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥৹

গল্পগ্রন্থ। গল্পগুলি সুলিখিত। প্রত্যেক গল্পই অভীপ্সিত রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে প্রায় সব গল্পগুলিরই সুর এক,—তাহা প্রেম, অথবা আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে, অধিকক্ষেত্রেই, হতাশ প্রেমের সুর। ইহাতে সমস্ত বইখানির মধ্যে একটু বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিয়াছে, যদিও লেখার গুণে ক্লান্তি আসে না।

শেষের গল্পটিতে নায়ক কুড়ি বৎসর আগে প্রথম যৌবনে যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, কুড়ি বৎসর পরে প্রৌঢ়ত্বে তাহারই কন্যাকে বিবাহ করিল—মেয়ের মধ্যে মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া—। লেখকের এ রুচিতে কয়জন পাঠক সায় দিবে বলিতে পারি না।

বইয়ের ছাপা ভাল, সজ্জাও সাদাসিধার উপর সুরুচিসঙ্গত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহারণ—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। এস্. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

এখানি স্ত্রীভূমিকাবর্জ্জিত কিশোরদের উপযোগী পৌরাণিক নাটক। রামায়ণ মহাকাব্যের 'লক্ষণের শক্তিশেল' অধ্যায় অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। এই পৌরাণিক বীরত্ব গাথাটি লেখক যেরূপ সরস ও সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ইহা কিশোরদের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলি অবলম্বনে এই শ্রেণীর নাটক-নাটিকা রচিত হইলে তাহা সমাজের বিশেষ কল্যাণকর হয়। এ কারণেও আমরা লেখককে অভিনন্দিত করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও ইহার চর্চা কিন্তু অত্যন্ত পরিমিত। লেখক একশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই সরস। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পার্থক্য তিনি অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইংরেজীতে Home University Library ও অনুরূপ গ্রন্থমালার সমপর্য্যায়ে ইহাকে রাখা যাইতে পারে। পুস্তকের কোথাও কোনও বাহুল্য নাই, পরিশিষ্টগুলি প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত।

এই সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রসারের মানচিত্র ও পারিভাষিক শব্দের

অর্থসূচী দিলে গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িত। মুদ্রাকর-প্রমাদগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সযত্নে সংশোধনীয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গৌরী-মা—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১০। মূল্য ১৷৹ টাকা

গৌরী-মা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যা ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসিনী হইয়া হিমালয়ে তপস্যা ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ মত মাতৃজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম তাঁহার এই আত্মোৎসর্গের মূর্ত্ত প্রতীক।

এই পুস্তকে তাঁহার বাল্যজীবন ও সাধনার বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

হিমালয়-অভিযান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা। পৃ. ৭+২২০।

বাংলা দেশের ছাত্রগণের মনে যাহাতে ভারতীয় পর্যটকগণের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয় তাহার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে কয়েকজন সাহসী ভ্রমণকারীর কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে পণ্ডিত কিষণ সিং (সিংহ নয়), কিনথাপ্ লালা, শরৎচন্দ্র দাশ এবং মোল্লা আতা মুহম্মদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে কুমারজীব এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিহাসও সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শেষের দুইটি বিষয় বাদ দিলেই ভাল করিতেন, কেননা উহার মধ্যে ভ্রমণের উপাদান কম, ইতিহাস বেশী। শুধু ভ্রমণের বা দুঃসাহিকতার কথা ধরিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাণপুরী গোঁসাই অথবা বর্ত্তমান কালের রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা স্বামী প্রণবানন্দের ভ্রমণের মধ্যে অফুরন্ত উপাদান পাওয়া যাইত।

বইখানির ভাষার দিক দিয়া একটু বলিবার আছে। ছাত্রদের জন্য যখন ইহা বিশেষভাবে রচিত তখন সব কাহিনীকে ঢালিয়া সাজা উচিত ছিল। তাহার অভাবে ভাষার সমতা রক্ষিত হয় নাই, লেখার মধ্যেও পারিপাট্যের অভাব লক্ষিত হয়। যেন তাড়াতাড়ি লেখা ও তাড়াতাড়ি ছাপা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভ্রমণের বর্ণনায় ভৌগোলিক ব্যাপার নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। কিন্থাপ ব্রহ্মপুত্রের উৎসের সন্ধানে যান নাই, সান-পো এবং ব্রহ্মপুত্র একই নদ কিনা তাহাই সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন; দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। তৃতীয়ত, শরৎচন্দ্রের ও দীপঙ্করের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালী-বাঙালী বলিয়া গৌরব করার ভাব যেন অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কমাইয়া ছাত্রদের মনে দুঃসাহসিকতার প্রতি আকর্ষণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহারই ত চেষ্টা করা উচিত ছিল।

মোটের উপর বইখানি ভাল। আশা করা যায় সামান্য দোষত্রুটি ভবিষ্যৎ সংস্করণে থাকিবে না এবং ছাত্রগণকে ইহা অনাবিল আনন্দ ও উৎসাহ বিতরণ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

প্রতিধ্বনি—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

কবিতার প্রাণ বজায় রাখিয়া তাহাকে ভাষান্তরিত করা অতিশয় দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান কবি সাহসের সঙ্গে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty এবং সুইনবর্ণের Hymn of man-এর মত কবিতাও তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষার স্বচ্ছন্দগতি এবং ছন্দের মধুর ঝঙ্কার বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করে। অথচ কবি সর্ব্বত্রই মূলের ভাবগতি ও বাগ্ভঙ্গীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন, অনাবশ্যকতার স্বেচ্ছা-বিচরণ করেন নাই। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কবির সুন্দর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যরসিক-সমাজে কাব্যখানির সমাদর হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরকীয়া—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। শ্যামবাজার পুস্তকালয়, ১৩১সি. কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

সমাজের নিম্নস্তরের ডোমবাউরীদের জীবন লইয়া লেখা হইলেও এই উপন্যাসখানিতে স্বকীয় ও পরকীয় প্রণয়ের সম্পর্কে মানবজীবনের চিরন্তন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা শক্তিশালী, গল্পবলার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। অন্ত্যজ-জীবনের পটভূমিকায় কামনাতাড়িত ভদ্রসন্তান শশিভূষণের চরিত্র সুচিত্রিত হইয়াছে।

ধূসর-ধরণী—গৌতম সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

জটিল প্রেমের কাহিনী, প্রাঞ্জল ভাষায় সরস করিয়া রচিত। সীতা, সমীর ও সুধাংশু—উপাখ্যানের এই তিনটি প্রধান চরিত্র টাইপ হিসাবে ভালই হইয়াছে। বইখানি সুখপাঠ্য।

সেই অভিশপ্ত রাত্রি—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। কথা-ভারতী, ৩৫নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

পিতৃহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত এক জমিদার-তনয়ের মনোবিশ্লেষণ-মূলক কাহিনী'। ছোটগল্পের উপাদানকে অসংযত উচ্ছ্বাসে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হইয়াছে। ভাল হয় নাই।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রহস্যপুরীর রাজকন্যা
শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ আবার এল ও গেল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর জন্মোৎসব যেমন অবিমিশ্র আনন্দের ব্যাপার ছিল, এখন তা নয়। এখন এই উৎসব বিষাদ-মিশ্রিত। তা হ'লেও জগতের আনন্দ ও কল্যাণ বিধানে উৎসর্গীকৃত ও ব্যয়িত তাঁর দীর্ঘ জীবনকে এখনও আমরা বিধাতার দান ব'লে সানন্দ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে পারি।

তাঁর সম্বন্ধে আমাদের বার-বার মনে হয়েছে,

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

সেই জন্য এবং তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও কর্মশক্তি স্মরণ ক'রে আমরা তাঁর জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্তও তাঁর কাছ থেকে নূতন নূতন অপূর্ব দানের আশা করতাম। অথচ তাঁর অকৃপণ মন ও হাত পূর্বেই আমাদের সকলকে যে-সব অমূল্য রত্ন দিয়েছিল, তা কি আমরা স্বাঙ্গীকার করতে পেরেছিলাম? তখন পারি নাই, এখনও সেগুলি স্বাঙ্গীকৃত হয় নাই।

তিনি কবি বলেই সমধিক পরিচিত ও আদৃত। তাঁর কবিখ্যাতির ভিত্তি অবশ্য সুদৃঢ়। কিন্তু তিনি গদ্যে নানা বিষয়ে যা লিখে গেছেন তাও কম মূল্যবান নয়। এমন কি, আমরা যে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করি, সে-বিষয়েও তিনি যা লিখে গেছেন, তার যথেষ্টসংখ্যক শ্রদ্ধাবান্ পাঠক এখনও জোটে নি। জোটা আবশ্যক ও উচিত। শুধু এরই জন্যে দেশের সর্বত্র রবীন্দ্র-পাঠচক্র গঠিত হ'লে তা বৃথা হ'বে না।

শিক্ষার একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ তাঁর মনে বিকশিত হয়েছিল। সেইটিকে তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে। তাঁর জীবিতকালে সেই রূপটি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম অবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টা অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা ক'রে সেই রূপটি উদ্ধার করতে হবে এবং তাঁরই অনুপ্রাণনা অনুসারে সেইটিকে আরও ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাঁর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাব্রতীদের জীবনে তিনি বেঁচে থাকুন, এই আমাদের হৃদ্গত বাসনা।

পল্লী-সংগঠন গ্রাম সকলের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি কথা আজকাল অনেকেই বলেন। গ্রামের লোকদের জীবনকে কেমন ক'রে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে শোভায় আনন্দে পূর্ণতর করা যায়, সে-বিষয়েও তাঁর একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ অনুসারে তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সহকর্মী এল্মহার্স্ট সাহেব শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ ক'রেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীরা যদি জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন, তবেই আদর্শটি ক্রমেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে।

এই কর্মিগণকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে,

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

বিশ্বভারতীতে এবং তার আদর্শে পৃথিবীর সব

জাতি ও সব সংস্কৃতি "একনীড়" হবে, এই ছিল তাঁর হৃদ্গত কামনা। যদিও পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ তার বিপরীত ভবিষ্যৎই সূচনা করছে, তথাপি হয়ত এই অমঙ্গল হতেই মঙ্গলের আবির্ভাব হবে।

বিশ্বের ভাবনা ভাববার অধিকার পরাধীন আমাদেরও আছে, বিশ্বের ভাবনা আমরাও ভেবে থাকি। ভাবতে গিয়ে এই সঙ্কটকালে কবির সেই গানটি মনে পড়ে যাতে তিনি প্রার্থনা করেছেন :—

"দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই।
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব কর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ করো ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।" ইত্যাদি।

বিশ্বের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি বাংলা দেশকে এক দিনের তরেও ভুলে যান নি। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গে, তাঁর বাণী প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গের ভাষায়, তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন ও দিয়ে গেছেন বাংলা গান রচনার দ্বারা। সমুদয় বিশ্বের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল। সেই বিশ্বের অন্তর্গত বাংলাকে প্রাণ দিয়ে তিনি ভালবাসতেন।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

তিনি বঙ্গজননীর কেবল আনন্দদায়িনী মূর্তিই কল্পনা করেন নি; জন্মভূমির শত্রুনাশিনী বরাভয়প্রদা অন্য রূপও তাঁর কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন-বরণ।"
"তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি।"

পৃথিবীর, ভারতবর্ষের, বঙ্গের এই দুর্দিনে কবি এখনও বলছেন—

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু-বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চলব ভেবে পাঁকের পরে পড়ব না।
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধা রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না।"
"নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ ক'রে থাকিস সে পণ তোমার র'বেই র'বে।
ওরে মন হবেই হবে।
পাষাণ সমান আছে পড়ে প্রাণ পেয়ে সে উঠবে নড়ে,
আছে যারা বোবার মতন, তারাও কথা ক'বেই ক'বে।
সময় হোলো, সময় হোলো, যে যার আপন বোঝা তোলো;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে-দুঃখ তোর স'বেই স'বে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে;
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে।"

—

ক্রিপ্সের দুই রূপ

সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের লর্ড প্রিভি-সীল ও যুদ্ধমন্ত্রণাসভার সদস্য হবার আগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারি লণ্ডনের ডেলি মেলের প্রতিনিধির সহিত তাঁর যে কথাবার্তা হয় তাতে বলেন :

"The Indian question badly wants settling. It is not a question primarily for the Indians but for the Government. When Britain has settled her political policy, then I think Indians can be persuaded to agree. The tendency is to shove responsibility on to the Indian leaders. The first stage is that the British Government has to make up its mind on its policy—a different policy from any so far announced.'

তাৎপর্য। ভারতীয় সমস্যার সমাধান খুবই দরকার হয়েছে। এ বিষয়ে যা কর্তব্য তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ভারতীয়দের করণীয় নয়, কিন্তু গবর্মেণ্টেরই কৃত্য। ব্রিটেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার রাষ্ট্রনৈতিক পলিসি স্থির ক'রে ফেললে, তখন আমার বোধ হয় ভারতীয়গণকে একমত হতে প্ররোচিত করতে পারা যাবে। কিন্তু ব্রিটিশ ভাবগতিক বা প্রবণতা হচ্ছে একমত হবার দায়িত্বটা ভারতীয় নেতাদের ঘাড়ে ঠেলে চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু ভারতীয় সমস্যা সমাধান কাযের প্রথম অংশ হচ্ছে এই যে, গবর্মেণ্টকে নিজের পলিসি সম্বন্ধে মন স্থির করতে হবে—এবং এই পলিসিটা এ পর্যন্ত ঘোষিত সব পলিসি থেকে পৃথক্ হওয়া চাই।

সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্সের এই মতের সহিত ভারতীয় স্বাজাতিক নেতাদের মতের মিল আছে।

এই মত প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রণাসভার সদস্যরূপে তার দূতস্বরূপ ভারতবর্ষে এলেন ভারতীয় সমস্যার ব্রিটিশ সমাধানে ভারতীয় নেতৃবর্গকে সম্মত করতে। তাঁর চেষ্টা বিফল হওয়ার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যাবার পথে করাচীর সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :—

"There are always chances. We have to come to some arrangement some day. I have no idea when it will be. It depends on Indians themselves, on Indian parties and Indian leaders.

তাৎপর্য। সুযোগ সর্বদাই ঘটতে পারে। কেননা কোন সময়ে আমাদিগকে একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। সেটা কখন হবে সে সম্বন্ধে আমার কোন. ধারণা নাই। ভারতীয়দের উপরই এটা নির্ভর করছে—তাদের রাজনৈতিক দলগুলির উপর ও তাদের নেতাদের উপর।

অর্থাৎ ক্রিপ্সের দৌত্য যে বিফল হ'ল তার জন্য

ব্রিটিশ পলিসি দায়ী নয়, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দায়ী নয়; ভারতীয় দলসমূহ ও নেতারা একমত না-হওয়াতেই সমস্যার সমাধান হ'ল না!

—

"ব্রিটেনের অকপটতা প্রমাণ হয়ে গেছে"

ভারত-সচিব এমারির মতে ক্রিপ্স্ সাহেবের দৌত্য নিষ্ফল হয় নি। এর দ্বারা ব্রিটেনের অকপটতা, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার আন্তরিক ইচ্ছা, প্রমাণিত হয়ে গেছে! কার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেছে তা কিন্তু তিনি বলেন নি। যাদেরকে ব্রিটেন স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাদের দোষত্রুটিতে (!) ঐ বরটা তারা পেল না, সেই ভারতীয়দের মধ্যে কোন দলেরই কিন্তু এ বিশ্বাস জন্মে নি যে, ব্রিটেন ক্রিপ্সের মারফৎ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার বর পাঠিয়েছিলেন। তবে ব্রিটেনের অকপটতাতে বিশ্বাস কার জন্মেছে? ব্রিটিশ জাতির? তারা ত বরাবরই আত্মতৃপ্ত বা আত্মপ্রতারিত। এমারি সাহেব এবং তাঁর পোঁ-ধরা অন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ও ব্রিটিশ সাংবাদিকরা বোধ হয় কথাগুলা বলেছেন আমেরিকার উদ্দেশে। তাঁদের মতে আমেরিকান্‌রা এখন বুঝেছে যে, ব্রিটেন সত্যসত্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রে দিতে চায় কিন্তু মূর্খ ভারতীয়রা নিজ দোষে তা পেল না। ব্রিটেন এখন সকল রকম সাহায্যের জন্য আমেরিকার মুখ চেয়ে আছে। সুতরাং আমেরিকাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজ সাধু উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করাতে পারাতেই ব্রিটেন বর্তে গেছে;—নাই বা বুঝল কমবখ্‌ত ভারতীয়রা?

ভারতীয়েরা যে ব্রিটেনের আন্তরিক ইচ্ছা মোটেই বুঝতে পারে নি, তা কিন্তু সত্য নয়। তারা ব্রিটেনের আন্তরিকতম ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বুঝেছে। সেই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব কখনও ত্যাগ না-করা। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব রক্ষার জন্য সামরিক বিভাগ, যাকে বলা হয় দেশরক্ষা বিভাগ, ব্রিটেনের নিজের হাতে রাখা একান্ত আবশ্যক। এই জন্য ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাত থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে ভারতীয়দের কোন প্রতিনিধিকে বা কাউকে, ভারতীয়দের আইনসভাকে এই বিভাগের উপর বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ক্রিপ্স বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল একমত হয়ে বল্‌ত যে, একজন ভারতীয়কে বড়লাটের শাসন-পরিষদে সমরসচিব নিযুক্ত ক'রে অন্যান্য দেশের সমরসচিবদের মত ক্ষমতা তাকে দেওয়া হোক, তা হ'লেও তা করা হ'ত না, দেশরক্ষায় একমাত্র ব্রিটেনেরই দায়িত্ব থাকত এবং ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রধান সেনাপতি সেই দায়িত্ব পালন করতেন—যেমন চিরকাল ক'রে আসছেন ও করবেন।

—

"ন্যাশন্যাল ওআর ফ্রণ্ট"

মাস দুই পূর্বে বড়লাট "ন্যাশন্যাল ওআর ফ্রণ্ট" গঠন করবার জন্য ভারতীয়গণকে আহ্বান করেছিলেন। গত ৭ই মে তিনি দিল্লীর সমগ্রভারতীয় রেডিও থেকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন।

জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যে সকলেরই কর্তব্য সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিরোধ-চেষ্টা কেমন ক'রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হ'তে পারে, সে-বিষয়ে গবর্মেণ্টের সহিত ভারতবর্ষের লোকদের মতের ভিন্নতা আছে।

বড়লাটের সমগ্র বক্তৃতাটির বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান আমাদের নাই। কেবল তাঁর দু-একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলব।

প্রধান সেনাপতি ওআভেল দুই সপ্তাহ আগে বলেছিলেন, স্থলযুদ্ধে ও আকাশ-যুদ্ধে ভারতবর্ষের শক্তি দিন দিন বাড়ছে। বড়লাট তার উল্লেখ ক'রে বলেন, ভারতবর্ষের সৈনিকরা শত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে আপনাদের কার্যকারিতার সন্তোষজনক প্রমাণ যথাসময়ে দিতে পারবে। তার পর তিনি বলেন:—

What of the rest of us, the unarmed forces of the country? Are we going to give a good account of ourselves? Not, I suggest, unless we stand shoulder to shoulder and work actively for the common cause. I have often heard it said lately "We are unarmed; what can we do? Let Government put arms in our hands and we will spring to the defence of India like one man." Well, here is my answer to that. Were the people of Great Britain armed in June 1940? Were the people of Russia armed in June 1941? During the long agony of China have ordinary men had arms in their hands? The answer is, "No." The mass of the people have never carried arms in any country or in any modern campaign.

The activities of irregular bands operating behind an enemy's advancing line can be of very great value provided they are fully trained for this most exacting task. This phase of warfare is being developed and will be more fully developed as arms become available. Meanwhile, the position is that the expansion of the Regular Army proceeds apace, and we put no limit on it. We require, therefore, for fully trained soldiers all the modern arms that are available.

What then can we, the unarmed forces of the country, do? Let me remind you of what General Wavell has said: That of the elements which contribute to success in modern war, the spirit of the people is the most important. That is our responsibility, yours and mine, and that is why I invite you again to join together in building a National War Front. I do not

care whether we spell this with capital letters; I do not care, in fact, what we call it. We all know what it means, a united determination, transcending all racial, religious and political differences, to stand up and stand together to defend the things we have and hope to have and to make sure that they shall never be so threatened again.

যারা সৈনিক নয়, যারা নিরস্ত্র, তাদের মুখ দিয়ে বড়লাট এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, "আমরা কি শত্রুকে বাধাদানে আমাদের কার্যকারিতার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি ও যাচ্ছি?" উত্তর দিচ্ছেন, "না। যদি আমরা পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলেরই সাধারণ অভীষ্টের জন্য তৎপরতার সহিত কাজ না করি, তা হ'লে প্রমাণ দিতে পারব না।" বড়লাট শাসনকর্তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং শাসিত ভারতীয়গণ, উভয়ের সমষ্টিকে বলছেন, "আমরা।" সমশ্রেণীস্থ সমপর্যায়ের লোকেরাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু শাসক কর্তৃপক্ষ দেশ-রক্ষার উপায় চিন্তা ও স্থির ক'রে হুকুম করেন, ভারতীয়দের মধ্যে কেউ সে কাজ করতে পায় না ও পারে না, তারা সকলেই শাসিত, আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাকারী। এ অবস্থায় কাঁধে কাঁধ মিলাবার কথা উঠতে পারে না।

বড়লাট বল্‌ছেন, "আমি শুনেছি ভারতীয়েরা বলেন, আমরা নিরস্ত্র, আমরা কি করতে পারি? গবন্মেণ্ট আমাদের হাতে অস্ত্র দিলে আমরা একদেহ এক মনপ্রাণের মত দেশরক্ষার কাজে লেগে যাব।" বড়লাট বলছেন, "আমার এর উত্তর এই—১৯৪০ সালের জুন মাসে ব্রিটেনের লোকেরা সশস্ত্র ছিল কি? ১৯৪১এর জুনে রাশিয়ার লোকদের অস্ত্র ছিল কি? চীনের দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণার মধ্যে তথাকার সাধারণ লোকদের হাতে অস্ত্র ছিল কি? না। কোন দেশেই কখনো বা কোন অভিযানেই জনসমষ্টি অস্ত্রধারী ছিল না।"

বড়লাট ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের জুন মাসের অবস্থার কথা কেন বললেন? **এখন** একথা কি সত্য নয় যে, ইংলণ্ডের প্রাপ্তবয়স্কা নারীরাও রাইফেল ব্যবহার করতে শিক্ষা পাচ্ছে? রাশিয়ার পক্ষেও কি একথা সত্য নয়? ব্রিটেনে, রাশিয়ায়, চীনে এমন অস্ত্র-আইন আছে কি যার ফলে অস্ত্র পাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্ঘট? ঐ সব দেশের সাধারণ লোকেরা অস্ত্র সহজে পাবে, কি পাবে না, তা কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষ স্থির ক'রে দিয়েছেন বা দেন কি? ঐ তিন দেশের পুরুষদের মধ্যে শতকরা যত যত জন সৈনিক হ'য়ে অস্ত্রচালনা করতে শিখেছে এবং সৈনিক না হ'য়েও শিখেছে ও অস্ত্র রাখে, ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে শতকরা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোকও কি অস্ত্র ব্যবহার জানে ও অস্ত্র রাখতে পারে?

বড়লাট বলেছেন, ভারতবর্ষের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বাড়ান হচ্ছে এবং এই বৃদ্ধির কোন সীমা নির্দেশ ক'রে দেওয়া হয় নি। বৃদ্ধি যে হচ্ছে তা স্বীকার্য ও সমর্থন-যোগ্য। কিন্তু সৈন্যসংখ্যা, কথায় না হ'লেও কার্যতঃ, সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ও হচ্ছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে অধিকাংশ সিপাহী নেওয়া হয়েছিল ও হ'ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকটি জা'তের মধ্য থেকে। এখনও কার্যতঃ সেই অবস্থা বিদ্যমান। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যত সিপাহী ভর্তি করা হয়েছে, সরকারী অঙ্ক অনুসারে দেখা যাচ্ছে তার শতকরা পঞ্চাশ জন পঞ্জাব থেকে প্রাপ্ত। বাংলা দেশ থেকে শতকরা দু-জনের বেশি নয়। মধ্যপ্রদেশ-সমূহ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম থেকে যুদ্ধারম্ভের পর শতকরা একজনের কম সিপাহী পাওয়া গেছে। সুতরাং সবাইকে পাশাপাশি কাঁধাকাঁধি দাঁড়াতে আহ্বান করা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে, কার্যতঃ তা হচ্ছে না। যদি এমন হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট সকলকেই সমভাবে ডাকছেন (এ বিষয়ে ঠিক কিছু জানি না), কিন্তু সাড়া সকলের কাছ থেকে সমভাবে পাচ্ছেন না, তা হলে তার জন্যও কেবল অধিকাংশ প্রদেশের লোকেরাই দায়ী নয়। গবর্ন্মেণ্ট দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ সব প্রদেশ থেকে সিপাহী না নেওয়ায় সেখানে পুরুষপরম্পরাগত সামরিক ঐতিহ্য ও অভিরুচি উৎপন্ন ও রক্ষিত না হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে; এখন গবর্ন্মেণ্টের আকস্মিক প্রয়োজনের ডাকে ঐসব প্রদেশের লোকেরা যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে না। সকল প্রদেশ থেকে সিপাহী নেবার সমান চেষ্টা হচ্ছে, এটা আমাদের অনুমান। কিন্তু ঠিক্ তথ্য হয়ত এই যে, পঞ্জাবে সিপাহী পাবার যে-রকম চেষ্টা হচ্ছে, উক্ত প্রদেশগুলিতে সে-রকম হচ্ছে না, তার কাছাকাছি চেষ্টাও হচ্ছে না।

বড়লাট বলেছেন, গেরিলা যুদ্ধের আয়োজনও হচ্ছে এবং অস্ত্রশস্ত্র যেমন পাওয়া যেতে থাকবে এই আয়োজনও সেইরূপ বাড়ান হবে। বাংলা দেশে আমরা এ রকম কোন উদ্যোগ দেখছি না।

আমরা বড়লাটের বক্তৃতার যে-অংশ উদ্ধৃত করেছি তার শেষের দিকে তিনি প্রধান সেনাপতি ওআভেলের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"আধুনিক যুদ্ধে জয় যে-যে উপকরণ দ্বারা লাভ করা যায়, জনগণের দৃঢ় মনোভাব, হৃদয় মনের তেজস্বিতা, তার মধ্যে প্রধান।" অর্থাৎ আমরা কিছুতেই দমব না, কিছুতেই হার মানব না; আমাদের যা-

কিছু আছে এবং যা-কিছু পাবার আশা আমাদের আছে, তা রক্ষার জন্য আমরা সমবেত ভাবে দাঁড়াব ও লড়ব, এই ভাব। এই যে অনমনীয়তা, এই যে অটল দৃঢ়তা—আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা কি এই গুণ জন্মাবার ও রক্ষা করবার অনুকূল? যে-দেশের রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মরজিসাপেক্ষ, সে-দেশে এই গুণ কি সুলভ?

—

বঙ্গের 'পীপ্‌ল্‌স্‌ ওআর ফ্রন্ট'

বঙ্গের অধিবাসীদের ওআর ফ্রন্ট (Bengal People's War Front) গড়বার জন্যে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাশেম ফজলল হক সাহেব বঙ্গের সব অধিবাসীকে আহ্বান ও অনুরোধ করেছেন। ('ফ্রন্ট') কথাটা এখানে যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অর্থব্যঞ্জক বাংলা প্রতিশব্দ পাচ্ছি না। হক সাহেব বলেছেন :—

"It is not the Government's Front but the People's Front—the Front of those who are determined that we here shall emulate the great example of the people of China, of Russia and of Britain."

তাৎপর্য। এই ফ্রন্টটি গবর্মেন্টের ফ্রন্ট নয়, জনগণের ফ্রন্ট—সেই সব মানুষের ফ্রন্ট যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, আমরা চীন, রাশিয়া, ও ব্রিটেনের জনগণের মহৎ দৃষ্টান্তের সমকক্ষতা করবার চেষ্টা করব।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী আরও বলেছেন যে,

This Front "has no connection with parties or politics; to join it commits you to no creed except that which teaches hatred of aggression, cruelty and tyranny. It leaves you free to fight at the appropriate time for any political idea or any constitutional form."

তাৎপর্য। কোন রাজনৈতিক দল বা কোন প্রকার রাজনীতির সঙ্গে এই ফ্রন্টের সম্বন্ধ নাই, এই ফ্রন্টে যোগদান, গায়ে পড়ে অন্যকে আক্রমণ, নিষ্ঠুরতা এবং স্বেচ্ছাচারপ্রসূত অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কোন মত ও বিশ্বাস স্বীকার করতে কাওকে বাধ্য করে না। উপযুক্ত সময়ে যে-কোন রাজনৈতিক আইডিয়ার বা শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবার স্বাধীনতা ফ্রন্টে যোগদানকারীদের থাকে, সেই স্বাধীনতা থেকে এই ফ্রন্ট কাউকে বঞ্চিত করে না।

চীন আপন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার নিমিত্ত জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করছে; অন্যত্র কোথাও কোথাও যেখানে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানেও চীন তার জন্য যুদ্ধ করছে। চীন অন্য কোন দেশকে পদানত রাখতে বা করতে চায় না। অতএব চীনের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সহিত আমাদের আদর্শের কোন প্রভেদ নাই। রাশিয়া নিজের স্বাধীনতাকে এবং স্বদেশে যে প্রকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাকে নাৎসী আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য লড়ছে। ষ্টালিন সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, অন্য কোন দেশকে রাশিয়া নিজের অধীন করতে বা রাখতে চায় না। অতএব রাশিয়ার আদর্শের সহিতও আমাদের আদর্শের মূলত মিল আছে। ব্রিটেন নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এবং নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্যে জার্মেনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। আমরাও আমাদের দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। অতএব এই পর্যন্ত ব্রিটেনের আদর্শের সহিতও আমাদের আদর্শের মিল আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে চীনের ও রাশিয়ার আদর্শের সহিত ব্রিটেনের আদর্শ নিশ্চয়ই এক, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সেটি হচ্ছে, চীন ও রাশিয়া অন্য কোন দেশকে নিজের অধীন রাখতে বা করতে চায় না; কিন্তু ব্রিটেনের সম্বন্ধে কি নিঃসংশয়ে এই কথা বলা যায়?

সে যাই হোক, **স্বদেশে** স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত **রাখবার** জন্য চীন, রাশিয়া ও ব্রিটেন যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমরা যে স্বদেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত **করবার** জন্য সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে চাই, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা চীন, রাশিয়া ও ব্রিটেনের সমকক্ষ হ'তে চাই।

সাধারণ এই রকম বৃহৎ একটি আদর্শ সম্মুখে রেখে হক সাহেব প্রথমে উদ্ধৃত তাঁর কথাগুলি বলেছিলেন কি না, জানি না। সম্ভবতঃ তিনি একটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর অথচ বৃহৎ আদর্শে চীন, রাশিয়া ও ব্রিটেনের সমকক্ষতা করবার কথাই বলেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, চীন যেমন জাপানের বিরুদ্ধে, রাশিয়া যেমন জার্মেনীর বিরুদ্ধে এবং ব্রিটেন যেমন জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে লড়ছে, আমরাও সেইরূপ জাপানের বিরুদ্ধে লড়ব। এই ইচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু চীন, রাশিয়া ও ব্রিটেনের লোকেরা স্বাধীন; আমরা স্বাধীন নই। তারা তাদের **বাস্তবিক** জাতীয় লড়াইয়ে যা করতে ও করাতে চায়, আমরা আমাদের **ঈপ্সিত** জাতীয় লড়াইয়ে তা করতে ও করাতে পারি না। সুতরাং ঐ সব দেশের দৃষ্টান্তের অনুকরণ, অনুসরণ ও সমকক্ষতা করবার কথা না তুলাই ভাল। অধীন দেশের লোকদের মুখে বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে লম্বা-চৌড়া কথা শোভা পায় না।

কিন্তু তাই ব'লে আমরা সেই মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্রও সমর্থন করি না যা আগে থেকেই হার মেনে বসে থাকে, যা যে-কেউ দেশ দখল করবে তাকেই প্রভু বলে মেনে নিতে রাজী!। আমাদের দেশে যাঁরা সৈন্যদলে ঢুকতে

পারেন, তাঁদের নিশ্চয়ই সৈনিক হ'য়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। যার অন্য যে-দিক দিয়ে যে-রকম সামর্থ্য আছে সেই প্রকারেই জাপানের পরাজয়ে সাহায্য করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধী সকল রকম যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যুদ্ধ না-ক'রেও জাপানের দ্বারা ভারত-বিজয় বন্ধ করা যায়। অন্য যাঁরা যুদ্ধবিরোধী, তাঁরা যদি বিনা যুদ্ধে জাপানকে নিরস্ত করবার কোন উপায় না-জানেন, তা হ'লে গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ করুন। তাঁদের নিজের কোন উপায় থাকলেও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের পরামর্শ করা উচিত।

মোট কথা, জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা সকলেরই কর্তব্য। আমরা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-অধীনতার স্থায়িত্ব কামনা করি না, কিন্তু ব্রিটিশ-অধীনতার পরিবর্তে জাপানী অধীনতাও চাই না। ব্রিটিশ-অধীনতা কেমন ক'রে আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই শেষ করা যাবে, সে-বিষয়ে দেশের নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহ। কিন্তু জাপানী ফাঁস গলায় একবার লাগলে কেমন ক'রে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কেউ জানে না।

—

লবণের দুষ্প্রাপ্যতা ও মহার্ঘতা

নুন ধনী দরিদ্র সকলেরই নিত্য ও একান্ত আবশ্যক সামগ্রী। এর দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় গরিব লোকদের বড় অসুবিধা হয়েছে। অন্যদেরও যে অসুবিধা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু তাদের বেশি দাম দেবার সামর্থ্য আছে, গরিবদের নাই। কোথাও কোথাও নুন পাওয়াই কঠিন হয়েছে।

ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র। সমুদ্রের জল থেকে অপর্যাপ্ত নুন তৈরি হ'তে পারে। তা ছাড়া, রাজপুতানার সম্বর হ্রদের নুন ও খনিজ নুনও আছে। এ হেন দেশে নুনের দুষ্প্রাপ্যতার একমাত্র বা প্রধান কারণ এই যে, দেশের লোকে অবাধে নুন তৈরি করতে পারে না, এই বাধা গবর্মেণ্টের অবিলম্বে দূর ক'রে দেওয়া উচিত।

সমুদ্রে জাহাজডুবি হ'লে তৃষ্ণার্ত নাবিক ও অন্য আরোহীদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে ইংরেজ কবি কোল্‌রিজ্ "বর্ষীয়ান্ নাবিক" ("The Ancient Mariner") কবিতায় লিখেছেন, "Water, water everywhere, but not a drop to drink," "চারদিকে জল আর জল, কিন্তু পান করবার জন্যে এক বিন্দুও নাই।" তিন দিকে লবণসমুদ্রবেষ্টিত এবং কোথাও কোথাও লবণাক্ত জলাশয় ও লবণের খনিযুক্ত দেশে থেকেও কি তেমনি বলতে হবে, নুন সর্বত্র রয়েছে কিন্তু খাবার জন্যে কণামাত্রও নাই?

গান্ধীজীর লবণ-সত্যাগ্রহের পর সরকারী নিয়ম হয়েছিল যে, সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম সকলের ও অন্য যে-সব গ্রামে নুন হ'তে পারে তথাকার লোকেরা নিজ নিজ ব্যবহারার্থ নুন তৈরি করলে তা বে-আইনী হবে না, কিন্তু তারা নুন বিক্রী করতে পারবে না। এই নিয়ম এখনও বলবৎ থাকলে আবশ্যকমত সর্বত্র এর প্রচার আবশ্যক।

যে শুল্ক কর বা ট্যাক্সের ভার ধনী দরিদ্র সকলের উপর সমানভাবে পড়ে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। যে ট্যাক্সের ভার গরিবের ঘাড়েই বেশি পড়ে, তা আরও ন্যায়বিরুদ্ধ। ট্যাক্সের ভার ধনীর উপরেই অধিক পড়া উচিত। ধনীদের নানা সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু আছে। অনেক স্থলেই গরিবরা ভাত ও শাক কিছু নুনের সাহায্যে এবং মুড়ি নুনলঙ্কার সাহায্যে খেয়ে থাকে। এই জন্যে ধনীদের চেয়ে গরিবদের নুন বেশি আবশ্যক হয়, সুতরাং নুনের ট্যাক্স তারাই বেশি দ্যায়। এ রকম ট্যাক্স একেবারে উঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং নুন তৈরি করবার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত।

—

কুইনীন-সমস্যা

ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে। কুইনীন এই জ্বরের প্রধান ঔষধ ব'লে গণ্য হয়। ভারতবর্ষে যত কুইনীন আবশ্যক, সমস্তই এখানে উৎপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু কুইনীনব্যবসায়ী বিদেশী বণিকদের একটা দলের অপচেষ্টায় ভারতবর্ষ কুইনীনের জন্য প্রধানতঃ জাভার উপর নির্ভর ক'রে আসছিল। জাভা এখন জাপানীদের হস্তগত। সুতরাং সেখান থেকে কুইনীন পাওয়া যাবে না, এবং তার ফলে কুইনীনের দাম ত খুব বেড়ে যাবেই, যথেষ্ট কুইনীন পাওয়াই যাবে না। এসব কথা নানা সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে। জাপান যখন ব্রিটেনের ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে নি, যখন জাভা জাপানের হস্তগত হয় নি, যখন ইয়োরোপেও বর্তমান যুদ্ধ ঘোষিত হয় নি, তখনও যথেষ্ট সুলভ মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে কুইনীন পাওয়া যেত না। সেই জন্য দুই বৎসরেরও অধিক পূর্বে ভারত-গবর্মেণ্টের প্রধান কুইনীন অফিসার লিখেছিলেন :—

"The necessity of organizing the production of

quinine within the country on a national basis appears to be urgent."

তাৎপর্য্য। ভারতবর্ষের মধ্যেই সমগ্রভারতীয় ভিত্তিতে কুইনীন উৎপাদনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা জরুরী মনে হচ্ছে।

দুই বৎসরেরও অধিক পূর্বে যার সমগ্র ভারতীয় ব্যবস্থা জরুরী মনে হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে গবর্ন্মেণ্ট সিঙ্কোনা গাছ জন্মাবার উপযোগী জমি পরীক্ষা ইত্যাদি করবার যথেষ্ট সময় পান নি বলতে পারেন না। অবিলম্বে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শুনেছি, সিঙ্কোনার চাষ দেশের সাধারণ সমতল ভূমিতেও হ'তে পারে, কিন্তু দার্জিলিং জেলার মত উঁচু পাহাড়ে ঠাণ্ডা জায়গাতেই ভাল হয়। বেসরকারী কোন কোন উদ্যোগী লোক সিঙ্কোনার চাষ ক'রে তার ছাল থেকে কুইনীন তৈরি করবার চেষ্টা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁরা সিঙ্কোনার বীজ সংগ্রহ করতে পারেন নি। গবর্ন্মেণ্ট কখনো সরকারী ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ কুইনীন যথেষ্ট সস্তা দরে জোগাতে পারেন নি, এখন ত পারবেনই না। সুতরাং সিঙ্কোনার চাষ ও কুইনীন প্রস্তুতি এক প্রকার সরকারী একচেটিয়া ব্যবসার মত না রেখে যদি সিঙ্কোনার বীজ সকলে পেতে পারে এই রকম ব্যবস্থা গবর্ন্মেণ্ট করেন তা হ'লে ভাল হয়। দেশে যে-সব কারখানা গাছগাছড়া ও খনিজ দ্রব্য থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত করে এবং তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কেবল তাদেরই সিঙ্কোনার বীজ পাবার সুবিধা ক'রে দিয়ে গবর্ন্মেণ্ট যদি তাদিগকে কুইনীন প্রস্তুত করবার অনুমতি দেন, তা হলে দেশের খুব উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে, গবর্ন্মেণ্ট নিজে কুইনীন উৎপাদনের জন্য যা করছেন, তাও বজায় থাকতে পারে। বেসরকারী প্রচেষ্টা সফল হবার পর গবর্ন্মেণ্ট এই কার্যক্ষেত্র থেকে সরে যেতে পারেন।

দার্জিলিং জেলার মংপুতে যিনি সিঙ্কোনার চাষ ও কুইনীন প্রস্তুতির অফিসার তাঁকেই সিঙ্কোনার চাষের ও কুইনীন প্রস্তুতির বিস্তারের একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা উচিত।

—

ব্যবসাবাণিজ্য ও বিজ্ঞাপন

'প্রবাসী'র বর্তমান সংখ্যায় ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে, প্রবাসীর পাঠকদের মধ্যে যাঁরা উদ্যমশীল ব্যবসায়ী, তাঁরা স্বভাবতই সেটি পড়বেন। খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে যে সকল ব্যবসাদার ও কারখানার মালিক বিজ্ঞাপন দেন তাঁরা আপনাদের লাভের জন্য তা করলেও সর্বসাধারণেরও এতে লাভ আছে। কারণ, তাঁরা তাঁদের আবশ্যক জিনিস কোথায় পাবেন বিজ্ঞাপন প'ড়ে জানতে পারেন। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রকাশকেরাও লাভের জন্য বিজ্ঞাপন ছাপলেও তাঁরাও পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের সুবিধা ক'রে দেন। অবশ্য মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা সমাজের অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। সে রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া ও ছাপা উচিত নয়।

বাজার 'মন্দা'র সময়ে কোন কোন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে দেন, আবার কেউ কেউ বিজ্ঞাপন বন্ধ না ক'রে চালাতে থাকেন। উভয় পক্ষেরই পছন্দসই যুক্তি আছে। যাঁরা বন্ধ করেন, তাঁরা বলবেন, "এখন জিনিসের কাটতি হবে না, এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লাভ?" যাঁরা বন্ধ করেন না তাঁরা বলবেন,"জিনিসের **কিছু** কাটতি ত আছে? ক্রেতাদের সেই সব দোকানে যাবার সম্ভাবনা হয়ত কিছু বেশি, 'মন্দা'র দিনেও যাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ হয় না। তা ছাড়া, মানুষের চোখের সামনে থাকার, মনে থাকার, একটা গুণ আছে; যে চোখের সামনে নাই, তাকে ভুলে যাওয়া সোজা ও স্বাভাবিক—ইংরেজিতে তাই বলে, 'out of sight,' out of mind'। 'মন্দা'র দিনে যারা বিজ্ঞাপন বন্ধ করে ও যারা বন্ধ করে না, 'মন্দা' কেটে যাবার পর এই উভয় শ্রেণীর ব্যবসাদারের মধ্যে ক্রেতাদের কাকে বেশি মনে থাকবে ও মনে পড়বে? সম্ভবতঃ তাকে যে 'মন্দা'র দিনেও বিজ্ঞাপন বন্ধ করে নি। অতএব বিজ্ঞাপন বন্ধ না-ক'রে চালানই ভাল।"

উভয় প্রকার যুক্তির মধ্যে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তা আমাদের না-বলাই ভাল। কারণ, পাঠকেরা স্বভাবতই এই সত্য কথা ভাববেন, যে, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রের প্রকাশকরা বিজ্ঞাপন বন্ধ না-হওয়াটাই পছন্দ করবেন, কারণ তাতেই তাঁদের লাভ। আমরা তা অস্বীকার করি না; কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদেরও লাভ আছে কি না, বুদ্ধিমান ব্যবসাদারেরা তা নিজেরাই স্থির করতে পারবেন।

"ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন" প্রবন্ধের লেখক অনেক বাঙালী বিজ্ঞাপনদাতার বৈচিত্র্যহীন বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিচিত্র বিজ্ঞাপনও অনেকে দিয়ে থাকেন। আমরা অনেক আগে বাঙালী কাপড়ের কল-ওয়ালারা যে-রকম সচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভবান্ হবেন লিখেছিলাম, বিশেষ ক'রে বাংলার একটি মিল আমাদের

সেই সঙ্কেত অনুসারে সেই রকম বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছেন। বঙ্গের বাহিরের একটি মিলও করছেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধটির লেখক সাধারণতঃ বাঙালী ব্যবসাদার ও কারখানা-মালিকদের বিজ্ঞাপন-বিমুখতার উল্লেখ করেছেন। অনেকের পক্ষে এই মন্তব্য সত্য না হ'লেও অনেকের পক্ষে সত্য। অনেক বৎসর পূর্বে আমরা লিখেছিলাম, যে, যে-সব শিল্পদ্রব্য বিদেশ থেকে কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে বাংলা দেশে আসে, বাংলা দেশে প্রস্তুত সেই সব শিল্পদ্রব্যের ছোট ছোট বিজ্ঞাপন আমরা তিন মাস 'প্রবাসী'তে বিনামূল্যে ছাপব। কিন্তু আমরা উল্লিখিত রকমের বিশেষ কোন শিল্পদ্রব্যের বিজ্ঞাপন পাই নাই, কেবল কয়েকটা সুবাসিত তেল ও অত্যাশ্চর্য ঔষধের বিজ্ঞাপন পেয়েছিলাম।

দেখতে পাই, বাংলা দেশের বাইরের অনেক কারখানা বাঙালীর বাংলা দেশের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন কিন্তু বাংলা দেশেই বাঙালীর কারখানায় সেই জিনিস তৈরি হ'লেও সে কারখানা বিজ্ঞাপন দেন না। যেমন মনে করুন পাম্প (pump) বা দমকল। বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় নির্মিত পাম্প প্রভৃতি লৌহদ্রব্যের বিজ্ঞাপন বাংলা মাসিক কাগজেও পাবেন, কিন্তু কলকাতা ও তার নিকটবর্তী জায়গায় প্রস্তুত ঐ রকম সব জিনিসের বিজ্ঞাপন বঙ্গের কাগজে পাবেন না।

অনেক ব্যবসাদার মনে করেন, বিজ্ঞাপন না দিয়েই ত আমাদের বেশ কাট্‌তি আছে। কিন্তু ব্যবসা বৃহত্তর করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সমব্যবসায়ী যদি বিজ্ঞাপন দ্যান, তা হ'লে সেই প্রতি-যোগিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।

যাঁরা বাংলা দেশের বাইরে নিজেদের জিনিসের কাট্‌তি চান, তাঁদের এমন ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত যার প্রচার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই আছে। বাংলা কাগজে বা ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন দিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার কথা নয়।

এই বিষয়ে আমরা যা লিখলাম, গোড়াতেই বলেছি তাতে বিজ্ঞাপনদাতাদের লাভ, সর্বসাধারণের সুবিধা এবং পত্রিকা-পরিচালকদের লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে তা লিখিত হয়েছে; 'নিঃস্বার্থ পরোপকার'এর জন্য লিখিত হয় নি, বলা বাহুল্য। কিন্তু যাতে বিক্রেতা, ক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনপ্রকাশকদের সহযোগিতায় বাংলা দেশে বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্য ও বাঙালীর পণ্যশিল্পের কারখানা বাড়ে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কিছু লিখলে সেই চেষ্টা বাঙালীদের সমর্থন পাবে বিশ্বাস করি—সে-চেষ্টাকে নিঃস্বার্থ বা স্বার্থ-প্রণোদিত যাই মনে করা হোক না কেন।

—

নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র রায়

রাঁচির প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাঙালী সমাজ ও ভারতবর্ষ এক জন সুপণ্ডিত নৃতত্ত্ববিৎ, স্বদেশপ্রেমিক ও ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসীদের অকপট দরদী বন্ধু হারাল। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" এই বাক্যের তিনি দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭১ হয়েছিল। গত শতাব্দীতে যখন কল্‌কাতার সিটি কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রবাসীর সম্পাদকের স্থান ছিল, তখন শরৎচন্দ্র ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিখ্যাত হবার পর এই কথা বোধ হয় তাঁরই প্রমুখাৎ জানতে পেরেছিলাম। বার্দ্ধক্যেও তিনি ছাত্রের মত ব্যবহার করতেন। প্রথম যখন আমি রাঁচি যাই ও তাঁর বাড়ীতে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি তাঁরই বাড়ীতে তাঁর ও পরিবারস্থ অন্য সকলের জন্য যে নানা মিষ্টান্ন তৈরি হ'ত, তা দিয়ে ত তৃপ্ত করলেনই, অধিকন্তু আমার মানসিক পুষ্টির যা ব্যবস্থা করলেন অন্যত্র তা দুর্লভ। তাঁর বৈঠকখানাটি দেখলাম নৃতত্ত্বের একটি ম্যুজিয়মবিশেষ। প্রাগৈতিহাসিক বহু প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মানবসভ্যতার নানা স্তরের যে-সব নিদর্শন সেখানে কালানুক্রমে সাজান ছিল, সবগুলি সম্বন্ধে তিনি আমাকে পাঠ দিলেন বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শিক্ষাদানশক্তি তাঁর সৌজন্যের সমতুল্য ছিল।

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বই পড়েছিলেন। কিন্তু বই-পড়া বিদ্যা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল না। গবেষণালব্ধ জ্ঞান তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এই গবেষণা লাইব্রেরিতে ব'সে গবেষণা নয়। ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসী ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি নানা উপজাতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবার জন্যে তাঁকে তাদের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল, সুপরামর্শ ও অন্যবিধ নানা সাহায্য তাদিগকে দিতে হয়েছিল, তাদের ভাষা শিখতে হয়েছিল, তাদের গান ও উপকথা ও তাদের বিবাহ-আদি আচারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে হয়েছিল, এবং কোন কোন উপজাতি তাদের যে-সব আচার খুব গোপন রাখে ও যে-সব অনুষ্ঠান বাইরের কাউকে দেখতে দেয় না, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্যে তিনি কখন কখন প্রাণ যাবার ভয় সত্ত্বেও

গহন বনে গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে কোন কোন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিলা-যুগের ও তাম্র-যুগের নানা সামগ্রী তিনি দুর্গম স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ অনেকগুলি মূল্যবান সচিত্র পুস্তক আছে। ফোটোগ্রাফগুলি তাঁর নিজের তোলা। কোন কোনটির অনেক অধ্যায় মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'প্রবাসী'তেও তিনি নৃতত্ত্ববিষয়ক অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তিনি তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর অভিভাষণটি স্বজাতি বাঙালীর প্রতি প্রীতি, আদিম নিবাসীদের প্রতি মৈত্রী এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক পাণ্ডিত্যের সমাবেশে অপূর্ব হয়েছিল। তাঁর বৃত্তি ছিল ওকালতী। আইনের জ্ঞান এবং তার প্রয়োগে দক্ষতা তাঁর যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অনুরাগ ছিল নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, গবেষণা ও বিতরণে। তিনি "ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক নৃতত্ত্ববিষয়ক উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। এতে তাঁর এবং ভারতীয় ও বিদেশী বহু নৃতত্ত্ববিদের অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

—

প্রাদেশিক শব্দের অভিধান

বঙ্গীয় শব্দকোষের সঙ্কলনকর্তা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বঙ্গীয় শব্দকোষ সমাপ্ত হবার পর একটি প্রাদেশিক শব্দের অভিধান রচনা করতে বলেছিলেন। এরূপ অভিধান অত্যন্ত আবশ্যক। এর দ্বারা নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, এবং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বোঝা যাবে, বাড়বে ও স্থায়ী হবে। আমরা অনেক সময় কোন কোন ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না পেয়ে সংস্কৃত ধাতু থেকে তা রচনা করি, অথচ প্রাদেশিক শব্দ-সমষ্টির মধ্যেই হয়ত ঠিক্ প্রতিশব্দটি রয়েছে ভুলে যাই। প্রাদেশিক শব্দের অভিধান সংকলিত হ'লে যদি সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার বাড়ে, তা হলে সাহিত্য মানুষের বাস্তব জীবনের নিকটতর এবং অধিকতর প্রাণবান্ হবে। শব্দসম্ভারের নিমিত্ত বাংলা হিন্দীর চেয়ে সংস্কৃতের উপর বেশি নির্ভর করে। প্রাদেশিক শব্দ অধিক ব্যবহৃত হ'লে এই পরনির্ভরতা কমবে ও স্বাবলম্বন বাড়বে।

প্রাদেশিক অভিধান সংকলনের প্রস্তাব আগে অন্য কেউ কেউও করেছেন। আমরা অনেক বৎসর আগে এই রকম প্রস্তাব "দাসী," "প্রদীপ," বা "প্রবাসী"তে করেছিলাম—ঠিক্ কোন্ মাসিকে মনে নাই। কোষকার স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাবের একটি অঙ্গ-স্বরূপ বলেছিলাম, গোরুর গাড়ী, লাঙ্গল, রান্নাঘরে ব্যবহৃত নানাবিধ পাত্র প্রভৃতির ছবি এঁকে বঙ্গের সর্বত্র সেগুলি সহায়কদিগকে পাঠিয়ে দিয়ে সকল জেলা ও মহকুমায় ব্যবহৃত সেগুলির নাম সঙ্কলন করতে হবে—গোরুর গাড়ীর ও তার চাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, লাঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, রান্নাঘরের হাঁড়িকুঁড়ি হাতা বেড়ি খুন্তি কুলা ধুচুনি প্রভৃতির নাম, খড়ের চালের ঘরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, নানা রকম নৌকার নানা অংশের নাম, ইত্যাদি সংকলন করতে হবে। আমাদের প্রস্তাব অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবু কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যাঁদের কাছে তিনি তাঁর প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যত দূর মনে পড়ছে, কেবল একজন উত্তর দিয়েছিলেন। এখন যদি এই রকম কাজে সব জেলা হ'তে সাড়া পাওয়া যায়, তা হ'লে কাজটি শীঘ্র সম্পন্ন হ'তে পারবে।

—

রাজবন্দীদের নথিপত্র পরীক্ষার আদালত

বিনা-বিচারে যে-সকল লোককে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবী সভাসমিতির বক্তৃতায়, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আইন-সভায় দীর্ঘকাল ধরে করা হয়ে আসছে। এত দিন পরে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের নথিপত্র পরীক্ষা করবার জন্য তিন জন বিচারকের একটি ট্রিব্যুন্যাল বা আদালত গঠিত হয়েছে। তার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবার কথা বা হয়েছে।

একটি কাগজে দেখলাম, বন্দীদিগকে কেন বন্দী দশাতেই রাখা হবে না, তার কারণ দেখাতে তাদিগকে বলা হবে। যদি তাই হয়, তা হ'লে বর্তমান যুগের দণ্ডবিধির ভিত্তিগত নীতির বিরুদ্ধ কাজ হবে। ব্রিটিশ দণ্ডবিধি ও বিচারের এবং পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ দণ্ডবিধির মূলনীতি এই, যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য রীতিমত বিচারের দ্বারা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী ব'লে প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ মনে করতে হবে। বিনা-বিচারে বন্দী সকল ব্যক্তিকে আমরা এই নীতি অনুসারে বরাবর নির্দোষ গণ্য

ক'রে আসছি এবং এই দাবী ক'রে আসছি যে, হয় তাদের প্রকাশ্য বিচার হোক, নয় তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ দণ্ডবিধির ভিত্তিগত আর একটি উৎকৃষ্ট নীতি এই যে, দশ জন প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড না-হওয়া নিরপরাধ একজন মানুষেরও শাস্তি হওয়ার চেয়ে ভাল। যদি বিনা-বিচারে বন্দীরা সবাই অপরাধী ধরে নিয়ে তাদিগকে বলা হয়, "তোমরা যে অপরাধী নও, প্রমাণ কর," তা হলে পাশ্চাত্য বিচার-পদ্ধতির ঠিক্ উল্টা কাজ হবে, এবং সর্বসাধারণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে মনে করতে পারবে যে, নিরপরাধ অনেক লোককে অপরাধী মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক অনেক অপরাধীর প্রকাশ্য বিচারের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান হয়ে আসছে যে, সে-রকম বিচার ক'রলে একটা হুজুক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, রাজনৈতিক চক্রান্ত-কারীদের অনেক ষড়যন্ত্র ও ফন্দী প্রকাশিত হ'য়ে পড়ায় অন্য অনেকের—বিশেষতঃ যুবকদের উপর সেই সকলের কুপ্রভাব পড়বে, তারাও সেই সকল শিখবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে-সব সাক্ষী হাজির করা হবে, তাদের প্রাণ সংশয় হ'তে পারে। কিন্তু এ সব যুক্তি সত্ত্বেও অনেক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসনবাদীর প্রকাশ্য বিচার হয়েছে এবং সাক্ষীদের প্রাণহানি হয় নি। তথাপি যুক্তিগুলার অকাট্যতা মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে, (১) বিচার অপ্রকাশ্যই হোক্, কিন্তু (২) বিনা-বিচারে দণ্ডিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে জানান হোক কি অপরাধে তাকে আটক করা হয়েছে, (৩) সেই অপরাধের কি প্রমাণ আছে তা তাকে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে জানান হোক, (৪) সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে সাক্ষী ও অন্য প্রমাণ উপস্থিত করবার অধিকার তাকে দেওয়া হোক, (৫) স্বপক্ষ সমর্থনার্থ উকিল ব্যারিস্টর নিযুক্ত করবার অধিকার তাকে দেওয়া হোক এবং (৬) উকীল ব্যারিস্টর নিযুক্ত করবার আর্থিক সামর্থ্য যাদের নাই গবর্ন্মেণ্ট নিজ ব্যয়ে তাদের জন্য উকীল ব্যারিস্টর নিযুক্ত করুন।

বিনা-বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'অভিযোগ' ও 'প্রমাণ' গোয়েন্দা পুলিসের গোপনীয় রিপোর্টে থাকে। পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনার‍্যাল আবশ্যক মনে করলে এসব কাগজপত্র কাওকে দেখাতে অস্বীকার করতে পারেন। আবশ্যক হ'লে মন্ত্রীরাও যাতে এসব কাগজপত্র দেখতে না পান, তার ব্যবস্থা ভারতশাসন-আইনে করা হয়েছে। গোপনীয় অগোপনীয় সব কাগজপত্র ট্রিব্যুন্যালের বিচারকত্রয় তলব করতে, দেখতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার কৌঁসুলিকে দেখাতে পারবেন কি?

ট্রিব্যুন্যালের ক্ষমতা এবং কাগজপত্র পরীক্ষার ও বিচারের পদ্ধতি সর্বসাধারণকে জানতে দেওয়া উচিত। এই সব যদি সন্তোষজনক হয়, তবেই লোকের বিশ্বাস হবে যে, নিরপরাধ লোকদের মুক্তির আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের বিবেচনায় নিরপরাধ এবং টেক্নিক্যাল অপরাধী উভয় প্রকার বন্দীকেই এখন খালাস দেওয়া উচিত।

খবরের কাগজে বেরিয়েছে, বিনা-বিচারে বন্দী ২০০ জনের নথিপত্র বিচারকত্রয় পরীক্ষা করবেন। এ রকম বন্দীর সংখ্যা ২০০র বেশি। তাদের মধ্যে থেকে কেবল ২০০ বেছে নিয়ে শুধু তাদেরই বিরুদ্ধে প্রমাণ পরীক্ষিত হবে, এ খবর যদি সত্য হয়, তা হ'লে এর কারণ কি? বাকী বন্দীদের কাগজপত্র কেন পরীক্ষিত হবে না? কাদের কাগজপত্র পরীক্ষিত হবে, তা কে স্থির করবেন? রাজ-বন্দীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার ভার যাদের উপর ছিল ও আছে, ঐ ২০০ বাছাই করবার ভার তাদেরই উপর থাকবে কি? তা যদি হয়, তা হ'লে যাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নাই বা নামমাত্র প্রমাণ আছে, তাদের ঐ ২০০র মধ্যে স্থান না-পাবার সম্ভাবনা নাই কি?

—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েদী

স্টেট্স্ম্যানের সম্পাদক আর্থার মূর সাহেব কল্‌কাতা কন্সিলিয়েশন গ্রুপের এক অধিবেশনে বক্তৃতায় ভারতীয়-দিগকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে অনুরোধ উপরোধ করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নাই মনে হয়। তিনি এই যুদ্ধে সঙ্গী চান চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য কারারুদ্ধ বন্দীদিগকে। তিনি বলেন:

> Give me the Armoury Raid prisoners every time. These are the kind of people I want. These are the people I would like to go tiger hunting with.

তাৎপর্য। প্রতিবার আমাকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বন্দীদের দাও। আমি এই রকম মানুষই চাই। এই রকম মানুষ নিয়ে আমি বাঘ শিকার করতে যেতে চাই।

এই বন্দীরা প্রাণপণ ক'রে তাদের ভ্রান্ত ও নিষ্ফল বিদ্রোহ করেছিল। অনেকের প্রাণ গেছেও। ঠিক পথ ধরতে না পারলেও তারা দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং কিছু দিন পূর্বে নাৎসীবাদের বিরোধিতা প্রকাশ্যভাবে জানিয়েছিল।. তার জন্যেই বোধ হয় মূর সাহেব তাদের মুক্তি চেয়েছেন।

অন্য অনেক বন্দী আছে যারাও রাজদ্রোহ-অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছে। জেলের বাইরে যে-সব বুদ্ধিমান্ লোক আছে, তাদেরই মত এরা কেউ বিশ্বাস করে না যে, জাপানীরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের ইতিহাস যারা মোটামুটি জানে, বুদ্ধিমান্ এরূপ বাঙালী মাত্রেই বুঝে ও জানে যে, কি জার্মেনী কি জাপান কেও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দিতে চায় না ;—প্রত্যেকেই চায় ভারতবর্ষকে পদানত করে ও তার পায়ে নূতন শিকল পরিয়ে তাকে লুণ্ঠন ও শোষণ করতে। এই কারণে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আশঙ্কার বিষয় নয়। তারা কেও পঞ্চম বাহিনী গড়বে না, কুইসলিং হবে না। বরং তার বিপরীত ব্যবহারই তাদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে। তারা দল বাঁধতে, দল চালাতে ও সব রকম দায় ঝুঁকি নিয়ে সাহসের কাজ করতে অভ্যস্ত। অতএব গবর্মেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে যথাসময়ে স্বাধীনতা দিতে চান, তা হ'লে এই বন্দীদের মনে সেই বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে তাদের মুক্তির হুকুম দিলে সুদক্ষ সহায়ক পাবেন। গবর্মেণ্ট এই যুদ্ধে দেশের লোকদের সব রকম সহযোগিতা চান এবং পরে দেশকে স্বাধীনতা দেবেন বলেছেন। রাজনৈতিক বন্দীদের খালাস দিলে গবর্মেণ্টের কথায় দেশের লোকদের আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিবে। কারণ, এই বন্দীরা যত ভুল ও অপরাধই ক'রে থাকুক না কেন, তারাও দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং যে জাপান ও জার্মেনী দেশকে আবার শৃঙ্খলিত করতে চায় তারা তাদের বিরোধিতাই করবে।

—

সিভিক গার্ড, গ্রাম-রক্ষী, ও হোম গার্ড

কলকাতায় অনেক আগে সিভিক গার্ডের দল গঠিত হয়েছে, সম্প্রতি গ্রাম-রক্ষী দল গড়বার চেষ্টা হচ্ছে, এবং তার পর হোম গার্ড্স্ (Home Guards) দল গঠনের উদ্যোগ হয়েছে। এদের কাজের, ক্ষমতার ও সজ্জার কী কী প্রভেদ আছে জানি না। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় এক দিকে যেমন বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করবার জন্য যুদ্ধে সুশিক্ষিত উৎকৃষ্টতম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনা চাই, তেমনি অন্তঃশত্রু চোর-ডাকাত বদমাইসের অপচেষ্টা থেকে সমাজকে রক্ষা করবার লোকও চাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গবর্মেণ্ট এই রকম সব লোকের দল গড়বার চেষ্টা যদি না-করতেন বা না-করেন, তা হ'লেও বেসরকারী লোকদের এ বিষয়ে কর্তব্য করা উচিত হ'ত বা হবে। সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার যোগাযোগেই সুফল হ'তে পারে।

খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে হোম গার্ডদের হাতে একমাত্র অস্ত্র থাকবে লাঠি। লাঠির প্রশংসা বঙ্কিমচন্দ্র ক'রে গেছেন। কিন্তু আধুনিক জলস্থলআকাশ যুদ্ধে যে-সব অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, লাঠি তার প্রতিরোধ বা সমকক্ষতা করতে পারে না। সুতরাং জাপানীরা দেশ আক্রমণ করলে হোম গার্ডরা তাদের সঙ্গে লড়বে এ আশা কেউ করে না। কিন্তু সাধারণ বদমাইস ও চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে লাঠি কতকটা কার্যকর হ'তে পারে। 'কতকটা' বলছি এই জন্যে যে, অনেক দিন হ'তেই দেখা যাচ্ছে, চোর-ডাকাত ও 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী'রা লাঠি তলোয়ার বর্শা ত সংগ্রহ করেই, বন্দুকও সংগ্রহ করে। এই রকম দুর্বৃত্তদের আক্রমণ নিবারণ করতে হ'লে বন্দুকধারী হোম গার্ড চাই। কর্তৃপক্ষের যে-রকম মতিগতি, তাতে হোম গার্ডদের বন্দুক পাবার সম্ভাবনা নাই। তা হ'লেও 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' প্রবাদবাক্য অনুসারে কোন রকম হোম গার্ড না থাকার চেয়ে লাঠিধারী হোম গার্ড ভাল।

—

'গেরিলা' যুদ্ধ

একটা কথা উঠেছে, আমরা সৈন্যদলে গিয়ে জাপানীদের বধ বা জখম বা কাবু করতে না পারি, গেরিলা যুদ্ধ দ্বারা কতকটা সেই কাজ করতে পারব। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের জন্যও যে অস্ত্র চাই এবং যুদ্ধশিক্ষা চাই তা ভুলে গেলে চলবে না। যাদের অস্ত্র নাই ও যুদ্ধশিক্ষা নাই, তারা রীতিমত বৃহৎ যুদ্ধ যেমন করতে পারে না, গেরিলা যুদ্ধ নামক খণ্ডযুদ্ধও তারা করতে পারে না।

আমাদের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, অনেকে হয়ত গেরিলা (guerrilla) যুদ্ধকে গরিলা (gorilla) যুদ্ধ মনে ক'রে থাকবেন। গরিলা নামক লাঙ্গুলহীন বৃহৎ বনমানুষ বনের গাছের ডাল ভেঙে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বটে, কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে উক্ত প্রকার প্রহরণ যথেষ্ট কার্যকর হবে না। গেরিলা (guerrilla) শব্দটা স্পেনের ভাষা থেকে ইংরেজিতে আমদানী করা হয়েছে। স্পেনীয় ভাষায় এর মানে ছোট যুদ্ধ (little war)। ছোট যুদ্ধেও অস্ত্রের দরকার হয়ে থাকে।

ব্রিটেনের মাডাগাস্কার দখল

ব্রিটেন আপাতত মাডাগাস্কার দখল করবার সময় বলেছেন যে, আফ্রিকার ঐ দ্বীপ ফ্রান্সেরই থাকবে, কেবল যত দিন যুদ্ধ চলবে তত দিন দ্বীপটি ব্রিটেন ও মিত্রশক্তিদের হাতে থাকবে। ব্রিটেন সমস্ত দ্বীপটা অধিকার করতে এখনও পেরেছেন কি না এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে কার প্রভুত্ব থাকবে এখনও নিশ্চিত বলতে পারা না গেলেও, মিত্রশক্তিদের এই দ্বীপটায় নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা রণনীতিসঙ্গত হয়েছে। এটি যে ফ্রান্সেরই থাকবে তা বলাও ন্যায়সঙ্গত হয়েছে।

এই প্রকার রণনীতির অনুসরণ ক'রে যদি ব্রিটেন ইন্দোচীনে ও থাইল্যাণ্ডে (শ্যামদেশে) জাপানের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতেন তা হলে এশিয়ায় যুদ্ধ সম্ভবতঃ এত ব্যাপক হ'ত না, এবং সিঙ্গাপুরসমেত মালয় এবং ব্রহ্মদেশের বৃহৎ অংশ জাপানের হস্তগত হ'ত না।

—

আটকবন্দী ট্রিব্যুন্যালের প্রতি সরকারী নির্দেশ

রাজনৈতিক আটক-বন্দীদের মামলা পর্য্যালোচনা করবার জন্য বাংলা সরকার বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজকে সভাপতি ক'রে যে স্পেশ্যাল ট্রিবুন্যাল গঠন করেছেন তাঁদিগকে নিম্নলিখিত কার্য্য করতে বলা হয়েছে:—

ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারায় যে উদ্দেশ্য ও গণ্ডীর কথা নির্দেশিত হয়েছে তা বিবেচনা করে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে প্রত্যেক বন্দীর বিরুদ্ধে কোন মোটামুটি মামলা দায়ের করা সম্ভব কি না তদ্বিষয়ে তাঁদের উপদেশ দিতে হবে। যদি বোঝা যায় যে আবেদনকারীদের উপরে ইতিপূর্বে যে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, তা হলে তাঁদিগকে দেখতে হবে যে, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রী বন্ধন এবং ভারতের উপর জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা ইত্যাদির ফলে আটক করবার পর হতে বন্দীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালনা হচ্ছে তার প্রতি তাদের সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে কিনা. এবং বন্দীদের আবেদন অনুসারে তাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হতে পারে কিনা। --ইউ. পি

—

খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সরকারী চেষ্টা হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হবে সেখানকার লোকদের জন্য তার যথেষ্ট অংশ যাতে থাকে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। এই জন্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত ভারত-সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর ক'রেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নেণ্টকে জানাতে বলা হয়েছে তাঁরা কত চান। বাংল দেশের অভাব ও প্রয়োজন কত, কেন্দ্রীয় গবর্নেণ্টকে কি তা জানান হয়েছে?

—

পশ্চিম-বঙ্গে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার

খবরের কাগজে দেখলাম, পশ্চিম-বঙ্গে জলাশয় সকলের পঙ্কোদ্ধারের নিমিত্ত বাংলা-সরকার এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর ক'রেছেন। পুকুর ও বাঁধগুলির পঙ্কোদ্ধার হ'লে সেগুলির দ্বারা চাষের ক্ষেতে আবশ্যকমত জল সেচন করা চলবে, জলাশয়গুলির পাড়ে ফেলা পাঁক উৎকৃষ্ট সারের কাজ করবে ও পাড়ে নানা রকম তরীতরকারী ও ফল উৎপন্ন হ'তে পারবে, এবং জলাশয়গুলিতে মাছের চাষও চলবে। জল-সেচনের ব্যবস্থা থাকায় একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারা যাবে। পঙ্কোদ্ধার হ'তে এই সমস্ত উপকারই পাওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া অন্ততঃ এই তিনটা জেলার ক'টা জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার লাখ টাকায় হ'তে পারবে? স্বর্গগত গুরুসদয় দত্ত যখন বাঁকুড়া জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি এ জেলার বাঁধগুলির সংখ্যা নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের যত দূর মনে পড়ছে, তিনি দেখেছিলেন এ জেলায় ৩৫।৪০ হাজার বাঁধ ছিল, যার অনেকগুলি সম্পূর্ণ ও অনেকগুলি অংশতঃ ধানের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। তা হবার আগে এই জেলায় চাষের ক্ষেতে বাঁধগুলির জল দেবার যে বন্দোবস্ত ছিল, সেই বন্দোবস্ত আবার কায়েম করতে হ'লে কত টাকা আবশ্যক আন্দাজ ক'রে বলা যায় না।

যতগুলি জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার আবশ্যক, হয় তার সবগুলিরই পঙ্কোদ্ধার হোক নতুবা একটিরও হ'য়ে কাজ নেই। এরূপ কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা কেবল এই কথাই বলতে চাই যে, এক লক্ষ টাকা এই কাজের জন্য অত্যন্ত অযথেষ্ট, এক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে সরকার যেন মনে না করেন যে যথেষ্ট করা হয়েছে।

—

"অপারিবারিক" অঞ্চল

বাংলা-গবর্নেণ্ট বঙ্গের কতকগুলি অঞ্চলকে "অপারিবারিক" অঞ্চল ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র রাখতে হবে ও দুটা বাসার ব্যবস্থা করতে হবে ব'লে তাঁরা বেতনের উপর ভাতাও

পাবেন। এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু এখানে একাধিক বৃহত্তর প্রশ্ন উঠছে। "অপারিবারিক" অঞ্চলের অর্থ কি? সম্ভবতঃ অর্থ এই যে, স্থানগুলির উপর জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে ব'লে সেগুলি বিপৎসঙ্কুল ও সেখান থেকে শিশু বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে সরিয়ে ফেলা উচিত। তাই যদি হয়, তা হলে শুধু মুষ্টিমেয় সরকারী চাকরেদের পরিবারবর্গকেই যে ঐ অঞ্চলগুলি থেকে সরান আবশ্যক, তা নয়, প্রত্যেক বিপৎসঙ্কুল জায়গার হাজার হাজার বেসরকারী লোকদের পরিবারবর্গকেও সরান দরকার। গবন্মেণ্ট কেবল সরকারী কর্মচারীদেরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী, এমন নয়; দেশের সমুদয় অধিবাসীদেরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। যদি কোন অঞ্চল থেকে শিশু বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদের অপসারণ বাঞ্ছনীয় হয়, তা হ'লে গৃহস্থদের মধ্যে সরকারী বেসরকারী ভেদ করা সঙ্গত হবে না।

অবশ্য এমন অবস্থা ঘটতে পারে, এবং এই যুদ্ধের মধ্যেই কোন কোন দেশে ও অঞ্চলে তা ঘটেছে, যাতে সেখানকার গবর্ন্মেণ্ট সর্বসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হ'য়ে পড়েছেন। বাংলা দেশের কোন অঞ্চলে সে-রকম অবস্থা ঘটবার আশঙ্কা বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট করছেন কি না, জানি না। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট দেশের লোকদের আতঙ্কগ্রস্ত হ'তে বার-বার নিষেধ করছেন, সকলের মনে সাহসের সঞ্চার করবার চেষ্টা করছেন। সেই জন্য, কর্তৃপক্ষের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে আতঙ্কের কারণ ঘটতে পারে। রাজ্যের কাজ চালাতে হ'লে সব কথা প্রকাশ করা যায় না, অনেক তথ্য, সংবাদ, অনুমান গোপন রাখতে হয়। কিন্তু অনেক বিষয়ে দেশের লোকদিগকে বিশ্বাস ক'রে অনেক কথা জানানও আবশ্যক; না-জানালে গুজবের ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গবর্ন্মেণ্ট তাঁদের জানা তথ্য, অনুমান প্রভৃতির কিয়দংশ জনসাধারণকে বিশ্বাস ক'রে প্রকাশ করবেন কি না, তা তাঁরা বিবেচনা করবেন।

—

পাকিস্তান ও কংগ্রেস

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমীটি দুটি প্রস্তাব দ্বারা পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ও ভারতবর্ষের অখণ্ডত্বের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। প্রস্তাব দুটি উপস্থিত সকল সভ্যেরই সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নি, খুব বেশি অধিক ভোটের জোরে গৃহীত হয়েছে। যা হোক গৃহীত যে হয়েছে এও মন্দের ভাল। এও সন্তোষের বিষয় যে, এক শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার ভিন্ন কোন প্রধান কংগ্রেস-নেতা পাকিস্তানের অনুকূল মত পোষণ করেন না।

রাজাজীর কোন কোন উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশে বর্তমান গবর্নরী শাসনের পরিবর্তে মন্ত্রিমণ্ডলদ্বারা শাসন বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং সেই মন্ত্রিমণ্ডলে মুসলমান সদস্য এবং অ-কংগ্রেসী সদস্য থাকাও আবশ্যক মনে করেন। সে-রকম মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কিন্তু মুসলিম লীগের পাকিস্তান-পরিকল্পনা সমর্থন করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের কথা ছেড়ে দিয়ে, বাংলা দেশেই অল্প দিন আগে যে-রকম কোয়ালিশ্যন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, রাজাজী মান্দ্রাজে সেই রকম মন্ত্রিসভা গঠন করবার চেষ্টা করতে পারতেন।

—

"পাকিস্তানবিরোধী দিবস"

হিন্দু মহাসভা গত ১০ই মে "পাকিস্তানবিরোধী দিবস" ব'লে ঘোষণা করায় ঐ দিন সকল প্রদেশে নানা জায়গায় পাকিস্তানবিরোধী সভা হয়েছিল এবং পাকিস্তানবিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল বটে, কিন্তু যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনাব জিন্না-সাহেব পাকিস্তানের প্রধান পাণ্ডা, সেই সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক এর বিরোধী। সাড়ে চারি কোটি মোমিনরা এর বিরোধী, শিয়ারা বিরোধী, জমিয়ৎ-উল-উলেমা বিরোধী, অহ্‌রররা বিরোধী, কংগ্রেসী মুসলমানরা (বা অন্ততঃ তাদের কতক অংশ) এর বিরোধী। ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা নয় কোটির কম। তার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেকের অধিক পাকিস্তানবিরোধী। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, পাকিস্তান-পরিকল্পনা ইসলামের মূল নীতির বিরুদ্ধ। বঙ্গের কৃষক-প্রজাদলের সভাপতি সৈয়দ হবিবুর রহমান ঐরূপ কথা বলেছেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী সৈয়দ নৌসের আলিরও মত ঐ প্রকার। অনেক কৃতবিদ্য মুসলমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে মৌলবী রেজাউল-করীমের ইংরেজী বহিটি সর্বোৎকৃষ্ট। এই বই কলকাতার বুক কোম্পানীর দোকানে দেড় টাকা দামে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ জৈন ভারতীয় খ্রীষ্টীয়ান, পারসী ও শিখেরা এর বিরোধী।

পাকিস্তানবিরোধিতার মানে মুসলমানবিরোধিতা নয়। ভারতবর্ষ অখণ্ডিত থাকলে শুধু যে হিন্দু শিখ প্রভৃতিরই সুখ-সুবিধা বাড়বে ও দেশ স্বাধীন হ'তে পারবে

তা নয়, মুসলমানদেরও সুখ-সুবিধা বাড়বে এবং দেশের অন্য সব লোকদের মত মুসলমানরাও স্বাধীনতার ফলভাগী হবে। পক্ষান্তরে, কয়েকটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশকে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানে পরিণত করলে সেগুলিকে ব্রিটেনের তাঁবেদারি করতে হবে, তারা স্বাধীন হ'তে পারবে না।

পাকিস্তান-পরিকল্পনার দোষক্রটি সংক্ষেপে বলা যায় না, বিস্তারিত ভাবে আগে অনেক বার বলা হয়েছে। ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দু-ভাগে বিভক্ত করলে, ভারতবর্ষের শক্তি কমবে, তার দু-অংশ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের শাস্তি কমবে, এবং সমগ্র দেশ দরিদ্রতর হবে।

দেশের সমুদয় অংশ একত্র থাকার সুবিধা এত বেশি, যে, যখন গত শতাব্দীতে আমেরিকার য়ুনাইটেড্ স্টেট্সের দক্ষিণের স্টেটগুলি পৃথক্ হতে চায়, তখন উত্তর ও দক্ষিণের স্টেটগুলিকে একত্র রাখবার জন্য ভীষণ যুদ্ধ হয় ও দক্ষিণের স্টেটগুলি পরাস্ত হয়।

পাকিস্তান কথাটা ব্যাকরণসম্মত না হলেও চলে গেছে। ওর মানে পবিত্র দেশ। যেখানে মুসলমানরা প্রধান নয়, সেই সমস্ত দেশই অপবিত্র!

—

চিনি, পোড়া কয়লা ও বস্ত্র

সম্প্রতি ভারত-সরকার চিনির দাম কারখানাতে এগার টাকা বার আনা মণ বাঁধিয়া দিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফ্রান্সিস মাক্সওয়েলের মতে চিনি তৈয়ারীর খরচ মণ-প্রতি ছয় টাকা পড়ে। আন্তর্দেশীয় শুল্কের পরিমাণ মণ-করা দুই টাকা তিন আনা তিন পাই। সুতরাং আট টাকার কিছু অধিক পড়তার জিনিসকে এগার টাকা বার আনা দরে বেচিতে দিয়া সরকার ক্রেতার বিশেষ কিছু উপকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, এই দরে কারখানাওয়ালার মণে এক টাকা লাভ থাকিতেছে। কি হিসাবে তাহা হয় সরকারের তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। প্রায় দশ টাকার জিনিসে এক টাকা লাভও অত্যধিক। চিনির কলওয়ালারা যে দাম কমে বাঁধা হইয়াছে বলিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহাদের অতিরিক্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বিড়লা ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার সময়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কয়েকটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমরা বরাবর অনুভব করিয়াছি যে অন্যায় উচ্চ মূল্য রক্ষা করিবার জন্য একচেটিয়া সমিতি গঠন করিয়া আমরা এমন এক নীতি অনুসরণ করিতেছি যাহার ফলে শেষ অবধি চিনির কারখানাগুলির অপরিমেয় ক্ষতি হইবে।"

"উচ্চ মূল্যের সুবিধা পাইয়া আমরা সকল দিকে তৈয়ারী করিবার খরচ বাড়াইয়া দিয়াছি।"

বঙ্গদেশে বৎসরে প্রায় একত্রিশ লক্ষ মণ চিনি যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে আমদানী হয়। বর্ত্তমান হারে ইহার মূল্য প্রায় তিন কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। যে সকল কারখানা হইতে ঐ চিনি আসে, তথায় ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসী বাঙালীকেও কাজ দেওয়া হয় না। বাঙালী রাসায়নিক সর্ব্বাপেক্ষা কম বেতনে পাওয়া যায় বলিয়া একটি করিয়া (কলওয়ালাদের ভাষায়) 'কেমিষ্ট বাবু' প্রতি কারখানাতে দেখা যায়। যশোহরে কোটচাঁদপুরে যেরূপে চিনি তৈয়ারী হয় বাংলার সর্ব্বত্র তাহা করা উচিত। বৎসরে পৌনে চারি কোটি টাকা যদি বঙ্গদেশে থাকিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য অনেকটা হ্রাস পাইবে। যে-জাতির ধনীরা ব্যবসায়ে মূলধন লাগাইতে অনিচ্ছুক তাহারও বাঁচিবার পন্থা আছে। তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, বাঙালীর প্রস্তুত চিনি ভিন্ন খাইব না। রেলওয়ের মালগাড়ীর অভাব বিবেচনা করিয়া আখের চাষ বাড়াইতে হইবে ও এখনই সেই সময়।

ভারত-সরকারের যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্য মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় মধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ও কয়লার মালগাড়ীর সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি যদি বলিতে পারিতেন যে, যুদ্ধের কাজ করিতেছে না এমন কারখানাকে আগের ভাগের মালগাড়ী দিবার পূর্ব্বে রন্ধনের কয়লার চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে মিটান হইবে, তাহা হইলে সেই কথা যুক্তিসিদ্ধ, অপক্ষপাতমূলক ও যুদ্ধকালীন সরকারের উপযুক্ত হইত। বিলাতের অর্থসচিব সর্ কিংসলি উড সম্প্রতি বলিয়াছেন, যুদ্ধঘোষণার পূর্ব্বের তুলনায় প্রধান খাদ্যগুলির মূল্য হ্রাস পাইয়াছে ও বাড়ীভাড়া অপরিবর্ত্তিত আছে। পোড়া কয়লা খাদ্য-প্রস্তুতির উপকরণ ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি।

তুলার দর আরও পড়িয়া ৭৮৪ পাউণ্ডের মূল্য ১৮৫ টাকা হইয়াছে, অথচ মোটা ধুতি চারি টাকা জোড়ার কমে পাওয়া যায় না। খুব মোটা সুতার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কাপড়ের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য-সচিবের কল্যাণে অনেক বার শুনিলাম কিন্তু চক্ষুতে উহা দেখিতে পাইলাম না। এই কাপড়ে কলওয়ালাকে অধিক লাভ করিতে দেওয়া হইবে না একথাও বলা হইয়াছে। সকল রকমের কারখানাওয়ালাকে মোটা লাভ করিতে দিয়া সরকারের তাহার একটা অংশ লওয়ার মধ্যে যে অন্যায়ের বীজ নিহিত রহিয়াছে, এই কথা আমরা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি। বিগত ১লা মে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভা অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৯৪ অংশ রাজকোষে লইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক অ্যাডিসনের মতে শহরের ফ্যাশানগুলি পল্লীগ্রামে যাইতে কিছু সময় লাগে। মিত্রশক্তিগুলির নিজের দেশে যে সুনিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ভারতে আসিতে কত দিন লাগিবে? সরকার 'অচলায়তন' সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া শত্রু কিন্তু বসিয়া নাই। আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় বাঁচিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে দেশে যে ভাবের বন্যা দেখা দিয়াছিল, এখন কি তাহা আসিতে পারে না? স্থানীয় স্বয়ম্পূর্ণতার (Regional self-sufficiencyর) কথা সকলেই বলিতেছেন কিন্তু কাজ আগাইতেছে কই?

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

চট্টগ্রামে জাপানী বোমাবর্ষণ

ব্রহ্মদেশের কোন কোন অংশ ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানের দখলে যাওয়ায় আশঙ্কা হ'য়েছিল যে, এর পর প্রথমেই বাংলার কোন কোন স্থান আক্রান্ত হবে। যদিও তা না হয়ে মাদ্রাজের দুটি বন্দরে জাপানীরা বোমা ফেলে-

ছিল, কিন্তু বাংলার পালা এসেছে, চট্টগ্রামে দু-দুবার বোমা পড়েছে, সামরিক কারণে বোধ হয় ক্ষতির ঠিক পরিমাণ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু চট্টগ্রাম আক্রান্ত হবার পর ব্রিটিশ-ভারতীয় পক্ষের বিমান ও কামান লড়ে থাকলে এবং তাতে শত্রুপক্ষের ক্ষতি হয়ে থাকলে কিরূপ ক্ষতি হয়েছিল, তা প্রকাশিত হ'লে কোন কুফল হ'ত না, সুফলই হ'ত। এখনও প্রকাশিত হ'লে ভাল হয়।

—

পার্লেমেণ্টে ক্রিপ্স্-দৌত্য সম্বন্ধে বিতর্ক

হাউস অব কমন্সে সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ নিজের দৌত্য সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করার পর তর্কবিতর্ক হয়। হাউস অব লর্ডসেও তর্কবিতর্ক হয়। উভয় হাউসের অধিকাংশ সভ্য দৌত্য যেভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে ও তার ফল যা হয়েছে, তাতে খুশিই হয়েছেন। কিন্তু হাউস অব কমন্সের অল্প-সংখ্যক সভ্য এবং হাউস অব লর্ডসের তার চেয়ে অল্প-সংখ্যক সদস্য কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও করেছিলেন এবং কেউ কেউ বলেছিলেন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টেরই ভারতীয় সমস্যার এরূপ সমাধান করবার চেষ্টা আবার করা উচিত যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়।

এর অনেক আগেই, গত ৬ই এপ্রিল, স্বাধীন শ্রমিক দলের কন্‌ফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত একটি প্রস্তাবে ভারতের এখনই স্বাধীনতা লাভের অধিকার মেনে নেওয়া হয়, দেশরক্ষাসমেত সব বিষয়ে দেশপ্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্বশীল গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে গঠন দাবী করা হয়, ভারতকে খণ্ডিত না ক'রে সংখ্যালঘুদের আধুনিক রাষ্ট্রনীতিসম্মত অধিকার স্বীকৃত হয়, এবং কন্সটিট্যুয়েণ্ট য্যাসেমব্লীতে দেশী রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সাবালক সব প্রজাদের দিতেই হবে বলা হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রমিক দল কিম্বা পার্লেমেণ্টের যে-সব সদস্য ক্রিপস্-দৌত্যের প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন, তাঁরা যদি ভবিষ্যতে ব্রিটেনের গবর্ন্মেণ্ট গঠন করেন, তা হ'লে তাঁরা কি তখন তাঁদের সাম্প্রতিক মত অনুসারে কাজ করবেন? তা ত সহজে বিশ্বাস হয় না।

—

ক্রিপ্স্-দৌত্য সম্বন্ধে মডারেটদের মত

ভারতবর্ষের লিবার্যাল বা উদারনৈতিক রাজনীতিকরা মডারেট ও নরমপন্থী এবং অল্পে সন্তুষ্ট ব'লে পরিচিত। তাঁদের নেতা সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রুকে কিন্তু বিলাতী নিউস রিভিয়ু বলেছেন, "Not so moderate," "তেমন নরমপন্থী নয়," অর্থাৎ যতটা নরম মনে কর তা নয়। ঐ কাগজে এও বলেছে, Even he wanted "some bold stroke," "এমন কি তিনিও গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ থেকে কিছু সাহসিক পলিসির প্রবর্তন চেয়েছিলেন।"

বিলাতী লোকেরা যাই মনে করুক, ভারতবর্ষে মডারেট দলের চেয়ে কমে সন্তুষ্ট হবে এরূপ রাজনৈতিক দল নাই। অতএব তাঁরাও ক্রিপ্স্-দৌত্য সম্বন্ধে গত ৬ই মে এলাহাবাদে কি মত প্রকাশ করেছেন দেখা যাক্।

ভারতীয় অচল অবস্থার অবসানের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় নূতনভাবে চেষ্টা করার অনুরোধ জানিয়ে যুক্তপ্রদেশ উদারনৈতিক সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

ক্রীপস্-দৌত্য সম্পর্কে তাতে বলা হয়েছে—"আলাপ-আলোচনাকালে ইহা বেশ সুষ্পষ্টভাবেই বুঝা গিয়েছিল যে কেবলমাত্র দেশরক্ষা সম্পর্কিত প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নারাজ তাহা নহে, পরন্তু নবগঠিত গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ একটি মন্ত্রিসভা ব'লে গণ্য না করতেও পারে যার শাসনকার্যসংক্রান্ত দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত উচ্চতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন।"

ক্রীপস্-দৌত্যের ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতীয়দের স্কন্ধে চাপান যেতে পারে না বলে উল্লেখ ক'রে উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে কমিটি ইংলণ্ড ও ভারতের স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে বর্তমান সঙ্কট সময়েও ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে অচল অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তার অবসানের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নূতনভাবে চেষ্টা করার অনুরোধ জানাচ্ছে। কমিটি মনে করেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি বিরূপ মনোভাবই দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাকেন তবে তাতে অবস্থা আরও খারাপ হবে এবং যখন উভয় দেশের একসঙ্গে কাজ করা উচিত ঠিক সেই সঙ্কটকালে ভারত ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক তিক্তকর হবে।

—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমীটির প্রধান প্রস্তাব

গত ১লা মে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমীটি তাঁদের যে দীর্ঘ প্রধান প্রস্তাব ধার্য করেন তা বর্তমান যুদ্ধ ও সঙ্কট অবস্থা এবং পরোক্ষভাবে ক্রিপ্স-দৌত্য সম্বন্ধীয়। এই প্রস্তাবে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান হয়েছে, নাৎসী ও ফাসিষ্টদের মত ও কার্যের বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়েছে, আক্রান্ত পরাজিত ও অত্যাচরিত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি জানান হয়েছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত সৈন্যদল নিয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন, বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—ভারতবর্ষের এবং সম্মিলিত সমুদয় মিত্র জাতিদেরও এই বিপদের সময়ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যাসক্ত রাষ্ট্রের মতন কাজ

করছে এবং ভারতের উপর প্রভুত্বশক্তি ছেড়ে দিতে চায় না; এবং ভারতবর্ষের জনবলের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও ব্যবহার না ক'রে বিদেশী কোন কোন রাষ্ট্রকে ভারতবর্ষের জন্য ভারতে যুদ্ধ করতে ডাকা হয়েছে (যা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক)। বিদেশী শত্রু ভারতবর্ষের কোন অংশ আক্রমণ বা দখল করলে কংগ্রেস তার সঙ্গে কেবল অহিংস পূর্ণ অসহযোগই করতে পারেন, কারণ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয়দের দ্বারা জাতীয় আত্মরক্ষার অন্যবিধ শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা হতে দেন নি। কংগ্রেস সেই জন্যে দেশের অধিবাসিগণকে শত্রুর সঙ্গে অহিংস সম্পূর্ণ অসহযোগ করতে ও তাকে কোন সাহায্য না-দিতে অনুরোধ করছেন। "আমরা আততায়ীর কাছে নতজানু হতে বা তার আজ্ঞা পালন করতে পারি না। আমরা তার অনুগ্রহপ্রার্থী বা তার উৎকোচগ্রাহী হতে পারি না। যদি সে আমাদের ঘর বাড়ী ও মাঠ-ময়দান নিতে চায়, তা আমরা দেব না— বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ গেলেও দেব না। যেখানে ব্রিটিশ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলবে, সেখানে আমাদের অসহযোগ নিষ্ফল ও অনাবশ্যক হবে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সমরপ্রচেষ্টায় কোন রকম বাধা না-জন্মানই সাধারণতঃ শত্রুর সহিত অসহযোগের একমাত্র উপায় হবে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে, তাঁদের কাজে বাধা না-জন্মান ছাড়া তাঁরা আমাদের অন্য কোন সাহায্য চান না।"

প্রস্তাবটির মোটামুটি তাৎপর্য দিলাম। আমাদের বিবেচনায় কংগ্রেসের মত বিশ্বাস ও নীতির অনুসরণ ক'রে এবং জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা ক'রে অন্য কোন প্রস্তাব কমীটি গ্রহণ করতে পারতেন না।

—

এই যুদ্ধটার নাম

আমেরিকায় গ্যালাপ (Gallup) ভোট দ্বারা স্থির হয়েছে বর্তমান যুদ্ধটাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ নম্বর দুই বলাই সঙ্গত। এই নামের পক্ষেই সকলের চেয়ে বেশী ভোট হয়েছিল। শতকরা ২৬ জন একে বলতে চেয়েছিল "বিশ্বস্বাধীনতার সংগ্রাম"; শতকরা ১৪ জন, "স্বাধীনতা সংগ্রাম"; তের জন, "মুক্তি সংগ্রাম"; এগার জন, "ডিক্টেটর-বিরোধী সংগ্রাম"; নয় জন, "মানবতার সংগ্রাম"; এবং সাত জন, "বেঁচে থাকার সংগ্রাম"। যুদ্ধটাকে যে বিশ্বস্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি সংগ্রাম, ডিক্টেটরবিরোধী সংগ্রাম, বা মানবতার সংগ্রাম বলা হয় নি, তাতে অকপটতার জয় হয়েছে, কারণ যুদ্ধটা বাস্তবিক ঠিক্ উক্ত কোন নামেরই যোগ্য নয়।

—

"১লা মে দিবস"

পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকরা প্রতি বৎসর ১লা মে শোভাযাত্রা ও সভা ক'রে আপনাদের আদর্শ ঘোষণা করেন এবং দাবী জানান। ভারতবর্ষেও কয়েক বৎসর থেকে ১লা মে দিবসে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা ও সভা হ'য়ে আসছে।

রাশিয়াতে শ্রমিকদের ক্ষমতা ও অধিকার অন্য সকল দেশের চেয়ে অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জমি, কারখানা প্রভৃতি সব সম্পত্তি রাষ্ট্রের। অন্যত্র জমি কারখানা যন্ত্রপাতি স্বত্বাধিকারী ধনিকদের হ'লেও ধন উৎপাদনের পরিশ্রম শ্রমিকরাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই উৎপন্ন ধনের ন্যায্য অংশ শ্রমিকরা পান না। এ বিষয়ে তাঁদের অভিযোগ ন্যায্য।

—

বঙ্গে "আরো খাদ্য উৎপাদন" প্রচেষ্টা

যুদ্ধের দরুন যে-সকল প্রদেশে খাদ্যসংকট উপস্থিত হয়েছে এবং পরে আরো বাড়তে পারে, বাংলা তার মধ্যে একটি। ব্রহ্মদেশের (এবং কিয়ৎ পরিমাণে শ্যামদেশের) চালের উপর ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চল আংশিকভাবে নির্ভর করত, বাংলা তাদের অন্তর্গত। এখন উক্ত দুই দেশ থেকে চাল পাওয়া যাবে না। সুতরাং বঙ্গে ধানের চাষ খুব বাড়ান দরকার। বিঘাপ্রতি ধানের ফলনও নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাড়ান আবশ্যক। ভারত-গবর্মেণ্ট সর্বত্র খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের শিক্ষা, ভূমি ও স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। তিনি সম্প্রতি কলকাতা এসে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় উৎসাহ দেওয়ার ফল ভাল হবে আশা হয়।

—

শান্তিনিকেতনে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীরাণী চন্দ

গুরুদেবকে হারাবার বেদনা ভেবেছিলুম খানিকটা মিটবে অবনীন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে পেলে। এই দোল-পূর্ণিমায় তারই আয়োজন হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"আমি তো মাটির ঢেলা মাত্র. যাঁর তাপে আমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হ'ত, তিনি চলে গেছেন। কোথায় যাব এখন আর? চলব কিসের জোরে? আমাকে আর কোথাও চলতে ব'লো না।"

কিছু দিন আগে ২৭শে ফাল্গুন গুপ্ত নিবাসের বাসায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললুম—গুরুদেব আমাদের আপনার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, আপনার মাঝে আশ্রয় মিলেছে—তা অবহেলা করবেন কি ক'রে?

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—"যেতে আমাকে হবে একবার। যেটুকু শক্তি আছে তা থাকতেই যাওয়া ভাল। বেশ চল, আজই, এখুনি।" ট্রেন ধরবার সময় বেশি নেই। সেক্রেটারী ইতস্ততঃ করছিলেন, পরের ট্রেন বা পরের দিন গেলে সব দিকে সুবিধে হয়। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"না, মন হয়েছে যাব, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি নয়।" বলে তৈরি হয়ে নেবার জন্য ভিতরে উঠে গেলেন।

যেটুকু সময় ছিল তারই মধ্যে যতটুকু ব্যবস্থা করা সম্ভব তাই ক'রে কোন-রকমে ১-৫৫ মিনিটের গাড়িতে ওঠা গেল। সঙ্গে নিলেন ছোট্ট একটি সুটকেসে খানকয়েক কাপড় ও জামা, আর কিছু নয়। বললুম—চাকর-বাকর কাউকে নেবেন না?

তিনি বললেন—"তীর্থে যাচ্ছি, একলাই যাব। বোঝা বাড়াবো না।" ট্রেন ছাড়ল—জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন—"চোদ্দ বছর আগে এই পথে গিয়েছিলুম। তখন গিয়েছিলুম যেমন বাপের কোলে ছেলে যায়। আর আজ! আজও যাচ্ছি সেখানেই, কিন্তু সে শান্তিনিকেতন ত ফিরে পাব না।...সইতে পারবো ত? কোকিল চলে গেল, এখন কাক নিয়ে তোমরা করবে কি?"

ট্রেনে সারা রাস্তায় তাঁর রবিকাকার কত গল্প করলেন। রবিকা'র স্মৃতিতে যাত্রাপথের দু'দিকের গাছপালা ষ্টেশনের নামগুলো পর্য্যন্ত যেন ভরে রয়েছে। বললেন—"তখনও দুধারে এসব গাছই বেশির ভাগ ছিল। এটা কি ষ্টেশন? হাঁ, এই ষ্টেশনই ত ঐ ষ্টেশনের পর—এর পরে আবার অমুক ষ্টেশন—তাই না?" বোলপুর যত এগিয়ে আসছে ততই যেন ষ্টেশনের নামগুলোর প্রতি তাঁর আগ্রহ উপচে উঠছে। ছোট ছেলে যেন স্কুল-ছুটির পর বাড়ি ফিরছে, কত ক্ষণে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কলাভবনে আলোচনা-নিরত অবনীন্দ্রনাথ

বোলপুর ষ্টেশনে নন্দদা* ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমেই তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে মালা-চন্দন পরিয়ে সবাই গান গাইলে—"আজি সবারে করি আহ্বান।" তত ক্ষণে অবনীন্দ্রনাথ যেন অনেকখানি সামলে নিলেন।

রাত আটটা হবে তখন। মোটর আশ্রমের ভিতর দিয়ে 'উদয়নে' এসে থামলো। বৌঠান† এগিয়ে এসে তাঁকে গাড়ী থেকে নামালেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—"প্রতিমা, আমার সেই ঘর, সেই ঘর কোথায়? যে-ঘরে সেবারে এসে থেকেছিলুম।"

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু।

† শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী।

বৌঠান তাঁর জন্য সেই ঘরই সাজিয়ে রেখেছিলেন। হুড়হুড় ক'রে এক রকম প্রায় ছুটেই সেই ঘরে ঢুকে দুহাত তুলে বলে উঠলেন—"এই ত আমার সেই ঘর।" শিশুর মত খুশিতে মুখখানি ভরে গেল।

পর দিন ভোরে সূর্য্য উঠবার অনেক আগেই উঠলুম। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি কেউ নেই। খবর নিয়ে জানলুম রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে খানিক ক্ষণ ঘরের ভিতরে অপেক্ষা ক'রে চারি দিক ফরসা না হ'তেই বেরিয়ে পড়েছেন। এ-বাগানে সে-বাগানে খুঁজে দক্ষিণের ফুলবাগানে তাঁর সন্ধান পেলুম। বললেন—"অনেকক্ষণ উঠেছি। উঠেই রবিকা'র বাড়িগুলো একে একে প্রদক্ষিণ করলুম। শ্যামলী প্রদক্ষিণ ক'রে অনেক ক্ষণ সেখানেই এক পাশে বসেছিলুম, বড় ভাল লাগল। রবিকা'র বাড়িগুলো যেন যত্নে সাজিয়ে রাখা হয়। এত বড় একটা শক্তি, এমন একটি মহাপ্রাণ এ কি লুপ্ত হয়ে যায় কখনও। হ'তেই পারে না—তাঁর কীর্তির কায়া থেকে যাবেই। তিনি বর্তমান থেকে যা দিয়ে গেছেন—তাঁর অবর্তমানেও তোমরা তা পাবে—তাঁর এই সব বাড়িগুলি থেকে। মন্দির থেকে আমরা যা পাই—এও সেই একই জিনিস। তাঁর বাড়িগুলিই আমাদের কাছে মন্দির। এই মন্দির থেকেই সবকিছু পাবে—অন্য কোথাও খুঁজতে যেও না।"

সকালে চা খাবার পর অবনীন্দ্রনাথ আশ্রম দেখতে বের হলেন। পুরনো আশ্রমকে খুঁজে পেলেন না। বললেন—"চোদ্দ বছর আগের আশ্রম আর নেই। এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, এ বরং ভালই। এর মানে—এ চলছে। এক জায়গায় এসে ঠেকে থাকে নি, চোদ্দ বছর আগে দেখেছিলুম এর এক রূপ, এখন দেখছি আর একরূপ, আবার চোদ্দ বছর বাদে হয় ত এ অন্য এক রকম রূপ ধারণ করবে।" শালবীথির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বললেন—যতই মনকে সামলাতে চেষ্টা করি পারি নে, ভিতরটা থেকে থেকে কেমন ক'রে ওঠে। আমার অবস্থা হয়েছে যেমন মৌমাছি মধু খেয়ে মৌচাক থেকে চলে গিয়ে আবার সেই চাকে ফিরে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি চীন ভবনে উপস্থিত হলেন। সেখানে নন্দদা কলা-ভবনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেয়ালে ছবি আঁকছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন "এই ত এখানেই কলা-ভবনের সবাই উপস্থিত, এখানেই আসর জমান যাক" ব'লে একটা টুলের উপরেই বসে পড়লেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকেই সেখানে জড় হলেন। আর্ট সম্বন্ধে অনেক আলাপ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "নন্দলাল, আমার মনে হয় আমাদের আর্ট এক জায়গায় এসে ঠেকে গেছে। মনের দৃষ্টি ও চোখের দৃষ্টি এই দুই মিলিয়ে তবে আর্টের পরিপূর্ণতা। আমি হয় ত ঠিক মত একথা বুঝিয়ে বলতে পারছি নে,—মনের ভিতরে আঁকু-পাঁকু করে সব। এক এক সময়ে ভাবি যে কি করলে আর কোন্ সাধনার দ্বারা ঐ জিনিস আমি তোমাদের দিতে পারব।"

বিকেল সাড়ে তিনটায় আম্রকুঞ্জে অবনীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হ'ল। আশ্রমের সবাই সেখানে একত্র হয়েছিলুম। আশ্রমের মেয়েরা অর্ঘ্যথালা হাতে নিয়ে গীত-গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে তাঁকে মাল্যচন্দন দিলে। গান হ'ল, ক্ষিতিমোহনবাবু আচার্য্যদেবের আশ্রমে শুভাগমন উপলক্ষে মন্ত্রপাঠ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন—"আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে এসেছিলুম এখানে, সেও এই রকম সময়ে এই আমগাছেরই তলায়। সে সময়ে আমাদের গুরুদেব যিনি তিনি বলেছিলেন কয়েকটি কথা, ভুলি নি আমি কোন দিন। আর আজ আমি যে কথা বলব তোমরাও ভুলবে না আশা করি।

গুরুদেব বলেছিলেন, 'অবন, আমি যখন না থাকব, তুমি এসে এদের ভার নিও।' তখন ভয় পেয়েছিলুম, বলেছিলুম তা আমি পারব না, হবে না আমার দ্বারা, তুমি না থাকলে আমি কি আসতে পারব? কিন্তু পারলুম ত, এলেম ত ধরে সেই রাস্তা, এসেছি এখানে। এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল কি না, তাই এমন হ'ল।

এই আশ্রম, এখানে আমাদের জীবন কত দিন কি ভাবে কাটবে কে জানে, তার জন্য ভাবনা নেই, যে কয় দিন চলে চলুক এই ভাবেই। যিনি চলে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ধর্মে নিষেধ। তাই ত আমি প্রথম কথাই বলেছি আশ্রমের উৎসবগুলি যেন বন্ধ না হয়। উৎসব চাই, মনের উৎসব বন্ধ হ'লে কাজ চলবে কি ক'রে? এ পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কত লোক আসছে কত লোক যাচ্ছে, দুঃখ ভেবে কি হবে, উপর থেকে তাঁর আশীর্ব্বাদ পড়বে—দুঃখ ভেব না কিছু। অমৃত পরিবেশন ক'রে গেছেন তিনি এখানে, এই জেনে নির্ভয় হও—আনন্দে থাক। সে জায়গায় ঢুকতে পাবার চাবি যদি পাওয়া যায় তবে আর ভাবনা কি? সে চাবির সন্ধান আমি জানি। শিল্পী অনেক কিছু পারে, আমি দেখি যদি পারি তোমাদের সে চাবির সন্ধান দিতে।

এক এক সময়ে ভাবি আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। হয় ত এই-ই ঠিক সময়। জেনো, তোমরা সব তাঁরই পরিবার। অত বড় মহাপ্রাণের এই পরিবার—তাদের ভার

আমি নেব, তাদের আপন ক'রে পাব এত পুণ্য আমার নেই। তবে ভরসা আমার, আশীর্ব্বাদ আছে গুরুর, আর আছে তোমাদের অনুকম্পা।

এই ছায়া এই আশ্রয়নীড়, নিজের হাতে তিনি এই নীড় তৈরি করে গেছেন তোমাদের জন্য। এ যেন না ভাঙে কোন দিন। তা যদি ভাঙে তবে এত বড় দুর্দৈব জগতে আর ঘটবে না। মহাকবির মহাপ্রাণের মানস সৃষ্টির চমৎকারী—এই রূপ, এ যদি মোছে ত সে আমাদের নিজে-দেরই দোষে, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাবে।

এ বস্তু রক্ষা করবার একমাত্র উপায়—একপ্রাণ হয়ে এক দিকে এক ভাবে সবাই চল একসঙ্গে। তবেই ফল পাবে। 'সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং' এই মন্ত্র ধরে থাক। দেখ, তোমরা যাও পারুলবনে, শালবনে, দল বেঁধে যেতে হ'লে সবাইকে এক হয়ে যেমন যেতে হয় আবার একা একাও যেতে হয়। এই শান্তিনিকেতনে তেমনি একা একাই চল আর এক-সঙ্গেই চল আনন্দ গেয়ে যাবে। এই স্থানটি থেকে কবি দিয়ে গেছেন আনন্দের উৎসবে মহা আহ্বান সকলকে সমান ভাবে। তাঁর আমন্ত্রণ এ চির দিনের মত, ভুলো না কোন দিন। তাঁর অভাবে আনন্দ পাচ্ছ না তোমরা প্রাণে। জানি তা, বেদনা থাকবে, তা যাবে না কখনও, প্রকৃতি-মাতার শীতল হস্ত সে বেদনার উপর পড়তে দাও। এই ত আমি, ভেবেছিলুম আর আসব না এখানে, আসতে পারব না, হয়ত সইতে পারব না বেদনা। সেই এলুম, কি রকম লেগেছে বলতে চাই নে, তবে এসেছি, এসে তবে সইতে পেরেছি, এসে দেখছি ভালই করেছি। এসেছি, সইয়ে নিয়েছি অনেকখানি দুঃখ, তবে তাপ দূর হয়েছে।

এখন বয়স নেই আমার যে, গাছ লাগিয়ে ফল খেয়ে যাই। নাই পেলেম ফল, ছায়া তো পেয়েছি! আশ্রমের এই ছায়া হ'তে কেউ না বঞ্চিত হয় এইটি যেন হয়। আমি যাঁকে সেবা করি আমার এই দুই হাত জোড়া সেই শিল্প দেবতার কাজে। তাই সব চেয়েও যে আমার নিকটের জন আজ, গুরুদেব যাকে নিজের হাতে তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন—সেই রথীই* আমার হ'ল দক্ষিণ হস্ত। আর এক হাত আমার এ দিকে ক্ষিতিমোহনবাবু, এঁদের উপরে শ্রদ্ধা রেখ, ইতস্ততঃ ক'রো না এঁদের মানতে, ঠিক পথে এঁরা তোমাদের নেবেন, নির্ভয়ে থাক।

নিরানন্দ হওয়া কেন, সেই লোক নেই আর এ কথা ত মন নেয় না আমার। তোমাদের প্রাণের শান্তি মনের

ছাত্রছাত্রী-পরিবৃত অবনীন্দ্রনাথ

আরাম তাঁর কাছ থেকেই আসবে আসবে আসবে। আমাদের মাঝে যিনি এক দিন ছিলেন তিনি নেই এ কে বলবে? গানে কথায় যে তাঁরই সুর পৌঁচচ্ছে, মিলছে এসে যারা আছি তাদের সুরে, উথলে চলেছে অফুরন্ত প্রাণের ধারা। হায়, তোমাদের যে সান্ত্বনা দেব সেই আমিও ত কাঁদি, ভাষা খুঁজে পাই নে তোমাদের শান্ত করবার। কাজে মন দাও, কাজে মন বসাও। এই করতে করতে পেয়ে যাবে মনের বল।

তাই তোমাদের বলি "কাজ করে চল, রথীকেও বলি কর্মকর্তা ভাই, কাজের মধ্যে ডুব দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এই আমবাগান এই আলোছায়ায় আমাদের মাঝে বসে যিনি আজ আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন - তাঁর প্রতিটি কথায় যে তাঁরই কান্নার সুর ভেসে এসে আমাদের সুরে মিলিত হ'ল। সবার প্রাণ একই ব্যথায় কেঁদে উঠল। আম-বাগান থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যেটা অবনীন্দ্রনাথ "ফাল্গুনী"র রিহার্সেল দেখে কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন তিনি সকালে কলাভবনে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন—আর্ট সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হ'ল। বাড়ি ফিরবার পথে শুনলেন তখন মাত্র ৯॥টা। বললেন—এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি করব? তার চেয়ে ছোট ছেলেদের নিয়ে একটু গল্প করিগে চল। আশ্রমের ভিতরে গাছতলায় যেখানে ক্লাস বসেছে তার ভিতর দিয়ে

* শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চলতে লাগলেন। ক্লাসের সামনে যেতেই ছেলেরা লাফিয়ে উঠে বললে—"ছুটি আমাদের, গল্প শুনব।" অবনীন্দ্রনাথ পণ্ডিতমশায়ের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন—"কি বলেন পণ্ডিতমশায়?" পণ্ডিতমশায় বললেন—আচ্ছা। অবনীন্দ্রনাথ আবার ছেলেদের দিকে ঘাড় নেড়ে চোখ টিপে বললেন—"তবে আচ্ছা।" ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ ক'রে বইখাতা হাতে নিয়ে আসন পিঠে ফেলে চলল অবনীন্দ্রনাথের পিছু পিছু। আর অবনীন্দ্রনাথও ক্লাসের পর ক্লাস ছেলেমেয়েদের চোখ টিপে টিপে ছুটি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। আগে আগে চলেছেন অবনীন্দ্রনাথ লাঠি হাতে—পিছনে চলেছে ছোট ছেলেমেয়েদের মস্ত একটি দল কলরব করতে করতে। দেখে মনে হচ্ছিল—এই ত এইখানেই ত আশ্রমের প্রাণ।

অবনীন্দ্রনাথ আমবাগানের ছায়াতে গিয়ে বসলেন দলটি নিয়ে। তাদের দুয়োরাণীর রাজপুত্তুরের গল্প শোনালেন। সে রাজপুত্তুর একেবারে নতুন, সেই মুহূর্ত্তেরই সৃষ্টি। সে সৃষ্টির কৌশল বড়দের অভিভূত করে, ছোটদের ভোলায়। মুখে যে-যে কথা বেরিয়ে পড়ছে সেই কথাকে ধরে ধরে গল্প তৈরি হয়ে যাচ্ছে—রাজপুত্তুরের কাঠের গরুর শিং ভেঙে গিয়ে মরুভূমিতে এসে সে হঠাৎ উট হয়ে গেল। রাজপুত্তুর চলে দিনের পর দিন সেই উটের পিঠে মরুভূমির উপর দিয়ে—মাঝে মাঝে উটের গায়ে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘুণ-পোকা মারে। উট চলেছে খটখট খটখট, হেলছে দুলছে, দোলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলা এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, আবার ওদিকে থেকে এদিকে আসছে। এ জিনিস শুধু কানে শুনি না—চোখে দেখি অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলার ভঙ্গী'ত।

বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে "মৃন্ময়ী"র চাতালে এসে বসলেন। সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। সামনে "শ্যামলী"র উপর তারই আভাস এসে পড়েছে। পশ্চিমমুখো বসে তিনি এক বার শ্যামলীর দিকে তাকাচ্ছেন, এক বার আকাশের দিকে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে একে একে গান গেয়ে শোনালো, মাঝে মাঝে তিনিও এ গান ও গানের ফরমাশ করলেন। গানের ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠছিলেন —এই তো, এই কথাই তো আমার মনে হচ্ছিল সকাল থেকে, 'মন রয়না রয়না ঘরে' 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী', কী আশ্চর্য্য এই সব সুর, এই সব কথা। তোরা গেয়ে চল রবিকাকার গান তবে বুঝবি গানের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সব ভাব তিনি সুরে সুরে ধরে দিয়ে গেছেন। তাঁর গানের কথায় সুরে জড়িয়ে পাবি তাঁকে অমৃতরূপে। তাঁর গীতের মধ্যে তিনি পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। তাঁর গানই তোদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখবে। সব যাবে কিন্তু তাঁর গান যাবে না কোন দিন। শোন্, এখানে রোজ তোরা মনের আনন্দে তাঁর গান করিস শ্যামলীর দিকে চেয়ে। সেখানে পৌছবে ধ্বনি, দেখবি মনে শান্তি পাবি। "একটুকু ছোঁয়া লাগে" সেই গানটি গা তো একবার।"

গল্প শোনার লোভে সন্ধ্যেতে ছেলেমেয়েরা আবার অবনীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গেল। শিশুবিভাগের সামনে খোলা আকাশের নীচে—ফুলভরা শালগাছের তলায় গল্পের আসর জমল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রার খাতা থেকে গল্প পড়ে শোনালেন। তার পর দিন সকালে কোনার্কের পশ্চিমের ছোট্ট বারান্দাটিতে বসে অবনীন্দ্রনাথ নন্দদা ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে আর্ট ও শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক আলাপ করলেন। নন্দদার শিল্প সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন—সকালটা এই সব আলাপে আলোচনায় খুব জমেছিল।

দুপুরে ঘরে বসে কলাভবনের ছেলেমেয়েদের কাজ দেখলেন। রাশীকৃত অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তাঁর চার দিকে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল।

এক এক ক'রে সবার খাতাতেই কিছু আঁকলেন কিছু লিখলেন—যা বাকি রইল কালকের জন্য রেখে দিলেন।

সন্ধ্যে ৬৷৷টায় উদয়নের সামনের বারান্দায় ফাল্গুনী অভিনয় হ'ল। বহুকাল বাদে এই ধরণের জমাট অভিনয় কি গানে, কি কথায়, নাচে, কি ছেলে বুড়ো, প্রবীণ নবীনে মিলে—এক অভিনয়ে সব কিছুর সমাবেশ—বড় ভাল লাগল সবারই। অভিনয় দেখতে দেখতে অবনীন্দ্রনাথের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল গানের তালে শরীর দুলছিল। শেষ গান হ'ল—

আয় রে তবে মাত্‌রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন পানের বাঁধন হ'তে
চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

সে গানের সঙ্গে ছেলেবুড়ো মিলে সে কি হুল্লোড় নাচ। অবনীন্দ্রনাথেরও সমস্ত শরীর-মন যেন সে তালে, সে সুরে দোলা দিচ্ছিল। গানের শেষ কয়টা লাইন গেয়ে গেয়ে যখন সবাই নাচতে লাগলো—

অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কি রে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে,
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে—
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

অবনীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না—বাসন্তী রঙের চাদর মাটিতে লোটাতে লোটাতে ষ্টেজের দিকে ছুটে চললেন, সে নাচে তিনিও যোগ দিবেন। ষ্টেজের কাছে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন এমন সময় ষ্টেজের বাতি নিবে গেল, অভিনয় শেষ হ'ল। উচ্ছ্বাসের হৈ হৈ রবে তাতে বাধা পড়ল; সে জিনিস আর দেখতে পেলুম না—দুঃখ থেকে গেল।

পর দিন সকালে অবনীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে গেলেন। পাকুড়তলায় শ্রীনিকেতনের শিক্ষক, কর্মী, শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাচর্চার ছেলেরা সবাই তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করলেন। চাষবাসের কথা হ'তে অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের পুরাণের একটা চাষের গল্প বললেন। শিব এক বার পার্বতীর তাড়নায় মর্ত্যে নামলেন চাষ করতে। সমস্ত পৃথিবী চষে ফলে ফসলে ভরিয়ে দিলেন। ক্ষ্যাপা শিবের আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, দিনের পর দিন চষেই চলেছেন। শেষে অনেক কষ্টে পার্বতী আবার তাঁকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সেই অবধি পার্বতীর সংসারে আর দুঃখ নেই—শিবকে আর রোজ ভিক্ষেয় বের হ'তে হয় না। মর্ত্যলোক থেকে সেরা ফসল পার্বতীর সংসারে পাঠান হয়।

গল্পের শেষে তিনি বললেন—"যেমন তেমন ক'রে চাষ করলেই হবে না। মনে রেখ এ ফসল পার্বতীর সংসারে যাবে। সেরা ফসল ফলাতে হবে তোমাদের।" পাকুড়তলা থেকে শ্রীনিকেতনের সব ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে ঘুরে তিনি দেখলেন। বড়বাড়ির তেতলায়ও গেলেন একবার। তেতলার ঘরখানায় গুরুদেব মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। ঐ ঘরখানা থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। কখন কখন জায়গা বদলের শখ হ'লে গুরুদেব তেতলায় উঠে যেতেন। যত দিন ভাল লাগত থাকতেন আবার শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন। সে ঘরখানি তেমনিই সাজান আছে। অবনীন্দ্রনাথ সে-ঘরে বসে খানিক ক্ষণ কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। দুপুর থেকে আবার অটোগ্রাফ খাতার ভিড়। অটোগ্রাফের মালিকদের যত না ভিড়, তার চেয়ে দর্শকবৃন্দের ভিড় বেশী। বড় মজা লাগে ওঁর অটোগ্রাফে ছবি আঁকা ও লেখা দেখতে। চটপট কবিতা লিখে দিচ্ছেন ছবির সঙ্গে

ছাত্রদের ছায়ার খেলা প্রদর্শনে অবনীন্দ্রনাথ

মিলিয়ে মিলিয়ে। সে যে কত মজার মজার ছবি কবিতা।

বিকেলে কলাভবনের মাটির বাড়িগুলির সামনে ছাতিম গাছতলায় কলাভবনের ও সঙ্গীত-ভবনের ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসল, তিনি গান ও ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন—গল্পচ্ছলে অনেক উপমা-উপদেশ দিলেন।

সন্ধ্যে হয়ে এল—আদ্য বিভাগের সাহিত্যসভায় সভাপতি হবেন কথা দিয়েছিলেন। তাদের দল এসে তাঁকে নিয়ে গেল। লাইব্রেরির সামনে সভা হবে। বারান্দায় আলপনা দিয়ে পলাশ-শাল-ফুল ঘড়ায় সাজিয়ে ধুপ ধুনো জ্বালিয়ে সভাপতির বসবার জায়গাটি পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে।

সভাপতিকে মালা-চন্দন পরিয়ে সভার কাজ শুরু হ'ল। দু-একটি গান গেয়ে, কবিতা প্রবন্ধ পড়ে কোন রকমে সাহিত্য-সভার কাজ সেরে সবাই আব্দার করলে 'এবারে আপনার গল্প শুনব।'

অবনীন্দ্রনাথ বললেন। এ ত বেশ মজা, আমাকে গল্প শোনাতে নিয়ে এসে এখন বল কিনা গল্প। তা কি গল্প শুনবে?

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ভূতের গল্প শুনব।

'আচ্ছা বেশ, শোন তবে।' ব'লে তিনি ভূতের গল্প বলতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুঁহুরী ভূতের সৃষ্টি হয়ে

আশ্রমের আমবাগানে ছেলেমেয়েদের গল্পসভায় কথক অবনীন্দ্রনাথ

"রাণী, কি করি এখন।
ন যযৌ ন তস্থৌ
করে মন,
পা চলে ত মন সরে না
চলতে গিয়ে
যাই বলতে অক্ষম।

চল—যাবার আগে 'শ্যামলী'র আশপাশটা আর একবার ঘুরে আসি।"

নিজের মনেও কেমন একটা দুঃখ বাজছে। আর কতটুকু সময়ই বা ওঁকে এখানে পাব। এ কয় দিন যখন যেখানে গেছেন, বসেছেন, এমন কি চলতে চলতে ও কথায়, গানে, হাসিতে, গল্পেতে চারদিক মাত ক'রে রেখে ছিলেন—আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিয়েছেন। সে আনন্দে তিনি নিজেও ডুবে গিয়েছিলেন। বললেন—"কেন যেচে দুঃখ নিলে, আমাকেও দিলে। এ আনন্দমেলা থেকে গিয়ে থাকব কি করে?"

বিদায়ের আগে লাইব্রেরির সামনে আশ্রমের সবাই একত্রিত হয়ে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাইলে। সে গানের সময় অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল—আশ্রম ছেড়ে যেতে তাঁর কতখানি লাগছে।

গান শেষ হ'লে হেসে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'আমাদের শান্তিনিকেতন' কেন বললে? শান্তি-নিকেতন বুঝি কেবল তোমাদেরই; আমার বুঝি নয়? জান, এ আশ্রমের কাঁচা আম আমি প্রথম খেয়েছি—তখন তোমরা কোথায়? আজ আমাকে বাদ দিয়ে আমার সামনেই তোমরা গাইছ, আমাদের শান্তিনিকেতন। তা হবে না, একসঙ্গে এক সুরে আমরা সবাই গাইব—'আমাদের শান্তিনিকেতন' বলে ছল ছল চোখে হাসিভরা মুখে মোটরে উঠলেন।

ষ্টেশনে ট্রেনে তাঁকে তুলে দিয়ে আশ্রমে ফিরে এলুম। মনে হ'ল হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া চারদিকের ফুল পাতা ঘাস আনাচে কানাচে যেখানে যা ছিল সবকিছুকে যেন নাড়া দিয়ে গেল।

গেল। এই এখানেই নাকি সেই ভূতের সঙ্গে গত রাতে তাঁর আলাপ। মাঝরাতে মশারি তুলে ভুঁষুরী এসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে—শুধু তাই নয়—আবার ভনস্পতি গাছের তলায় যে ডোবা আছে সেখানে তাঁকে একটা বিচারের জন্য নিয়ে যাবে জেদ ধরলে।

এর পরের বারে যখন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে তখন হয়ত বিচারের বিষয় ও ফলাফলটা জানতে পারব।

সে রাতে বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ অবধি তাঁর সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে গল্প করলুম। মনটা বড় খারাপ লাগছে। কাল সকালের গাড়িতেই উনি কলকাতা ফিরে যাবেন। আবার কবে ওঁকে আমাদের মাঝে এমনি ক'রে পাব কে জানে। দেখতে দেখতে চারদিন কেটে গেল কোথা দিয়ে সময় গেল টেরও পেলুম না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে ওঁর কাছে গেলুম। এ কয় দিন ভোরে উঠেই উনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। এক এক দিন অন্ধকার থাকতে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সেদিনও ভাবলুম বুঝি বা এ জায়গা সে জায়গা খুঁজে ওঁকে বের করতে হবে। 'উদয়নে' গিয়ে দেখি তিনি সামনের পূবের বারান্দায় পূবমুখো হয়ে একটি চেয়ারে বসে আছেন। আজ আর কোথায়ও বের হন নি—পূবের আকাশে একটু একটু ক'রে আলো দেখা দিচ্ছে। কাছে গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই তিনি হাঁটুর উপর এলান হাত দুখানা উল্টে করুণ হাস হেসে বললেন—

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১১

পরদিন দুপুর বেলার কথা। অনিল আপিস গেছে। অম্বুরী খাওয়াদাওয়া সারিয়া খুকীকে লইয়া পাড়ায় কাহার বাড়ি বেড়াইতে গেল। অম্বুরীর পুত্র একে বীর তায় টাটকা কথকতা শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আমার মত আদর্শ শ্রোতা পাইয়াছে, জাপানী ভাঙা বন্দুকটা লইয়া হাত পা নাড়িয়া আস্ফালন করিতেছে—"এবার যখন রাবণরাজা সীটাকে ঢরটে আসবে শৈলটাকা, আমি এই বণ্ডুক নিয়ে যাব, ডশটা মুণ্ডু হওয়া বের ক'রে ডোব। টুমি এই ভাঙাটা সেরে ডিয়োটো শৈলটাকা।"

বলিলাম, "তার চেয়ে একটা নতুন কিনে দিলে কেমন হয়?"

সানু উল্লসিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় বাইরের রকে আওয়াজ শোনা গেল—"বৌ আছিস?" এবং সঙ্গে সঙ্গে সদু আসিয়া প্রবেশ করিল।

জানা থাকিলেও যেন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখিয়া অন্তরে অন্তরে চমকিয়া উঠিলাম। সিন্দুরহীন সীমন্ত, অধরে তাম্বুলরাগ নাই, বস্ত্রে পাড়ের স্নিগ্ধতা নাই, পায়ে আলতার চিহ্ন মাত্র নাই;—একটা অশুভ শুভ্রতায় সদু আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। হঠাৎ যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম—কী রিক্ততাই আসিয়াছে ওর জীবনে!

ঐ প্রথমে কথা কহিল, "শৈলদা? করে এলে?"

স্বপ্নোত্থিতের মত খানিকটা আবিষ্টভাবেই বলিলাম, "এই যে সদু,—আমি কাল—হাঁ, ঠিক ত—কালই সন্ধ্যেয় এসেছি।"

"ভাল আছ ত"—বলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে হুঁস হইয়াছে।

সদু বলিল, "বৌ কোথায় গেল? তার কাছে এসেছিলাম, একটু দরকার ছিল।"

"ও!"—বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ভুলটা সংশোধন করিল সানু, বলিল—"মা? মা বেড়াটে গেছে। রাবণের গপ্প শুনবে সড়ু পিসীমা?—টা হ'লে শৈলটাকার কাছে ব'স।"

সদু আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "না, রাবণের গল্প শুনলে চলবে না আমার, তোমার শৈলটাকাকে শোনাও।"

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, সদুকে আটকান দরকার। সানুকে বলিলাম, "তুমি আরম্ভ ত ক'রে দাও, একবার শুনলে কি যেতে পারবে তোমার পিসীমা?"

সদু হাসিয়া বলিল, "না আরম্ভ ক'রে কাজ নেই সানু, শুনলে শেষকালে আবার যেতে পারব না! আমার কাজ আছে; অন্য দিন শুনব তখন।"

আমায় প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন থাকবে শৈলদা?"

বলিলাম, "না, আজই যাব।"

তাহার পর কথাটা আরম্ভ করিবার একটা সুবিধা পাইয়া বলিলাম, "ভয়ঙ্কর দরকারী একটা কাজ আছে ব'লে অনিল ডেকে এনেছে।"—বলিয়া স্থির দৃষ্টিতে সদুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সদু ক্ষণমাত্রও বিচলিত বা অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "ভয়ঙ্কর কি এমন কাজ? আমি ত জানি সেইখানেই তুমি এমন ভয়ঙ্কর কাজে থাক যে নড়বার ফুরসৎ থাকে না, দুনিয়ায় কি হ'ল না হ'ল খোঁজ রাখতে পার না।···মুকুলে কি হবে?—আমি বৌয়ের কাছে সব শুনেছি"—বলিয়া সে-ই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। আমায় চক্ষু নামাইতে হইল। যখন তুলিলাম তখন আমার চোখে জল ভরিয়া গেছে। বলিলাম, "সদু, মাফ কর আমায়! আমি খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্যিই খোঁজ নেওয়া যাকে বলে তা হ'য়ে ওঠে নি এখন পর্যন্ত। আর এ অপরাধের জবাবদিহিও নেই কোন আমার কাছে।"

সদু বারান্দার দরজায় পিঠ দিয়া, দুইটা হাত দুয়ারের মাথার উপর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "দেখ কাণ্ড! বেটাছেলের চোখে জল!··· কি এমন হয়েছে আমার যে···"

আর অগ্রসর হইতে পারিল না; তাড়াতাড়ি হাত দুইটা নামাইয়া দুই হাতে আঁচলটা ধরিয়া মুখখানা ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চাপা, নীরব কান্না, সামলাইতে পারিতেছে না, ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, সমস্ত শরীরটা এক-একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, অঞ্চলের আগল ঠেলিয়া রুদ্ধ স্বর এক-একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

কিছু বলিলাম না। একটু কাঁদুক। সমস্ত পৃথিবীতে ওর কাঁদিবার জায়গা মাত্র দুইটি,—এক অনিলের আর এক আমার সামনে। এত বড় কথাটা ভুলিয়াছিলাম কি করিয়া? কাঁদুক, বুকে যে-পাষাণভার রহিয়াছে, অশ্রু-স্রোতে তাহার একটুও যদি ক্ষয় করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে।

সদু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আঁচলটা সরাইয়া লইল; দোরে ঠেস দিয়া মুখটা বাহিরের দিকে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক-একবার সমস্ত শরীরটা সঘন বিক্ষোভে কাঁপিয়া উঠিতেছে। সদু শোকের উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে; যাইতেও পা উঠিতেছে না।

সান্থ হতভম্ব হইয়া মুখ নীচু করিয়া ভাঙা বন্দুকটা নাড়াচাড়া করিতেছে, এক-একবার চক্ষুপল্লব তুলিয়া আমাকে আর সদুকে দেখিয়া লইতেছে।

একটু পরে একবার কোন রকমে আমার মুখের পানে চাহিয়া সদু বলিল, "এখন যাই শৈলদা।"

পা বাড়াইতে আমি বলিলাম, "একটু দাঁড়াও সদু।"

মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দু-জনে, তাহার পরে আমি বলিলাম, "অনিলের কাছে সব শুনলাম সদু,—তুমি এখানে আসবে। শুনে……"

সদু বাধা দিয়া বলিল, "না, আসছি না শৈলদা, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম বৌকে।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "আসছ না!—কেন?"

সৌদামিনীর মুখটা যেন একটা মাত্র ভাব-ফোটান পাথরের মূর্তির মত কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন আসব শৈলদা? আমার দুঃখে অনিলদা 'আহা' ব'লতে গেছেন ব'লে এই প্রতিদান দোব আমি? ওঁর সর্বনাশ করব, ওঁর স্ত্রীর সর্বনাশ করব, ওঁর সন্তানদের কপালে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে বংশটাকে চিরকালের জন্য দাগী ক'রে দোব? আমি যে এক সময় এটা ভাবতে পেরেছিলাম কি ক'রে, অনিলদার কথায় কি ক'রে 'হাঁ' বলতে পারলাম, তাই ভেবে সারা হচ্ছি। আমার দোষ নেই শৈলদা, আমি অনিলদা'কে বলেইছিলাম আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে কাজ করবার, ভেবে কথা বলবার শক্তি আমি হারিয়েছি।…কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ফেরবার পর আমি স্থির মনে কথাটা ভেবে দেখেছি; যতই ভেবেছি ততই আশ্চর্য হয়েছি—ওঁর এত বড় সর্বনাশ আমি কি ক'রে করতে যাচ্ছিলাম। আমি তাই ছুটে এসেছি এই অসময়ে, যতক্ষণ না বৌকে বলতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে একটু শান্তি নেই শৈলদা। বৌ জানে কথাটা, দু-জনে মিলে আমায় দিয়ে এই পাপটা করাতে বসেছিল। আশ্চর্য!—ওদের দু-জনকে কি এক ধাতুতে গড়েছিলেন বিধাতা? বৌ মেয়েছেলে, একটু পরামর্শ দিতে পারলে না অনিলদা'কে? আর কিছু না হোক নিজের স্বার্থটাও ত দেখা উচিত ছিল! বুঝলাম, ও নিজের স্বামীকে খুব ভাল ক'রে চেনে, জানে সেদিক দিয়ে ভয় নেই ওর, কিন্তু স্ত্রীর ঈর্ষা ব'লে ত একটা জিনিস থাকতে হয়? ওর তাও নেই?—ও একেবারে সব ধুয়ে মুছে ব'সে আছে?"

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "বেশ, এলে না, তার পর?"

সদু বলিল, "এর আর তার পর নেই শৈলদা। না-আসা মানে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া। ভেবে দেখলাম সেইটেই মানুষের স্বধর্ম;—এই নিজের অদৃষ্টকে চিনে তাকে মেনে নেওয়া। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার জীবনের গতি কোন্ দিকে। যার এই রকম বিয়ে, এই রকম ভাবে বিধবা হওয়া, এই রকম ভাবে চিরজন্ম এমন একজনের অন্নদাসী হয়ে থাকা যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই—তাকে যে ভগবান্ কিসের জন্যে সৃষ্টি করেছেন সে তো স্পষ্ট। ভাগবত-কাকা সময় সময় আমায় গীতা, ভাগবত—এই সব থেকে শ্লোক তুলে শোনান—হাঁ, ঠিক কথা, মন্ত্রও দিয়েছেন আমায়।—তুমি আশ্চর্য হচ্ছ?—বলিদানের পাঁঠার কানে পুরুত মন্ত্র দিয়ে দেয় না? তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শ্লোক হচ্ছে—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। আজ সাত-আট বছর ধ'রে এই মারাত্মক শ্লোকটার বিরুদ্ধে লড়েছি শৈলদা, কিন্তু আর না, এবার হৃষীকেশ আর তাঁর ভক্তেরই শরণ নোব ঠিক করেছি। ভেবে দেখলাম অনিলদার মত মানুষকে ধ্বংস করার চেয়ে সে ঢের ভাল। কেননা এই আমার স্বধর্ম, আর গীতা বোধ হয় একেই স্বধর্মে নিধন শ্রেয় ব'লে প্রশংসা করেছেন। সত্যিই ত,—সব রকমে মরাই যদি আমার স্বধর্ম হয় ত আমিই মরব,—একজন; অনিলদা মরবে কেন? বৌ মরবে কেন, আর সবচেয়ে—ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশু—ও কি করেছে যে…"

সদু আর পারিল না। মুখটা বাহিরের দিকে ঘুরাইয়া

লইল। দেখিতেছি কান্না চাপিবার জন্য নীচের ঠোঁটটাকে এক-একবার নিষ্ঠুরভাবে কামড়াইয়া ধরিতেছে। আর পারিল না;—অস্বস্তির মাঝে পড়িয়া সান্থু চোরের মত নামিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদ্বেলিত কান্নার মাঝে বলিয়া উঠিল, "আমার কি দশা হবে সান্থু?···ওঃ, বাবা গো, আর সহ্য হয় না কষ্ট···"

সান্থুকে বুকে চাপিয়া কপালটা কপাটে লাগাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে এক অসহ্য দৃশ্য,—পাষাণও বোধ হয় গলিয়া যায়। আমার সমস্ত শরীর-মন চাপিয়া যেন একটা জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে। এমন একটা সর্বব্যাপী বিরাট্ দুঃখের উচ্ছ্বাস যাহা আর সব থেকেই যেন আমায় বহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে,—ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র ভালবাসা, ক্ষুদ্র বিচার-কল্পনা সব থেকেই। আমি আর থাকিতে পারিলাম না; উঠিয়া গিয়া সদুর পাশে দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিলাম, "অত নিরাশ হ'য়ো না সদু, আরও একটা উপায় আছে।"

কোন উত্তর হইল না, সহানুভূতির কথায় কান্নাটা শুধু আরও বাড়িয়া গেল।

একটু চুপ করিয়া আবার বলিলাম, "আরও একটা উপায় আছে সদু, একেবারেই উপায়হীন করেন না ভগবান্।"

সৌদামিনী ধীরে ধীরে মুখটা তুলিতে যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া নামাইয়া লইল, প্রশ্ন করিল, "কি?"

কি ভাবে যে বলিব কথাটা প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না; তাহার পর নিজের মনটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "তোমায় আর আমায় নিয়ে কথা সদু, অবশ্য ধর্ম থাকবেন মাঝখানে।"

সদু কোন উত্তর দিল না। সান্থুকে বুকে লইয়া, কপাট-লগ্ন করতলে কপাল দিয়া তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না; শুধু একটু পরে বুঝিতে পারিলাম অশ্রুধারা আরও যেন প্রবলতর হইয়া নামিয়াছে।

বলিলাম, "থাক্ সদু, ভেবে দেখ, তোমার উত্তরের জন্যে না হয় আর একদিন আসব শীগ্‌গির।"

আর একটা দিন থাকিয়া গেলাম। পরদিন অনিল আহার করিয়া আপিসে বাহির হইয়া গেলে, অম্বুরী আমার সামনে আসিয়া জানালার খিলানের নীচে বসিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সব শুনেছ ত ঠাকুরপো?—কি হবে?"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চেহারাটা হইয়া পড়িল ভীত-ত্রস্ত হরিণীর মত। বুঝিলাম এই ওর এখনকার আসল চেহারা, যদিও অনিলের যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও ছিল সেই চিরকালের হাস্যমুখরা অম্বুরী। এই এক নারী যে উদয়াস্ত অভিনয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। আমি জানি অম্বুরীর এ কাজ নয়, এত বড় স্বার্থত্যাগ ওর দ্বারা সম্ভব নয়। যে একটা বড় স্বার্থত্যাগ করিবে তাহার তেমনই বড় একটা পৃথক্ সত্তা থাকা দরকার। সে সত্তা অম্বুরীর কোথায়?

একটা উপায় ঠাহর করিয়াছি বলিয়াই একটা পরিহাস করিলাম, বলিলাম, "বাঃ, এই শুনলাম তুমি নিজেই একটি সতীনের জন্যে······"

অম্বুরী অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা রাখো, ঠাট্টার ঢের সময় আছে ঠাকুরপো। ওঁকে যদি বাঁচাতে না পার ত সদু-ঠাকুরঝি যে-পথ ধ'রেছিল আমিও সেই পথ ধরব। ঠিক ক'রে রেখেছি আমি······"

অম্বুরীর চেহারা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলাম। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলাম, "বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অম্বুরী। তাহলে তুমি রাজি হ'লে কেন সদুকে জায়গা দিতে?"

অম্বুরী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, বলিল, "কিছু শুনব না, ওঁকে বাঁচাও, নইলে ঐ কথা;—অম্বুরীকে তোমরা আর বেশী দিন পাবে না।

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। অম্বুরীর রাজি হওয়ার অন্তরালে এই সঙ্কল্প! আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "উপায় একটা ঠাওরেছি অম্বুরী।"

অম্বুরী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কি, বল।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "ও, বুঝেছি, উনি বলে-ছিলেন বটে একবার।"

তাহার পর আমার উপর স্থির ভাবে চাহিয়া বলিল, "না, সেও হবে না; বংশে একটা দাগ লাগাবে ওর জন্যে?"

ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম, "তাহলে সৌদামিনী যায় কোথায়?"

অম্বুরী দৃঢ় অথচ অনায়াসকণ্ঠে বলিল, "ঢের পথ আছে; একবার ফিরে আসতে হয়েছে ব'লে বার-বারই কিছু ফিরতে হবে না।"

অম্বুরীর উপর রাগ করিতে পারিলাম না। সংস্কারের ভেলা বাঙালী ঘরের আদর্শ গৃহস্থ বধূ,—কিন্তু সেই সংস্কার এক দিকে যেমন ওর অন্তরে স্বর্গের অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, অন্য দিকে দুর্বলও ত করিয়াছে তেমনই?

জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা অম্বুরীর মত মেয়েই পারে

দিতে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অম্বুরী শৃঙ্খল, ওর কাছে কর্মের মুক্তি নাই, এমন কি চিন্তারও মুক্তি নাই।

১২

আমি আর একটা দিন যে থাকিয়া গেলাম সে এক প্রকার আলস্যভরেই এবং অন্যায় ভাবেও,—কেননা তরু রহিয়াছে, আর আমারই উপর এখন তাহার সম্পূর্ণ ভার।

শরীর-মন কি রকম এলাইয়া পড়িয়াছে, কলিকাতার কোন আকর্ষণ অনুভব করিতেছি না। নিছক কর্তব্য-জ্ঞানই সব সময় জীবনকে সচল করিতে পারে না, আরও কিছু চাই।

পরদিন একটা সুযোগে অনিলকে সব কথা বলিলাম, অবশ্য অম্বুরীর কথাটা বাদ দিয়া। অনিল প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না, ক্রমে তাহার মুখটা ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওর স্বভাবের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই বড় একটা, শান্তকণ্ঠেই বলিল, "তুই যে কি স্বার্থত্যাগ করলি, যার জন্যে করা সেও বোধ হয় কখনও জানতে পারবে না, তবু পৃথিবীতে অন্তত একজনের জানা রইল, আর জানলেন ভগবান্। লোকে যে কথা যত কম জানতে পারে তাঁর কাছে সেকথা তত বেশী ক'রে পৌছায় শৈল।"

জীবনে এক-একটা কেমন অদ্ভুত ঘটনাসাদৃশ্য আসে!—চারি-দিন পূর্বে কলিকাতা-অভিমুখী গাড়ীতে বসিয়া আমি যে-ধরণের চিন্তা করিতেছিলাম, চার দিন পরে কলিকাতা-অভিমুখী একখানি গাড়ীতেই, সন্ধ্যায়ই, আবার সেই ধরণের চিন্তা। কিন্তু দুই দিনের চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে যেটুকু পার্থক্য সেইটেই বেশী অদ্ভুত। সেই দিন ছিল মীরা, আর আজ, এই চারি দিনের ব্যবধানেই তাহার জায়গা লইয়াছে সৌদামিনী। সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মীরার কাছে ক্ষমা চাহিব, আজকের প্রতিজ্ঞা সদুকে উদ্ধার করিতেই হইবে—যাহার অর্থ হয় মীরাকে ভোলা।...মানুষের কত দম্ভের প্রতিজ্ঞা!

বাসায় আসিতেই প্রথমে তরুর সঙ্গে দেখা। আনন্দের চোটে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাষ্টারমশাই, কে আজকে এসেছেন বলুন ত, বুঝব বাহাদুর।"

বাহিরের কাহারও এখানে আসা-যাওয়া খুবই কম, বিশেষ করিয়া আজকাল, যখন অপর্ণা দেবী, মীরা, কেহই নাই। আন্দাজ করিতেছিলাম, তরুর আর ধৈর্য রহিল না, বলিল, "মা, দিদি!—একটুও ভাবতে পেরেছিলেন এত শীগ্‌গির আসবেন? সকালে উঠে পাঠশালায় বেরুব, হঠাৎ ট্যাক্সিতে ক'রে মা, দিদি, রাজু, মদন! ছুটে গিয়ে বাবাকে..."

কথার মধ্যেই আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তরু থামিয়া গেল। আমারও হুঁস হইল, তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হঠাৎ যে চলে এলেন! শরীর ভাল আছে ত তরু?"

তরু আশ্বস্ত হইল, বলিল, "শরীরে কি হবে?—এই ত, পরশু আমরা এলাম; মা বললেন তুই চ'লে আসতে একেবারে মন টেকছিল না তরু, তাই..."

আমি প্রশ্ন করিলাম, "আর তোমার দিদি,—তিনি কি বললেন?"

তরু বলিল, "অত জিগ্যেস ক'রতে যাই নি আমি। এলেন চ'লে, কেমন আমোদ হবে তা নয়, কেন এলে, কি করতে এলে—এই ক'রে তাঁকে উস্তমফুস্তম ক'রে তাড়াই,—মাষ্টারমশাই যেন কি!"

রাগের ভান করিতে গিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল।

মীরার সঙ্গে দেখা হইল। এই দুইটি দিনে কত পরিবর্তন! মীরা রাঁচিতে স্বাস্থ্যের যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল সব যেন দিয়া আসিয়াছে, বরং তাহার পূর্ব স্বাস্থ্য থেকে কিছু লইয়া। মুখে একটা আকুল, সশঙ্ক ভাব, খুব চাপা মেয়ে, তবু সেটা খুব প্রকট। নিজেই বলিল, "চ'লে এলাম। তরু চ'লে আসতে বাড়িটা যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল; এমন জানলে তরুকে আসতে দিতাম না।"

মুখের ভাবটা একটু অপ্রতিভ; বক্তা আর শ্রোতা দু-জনেই যখন ভিতরে ভিতরে জানে যে একটা মিথ্যা কথা বলা হইতেছে, সেই সময় বক্তার মুখের ভাবটা যেমন হয় আর কি।

মানানসই কিছু মুখে জোগাইল না, বলিলাম, "একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যেন।"

"তা গেল।"—বলিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মীরা চলিয়া গেল।

যা হউক প্রথম দেখা হওয়ার সঙ্কোচটা কাটিল এক রকম করিয়া।

কিন্তু তাহার পর দিন-দিনই জীবন হইয়া উঠিতে লাগিল দুর্বহ। সমস্তই রাখিতে হইতেছে,—মেলামেশা, হাসি-আলাপ, কিন্তু প্রাণহীন পরিশ্রম যেন একটা, যেন

তীব্র স্রোত আর প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে গুণ টানিয়া একটা নৌকা বাহিয়া চলিয়াছি। মীরার মুখেও সেই ক্লান্তি আর অবসাদ।

তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছি, বরং অনুভব করিতেছি বলা চলে, কেননা মীরা যাহা ভাবে তাহা লক্ষ্যের বাহিরে রাখে ;—অনুভব করিতেছি মীরা কিছু যেন বলিতে চায়। সুবিধা খুঁজিতেছে, কিন্তু চায় এবার সুবিধাটা আমি সৃষ্টি করি, অর্থাৎ আমি একটু অগ্রসর হই, তাহা হইলে মীরা বলিবে কিছু।

কিন্তু আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বেশ বুঝিতেছি দুই জনের মধ্যেই একটা ভ্রান্তি আছে কোথাও, দুইটা কথাতেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তবুও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সৌদামিনী হইয়াছে বাধা, আমার পায়ের নিগড়।

ভাবি—কর্তব্যের গুরুভার লইয়াছি মাথায় তুলিয়া ; আমার জীবনে প্রেমের হইয়াছে অবসান। যাহাকে বিদায় দিলাম আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া বিড়ম্বিত করি কেন ?

শুধু এইটুকুই নয়। আমার ক্ষুণ্ণ আত্মাভিমানও বিদ্রোহী হইয়া উঠে এক একবার। ভাবি, আমার ত সবই আছে, মীরার স্বয়ংবর-সভায় নিজেকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, মাত্র অর্থে আমি বড় নই এই অপরাধে মীরার ভালবাসাও শুদ্ধভাবে আমায় স্পর্শ করিবে না ?—তাহাতে থাকিবে ঘৃণার খাদ মেশান ?—সমাজে সে আমায় লইয়া পড়িবে লজ্জায় ?

তাহার চেয়ে আসুক সৌদামিনী। ও আমায় ভালবাসিবে ভালবাসার পূর্ণ নির্মলতায়, যেমন অম্বুরী ভালবাসে অনিলকে—একেবারে আত্মবিলোপে। হয়ত ওকে আমিও একদিন প্রতিদান দিতে পারিব ; আজ যাহা মাত্র করুণার আকারে দেখা দিয়াছে, আজ যেটাকে বলিতেছি সহানুভূতি, কাল তাহাই বোধ হয় অনাবিল প্রেম হইয়া ফুটিয়া উঠিবে,—কে জানে ? কতটুকুই বা তফাৎ এ-দুয়ের মধ্যে ?...সত্নুর সঙ্গে সাক্ষাতে আরও একটা নূতন জিনিসের সন্ধান পাইলাম, সেটা তাহার শিক্ষার দিক্‌টা। প্রথম সাক্ষাতে সে আত্মগোপন করিয়াছিল। প্রথম বারের কথাবার্তার বাঁধুনি আর এবারের কথাবার্তার বাঁধুনির মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রথম বারের লঘুভাবের কথাবার্তায় আত্মগোপন করিতে পারিয়াছিল, এবারে ভাবের উচ্ছ্বাসে পারে নাই। দেখিলাম ওর বলার ভঙ্গী, ওর ভাব, ওর আদর্শ, সবই উচ্চস্তরের। অনিল বলিয়াছিল সত্নু দুর্লভ নারীরত্ন, গলার হার করিয়া পরিবার জিনিস। তা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

এক এক সময় আবার সমস্ত তর্কবিতর্ক ছিন্ন করিয়া, অন্তরের সমস্তটা পূর্ণ করিয়া দাঁড়ায় মীরা, হৃদয়ের অধীশ্বরীর বেশে। বুঝি একমাত্র ওকেই চাহিয়াছি জীবনে। যেমন প্রীতি দিয়া, তেমনি ঘৃণা দিয়া ও আমার প্রেমকে উদ্রিক্ত করিয়াছে।...বিস্মিত প্রশ্ন হইবে—ঘৃণা আবার ভালবাসা জাগায় ?...হ্যাঁ, নারীর ঘৃণা ভালবাসাই জাগায়, কয়লার তীব্র চাপে মনের খনিতে হীরাই উৎপন্ন হয়। এ তত্ত্ব অবশ্য আপনাদের জানিবার কথা নয়। চরণে সাধ্বী বঙ্গ-ললনার প্রীতি-অর্ঘ্যই পাইয়া আসিয়াছেন বরাবর।... কী অসহ্য অবস্থা !—দেবতার মত সর্বক্ষণ পূজার পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান !—অহরহ সেই একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি শুনিতে থাকা !

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম। হাঁ, মীরা যেন চায় আমি ওকে একটু সুবিধা করিয়া দিই, এক সময় ও যেমন আমায় সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, ডায়মণ্ড হারবার রোডে। আমি একটু সুবিধা করিয়া দিলেই ও যেন আমায় কি বলিবে।

কিন্তু মনে এই নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমি আর সুবিধা দিতেছি না, বরং সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেছি।

এই অবস্থা চলিয়াছে দিনের পর দিন ধরিয়া।

সাঁতরা হইতে আসিবার পরদিন সকালেই অপর্ণা দেবী ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন. "কেমন আছ তাই জিজ্ঞাসা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। রাঁচিতে শেষ দিকটা তোমায় খারাপই দেখলাম কি না। হঠাৎ চলে এলে, কিছু দেখলে না শুনলে না..."

কিছু সন্ধান করিতেছেন এই ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার সেই এক কথা,—নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, "ভাবলাম, মিছিমিছি কলেজের পার্সেণ্টেজটা নষ্ট করব..."

বলিলেন, "হাঁ, সেকথা ঠিকই।" কিন্তু বেশ বুঝিলাম কথাটা বিশ্বাস করিলেন না, অবশ্য আশাও করি নাই যে বিশ্বাস করিবেন।

খানিকটা এদিক-ওদিক কথার পর সহসা প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ, মীরা হঠাৎ চ'লে এল কেন ?—জান তার কারণ ?"

উনি উত্তর চাহেন নাই, আশাও করেন নাই, শুধু

আমার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবার জন্য প্রশ্নটা হঠাৎ করিলেন; করিয়াই নিজে হইতেই বলিলেন, "আর জানবেই বা কোথা থেকে তুমি?"

আমি অস্বস্তির ভাবটা কাটাইবার জন্যই বলিলাম— "আমায় ত ব'ললেন—'তরু চলে আসতে…"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "সে ত আমায়ও ব'লেছিল। …তাই হবে বোধ হয়।"

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

অন্যান্য কিছু কথার পর উঠিয়া আসিলাম। আসিবার সময় একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে গেল।

মিষ্টার রায়ও জানেন। শুধু জানা নয়, তিনি ভাঙাটা জোড়া দেওয়ার জন্যও বোধ হয় সচেষ্ট।

তরু আমায় বলিল, "আপনার বিলেত যাওয়া এক রকম ঠিক মাষ্টারমশাই।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে টের পেলে?"

"বাবা আজ দিদিকে বলছিলেন কিনা, আমিও ছিলাম সেখানে। বলছিলেন, 'এম-এ'টা দিয়ে দিলেই আপনি বিলেত চ'লে যাবেন ব্যারিষ্টারী পড়তে। বললেন— আপনার সঙ্গে নাকি কথাও ঠিক হয়ে গেছে বাবার।"

বুঝিলাম যাহাতে স্থায়ীভাবে একটা বিপর্যয় না ঘটে আমাদের মধ্যে, সেই জন্য মিষ্টার রায় কন্যার সম্মুখে আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রটি খুলিয়া ধরিয়াছেন। হাসিও পাইল একটু; ভাবিলাম যৌবন গেলে যৌবনের সব কথাই কি ভোলে মানুষে? যশ-প্রতিষ্ঠার কল্পিত বাঁধ দিয়া প্রাণের ভাঙন রোধ করিতে যাওয়া!

আপনা হইতেই একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল, "তোমার দিদি কি বললেন?"

তরু উত্তর করিল, "বললেন—বেশ ত বাবা।"

একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া তরু আমার মুখের পানে চাহিল।

সেদিন রাত্রে পড়িতে পড়িতে তরু বারকতক চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল—"হাঁ, একটা কথা শুনেছেন বোধ হয় মাষ্টারমশাই?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কথা?"

"রণেন-দা আসছেন যে!—রাঁচির রণেন-দা, মনে আছে বোধ হয়?"

ভাবটা এমন দেখাইল যেন আচমকা মনে পড়িয়া গেছে, কিন্তু বেশ বুঝিলাম ও অনেকক্ষণ থেকেই কথাটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, শুধু মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম, "বেশ ভাল কথা। আলাপ করা যাবে, সেখানে ভাল ক'রে আলাপ হয় নি। কবে আসবেন?"

তরু আমার মুখের উপর আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু নামাইয়া বলিল, "আসছে রবিবার দিন; আজ বিকেলে টেলিগ্রাম এল। মা ব'লে দিয়েছিলেন কিনা— কলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা করতে।"

আবার ক্ষণিকের জন্য চক্ষু তুলিয়া বলিল, "দিদিও ব'লে দিয়েছিলেন।"

বিকাল থেকেই কেমন একটা গুমট গরম, অকস্মাৎ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উঠিয়া গিয়া জানালার সামনে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি। সন্ধ্যার আকাশে গুটি তিন-চার তারা ছিল, দিক্‌রেখার উপর আর একটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।…অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, নিরভিনিবেশ পাঠের গুনগুনানির মধ্যে তরু একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা মাষ্টারমশাই, ব্যারিষ্টার ভাল, না, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট?"

কষ্টও হয়, হাসিও পায়—বেচারি তরুর মনে পর্যন্ত উদ্বেগের ছোঁয়াচ! কি উত্তর দেওয়া যায়? ব্যারিষ্টারকে, অর্থাৎ ভাবী ব্যারিষ্টার শৈলেন মুখার্জিকে ডেপুটি রণেন চৌধুরীর কাছে খুব ছোট করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু স্বয়ং তরুর পিতাই ব্যারিষ্টার, পেশাটাকে খেলো করা যায় না। মাঝামাঝি একটা উত্তর দিলাম, "ব্যারিষ্টারী অবশ্য স্বাধীন ব্যবসা, তার কথাই নেই, তবে ডেপুটিরাও শেষ পর্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে একটা জেলার মালিক হ'য়ে বসে।"

উত্তরের জন্য যে তরুর বিশেষ কৌতূহল ছিল এমন নয়। বইয়ের উপর মাথাটা ঝুঁকাইয়া দিয়া বলিল, "হোক গে মালিক; আমি এখন গ্রামারটা আগে সেরে নিই। এত ক'রে পড়া দিয়ে দেয় নতুন সিস্টার!…"

গুনগুনানি আরম্ভ করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

২

আজ ২২শে মে খুকুর জন্মদিন। সকালে উঠেই বলছেন, "তোমাদের এখানে সানাই পাওয়া যায় না, কি কোন রকম বাঁশী? সানাই না হ'লে কি উৎসব হয়।" শেষ পর্য্যন্ত বাজাতে হ'ল গ্রামোফোনের সানাই। খুকুকে দিলেন ঈজিপ্সিয়ান কৌটোয় মেঠাই—"এর ভিতরের পদার্থটা তোমার আর বাইরের আবরণটার মর্য্যাদা তুমি এখনও বুঝবে না। ওটা তোমার মায়ের জন্য।" বিকেল-বেলা নিমন্ত্রিতেরা সবাই এলেন। বড় ছাতিম গাছটার নীচের মণ্ডপে সবাই ওঁকে ঘিরে বসলেন—ঐ মণ্ডপটার নাম দিয়েছিলেন শিলাতল। সেদিন Crescent Moon আর 'শিশু' থেকে অনেকগুলো কবিতা পড়েছিলেন। তার পর সকলের অনুরোধে নতুন কবিতাও অনেকগুলো পড়া হ'ল।

"খুকু, আজ তোমার জন্মদিনে যতগুলো কবিতা পড়া হ'ল এত আমার জন্মদিনে হয় নি।" সমাগত অতিথিরা তখনও বসবার ঘরে বসেছিলেন, খাওয়া শেষ হতেই বললেন, "আজ কোন্ পথে আমার ঘরে যাব? আজ ত তোমাদের ঘরের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে, দেখব ওখানে কী রহস্য গোপনীয় আছে, Sanctum Sanctorium! বাবা: তোমরা মেয়েরা কত রকমেই flattery করতে পার—নিজেরা যেমন flattery ভালবাস অন্যকেও তেমনি দলে টানতে চাও।" "অর্থাৎ? তার মানে?" "এই ঘরময় ছবি টাঙিয়ে বই ছড়িয়ে—ইত্যাদি।" "আচ্ছা, আমি কি জানতুম আজ আপনি এ ঘর দিয়ে যাবেন যে flattery করবার জন্য ছবি টাঙাব, বই সাজাব? কোনো একটা সুযোগে আমার নিন্দে করতে পারলে আপনি ছাড়বেন না, হাসলে কি হবে, এখুনি সব ছবি খুলব আমি।" "কখনো না, বোসো চুপ ক'রে, ছবি খুললে খারাপ লাগবে আমার, flattery কে না পছন্দ করে? সেটা ত তোমাদের একচেটিয়া নয়। ঠাট্টা বোঝ না কেন, তোমায় নিয়ে এই বিপদ। তুমি রয়েছ সামনে, ঠাট্টা করতে কি পাশের বাড়ীর লোক ডাকতে যাব? যা নমুনা দেখলুম, তাতে ত সেদিকেও বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছি না। তার চেয়ে শোনো, শান্তিনিকেতনে এক জন বাংলার প্রফেসর দরকার, ছুটির পরই। তোমার বাবার জানাশোনা কেউ আছেন? যেমন তেমন এক জন মাষ্টারী বুদ্ধিওয়ালা নয়—যে সত্যি সত্যি সাহিত্য বোঝে; রসজ্ঞ। ওই দেখ, অমনি তুমি ভাবছ তুমি যাবে। তা যেতে পার। কিন্তু তোমায় ঠিক জায়গায় এপ্লাই করতে হবে তা বলছি, নইলে চলবে না। আমি ত আর কর্ত্তা নই, তা ছাড়া আমি হয় ত ঠিক তোমায় নিয়ে নেব, লোকে বলবে পক্ষপাত, আর এমনি কি মিথ্যে বলবে। না দেখ, আমি ঠাট্টা করছিলুম, তোমায় আবার সর্ব্বদা সেটা মনে করিয়ে দিতে হয়।"

"শুয়ে পড়ুন এবার রাত হ'ল।" "কেন শোব কেন—বেশ বৃষ্টির শব্দ শুনছি আর ভূতের গল্প পড়ছি, একটু আরামে আছি, তোমার অসহ্য হয়ে উঠল, ভাবলে, যে ক'রে হোক এখুনি একটা কিছু করা চাই। তুমি নিদ্রা দাও গে, আমি এখান থেকে আমার ঘর চিনে দিব্যি যেতে পারব।" "আচ্ছা তাহলে বেঙ্গারস্ ফুডটা খেয়ে নিন্।" "দেখ, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার সুরু করেছ যেন খোকা দুদু খায় ঢকে ঢক—অত্যন্ত objectionable ব্যবহার, আবার কথায় কথায় আছে সুধাকান্ত বাবুকে ডাকি। আমাকে তোমরা কি মনে কর? সাবালক হই নি এখনও? এই দেখ না শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা জীবনে কত সহস্র বার যাতায়াত করেছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আজকাল সঙ্গে এক জন অভিভাবক থাকা চাইই। কি জানি যদি হারিয়ে যাই, যদি ছেলেধরা ভয় দেখায়! সে-বার সঙ্গে এলেন এক কর্ত্তা, ভেদিয়াতে গাড়ী থামতেই হাঁপাতে হাঁপাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে, গুরুদেব এটা ভেদিয়া! কি করি বলতেই হ'ল, ওঃ তাই নাকি, বড় আশ্চর্য্য ত! পৃথিবীতে এত স্থান, এত নাম আছে, এটা কিন্তু ভেদিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যাক্ গে, এই লও থিয়োসোফিষ্টদের জার্নেলগুলো পড়, দুটো আশ্চর্য্য গল্প আছে, নিজের নিজের experience লিখেছেন ভারি আশ্চর্য্য।" "আচ্ছা এগুলো আপনার বিশ্বাস হয়? আমার হয় না।" "ওই ত তোমাদের দোষ, বিশ্বাস করবার মত যেমন প্রমাণ নেই, অবিশ্বাস করবার মত একেবারে অপ্রমাণ হয়ে যায় নি

কিছুই। যার উভয় পক্ষই সমান, খামখা তা অবিশ্বাস করি কেন? তোমরা সব ভারি মস্ত মস্ত সয়েণ্টিস্ট হয়ে উঠেছ কি না, যা systematically proved হবে না তাতেই অবিশ্বাস। ক'টা বিষয় প্রমাণ হয়েছে সংসারে? তা ছাড়া এমন কিছু থাকা খুবই সম্ভব যা প্রমাণ হয় নি, হ'তে পারে না, কারণ তা সব মানুষের জ্ঞানের গম্য নয়। সে গোপনে থাকবার জন্যই meant. দৈবাৎ কোনো কোনো মুহূর্ত্তে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে তার এতটুকু প্রকাশ হয়, কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোনো স্থূল চিহ্ন থাকে না। এই ত—কি ক'রে সব লিখত বলত? আশ্চর্য্য নয় তার ব্যাপারটা।" "তা হোক্, আমার তাকে বিশ্বাস হয় না।" "এ কথা বলা খুব অন্যায়, ও কেন মিছে কথা বলবে? কি লাভ ওর এ ছলনা ক'রে?" "কেন মিছে কথা কেউ কি বলে না, নিজেকে অসামান্য ব'লে প্রমাণ করবার জন্য?" "তা হ'তে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার তা মনে হয় নি, এমন সব কথা বলেছে যা ওর বিদ্যা বুদ্ধিতে কখনো সম্ভব নয়। যদি স্বীকার কর যে একটুও সময় না নিয়ে আমি প্রশ্ন করা মাত্র তার ভাল ভাল উত্তর, উপযুক্ত উত্তর ও ফস্ ফস্ ক'রে লিখে যেতে পারে, তা হ'লে ত ওকে অসামান্য ব'লে মানতে হয়। আমি কি প্রশ্ন করব তা ত আর ও আগে থেকে জানত না যে প্রস্তুত হয়ে আসবে। তা ছাড়া এমন সব কথা আছে যা সে জানতেই পারে না, এই ধর না নতুন বৌঠান আমার সঙ্গে কি রকম ভাবে কথা বলতে পারেন তা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত—তিনি বললেন, বোকা ছেলে এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয় নি, একথা তিনিই আমায় বলতে পারতেন—ওর পক্ষে ফস্ ক'রে আন্দাজ করা কি সম্ভব। তা ছাড়া আরও অনেক কথা লিখেছিল যা জানতে সে পারে না বা তেমন ক'রে প্রকাশ করতে পারে না। একবার একটা খাঁটি কথা লিখলে—তোমরা আমাদের কাছে এত রকম প্রশ্ন কর কেন? মৃত্যু হয়েছে বলেই ত আমরা সবজান্তা হয়ে উঠি নি। তোমাদেরও যেমন জ্ঞানের একটা সীমা আছে, আমাদেরও তেমনি। কত অদ্ভূত অদ্ভূত কথা যে লিখেছিল, অনেক বোঝাও গেল না। শমী বলছে আমি বৃক্ষলোকে আছি, সেখানে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করছি। কে জানে কি তার মানে। যে-রকম দ্রুতগতিতে লিখে যেত আশ্চর্য্য লাগত, একটা কথা শুনে তার অর্থ বুঝে উত্তর লিখে যাওয়া এক মুহূর্ত্ত বিরাম না ক'রে আমি ত মনে করি নে সহজে সম্ভব। তা ছাড়া এত মিথ্যে বলেই বা লাভ কি?" "আপনার কথা শুনে মনে হয় যেন পৃথিবীতে কেউ কখনো মিথ্যে বলে না বা ছলনা করে না। আর যদি তাই হবে তাহলে হিষ্টিরিক টেম্পারামেণ্টের মেয়েরাই এ-সব বেশী টের পায় কি ক'রে? আপনি নিজে কোনো দিন কিছু দেখলেন না কেন?" "তা অবশ্য ঠিক, খুব শক্ত সবল জোরালো মানুষরা বোধ হয় ভাল মিডিয়াম হয় না, কিন্তু তারও বোধ হয় কারণ থাকতে পারে—কোনো এক শ্রেণীর মনের পক্ষে হয়ত এর গ্রহণ সহজ হয়। আমি আবার দেখব। স্বপ্নই দেখি নে। এত কম স্বপ্ন দেখি আমি। মনে আছে একবার মাত্র নতুন বৌঠানকে স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন তিনি নীরবে এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। আমি বললুম, "তুমি কেন এলে, এখানে ত তোমাকে আর কেউ চায় না।" "আমিও কখনো কিছু দেখতে পাই নে, কত চাই, সেই জন্যই আমার বিশ্বাস হয় না একেবারে।" "এ কথা তোমার বলা ভুল মৈত্রেয়ী, অত্যন্ত ভুল। পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জান না, তাই বলেই সে সব নেই? কতটুকু জান? জানাটা এই এতটুকু, না-জানাটাই অসীম, সেই এতটুকুর উপর নির্ভর ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না, আর তা ছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারি নে। তবে অনেক গোলমাল হয় বইকি। কিন্তু যে বিষয় প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়াটাই গোঁড়ামি। আমার তাই এই রকম নানা লোকের experience পড়তে ভারি ভাল লাগে। অপমৃত্যু সম্বন্ধে একটা কি কথা আমার মনে হয় জান—হঠাৎ যে বন্ধন ছিন্ন হয় হয়ত তা সুসমঞ্জস ভাবে হয় না ছিন্ন। যদি আত্মা ব'লে কিছু থাকে তা হ'লে তার পুরানো বন্ধন মুক্ত হয়ে নূতন অস্তিত্বে প্রবেশ করবার জন্য হয়ত একটা পথ পার হবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় সে ছেদ হয়ত ভাল ভাবে হয় না—এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবেশ তাই বিলম্বিত আর অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। জানি নে অবশ্য এসব কি হ'তে পারে বা না-পারে সমস্তই অনিশ্চিত; তবে মনে হয় অপমৃত্যু অস্বাভাবিক বলেই তার মধ্যে একটা যন্ত্রণা থাকা সম্ভব। তার জন্য যে ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল না। সে জন্য আরও একটা কথা মনে হয়, যদি কারু মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে তখন আসক্ত হয়ে শোকাকুল হয়ে তাকে বদ্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়—আমার জীবনে যত বার মৃত্যু এসেছে যখন দেখেছি কোনো আশা নেই তখন আমি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র

ক'রে মনে করেছি তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে। নিজের সন্তানকেও আঁকড়ে রাখতে চাই নি, যেতে যখন হবেই তখন যেন আমার আসক্তি, আমার বেদনা তাকে মর্ত্ত্যের সঙ্গে বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য যেন কষ্ট না পেতে হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল সেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করা উচিত। ঘটনাপ্রবাহ আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি ত আমার হাতে আছি। Inevitable-এর সঙ্গে তর্ক কখনো করি নে। যত অপ্রিয়ই হোক, যত বেদনাদায়কই হোক, যা নিশ্চিত ঘটবে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত হওয়া কিছু নয়—সেখানে নম্র হয়ে মেনে নিতে হয়, তাতেই কল্যাণ। আমার মৃত্যুসময়ে যদি উপস্থিত থাক তা হ'লে কান্নাকাটি ক'রে আকুল হয়ে পিছনে ডেকো না, একান্ত মনে ত্যাগ ক'রো আমাকে, মনে হয় মুমূর্ষুর প্রতি সে-ই সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য।"

ব'সে ব'সে গান শুনছিলুম—'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে'—"আবার থেকে থেকে বলে, উহু আপনাদের ঠিক হচ্ছে না—আমি বলি আমার ত ঠিকই হচ্ছে, এখন তোমার ঠিক হ'লে যে বাঁচি! দেখ রবিঠাকুর গান মন্দ লেখে না এক রকম চলনসই তা বলতেই হবে।—চলিতে পাবে রজনীগন্ধার গন্ধ মিশেছে সমীরে ধীরে ধীরে, এসে তুমি যেও নাকো ফিরে। দীপ নিবে গেছে মম—কম গান লিখেছি, হাজার হাজার, গানের সমুদ্র। সে দিকটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে না গো, বাংলা দেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পার, আমার গান ভুলবে কি ক'রে?—তাও যেন হ'ল কিন্তু এ পদার্থটা কি? ওভালটিন মহামান্য ওভালটিন, কিন্তু চিনিই যে দাও নি, একটু না-হয় মিষ্টি ছড়ালে, তাতে ক্ষতি কি, না হয় একটু মাধুর্য্য বিস্তার করলে, কী রকম কঠোর তোমার স্বভাব! তোমাদের কত সুবিধে, ওগো ধীর মধুরভাষিণী বোলো ধীর মধুর ভাষে—তোমাদের তাতেই চলে যায়, একটু মিষ্টি হাসি, মোলায়েম কণ্ঠস্বরে এটা খাও ওটা খাও ক'রেই জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পার, আর পুরুষদের? বাবা! কত কি কাণ্ড, বি. এ. পাস কর—কাগজের পর কাগজ লেখ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হাঙ্গামার কি অন্ত আছে।" "আজকাল মেয়েদেরও ত এ সবই জুটেছে, আবার তার সঙ্গে নাচ আছে গান আছে, তরকারি কোটাও আছে। আগেকার মত শুধু বাবা বাছা এটা খাও ওটা খাও ক'রে চলে আজকাল?" "তা সত্যি। অনর্থক হাঙ্গামা কি কম সুরু হয়েছে মনে কর সেদিন যে মেয়েটির গান শোনা গেল, তারও ত বিয়ে হবে, ভাব একবার তার স্বামীর অবস্থা। ও-রকম গান না শিখলে কোনো ক্ষতি হ'ত না। কী করা বলো যুগধর্ম্ম। তার চেয়ে চল বারান্দায় বসা যাক। আচ্ছা, আমরা যখন ছিলুম না, একা একা তুমি কি করতে এখানে? এই নির্জ্জনতায় কাটাও কি ক'রে দিন, তোমার নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতিটা একবার বলো ত। ওই ত সকালে উঠে একটুখানি ঘরকন্না ওভালটিন বানানো এক জন আর আধজনের ব্যাপার, অবশ্য আধজনটি নেহাৎ কম নন।" "প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হ'ত বইকি, তা ছাড়া জানেন ত আমার স্বভাব—" "তা জানি বইকি, সেটা ত বেশ একটু মুখর রকমের রাজ্যের বন্ধু জোটাতে, লোকের সঙ্গে ভাব করতে—" "প্রথম যখন এসেছিলাম তখন ত কেউই ছিলেন না, এখন তবু অনেকে এসেছেন, তবে একেবারে কেউ না থাকা এক রকম—" "তা ঠিক এ যেন থাকা অথচ না-থাকা, নির্জ্জন অথচ পুরোপুরি নয়—এ ভাল না।" "এখন কিন্তু আমার ভালই লাগে, পড়ি, সেলাই করি,—" "জানি জানি আরও একটা কাজ কর, চিঠি লেখ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—ওটা একটা কাজের মত কাজ, ওই ত তোমাদের সাহিত্য, আর আমাদের? দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে··· এ পথে যখন যাবে আঁধারে···চলিতে পাবে রজনীগন্ধার গন্ধ···আমারও এই ভাল লাগে এই জনশূন্য দিন, এক-এক দিন যখন রোদ ঝলমল ক'রে ওঠে, কিংবা যে দিন ঘন কুয়াশায় আবৃত হয়ে যায় চারি দিক, আমি চুপ ক'রে ব'সে ব'সে অনুভব করি এই স্তব্ধগভীর নির্জ্জনতা, তার একটা স্পর্শ আছে হৃদয়ের মর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌঁছয়। তোমার বদলে যদি আমার এখানে বিয়ে হ'ত আমি দিব্যি থাকতুম। আমার স্বামীকে বলতুম, যাও তুমি কুইনিন বানাও গে—আমি চুপচাপ ক'রে থাকি। আমাকে এখানে একটা কাজ দেও না, একটা কুঁড়ে বেঁধে থাকি, আর উনি নিশ্চয় আমার শরীরের অবস্থা বুঝে দয়া ক'রে হাল্কা রকমের কাজ দেবেন। বেশ থাকব চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেই, আশীর্ব্বাদ নেই, বক্তৃতা নেই, নামকরণ নেই, ঈশ্বর দয়াময় কি না আমার কাছে তার সার্টিফিকেট চাওয়া নেই।"

খুকু এসে উপস্থিত খানিকটা ছেঁড়া ফুল পাতা নিয়ে। "কি গো তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হয় নি? গাছের পাতা ছিঁড়লে যে ওদের ব্যথা লাগে তা জান?" "সত্যি লাগে নাকি দাদু?" "আমি যখন ছোট ছিলুম এই ধর দশ-বারো বছর বয়স, তখন কাউকে গাছের পাতা ছিঁড়তে দেখলে

ভারি কষ্ট পেতাম —অনেকের অভ্যাস আছে চলতে চলতে হঠাৎ এক মুঠো পাতা ছিঁড়ে নিল। আমার ভারি খারাপ লাগত দেখতে, আরও খারাপ লাগত যদি কেউ কুকুর বেড়াল বা পোকামাকড়কে বিরক্ত করত, কষ্ট দিত। অসহায় প্রাণী, ওদের নির্ব্বাক বেদনা মনে লাগে বড়। একবার দীপু অনর্থক একটা কুকুরকে মেরেছিল, আমি জোর ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে দিলুম। সে ছিল বাড়ীর নাতি, বড় আদরের। নালিশ করল বড়দার কাছে। আমায় মেরেছে। কেন মেরেছ? কোণে দাঁড়াও। রইলুম দাঁড়িয়ে। এই রকম ছোটদের উপর প্রায়ই অবিচার হয়। তার বেদনা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে, কথা বলবার উপায় নেই, ভাষা নেই প্রতিবাদের।"

"ন ছুঁয়ো ন ছুঁয়ো মেরী হাথ
নগর লোক সব আওত যাওত হায়

পথের মাঝে আমার হাত ধরো না, নগরলোক কত আসছে যাচ্ছে তারা কি ভাববে। যখন বিদেশে ছিলুম, এসব গান খুব গাইতুম। এ সব গানের মধ্যে দেশের ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত। বিদেশে থাকলে যেন এই সুরের পথে দেশে ফিরে যাওয়া যায়। যেন রোদ্দুর ঝলমল করছে পথের উপর। কত লোক চলছে সে পথে, তার মাঝখানে বিপদে পড়েছে কলসী-মাথায় একটি মেয়ে। খুব যে অবাঞ্ছনীয় বিপদ তা নয়—ন ছুঁয়ো ন ছুঁয়ো মেরী, আর ওই গানটা শুনেছ—কী যাতনা যতনে মনে মনে।

কী যাতনা যতনে মনই জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে আমি লাজে প্রকাশিতে পারি নে।
প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী
নিরবধি সাধি প্রাণপণে।
তবু ত সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে।
কী যাতনা যতনে মনই জানে।

এই গানগুলির কথা simple, সুর simple, কিন্তু এর সহজ স্বাভাবিক সুরের ধারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। এর সুরের pathos, আকুল ক'রে তোলে মন। এ সব আমাদের সময়ের গান, কে লিখেছে তাও জানি নে, কবে লিখেছে তাও জানি নে। ভেসে-যাওয়া সাহিত্য। আর একটা গান ছিল—

কত কেঁদেছে ও কাঁদায়ে গেছে
যাবার বেলায় হাতে ধরে কেঁদেছে—
ও যার বঁধু বিদেশে যায় সে কি কান্না সয়
কাঁদতে স্বামীর কান্না মুখ মনে পড়েছে
কত কেঁদেছে ও কাঁদায়ে গেছে কেঁদেছে—

এই গানটির কথা কিছু সাহিত্যসম্পদে ভরা নয়, কিন্তু কী এর সুরের pathos, আর কত সহজ করে বলা, এমন বলা যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায় তার কান্না। বিদেশে এ গান-গুলো খুব গাইতুম। ওখানকার atmosphere অন্য রকম। গল্পের বই পড়লেই ত দেখতে পাও সে আমাদের দেশ নয়—সেখানে এসব গানের সুর এমন একটা ছবি সৃষ্টি করত যেন স্পষ্ট দেখতে পেতুম বাঙালী ঘরের মেয়েকে দেশের ছবিকে। আজকালকার আমার গানে খুব কারু-কলা, চারুশিল্প, এ আমার মনে থাকে না, আগেকার সহজ কথার সহজ মিঠে সুরের গানগুলি মনে আছে আমার।

মনে রয়ে গেল মনের কথা
চোখের জল আর প্রাণের ব্যথা
মনে করি দুটো কথা বলে যাই
কেন মুখপানে চেয়ে চলে যাই
সে যদি চাহে মরি যে তাহে
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা
মনে রয়ে গেল মনের কথা।
ম্লানমুখে সখী সে যে চলে যায়
তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয়লতায়।

এ সব হ'ল আমার আগের গান, এ তোমরা কখনো শোন নি। এখনকার গানের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ।"

সমস্ত দুপুর একটা লেখা লিখছিলেন—নরেশকে চিঠি লিখছে মন্দিরা কবিকে তার লীলাসঙ্গিনী—এই হ'ল লেখাটার বিষয়, পরে সেটার কত রকম যে বদল হ'ল। অন্তত পাঁচ-ছ বার সে লেখা লেখা হ'ল, তার পরে আরও অনেক পরিবর্ত্তিত হয়ে "পরিচয়" নামে "সানাই"তে প্রকাশিত হয়েছে। "স্থির হয়ে ব'সে পড়।" পড়ে দেখি পূর্ব্বের চেহারা সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেছে। একবার একটা লেখা লিখে কখনো ছেড়ে দিতেন না, ঘষা-মাজা ছাঁটাকাটা চলতই নিরন্তর। প্রত্যেক বার কপি করতেন আর একটি একটি ক'রে শব্দ বদলাতেন, সে যেন একটা কারুকার্য্য, আলপনার মত সজ্জিত হয়ে উঠত। তাই বলতেন, "অন্যকে কপি করতে দিলে এই বড় মুস্কিল হয়, প্রত্যেক বার লেখবার সময় মনে পড়ে কোন্‌টা কেন ঠিক শোনাচ্ছে না। অন্য কেউ লিখে দিলে তাই সে সুযোগ পাওয়া যায় না। এই কবিতাটার মধ্যে একটা বলবার কথা আছে। জানি নে সেটা লোকের চোখে পড়বে কিনা, লক্ষ্য হবে কি না, সে হচ্ছে কোন্‌খানে রোমান্সের সুরু, আর কোথায় অবসান। যেখানে সে প্রতিদিনের আলোতে প্রকাশিত ধূলোতে

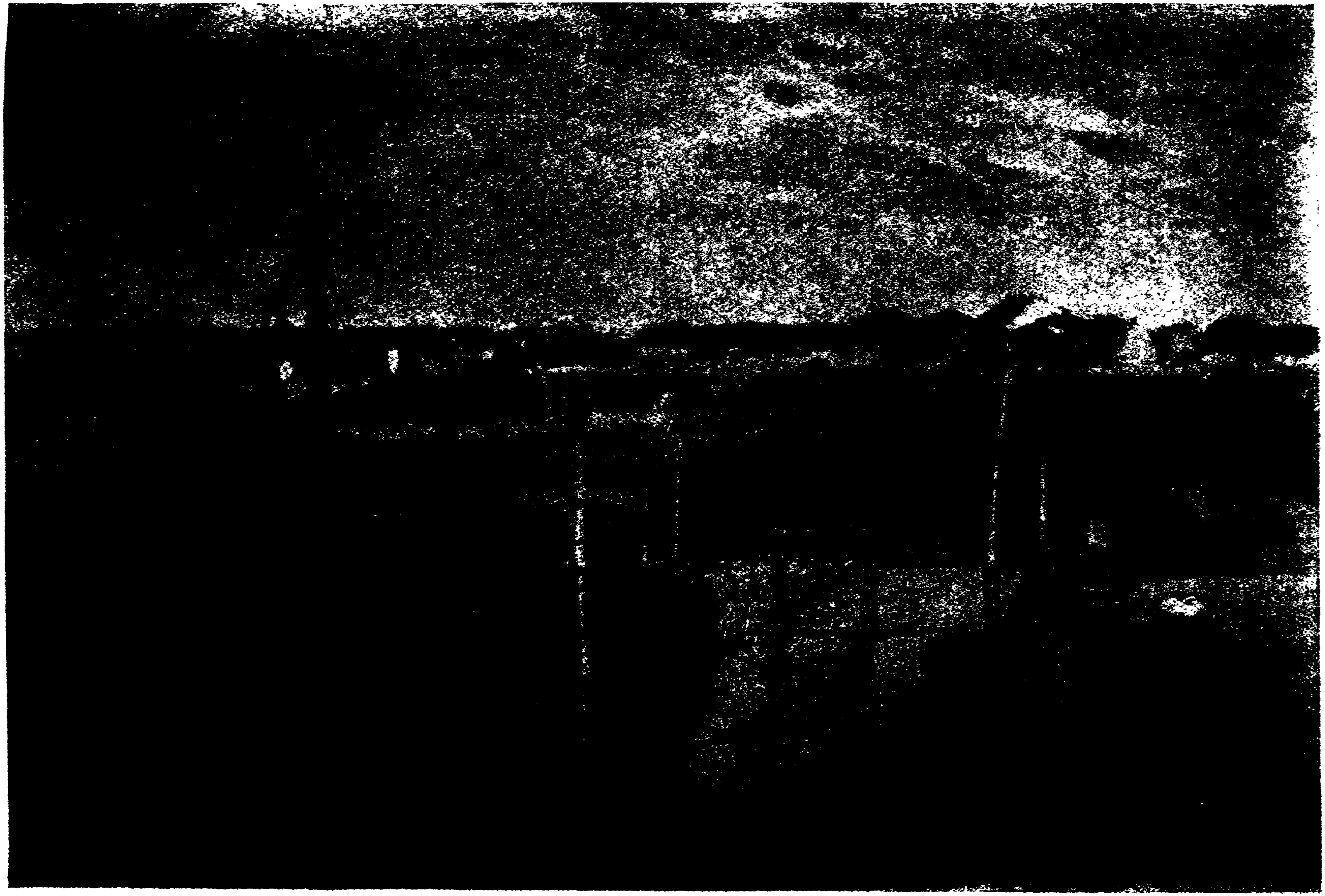

নদীকূলে
শ্রীসুনীল সেন

মলিন, যেখানে সে সুলভ সেইখানেই অবসান রোমান্সের।"

ডাক এল অনেক চিঠিপত্র কাগজ দেশ-বিদেশের। "ওগো গৃহিণী, এ মাসের 'প্রবাসী'টা খুঁজে আনতে পার? সেটা আছে না গেছে?" এল 'প্রবাসী'। নিজে নিজে অনেক ক্ষণ পড়লেন। কিছু ক্ষণ বাদে ঘরে এসে দেখি স্থির ব'সে আছেন 'প্রবাসী'টা নিয়ে। এস ত, ব'স দেখি এখানে, পড় এ কবিতাটা। তুমি ত একজন রসিকা; শুনি কি তোমার মত? এর মানে বুঝতে কোথাও বাধে? কবিতাটির নাম "অদেয়" (পরে "সানাই"তে প্রকাশিত হয়েছে)—দাও আমার হাতে আমি পড়ে দিই। স্নিগ্ধ করুণ হয়ে আসে ছন্দের সুর:—

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা,
এমন দৈন্য এমন কৃপণতা
যৌবন ঐশ্বর্য্যে আমার এমন অসম্মান
সেই বেদনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।
ধেয়ান মগ্নক্ষণে
নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্য ছায়ায়
অবসন্ন পল্লী চেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে বলা মৃদু ভাষার ধারা
প্রথম রাতের তারা
অবাক চেয়ে থাকে
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কাকে
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে
কে দেয় দুয়ার রুধে
একলা ঘরের শুব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে
সময় হ'লে রাজার মত এসে
জানিয়ে কেন দাও নি আমার প্রবল তোমার দাবী
ভেঙ্গে যদি ফেলতে ঘরের চাবী
ধূলার পরে, মাথা আমার দিতাম লুটায়ে
গর্ব্ব আমার অর্ঘ্য হত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি
সুধার পাত্র উঠেছে এই ভরে
তোমার পানে উদ্দেশেতে উর্দ্ধে আছি ধরে
চরম আত্মদান
তোমার অভিমান
আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ
পাইনে খুঁজে সার্থকতার পথ।

"আজ এক জন লিখেছেন এই কবিতাটা পড়ে তাঁর মন খুব ব্যাকুল হয়েছে, খুব গভীর ক'রে বেজেছে এর কথাটা। জানি নে কোন্‌টা কার কি মনে হয় কী ভাবে লাগে। আমার মনে ছিল না কি লিখেছি, তাই বোঝবার চেষ্টা করছিলুম, কি এর কথাটা। কি মনে ক'রে লিখি নিজেও অনেক সময় ভুলে যাই। অনেক সময় দেখেছি নিজেরই বুঝতে অসুবিধা হয়। অথচ যখন লিখেছিলুম তখন নিশ্চয় বুঝেছিলুম, নইলে লিখলুম কি ক'রে? যেমন ধর ঐ সাজাহান (তাজমহল) কবিতাটা। ওর মধ্যে কয়েকটা লাইন অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ্য লেগেছিল, এসেছিল আমার কাছে। তখন আমিও দেখি মনে পড়ে না কি মনে ক'রে লিখেছি। এই বার তুমি বুঝি সাজাহানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে, সে এখন থাক— আপাততঃ এইটা দেখ আগে, কি মনে হয় এই কবিতাটা। তোমায় যখন সাজিয়ে দিলাম দেহ, তখন সেই বাইরের দেওয়ার সঙ্গে দিই নি আমার প্রেম—তাই সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে। সেই প্রেমকেই বলি সত্য। সন্দেহ করেছিলে সে বঞ্চনা। সে বঞ্চনা যে ঘোর অসম্মান, আমার স্বভাবের সে কৃপণতা যৌবনের অপমান। সেই অন্যায়, সেই অপরাধ আজ আমাকে সমস্ত বিশ্বের কাছ থেকে, প্রকৃতির আনন্দ-উৎসব থেকে, দূরে সরিয়ে রাখছে। আমি এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে যোগ দেবার অধিকার হারিয়েছি। হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে, দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে কিন্তু সে ত তার অযোগ্য, তাই কে দেয় দুয়ার রুধে একলা ঘরের শুব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে। কিন্তু না-হয় আমিই অন্ধ হয়েছিলাম তুমি কেন জোর করে কেড়ে নিলে না যা তোমার সত্যকার প্রাপ্য—সময় হ'লে রাজার মত এসে জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবী? ভেঙে কেন ফেললে না ঘরের চাবী? টেনে নিয়ে এলে না আমার হৃদয়ের মধ্যে থেকে সেই সত্য, তোমার দাবির অধিকারে? আজ যে সেই মিথ্যার বোঝা অন্ধকার করে দিল, জীবন ছিন্ন ক'রে দিল, যোগ প্রকৃতির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক আনন্দের। তাই তোমার অভিমান আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ, পাই নে খুঁজে স্বার্থকতার পথ। এখন বুঝতে পার কবিতাটা? আগে একটু অস্পষ্ট ছিল নিশ্চয়ই। তাই হয়, আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি বাঙলা লেখায় কেমন যেন একটু অস্পষ্টতা থেকে যায়ই, ইংরেজীতে অনেক direct হয় লেখা।

"তা হ'লে এখন ঘরে যাওয়া যাক। বন্ধ করিয়া কাব্য কূজন, এস ঘরে যাই আমরা দুজন। আর যে কোন

সাড়াশব্দ নেই, ওঁরা সব গেলেন কোথায়—বড় কর্ত্তা, ছোট কর্ত্তা আর গৃহকর্ত্তা ?" "ওঁরা টেনিসে গেছেন।" "তুমি কেন গেলে না তবে ? এই ত অন্যায় কর—তোমার নাম হ'ল শৈলশ্রী অর্থাৎ শৈললক্ষ্মী, এখানকার সকলের মনে আনন্দ দেবে, তা নয় তুমি চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকবে, এ কি ভাল ?" "আর আনন্দ দিয়ে কাজ নেই এখন, সেজন্য সারা বছর পড়ে রয়েছে।" "ঐ ত, ঐখানেই একটু বাঁকা আছে। জান না, সেই বাউল আমায় বলেছিল ? আমি বাউলকে বললুম, 'তোরা যে বলিস সবাই সমান, সবাইকে তোরা ভালবাসবি, তবু যাদের সঙ্গে তোদের বনে না তাদের ঘরে কেন ভিক্ষে নিস না ? এটা কি উচিত করিস ?' সে বললে, 'ঠাহেন কত্তা, বুঝি ত সব, তবে ঐখানটায় একটু বাঁকা আছে।' তোমারও হয়েছে তাই, বোঝ সব যে পাঁচজনের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করা যাতায়াত এ সবই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু বুঝলে কি হয়, ঐখানটায় একটু বাঁকা আছে।" টেনিস শেষ ক'রে সবাই এলেন। সেদিন আবার সম্পূর্ণ 'গীতাঞ্জলি'টা পড়েছিলেন।

এক জন খাদ্যবিজ্ঞান ব'লে একখানা বই পাঠিয়েছিলেন। সকাল থেকেই বইটা পড়ছেন। "দেখ, science আমার খুব ভাল লাগে আর তোমাদের খালি ভাল লাগে romantic জিনিস। এই যে সবুজ পাতা ঝিরঝির করে হাওয়ায়, এর প্রত্যেক নড়ার সঙ্গে সূর্য্যালোক নিচ্ছে ভিতরে, আর তা থেকে তৈরি হয়ে উঠছে নানা রকমের জিনিস। কী আশ্চর্য্য অদৃশ্য ব্যাপার চলেছে সমস্ত প্রকৃতির শিরায় শিরায়। ভাবতে গেলে মন বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে যায়। বড় বিস্ময় মানি হেরি তোমারে, বড় বিস্ময় মানি।"

সেদিন সারাদিন খাদ্যবিজ্ঞান নিয়ে চলল—থেকে থেকেই একটা-না-একটা কথা শোনাচ্ছেন। "ওগো সীমন্তিনী, শুনে যাও। বইতে না লিখে দিলে তোমরা ত মানতে চাও না, এই দেখ লিখেছে বিস্কুটের চাইতে মুড়ির উপকারিতা বেশী। মুড়ির যেটা প্রধান উপকারিতা সেটা লেখে নি যদিও, সে হচ্ছে অর্থের দিকে। সেই জন্যেই ত আমি মুড়ি খাই। দিশী খাবারের দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে। খৈ মুড়ি নারকোল এই আমার ভাল লাগে। আর তোমাদের চাই চীজ্ বিস্কুট, এগ্‌স্ এণ্ড বেকন, সার্‌ডিন আর শ্যামন্, আর কত বলব—আমাদের বড়কর্ত্তার বিশেষ ক'রে এই সবই পছন্দ, উঁচুদরের পছন্দ। তিনি অক্সোনিয়ান কি না! বলডুইনের ওসব বালাই নেই, হলেই হ'ল। সাম্যবাদী পছন্দ তার অনেকটা আমার মত। দেখ একটা জিনিস আনিয়ে দেবে—এই বইতে লিখেছে তার উপকারিতার কথা, কত আর বলব। লজ্জায় মরে যাই—" "আহা বলুন না কি জিনিস ?" "ওই যে তোমার দুগ্ধ-শর্করা না কি বলে ?" "ও 'Sugar of milk' ? তার জন্য এত ভাবনা কি ? বাড়ীতেই রয়েছে।" "ও বাবা, ভাবনা নয় ? ভয়ঙ্কর ভাবনা, ভাবতে ভাবতে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি, এখন দুগ্ধ আর শর্করা নয়, দুগ্ধ-শর্করা খেয়ে গায়ে জোর করতে হবে।" খুকু এল, "মা তুমি কোথায় আমি খুঁজে বেড়াই।" "দেখ মিঠুয়া, তোমার মা যদি আত্মগোপন ক'রে থাকেন সে তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে করেছেন, আমি তার জন্য দায়ী নই।" "দাদু একটা গান কর, কি তুমি বাজে বকচই বকচই।" হেসে উঠলেন, "এইবারে একটা কথার মত কথা বলেছ মিঠুয়া। দাদু এত বাজে বকতেও পারে—চিরজীবন ধরে বকেই চলেছে, বকেই চলেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি হয়েছে জমা, এখন তার ভার সামলান দায় হয়েছে, বিশ্বভার—। ওই দেখ আবার বুঝি বকুনি সুরু হয়। তার চেয়ে গানই ভাল।" সেদিন একটা হিন্দী গান করেছিলেন, তার সব কথাগুলো হারিয়ে গিয়েছে, মনেও করতে পারি নে, তবে তার একটি মাত্র লাইনের অর্থ মনে আছে—রাঙিয়ে দাও আমার চুনরিয়া যৈ সা তেরি পাগিয়া—তোমার ওই পাগড়ীর রঙে রাঙিয়ে দাও আমার ওড়না। এই গানটি আরও বহুবার তাঁর কাছে শুনেছিলুম, মনে পড়ে তার সুন্দর সুরের রেশ।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

সকাল বেলায় একটা চাকা পাখী ডাকিয়া গেল। দুয়ারে জল দিতে গিয়া পিসিমার হাত হইতে ঘটিটাও পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমার শাশুড়ী আজই ফিরে আসবেন, বউমা।

আজ! যোগমায়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আজ সকালের আকাশটিকে ভারি ভাল লাগিতেছিল তার। ভারি মিষ্ট বাতাস দক্ষিণ হইতে বহিতেছিল। অকস্মাৎ হাওয়া বদলাইয়া গেল।

আজ কি ক'রে আসবেন ?

না হলে চাকা পাখী ডাকলো কেন, ঘটিই বা পড়লো কেন হাত থেকে ? যে অস্থির মানুষ, সংসার ফেলে কোথাও কি দু'দণ্ড থাকতে পারেন ? সেবার শ্রীক্ষেত্তর যেতে যেতে পথ থেকে ফিরে এলেন। বলেন, বাড়ি থেকে গিয়ে— বাড়ির কথাই খালি মনে পড়ে, ঠাকুরঝি ; শেষকালে কি লাউমাচা—পুঁইমাচা দেখব ?

আপনি গেছেন শ্রীক্ষেত্তর ?

কই আর হ'লো, মা। তিনি না টানলে কার সাধ্যি যায়। ডুরি ধরে না টানলে যাবার যো কি ! আহা,

কপালে মাণিক জ্বলে
মণিকোঠা আলো করে,
আমার মায়া ডুরি দাও হে কেটে,
ওগো জগবন্ধু—দীনবন্ধু—

গৃহের কাজ সারা হইলে বলিলেন, আজ একাদশী আমার তো খাওয়া নেই, দেখি একবার কাউকে বলে যদি মাছটা এনে দেয়।

মাছ কি হবে, পিসিমা, এমনি ভাতে-ভাতে দিয়ে—

একাদশীর দিন সধবা মানুষের যে মাছ খেতে হয়। বেলায় বাজার বসে। দশটার সময় পিসিমা একগলা ঘোমটা টানিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা দিবেন, এমন সময় একখানা গরুর গাড়ি আসিয়া বাড়ির দুয়ারে থামিল। পিসিমার আর বাহির হওয়া হইল না। তিনি ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছনে কে ডাকিল, আমি বাড়ি এলাম, আর আমায় দেখে পালাচ্ছ, পিসিমা

পিসিমা মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

ওমা, রামু আমার কোত্থেকে এলি ? না পত্তর—না কিছু ?

হঠাৎ কুষ্টেয় বদলি হ'লাম যে, পিসিমা। সাত দিনের ছুটি পেয়েছি।

কুষ্টে ? সে তো অনেক দূর।

হাঁ, তা ওখান থেকে এক দিনের পথ। দাঁড়াও, গাড়ি থেকে জিনিসপত্রগুলো নামাই। মা কোথায় ?

বউ গেছেন—জিরেটে। কালই গেছেন।

জিরেটে গেছেন মা। তাই ত, কবে আসবেন ?

কাল না হয় পরশু। আজ চাকা পাখী ডেকে গেল দেখে ভাবছিলাম—বউই হয় ত এসে পড়বেন। তা তুই এলি। শরীরগতিক ভাল ত ? রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন ?

নিজে হাতে রেঁধে খেতে হয়। আজ এখানে, কাল সেখানে দশ দিন পনেরো দিন ক'রে ঘুরছিই। এবার ইনস্‌পেক্টর বাবুকে ব'লে কয়ে—একটা ভাল জায়গায় বদলি হলাম। উনি আমায় ভালও বাসেন।

আহা, ভগবান্ তাঁর ভাল করুন। রেঁধে খেলে কি ব্যাটাছেলের শরীর থাকে ? মাছ-টাছ সব রাঁধতে পারিস তো ?

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান মোটগুলি বাড়ির রোয়াকে রাখিয়াছে। তাহার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া রামচন্দ্র কথা কহিতে কহিতে বাড়ীর মধ্যে আসিল।

হাঁ, মাছ ! বলে কোন রকমে ভাতে-ভাতে—

ও মাগো, তাই এমন চেহারা হ'য়েছে। ওই যে জল রয়েছে—হাত পা ধুয়ে ঘরে বসে একটু জিরো। দেখি নারকোল নাড়ু-টাড়ু কিছু আছে কি না শিকেয় তোল।

রামচন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া তক্তাপোষের উপর বসিল। দু'টি ঘরের সংযোগস্থল অন্ধকার সিঁড়িটার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া যোগমায়া রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। অনেকদিন পরে দেখা। পরিচিত লোককেও কত না অপরিচিত মনে হইতেছে ! রামচন্দ্র ঢেঙা হইয়াছে, সেই

জন্যই কি রোগা-রোগা দেখাইতেছে? রঙের সে ঔজ্জ্বল্য নাই, মুখের গোঁফটি ঘন হইয়া যাত্রাদলের সাজা সেনাপতির মত অনেকটা দেখিতে হইয়াছে। জরির পোষাক পরিলে ও শিরপেঁচ মাথায় দিলে—কে বলিবে রামচন্দ্র সেনাপতি নয়? তবে রামচন্দ্রের মুখে তেমনই হাসি লাগিয়া আছে। ও ঘরের মধ্যেও ত পূরা আলো নাই, তাই সেই হাসির বেগ মন্দীভূত ও ছটা স্তিমিত বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বরটি আরও ভরাট হইয়া অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন একটু বেশী করিয়াই টানিয়া দিয়াছে। বিদেশ হইতে দেড় বৎসর পরে রামচন্দ্র আসিয়াছে নূতন মানুষ হইয়া।

নারিকেল নাড়ু জলযোগ করাইয়া পিসিমা বলিলেন, আজ তোকে বাজারে যেতে হবে। একটু মাছ-টাছ—

রামচন্দ্র বলিল, আবার মাছ কি হবে; তুমি যা রাঁধবে তাই অমৃত লাগবে। কত দিন যে তোমাদের হাতের রান্না খাই নি! নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর রামচন্দ্রের।

ওমা, তাকি হয়? আজ একাদশী, বউমা সধবা মানুষ—

বউমা! বিস্ময়ে রামচন্দ্রের বিস্তৃত চক্ষু বিস্তৃততর হইয়াছে।

পোড়া মনের দশা দেখ, বলতে ভুলেছি! বউমা যে আজ তিন দিন হ'ল এসেছেন।

কথা কহিয়া রামচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিল না, একটু চঞ্চল হইয়া নড়িয়া বসিল শুধু। চোখ দু'টি তার খুশীর ছটায় চক্‌চক্ করিতে লাগিল।

তবে ত মাছ আনতেই হবে পিসিমা। কিন্তু হঠাৎ তোমার বউমা যে এলেন।

বাড়ির বউ বাড়ি আসবে না ত যাবে কোথায় শুনি? বউয়ের যেমন কাণ্ড! সামান্য জিনিস নিয়ে কুটুমের সঙ্গে মনকষাকষি চলছিল। দোষ দু-পক্ষেরই। ঝগড়া-বিবাদ কি চিরদিন থাকে।

বলিয়া সংক্ষেপে তিনি বৈবাহিকের সঙ্গে মনোমালিন্যের ইতিহাসটুকু বিবৃত করিলেন। রামচন্দ্র নীরবে শুনিয়া গেল, কোন মতামত প্রকাশ করিল না।

সিঁড়ির ওপারে দুরু-দুরু বক্ষে রুদ্ধনিশ্বাসে যোগমায়াও সব শুনিতেছিল। রামচন্দ্র কোন কথা কহিল না দেখিয়া সে কিছু আশ্বস্ত হইল। যাক্, উনি তাহা হইলে ব্যাপারটিকে তেমন গুরুতর ভাবেন নাই।

যাই পিসিমা, অনেকদিন পরে এলাম কে কেমন আছেন একবার দেখাশোনা ক'রে আসি।

রামচন্দ্র বাহির হইয়া গেলে পিসিমা ডাকিলেন, বউমা।

যোগমায়া সিঁড়ি হইতে পাশের ঘরে নামিয়া গেল ও রোয়াক দিয়া ঘুরিয়া ওঘরে আসিল।

কি পিসিমা?

পিসিমার মুখ খুশীতে ভরা। কহিলেন, রাম যে কুষ্টেয় বদলি হ'য়েছে, সাত দিন ছুটি পেয়েছে।

ঘোমটা টানিয়া যোগমায়া নীরব রহিল।

পিসিমা বলিলেন, তুমিই আজ রাঁধ না হয়। মুগের ডাল, নিম বেগুন ভাজা, সজনে ফুলের চচ্চড়ি, মাছের ঝোল আর টক্।

যোগমায়া বলিল, না, আপনি রাঁধুন।

কেন, ভাল হবে না রান্না তাই ভয় করছ? তিনি হাসিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তা হোক, আমি বরঞ্চ দেখিয়ে দেব'খন!

না, পিসিমা—আপনিই রাঁধুন।

আজ না হয় আমি রেঁধে খাওয়ালাম—চিরদিন যে তোমাকে খাওয়াতে হবে, মা।

মাছ না হয় আমি রাঁধব—আপনি দেখিয়ে দেবেন।

সেই ভাল।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। গ্রামে যত আত্মীয়বন্ধু বা পরিচিত প্রতিবেশী আছেন সকলের সঙ্গে তবু রামচন্দ্র দেখা করিতে পারে নাই। বেলা একটায় বাজারে গিয়াও চুনা মাছ ছাড়া আর কিছু মিলে নাই।

বিছানায় গা ঢালিয়া রামচন্দ্র পান চিবাইতে চিবাইতে হয়ত যোগমায়ার কথাই ভাবিতেছিল। আজ সে পাড়ায় প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছে। যে মেঘ মাথার উপর ঘন হইয়া জমিয়াছিল, তাহা দক্ষিণা বায়ুর দাক্ষিণ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র নিজেকে বড়ই পরিতৃপ্ত ও সুখী মনে করিতেছে। চোখ বুজিয়া সে সুদূর অতীতে চলিয়া গেল।

তিনটার পর খুট্ করিয়া সিঁড়ির দুয়ার খোলার শব্দ হইল। রোয়াক দিয়া যোগমায়া দিনের বেলায় ওঘরে আসিতে পারে নাই। আমতলার ঘর হইতে পিসিমা যদি দেখিয়া ফেলেন? নড়বড়ে দুয়ার সিঁড়ির। এক দিকের ডোমনি উপড়াইয়া গিয়াছে, হাঁসকলটা ঝুলিয়া পড়াতে ওদিকের কপাটটা কাত হইয়াছে। বন্ধ করিবার ও খুলিবার সময় খটাং করিয়া শব্দ হয়। সেই শব্দে রামচন্দ্রের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যোগমায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ওদিকের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। রামচন্দ্র তৎক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ?

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া রামচন্দ্রের পায়ের গোড়ায় অবনত হইল। হাত দিয়া তাহার পদস্পর্শ করিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রামচন্দ্র তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কাঁদ কেন ?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া যোগমায়া শান্ত হইল। শান্ত হইলেও মাঝে মাঝে সেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। কেন যে কাঁদে—সে কথা যোগমায়া কাহাকেও তো বুঝাইতে পারে না। নারীর কত বড় সর্ব্বনাশ যে হইতে বসিয়াছিল!

বেলা বেশি ছিল না, কাজেই প্রথম মিলন-পর্ব্ব রোদন ও নীরব সান্ত্বনার মধ্য দিয়াই শেষ হইল। যোগমায়াই তাড়াতাড়ি উঠিবার মুখে বলিল, এখনি সন্ধ্যে হবে—ঘর ঝাঁট দিয়ে নিই।

রাত্রিতে রামচন্দ্র বলিল, তোমার বড্ড ভয় হয়েছিল, না মায়া ? যদি আর একটা বিয়ে ক'রে বসতাম ?

ডান হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত চাপা-স্বরে যোগমায়া বলিল, আবার!

রামচন্দ্র বলিল, আচ্ছা, ও কথা না হয় বলব না। কিন্তু আর একটা সুখবর আছে।

কি ?

শুনেছ বোধ হয় আমি কুষ্টেয় পোষ্টমাষ্টার হ'য়ে বদলি হ'য়েছি ? পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে হ'য়েছে।

সত্যি ?

পোষ্টমাষ্টার হ'লে একটা বাসাও ওই সঙ্গে পাওয়া যায়। তাই ভাবছি, কতদিন আর একলা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাব ?

তুমি আবার রাঁধতে পার নাকি ?

রাঁধলাম তো এই চার বছর ধরে। কখনও হয়ত কোন পোষ্টমাষ্টারের বাড়ি খাওয়ার সুবিধা হ'য়েছে। কাল হয়ত তোমাকে মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়াব।

লজ্জা করবে না তোমার রাঁধতে? পিসিমা কি বলবেন ?

পিসিমা যাই বলুন—আমার রান্নার তারিফ তোমায় করতেই হবে।

আচ্ছা বল দেখি—ঝোলের আলু কি ক'রে কোটে ? কৌতুকভরে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

কেন, ছুরি দিয়ে কুচি কুচি ক'রে—

ও হরি, তবেই তুমি রেঁধেছ মাছের ঝোল। ঝোলের আলু বুঝি কুচি কুচি করে? চারফালা করে কুটতে হয় আলু। আচ্ছা, কি কি মশলা দিতে হয় বল দেখি ?

কাল খেলেই বুঝতে পারবে—কেমন হ'য়েছে ঝোল। আচ্ছা, ঝোল না হয় রাঁধব না, যদি তুমি গিয়ে বাসায় আমায় রেঁধে দাও।

আমি যাব বাসায় ?

কেন, সবাই তো যায়। আমাদের মহাদেববাবু—তের বছরের বউ নিয়ে গেলেন বাসায়। কেমন রাঁধছে—বাড়ছে।

শাশুড়ী বাড়িতে রইলেন—বউ যাবে বিদেশে! লোকে নিন্দে করে না ?

কিন্তু লোকের নিন্দে শুনতে গেলে নিজের সুবিধেয় জলাঞ্জলি দিতে হয় ?ঃএই ধর, তুমি যদি যাও আমার সঙ্গে—

হাঁ—গেলাম ত ? তা হ'লে মা—,সহসা যোগমায়া চুপ করিয়া গেল। তাহার কৌতুকোজ্জ্বল মুখে ছায়া নামিল। রামচন্দ্র যোগমায়ার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আর একটু কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল, মা বুঝি তোমার ওপর এখনও রাগ ক'রে আছেন ?

যোগমায়া থমথমে মুখে চুপ করিয়া রহিল। সেকথা স্বামীর কাছে বলা যায় নাকি ?

রামচন্দ্র কহিল, আমার মাকে আমি যেমন জানি আর কেউ তেমন জানে না। উনি রাগ করেন বটে, ভেতরে ভেতরে ভালও বাসেন। তাই ত আমি এখনও ভাবতে পারি না, কি ক'রে বিয়ের কথা লিখেছিলেন আমায়।

যোগমায়া কোন কথা কহিল না। মায়ের নিকট সন্তানেরা চিরকালই দোষত্রুটিশূন্য। 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়।' ভক্ত রামপ্রসাদের এই গান তো মিথ্যা নহে। কিন্তু পরের মেয়ে যোগমায়া—তাহার সম্বন্ধেও যে শাশুড়ী অতটা স্নেহশীলা হইবেন!

রামচন্দ্র তাহার হাতে দোলা দিতে দিতে বলিল, ভয় কি, মায়া, দেখো, আমার হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়ার কথা শুনলে—উনি কখনই অমত করবেন না।

না, তুমি ব'লো না।

কেন গো, তোমার লজ্জা কি ?

মা হয়ত মনে করবেন—আমিই তোমায় বলেছি এ কথা।

বললেই বা তুমি, এমন তো সবাই বলে মাকে। রামচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

যাও! কৃত্রিম ক্রোধে যোগমায়া মুখ ফিরাইল।

আচ্ছা, আচ্ছা, যাতে কেউ কিছু মনে না করেন—তেমন ভাবেই বলব। ভয় নেই তোমার।

আশ্বস্ত হইয়া যোগমায়া বলিল, কৈ, এবার আমার জন্য তো কিছু আন নি।

তুমি যে এখানে আছ জানব কি ক'রে। তা ছাড়া—

থাক, রাত হ'য়েছে—ঘুমোও।

না মায়া, আজ ঘুমুবো না, তোমায়ও ঘুমুতে দেব না।

তোমার কি, দুপুরবেলায় ঘুম মারবে?

তুমিও—

হাঁ, বেশ বলেছ যা হোক। আমি ঘুমুলে কেউ রক্ষে রাখবেন নাকি। যা ঠাট্টা করবেন!

কিন্তু এত বিবেচনা সত্ত্বেও যোগমায়া গল্প করিতে লাগিল। কত দিনের জমা-করা যত রাজ্যের গল্প। সই-পাতানো হইতে আরম্ভ করিয়া পিত্রালয় বাস পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির কত না বিবরণ! এতও মনে আছে যোগমায়ার! তবু সব গল্প করা হইল কৈ, মুসলমানপাড়ায় মুরগী ডাকিয়া উঠিল। যোগমায়া চঞ্চল হইয়া কহিল, ওই যাঃ, কুঁকড়ো ডেকে উঠলো, রাত পুইয়ে এলো বুঝি?

রামচন্দ্র কহিল, দুপুরে ঘুমুবে তো?

তুমি নাক ডাকিয়ো।

তোমার নাক বুঝি ডাকে না?

যাও। যোগমায়া উঠিয়া গেল।

ত্রয়োদশীর দিন বেলা দু'টার সময় শাশুড়ী আসিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি পুঁটুলি। ওপারে জামাইয়ের বিস্তর নারিকেল গাছ আছে। আধ পাকা ও ঝুনা নারিকেলে দু'টি পুঁটুলি বোঝাই হইয়াছে। এক রাশ নারিকেল-কাঠি চাঁচিয়া তাড়া বাঁধিয়া আনিয়াছেন—ঝাঁটা হইবে। আর যাহা আসিয়াছে, আনাজপাতি। জামাই একখানা কাপড় দিয়াছেন আর কলিকাতা হইতে বাঁধা কপি আনা হইয়াছিল তাহাও একটি দিয়াছেন।

রামচন্দ্র তখন বাড়িতে ছিল না। পিসিমার মুখে তাহার পদোন্নতির খবর শুনিয়া বলিলেন, মা-সিদ্ধেশ্বরীর সওয়া পাঁচ আনার পূজো দিয়ে আসব কাল, আর মা-বাগ্‌দেবীর পাঁচ সিকে পুজো মানত করা যাক—আসচে বার দেব। রামকে বলতে হবে—পেরথম মাইনে পেলে যেন আমায় পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দেয়। ভাল ক'রে সত্যনারাণের সিন্নিও তো দিতে হবে।

ওতে কি, বউ? মেলাই পুঁটুলি এনেছ যে।

আর বল কেন, ভাই! আমিও নেব না—মেয়ে-জামাইও ছাড়বে না। আর ওই কুঞ্জটাই কি কম! বলে, দিন মাঠাকরোন, আমি নিয়ে যাব। তেমনি নাকাল আসতে! নারকোল ছুলে আনলে কি অত ভারি হয়। হাঁ, ওগুলোয় জল ঢেলে ধুয়ে নাও। তার পর একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও। হয়েছে। পাড়ার সবাইকে একটা ক'রে কপির পাতা আর নারকোল একটা ক'রে বিলুতে হবে। কুঞ্জকে দুটো নারকোল দিও। আচ্ছা, হাত পা ধুয়ে আমিই গুছিয়ে দিচ্ছি।

নিজে হাতে না দিলে শাশুড়ীর তৃপ্তি হয় না—সেকথা পিসিমা জানেন। কাজেই জিনিস শুদ্ধীকৃত করা ছাড়া ভাগ-বাঁটোয়ারার দিকে তিনি ঘেঁষিলেন না। শাশুড়ী আঁচলের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, ভাল কথা, কমলি কি লিখেছে বউমাকে।—এই নাও গো চিঠি। বলেছে উত্তর পেলে আসবে একবার। কৈ গো—বউমা কোথায়?

যোগমায়া আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইল। মেয়েবাড়ি হইতে আসিয়া এই তিনি তাহাকে 'বউমা' বলিয়া প্রথম ডাকিলেন। সে ডাকে স্নেহ না ফুটুক—মাধুর্য্য আছে বইকি। রামচন্দ্রের উপর মনে মনে যোগমায়া আরও বেশী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। তাঁহারই জন্য আজ সব দিক হইতেই সমস্ত জঞ্জাল যেন কাটিয়া যাইতেছে।

৪

নূতন দেশে আসিবার পথটিও চমৎকার। ছোটবড় দু'রকমের রেল গাড়ি চড়িয়া তিন জায়গায় গাড়ী বদল করিয়া, অধিক রাত্রিতেই হইবে, যোগমায়া কুঠিয়া পৌছিল। রাত্রি বারোটা কি একটাই হইবে—তখন। চারিদিকে অন্ধকার—নিশুতি রাত সাঁ-সাঁ করিতেছে কানের কাছে। কোথাও জনপ্রাণী নাই। ষ্টেশনে ঘুমন্ত কানে যা দুই-একবার কুলির ডাক শোনা গিয়াছিল! তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিতে গিয়া যোগমায়ার বাঁ-পায়ের খানিকটা ট্রেনের দুয়ারে লাগিয়া ছড়িয়া গেল, শাশুড়ী হুমড়ি খাইয়া প্ল্যাটফরমের কাঁকরের উপর পড়িয়া গেলেন। ওদিকে মোটঘাট নামাইবার তাড়াই কি কম। ঘুম চোখ বলিয়া এবং ছোট ষ্টেশনে গাড়ি বেশিক্ষণ থামে না বলিয়াও রামচন্দ্র কুলিকে একটা ধমক দিয়া নিজেই মালপত্র টানাটানি করিতে লাগিল। কে জানে, সব মাল নামিল

কিনা, ট্রেন তো ধোঁয়া ছাড়িয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ক'টা মোট ছিল, মা?

কি জানি বাপু, বারোটা কি তেরোটা ঠিক মনে হচ্ছে না।

চোদ্দটা নয় তো?

না।

তাহলে ঠিকই আছে।

অদূরে একজন লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের অবতরণ দেখিতেছিল, সে অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনিই নতুন পোষ্টমাষ্টার বাবু?

তুমি কে?

আজ্ঞে—আমি লক্ষ্মণ। ডাক-হরকরা। রমেশবাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, রাত্তির-কাল—নতুন জায়গা।

রমেশবাবু কে?

আজ্ঞে কেরানীবাবু। আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন পোষ্ট মাষ্টারের নামে, তা তেনার জ্বর। কেরানীবাবু বললেন, লক্ষ্মণ তুই যা—নতুন মানুষ বিপদে পড়বেন।

বাঁচালে লক্ষ্মণ, তুমি না এলে ভারি মুশ্‌কিল হ'ত। গাড়ি এনেছ তো? ষ্টেশন এখান থেকে কতদূর?

এজ্ঞে এক পোয়া রাস্তা। ছোট ইষ্টিশানে নেবে ভালই করেছেন, হেঁটে যেতেই পারবেন। গাড়ি তো পাইনি বাবু। এই কুলি, বাবুর মোট নিয়ে যেতে পারবি?

কেন পারব না, চার আনা পয়সা চাই।

হাঁ, চার আনা? এই মাঠটা পেরুলেই পোষ্ট আপিস, দু' আনা পাবি।

অনেক দরকষাকষি করিয়া তিন আনাতে রফা হইল।

রামচন্দ্র বলিল, এত মোট—ও একা নিতে পারবে কেন?

আজ্ঞে আমিও কিছু নেব। হাল্‌কি হাল্‌কি বুঁচকি গুলো আপনারা হাতে করে নেন। যেতে তো হবে।

মোট লইয়া লক্ষ্মণ আগাইয়া চলিল। তার পিছনে রামচন্দ্র, যোগমায়া ও শাশুড়ী চলিলেন; সর্ব্বশেষে চলিল কুলিটা। রেলের তার দিয়া ঘেরা জমিটা পার হইয়াই মাঠ। কোন দিকে বাড়ি নাই, মানুষ নাই; থাকিলেও অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তারের ওপারে অনেকগুলি বড় ঝাউগাছের মাথায় ফাল্গুনের হাওয়া শোঁ-শোঁ করিয়া ঝড় তুলিয়াছে। অদূরে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল।

রামচন্দ্র বলিল, কোয়াটারে তো মাষ্টারবাবু আছেন বললে, আমরা গিয়ে উঠবো কোথায়।

আজ্ঞে তিনি আছেন রমেশবাবুর বাসায়। কাল আপনাকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

ও! তা এখানে বুঝি খুব ম্যালেরিয়া আছে?

ফাল্গুন মাসে কি ম্যালেরিয়া হয় বাবু? যে রকম গায়ে হাতে ব্যথা, সন্দ হচ্ছে মা'র অনুগ্রহ হবে।

মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া রামচন্দ্র বলিল, বল কি! খুব হচ্ছে বুঝি?

আজ্ঞে না। প্রেত্যেক বার যেমন হয়—তেমনি। যে সময়ের যা। এই যে বাবু পোষ্ট আপিসের পেছনে এসে পড়লাম। এই যে তার দিয়ে ঘেরা—এই সব জমিই পোষ্ট আপিসের। এইকাঁঠাল গাছ, দুটো আমগাছ, ওই বেলগাছ—সব গবরমেণ্টের জমি। হাঁ, কোঠাঘরেই আপিস বসে। সামনেরটা আপিস—পেছনটা কোয়াটার। রান্নাঘর দো-চালা।

জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিটা চলিয়া গেল। লক্ষ্মণ রান্নাঘর হইতে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া এ ঘরে আনিয়া বলিল, আজ কোন রকমে একটু ফলমূল আর দুধ সেবা ক'রে শুয়ে পড়ুন—কাল সকালে সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। ঐ কুয়ো, বালতিতে জল তুলে রেখেছি। আমরা কৈবর্ত্ত, নমস্কার বাবু। যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল, উই শিকেয় মাটির ভাঁড়ে কাঁচা দুধ আছে, রান্নাঘরে পাঁকাটি আছে—জ্বাল দিয়ে নেবেন।

লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে শাশুড়ী কহিলেন, ঐ এক রত্তি বালতির জলে কি কাপড়চোপড় কাচা হয়? না নেয়ে ধুয়ে—ট্রেনে সত্তিক জা'ত ছুঁয়ে আসা—ঘুম হবে কেন? কুয়োর দড়া আছে তো? বলিয়া তিনি জল তুলিবার জন্য ওদিকে আগাইয়া গেলেন।

যোগমায়া ঘোমটা টানিয়া বিশৃঙ্খল মোটঘাটের এক ধারে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী সঙ্গে আসিয়াছেন বাসা গুছাইয়া দিবার জন্য। দিন কয়েক থাকিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। তিনি না আসিলেও বা গোছগাছের কাজে যোগমায়া কিছু সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু কোন্ জিনিসটি কি ভাবে রাখিতে হইবে সে নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত যোগমায়াকে এমনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

ছোট্ট বাড়িটি। চারিদিক উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এধারে দু'খানি নাতিপ্রশস্ত কোঠাঘর, ওধারে খড়ের দু'খানা চালা। মাঝখানে ফালি এতটুকু উঠান। উঠানের

এক পাশে—পশ্চিমের প্রাচীর ঘেঁষিয়া পাতকুয়া—তার ওধারে পায়খানা। পূবদিকে সদর দরজা; সেই দরজার মাথায় কি সব লতাগাছ। দরজার পাশে কয়েকটা বেগুন গাছ অন্ধকারেও সতেজ বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কোঠাঘরের ঠিক নীচেয় পাঁচ-সাত হাত লম্বা অপ্রশস্ত শাকের ক্ষেত। প্রচুর ধূম উদ্গীরণকারী কেরোসিনের কুপির আলোয় এতটা অবশ্য দেখিবার কথা নহে, কিন্তু অন্ধকারে বহুক্ষণ থাকিয়া চোখের দৃষ্টিও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে; গাঢ় অন্ধকার ফিকে বোধ হইতেছে।

রামচন্দ্র বালতির মধ্য হইতে তেলভরা হিঙ্কসের লণ্ঠনটা বাহির করিয়া জ্বালিল। সে আলোকে ঘর আলোকিত হইল। লোহার কড়ি-দেওয়া ছোট ঘর। মাত্র দুইটা লোহার কড়ি। পূবের দিকে একটি মাত্র হাফ্ জানালা আছে, উত্তরে পোষ্ট আপিসের দেওয়াল। ওদিকে একটি মাত্র দুয়ার রহিয়াছে, সেটি খুলিলে আপিসের মধ্যে যাওয়া যায়। পশ্চিমেও একটি দুয়ার পাশের ঘরে যাইবার জন্য। খালি দক্ষিণে একটা বড় জানালা ও দুয়ার আছে। পাশের ঘরটি আয়তনে ঈষৎ বড়। সেটির পশ্চিম দিকে খড়খড়ি-দেওয়া দু'টি জানালা। উত্তর দিকটায় দেওয়াল। আর পূর্ব্ব-দক্ষিণ এই ঘরেরই মত। আলো উঁচু করিয়া রামচন্দ্র ঘর দেখিতে লাগিল। যোগমায়াও ঘোমটাটা ঈষৎ খাটো করিয়া চারিদিকে চাহিল। শাদা দেওয়াল, এখানে ওখানে চুণবালি খসার দাগ। আসবাবপত্র যাহা ছিল পোষ্টমাষ্টার উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন,—এমন কি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পেরেকগুলি পর্য্যন্ত। পেরেক তোলার জন্যই হয়ত মেঝেয় অত ধুলা বালি জমিয়া জঞ্জালের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাপড় কাচিয়া শাশুড়ী ফিরিলেন। ঘর দেখিয়া বলিলেন, তাই ত, একবার ঝাঁট দিয়ে দিলে হ'ত। কাল সব ধুয়েমুছে নিলেই হবে।

রামচন্দ্র বলিল, এত রাত্রে ঝাঁটা কোথায় পাবে, মা?

সব এনেছি বাবা। নতুন বাসা পাতানো—কিছু ভুলে গেলে কি চলে।

সমস্ত গোছগাছ করিতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল।

কয়েক টুকরা শাঁকালু, কলা ও কিছু দুধ খাইয়া রামচন্দ্র ও যোগমায়া শয়ন করিল; শাশুড়ী জলস্পর্শ করিলেন না। গঙ্গাস্নান না করিয়া ট্রেনের মানুষ কি শুদ্ধ হইতে পারে?

নূতন দেশের প্রথম সকাল। প্রাচীরের ওপিঠে কাঁঠাল-গাছটার মাথায় রোদ পড়িয়া পাতাগুলি চিক্‌চিক্ করিতেছে। আমের কচি-কচি পাতাগুলি বাতাসে পত্ পত্ করিয়া দুলিতেছে। কাঁঠালগাছের মাথা ছাড়াইয়া অনেক দূরের একটা নবপত্রশোভিত দেবদারু গাছ দেখা যায়, গাছের মাথায় একটা চিল বসিয়া ডানা ঝাড়িতেছে। পশ্চিমের প্রাচীরের গায়ে একটা উঁচু তালগাছ—তার বাগড়াগুলি হইতে অসংখ্য বাবুই পাখীর বাসা সকালের হাওয়ায় এধার-ওধার দুলিতেছে। তার পাশে ঝাঁকড়া ডুমুর গাছে এক ঝাঁক ছাতারে পাখী কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। ঘরের নীচের পালং শাকের ক্ষেতটা মুড়াইয়া লওয়া সত্ত্বেও কচি কচি শীষ সমেত শাক বাহির হইয়াছে। বেগুনগাছে অনেকগুলি বেগুনী ফুল ধরিয়াছে—বেগুন একটাও নাই। দুয়ারের মাথায় সিমগাছে সাদা ও কালো সিম থলো থলো ঝুলিতেছে। ছোট্ট একটা চারা আমগাছ পায়খানার পাশে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে।

লক্ষ্মণ আসিতেই শাশুড়ী বলিলেন, বাবা আমায় একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে হবে।

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিল, এখানে গঙ্গা কোথায় মাঠাকরুণ! গোরাই নদী আছেন।

নদী তো, তাহলেই হবে। কত দূর বাবা?

এই তো কাছে। রশিটাক পথ হবে। কাপড় গামছা নিয়ে আপনি বরঞ্চ আমার সঙ্গে আসুন—

ঘরদুয়োরগুলো ততক্ষণে ধুয়ে ফেলি বাবা?

হাটবাজার কি করতে হবে আমায় বলবেন।

আজ আর কিছু চাই নে, বাবা। আলু, বেগুন, সিম, বড়ি সব এনেছি—তুমি একটু দুধ এনে দিও। আর বোকনোয় রাঁধবো। আমি চলে গেলে একটা ছোট তোলো হাঁড়ি আর খান দুই সরা কিনে দিও। পয়সা দিচ্ছি আজই না হয়—আজ কি বার বাবা?

আজ্ঞে, আজ সোমবার।

সোমে শুক্কুরে তো হাঁড়ি কিনতে নেই—কাড়তেও নেই। কালই তুমি কিনে এনো—এই পয়সা চারটে রাখ শুকনো কাঠ আছে তো বাবা?

হাঁ, একগাড়ি কাঠ কিনে সেদিন পোষ্টমাষ্টার মশায় চেলিয়ে রেখেছেন—দাম দিয়ে সেগুলো কিনে নিলেই হবে।

সেই ভাল। যিনি ছিলেন—তাঁরা কি জাত লক্ষ্মণ?

আজ্ঞে—ওনারা কায়েস্থ। ভারি ভালমানুষ আর ভদ্দর লোক ছিলেন।

চল, তোমার সঙ্গে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি—

অমনি পথটাও চেনা হয়ে যাক। বউমা, তুমিও তেল মেখে নেয়ে টেয়ে নাও। কাঠের উনুন—এসেই ধরাবো খন।

চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে রামচন্দ্রের একটু বেশী দেরিই হইল। বেলা দুইটার পর সে আসিলে শাশুড়ী বলিলেন, হাঁরে রাম, এই তিন পোর বেলায় খেয়েই তোর শরীরের এমন দশা বুঝি? এ কি কাজ রে বাপু, তিনপোর বেলা পর্য্যন্ত পিত্তি পাড়িয়ে—

কাল থেকে দশটায় খেয়ে বেরুব মা। আজ চার্জ্জ বুঝে নিতে একটু দেরি হ'ল কি না। ভাত বাড়, আমি চট্ করে মাথায় জলটা ঢেলে নিই।

কড়কড়ো ভাত ফেলে আবার ভাত চাপিয়েছে বউমা। ভাল ক'রে তেল মেখে নে।

আবার তিনটেয় আপিস যে।

পোড়া কপাল আপিসের, মানুষের নাবার খাবার সময় থাকে না! কি জানি বাপু—কেমন আপিস তোদের। আপন মনেই তিনি গজ্ গজ্ করিতে লাগিলেন।

বৈকালে রমেশবাবুদের বাড়ির মেয়েরা বেড়াইতে আসিলেন। বিদায়ী পোষ্টমাষ্টারের বাড়ির মেয়েরাও আসিলেন। বেশ মিশুক ও ভদ্র মেয়েগুলি। শাশুড়ী কম্বল পাতিয়া তাঁহাদের বসাইয়া আপ্যায়িত করিলেন।

এস মা, বোস। এটি তোমার মেয়ে বুঝি? এখনও বিয়ে হয় নি? তা ষেটের বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে উঠেছে।

পোষ্টমাষ্টারের গৃহিণী কহিলেন, আর মা, এই মাইনে—সংসার তো ষেটের এক ফোঁটা নয়। দু'বেলা আঠারোখানি পাতা পড়ে। বাড়িতে মা আছেন, বিধবা বোন আছেন, সেখানেও একটা সংসার। ভাগ্যি চার বিঘে ধানের জমি আছে—তাই।

শাশুড়ী বলিলেন, তা তো বটেই, তোমারই ত ষেটের ছেলে-মেয়ে সাতটি। কোলেরটি কি? ছেলে ঝি?

হাঁ মা, ছয় মেয়ের কোলে ওইটুকু সোনার গুঁড়ো। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—যেন বেঁচেবর্ত্তে থাকে।

কেরানী রমেশবাবুর বউটি অল্পবয়সী—সবে মাত্র কালে একটি ছেলে। সে যোগমায়ার কাছে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া আলাপ করিতেছিল।

তোমরা কত দিন এখানে আছ, ভাই?

কত দিন আর! এই ত শীতকালে এলাম—কুমোরখালি থেকে বদলি হ'য়ে। কোনখানে কি স্থিতু হ'য়ে বসতে পায়? পায়ে যেন কাক বাঁধা! তেমনি শরীরও ভাই, নানান জায়গার জলহাওয়া—

বউটি কথা কয় বেশি। তা হোক, কথাগুলি তার ভারি মিষ্ট। কতই বা বয়স, বড় জোর কুড়ি। একটি ছেলে কোলে পাইয়া সে যেন কতকালের বুড়ি গৃহিণী হইয়া গিয়াছে।

তোমার শাশুড়ী নেই, ভাই? যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল।

না ভাই। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক বলতে কেউ নেই। একটু থামিয়া বলিল, নেই এক হিসেবে ভাল। যা শুনি সব!

কি শোন ভাই?

এই বৌ-কাঁটকি-পনা। কুমোরখালিতে আমাদের কোয়াটারের পাশে এক ঘর তেলি ছিল। সে বাড়ির গিন্নি এমন দজ্জাল ছিল যে বাক্যিযন্ত্রণা সইতে না পেরে কচি বউটা এক দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরল। সে কি কাণ্ড ভাই! থানা পুলিস হৈ-হাকার। টাকার ঘণ্ট ক'রে তবে ওরা সে যাত্রা রক্ষে পায়।

কেন যন্ত্রণা দেয় বউকে?

স্বভাব। একলষেঁড়ে লোকগুলোর স্বভাবই ওই। তোমার শাশুড়ী দেখছি খুব ভাল লোক। নতুন বাসা গুছিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছেন। আর গোছানীও খুব।

হাঁ, অপরিষ্কারপনা মা দেখতে পারেন না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে শাশুড়ী বলিলেন, আসন কখানা উঠিয়ে ওই জানালায় রাখ। কম্বলের আসন কাচতে হবে না—একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলেই শুদ্ধু হবে।

গঙ্গাজল কোথায় পাবেন?

কেন, লক্ষ্মণ যে বললে, একটা তাঁবার ফেরো ক'রে পাঠিয়ে দেবে। দেয় নি?

ওই ত একটা ছোট ফেরো দিয়ে গেছে।

এইটুকুন? আগে কি জানি অগঙ্গার দেশ, তাহলে এক ঘড়া জলও আনতাম সঙ্গে ক'রে। কে জানে মা, গঙ্গা নেই—এমন দেশও আছে!

ক্রমশঃ

৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

শ্রীইন্দিরা দেবী

২

গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় মাতৃদেবীর বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার কথা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করেছি; তাই এবার তাঁর লেখাপড়া-চর্চ্চার কথা দিয়ে আরম্ভ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যদিও বাল্যের সেই পাঠশালার পর থেকে তিনি আর কখনো কোন স্কুলে গিয়ে রীতিমত শেখবার সুযোগ পান নি তবু নিজেকে নিজে যে পরিমাণ শিখিয়ে তুলেছিলেন, অনেক আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের তুলনায় সেটা বেশী বই কম নয়। মাতৃভাষা বাঙ্গলার কথা ছেড়ে দিলেও, ইংরেজী বেশ ভালই বলতে ও কাজচলাগোছ লিখতে পারতেন। তবে স্বভাবতঃই নিজের উপর বিশ্বাস কম ছিল ব'লে বানানাদি দেখবার জন্য সর্ব্বদাই ইংরেজী-বাঙ্গলা অভিধান হাতের কাছে রাখতেন, বা কারও কাছে সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে নিতেন। তাঁর পড়ার ঝোঁকের বিষয় এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই কয়েক বৎসর আগেও রাত বারোটা পর্য্যন্ত সমানে জেগে আরাম-চৌকীতে ব'সে বই পড়ে তবে শুতে যেতেন। আর শেষবয়সেও ক্রমাগত জিজ্ঞেস করতেন যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে নতুন নতুন যে-সব তথ্য বেরিয়েছে, সে বিষয়ে কোন বই দিতে পারি কি না। অবশ্য এই বিদ্যাচর্চ্চার মূলে বাবার প্ররোচনা ও উৎসাহ ছিল। বিলেত ও পরে বোম্বাই থেকে যে-সব চিঠি তিনি মাকে লিখেছিলেন, সেগুলি এখনো আমার কাছে রয়েছে (আনুমানিক ১৮৬২—৬৫ খ্রীঃ)। তাতে প্রায়ই খোঁজ করতেন মা কি বই পড়ছেন, ইংরেজী শেখবার জন্য 'বিবি' রেখেছেন কি না, ইত্যাদি। তার উপর মায়ের স্বাভাবিক গল্প পড়বার নেশাও তাঁকে বিদেশী ভাষার প্রথম সোপানগুলি অতিক্রম করবার সহায়তা করেছিল। ফরাসীও কিছু কিছু শিখেছিলেন; বলবার মত না হোক্, বই পড়বার মত। বিলেতে থাকাকালীন এই দুই বিদেশী ভাষারই কিছু-না-কিছু অনুশীলনও আপনা হতেই হয়েছিল। বাড়ীতেও উপনিষদ থেকে সংস্কৃত কাব্য পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার যে হাওয়া বইত, তার কিছু মেয়েদের গায়েও নিশ্চয়ই লাগত। সংস্কৃত কাব্যচর্চ্চা বাবার বিশেষ প্রিয় ছিল। তা ছাড়া তিনি বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত প্রদেশে বদ্‌লি হতেন, তত্তৎ ভাষায় তাঁর মত পরীক্ষা দিতে না হ'লেও, কিছু কিছু ছিটেফোঁটা মায়েরও আয়ত্ত হ'ত। যদিও আমরা এত সুযোগ পেয়েও বোম্বাই প্রদেশের কোন ভাষাই ভাল ক'রে শিখি নি ব'লে আমার এখনো আপশোষ হয়। তার কারণ পুরুষরা সকলেই ইংরেজীতেই কথা বলতেন, আর মেয়েরা একরকম ভাঙ্গা হিন্দীতেই কাজ চালিয়ে দিতেন। গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়ী, সিন্ধী,—কত ভাষাই বা মানুষে শিখতে পারে?—এই ভাষা-সঙ্কটে পড়েই ত এতদিনেও আমাদের ঐক্য হল না; কোনকালে হবে কি না, কে জানে।

বোম্বাইয়ের কথা

বাবা বোধ হয় ১৮৬৪ খ্রীঃ বিলেত থেকে সিবিল সার্ব্বিস্ পাস ক'রে দেশে আসেন, ও তার কিছু পরেই মাকে নিয়ে বম্বে যাত্রা করেন। তখনকার দিনের এক বস্ত্রে ত আর বাড়ীর ভিতর ছেড়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কোন এক ফরাসী মেম দর্জ্জিনীর শরণাপন্ন হ'য়ে মায়ের জন্য এক তথাকথিত "oriental" পোষাক তৈরি করালেন। অনুমানে মনে হয় সেটা ফুলো পায়জামার উপর পিঠের দিকে খোলা পেশোয়াজ বা ঘাঘরাজাতীয় কিছু একটা হবে; যা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে, মা নিজে পরতে পারতেন না, তাই বাবার পরিয়ে দিতে হ'ত। দু-চারখানা শাড়ীও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

বাপের কাছ থেকে বউকে বম্বে নিয়ে যাবার অনুমতি পেলে, ঐ পোষাক পরিয়ে, ঘেরাটোপ-দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়ে মা'কে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। সেখানকার অনভ্যস্ত খাবারও তাঁকে বাবার খাইয়ে দিতে হ'ত। বাবা নিজে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও সংসার-অনভিজ্ঞ লোক ছিলেন ব'লে প্রথম প্রথম মতি নামে এক চালাক মুসলমান চাকরের উপরেই সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে বুঝেছিলেন যে, সেঁ ব্যক্তি ওঁদের যথেষ্ট ঠকিয়েছিল।

বম্বে গিয়ে ওঁরা প্রথমে মাণিকজী খুরশেদজী নামক

এক পার্শী রইসের বাড়ীতে ওঠেন ও কিছুদিন থাকেন। তাঁর বিদুষী কন্যাদ্বয়ের মধ্যে চিররুগ্না ও চিরকুমারী সিরীণ বাই ৯০ বৎসর বয়সে এই সেদিন মারা গেলেন। তাঁরা মাকে খুব যত্ন করতেন ও লজ্জায় কথা বলতেন না ব'লে "মূগীমাসি" (বোবা) বলে ডাকতেন। ইংরেজ সমাজে মেলামেশা ও কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া প্রভৃতি মেমিয়ানীর হাতেখড়ি তাঁদের বাড়ীতেই মায়ের হয়। এবং তাঁদের দৃষ্টান্তেই তাঁর পূর্ব্বোক্ত কিম্ভূতকিমাকার পোষাক ছেড়ে পার্শী শাড়ীর অনুকরণে"বোম্বাই" শাড়ী পরা নামক সেকেলে শাড়ী পরবার রেওয়াজ তিনি প্রবর্ত্তন করেন; কেবল ডান কাঁধের পরিবর্ত্তে বাঁ কাঁধের উপর শাড়ীর আঁচল ফেলে। দেশে এসে নাকি বিজ্ঞাপন দেন যে, যাঁরা উক্ত প্রকার শাড়ী পরবার কেতা শিখতে ইচ্ছে করেন, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এলে তাঁদের সেটা শিখিয়ে দেওয়া হবে। পরে শুনেছি যে সিবিলিয়ানী, বাবার বন্ধু ও পরে কুটুম্ব বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত ছিলেন প্রথম শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে অন্যতম। এই বোম্বাই ধরণ থেকেই কালক্রমে বাঙ্গালী মেয়েদের বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর 'পহিরওয়া' উদ্ভূত হয়েছে; তাই তার প্রবর্ত্তকের প্রতি আমাদের মেয়েদের নিশ্চয়ই চিরকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং ব'লে এক মারাঠী পরিবারের সঙ্গেও মা'দের খুব ভাব হয়েছিল। তাঁদের তিন মেয়ে আনা, দুর্গা ও মাণিক বাঈয়ের মধ্যে শেষোক্ত দুটিকে আমার একটু একটু মনে আছে। আর গোবিন্দ কড়্‌কড়ে ব'লে বাবাদের এক সুরসিক ও সুপুরুষ খ্রীষ্টান মারাঠী বন্ধুকে এখনো অনেক সময়ে মনে করি। তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা বাবার বোম্বাই-প্রবাস বইয়ে আছে। আমাদের স্কুলের ছুটির সময় যখন বাবার কাছে যেতুম, তখন তাঁর পুনার বাড়ী আমাদের একটি প্রিয় ও পরিচিত গম্যস্থান ছিল। তাঁর মজার মজার গল্প করতে গেলে আর কথা ফুরবে না। আর মা-বাবার সুদীর্ঘ বোম্বাই-প্রবাসের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত দিতে গেলেও স্থান সঙ্কুলান হবে না। আমেদাবাদ, আহমদনগর, পুনা, বেলগাঁও, নাসিক, সক্কর, শিকারপুর, থানা, শোলাপুর, বিজাপুর, কারোয়ার সাতারা প্রভৃতি বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে ওঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন। মাঝে বছর খানেকের জন্য আমরা সিমলা পাহাড়ে গিয়ে থাকি ও ইস্কুল যাই। সেই সময়েই মা'র কাছে আমাদের বাঙ্গলায় হাতে খড়ি হয়; আর আমাকে তিনি তাঁর প্রিয় কবি শেলির কবিতা মুখস্থ করান মনে আছে। কারোয়ার থেকেই রবিকাকা বিয়ে করতে বাড়ী আসেন এবং সে সুন্দর বন্দরের সঙ্গে আমাদের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। শোলাপুর-বিজাপুরে বাবা দীর্ঘকাল ছিলেন, আমরাও অনেক বার গেছি; সাতারা থেকে ১৮৯৬ খ্রীঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বাবা এবং বিশেষতঃ মা চিরকালই আত্মীয়বৎসল ছিলেন। তাই বোম্বাই প্রবাসকালে বোধ হয় আমাদের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কারোরই বোম্বাইয়ে আসা ও থাকা বাকি ছিল না। বাবা অল্পবয়সে অনেক দিন বাতে ভুগেছিলেন ব'লে মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতেন। তখন আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁরা খুব আদর-যত্ন পেতেন। এই রকম কোন এক সময় বাবা মাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে কোন্ বড়ামেমের সঙ্গে লাটসাহেবের বাড়ী পাঠান; নিজে অসুস্থ ছিলেন বলে সঙ্গে যেতে পারেন নি। সেখানে ঠাকুর-গোষ্ঠীর যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বাড়ীর এক বউ গেছে শুনে তাঁরা নাকি লজ্জায় পালিয়ে যান।

বাবার সংসারানভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি। মায়েরও বম্বে থাকাকালীন মাথার উপর কোন প্রবীণা গৃহিণী সহায় ছিলেন না ব'লে অজ্ঞতাবশতঃ প্রথম প্রথম দু'-একটি সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম অবস্থায় কিছুদিন এসে একবার একলা জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। সেই সময়েই বাবার পূর্ব্বোক্ত চিঠির অধিকাংশ লেখা, এবং তার থেকে তৎকালীন অনেক পারিবারিক কথা জানা যায়। গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর (গগনেন্দ্রনাথের জ্যাঠামশায়) সেকালে পুরস্কার ঘোষণা পূর্ব্বক এক নাটক লিখিয়ে প্রথম নিজের বাড়ীতে অভিনয় করান। বাড়ীর লোককে দিয়ে মিলেমিশে ঘরাওভাবে নাটক অভিনয় করানো মায়েরও বিশেষ সখের মধ্যে ছিল, যখন ছেলেবেলায় আমরা জোড়াসাঁকোর বাড়ী থাকতুম। তার জন্য কত মান-অভিমানের পালা ভাঙতে হ'ত, তিনি নিজে তার গল্প করতেন।

তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয় পুনা শহরে; যে জন্য তিনি নিজে বলতেন, আমি একাধারে ইংরেজরাজের বিদ্বেষভাজন দুই প্রকার ব্যক্তি,—Bengali Babu এবং Poona Brahmin! স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালেরও একই জন্মস্থান। আমার জন্ম হয় বিজাপুর অঞ্চলের কালাদ্‌গি শহরে। আমার পরে 'কবীন্দ্র' নামে একটি ভাই ছিল, যাকে 'চোবি' ব'লে ডাকা হ'ত। আর বিলেতে গিয়ে একটি ছেলে হয়ে ত্রিশ দিন মাত্র বেঁচে থাকে। এই শেষ দু'টি ছেলেই সেখানে মারা যায়। একটির ছোট গোর এখনো বিলেতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের

পাশে দেখতে পাওয়া যায়। চোবির জন্য সেদিন পর্য্যন্তও মা দুঃখ ক'রে গেছেন,—আশ্চর্য্য।

বিলেতের কথা

কি সূত্রে ও কেন যে আনুমানিক ১৮৭৭ খ্রীঃ বাবা নিজে সঙ্গে না গিয়ে এক ইংরেজ বন্ধু-দম্পতী এবং দু-একটি চাকরের তত্ত্বাবধানে মাকে বিলেত পাঠিয়ে দেন, তা আমরা ঠিক জানিনে। আমাদের মত তিনটি অপোগণ্ড শিশুসন্তানসহ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঐ অল্প বয়সে অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে যে মা ঐ দূরদেশে পাড়ি দিতে রাজি হ'লেন, তার থেকেই বোঝা যায় তাঁর কতটা মনের জোর ছিল। আমরা ত এখনো বোধ হয় পারিনে। ওঁদের জ্ঞাতি জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হয়ে কৃষ্ণ বন্দ্যোর মেয়েকে বিয়ে করে সপরিবারে বিলাতপ্রবাসী হয়েছিলেন; তিনিও এতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করলেন। আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন, এবং কিছুদিন নিজের বাড়ীতে রাখলেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন বাসাবাড়ীতে মা থাকেন, এবং তাঁর নিজের ও ছেলেদের ব্যারামে বিপদআপদে কতকগুলি ইংরেজ মেমের কাছ থেকে খুব সাহায্য-সহানুভূতি পান। বিলেতে Tunbridge Wells, ও Brighton, Torquayতে যাবার কথা আমাদেরও একটু একটু মনে পড়ে। আর দেশী লোকের মধ্যে মেবল্ দত্ত (যিনি পরে তারকনাথ পালিতের পুত্রবধূ হন), অ্যানি চক্রবর্ত্তী (সূর্য্যকুমার গুডীভ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে) প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। যেমন মনোমোহন ঘোষ, তেমনি স্যর তারকনাথ বাবার সহপাঠী ও আজীবন বন্ধু ছিলেন। পরের বৎসর বোধ হয় বাবা রবিকাকাকে নিয়ে আমাদের কাছে আসেন ও প্রায় বছর আড়াই আমরা সকলে বিলেতে থাকি। মাঝে একবার ফ্রান্সে যাই।

মা বলেন প্রথম বিলেতে বরফ-পড়া দেখে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে, পাতলা রেশমী শাড়ীজামা পরেই বাইরে ছুটে গিয়ে বরফ কুড়তে থাকেন, যদিও সবাই বারণ করেছিল। তার ফলে তাঁর খুব অসুখ করে, আর উপর-হাতে একটা নালি-ঘা হয়, যার দরুন বহুকাল উঁচু করে হাত তুলতে পারতেন না। এদেশে এসে গুরুচরণ কবিরাজের তেল মালিশে তবে সারে।

আমার মায়ের স্বাস্থ্য স্বভাবতঃ খুব ভাল ছিল বটে, কিন্তু ঐরকম এক-একটা খেয়ালের বশে এক একবার খুব অসুখে ভুগতেন। যেমন ঐ বরফ কুড়বার কথা বল্লুম। তার পরে এদেশে পাহাড়ে থাকবার সময় হঠাৎ খেয়াল হ'ল দরওয়ানের হাতের তৈরি ডালরুটি কেবল খাবেন; আর একবার শিলাইদহের জমিদারীতে বেড়াতে গিয়ে কোমর পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে কতক্ষণ ধরে বসে রইলেন। বলা বাহুল্য এ কোনটারই ফল ভাল হয় নি। ওদিকে নিজের বা পরের সামান্য অসুখ বা কষ্টকে খুবই ডরাতেন। কতকগুলি অসাধারণ সাহসের সঙ্গে কতকগুলি অসাধারণ ভয়ও ছিল,—যথা জলের ভয়, চোরের ভয়, ইত্যাদি। কি ভাগ্যি আমরা সেগুলি ততটা পাই নি। নিজেকে অহেতুক কষ্ট দেবার কি রকম একটা প্রবণতা তাঁর ছিল, যে জন্য ছেলের কাছে খুব বকুনি খেতেন। বোধ হয় প্রথম ছেলেগুলি নষ্ট হওয়ায় ও পরে মারা যাওয়ায় স্বাভাবিক ব্যস্ততাটা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। ছেলেদের সামান্য ব্যামোতেই অতিরিক্ত ভয় পেতেন, সামান্য ফিরতে দেরি হ'লেই একদৃষ্টে পথ চেয়ে বসে থাকতেন। ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না ব'লে প্রথম বয়সে ত কেঁদে কেটে তাঁকে বিলেত যেতেই দিলেন না। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে যখন কোন কাজে একবার তিনি বিলেত যান, তখন ঘটনাচক্রে পৌঁছান সংবাদের তার আসতে একদিন দেরি হয় বলে মা নিজেকে ও পুত্রবধূকে একেবারে বিশ্বাস না করিয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না যে, তাঁর ছেলে আর নেই, ঐ পশ্চিম-সমুদ্রেই ডুবে গেছে,—এই ব'লে ছেলেমানুষ বউকে নিয়ে পশ্চিমের দিকে চেয়ে বালিগঞ্জের বাড়ীর (এখন বিরলা পার্কের) ছাতে বসে রইলেন। পরে বড় নাতি সুবীরেন্দ্রকে মানুষ ক'রে সেই মনোভাব তার প্রতি আরোপ করেছিলেন। সে বিলেতে থাকতে যদি সাপ্তাহিক চিঠির একখানাও ফস্কে যেত ত চক্ষে অন্ধকার দেখতেন; আমরাও যে কি ক'রে কা'কে দিয়ে তার খবর আনাই তার ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়তুম। আবার তার কুশল-সংবাদ এলে হয় ত আহ্লাদের চোটে চাকরবাকরকে ভোজ খাইয়ে দিতেন। হায়!—সেই মানুষকেও শেষাশেষি জিজ্ঞেস করতে শুনেছি যে—"সুবীর" কে? আর চেঁচিয়ে হাজার বুঝিয়ে বললেও বুঝতে পারতেন না। জরার মত গৃহশত্রু কি মানুষের আর আছে?—অথবা স্মৃতিলোপ করে ব'লে এই জরাকে এক হিসেবে পরম বন্ধুও বলা যেতে পারে। নইলে ঐ মানুষ কি প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারতেন?—Whom the gods love die young.

মানুষের জীবন বাইরের ঘটনাসমষ্টিতে নয়, মানুষের জীবন মনের গতিতে। বিলেত যাবার আগে পর্য্যন্ত মাতৃ-দেবীর জীবন আমাদের পক্ষে যেমন অজানার কোঠায়

পড়ে, তেমনি সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নিজের মুখ থেকেই তার কতক বৃত্তান্ত আদায় করে নিতে পেরেছি। তাঁর পরবর্ত্তী জীবন আমাদের স্মৃতির এলাকার মধ্যেই এসে পড়ে, এবং বলতে গেলে আমাদের জীবনের সঙ্গেই অ-বিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। তাই ভাবি যে, মানুষের জীবনের কতটুকু বাস্তবিক তার নিজের একার?—দশজনের সম্পর্কে আদান-প্রদানেই তার জীবন ফুটে ওঠে। বিশেষতঃ মেয়েদের, ও বিশেষতঃ এদেশে। তবু মা একটা যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন ব'লে তাঁর জীবন যথেষ্ট পরিবর্ত্তনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল; আমাদের মত নয় যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক ভাবেই চলে যাচ্ছে ও যাবে। তাঁরা এক একটা যুগের প্রতীকস্বরূপ।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর মা আমাদের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বেশীর ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন। ছুটিতে ছুটিতে আমরা, বিশেষতঃ আমি, বাবার কাছে গিয়ে থাকতুম। যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অল্পই বাস করেছি। ভবানীপুর অঞ্চলে ও শেষাশেষি বালিগঞ্জেই ভিন্ন ভিন্ন ভাড়া বাড়ীতে থেকেছি, যতদিন না নিজেদের বাড়ী কেনা হয়। তাও শুধু একবার নয়। দুই-তিনটে বাড়ী একবার কেনা আবার বেচা হয়েছে। আর যখনই কারও অসুখ বা কোন আত্মীয়ার প্রসববেদনা উপস্থিত, তখনই যোড়া-সাঁকোয় মায়ের ডাক পড়েছে; কিম্বা তাদের নিজের বাড়ী এনে তিনি শুশ্রূষা করেছেন। যেখানেই যখন থাকি না কেন, মায়ের সৌজন্যগুণে সে বাড়ী সর্ব্বদাই আনন্দময় এবং আত্মীয়-বন্ধু-কলরবে মুখরিত থাকত। তখনকার তুলনায় এখনকার অনেক পরিবার কি নিরানন্দ ও একলষেঁড়ে মনে হয়। সকলেই হয় নিজের নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ, কিংবা দেশের উপকার নিয়ে ব্যস্ত; কিন্তু ভালই হোক্ মন্দই হোক্, সমবেত সামাজিক জীবন নেই বললেই হয়। যেটুকু পড়াশুনা করেছি, তা ঐ হট্টগোলের মধ্যে কি ক'রে করেছি তাই ভাবি। কিন্তু মায়ের সেদিকেও খুব লক্ষ্য ছিল। ভাল ক'রে দেখাশুনা হবে ভেবে দাদাকে St. Xavier's-এ এবং আমাকে লোরেটোতে ভর্ত্তি করেন। তিনি যা ব্যবস্থা করতেন, বাবা কখনো তা'তে আপত্তি করতেন না, সেই জন্য নিজের মতে চলতে এবং অপরকে চালাতে তিনি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন।

যোড়াসাঁকোর সেই প্রাথমিক গীতাভিনয় ও বাল্মীকি প্রতিভার পরে আমাদেরই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে ও বেথুন স্কুলে "মায়ার খেলা," "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জ্জন" অভিনীত হয়। দ্বিতীয়টিতে মা রাণী সুমিত্রা ও রবিকাকা রাজা বিক্রম সাজেন। "হঠাৎ নবাব"ও একবার হয়। সে যে কি আমোদ! এক-একটা বংশের এক একটা সত্য যুগ থাকে। আমাদের তখন তাই ছিল এখন মনে হয়। একবার একটা ছদ্মবেশ সান্ধ্য সম্মিলন হয়েছিল মনে আছে; তাতে শাদা কাপড় পরে মা 'দিন,' এবং কালো কাপড় প'রে আমি 'রাত্রি' সেজেছিলুম। আর আমার একটি জ্যেঠতুতো বোন গোঁফ লাগিয়ে ধুতিচাদর প'রে এমন সুন্দর ফুল-বাবুটি সেজেছিলেন যে, তিনিই পুরস্কার পেলেন। এই সেদিনই আমাদের বাড়ীতে ঠিক এই জিনিসটির পুনরাবৃত্তি হল, ছদ্মবেশগুলিও ভালই হয়েছিল; কিন্তু ঠিক সে জিনিষটি হয় না, কেন কে জানে। হয় সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মধ্যস্থতা অভাবে "কি যেন কি নেই" মনে হয়, কিংবা আমরাই বুড়ো হয়ে গেছি।—সেইটেই আসল কথা। তবে এটাও ঠিক যে—তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। অর্থাৎ অনেক প্রতিকূল জিনিস এখন সকলের জীবনে এসে পড়েছে, যা তখন ছিল না; আর অনেক অনুকূল জিনিস তখন ছিল, যা এখন নেই।

বাইরের ঘটনাবলীর ক্রম ধরে দেখতে গেলে, আমাদের সম্মিলিত জীবন গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মোটামুটি এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী বদল ও দেশ-ভ্রমণের ভিতর দিয়ে, লেখাপড়া ও আমোদ-প্রমোদের আবেষ্টনে সমভাবে কেটে গিয়েছিল; তার মধ্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি, পারিবারিক জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ছাড়া। অবশ্য সেইগুলিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেদের হ'লেই উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে। যথা, মায়ের নিজের ছেলেমেয়ের বিবাহ। ছেলেকে অনেকদিন বিয়ে করতে রাজি করাতে পারেন নি, এবং সুন্দর মেয়ে খোঁজবার পালা লিখতে গেলে একটা আলাদা বই হয়ে পড়ে। অবশেষে মায়ের ঐকান্তিক অনুরোধ-উপরোধ এড়াতে না পেরে তিনি ১৯০৩ খ্রীঃ অনেক বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠা একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। তার কয়েক বৎসর আগে আমার বিবাহ হয়। সে সময়ও মায়ের ঐ এক সর্ত্ত ছিল, যেন তাঁর মেয়েকে কোথাও দূরে বিদেশে নিয়ে যাওয়া না হয়।

বস্তুতঃ ভেবে দেখতে গেলে, সব প্রথমে নিজের ছেলে-মেয়ে, তার পরে নিজের বাপ-মা, তার পরে নিকট আত্মীয়-স্বজন,—এই ক্রমবিবর্দ্ধমান পরিধির মধ্যবিন্দু স্বরূপেই মায়ের কেন্দ্রানুগ প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পেত। ছেলেবেলা সেই যে আলাদা ঘরে গিয়ে শুধু মা মা বলে ডাকতেই আনন্দ পেতেন, সেই ভাবে নিজের কাছে থাকবেন ব'লে বাপ-মাকে কলকাতায় ভিন্ন ভিন্ন বাসায় রেখে

সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ সেবাযত্ন করেছেন। দিদিমা গঙ্গার ধারে থাকতে ভালবাসেন ব'লে নিজের হীরের গয়না (খুব সম্ভব ন্যায্য দামের ঢের কমে) বিক্রী ক'রে ঘুস্‌ড়িতে বেশ একটি ছোটখাটো বাগানবাড়ী কিনে দিলেন। তার পর অসুখে-বিসুখে ছেলেপিলে ছেড়ে অতদূরে ঠিকে গাড়ী ক'রে গিয়ে দেখাশুনা করতে অসুবিধে হয় ব'লে কিছু দিন পরে সেটা (আবার সম্ভবতঃ অতি সস্তায়) বিক্রী করে দিলেন। এই হীরের গয়নার একটু ইতিহাস আছে। বাবাকে বিলেতে যাবার খরচ দিতে হয়েছিল, তাই বোধ হয় ঠাকুরমা (তাঁকে আমরা বলতুম কর্ত্তা দিদিমা) ভাবলেন যে, বউয়ের গয়না নিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিলে কোন দোষ হবে না। কর্ত্তাদাদামশায় এই কথা শুনে নাকি বললেন যে, সত্যেন্দ্রের বিলেতের খরচা লেগেছে ব'লে তার বউয়ের গয়না যাবে কেন?—ব'লে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক হীরের কণ্ঠী ছিল, যেটা প'রে ছেলেবাবুরা বিয়ে করতে যেতেন, সেইটে মাকে দিয়ে দিলেন। এরকম জিনিস সাধারণতঃ লোকে পরিবারের বাইরে যাওয়া পছন্দ করে না: কিন্তু মায়ের তার চেয়ে প্রবল আপত্তি ছিল অন্যান্য নিয়মিত অর্থ-সাহায্যের উপর বাপমায়ের জন্য আবার স্বামীর কাছ থেকে টাকা চাওয়ায়। এই এক ঘটনা থেকেই তাঁর মাতৃভক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি অনেক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক মনোভাব মায়ের খুবই ছিল এই হিসেবে যে, অতিথি-অভ্যাগত ছোট বড় যে কাছে আসত, তাদের আদর-আপ্যায়নে তাঁর মত সিদ্ধহস্ত ও মুক্তহস্ত লোক কমই দেখেছি। কিন্তু ঠিক যাকে আজকাল "সোসাইটি" বলে, অর্থাৎ সময় কাটানোর জন্য বা কর্ত্তব্যবোধে দশ জন বন্ধুমানুষ বা গণ্যমান্য লোকের বাড়ী যাওয়া বা নিমন্ত্রণ খাওয়া,—সে ভাবটা একেবারেই ছিল না। আমরা নিমন্ত্রণাদিতে যেতুম ব'লে বরং আগে আগে খোঁটা দিয়েছেন; এবং তারও আগে বোম্বায়ে থাকতে ছোট ছেলেপিলে ছেড়ে বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইতেন না ব'লে কত দাম্পত্য কলহ বেধেছে শুনেছি। যতদিন জ্ঞান ছিল, বাড়ীর অন্য কারও ছেলেদের ছেড়ে বাইরে যাওয়াও পছন্দ করতেন না। বায়স্কোপ দেখাটা যে কি পদার্থ, তা কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত বুঝলেন না। অনেক কষ্টে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, একরকম পুতুলনাচ হবে! ইংরেজী কাপড় পরা তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। ভালমানুষ স্বামী পেয়েছিলেন ব'লে সেকেলে বিলাতফেরৎ হয়েও স্ত্রীর অনুরোধে কখনো তিনি মাথায় বিলিতী হ্যাট্ চড়ান নি; ছেলেরও কোনকালে সে প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু নাতিদের পর্য্যন্ত আর তাঁর সে আধিপত্য খাটে নি। 'যবন' জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

আত্মীয়বন্ধুবৎসলতার অবধি তাঁর ছিল না; কত আর দৃষ্টান্ত দেব? নিজের বাড়ীর যে জামাইদের শাশুড়ী ছিল না, বৎসর বৎসর তাঁদের সকলকে ডেকে জামাইষষ্ঠী দিয়েছেন; যে ভাইদের বোন নেই, আমাকে দিয়ে তাদের ভাইফোঁটা দিইয়েছেন। সকলের প্রতি এই সাম্য-ভাবেরই অভাব আজকাল দেখা যায়। চাকরদাসীও তাঁর স্নেহদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত ছিল না। খাওয়া হয়েছে কি না, শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল তাঁর প্রথম সম্ভাষণ। বড়লোকের চেয়ে চাকরদের তৃপ্তি ক'রে খাওয়াতেই তিনি বেশী ভাল-বাসতেন। পশুপক্ষী পর্য্যন্তও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য ব্যাপ্ত ছিল। একবার এক কসাইয়ের কাছ থেকে তিনটি বাছুর কিনে নিয়ে রাম লক্ষ্মণ সীতা নাম দিয়ে অতি যত্ন ক'রে রেখেছিলেন। কালো শাদা দুটো রাজহাঁসের নল দময়ন্তী নাম দিয়েছিলেন। বালীগঞ্জের বাড়ীতে (অধুনা বিরলা পার্কে) বিকেলে বাগানে বাঁধানো গাছতলায় ব'সে নিজের সামনে সব খাওয়াতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কত অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর কাছ থেকে কতরকম উপকার পাবার কথা জানিয়েছেন, যা আমরা জানতুমও না। ফ্রেনলজি শাস্ত্রে যাকে বলে motive temperament, তাই তাঁর ছিল। চুপ ক'রে থাকবার লোক তিনি ছিলেন না। যতক্ষণ অঙ্গ সচল ও মন সবল ছিল, কারো না কারো জন্য কিছু করতেন বা করবার অভিপ্রায়ে কল্পনায় জাল বুনতেন।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরে দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে যে শরীর খারাপ হয়, সে অসুখ শীঘ্র সারে না ও খুব রোগা হয়ে যাই। মা ত কেঁদেকেটে অনেক হাঙ্গাম ক'রে পাহাড় থেকে নাবিয়ে আনলেন। তার পর বললেন আমার মেয়ের যেখানে শরীর সারবে, সেইখানে বাড়ী করব। তখন স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে রাঁচির গুণগান সবে সুরু হয়েছে। কতক কবিরাজী ওষুধের ফলে এবং কতক রাঁচির হাওয়ার গুণে আমার নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়। তাই যে কথা, সেই কাজ,—মা ওঁরা সেখানে প্রথম দু-একটা ভাড়াবাড়ীতে থেকে পরে নিজেরা বাড়ী তৈরি করেন। কাকামশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাহাড়ের উপর শান্তিধাম বাড়ী ও চূড়ার উপর মন্দির ত এখন রাঁচিযাত্রী মাত্রেরই একটা দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছে। আর

পাহাড়ের তলায় মায়ের পরিকল্পিত বাংলো বাড়ীও তার আটপৌলে গড়নের দরুন একটু অসাধারণ ধরণের। বাবার ইচ্ছায় তার নাম রাখা হয় 'সত্যধাম'। যদিও তার আগে মা নিজের থেকে নাম দিয়েছিলেন 'ছাতুর হাঁড়ি'; অর্থাৎ আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত আল্‌নাস্কর যেমন এক হাঁড়ি ছাতু কিনে বেচে তার লাভ থেকে লক্ষপতি পর্য্যন্ত হবার স্বপ্ন দেখেছিল, এই বাড়ী থেকে তাঁরও সেই রকম লাভ হবে। এই টাকা ফেলে টাকা আনবার নানারকম কল্পনা তাঁর খেলত, কিন্তু বলা বাহুল্য কোনটা ফলপ্রসূ হয় নি; মাথাখেলানোই সার। বরং অনেক লোকসান দিয়েছেন। বাবা অবসর গ্রহণ করবার বছর পনর পরে তাঁরা দুই ভাইয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিধামে বহুকাল কাটান, ও কাকামশায় সেখানেই দেহ রাখেন। বহু বাড়ী বদল ও দেশভ্রমণের পর্ব্ব এই রাঁচির অধ্যায়েই সমাপ্ত হয়। মা তাঁর বড় নাতিকে ষোলো বছর বয়স পর্য্যন্ত 'সত্যধামে' রেখে মানুষ করেন, আর তারই মনোরঞ্জনার্থে তিনি "টাকডুমাডুম" ও "সাতভাই চম্পা" নামক দুটি পুরনো রূপকথাকে নাটিকাকারে লেখেন; সেগুলি পরেও অনেক ছেলেবুড়োর মনোরঞ্জন করেছে। সে নাতিও তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে গেলে আর একবার তাঁর জীবনে প্রাণান্তক যাতনা বোধ করেন। পরে বাবা ও কাকা দুজনেই চলে যাবার পর তাঁকে আমাদের কাছে কলকাতায় নিয়ে আসি। সেখানে প্রথমে কয় বৎসর মেয়ের কাছে ও পরে বছর আষ্টেক ছেলের কাছে থেকে গত ১৯৪১ খ্রীঃ ২রা অক্টোবরে অল্পদিন অসুখের পরেই ৯০ বৎসরে প'ড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই দীর্ঘজীবনের ও প্রাণপূর্ণ বিচিত্রমুখী ব্যক্তিত্বের আংশিক পরিচয়ও আমার অক্ষম লেখনীর পক্ষে দেওয়া অসম্ভব; তার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। আমরা খালি মালমশলা জড় করতে পারি, কিছু গ'ড়ে তুলতে পারি নে। তবু ভিতরের ও বাইরের তাগিদে সাধ্যমত এইটুকু অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্যে লিখে শেষ করলুম। তাঁর ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ ছিল। একবার আমার ভাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি মরে গেলে কি সুরেন বিবিকে দেখতে পাব?—কি জানি এখন সে প্রশ্নের উত্তর মিলেছে কিনা।

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

জটায় জড়িত প্রেম জটিল বাঁধন
পরাহত করে নিত্য সমস্ত সাধন—
কী দৈব দুর্গ্রহ—বসন ভূষণ পড়ি
নাই যে বিগ্রহ—, কারে কল্পনায় গড়ি
ক্ষণিক পূজিয়া ক্ষণে বিসর্জ্জন দেই
শূন্য ঘরে কর হানি; বলে নেই নেই।
মানসে জড়ায়ে আছে, সীমার সমস্যা
জটিল করিছে সে যে আত্মার তপস্যা।

আত্মা মোর অবিনাশী অনন্ত পিয়াসী
অনন্তের সনে তার যুক্ত জন্মরাশি
কোনোখানে ছেদ তার পড়ে না কখনও
আতঙ্কিত অভিভূত করে না মরণও
দৃষ্টি তার সৃষ্টি পারে সুনিবদ্ধ রয়
প্রেমে তার সুন্দরের সাক্ষাৎ মিলয়
নিত্য তার পূজা চলে অন্তরে অন্তরে
আনন্দগুঞ্জনে প্রেম অনন্তে গুঞ্জরে।

সঙ্কটে মধুসূদন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জলে কুমীর এবং ডাঙায় বাঘ:—ইহার মধ্যস্থলে গিয়া পড়াটা যে খুব নিরাপদ ও সুখের নহে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্র একথা স্বীকার করিতে বাধ্য।

অবশ্য, ও অবস্থা হইতে সচরাচর বাঁচিবার আশা কম থাকিলেও একেবারে যে অসম্ভব, তাহাও নহে। কেন না 'রাখে কেষ্ট মারে কে' এমন ভাগ্যবান লোকও জগতে আছে।

বিপদে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। অনেকে কি করিবে না-করিবে ভাবিয়া না পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে; অনেকের কল্পনা-শক্তি হঠাৎ বাড়িয়া যায়; আবার অনেকের মগজে এমন উপস্থিত বুদ্ধি খেলিয়া যায়, যে নিমেষে বিপদ কাটিয়া যায়!

আপনি আমি, ও-অবস্থায় পড়িলে কি করিতাম জানি না। আমি ত এক পা নড়িবার বা বাঁচিবার কল্পনাও করিতে পারিতাম না। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া ভগবানকে ডাকিবার কথাও ভুলিয়া যাইতাম।

আপনি হয়ত নিজেকে আমার মত অতটা অসহায় না ভাবিয়া, কল্পনা করিতে পারিতেন—হুস্ করিয়া উপর হইতে একটা হাওয়াই জাহাজ চিলের মত ছোঁ মারিয়া আপনাকে শূন্যমার্গে তুলিয়া লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিল;—চোখ খুলিয়া দেখিলেন, একটি পরিপাটি সাজান ঘরে ছোট্ট একটি চায়ের টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন—সম্মুখে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া চামচ দিয়া চা নাড়িতেছেন এক অচেনা তরুণী, মুখে তাঁহার বিস্মিত-স্মিত হাসি।

কিংবা হয়ত, পিছন দিকের গাছের আড়াল হইতে গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের নির্ঘোষ, গাঁক্ করিয়া বাঘটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল, কুমীরটাও সে শব্দে টুপ্ করিয়া জলের নীচে তলাইয়া গেল, এবং হয়ত, দু-একটা ছিটাগুলি ছিট্‌কাইয়া আপনার বাঁ-কাঁধের পিছনটা ফুঁড়িয়া ঢুকিয়া পরায়, অথবা অমনি একটা কিছুর আশঙ্কায় আপনি আর নিজেকে সজ্ঞানে রাখিতে পারিলেন না।

জ্ঞান হইলে দেখিলেন, হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া আছেন, সর্ব্বাঙ্গে দারুন ব্যথা, পিপাসায় ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে; অতি কষ্টে "একটু জল" বলিতেই মাথায় ফ্যাটা-বাঁধা নার্স আসিয়া কাচের গ্লাসে করিয়া একটু ব্র্যাণ্ডি খাইতে দিল।

আপনি বলিলেন, "আমি কোথায়? বাঘ কই?—কুমীর?"

স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর আসিল, "উত্তেজিত হবেন না, একটু ঘুমবার চেষ্টা করুন।"

নিতাই কিন্তু আপনার আমার মত নহে। সে ভাল করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিয়া চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি খেলাইল। বাঘও বনে গেল, কুমীরও জলে ডুবিল এবং নিজেও সে অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরিল।

কেমন করিয়া, বলিতেছি:—

বি. এ. পাস করা নিতাইচরণের বিবাহের বয়স হইয়াছে। মার্চ্চেণ্ট আপিসে ভাল চাকরিও জুটিয়াছে এবং বড়বাবুর বেশ ভাল রকম সুনজরেও পড়িয়াছে। এ হেন ত্র্যহস্পর্শযোগেও বিবাহের বিলম্ব হওয়া বিশেষ রহস্যপূর্ণ এবং সমাজে আন্দোলনের ব্যাপার!

নিতাইকে চাপিয়া ধরিলে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, "হবে হবে, সময় হলেই হবে।" কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠে।

তবে কি ফুল এখনও ফুটে নাই?

মাত্র মাস-তিনেক চাকরি করিতেছে—ইতিমধ্যে একটি প্রমোশনও পাইয়াছে।

বড়বাবু এক দিন নিজের চেম্বারে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কাজে সাহেব ও আমি বড় খুশী হয়েছি, বেশ মন দিয়ে কাজ করে যাও—উন্নতি হবে। হাঁ দেখ, বাড়ী ফেরবার পথে একবার আমার বাসাটা হয়ে যেও,—নম্বর জানা আছে ত? আচ্ছা যাও।"

বড়বাবুর দুই ছেলে এক মেয়ে। বড়ছেলে রমেন প্রায় নিতাইয়ের সমবয়সী। আই. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়াছে। ছবি আঁকে, বেহালা বাজায়, কবিতা লেখে এবং নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা ডাম্বেল ভাঁজে। বাড়ীর বাহির বিশেষ হয় না, কাহারও সঙ্গে বেশী কথা কহে না, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখে।

মাধবীর বয়স ষোল-সতের বৎসর হইবে। দেখিতে ভাল। ম্যাট্রিক দিবে। মায়ের ইচ্ছা, পড়াশুনা ছাড়াইয়া বিবাহ দেওয়া। বাপের ইচ্ছা—একটিমাত্র মেয়ে, আরও পড়ুক, আরও কিছু দিন মা-বাপের কাছে থাকুক। মা অমত করিতে পারেন না।

ছোট ছেলেটি বছর বারো-তেরোর হইবে। নাম হারাধন।

বড়বাবু আগেই বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। আরাম-চেয়ারে শুইয়া চা ও গড়গড়ার সঙ্গে একটি আধুনিক নভেল পড়িতেছিলেন। নিতাই আসিতেই—"এস এস, ঐ চেয়ারটায় ব'স,—হেঁটে এলে? দাঁড়াও, পাখাটা একটু জোর ক'রে দিয়ে ব'স। হারু, ও হারু" হাফপ্যাণ্ট-পরা হারু ছুটিয়া আসিতেই—"তোমার দিদিকে বল নিতাই বাবু এসেচেন—চা দিক।"

হারাধন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এক্ষুনি বলছি। আমার বইগুলো তাহলে নিয়ে আসি বাবা?"

বাবা যেন শুনিতে পান নাই—এমনি ভাবে নিতাইকে বলিলেন, "পড়াশোনার খুব ঝোঁক বুঝেছ, রমেনটারও ঠিক এমনি ছিল।" বলিয়া নভেল দিয়া মুখ আড়াল করিলেন।

হারাধনের উৎসাহ দমিয়া যায় দেখিয়া নিতাই বলিল, "নিয়ে এস ত দেখি, কি কি বই পড়!"

"এখন থাক্ না হারু, লোককে একটু জিরোতে দিতে হয়, তোমার সব তাতেই ব্যস্ততা" বলিতে বলিতে পর্দা সরাইয়া কাচের থালায় কিছু ফল ও মিষ্টি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া, নিতাইয়ের সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "আমি হারুর মা, এটুকু আগে মুখে দাও বাবা।" হারুকে বলিলেন, "এক গ্লাস জল নিয়ে এস ত।"

নিতাই একেবারে এতটা আশা করে নাই। হঠাৎ কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বেঁচে থাক, রাজা হও" বলিয়া তিনি তাহাকে বসিতে এবং খাইতে অনুরোধ করিয়া, কর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "নিতাই ত ইচ্ছে করলে সময় ক'রে হারুর পড়াশোনা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারে। আজকাল মাষ্টারের যা দর হয়েছে, তার ওপর সুবিধে মত;—আমার বাপু যাকে তাকে পছন্দও হয় না। কি বল?"

কর্ত্তা যেন এতক্ষণ এ জগতে ছিলেন না এমনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া, চা লইয়া সদ্য-আগতা কন্যাকে বলিলেন, "মাধু চা এনেছ—ঐ নিতাইকে দাও।" নিতাইকে—"এটা আপিস নয় নিতাই, আমিও এখন বড়বাবু নই,—লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ছ কেন?"

বস্তুতঃ মাধবীকে দেখিয়া নিতাইয়ের ঘাড় যেন ভাঙিয়া পড়িল,—সোজা আর হয় না।

বড়বাবু—গৃহিণীকে, "কি বলছিলে হারুর পড়ার কথা? নিতাইয়ের সুবিধে হ'লে অবশ্য খুবই ভাল হয়, তবে আমার তরফ থেকে জোর ক'রে বলা, বুঝতেই ত পাচ্ছ—আমাদের সম্বন্ধটা অন্য রকম কি না!"

হারু বিজ্ঞের মত বলিল, "আর দিদির?" মাধবী তাহাকে চাপা-ধমক দিল, "ঢের হয়েছে, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না—এঁচোড়! দিদির ভাবনা ভাবতে হবে না—নিজেরটা ভাব গে যাও।"

গৃহিণী, পুত্রকন্যাকে থামাইয়া অন্যত্র সরাইয়া দিলেন। কর্ত্তাকে পড়ায় মগ্ন দেখিয়া বলিলেন, "ওনার মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনে শুনে, তোমায় পর ব'লে আর মনে করতে ইচ্ছে করে না বাবা। সেই জন্যেই একটু জোর খাটাতে চাইছি। ছেলেটার পড়াশোনার বড় অসুবিধে হচ্ছে, মাধুরও পরীক্ষা মাথার ওপর। তোমায় কিন্তু এজন্যে কিছু নিতে হবে বাবা,' অতটা আব্দার চলবে কেন? তাই বলছিলাম ওনাকে—"

নিতাই প্রবল আপত্তি তুলিয়া বলিল, "না না, ওসব কথা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না। হারাধন আমার ভাইয়ের মত,—আমায় আর কিছু বলতে হবে না।" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল এবং কর্ত্তা, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বড়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "চললে নাকি হে, বেশ, বেশ। আপিসে এ সব কথা পাঁচ-কান ক'রো না। তোমার কাজে বড়সাহেব যে-রকম খুশী—বছরখানেকের মধ্যে চট্‌পট্ উন্নতি ক'রে ফেলবে। তা ছাড়া আমি ত পেছনে রয়েইছি—কি বল—হাঃ হাঃ হাঃ" হাসির রেশের মধ্যে নিতাই পথে আসিয়া পড়িল।

দু-চার দিনেই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গেল। হারাধন রোজ নিয়মিত পড়ে, মাধবী পড়ে না। বাতের অজুহাতে মা আসিতে না পারায় চা-জলখাবার, আপ্যায়ন ইত্যাদি তাহাকেই করিতে হয়। সে সহজ ভাবেই নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যায় এবং উপরন্তু এটা-ওটার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে, হারুর পড়ার ঘরে আরও বার-কয়েক আসিয়াও পড়ে।

এক ঘণ্টার স্থলে কোন কোন দিন দেড়-দু-ঘণ্টাও হইয়া যায় এবং নিয়মিত চা জলখাবারের উপর রাত্রের আহারও প্রায় সারিয়া যাইতে হয়।

চার-পাঁচ দিন পরে হারাধন এক দিন হাসিয়া বলিল, "দিদি আজ খুব বকুনি খেয়েছে, জানেন?"

"কেন? কার কাছে?"

"মার কাছে—আবার কার কাছে। বাবা ত আমাদের বকেন না!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিতাই চাহিয়া রহিল। "মা রোজ বলেন আপনার কাছে পড়তে, শোনে নি তাই।" কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "কাঁদছে—নিজের ঘরে ব'সে ব'সে—হি হি।"

নিতাইয়ের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। ভাবিল, মাধবী তাহার কাছে পড়িলেই ত পারে, কেহ ত আপত্তি করে নাই। আসে, যায়, কথা কয়, খাবার খাওয়ায়—সবই করে, শুধু পড়িতেই যত লজ্জা!

কিঞ্চিৎ দুঃসাহস হইলেও নিতাই পিছাইল না। সুযোগও ঘটিল। হঠাৎ বিরক্ত হইয়া হারু বলিল, "দেখুন না আমার খাতার সঙ্গে নিজের খাতাটি রেখে দেওয়া হয়েছে। খুঁজে না পেলে তখন আমার ওপর তম্বী হবে—দিদিগিরি ফলান হবে,—দেখেছেন ত?"

খাতাটি উল্টাইয়া নিতাই দেখিল নানা রকম আজেবাজে লেখায় পাতা ভরা। এক পাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু লেখা। শেষ পৃষ্ঠায় একটি ইংরেজী রচনা। নিতাই হাসিল।

"তোমার দিদিকে একবার ডেকে আনতে পার?"

হারাধন ত ঠিক ইহাই চাহিতেছিল। দিদির দোষ ধরা পড়িয়াছে। মাষ্টারমশাই শাসন করিবেন—সে দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে।

লাফাইয়া উঠিল, "এক্ষুনি ডাকছি।"

মধ্যসিঁড়িতেই দিদির সাক্ষাৎ,—সে নামিয়া আসিতেছিল। হারু গম্ভীর ভাবে বলিল, "মাষ্টারমশাই ডাকছেন।"

"কেন?"

"জানি নে।"

হারু ফিরিতেই মাধবী তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "একটা কাজ ক'রে দিবি ভাই?"

ঘুরিয়া হারু বলিল, "কি?"

"দেখ না ঝি এখনও এল না, তোর মাষ্টারমশাইকে চা জলখাবার দিতে পারছি নে, চট্ ক'রে বাজার থেকে একটু এনে দিবি?"

হারাধন দেখিল, দিদির শাস্তি দেখাটা তাহার ফস্‌কাইয়া যায়; অথচ দিদিকে কিছু বলাও ঠিক হইবে না। সে বলিল, "বা রে, আমি, আমি বাজার যাই—আর মাষ্টারমশাই একলা ব'সে থাকুন,—রাগ করেন যদি?"

"তুই যা না, আমি গিয়ে বলছি তাঁকে।" আর আপত্তি চলে না—অগত্যা মুখ হাঁড়ি করিয়া তাহাকে যাইতে হইল!

"আমায় ডেকেছিলেন?"

সঙ্গে হারাধন না থাকায় নিতাই যেন একটু অসহায় বোধ করিল। বলিল, "হারু কই?"

"আসছে, কেন?"

নিতাই হাসিয়া, "তার মহা রাগ, তার খাতার মধ্যে আপনার খাতা এল কি ক'রে।"

"কই দেখি?"

"সে আসুক, তবে না মজা দেখবেন।"

কিছুক্ষণ দু-জনেই নীরব। নিতাই নীরবতা ভাঙিল: "আপনার পরীক্ষা কবে?"

"মাস-তিনেক আছে।"

"আপনার ইংরিজী লেখাটায় কিছু কিছু গ্রামারের ভুল চোখে পড়ল, শুধরে দোব কি?"

"আপনি ত হারুর মাষ্টার, আমাকেও ওমনিতে পড়াবেন নাকি?"

"যদি পড়াই?"

"মা বলছিলেন মাষ্টারদের দর বেড়ে গেছে,—যুদ্ধের বাজার! মাইনে না নিলে আমি কিন্তু আপনার কাছে পড়ছি নে।"

"পাস করলে বকশিশ দেবেন।"

মাধবীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। মুখ নীচু করিয়া সে বলিল, "বেশ, যাকে সেই কথাই বলবেন। ওটা তা হ'লে শুধরেই দেবেন। গুরুই যখন হলেন, প্রথম দিনে একটি প্রণাম ক'রে নিই।"

ব্যস্ত ভাবে নিতাই "ছি ছি ও কি করেন! না না, এতে আমি কিন্তু ভারী লজ্জা পেলাম।"

মাধবী "এতে লজ্জা পেলে ত চলবে না এবং আমাকেও আর 'আপনি' ব'লে লজ্জা দিতে পারবেন না। হারু আসছে। আমি এখন যাই।"

মাধবীকে নিতাইয়ের কাছে নিয়মিত পড়িতে দেখিয়া তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়া কর্ত্তা-গৃহিণী নীরবে হাস্য বিনিময় করিলেন।

নিতাই রোজই দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, বিকালের জলযোগ ছাড়িয়াই দিয়াছে, রাত্রেও প্রায় খায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আপিসে কাজের চাপ পড়িয়াছে। খাওয়ার কথায়, কোন দিন হোটেলে খাইয়াছে বলে, কোন দিন বন্ধুবান্ধবের দোহাই দেয়, কোন দিন বলে, ক্ষুধা নাই। বিশেষ কেহ নজর না করিলেও মাতৃস্থানীয়া মাতুলানীর দৃষ্টি এড়ায় নাই এবং নানা রকম আশঙ্কায় তিনি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

মাতুল ব্রজনাথ অবসর-প্রাপ্ত সবজজ্। সারাজীবন বিহারেই কাটিয়াছে। ইদানী পেন্সনের সঙ্গে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অনিদ্রা এবং আরও কয়েকটি উপসর্গও ভোগ করিতেছেন। বিহারে স্বাস্থ্য ভালই ছিল, বাংলায় ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বিহারেই পরবাসী হইয়া বাকী জীবনটা কাটাইবার কল্পনা করেন, তবে সেখানে বাঙালী-বিহারী সমস্যা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মন শঙ্কাকুল হইয়া পড়ে।

শরীরের মধ্যে প্রকাণ্ড কেশবিহীন মস্তিষ্কের নীচে কালো ফ্রেমের মুখ-জোড়া চশমা ছাড়া, অস্থিচর্ম্মসার বাকীটুকু, বুক পর্য্যন্ত উঁচু টেবিলের আড়ালে প্রায় ঢাকাই পড়িয়া থাকে। সারাদিন ঐ ভাবে নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকেন। নানা প্রকার ওষুধ-বিসুধের ছোটবড় শিশি-বোতল টেবিলে র‍্যাকে আলমারীতে এবং ঘর জুড়িয়া এখানে ওখানে সাজানো,—ঘরটি দেখিলে হঠাৎ ছোটখাট ডিস্‌পেন্সারী বলিয়া ভ্রম হয়।

ব্রজনাথ নিঃসন্তান, পিতৃমাতৃহীন নিতাই তাঁহাদের সে অভাব মিটাইয়াছে। নিতাইয়ের এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু হয়। মাকেও তাহার মনে পড়ে না।

জ্ঞান হওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নিতাই তাঁহাদেরই পিতা মাতা বলিয়া জানিয়াছে, মানিয়াছে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছে এবং সন্তানের মতই তাঁহাদের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে।

মাতুলানীকে সে মা বলিয়া ডাকে, ব্রজনাথকে মামা বলে।

ব্রজনাথ ও নীরদাসুন্দরীর সারা-জীবনের সাধ, নিতাইকে ভাল করিয়া মানুষ করিয়া, নিজেদের পছন্দমত বিবাহ দিয়া ঘর-সংসার করেন।

নীরদাসুন্দরীর আরও একটু সাধ ছিল,—নিজের মামাতো ভাইয়ের মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। মেয়েটি বড় ভাল এবং অনেক দিন তাঁহার কাছে ছিল। মামাতো ভাই সুবোধ,—স্ত্রী মারা যাইবার পর হইতে দ্বিতীয় পক্ষ করা পর্য্যন্ত, প্রায় বছর-খানেক পদ্মাকে তাঁহার কাছেই রাখিয়াছিল। পদ্মা তখন বছর পাঁচ-ছয়ের মেয়ে।

তখনই তিনি মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, সুবোধকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রজনাথও জানিতেন, তবে কোন দিন বিশেষ উৎসাহ দেন নাই।

মা-মরা এবং বিমাতার কাছে মানুষ হওয়া মেয়েটির উপর নীরদার যথার্থই বড় মায়া!

ব্রজনাথের ইচ্ছা,—নিতাই বিবাহাদি করিয়া ওইখানেই বসবাস করে এবং তাঁহার সাধের বাড়ীটির তত্ত্বাবধান করে। তিনি শরীরের উন্নতির জন্য পশ্চিমেই থাকেন;—এবং মাঝে মাঝে আসিয়া বেড়াইয়া যান।

নিতাই ভাল ছেলে—ভাল চাকরিও করিতেছে। মাতুল ও মাতুলানীর মনোগত ইচ্ছা তাহারও অজানা নাই এবং ইহাতে অমত করিবারও তাহার কিছু থাকিতে পারে না। তাঁহাদের সাধ ও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়া, তাঁহাদের মনে ব্যথা দিয়া, নিজের জীবনের কর্ত্তব্য অবহেলা করিবার মত ছেলে সে নহে। এ-বিষয়ে দু-জনেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সুবোধ প্রায়ই তাগাদা দিয়া পত্র দেয়। আজও তাহার পত্র আসিয়াছে। লিখিয়াছে, পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায়, পদ্মা বয়সের অনুপাতে বেশী বাড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিম বলিয়াই রক্ষা, বাংলা হইলে এত দিনে পিতামাতার চিন্তার, অনিদ্রার এবং অন্নজল মুখে না রুচিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইত। পদ্মার বিমাতা ও বিষয়ে আর উদাসীন থাকিতে না পারিয়া, সাধ্যমত পাত্রানুসন্ধান করিয়া, কোথা হইতে নিজের এক জ্ঞাতিভ্রাতার উপযুক্ত পুত্রকে আমদানী করিয়া, তাহাকে সুবোধের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে;—এবং ছেলেটিও বেশ কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। চেহারা এবং চালচলনে বিশেষ সৎপাত্র বলিয়া মনে হয় না।

নিতাই সম্বন্ধে বারংবার আশ্বাস দিয়াও তাহাকে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট করিতে পারে নাই। স্ত্রীর জিদ ও জেরার সামনে সুবোধ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার ও পদ্মার জীবন দিনের পর দিন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই সমূহ বিপদ হইতে কন্যা ও পিতাকে উদ্ধার করিতে হইলে, নিতাই সম্বন্ধে তাঁহাদের একটু শীঘ্র সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ইহা কম চিন্তার কথা নহে। তাহা ছাড়া নিতাইয়ের ভাবগতিকও ইদানী কেমন-কেমন বোধ হইতেছে।

চিন্তিতা ও শঙ্কিতা নীরদাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন, "সুবোধের চিঠি পড়েছ ?"

মাথা নাড়িল, কথা শুনা গেল না। "নিতুকে একটু বল। মিছি মিছি দেরি ক'রে ওদিকে সুবোধের বউ একটা গোলমাল না বাধায়। যা দজ্জাল মাগী, আমি এক দিনেই চিনে নিয়েছি। মেয়েটাকে মেরে না ফেলে।"

"হুঁ,—তা ত বটেই ! এ বেলা পেটে বড় উইণ্ড হয়েছে—রাত্রে আর কিছু খাব না।"

ব্যথিত স্বরে নীরদা বলিলেন, "ক'দিনই বা খাও ? নিতুও ত রাত্রে খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, একলা আমিই কেবল খেয়ে মরি।"

"কেন ? তার আবার কি হ'ল ? এই বয়সে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরল নাকি। কেরানীগিরির ফলই ঐ। এই বেলা ভাল ক'রে ওষুধপত্র খেতে বলো। রোগের সূত্রপাত, এক-আধ ফোঁটা হোমিওপ্যাথিতেই দে'বে যেতে পারে। বাড়ীতে থাকে ত ডাক দিকি নি দেখি—আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা দাও ত।"

নীরদাসুন্দরী ঝাঁঝিয়া উঠিতেই ব্রজনাথ সোজা হইয়া বসিলেন। সুবোধ, পদ্মা এবং নিতাইয়ের ভাবগতিক পরিবর্ত্তনের কথা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। নীরদা বলিলেন, "নিতুকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলা যাক; তবে ওর যদি কোন কারণে এখন বিয়ে করার ইচ্ছে না থাকে, পদ্মাকে কোন অজুহাতে এখানে আনিয়ে নিতে দোষ কি ? নিতু দু-চার দিনের ছুটি নিয়ে পদ্মাকে বরং নিয়ে আসুক—কি বল ?"

সদরালা সাহেব রসিকতা করিয়া বলিলেন, "ওদিকে সুবোধের দ্বিতীয়ার্দ্ধটি যদি সুপাত্রটি ফস্‌কে যাবার ভয়ে, মেয়েটি পাঠাতে বেঁকে বসেন ?"

"সে আমি চেপে চুপে ধরে রাজী করিয়ে নোব। আর এখন, মাস-দুইয়ের আগে বিয়ের দিনও ত নেই।"

"তবে তোমারই বা এত তাড়া কিসের ?"

"তোমরা কিছু বোঝ না। ছোঁড়াটা ওখানে চেপে ব'সে রইল,—তোমাদের কি আর চোখ কান আছে ?"

"ও বুঝেছি" হাসিলেন।

"কিন্তু ওদিকের চেয়ে এদিকের ভাবনাই আমার বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিতুর যেন কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব হয়ে আসছে। মধুবাবুর মা বলছিলেন, অমন লোভনীয় ছেলে,—কেউ ফাঁদে না ফেলে।"

"ছেলেধরা ?"

"তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।"

ব্রজনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম, নিতু যদি ও বিয়েতে শেষ পর্য্যন্ত মত না করে ?—না না, রাগ ক'রো না, কথাটা বলতেই দাও। ধর, তুমি যেমন ওর হাবভাবের কথা বলছ, ও যদি অন্য কোন মেয়ের প্রতি ;—কালের গতি যেমন, আজকালকার ছেলে, আধুনিকতম শহর, কিছু বলা যায় কি নীরদা !"

নীরদা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আর ভাবতে পারি নে বাপু। পেটের ছেলের চেয়েও আপন ক'রে যাকে মানুষ করলাম, সেই যদি শেষ পর্য্যন্ত,—কলিকাল ! তুমি যা হয় ব্যবস্থা কর, তাকে ডেকেডুকে ব'লে কয়ে দেখ।" কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সেদিন নিতাই বাড়ী ঢুকিতেই হারাধন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আজকে ছুটি মাষ্টারমশাই—আজ আমরা—"

মাধবী আসিয়া বাধা দিল, "এই হেরো, মা ডাকছেন।"

হারু রাগিয়া বলিল, "হেরো বললে ভাল হবে না কিন্তু।"

"তুই কেন মাষ্টারমশাই বললি ? মা বারণ করেছেন না ?"

নিতাই হারুকে কাছে টানিয়া বলিল, "তবে কি বলতে হবে ? 'সার্' না গুরুজী ?"

"জানি নে" বলিয়া মাধবী ফিরিয়া বলিল, "মা আপনাকে একবার ডেকেছেন" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই নিতাই ডাকিয়া বলিল, "শোনই না, ব্যাপারটা কি ? হারুকে ত বলতে দিলে না, নিজেই না-হয় বল।"

"বাবা, তাহলে ঐ মজন্তালী সরকার কি আমায় আস্ত রাখবে ?"

"বলে দিচ্ছি মাকে, তুমি আমায় যা-তা বলছ মাষ্টার—"

"ফের ?"

"বেশ করব" বলিয়া হারু দুম্ দুম্ করিয়া চলিয়া গেল।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া মাধবী বলিল, "আসুন, নইলে মাকে গিয়ে যা-তা লাগাবে।"

"তুমি ওকে অযথা বড় রাগাও কিন্তু।"

"তবুও ত দিদি না হ'লে এক মিনিট চলে না।"

হাসিয়া মাধবী অগ্রসর হইল।

মা বলিলেন, "ওরা সব আজ থিয়েটার দেখতে যেতে চাইছে নিতাই—"

হাসিয়া নিতাই বলিল, "ও তাই বুঝি হারু আমায় দোর গোড়া থেকেই বিদেয় করবার চেষ্টায় ছিল।" হারু লজ্জায় মুখ লুকাইল।

হারুর মা, ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,

"লজ্জা কিসের? বল না, আপনিও চলুন। এতক্ষণ ত হচ্ছিল, দিদির সঙ্গে যাবো না মা, তুমি নিতাই দাকেও যেতে বল। তা তুমিও কেন যাও না সঙ্গে।" হারুকে "যাও ত বাবা, দেখ ত, তোমার দাদার হ'ল কিনা।" হারু ছুটিল।

নিতাই "আমার থিয়েটার বায়স্কোপে তত সখ নেই, রমেনবাবু ত যাচ্ছেনই; আমার অন্য একটু কাজও ছিল।"

হারু ফিরিল "দাদা তৈরি,—আসছে, দেখ না, দিদির যত দেরি, এখনও শুয়ে রয়েছে, বলছে মাথা ব্যথা করছে।"

কেহ কিছু বলিবার আগেই "কই রে মাধু হ'ল তোদের? মাষ্টার আসে নি এখনও? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—" বলিতে বলিতে রমেন ঘরে ঢুকিয়াই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া "আরে নিতাই যে?"

নিতাই ব্যস্তভাবে উঠিয়া, "রমেন—তুমি?"

"আরে, তুমি হারুর মাষ্টার?"

"তুমি মাধবীর দাদা?"

বছর-তিনেক পরে দুই সহপাঠীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। ঘরসুদ্ধ সকলের মুখেই আনন্দের হাসি।

রমেন, "চল চল, একসঙ্গে থিয়েটার দেখা যাক। অনেক দিন পরে দেখা। সময় নেই, পথে যেতে যেতেই গল্প করা যাবে। আয় রে হারু, মাধু কই?" নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

হারু চেঁচাইয়া "আঃ দিদির আর হয় না,—ও দিদি, তোমার মাথাব্যথা সারল?"

মাধবী আসিয়া রাগিয়া বলিল, "ঢের হয়েছে, মশাই ঢের হয়েছে, তোমার চেঁচিয়ে আর বাড়ী ফাটাতে হবে না—ষাঁড় কোথাকার।"

থিয়েটারের ফাঁকে ফাঁকে দুই বন্ধু অনেক প্রাণের কথাই কহিল।

রমেন, "জীবনটা বৃথাই গেল ভাই, কিছুই করা হ'ল না।"

নিতাই, "কিছু একটা করলেই ত পার। নিজেকে কোন কাজে লাগিয়ে দাও, নইলে জীবনের সার্থকতা কোথায়?"

"ফাইন আর্টে কিছুই নেই নিতাই, মনের অভাব মেটে কই? কি করি, তুমিই বলত হে।"

"এর জবাব দেওয়া ভারি শক্ত রমেন। তোমার মনের গতি কোন্ দিকে আমি কি ক'রে জানব বল? আমরা বাস্তব জগতের মানুষ, সহজবুদ্ধিতে বুঝি, জীবনে কাজ চাই।"

একটু চুপ করিয়া রমেন, "এবার ভাবছি সিনেমায় ঢুকব।"

"গান জান?"

"শিখে নেব।"

"রক্ষে কর—ঐ দুঃখে আমি সিনেমা দেখি নে। আড়ষ্ট অ্যাকটিং আর বেখাপ্পা গান, ওর চেয়ে—"

"চাকরি ভাল।" দু-জনে হাসিল।

মাধবী ও ঘুমন্ত হারাধনকে একটা রিকশয় চড়াইয়া রমেন বলিল, "তুমিও উঠে পড় নিতাই—কষ্ট ক'রে এদের একটু পৌছে দিয়ে যাও ভাই—আমার দেরি হবে।" বলিয়া দ্রুতপদে ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর নিতাই বলিল, "রমেনটা চিরকাল একই রকম রয়ে গেল। অমন ইণ্টেলিজেণ্ট ছেলে—প্রিন্‌সিপ্যাল বলতেন ওর মাথায় ছিট আছে।"

মাধবী, "মা বাবা এই জন্যে কত দুঃখ করেন। বাবা ত আর কিছু বলেন না, মা-ই মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করেন, বোঝান। কত বলেন একটা কোন কাজকর্ম্ম করতে;—বাবার হাতে ত কত চাকরি খালি হয়! কিছুতেই শোনে?"

"কি বলে?"

"কোন জবাবই দেয় না। এই সেদিন মা বলছিলেন, কোন কাজও করবি নে, বিয়ে-থাও করবি নে, মাধু চলে গেলে আমি একলা কি ক'রে থাকব? হেসে বললে, তাহলে মাধুর কোথাও যাবার দরকার কি?" বলিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

"পাগল!"

"পিসিমা সেদিন মাকে বলছিলেন, বিয়ে না দিলে ও ছেলে কিছুতেই বাগ মানবে না।"

নিতাই হাসিয়া বলিল, "মাসী পিসিরা সময় সময় উচিত কথাই ব'লে থাকেন।"

"আপনিও বুঝি ঐ দলে?"

রিকশ বাড়ীর কাছে থামিতে নিতাই বলিল, "আমি যদি ঐ দলেই হই—শেষ পর্য্যন্ত ঘটকালিটা আমাকেই না করতে হয়।"

বলিয়া নামিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি যাই, রাত হয়ে গেছে।"

"কাল আসবেন ত? ঘটকালির কথাটাও ত মাকে বলতে হবে।"

"বলতে পারি নে—দিনকতক ছুটি নেবার ইচ্ছে আছে।"

বাড়ী ফিরিতেই মামার ঘরে ডাক পড়িল। হাকিম মাতুল চেয়ারে আসীন।

মাতুলানী গম্ভীর-বদন ব্যারিষ্টারের মত পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। বিচারার্থী আসামীর মত নিতাই এজলাসে ঢুকিল। নিস্তব্ধ থমথমে ঘর।

নীরদাসুন্দরী জেরা সুরু করিলেন, "আজ এত বেশী রাত হ'ল যে? খাবে না নিশ্চয়। দিন দিন তোমার কি যে হচ্ছে বুঝি নে বাপু। চেহারার দিকে ত আর তাকাবার জো নেই।" বস্তুতঃ শেষ অনুযোগটি অতিরঞ্জিত।

নিতাই বলিল, "আজ থিয়েটারে গিয়েছিলাম তাই একটু রাত হয়ে গেছে।"

মাতুল, "শুনছি তোমার হজমশক্তি কমে যাচ্ছে, রাতে প্রায়ই খাও না, তার ওপর এত রাতজাগাজাগি করা সুবিবেচনার কাজ নয়। তোমার ওষুধ আমি সিলেক্ট ক'রে রেখেছি, রাত্রে শোবার সময় বা কাল আর্লি মর্ণিঙে প্রথমে এক ডোজ নক্স্ ২০০ খাবে। যাও, খাওয়া না হয়ে থাকে খেয়ে এস। শোবার আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।"

নিতাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নীরদা রাগিয়া বলিলেন, "ওষুধ ওষুধ করেই গেলে—আসল কথাটা ক'দিন থেকে বলতে বলছি—তোমার হুঁস্ আর হয় না।"

গম্ভীর ভাবে ব্রজনাথ বলিলেন, "হবে গো সব হবে, না খেয়ে ছেলেটার মুখ শুকিয়ে রয়েছে দেখতে পাও না? হাজার হাজার মামলার বিচার সারাজীবন ধরে ক'রে এলাম; আর এ সামান্য ব্যাপার, হুঁ, যাও যাও ওকে খেতে দাও গে।"

সমস্ত শুনিয়া নিতাই প্রথমে কোনই উত্তর দিতে পারিল না। কপালে চিন্তার রেখা আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মহা সমস্যা। এক দিকে অতীতের, আজন্মের কর্ত্তব্য-বন্ধন, অন্য দিকে ভবিষ্যতের আশা, আনন্দ ও উন্নতির উন্মুক্ত পথ। জীবনের এই সন্ধিস্থলে নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে প্রথমটা বিহ্বল হইয়া পড়িল। চট্ করিয়া মাথায় বুদ্ধি গজাইল। বলিল, "এম. এ.টা দেবার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছিলাম—তাই পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করবার ইচ্ছে ছিল।"

উৎসাহিত হইয়া ব্রজনাথ বলিলেন, "বেশ ত, বেশ ত, এ ত খুব ভাল কথা। তোমার মাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। তবে বেশী রাতজাগাজাগি ক'রো না—শরীরটা আগে। তুমি এখন আপাততঃ কদিনের ছুটি নিয়ে পদ্মাকে নিয়ে এস—তাহলেই তোমার মা নিশ্চিন্ত হবেন। তাই হবে, এখন যাও, রাত হয়েছে। কাল একটা দরখাস্ত ক'রে দিও;—আর দেখ, ঐ ওষুধটা খেতে ভুলো না যেন।"

রমেন শুনিয়া বলিল, "চল না হে, আমিও তোমার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি।"

নিতাই পুলকিত হইয়া উঠিল, "বেশ ত চল না ভাই, আমি ত বাঁচি তাহলে। এতটা পথ একলা যাওয়া ভারি কষ্টকর।"

সুবোধের দ্বিতীয় পক্ষ সরলাবালা প্রথমটা ত বেশ বাঁকিয়া বসিলেন। সুবোধ নানা ভাবে বুঝাইয়া শেষে বলিল, "দিদি একটু সামলে উঠলেই পদ্মা চলে আসবে। নিতাইয়ের বিয়েতে আমরা ত যাবই, কটা দিনই বা আছে।"

অবশেষে সরলা কিছু নরম হইয়া বলিল, "নীহার যদি কিছু মনে করে?"

সুবোধ বলিল, "নীহার খুবই বুদ্ধিমান্ ছেলে। আত্মীয় কুটুম্বর বিপদে-আপদে এটুকু লোকে করেই থাকে; এ আর সে বুঝবে না?"

সরলা যেন গলিয়া গেল। "ও পদি, নীহারকে একবার ডেকে আন না, বল দাদা এসেছেন, মা দেখা করতে ডাকছেন। ছেলে ভারি লাজুক—একেবারে মাটির মানুষ, বুঝলে বাবা!"

নিতাই ঘাড় নাড়িল। সঙ্কুচিতা পদ্মা জড়সড় হইয়া নীহারকে ডাকিতে গেল। সুবোধ রমেনের সঙ্গে কথা কহিতে বাহিরে গেল।

লজ্জাকম্পিত স্বরে পদ্মা বলিল, "বললেন, একটু দেরি হবে।"

সরলা, "কেন?"

মুখ নীচু করিয়া পদ্মা বলিল, "টেরি কাটছেন।"

কথাটাকে ঘুরাইয়া সরলা বলিল, "বাইরে ও ছেলেটি কে নিতাই?"

"আমার এক জন বন্ধু।"

"আহা তা বেশ", পদ্মাকে, "তুই কি মেয়ে না? ছেলেটি ব'সে রয়েছে, মুখ-হাত ধোবার জল দেবে—খাবার-দাবার দেবে—তা না ধিঙ্গির মত দাঁড়িয়ে রইলি? লজ্জা—মরণ! আমার এক জ্বালা হয়েছে বাপু।"

নিতাই দেখিল বাড়ীতে দাই-চাকরের পাট নাই,—পদ্মাই একাধারে সব।

সুবোধ বলিল, "রমেন ছেলেটি বেশ, ভারি অমায়িক। বড়লোকের ছেলে বুঝি?"

নিতাই, "আমাদের আপিসের বড়বাবুর ছেলে।"

নীহার রমেনের সঙ্গে খুব ভাব জমাইয়া ফেলিল।

ট্রেনে চড়িয়া রমেন বলিল, "বাবাঃ ছিনে জোঁক একটি।"

হাসিয়া নিতাই বলিল, "কেন, তোমার সঙ্গে ত বেশ পটেছিল। আমার কাছে বিশেষ ঘেঁষে নি।"

"সাধে পটেছে? দুটি টাকা আদায় ক'রে তবে ছাড়লে। বলে, গরমে বিড়ি খেয়ে খেয়ে বড্ড কাসি হয়েছে, পয়সার অভাবে সিগারেট খেতে পাচ্ছে না। কেসে কেসে গলা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—গান গাইতে দম পায় না,—গলা শুকিয়ে যায়;—তা ছাড়া গলা ভিজোবারও জুং হয় না।"

"যাত্রাদলের ছোঁড়া নাকি? ঘা-কতক কসিয়ে দিলে না কেন?"

পদ্মা জানালার বাহিরে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। নিতাই হাসিয়া বলিল, "পদ্মার রাগ হ'ল নাকি?"

কোনই উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ পরে দুই বন্ধু বুঝিল, পদ্মা নীরবে কাঁদিতেছে।

গাড়ী চড়িলেই নিতাইয়ের ঘুম আসে, সে লম্বা হইল। পশ্চিমের জল-হাওয়া এবং খাঁটি ভোজন রমেনের ঠিক বরদাস্ত হয় নাই। বার-দুই বাথরুমে যাইতে হইল, একবার বমিও করিল। অবশেষে পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পদ্মা আর থাকিতে না পারিয়া, কাছে আসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনার, নিতাই-দাকে ডাকি?"

"না থাক, ও ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক্। এখনি কমে যাবে। আপনি আর কষ্ট করবেন না।"

কিন্তু বলিলেই ত হয় না। এক জনকে সম্মুখে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া কোন মেয়েছেলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? ক্রমাগত জল খাওয়াইয়া পেটে হাত বুলাইয়া মাথায় বাতাস করিয়া তবে ঘণ্টা দুই পরে রমেনের চক্ষে ঘুম আসিল।

শেষরাত্রে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিতে দেখিল, রমেন নিদ্রিত এবং পদ্মা তাহার মাথার শিয়রে হাতে পাখা লইয়া বসিয়া ঘাড় গুঁজড়াইয়া ঘুমাইতেছে।

সকালে ব্যাপারটা শুনিয়া নিতাই রাগ করিয়া বলিল, "আমায় তোমাদের ডাকা উচিত ছিল, কিন্তু যদি কিছু হয়ে যেত!"

পদ্মাকে লজ্জিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া রমেন বলিল, আমিই ডাকতে দিই নি ভাই,—উনি বার-বার বলেছিলেন।"

স্টেশনে নামিবার সময় দেখা গেল, জ্বরে রমেনের গা পুড়িয়া যাইতেছে।

নিতাই একটা ট্যাক্সি করিয়া বলিল, "চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে তবে আমরা বাড়ী যাব।"

রমেনের মা খাওয়া-দাওয়ার আগে কিছুতেই ইহাদের ছাড়িলেন না।

বিকালের দিকে নিতাই আসিয়া দেখিল রমেনের জ্বর ছাড়িয়াছে,—সে নির্জীবের মত পড়িয়া আছে।

নিতাইয়ের ডান হাতটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রমেন গাঢ়স্বরে বলিল, "নিতাই, আমার চোখ খুলেছে। কি অপূর্ব্ব সেবাপরায়ণা মূর্ত্তি যে মৃত্যু-যন্ত্রণার মাঝখানে দেখতে পেয়েছি, তোমায় কি বলব ভাই!"

নিতাই বিস্ময়ের ভান করিয়া রমেনের মাথায় হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, "জ্বর বেড়েছে দেখছি, প্রলাপ বকছ। কি চাই বরফ, না ওডিকলন?"

"কি চাই তুমি তা জান না নির্ব্বোধ?"

"পদ্মা?"

চক্ষু বুজিয়া রমেন বলিল, "বাবাকে আমার বলতে লজ্জা করে। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল—তাঁর অবাধ্য আমি আর হব না।"

ব্রজনাথ নীরদাসুন্দরীকে বলিলেন, "নিতাইয়ের আপিসের বড়বাবু আমাদের সকলকে আজ নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন। ছেলের ভাল চাকরি হয়েছে। তা আমার এই শরীরে নড়াচড়া বিশেষ সুবিধে হবে না সে আমি তাঁকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি পদ্মাকে নিয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে যেও।"

নীরদা হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

ব্রজনাথ, "বড়বাবুর মুখে নিতাইয়ের সুখ্যাতি আর ধরে না। বললেন, ছেলেটি বড় ভাল, সাহেবের সুনজরে আছে—খুব চট্‌পট্ উন্নতি হয়ে যাবে। বড় ভদ্রলোক;—নিতাইকে ঠিক আপনার লোক মনে করেন—ভারি ভালবাসেন। শেষ পর্য্যন্ত ত আনন্দের আতিশয্যে কুটুম্বিতা পাতাবার উপক্রম। বলেন, নিতাইয়ের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে,—এমন সৎ ছেলে, এত ভাল চাকরি করছে, ভবিষ্যতের উন্নতি বাঁধা; ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি শেষে বললাম, তোমার মত না নিয়ে ত কোন কথা বলতে পারি নে—কি বল?"

একটু থামিয়া, "আমার মনে হয়, হ'লে নেহাৎ মন্দ হয় না। ছেলেটার আখের এক রকম ওঁরই হাতে—উন্নতির অত আশাও দিচ্ছেন,—অমত করলে শেষে আবার—"

"কিন্তু পদ্মা?"

"হুঁ—তা বটে। দেখা যাক্।"

রমেনের মা নীরদাকে ধরিয়া বসিলেন, "রমেনের সঙ্গে পদ্মার বিয়ে দিতেই হবে।"

মাধবীকে দেখিয়া এবং নিতাই সম্বন্ধে স্বামীর কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া নীরদার সঙ্কল্পও যেন শিথিল হইয়া আসিল। তবুও বলিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হ'ত, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে পদ্মার বিয়ের কথা অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছিল। পদ্মার বাপও তাই জানে কিনা।"

"কিন্তু নিতাই যে বলছিল, পদ্মার বাবার খুব মত আছে। তিনি রমেনকে দেখেছেন,—নিতাইয়ের সঙ্গে তাঁর নাকি কথাও হয়েছে।"

নীরদা বুঝিলেন, ইহার মধ্যে নিতাই আছে। ব্রজনাথের সেদিনের কথা—'আজকালকার ছেলে,—আধুনিকতম শহর;—কিছু বলা কি যায় নীরদা'—কানে বাজিতে লাগিল। মুখে বলিলেন, "দেখি ওঁকে বলে। আমি ত ভাই মেয়েছেলে।"

ফিরিবার পথে নীরদা প্রথমটা গম্ভীর হইয়া রহিলেন। পরে শুষ্ক স্বরে ধীরে ধীরে নিতাইকে সব কথা বলিয়া বলিলেন, "এটা কি তোমার খুব ভাল কাজ হয়েছে নিতু,—আমাকে কিছু না জানিয়ে—এতটা কথা এগিয়ে দেওয়া? আমি এখন কি করি? আর উনিই বা কি ভাববেন?"

নিতাই অনুনয় করিয়া বলিল, "এতে আর তুমি অমত করো না মা। মামাকে ত জানি—তিনি কিছু বলবার লোক নন।"

ব্যথিত স্বরে নীরদা বলিলেন, "কিন্তু আমার যে সব সাধ উল্টে গেল বাবা!"

"ভগবানের হয়ত তাই ইচ্ছে মা?"

"তাহলে তোমাকেও মাধবীকে বিয়ে করতে হবে,—কথা দাও।"

"সে ত এখন দেরি আছে। ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে দেখবার সময় পাবে। কিন্তু এদিকে তোমার ভ্রাতৃবধূর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ নীহাররঞ্জনটি যে মাথার ওপর ঝুলছেন মা!"

নীরদা ও পদ্মা হাসিয়া উঠিলেন।

নিতাইয়ের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া নীরদাসুন্দরীকে অগত্যা রাজী হইতে হইল।

নিতাই যেন আনন্দে পাগল।

মাতুল রায় দিলেন, "যাক্ বাঁচা গেল। আগাগোড়া সবাই মিলে যে রকম বেঁকে বসেছিলে, ওদিকে সুবোধের বউ এদিকে তুমি,—মামলা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি মনে মনে রোজ ভগবানকে ডাকতাম। এখন সব এক রকম সুরাহা হয়ে গেল। নিতাই আজকাল খাচ্চেটাচ্চে? ওষুধ আর খায় না বোধ হয়।—শেষে ওই না আবার গোল বাধায়।"

মাধবী ম্যাট্রিক পাস করিল।

নিতাইয়ের এম. এ. দেওয়া আর হইয়া উঠিল না।

বাঘ জঙ্গলে লুকাইল, কুমীর অতল জলে তলাইয়া গেল!

মাধবীকে বক্ষে টানিয়া নিতাই বলিল, "আমার বক্‌শিশ?"

লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া মাধবী বলিল, "তুমি ভারি দুষ্টু।"

অ্যাল্‌বিনো বা শ্বেতকায় প্রাণী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'শ্বেত' কথাটায় আমরা সাধারণ সাদা রঙই বুঝিয়া থাকি। পদ্ম বিশেষকে শ্বেত-পদ্ম এবং জাতিবিশেষের মানুষকে শ্বেতকায় বলাই প্রচলিত রীতি। দুধের রঙও সাদা আবার ঘোলের রঙও সাদা। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন

অ্যাল্‌বিনো-অপোসাম

রকমারির মত সাদার মধ্যেও অসংখ্য রকমারি রহিয়াছে। কিন্তু সেই রকমারিকে নির্দ্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শব্দ প্রচলিত নাই। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের "শ্বেতকায়" শব্দটি হইতে এরূপ কোন ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কাজেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় "অ্যাল্‌বিনো" কথাটি প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক নহেন অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ অবগত হইবার জন্য আগ্রহশীল অনেককে বলিতে শোনা যায় যে, বৈজ্ঞানিকেরা যদি দুর্ব্বোধ্য পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতেন, তবে তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী এবং সুখবোধ্য হইত। একথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, সরস ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করিয়া বোঝানোই বিজ্ঞানের প্রধানতম উদ্দেশ্য নহে, যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রকাশ করিবার জন্যই বৈজ্ঞানিককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হয়। ভাষা বা শব্দবিশেষের অপপ্রয়োগে বিষয়বস্তু দ্ব্যর্থবোধক না হইয়া পড়ে এজন্য দুর্ব্বোধ্য বা শ্রুতিকটু হইলেও সুনির্দ্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। সাহিত্যিকই হউন, বৈজ্ঞানিকই হউন, স্ব-স্ব বিষয়বস্তুকে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিতে সকলেরই সমান আগ্রহ; কিন্তু তথ্য বা ঘটনাসমূহের যথাযথ বিবরণই বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা ঠিক রাখিতে হইলে ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের "অ্যাল্‌বিনো" (Albino) শব্দটি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কথাটি খাঁটি ইংরেজীও নহে, ল্যাটিন albus শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। albus শব্দের অর্থ সাদা বা শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণেরও বিবিধ রকমফের রহিয়াছে; তবে 'অ্যাল্‌বিনো' কাহাকে বলিব?

বর্ণ-সমন্বিত প্রাণী-জগতে, কোন কোন ক্ষেত্রে অকস্মাৎ দুই-একটি শ্বেতকায় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। এইরূপ শ্বেতকায় প্রাণীদের কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাদিগকেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় "অ্যাল্‌বিনো" বলা হয়। কিন্তু বহুবিধ শ্বেতকায় প্রাণীর মধ্যে কোন্‌গুলি অ্যাল্‌বিনো নহে মোটামুটি তাহার একটা ফিরিস্তি না দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে না। সাধারণ শ্বেতাঙ্গমনুষ্যেরা অ্যাল্‌বিনো নহে। অন্ধকার গহ্বরে বাস করে বলিয়া কোন কোন প্রাণীর শরীর শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। জীবজন্তুর অন্ত্রস্থিত কৃমিকীট অন্ধকারে পরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া আলোর অভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ভূগর্ভস্থ

অ্যাল্‌বিনো-কাঠবিড়ালী

শ্বেত-কাঙ্গারু

জলস্রোতের মধ্যে অন্ধকারে বাস করে বলিয়া প্রোটিয়াস্ অ্যাঙ্গুইনাস্ নামে এক প্রকার জল-টিকটিকির গাত্রবর্ণ সাদা হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাদিগকে অ্যাল্‌বিনো বলা যায় না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, উন্মুক্ত আলোতে গাছপালার সবুজ রঙের খোল্‌তাই হয়; কিন্তু অন্ধকারে রাখিলেই সবুজ তৃণগুল্ম শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। এরূপ শ্বেতবর্ণের তৃণগুল্মও অ্যাল্‌বিনো নহে।

শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দেহবর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে মনুষ্যেতর বিবিধ প্রাণীর শরীরের রং সাদা হইয়া থাকে। মেরুমণ্ডলের ক্যানিস্ ল্যাগোপাস্ নামক এক জাতীয় খেঁকশিয়ালের শরীর শীতকালে সাদা লোমে আবৃত হয়। লেপাস ভেরিয়েবিলিস্ নামক পার্ব্বত্য খরগোস, মাষ্টেলা আর্মাইনিয়া নামক এক প্রকার নকুল জাতীয় জানোয়ার এবং উইলো গ্রাউজ নামক বন্যকুক্কুটের বাসস্থল শীতকালে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের শরীর শ্বেতবর্ণের লোম ও পালকে আচ্ছাদিত হয়। ইহাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহাদের দেহবর্ণ মিশিয়া যায় এবং শত্রুর দৃষ্টি হইতে সহজে আত্মগোপন করিতে পারে। অধিকন্তু এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদনের ফলে শিকার সংগ্রহেও তাহাদের যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের অনেক পাখীও শীতের প্রারম্ভে রঙীন পালক পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতবর্ণের পালকে দেহ আবৃত করে। প্রতিবৎসরই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে; কিন্তু কি ভাবে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা আজও জানিতে পারা যায় নাই। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে প্লেইস্ বা বাঁশপাতি নামে এক প্রকার অদ্ভুত চেপ্টা মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলের নীচে মাটির সহিত লেপ্‌টিয়া পড়িয়া থাকে। ইহাদের দেহের নিম্নভাগ সাদা। উপরের দিকের রং কালো বা ধূসর। ইহাদিগকে উল্টাইয়া রাখিলে উপরের দিকের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহাদের কেহই অ্যাল্‌বিনো নহে। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের মধ্যে এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাদের দেহবর্ণ সাদা হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা অ্যাল্‌বিনো নহে। আপাত-দৃষ্টিতে শ্বেত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণের ফলে দেখা যাইবে তাহাদের অনেকেই নিছক সাদা নহে। ক্ষীণ হইলেও কোন-না-কোন বর্ণের আভাস উহার মধ্যে রহিয়াছে। বিশেষতঃ উপরোক্ত শ্বেতবর্ণের প্রাণীদের চক্ষু-তারকা লক্ষ্য করিলে তাহাতে কালো, ধূসর, নীল বা অন্য কোন রকম রং পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু অ্যাল্‌বিনোদের চক্ষু-তারকা বর্ণহীন। চক্ষু-তারকায় কোন রং না থাকিলে অবাধে প্রচুর আলো প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে চোখ ধাঁধিয়া যায়। বিশেষতঃ বরফের

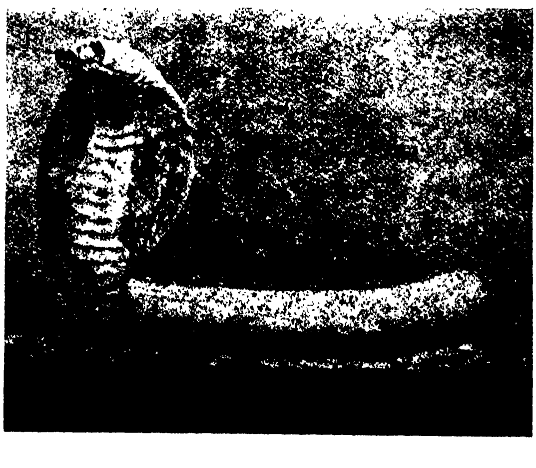

অ্যালবিনো-গোখরো

শ্বেত-হরিণ

উপর হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ অতি তীব্রভাবে চোখে লাগে। কাজেই সাময়িকভাবে বর্ণপরিবর্ত্তনকারী উপরোক্ত প্রাণীরা বরফের রাজ্যে বাস করে বলিয়া চক্ষু-তারকার বর্ণোৎপাদনকারী রঞ্জক পদার্থের একান্তই প্রয়োজন। অন্যথায় জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। রঞ্জকপদার্থের অভাবজনিত শ্বেতবর্ণই অ্যাল্‌বিনোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক প্রাণীদেহেই রঞ্জক পদার্থ উৎপত্তির উপাদান রহিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে সময় সময় বর্ণসমন্বিত প্রাণীদের সন্তানসন্ততির কাহারও কাহারও দেহে রঞ্জক পদার্থের উৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। তাহার ফলেই অ্যাল্‌বিনো সৃষ্টি হয়। সময় সময় কেন যে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; কিন্তু সঠিক ভাবে আজও তাহার হদিস্‌ মিলে নাই। তবে অনুসন্ধানের ফলে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় জীবশরীরে বর্ণোৎপাদনে প্রধানতঃ দুইটি পদার্থ ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কার্য্যকরী হয় না, বংশানুক্রমিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকারী কোন অজ্ঞাত কারণে একটি পদার্থের অভাব অথবা নিষ্ক্রিয়তার দরুন অপরটি বর্ণোৎপাদনে অক্ষম হইতে পারে অথবা দুইটি পদার্থেরই অভাব ঘটিতে পারে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। অ্যাল্‌বিনোর বৈশিষ্ট্য কি এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্‌।

সাধারণ অবস্থায় বিবিধ বর্ণের পশুপক্ষী ও প্রাণীদের শরীরে কমবেশী যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের রঞ্জক পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়, প্রকৃত অ্যাল্‌বিনোদের শরীরে সেরূপ রঞ্জক পদার্থের একান্ত অভাব। অ্যাল্‌বিনো প্রাণীদের গাত্রচর্ম্মেই যে কেবল রঞ্জক পদার্থের অভাব ঘটে তাহা নহে, শরীরের তন্তসমূহের অভ্যন্তরেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। রঞ্জক পদার্থের অভাবে চর্ম্মাভ্যন্তরস্থ রক্তপ্রবাহী শিরাগুলির ভিতর হইতে রক্তের লাল আভায় চামড়ার বর্ণ রক্তাভ দেখায়। প্রাণিবিশেষের দেহ লোম বা পালকে আচ্ছাদিত থাকায় এই রক্তিমাভা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত না হইলেও চক্ষু-গোলকে তাহা পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাধারণ জীবজন্তুর চক্ষুপুত্তলির চতুর্দ্দিকস্থ আইরিশ (iris) নামক বৃত্তটি কোন-না-কোন বর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু অ্যাল্‌বিনোদিগের চোখের আইরিশটি হয় সম্পূর্ণ বর্ণহীন। যে-কারণে অ্যাল্‌বিনোর চামড়ার বর্ণ রক্তিমাভ হয় সে-কারণেই তাহাদের অক্ষি-গোলক ও পুত্তলি-বৃত্ত রক্তবর্ণ ধারণ করে। যাঁহারা সাদা ইঁদুর পুষিয়াছেন তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই ইঁদুরগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে অ্যাল্‌বিনো এবং অ্যাল্‌বিনো পিতামাতার সংযোগে বংশানুক্রমে অ্যাল্‌বিনো-বংশই বিস্তার করিয়া যাইতেছে। চক্ষু তারকা বর্ণসমন্বিত হওয়ায় সাধারণ প্রাণীদের চোখে আলোর তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম অনুভূত হয়; কিন্তু অ্যাল্‌বিনোদের চোখে রঞ্জক পদার্থের অভাব ঘটায় তাহারা আলো সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শ-কাতর। অ্যাল্‌বিনো মানুষ আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। আলো লাগিলেই তাহারা চোখ মিট্‌মিট্‌ করিতে থাকে। ইহা ছাড়াও অ্যাল্‌বিনো মানুষকে অন্যান্য অস্বস্তিকর

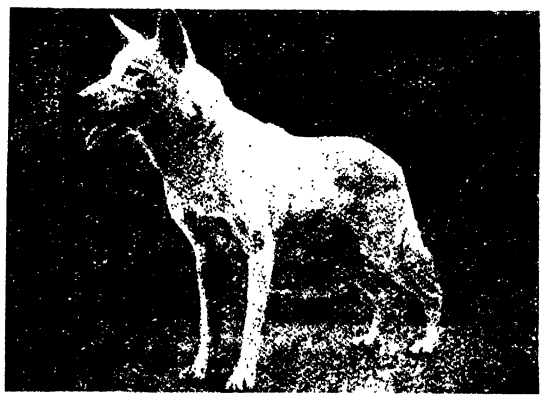

অ্যাল্‌বিনো-খেঁকশিয়ালী

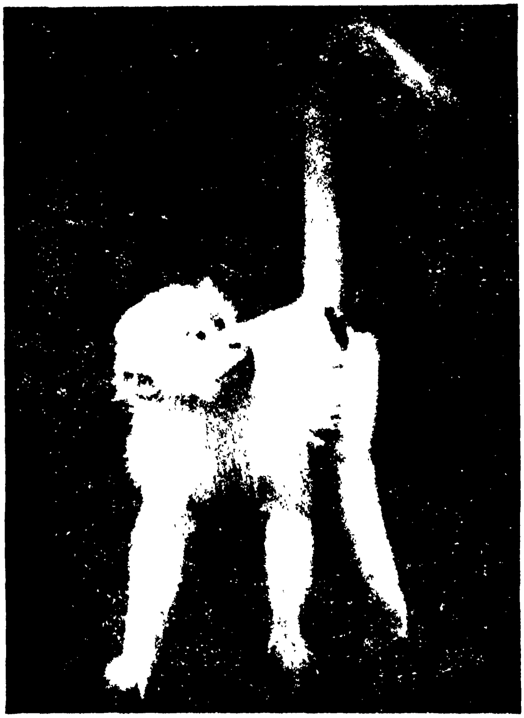

অ্যাল্‌বিনো-বানর

অবস্থা ভোগ করিতে দেখা যায়। কাজেই সাময়িক ভাবেই হউক, কি স্থায়ী ভাবেই শরীরের বর্ণ সাদা হইলেই যে তাহা অ্যাল্‌বিনো হইবে এমন কথা বলা যায় না। সাধারণতঃ চোখের রং হইতেই অ্যাল্‌বিনো নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর রঞ্জক পদার্থের অভাবজনিত অ্যাল্‌বিনোর শ্বেতবর্ণ এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের সমবেত ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের বৈষম্য নির্ণয় করা দুষ্কর; কিন্তু চক্ষুর বর্ণ হইতে এই পার্থক্য নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

অ্যাল্‌বিনোর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বংশানুক্রমে ইহারা অ্যাল্‌বিনোই উৎপাদন করিয়া থাকে। দুইটি অ্যাল্‌বিনো সংযোগে উৎপাদিত সন্তানসন্ততি সকলেই অ্যাল্‌বিনো হইবে। অর্থাৎ যে-কারণে রঞ্জক পদার্থের উৎপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটে সেই কারণগুলিই বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহা খুবই সম্ভব যে, যে কারণে বংশানুক্রমে পিতা বা মাতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহার মধ্যে এমন দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে যাহাদের উভয়ের সমবায়ে বিশেষ কোন বর্ণ আত্মপ্রকাশ করে। কোন কারণে যদি একটির অভাব ঘটে. তবে অপরটি কার্য্যকরী হয় না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বর্ণোৎপাদক উভয় পদার্থ যথাযথভাবে অবস্থিত হইলেও তৃতীয় কোন পদার্থের দৈবাৎ আবির্ভাবে তাহারা বর্ণোৎপাদনে অসমর্থ হয়। বংশানুক্রমিক সন্তান-উৎপাদনে কি কি পদার্থ কিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে আজও তাহার নির্দ্দিষ্ট হদিস্‌ মিলে নাই, এবং পিতামাতার শারীরিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কিরূপে সন্তানে পরিচালিত হয় সেই তত্ত্বও অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও ক্রোমোসোম্‌স্‌ ও জিনস্‌ সম্বন্ধীয় মতবাদ এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে তথাপি আসল প্রশ্নের সন্তোষজনক বা চূড়ান্ত জবাব পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, রঞ্জক পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিতেছিলাম। বিভিন্ন বর্ণের ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্তকণিকা এবং কাট্‌ল্‌ মাছের দেহাভ্যন্তরস্থ থলি হইতে নিঃসৃত কালির মত তরল পদার্থ হইতে রাসায়নিক পরীক্ষায় টাইরোসিনেজ্‌ (tyrosinase) নামক এক প্রকার স্ফুটনশীল পদার্থ (ferment) পৃথক্‌ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা রক্তের ক্রোমোজেন্‌কে chromogen) বিশেষ এক প্রকার রঞ্জক পদার্থে রূপান্তরিত করিতে পারে। কিন্তু অ্যাল্‌বিনো প্রাণীদের গাত্রচর্ম্ম বা দেহ-তন্তু হইতে এরূপ কোন 'ফার্মেণ্ট' পৃথক করা যায় নাই। ইহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় এই ধরণের কোন 'ফার্মেণ্ট' এবং 'ক্রোমোজেন' জাতীয় পদার্থের সমবায়ে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই জীবজন্তুর শরীরে বর্ণের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অ্যাল্‌বিনোদের শরীরে হয় 'ফার্মেণ্ট' না হয় 'ক্রোমোজেনের' অভাব ঘটে অথবা উভয় পদার্থের অভাব ঘটাও বিচিত্র নহে। গাছপালার

শ্বেত-ময়ূর

অ্যাল্‌বিনো-চিংড়ি

বংশানুক্রম সম্পর্কিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইতেও এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাদা মটর ও বিভিন্ন পশুপক্ষীর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া Bateson দেখাইয়াছেন, বর্ণসমন্বিত উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীর মত অ্যাল্‌বিনোরাও মেণ্ডেল আবিষ্কৃত বংশানুক্রমিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাতেই মনে হয়—উদ্ভিদও জীবজন্তুর দেহকোষস্থিত ক্রোমোসোম্‌গুলিতে (chromosomes) কোন নির্দ্দিষ্ট 'জিন্' (Gene) বা অনুরূপ কোন কিছু রহিয়াছে যাহা বর্ণোৎপত্তির কারণ। প্রজনন-সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষা হইতে বর্ণোৎপাদক অন্ততঃ দুই জাতীয় 'জিনে'র (Genes) অস্তিত্ব অনুমান করা স্বাভাবিক। এই হিসাবে ইহাদের পরস্পর সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণিদেহের বর্ণ বিকশিত হইতে পারে না। ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে পরিচালিত হয়। যদি কোন কারণে দুইটির পরিবর্ত্তে ইহার একটি মাত্র 'জিন'-সমন্বিত ক্রোমোসোম সন্তানে অনুপ্রবিষ্ট হয় তবে তাহার শরীরে বর্ণের অভাব ঘটিবেই। এই বিভিন্ন 'জিন'ই হয়ত উপরোক্ত 'ফার্মেণ্ট' ও 'ক্রোমোজেন' উৎপাদনের কারণ।

মোটের উপর অ্যালবিনো উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া গেলেও প্রকৃত ব্যাপার আজিও রহস্যাবৃত। বিশেষতঃ আংশিক অ্যালবিনোর অস্তিত্ব, ব্যাপারটাকে বিশেষ জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আংশিক অ্যাল্‌বিনোর বিশেষত্বও বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে যে, অ্যালবিনোরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বিষয়ে সাধারণ প্রাণীদের অপেক্ষা দুর্ব্বল, কিন্তু সাধারণ ভাবে একথা বলা চলে না, কারণ, দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে অ্যাল্‌বিনোরাই বরং বর্ণসমন্বিত প্রাণীদের অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে অধিকতর উপযোগী, এই সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা সম্ভব হইলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা না করিয়া কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য অ্যাল্‌বিনোর বিষয় আলোচনা করিতেছি।

বিলাতী ইঁদুর, পায়রা, গিনিপিগ খরগোস, প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেই সচরাচর বেশীর ভাগ অ্যাল্‌বিনো দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ, ইহাদের প্রজনন ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিরল হইলেও বন্য অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অ্যালবিনোর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত-হস্তীর মর্য্যাদার কথা সকলেই জানেন, সেখানে ইহারা রাজকীয় সম্পত্তি। এই শ্বেত-হস্তী অ্যাল্‌বিনো ছাড়া আর কিছুই নহে। কদাচিৎ এইরূপ শ্বেত-হস্তী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ; ছবি হইতে সাধারণ হস্তীটির তুলনায় শ্বেত-হস্তীটির বর্ণ বৈষম্য উপলব্ধি হইবে। কাঠবিড়ালীদের মধ্যে কখনও কখনও অ্যাল্‌বিনো আত্মপ্রকাশ করে, অপোসাম নামক জানোয়ারদের মধ্যেও অ্যাল্‌বিনো খুবই দুষ্প্রাপ্য। এ স্থলে সাসেক্স প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত একটি অ্যাল্‌বিনো কাঠবিড়ালী এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংগৃহীত একটি অপোসামের ছবি

অ্যাল্‌বিনো-দাঁড়কাক

দক্ষিণে—ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত হস্তী
বামে—সাধারণ হস্তী

দেওয়া হইল। সাধারণ কাঠবিড়ালী ও অপোসামের রক্তে যেরূপ টাইরোসিনেজ্ পাওয়া যায়, এই অ্যালবিনোদের রক্তে সেরূপ কোন ফার্মেণ্ট পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মুণ্টজ্যাক্স্ (Barking Deer) নামক মাঝারিগোছের এক প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গায়ের লোম উজ্জ্বল সোনালী বর্ণের। বন্য অবস্থায় ইহাদের মধ্যে একবার একটি অ্যাল্‌বিনো হরিণ পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ হইতে ম্যাঙ্গাবি নামক এক জাতীয় দুইটি বানর সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের চোখের রঙ ছিল লাল এবং দেহের বর্ণ ছিল দুগ্ধধবল। মালয় উপদ্বীপ হইতে রক্তচক্ষু ও শ্বেতকায় একটি গন্ধ গোকুল বা খট্টাশ এবং একটি গাছ-সজারু আবিষ্কৃত হইয়াছে। খেঁকশিয়াল ও অষ্ট্রেলিয়ার কাঙারুদের মধ্যেও অ্যাল্‌বিনো দেখা গিয়াছে, রঙীনপালক সমন্বিত রিয়া, জল-পিপি, পেঙ্গুইন ও অন্যান্য পাখীদের মধ্যেও মাঝে মাঝে অ্যাল্‌বিনো দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ময়ূরের মধ্যেও অ্যাল্‌বিনো বা শ্বেত-ময়ূরের অভাব নাই, মানুষের হাতে পড়িয়া নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় তাহারা বংশবিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য ইহারা প্রকৃত অ্যাল্‌বিনো কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এমন কি কাকের মধ্যেও দুগ্ধধবল অ্যাল্‌বিনো দেখা গিয়াছে। তবে অ্যাল্‌বিনো কাক অতি বিরল। এস্থলে একটি অ্যাল্‌বিনো-দাঁড়কাকের ছবি দেওয়া হইল। রূপকথার শ্বেত-কাক ও শ্বেত-মাছির কাহিনীর উৎপত্তির মূলেও বোধ হয় এই অ্যাল্‌বিনোই রহিয়াছে। এমন কি সাপ ও চিংড়ির মধ্যে পর্য্যন্ত অ্যাল্‌বিনো আবিষ্কৃত হইয়াছে। এস্থলে উদ্ধৃত অ্যাল্‌বিনো-গোখরা ও অ্যাল্‌বিনো-চিংড়ির ছবি হইতে তাহাদের দেহবর্ণের আভাস পাওয়া যাইবে।

"—থাক্—এখন নহে"

শ্রীউমা দেবী

"এখন হয়েছে সবে বিহান-বেলা—
ভোরের মেঘের পরে
লাল সোনা থরে-থরে
বিথারি আলোর শিশু করিছে খেলা,

ঘুম ভেঙে পাখীগুলি
কেবল ধরেছে বুলি
আকাশে পাখার সারি হয় নি ফেলা,
মৃদুল ফুলের বাস
কেবল ফেলিছে শ্বাস,
নিথর নদীর নীরে ভাসে নি ভেলা।
এমন মধুর ক্ষণ,
আনো নব-জাগরণ,
প্রভাতে প্রথম হোক্ মানস-মেলা—
কাজল-কলিত মিঠি
মেলো গো আঁখির দিঠি
মনের মিনতি রাখ ক'রো না হেলা।"

"না না—থাক্—এখন নহে—
এখনো নয়নে মোর
জড়ানো ঘুমের ঘোর
কোনো মতে দিঠিখানি যেন গো বহে-
থাক্ থাক্ এখন নহে।"

"দুপহর রিম্‌ঝিম্ রোদের ভরে,
তরুশাখে ফুলদলে
ভ্রমরের গান চলে,
বাতাসে পাতার রাশি আকুল করে।

ভেলাগুলি কাছে দূরে
ছলছলি জল স্বরে
চলে যেন প্রজাপতি-পাখার 'পরে।
ভিজে ডানা মেলে দিয়ে
কপোতীরে পাশে নিয়ে
কপোত কূজন করে কলস্বরে।
চারিদিক ভরপূর
এত কথা এত সুর,
নীরবে তিয়াষে শুধু মরম মরে—
একবার কথা রাখ
মোর নাম ধরে ডাক,
শ্রবণ কাঁদিছে সুর-সুধার তরে—।"

"না না—থাক্—এখন নহে—
চারিদিকে কথারাশি
কথারে ফেলিবে গ্রাসি,
অবোধ কে—সে যে কথা এখন কহে,
—থাক্ থাক্—এখন নহে।"

"জ্বলিছে সাঁঝের তারা দিনের শেষে—
পাখীগুলি নিজ-নীড়ে
আবার এসেছে ফিরে
পাখার পরশ-আশে বসেছে ঘেঁষে।
দূরের মাঠের পারে
ঝাউগাছ সারে সারে
পাতার দোলায় ডাকে নিরুদ্দেশে।
এপাশে ওপাশে ঢলি
ঢেউগুলি ছলছলি
বেলা-বালুকার পরে লুটায় হেসে।
আঁধার-আলোয় মেশা
আকাশে ঘনায় নেশা,
বিজনে ক্ষণেক তরে একেলা এসে
সব কিছু ভুলে যাও
বাহুর পরশ দাও,
এলাও হৃদয়ে মোর কোমল কেশে।"

"না—না—থাক্—এখন নহে—
এখনো আলোক-শিখা
আকাশে রয়েছে লিখা,
দিবস-দাহনে তনু এখনো দহে—
—থাক্ থাক্—এখন নহে।"

"রাতের আঁধারে যেন উচ্ছসিয়া—
বায়ুর আদরে ঢলি
ফুলেরা পড়িছে গলি
তুলিছে সুরভি-হাই নিশ্বসিয়া।
পৃথিবীর ঘন-বুকে
ঘনায়ে গভীর সুখে
সৌরভ ভরে যেন আকাশ-হিয়া।
বনের কোমল কোলে
শাখায় পাতার দোলে
উদাস বাতাস ওঠে মর্মরিয়া।
এমন আঁধার ঘোর
কাঁদিছে মরম মোর,
বসন-বাঁধন মৃদু এলায়ে দিয়া—
আকুল কেশের ঘ্রাণে
পাগল করিয়া প্রাণে
খেলিবে কি খেলা আজ হৃদয় নিয়া?"

"না না থাক্ এখন নহে -
ক্লান্ত এ দেহ মন
ঘুম-ভরে অচেতন,
জাগরণ-ব্যথা যেন আর না সহে—
-- থাক্ থাক্—এখন নহে।"

"রজনী পড়িছে খসি দিবস-আশে—
ঘাসের পাতার আগে
সরস শিশির জাগে
কাঁপে শেষ-বাতাসের শীতল শ্বাসে।
আলোর ঝরনা-ধারা
আঁধারে হয়েছে হারা,
ভাঙা-চোরা বাঁকা চাঁদ তবুও হাসে।
ঘুমন্ত নদীনীরে
চেতনা আসিছে ফিরে
কাঁপে ধীরে ঢেউগুলি আলো-আভাসে।
আর কোনো সাধ নাই
এখন ফিরিতে চাই—
তবুও ফেরার আগে ক্ষণেক পাশে
ব্যথিত বসিয়া শুধু
পান করি' মুখ-মধু
যাব ফিরে সুখহীন নিজ-আবাসে।"

"না—না—থাক্—এখন নহে—
স্বপনে দেখেছি কী যে
বুঝিতে পারি নে নিজে,
কোন মনো-ভার হায় বিনা বিরহে—
—থাক্ থাক—এখন নহে।"

শেষ বাতাসের মিল

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম. এ.

নাম তার ফ্রান্সিস মামি, বাঁশী বাজিয়েই তার জীবন কাটে। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে আমার এখানে আসে; টেবিলের কাছে বসে মদ খায় আর গল্প করে।

সেদিনের এক সন্ধ্যার কথা বলছি; ফ্রান্সিস একটা গল্প বলছিল, গ্রামবাসীদের পুরাতন ইতিহাস। মামির গল্প আমাকে স্পর্শ করেছিল, তাই যেমন শুনেছি ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে বলছি।

এই গল্প শোনার আগে মনে কর সন্ধ্যায় এক টেবিলের পাশে তোমরা বসে আছ, আর এক বৃদ্ধ বীণাবাদক তোমাদের কাছে এই গল্প বলছে।

—শুনছেন মশাই, আমাদের এই গ্রাম আজ দেখছেন, চিরকালই আর এমন নিরানন্দ, নির্জ্জীব, মরার মত ছিল না। কত মিলার এখানে বাস করত, দিনরাত চলত মিলের কাজ। চারদিকে দশ-পনর মাইল ধরে কেবল মিল আর মিল। গ্রামবাসীরা তাদের আপন আপন শস্য বয়ে নিয়ে আসত মিলে পিষতে। সমস্ত গ্রামভরা ছিল এই মিল, এগুলি বাতাসে চলত। ডা'ন বাঁয়ে যেদিকে তাকাবে দেখবে পাইন গাছের মাথার উপরে মিলের পাখা চলছে উত্তর-পশ্চিমের বাতাসে—গাধাগুলি রাস্তা দিয়ে বস্তা ব'য়ে আনছে, কখন উঠছে, কখন নামছে।

সপ্তাহ ধরে পাহাড়ের উপরে চলত মিলের কাজ, তাদের জীবনের সাড়া নীচে আমাদের স্পর্শ করত, মন আমাদের ভরে উঠত এক অপূর্ব্ব আনন্দে। রবিবারে আমরা যেতাম দলে দলে মিলের কাজ দেখতে। মিলারেরা কি আনন্দিত হ'ত আমাদের দেখে! মস্কট শরাব তৈরি করে আমাদের তারা খেতে দিত। মিলার-পত্নীদের কথা শুনবে—তারা থাকত রাণীর মত, কেমন সাজসজ্জা, কত গহনা—সোনারূপার তাদের অভাব ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলত ফারান্দোল নাচ। আজ সেদিন আর নেই, কত বাঁশী আমি বাজিয়েছি সে সব নাচে। যাই বল, এই মিলগুলিই ছিল গ্রামের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত আনন্দের মূল।

তার পরে দুর্ভাগ্য এক দিন আরম্ভ হ'ল; তারাস্কোঁর পথের ধারে নূতন কল বসল। বাষ্পীয় কল, একেবারে নূতন, দেখতে সুন্দর। দেশের লোক সব শস্য তাদের ওই কলেই নিয়ে যেতে লাগল। বাতাসের কল আর কাজ পায় না। কত দিন তারা বৃথা সংগ্রাম করল, কিন্তু ক্রমেই জীবনীশক্তি তাদের ক্ষীণ হ'য়ে এল। বাষ্পের নিশ্বাসে শক্তি বেশী, তাই বাতাসের কল একটির পর একটি বন্ধ হ'তে লাগল। মিলের গাধাগুলি আর এ পথে চলে না, মিলারপত্নীরা তাদের সোনা গয়না বিক্রী করে ফেললে। সেদিন থেকে কোথায় গেল মস্কট-রস, কোথায় গেল ফারান্দোল। উত্তর-পশ্চিমের বাতাস আসে কিন্তু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে চলে যায়, কলের পাখাগুলি নড়ে না। তার পরে এক দিন সবাই মিলে ফেলে দিলে তাদের ঠেলে, তাদের জায়গায় দেখা দিল দ্রাক্ষালতা আর অলিভ গাছ।

এই বিরাট সর্ব্বনাশের মধ্যে একটি মিল কি জানি কেন শেষচিহ্ন স্বরূপ দাঁড়িয়ে রইল—যেন সে এই বাষ্পীয় কলের দম্ভের প্রতিবাদ। মিলটির মালিক মাষ্টার কর্ণি। এক দিন ছিল সন্ধ্যেটা আমাদের যখন তার ওখানেই কাটত।

মাষ্টার কর্ণি বৃদ্ধ। বয়স তার ষাট বছরের উপর। যে আশায় যে উদ্যমে এই সুদীর্ঘ জীবন তার গড়ে উঠেছিল, আজ শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাকে ভেঙে পড়তে দেখে বৃদ্ধ সইতে পারলে না। বাষ্পীয় কলের সৌভাগ্য দেখে নয়, নিজের কলের দুর্ভাগ্য তাকে পাগল ক'রে তুলল। আট দিন ধরে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সে ছুটে বেড়ালে, ডেকে ডেকে সবাইকে বললে নূতন কলের আটা কেমন ক'রে তাদের এই পবিত্র অঞ্চলকে অপবিত্র করছে—বলছি তোমাদের, "ওখানে যেও না, যেও না ওখানে। অই যে দেখছ নতুন কল, ও দানব, ও রাক্ষস! ওকে চালায় কে?—শয়তান। আর এই যে আমাদের কল দেখছ—এ চলে দেবতার নিশ্বাসে।" পুরাতন মিলের জন্য কেঁদে কেঁদে সবারই দ্বারে দ্বারে সে ঘুরে বেড়াল কিন্তু একটি লোকও তার কথা শুনল না, কেউ তার দিকে ফিরে তাকাল না। সবাই ভাবলে লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

রাগে দুঃখে বৃদ্ধ মিলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দ্বার বন্ধ করলে। কাল কাটতে লাগল তার উন্মাদ ক্ষ্যাপার মতই।

স্নেহের নাতনী ভিভেত কে সে খুবই ভালবাসত—বৃদ্ধের জীবনে এই বালিকাই একমাত্র অবলম্বন। বালিকার বয়স পনর বছর, পিতামাতার মৃত্যুর পরে কর্ণিয়ের আদরযত্নেই সে আজ এত বড় হয়েছে। সবাই জানত বালিকার সমস্ত চাওয়া সমস্ত পাওয়াকে প্রাণ দিয়ে ভরে দেওয়াই বৃদ্ধের একমাত্র আনন্দ। কিন্তু মিলের দ্বার আজ তার পক্ষেও রুদ্ধ—নিজের অন্নবস্ত্র আজ তাকে নিজেকেই সংগ্রহ করতে হয়। রেশমের সুতা কেটে প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে তা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়—কেউ কিনে নিলে তাই দিয়ে তার জীবন চলে; কিন্তু বৃদ্ধ তাকে আজ যে একেবারে ভুলে গেছে তাও নয়। দুপুরের প্রখর রোদের মধ্যে তিন মাইল হেঁটে মাঝে মাঝে সে তাকে দেখতে আসে। কিন্তু ভিভেত কাছে এলেই বৃদ্ধ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে, তার দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে।

গ্রামের মধ্যে সবাই জানে এই বুড়ো বয়সে কর্ণি টাকার প্রলোভনে পড়েছে, সেই জন্যই দিনরাত এমনি করে মিলের মধ্যে বন্ধ হয়ে এতটুকু বালিকাকে ছেড়ে থাকে। নিরীহ বালিকা এমনি ক'রে পরের দোরে দাসত্ব করবে এ কেউ সইতে পারত না। বৃদ্ধকে দেখেও সবার দয়া হ'ত। তারা বলত, "মাষ্টার কর্ণি এক সময় আমাদের কি শ্রদ্ধার পাত্রই না ছিল। এ অঞ্চলে সবাই তাকে চেনে, এমনি করে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়ে সে রাস্তায় বেরোবে একথা আমরা কোন দিন ভাবিও নি।" প্রার্থনা-মন্দিরে তাকে দেখতাম; আমাদের ঘৃণা হ'ত দেখে। একদিন আমরাই ছিলাম তার বন্ধু, কিন্তু এখন দেখলেই দূরে সরে যেতাম সবাই। মাষ্টার নিজেও বোধ হয় একথা জানত, তাই গির্জ্জায় সে দরিদ্র শ্রমিকদের পাশেই গিয়ে বসত।

কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণির জীবনে কতকগুলি ব্যাপার ছিল যা কারও কাছেই খুব স্পষ্ট ছিল না। এক কণা শস্য তাকে মিলের মধ্যে কেউ কখন নিয়ে যেতে দেখে নি কিন্তু দেখা যেত মিলের পাখা তার আগের মতই ঠিক চলছে। সন্ধ্যেবেলা আটাভরা বস্তাগুলি গাধার পিঠে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে যেতে প্রতিদিনই তাকে সবাই দেখত।

—নমস্কার, মাষ্টার কর্ণি, মিল তোমার তা হ'লে বেশ চলছে।

বৃদ্ধ মিলার পরম উৎসাহে উত্তর করত, হাঁ, ভালই চলছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার কখন কাজের অভাব হয় না।

এর পরেও হয়ত কেউ কখন জিজ্ঞাসা করত,—কোন শয়তান তাকে এত কাজ দেয়, আর দিনরাত এত আটা তৈরি হয়ে যায়ই বা কোথায়! কিন্তু সে মুখে আঙুল দিয়ে বলত—"চুপ, ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না—আটা তৈরি ক'রে আমি বাইরে পাঠিয়ে দিই।" এর বেশী কেউ কোন দিন তার কাছ থেকে বার করতে পারে নি।

মিলের সামনে দিয়ে চলে যেতে সবাই দেখত, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, মিলের পাখা চলছে সব সময়েই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নেই। দেখত—গাধাগুলি সামনে আপন মনে চরছে, একটা প্রকাণ্ড বড় বিড়াল জানালার কাছে রোদে বসে ঘুমুচ্ছে।

আশে পাশের লোকের কাছে এসব খুবই রহস্যময় ছিল। এ নিয়ে তারা আলোচনাও খুবই করত। নিজ নিজ কল্পনা দিয়েই সবাইএর সমাধান করত কিন্তু সাধারণ জনরব ছিল এই যে মিলের মধ্যে আটার বস্তা যত আছে, তার চেয়েও বেশী আছে টাকার বস্তা।

শেষে একদিন কিন্তু সকল রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়ল কেমন ক'রে তা বলছি:—

সমস্ত জীবন আমি বাঁশী বাজিয়েই কাটিয়েছি। বছরের সমস্ত দিনগুলিই ছিল আমার কাছে একই রকম। এ আমার আনন্দ কি নিরানন্দ তা কখনও ভেবে দেখি নি, কিন্তু এক দিন সত্যি সত্যিই বুঝলাম আনন্দ কি। এক দিন শুনলাম আমার বড়ছেলে আর ভিভেত্ পরস্পরকে ভালবেসেছে। মনে মনে এতে আমি একটুও রাগ করি নি। যাই হোক, মাষ্টার কর্ণি এক সময়ে সবার শ্রদ্ধার পাত্রই ছিল। আর ভিভেত্, ওকেও আমি ভালই বাসতাম। আমারই ঘরে আমারই সামনে সব সময়ে ও চলবে, আমি ওকে আদর করব; আহা কত দুঃখই না বালিকা পাচ্ছে! চিন্তা ক'রে মনে মনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। পাছে আবার কোন ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে মনে করলাম বিয়েটা তাড়াতাড়িই সম্পন্ন হয়ে যাক। মনের উৎসাহে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম বন্ধ মিলে, বৃদ্ধ মিলারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কি আমার অদৃষ্ট কি সম্ভাষণই বৃদ্ধ আমাকে জানালে, তা যদি দেখতে! আমার সহস্র অনুরোধেও একবার সে দ্বার খুলল না, দরজার ফাঁক দিয়ে আমি বললাম আমার আসার কারণ কিন্তু বৃদ্ধ যেমন ব'সে ছিল ঠিক তেমনি বসেই রইল। মাথার উপর তাকিয়ে দেখলাম কাল বিড়ালটা শয়তানের ক্রূর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বৃদ্ধ আমাকে কোন কথাই বলতে দিলে না। স্পষ্ট জবাব দিলে, পরিষ্কার ভাষায় বললে—"তোমার কোন

কথাই আমি শুনতে চাই না, এর চেয়ে বাড়ী গিয়ে বাঁশী বাজাও। আর ছেলের বিয়ে যদি দিতেই হয় ত নতুন মিলে যাও না। সেখানে গিয়েই মেয়ে খোঁজ গে, এখানে কেন ?"

বুঝতেই পার তার মুখে এ সব শুনে কি আমার মনে হয়েছিল কিন্তু তবুও এক দিন ত তাকে শ্রদ্ধাই করতাম। ফিরে এসে ওদের দুজনের কাছে সব কথাই আমি বললাম। কিন্তু ওরা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না, শেষে আমাকে জানালে দুজনে এক সঙ্গে মিলে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে অনুমতি চেয়ে আনবে। তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর না করার মত সাহস আর যারই হোক অন্ততঃ আমার ছিল না। ওরা দুজন তৎক্ষণাৎ রওনা হ'ল।

দুজনে এক সঙ্গে যখন মিলে গিয়ে পৌঁছল, বৃদ্ধ তখন বাইরে গেছে। মিলের দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ কিন্তু মিলের মইখানা বৃদ্ধ ভুল ক'রে যাবার সময়ে বাইরেই রেখে গেছে। ওদের মাথায় কি খেয়াল চাপল, জানালার পথে ওরা মিলে ঢুকবে, মিলের মধ্যে কি আছে ওরা দেখবে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! মিলের মধ্যে সমস্ত কক্ষই শূন্য। একটা বস্তা নেই, এক কণা শস্য নেই সেখানে। একটুও আটা নেই এমন কি চলতি মিলের গন্ধ পর্য্যন্ত নেই! মিলের সমস্ত ভিতরটা ধুলায় আচ্ছন্ন। কোনকালে এ যে চলেছে, তার চিহ্নও নেই।

ধীরে ধীরে দুজনে তারা নীচে নামল কিন্তু সেখানকার আরও দুরবস্থা। একটা ময়লা বিছানা কত কালের পুরাতন, কতকগুলি ছেঁড়া নেকড়া, এক টুকরা রুটি, আর এক কোণে তিনটে বা চারটে বস্তা পাথরের নুড়ি এবং মাটি ভরা। এই সেখানকার সমস্ত জিনিস।

এই হ'ল কর্ণির মিলের সমস্ত রহস্য। মিলের সম্মান তাকে রক্ষা করতেই হবে তাই সন্ধ্যেবেলা, নুড়িভরা, মাটিভরা বস্তা নিয়ে সে রাস্তায় বেরোত, লোকে জানত মিল চলছে। হতভাগ্য মিল! হতভাগ্য কর্ণি! নূতন মিল অনেক আগেই এর জীবন কেড়ে নিয়েছে। মিলের পাখা আজও চলছে কিন্তু এর অন্তরের বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করবার এক বিন্দু কিছু এখানে অবশিষ্ট নাই।

মিল থেকে দুজনে ওরা ফিরে এল কিন্তু চোখে ওদের জল। সব এসে ওরা আমাকে বললে, সবই শুনলাম আমি মন দিয়ে। এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে তখনই উঠে পড়লাম, প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সংক্ষেপে সবই তাদের খুলে বললাম। স্থির হ'ল যার বাড়ীতে যতটুকু শস্য আছে তাই নিয়ে এখনই আমরা কর্ণির মলে যাব সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হ'ল। সমস্ত গ্রামবাসী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, দল বেঁধে গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে মিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

মিল খোলা ছিল। দেখলাম দরজার কাছে বৃদ্ধ কর্ণি মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে, পায়ের কাছে এক বস্তা পাথরের নুড়ি। ফিরে এসে বৃদ্ধ বুঝেছে তার অনুপস্থিতিতে এখানে কেউ ঢুকেছিল, মিলের সমস্ত রহস্য আজ সবার জানা হয়ে গেছে। সে বলছিল—এখন আমার মরাই ভাল। আমার মিল আজ অপবিত্র হয়েছে।

কান্নায় তার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। মিলের কত কি নাম ক'রে সে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছিল—যেন সে কোন মানুষ আর কি!

ঠিক এই সময়ে বস্তা বোঝাই গাধাগুলি তার সামনে এসে দাঁড়াল। যথাসাধ্য জোরে সবাই মিলে আমরা চীৎকার করে উঠলাম—"মাষ্টার কর্ণি দীর্ঘজীবী হোক, মিল তার বেঁচে থাক।" সকল বস্তার মুখ খুলে দেওয়া হ'ল, শস্য সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ কর্ণি দুই চোখ মেলে বিস্মিতের মত ফ্যাল ফ্যাল করে সকলের দিকে তাকালে। কতকটা শস্য সে তার হাতের মধ্যে নিল, তার পর বলতে লাগল—তার চোখে তখনও জল কিন্তু মুখে হাসি—

"হায় ভগবান্, এই ত শস্য! একেবারে সত্যিকার শস্য—এত আদরের আমার! একবার ভাল ক'রে দেখে নিই।"

তার পরে আমাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল—আমি জানি আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে। নতুন কলের ওরা সব চোর।

আমরা সমস্ত গ্রামবাসী মহাসমারোহে তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু কোনমতেই সে সম্মত হ'ল না। সবার দিকে চেয়েই সে বলল—মনের আনন্দ সে ধরে রাখতে পারছিল না—

"তোমরা বোঝো না ভাই, আমার মিলকে আগে কিছু খেতে দিয়ে নি তবে ত! একবার ভেবে দেখ দিকি, কতকাল ধরে ও এমনি অনাহারে পড়ে আছে, কতকাল ধ'রে ওর পেটে কিছু পড়ে নি!"

বস্তা খুলে শস্যগুলি সে মিলের মধ্যে ঢেলে দিলে, সমস্ত আকাশ ধূলিতে তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বৃদ্ধ এদিক ওদিক ফিরছে আর মাঝে মাঝে এক-

দৃষ্টে মিলের দিকে চেয়ে আছে। দেখে চোখ আমাদের অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

আমি জানি জীবনে আমি এই একটা কাজই করেছিলাম। সেদিন থেকে বৃদ্ধ মিলারের আর কাজের অভাব হয় নি।

তার পরে এক দিন প্রভাতে কর্ণি মরে গেল, শেষ মিলটির পাখা বন্ধ হ'ল কিন্তু এবারে চিরদিনের মত। কর্ণি মরে গেছে কিন্তু আর কেউ তার স্থান নিলে না। আপনি কি মনে করেন! মশাই, জগতে সবকিছুরই শেষ আছে। আমারও মনে হয় বাতাসের কলের দিনও চলে গেছে।*

* Alphonso Daudetএর Maitre Corneille নামক ফরাসী গল্পের মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ।

ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন

শ্রীঅরবিন্দ মৈত্র

পাইয়োনিয়রের সহকারী সম্পাদক, লক্ষৌ

আধুনিক বাংলার বিক্রেতামহলে প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়া থাকে যে, বাঙালীর স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ কম; তাঁহারা অন্য প্রদেশ অথবা বিদেশ হইতে আগত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে অধিক অভ্যস্ত, যদিও বাংলায় প্রস্তুত বস্তু অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট নহে; উহার ফলে বাংলার স্বদেশী শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে না। ক্ষোভ প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত, তথাপি বাঙালী ক্রেতা স্বদেশ-প্রেমের অভাবেই যে স্বদেশী জিনিস ক্রয় করেন না, ইহা বলা ঠিক হইবে না। কারণ, বাঙালীর বহু দোষ থাকিলেও তাঁহার স্বদেশপ্রেম খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বোধ হয় অতি অল্পসংখ্যক বাঙালীই আছেন যাঁহারা এখনও বিদেশীর মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

বাঙালীর স্বদেশজাত শিল্পের প্রতি দরদের কথা বলিতে গিয়া একটি কথা মনে পড়িতেছে। "বঙ্গ-ভঙ্গ" প্রতিবাদে যখন বাংলায় "স্বদেশী সমাজে"র প্রচলন হয় তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করেন। বাঙালী মাত্রকেই ঐ সমাজে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়। সমাজের নিয়মগুলির মধ্যে একটি নিয়ম ছিল— স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিব ও বিলাতী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না। অতএব স্বদেশী শিল্পের প্রতি বাঙালীর দরদ নাই একথা বলা চলে না।

প্রধানতঃ বাঙালী বিক্রেতা ও শিল্পীরাই যে নিজেদের পণ্যের প্রতি ক্রেতামহলের আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার অন্যতম একটি কারণ এই যে, তাঁহারা এখনও বিজ্ঞাপনের প্রভূত উপকারিতার উপর যথেষ্ট আস্থাবান হইতে পারেন নাই। এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা বিজ্ঞাপনকে অনাবশ্যক আড়ম্বর মনে করেন। কিন্তু রুচিসম্মত ও মার্জ্জিত প্রণালীর বিজ্ঞাপনের উপরই আধুনিক ব্যবসায়ের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে, ইহা বলা বাহুল্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য বিদেশী বহু মালের আমদানী কমিয়াছে, অথবা মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় শিল্পোন্নতির ইহা সুবর্ণ সুযোগ। বাংলার শিল্পগুলিও এই অবসরে পৃথক্ পৃথক্ অথবা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিলে দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ইহার জন্য বিক্রেতা ও ক্রেতা মধ্যে সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। ইহার অভাবে কোনও শিল্পেরই দ্রুত প্রচার সম্ভব নহে।

স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্ত্তী যুগে ব্যবসায়ের অনেক বিভাগেই বাঙালীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বস্ত্রশিল্প, ব্যাঙ্কিং, বীমা, প্রসাধন-সামগ্রী, সেলুলয়েড ও রবার শিল্প, ঔষধ, সিনেমা, ফিল্ম প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে আমরা সফলতা লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আরও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ও চলতি ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসারের অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত। বাঙালী শিল্পিগণ যদি শুধু বাঙালী খরিদ্দারের উপরই নির্ভর করেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উন্নতি কোনও প্রকারে সম্ভব হইবে না। এই জন্য ব্যবসায়িগণকে সতর্ক হইতে হইবে যে, তাঁহারা যেন প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত থাকেন। অন্ততঃ সমগ্র ভারতে কোনও শিল্পের প্রচার না হইলে সে শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিবে না। অতএব সমগ্রভারতীয় জনসাধারণকে বাংলার পণ্যের সহিত পরিচিত করা আবশ্যক। সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা

বিজ্ঞাপনই যে বর্ত্তমান যুগে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পগুলিকে সচল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ইংরেজ ও আমেরিকার ব্যবসায়ীরা সেই জন্যই তাঁহাদের মাল পৃথিবীর বাজারে চালাইবার জন্য বিজ্ঞাপনের উপর প্রভূত খরচ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিলাতে বিজ্ঞাপন দিবার কৌশল শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় আছে। এদেশে ঐরূপ সুযোগের একান্ত অভাব। বর্ত্তমান যুগের বাজার পূর্ব্বেকার মত সীমাবদ্ধ নহে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকেরা সমস্ত পৃথিবীর বাজারে তাঁহাদের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয় করেন।

এক জন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন—

The technique of modern production and finance has to be supplemented by the technique of sales management, including scientific advertisement. It is the connecting link between the modern system of large-scale production and a worldwide market.—Sir Francis Goodenough.

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সর্ ফ্রান্সিস গুড্এনাফের (Sir Francis Goodenough-এর) নেতৃত্বে বিলাতী মালের কাটতি বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়। জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় সফল হইবার জন্য এই সমিতির মতে প্রয়োজন—

Scientific education for sales managers which would comprise expert knowledge in salesmanship, commercial law, marketing and advertisement to enable successful handling of sales organisations of gigantic English corporations.

ইহা হইতে বুঝা যাইবে বিদেশী কোম্পানীর মালিকেরা প্রচার-বিভাগকে কত মূল্যবান মনে করেন।

বাঙালী প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন যে বিলাতী কোম্পানীর ন্যায় তাঁহারা বিজ্ঞাপনে খরচ করিতে অক্ষম, কারণ তাঁহাদের পুঁজি অল্প, বিক্রয়ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ও দেশের আর্থিক অবস্থা ও ব্যাপক নিরক্ষতার জন্য বিজ্ঞাপনের রিটর্ন্ (return) কম। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। শেষোক্ত কারণের জন্য বিদেশী শাসনই দায়ী। তাই বলিয়া হাল ছাড়িলে চলিবে না। ছোট, বড় সব প্রতিষ্ঠান মিলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেও লাভ আছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলার ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলিকেই ধরা যাউক। হিন্দুস্থান, নিউ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল প্রভৃতি কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ কোম্পানীই সেরূপ নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞাপন দেন না। যাহা দেওয়া হয় তাহাও বৈচিত্র্যহীন। অথচ অনেক উন্নতিশীল ভাল কোম্পানী আছে যাহার সহিত জনসাধারণের পরিচয় হওয়া আবশ্যক। চা'কর সমিতির ন্যায় ইহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অনেক বাঙালীই বীমার উপকারিতা ও স্বদেশী কোম্পানীতে বীমা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কোম্পানীর ন্যায় যাঁহারা সাবান, অঙ্গরাগ, প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুত করেন তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর আছে। সেই জন্য সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ক্রেতা বিদ্যমান। ভারতের সর্ব্বত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। অবশ্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞাপনে যেরূপ বিশিষ্টতা ও নৈপুণ্য দেখা যায় ভারতীয় বিজ্ঞাপনগুলি ততটা আকর্ষক হয় না। দু-একটি ছাড়া বাংলার কাপড়ের কলগুলি বিজ্ঞাপন-বিষয়ে অত্যন্ত অমনোযোগী। অতি অল্পসংখ্যক মিলেরই ভাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ভারতীয় রেলওয়েজ্, ভারতীয় চা'কর সমিতি, ভারতীয় শর্করা সমিতি প্রভৃতির ন্যায় একটি সাধারণ বিজ্ঞাপন তাঁহারা সমিতির দিক হইতে দিতে পারেন। তাহাতে সকলেই লাভবান হইবেন এবং দেশের ও দশের যথেষ্ট উপকার হইবে। প্রতি শহরে ও গ্রামে যাহাতে বাংলায় তৈয়ারী বস্ত্র ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সর্ব্বত্র যাহাতে মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহার প্রতি প্রচার-বিভাগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের প্রশস্ত উপায় বাংলার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি। সেই পত্রিকাগুলির মারফৎ বাংলায় ও বাংলার বাহিরে অসংখ্য বাঙালী বিজ্ঞাপিত বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যাঁহারা কোনও রূপ পত্রিকা বা সংবাদপত্র পড়েন না তাঁহাদের মধ্যে পণ্যের প্রচার করিতে হইলে সিনেমা, ষ্টেশন, পার্ক প্রভৃতি স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ডের এক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অভিমত যে নিয়মিত ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপর যে-কোনও শিল্প-বস্তুর প্রচার-সাফল্য নির্ভর করে। বাংলার ব্যবসায়ীমহল আশা করি ইহা উপলব্ধি করিবেন। বিজ্ঞাপনের অভাবে ভাল জিনিস বিকায় না বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জোরে নিকৃষ্ট বস্তুও বিক্রয় হওয়া অসম্ভব নহে।

সর্ এডোআর্ড বেন্থলের (Sir Edward Benthal) কথাগুলি এক্ষেত্রে বাঙালী ব্যবসায়িগণকে মনে রাখিতে অনুরোধ করি—

No business can carry on in these days of acute competition except on the most efficient basis, and suppliers can only get work by supplying goods of the best quality at the cheapest rate

ভারতীয় যুদ্ধ-তহবিল ও করদান-ব্যবস্থা

শ্রীনিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ব্রিটেনের স্কন্ধের গুরুভার লাঘব করবার প্রয়াসে বহুবিধ কর-স্থাপন ও অন্য উপায় দ্বারা অর্থসমাগমের চেষ্টা করছেন। যে-সকল কর এ উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটিই প্রধান।

১। অতিরিক্ত লাভ কর (Excess Profit Tax)

২। বিক্রয় কর (Sales Tax)

এই বিশাল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা শুধু কর স্থাপন দ্বারাই সম্ভব নয়। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের নিকট হ'তে ঋণও গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই সকল ঋণের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট Bond অথবা Certificate দেন। এই বণ্ডগুলো তিন প্রকারের, যথা :—(১) 3% Defence Loan Certificate, (২) Interest-free Bond, (৩) Defence Saving Certificate. আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে এগুলি আয়করমুক্ত।

সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ বনাম অতিরিক্ত লাভ কর আদায়

বছর আড়াই হ'ল যুদ্ধ সুরু হয়েছে। এই সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের দরও অভাবনীয়রূপে বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কিংবা বাংলা-গবর্ণমেণ্ট কেহই আজ পর্য্যন্ত কোন জিনিসের মূল্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেন নাই।* গবর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যের কারণ এই নয় যে, গবর্ণমেণ্ট মনে করেন জিনিসের অনটন ঘটেছে, অথবা জিনিস তৈরি করবার খরচ ততোধিক বেড়েছে, এবং অতিরিক্ত লাভ ঘটছে না। এই মুনাফা ঘটছে ইহা স্বীকার ক'রেই ত গবর্ণমেণ্ট "অতিরিক্ত-লাভ কর" নামক করটি বসিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান ত হ'ল না। এই কর ধার্য্য করার ফলে অবশ্য ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, কিন্তু জনসাধারণ ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য দিয়েই চলেছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ না ক'রে তার পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত-লাভ কর বসানোর ফল হয় এই যে, জিনিসের মূল্য সরাসরি বৃদ্ধি পাবার একটা প্রেরণা পায়,* এবং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে বর্ত্তমানের ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কারণ, ইহা সকল ব্যবসায়ীরই বোধগম্য যে অতিরিক্ত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হবার চেয়ে সেই মুনাফার উপর শুধু একটা কর দেওয়া অনেক লাভজনক। কারণ, জিনিসের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত উহা তাহার স্বাভাবিক মূল্য—যে-মূল্য নাকি সুদূরকালে জিনিসটির চাহিদা ও সরবরাহের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'ত। এই মূল্য দ্বারা শুধু সাধারণ মুনাফা লাভই সম্ভব, কারণ জিনিসের মূল্য উহার 'Bulkline Producer's cost" (marginal cost of production)এ ধার্য্য হয়েছে।† সুতরাং মূল্য নির্দ্ধারণের সুযোগ নিয়ে উৎপাদনকারীরা জিনিসের মূল্য দেদার বাড়িয়ে দিচ্ছে, লাভের মাত্রাও বেড়ে চলেছে, এবং কর দিবার পরও অপর্য্যাপ্ত সঞ্চয় করছে। অপর পক্ষে, গরীব ক্রেতাদের প্রাণ ত ওষ্ঠাগত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরূপ করদানের ব্যবস্থা প্রতীপ, এবং সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। এ করের গুরুভার গরীব জনসাধারণই ব'য়ে থাকে বেশী, এবং ধনী ব্যবসায়ীরা দিব্যি গরীবের মাথায় হাত বুলিয়ে ট্যাক্সের টাকা ও তদুপরি লাভ আদায় ক'রে নিচ্ছে।

---

* পাঠকগণ হয়ত অবগত আছেন যে Indian Price fixing Bodyটি a taproom byword of hapless inefficiency ব'লে পরিচিত হয়েছে। এই ধার্য্যনিয়ন্ত্রণের কার্য্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আরম্ভ করা হয় নাই; সুতরাং যে দু-একটি জিনিসের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে (কাগজ, ইত্যাদির) তাহাও uneneconomic price বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকে আবার মনে করতে পারেন—'কেন? কোন কোন জিনিসের মূল্য ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা বেশ বেঁধে দিয়েছেন।' কিন্তু, অন্য কথা বাদ দিয়ে, যেহেতু ইহা জিলাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং শুধু কয়েকটি জিনিসই অধিকার করে বসেছে, সেই হেতুই ইহা হৃতকর্ম্মা হ'তে বাধ্য।

* A. C. Pigon—Political Economy of War, pp. 116-117.

† Bye and Hewett—Applied Economics, p. 243 দ্রষ্টব্য।

আয়-করমুক্ত ঋণ-সনদ ও অতিরিক্ত-লাভ কর

কিন্তু এ প্রকার প্রতীপ কর-ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। গবর্ণমেণ্ট যে-সমস্ত "লোন সার্টিফিকেট" বের করেছেন সেগুলো আয়-করমুক্ত হওয়ায়, লোকের উহা ক্রয় করবার প্রতি একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। রাজনৈতিক মনোভাবের কথা বাদ দিলে অন্যথায় ব্যবসায়ীরা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা দ্বারাই পরিচালিত হন। এমতাবস্থায় অর্থ সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় ডিফেন্স লোন ক্রয় করা ; কারণ, তাহা দ্বারা ব্যবসায়ীরা উভয় প্রকারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমতঃ লাভ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোন সার্টিফিকেট কিনে অতিরিক্ত-লাভ কর নামক ট্যাক্সটির আঁচ থেকে রক্ষা পেতে পারেন* ; দ্বিতীয়তঃ, সার্টিফিকেট-গুলো আয়কর-মুক্ত হওয়ায়, তাহার উপর টাকা লগ্নী ক'রে বর্ত্তমানের 'অত্যন্ত সর্ব্বনাশা' graduated income tax-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এ প্রকার আয়কর-মুক্ত লোন সার্টিফিকেট ও অতিরিক্ত-লাভ কর সমকালীন প্রবর্ত্তিত হ'লে ট্যাক্সটি ব্যবসায়ী-দিগকে তাদের মনোভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ে লোন সার্টিফিকেট ক্রয় ক'রে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য করায়। অবশ্য, এই বাধ্য করানোর কাজটা সম্পূর্ণই অহিংস। ব্যবসায়ীরা যে ডিফেন্স লোন কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তাহা উহার বিক্রীর পরিমাণ দেখেই বুঝা যায়। ১৯৪০ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ১০৩,৪৯,৭৭,০০০ টাকার লোন সার্টিফিকেট বিক্রী হয়েছে। অথচ আমরা অতিরিক্ত-লাভ কর আদায় সম্বন্ধে কিছুই শুনছি না এবং ব্যবসায়ীরাও উহার দোহাই দিচ্ছেন না ; তাই মনে হয়, উহা হৃতকর্ম্মা হয়ে পড়েছে। অবশ্য, ইহা নিশ্চিত যে এ করটি সরাসরি অর্থ উপায় না করলেও, পরোক্ষভাবে লোন সার্টিফিকেট বিক্রীর সহায়তা ক'রে গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধভার বহনের জন্য অর্থাগমের পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এই কর ধার্য্য না ক'রে তাহার পরিবর্ত্তে জিনিসের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিতেন তাহ'লে ব্যবসায়ীদের বর্ত্তমানের অতিরিক্ত লাভটা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গিয়ে খরচ হয়ে যেত, ব্যবসায়ীদের বর্ত্তমানের অতিরিক্ত লাভটাও ঘটত না—ফলে, সার্টিফিকেটও বিক্রী হ'ত না।

বিক্রয়-কর

এ কর-ব্যবস্থাটিও প্রতীপ। ক্রেতাদের নিকট ইহা যেন 'গোদের উপর বিষ-ফোড়া' ব'লে মনে হচ্ছে। কারণ ইহার বোঝা বিন্দুমাত্র বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর উপর না প'ড়ে সমস্তটাই ক্রেতাদের উপর চেপে বসেছে। ক্রেতাদের অধিক মূল্য দিয়ে জিনিস কেনার পরও এরূপ করভার বহন করা এবং বিক্রেতাদের কোন করের আঁচ না লাগিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান মুনাফা লাভ—এরূপ সামাজিক অসামঞ্জস্যের উদ্ভব যে ব্যবস্থা দ্বারা সাধিত হয়েছে তাহা বাস্তবিকই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিপন্থী। অবশ্য এই করভারটি যে ক্রেতারাই বহন করবে এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। অনেক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, যেহেতু অর্থসচিব বিলটি উত্থাপনকালে এরূপ বলেছিলেন যে ইহার ভার শুধু বিক্রেতারাই বহন করবে এবং ক্রেতাদের ইহা দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি সাধিত হবে না, সেই হেতু নিশ্চিতই বিক্রেতারাই ইহা বহন করবে—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এরূপ ধারণাকারীদের আমরা শুধু রাজা ক্যানিয়ুটের পারিষদবর্গের সহিত তুলনা করতে পারি। কারণ, যে-সকল ধারা অর্থনৈতিক জগৎকে পরিচালিত করছে, তাদের স্বাভাবিক শক্তি কোন আইনকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায় না। উহাদের শক্তি প্রতিহত করা রাজশাসনের ক্ষমতার বাইরে। আইনের বলে হয়ত বা ক্যাশ-মেমোর সঙ্গে করটা আলাদা লিখে আদায় করবার প্রণালীটিকে বন্ধ করা যেতে পারে ; কিন্তু লাভ কি? ব্যবসায়ীরা অনায়াসেই ট্যাক্স অনুপাতে জিনিসের দর বাড়িয়ে উহা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে পারে। ইহাতে বাধাদানের কিছুই নেই। যাদের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট সরাসরি ট্যাক্সটা আদায় করবেন সেই অতিবৃহৎ ফার্ম্মগুলোর সংখ্যা খুবই কম ; সুতরাং তারা সকলে মিলে অনায়াসেই গোপনীয় বন্দোবস্তের দ্বারা (Gentleman's Agreement) ট্যাক্সের পরিমাণ অনুযায়ী জিনিসের দর কমিয়ে বিক্রী করতে পারেন।

সুতরাং মোটামুটিভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা যাচ্ছে যে, এই কর-ব্যবস্থাগুলো সবই প্রতীপ। কিন্তু এইরূপ কর-ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ধনী ব্যবসায়ীরা গরীব ক্রেতাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরও ধনবান্ হোক, ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এরূপ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের সাধ্যাতিরিক্ত দান ধনী ব্যবসায়ীর হস্তগত হবে এবং এই সব ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রমবর্দ্ধমান ধনের পূর্ণাবয়ব রক্ষার পথ যে শুধু ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করা ইহা অনুধাবন করতে পেরে, তাদের লাভের প্রায় সম্পূর্ণাংশই যুদ্ধচালনাকল্পে নিয়োজিত করতে বাধ্য হবেন।

* Bye and Hewett—Applied Economics, p. 507.

আর্যদেবের মহাপ্রস্থান*

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য, নাহি গ্রহ নক্ষত্র নিকর
নাহি তৃণ তরুলতা, নদ নদী, পর্বত প্রান্তর,
নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, পশুপক্ষী, নাহিক মানব
শূন্য শূন্য—মহাশূন্য, আকাশের মত শূন্য সব!
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, ইহলোক নাহি পরলোক,
স্বপ্নোপম শূন্য সব—মরীচিকাসম, কার তরে করিতেছ শোক?
কোথা সুখ, কোথা দুঃখ? কেবা মিত্র, কেবা তব অরি?
কী বা প্রিয়? কী অপ্রিয়? কাঁদিতেছ কোন্ কথা স্মরি?
কী ছিল না, কী লভিলে? কী বা ছিল, কী বা গেল চলি?
নাহি ছিল—নাহি আছে—নাহি হবে, শূন্য যে সকলি!
কে কাহারে কী বা দিল, কে কাহার করিল সম্মান?
কে কাহার কী বা নিল, করিল কে কারে অবমান?
কোথা রূপ, কোথা তৃষ্ণা? কী যে তুমি করিছ বিচার!
কে জন্মিল, কে মরিল? কে বা বদ্ধ, মুক্তি হবে কার?

এই চতুর্দশপদী পদ্যটি আচার্য শান্তিদেবের অমর গ্রন্থ 'বোধিচর্যাবতারে'র নবম পরিচ্ছেদের কতিপয় শ্লোকের ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ। মূলের অনুপম সৌন্দর্য অনুবাদে প্রকাশ করিবার দক্ষতা আমার নাই, কেবল ভাবমাত্র প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি। যে-মহামানবের মহাপ্রস্থানের বিষয় লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহার পটভূমির জন্য ইহার প্রয়োজন।

আচার্য আর্যদেব শূন্যবাদী বৌদ্ধ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের[১] এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম।[২] মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরমপূজ্য আচার্য নাগার্জুনের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। কী প্রতিভায়, কী পাণ্ডিত্যে, কী বাগ্মিতায়, কী চরিত্রের মাধুর্যে, তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এক বার দাক্ষিণাত্যের এক রাজার উদ্যোগে আহূত এক বিরাট্ বিচারসভায় তিনি সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন।[৩] পরাস্ত পণ্ডিতগণ বিচারের নিয়মানুযায়ী বৌদ্ধ শূন্যবাদ স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষা লইলেন। কিন্তু হায়! এই জয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। এই পরাজিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাহারও এক উদ্ধত শিষ্য, গুরুর পরাজয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, আর্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া, শপথ করিল—"জ্ঞানের দ্বারা তুমি জয়ী হইয়াছ, আমি জয়ী হইব কৃপাণের দ্বারা।"

সে তাহার প্রতিহিংসার সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

লোকালয় হইতে দূরে, একান্তে, এক নির্জন অরণ্যে, আচার্য আর্যদেব শিষ্যগণসহ, ধ্যানে এবং শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই তপোবনেই তিনি তাঁহার "শতশাস্ত্র" ও "চতুঃশতক[৪]" রচনা করেন।

একদিন যখন তিনি তাঁহার যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন, শিষ্যগণ যখন অন্যত্র ধ্যানমগ্ন, তখন হত্যাকারী সহসা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া উঠিল—"'শূন্য'-অস্ত্রের দ্বারা তুমি আমাদের জয় করিয়াছিলে, আজ 'প্রকৃত'-অস্ত্রের দ্বারা আমি তোমাকে জয় করিলাম।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাঁহার উদরে অস্ত্রাঘাত করিল।

দারুণ আঘাতে পাকস্থলী হইতে অন্ত্রসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—জীবনপ্রদীপ নির্বাণোন্মুখ, তথাপি প্রশান্ত

* চীন ভাষায় (১) কুমারজীব এবং (২) *Chi-Chia-Ye* (*Ki-Kia-Ye*) ও *Than-Yao* কর্তৃক অনূদিত আর্যদেবের দুইখানি জীবনচরিত হইতে এই ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐ দুই জীবন-চরিতকারের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। কুমারজীব ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং *Chi-Chia-Ye* (*Ki-Kia-Ye.*) ও *Than-Yao* এই দুই জন সম্মিলিত ভাবে ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে উহা অনুবাদ করেন।

Vide Chinese Catalogue by Bunyiu Nanjio, No. 1462, No. 1340.

১ চীন ভাষার এই দুই জীবনচরিতেই দক্ষিণ-ভারতে তাঁহার জন্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু তিব্বতী গ্রন্থে লিখিত আছে তাঁহার জন্ম সিংহলে।

২ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে তাঁহার জন্ম।

৩ কুমারজীব বলেন—এই সভায় এত পণ্ডিত-সমাগম হয় যে রাজাকে প্রতিদিন দশ শকটপূর্ণ খাদ্য ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে হইত। তিন মাস যাবৎ এই বিচার চলিতে থাকে এবং এই তিন মাসের মধ্যে এক লক্ষের অধিক লোক শূন্যবাদে দীক্ষিত হয়।

৪ কুমারজীবের অনুবাদে "শতশাস্ত্র" ও "চতুঃশতক" এই উভয় গ্রন্থের কথাই আছে। কিন্তু অন্য অনুবাদখানিতে কেবল 'শতশাস্ত্রে'র কথা আছে।

আর্যদেব করুণাপূর্বক হত্যাকারীকে বলিলেন—"বৎস! ঐ আমার কাষায়বস্ত্র, ঐ আমার ভিক্ষাপাত্র; উহা লইয়া ভিক্ষুর বেশে অবিলম্বে ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন কর। আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এখনও অজ্ঞান, তাহারা তোমাকে বন্দী করিয়া রাজসকাশে প্রেরণ করিবে। এখনও তোমার দেহের মায়া দূর হয় নাই, সুতরাং দেহ-নাশের দুঃখ সহিতে পারিবে না।"

প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, দেহত্যাগের আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় কোনও এক শিষ্য দৈব-ক্রমে তথায় আসিয়া পড়িলেন। এই শিষ্যের করুণ-আহ্বানে চতুর্দিক হইতে শিষ্যবৃন্দ দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইলেন। চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদের প্রিয়তম আচার্যের সেই শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া কেহ স্তম্ভিত, কেহ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ উন্মত্তবৎ রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা হত্যাকারীর সন্ধানে ইতস্তত ধাবমান হইলেন। "কে হত্যা করিল?" "এই নৃশংস অত্যাচার করিল কে?"—"হত্যাকারী কোথায় গেল?" অরণ্যে, পর্বতে, দিকে দিকে এই প্রশ্ন মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তখন সেই মহারণ্য, সেই তাপসজনযুত তপোবনভূমি সচকিত করিয়া মুমূর্ষুর অবরুদ্ধ কণ্ঠ সহসা ফুকারিয়া উঠিল:

নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার,
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ দুঃখ হাহাকার!
কে তোমার প্রিয়জন? কার তরে কর অশ্রুপাত?
কে মারিল? কে মরিল? কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত?
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব! মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত!
মহাব্যোম-সমান-শূন্যতা; শান্ত, শিব, প্রপঞ্চ-অতীত।

মালয় ও ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

মালয় এবং ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ জাপ-কবলিত হইবার পর জাপানের হাতে খনিজ দ্রব্য, রবার, চা ও চিনির এক বিপুল সম্পদ চলিয়া গিয়াছে। ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের প্রধান খনিজ দ্রব্য তৈল। সমগ্র পৃথিবীতে যত খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৩ ভাগ আসে এই অঞ্চল হইতে। ইহার পরিমাণ কম নয়। পূর্ব্ব-এশিয়ার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যত খনিজ তৈল প্রয়োজন একা ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ তাহার সবটাই সরবরাহ করিতে পারে। ১৯৩৮ সালে এই দ্বীপপুঞ্জে ৮৩ লক্ষ টন অপরিস্রুত তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে একা সুমাত্রার উত্তরে মেডান জেলা এবং দক্ষিণে পালেমবাং-জাম্বি জেলা হইতে ৪৬ লক্ষ টন; জাভার পশ্চিমে বাটাভিয়া এবং পূর্ব্বে সুরাবায়া ও রেমবাং হইতে ১০ লক্ষ টন; ডাচ বোর্ণিওর বালিক পাপান হইতে ১০ লক্ষ টন এবং উহার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে টারাকান দ্বীপে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং মালাক্কার সেরামে ৮২ টন তৈল পাওয়া যায়। এই সমস্ত তৈল উৎপাদন করিত তিনটি কোম্পানী—রয়েল ডাচ শেল, নিউ জার্সি'র ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোং এবং রয়েল ডাচ শেল ও ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ গবর্ণমেণ্ট এই উভয়ের দ্বারা গঠিত একটি কোম্পানী। ১৯৩৯ সালে ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন তৈলের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৬½%, ২৭% এবং ১৬½%। ব্রিটিশ বোর্ণিওর ব্রুনেইতে ৭ লক্ষ এবং সর্ব্বকে ২ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জে তিনটি তৈল শোধনাগার আছে—বৃহত্তমটি সুমাত্রার পালেমবাং জেলায়, মাঝারিটি ডাচ বোর্ণিওর বালিক পাপান জেলায় এবং ছোটটি ব্রিটিশ বোর্ণিওর সর্ব্বকে অবস্থিত।

টিন পাওয়া যায় মালয়ে এবং ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের বঙ্ক, বিলিটন ও সিঙ্কেপ দ্বীপে। ১৯৪০ সালে মালয়ে ৮৫৩৮৪ টন এবং ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের উপরোক্ত দ্বীপ তিনটিতে ৪৪৫৬৩ টন টিন উৎপন্ন হয়। মালয় এবং ডাচ ইণ্ডিজ মিলিয়া পৃথিবীর মোট উৎপন্ন টিনের শতকরা ৫৫ ভাগ সরবরাহ করে। মালয়ের টিনপ্রস্তর হইতে টিনের পাত তৈয়ারির কারখানা আছে পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে। ডাচ ইণ্ডিজে টিনের কারখানা আছে একমাত্র বঙ্ক দ্বীপে। বিলিটন ও

সিঙ্কেপের টিনপ্রস্তর আগে হল্যাণ্ডের আর্ণহেম শহরের কারখানায় প্রেরিত হইত। সম্প্রতি মালয়ে পাঠাইয়া উহা টিনের পাতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মালয়ের জহোর রাজ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ সালে এখান হইতে মাত্র ৩৬ টন বক্সাইট জাপানে রপ্তানী হয়। ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৫৫৭৫১ টন হয়। সিঙ্গাপুরের নিকটে বিনটান দ্বীপেও প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজে ১৯৩৮ সালে ২ লক্ষ টন বক্সাইট সংগৃহীত হয় এবং ইহারও প্রায় সবটাই জাপান তাহার এলুমিনিয়ামের কারখানাগুলির জন্য ক্রয় করিয়া লয়। এলুমিনিয়ামের উপর এরোপ্লেনের কারখানাগুলিকে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া জাপান দেশেই এলুমিনিয়াম তৈরির উপর খুব ঝোঁক দিয়াছিল। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তাহার নিজস্ব কারখানায় এলুমিনিয়াম উৎপাদন ৭০০ টন হইতে বাড়িয়া ২৩ হাজার টনে দাঁড়ায়। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে তাহার চাহিদাও বাড়িয়া ৫৮০০ টন হইতে ৪৫ হাজার টন হয়। ১৯৪০ সালেও জাপান তাহার এলুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫ হাজার টনের বেশী করিতে পারে নাই। ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ এবং জহোরের সমুদয় বক্সাইট তাহার হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুই স্থান হইতে প্রাপ্ত বক্সাইটের দ্বারা তাহার এলুমিনিয়ামের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স ও আমেরিকা হইতে এলুমিনিয়াম ক্রয় করিয়া জাপান তাহার অভাব মিটাইত।

তৈল, টিন এবং বক্সাইট এই অঞ্চলের প্রধান খনিজ দ্রব্য হইলেও আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এখানকার খনিতে পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ হইতে ১৭ লক্ষ ৮১ হাজার টন কয়লা সরবরাহ হয়, তন্মধ্যে সুমাত্রার দুইটি সরকারী খনি হইতেই উঠিয়াছিল ১২ লক্ষ ২২ হাজার টন। মালয়েও কয়লা কিছু পাওয়া যায় বটে, তবে তার চেয়েও বেশী পাওয়া যায় লোহা। ১৯৩৮ সালে মালয়ের ট্রেঙ্গানুতে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন, জহোরে ৫½ লক্ষ টন এবং কেলাণ্টানে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন, মোট ১৬ লক্ষ ১৬ হাজার টন লৌহপ্রস্তর পাওয়া যায়। ডাচ বোর্ণিও এবং সেলিবিসেও প্রচুর লৌহপ্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

গত যুদ্ধের পর জাপানে লোহা উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা পর্য্যাপ্ত নহে। ১৯১৩ সালে ঢালাই লোহা ২৩৬ হাজার টন এবং ইস্পাত মাত্র ৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে উহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার টন এবং ৬২ লক্ষ ৩০ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। জাপ সাম্রাজ্যে জাপানের নিজস্ব প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লৌহ-প্রস্তর পাওয়া যায় এবং ভাঙা লোহা সংগৃহীত হয় তাহার প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-দশমাংশ। মালয়, ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ এবং ফিলিপাইন অধিকার করিলেও তাহার লোহার অভাব ঘুচিবে না। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় প্রচুর লৌহ-প্রস্তর পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং উহা হইতে লোহা বাহির করিবার ব্যয়ও অত্যধিক পড়ে। জাপানের লোহা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেরিকা ও ভারতবর্ষ এবং এই দুইটি কেন্দ্রই আজ তাহার নিকট বন্ধ।

মালয়ের ট্রেঙ্গানু এবং কেলাণ্টানে ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে, ১৯৩৮ সালে ৩১৯০০ টন জাপানে রপ্তানী করাও হইয়াছিল। জাভাতেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে বার্ষিক ১০ হাজার টনের বেশী খনি হইতে তোলার ব্যবস্থা সেখানে হয় নাই। মালয়ের কেডা এবং ট্রেঙ্গানুতে উলফ্রাম পাওয়া যায়। ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজেও উলফ্রামের খনি আছে এবং ১৯৩৯ সালে উহার উৎপাদন বাড়াইয়া সাড়ে তিন হাজার টন পর্যন্ত করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০০ টন। উলফ্রাম হইতে টাঙ্গষ্টেন ধাতু বাহির করা হয়। উন্নত ধরণের ইস্পাত তৈরিতে টাঙ্গষ্টেন ব্যবহৃত হয় বলিয়া অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেলিবিস দ্বীপে নিকেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং উহা একটু নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও খনির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ২৩৫০০ টন নিকেলপ্রস্তর তোলা হয়।

বৃক্ষজাত দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রবার। গত বৎসর মালয় উপসাগর অঞ্চল হইতে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টন রবার রপ্তানী হইয়াছিল। পৃথিবীর মোট রবার রপ্তানীর ইহা শতকরা ৮১ ভাগ। থাই রাজ্য এবং ফরাসী ইন্দোচীন হইতে শতকরা ৮ ভাগ রপ্তানী হয়। অর্থাৎ এই কয়টি মাত্র স্থান হইতেই পৃথিবীর মোট উৎপন্ন রবারের শতকরা ৮৯ ভাগ সরবরাহ হয়। অবশিষ্ট ১১ ভাগ আসে সিংহল, ব্রহ্ম, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে। মালয় এবং ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের উৎপাদন প্রায় সমান সমান। ১৯৪০ সালে মালয় হইতে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন, উত্তর-বোর্ণিও হইতে ১৮ হাজার টন, সর্ব্বক হইতে ৩৫ হাজার টন এবং ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ হইতে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টন রবার রপ্তানী হয়। মালয়ের প্রায় সর্ব্বত্রই রবার পাওয়া

যায় বটে, তবে জহোর পেরাক সেলাঙ্গর নেগ্রি-সেম্বিলান এবং কেডা বিশেষভাবে রবারপ্রধান। ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে রবার আসে জাভা এবং সুমাত্রা হইতে।

মালয়ের রবার হাতছাড়া হইবার ফলে বৃটেনকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। কিছু রবার মজুত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরনো এবং পরিত্যক্ত রবার নূতন করিয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা আমেরিকার ন্যায় ব্যাপক ও উৎকৃষ্টভাবে ব্রিটেনে হয় নাই। পরিত্যক্ত রবার ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত অনেকগুলি কারখানা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যেই আমেরিকায় এই প্রকার রবারের ব্যবহার শতকরা ২৯ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৪৪-এ দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকা রাসায়নিক রবার তৈরিতেও মনোযোগ দিয়াছে; ব্রিটেন তাহাও করে নাই। পুরনো ও পরিত্যক্ত রবার হইতে ব্যবহারোপযোগী রবার তৈরি এবং রাসায়নিক রবার তৈরি এই দুইটি প্রক্রিয়ার প্রতি আমেরিকার অনুরাগ এবং ব্রিটেনের বিরাগের কারণ নাই এমন নয়। আমেরিকা চিরকাল রবারের ক্রেতা এবং ব্রিটেন উহার উৎপাদক ও বিক্রেতা। বাহিরের আমদানী কোন কারণে বন্ধ হইয়া গেলে বিপদ ঘটিতে পারে ইহা বুঝিয়া আমেরিকা সময় থাকিতে সাবধান হইয়াছে। মালয়ের রবারক্ষেতের ব্রিটিশ মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে পুরনো ও পরিত্যক্ত রবারের ব্যবহার বৃদ্ধি কোন দিনই প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। পরিত্যক্ত রবারের মূল্য কৌশলে টন প্রতি ২০ শিলিং হইতে ১০ শিলিঙে নামাইয়া দিয়া ইঁহারা এই উদীয়মান ব্যবসায়টিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দেন। যে সব রবারের কারখানা পরিত্যক্ত রবারের টুকরাগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা আর লাভ নাই দেখিয়া উহা পোড়াইয়া ফেলিতে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পুরনো রবারের ব্যবহার বাড়াইতে গিয়া রবারওয়ালাদের কায়েমী স্বার্থের বিরাগভাজন হইতে সাহস পান নাই। একজন রবার কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কণ্ট্রোলার নিয়োগ ব্যাপারেও তাঁহারা রবারওয়ালাদের মনস্তুষ্টি করিতে বাধ্য হন; ঐ পদে নিযুক্ত হন ব্রিটিশ টায়ার এণ্ড রবার কোম্পানীর চেয়ারম্যান সর্ ওয়ালরণ্ড সিনক্লেয়ার। বলা বাহুল্য, ইনি পরিত্যক্ত রবার হইতে ব্যবহারোপযোগী রবার প্রস্তুতকার্য্যে উৎসাহ দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি রবার-কণ্ট্রোলার নিয়োগের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ঐ পদ তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ডে আছেন ডানলপ রবার কোম্পানীর চেয়ারম্যান সর্ জর্জ্জ বেহারেল, প্রাক্তন কণ্ট্রোলার সর্ ওয়ালরণ্ড সিনক্লেয়ার, রবার রিজেনারেটিং কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর এবং আর কয়েকটি সংশ্লিষ্ট শিল্পের লোক। এই বোর্ডের গঠনপ্রণালী দেখিয়া বুঝা যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রবারের অভাবজনিত ভাবী অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন কিন্তু মালয়ের রবারক্ষেতের মালিকদের প্রভাব এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। পারিলে তাঁহারা রবারক্ষেতের সহিত সংস্রববিহীন কোন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ্ অথবা বৈজ্ঞানিককে কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়া পরিত্যক্ত রবার কাজে লাগাইতে এবং রাসায়নিক রবার উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন।

ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের চিনি ও চা উৎপাদন কম নয়। একমাত্র জাভাতে ১৯৩৮ সালে ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টন অর্থাৎ পৃথিবীর মোট রপ্তানীর ৫°/. রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে চা রপ্তানী হইয়াছে ১৬২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ পৃথিবীর মোট রপ্তানীর ১৮½°/.। এতদ্ব্যতীত এই দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল-শাঁস, মসলা, তামাক, কফি এবং সিঙ্কোনা ও কুইনাইন উৎপাদনও উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ডাচ কিনা বুরো ভারতবর্ষের কুইনাইনের বাজার দখল করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার কুফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইতেছে। পৃথিবীর মোট কুইনাইনের শতকরা ৯০ ভাগ আসিত জাভা হইতে।

এই বিপুল সম্পদ জাপানের হাতে পড়িলে তাহার শক্তি কতখানি বাড়িবে এবং নিজেদের ক্ষতি কি পরিমাণে হইবে তাহা জানিয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজস্ব উপনিবেশ মালয়ে পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে ঝলসানো-ভূমি নীতি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রের মন্তব্যে প্রকাশ, রবার, টিন এবং ষ্টক মার্কেটে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার-ওয়ালা কারখানা সেখানে বিশেষ নষ্ট হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে এবং যাঁহারা উহা নষ্ট না করিয়া সরিয়া গিয়াছেন, লণ্ডনের কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছেন। মালয়ের বহু খনি, রবারক্ষেত প্রভৃতি জাপানীর হাতে পড়িয়াছে এই সংবাদ শুনিয়াও ইঁহারা বলিতেছেন যে এগুলি নষ্ট করিয়া বিশেষ ফল হইত না এই কারণে যে, জাপানীরা পূর্ব্বেই বহু রবার ও টিন মজুত করিয়া ফেলিয়াছে। ইঁহাদের মতে টিনের কারখানার স্মেল্‌টার ও ড্রেজার নষ্ট করা হইয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এই সব মালিকদের মতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কারখানাগুলি বলপূর্ব্বক নষ্ট করিতে পারেন নাই।

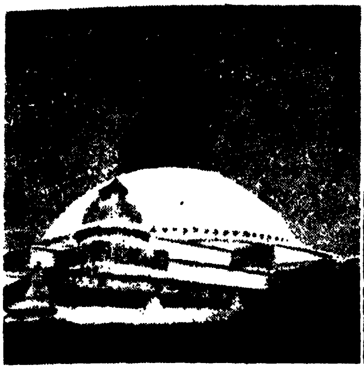
বোধনাথ মন্দির

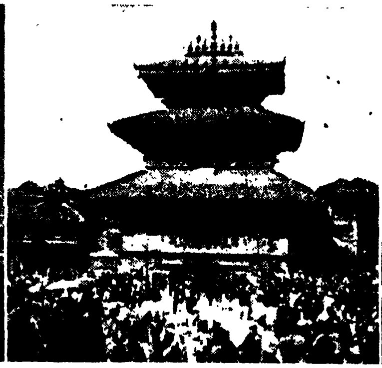
ভৈরবনাথ মন্দির

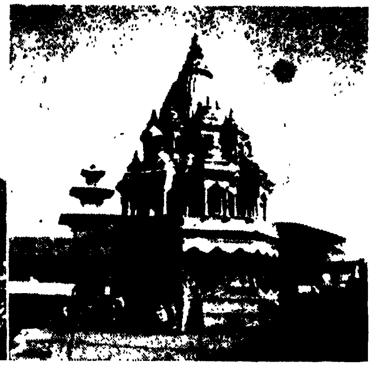
শ্রীকৃষ্ণজীর মন্দির, পাটন

নেপালের পূজাপার্ব্বণ

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় উপনিষদ-যুগের অবসানের সঙ্গেই। মৈত্রীমূলক উদার বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুণে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নিখিল ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহ-রক্ষার প্রায় এক শত বৎসর মাত্র পরেই বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম্মমত নিয়ে এমন প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয় যে তার ফলে তাঁরা কালক্রমে হীনযান ও মহাযান নামে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই অনৈক্যই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ অবনতির সূচনা করে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির অশ্বঘোষ মহাযান মত প্রচার করেন। এই ধর্ম্মমতের আদর্শ ছিল যেমন মহৎ, ক্রিয়াপদ্ধতি ছিল তেমনই কঠিন ও কষ্টকর। হিন্দুদিগের পবিত্র গ্রন্থ ভগবদ্গীতা অনুসরণে এই ধর্ম্মমত গঠিত হয়েছিল, অনেকে এই রকম অনুমান করেন। শৈব ধর্ম্মমতের সঙ্গে মহাযান ধর্ম্মমতের সাদৃশ্য আছে। তান্ত্রিক গুহ্য ধর্ম্মও এই ধর্ম্মমতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই প্রভাবের ফলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মন্ত্রযান' নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হয়। চার শতাব্দী পরে এই মন্ত্রযানই আবার তিব্বতে 'কালচক্রযান' নামক এক বীভৎস মতবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। নেপালে 'বজ্রযান' নামে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত, তাও এই কালচক্রযানেরই রূপান্তর মাত্র। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যখন মগধ বিজিত হ'ল তখন তত্রত্য বৌদ্ধগণ মগধ ত্যাগ ক'রে উড়িষ্যা, ব্রহ্ম, কম্বোজ, নেপাল প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। স্বনামখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু রত্নরক্ষিত সেই সময় অন্যান্য বৌদ্ধাচার্য্যগণসহ নেপালে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে পূর্ব্বোক্ত বজ্রযান ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন। কালচক্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা প্রচণ্ড তান্ত্রিক ও পঞ্চ-মকারের সাধনা তাঁদের ধর্ম্মের অঙ্গ। সহজযান মহাযানের আর একটি সহজতর সংস্করণ। এই সকল অল্পায়াসসাধ্য শাখা ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তনের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জনপ্রিয়তা প্রথমে কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে উক্ত ধর্ম্মের আদর্শ যথেষ্ট খর্ব্ব হয়েছিল ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধির ফলে ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোতে বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত হ'য়ে উঠেছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে উন্নীত করার অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য বৌদ্ধ আচার্য্যরা সঙ্ঘের বাহিরে সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে স্বধর্ম্মানুমোদিত কোনরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রতি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। সেই কারণে বিকট ব্যভিচারপরায়ণ আদর্শভ্রষ্ট বামাচারী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অনাচারের ফলে ধর্ম্মবলহীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন পতন হ'ল তখন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সহজেই মিশে গেল।

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত আদি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দেবপূজার

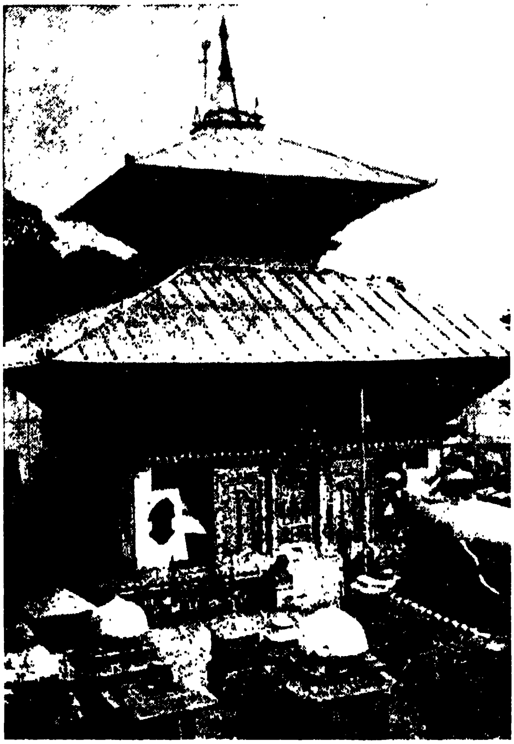

শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দির, কাঠমণ্ডু

কোন বিধান ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেবের লোকান্তরপ্রাপ্তির বহু বৎসর পরে তাঁর প্রতি দেবত্ব আরোপিত হয় ও বৌদ্ধ বিহারসমূহে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলি দেবমূর্ত্তিরূপে পূজিত হ'তে আরম্ভ হয় দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার সূচনা এই ভাবে হ'ল। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন ও তার মূর্ত্তি পরিকল্পিত হ'ল তার পর। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির বামে 'ধর্ম্মে'র স্ত্রীমূর্ত্তি ও দক্ষিণে 'সঙ্ঘের' পুরুষ মূর্ত্তি গঠিত হয়ে ত্রিরত্নের এই ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ-শিষ্যদের উপাস্য হয়ে উঠলেন। তার পর ক্রমশঃ অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ ও তার সঙ্গে লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা ও আর্য্যতারিকা নাম্নী তাঁদের পঞ্চশক্তির পূজার প্রবর্ত্তন হ'ল। হিন্দু তান্ত্রিক তন্ত্রের শক্তিবাদ এই ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্ত্তীকালে এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ ও পঞ্চশক্তি থেকেই উদ্ভূত হ'লেন মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি পঞ্চ বোধিসত্ত্ব। এই সকল দেবদেবী ভক্তদের কল্পনার বিভিন্নতানুযায়ী বহু হস্তপদাদিবিশিষ্ট নানা বিচিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রলেন। অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন অবনতির নিম্নতম সোপানে অবতীর্ণ হ'ল, তখন প্রেত, প্রেতিনী, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, যক্ষিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতিও দেবদেবীর যোগ্য সমাদরে মহোৎসাহে পূজিত হ'তে লাগলেন।

হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল যে প্রভাবান্বিত হয়েছিল ও হিন্দুদের শিবোক্ত তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয়েছিল তাই নয়, পুরাণোক্ত অনেক হিন্দু দেবদেবী স্বনামে অথবা নামান্তরে বৌদ্ধদের উপাস্য হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু তান্ত্রিকদের অনুকরণে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাও তারা, বারাহী, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীদের উপাসক হয়ে উঠলেন ও হিন্দুদের শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নিকট বজ্রসত্ত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামান্তরে পূজা পেতে লাগলেন। পক্ষান্তরে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মও হিন্দু ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রে উহার রূপান্তর সাধন করেছে ও বৌদ্ধদের বহু দেবদেবী স্বনামে অথবা বেনামে, আদিরূপে অথবা পরিবর্ত্তিত রূপে হিন্দুদের উপাস্য দেবদেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপে হিন্দুদের পূজ্য। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত অনেক হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক গবেষণা করলে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম থেকে তাদের হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে আমরা বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সমন্বয় দেখতে পাই। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মমতও যে বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের দ্বারা প্রভাবিত, একথা অনুমান করা কঠিন নয়।

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই স্থানীয় লৌকিক সভ্যতা ও ধর্ম্মমতের প্রভাবে ও পারস্পরিক সংঘর্ষে ও সংমিশ্রণে কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ত্তমানে এমন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে যে আদিম আর্য্য বৈদিক ধর্ম্ম অথবা ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত মূল বৌদ্ধ ধর্ম্ম থেকে যে এদের উৎপত্তি তা নির্ণয় করা আজ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দুটি ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ ও বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক, তাদের মধ্যে আজ সৌসাদৃশ্যের অভাব নেই; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভেদরেখা কালক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে এসেছে; পরস্পরে মিতালি ক'রে যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুজনের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য সাধন ক'রে নিয়েছে।

পূর্ব্বোক্ত অংশটুকু হ'ল এই প্রবন্ধের পটভূমি। এবার আমি নেপালে অধুনাপ্রচলিত পূজা-পার্ব্বণের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত ক'রে আমার বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার চেষ্টা করব।

গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির

হনুমান ধোকার প্রাঙ্গণ। দক্ষিণে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ

মহাকাল মন্দির, কাঠমণ্ডু

একই মন্দিরে একই দেববিগ্রহকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভক্তরা স্ব-স্ব ধর্ম্মের দেবতাজ্ঞানে কেমন নির্ব্বিবাদে পূজা করেন, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু শহরের কেন্দ্রস্থলে 'টুর্ণিখেল' নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের উত্তর দিকে অবস্থিত বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহের পূজা থেকে হিন্দুদের বিশ্বাস এটি মহাকাল শিবের বিগ্রহ; কিন্তু বৌদ্ধদের বিশ্বাস এটি বজ্রপাণির মূর্ত্তি। ফলে বিগ্রহ উভয় সম্প্রদায়েরই পূজা লাভ ক'রে থাকেন।

নেপালের বৌদ্ধ চৈত্যে ও মন্দিরে যেমন হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তির দর্শনলাভ দুর্লভ নয়, হিন্দু মন্দিরেও তেমনি বৌদ্ধ দেবদেবীর বিগ্রহ বিরল নয়। তত্রত্য অধিকাংশ মধ্য-যুগীয় অথবা আধুনিক চৈত্যে আদি বুদ্ধ, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ প্রভৃতির মূর্ত্তির সঙ্গে হিন্দু দেবী শীতলাও সসম্ভ্রমে স্থান লাভ করেছেন; অবশ্য, সে জন্য তাঁকে নামান্তর গ্রহণ ক'রে বৌদ্ধদের নিকট "হারীতী" নামে পরিচিতা হ'তে হয়েছে।

হিন্দু দেবতা গণেশের ও দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তি নেপালের বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা পেয়ে আসছেন। নেপাল রাজ্যান্তর্গত প্রাচীন শহর ভাদগাঁওয়ের (প্রাচীন ভক্তপুরী) একটি পর্ব্বতের উপরিস্থ "সূর্য্য-বিনায়ক" নামক গণেশ মূর্ত্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই দেবতা খুব জাগ্রত ব'লে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন। সূর্য্য-বিনায়কের শরণাপন্ন হ'লে নাকি বোবা শিশুর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত নেপাল রাজ্যে 'বিনায়ক' অর্থাৎ গণেশের আরও তিনটি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবেই যে গণেশ বৌদ্ধদেরও ভক্তি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, একথা সহজেই অনুমেয়।

নেপালে "গুভাজু" নামে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য আছেন, তাঁরা গৃহী; বৌদ্ধ-বিহারসমূহে তাঁরা বাস করেন ও পূজার্থীদের প্রদত্ত দক্ষিণা-সামগ্রীতেই তাঁদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। 'গুভাজু' কথাটির উৎপত্তি 'গুরুভাজু' অর্থাৎ গুরুবাদী থেকে। বলা বাহুল্য, হিন্দু ধর্ম্মের অনুকরণেই বৌদ্ধদের মধ্যেও গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

নেপালে বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজা ক'রে থাকেন। সেখানে এই পদচিহ্নকে 'পাদুকা' বলা হয়। হিন্দুদের মধ্যে বিষ্ণুর পদচিহ্ন-পূজার প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত। এই প্রথা থেকেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে বুদ্ধ-পদচিহ্ন পূজার প্রচলন হয়েছে।

কাঠমণ্ডু শহরের উত্তরে 'বুড়ানীলকণ্ঠ' বা 'বড় নীলকণ্ঠ' নামধেয় বিষ্ণুমূর্ত্তি অতি জনপ্রিয়। এই নয়নমোহন প্রস্তর মূর্ত্তিটি নেপালের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনরূপে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রায় বার হাত দীর্ঘ নারায়ণের মূর্ত্তি একটি অগভীর জলাশয়ে শায়িত; বহুফণ অনন্তনাগ তাঁর মাথার উপর ফণা বিস্তৃত ক'রে আছে; নারায়ণের দীর্ঘায়ত নয়নযুগলে পরমা শান্তি ও আননে আনন্দ স্ফুরিত হচ্ছে। শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় জড় প্রস্তর মূর্ত্তিতে যে অপার্থিব সৌম্য শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে, তা সত্যই অভিনব। নারায়ণ যদিও হিন্দুদেরই উপাস্য দেবতা, তথাপি নেপালী বৌদ্ধরাও বুড়া নীলকণ্ঠকে ভক্তির চক্ষে দর্শন ক'রে থাকেন। এই প্রসঙ্গে নেপালের একটি বিশেষ প্রাচীন প্রথার উল্লেখ করছি। নেপালের আপামর প্রজাবৃন্দের নিকট বুড়া নীলকণ্ঠের মন্দির দ্বার অবারিত হ'লেও, নেপালের অধিরাজের

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির

(অর্থাৎ রাজার) কিন্তু বুড়া নীলকণ্ঠের দর্শনলাভ নিষিদ্ধ। তাঁর দর্শনের জন্য 'বালাজু' নামক স্থানে 'বালনীলকণ্ঠ' নামক আর একটি অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এটি পূর্ব্বোক্ত 'বুড়ানীলকণ্ঠ' মূর্ত্তির হুবহু অনুকৃতি, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্রতর। উপরোক্ত দুটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্নও কাঠমণ্ডুর প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে দোলা পর্ব্বতের উপর ঈচাঙ্গুনারায়ণ, চাঙ্গুনারায়ণ, বিসংখুনারায়ণ ও শিখরনারায়ণ নামে গরুড়োপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি-চতুষ্টয় উল্লেখযোগ্য। কার্ত্তিক মাসে যখন স্থানীয় গোর্খারা এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের মহা সমারোহে বাৎসরিক পূজা করেন তখন স্থানীয় বৌদ্ধ নেওয়াররাও সেই উৎসবের আনন্দে যোগদান ক'রে থাকেন। পাটনের বিষ্ণুমন্দিরেও পূজার্থীদের সমাগম হয়।

প্রাচীনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যখন নিয়ত সংঘর্ষ ঘটত, তখন যে হিন্দুদের ইন্দ্র দেবতাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা বেশ সুনজরে দেখতেন না, তা নেপালে প্রচলিত একটি আখ্যান থেকে বেশ বোঝা যায়। এক সময় ইন্দ্র ও বুদ্ধদেবের মধ্যে প্রবল কলহ হয়। সেই কলহের পরিণামে ইন্দ্র পরাভব স্বীকার করেন ও বুদ্ধদেব তাঁর নিকট থেকে বজ্রটি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কাঠমণ্ডু শহরের দু-মাইল পশ্চিমে একটি পর্ব্বতোপরি বৌদ্ধ দেবতা স্বয়ম্ভুনাথ বা স্বয়ম্ভুনাথের প্রাচীনতম মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরাভ্যন্তরে আদিবুদ্ধের মূর্ত্তি বিদ্যমান। প্রস্তরনির্ম্মিত চার-শ সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে মন্দিরের পূর্ব্ব ফটকে উপনীত হ'লে সম্মুখেই বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ইন্দ্রের সেই বজ্রের প্রতীক্ রূপে একটি অন্যূন তিন হাত দীর্ঘ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণবর্ণ 'বজ্র' দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের নিকট হিন্দু দেবতার পরাভব চিরস্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য মন্দিরের সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দ্বারপালরূপে গরুড়ের মূর্ত্তিও স্থাপিত আছে। বৌদ্ধরা ইন্দ্রকে যে নজরেই দেখুন, ইন্দ্রের বজ্রকে কিন্তু তাঁরা খুব ভক্তি করেন। হিন্দুরা লিঙ্গ ও যোনিকে যেমন দেবদেবীর প্রতীক রূপে ভক্তি করেন, বৌদ্ধরাও সেইরূপ বজ্র ও ঘণ্টাকে বুদ্ধদেব ও প্রজ্ঞা দেবীর প্রতীক জ্ঞানে পূজা করেন। এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বজ্রই ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের চিহ্ন, আর বিষ্ণুর বাহন গরুড়ই অপর ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধিরও বাহন। কেবল তাই নয়; হিন্দুরা যেমন বিষ্ণুকে সূর্য্যের রূপান্তর ব'লে জ্ঞান করেন, মহাযান বৌদ্ধদের উপাস্য অমিতাভকেও সেইরূপ অনেকে সূর্য্য-দেবতার প্রতিরূপ ব'লে জ্ঞান করেন। স্বনামখ্যাত শক নৃপতি কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর যে মহাযান ধর্ম্মমত সৌর প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল একথা ঐতিহাসিকদের নিকট অপরিজ্ঞাত নয়। বৌদ্ধ দেবদেবীর যাঁরা পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় বজ্রাচার্য্য। হিন্দু পুরোহিতের ন্যায় বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় কেবল তাঁদেরই অধিকার, অপরের নয়। পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে তাঁরা পূজায় বসেন। হিন্দুরা যেমন কোশাকুশি নিয়ে পূজা করেন তাঁরা তেমনি পূজা করেন পিত্তলনির্ম্মিত 'বজ্র' নিয়ে। পূজারত বজ্রাচার্য্যদের মুকুটেও থাকে এই বজ্রের একটি প্রতিকৃতি। স্বয়ম্ভুনাথের মূল মন্দিরের চারি পার্শ্বে বহু স্তূপ ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে তারা দেবীর তাম্রনির্ম্মিত মনুষ্যপ্রমাণ অনবদ্য একটি মূর্ত্তি সহজেই শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু ধর্ম্মচক্র বিন্যস্ত আছে। ধর্ম্মচক্র-গুলির গাত্রে সংস্কৃত দেবনাগরী অক্ষরে "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্র লিখিত। ধর্ম্মার্থীরা এই ধর্ম্মচক্রগুলিকে মধ্যে মধ্যে বাম দিক্ থেকে দক্ষিণাবর্ত্তরূপে ঘুরিয়ে দেন। মালা জপ ক'রে যে পুণ্য হয় হিন্দুদের বিশ্বাস, ধর্ম্মচক্র ঘুরিয়ে অনুরূপ

পুণ্য অর্জ্জিত হয় ব'লে বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস। ধর্ম্মচক্রের গাত্রে লিখিত মন্ত্রের "ওঁ" শব্দটি বলা বাহুল্য, হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। কেবল তাই নয়; ঋগ্বেদ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মচক্রের উল্লেখও দেখা যায়। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে আশ্বিন-পূর্ণিমায় স্বয়ম্ভুনাথের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

পশুপতিনাথ মন্দির থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত মহাবোধ বা বোধনাথ মন্দিরকে তিব্বতী বৌদ্ধরা অতি পবিত্র তীর্থ ব'লে জ্ঞান করেন। এ মন্দিরটির আকৃতিও এ বিরাট্ স্তূপের ন্যায়।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের অদূরে আর একটি পর্ব্বতের উপর আছে মহাযানী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা মঞ্জুশ্রীর মন্দির। ইনি বাগীশ্বর; সেই জন্য অনেক হিন্দুও এই মন্দিরে যান ও মঞ্জুশ্রীকে বাগ্‌দেবী সরস্বতীরূপে কল্পনা ক'রে ভক্তি নিবেদন করেন।

নেপাল বৌদ্ধদের যেমন, হিন্দুদেরও তেমনই অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের চতুর্ম্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শনার্থী বহু ভারতীয় পুণ্যকামী অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার ক'রে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর সময় নেপালে গমন করেন। আরও অনেকগুলি দেবমন্দির পশুপতিনাথের মূল মন্দিরটিকে বেষ্টন ক'রে আছে। মন্দিরের হাতার মধ্যে এক স্থানে এক-শ আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। পশুপতিনাথের মূল মন্দিরটির গঠন ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডার ন্যায়। মন্দিরের উপরের দুটি ছাপ্পর স্বর্ণমণ্ডিত তাম্রের পাত দ্বারা আবৃত। মন্দিরের গর্ভগৃহের আয়তন আন্দাজ পাঁচ বর্গগজ। গৃহের মধ্যস্থলে পশুপতিনাথের চতুর্ম্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তিটি প্রায় তিন-চার হাত উচ্চ ও বার-তের ইঞ্চি মোটা। গর্ভগৃহের চারদিক বেষ্টন ক'রে চারটি দরজা; সেই দরজাচতুষ্টয়ের কোলে কোলে মর্ম্মরমণ্ডিত রোয়াক। রোয়াকের কিছু নিম্নে মন্দিরের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ দীপাধার। শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি পূজা উপলক্ষ্যে এই সকল দীপাধার দীপালোকে শোভিত করা হয়। নেপালের বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে যেমন শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মচক্র আছে, পশুপতিনাথের মন্দিরে তেমনই আছে এই দীপাধারের শ্রেণী। মন্দিরের সন্নিকটে এক ঘর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। এই বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের দ্বারা পশুপতিনাথের পূজা নিষিদ্ধ। বৌদ্ধরা অনেকে বিশ্বাস করেন হিন্দুরা অধুনা যাঁকে পশুপতিনাথের মূর্ত্তি জ্ঞানে পূজা করেন, উহা বস্তুতঃ আদিবুদ্ধের মূর্ত্তি। সেই কারণে তাঁরাও এই মূর্ত্তিকে ভক্তির চক্ষে দর্শন ক'রে থাকেন।

পশুপতিনাথের মন্দির থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি পর্ব্বতের উপর গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির। ইহা হিন্দুদের পুরাণোক্ত ৫১ পীঠের একটি। সেই কারণে হিন্দুরা এই দেবীদর্শন অতি পুণ্যকর্ম্ম ব'লে মনে করেন। এই মন্দিরের ছাপ্পরও সোনার পাতে আবৃত। মন্দিরে দেবীর কোন মূর্ত্তি নেই। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে কতকগুলি ধাপ দিয়ে কিছু নিম্নে অবতরণ করলে মন্দিরের অঙ্গনে এক স্থানে থালার মত একটি আবরণী সংলগ্ন আছে দেখা যায়। আবরণীটি তুলে ধরলে জলস্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। জল-উৎসে দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে তদুদ্দেশ্যে আবরণীটির উপরেই অজস্র ফুল বিল্বপত্র নিবেদন ক'রে পুণ্যার্থীরা পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করেন। এই মন্দিরে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে মহিষ বলি হয় ও প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে নাকি মুরগীর ডিম নিবেদিত হয়। স্বয়ম্ভুপুরাণ পাঠে কিন্তু জানা যায় গুহ্যেশ্বরী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবী; সেই কারণে বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ব্বকালে গুহ্যেশ্বরী দর্শনে এসেছিলেন। গুহ্যেশ্বরী কেবল যে বিভিন্ন দেশের হিন্দু পুণ্যার্থীদের দ্বারা পূজিত হন তা নয়; বহু পুণ্যকামী বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন, রুশিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতি সুদূর অঞ্চল থেকেও দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে নেপালে আসেন গুহ্যেশ্বরী দেবীর দর্শনকামনায়।

নেপালে দুর্গার মূর্ত্তিপূজার বিশেষ প্রচলন নাই; কিন্তু দুর্গাপূজার অন্যান্য সমারোহ আছে। তন্মধ্যে মহিষ বলির সমারোহই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার কয়দিন কত মহিষ যে বলি হয়, তার আর ইয়ত্তা নাই। নেপালে কালীপূজাও প্রতিমা গঠন ক'রে হয় না, ঘটস্থাপনা ক'রে হয়।

দোললীলা বা হোলিখেলা নেপালে সাত-আট দিন চলে। ঐ সময়ে আমাদের দেশে 'মেড়া-পোড়ান' নামে যে একটি অনুষ্ঠান হয়, তার অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান নেপালেও হয়। কাঠমণ্ডুতে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে 'কুমারী-বাড়ী'র সন্নিকটে রাজপথের মধ্যস্থলে স-সমারোহে একটি চীড় পোঁতা হয়। একটি বড় কাষ্ঠদণ্ডের উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি পতাকার ন্যায় বিবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন ক'রে এই চীড় নির্ম্মিত হয়। উৎসবের ক'দিন অবিরাম ফাগ খেলা ও তৎসহ কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন চলে। উৎসবের শেষে টুর্নিখেল নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে সাড়ম্বরে চীড়টিকে এনে দগ্ধ করা হয়। পাটনে শ্রীকৃষ্ণজীর যে মন্দির আছে, সেখানেও দোললীলায় উৎসব হয়।

আলোচনা

গান্ধীর অহিংসা কি তামসিক অহিংসা ?

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' প'ড়ে খুশী হয়েছি, উপকৃত হয়েছি। জোরালো বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়ে তিনি ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের বহুবিধ সমস্যার আলোচনা করেছেন—সংস্কার-মুক্ত বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে হিন্দু সমাজের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করবার এই চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বই যাঁরা পড়বেন তাঁরা উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। অস্পৃশ্যতার মহাপাপ হিন্দুসমাজের কি ভীষণ ক্ষতি করেছে—ধরিত্রীমাতার ক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বাংলার হিন্দু কেমন ক'রে আপনাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে, যৌথ-পরিবার প্রথার মধ্যে যে সংঘজীবনের আদর্শ ছিল যার আধুনিক প্রকাশ সোস্যালিজমে—সেই আদর্শ হারিয়ে হিন্দুসমাজ কেমন ক'রে দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, জাতিভেদ বিলোপের জন্য অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং অসবর্ণ বিবাহ, এ দুয়ের কেন প্রয়োজন—প্রফুল্লবাবু চমৎকারভাবে তা দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

হিংসা এবং অহিংসার কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'বস্তুত হিংসা ও অহিংসার সুসঙ্গত সামঞ্জস্য সাধনেই মানব সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ।' এখানে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। হিংসার সঙ্গে ন্যায়ের চিরবিরোধ নেই; ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের চিরবিরোধ। হিংসা যেখানে ন্যায়ের সেবায় নিয়োজিত সেখানে তা দোষের ব'লে মনে করি নে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ন্যায়ের জয়ধ্বজাকে উড্ডীন রাখবার জন্য গাণ্ডীব ধরিয়েছেন। গীতার আদর্শ গুণাতীত হবার আদর্শ, অহিংসার আদর্শ নয়; হিংসার আদর্শও নয়। হিংসা সেখানেই সর্ব্বনেশে যেখানে সে অন্যায়ের কিঙ্করী। এখানে একটা কথা শুধু প্রফুল্লবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিই। সর্ব্বকালে সর্ব্বঅবস্থাতে অহিংস থাকবার আদর্শও হিন্দু শাস্ত্রেই আছে। পতঞ্জলি-প্রণীত যোগদর্শনে সেই অহিংসাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রতের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে যা জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। তা ছাড়া গীতার গুণাতীত আদর্শের মহিমাগানে উচ্ছ্বসিত হওয়া যত সহজ—সেখানে পৌছানো তত সহজ নয়। সত্ত্বগুণের সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত গুণাতীত হওয়া যে সম্ভব নয় একথা গীতারই কথা। অতএব গুণাতীতের আদর্শকে বড় ক'রে দেখাবার জন্য অহিংসার আদর্শকে ছোট করবার সময় একটু ভেবে চিন্তে করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু প্রফুল্লবাবু 'গান্ধী আজ সেই তামসিক অহিংসার বাণীই প্রচার করিতেছেন'—এমন একটা আজগুবি কথা লিখতে গেলেন কেন? কুড়ি বছর আগে গান্ধী অহিংসার যে ব্যাখ্যা করতেন—আজও তো সেই ব্যাখ্যাই ক'রে থাকেন। সেই ব্যাখ্যার মধ্যে ভীরুতার তো কোন স্থান নেই। Cowardice should have no place in the national dictionary অর্থাৎ জাতীয় জীবনের অভিধানে ভীরুতা ব'লে কোনো শব্দ থাকবে না—এই কথাই গান্ধী বারম্বার আমাদের কর্ণে উচ্চারণ করেছেন। অনেক বছর আগে আনন্দবাজার গান্ধীজীর বাণী বড় বড় অক্ষরে ললাটে নিয়ে প্রতি প্রভাতে যখন দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ'ত, গান্ধীজীর জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দিকে দিকে অভিযানে বাহির হ'ত, তখন কিন্তু প্রফুল্লবাবু গান্ধীর বাণীর মধ্যে বীর্য্যহীন অহিংসার কোনো নিশানাই পান নি—তাঁর প্রচারিত অহিংসা 'দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্যের তামসিক অহিংসা'—আনন্দবাজারের হালে ব'সে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করেন নি। বৈষ্ণব প্রফুল্লচন্দ্রের আনন্দবাজার বৈষ্ণবী ঢঙে সর্ব্বাঙ্গে গান্ধীর ছাপ বহন ক'রে তখন সবরমতীর ঋষির গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত ছিল। আনন্দবাজার তখন গান্ধীর প্রতিধ্বনি,—আনন্দবাজারের সম্পাদক তখন গান্ধীর ছায়া। গান্ধীর অহিংসার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র দেখেছিলেন নির্ভীক সেনাপতির শৌর্য্যের অগ্নিশিখা। আজ সহসা আনন্দবাজারের আপিসে ব'সে প্রফুল্লবাবু আবিষ্কার করেছেন—গান্ধী মানুষটা ভারতবর্ষকে ক্লৈব্যের পঙ্কে ডুবাতে ব'সেছেন। এই ডিগবাজি খাওয়ার কারণ কি? গান্ধী কি কোথাও বলেছেন শক্তির ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নোয়াতে? অত্যাচারের সামনে নতজানু হ'তে? ১৯৩৯এর ৩১শে মে গান্ধী রাজকোটে কাটীহারের কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন :—

"আমি যখন চলে যাব তখন একথা যেন কেউ না বলে—জাতটাকে আমি শিখিয়েছি ভীরু হ'তে। তোমরা যদি মনে কর আমার অহিংসা ক্লৈব্যের নামান্তর অথবা জাতটাকে ক'রে তুলবে ভীরুর জাত তবে কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে অহিংসাকে বর্জ্জন করাই তোমাদের উচিত। কাপুরুষের মতো ম'রো না। তার চেয়ে ঘুঁসি দিয়ে এবং ঘুঁসি খেয়ে যদি মরতে পার—সে মৃত্যু দেখে আমি খুশী হব। যে অহিংসার স্বপ্ন দেখছি আমি—অসম্ভব হ'লে তাকে ত্যাগ করা ভাল তবুও অহিংসার মুখোস পরে থাকা ভাল নয়।"*

এই বাণীর মধ্যে প্রফুল্লবাবু নির্বীর্য্যের তামসিক অহিংসার কি কোনো পরিচয় পেলেন? পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে দেশের জন্য দুঃখ বরণ ক'রত মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীর দল। অসূর্য্যম্পশ্যা নারীরাও আজ গান্ধীর ডাকে বেরিয়ে এসেছে অন্তঃপুরের গণ্ডী থেকে—পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতার দুর্গম পথে, কারাগারের দুঃখকে দলে দলে করছে বরণ। স্বাধীনতার জন্য সমস্ত রকমের ক্ষতিকে হাসিমুখে সহ্য করবার এই যে ক্ষত্রিয়োচিত নির্ভীকতা—সহস্র সহস্র নর-নারীর চিত্তে এই নির্ভীকতা এনে দিয়ে গান্ধীজী ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, না জাতির ললাট থেকে ভীরুতার কালিমা মুছে দিয়েছেন? প্রফুল্লবাবু গান্ধীজীর দেশের মানুষ হ'য়ে তাঁর জীবন ও বাণীর যে বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে পারেন নি—রোমা রলাঁ বিদেশের মানুষ হ'য়ে সে বৈশিষ্ট্যকে অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন। গান্ধীর কথা লিখতে গিয়ে রলাঁ লিখেছেন :—

"No one has a greater horror of passivity than

---

* "Let no one say when I am gone that I taught the people to be cowards. If you think my ahimsa amounts to that, or leads you to that, you would reject it without hesitation. I would far rather that you died bravely dealing a blow and receiving a blow than died in abject terror. If the ahimsa of my dream is impossible you can reject the creed rather than carry on the pretence of non-violence."

this tireless fighter who is one of the most heroic incarnations of a man who *resists*. The soul of his movement is active resistance—resistance which finds outlet, not in violence but in the active force of love, faith, and sacrifice." (Mahatma Gandhi by Romain Rolland, p. 46.)

"এই অক্লান্ত যোদ্ধা নিষ্ক্রিয়তাকে যেমন ঘৃণা করেন এমন আর কেউ নয়। তাঁর মধ্যে আমরা দেখছি মানুষের যে যোদ্ধৃরূপ তারই বীর্য্যময় প্রকাশ। তাঁর আন্দোলনের মর্ম্ম হচ্ছে সক্রিয়ভাবে বাধা দেওয়ায়। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার সেই অভিব্যক্তি হিংসার মধ্য দিয়ে নয়,—প্রেমের, বিশ্বাসের এবং আত্মোৎসর্গের সক্রিয় শক্তির মধ্য দিয়ে।"

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর সমালোচনা করতে গিয়ে একটা কথা আমি ভুলে যাচ্ছি। সত্যিকারের যিনি মহৎ তাঁকে ঠিকমত বুঝতে গেলে দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকা দরকার। রলঁ্যার কাছে যা আশা করবো—প্রফুল্লবাবুর কাছে তা যদি আশা করি সেটা মূঢ়তা হবে। প্রফুল্লবাবু যে গৌরাঙ্গের জীবন-কথা লিখেছেন তখনকার দিনের ফিলিষ্টাইনেরা তাঁকেও বোঝে নি—বোঝে নি ব'লেই তাঁকে নবদ্বীপ ছাড়তে হ'য়েছিল—অনেক বিদ্রূপ, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। আজকের দিনেও ফিলিষ্টাইনদের অভাব নেই, আর অভাব নেই ব'লেই যে মহামানব একটা ধূল্যবলুণ্ঠিত জাতিকে বীর্য্যের কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নবজীবনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন তিনি তামসিক অহিংসার বাণী প্রচার করছেন- এই ভুল বোঝার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন না। A prophet is not honoured in his own country—এ কথাটা মিথ্যা নয়। কাছের মানুষ বড় হ'লেও তাঁকে ছোট ক'রে দেখবার দুর্ব্বলতা মানব-স্বভাবেরই একটা সনাতন দুর্ব্বলতা।

প্রফুল্লবাবু লিখেছেন:—"হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ, বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করা যায়—ইহা বাস্তব জগতের পরীক্ষিত সত্য।" প্রফুল্লবাবু ঠিকই লিখেছেন। ফরাসীরা হিংসার দ্বারা জার্ম্মানদের হিংসাকে ঠেকাতে পেরেছে! নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, অষ্ট্রিয়া—সবাই বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করেছে! কেউ জার্ম্মানীর পদানত নয়। প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রশংসা না ক'রে সত্যই উপায় নেই!

প্রফুল্লবাবু লিখেছেন, "অহিংসা ও প্রেমের আদর্শ রক্ষার জন্য কোনো রাষ্ট্রই চোর ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।" প্রফুল্লবাবু যদি গান্ধীজীর লেখা ভাল ক'রে পড়বার মত কষ্ট স্বীকার করতেন তবে তিনি দেখতে পেতেন গান্ধীজীও ৯.৩.৪০ তারিখের হরিজনে লিখেছেন:—

"But no Government worth its name can suffer anarchy to prevail. Hence I have said even under a government based primarily on non-violence a small police force will be necessary."

"কিন্তু কোনো গবর্ণমেণ্টই অরাজকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। অতএব আমি বলেছি, কোনো গবর্ণমেণ্ট মূলত নন্‌ভায়োলেন্সে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তার পক্ষে ছোট পুলিসবাহিনী রাখবার প্রয়োজন আছে।"

পুনরায় লিখেছেন:—

A government cannot succeed in becoming entirely non-violent because it represents all the people.

গান্ধীজী আদর্শবাদী, কিন্তু সে আদর্শবাদ বাস্তবের কঠিন দাবীকে অস্বীকার করে না। অস্বীকার করলে গান্ধীজী আজ কংগ্রেসের কর্ণধার না হ'য়ে হিমাচলে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। বাস্তবের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ব'লেই লীডারশীপ ছেড়ে দিয়েও আজও তিনি কংগ্রেসের শিখরদেশে রাজসমারোহে বিরাজ করছেন।

গান্ধীজী বলেন,

Practice will always fall short of the theory even as the drawn line falls short of the theoretical line of Euclid.

আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের তফাৎ হবেই। হাতে আঁকা লাইন জ্যামিতির লাইনের মত কখনো নিখুঁত হ'তে পারে না। অহিংসার আদর্শকে ব্যবহারিক জগতে এসে কিছু না কিছু ক্ষুণ্ণ হতেই হবে। সেই আদর্শ যদি বাস্তবকে স্বীকার না করে—তা আদর্শবাদীর মগজে থিয়োরী হ'য়ে থাকবে—সংসারের কোনো কাজে আসবে না। গান্ধীজী অহিংসার আদর্শকে পতঞ্জলির পাতায় তুলে রাখতে চান না—তাকে আমাদিগের এই প্রতিদিনের জগতে হাজার হাজার মানুষের জীবনে সত্য ক'রে তুলতে চান। সেই জন্য আদর্শকে বাস্তবের তাগিদে কোথাও কোথাও খর্ব্ব করতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ নন। গান্ধীজীর সমগ্র লেখাকে ভাল ক'রে বুঝে হজম করবার জন্য আমি প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করি। সর্ব্বতোভাবে কোনো মহাপুরুষকে জানবার চেষ্টা না করলে তাঁর বাণীর কদর্থ হবার সম্ভাবনা পদে পদে।

প্রফুল্লবাবু হিংসার শক্তিতে বিশ্বাসী—অহিংসার শক্তিতে তেমন বিশ্বাস তাঁর নেই। যাঁরা মানুষের মধ্যে অতিমানুষ তাঁরা মানুষের শক্তিকে কখনো ছোট ক'রে দেখেন নি। সেই জন্য দিগন্ত যখন মেঘাচ্ছন্ন তখনো তাঁরা মানুষের মনুষ্যত্বের গরিমায় বিশ্বাস হারান নি—কামান-পূজার দুর্দ্দিনে প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের The Religion of Man-এ মানুষের নৈতিক শক্তির বিপুলতায় কবির অখণ্ড বিশ্বাসের কথাই বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে।

"But when we see that in the range of physical power man acknowledges no limits to his dreams, and is not even laughed at when he hopes to visit the neighbouring planet, must he insult his humanity by proclaiming that human nature has reached its limit of moral possibility?" (Religion of Man by Rabindranath).

"শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষ কোনো সীমারেখাকে মানতে রাজি নয়। সে নিকটবর্ত্তী গ্রহে যাবারও আশা করে এবং সে আশা দুরাশা ব'লে উপহসিত হয় না। তবে কেন সে বলবে যে তার নৈতিক শক্তি শেষ সীমায় পৌছে গেছে? এ কি তার মনুষ্যত্বের অপমান নয়?"

প্রফুল্লবাবুর এবং তাঁর মত মানুষদের সঙ্গে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানুষদের তফাৎ হচ্ছে—এঁরা মানুষকে ছোট ক'রে দেখেন নি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেছেন আর এই দেখাই ত সত্যিকারের দেখা। মানুষের মধ্যে অনন্তকে দেখেছেন ব'লেই মানুষের সম্পর্কে এঁদের আশাও অসীম। তফাৎ হচ্ছে দৃষ্টির তফাৎ। সকলের দেখবার ক্ষমতা সমান নয়।

সর্ব্বশেষে প্রফুল্লবাবু যেখানে অতিভেদ অপসারিত করার কথা লিখেছেন সেখানে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর একটু উদার হ'তে পারতেন। সাম্যের আদর্শকে সমাজ-জীবনে জয়যুক্ত করবার চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ কিয়ৎ পরিমাণে করে নি, বৃহৎ পরিমাণেই করেছে। যাই হোক, ভুল-ত্রুটি নিয়েও প্রফুল্লবাবুর 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' একখানা উৎকৃষ্ট বই —একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। তাঁকে পুনরায় আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালীর তৃতীয় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা 'প্রবাসী'তে "বাঙালীর দ্বিতীয় পাটকল" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের হাওড়া শানপুরে ভারত জুট মিল্‌স্ নামক পাটকল স্থাপনের কথা লিখিয়াছিলাম। তাহার পর পূজনীয় আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 'কর্ম্মবীর আলামোহনের জীবনকথা' 'প্রবাসী'তে বর্ণনা করেন। যন্ত্রশিল্পে বাঙালী কারিকরের স্বাভাবিক প্রতিভা আছে। যে কারণে বাঙালী উকিল, ডাক্তার, কবি, বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রগণ্য, বোধ হয় সেই কারণেই মস্তিষ্কের শক্তিতে বাঙালী কারিকর ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। আমরা জানি বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় কারখানাওয়ালারা হাওড়া হইতে কারিকর লইয়া যান। হাওড়া শহরে শত বৎসরের উপর ইউরোপীয়দিগের কয়েকটি এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা চলিয়াছে। তাহার ফলে এখানে এক দল কুশাগ্রবুদ্ধি শিল্পী পুরুষানুক্রমে কাজ করিতেছে। বৃদ্ধ বয়সে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহাদের অনেকে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়াছে। হাওড়া শহরের বেলিলিয়স রোডের দুই পার্শ্বে এই কারখানাগুলিকে চলিতে দেখিলে বাঙালীমাত্রেরই আনন্দ হয়। আলামোহনও এইরূপ একটি ছোট কারখানা লইয়া আরম্ভ করেন। রেলওয়ের মালগাড়ী বোঝাইসুদ্ধ যাহাতে ওজন হয়, সেই অতিকায় ওজনকল (weightbridge) এ দেশে তিনিই প্রথম তৈয়ারি করেন। বৃহদায়তনে এইরূপ কারখানা করিতে পারিলে তাহা কত দূর কার্য্যকর হইতে পারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর কারখানায় তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বহু যন্ত্র যাহা এদেশে কখনও প্রস্তুত হয় নাই তাহা এখন এখানে হইতেছে। গঙ্গার দুই ধারে ইংরেজদিগের পাটকলগুলিও এখানকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতেছে; ইহারা বরাবর ইউরোপ হইতে যন্ত্র আমদানী করিত। পৃথিবীর যে-কোনও দেশে যে যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে—তাহা যে হইতে পারে, সে বিষয়ে এখন কোনও সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি আলামোহনের উদ্যোগে দাশ কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পাঁচ কোটি টাকার স্থিরীকৃত মূলধনে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টার্ড হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারি করা। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকরা এদেশে লৌহ ও ইস্পাতের বৃহৎ বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান

শ্রীআলামোহন দাশ

(iron ores) আবিষ্কারের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। এক জন বাঙালী বৈজ্ঞানিক, স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যে ইহা প্রথম বাহির করেন। এই অমূল্য সম্পদ যাহাতে কোন বিদেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের হস্তে যাইয়া না পড়ে, সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া বোম্বাইয়ের ধনকুবের টাটাদের সহিত লেখালেখি করিয়া উঁহাদের অধিকারে ইহা আনিয়া দেন। এই ব্যাপারে অপর কোনও লোক নিজের আশানুরূপ লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন কিন্তু এই দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি তখন সরকারী ভূতত্ত্ববিভাগে কার্য্যের পর পেন্সন গ্রহণ করিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের কর্ম্মে

নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার গুণে সাকচী গ্রামের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন অরণ্য কাটিয়া আজ নগর বসিয়াছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী গঠিত হয়। ইহার প্রদত্ত মূলধন দশ কোটি টাকা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জামশেদপুরে প্রথম বাণিজ্যের উপযোগীভাবে ইস্পাত প্রস্তুত হয়।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায়ের আদি হইতে বাঙালীর মস্তিষ্ক কাজ করিয়াছে। সুতরাং বাঙালীর মূলধন ও উদ্যম ইহাতে নিয়োজিত হওয়া স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। স্বর্গীয় স্বনামধন্য সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আসানসোলের নিকট হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া বাঙালীর এই আশা প্রথম পূর্ণ করেন। তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী সেই সময়ে ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে যাইয়া সামান্য বেতনের বাঙালী কর্ম্মচারীদের স্ত্রীদিগের সহিত "মায়েরা কেমন আছ গো" বলিয়া যে মিশিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মনে করিয়াছিল এত দিনে এই বিরাট্ ব্যবসায় প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর হইল। সর্ রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে "ষ্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল" নামে পাঁচ কোটি টাকা মূলধনে একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আলামোহন তাঁহার পাটকল তৈয়ারীর সময়ে হাওড়া-আমতার নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে এক শত বাঙালী হিন্দু মুসলমান রাজমিস্ত্রি আনাইয়াছিলেন—যদিও হাওড়া শহরের ভিতর পিলখানায় অবাঙালী রাজমিস্ত্রি প্রচুর আছে ও কলিকাতার অনেক বাড়ীঘর পর্য্যন্ত তাহারাই তৈয়ারী করে। তাঁহার কারখানার বাগ্‌দী দরওয়ানগুলিকে তিনি গুর্খাদের সঙ্গে রাখিয়া কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙালী দালালকে তিনি ইচ্ছা করিয়া কাজ দেন বলিয়া পাটে বাঙালী দালালের সংখ্যা এখন বাড়িয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতার রাস্তায় খৈ ফিরি করিয়াছেন ও পরে মিস্ত্রির কাজ করিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্রের কারখানায় উনিশ-কুড়ি বৎসরের কারিকরগুলিকে নিজ হাতে কাজ শিখাইয়া তিনি আশী টাকা বেতন দিতেছেন। তাঁহার নূতন কারখানায় বহু সহস্র বাঙালীর কাজ হইবে ও বাংলার বেকার সমস্যার তীব্রতা কতকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পঁচিশে বৈশাখ

'চিত্রগুপ্ত'

পঁচিশে বৈশাখ—
আবার আসিয়া কবি, তব নাম ধরি দেয় ডাক!
সে নামে শিহরি উঠে আম্র-মঞ্জরীর দল শাখায় শাখায়,
চাঞ্চল্য উচ্ছ্বসি উঠে বলাকার পাখায় পাখায়,—
ধায় তারা কবির সন্ধানে;
বন্দনার অর্ঘ্য রচে সারা বিশ্ব ছন্দে, গন্ধে, গানে।
ওগো নিখিলের কবি!
বন্দনার আয়োজন পরিপূর্ণ সবি,
শুধু তুমি নাই—
প্রথম প্রণামখানি কাহারে জানাই—
আজিকার নির্ম্মল প্রভাতে?
যত ভাবি ঘনাইয়া আসে বাষ্প তত আঁখিপাতে।

অনুরাগ রক্তিমায়
শিহরায়
অশোক-স্তবক;
শুভ্র-পক্ষ বিস্তারিয়া সারি সারি উড়ে আসে বক-
নীল নভোপথে;
মানস-সরসী হ'তে
যেন বহে নিয়ে আসে ভারতীর প্রসাদী-মালিকা-
শ্বেত পদ্ম-অক্ষরেতে বিরচিত আশীর্ব্বাণী লিখা
তোমার উদ্দেশে;
মলয় এসেছে দ্বারে—দু-হাতে ভরিয়া এনেছে সে
যূথী-বেলী-মল্লিকার গন্ধঘন আনন্দের রাশি,—
সর্ব্ব-অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি,—

তোমারে বন্দিবে—
আশা আছে—সাগ্রহে বাড়ায়ে বাহু তুমি তারে
আলিঙ্গন দিবে।

আলিঙ্গন কোথা?—
ব্যাকুল বাতাস শুধু, কাঁদি ঘুরে ফিরে হেথা হোথা—
অলিন্দে অঙ্গনে;
আকন্দে রঙ্গনে—
নীলমণি লতা আর মধুমঞ্জরীরে—
ব্যাকুলি শুধায় ডাকি, "দেখেছো কবিরে?"
আন্দোলিয়া নব কিশলয়
তারা কয়—
"জানি না তো!—"
আরো বলে, "ব্যস্ত কেন? ক্ষণপরে পাবেই দেখা তো—
আমরা ক'জনে
রত আছি পূজা-আয়োজনে
আজ তাঁর জন্মদিন—স্নানে গিয়াছেন হবে বুঝি!"

ব্যাকুলিয়া তবু তাঁরে খুঁজি'
ধায়,
দক্ষিণের বায়—
না মানিয়া বোধ
উপেক্ষিয়া বৈশাখের তীব্র খর রোদ
শুষ্ক পত্র মর্মরিয়া, বেণু-নিকুঞ্জের বীথি করিয়া মুখর—
নদীতীরে নিঃশ্বসিয়া উতলা করিয়া তার শূন্য বালুচর
ভগ্নমনে চ'লে গেল মাঠে
চরণের স্পর্শ স্মরি মাটি যেথা ফাটে;
রাখালের বেণু-সাধনার বেদী বংশী-বট-মূলে
বাতাস থামিল এসে—হৃদয়ের দ্বার দিল-খুলে।
বাঁশরীর রন্ধ্র-পথে—হতাশার
ব্যথা তার
গান হয়ে ওই উঠে বাজি'
শুনিতে কি পাও কবি? ডাকিছে তোমারে তব
জন্মদিন আজি!

এই তব জন্মদিন—
বিরাশী বছর আগে—একদিন আনি এক শিশুরে নবীন—
সঁপি দিয়ে গয়েছিলো ধরণীর স্নেহভরা কোলে;
উল্লাস কল্লোলে
আবির্ভাব ঘোষি তার গ্রহণ করিয়াছিল বুকে
সে দিন ধরিত্রী তারে—কী নিঃসীম সুখে!
তারপরে এতকাল ধরি'
বর্ষে বর্ষে তত্ত্ব নিতো এই দিনে সে-শিশুরে স্মরি
সেই তার জন্মদিন—
ক্ষয়হীন—
তাহার গচ্ছিত ধন—সেই শিশু আমাদের কবি
ফিরিত এ কথা জেনে—কী আনন্দ লভি'!

কে জানিত বাইশে শ্রাবণ
বক্ষে লয়ে ঈর্ষ্যা-ভার পিছে তার করিত ধাবন?
নিল শেষে অন্ধ হয়ে হরণ গৌরবে;
—জন্মদিন সাথে তার কোনোদিন দেখা নাহি হ'বে।
না জানি সেকথা—
ডাক দেয় বক্ষে লয়ে দর্শনের তীব্র আকুলতা—
বর্ষ পরে
ব্যগ্র স্বরে
আজো তব জন্মদিন, 'পঁচিশে বৈশাখ'
সঘনে মন্দ্রিত কই উৎসবের শাঁখ?

ওরে নাহি কবো
বাইশে শ্রাবণ-বার্ত্তা—হাসিমুখে মোরা চেয়ে রবো—
ওর মুখে
সকৌতুকে
বলিব,—"এ লুকোচুরি খেলা,—
বাহির করতো তারে খুঁজে এই আনন্দের মেলা?"

তারে কবি, তোমার কীর্ত্তির মধ্য হ'তে বল, "আছি—
তোমার অত্যন্ত কাছাকাছি—
যুগে যুগে চিরদিন মরমের মাঝখানে তব
অক্ষয় অমর হয়ে রবো!"

শুনে তাহা হাসিমুখে তৃপ্তচিত্তে ফিরে চ'লে যাক্
পঁচিশে বৈশাখ!!

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাবান্তর

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টাউনহলে সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ সভার অধিবেশনে যে-যে বিষয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১৩৪৯ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সেগুলির উল্লেখ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পড়িয়া, আমার প্রতি কবির একটি বিশিষ্ট আদেশ প্রস্তাবরূপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া আমি সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করিলাম। কবির স্মৃতিরক্ষার্থ যে সকল উপকরণ উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাও তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কবিস্মৃতি ইহাতেও চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

কবি যখন "উত্তরায়ণে" অসুস্থ ছিলেন, সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে সুবিধামত তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে তাঁহার কাছে যাইতাম। এক দিন সকালে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলে, তিনি ধীর মৃদুস্বরে আমার অভিধানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার জীবনের পরিধি বাড়ে, তা হ'লে অভিধান শেষ ক'রে তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে।" আমি বিনীত ভাবে জানাইলাম,—"আদেশ করুন।" তখন তিনি বলিলেন,—"বাংলা ভাষার প্রাদেশিক শব্দের ভাল অভিধান নাই, সকল প্রদেশের কথ্য ভাষার শব্দ সংগ্রহ ক'রে একটা অভিধান করতে হবে।" আমি বলিলাম,—"যদি আমার এই অভিধান জীবনে শেষ হয়, আর আমার কাজের শক্তি থাকে, তা হ'লে আমি আপনার এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবো, ত্রুটি করবো না।" কবি তখন আশীর্বাদ করিলেন,—"তুমি পারবে, আমি বলছি।" কবির স্বর্গারোহণের পরে, পাছে আমি একথা ভুলিয়া যাই, এই ভাবিয়া শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথকে ও মাননীয় 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ে বলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, সুবিধা হইলে, কোন-না-কোন সময় বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কবির এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে। এক্ষণে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণকে এ বিষয় বিশেষভাবে জানাইতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন, মনে হয় না।

এই আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়া, সেই সমিতির উপরে ইহার কার্য্যভার অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ সমবেত চেষ্টায় অভিধানের কার্য্য অবাধে চলিতে পারে, মনে হয়। ইহা একের কার্য্য নহে—মহৎ কার্য্যে মহান্ সমবায় সিদ্ধির সুফলপ্রসূ।

সমিতি গঠনের পরে, প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ অভিধানের কার্য্যের প্রথম পদ্ধতি—ইহাও সমবায়ের চেষ্টাসাধ্য বিষয়। এই হেতু প্রদেশ বিভাগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শব্দতত্ত্বরসিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। সংগৃহীত শব্দসমূহ কিরূপ প্রণালীতে লিখিলে সুব্যবস্থিত ও অভিধানের উৎকর্ষজনক হয়, তাহা সমিতির সভ্যগণ বিচারপূর্বক নির্ধারণ করিলে, তদনুসারে অভিধান লেখার কার্য্য চলিবে।

বিশ্বভারতী এই কার্য্যের সবিশেষ ভার গ্রহণ করিয়া প্রধান কেন্দ্র হইলেও, ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—এই বিদ্যাকেন্দ্রদ্বয়ের সহযোগিতার আশা বিশ্বভারতী বিশেষভাবে করিলে, তাহা অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অন্য শাখাসাহিত্য-পরিষৎসমূহের সহকারিতার আশাও দুরাশা বলা যায় না। বস্তুতঃ এইরূপ কার্য্যে সকল বিদ্যাকেন্দ্রেরই সাহায্য বিশেষ আবশ্যক এবং ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহারা ভিন্ন প্রদেশের হইলেও, ব্যাপক সাহিত্যসম্পর্কে ইহাতে তাঁহাদেরও সাহিত্য রহিয়াছে।

এই কার্য্য যেমন ব্যাপক, তেমনই ব্যয়বহুল; সুতরাং কেবল কর্ম্মে সহকারিতা করিলে, অর্থাভাবে তাহা অনর্থক আয়োজন হইবে। সার্থক করিতে হইলে, অর্থসঞ্চয় চাই। কর্ম্মীরা দক্ষিণা না পাইলে, স্ব-স্ব কর্ম্মে দক্ষতা দেখাইতে শৈথিল্য করেন, তাই সকল কর্ম্মেই দক্ষিণার ব্যবস্থা। এই হেতু অর্থসংগ্রহ বিশেষ চিন্তনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিশ্বভারতীর অভিধানের অর্থকোষের বিশেষ শক্তিসঞ্চয় হয়। বৃত্তি-

প্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও স্ব-স্ব কার্য্য নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া আশাতীত ফল দেখাইতে পারেন।

'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিষয়সমূহের মধ্যে, বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ববিধান ও বিশ্বভারতীর কার্য্যের সম্প্রসারণ—এই দুইটি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই দুইটির জন্য যে অর্থ আবশ্যক, তাহা সংগৃহীত ও সেই সংগৃহীত অর্থে ঐ দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইলে, উদ্বৃত্ত অর্থে স্মৃতিরক্ষার্থ অন্য কোন কোন কার্য্য করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমার প্রস্তাব যে, ঐ উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশে অভিধানের কোষের সূত্রপাত করিলে ভাল হয়। সে কোষ স্বল্পধন হইলেও, অল্প অল্প সঞ্চয়ে ক্রমে তাহা কার্য্যসাধনে শক্তিমান্ হইতে পারে। বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বভারতীর মূল এইরূপ স্বল্পধন-কোষ। বনস্পতি বিশাল বটের মূলবীজ অতিক্ষুদ্র।

মুস্‌লমান সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত জাতি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

বাংলা দেশে হিন্দুজাতি ও মুসলমান-সম্প্রদায়ই হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টকৃত লোক-গণনার সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী মুসলমান-সম্প্রদায় হিন্দুজাতি অপেক্ষা দ্রুত-বর্দ্ধনশীল বলিয়া গণ্য। ইং ১৯৩১ সালের গণনানুসারে বাংলা-দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০৭ জন। মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬২৪ জন। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫৯ লক্ষ ২৭ হাজার ২১৭ অধিক। মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ ছিল। বর্ত্তমান ১৯৪১ সালের গণনায় ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটি ৩ লক্ষ। হিন্দুর সংখ্যা হইয়াছে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার। মুসলমানের সংখ্যা হইয়াছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪·৭৩ হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ নাই কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। ইং ১৯০১ সালের সেন্সাসের সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ৫৫টি শ্রেণী ছিল। ইহাদের মধ্যে বড় দুইটি শ্রেণী সিয়া ও সুন্নী। ইহা ব্যতীত মোতাবিলা নামক তৃতীয় শ্রেণী আছে। ইঁহাদের কোরাণে লিখিত আছে—

"O ye men, verily I have created you male and female and divided you into classes and communities so that you can distinguish one from another."

('প্রবাসী'—আশ্বিন ১৩৪৭,)।

হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ আছে, শ্রেণীভেদও আছে। বাংলায় হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতির সংখ্যা প্রায় শতাধিক। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের বিচার প্রবল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীভেদ থাকা সত্ত্বেও তাহা নাই। একসঙ্গে বসিয়া আহার করা ও এক রান্নায় খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে তেমন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকিলেও বৈবাহিক আদান-প্রদান বিষয়ে খুব সতর্কতা দৃষ্টিগোচর হয়। তথাপি গবর্ণমেণ্টকৃত লোক-গণনার সময়ে সকল মুসলমানকেই একসঙ্গে গণনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং ভিতরে সামাজিক ব্যবধান থাকিলেও বাহিরে তাঁহারা একই সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হন। হিন্দুদিগকেও বরাবর এইরূপ ভাবে সেন্সাসের সময়ে একটি জাতিরূপেই গণনা করা হইত। হিন্দুদিগের মধ্যে নানা শ্রেণী-বিভাগ জাতি-বিভাগ ও আহার এবং বৈবাহিক আদান-প্রদানের পার্থক্য সত্ত্বেও সকল হিন্দুকেই হিন্দুর কোঠায় ফেলা হইত। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ আছে; যথা, রোম্যান্ ক্যাথলিক্ ও প্রোটেষ্টাণ্ট। প্রোটেষ্টাণ্টগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—অ্যাংলিকান্ ও নন্-কন্ফরমিষ্ট বা ডিসেণ্টারস্। প্রথমটি সরকারী ধর্ম্ম ও দ্বিতীয়টি বেসরকারী ধর্ম্ম। দ্বিতীয়টির আবার তিনটি শাখা আছে, যথা, ওয়েস্‌লিয়ান্, ব্যাপটিষ্ট ও প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ (স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা এই ধর্ম্মী)। ইঁহাদের সকলকেই খ্রীষ্টান বলিয়া গণনা করা হয়। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও 'মহাযান' ও 'হীনযান' নামে দুইটি শাখা আছে; ইহাদের সকলকেই বৌদ্ধ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ

প্রভৃতির জনসংখ্যা-গণনার কার্য্য পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এই চিরন্তনী প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে 'বর্ণহিন্দু' (Caste Hindu) এবং 'তপশীলভুক্ত জাতি' (Scheduled Castes) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বেলায় সংখ্যা-গণনার কার্য্য করা হইয়াছে ধর্ম্মের বিচার করিয়া, কিন্তু হিন্দুদের বেলায় করা হইয়াছে অন্যরূপে। কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ করা হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও গবর্ণমেণ্ট দেন নাই। কখনও তাঁহারা বলেন যে, রাজনৈতিক অধিকার দানের ভিত্তিতে এরূপ করা হইয়াছে; কখনও বলেন যে, সামাজিক হীনতার ভিত্তিতে এরূপ করা হইয়াছে। তপশীল-বিলাসীরা কিন্তু এই দুই কথার কোনটিরও উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অম্লান বদনে বলেন—"এটা রাজনীতিক্ষেত্রে যে-কোন কারণেই হোক আজ উদ্ভব হয়েছে।" ('পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' পত্রিকা—১৩৪৬, আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তাঁহাদের মনের ভাব বোধ হয় এই যে, একথা লইয়া বিশেষ তোলাপাড়া করিবার আবশ্যক নাই। উপকারক নূতন কিছু একটা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

যাহা হউক, 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণ এখন কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা স্থির করা বাস্তবিকই কঠিন। এই হেতু সুপণ্ডিত ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী মহোদয় মোবাহমে মাত্র এই কথা বলিয়াছেন, যে, মুসলমান হইতে হিন্দু যেমন পৃথক্, হিন্দু হইতে 'তপশীলীরা সেইরূপ পৃথক্, এ কথার ভিতরে বুঝিবার গণ্ডগোল কিছুই নাই। 'তপশীলী'রা না লইলেন 'ভেক্' আর না পড়িলেন 'কলমা', কাজে কাজেই মিষ্টার আমেরীর উক্তিটি যথাপ্রযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। "তপশীলীরা হিন্দু হইতে পৃথক্" বর্ত্তমানে এই উক্তিই যথেষ্ট। ভাষ্যাদি অবশ্য পর-পর বিবৃত হইতে দেখা যাইবে। পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্র যেমন আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনই হিন্দু সমাজের অঙ্গ হইতে ছিটকাইয়া গিয়া 'তপশীলী'গণ রাষ্ট্রনৈতিক গগন-মার্গে এক্ষণে শোভাবিস্তার করিতেছেন। নাড়ীর যোগ থাকায় চন্দ্র অবিরাম পৃথিবীর বক্ষে সুধাই বর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রতি 'তপশীলী'গণের আচরণে নাড়ীর যোগের পরিচয় ধোঁয়াটে আকার ধারণ করিয়াছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাঙালী মুসলমানদিগের অধিকাংশের পূর্ব্বপুরুষই ছিলেন হিন্দু। 'জাতিভেদ'-আদিগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'ভারতের মুসলমান হিন্দুমা'র সন্তান' নামক পুস্তকেও এই কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সাক্ষ্য প্রবল হইলে কি হয়, এই কথাকে স্বীকার করিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই রাজী নহেন। আজ তাঁহারা ধর্ম্মের নামে বিশেষ-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও একলক্ষ্যগামী। এমন কি হিন্দুস্থানের ও হিন্দুজাতির কল্যাণের দিকে দৃক্পাত না করিয়াও স্বকীয় ইষ্টসাধনে তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। হিন্দুর সৌহার্দ্দ্য, সততা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা ঘোর সন্দিহান এবং উদাসীন। ইহার নিগূঢ় কারণ সম্বন্ধে 'অখিল ভারত হিন্দুমহাসভা'র সভাপতি ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত বীর সাভারকার মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, যে, মুসলমানের নিকট ভারতবর্ষ মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্ম-মতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতির নির্দ্দেশ অনুসারে মুসলমান রাজার শাসনাধীন দেশ বা সংখ্যাধিক মুসলমান দ্বারা অধ্যুষিত দেশ ব্যতীত অন্য সকল দেশই উঁহাদের নিকট শত্রুর দেশ বলিয়া গণ্য। (১৯৩৮।২৮শে ডিসেম্বরের 'নাগপুর-অভিভাষণ', ৩৬ পৃষ্ঠা) সুতরাং হিন্দু-বহুল ও খ্রীষ্টান রাজার দ্বারা শাসিত দেশ এই ভারতবর্ষ তাঁহাদের পক্ষে শত্রুরই দেশ। এই জন্যই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হইতে আরম্ভ করিয়া পাকিস্থান-পরিকল্পনা পর্য্যন্ত এদেশে গজাইয়া উঠিয়াছে। এই স্বদেশ অর্থাৎ জন্মভূমি ভারতের প্রতি 'লীগ'-পন্থী-মুসলমানদের সত্যিকার আন্তরিক টান কখনও জন্মিবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু কেবল মাত্র ধর্ম্মের টানেই স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও তাহাদের দেশগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা মন হইতে যে মুছিয়া যাইতে পারে না, তাহা স্বধর্ম্মী চীনের প্রতি জাপানের এবং স্বধর্ম্মী অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশগুলির প্রতি জার্ম্মানীর নিষ্ঠুর সমরাভিযান অতি পরিষ্কাররূপেই প্রতিপন্ন করিতেছে। প্রতিবেশী ইরাক, ইরান, আরব ও আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ ভারতের মুসল-মানকে কি চক্ষে দেখিতে পারেন সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা উপরিউক্ত ঘটনা হইতে করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষ এবং বাংলা দেশকে ভিন্নচক্ষে দেখিবার পক্ষে অন্ততঃ 'লীগ'-পন্থী বাঙালী মুসলমানগণের ভাল হউক বা মন্দ হউক একটা কৈফিয়ৎ দিবার আছে, কিন্তু স্বধর্ম্মী হিন্দুজাতি সম্বন্ধে ও মাতৃভূমি বাংলা দেশ সম্বন্ধে

বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবার পক্ষে তপশীল-বিলাসিগণের কৈফিয়ৎ কি? 'তপশীলীগণ' বাঙালী-হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ এবং বাংলা দেশ তাঁহাদের মাতৃভূমি। হিন্দু-সংস্কৃতি তাঁহাদের দেহ, মন ও আত্মায় পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ অস্থিমজ্জাগত। বাংলা দেশের আলো, বায়ু, জল, মাটি, ফল ও মূল তাঁহাদের জীবনের চির-সম্বল। হিন্দুসমাজ ও বাংলা দেশকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে শত চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের অন্তরাত্মা তাহাতে সায় দিবে না।

সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থলাভের আশায় বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির পথ রুদ্ধ করা বা কণ্টকিত করা কর্ত্তব্য কিনা। আমরা আগে হিন্দু, তার পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বিরাট্ হিন্দুসমাজের অঙ্গ হইতেই যদি আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি, তবে আমাদের ক্ষুদ্রতম শক্তিতে বৃহত্তর স্বার্থগুলি আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব হইবে কি? বরং হিন্দুসমাজের সহিত একযোগে চেষ্টারত থাকিলেই বৃহত্তর স্বার্থগুলি আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ পরানুগৃহীত লোক-সমষ্টির দ্বারা অন্য যে-কোনও প্রকার উন্নতি করা সম্ভবপর হউক না কেন, দেশ বা জাতির (Nation-এর) কোনও প্রকার বৃহত্তর স্বার্থকে সফল করা অসম্ভব। আর দেশ বা জাতি যত কাল পরায়ত্ত থাকিবে, তত কাল মাত্র মুষ্টিমেয় লোক অনুগ্রহজীবী-সুলভ আরামপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারিবে সত্য, কিন্তু সারা জাতির (Nationএর) শরীরে নানাপ্রকার দুর্ব্যাধি আক্রমণ করিয়া তাহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিবেই, এবং সেই দুর্ব্যাধির হস্ত হইতে যে অনুগ্রহজীবীদের বংশপরম্পরা বা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনগণও রক্ষা পাইবেন না তাহাও পরীক্ষিত সত্য। রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষেত্রে এই কথাই খুব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙ্গালীর নাড়ী দুর্ব্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় ত হোক—তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে, শক্তি খাটাতে হবে, আত্ম-নির্ভরের বড় রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।" বাঙালীর এই চাকুরীপ্রিয়তাজনিত অনিষ্টকারিতাকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু বৎসর ধরিয়া জ্ঞানগর্ভ সতর্ক বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বাণী যেমন সত্য ও শিক্ষাপ্রদ, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ। কি গভীর অন্তর্দাহ লইয়াই না তিনি বলিয়াছেন—

"Young men now-a-days look like so many criminals as if going to be hanged to-morrow."

তিনি বাঙালী জাতিকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিয়াছেন, "আমাদের দুর্ব্বল-চিত্ত, চাকরি-প্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে না।" বাঙালী জাতির মধ্যে উল্লিখিত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব সত্যই জাতির মহাকল্যাণ-দ্যোতক। এই সকল ঋষিতুল্য মনীষীগর অমূল্য উপদেশবাণী অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তির অভাব শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে দেখা দেয়, সেখানে শিক্ষানীতির কিরূপ ভয়াবহ অধঃপতন চলিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতির কল্যাণকামী এই সকল সম্মানার্হ অগ্রদূতগণের সতর্কবাণীকে অবহেলা করার জন্য সকল সমাজেরই অনুশোচনার দিন অবশ্যই এক দিন আসিবে।

তার পর পদমর্য্যাদার প্রলোভনের দিক্‌টাও বিচার করা যাউক। পদমর্য্যাদা অর্জ্জন নানা প্রকারে করা যাইতে পারে। বিদ্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শৌর্য্য, কলা-ভিজ্ঞতা, আইন-দক্ষতা, ব্যবসায়-বুদ্ধি, রাজনৈতিক পারদর্শিতা, দেশপ্রেম, ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নৈপুণ্যের দ্বারা পদমর্য্যাদা লাভ করা যায়। যাঁহারা এই সকল কৃতিত্বের দ্বারা উচ্চপদে সমাসীন ও যশস্বী হন তাঁহাদের পদমর্য্যাদার সত্যই মূল্য আছে। তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের সসম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা তাঁহাদের সদ্‌গুণরাজির অনুকূল হওয়ায় অতীব শোভন ও সুন্দর দেখায়। কিন্তু যেখানে এইগুলির অভাব সেখানে পদগৌরব সংগ্রহ বা অনুগ্রহ-কৃত লাভ মানুষকে উপহাসের পাত্রই করে। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ক্রূর দৃষ্টি দ্বারাই সেই মানুষ অভিনন্দিত হইয়া থাকে। যে-কোনও প্রকারে উচ্চাসন লাভ করিতে পারিলেই কেহ কখনও সম্মানভাজন বা শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে না। পদমর্য্যাদা আহরণের লোভ যতই প্রবল হউক না কেন, পদাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ পরানুগ্রহলব্ধ পদ-মর্য্যাদা সকল সময়ে নিরাপদও নহে। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় তাই বলিয়াছেন—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" আরও এক কথা, সমগ্র সমাজের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিয়া যদি ব্যক্তিগত পদমর্য্যাদা লাভ করিতে হয়, তবে তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। "পেটে খেলে পিঠে সয়," এই নীতি কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অচল। ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে এই নীতির

অনুসরণ করিলে তাহাতে অন্য কাহারও কোনও ক্ষতি নাই। তপশীল-বিলাসিগণের পদমর্য্যাদা সংগ্রহের ক্ষুধা সত্যই কি এতই উগ্র, যে, অহিন্দুর ছাপ সমগ্র সমাজের শরীরে লাগাইয়া দিয়াও ইহা গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দু থাকিয়া উহা লাভ করিবার শক্তির অভাব কি সত্যই ইঁহাদের ঘটিয়াছে? যাঁহারা নিজদিগকে এতই দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করেন তাঁহাদের অনুগ্রহ-প্রদাতা যে কিরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ও বিকট সাম্রাজ্যবাদী একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? হয়ত তপশীল-বিলাসীরা আর একটি কথা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন যে, এখন কিছু দিন এই ভাবে সুবিধার সুধাভাণ্ড লুঠ করিয়া ভোগ করা যাউক, তার পর যাহা হয় হইবে। কিন্তু এই ভাবে সুবিধাভোগের দ্বারা দেশ, জাতি ও সমাজের অসুবিধার বোঝাই যে বেশী করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে? তপশীল-বিলাসিগণের মধ্যে অনেকেও একথা বলিতে চাহেন যে, তাঁহারা যখন সমাজেরই লোক তখন সমাজকে পথ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহাদেরও আছে। যে-কোনও সমাজের প্রত্যেক দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকেরই এই অধিকার রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সুপন্থা ও কুপন্থা বিবেচনা করিয়া সমাজকে পরিচালনা করিলে তাহা প্রশংসার্হ ও অনুমোদনযোগ্য বলিয়াই গণ্য হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, যে, তপশীলভুক্ত হওয়া একটা নীতির ও মতের কথা, সুতরাং ইহা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সুনীতি-দুর্নীতি এবং সমাজ-কল্যাণের অনুকূল মত ও বিরুদ্ধ মতের কথাও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তবে সমগ্র সমাজের কল্যাণ হউক কি অকল্যাণ হউক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কেবল কতিপয় স্বার্থপ্রয়াসী ও পদমর্য্যাদাভিলাষী ব্যক্তির স্ব স্ব অভীষ্ট পূরণের বাঞ্ছাকে যদি প্রধান স্থান দেওয়া হয়, তবে তাহা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। সমগ্র সমাজের কল্যাণের নামে নিজেদের স্বার্থসাধনে নিরত হইয়া "মনকে চোখ ঠারিলে" তাহা কোনও মতে বুদ্ধিমান্‌গণের চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। আর বাহিরের আড়ম্বরের জোরেও কোনও মানুষ, সমাজ বা জাতি (Nation) প্রকৃত বড় হইতে পারে না। এই কারণেই আমেরিকার বিখ্যাত ও স্বনামধন্য নিগ্রো কর্ম্মবীর বুকার ওয়াশিংটন তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে উন্নতির প্রথম যুগে আইন-সভা, করপোরেশান, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতিতে প্রবেশ না করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার স্বজাতিগণ এই যুগে সর্ব্ববিধ দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার পদমর্য্যাদা গ্রহণ তপশীল-বিলাসিগণের পক্ষেও বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ একটি অশোভন আড়ম্বরের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতেছে। তপশীল-বিলাসিগণ কি মনে করেন, যে, তপশীলভুক্ত হইয়া পদমর্য্যাদালাভ ও রাজকীয় চাকরি গ্রহণ প্রকৃত সমাজ-সেবারই বিশিষ্ট অঙ্গ? তাঁহারা এখন প্রকৃত পক্ষে কাহার সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন কি? হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ও হিন্দুরূপে ও যোগ্যতানুসারে পদমর্য্যাদালাভ ও চাকরি অধিকারের চেষ্টা না করিয়া পার্থক্যসূচক তপশীলের মারফৎ স্বর্গরাজ্যের অধিকারলাভের স্বপ্নে যাঁহারা বিভোর হইয়াছেন, স্বর্গরাজ্য যে তাঁহাদের জন্য নহে ইহা ত নিশ্চিতই; অধিকন্তু মর্ত্ত্যের অধিকার হইতেও যে তাঁহারা বঞ্চিত হইতে চলিয়াছেন সেদিকে লক্ষ্য করিবেন কি? অর্থাৎ জাতও যাইবে পেটও ভরিবে না। প্রায় সওয়া কোটি 'তপশীলভুক্ত' জাতিদিগের সওয়া কোটি পেট কি মাত্র কতকগুলি সামান্য টাকার চাকরিতেই ভরিবে?

পরিশেষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু মহোদয়ের জ্ঞানগর্ভ উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "জাতির কর্ত্তব্য হইতেছে প্রধান সমস্যাকে ভুলিয়া না যাওয়া।" জনসেবার প্রকৃষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "লোকসেবার আর একটি পন্থা দুঃখ-দুর্গতির মূল অনুসন্ধান করিয়া উহা সমূলে উৎপাটিত করা।" তপশীল-বিলাসী বন্ধুগণ উপরি উদ্ধৃত উদ্দেশ্য দুইটির মধ্যে কোন্‌টির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন? তাঁহাদের জাতির (Nation-এর) প্রতি কর্ত্তব্যের ও সমাজ-সেবার মূলমন্ত্র কি?

বোর্ণিও দ্বীপের কথা

শ্রীদুলু দত্ত

যুদ্ধের খবর পড়িতে পড়িতে আমরা প্রায়ই বোর্ণিও দ্বীপের উল্লেখ পাই। আজ আমরা বোর্ণিও দ্বীপের এক

র‍্যাফ্লেসিয়া তুয়ান মুদার ফুল

অত্যাশ্চর্য্য ফুলের কথা বলিব। বোর্ণিও দ্বীপের গাছ-গাছড়ার এক আজগুবি রকমের বাড়—মনে হয় যেন আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য বা জিন্ আসিয়া ফুলগুলি সাজাইয়া দিয়া গেল বা গাছটিকে বড় করিয়া দিল। Dendrobium-জাতীয় অর্কিডের দুই দিনের মধ্যে এক থোলোতে আট শত ফুল হয়। Coelogiyne গাছের ত্রিশ ফুট লম্বা ডাঁটাতে দুই শত ধবধবে ফুল ৪৮ ঘণ্টা যাইতে-না-যাইতে ফুটিয়া উঠে।

সিঙ্গাপুরের (যাহার প্রকৃত নাম সিংহপুর) প্রথম লাট সর্ ষ্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্লসের নামে পরিচিত Rafflesia tuan mudæ নামক এক বিচিত্র ফুলের বিবরণ দিতেছি। কি চক্ষু জুড়ান সৌন্দর্য্যে, কি রাক্ষুসে আকারে, কি বিশ্রী দুর্গন্ধে বা কি ইহার অদ্ভুত জন্ম ইতিহাসে এই ফুল জগতে এক অতি বিচিত্র পদার্থ।

র‍্যাফ্লেসিয়ার ফুলই সর্ব্বস্ব। না আছে ইহার ডাঁটা, না আছে ইহার পাতা। ইহা জন্মায় পরগাছার ন্যায় এবং একটি মাত্র ফুল হয়। Cissus liaua নামক গাছের শিকড় হইতে নিজের প্রয়োজনীয় রস সংগ্রহ করিয়া লয়। প্রথমে Cissus liaua গাছের গোড়ায় একটি সামান্য উঁচু ঢেলার ন্যায় দেখা দেয়, তার পর ঘোরাল লাল রঙের খুব বড় বাঁধাকপির আকার ধারণ করে। পরে হঠাৎ এক রাত্রিতে ফুল ফুটিয়া উঠে—ফুটন্ত অবস্থায় সপ্তাহ-খানেক থাকে। ফুলের রং সুন্দর সুন্দর সাদা ডোরাদার

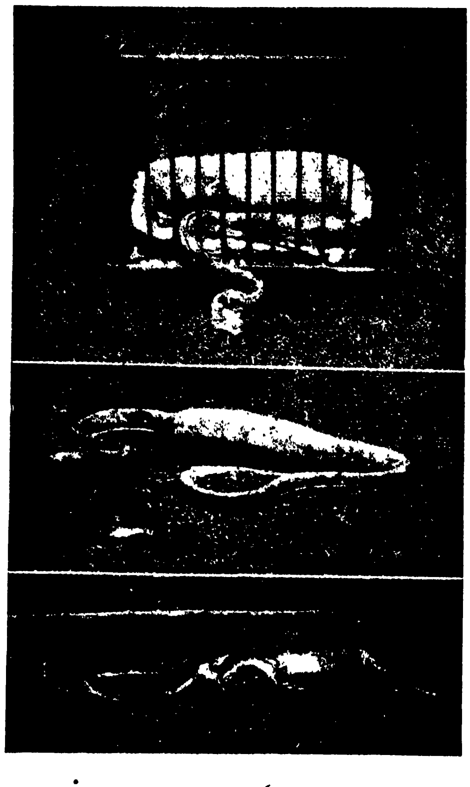

অজগরের গর্ভে বরাহ
উপরে: ১ নং মধ্যে: ২ নং নীচে: ৩ নং

বিচিত্র গোলাপী রঙের। ফুলের পাপড়িগুলি প্রায় এক ইঞ্চি পুরু এবং ইহার বেড় প্রায় নয়-দশ ফুট। ওজনে প্রায় সাত আট সের। ইহা অতি দুর্গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া স্থানটিকে দুর্গম করিয়া তুলে। ফুলটির আকার ছবি হইতে বুঝা যাইবে।

আমরা বোর্ণিও দ্বীপের অদ্ভুত ফুলের কথা বলিয়াছি; এইবার অজগর সাপের কথা বলিব। পাছে বাঘ প্রভৃতি বন্য হিংস্র জানোয়ারে ধরিয়া লইয়া যায় বলিয়া একটি বৃহদাকার বরাহ রাত্রির জন্য একটি খাঁচার ভিতর আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। কোনক্রমে অজগরটি ইহার সন্ধান পায়। লোহার শিকের ফাঁকে ফাঁকে নিজের মুখটি ঢুকাইয়া দিয়া রাত্রির মধ্যেই বরাহটিকে উদরসাৎ করে। উদরসাৎ করিয়া অজগরটি আর খাঁচার বাহির হইতে পারে নাই। সকালে লোকজন আসিয়া দেখে বরাহটি আর নাই। বরাহটিকে নিজের পেটের মধ্যে পুরিয়া অজগরটি অবসর-মত হজম করিতেছে। অবস্থাটা কিরূপ তাহা ১নং চিত্র হইতে বুঝা যাইবে। ২ নং চিত্রে খাঁচা হইতে অজগরটিকে মারিয়া (বরাহ-সমেত) বাহির করিবার পরের অবস্থা, আর ৩ নং চিত্রে অজগরের পেট চিরিয়া বরাহটিকে বাহির করিবার অবস্থা। ইহারা শিকারের চতুর্দ্দিকে প্রথমে জড়াইয়া ধরিয়া চাপ দিতে থাকে। ইহাতে শিকারের বুকের অস্থি ভাঙিয়া যায় ও দম বন্ধ হইয়া শিকার মারা যায়। পরে ইহারা শিকারটিকে আস্ত গিলিয়া ফেলে ও ধীরে ধীরে হজম করিতে থাকে। এইরূপ একটি বৃহদাকার বরাহ শিকার করিতে পারিলে ইহাদের আর পাঁচ সাত দিন শিকার ধরিবার কষ্ট করিতে হয় না।

মরুপথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভগ্ন প্রাণে দিনে-দিনে যাতনায় প্রবঞ্চিত
হৃদি মোর করে হাহাকার,
বর্ষাস্নাত শ্যামতটে শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতি
এ জীবনে পাব কি আবার!
দক্ষিণের সমীরণ বসন্তকুসুমবনে
আলিঙ্গন দিত এক দিন,
সে মোরে গিয়েছে ভুলে, স্মৃতি তার স্বপ্নসম,—
আমি আজ দিশারীবিহীন।
আঁখি দুটি অন্ধ ক'রে বালুর ঝটিকা ওঠে,
অনন্তের কোলে রিক্তরাহী।
পাথেয় ফুরায়ে গেছে,—কোন্ পথে চলিয়াছি
কেবা জানে! শান্তি সুখ নাহি।
তৃষিত তাপিত হয়ে কত দূর যেতে হবে!
পথ চলা হ'ল কি নিঃশেষ!

এ সংসার মরুভূমে করুণার বারিবিন্দু কিবা হবে!—
করুণা কোথায়—
সিন্ধুসম দেখা দিল, দুর্য্যোগ সঙ্কট ভেদি সেথা মোর
চিত্ত যেতে চায়।
খর্জ্জুর-বীথিকা-ঘেরা নাহি কোন বনচ্ছায়া,
তরুর আতিথ্য কোথা পাই!
সভ্যতার বীভৎসতা যে-পথে করিছে হত্যা,
সেই পথ নাহি ফিরে চাই।
তার চেয়ে মৃত্যু কাম্য,—মর্ম্মের লিপিকা লিখি
বালুপথে শোণিত অক্ষরে
বক্ষে নিয়া উগ্রশিখা,— এই নিঃস্ব জীবনেরে
রেখে যাই মরুর প্রান্তরে।

প্রাচ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান ও সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের শেষ পরিণতি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ যুদ্ধবিভাগ বলেন যে, ব্রহ্মদেশে নূতন লোকলস্কর বা যুদ্ধসম্ভার পাঠান সম্ভব হয় নাই এবং বিপক্ষের জনবল ও অস্ত্রবল দুইই যুক্ত জাতীয় দল অপেক্ষা এখানে অধিক; সুতরাং শক্তিগঠনের অবকাশের জন্য বিপক্ষকে বাধা-প্রদান ভিন্ন ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের এখন যে অবস্থা তাহাতে সেখানকার চীনা সৈন্য বিপদগ্রস্ত এবং চীন-ব্রহ্ম-সীমান্তও জাপানের শক্তি-অধিকৃত। এমত অবস্থায়ও চীনা সৈন্য অকুতোভয়ে লড়িয়া যাইতেছে। আমাদের পক্ষে তাহাদের বাহবা দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই। ব্রহ্মদেশে যে-সকল ভারতীয় আছে তাহাদের অবস্থা এখন বর্ণনার কেন, কল্পনারও অতীত। ব্রহ্মদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে তাঁহাদের ঐ দেশে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল তাহা অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সবকিছুই করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ের বিচার ভবিষ্যতে হইবে, বর্ত্তমানে তাহা করিবার অধিকার বা তথ্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা কোনটাই আমাদের নাই।

সুদূর প্রাচ্যে ফিলিপাইনের করেগিডর দুর্গ জাপানের হস্তগত হইয়াছে। ফিলিপাইনের দ্বীপমালায় অন্যান্য স্থলে যে মার্কিন সৈন্যদল লড়িতেছিল তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার কোনও সংবাদ সম্প্রতি আসে নাই। যাহা হউক, ফিলিপাইন হইতে এখন বহু জাপানী সৈন্য অন্যত্র যাইতে পারিবে মনে হয়। সুতরাং প্রবাল সমুদ্রের নৌযুদ্ধ অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের উদ্যোগ-পর্ব্বের এক অংশ হইতেও পারে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সম্প্রতি এক ঘোষণায় নানা কথা জানাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে এদেশ সম্বন্ধে কিছুই নাই; সুতরাং তাহার কোনও বিবরণ এই লেখার মধ্যে দেওয়া বৃথা। তবে অন্য কথার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, রুশদেশের যুদ্ধে জার্ম্মানীর লোকবল যে পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে তাহা বিগত মহাযুদ্ধের সওয়া চার বৎসরের যুদ্ধের লোকক্ষয় অপেক্ষাও অধিক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এখনকার রুশ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের রুশ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। যদি তাহাই সত্য হয় তবে জাপানের শক্তি-পরীক্ষা শীঘ্রই কঠোরতর হইবে,

ককেশসের দ্বার

কেননা যখন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের রুশকেই জার্ম্মানবাহিনী পরাজিত করিতে পারে নাই তখন এ বৎসরের যুদ্ধে হিট্‌লারের জয়লাভ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য ও নৌ-শক্তি নির্ভয়ে জাপানকে আক্রমণ করিতে পারিবে বোধ হয়। অন্ততপক্ষে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের বক্তৃতার যুক্তিতে তাহাই বুঝা যায়।

অক্ষ-শক্তিপুঞ্জ এখন সাবমেরিণ-আক্রমণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নৌবল এবং বাণিজ্যপোতবল ধ্বংস করিবার চেষ্টায় বিশেষ ব্যস্ত। ১৯৪১-এর শেষভাগে ব্রিটিশ বক্তা ও লেখকগণ বলেন যে জার্ম্মান ও ইটালিয়ান সাবমেরিণ শক্তি প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনা হইয়াছে। তাহার পর সাবমেরিণ-অভিযান আবার প্রবলভাবে বাড়িয়া উঠে। ইহাতে এক দিকে রুশ দেশে ও সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধসম্ভার প্রেরণে বাধা দেওয়া হয়, অন্য দিকে জাপানী নৌবলের

প্রাধান্য নষ্ট করার জন্য মিলিত জাতীয় দলের যুদ্ধপোত প্রেরণও অসম্ভব করা হয়। সুতরাং যত দিন এই সাবমেরিণ-অভিযান আপেক্ষিকভাবে ব্যর্থ না-হয়, তত দিন সুদূর প্রাচ্যে জাপানের নৌবলের প্রাধান্য থাকিয়া যাইবে মনে হয়।

বিমান-শক্তিতে এখন উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে কিনা সন্দেহ। এক দিকে ব্রিটিশ বোমা-ক্ষেপণের পাল্লা ফ্রান্স হইতে চেকোস্লোভাকিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং তাহার আক্রমণের প্রবলতা সমান ভাবেই চলিয়াছে, অন্য দিকে জার্ম্মান দল সমান ভাবেই মাল্টা, ভূমধ্যসাগরের অন্য অঞ্চল এবং সোভিয়েট রুশের নানা অঞ্চলে তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে এবং ব্রহ্মদেশে এখনও জাপানের বিমানবল গরিষ্ঠ রহিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এ অঞ্চল ত এত দিন পাশ্চাত্য রণবিশারদগণের "দুয়ো রাণীর দেশ" ছিল, কত দিনে এখানকার ভুলভ্রান্তি এবং অবহেলার বকেয়া উদ্ধার হইয়া জমার কোটায় আঁচড় পড়িবে বলা যায় না।

নৌবলে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারতমহাসাগরে জাপানের একাধিপত্য এখনও রহিয়াছে। পার্ল্ হার্বার ও সিঙ্গাপুরে জাপানের প্রচণ্ড আঘাতের ফল জাভা সমুদ্র ও সিংহলের দক্ষিণের যুদ্ধের পরিণতিতে আরও বিষম হইয়া উঠে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নিকটে প্রবাল সমুদ্রে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই (১২-৫-৪২); সুতরাং জাপানের নৌশক্তির প্রাধান্য উহার ফলে কতটা বদল হইবে তাহা বিচার করা সম্ভব নহে। জাপান এ পর্য্যন্ত নৌযুদ্ধ করিয়াছে প্রধানতঃ এরোপ্লেন এবং সাবমেরিণ দ্বারা এবং এই দুই অস্ত্রের ব্যবহারেই তাহার দক্ষতা ও শক্তির প্রচণ্ড পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুক্ত জাতীয় দলের এত দিন এই দুই বিষয়েই ক্ষমতার অভাব দেখা গিয়াছে। এই সকল অস্ত্রের ব্যবস্থা এক দিনে হয় না, সুতরাং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের নৌ শক্তি কত দিনে সমভাবে বলপরীক্ষার সম্মুখীন হইবে তাহা বলা কঠিন। এরোপ্লেনবাহী পোত জাপানের কতগুলি আছে তাহা সঠিক জানা নাই এবং যুক্ত জাতীয় দলের সে বিষয়ে যথেষ্ট অভাব এত দিন ছিল তাহা ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বলিয়াই দিয়াছেন।

মোটের উপর ইয়োরোপে এখন যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ ও ব্যবস্থার পালা চলিয়াছে। দুই পক্ষই এখন প্রধানতঃ পরস্পরের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ ও সরবরাহের ব্যাপারে বাধা দিতে ব্যস্ত। এই বাধা প্রদানে কে কতটা সফল হইয়াছে

উরাল অঞ্চলে ষ্টালিনস্ক্ শহর

তাহার বিচার সম্ভব হইবে যখন প্রকৃত যুদ্ধের ফলাফল দেখা যাইবে। আমেরিকাতে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে সন্দেহ নাই। তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা কতটা সফল হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। অন্য দিকে জার্ম্মানিতে ব্রিটিশ বোমাক্ষেপণের ফল কতটা হইয়াছে তাহাও জানা যায় নাই। সুতরাং পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফল সম্বন্ধে বিচার করা বৃথা।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে এখনও প্রাথমিক অবহেলা এবং নির্ব্বুদ্ধির কুফল ফলিতেছে।

* * * *

রুশ রণক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী শীতের পর হিমতুষার দ্রবণের সময়ও সুদীর্ঘ হইয়াছে। এখন উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ যুদ্ধব্যবস্থার সুসংস্করণের চেষ্টায় ব্যস্ত। বসন্তকালীন অভিযান এখন গ্রীষ্ম-অভিযানে পরিণত হইল। সময় এখন ক্রমেই সোভিয়েটের স্বপক্ষে যাইবে বলিয়া মনে হয়। উরাল ও বৈকাল অঞ্চলের যুদ্ধসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানাগুলি ক্রমেই পূর্ণগতিতে চলিতে আরম্ভ করিবে। শ্রমিক ও দক্ষ-কারুকরগণও এত দিনে সে সকল অঞ্চলে সুব্যবস্থার মধ্যে কার্য্যারম্ভ করিতে পারিয়াছে মনে হয়। উক্রাইন অঞ্চলে জার্ম্মান সেনাবাহিনীর প্রবেশের পর হইতেই ঐ সকল সোভিয়েট রাষ্ট্রের অতি দূরে অবস্থিত শিল্পকেন্দ্রগুলির প্রসার ও সুনিয়ন্ত্রণের দ্রুত ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। জার্ম্মান-অধিকৃত অঞ্চলগুলির কিছু পরিমাণ কলকারখানাও স্থানান্তরিত করিয়া ঐ সকল প্রদেশে স্থাপন করা হয়। এখন প্রায় আট মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সোভিয়েটের যুদ্ধসম্ভার উৎপাদনের ব্যবস্থা অনেক অগ্রসর হওয়া উচিত। অন্য দিকে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের

ম্যাগ্নিটগরস্ক্—রাশিয়ার বিখ্যাত লৌহশিল্প কেন্দ্র

সহিত সোভিয়েটের যেরূপ যুদ্ধসহায়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ীও এত দিনে বেশ কিছু যুদ্ধযন্ত্র, এরোপ্লেন ইত্যাদি সোভিয়েটের রণনায়কগণের হস্তগত হওয়া উচিত।

অন্য দিকে জার্ম্মানী এবং জার্ম্মান-অধিকৃত দেশগুলিতেও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পূর্ণতম উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় চলিতেছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ বোমাক্ষেপণ-অভিযান সুদূর প্রসারিত হইয়াছে এবং তাহাতে বিপুল শক্তি প্রয়োগও চলিয়াছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ, জার্ম্মানীর যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় নানা প্রকার বিঘ্ন ও বিভ্রাটের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মান লুফ্‌ট্‌ভাফার (এরোপ্লেনবাহিনী) এক প্রধান অংশকে দেশরক্ষায় ব্যস্ত রাখিয়া রুশবাহিনীর উপর চাপ কিছু হ্রাস করা। এই দুই উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে তাহা বুঝিবার কোনও সহজ উপায় নাই। তবে কিছুমাত্রায় যে তাহা হইয়াছে তাহা হিটলারের বক্তৃতায় বুঝা যায়। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে জার্ম্মান বিমানবহর পাল্টা জবাবে সেরূপ কোনও অভিযান ব্রিটেনের উপর চালায় নাই। ইহাতে মনে হয় যে জার্ম্মান রণনায়কগণ তাহাদের সমস্ত শক্তিই যতটা সম্ভব সোভিয়েট রণক্ষেত্রের জন্যই গচ্ছিত রাখিতে চাহে।

সোভিয়েট বাহিনীর এক প্রধান অংশ বিগত শীতকালে জার্ম্মান সেনাদলের উপর অক্লান্ত এবং অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণে দুই পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং সম্ভবতঃ জার্ম্মান সেনাদল আশ্রয়বিহীন হওয়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে জার্ম্মানী সোভিয়েট অপেক্ষা অধিক ক্ষতি সহিতে সক্ষম, সুতরাং আসন্ন অভিযানে জার্ম্মান সেনাবাহিনী যন্ত্রযুদ্ধাস্ত্র ও এরোপ্লেনের অনুপাতে প্রথম দিকে গরিষ্ঠ থাকিবে মনে হয়। যত দূর দেখা যাইতেছে নূতন অভিযান দক্ষিণ অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বিরুদ্ধেই চালিত হইবে। এখানকার জার্ম্মান দল অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে এবং এই মুখের অভিযান সফল হইলে ককেশসের দ্বারপথ জার্ম্মান-শক্তির আয়ত্তে আসিতে পারে। তবে ককেশসের দ্বারপথ অধিকার এবং দুর্গম গিরিমালাবেষ্টিত ককেশস অঞ্চল জয় এক কথা নহে এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কোর যুদ্ধকৌশলও নগণ্য নহে। যদি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কথামত যুদ্ধসম্ভার সোভিয়েট রণাঙ্গনে পৌছাইয়া থাকে, তবে জার্ম্মান সেনাবাহিনীর সম্মুখে অতি প্রচণ্ড সংগ্রাম রহিয়াছে। সম্প্রতি ক্রাইমিয়ায় যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা ঐ মূল আক্রমণের মুখবন্ধ মাত্র।

* * *

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে চালমাৎ অবস্থা এখনও চলিয়াছে। আর দেড় মাস পরে এই মরুময় প্রদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রকোপে থামিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। সেই জন্য এখন দুই পক্ষই বলসঞ্চয়ে ব্যস্ত। অক্ষদলের রণসম্ভার সাগরপথে যাইতে বাধ্য এবং মাল্টায় স্থিত ব্রিটিশ নৌবহর সেই পথের প্রধান অন্তরায়। সেই জন্যই এই দ্বীপের উপর জার্ম্মান ও ইটালীর বিমানবহর অবিশ্রাম প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। মনে হয় এই আক্রমণের অন্তরালে যুদ্ধাস্ত্র ও লোকলস্করের চলাচলও চলিয়াছে। ব্রিটিশ সংবাদে প্রকাশ যে দুই জন নূতন জার্ম্মান রণনেতা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে। সুতরাং এখানেও নূতন যুদ্ধের আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে সেটা কোন্ পক্ষ হইতে আরম্ভ হইবে তাহা নির্ভর করিবে কাহার বলসঞ্চয় প্রথমে অধিক অনুপাতে হয়।

আফ্রিকা এখন ক্রমে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের বেষ্টনীর মধ্যে আসিতেছে। ভারতমহাসাগরে জাপানের নৌবলের নূতন শক্তিকেন্দ্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত জাতীয় দল তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থার জন্য মাদাগাস্কারে নূতন নৌকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছে। ডিগো সুয়ারেজ নৌ-ঘাঁটির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সাময়িক পত্রে এবং বেতার-সংবাদে অজস্র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলা যথেষ্ট যে ওখানে জাপানের নৌবহর যদি অভিযান করে তবে তাহাকে সকল আশ্রয়, সকল সরবরাহকেন্দ্র ছাড়িয়া প্রায় তিন হাজার মাইল সমুদ্রপথ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। অন্য দিকে যদি সেরূপ চেষ্টা না-হয় তবে আরব

সমুদ্র ও পারস্যোপসাগরের পথ যুক্ত জাতীয় দলের আয়ত্তে থাকিবে, এবং এই পথে ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌ- ও বিমান-শক্তি নির্ব্বিবাদে শক্তি সঞ্চয় ও প্রসারণ করিতে পারিবে। জাপানী নৌশক্তি এই দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে সিংহলের উপর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হইবে।

ভারতবর্ষের উপর বোমাক্ষেপণ আরম্ভ হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত শক্তিসঞ্চয়ে বাধাদান এবং ভারতের সহিত বহির্জগতের সমুদ্রপথের যোগ ছিন্ন করাই এই বোমাক্ষেপণের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়। সামরিক আক্রমণের সূত্রপাতরূপে যে বিমান পথে আক্রমণ হয় এখনও এদেশে তাহার সূচনা হয় নাই। দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য নূতন ব্যবস্থার যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুশৃঙ্খলা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ণেল জনসন যে বেতার-বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে, এবং সম্প্রতি ডক্টর গ্রেডি প্রমুখ কয়েক জন মার্কিন শিল্পবিশারদের আগমনে এবং দেশব্যাপী শিল্পকেন্দ্র পর্য্যবেক্ষণে, মনে হয় অষ্ট্রেলিয়ার মত ভারতেও যুক্ত জাতীয় দলের আক্রমণ-কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। তবে অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে প্রভেদ অনেক। যে সকল সামরিক ব্যবস্থা অষ্ট্রেলিয়ায় হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটিই ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় দপ্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া এখন অনেক বিষয়ে—বিশেষতঃ সামরিক যন্ত্রশিল্পে—বহু অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সে স্বাধীনতা থাকিলে বা ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় পরিচালকগণের ভবিষ্যৎজ্ঞান কিছুমাত্র থাকিলে এই মহাযুদ্ধের মালয় ও ব্রহ্মদেশের অধ্যায়গুলি অন্যভাবে লিখিত হইত। এদেশের কর্ণধারগণের সম্পর্কে কিছু বলা বৃথা। তাঁহারা এখনও বিংশ শতাব্দীতে পদক্ষেপ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ এখন তিন অংশে বিভক্ত। পশ্চিমে ব্রিটিশ দল জেনারেল আলেকজাণ্ডারের অধীনে এখন ভারতসীমান্তের দিকে ক্রমাগত হটিয়া আসিতেছে। এই পশ্চাদপসরণের সঙ্গে বিপক্ষের আক্রমণ ঘনসংশ্লিষ্ট নহে। সুতরাং ইহাকে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সামরিক কার্য্যপ্রকরণের অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। মণিপুর-সীমান্তের দিকে এই সৈন্যচালনার গতি। অবশ্য ব্রিটিশ সৈন্যদল যতই ভারতের নিকটে আসিবে ততই তাহাদের রসদ, অস্ত্র এবং লোকলস্কর যোগাইবার ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত। এত দিন ইহারা সে সকল ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত ছিল বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল রেঙ্গুনের জলপথ, যদিও ভারত ও ব্রহ্মদেশের স্থলসংযোগ বহু শত মাইল ব্যাপী।

মধ্যব্রহ্ম অঞ্চলে, অর্থাৎ ইরাবতীর কূলে, বিভিন্ন চীনা সৈন্যদল এখন প্রবল যুদ্ধ করিয়া মান্দালয় হইতে লাসিয়ো পর্য্যন্ত বিস্তৃত জাপানী বেড়াজাল ছিন্ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। ইহাদের যুদ্ধসম্ভার যোগাইবার এবং বিমানপথে সহায়তা করিবার কি ব্যবস্থা এখনও আছে তাহা জানা যায় নাই। তবে চীনা সৈন্য অতি দুরূহ সামরিক অবস্থার মধ্যে অদম্য তেজে লড়িতে অভ্যস্ত, সুতরাং এই অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে জাপানের করায়ত্ত এখনও হয় নাই বলা যায়। তবে এখানকার চীনা সৈন্যদলের অবস্থা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় তাহারা হটে নাই, বরঞ্চ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহা তাহাদের শৌর্য্য ও দৃঢ়তার গৌরবময় পরিচয়।

ব্রহ্ম-চীন সীমান্তে এখন কয়েকটি বিষম খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছে। জাপানী রণবিশারদগণ এই দিকে দ্রুতগামী যুদ্ধশকটবাহিত সেনাদল চালাইয়া ব্রহ্মদেশে অবস্থিত চীনা সৈন্যদলের সহিত তাহাদের মূলশক্তিকেন্দ্রের যোগসূত্র ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। উপরন্তু এই বাহিনী স্বাধীন চীনের পশ্চাদ্দ্বার ভাঙিয়া নূতন আক্রমণের পথ পরিষ্কার করিবার সুযোগও পায়। এখন এই বাহিনী ক্রমেই চীন সৈন্যদল দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু জাপানী সেনাও ক্রমাগত নূতন সৈন্যদল ও যুদ্ধাস্ত্রের সরবরাহে সবল হইতেছে। এইখানে যে সংঘর্ষ চলিতেছে তাহার ফলের উপর ভারত ও চীনের যোগাযোগের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ এখন স্বাধীন চীনের পশ্চিম-অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর অবস্থা বিষম সমস্যাপূর্ণ এবং এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে চীনা-সেনানায়কগণকেই। অন্য কাহারও বিশেষ কিছু সাহায্য সম্প্রতি তাঁহারা পাইবেন কিনা সন্দেহ।

সুদূর প্রাচ্যে করেগিডর দুর্গ পাঁচ মাস ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাপানীদিগের হস্তগত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে স্বল্পাস্ত্র চীন ও যুদ্ধে-অনভ্যস্ত আমেরিকার সৈন্যদল যেরূপ পুরুষকার দেখাইয়াছে তাহাতে জাপানের অজেয়তার দাবী বা পাশ্চাত্য সমরবিশারদগণের "সামরিক" ও "অসামরিক" জাতি নির্দ্দেশের সার্থকতার মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে।

* * * *

এখন প্রশ্ন জাপানের অভিযানের গতি কোন্ দিকে যাইবে? জাপান এখন অতিবিস্তৃত ভূমি ও সমুদ্রসমষ্টির

উপর আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছে। এই অধিকৃত অঞ্চলগুলি মহামূল্য বাণিজ্য ও সামরিক পণ্যোৎপাদনে সমর্থ, এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক সুবিধাও অনেক আছে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় সে সকল অঞ্চল সুদৃঢ়ভাবে দুর্গমালায় এবং রক্ষণ-কেন্দ্রে পূর্ণ করিয়া জাপান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় এবং পশ্চিমে ভারতবর্ষে যুক্ত জাতীয় দল আক্রমণ-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছে। আর কিছুদিন পরেই ভারতের সীমান্ত বর্ষার প্লাবনে আচ্ছন্ন হইবে। তাহার পর প্রায় চার মাস কোনও বিরাট্ অভিযান উত্তর-ভারতের সীমান্ত পথে চলা দুঃসাধ্য, যদিও নৌবলের সাহায্যে দক্ষিণ-ভারতে তাহা চলিতে পারে। এদিকে ভারত-সংরক্ষণের ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এই দিকে জাপানের পক্ষে অভিযান চালনের সুযোগ আর বেশী দিন থাকিবে না। অন্য দিকে চীন-ভারত সংযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না করিতে পারিলে যুদ্ধে অভিজ্ঞ চীন সৈন্য যথাযথ অস্ত্রসজ্জিত হইলে জাপানের সাম্রাজ্য-চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিন শক্তির সন্নিবেশও জাপানের পক্ষে বিপজ্জনক।

এই তিন অঞ্চলের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণে জাপানের নৌশক্তির প্রয়োগ সকল অপেক্ষা ফলপ্রদ হইতে পারে, যদি তাহা যুক্ত জাতীয় দলের নৌবলকে পরাস্ত করিতে পারে। এবং সে কার্য্যে সফল হইলে অষ্ট্রেলিয়া-জয় চীন-জয় বা ভারত-জয় অপেক্ষা সহজসাধ্য হইতে পারে। প্রবাল সমুদ্রের নৌযুদ্ধের কারণ ইহাই। তাহার ফল কি হইবে তাহা অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাইবে।

উদাসিনী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বেণীবন্ধচ্যুতকেশ মৃদু অগোছালো !
বিস্রস্ত বসন-ভাঁজে তনু আবরিয়া
ভ্রূকুটি-ভাষণহীন দুটি আঁখি দিয়া
চেয়ে থাকে—তন্বী বালা অঙ্গ যার কালো,
নাহি কোনো লীলাভঙ্গী তবু লাগে ভালো।
শুচি-স্নিগ্ধ অঙ্গ ঘিরে দীপ্তি-সমাবেশ
মরি, মরি !—হাসিমাখা মুখখানি বেশ ;
বিত্তহীন কোথা পেল শুধু এত আলো ?

গতি মোর থেমে যায় চলিবার কালে,
বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি শুধু অনিবার,
রূপহীন অঙ্গ-শোভা ধরে না তাহার,
মরীচিকা-মায়া নহে মরু-অন্তরালে ;
নিকটে ডাকিয়া আনি নাহি যারে চিনি,
কাছে আসে, কথা কয় তবু উদাসিনী।

মাদাগাস্কারের উত্তরতম অঞ্চল। এখানেই বোধ হয় বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হয়

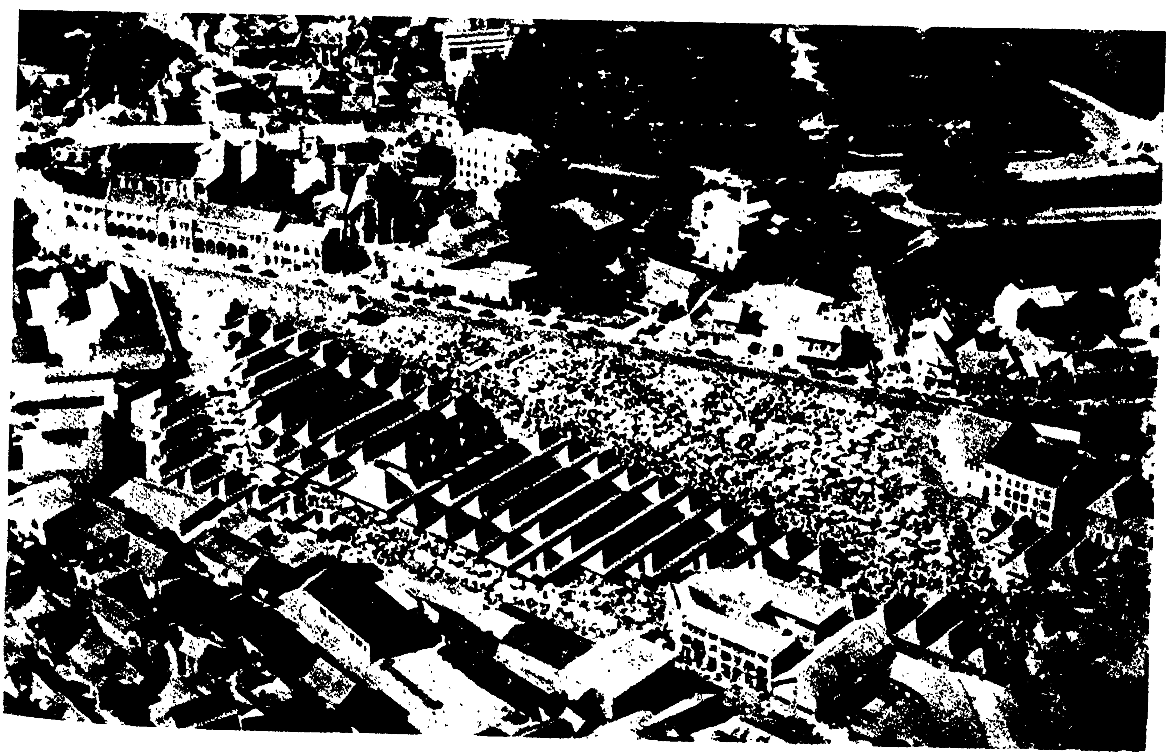

মাদাগাস্কার। রাজধানী টানানারিভের দৃশ্য

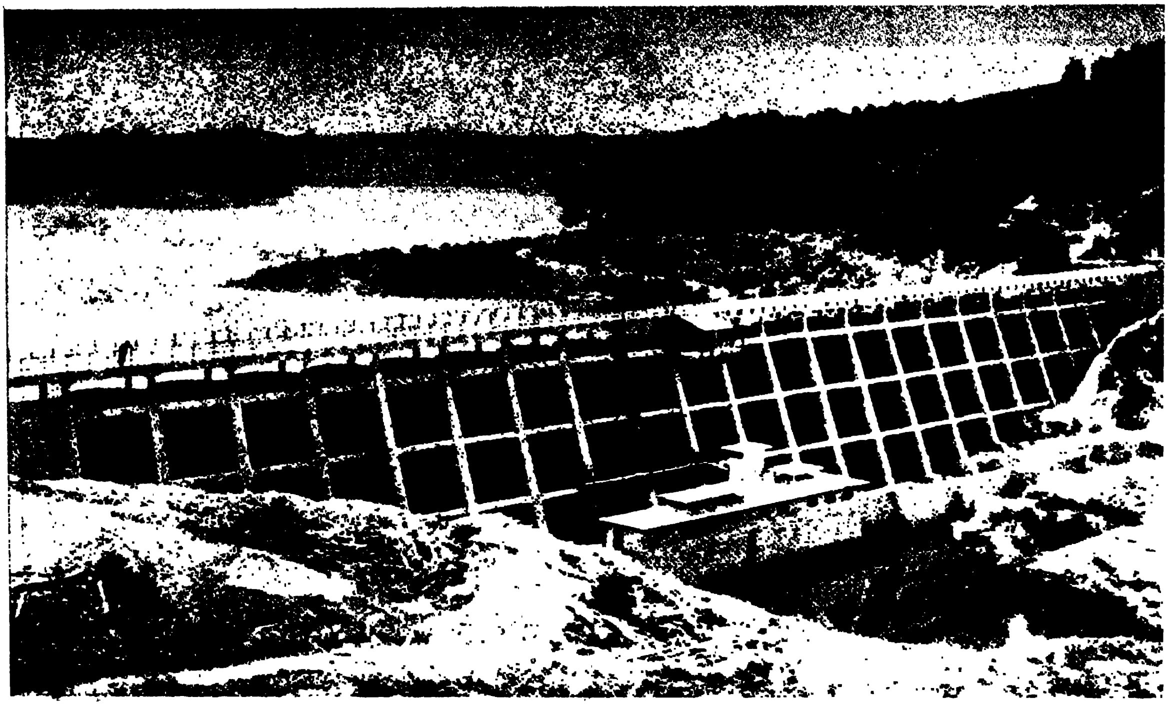

মাদাগাস্কার। ইকোপা মান্টাসোয়ার বাঁধ ও হ্রদ

মাদাগাস্কার। ফার্দোনি উপত্যকায় কফির বাগান

মাদাগাস্কার। ফোর্ট দফ্যা। এখানে ১৬৪৩ খৃঃ প্রথমে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়

মাদাগাস্কার। ইটাসি হ্রদের নিকটস্থ আগ্নেয়গিরির মুখ

ইরাবতীর চর হইতে ইনাংজিয়াং শহরের দৃশ্য

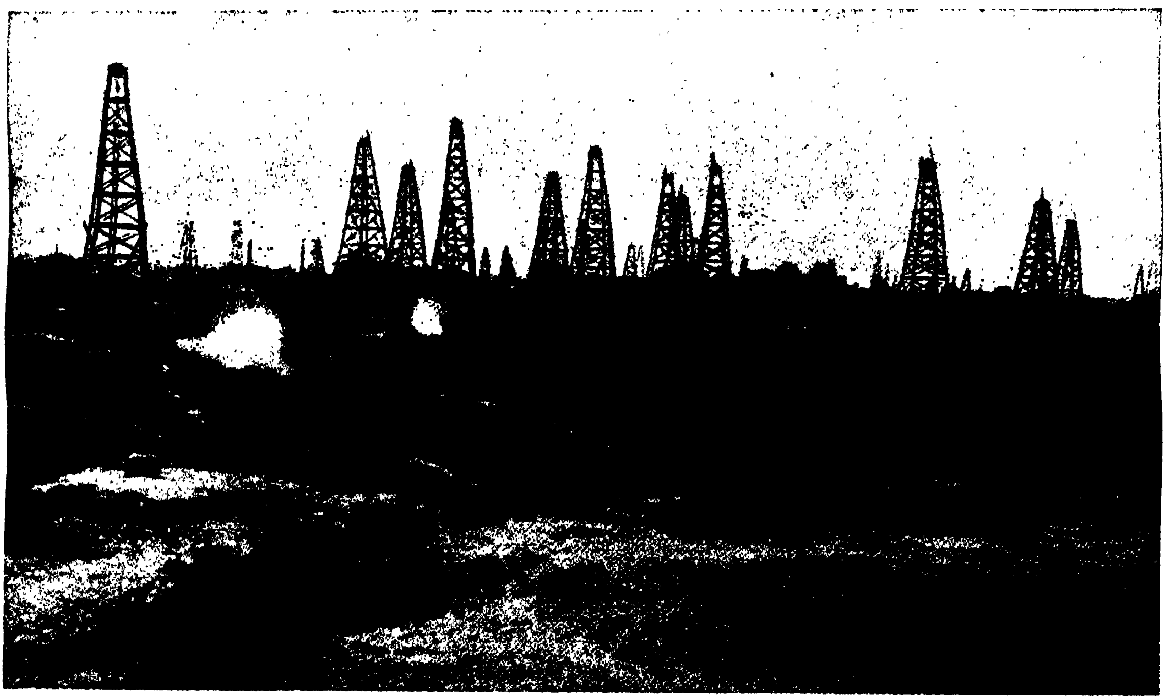

ইনাংজিয়াং তৈলখনি অঞ্চলের দৃশ্য। ১৯১০

দেশ-বিদেশের কথা

ডাঃ অমরনাথ বন্দোপাধ্যায়

ডাঃ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীধামে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ও নানা জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

ডাঃ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ অমরনাথের পিতা ৺শিবদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় যৌবনে পদার্পণ করিয়াই কাশীধামে গমন করেন। দীর্ঘকাল পশ্চিমের নানা অঞ্চলে কর্ম্ম করিয়া শেষে কাশীবাসী হন।

ডাঃ অমরনাথ কাশীধামে জয়নারায়ণ হাই স্কুল ও কুইন্স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম্-এস্ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া কাশীতেই স্বাধীন চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রকালে ১৯০৫ সালে ঔষধ প্রকরণ বিদ্যা শিখিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ও ১৯০৮ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া অমরনাথ ঔষধ প্রকরণ বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ অভাবে পুনরায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি জনসাধারণের, বিশেষ দরিদ্রের অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল।

ডাঃ অমরনাথ রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি স্থানীয় শহর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি, জগদম্বা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সম্পাদক, কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির সভ্যরূপে কার্য্য করেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কাশীধামের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অমরনাথ গত ১লা এপ্রিল সাতষট্টি বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত ভারতবাসী

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ও মালয় আক্রান্ত হইলে প্রায় দুই লক্ষ নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থী ভারতবাসী চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া স্ব স্ব প্রদেশে গমন করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশবাসীর সংখ্যা অধিকতর ছিল। সরকার প্রায় প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর যাতায়াতের ভাড়া বহন করিয়াছেন এবং খোরপোষের বাবদে প্রত্যেককে একটাকা হারে প্রদান করিয়াছেন। চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক দল আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখ ও অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। ৺নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা রাণীবালা দাশগুপ্তা তাঁহার স্বামীর শ্রাদ্ধদিনে পাঁচ সহস্রের অধিক আশ্রয়প্রার্থীকে একবেলা তৃপ্তির সহিত আহার করাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে চট্টগ্রামে আগত ভারতবাসী

পুস্তক পরিচয়

লীলা-রহস্য—শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্তশর্ম্মা। প্রকাশক—গ্রন্থকার। পোঃ বহরমপুর, জিলা মুর্শিদাবাদ। পৃ. ২১১। মূল্য ৸৶০।

অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা দুই রকমে হইতে পারে। এক, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে তুলনাদ্বারা সাম্য ও বৈষম্য বুঝিয়া তত্ত্বের আলোচনা করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সাম্য বৈষম্যের উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তি-বহির্ভূত ও বিচার-বিহীন, উচ্ছ্বাস-পূর্ণ, আবেগময় কবি-ভাষায়ও ঐ সব তত্ত্ব প্রকাশ করা চলে। ইদানীং এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত যেসব বই আমাদের হাতে পড়িয়াছে তাহার বেশীর ভাগই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কোলাহলময় স্থানে—পার্কে ও স্কোয়ারে—আবেগপূর্ণ, অঙ্গ-ভঙ্গিদ্বারা সমুচ্ছ্বসিত বক্তৃতার মত এগুলি পড়িতে এবং শুনিতে একেবারে মন্দ লাগে না। কিন্তু ইহার আনন্দ কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া কানের ভিতর দিয়াই বাহির হইয়া যায়—মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

এই কথাটাই বাঙ্গালী আধ্যাত্মিকেরা অনেক সময় বুঝিতে চাহেন না। তাহার ফলে, শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈতাদ্বৈত, কৃষ্ণ-খ্রীষ্ট, কর্ম্ম-ব্রহ্ম—সব মিলাইয়া একাকার করিয়া এমন এক মহাপ্রমাদ তাঁহারা সৃষ্টি করেন, যাহা বিচারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হজম করা কঠিন হয়। বেদান্তের ব্রহ্ম আর তন্ত্রের আদ্যাশক্তি নিশ্চয়ই ভিন্ন কল্পনা। মুসলমান ও খ্রীষ্টানের পিতৃস্থানীয় ঈশ্বর আর গোকুলের কানাই এক ধরণের ধারণা নয়। একটা সাধারণ সাম্য এই সকলের মধ্যেও আবিষ্কার করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রভেদ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইলেই সত্যকার সাম্য আবিষ্কৃত হয় না। এমন কি, বৃন্দাবনের বেণুবাদনরত কৃষ্ণ আর সুদর্শনধারী পার্থ-সারথির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়াও হয়ত কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার পক্ষে বাধা। তাল ও তমাল উভয়ই বৃক্ষ; কিন্তু যে তালও চিনে না, তমালও চিনে না, এবং উভয়ের পার্থক্যও বুঝে না, সে বৃক্ষও চিনে না।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের আধ্যাত্মিক লেখকেরা ব্রহ্মতত্ত্ব ও শক্তি-তত্ত্ব, বেদান্ত ও তন্ত্র, এমন ভাবে মিশাইয়া ফেলেন যে, তাহাতে বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া যায়।

আরও একটা দোষ এই ধরণের লেখকদের অনেক সময় দেখা যায়।

তাঁহারা উপকথা ও শাস্ত্রের একটা অসহনীয় সংমিশ্রণ সৃষ্টি করিয়া দার্শনিক আলোচনাকে কথকতার স্তরে অবনমিত করিয়া ফেলেন। কথাচ্ছলে বালকদিগকে নীতি শিখাইবার জন্য বিষ্ণু শর্ম্মা এবং ঈসপ্‌ যে ইতরপ্রাণীদের কথোপকথন কল্পনা করিয়াছেন, তাহা দর্শনশাস্ত্রে ঠিক শোভা পায় কি ?

আলোচ্য গ্রন্থকারও এই সব দোষ হইতে একেবারে মুক্ত নন। তার ফলে, তিনি কখনও কখনও এমন সব উক্তি করিয়াছেন যাহা বিচার-সহ নয়। যেমন, ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্বৈতবাদের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের ক্রিয়া আছে এবং ফলভোগও আছে। কথাটা কি ঠিক ? অন্যত্র (১২৭ পৃষ্ঠায়) দেখিতে পাই, এক বাঘ আর এক বাঘের ছেলেকে পুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখাইতেছে এবং আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছে। ইহা নিরেট বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প, তার বেশী কিছু নয়। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার উপমা হিসাবে খুব ভাল নয়।

গ্রন্থকার পণ্ডিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা এবং লিখনভঙ্গীও মোটের উপর প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তিনি যদি কথকতার স্তরে না নামিতেন তাহা হইলে হয়ত বইখানা আরও ভাল হইত। কথকতার উপাদান হিসাবে বইখানা খুবই ভাল; কিন্তু যে ভাবেই ইহার বিচার হউক, তাহাই কি তিনি চান ?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রজাপতয়ে—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

বহু গল্প এবং উপন্যাসের স্রষ্টা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যে সুপরিচিত। প্রজাপতয়ে তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। লঘুকৌতুক রস পরিবেশনের প্রচেষ্টা গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়; জীবন-অভিজ্ঞতার ছাপও কতকগুলি গল্পকে সরস ও উপভোগ্য করিয়াছে। কোন কোন গল্পের ঘটনা-বিন্যাসে কিছু অসঙ্গতি দেখা গেলেও সরস বর্ণনভঙ্গীর দ্বারা লেখক সে ত্রুটি শুধরাইয়া লইয়াছেন। কোন কোন গল্পে (যেমন মাটি, পরাভূত, চূড়ান্ত) করুণ রস জমিয়াছে ভাল। প্রজাপতয়ে গল্পটির মধ্যে সহজ সাবলীল ঘটনার সুষ্ঠু পরিণতি আছে। এই সংগ্রহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প—অবস্থত। প্রভুত্ব-বিলাসী দাস-জীবনের যে চিত্র এই গল্পে লেখক আঁকিয়াছেন তাহাতে মুন্সিয়ানা আছে, কল্পনার প্রসার ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতাও যথেষ্ট। মোটের উপর প্রজাপতয়ের গল্পসমষ্টি পাঠকের চিত্ত-তুষ্টির সহায়তা করিবে, এবং এইখানেই লেখকের লেখনীধারণ সার্থক।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূরবী—এস, এ, জাফর। প্রকাশক—সালাহ্‌উদ্দিন আজাদ। পি. ২ সুহ্‌রাওয়ার্দী এভিনিউ. পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

বইখানি উপন্যাস, ২১৫ পাতায় সম্পূর্ণ। কাঁচা হাতের লেখা, চরিত্র এবং ঘটনাবলি কেমন যেন খাপছাড়াগোছের। প্রায় অর্ধেকটা গিয়া প্লটের একটা বাঁধুনি পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে আর একটা জিনিসের সন্ধান এই পাওয়া যায় যে, লেখকের লোমহর্ষক আখ্যানের দিকে ঝোঁক এবং খানিকটা ক্ষমতাও আছে। এই ধরণের নভেলে লেখক পরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। তবে এখন থেকেই চরিত্র এবং ঘটনার সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

লেখক বিবাহকে legalised prostitution যে প্রসঙ্গে এবং যে মুখ দিয়া বলাইয়াছেন তাহাতে সুরুচির পরিচয় দেন নাই।

লক্ষ্য-ভেদ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। কমলা বুক ডিপো। মূল্য দেড় টাকা

একটি উদ্যমশীল যুবা লেখাপড়া না করিয়া জাহাজে ক্লীনার হইয়া বিলাত গেল এবং সেখানে নানা বাধাবিপত্তির পর একটা উন্নতির পথে দাঁড়াইল; আখ্যায়িকার সারাংশ মোটামুটি এই। লেখার মধ্যে একেবারেই বাঁধুনি নাই;—কখনও মনে হয় জীবনী পড়িতেছি, কখনও মনে হয় নভেল, আবার কখনও ধোঁকা লাগে—লেখক বোধ হয় নভেলের আবরণে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে ভাষা এবং আলোচনায় খানিকটা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আখ্যানটি রচিত না হওয়ায় সবই যেন এলাইয়া গেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

থেরীগাথা। ভিক্ষু শীলভদ্র। প্রকাশক—শ্রীসুধীরকুমার হাজরা, ২৯ একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

থেরীগাথা বৌদ্ধসাহিত্যের অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষু শীলভদ্র ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অভিজ্ঞতা, সাধনা ও সিদ্ধির কথা ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে—তাঁহাদের সারা জীবনের চেষ্টার সুফল। বিস্তর মুদ্রাকরপ্রমাদসত্ত্বেও বর্তমান যুগের প্রকাশপারিপাট্যে ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদ উজ্জ্বল।

বহুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় থেরীগাথার অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা ঢাকা উয়ারি হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে অনুবাদ ছিল পদ্যে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গীতির সামান্য একটু উপক্রমণিকা, মূল পালি ও মোটামুটি পালি টীকার অনুগামী বাংলা টীকাও ছিল। বর্তমান অনুবাদ দুই-এক স্থলে সেই অনুবাদের চেয়ে ভাল হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। প্রথম সর্গের পঞ্চম গীতিকার 'অঞ্ঞতরা তিস্‌সা'র গাথায় শেষ-চরণটি 'নিরয়ম্হি সম্পাপিতা' বাদ গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। উৎপলবর্ণার (একাদশ সর্গে) জীবনকথা বিজয়বাবুর অনুবাদে আরও ভাল করিয়া, সমস্তার কারণ আরও স্পষ্ট করিয়া, দেওয়া হইয়াছে। ১২৩ পৃঃ "ত্রিবিদ্যালব্ধ হইলেন"—বাংলা কি?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সুত্তনিপাত। ভিক্ষু শীলভদ্র অনুবাদিত। মহাবোধি সোসাইটী, ৪-এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত কিছু কিছু বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মনীষিকর্তৃক ইতঃপূর্বে অনূদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশাল বৌদ্ধসাহিত্যের বেশীর ভাগই এখন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের নিকট অপরিচিত। বস্তুতঃ, বৌদ্ধসাহিত্যের আকরস্বরূপ ত্রিপিটকের অতি অল্প অংশই এযাবৎ বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙালী সমাজে পরিচয় লাভ করিয়াছে। সেই জন্য ত্রিপিটকের অন্তর্গত এবং বৌদ্ধসমাজে বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত সুত্তনিপাতের এই প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া মহাবোধি সোসাইটী বাঙালী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনুবাদক ভিক্ষু মহাশয় মাঝে মাঝে পাদটীকায় কিছু কিছু অপরিচিত ও পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া এই আধ্যাত্মিকতত্ত্ববহুল গ্রন্থের রহস্যবোধের সহায়তা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসু পাঠক বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন—সাধারণ পাঠকও ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞান ও তৃপ্তিলাভ করিবেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধতীর্থের সাতখানি সুন্দর চিত্র সুন্দর কাগজে সুমুদ্রিত এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তুলিয়াছে। চন্দননগর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত দাশরথি দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থমুদ্রণের সমগ্র ব্যয়-ভার বহন করিয়া যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, বাংলার সম্পন্ন গৃহস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তাহার অনুসরণ করিলে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গৌরবময় হইবে। আশা করি, বাংলার বদান্য মহাপুরুষদের সহায়তায় অনুবাদক-মহাশয় ও মহাবোধি সোসাইটী অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থের এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বাঙালীর চিত্তকে পরিপুষ্ট করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

চতুর্দ্দশী—'বনফুল'-প্রণীত। ডি, এম্ লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আটাশটি চতুর্দ্দশ পদী কবিতার সমষ্টি; প্রথম চৌদ্দটি লইয়া 'কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী', পরবর্ত্তী চৌদ্দটি লইয়া 'শুক্লা চতুর্দ্দশী'। কবিতাগুলিতে দৃঢ়-সংযত কমনীয় লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরাতন চতুর্দ্দশাক্ষরী পংক্তি অপেক্ষা অষ্টাদশাক্ষরী পংক্তি সনেটের গাঢ়ত্ববিধানের পক্ষে বেশী অনুকূল। কবি শেষোক্ত রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমাংশে—'কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী'তে বাজিয়াছে বিষাদের সুর। প্রেম পুরাতন হইয়াছে;

"নিতান্ত অভ্যাসবশে তরীখানি বাঁধা আছে তীরে,
নিয়ম-নিগড়পাশে বহিতেছে নোঙরের ভার।"

কিন্তু 'শুক্লা চতুর্দ্দশী'তে স্নিগ্ধ আলোক দেখা দিয়াছে। বাসনার আবেগ শান্ত; মানবীর মুখে আজ ফুটিয়াছে দেবীর আভা।

"মহান্ আলোকতীর্থে চমৎকৃত দাঁড়াইয়া আছি,
বিমোহিত আত্মহারা তোমার আত্মার কাছাকাছি।"

কবি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। বর্ত্তমান কাব্যে তাঁহার পরিণত কবি-শক্তির পরিচয় আছে।

গীতা-স্মৃতি—শ্রীমতিলাল দাশ। ডি, এম্ লাইব্রেরী, কলিকাতা। প্রকাশক—শিব সাহিত্য কুটীর, ২৬।৮এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

'গীতা' গ্রন্থকারের পরলোকগতা কন্যা। তাহারই স্মৃতি লইয়া এই ক্ষুদ্র শোককাব্য। শুধু শোকোচ্ছ্বাস নহে একটি কাতর জিজ্ঞাসার ভাব কবিতাগুলির মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘটনার আঘাত হইতে যতটুকু ব্যবধান শিল্প-সৃষ্টির জন্য আবশ্যক, কবির মন ততটুকু ব্যবধানে যাইবার অবকাশ পায় নাই। ভূমিকা এবং আরম্ভের ও শেষের নিবন্ধ দুইটি সুন্দর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজকের আমেরিকা—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৫৩ আপার সার্কুলার রোড, এম ৬, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস বিখ্যাত ভূ-পর্য্যটক। তিনি বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়া যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, নানা পুস্তকে তিনি তাহা পাঠককে উপহার দিতেছেন। আলোচ্য বইখানিতে তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের আংশিক বর্ণনা আছে। আমেরিকার শহর-পল্লী নর-নারী, বিশ্ব মেলা, দীন দুঃখী প্রভৃতির বর্ণনা ও পরিচয় নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দিয়াছেন। এজন্য ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বইখানিতে কয়েকখানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পুরাতন রোগের জলচিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন। ১১৪।২ বি, হাজরা-রোড, কালীঘাট। পৃঃ ২১৫। মূল্য—পাঁচসিকা।

পুস্তকখানিতে লেখক পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, রক্তসঞ্চালন, স্নায়ু, চক্ষু, দন্ত ও জননেন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিভিন্ন পুরাতন রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভি-

মত সহ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা জলচিকিৎসায় বিশ্বাসী নহেন তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে অন্ততঃ রোগীর পথ্যাদি ও আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং : শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির বিনয়বিশারদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত এবং রাজবিহার, রাজানগর পোঃ রাজাভুবন (চট্টগ্রাম) হইতে প্রকাশিত। ২৬৬+১।৶০ পৃষ্ঠা . মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থখানিতে 'মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে'র মূল পালি ও সরল অনুবাদ আছে। অনুবাদ পালি টীকানুযায়ী করা হইয়াছে, তবে অনুবাদে প্রাঞ্জলতা অপেক্ষা আক্ষরিকতাই সমধিক। একশত পৃষ্ঠা ব্যাপী 'পরিশিষ্টে' মূলস্থ কঠিন শব্দ ও জটিল অংশসমূহের বিশদ টিপ্পনী, বিষয়-সূচী, শব্দ-সূচী, ব্যক্তিনাম-সূচী এবং স্থাননাম-সূচী আছে। এইভাবে পালি ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-ভাষার সম্পদবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ত্রিপিটকের হিন্দি অনুবাদ অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুত্রপিটকের উপাধি এবং বি, এ, অনার্স পরীক্ষার পাঠ্য। সুতরাং ছাত্রগণের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষেও বইখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, কারণ অনুবাদের সাহায্যে পাঠকগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পালিতে পড়িতে পারিবেন।

'মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তং' গ্রন্থখানি সুত্রপিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ এবং 'দীর্ঘনিকায়'স্থ মহাবর্গের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধের অন্তিমজীবনের দেড় বৎসরের ঘটনা এবং পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহ সংকার ও দেহাবশেষের সুব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভিক্ষুদের প্রতি ভগবান্ বুদ্ধের অনুশাসন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের গুণাবলী, সংসৃতির হেতু ও উপশমের উপায়, স্ত্রীজাতির প্রতি ভিক্ষুদের ব্যবহার-বিধি, ধ্যানের বিভিন্ন ভূমি ও নির্ব্বাণের স্বরূপ প্রভৃতি বহুবিধ বৌদ্ধ তত্ত্বে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। পণ্ডিত ও প্রবীণ অনুবাদক গ্রন্থ-পরিচয়ে বৌদ্ধ নির্ব্বাণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ব্রহ্মনির্ব্বাণ হইতে "অন্য কিছু" বলিলেও 'পরিশিষ্টে' বৌদ্ধ নির্ব্বাণের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ব্রহ্মনির্ব্বাণের বর্ণনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীম-কথা। প্রথম খণ্ড। স্বামী জগন্নাথানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। পৌষ, ১৩৪৮।

কথামৃতের অমর লেখক "শ্রীম", মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মাষ্টার মহাশয় নামেই সুপরিচিত; পরমহংসদেবের অপূর্ব কথামৃত প্রচার করিয়া তিনি জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অন্যকে স্তব বা প্রশংসা করার একটি পথ হইল অন্যের মতে চলা, অন্যের অনুসরণ করা। জার্মাণ দার্শনিক ফিকটে তরুণ বয়সে প্রবীণ দার্শনিক কাণ্টের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠিক এই ভাবেই—কাণ্টের পদ্ধতি অনুসারে স্বরচিত পুস্তক লইয়া। স্বামী জগন্নাথানন্দ ঠিক সেই পথ ধরিয়া শ্রীম-কথা রচনা করিয়াছেন। তিনি ডায়েরিতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়ের নিজস্ব মন্তব্য ও কথার ভাণ্ডার যথেষ্ট থাকিলেও অধিকাংশ সময় তিনি পরমহংসদেবের কথা ও উপাখ্যানই বলিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে কথামৃতের পরিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে।

পুস্তকের প্রথম দিকে "শ্রীম-জীবনকথা" লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে; ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি পরবর্তী তিন বৎসরের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রথিত হইয়া সত্বরেই দেখা দিবে।

ইহার সমগ্র আয় বেলুড় মঠে নিত্যসেবায় ব্যয়িত হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বঙ্গীয় শব্দকোষ। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কতৃক শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল আলাদা।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ বাংলা অভিধানখানি কাগজের মহার্ঘতা ও দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ৮৫তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ "লাট' এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭০৪।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীগুলিতে সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ লাইব্রেরীগুলিতে এবং পারিবারিক লাইব্রেরীগুলিতে ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

"রবীন্দ্র-রচনাবলী" এবং বিশ্বভারতীর অন্যান্য গ্রন্থ—যুদ্ধের জন্য কাগজ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং ছাপাখানায় কাজের জন্য আবশ্যক অন্যান্য জিনিসও ঐরূপ হওয়ায় পুস্তক-প্রকাশ দুঃসাধ্য হয়েছে। এই অবস্থা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীর পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ নিয়মিতরূপে নিজের কাজ ক'রে চলেছেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী-র দশম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর কাগজ ও ছাপা আগেকার খণ্ডগুলির মতই উৎকৃষ্ট আছে। এই খণ্ডে ছবি দুটি আছে;—(১) আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ, (২) 'খেয়া'র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় মহর্ষির যে শিলাসন আছে, তাতে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথকে এই ছবিতে দেখতে পাই। এটি তপঃশীর্ণ আশ্রমগুরু বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের ছবি। যাঁরা ১৩৪৬ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর "সংসারী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ পড়েছেন, তাঁরা জানেন কবি সেকালে মধ্যে মধ্যে কিরূপ অল্প আহার ও উপবাস করতেন। তার উপর ছিল কঠোর পরিশ্রম, অর্থাভাবের উদ্বেগ এবং অনেক স্বদেশবাসীর ও গবর্মেণ্টের বিরোধিতা। তাই তাঁকে "তপঃশীর্ণ" বলেছি। বৈশাখের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি সেই সময়কার কথা মনে পড়িয়ে দ্যায়।

"—জীবন সম্বন্ধে আর আমার স্পৃহা নেই। কেবল একটি কথা মনে হয় কি জান, এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্তমানে এর আর মূল্য কিছুই থাকবে না। এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তা ত জান না। কি দুঃখের যে সে-সব দিন গেছে, যখন ছোট বৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে. চারি দিকে ঋণ বেড়ে চলেছে। ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করছি। কেউ ছেলে ত দেবেই না, গাড়ী ভাড়া ক'রে অন্যকে বারণ ক'রে আসবে।......আর তখন চলেছে

একটির পর একটি মৃত্যুশোক। সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে গেছে। লোকে জানে উনি সৌখিন বড়লোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হ'য়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোট বৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে;—জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না। কিন্তু এত বাধা যদি দেশের লোকের কাছ থেকে না পেতুম তা হলে শুধু অর্থাভাবে এত কষ্ট পেতে হ'ত না, কিন্তু কী বাধা!" (পৃ. ১৭)

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"র এই খণ্ডে কবিতা ও গান বিভাগে আছে 'উৎসর্গ' ও 'খেয়া', নাটক ও প্রহসন বিভাগে 'রাজা'; উপন্যাস ও গল্প বিভাগে 'শেষের কবিতা', প্রবন্ধ বিভাগে 'রাজা ও প্রজা' ও 'সমূহ'। তদ্ভিন্ন পরিশিষ্টে আছে, সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন ও প্রবাসীতে প্রকাশিত সমসাময়িক কোন কোন বিষয়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধ। 'রাজা ও প্রজা' এবং 'সমূহ' গ্রন্থ দুটিও সমসাময়িক অনেক বিষয়ে সাধনা,। ভারতী, বঙ্গদর্শন ও প্রবাসীতে লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। সমসাময়িক বিষয়ে লিখিত হ'লেও এগুলির মূল্য ও উপযোগিতা এখনও আছে এবং পরেও থাকবে।

গ্রন্থপরিচয় নামক' অংশে রবীন্দ্র-রচনাবলীর আলোচ্য খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। শেষে আছে বর্ণানুক্রমিক সূচী।

চয়নিকা সন ১৩১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পর ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত আরো ১২ বার মুদ্রিত হয়েছিল। এখন নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর আগেকার সংস্করণে কবির কবিতাগ্রন্থ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (প্রকাশের বৎসর সন ১২৯১ সাল) হ'তে প্রান্তিক (পৌষ ১৩৪৪) পর্যন্ত গ্রন্থের নির্বাচিত কবিতা ছিল। নূতন সংস্করণে সেঁজুতি, প্রহাসিনী, আকাশ-প্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, ছড়া ও শেষলেখা, এই দশখানি বই থেকে কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন ও সংকলনের কাজে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগকে সাহায্য করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আগেকার সংস্করণের চেয়ে ৩৪ পৃষ্ঠা বেশি আছে। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' নিবদ্ধ হয়েছে।

গীতবিতান প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ গীতবিতান নামে তিন খণ্ডে ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে গানগুলি গ্রন্থানুক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে, বিষয়ানুক্রমে গানগুলি সাজাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে কবি নিজে গানগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। সেই বিভাগ অনুসারে গানগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সাজান হয়েছে। এ বিষয়ে কবির নিজের মন্তব্য এই :—

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি হয়েছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা ক'রে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

যাঁরা স্বয়ং গান করতে পারেন না কিংবা সুগায়কের কণ্ঠে গানগুলি শুনবার সুযোগ যাঁদের নাই, ভাবের অনুষঙ্গ অনুসারে গানগুলি সাজিয়ে দিয়ে কবি তাঁদের বিশেষ উপকার করেছেন। যাঁরা গান করতে পারেন কিংবা সুগায়কের সাহায্য ও সাহচর্য যাঁরা সহজে পেতে পারেন, তাঁরাও এই বিভাগ দ্বারা উপকৃত হবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ানুক্রমে গানগুলি সাজান হয়েছে :—

পূজা : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।

স্বদেশ : [এই বিভাগের গানগুলির কোন উপবিভাগ নাই।]

প্রেম : গান, প্রেমবৈচিত্র্য।

প্রকৃতি : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

গীত-বিতান দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গান তৃতীয় খণ্ডে শীঘ্র প্রকাশিত হবে। অনবধানতাবশতঃ প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি গান বাদ পড়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ঐ গানগুলি সংযোজিত হবে।

পাঠ-পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, "কবির নির্দেশ মতো এই সংগ্রহ হতে ১৪৮টি গান বাদ পড়িল।" কবি তাঁর নিজের রচনার কঠোর বিচারক ছিলেন। তাঁর চেয়ে কম কঠোর বিচারক কোন যোগ্য ব্যক্তির মতে যদি সেগুলি রক্ষণযোগ্য হয়, তা হলে হয়ত সেগুলি কোন "অচলিত গীত-সংগ্রহ" আকারে প্রকাশিত হবে।

নির্বাণ। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ১৯৪০ সালের অক্টোবর থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবনেতিহাস এই পুস্তকখানিতে নিবদ্ধ করেছেন। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর আঁকা কবির একটি আলেখ্য এতে আছে এবং তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদা 'মা-মণি' বৌমাকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন তার ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি আছে। ভক্তি ও স্নেহ রসাপ্লুত এই সুলিখিত গ্রন্থটির অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সমালোচনা হবে।

ড.

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উমার তপস্যা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৯

৩য় সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

ফুলের বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূর্য্য কখন আলোর তিলক
দিলেন তোমার ভালে
অজানা উষার কালে
কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মত
দেন নাই তিনি ফুল
তোমার আপন হৃদয়েতে ছিল
মাধুরী-লতার মূল।
অরুণ কিরণে ঝরিল করুণা
বিকশিল মঞ্জরী
দেবতা আপনি বিস্মিত হোলো
আপন মন্ত্র স্মরি।

কবিতা-কণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অটোগ্রাফ খাতাখানা
পাতা তুলে থাকে,
যে যা পারে যা তা লিখে
ভরে দেয় তাকে,
যার কোন দাম নেই,
কোথা নেই ঠাঁই
তাই কুড়াইয়া রাখে
এ কি রে বালাই।

১৮।২।৩৫ [শ্রীমতী শান্তিসুধা গুপ্তার স্বাক্ষর-পুস্তক হইতে

মংপুতে

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ কথায় কথায় গল্পগুচ্ছের গল্পর কথা উঠল। "যদি কিছু না মনে কর তবে সন্ধ্যেবেলা তোমাদের গল্প পড়ে শোনাব। আমার নিজেরই মনে নেই বিশেষ, পড়তে গেলে আবার মনে পড়বে।" সে দিন পড়লেন "অপরিচিতা" সেই গল্পের মধ্যে যেখানে আছে :—

"এমন সময় সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল—শিগ্‌গির চলে আয় এই গাড়ীতে জায়গা আছে। মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এম্‌নি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়।...রূপ জিনিষটি বড় কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্ব্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারি চেহারা।...ওগো সুর ওগো অচেনা কণ্ঠের সুর এক নিমেষে তুমি আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপর বসিয়াছ।"

"......বাবা : নিজের জাতকে কি ঠোকনই দিয়েছি আর তোমাদের কি স্তুতি! ঐ জন্যই ত বাঙ্গালী মেয়েরা আমায় পছন্দ করে আর তাই নিয়ে তাদের কর্ত্তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়! কণ্ঠস্বরের যে বর্ণনা করলুম এগুলো কি অত্যুক্তি নয় বলবে? কৈ শুনতে ত পাইনে এরকম অনির্ব্বচনীয় মধুর স্বর? যে সব স্বর শুনি তা—থাক্ গে আর বলে কাজ নেই কে আবার কি ভাবে নেবে!"

সকাল সাড়ে ন'টা দশটার সময় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে। হাতে থাকত একটা বই বা কোন মাসিক পত্র—রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য অশ্রাব্য মেশান প্রগ্রাম কিছু শুনতেন কিছু শুনতেন না।

"ইয়োরোপের সঙ্গীত শুনছিলাম গো আর্য্যে। কী আশ্চর্য্য এই যন্ত্রটা। কোন্ সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে দেশে এখন কত কাণ্ডই চলেছে, মারামারি হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে এতটুকুও ছায়া পড়ে নি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও ত নানা রকম ব্যাপার চলেছে, নানা রকম ঘটনা প্রবাহ, কতলোক আসছে যাচ্ছে, যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল সম্পর্ক রহিত, নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে। দূরে দেখা যায় বালির চর, ধূ ধূ করছে। আমি লিখেই চলেছি, লিখেই চলেছি মানসী (মানস সুন্দরী)। যখন সুরু করেছিলাম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর তার পর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙীন করে অস্ত গেল সূর্য্য, একটি মাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী সে কখন নীরবে একটি মিট্‌মিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল, আমি লিখেই চলেছি, লিখেই চলেছি মানসী—আজ কোন কাজ নয় সব ফেলে দিয়ে ছন্দবন্ধ গ্রন্থ গীত এসো তুমি প্রিয়ে! কোথায় গেল সেই দিন, সেই পদ্মার চর, ধূ ধূ করে সোনালী বালি, সেই মিট্‌মিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে শুধু আছে মানসী। তার যে পরিবেশ ছিল সে ত লুপ্ত হয়ে গেল, এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার কবিত্ত। চারিদিকের সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন। সে শুধু একখানি 'সূত্রছিন্নবাণী।' তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর ভাবছি এই সব।" সে দিন একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখেছিলেন এ বিষয়ে, তারপর পরিবর্ত্তন করতে করতে একটা কবিতা থেকে দুটো কবিতা হয়। তার একটি "সাড়ে ন'টা" নামে নবজাতকে ও আর একটি মানসী নামে সানাইতে প্রকাশিত হয়েছে। সাড়ে ন'টায় আছে :—

সমুদ্র পারের দেশ হ'তে
আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে।

* * *

দেহ হীন পরিবেশ হীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে
—একাকিনী বহি রাগিনীর দীপশিখা—
আসিছে অভিসারিকা
সর্ব্বভার হীনা
অরূপা সে অলক্ষিত আলোকে আসীনা।

গিরি নদী সমুদ্রের মানেনি নিষেধ
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব
পদে পদে জন্ম মৃত্যু বিলাপ উৎসব।
* * *
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সঙ্গীতের ধারা।
......যক্ষের বিরহ গাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত
বাণীমূর্ত্তি সেও একা—
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।

"যখন মেঘদূত রচনা হয়েছিল তখনও ত চলেছিল সংসার-চক্র, কত লোকের যাওয়া-আসা, সে-সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এই আজ এই লেখাটা লিখলুম কিছু দিনের জন্য এও কালের সমুদ্রে সাঁতার দেবে। কিন্তু এই আজকের নীলাকাশ, এই রেডিওর গুঞ্জনধ্বনি, তোমাদের যাওয়া আসা আমারও সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে। ইতিহাস তাদের গ্রহণ করবে না। সেই পদ্মার দিনগুলো মনে পড়ে তারা শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাই লিখেচি—

কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে কম্পমান সেই শুক্লরাতে
সেই সন্ধ্যা তারা
জন্ম সাথী হারা
কাব্যখানি দিল পাড়ি চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী।
সে দিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হোতে
ভেসে যায় স্রোতে।

বেশ স্পষ্ট হয়েছে ত কথাটা? আমার আবার ওই ভয় করে যা বলতে চাইলুম বলা হোল কি না, খামাখা দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলে রচনার অর্থই থাকে না।"

"তোমার সিঁড়ির উপর এগুলো কি ফুল, আমি রোজ ভাবি জিজ্ঞাসা করব মনে থাকে না, এদের কথা লিখতে হবে।" "ও লালজিরেনিয়াম" "এই বুঝি জিরেনিয়াম, তাইত এ ফুল ওরা জানালার সীলের উপর রাখে আর তার আড়াল থেকে নায়িকা নায়ককে রাস্তায় দেখতে পায়।" "এর বোঁটায় কি সুন্দর গন্ধ দেখুন কাঁচা আমের মত।" এই টবগুলির কথা ওঁর অনেকদিন মনে ছিল। দুটো কবিতায় এদের কথা আছে, একটা সানাইতে প্রকাশিত "স্মৃতির ভূমিকা" আর "মনে পড়ে তোমাদের নিভৃত কুটির" বলে একটি কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন তাতে।

"এ পদার্থ টা কি?" "আপেলের রস—।" "আহা শুনে কান একেবারে জুড়িয়ে গেল—কবিত্ব জাগ্রত হয়ে উঠছে—দ্রাক্ষারসের কাছাকাছি আপেলের রস। আমাদের নীলরতনবাবুর আবিষ্কার। মোটেই সুখাদ্য নয় তা বলে রাখছি। তোমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে ত? তোমাদের যে দিনটা কখন কি রকম ভাবে চলেছে কিছুই বুঝতে পারি নে। আমার সঙ্গে তার এত তফাৎ। আমার যখন মঙ্গলবারের দুপুরবেলা তোমাদের তখন সবে সোমবারের সকাল হয়েছে, আমার যখন চায়ের আয়োজন চলেছে—ফস্ করে শুনলুম তোমাদের তখনও খাওয়াই হয় নি। এখন কর্ত্তারা সব কোথায়? নিদ্রা দিচ্ছেন?" "না আড্ডা দিচ্ছেন।" "সে ত অতি উপাদেয় ব্যাপার, এখানে আড্ডা দিলেই পারতেন, আমিও যোগ দিতুম। না না সে হবে না, তাঁদের আবার আর একটা ব্যাপার আছে সে আমার সামনে চলবে না। আমাদের অক্সোনিয়ান খুব গল্প করতে পারে, রসিক লোক জমাতে পারে আসর, কিন্তু তার আবার মুড আছে—আর উপযুক্ত সঙ্গী চাই ও যেমন তেমন হলে তার চলে না উঁচুদরের পছন্দ! আর তুমি কি করছিলে আড্ডা দিচ্ছিলে না, চিঠি লিখছিলে মাসীর কাছে?" "মোটেই নয় আমি আপনার কথা লিখছিলাম; আপনি সব সময় যা বলেন সময় পেলেই লিখে রাখি।" "বল কি—তোমার সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করব তাহলে। তোমার মনে যে এ আছে কে জানত? এবার থেকে ত তাহলে তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা কাব্য রচনা করে কথা বলতে হবে কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে তাহলে!" "মোটেই নয় কাব্য ত ঢের রচনা হয়েছে আপনি আমাদের সঙ্গে যা কথা বলেন সর্ব্বদা, তাই লিখে রাখি আমার নিজের জন্য। যখন শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন তখন পড়ব বসে।" "কিংবা যখন আরো দূরে চলে যাব আর মোটেই কথা বলব না, তখন তুমি এই বারান্দায় বসে বসে পড়বে আর ভাববে লোকটা ছিল মন্দ নয়, গালমন্দ যাই দিক মোটের উপর ব্যবহারটা ছিল চলনসই।"

"আচ্ছা সে থাক, এখন দিন কপি করব।" "হ্যাঁ নিশ্চয় এ সব অলুক্ষুণে কথা বলে কাজ নেই, বালাই ষাঠ আমার মাথার যত চুল তত বছর আপনার পরমায়ু হোক—, কেমন ঠিক হচ্ছে না?"

"একেক সময় আমার মনে হয় যে অনেক কথা হারিয়ে

গেছে যা থাকলে ভাল হ'ত। বিশেষ করে ইয়োরোপে, কত বড় বড় মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে—কত বিষয়ে কত আলোচনা হয়েছে সে সব যদি লিখে রাখত কেউ ভাল হ'ত। কিন্তু তখুনি না লিখলে সে হয় না, পরে যারা বানিয়ে বানিয়ে লেখেন আমি দেখি সে আমার কথা নয় আমার ভাষাই নয়। বিদেশে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে যা রাখবার যোগ্য ছিল। যাক্ এখন আর সে ভেবে কি হবে—যা যাবার তা যাবেই, যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর! বোঝা যে কত জমেছে, পুঞ্জীভূত বোঝা! তা হ'লে এই কবিতাটা কপি ক'রে ফেল তোমার মংপুর সকাল বেলার একটা ছবি। আজ সকালে হঠাৎ একটা প্রজাপতি আমার চুলে এসে বসল চুপচাপ করে রইলুম পাছে ওকে চমকে দিই পড়ি শোন :—

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্র পুঞ্জ আছে ভরি
সারা বেলা ধরি
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি।
হঠাৎ কি হলো মতি
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রূপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়
পাছে ওর জাগাই সংশয়,
ধরা প'ড়ে যায় পাছে, আমি নই গাছের দলের
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।
চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড়;
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দ্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক।
এখনি এ আমার লেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জিরেনিয়েমের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ।
এ চারিদিকের এই সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক'দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার।

"এখন বারান্দায় যাবেন? রেডিওতে আপনার গান গাইবে—এ ভদ্রলোক ভাল গায়।" "কি গান বল?" "আমি তারেই খুঁজে বেড়াই। আর ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না বাইরে।" "চল চল কেন তবে আমাকে ঘরে পুরে রেখেছ? অত্যন্ত বিশ্রী objectionable ব্যবহার তোমার। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে আমার মনে! সে আছে বলে…সে আছে বলে…আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে…সে আছে বলে চোখের তারার আলোয় এত রূপের খেলা, রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়, চল গো তোমার জ্যোৎস্না দেখিগে—অসীম সাদায় কালোয়।" বারান্দার চৌকিতে এসে বসলেন—এক টুকরো কাল মেঘ হঠাৎ আচ্ছন্ন করে দিল আলো। "কৈ তোমার অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না কৈ? ওগো গৃহস্বামী—একবার এস ত এদিকে এর একটা বিচার কর। তোমার গৃহিণীর ব্যবহার যে ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে। ইনি বললেন বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না আমি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখি চমৎকার অন্ধকার। ভাল বিপদে পড়েছি, এমন লোককে নিয়ে তোমার চলে কি করে!"

"কি গো আজ সারা সকাল যে পদচারণাই চলেছে। মাসী আসবার আগে ত ভাগ্নিকে কখনো বলে বলে ঘর থেকে নড়ান যেত না একি স্বাস্থ্য চর্চ্চা না মনশ্চর্চা?" "মনের চর্চাই বেশী।" "তাই বল, কাল কত রাত্রি অবধি চল্ল তোমাদের?" "না সে বলব না আপনি ঠাট্টা করবেন।" "ঠাট্টা? অসম্ভব! সে আমি শপথ করে ছেড়ে দিয়েছি, তোমার কাছে থেকে আমার অসম্ভব রকম নৈতিক উন্নতি হচ্ছে, এবার থেকে মাষ্টার মশাইর মত ধমক দিয়ে ছাড়া কথাই কইব না।" "আড়াইটে অবধি গল্প করেছি কাল।" "ও বাবা বল কী—কি এত গল্প হয় তোমাদের? উনি ওঁর কথা বলেন আর তুমি তোমার কথা বল এই ত? তোমরা মেয়েরা পার বটে গল্প করতে অকারণ হাসি অকারণ গল্প আরো একটা আছে অকারণ কান্না। আড়াইটে অবধি গল্প করলে আমায় ডাকলে না কেন! আমিও গল্প করতুম।" "তা হলে আর আজ গল্প করতে হোতো না।" "তা বটে, সেই গল্পই শেষ গল্প হোতো, যেমন শেষ গল্প করেছিলুম সুধাকান্তর সঙ্গে—গল্প করতে করতে অতলে ডুব দিয়েছিলুম। তবে করেছি আমরাও

একদিন গল্প করেছি যখন সুদিন ছিল, একেকদিন রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে গল্প শেষ হয় নি। সেই যে কি বলে অবিদিতগতযামা—···।" "কার সঙ্গে বলুন।" "ওই দেখ, একবার রোম্যান্সের গন্ধ পেলে হয়।" "আপনার ছোটবেলার গল্প বলুন।" "সে ত সবই লিখেছি জীবন-স্মৃতি পড় গে।" "সে শুনতে চাইনে।" "কি শুনবে তবে আমার র‍্যোমণ্টীক লাইফ? আমাদের কি আর এ যুগের মত এত সৌভাগ্য ছিল গো, সমস্ত দেশে স্ত্রী জাতিই ছিল না, এখন যে দলে দলে বেণী দোলান মূর্ত্তি দেখা যায় আমাদের দিনে সব অদৃশ্য ছিল। সমস্ত দেশ ছিল ঘোরতর রকম আদর্শবাদী! তোমাদের মত এরকম রোম্যান্স করে বেড়াবার সুযোগ পাব কোথায়!" "বেশ যাহোক আপনি, আমরা রোম্যান্স করে বেড়াই, শেষটায় একটা অপবাদ রটবে!" "ওই দেখ ফস্ করে কখন কি বলে ফেলি, সত্যি কথাই বা বলে বসি। যাকৃগে তুমি কিছু ভেবোনা। ডাক্তারের সামনে এসব কথাই তুলব না একেবারে চুপ!"—এই যে মাসী–এসো এসো—মাসীকে দেখলে মনে হয় উনি গুহাহিত হয়ে তপস্যা করছিলেন, এইমাত্র উঠে এলেন—তুমি রাতদিন ওই ঘরটার মধ্যে বসে কি কর? তাই ত তোমাকে দেখলেই গাইতে ইচ্ছে করে—আকুল কেশে কে আসে, চায় ম্লান নয়ানে ওকে চির-বিরহিণী—···"

"এ কি আপনি এখনো রস খান নি?" "আরে রাখো তোমার রস আমি বসে মনে মনে সাহিত্য আলোচনা করে চলেছি প্রশ্নোত্তর যাকে বলে মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টেরিটির পথে, স্বপ্ন-মনোরথে। যে কাল এখন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সেই কাল ত একদিন বর্ত্তমান হয়ে আসবে, বসে বসে তাই ভাবছি, আজ যে চিন্তাকে, যে রূপকে, যে expressionকে, এত মূল্য দিচ্ছি সব মূল্য তখন চুকে যাবে? এই যে আজকাল এক তর্ক উঠেছে আধুনিক আর পুরাণো নিয়ে এর যথার্থ কোনো অর্থ আছে কি না ভাবি। যা নূতন তাই জায়গা পাবে আর যা পুরাণো তাকেই সরে যেতে হবে তা ত বলা যায় না, নূতন বলেই প্রমাণ হয় না তার অসংশয় শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু মানুষের মনের কি এতই পরিবর্ত্তন হয় সত্যি, যে কালনিরপেক্ষ হয়ে সাহিত্যের কোনো স্থায়ী মূল্য থাকে না? যারা পূর্ব্ববর্ত্তী তারা পরবর্ত্তীদের বলে ওরা অর্ব্বাচীন, ওরা কি-ই বা জানে, আর যারা আধুনিক তারা বলবে ওসব পুরাণো কথা ওতে আর ধার নেই। যেমন ধর আমাদের সময় যখন গান হোতো, ওরে রে লক্ষণ একি অলক্ষণ একি বিলক্ষণ দুর্লক্ষণ জানকীরে দিয়ে এসো বন।···আহা ছি ছি একি অগণ্য কাজে জঘন্য সাজে ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম···আহা···অপার জলধি কেন বাঁধিলাম···বাঃ বাঃ এ গান শুনে আসর মেতে উঠত। ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণ তে মাতিয়ে দিত একেবারে। তখনকার তাঁদের কাছে, গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা—এ একেবারেই নীরস অলঙ্কার বর্জ্জিত সাদা কথা বলে না ঠেকেই পারে না। এ আবার কি একটা কবিতা হোলো? কি, না, গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা, আছ ত আছ, ভরসা নেই ত কি আর করা যাবে, কিন্তু এর সঙ্গে একবার তুলনা কর দেখি, ভব শ্রীকান্ত নরকান্ত-কারীরে একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ··বাহাবা রস একেবারে উথলে উঠত। কী অলঙ্কার-কী ঝঙ্কার। কিন্তু অস্বীকার করতে ত পারিনে যে আমরা একে তেমন জায়গা দিইনে। সাহিত্যের পংক্তিতে এর স্থান নির্দ্দেশ করে দিই ওই নিচের তলায়। এর মধ্যে যে একান্ত কৃত্রিমতা আছে যাকে তোমাদের স্বদেশবাসীরা বলেন "ক্রিত্রিমতা" সেটা আমাদের খারাপ লাগে। যে রস সৃষ্টি করে তা নেহাৎই খেলো, তেমন একদিন হয়ত আসবে যখন আজ যা লিখেছি যা তোমাদের ভালো লাগছে তা তাদের ভালো লাগবে না। এর মধ্যেও হয়ত অনেক কৃত্রিমতা, অনেক নিকৃষ্ট জিনিষ মুখোস পরে বসে আছে যা তোমরা ধরতে পার নি তারা উদ্ঘাটন করবে। এই তোমার খুকু যখন বড় হয়ে একজন সমজদার হয়ে উঠবেন তখন তোমায় বলবেন, মা, তোমরা কি যে ছিলে, দাদু এমনই কি লিখতেন যে তোমরা একেবারে গদ গদ হয়ে উঠতে? ওর চেয়ে দেখ ত আমাদের পঙ্কজাক্ষ বাবুর লেখাটা কত সহজ স্বাভাবিক—আমাদের ত ওঁর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা ভালই লাগে না। তবে দাদুর কপালে এ ভাল যে তখন গদগদ হবার জন্য মা ছিলেন, নাতনী ছিলেন না। নগদ বিদায় ত অনেক হ'ল তবে আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কেন? কিন্তু তবুও ভাবি এও কি সত্য হ'তে পারে যে সাহিত্যের মধ্যে সময়নিরপেক্ষ চিরন্তন কিছুই নেই? যা ভাল তা চিরকালের ভাল? আজের আগেও আজ ছিল তখন যা এত ভাল লেগেছিল আজ সে মিথ্যা হয়ে গেল, আজ যা ভাল লাগছে কাল তা মিথ্যা হয়ে যাবে? তাহ'লে এমন কিছুই নেই যা চিরকালকে, সুদূর পস্টেরিটিকে উপহার দিতে পারি, যা যথার্থই 'সময়হারা'। এই সব কথা আমি মনে মনে প্রশ্নোত্তর করে চলেছি এমন সময় তুমি নিয়ে এলে চাল কুমড়োর রস! সংসারে ওর

নিত্যতা কতটুকু ? সেই যে অপরাজিতাকে লিখেছিলুম, কি হে বলনা লাইনগুলো নিশ্চয় মনে নেই তোমার।" "কোন্‌খানটার কথা বলছেন ?

মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ
স্বামী যাহা আর যাহা থাকার অযোগ্য
সকলি আহুতি রূপে পড়ে তার শিখাতে
টিকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সেত কহিবেই কহিবে।

এখানটা কি ?"

"হাঁ গো এইটাই সত্যি কথা, জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ। নম্র হ'য়ে একথা মেনে নেওয়াই উচিত। আর তাই যদি হয় তাহলে রসটা খেয়ে ফেললেই তোমার সঙ্গে সব ঝগড়া মিটে যায় !"

"তোমাদের অত সমারোহ চলে ছিল কিসের সন্ধ্যে-বেলায় ? কিছু ত পড়াই হ'ল না।" "গাঙ্গুলী হারিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী তাই ব্যস্ত হয়ে এসে উপস্থিত।" "হারিয়ে গিয়েছিলেন অর্থ ?" "ঠিক হারান নয় দার্জ্জিলিং গিয়ে ফিরতে একদিন দেরী হয়েছিল।" "যাক এখন return of the prodigalএর পালা চুকে গেছে ত ?" "এত গোলমাল হচ্ছিল বুঝতে পারেন নি ?" "বুঝব কি করে ভাবলুম লোকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে রহস্যালাপ হচ্ছে। তোমাদের কণ্ঠস্বর এত মধুর যে ব্যাপারটা শোচনীয় না বিবাহ উৎসব তা বুঝতে পারিনি। গলায় যা মাধুর্য্য ছড়ায় তাতে আলাপ কর কি বিলাপ কর বোঝা কঠিন !" "আশা করি এটা ঠাট্টা।" "ঠাট্টা হলেও জানি সত্যি ভেবে নেবে, মেয়েরা কখনো স্তুতিবাদকে ঠাট্টা বলে হাতফস্‌কে যেতে দেয় না। যত Thick করেই Butter মাখাও না কেন, অরুচি নেই, হয় ত একটু ছলনা করে বলবে আহা ঠাট্টা করেন কেন ? আমি বলি অত মিষ্টি করে কিছুতেই বলতে না যদিনা একটু বিশ্বাস থাকত !" "এবার আমি সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছি কিন্তু।" আহা হা চট কেন individual-এর কথা ত হচ্ছে না, এটা একটা general ভাবে বলা, তবে তোমার কথা যদি বল, তুমি কি কখনো ....নাঃ এখন আর চলবে না ! যাক্ এখন গাঙ্গুলী পত্নীর ভাবনা ঘুচেছে ত ? তোমরা এত অনাবশ্যক রকম ভাবো ওতে অপর পক্ষকে বড় বাধাগ্রস্ত করা হয়।" "আমাদের দেশে মেয়েদের অপরপক্ষের সঙ্গে যে রকম শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয়েছে, সে বন্ধনের ফল উভয়পক্ষকেই ভুগতে হবে বৈ কি।" "আচ্ছা স্বামী বিয়োগ হলে স্ত্রীর বেশী কষ্ট না স্ত্রী বিয়োগ হলে স্বামীর ?" "বিধবার দুঃখের সঙ্গে তুলনা কি, স্বামীদের কি বা ক্ষতি।" "কিন্তু আমি ত দেখি বিধবারা দীর্ঘায়ু হয়।" "সে সত্যি, বোধ হয় শুদ্ধাচারে থাকে বলে, একবার কোন রকমে বিধবা হ'তে পারলে আর মরা শক্ত হয়।" "শুধু তাই কি, আমার ত মনে হয় স্বামীর যে একটা প্রকাণ্ড বোঝা তাকে বহন করতে হ'ত সেটা নেমে যাওয়ায়, অনেক ভার লাঘব হয়। তখনকার মুক্তি শরীর মনের পক্ষে একটা বিশ্রাম আনে বৈ-কি। সত্যি জানো সেন্‌সাসে দেখা গেছে Widowerরা মরে বেশি। বোধ হয় তাদের যে ভারটা স্ত্রীরা বহন করত সেটা তাদের নিজেদের করতে হয়। নিজের বোঝা বড় দুর্ব্বহ বোঝা। সত্যি স্ত্রীর অভ্যাস বিশ্রী অভ্যাস, একবার হ'লে আর রক্ষে নেই। সেই জন্যেই ত স্ত্রী মরতে মরতে আবার সব বিয়ে করতে ছোটে। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকলে সে এক বিষম বিপদ্ কে দেখবে কে খাওয়াবে কে মানুষ করবে, সে কি পুরুষের কাজ ! বিশেষতঃ যারা নিজেদের সংসারের সঙ্গে খুব জড়িয়ে রাখে তাদের বিপদ আরও বেশী।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মহাদেব চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। বুঝলুম কিছু ভাবছেন অন্যমনস্ক-ভাবে। কিছুক্ষণ পরে বললেন "অবশ্য আমার নিজের কথা একেবারে অন্যরকম ছিল, আমি কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলিনি সংসারে কোন কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়।" "কিন্তু আপনাকে ত সংসারের ভার একলাই বহন করতে হয়েছে।" "তা ত হয়েইছে, এদের প্রত্যেকের সমস্ত ব্যবস্থা পড়ান বিবাহ এমন কি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলাই বহন করতে হয়েছে। ঠিক মনে নেই বেলার বিবাহ বোধ হয় তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে হয়েছিল। সবই করেছি, কিন্তু জালে জড়াই নি, দূরের থেকে করেছি।

"ছেলেদের মানুষ করা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সে করেছি কিন্তু সে যেন একটা intellectual task। সেটা বুদ্ধি বিচার বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত ভাবেই। রথীদের পড়াতে গিয়েই ত শান্তিনিকেতনের সুরু হল। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে। এখানকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁতখুঁতে ছিলুম না। আধুনিক ভাবে আমাদের বিবাহ হয় নি ত কিন্তু কিছুই এসে যায় নি তাতে। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি ত চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সাঙ্গিনী হবার। বিশেষ করে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ

মংপুর বারান্দায়

হয়েছিল কাজ করবার কিন্তু সে ত হ'ল না, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল।" "আপনার খুব অভাব বোধ হয় নি?" "ঐযে বললুম, চিরদিন আমি একটা জায়গায় উদাসীন নিরাসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। তাছাড়া যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন সুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে। কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখদুঃখকে কেন্দ্র করে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়? মেজ মেয়ে মৃত্যু-শয্যায় আলমোড়ায়, তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হত শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া-আসা ছুটোছুটি চলেছেই। তবে সব চেয়ে কি কষ্ট হ'ত জান, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়,—সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে; ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়। শুধু বলার জন্যই, এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়। সে ত আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন সেইটেই সব চেয়ে কষ্ট ত যে, এমন কেউ নেই যাকে সব বলা……। এই যে পটেটো, কি তোমার উদ্দেশ্য কি, রেডিওটা ভাঙতে চাও?"

এ সব কথা তাঁর মুখে বেশীবার শুনি নি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে দু-একবার মাত্র বলেছেন। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে, নিজের দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে, এমন কি শারীরিক কষ্ট সম্বন্ধেও তাঁর ছিল গভীর আশ্চর্য্যজনক নীরবতা। সে দিন হয় ত আরো কিছু বলতেন কিন্তু হঠাৎ আর একজনের প্রবেশ মাত্র এক নিমেষে সজাগ হয়ে উঠলেন।—"ওগো কন্তে, তোমার ও যন্ত্রটা গেল, যদি বাঁচাতে চাও তবে এই বেলা আলুর হাত থেকে ওকে রক্ষা কর।"

"ও কি হচ্ছে, আমার সঙ্গে লুকোচুরী ফস্ করে মাছ তুলে দিলে থালার উপর খাব না ত আমি!" "আপনার একি ব্যবহার বলুন ত? আপনি ওটা নিশ্চয় খেতেন আমি দিলুম বলেই খাবেন না।" "নিশ্চয় তাই, আমার একটা স্বাধীন ইচ্ছে নেই? তোমরা যা বলবে আমি তাই করব না, সর্ব্বদা এরকম Strongly resist না করলে আমার স্বাধীন মতামত একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এমনিতেই ত যা হয়েছে এখন এটা খান, এখন ওটা খাবেন না, এখন চশমা পরুন এখন ও জামাটা পরবেন না, কেন এত অধীনতা আমি সহ্য করব কেন?" "আচ্ছা তবে নিন এখন যা আপনার ইচ্ছে।" "না কখনও নয় যখন বললে নিজে নিন তখন বলব দাও তুলে দাও।" মহাদেব একটু একটু হাসতে লাগল মুখ টিপে। "এ সব আমার বনমালী ভাল বোঝে।"

"চল এইবার স্থির হয়ে বসবে তোমার ছবি আঁকব। অবশ্য আশাও কোরো না যে সে ছবি তোমার মত হবে কিংবা আশঙ্কা!" "একটা গল্প শুনেছিলুম একজন খুব বিশ্রী দেখতে লোক এক বড় আর্টিষ্টকে দিয়ে অনেক খরচ করে ছবি আঁকালে, পরে ছবি আনতে গিয়ে সে নিজের চেহারা দেখে চটে অস্থির। বলে এও কি একটা ছবি? তুমি যত বড় আর্টিষ্টই হও I must say it is a very bad work of art! আর্টিষ্ট বললে তা কি করব বল you must admit that you are a bad work of

ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত
সূর্য্য উদয় দেখে দেখে তার অস্ত।

nature!" "দেখ আমি কখনই তোমাকে একথা বলব না, কিছুতেই না, মনে হলেও চেপে যাব।"

"রজনী শাওন ঘন
ঘন দেয়া বরিষণ
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে—

রজনী শাওন ঘন······কাঁচের ঘরে চলে এলুম তোমরা উঠে যেতেই। ভাবলুম বৃষ্টির শব্দ শুনব বসে বসে। কি ঘোর বর্ষাই নেমেছে। কিন্তু বিধাতা ত পথ বন্ধ করেছেনই তুমিও এমন এঁটে দরজা বন্ধ করেছ। তাই বসে বসে কুঁড়েমি করছি আর ভাবছি রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া বরিষণ···ও কি ও ছেঁড়া কাগজগুলো সংগ্রহ করছ কি জন্য?" ছেঁড়া কাগজ কেন, ওত আপনার লেখা কবিতার টুক্‌রো।" "ও বুঝি তোমার মিউজিয়ামে উঠবে? তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না, কোথায় ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া জুতো, একটুক্‌রো কাপড়, সব জড়ো করছ। তোমার বাড়ী যে শেষটায় বেলুড় মঠ হয়ে উঠবে। তারপর আবার এক ডায়রী আছে তাতে সব ছেঁড়া কথা জমা হচ্ছে। বাড়ীটাকে মিউজিয়াম কর ক্ষতি নেই কিন্তু জীবনটাকেও মিউজিয়াম করে তুল না যেন, তোমার কাছে আমার এই মিনতি। সেই যে ক্ষণিকাতে লিখেছি ফুরায় যা দাও ফুরাতে।" "তা হোক ক্ষতি কি, না হয় মিউজিয়ামই হল আমার জীবন।" "বিশেষ ক্ষতি, সমূহ ক্ষতি, আমি সেই মিউজিয়ামের মামি হতে চাইনে যে। যে কটা দিন থেকে গেলুম তোমাদের সকলকে খুসী করে গেলুম, এই ত ভাল, স্মৃতির বোঝা চাপিয়ে কেন ভারাক্রান্ত করব তোমাদের জীবন? এই কয়েক দিনের স্মৃতি যদি খুসী হয়ে মনে কর সে ভাল, যদি মনে করে খুশী হও সে আরো ভাল, কিন্তু ভার নয়, বোঝা নয়, আমি তোমাদের জীবনে সমাধিমন্দির হয়ে উঠতে চাইনে এ স্পষ্টই বলে দিচ্ছি, ভীষণ ঝগড়া হয়ে যাবে তাহলে।"

নীচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৩)

একটা কিছু হোক, আর যেন সয় না। নয় একেবারে ভাঙনই, নয় সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলিয়া সুনিবিড় বাঁধন, চিরদিনের জন্য। মীরা কি বলিবে বলুক, দিব সুযোগ।

কিন্তু কি করিয়া?

মীরা নিজেই আবার সুযোগের উদ্‌যোগ করিল।

সেদিন বিকাল বেলায় আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি। হেমন্ত-দিন-শেষের তামাটে রোদ সামনের গাছপালা রাস্তাবাড়ীর উপর পড়িয়াছে, বেশ একটা সুস্থভাব জাগায় না মনে। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা যাওয়া-আসা করিতেছে, কোনটাই স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

নিশীথ তাহার নূতন মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমায় দেখিয়া কি ভাবিল বলিতে পারি না তবে বাহিরে বাহিরে রাঁচিতে সেই বিদায়ের সময়ের ভাবটা বজায় রাখিল। "হ্যাল্লো, মিষ্টার মুখার্জ্জি, কি রকম আছেন?"—বলিয়া হাতটা বাড়াইয়া ডানদিকে একটু ঝুঁকিয়া বিলাতী কায়দায় অগ্রসর হইয়া আসিল। আমিও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "ভালই, ধন্যবাদ; আপনি কি রকম ছিলেন? আপনিও হঠাৎ চ'লে এলেন দেখছি।"

নিশীথ টুপিটা হ্যাটষ্ট্যাণ্ডে টাঙাইয়া দিয়া একটা কুশন-চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল, "থেকেই যেতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম ওদিকে আবার বেজায় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।"

"ওদিকে" মানে অবশ্য ওর সেই 'পরের জাহাজেই গ্ল্যাসগো-যাত্রা'। বলিলাম, "হ্যাঁ, তা হ'য়ে যাচ্ছে বটে!"

নিশীথ বলিল, "মিস্ রয় বাড়ীতে আছেন নাকি?" কব্জিটা উল্টাইয়া হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "বাই জোভ্, সাড়ে পাঁচটা হ'য়ে গেল।"

বলিলাম, "বাড়ীতেই আছেন বোধ হয়, বাইরে ত কই যেতে দেখি নি।"

রাজু-বেয়ারা যাইতেছিল, ডাকিয়া মীরাকে খবর দিতে বলিলাম।

খুব প্রফুল্ল নিশীথ।—সেই লোকের মত সে নিজের মনে বিশ্বাস করে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া বিজয় লাভ করিবেই। সত্য হোক মিথ্যা হোক এই আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই ও আমায় ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে। বিজয় যখন প্রত্যক্ষ—অন্ততঃ যখন ভাবা যায় সে প্রত্যক্ষ—তখন উদারতা আসে না খানিকটা?"

কেমন একটা ছেলেমানুষি লোভ হইল—একবার রণেন চৌধুরীর আসিবার কথাটা জানাইয়া দিই। দিলাম না কিন্তু, ভাবিলাম যে যতটুকু নিজের মনগড়া স্বর্গে কাটাইতে পারে কাটাক্।···বেচারি নিশীথ!

একটু চঞ্চলভাবে পা নাড়িতে নাড়িতে নিশীথ বলিল, "বিশেষ কাজ রয়েছে, একটা foreign travel-এর (বিদেশ যাত্রার) হাঙ্গাম ত আন্দাজ ক'রতেই পারেন; কিন্তু রাঁচি থেকে চ'লে এসেছি অথচ যদি দেখা না করি···এ বিষয়ে মহিলারা কি রকম sensitive (অভিমানী) জানেনই ত?"

তাহার পর সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলিল—"But this is beetwen you and me, mind you" (কিন্তু মনে রাখবেন, কথাটা নিজেদের মধ্যে বলছি।)

—বলিয়া, সামনে পিছনে দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি বললেন—ওঁর মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

একটা ঝড়ে দোদুল্যমান বৃক্ষ হঠাৎ মচকাইয়া গেলে যেমন হয়, নিশীথ যেন ঠিক সেই রকম হইয়া গেল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে খুব পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে সে, চক্ষু দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "বাই জোভ! আপনি ত আমায় বলেন নি মিষ্টার মুখার্জ্জি!"

বলিলাম, "আমি নিজেই জানতাম না। ভালই ত ছিলেন, বোধ হয় এই মাত্র আরম্ভ হয়েছে।

মুঠায় মুখটা চাপিয়া নিশীথ একটু চিন্তা করিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা ওদের মধ্যেও একা ওই পারে। বলিল, "একবার বল ত গিয়ে রাজু, মিষ্টার সেন বড্ড

ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, যদি আপত্তি না থাকে ত ওপরে গিয়েই দেখা করি। যদি ডাক্তার দেখাবার দরকার হয় ত।···বলবে—বড্ডই ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন শুনে, বুঝলে ত?"

আমার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না, নিশীথ সেই ভাবেই মুঠায় মুখ চাপিয়া পা নাড়িতে নাড়িতে বার-দুই —"বাই জোভ্, বাই জোভ্" করিল।

চঞ্চল হইয়াছে সন্দেহ নাই, তা যে কারণেই হোক।

রাজু আসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ জানালেন আর বললেন—না, ডাক্তারের দরকার নেই, একটুখানি একলা থাকলেই সেরে উঠবেন।"—এমন সতর্কভাবে বলিল যেন যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহার একটি অক্ষরও বাদ না পড়ে।

তাহার পর সে গ্যারেজের দিকে চলিয়া গেল।

নিশীথের মোটর চলিয়া যাইবার একটু পরেই বাড়ীর গাড়ীটা ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইল। কে যায় দেখিবার জন্য উগ্র রকম একটা কৌতূহল হইতেছে।

তরু আসিয়া বলিল, "দিদি বেড়াতে যেতে বললেন মাষ্টার মশাই!" আজ বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল না বলিয়াই বসিয়া ছিলাম। তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আর বলিলাম না, "বেশ চল" বলিয়া জামাটা পরিয়া লইবার জন্য ঘরের দিকে গেলাম। তরু বলিল, "আমি যাব না।"

একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তবে? একলা কি করতে যাব আমি?"

তরু ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "একলা নয়, আপনি আর দিদি।"

আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতেছিলাম, সেই অবস্থাতেই ঘরের মাঝে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মীরার আচরণ কয়েক দিন হইতে খুবই অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন, কিন্তু এত বড় একটা বেমানান ব্যাপার করিয়া বসিবে, তাহাও এত স্পষ্টভাবে—স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাহার পর বলিলাম, "বল'গে আমায় একটু অন্যত্র যেতে হবে, তিনি একলাই যান।"

তরু ফিরিয়া বলিতে যাইবে এমন সময় সিঁড়ির মোড়ের কাছে চাপা রাগের একটা বিকৃত স্বরে মীরার কণ্ঠ শোনা গেল, "তরু বল মাষ্টার মশাইকে এটা আমার হুকুম, ওঁর অনুগ্রহের কিছু নেই এতে।"

আমি প্রায় সংযম হারাইয়াছিলাম, কিন্তু ঠিক সময়ে নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইলাম। একটি আত্মসংযম-হারান মেয়েছেলের সঙ্গে এখনই কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়া যাইত ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। তবে মনে মনেই স্থির করিয়া ফেলিলাম বন্ধনের যাহা একটু অবশেষ আছে এই বার শেষ করিয়া দিতে হইবে; সুযোগ আসিয়াছে। খুব সহজ স্থৈর্যের সঙ্গে জামাটা পরিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

সিঁড়ির মোড়ের দুইটা ধাপ নীচে মীরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাম দিকের নাসিকাটা কুঞ্চিত, চোখের কোণ যেটুকু দেখা যায় যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ একটা, চাপা উত্তেজনায় বুকটা দীর্ঘচ্ছন্দে উঠানামা করিতেছে।

আমি শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

দু-জনে গিয়া মোটরে উঠিলাম।

মোটর ষ্টার্ট দিতে দৃষ্টিটা আমার আপনা আপনিই একবার তরুর উপর গিয়া পড়িল। উগ্র আশঙ্কায় যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া সে চৌকাঠে ঠেস দিয়া আমাদের পানে চাহিয়া আছে।

গেটের কাছে আসিয়া ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "কোন্ দিকে যাব?"

মীরা কোন উত্তর দিল না, বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "ডায়মণ্ড হারবার রোডের দিকে চল না হয়।"

যেখানে একদিন মিলন হইয়াছিল স্পষ্ট, সেখানে আজ বিচ্ছেদকে স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

গাড়ী সার্কুলার রোড হইয়া, চৌরঙ্গী রোড পার হইয়া পশ্চিমে ছুটিল। খিদিরপুরের পুল পার হইয়া বাঁয়ে ঘুরিয়া ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরিল। কোন কথা নাই। শুধু শেভ্রোলে গাড়ীর মসৃণ আওয়াজ। খালের পুলটা যখন পার হইলাম মীরা হাওয়া লাগাইবার জন্য মোটরের কিনারায় মাথাটা পাতিয়া দিল, কপালের চারিদিকে চুল-গুলা আলগা হইয়া চোখে মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল।

বেহালা বঁড়িশা পার হইয়া মোটর সবে একটু ফাঁকায় আসিয়াছে, মীরা ড্রাইভারকে বলিল—"ফেরো।"

ফিরিবার সময়ও কোন কথা হইল না! দুই জনের মাঝখানে বীচিহীন জলরাশির মত একটা অটুট স্তব্ধতা থম থম করিতে লাগিল।

বাড়ীতে আসিয়া মীরা তেমনি অভঙ্গ নিস্তব্ধতায় সিঁড়ি বাহিয়া ঋজু গতিতে উপরে উঠিয়া গেল।

কি বলিত মীরা?—কেন বলিল না? ডায়মণ্ড হারবার রোডের যেখানটিতে আসিলে দু-জনের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম সন্ধ্যাটিকে বোধ হয় পাওয়া যাইত, অতটা যাইয়াও মীরা তাহার সম্মুখীন হইল না কেন?—তাহার কি ভয় হইল দুর্মদ অভিমানের মধ্যে যে কঠোর সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই আমাদের তীর্থ-ভূমিতে যাইলেই সেটা চূর্ণ হইয়া যাইবে?

হ্যাঁ, একটা অতি কঠোর সঙ্কল্পকেই মীরা সেদিন প্রাণের সমস্ত উত্তাপ দিয়া লালন করিয়া তুলিতেছিল,—আত্মহত্যার সঙ্কল্প।

কেন, কি করিয়া বলিব? নারীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের সংবাদ কি করিয়া জানিব?—অভিমান?—নৈরাশ্য?—না, তাহার ধমনীর সেই রহস্যময় রাজরক্তের কণিকা?

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সকলেই জানিতে পারিল মীরা নিশীথকেই বরমাল্য দিবে।

আত্মহত্যাই বইকি। আত্মহত্যার কি একটিই রূপ আছে?—আরও ভয়ঙ্কর রূপ নাই?—তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া?—সমস্ত জীবনকে একটা দীর্ঘীকৃত মৃত্যুতে পরিণত করা।

মীরা এই আত্মহত্যাই বাছিয়া লইল। কেন? তাহাই বা কি করিয়া বলি?—হয়ত আমার উপর অভিমান, হয়ত যে আভিজাত্যকে ইচ্ছামত নোয়াইতে পারিল না তাহার উপর প্রতিশোধ।

(১৪)

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না।—কি জানি, নারীর মন, শুভানি বহু বিঘ্নানি···কতকটা পৌরাণিক, কতকটা আধুনিক মতে বাগ্‌দানের একটা পাকারকম বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। আধুনিকতার দিকে থাকিবে একটা বড় রকম পার্টি, অবশ্য নিশীথের বাড়ীতেই।

যেদিন পার্টি তাহার আগের দিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অপর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা করিলাম, বলিলাম —"বাড়ী থেকে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম পেলাম, যেতে লিখেছেন।"

টেলিগ্রামটা ঠিকই। তবে ফরমাসী, আমিই বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আর থাকাও চলে না, অথচ এই সব ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ কর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আশাও বড় কটু দেখায়। সেখানে গিয়া একটা চিঠি লিখিয়া দিলেই চলিবে।

অপর্ণা দেবী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে একটু চাহিলেন। প্রথমটা একটা শঙ্কার ভাব ছিল সে দৃষ্টিতে, কিন্তু অচিরেই সেটা মিলাইয়া গেল। ওঁকে এত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বলিলেন, "টেলিগ্রাম? তাহ'লে তোমার আজই ত যাওয়া উচিত···"

কালকের পার্টি থেকে অব্যাহতি পাইয়াছি দেখিয়া যেন বাঁচিলেন উনি। মহীয়সী রমণী, ওঁর সহানুভূতির স্পর্শে আমার সমস্ত মন ওঁর চরণে যেন লুটাইয়া পড়িল।

মিষ্টার রায় শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। কয়েকটা প্রশ্নও করিলেন, "বাড়ী থেকে মানে,—চন্দননগর থেকে?—না, তোমাদের সেই···"

বলিলাম, "আজ্ঞে না, চন্দননগর আমার বন্ধুর বাড়ী, টেলিগ্রাম এসেছে পশ্চিমে আমাদের বাড়ী থেকে।"

"Hope it is nothing serious? (আশা করি কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়?)

বলিলাম, "বোধ হয় নয়। প্রায় বছর-খানেক যাই নি, কয়েক বার যেতে লিখেছিলেনও···"

"কবে যাচ্ছ?"

বলিলাম, "আজই রাত্রের গাড়ীতে যাব ভাবছি।"

মিষ্টার রায় একটু অধীরতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "How unfortunate! কাল মীরার উপলক্ষে পার্টি, আর······"

অন্যমনস্ক ধাতের মানুষ, এক এক সময় আবার খুবই অন্যমনস্ক থাকেন। একেবারে মোক্ষম স্থানটিতে আসিয়া তাঁহার হুঁস হইল। চুপ করিয়া গেলেন।

"I see, I see; বেশ, তা যাবে।" বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

বাকি থাকে মীরা। দেখা করিব কি না স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ সমস্ত দিন বাহির হয় নাই।

যাত্রার প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পূর্বে মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। চোরের মত অনেকক্ষণ দরজার পাশে অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন কি?"

. সেকেণ্ড দুই তিন বিলম্ব করিয়া উত্তর হইল—"আসুন।"

মীরা বিছানায় নিশ্চয় শুইয়া ছিল। বোধ হয় নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া পাশের শোফায় নামিয়া বসিতে

যাইবে, তাহার পূর্বেই আমি প্রবেশ করায় হইয়া উঠিল না ; বিছানাতেই বসিয়া রহিল।

কিন্তু এ মীরা নাকি? চোখের কোলে কালি, মুখটা লম্বা হইয়া গিয়াছে যেন। একটা শ্রান্ত, আচ্ছন্ন উৎকণ্ঠিত ভাবের সঙ্গে আমার মুখের পানে চাহিল।

বলিলাম, "বাড়ী থেকে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল······"

মীরা খুব দূর থেকে যেন আওয়াজ টানিয়া আনিয়া বলিল, "বাবাকে, মাকে বুঝিয়েছেন ঐ কথা,—আমাকেও?······"

আর বলিতে পারিল না। বুকে অসহ্য বেদনা হইলে যেমন একটা অব্যক্ত আওয়াজ হয় সেই রকম একটা আওয়াজ করিয়া থামিয়া গেল ; এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন মুষড়াইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পর কান্না। সে-রকম নীরবে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে আমি আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে শুধু দ্রুতনিস্বৃত ফোঁপানির শব্দ, সমস্ত শরীরটা থর থরিয়া উঠিতেছে; একটা নিরুদ্ধ ঢেউ যেন তাহার দেহ-সরসীর চারি তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি রচনা শুনাইতেছি না, যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতেছি,—আমি সংযত থাকিতে পারি নাই। দু-দিন পরে মীরার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদের কথা, মীরার অভিনব সম্বন্ধের কথা, কি উচিত, কি অনুচিত—এসব কিছুই ভাবিয়া দেখিতে পারি নাই। তখন শুধু একটি অনুভূতি মাত্র ছিল—মীরার বুকে আমার বুকে একই বেদনা।...আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মীরার পিঠে দক্ষিণ হাতটা রাখিয়া ডাকিলাম—"মীরা!"

শুধু কান্নার আওয়াজ আরও উদ্গত হইয়া উঠিল।

আমার মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল ; কয়েকটা মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা গোটা জীবনের স্বপ্ন যেন একসঙ্গেই ভাঙা-গড়া দুইই হইয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত শোক যথাসাধ্য দমন করিয়া মুখটা আরও নামাইয়া বলিলাম—"মীরা, কেঁদ না। আমি তোমায় সুখী করতে পারতাম না, কিন্তু আমি দুর্বল, মন স্থির ক'রে উঠতে পারছিলাম না ; এই ঠিক হয়েছে।"

মীরা তেমনি উবু হইয়াই ক্রন্দনের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলিল—"না, না, এই ক'রেই আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, আর বলবেন না······আমি নিজেকে ঠিক ক'রে ধরতে পারি নি আপনার সামনে, কিন্তু আপনি কেন চিনে নিলেন না?······বাইরে যা পেলেন সত্যিই কি মীরা তাই?—বলুন······আমার সর্বনাশের মধ্যে থেকে আমায় কেন জোর ক'রে টেনে নিলেন না?······কেন?···আমি কি এটুকুও আপনার কাছে আশা ক'রতে পারতাম না? · বলুন···বলুন···" সেদিনকার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে, ভুলি নাই। মীরা আর কিছু বলিতে পারে নাই।

(১৫)

বাড়ী চলিয়া আসিবার প্রায় মাসখানেক পরে অনিলের একখানি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে—

"এত দিন সদুর একটা উৎকট শপথ দেওয়া ছিল ব'লে তোকে পত্র দিই নি। আজ সেই শপথের সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তোকে লিখতে বসলাম।

সৌদামিনী মরেছে। মরে তোকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছে, সমাজকে করেছে নিরুপদ্রব, ভাগবতকে করেছে নিরাশ।

আমাদের পক্ষে সৌদামিনী মরলই বইকি, এ-লোক ছেড়ে সে এখন সিনেমা-লোকের জীব। এই মরা-সদু এক দিন সিনেমা ষ্টার হ'য়ে জ্যোতির্লোকে ফুটে উঠবে। সবাই থাকবে বিস্ময়ে চেয়ে। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে ওর কম্পমান দীপ্তি ঠিকরে প'ড়বে দেশের যত যুবার হা-হুতাশভরা দৃষ্টির ওপর। ওর আলোকরশ্মিতে নীল রঙের ঈর্ষ্যা ফুটে উঠবে কুললললনার চক্ষে। ও একদিন দেবে দীপ্তিহীন ক'রে কবিকে, কর্মীকে, জ্ঞানগরীয়ানকে ; ধূমকেতু যেমন নিজের দীপ্তি দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ম্লান ক'রে তোলে। সদু হবে জ্যোতিষ্ক, উপায় নেই। রূপ আর প্রতিভার আলো নিয়ে যে ওর জন্ম। কিন্তু সদু সেই জ্যোতিষ্ক হবে, যে-জ্যোতিষ্ক ধূমকেতু, এরও উপায় নেই আর। কেন না ধূমকেতুর ইতিহাস আর সদুর ইতিহাস একই—অর্থাৎ সমাজ ওদের কোল দেয় নি। নিজের নিজের অসহ্য আলোকের জ্বালা নিয়ে ওরা দিকে দিকে আগুন লাগিয়ে বেড়াবেই।

অথচ এই সদু এক দিন হ'তে পারত গৃহস্থ-গৃহের তুলসী-মঞ্চের প্রদীপটি। ওর আলোয় এক দিকে ফুটে উঠত ধর্ম, এক দিকে ফুটে উঠত সংসার। ও ক'রত সৃষ্টি, আর সেবা শ্রী আর কল্যাণের মধ্যে দিয়ে ও সেই সৃষ্টির ওপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ নামিয়ে আনত। এই ছিল ওর মিশন, এই ছিল ওর সাধ। জলহীন তৃষ্ণার মত ওর এই সাধ প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।···মনে আছে শৈল সেইদিনকার কথা?—দুপুরে আমরা দু-জনে

শুয়ে আছি ঘরে, সদু এল অম্বুরীর কাছে; মেয়েটাকে নিয়ে সেই আকুলি-বিকুলির কথা মনে আছে? আমি ত ভুলব না কখন। যতই দিন যাচ্ছিল, সদু যতই বুঝতে পারছিল ওর সৃজনীসত্তার দুর্বল হ'য়ে আসছে, ততই ওর এই রচনা করবার পিপাসা উগ্র হ'য়ে আসছিল। কেন হবে না?—নিতান্ত কুরূপারও যদি হয় ত সদুর হবে না কেন? ঘেঁটুরও যদি সাধ হয় ফুল ফোটাবার ত কমললতার বেলাই হবে যত দোষ?

সদু ওর স্বামীকে—জীবনের সব রকম সফলতার প্রতিবন্ধককে—এক দিনের জন্যেও ভালবাসে নি। ভেতরে ভেতরে ছিল ঘৃণা, ওপরে ওপরে ছিল ঔদাসীন্য,—এমন একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য যা ভেদ ক'রে কারুর নজর ওর নিদারুণ ঘৃণার স্তরে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু আমি জানতাম ওর ঘৃণা, ওর অধৈর্য দিন-দিন কতই না উৎকট হ'য়ে উঠছিল, কেন না আমার মনের বিদ্রোহের একটা সাড়া পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে।...তার পর ওর এল মুক্তি, যা এক দিন আসবেই ব'লে ওর একমাত্র ভরসা ছিল জীবনে। শৈল, দূরেই হোক বা অদূরেই হোক ভবিষ্যৎ জীবনে একটা আলোর-রেখা না থাকলে আমরা কেউ-ই বাঁচি না,—যাকে বলা চলে একটা ফিউচার প্রসপেক্ট। সদুর এই রকম একটা ফিউচার প্রস্‌পেক্ট ছিল,—অর্থাৎ স্বামী ব'লে যে অস্থিচর্মের বেড়াটা ভাগবত ওর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেটা এক দিন খ'সে প'ড়বেই। ওর তখন হবে মুক্তি। খ'সল বেড়া, এল মুক্তি; শুধু তাই নয়, সদু যা কখনও বোধ হয় কল্পনার মধ্যে আনতে পারে নি, ওর এই মহামুক্তির সঙ্গে তাও এসে দাঁড়াল সামনে,—অর্থাৎ তুই এলি।

গত এই দুই মাসের মধ্যে অন্ততঃ একটা মাস ধ'রে আমি একটা জিনিস দেখেছিলাম শৈল,—অপূর্ব একটা জিনিস—একটা স্ফুটমান শতদল। তোকে পাবে এই বিশ্বাসে সদু দিন-দিন যে কী অপরূপ হ'য়ে উঠছিল, যে না দেখেছে, যার চোখ নেই তাকে বোঝান যায় না। ও খুব চাপা মেয়ে, অর্থাৎ মনের প্রধান চিন্তাটাকে ও বেশ ওর মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে ঢেকে রাখতে পারে; কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতাম—কেন্দ্রগত মধুর চারি দিকে শতদল-কমলের পাপড়ি একটি একটি ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠছে; সদু তার আনন্দলোকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

তার পর প্রতিদিনের আশাভঙ্গের পর এল শ্রান্তি। তোর আসা নেই, চিঠি নেই, কোন খবর নেই। দেখছি সেই শতদলের রক্তাভা ম্লান হ'য়ে আসছে, পাপড়ি আসছে যেন কুঁকড়ে। তোকে ইঙ্গিত দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। পেয়েছিলি কি না জানি না, আমি কোন উত্তর পাই নি। ঠিক করলাম—কলকাতায় যাব তোর কাছে। একটা যে ক'রব কিছু এইটুকু সন্দেহের ওপরই নির্ভর ক'রে সদু এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করলে। প্রসঙ্গটা আমাকে দিয়েই তোলালে পাকেচক্রে। তার পর হঠাৎ উৎকট শপথ দিয়ে আমার চিঠি দেওয়া, যাওয়া সব কিছুরই পথ বন্ধ ক'রে দিলে।

কিন্তু তার পরেও রইল প্রতীক্ষা ক'রে শুধু আরও সঙ্গোপনে। সে যে আরও কত করুণ দৃশ্য শৈল,—নিজের অভিমানের কাছেও হার মেনে আবার পথের পানে দৃষ্টি ফেলে রাখা!

তার পর টের পেলাম তুই পশ্চিমে চলে গেছিস্। লিওসে ক্রিসেণ্টের আরও সব কথা টের পেলাম।

শৈল, তোকেই বা কি ক'রে দোষ দেব? জানি প্রেম অসপত্ন,—তার সামনে সমাজ নেই, উপকার নেই, এমন কি ধর্মও নেই; সে স্বরাট্। নিজের কেতন উড়িয়েই চলে, আর সবকেই দলিত ক'রে। জানি মীরাকে পাওয়া আর না-পাওয়া এই দুইয়ের সামনেই সদুর উপকার করা তোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বরং—অদ্ভুত শোনালেও—এটা খুব সত্য যে মীরা যতক্ষণ তোর সামনে ছিল ততক্ষণ মান-অভিমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সদুর উপকারের কথা ভাবতে পারতিস—সেই জন্যেই দিয়েছিলি আশা—এখন তোর মীরাহীন জগতে সবই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। জানি যখন একথা, তখন তোকে না ক্ষমা ক'রে উপায় কি?

তবুও মনে হচ্ছে—আমি কি হারালাম, তুই কি হারালি, সমাজ কতটা বঞ্চিত হ'ল। অসহ্য বেদনায় মনটা টন্‌টনিয়ে ওঠে যখন ভাবি—সদুর নাচে, গানে, অভিনয়ে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ হাততালির চোটে ভেঙে পড়ছে, সদুর রূপের ওপর শত শত দৃষ্টি লালসার ক্লেদ নিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ছে, স্থানে-অস্থানে সদুর নানা ভঙ্গিমার ছবি পথিকের পথবিভ্রম ঘটাচ্ছে, ছোট বড় সব কাগজগুলো সদুর অভিনয় ভাঙিয়ে সস্তা পয়সা লুটতে মেতে উঠেছে।—আমাদের ছেলেবেলার সেই এত আদরের সদুর!

খুকীর ভাত হবে আসছে সোমবার, আসবি না জেনেও নেমন্তন্ন দেওয়া রইল। খোকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বলতে এসেছে ভাতের পরেই নিশ্চিন্দি হ'য়ে খুকীর বিয়ে দিয়ে দিতে; ও তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে খুকীকে শ্বশুরবাড়ী দিয়ে আসবে।

বললাম, "তা হ'লে ত মস্তবড় একটা ভাবনা যায়, সান্নু।"

অম্বুরী দু-জনকেই খোঁচা দিলে, বললে—"তা না হ'লে আর বলে পুরুষ মানুষ সেয়ানা জাত!—বোনের ভাতটি মুখে দেওয়ার কথা হ'য়েছে কি বাপ-বেটায় তাকে বিদেয় করবার পরামর্শ আরম্ভ হ'ল।"

অম্বুরী হাসছে, যোগ দিতে পারলাম না কিন্তু।—সত্যিই ত মেয়ে হ'লেই নিত্য বিদায়ের চিন্তা,—বাড়ী থেকে, কাউকে সমাজ থেকে, কাউকে একেবারে ধর্ম থেকে। কোথাও না হয় সুখের বিদায় মালাচন্দনে, কোথাও আবার ললাটে গ্লানির প্রলেপ দিয়ে। বিদায়ের অশ্রু নিয়েই ওদের জন্ম।"

* * * *

এই আমার ঘৃণায়-মেশান ভালবাসা। এরই মধ্যে অপর দিক থেকে সৌদামিনী আসিয়া আমায় দিতে চাহিয়াছিল খাঁটি সোনা। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার অপরাধের কথাটা স্বীকার করিয়া রাখিলাম। লইতে পারি নাই, তাহার কারণ ভালবাসার নি-খাদ সোনা নি-খাদ সোনা দিয়াই লইতে হয়। আমার সুবর্ণ আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল—মীরাকে। এ অদ্ভুত দান-প্রতিদানকে কোন্ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন?—তাঁহাকে কোটি নমস্কার।

ঘৃণায়-মেশান এই আমার ভালবাসা। অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে?—আমারও হয় এক এক সময় সন্দেহ—এত বিরুদ্ধ দুইটি জিনিস সত্যই কি জীবনে এক দিন হাত-ধরাধরি করিয়া আসিয়াছিল?

সন্দেহ হইলে আমার দক্ষিণ হস্তের অনামিকার পানে চাহিয়া দেখি।—

বহুদিন পরে আমি অনামধেয়া এক কাহারও নিকট হইতে একটি চিঠি পাই। রেজেষ্টারী করা; খাম খুলিয়া দেখি ভিতরে কাগজে-মোড়া একটি নীলা পাথর। চিঠি বলিয়া বিশেষ কিছু নাই, ছোট্ট একটি কাগজের টুকরায় লেখা—"এইটি বাঁধিয়ে পোরো।"

আংটি করিয়া অনামিকায় ধারণ করিয়াছি। যখনই সন্দেহ হয়, এই বিষের রং-মেশান হীরার দিকে চাই,—মনে পড়ে, সত্যই এক দিন ঘৃণার সঙ্গে মেশান ভালবাসা পাইয়াছিলাম,—এই হীরার মতই নীল, এই হীরার মতই খাঁটি।

সমাপ্ত

নেপালের ধর্ম্মোৎসব

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" ব'লে একটি কথা প্রচলিত আছে। নেপালের প্রসঙ্গে এই প্রবচনটির প্রয়োগ করতে হ'লে কিন্তু "বার মাসে ছাব্বিশ পার্ব্বণ" বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ, ওদেশে কোন-না-কোন পার্ব্বণ বা ধর্ম্মোৎসব থাকেই বৎসরের যে কোন দিনে। সেই কারণেই নেপালে দেবদেবীর বিগ্রহের সংখ্যা মানবসংখ্যা অপেক্ষা ও দেবালয়ের সংখ্যা লোকালয়ের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ব'লে একটি অত্যুক্তির প্রচলন আছে। সেই সমস্ত পাল-পার্ব্বণের অথবা দেবদেবীর বিস্তৃত বর্ণনা করার এখানে স্থানাভাব। নেপালের কতকগুলি অন্যতম ধর্ম্মোৎসবের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

চৈত্রের শেষে অথবা বৈশাখের প্রারম্ভেই নেপালের অধিদেবতা মীননাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা আরম্ভ হয়। নেপালী বৌদ্ধরা মচ্ছেন্দ্রনাথকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। যদিও মচ্ছেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ারদিগের উপাস্য দেবতা, তথাপি এই ধর্ম্মোৎসবে হিন্দুদেরও উৎসাহ অল্প নয়। বস্তুতঃ, হিন্দু পার্ব্বণ রামনবমীর দিন যে বোধিসত্ত্বের অবতার মচ্ছেন্দ্রনাথের পূজারম্ভ হয়, এর মধ্যেও কার্য্য-কারণের যোগাযোগ নির্ণয় করা যায়। কারণ, রামচন্দ্র ও গৌতম বুদ্ধ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। বাংলার শূন্যপুরাণ ও নানা ধর্ম্মমঙ্গলে গোরক্ষ, মীননাথ প্রভৃতির উল্লেখ ও অমরপটলে মীন-গোরক্ষ সংবাদের বর্ণনা আছে। গোরক্ষনাথ ছিলেন এক জন বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য। তিব্বতের খ্যাতনামা লামা সুম্পোখাম্পো লিখিত প্যাগ-সোম-সন্-সাং নামক গ্রন্থপাঠে

বিষ্ণুমন্দির, পাটন

অবগত হওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গোরক্ষনাথের বহু শিষ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে শৈব হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। কালক্রমে গোরক্ষনাথের প্রতি তাঁদের সেই পূর্ব্বলালিত ভক্তিভাবের হ্রাস ত হয়ই নি, বরং পুরুষানুক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভই করেছে। গোরক্ষনাথ বর্ত্তমান গোর্খাজাতির উপাস্য দেবতা ও গোরক্ষনাথ বা গোরখনাথ থেকেই গোর্খা নামের উৎপত্তি। মচ্ছেন্দ্রনাথ ছিলেন গোরক্ষনাথের গুরু। তাঁর পূজা কিরূপে নেপালে প্রবর্ত্তিত হ'ল সে বিষয়ে একটি কিম্বদন্তী আছে। বহুকাল পূর্ব্বে গোরক্ষনাথ একদা ভ্রাম্যমাণ পরিব্রাজকরূপে নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থনা না করার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নবনাগকে বন্দী করেন ও পরে তাদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দেওপাটন নগরের দক্ষিণে একটি পর্ব্বতোপরি দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সুগভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। নাগদের বন্দী করার ফলে ভীষণ অনাবৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন নেপালের দুর্ভিক্ষপীড়িত ও অনুতপ্ত অধিবাসীরা তাঁর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাতে সাহস না ক'রে এক উপায় স্থির করলেন। ভাদ-গাঁওয়ের রাজা নরেন্দ্রদেব ও তাঁর গুরুর নেতৃত্বে তাঁরা গোরক্ষনাথের কামরূপ-নিবাসী গুরু মচ্ছেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলেন। তাদের বহু বিনয় বচনে তুষ্ট হয়ে অবশেষে মচ্ছেন্দ্রনাথ মক্ষিকা রূপ গ্রহণ করে একটি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন ও রাজা নরেন্দ্রদেব ও তাঁর গুরু সেই কলসটি বহন ক'রে নেপালে আনয়ন করলেন। তখন গোরক্ষনাথ অবিলম্বে নাগদের মুক্তি দিয়ে মচ্ছেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। অজস্র ধারাবর্ষণের ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে নেপাল পুনরায় শস্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

অতঃপর মচ্ছেন্দ্রনাথ নেপাল ত্যাগ করলেন ও রাজা নরেন্দ্রদেব এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথের বাৎসরিক পূজার প্রবর্ত্তন করলেন।

নেপালে এই উৎসবকে 'মচ্ছেন্দ্রযাত্রা' নামে অভিহিত করা হয়। একটি 'যাত্রা' হয় নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে ও অপরটি হয় পাটনে। প্রথমোক্তটিকে বলা হয় 'শ্বেত মচ্ছেন্দ্র' ও শেষোক্তটিকে 'রত' বা 'রক্ত মচ্ছেন্দ্র'। মচ্ছেন্দ্রনাথের একটি মন্দির কাঠমণ্ডু শহরে ও অপরটি পাটনের অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে। সমারোহ ও আমোদ-প্রমোদ অধিক হয় পাটনের উৎসবে। এই উৎসবের তিনটি অঙ্গ। প্রথমতঃ, মচ্ছেন্দ্রনাথের স্নানযাত্রা, দ্বিতীয়তঃ রথযাত্রা, তৃতীয়তঃ, "গুড্রিযাত্রা" বা "ভোটোযাত্রা"। মচ্ছেন্দ্রনাথের বিগ্রহকে একটি নির্দ্দিষ্ট পবিত্র বৃক্ষতলে আনয়ন ক'রে প্রথমে স্নান ও পরে রাজার তরবারি পদতলে রেখে তাঁর পূজা করা হয়। তার পর তাঁর প্রসাধন ও বেশ সমাপন

দোললীলার 'চাঁড়'। পশ্চাতে একটি মন্দির

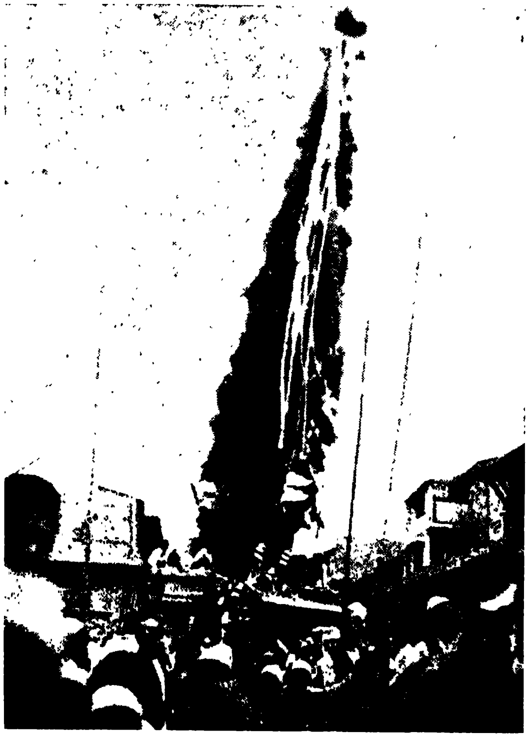

মচ্ছেন্দ্রনাথের রথযাত্রা

হ'লে, একটি পত্রপুষ্পশোভিত সু-উচ্চ রথে স্থাপন ক'রে তাঁকে নগর প্রদক্ষিণ করান হয় ও সর্ব্বশেষে পাটনের অন্তর্গত জাওলাখেল নামক স্থানে বিশ্রামের পর তাঁর "ভোটো" অর্থাৎ অঙ্গরাখা উন্মোচন ক'রে সমবেত জনতার সমক্ষে প্রদর্শিত হয়। ঐদিন সাধারণতঃ নেপালে বৃষ্টি হয়; অন্ততঃ নেপালের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেরই এই বিশ্বাস। উৎসবের তিনটি অঙ্গের মধ্যে মধ্যম অঙ্গ অর্থাৎ রথযাত্রাই বহুদিবস স্থায়ী হয়। কারণ সুসজ্জিত রথটি পাটনের প্রায় সমুদয় প্রধান রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করে। বৃক্ষশাখাপত্রশোভিত রথের চূড়াটি এরূপ উচ্চ হয় যে তজ্জন্য শহরের বৈদ্যুতিক তারগুলি সাময়িকভাবে কেটে দিতে হয়। উৎসবের কয়দিন হিন্দু, বৌদ্ধ, গোর্খা, নেওয়ার নির্ব্বিশেষে সকল নেপালীই আনন্দে ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে; পাটনের রাজপথগুলি জনসমাকীর্ণ হয় ও নেপালের বিশিষ্ট রাজপুরুষরাও এই আনন্দে যোগদান করেন। নেওয়ারদের 'দেওয়ালী' অর্থাৎ গৃহদেবতার পূজা ও তদুপলক্ষ্যে ভোজও এই সময় চলতে থাকে। বলা বাহুল্য, সমস্ত উৎসবটি সমাপ্ত হ'তে দু-মাসেরও অধিক সময় লাগে।

নেপালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ধর্ম্মোৎসবের নাম "গাই-যাত্রা"। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ প্রতিপদের দিন এই পর্ব্বের সুরু ও জন্মাষ্টমীর দিন এর সমাপ্তি। গাই-যাত্রা যদিও হিন্দুদের পর্ব্ব, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে যোগদান ও একযোগে আনন্দ উপভোগ করেন। এই কয়দিন নেপালীরা সমস্ত দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বিস্মৃত হয়ে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠেন ও ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচের প্রভেদ ভুলে যান।

উৎসবের প্রথম দিনটিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন দলে দলে লোক গরুর বিচিত্র মুখোসে স্বরূপ গোপন ক'রে গরুর ভাব-ভঙ্গী অনুকরণ ক'রে পথে পথে ভ্রমণ করে। সেই সব মুখোসে ঠিক গরুর মতই শিং থাকে ও সেই শিঙে জড়িত থাকে নানা প্রকারের ঘাস ও পাতা। গত এক বৎসরের মধ্যে যে সকল পরিবারে কারও মৃত্যু হয়েছে, সেই রকম প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে এক জন 'গাই'বেশী ব্যক্তি, এক জন গায়ক ও এক জন বাদক মৃত ব্যক্তির কীর্ত্তিগাথা গান করে। এরা নেপালের মহারাজাধিরাজ, মহারাজা ও অন্যতম রাজ-পুরুষদের বাড়ীতে গিয়েও গীতবাদ্যাদি করে ও তাঁরাও তাদের পুরস্কৃত ক'রে উৎসাহ দান করেন। এই সকল ছদ্মবেশী ব্যক্তিরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পথে চলতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে দেখা যায় হয়ত গোপী ও গোপিনীরা সত্যই গরু নিয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা; তার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছেন বিভিন্ন দেবদেবী, রাজা-রাণী, রাক্ষস-রাক্ষসী, সাধু-সন্ন্যাসী, সৈন্য-সামন্ত; যেমন অপরূপ তাদের ছদ্মবেশ, তেমনি বিচিত্র তাদের কৌতুকাভিনয়। প্রায় প্রত্যেক 'টোলে' (রাস্তার চৌমাথায়) একটি কাষ্ঠদণ্ডের অথবা থামের ওপর "ভক্কু" বা ভৈরবের কাষ্ঠ অথবা ধাতুনির্ম্মিত ভীষণ দর্শন মুখোস সংলগ্ন থাকে। মুখোসের ঠিক নিম্নে থাকে জালার মত একটি বৃহদাকার পাত্র। ভক্কুরা মাঝে মাঝে ভৈরবের মুখে 'রক্সি' অর্থাৎ নেপালী সুরা ঢেলে দেয়। জালার গায়ে ছিদ্রপথে একটি নল সংলগ্ন থাকে ও সেই নলের মুখ বন্ধ থাকে ছিপি দিয়ে। পথযাত্রীরা ইচ্ছামত সেই ছিপি খুলে রক্সি পান করে। গাই-যাত্রার সঙ্গে ভৈরবের এই যোগাযোগ ঠিক্ কি ভাবে হ'ল জানি না, কিন্তু তন্ত্রের প্রভাবে যে হয়েছে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। এই উৎসবের দেবতা নেপালের অন্তর্গত হলচোকের

অধিষ্ঠাতা "ভক্কু" বা ভৈরব। এই সময় তাঁর উদ্দেশে 'রাঙ্গা' বা মহিষ উৎসর্গ করা ও বলি দেওয়া হয়। এই বলিদান এক বীভৎস ব্যাপার। হলচোকের বাসিন্দা এক জন বলিষ্ঠ নেওয়ার মুখে একটি বিকট-দর্শন মুখোস ও কোমর থেকে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত লম্বিত একটি গাঢ় লাল বর্ণের ঘাঘরার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দীর্ঘ কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করতে করতে হাতে একটি তীক্ষ্ণধার খড়্গ ধারণ ক'রে মৃদঙ্গ ও করতালের তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করতে করতে প্রথমে 'হনুমান ধোকা'র অর্থাৎ কাঠমণ্ডুর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়। অত্যধিক সুরাপানের ফলে তখন সে ভীষণ উত্তেজিত। ভৈরবের নামে উৎসৃষ্ট মহিষটির সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অতি ক্ষিপ্র হস্তে নৃশংসভাবে সে তাকে হত্যা করে। অতঃপর সেখান থেকে সে যায় নেপালের মহারাজাধিরাজের আধুনিক প্রাসাদে। সেখানেও পূর্ব্বোক্তরূপে সে আর একটি মহিষকে হত্যা করে। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজপুরুষ দর্শকরূপে সেখানে সমাগত হন। এইরূপ জীবহত্যা প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলে, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গৃহে গৃহে। ভৈরবের প্রসঙ্গে ভাদগাঁওয়ের ভৈরব-যাত্রা উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবের সময়েও যথেষ্ট সমারোহ হয় ও শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য পথে বিপুল জনসমাগম হয়। গাই-যাত্রার কয়দিন ভীষণ-দর্শন দৈত্যরাজ কংসের উৎপাতে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে; অবশেষে জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে ধরায় জন্মগ্রহণ করার পর এক বৎসরের মত কংসের লীলা ও রাজত্ব শেষ হয়।

জন্মাষ্টমীকে নেপালে কৃষ্ণাষ্টমী বলে। আমাদের দেশের জন্মাষ্টমীর সঙ্গে কিন্তু কৃষ্ণাষ্টমীর প্রভেদ আছে। ঐ দিন উপবাস, জাগরণ ও কৃষ্ণের ভজন হয়। বিষ্ণু-মন্দিরে পূজারতি হয় ও রাত্রে দীপাবলির আলোকে মন্দির আলোকিত করা হয়। দর্শকরা মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ করেন; সে জন্য জনসমাগমও হয় খুব।

গোর্খারা 'গাই' বা গরুকে অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে দেখেন। তাঁদের ধর্ম্মে গরুর স্থান অতি উচ্চে। বস্তুতঃ, 'গোর্খা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই 'গো-রক্ষক'। কেবল ইহলোকেই নয়, মানবের পরলোকেও গরুর মঙ্গল করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। নেপালী হিন্দুদের বিশ্বাস ইহলৌকিক জীবনের অবসানের পর মানবাত্মা মরজগতের চারিধারে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাকে। পবিত্র গাই-যাত্রার দিন যদি মৃতের নিকটাত্মীয়রা তার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট

ইন্দ্রযাত্রার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান. "লিঙ্গোত্তোলন"

গাইকে সঙ্গে ক'রে মৃতের পরিচিত ব্যক্তিদের বাড়ী বাড়ী পরিভ্রমণ করে ও যথারীতি পূজাদির পর সেই গাই ব্রাহ্মণকে দান করে, তবেই সেই মৃতের আত্মা বৈতরণী পার হয়ে যমপুরীতে উত্তীর্ণ হ'তে পারে; অন্যথায় নয়।

গরুর প্রতি এ রকম অলৌকিক ক্ষমতা কেন আরোপিত হ'ল, সে বিষয়ে একটি বেশ কিম্বদন্তী আছে। শ্রীকৃষ্ণ এক দিন যখন গোচারণ করছিলেন, সেই সময় কতকগুলি দেহমুক্ত মানবাত্মার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিনি ধর্ম্মরাজের রাজ্যে তাঁদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে তাঁরা রাখালের আকৃতি প্রাপ্ত হলেন ও গরুর লাঙ্গুল ধারণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈতরণী পার হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভাবিত দর্শনলাভে ধর্ম্মরাজ আনন্দে এমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি সেই মানবাত্মাগুলির সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলেন। তদবধি মানবাত্মার মুক্তিদাত্রীরূপে গাইর পূজাও প্রচলন হ'ল।

কিন্তু কালক্রমে আর্থিক অসাচ্ছল্যবশতঃ মৃতের দরিদ্র

গাই-যাত্রার "গাই"

আত্মীয়গণের পক্ষে ব্রাহ্মণকে গাই দান করা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন গাই দানের প্রথা লুপ্ত হয়ে ক্রমশঃ এই নূতন রীতির প্রচলন হ'ল যে গাইর অনুকল্প প্রতিনিধি হিসাবে গাইর ছদ্মবেশে মানবই মৃতের কীর্ত্তিগাথা গান ক'রে মৃতের পরিচিত ব্যক্তিদের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করবে। এইরূপে যে পর্ব্বের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়েছিল শোকের মধ্য দিয়ে, নানা বিবর্ত্তনের পর তাই আজ এমন আনন্দময় একটি ধর্ম্মোৎসবে পরিণতি লাভ করেছে যা থেকে গীত, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়, ক্রীড়া, কৌতুক বাদ দেওয়াই চলে না।

ভাদ্র মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশীতে নেপালে আর একটি ধর্ম্মোৎসব স-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়; তার নাম 'ইন্দ্রযাত্রা' বা 'কুমারীযাত্রা'। প্রকৃত উৎসবটি হয় এক দিন, কিন্তু উৎসবের আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদ চলে আট দিন। যদিও এটি মূলতঃ নেওয়ারদেরই উৎসব, তা হ'লেও বর্ত্তমান কালে নেপালের হিন্দু, বৌদ্ধ, নেওয়ার ও গোর্খা সম্প্রদায়ের আপামর জনসাধারণ সকলেই এই উৎসবে যোগদান করে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পূজাই ছিল নেওয়ারদের উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই উৎসবের সময় নেওয়াররা আনন্দপ্রবাহে ভাসতে থাকত। উৎসবের ক'দিন বিধিবিরুদ্ধ কোন প্রকার বাচালতা বা উচ্ছৃঙ্খলতাই নিন্দনীয় বলে গণ্য হ'ত না। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দের এমনই একটি উৎসব-রজনীতে যখন নেওয়াররা সকলেই সুরাপানে মত্ত অপ্রকৃতিস্থ, সেই সময় বর্ত্তমান গোর্খা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ তাদের অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে প্রায় বিনা যুদ্ধেই নেপাল জয় ক'রে সেখানে গোর্খা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তদবধি গোর্খা রাজবংশ কর্ত্তৃক নেপাল জয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসব রূপেই ইন্দ্রযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উৎসবের প্রথম দিন সকালে পূর্ব্বোক্ত "হনুমান ধোকা'র প্রাঙ্গণে একটি বড় বাঁশকে স-সমারোহে প্রোথিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলে 'লিঙ্গোত্তোলন'। এই সময় কোন কোন ব্যক্তি অভিনব মুখোসে সজ্জিত হয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করতে থাকে। উৎসবের তৃতীয় দিনটিই বিশেষ সমারোহ ও আনন্দের দিন। ঐ দিন কাঠমণ্ডুতে বিরাট্ শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন রথারূঢ়া কুমারী ও তাঁর দুই পার্শ্বে দুই দ্বারপাল গণেশ ও ভৈরব। এঁদের কোনটিই মৃণ্ময় মূর্ত্তি নয়; রক্তমাংসে গঠিত মানবমূর্ত্তি এঁদের। এই কিশোরী কুমারীটিকে দেবী কুমারী রূপে জ্ঞান ও তদনুযায়ী ভক্তি করা হয়। দেবী কুমারী অষ্টমাতৃকার এক জন। নির্ব্বিচারে যে কোন বালিকা কুমারী হ'তে পারে না। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ঘরের মেয়েদের মধ্য থেকে বিধিমত লক্ষণ বিচার ক'রে কুমারী নির্ব্বাচন করা হয়। নির্ব্বাচনের পর কুমারীর সঙ্গে তাঁর পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কুমারীকে হনুমান ধোকার অদূরবর্ত্তী একটি নির্দ্দিষ্ট সরকারী গৃহে পর্দ্দার অন্তরালে সরকারী ধাত্রীর সাক্ষাৎ তদারকে সযত্নে রাখা হয়। তার

নেপালের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীশ্রীশ্রী যোদ্ধাশামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা (× চিহ্নিত) পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রযাত্রার অনুবর্ত্তন করছেন

ভৈরবযাত্রা, ভাদগাঁও

সালঙ্কারা ও সুসজ্জিতা 'কুমারী'

বুড়া নীলকণ্ঠ

মঙ্গলামঙ্গলের সকল দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন ও তার আজীবন গ্রাসাচ্ছাদনেরও সরকারী ব্যবস্থা হয়। যত দিন পর্যন্ত সেই কুমারী রজস্বলা না হয়, তত দিন এই ব্যবস্থা চলে। তার পর নূতন কুমারী নির্ব্বাচন হয় ও পূর্ব্বতনা কুমারীর নামে বিস্তৃত জাগীর লেখাপড়া ক'রে দেওয়া হয় যাতে সে তার অবশিষ্ট জীবন স্বাধীন ভাবে ও শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারে। এই সব "কুমারী"দের সাধারণতঃ চিরকুমারীই থাকতে হয়। কারণ, এককালে যে দেবীরূপে দেশের রাজা মহারাজা থেকে আপামর জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেরই পূজা পায়, পরবর্ত্তী জীবনে তাকে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করতে সচরাচর কোন যুবকই অগ্রসর হয় না। দেবী কুমারীর দ্বারপাল দুটিও অনুরূপ লক্ষণ বিচারের পর নির্ব্বাচিত হয় নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি "বান্‌রা" বংশের কিশোরদের মধ্য থেকে।

কুমারী-যাত্রার প্রচলন কি ক'রে হ'ল তার এক চিত্তাকর্ষক কিম্বদন্তী আছে। অনুমান ১৭৪০-৫০ খ্রীঃ অব্দে মল্লরাজ জয়প্রকাশ মল্লের রাজত্বকালে একদা "বান্‌রা" বংশীয়া একটি সপ্তবর্ষীয়া বালিকা অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় অদ্ভুত আচরণ করতে ও প্রলাপ উচ্চারণ করতে থাকে। তদবস্থায় সে প্রকাশ করে যে সে স্বয়ং দেবী কুমারী। এই সংবাদ রাজার গোচর হ'লে সে মিথ্যা অভিনয় ক'রে সকলকে প্রবঞ্চনা করছে মনে ক'রে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ও তার বংশের সকলকে নগর থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন ও তাদের বিষয়সম্পত্তি সমস্ত রাজাজ্ঞায় বাজেয়াপ্ত হ'ল। কিন্তু সেই রাত্রেই রাণীরও ঠিক সেই বালিকার ন্যায় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেল ও তিনিও ঠিক তারই ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন। তখন রাজা নিজের ভ্রম বুঝে ভীত ও অনুতপ্ত হয়ে সেই বালিকার নিকট ক্ষমাভিক্ষা ক'রে তাকে ও তার বংশের সকলকে অতি সমাদরে নগরে আনয়ন করলেন ও সেই বালিকাকে সত্যই দেবী কুমারী জ্ঞানে সাড়ম্বরে পূজা করলেন। তদবধি "কুমারী-যাত্রা"র প্রচলন হ'ল।

কুমারী-যাত্রার দিন কুমারী ও তাঁর দুই কিশোর দ্বারপালকে বিবিধ অলঙ্কার ও সাজসজ্জায় ভূষিত করা হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে কুমারীর অপেক্ষাকৃত বড় রথটি ও তার উভয় পার্শ্বে দুই দ্বারপালের দুটি ক্ষুদ্রতর রথ। তিনটি রথকে একত্র দর্শনে সহসা সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলরামের রথের ন্যায় অনুমান হয়। নেপালের মহারাজাধিরাজ, মহামন্ত্রী ও তাঁদের পশ্চাতে নেপালের সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দ ও সৈন্যদল রথ তিনটির অনুবর্ত্তন করেন। কাঠমণ্ডুর প্রধান রাজপথগুলি ঘুরে শোভাযাত্রা হনুমান ধোকায় সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বে প্রায়ই ফিরিতে পারে না। সেখানে একটি বাঁধান সুপরিষ্কৃত নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; সেই স্থানে গদি স্থাপিত হয়। মহারাজাধিরাজ সেই গদিতে উপবিষ্ট হ'লে তাঁর সম্মানের জন্য তোপধ্বনি করা হয় ও সমস্ত রাজকর্ম্মচারীরা সামরিক ভঙ্গীতে তাঁকে অভিবাদন করেন। এই অনুষ্ঠানটি হয় ঠিক সেই সময়ে, যে সময়ে পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল জয় করেছিলেন। কোন অনিবার্য্য কারণে মহারাজাধিরাজ শোভাযাত্রায় যোগদানে অসমর্থ হ'লে গদির উপর তাঁর অনুকল্প প্রতিনিধি রূপে তরবারিকে স্থাপন ক'রে উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

হাঙ্গরমুখী বালা

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

চল্লিশ টাকার স্কুল-মাষ্টারের হয়ত বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু সব সময় অত উচিত-অনুচিতের চুল-চেরা বিচার করিয়া সংসার চলে না।

বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান নিখিলেশকে মায়ের পীড়াপীড়িতে নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু বিবাহের সাত দিনের দিন পুত্রের মাথায় একটি ভারী বোঝা চাপাইয়া মা সুট্ করিয়া অজানা লোকের উদ্দেশে পাড়ি জমাইলেন, ডাক্তার বলিল,—হার্ট-ফেলিয়োর।

তা যাই হোক না কেন, নিখিলেশের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল কিন্তু। এই বিপদে নিখিলেশ একেবারে হাল-ভাঙা নৌকার মত বে-সামাল হইয়া পড়িল; তাহার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন অসহায় এক দিনের জন্যও নিজেকে মনে হয় নাই।

নব-বধূ কিন্তু গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল ইহার মধ্যেই। স্বামীকে নাওয়ান খাওয়ান হইতে সুরু করিয়া বিন্দু গোয়ালিনীর দুধের দাম লইয়া ঝগড়া করা সবই তাহাকে একা করিতে হইল। বেশ শক্ত মেয়ে যা হোক!

...সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। বাইরের ঘরের খাটে নিখিলেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘর অন্ধকার, আলো এখনও জ্বালান হয় নাই। বাইরে তুলসীমূলে আলো দেখাইয়া নব-বধূ আশা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রদীপ-হাতে গলায় আঁচল জড়ানো আশাকে কিন্তু বড় সুন্দর দেখায়! মুখ দেখিয়া তাহাকে বেশ শান্ত সলজ্জ বধূটির মত দেখায়, কিন্তু কথা ফুটিলেই সব মাটি! ভাল কথা যেন আশা বলিতে শেখে নাই কোনদিন!

ঘরে পা দিয়াই আশা বলিয়া উঠিল, "কিগো এখনও তেম্‌নি ঠায় ব'সে আছ! বাইরে ঘুরে আসতে ব'লে গেলাম না। কথা কানেই গেল না বুঝি?"

অন্য দিন নিখিলেশ আশার এই রকম গিন্নীপনায় কিছুই বলে না, আজ যেন আর তাহার সহ্য হইল না। হিংস্র পশুর মত দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, "সব কাজই তোমার কথামত করতে হবে নাকি! আমার ইচ্ছে, যাব না।" তার পর খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া "কারও তোয়াক্কা রাখি নে আমি।" পায়ের নীচের র‍্যাপারটা টানিয়া গায়ে দিয়া "আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর উনি এসেছেন মেজাজ্ দেখাতে", মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিতে দিতে "ভাল লাগে না ছাই।"

আশা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর প্রদীপটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রথম বিবাহের দিনগুলির ঔজ্জ্বল্য কোন্ অলক্ষিতে দেবতা ইচ্ছা করিয়া এমনি করিয়াই পণ্ড করিয়া দিতেছিল বুঝি।

তিন দিন কাহারও মধ্যে কথা নাই। আশা কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যায়, নিখিলেশ নাকমুখ বুজিয়া খাইয়া স্কুলে পড়াইতে যায়, তার পর বিকালে সেই যে আড্ডা মারিতে বাহির হইয়া যায়—ফেরে একেবারে রাত ৯টায়। অর্থাৎ খাওয়ার সময়।

এ রকম করিয়া আর কত দিনই বা চলা যায়! শেষে নিখিলেশ একদিন সাধিয়া ভাব করিতে যায়। বাজার হইতে সকালে সে এক জোড়া কাঁচের চুড়ি কিনিয়া আনিল আশার জন্য। কাল সরু চুড়ি দুইগাছি। আশার নিটোল হাতে মানাইবে কিন্তু বেশ।

আশা ফিরিয়াও তাকাইল না। নাকের দুই পাশে অবজ্ঞার চিহ্ন ঘন করিয়া বলিল, 'কাঁচের চুড়ি!'

নিখিলেশের মুখ মুহূর্ত্তে ফাটা বেলুনের মত চুপসাইয়া যায়—'কেন সুন্দর নয়?'

—'ছাই!' বলা হয়ত উচিত নয়, তবু আশা বলিল।

—'তবে কি রকমটি চাও তুমি!' নিখিলেশের কণ্ঠে চাপা আগুন।

—'যা চাই তাই বুঝি দেবে তুমি?' ধারাল ছুরির মত এক টুকরা হাসি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল আশার ওষ্ঠাধরে।

—'হ্যাঁ দোব, কি চাই বল!' নিখিলেশের কণ্ঠে বজ্রের দৃঢ়তা।

—'কি চাই—আচ্ছা এই ধর, দুই গাছি হাঙ্গরমুখী সোনার বালা। বুঝলে, সোনার—কাঁচের নয় কিন্তু।' কথার শেষের দিকে এক ঝলক তীব্র গরল যেন গড়াইয়া পড়িল আশার মুখের ভিতর দিয়া।

নিখিলেশের ইচ্ছা হইল ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া জন্মের মত কথা বন্ধ করিয়া দেয় আশার। কিন্তু সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'বেশ পাবে!' কথা বলিয়া ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল সে। কুমারীর সিঁথির মত সাদা সরু রাস্তাটি সোজা ইচ্ছামতী নদীর পাশ দিয়া বুড়া শিবের মন্দির ঘুরিয়া, ধানক্ষেত বাঁয়ে রাখিয়া বাজারের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

নিখিলেশকে তাহার কথা রাখিতে অনেকটা ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইল। তাহার আজীবনের সঞ্চয় সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল আশার বালা গড়াইতে। যাক্ সব যাক্। তবুও আশা সন্তুষ্ট থাকুক। গয়না-কাপড় লইয়াই যাহার সম্পর্ক তাহার মন পাইতে চায় না নিখিলেশ, কিছুতে না। থাকুক আশা হাঙ্গরমুখী বালা লইয়া। মরুক গে সে!

দুই দিন পরের ঘটনা।

আশা তরকারি কুটিতেছিল। নিখিলেশ কাগজের একটা মোড়ক তাহার পায়ের কাছে নামাইয়া দিল, আশা চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি আছে এতে।'

—'খুলে দেখ্‌লেই হয়।' নির্ব্বিকার মুখে উত্তর দিল নিখিলেশ।

আশা মোড়ক খুলিতেই বালা দুইগাছি সকালের আলোতে যেন ঝর ঝর করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বঁটি কাত করিয়া আশা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কই!

কিছু ক্ষণ নিখিলেশের মুখের উপর শান্ত চোখ দুইটি স্থির রাখিয়া বলিল, 'কত দাম লাগল?'

—'তা দিয়ে তোমার দরকার? তবে নেহাৎ কম নয়, সোনার কিনা! ইচ্ছে হয় অন্য কোন স্যাকরাকে দিয়ে যাচাই ক'রে দেখতে পার।' পিশাচের মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠে নিখিলেশ।

ব্যাথাতুর দৃষ্টি মেলিয়া আশা বলিল, 'সে কথা ত বলি নি।'

—'তবে কি কথা বলছ তুমি, এ্যাঁ? তুমি কি কথা বলতেই বা জান?' ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল নাকি নিখিলেশ!

—'দেখবই ত যাচাই ক'রে, নিশ্চয়ই দেখব। কেন দেখব না বলতে পার।' অসংলগ্ন কথাগুলি নিখিলেশের মুখের উপর ছুড়িয়া মারিয়া আশা দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

আর নিখিলেশ!

দাঁত দিয়া ঠোঁট কাম্‌ড়াইতে কাম্‌ড়াইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়াছে বুঝি।

……অদৃশ্য দেবতা দিনের মালা গাঁথিয়াই চলিয়াছে। একটির পর একটি করিয়া…বিরাম নাই…ছেদ নাই…একটানা দিনগুলি…

ইহার মধ্যে সংসারের হয়ত অনেক কিছুই ওলট-পালট হইয়া গেছে, কিন্তু আশা-নিখিলেশ-সংবাদ পূর্ব্ববৎ। তাহাদের প্রায় কথা বন্ধ।

…বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্রামগুলির আর কিছু না থাক্ ম্যালেরিয়া সাধারণতঃ থাকিবেই। নবগ্রাম ম্যালেরিয়া-প্রসিদ্ধ গ্রাম।

সেদিন স্কুল হইতে ফিরিয়াই নিখিলেশের গা-কাঁপাইয়া জ্বর আসিয়া পড়িল। কাঁথা কম্বল চাপা দিয়া হু হু করিয়া কাঁপিতে লাগিল সে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের কিন্তু একটা বড় গুণ আছে, প্রথম অবস্থায় জ্বর সাধারণতঃ একদিন পরেই ছাড়িয়া যায়।

পরদিন নিখিলেশ ভাত খাইয়া স্কুলে পড়াইতে চলিয়া গেল। রাত্রে আবার আসিয়া জ্বরের ধাক্কায় বিছানা লইল। কিন্তু এই জ্বরে ভ্রূক্ষেপ করিবার মত ছেলে নয় নিখিলেশ। সে দস্তুর মত স্নান করে, ভাত খায়, স্কুলে যায়। অত পুতুপুতু করিলে চলে নাকি পুরুষমানুষের। আর রাত্রে, দারুণ গ্রীষ্মেও কাঁথা কম্বল গায়ে হু হু করিয়া কাঁপিতে থাকে।

এই ভাবে আর বেশী দিন চলিল না। নিখিলেশের অসুখটা এবার বেশ গাড়িয়া বসিল। নিখিলেশ বিছানা লইল।

বাড়ীর বুড়ী ঝি মনদা রুগীকে মাথা ধোয়ায়, ঔষধপথ্য মুখে তুলিয়া দেয়। আশা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এক দিনের কথা। আজ আশার মনে কি হইল সেই জানে। নিজের হাতে নিখিলেশের সাবু জ্বাল দিল, তার পর বাটি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার শিয়রে। নিখিলেশ চোখ বুঝিয়া শুইয়াই রহিল কিন্তু। চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ শুনিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারে নাই নাকি! মনদা কি চুড়ি পরে, যে তাহার হাতে ঠুন ঠুন শব্দ হইবে! কিছুই যেন জানে না সে, আহা ন্যাকা!

আশা লজ্জার মাথা খাইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'তোমার সাবু—'

—'রেখে দাও টুলটার ওপর।' উদাস কণ্ঠের জবাব।

ঠক্‌ করিয়া টুলের উপর বাটিটা নামাইয়া দিয়া আশা ঘরের হাওয়া তোলপাড় করিয়া চলিয়া গেল। ধাক্কা খাইয়া খানিকটা দুধ-সাবু বাটি চল্‌কাইয়া পড়িয়াও গেল বুঝি।

...রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া নিখিলেশের চেহারাটি হইয়াছেই খাসা! চুল উস্কোখুস্কো, হাড় জিরজিরে চেহারা, গায়ে যেন খড়ি উড়িতেছে!

বাড়ীর ঝি মনদা আর পারিল না, সেদিন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'এ রকম করলে আর কটা দিন বাঁচবে দাদাবাবু, আজ একটা ডাক্তার আনবই আনব। তা যাই বল তুমি।'

নিখিলেশ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, কথা বলিবার শক্তিটুকুও যেন নাই তাহার। তাহার এই চুপ করিয়া থাকাটা সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া ঝি ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার অনেক করিয়া পরীক্ষা করিয়া একটা ওষুধ লিখিয়া দিল। শেষে যাইবার সময়ব লিল,—একবার হাওয়া বদলান দরকার।

নিখিলেশ খেঁকাইয়া উঠিল,—'হাওয়া বদলে কি হাওয়া খেয়ে থাকবো নাকি। ডাক্তার রুগীকে আর না ঘাঁটাইয়া প্রাপ্য ভিজিট লইয়া সরিয়া পড়িল।

সেদিন রুগীর ঘরে টুলের উপর বসিয়া আশা জানালার বাইরে তাকাইয়া ছিল, সন্ধ্যা হইয়া গেছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। গোল ভাঁটার মত চাঁদ।

জ্যোৎস্না...শুভ্র জ্যোৎস্না যেন সমস্ত দেশটাকে সাদা রঙে ছোপাইয়া দিয়াছে...যেন দুধের একটা পোঁচ বুলান হইয়াছে গ্রামখানির ওপর। গাছের পাতার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া চক্‌ চক্‌ করিতেছে, নীচে চিতাবাঘের গায়ের মত ডোরা ডোরা দাগ।... চোরের মত খানিকটা জ্যোৎস্না জানালার গরাদ গলাইয়া ভিতরে নিখিলেশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নিখিলেশের পাণ্ডুর মুখের দৈন্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সত্যিই দুঃখ হয় নিখিলেশকে দেখিলে, কি চেহারা কী হইয়া গেছে, আহা বেচারা!... একটা ডাহুক পাখী সেই কখন হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ফাটাইতেছে...মাথার উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া এক ঝাঁক বক উড়িয়া গেল...দূরে একটা শিয়াল ডাকিয়া উঠিল বুঝি...কাহার উদাস বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে হাস্‌নুহানার গন্ধের সঙ্গে...

সহসা আশার দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। আজ তাহার মনে হইল জীবনে যেন তাহার একটা বড় ফাঁকি রহিয়া গেছে, অনেক কিছুই যেন সে হারাইতে বসিয়াছে।... সে শাড়ী চায় না গহনা চায় না... সে চায় এমন কিছু যাহা সে পায় নাই, যাহার স্বাদ তাহার জানা নাই, কিন্তু আছে সহানুভূতি...অন্ধ অস্পষ্ট একটা অনুভূতি...

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া...নিখিলেশের রোগকাতর পাণ্ডুর মুখ দেখিতে দেখিতে...একটানা ঝিঁঝিঁর আওয়াজ শুনিতে শুনিতে...আশা যেন আজ নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে। আর সে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবে না...কিছুতেই না...

আশা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। রান্নাঘরে মনদা রাত্রের খাবারের জোগাড় করিতেছিল। আশা গিয়া বলিল,—মনদা একবারটি গোব্‌রা স্যাক্‌রাকে ডেকে নিয়ে এস না। বলবে বড্ড দরকার।

মনদা একটু আপত্তি করিল—'এখন যে রাত হয়ে গেছে মা!' আশা বিরক্তস্বরে জবাব দিল,—'তা হোক। তুমি যাও।' মনদা মুখরা আশাকে বড় ভয় করে। উচ্চবাচ্য না করিয়া সে চলিয়া গেল।

আশা রুগীর পথ্য তৈয়ারী করিয়া নিখিলেশের মাথার কাছে আসিয়া বসিল।

ধীরে ধীরে একটা হাত তুলিয়া দিল নিখিলেশের কপালে। পায়রার বুকের মত ভীরু, নরম তুলতুলে হাত। নিখিলেশ সবই টের পাইল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না। এমন একটি মুহূর্ত্তের জন্য যেন সে কত দিন ধরিয়া গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছিল। ইচ্ছা হইল একবার আশাকে টানিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে, তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া লয় এত কটু কথা বলার জন্য...

ঝি আসিয়া বলিল—মা, স্যাক্‌রা এসেছে।

নিখিলেশের চোখের সামনে যেন লক্ষ লক্ষ বাতি একসঙ্গে দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল। কনুইয়ে ভর দিয়া কোন মতে মাথা তুলিয়া আশার দিকে চাহিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—'এবার কি চাই! কানের দুল না গলার হার? কি চাই, এ্যাঁ? বল না, লজ্জা কিসের? আমি মরছি অসুখে আর তুমি এ সময়েই ত গয়না গড়াবে—নইলে

সতী-সাধ্বী স্ত্রী হবে কি ক'রে—' একসঙ্গে এত কথা বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

আশা একটুও দমিল না। ঝিকে বলিল,—'বাইরে বসতে বলো, আমি যাচ্ছি।' তার পর গভীর যত্ন-সহকারে নিখিলেশের মাথা বালিশের উপর নামাইয়া রাখিয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগল।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। আশা ধীরে ধীরে বলিল,—'দেখ, বাবাকে কাল চিঠি লিখে দেব, এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। এখানে থাকলে তুমি আর বাঁচবে না।' গলার স্বর তাহার গাঢ় হইয়া আসিল। একটু থামিয়া মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, 'কয়েক দিন সেখানে থেকে তার পর আমরা দেওঘরে যাব। সেখানে আমার মামার একটা বাড়ী আছে। টাকার কথা ভাবছ?' আশা একটু তরল হইয়া আসিল,—'সে ভাবনা তোমাকে আর এই রোগা শরীর নিয়ে ভাবতে হবে না। তার জোগাড় হয়েছে।' তার পর নিখিলেশের বুকে মুখ লুকাইয়া: 'আমার সেই হাঙ্গরমুখী বালা দু-গাছি বিক্রী করে দেব, তাই ত স্যাক্‌রাকে ডেকে পাঠালাম।'

নিখিলেশ সবই শুনিল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু দুর্ব্বল হাতে বধূকে আরও ঘন করিয়া টানিয়া লইল।

বিবাহের দুই মাস পরে প্রথম মিলন-রাতে দূরে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল বুঝি—'বউ কথা কও।'

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রের দ্বিতীয় ভাগের ৩য় সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩০৫) "দীনেশচরণ বসু" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রামানন্দ বাবু সম্পাদিত 'প্রদীপ' মাসিকপত্রই সচিত্র পত্রিকা হিসাবে সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

কবি দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের কথা অনেকে হয়ত আজ ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'মানস-বিকাশ', 'কবিকাহিনী,' 'মহাপ্রস্থান' ও 'কুলকলঙ্কিনী' প্রভৃতি এক সময়ে সাহিত্যসমাজে বিশেষ সুপরিচিত ছিল। কবি দীনেশচরণের "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা" শীর্ষক কবিতাটি এক কালে শিক্ষিত বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইত।

কবি দীনেশচরণ বাংলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। তৎসম্বন্ধে দীনেশচরণ উক্ত সনের ১৬ই বৈশাখ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে পত্র লিখেন সে পত্রখানা দীনেশ বাবুর লিখিত দীনেশচরণ বসু শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় ঐ পত্রখানির বিষয় পুনর্মুদ্রিত হইলে বর্ত্তমান যুগের তরুণেরা সেকালে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে কেমন ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, কিরূপ উদারতা তাঁহার ছিল সে পরিচয় পাইবেন।

কবি দীনেশচরণ তাঁহার বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গসাহিত্যজগতের উঠন্ত রবি রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। বিগত কল্য তাহাই গিয়াছিলাম। ঠাকুরবাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতালার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দ-সাগরে ডুবিল। কোন ইংরাজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্ত্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা, চক্ষু, ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধান ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর Albert ইত্যাদি কেশরক্ষার ফ্যাশনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিষ বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবিঠাকুরের বয়স অতি অল্প, ২৩শের অধিক হইবে না। কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ "Lady" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবিঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত। রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই :—

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
এ যে, নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ;
এ যে বুক-ফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙ্গালী,
কথা গেঁথে গেঁথে দিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশঃ লয়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিছে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ;
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিয়ে
সকল প্রাণের কামনা।"

তেইশ বৎসরের যুবক রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া সেকালের বাংলার একজন প্রসিদ্ধ কবির বর্ণনাটিক বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের সকলের মনেই আনন্দ দান করিবে।

পল্লী-উন্নয়নে নারায়ণপুর কলোনির আদর্শ

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

যে হাজার হাজার লোক শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়াছেন, গ্রামগুলিকে বাসযোগ্য করিয়া লইতে না পারিলে গ্রামের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য করা হইবে না এবং তাঁহাদেরও বহু কষ্ট হইবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে দমদমার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রাম জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এখনও কিছু দূরে এত বড় জঙ্গল আছে যে, লোক বন্য বরাহের ভয়ে সেদিক দিয়া দিনে চলিতেও ভয় পায়। শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার জমি কিনিয়া জঙ্গল কাটাইয়া লোক বসাইতে আরম্ভ করেন। এখন নূতন প্রায় চল্লিশখানি পাকা ও কুড়িখানি কাঁচা বাড়ী হইয়াছে। এখন সমস্ত গ্রামটির মধ্যে কোথাও একটু জঙ্গল নাই। রবিবার সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ভদ্রশ্রেণীর যুবক ও বালকরা পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটার কাজ করিতেছে, ইহা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি। রাত্রিতে পালা করিয়া যুবকরা দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া চুরি ডাকাইতি ঘটে না। গ্রামের মধ্যে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসানর ফলে গরীব লোক সামান্য তরিতরকারি, শাক পর্য্যন্ত বেচিতে পায়, যেগুলি দূরের বাজারে লইয়া যাইতে মজুরি পোষায় না। পূর্ব্বে এখানে গ্রীষ্মকালে ওলাউঠা সংক্রামক ভাবে দেখা দিত। হরিদাসবাবু কয়েকটি পুষ্করিণী খনন ও নলকূপ স্থাপন করিয়া দিবার পর ইহা আর নাই বলিলেই চলে; গ্রামে একজন এম্, বি ডাক্তারকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষকরূপে অল্প বেতনে রাখায় অধিবাসীরা প্রয়োজনের সময়ে তাঁহাকে দর্শনী দিয়া ডাকিতে পারে। দরিদ্র লোকদিগের রোগের সময়ে বিনামূল্যে আইস-ব্যাগ ও থার্ম্মোমিটার দিবার ও ব্যবহারান্তে সেগুলি ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার এত নিকটে ঐ অঞ্চলের মত দরিদ্র স্থান অল্পই আছে। দুর্গাপূজার সময়ে বাংলার সকল পল্লীগ্রামই ঢাকের শব্দে মুখরিত থাকে, কিন্তু ওখানে পূর্ব্বে কোন গ্রামে একখানিও পূজা হইত না। এখন সার্ব্বজনীন পূজা ও সেই উপলক্ষে গ্রামবাসীদিগের অভিনয় ও চব্বিশ-পরগণার বিশেষত্বপূর্ণ 'কৃষ্ণযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় মাণিকলাল শীল মহাশয়ের দানে প্রতিষ্ঠিত পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির নামক শিল্পশিক্ষাসমন্বিত অবৈতনিক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের (যাহার কথা সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীতে একাধিক বার আলোচনা করিয়াছেন) শাখা এই স্থানে স্থাপিত হওয়ায় তিন ক্রোশ দূর হইতে পর্য্যন্ত বালকরা হাঁটিয়া পড়িতে আসে। মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ের নারায়ণপুর কলোনি ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। দুইখানি সাইক্‌ল্ রিক্‌শ গ্রামের অপর দিকের রাস্তায় প্রথমে লোকসান দিয়া চালাইয়া এখন লাভে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে ম্যালেরিয়া না থাকায় বিদ্যালয়ের নবনির্ম্মিত ছাত্রাবাসে অন্য স্থানের ধনীর পুত্ররাও আসিয়া বাস করিয়া বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। অল্প দূরে যোগবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বহু ছাত্রকে আহার, বাসস্থান, পরিধেয়, বই, খাতা প্রভৃতি দিয়া রাখা হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষক ইহাদিগকে যোগের আসনগুলি অভ্যাস করান। তাহাতে দেখা গিয়াছে শীঘ্রই ইহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। সকালে এক ঘণ্টা ও বৈকালে এক ঘণ্টা ইহারা তরিতরকারির চাষ করে। ইংরেজী বিদ্যালয়েও ইহারা পড়ে ও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষক এই দুইটি ছাত্রাবাসে বাস করেন, কেহ কেহ সপরিবারে পৃথক্ বাড়ীতে থাকেন। বিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ উদ্যানে প্রতি ছাত্রকে কৃষিকার্য্য করিতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভূমিখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হয়। ভৈষজ্য উদ্যানে আয়ুর্ব্বেদের বৃক্ষ, লতা, গুল্মের চাষ হয়। স্বাস্থ্যকর গ্রাম বাছিয়া তথায় স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস স্থানান্তরিত করিলে বহু দিক দিয়া সুফল পাওয়া যাইবে।

হরিদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই স্থানে একটি অনতিবৃহৎ সেলুলয়েডের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। উঁহাদের প্রদত্ত জমি ও বাড়ীতে বাংলা-সরকারের রেশম-চাষের কতকগুলি কাজ চলিতেছে।

পূর্ব্বে এখানে জঙ্গলের মাঝে মাঝে কাওরা জাতির লোকরা বাস করিত। তাহাদের জীবন দুর্নীতিপূর্ণ ও ঘৃণিত ছিল। এখন কয় বৎসর ভাল লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া এই কাওরা জাতির আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে আত্মীয় মরিলে মৃতদেহ জঙ্গলে ফেলিয়া দিত, এখন নিয়মিত সংকার করিতেছে। এখন ইহারা 'জন' খাটিয়া, চাষ করিয়া, গোয়ালার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে ভদ্রশ্রেণীর শহরের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান অভিযানের ফলে তথাকথিত নিম্ন-জাতিগুলি আরও ডুবিয়া গিয়াছে অথচ সমাজের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। গ্রামে বাস করিতে হইলে ইহাদের মধ্যেই বাস করিতে হইবে। ইহাদিগকে কাজ দিয়া, আদর্শ দিয়া তুলিতে হইবে। নারায়ণপুর কলোনিতে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে বাংলার কোথায় তাহা করা যায় না? সর্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। রস ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যরাও ইহা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হন। বোমার আতঙ্কে দিকে দিকে যদি আদর্শ গ্রাম গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের স্থায়ী উন্নতি হয়।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

তবু শাশুড়ী থাকিতে নিজেকে এতটা নিঃসঙ্গ বোধ হইত না। সঙ্গী হিসাবে তিনি খুব বাঞ্ছনীয় না হইলেও—সকাল হইতে সারা দিনমান ও সন্ধ্যা হইতে শুইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ও বকিয়া এই ক্ষুদ্র বাসস্থানটিকে মুখরিত করিয়া রাখিতেন। ছোট ছোট কত যে অসংখ্য উপদেশ দিয়াছেন যোগমায়াকে—সবগুলি সে কিছু মনে রাখিতে পারে নাই। উপদেশ দিবার ছলে কত বকিয়াছেন, তবু, যাইবার সময় যখন বধূর চিবুকে দক্ষিণ হাতের আঙুল দিয়া চুম্বন করত সজল চোখে বলিলেন, 'বউমা, রাম রইলো—তুমিও ছেলেমানুষ, বুঝে-সুজে সংসার চালিও। খেতে বেলা ক'র না, রাত্তিরে সকাল-সকাল শুয়ো। ভগবান না করুন—অসুখবিসুখ কিছু হ'লে খবরটা দিও। যাচ্ছি বটে বাড়িতে, প্রাণ আমার তোমাদের কাছেই পড়ে রইল।'

কত দিনের কত অপ্রীতিকর কথা, কত কটু কথা, কলহ, অভিমান—সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, যোগমায়ার চোখেও জল টল টল করিয়া উঠিল। আকের ছিবড়া শক্ত হইলেও ভিতরে তার তরল মিষ্ট রস।

এখন বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ হয়। নূতন দেশ, তা ছাড়া বাসাও গ্রামের একটেরে। সামনের পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, প্রতিবেশী হিসাবে এক রমেশবাবুর বউ ছাড়া আর কেহ নাই। আর মাঠের এক পাশে—যেখানে পোষ্ট-আপিসের জমিটা শেষ হইয়াছে—ওইখানে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধা তাহার দশ বছরের নাতিটিকে লইয়া বাস করে।

নাতির নামটি যোগমায়া এখনও শোনে নাই, কিন্তু বৃদ্ধাকে কেষ্টর মা বলিয়া সকলে ডাকে। ঘুঁটে বেচিয়া, ধান ভানিয়া সে সংসার চালায়। এক দিন ঘুঁটে বেচিতে আসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে সামান্য মাত্র আলাপ ক'রয়া গিয়াছে। বউমানুষ যোগমায়া—এখানেও শ্বশুরবাড়ির ধরণে ঘাড় নাড়িয়া ও 'হাঁ হুঁ' দিয়া আলাপ সারিয়াছে।

রমেশবাবুর বউয়ের নাম কালিতারা। একাই সে স্বামীর আপিসের ভাতজল করে, দেড় বছরের কচি ছেলে লইয়া সারা দুপুর ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেয়। বউটি ছেলেকে যত্ন করিতে জানে। রোজ গরম জলে গা মুছাইয়া—চোখে কাজলের রেখা টানিয়া—কপালের উপর মাথার কাঁটা দিয়া ছোট্ট একটি খয়েরের টিপ পরাইয়া দেয়। ছেলের গলায় সরু একগাছি রূপার হাঁসুলি গড়াইয়া দিয়াছে। আর মাথার কোঁকড়া চুল কপালের দিকে যেখানে বড় হইয়াছে—সেইখানে একটি ছোট সোনার পুঁটে বাঁধিয়া দিয়াছে। নাদুস-নুদুস কালো ছেলেটি—নাড়ু হাতে বসাইয়া দিলে অবিকল হাঁটু-গাড়া গোপালের মতই বোধ হয়।

দুপুর বেলায় ছেলের দুধ খাওয়ানো ও প্রসাধন শেষ হইয়া গেলে—যে দিন ছেলে ঘুমায় না ও কালিতারার হাতে কাজ থাকে না—সেই দিন সে এ-বাড়িতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াইতে আসে। ও-বাড়ি হইতে এ-বাড়ি দু'মিনিটের পথও নয়। দুপুরে পথে লোকজন চলে কম, কালিতারা এধার-ওধার উঁকি মারিয়া—ঘোমটা টানিয়া ও-বাড়ির শিকল তুলিয়া—এক ছুটে এ-বাড়িতে আসিয়া ডাকে, কি ভাই, কি করছ?

আসুন দিদি। বসুন। কম্বলের আসনখানা যোগমায়া পাতিয়া দেয়।

কালিতারা বসিয়া বলে, ছেলে যাই কাঁদুনে নয়, তাই একা হাতে অনেক কাজ করতে পারি। পরশু এক কাঠা ডা'ল ভিজিয়েছিলাম, কাল সারাটা দিন বসে বসে বড়ি দিলাম। খোকা চুপটি ক'রে বসে বসে দেখলো। তুমি বড়ি দেওনি?

মা অনেক বড়ি দিয়ে গেছেন; ভাজা বড়ি, কুমড়ো বড়ি, মটর ডালের বড়ি।

মটর ডালের বড়ি কিসে দাও তোমরা?

কেন, লাউয়ের ঝালে মটর ডালের বড়ি বেশ হয়।

ঠিক বলেছ ভাই। গিন্নীবান্নী বাড়িতে না থাকলে অত মনেও হয় না সব। আচ্ছা ভাই, তোমার গহনা সব খুলে রেখেছ কেন?

যোগমায়া বিপদে পড়িয়া গেল। বানাইয়া কথা বলা তার অভ্যাস নয়। একটু ভাবিয়া—মুখ নীচু করিয়া বলিল, গহনা সব বাড়িতে আছে।

সে স্পর্শ যোগমায়ার মন্দ লাগে না, কৌতুক-আনন্দে মনটা বেশ সরস থাকে। কিন্তু মনের তলায় অল্প খুঁত খুঁতানির ধোঁয়াও উঠিতে থাকে। হেঁসেল না ছুঁইয়া কি কৌতুক করা যায় না!

ক্রমে নূতনত্বের মোহ কাটিয়া যায়। রামচন্দ্র যখন তখন আর হেঁসেলে আসিয়া বসে না। যোগমায়াও তাহাকে ডাকে না। আপিসের অনেক খাতাপত্র ফাইল লইয়া—লণ্ঠন জ্বালিয়া বড় ঘরটায় রামচন্দ্র কাজ করিতে থাকে। যোগমায়া আপন মনে রাঁধিতে থাকে। রান্না হইলে এ-ঘরে আসিয়া ডাকে, এখন খাবে?

হাঁ। রাত কটা বেজেছে?

যোগমায়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। রামচন্দ্র বলে, পকেট ঘড়িটা দেখ না একবার।

যোগমায়া মৃদু স্বরে শুষ্ক মুখে বলে, আমি তো ঘড়ি দেখতে জানি না।

জান না! খানিক যোগমায়ার পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রামচন্দ্র বলে, আন তো ঘড়িটা—আমার ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে। আজ তোমায় ঘড়ি-দেখা না শিখিয়ে ভাত খাব না।

যোগমায়া ঘড়ি লইয়া আসিলে রামচন্দ্র বলে, বোস। এই যে দেখ—ঘড়িতে বারটা ঘর আছে। এক, দুই—

কিন্তু রোম্যান ফিগার যোগমায়া বুঝিতে পারে না। পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটি দাগ, এবং বারটি দাগে মিলিয়া মোট ষাটটি মিনিটে একটি করিয়া ঘণ্টা হয়। এ বড় আশ্চর্য্য ও দুরূহ তথ্য! ছোট কাঁটা কত কম চলে— আর বড় কাঁটাটি চলে দ্রুত। বড়টা সব ঘরগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া উপরের ঐ বারোটার ঘরে আসিলেই—তবে নাকি ঘণ্টা হয়। তথ্য দুরূহ নহে তো কি? ছোট কাঁটা যেখানে থাকিবে—সেইখানেই ক'টা বাজিল বুঝিতে হইবে।

কিন্তু রোম্যান ফিগারগুলিই তো গোলক ধাঁধা। চার পর্য্যন্ত দাগ গুনিয়া না হয় বোঝা গেল। পাঁচে আসিয়াই মাথা গুলাইয়া যায়। থিয়োরী-অব-রিলেটিভিটির যুগে এই তথ্য হাস্যকর হইতে পারে—কিন্তু ঘড়ির সময়-দেখার যুগও এমনি সঙ্কটজনক ভাবে একদিন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

রান্না ঘরে ঢুক্ ঢাক্ শব্দ হইতেই যোগমায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ওই যাঃ, বেরালে বুঝি মাছ খেয়ে গেল।

অগত্যা হতাশ রামচন্দ্রও খাতা পত্র গুছাইয়া যোগমায়ার অনুসরণ করিল। ক্রমশঃ

কবি হালি

(১৮৩৭-১৯১৪)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উর্দু সাহিত্যে কবি হালির অক্ষয় নাম। কিন্তু আমরা অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখি না। আজকের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের দিনে তাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ তিনি ছিলেন জাতীয়তার কবি, 'অখণ্ড ভারতে'র সেবক।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক মিলনে সাহায্য করতে পারে। আজ যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারছি না, তার প্রধান কারণ আমাদের আন্তরিক অপরিচয় এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা।

অথচ এককালে আমাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান স্বচ্ছন্দভাবে চলত। আজ বাইরে আমাদের মেলামেশার সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু অন্তরে যেন আমরা ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।

* * * *

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনপন্থী এক মুসলমান-পরিবারে কবি হালির জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি সনাতন রীতির দেশী শিক্ষাই পেয়েছিলেন। পরে বড় হ'য়ে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা করেন এবং আধুনিক ভাবজগতের সঙ্গে পরিচিত হন। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রে কিছুকাল তিনি দিল্লীতে ইঙ্গ-আরবীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এই সময়েই তাঁর কবি-কীর্ত্তি লোক-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজাম বাহাদুরের কাছ থেকে

তিনি মাসিক ৭৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। পরে, এই বৃত্তির পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়ে ১০০৲-য় দাঁড়িয়েছিল। চাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ঘালিব ও শাইফ্তার প্রভাব লক্ষিত হয়। উর্দু ভাষায় তিনি অনেক সুন্দর গজল্ রচনা করে গিয়েছেন। 'দিওয়ান্' তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। এতে কবি প্রেম-বিলাসী, রূপমুগ্ধ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল তাঁর কল্পনাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে। 'শের বা শাইরি' নামক গদ্যগ্রন্থে তিনি কবিতার সমালোচক। 'বরখরুত' ঋতুলীলার কাব্য—কতকটা টম্সনের 'সীজ্‌ন্‌স্' এবং কালিদাসের 'ঋতু-সংহারে'র অনুরূপ। 'নিশাত-ই-উমিদ' আশার জয়গান। 'হুব্বি ঘাতানে' প্রবাসীর হৃদয়-বেদনা এবং কবির দেশানুরাগ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বদেশের উদ্দেশে কবি বলছেন,

"স্বর্গ পেলেও চাই না আমি একমুঠো তোর ধূলির বিনিময়ে।"

ভারতকেই তিনি তাঁর স্বদেশ বলে জান্‌তেন এবং তারই বন্দনা গেয়েছেন বহু কবিতায়। ভারতের আদিম অধিবাসীদের দেশপ্রীতি তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল। আর্য্যদের হাতে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে তারা, কিন্তু দেশের মাটি ছাড়ে নি। শত দুঃখেও তাঁরা দেশের ধূলি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে।

"কাহারেও তুমি ভাবিও না পর হিন্দু মুসলমান
ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ যেই হোক্ সে যে স্বদেশেরই সন্তান।
প্রীতির নয়ানে চাহ সবাপানে, তাহারা নয়নমণি,
স্বদেশের শুভ চাহ যদি, লহ সবারে আপনা গণি।"

জাতি অসাড়, নিদ্রিত। উদ্দীপনমন্ত্রে আহ্বান করেছেন কবি :

"ভাঙো অবসাদ, জেগে ওঠো সবে! নিন্দায় অপমানে
ঘুমায়েছ বহুদিন।
উঠাও, জাগাও, বাঁচিতে শিখাও সবারে সসম্মানে
কলঙ্ক গ্লানিহীন।"

ভারতের অনৈক্য ও গৃহবিচ্ছেদই তার দুর্গতির প্রধান কারণ। কবিকে পীড়িত ক'রেছে তার এই শোচনীয় হীনতা।

"জগৎ জুড়ে এমন জাতি মিলবে নাক' কোন দেশে
ভাই যেখানে ভাইকে রুখে দাঁড়ায় এসে শত্রুবেশে।
আপন হয়ে পরের মতন যা'রা কেবল বিবাদ করে
প্রাণের দাবি নাই তাহাদের, মৃত্যু ভালো তাদের তরে।"

আত্মকলহ জাতির ধ্বংসের পথ, বারবার সে কথা তিনি তাঁর দেশবাসীকে শুনিয়েছেন। আমরা কেউবা শুনেছি, কেউবা শুনিনি।

'মুসাদ্দা' রচনায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। 'মদ্দ্‌ব্রা-জাজর-ই-ইস্‌লাম' বা 'ইসলামের উত্থান-পতন' গ্রন্থে তিনি ইসলামের বর্ত্তমান অবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন জাগাতে চেয়েছেন। তাঁর শেষ জীবনের রচনায় ইসলামের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু তাতে সঙ্কীর্ণতা বা ভেদনীতির সমর্থন নেই।

উর্দু সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্যসাধারণ। তাঁর গজল এবং মুসাদ্দা উর্দু সাহিত্যের পরম সম্পদ। প্রকৃতি-প্রীতি এবং মানবপ্রেমের রসে তাঁর কাব্য স্নিগ্ধ। উর্দু সাহিত্যে তিনিই এনেছিলেন নবযুগের বাণী। গতানুগতিক রীতি থেকে উর্দু কবিতাকে তিনি মুক্তি দিয়ে গিয়েছেন; ইক্‌বাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী শক্তিশালী কবিদের তিনি পথপ্রদর্শক। জাতীয়তার উদ্বোধক ব'লেও তিনি স্মরণীয়।

স্বার্থরচিত সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে দিয়ে জাতীয়তার রাজপথে বাহির হ'তে আহ্বান করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সাতাশ বছর পরেও আমরা সে আহ্বানে সাড়া দিই নি।

* * * *

জাতীয় প্রগতির অভিলাষী যাঁরা, তাঁদের কর্ত্তব্য জাতীয় ভাবনায়কগণের সঙ্গে জাতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রদেশে-প্রদেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ভাবগত যোগ সাধন করতে পারলে অন্ধ বিদ্বেষের তীব্রতা হয়ত উপশমিত হবে। বাঙালী লেখকগণের এবিষয়ে দায়িত্ব আছে। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতীয় ভাব-ধারাকে প্রবাহিত ক'রে দেওয়া তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। বাঙালী মুসলমান লেখক সম্প্রদায় যদি আরবী, ফারসী এবং উর্দুর উন্নত ভাবসমূহকে সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী ক'রে বাংলা ভাষার মারফতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, তাহ'লে তাঁদের স্বসম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে।*

* উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি প্রবন্ধকার কর্ত্তৃক অনূদিত।

আল্লা হো আকবর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আল্লা হো আকবর !
তুমিই জীবন, তুমিই মৃত্যু, তুমি সর্ব্বেশ্বর।
বৈশাখী ঝড়ে তোমারই ডঙ্কা, ভূমিকম্পেও তুমি,
ফাল্গুনে কর গানে গানে তুমি মুখরিত বনভূমি!
রাতের গোপনে তুলি দিয়া তুমি রাঙাইয়া তোল ফুল,
কুঞ্জে কুঞ্জে গান গেয়ে চলে তোমারই সে বুলবুল!
আবার কখন কঠিন হইয়া সব্যসাচীর হাতে
গাণ্ডীব দিয়ে রক্তবন্যা আনো প্রলয়ের রাতে!
বৃন্দাবনের বাঁশরির সুর ডুবায়ে শঙ্খরব
ফুকারিয়া ওঠে—রেণু রেণু হয়ে ভেঙে ভেঙে যায় সব।
সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব তুমি! তোমারে নমস্কার!
নিমেষে নিমেষে দিকে দিকে হেরি তোমারে বারম্বার।

আল্লা হো আকবর !
পাতার আড়ালে লুকানো ক্ষুদ্র বন-ফুল সুন্দর!
—ওরে তুমি জানো যেমন করিয়া—জানিছ তেমনি ক'রে
লক্ষ রবিরে শূন্যে শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে যারা ঘোরে!
প্রতিটি পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, প্রতিটি দূর্ব্বাদল—
সবার উপরে দৃষ্টি তোমার করুণায় ঢল ঢল!
সব-কিছুতেই তোমারই হাতের স্বাক্ষরটিরে চিনি!
তারার আখরে লেখা প্রেম-লিপি আনে তব নিশীথিনী!
বিশ্বভুবনে যাহা কিছু আছে নহে তব অগোচর।
অণু হ'তে অণু বৃহৎ হইতে তুমি যে বৃহত্তর!

আল্লা হো আকবর !
আলোর উৎস, তোমারই আলোকে আলোকিত চরাচর!
জ্যোতিঃ-সমুদ্র, তোমারই জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়,
চন্দ্র-তারারে আলো দিলে! তারা তোমারই গাহিছে জয়!
আলোয় তোমার আলোকিত হ'য়ে অগ্নি জ্যোতিষ্মাণ!
বিদ্যুৎ হ'ল ভাস্বর তব দীপ্তিতে করি স্নান!
জ্যোতির জ্যোতি হে বাসুদেব তুমি! তোমারে নমস্কার।
তোমার চরণ-কিরণে ঘোচাও মনের অন্ধকার।

আল্লা হো আকবর !
তোমারি আদেশ মস্তকে বহি চলিব নিরন্তর!
তুমি যা বলাবে সে কথা বলিব, তুমি যা করাবে তাই
করিয়া চলিব—মর্ম্ম-বেদীতে কেবল তোমারই ঠাঁই!
তোমার কাছে যে নোয়ায়েছে মাথা, হবে না সে নতশির
মানুষের কাছে—হোক সে মানুষ ভুবনবিজয়ী বীর।
সত্যস্বরূপ! ধূলির সঙ্গে আমি ধূলি হয়ে যাই—
ক্ষতি নাই—শুধু তোমার নিশান উড়ুক সর্ব্বদাই।
অস্ত্রের জয়, শাস্ত্রের জয়, অর্থের জয় নয়।
বন্ধুজনের বিদ্রূপবাণ—তারেও করি নে ভয়।
বিজয়ী হউক সত্য কেবল। সেই সত্যের লাগি
শত মৃত্যুরে বরিয়া লইব। সত্যে যে অনুরাগী
কোনো ক্ষতিরে সে ক্ষতি মানিবে না। চিরবন্ধনহীন
কূল হ'তে চলে অকূলের পানে একাকী সে নিশিদিন।

আল্লা হো আকবর !
তুমি সকলের নিয়ামক প্রভু, তুমি ভুবনেশ্বর!
তোমারই আদেশ মস্তকে বহি মৃত্যু সে ধাবমান,
বহে সমীরণ, চন্দ্র-তপন কিরণ করিছে দান।
অগ্নি—সে দেয় দীপ্ত—আকাশে মেঘেরা ঢালিছে জল,
নদী ছুটে চলে সাগরের পানে কল কল ছল ছল।

আল্লা হো আকবর !
আমারে তোমার গাণ্ডীব কর হে মহাধনুর্দ্ধর!
পঙ্গুরে তুমি পাহাড়ে চড়াও, বোবারে দাও হে বাণী,
তুমি যদি কৃপা না কর দেবতা, হালে পায় নাকো পাণি।
আমি যাহা চাই মূল্য কি তার—যদি তার পশ্চাতে
তুমি নাহি থাকো? আমার ইচ্ছা তব ইচ্ছার সাথে
মিলিত না হ'লে সকলই ভস্মে হয় শুধু ঘৃত ঢালা!
সুরু হ'ল, তাই, যে পথে চলি নি সে-পথে চলার পালা।
তোমার করুণা জেনেছি জীবনে সব শক্তির মূল।
আমিই আমার ভাগ্য-বিধাতা—এর চেয়ে নেই ভুল।
আমি নই আর—তুমি হে কেবল! আমার জীবনরথে
সারথী হইয়া যে পথে চালাবে—চলে যাবো সেই পথে।

চিতোর

শ্রীউষা দেবী, বি-এ

সেই ছোটবেলার শোনা চিতোর। চিতোরের আজ চিতাই আছে, কিন্তু সেই চিতার প্রতিটি রেণু দেশভক্ত বীরের বুকের রক্তে সিক্ত, তাই চিতোর দেখতে আসা শুধু অতীতের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসা নয়, ভারতের একটি পবিত্রতম তীর্থদর্শনে আসা।

সময় ছিল হাতে তিনটি দিন। তাই যখন অল্প সময়ের মধ্যে দেখে আসা সম্ভব ব'লে উদয়পুর ও চিতোর যাওয়াই ঠিক হ'ল, তখন মনটা অনেক দিনের পুষে-রাখা আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেও বুঝতে পারি নি ঐ তিনটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ সোনায় ভ'রে উঠবে।

আমরা কিন্তু গিয়েছিলুম উল্টোভাবে, অর্থাৎ আগে উদয়পুর গিয়ে ফিরতি পথে চিতোর। সুন্দরী নগরী উদয়পুর। উদয়পুর ছাড়লুম আমরা বেলা ১০টায়। মেবার স্টেট রেলওয়ের ছোট ছোট গাড়ী। এই রেলপথের একটি শাখা চিতোরেই শেষ হয়েছে। আন্দাজ ১টা চিতোরে পৌছাব। বারোটা বাজতেই গাড়ীতে খেয়ে নিয়ে তৈরি রইলুম। কয়েক ঘণ্টা মাত্র হাতে, কাজেই চিতোরে একটি মিনিটও নষ্ট করতে চাই না।

দুই-তিনটি স্টেশন আগে থেকেই রাণা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ-শোভিত চিতোরের সুউচ্চ শির দেখা গেল।

চিতোর স্টেশন আসতেই নেমে প'ড়লুম। জিনিসপত্র নামাবার ঝঞ্ঝাটও ছিল না, কেননা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর চারখানি টিকিটের ওপর দশ টাকা বেশী দিলেই compartmentখানি ইচ্ছামতন কাটিয়ে রেখে দেবার ব্যবস্থা এদের আছে। জিনিসপত্র ও তার সঙ্গে জীবন্ত লগেজ স্বরূপ বাবলু, টুকটুক, আয়া ও চাকর সর্দ্দার সিংকে রেখে আমরা স্টেশনের বাইরে এলুম।

স্টেশন থেকে চিতোর দু-মাইল। দু-তিনখানি টাঙা দাঁড়িয়েছিল, তারই একখানিতে আমরা তিন জন উঠে বসলুম।

চারিদিকের সুবিস্তৃত সমতল ভূমির মাঝখানে চিতোর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের জমি থেকে এর উচ্চতা ৫০০ ফুট, আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮৫০ ফুট। চিতোরগড় উত্তর হ'তে দক্ষিণে সওয়া তিন মাইল ও পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত।

এই দুর্ভেদ্য দুর্গ কবে তৈরি হয়েছিল কেউ জানে না। কিংবদন্তী অনুসারে মহাভারতের ভীম এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইতিহাসের মতে মোরি রাজপুত জাতির নেতা চিৎরাৎ এই দুর্গ গঠন করেন। তাঁরই নামানুসারে চিত্রাকট নাম হয়। ৭৩৪ অব্দে বাপ্পারাও এই দুর্গ অধিকার করেন। বাপ্পারাওয়ের বংশধরগণই আজ অবধি মেবার শাসন করছেন।

খানিক দূর গিয়ে আমরা গাম্ভেরী নদীর সেতু অতিক্রম করলুম। নদীটি ছোট কিন্তু সেতুটি ছোট নয়, কেননা বর্ষাকালে এদিকের নদীগুলি ভীষণাকার ধারণ করে। সেতুটি নাকি আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খাঁ নির্ম্মাণ করেন দশম শতাব্দীতে।

গেট-পাস নিতে হবে, সুতরাং চিতোরগড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট্ট গ্রামের মধ্যে আমাদের টাঙা প্রবেশ করল। এই ক্ষুদ্র গ্রামটি তুলার চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানে কয়েকটি পাথরের খনি আছে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই রাশি রাশি শিলাফলক নজরে পড়ে। গেট-পাসের জন্যে ফি দিতে হয় না, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থেকে চেয়ে আনলেই হ'ল। শুনলুম কোনও অস্ত্র নিয়ে চিতোরগড়ে যেতে দেওয়া হয় না।

এবার চড়াই উঠতে আরম্ভ করা হ'ল। মাইলখানেক উঠতে হবে। রাস্তাটি বেঁকেচুরে গেছে তার মধ্যে দুটি প্রধান বাঁক আছে। রাস্তার ধারের দিকে সুউচ্চ প্রাচীর। আর এই এক মাইল রাস্তাটি সাতটি সুদৃঢ় বৃহৎ দ্বার দ্বারা সুরক্ষিত। এই রাস্তা দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবলে অবাক হ'তে হয়, কত দুর্ভেদ্যই ছিল এই চিতোরগড়।

প্রথম দ্বারটির নাম পদন পোল। পদন পোলে প্রবেশ করেই বাঁ-দিকে বাঘসিঙের স্মৃতিফলক দেখা যায়। ইনি গুজরাটের বাহাদুর শাহের চিতোর অবরোধকালে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এই স্থানে ভূপতিত হন।

এর পরে আমরা ভাইরণ পোল অতিক্রম করি। ভাইরণ দাশ মোলঙ্কী চিতোরের দ্বিতীয় অবরোধকালে

এখানে পতিত হন, তাঁরই নামে এই দ্বারটির নামকরণ হয়। মহারাণা ফতেসিং এই ভগ্নপ্রায় দ্বারটি পুনর্গঠন করেন, তাই সম্প্রতি এটি ফতে পোল নামে খ্যাত। তার পর আসে হনুমান পোল ও তার পরে ভেরুন পোল। এই দুটি দ্বারের মধ্যে দুটি স্মৃতি-বেদী দেখা যায়, একটি কালার ও একটি জয়মলের। শোনা যায়, আকবরের চিতোর আক্রমণকালে জয়মলের পা দুটি গুরুতররূপে আহত হ'লে তিনি কালার কাঁধে চড়ে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করেন। আকবর এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান ও ভাবেন বুঝি বিষ্ণুর অবতার যুদ্ধ করছেন।

তার পর আমরা যথাক্রমে গণেশ পোল, ঝরণা পোল ও লক্ষ্মণ পোল অতিক্রম করি। প্রতিটি দ্বারের বহির্দিক বড় বড় লৌহশলাকা দ্বারা সুরক্ষিত, যাতে হাতী মাথা দিয়ে ভেঙে না ফেলতে পারে।

সর্ব্বশেষ দ্বারটির নাম রাম পোল। মেবারের রাজবংশ নিজেদের রামচন্দ্রের বংশধর ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁরই নামে এই দ্বারের নাম। এই দ্বারটি সবগুলি দ্বারের মধ্যে সুন্দরতম, নানারূপ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য-শোভিত। রাম পোলের সম্মুখে একখানি জৈন বিক্রম সংবৎ খোদিত শিলাখণ্ড দেখা যায়। এখানে পাট্টার স্মৃতি-বেদী আছে। শোনা যায়, পাট্টা যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হ'লে, তাঁর মা, স্ত্রী ও কন্যা তরবারি-হস্তে যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন।

আকবর কর্তৃক চিতোরগড় অধিকৃত হ'লে চিতোর-বাসীরা চিতোর ছেড়ে চলে যান। তার পর প্রায় দুই শতাব্দী চিতোর নিরালায় অশ্রুপাত করেছে। ১৮৮১ সাল থেকে বর্ত্তমান রাণার পিতামহ মহারাণা সজ্জনসিং চিতোরের পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। তিনি যখন জি. সি. আই. ই. হন তখন লর্ড রিপন চিতোরে গিয়েই তাঁকে সে সম্মান প্রদান করেন। তাঁর পুত্র ফতেসিং চিতোরের অনেক ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন, তাঁরই সময় "ফতে প্রকাশ মহল" নামে চিতোরে একখানি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, এখনও চিতোরের পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে দেখা যায়।

একটি আধপাকা আধকাঁচা রাস্তা ডিমের আকারে চিতোরকে ঘিরে রেখেছে, আমরা সেই রাস্তা ধ'রে দক্ষিণে অগ্রসর হ'লুম। ধ্বংসাবশেষের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারের এক কুটীর থেকে একটি বৃদ্ধা ছুটে আসছে। কতকগুলি ছোট বাচ্চা আমাদের টাঙার পেছনে আসছিল, ভাবলুম তাদের কারওকে ধরতে আসছে বৃদ্ধা। খুবই অবাক হয়ে গেলুম যখন সে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এসে বললে, সে গাইড। হাতে তার একখানি ইংরেজী বই চিতোর সম্বন্ধে, গাইডের কোনও স্থান সম্বন্ধে যত জ্ঞান থাকা উচিত, তা তার কিছুই ছিল না, তবু তার সঙ্গ আমাদের আনন্দ দিয়েছিল, তাকে সারা রাস্তা খুব জ্বালাতন করেছি।

টাঙা থেকে নামলুম, প্রথমেই গণেশ-মন্দির দর্শন করা গেল ; ভাবলুম, এ মন্দ না, শাস্ত্রেও আছে গণপতির পূজা সর্ব্বপ্রথমে। তার পর রাজপুরোহিতের গৃহের ভগ্নস্তূপ, কাছেই তুলজামাতার মন্দির, কোনও তুলাদানের অর্থে নির্ম্মিত ব'লে ঐ রকম নাম। ছোট মন্দির, বেশ পরিষ্কার, দেবীর মূর্ত্তিটিও বেশ।

তার পর স্টেটের খাতাঞ্চীখানা, এটি নওলক্ষভাণ্ডার নামে খ্যাত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি তৈয়ারী হয়, তখন স্টেটের আয় ৯ লক্ষ টাকা ছিল। এর কাছেই একখানি মস্ত বড় ঘর দেখা যায়, ঘরটির মাঝে বড় বড় গোল থাম, এখানে ছোট বড় নানা রকম কামান রাখা আছে। আমাদের বৃদ্ধা গাইডের অভিজ্ঞতা অনুসারে তার মধ্যে তিন-চারটি বাবরের কাছ থেকে আনা। এইটিই ছিল চিতোরের তোপখানা।

এরই কাছে একটি ভারি সুন্দর জৈন মন্দির আছে। নামটিও সুন্দর, সিঙ্গার চৌরী। মন্দিরের মধ্যে চারটি কারুকার্য্যকরা থামের উপর একটি মণ্ডপ, তার নীচে বিগ্রহের আসন, বিগ্রহ এখন অন্তর্দ্ধান।

একটু দূরেই একটি বিশাল প্রাসাদ নয়ন-গোচর হয়। এটি মহারাণা কুম্ভের পৈতৃক গৃহ। তিনি এর অনেক সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাতে এটি রাণা কুম্ভের প্রাসাদ নামেই খ্যাত। প্রাসাদ-টির কারুকার্য্য চমৎকার, এই প্রাসাদ থেকে একটি সুড়ঙ্গ-পথ গৌমুখ নামক ঝরণায় গিয়েছে। অন্তঃপুরিকারা এই পথে গৌমুখে স্নান করতে যেতেন। এই সুড়ঙ্গ-পথটি কখনও কখনও জহর-ব্রতের অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখন সুড়ঙ্গ-পথটির মধ্যে অল্প দূর মাত্র যাওয়া যায়,—কুম্ভের প্রাসাদে "বড়ি পোল" নামক সিংহদ্বারটি সুবৃহৎ। "ত্রিপোলিয়া" অর্থাৎ তিনদ্বার-প্রবেশপথটি প্রায় পুনর্নির্ম্মিত, তাই একটু খাপছাড়া দেখায়।

কুম্ভের প্রাসাদের কাছেই রাণা সঙ্গের মন্দির। তাঁর গুরু নারাণ দেবের সম্মানার্থে তিনি এই মন্দিরটি করেন। এই গুরুর দেওয়া একটি কবচ ধারণ ক'রে তিনি নাকি অনেক যুদ্ধ জয় করেছিলেন।

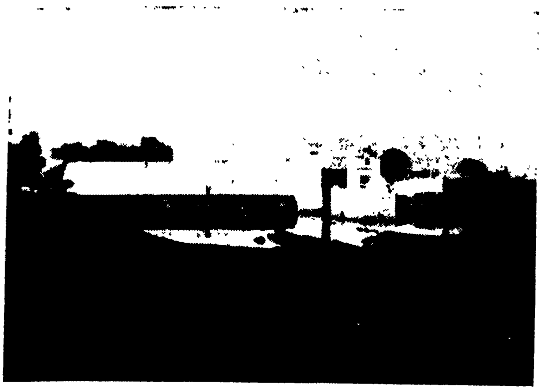

পদ্মিনীর প্রাসাদ চিতোর

কুম্ভের প্রাসাদের অদূরে ধাত্রী পান্নার গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। যে মহীয়সী নারী রাজবংশধরকে রক্ষা করবার জন্যে আপনার সন্তানকে স্বহস্তে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছিল, তার ভগ্ন গৃহটির পানে শ্রদ্ধাভরে চেয়ে রইলুম। যে-চিতোরের সামান্য একটি বেতনভোগী নারী এত মহান্, সে-দেশ এত বড় হয়েছিল, তার আর আশ্চর্য্য কি!

রাণা কুম্ভের প্রাসাদ থেকে বার হয়ে অল্প দূরে মহারাণা ফতে সিং নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়। চারিদিকের ভগ্নস্তূপের মধ্যে এই নূতন অটুট প্রাসাদখানি বড় বিসদৃশ ঠেকে। আমরা এর ভিতর যাই নি।

ফতে প্রকাশ মহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতবিশ দেওড়া, অর্থাৎ সাতাশটি মন্দির। এগুলি জৈন মন্দির। একাদশ শতাব্দীতে এগুলি তৈয়ার হয়। এগুলির সংস্কারের কাজ পূর্ণোদ্দমে চলছিল। সারি সারি বড় সুন্দর ভাবে তৈরি মন্দিরগুলি।

এর একটু দূরে কুম্ভশ্যাম মন্দির। রাণা কুম্ভ এই মন্দির তৈরি করেন ও ইহা মীরা বাঈয়ের মন্দির নামে খ্যাত। সুন্দর মন্দিরটি, বিস্তৃত অঙ্গন। এখানে বরাহমূর্ত্তি আছে। তার উত্তরে মীরাবাঈয়ের মন্দির, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মীরাবাঈয়ের শতস্মৃতিবিজড়িত মন্দিরটি মনটা উদাস ক'রে দিয়েছিল। মনে হ'ল এই প্রেমময়ী নারীর কৃষ্ণ-প্রেমরূপী শিলায় মহারাণার বুকভরা প্রেম প্রতিহত হ'য়ে ধূলায় লুটিয়েছে। কি জানি আমি মীরাবাঈয়ের রীতিমত এক জন ভক্ত হ'লেও মহারাণার প্রতি একটা নিবিড় সহানুভূতি আমার মনের কোণে লুকান আছে।

এতক্ষণ আমরা হেঁটেই বেড়িয়েছি, এবার টাঙায় উঠলুম। খানিক দূরেই জয়স্তম্ভ। ১৪৪৮ অব্দে মাণ্ডুর সুলতান মামুদকে পরাজিত ক'রে রাণাকুম্ভ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। চিতোরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে আজও বড় গর্ব্বেই এই স্তম্ভটি অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য অল্পস্বল্প সংস্কার এরও দরকার হয়েছিল, তবু এর বিশাল মূর্ত্তি মনটায় শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। স্তম্ভটির আগাগোড়া সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত: এর গায়ে হিন্দু পুরাণের নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছে। শোনা যায়, ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম্ম সুবিশাল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আসে, ততগুলি ধর্ম্মের প্রত্যেকটির প্রতীক জয়স্তম্ভের গায়ে অঙ্কিত আছে। কর্ণেল টড বলেছিলেন, জয়স্তম্ভের সঙ্গে একমাত্র কুতুব-মিনারের তুলনা হয়, কিন্তু কুতুবমিনার দীর্ঘতর হ'লেও কারুকার্য্য হিসাবে জয়স্তম্ভ অনেক উচ্চদরের।

জয়স্তম্ভের কাছেই রাজা ভোজের নির্ম্মিত সামিদেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরটি বেশ বড় ও এর কারুকার্য্যও খুব সুন্দর।

এর কাছেই কতকগুলি ছোট ছোট মন্দিরমত দেখা যায়। এগুলি মহাসতী নামে খ্যাত। পুণ্যবতী রমণীগণ যে-যে স্থানে স্বামীর চিতায় জীবনাঞ্জলি দেন, সেই সকল স্থানে এক একটি মন্দির গঠিত হয়।

এর পরে আমরা গোমুখে এলাম। উপরের একটি জলাশয় থেকে জল এসে একটি মর্ম্মরের গোমুখ দিয়ে চু-

সিঙ্গার চৌরী, চিতোর

সাতবিশ দেওড়া, চিতোর

তিনটি শিবলিঙ্গের ওপর পড়ছে। জলটি খুব পরিষ্কার। এক আঁজলা খেলাম ও মুখে চোখে দিলাম। জল শিবলিঙ্গের ওপর থেকে বয়ে গিয়ে নীচে আর একটি জলাশয় সৃষ্টি করেছে। এই জলাশয়টির নাম "শাস বহু কুণ্ড" অর্থাৎ শ্বশ্রূ ও বধূর কুণ্ড। এই জলাশয়ের জল আগে দু-ভাগে বিভক্ত করা ছিল, একটি শ্বশ্রূদের ও একটি বধূদের স্নানের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিভাগটি এখন নেই।

গৌমুখ থেকে কিছু দূরে হাতীকুণ্ড নামে আর একটি জলাশয় দেখা যায়। শোনা যায়, রাণাদের করীকুল এইখানে স্নান করত।

তার পর জয়মলের গৃহের ধ্বংসাবশেষ পার হয়ে আমরা পাট্টার গৃহে এলাম। পাট্টার গৃহটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন অবস্থায় আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য বাড়ীটির অনেক জায়গায় নীল রং করা আছে দেখা যায়। পাট্টার বাড়ীর সামনেই "পাট্টা জয়মলতাল" নামক জলাশয়।

আরও কিছু দূরে গিয়েই মালকা মাতার সুবিশাল মন্দির। এই মন্দিরটি দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। অনেকগুলি সোপান অতিক্রম ক'রে মন্দিরে পৌছলুম। ভেবেছিলুম এক দিন যে দেবী "মায় ভুঁখা হুঁ" ব'লে বার জন রাজদণ্ডধারী রাণার রক্ত চেয়েছিলেন, তাঁর মূর্ত্তি নিশ্চয় ভীষণ ও ভয়াবহ হবে। দেখলুম একটি ছোট্ট মিষ্টি দেবী-মূর্ত্তি। এই জাগ্রতা দেবী চিতোরের সব উত্থান-পতনের সাক্ষীরূপে বিদ্যমানা আছেন। অকৃত্রিম ভক্তিতে মাথা নুয়ে এল।

মালকা মাতার মন্দিরের সামনে সুরযকুণ্ড নামে একটি জলাশয়। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে, এত দিনের অযত্নেও চিতোরে এখনও যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে চাণ্ডার বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। ইনি কলির রামচন্দ্র, পিতার ইচ্ছানুসারে ছোট ভাই মুকুলকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। রাস্তার ওপারে নওগজাপীরের কবর দেখা যায়। ইনি নাকি ন-গজ দীর্ঘ ছিলেন।

এর পরে আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদে এলুম। এই প্রাসাদটি বেশ সযত্নরক্ষিত। প্রাসাদের দু-ধারে দুটি জলাশয়। সুউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা প্রাসাদ। এক দিকের জলাশয়ের মধ্যেও একটি ছোট প্রাসাদ আছে। যে ঘরটিতে দর্পণে পদ্মিনীর অসামান্য রূপরাশির ঝিলিক দেখে আলাউদ্দীন পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সে ঘরটি দেখলুম। কিন্তু ঘরগুলি সব তালাবন্ধ রয়েছে। পদ্মিনীর প্রাসাদে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, রূপের অগ্নিলীলা জগৎ তিন বার দেখেছে, একবার যখন রূপের বহ্নিতে সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, আর একবার যখন রূপের আগুনে ট্রয় পুড়েছিল, আর একবার যখন পদ্মিনীর পবিত্র রূপদীপ্তি রক্ষা করতে সহস্র সহস্র রাজপুত সেনা সমরানলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পদ্মিনীর প্রাসাদের অদূরে "ভাক্সী" নামক একটি গৃহ। এই গৃহটিতে রাণা কুম্ভ মালবের সুলতান মহম্মদ শাকে বন্দী ক'রে রাখেন।

মৌরী রাজগণের সময়কার কিছু ভগ্নস্তূপও বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইট ও পাথর ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

চিতোর থেকে মাইল-খানেক দূরে দক্ষিণে একটি ঢিবি মতন ছোট পাহাড় দেখা যায়। শোনা যায়, ঢিবি অবরোধের সময় আকবর এই ঢিঠিটি তৈয়ার করান। প্রতি ঝুড়ি মাটির জন্যে তিনি নাকি একটি ক'রে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। সেই জন্যে এর নাম "মোহর মোগরি"। একে চিতোরিও বলা হয়।

এবার আমরা উত্তর-পূর্ব্বে মোড় ফিরলুম। একটু দূরে গিয়ে একটি বাঁধান বেদী মতন দেখা গেল। মৌরী রাজাদের সময় এখানে নাকি রাজ্যাভিষেক হ'ত। এর নাম রাজটিলা।

খানিক দূরে গোরা ও বাদলের গম্বুজ দেখা গেল। এঁরা আলাউদ্দীনের চিতোর অবরোধের সময় বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপুতের বাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করেন।

চাণ্ডার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রাও রাইমলের গৃহ এখনও বিদ্যমান আছে। এর পরে কয়েকটি বাঁধান বেদী দেখা যায়, খুব সম্ভব এখানে জহরব্রত অনুষ্ঠান হয়েছিল।

পথের পশ্চিমে ত্রিমূর্ত্তি মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির। এটি ১৩৯৪ সালে মহারাণা রায়মল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের ভেতরে গেলুম। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি কখনও দেখি নি। মন্দিরে সে সময় ধোওয়া-পোঁছা হচ্ছিল। প্রকাণ্ড ঘণ্টা কষ্টে নাড়া দিয়ে সামান্য দক্ষিণা দিয়ে চলে এলাম। কুম্ভশ্যাম মন্দির ও মালকা মাতার মন্দিরে মন্দির-রক্ষক দক্ষিণা নিয়ে কিছু গোলমাল করেছে। কিন্তু এই মন্দিরে এইটি বড় ভাল লাগল, আমরা কি দিলাম না-দিলাম, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

মন্দির ছাড়িয়ে একটু দূরে সুরযপোল নামক একটি দ্বার আছে। আকবরের চিতোর-অবরোধের সময় সালুম্বরের সেনদাস উদয়সিংয়ের অনুপস্থিতিতে অমিতবিক্রমে এই দ্বারটি রক্ষা করেন। এখানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে স্থাপিত একটি বেদী আছে।

আর একটু দূরে এক মহাজনের তৈরি কীর্ত্তিস্তম্ভ। এটি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এটিতে আমরা উঠি নি। এটিরও কারুকার্য্য খুব সুন্দর।

এর পর আমরা রাণা হামীরের তৈরি অন্নপূর্ণার মন্দির ও বাপ্পারাওয়ের তৈরি বাণমাতার মন্দির দেখলুম।

এর খানিক দূরে "হিঙ্গল আহারার মহল" নামক একটি প্রাসাদ আছে। শোনা যায়, উদয়সিং চিতোর ত্যাগ করবার আগে এখানে থাকতেন। এই ভগ্ন প্রাসাদের সামনে প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে আজও ঢোল বাজান হয়।

দূরে একটি ছোট দ্বার দেখা গেল। এইখানে নাকি এক লক্ষ লোক হত হয়েছিল। তাই এর নাম "লাখোটা বাড়ি"।

এর পর আমরা "ভীমলাৎ কুণ্ডে" এলাম। এ জলাশয়টি বেশ বড়। শোনা যায়, নির্ভয়নাথ নামক এক যোগীর কথায় ভীম এক রাত্রির মধ্যে চিতোরগড় নির্ম্মাণ করতে প্রতিশ্রুত হন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে যোগীর সাধনার সব ফল ভীমকে দিতে হবে। যোগী যখন দেখলেন ভীম সত্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন ক'রতে সফল হবেন, তখন তিনি ভোর হবার পূর্ব্বেই মিথ্যা কুক্কুটের ডাক ডাকেন। ভীম কার্য্য অসমাপ্ত থাকায় বিরক্তিতে পা ছোঁড়েন, তাতে নাকি এই জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের মতে অবশ্য অন্য কথা শোনা যায়।

খুঁটিনাটি কিছু জিনিস দেখতে এখনও বাকি ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তার ধূসর ছায়াতলে ম্লানমুখী চিতোর আরও করুণ হয়ে উঠেছে, আমরা ফেরার পথ ধরলাম। নিস্তব্ধ, অসাড় চিতোরের পানে বার বার ফিরে চাইলাম। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি করুণ লাইন কানে বাজতে লাগল।

এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর?

সারাদিন দেখবার উৎসাহে আগ্রহে বুঝতে পারি নি চিতোর মর্ম্মমূলে কতখানি নাড়া দিয়েছে। এখন সমস্ত মনটায় অবসাদ ছেয়ে এল। সেই বিশাল দুর্দ্ধর্ষ মোগল-বাহিনীকে বার বার প্রতিহত করেছে এই চিতোরের মুষ্টিমেয় সেনা। এই রাণা প্রতাপের চিতোর, ঘাসের বিছানায় শুয়ে, পর্ণপাত্রে আহার ক'রে চিতোর-উদ্ধারের ব্যর্থ স্বপ্নে জঙ্গলে জঙ্গলে তাঁর দিন কেটেছে। সে মহৎ প্রাণ আজ কোথায়? মেবারের রাণা আজও শয্যাতলে খড় রেখে শয়ন করেন ও স্বর্ণপাত্রের নীচে পাতা রেখে আহার করেন, কিন্তু আজ সব হারিয়ে গেছে, ঐ চিতোরের ইট-পাথরের সঙ্গে তার আত্মাও মরে গেছে। সমস্ত মনটা ব্যথায় টন টন ক'রে উঠল, কিন্তু সত্যি কি ম'রে গেছে? না, যে অমর সে মরবে কেমন ক'রে? ঐ মহাশ্মশানের প্রতিটি ইট যে ডেকে ডেকে বলছে :—

"আবার তোরা মানুষ হ,
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ।"

ক্ষণিকের দেখা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মেঘডম্বরে আজি আষাঢ়ের জেগেছে নবীন চেতনা
অম্বরে ওঠে ঘন কাল মেঘ শিহরি বিরহ-যাতনা ;
কবে কোন দিন কুটজ অর্ঘ্য লয়ে'
গেয়েছিল গান বিরহে বিভোর হয়ে'
দাঁড়ায়ে যক্ষ বিরহী, কাতর কামে
জাগর ক্লান্ত নিশির প্রান্ত যামে ;
সে গান ভাসিয়া আসিছে হেথায় দূর-দুরান্ত লোকে
কবির ছন্দে ভাষার বন্ধে মন্দাক্রান্তা শ্লোকে।

২

আজি কদম্ব মেলিছে তাহার পুলক বিহ্বল আঁখি
কাদম্বিনীর শিহরে বিহ্বল শাখায় কাঁপিছে পাখী ;
গর্জনে তার বাজে মৃদঙ্গধ্বনি
শিখী নাচে তার দুলায়ে পাখার মণি,
ছাতিম ফুলের উৎকট বাস ছুটে
কেতকী পরাগ পবনের গায় লুঠে,
অভিষেকধারে সিক্ত মাটির সৌরভ ধায় ছুটে
নিঝর ধারায় ভূমিচম্পার পুষ্প উঠিছে ফুটে।

৩

প্রথম পয়োদে ঝর ঝর ঝর ঝরিছে সলিল ধারা
প্রাণরস যেন ভূতলে নামিয়া প্রাণরসে হয় হারা ;
ধূলিবিধৌত বনস্পতির শাখা
উল্লাসে নাড়ে হরিত কান্তি পাখা,
বলাকার সাথে গগনে উড়িতে চায়
উড়িতে সে নারে শৃঙ্খল বাঁধা পায় ;
ফুটিছে মালতী, ঝরিছে বকুল, পবনে চম্পা দোলে,
উৎসবরস উচ্ছলি ওঠে সারা ভুবনের কোলে।

৪

সুন্দর আজ সুন্দর হয়ে' গগনে ভুবনে ছুটে
ভুবনপতির মহা আনন্দ কি মহাছন্দে লুঠে ;
আমারে ভুলাতে পেকেছে জম্বু ফল
ঘননিকুঞ্জে পেকেছে আম্রদল,
ফুলের গন্ধে পবন মন্দ বহে
গুমরি গরজি মেঘেরা কি কথা কহে ;
বিরহী প্রাণের শত কামনায় নিয়ত যে ভাষা ফুটে
মহাধরণীর মর্মের বাণী চঞ্চলি সেথা উঠে।

৫

লয়েছ যে বাসা মহামানবের হৃদি-শতদল দলে
সুন্দর তোমা তাই ত দেখাও দিবসে দণ্ডে পলে ;
যেথা ভুবনেরে বুদ্ধিতে পেতে চাই
ধরা নাহি পাই কোথা নাহি তার ঠাঁই,
ধরিতে না পারি তাহারে কাজের ফাঁদে
বিলাসে হাসিয়া পলায় নানান্ ছাঁদে ;
ঋতুতে ঋতুতে কিশলয় ফুলে নব নব বাস পরি
হৃদয় ভুলানো নিতেছ নিয়ত হৃদয় নয়ন হরি।

৬

তবুও অধরা থমকি বক্ষে কভুও চমক হানে
উল্লাসে তারে চিত্ত তখনি আপন বলিয়া মানে ;
মনন বচন অতীতে তবু সে রহে
নিরালা মনের গোপনে বাক্য কহে,
পেয়েছি পেয়েছি হৃদয়ে তাহারে জানি
তবু সঙ্কোচে ফোটে না একটি বাণী,
নিমেষ-নিহত বাহির ভুবনে অপলকে চেয়ে রহি
রূপের ভাষায় আমারে ভুলায়ে ওঠে সে বাক্য কহি।

৭

শিরায় শিরায় সেই অনুভব উচ্ছলি যায় চলে
মেঘ-মৃদঙ্গে ফুল-অঙ্গনে বরষার ছলছলে ;
ক্ষণে দেখা ক্ষণে হারাই নানান্ কাজে
ভুলে যাই, দেখে আবার মরি যে লাজে,
ভুলে যাই তবু ফের সে যে আসে ফিরে
নৃত্য তাহার নিয়ত আমায় ঘিরে,
এস এস এস নবজলধর আন গো বার্তা নব
নিত্য কালের পুলক জাগাও ক্ষণে ক্ষণে অভিনব।

৮

দেখেছি তাহারে এ কথা বলিতে নিয়ত যে পাই ভয়
তবুও দেখেছি একথা জানি যে তেমনি অসংশয় ;
সন্দেহ যেথা সহসা মনেতে হানে
মিথ্যা সেথায় মনেতে তন্দ্রা আনে,
ক্ষুদ্র আমির নিত্য যে পরাজয়
তোমার পরশে নাহি ত সেথায় ভয়,
বাসরের সাজে ধরণী নাচিয়া আসিয়াছে অভিসারে
চিত্ত যেন গো মানুষের মাঝে বরিতে তাহারে পারে।

৯

এসেছে ঝঞ্ঝা কেঁপেছে মেদিনী ইন্দ্র হেনেছে বাজ
নিষ্ঠুরঘাতে মানুষে হানিয়া ভুবনে ব্যেপেছে লাজ ;
পশু হ'তে পশু মানুষেরে বার বার
দেখেছি করিতে ত্রিভুবন ছারখার,
বিশ্বাস তবু রেখেছি তাহার মাঝে
নহিলে মরি যে আপনি আপন লাজে,
ভুবন ভোলানো ইঙ্গিত মোর ক্ষণে ক্ষণে আসে কানে
নানা কলঙ্ক-পঙ্ক মাঝারে চিত্ত মানুষে মানে।

বঙ্গীয় গ্রাম্যশব্দ-কোষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য কবিবরের অন্তিম অভিলাষের অনুযায়ী একখানি গ্রাম্যশব্দ-কোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই অভিলাষ কার্যে পরিণত করিতে হইলে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কার্য আরম্ভ করিতে হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই কার্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক দিন পূর্বেই এইরূপ অভিধান সংকলনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, যথোপযুক্ত অর্থ ও সহায়তার অভাবে কার্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, পরিষৎ হইতে এ বিষয়ে যে কিছু কাজ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ছাপা আছে। গ্রাম্যশব্দ-কোষের কার্যে হাত দিবার পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ বা অন্য স্থান হইতে যে সমস্ত কাজ হইয়াছে তাহার একটা হিসাব ও পরিচয় লওয়া দরকার। পরিষদের গ্রাম্যশব্দ-কোষের কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকাকালে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম বর্তমানে তাহাই এখানে প্রকাশ করিতেছি।

গ্রাম্যশব্দ-কোষ প্রণয়ন ও সেই জন্য গ্রাম্যশব্দসংকলন ব্যাপারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎই অগ্রণী এমন কথা বলা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের জন্মের বহু পূর্বে ১২৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে তৎকালে কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত অসংস্কৃত গ্রাম্য শব্দের একটি তালিকা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, আধুনিক কালের প্রথম যুগে প্রকাশিত একাধিক বাংলা গ্রন্থে গ্রাম্যশব্দপ্রয়োগের এত বাহুল্য দেখা যায় যে একখানি গ্রাম্য-শব্দ-কোষের অভাবে অনেক স্থলে অর্থবোধ দুষ্কর হইয়া উঠে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লেউয়িন (Lewin) সাহেব চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের গ্রাম্য-শব্দ সংকলন করিয়া প্রকাশিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম Hill Tracts of the Chittagong and the dwellers therein with comparative vocabularies of the hill dialects. ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি অ্যাণ্ডারসন্ (J. D. Anderson) সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্য শব্দ সংকলন করিয়া A Short list of Words of the Hill Tippera Language গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত শব্দকোষ পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রহ ছাড়া পরিষৎ-পত্রিকায় এ যাবৎ বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, মালদহ, পাবনা, যশোহর*, ঢাকা, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা, বগুড়া, মুরশিদাবাদ, খুলনা, চট্টগ্রাম, বীরভূম, ফরিদপুর ও শ্রীহট্ট এই সকল জেলা হইতে সংগৃহীত শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দসংকলন ও প্রকাশের কার্যে পরিষৎ হস্তক্ষেপ করার পরেও বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থান হইতে গ্রাম্য শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'মেময়রস্ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'র সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত পার্জিটর সাহেবের শব্দসংকলন ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ-প্রকাশিত গৌরচন্দ্র গোপ-রচিত 'ত্রিপুরা জিলার কথ্য ভাষা' নামক গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি রচিত অভিধানেও মাঝে মাঝে গ্রাম্যশব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—কিন্তু শব্দগুলির আকর যথাবিধি উল্লিখিত হয় নাই।

ব্যাপকভাবে গ্রাম্য শব্দকোষ সংকলনের চেষ্টাও নানা স্থান হইতে করা হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে দুই জনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন হুগলি কৈকালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

* ১৩৩৮ সনের ফাল্গুন মাসের 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও যশোহরের কতকগুলি গ্রাম্যশব্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজকুমার বেদস্মৃতিতীর্থ ও আর একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ভূতপূর্ব সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। বেদস্মৃতিতীর্থ মহাশয় ১৩১৭ সালে পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলেন—'দশ বৎসরের চেষ্টার ফলে আমি গ্রাম্য-শব্দ-কোষের কাঠাম সৃষ্টি প্রায় শেষ করিয়াছি' (পৃ. ৩৫)। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় তিনি বিভিন্ন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির সাহায্যে খুলনা, যশোহর, বীরভূম, নদীয়া, শ্রীহট্ট, রংপুর, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, পাবনা ও ঢাকা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় কতকগুলি শব্দ লিথো-মুদ্রিত করিয়া নানা জেলার বৈশিষ্ট্য নির্দেশের জন্য উহা পুস্তিকাকারে নানা জেলার লোকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টার কি ফল হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে গ্রাম্যশব্দ-কোষ সংকলন বিষয়ে অগ্রণী হিসাবে ইঁহারা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই। নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত উপকরণ অবলম্বন করিয়া একখানি গ্রাম্যকোষ সংকলনের ব্যবস্থার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৩৪ সালে কয়েক জন সাহিত্যিককে লইয়া একটি 'গ্রাম্যশব্দকোষ-সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসর এই সমিতি কিছু কিছু কাজ করেন—কিন্তু কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

একখানি বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষের অভাব ও উপযোগিতা অনেক দিন হইতেই সাহিত্যিক সমাজ অনুভব করিয়া আসিতেছেন সত্য,† কিন্তু সুশৃঙ্খল ও আশানুরূপ কার্য এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে সমস্ত সংকলন এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণাঙ্গ নহে—তাহা ছাড়া, কোনও সুসম্মত নিয়ম অবলম্বন করিয়া এগুলি প্রস্তুত করা হয় নাই। ফলে এগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও কেবল ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া চলে না। একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রণয়ন করিতে হইলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে বিভিন্ন স্থান হইতে শব্দ সংকলন করিতে হইবে—সেই সমস্ত সংকলন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। এজন্য চাই দীর্ঘ কালের একনিষ্ঠ সাধনা। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। ইংরেজী ভাষার গ্রাম্যশব্দ-কোষ প্রস্তুত করিতে অধ্যাপক রাইট্ সাহেবকে শুধু শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহস্র লোকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই বিশাল গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করিতে পঁচিশ বৎসরের নিরন্তর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহস্রের অধিক শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত ইংলিশ ডায়ালেক্‌টিক সোসাইটী ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডেও এইরূপ স্কচ গ্রাম্য-শব্দ-সমিতির একদল পণ্ডিত বিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে সকল কার্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ Transactions of the Scottish Dialects Committee গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সময় ও অর্থব্যয়ের ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অল্পকালের মধ্যেই শব্দশাস্ত্রের অনেক অমূল্য রত্ন নষ্ট হইয়া যাইবে—ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া সেটা বিশেষ ভাবিবার কথা। মুদ্রাযন্ত্র ও নাগরিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া গ্রাম্য শব্দ, গ্রাম্য সভ্যতা ও গ্রাম্য রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার আজ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাংলার লৌকিক শব্দ ও 'লোকসাহিত্য'কে অচিরে উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিলে রবীন্দ্রনাথের পারত্রিক তৃপ্তি ও দেশের অতীত সম্পৎ সংরক্ষণের কার্য একই সঙ্গে হইবে। বহুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এদিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অচিরে বিশ্বভারতী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রাম্যশব্দ-কোষ সংকলনের যথাবিধি ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রকৃত সম্মানপ্রদর্শন ও তাঁহার যথোচিত স্মৃতিরক্ষা করা হইবে এবং বাংলা সাহিত্যের একটা গুরুতর অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই।

† 'জাহ্নবী' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয়, ১৩১৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদস্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও ১৩৩৫ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সংগ্রাম

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

অন্তরে বাহিরে চলে নিয়ত সংগ্রাম
সেই ত সৃষ্টির গতি—শেষ পরিণাম
সেই ত আনিবে ; যত বিকারবক্রতা
বিষময় বিদ্বেষের সঞ্চিত শক্রতা
সেই ত হানিবে ; দিবে শক্তি করি ক্ষয়
সৃষ্টির আনন্দ যাহা করে অপচয়।
সংগ্রাম জড়ত্ব-নাশা-নিরাশা উৎসন্ন—
নবশক্তি বলে নব আনন্দ উৎপন্ন
সেই ত করিবে ; পুঞ্জ পুঞ্জ গ্লানি
অগ্নিমুখে দগ্ধ করি, সেই দিবে আনি
শুদ্ধির স্বচ্ছতা, দৃষ্টি করিবে সরল
সুন্দরে নিরখি সৃষ্টি আনন্দ-বিহ্বল।
আত্মার অনন্ত দীপ্তি কেহ রুধিবে না
জ্ঞান-চক্ষু ফুটি রবে কভু মুদিবে না।

মনুষ্যেতর প্রাণীর শিল্পনৈপুণ্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর মত, ব্যষ্টিগতভাবেই হউক কি সমষ্টিগতভাবেই হউক, জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আহার, আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের প্রবৃত্তিও তাহাদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। জীবের শত্রু পদে

বোতলের মত আকৃতিবিশিষ্ট আফ্রিকার বাবুই পাখীর বাসা

পদে। জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। তা ছাড়া স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যও তাহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী বিভিন্ন উপায়ে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীই আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রধানতঃ বহির্বেষ্টনী অথবা বিচিত্র রকমের আবাসস্থলের আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গ, এমন কি, আণুবীক্ষণিক কীটাণু পর্য্যন্ত—অন্ততঃ নিদ্রা বা বিশ্রামের সময়—কোন-না-কোনরূপ সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বাসগৃহ বা তদনুরূপ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণে মানুষ তাহার সৌন্দর্য্যবোধের চরম উৎকর্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু আবাসস্থল নির্ম্মাণে মনুষ্যেতর বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। বহুদিনের সাধনার ফলে মানুষ শিল্পকার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীরা সংস্কারবশেই জন্মাবধি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। বিশেষ বিশেষ শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিতে মানুষের মত তাহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হয় না। কিন্তু বংশানুক্রমিক নির্দ্দিষ্ট শিল্প ছাড়া তাহারা নূতন কোন কলা-কৌশলেরও উদ্ভাবন করিতে পারে না। ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পরেই মাকড়সার বাচ্চা পরিণতবয়স্ক মাকড়সাদের মতই নিখুঁৎ জাল নির্ম্মাণ করে। বোল্‌তা, প্রজাপতির বাচ্চারা অপরিণত অবস্থাতেই তাহাদের দেহাবরণ-নির্ম্মাণ করে। এজন্য তাহাদের কোনরূপ শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না। বাচ্চা, মৌমাছি রূপ পরিগ্রহ করিবার পরই পরিণতবয়স্কদের মত মধুচক্র নির্ম্মাণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

বিভার নামক প্রাণীরা তাহাদের আবাসস্থল-নির্ম্মাণে অপূর্ব্ব দক্ষতা ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেয়। জল-

ফলের মত আকৃতিবিশিষ্ট আফ্রিকার বাবুই পাখীর বাসা

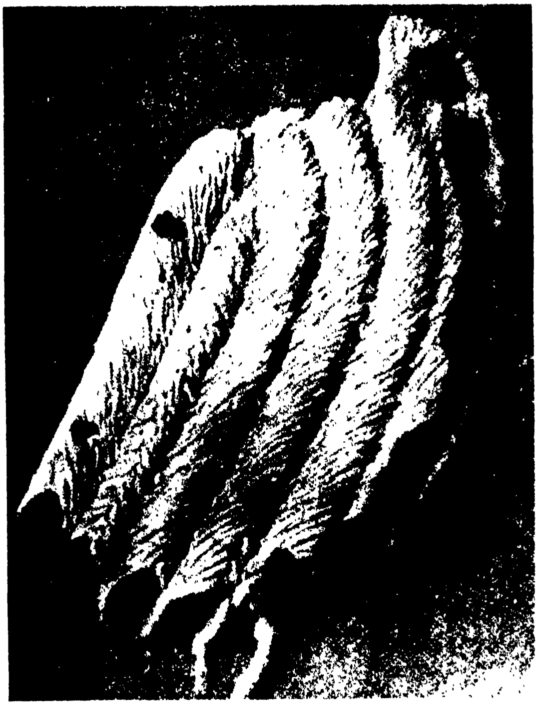

কুমুরে পোকার বাসা

স্রোতের মধ্যে বাসোপযোগী উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া একপরিবারভুক্ত অনেকগুলি বিভার ভিন্ন ভিন্ন গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। প্রত্যেকটি গর্ত্তের দুইটি করিয়া মুখ। এক দিকের প্রবেশ-পথ থাকে ডাঙার উপর; অপর দিকের পথটি থাকে জলের নীচে। স্রোতের জল কমিয়া গেলে জলের নীচে লুক্কায়িত মুখটি শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত হইবার আশঙ্কায় তাহাদের আবাসস্থলের কিছু দূরে জলস্রোতের আড়াআড়ি ভাবে মোটা মোটা বৃক্ষকাণ্ড, ডালপালা কাটিয়া আনিয়া মাটি ও ঘাসপাতা সহযোগে সুদীর্ঘ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। সময় সময় এই বাঁধ দশ-বার ফুট চওড়া ও দুই তিন শত গজ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহারা যেরূপ একযোগে সুশৃঙ্খলার সহিত বড় বড় গাছ একটু একটু করিয়া দাঁতে কাটিয়া জলে ভাসাইয়া লইয়া আসে তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। নির্দ্দিষ্ট গভীরতা রক্ষার জন্য বাঁধের সাহায্যে জল আটকাইয়া এক প্রকার কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করে। প্রয়োজনমত তাহারা হ্রদের জলে ডুবাইয়া সাঁতার কাটিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। আবাসস্থল নির্ম্মাণের এরূপ পরিকল্পনা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

বেটং নামক অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রকার কাঙারু-ইঁদুর মাটির নীচে গর্ত্তে বাস করে। গর্ত্তটিকে বাসোপযোগী করিয়া সজ্জিত করিবার জন্য ইহারা অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। শুষ্ক ঘাস ও লতাগুল্মাদির সাহায্যে গর্ত্তের অভ্যন্তরভাগ কোমল ও সুদৃশ্য আস্তরণে আবৃত করে। শুষ্ক তৃণ ও লতাগুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া তাহারা একত্র করে এবং লেজের সাহায্যে গড়াইতে গড়াইতে তাহা বাসায় লইয়া আসে। তার পর বাছিয়া বাছিয়া সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। কাঠবিড়ালীরাও নানা স্থান হইতে খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া কোমল এবং আরামপ্রদ বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাসার বহির্ভাগ সুদৃশ্য না হইলেও অভ্যন্তরভাগ অতিশয় নরম ও মসৃণ।

বানর-জাতীয় প্রাণীরা মানুষের মত হাতের ব্যবহার জানিলেও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মত কোন শিল্পকৌশলের পরিচয় দিতে পারে না। ইহারা বাসোপযোগী কোনও আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করে না, তবে ইহাদের মধ্যে একমাত্র শিম্পাঞ্জিদিগকেই এক প্রকার আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। শিম্পাঞ্জিরা মাটি হইতে প্রায় ২৮ ফুট উপরে চতুর্দ্দিকের গাছের ডাল নোয়াইয়া মাচার মত এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। ডালগুলিকে আবার শক্ত লতার সাহায্যে গাছের কাণ্ডের সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া দেয়। বর্ষার প্রবল বারিপাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডালপালার সাহায্যে চালার মত ছাউনি তৈয়ারী করিয়া

বঙ্গদেশীয় এক প্রকার বাবুই পাখীর বাসা

পশম ও তন্তুনির্ম্মিত পাখীর বাসা

অনেক সময়ে তাহার নীচে বসবাস করে। প্রকৃত প্রস্তাবে বাসা নির্ম্মাণের কার্য্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মত ইহাদের তেমন কোন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় ইঁদুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকেই গর্ত্তে অথবা গৃহাভ্যন্তরে নিভৃত স্থানে বাস করে। কিন্তু গেছো ইঁদুর নামে মাঝারি ধরণের এক প্রকার ইঁদুর শস্যক্ষেত্র, বা বাঁশ বেতের ঝোপের মধ্যে সরু ও কোমল ডাঁটা পাতাগুলিকে একত্র করিয়া গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসা নির্ম্মাণে ইহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে।

কিন্তু জন্তুজানোয়ার অপেক্ষা পাখীরাই বাসগৃহনির্ম্মাণে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে বেশী। আমাদের দেশীয় বাবুই পাখীর বাসানির্ম্মাণের অপূর্ব্ব নিপুণতা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় বাবুই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই প্রায় একই স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। বাবুই পাখী সাধারণতঃ শক্ত আঁশযুক্ত তাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছের ডালেই বাসা তৈয়ারী করে; কিন্তু পূর্ব্ব-আফ্রিকার রক্ত-চঞ্চু বাবুইরা যে-কোন গাছের ডালে বাসা বাঁধে। ঐ স্থানের এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় বাবুই খেজুরের ডালে গোলাকার ফলের মত অসংখ্য বাসা নির্ম্মাণ করে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন ডালের গায়ে ফল ধরিয়াছে। কোন কোন বাবুই বৃক্ষের কচি কচি পল্লব একত্র জুড়িয়া দলবদ্ধভাবে বাসা বাঁধে। বিভিন্ন জাতীয় বাবুইয়ের বাসার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর সকল জাতীয় বাবুইয়ের বাসা নির্ম্মাণেই তাহাদের অপূর্ব্ব শিল্পকুশলতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার ফ্যান্‌-টেল ও মিজ্‌ল্‌টো পাখীরা বাসা-নির্ম্মাণে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। মিজ্‌ল্‌টো পাখীরা তুলা, পশম বা কোমল পালক সংগ্রহ করিয়া থলিয়ার মত ঝুলান বাসা নির্ম্মাণ করে। তুলা বা পশমের অভাবে গাছের কোমল তন্তু সংগ্রহ করিয়া বাসার অভ্যন্তরভাগে মখমলের মত নরম আস্তরণ প্রদান করে। বাহির হইতে হঠাৎ দেখিলে বাসাটিকে তত সুদৃঢ় মনে হয় না; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সুদৃঢ় তন্তুর সাহায্যে দৃঢ় ভাবেই নির্ম্মিত হয় এবং কতকগুলি বাচ্চার ভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে পারে। ফ্যান-টেল পাখীরা গাছের ডাল ও মাকড়সার সূত্র সাহায্যে ফুদেলের মত সুদৃশ্য বাসা তৈয়ারী করে। অনেক সময় গাছের সরু ডালের সাহায্যে বাসাটিকে তলার দিক হইতে ঠেকা দিয়া রাখে, এবং ডালটির উপরেও আস্তরণ দিয়া দেয়।

অষ্ট্রেলিয়ার ফ্যান্‌-টেল নামক পাখীর বাসা

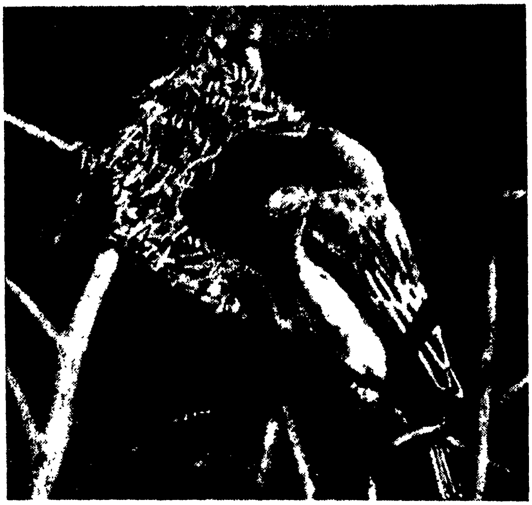

আফ্রিকার রক্ত-চঞ্চু বাবুই পাখীর বাসা

আমাদের দেশীয় জংলী-ফিঙেরাও ছোট ছোট গাছের তিনটি ডালের মধ্যস্থলে কাদা ও খড়কুটার সাহায্যে ঐরূপ বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসার চতুর্দ্দিকে শ্যাওলার আস্তরণ দিয়া আরও সুদৃশ্য করিয়া তোলে।

এক জাতীয় ফিঙে পাখী তাহার মুখের লালা বা থুথু জমাইয়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে পেয়ালার মত সুদৃশ্য বাসা নির্ম্মাণ করে। এই পাখীর বাসা চীনাদের অতি প্রিয় খাদ্য। এই থুথু-জমান পাখীর বাসা তাহারা 'সুপে'র মত রান্না করিয়া খায়। কিন্তু এই বাসা এতই দুর্ম্মূল্য যে, সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা এক প্রকার অসম্ভব। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কুঞ্জপাখীর সৌন্দর্য্যবোধ অতীব বিস্ময়কর। অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি ও তৎসন্নিহিত দ্বীপসমূহে এই পাখী যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্গীয় পাখীর সহিত ইহাদের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক আছে। সরু সরু কঞ্চি ও ঘাসের সাহায্যে পুরুষ-কুঞ্জপাখী তাহার আবাসস্থল নির্ম্মাণ করে এবং স্ত্রী-পাখীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সুদৃশ্য ঝিনুক পাখীর পালক বা রঙীন প্রস্তর বাসার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রাখে। সময় সময় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা জাতীয় রঙীন ফুলফলও সংগ্রহ করে। স্ত্রী-পাখী উপস্থিত হইলে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনার্থ পুরুষ-পাখী বাসার সজ্জিত প্রাঙ্গণেই নৃত্য করে।

গুঞ্জনকারী পাখী, চাফিন্স পাখী এবং আমাদের দেশীয় টুনটুনি পাখীরা বয়নকার্য্যে সুনিপুণ। ইহারা মাকড়সার সুতা, তুলা বা অন্য কোন তন্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে গাছের পাতা সেলাই করিয়া 'পকেটে'র মত সুদৃঢ় বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসা বুনিতে ইহারা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

বাবুই পাখীর মত এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় সামাজিক পাখী দেখা যায়। ইহারা বাবলা-জাতীয় শক্ত গাছের একটি ডালেই পরস্পর সংলগ্ন ভাবে মাটি ও খড়কুটার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। প্রত্যেক বাসার একটি করিয়া সরু ছিদ্রের মত প্রবেশপথ থাকে। এক-একটি ডালে প্রায় তিন-চারি শত পাখী বাসা বাঁধে। অনেক সময়ই মাটির ভারে ডাল ভাঙিয়া পড়ে এবং বহু বাচ্চা ও ডিম নষ্ট হইয়া যায়।

পাখীদের চেয়েও নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে আবাসস্থল নির্ম্মাণে অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাকড়সার জাল শিকার ধরিবার ফাঁদও বটে, আবার বাসস্থলও বটে। বিভিন্ন-জাতীয় মাকড়সারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য কৌশলে যেরূপ বিচিত্র জাল রচনা করে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ক্ষুদ্র মনিব্যাগের মত আরশোলার ডিমের থলিও অতীব বিস্ময়ের বস্তু। অপরিণতবয়স্ক রেশম-কীট ও বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা তাহাদের গুটি নির্ম্মাণে যে অপূর্ব্ব

এক জাতীয় ফিঙে পাখীর থুথু-জমান বাসা

এক জাতীয় শুঁয়ো-পোকা সূতার সাহায্যে পাতা মুড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে

কলাকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে, শিল্পকুশলী মানুষের পক্ষেও তাহা অনুকরণ করা দুঃসাধ্য। লাল-পিঁপড়েরা সামাজিক জীব। তাহারা দলবদ্ধভাবে যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। কতকগুলি পিঁপড়ে সারবন্দি ভাবে পল্লবের দুইটি পত্রকে কামড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখে। অপর পিঁপড়েরা তখন মাকুর মত বাচ্চাগুলিকে মুখে করিয়া সেস্থলে উপস্থিত হয়। পিঁপড়েরা শুঁড় দিয়া বাচ্চাগুলির মুখে সুড়সুড়ি দিলেই তাহারা অতি সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করে। এই সূতা যেখানে লাগান হয় সেখানেই আঁটিয়া থাকে। বাচ্চার মুখনিঃসৃত সূত্রসাহায্যে পিঁপড়েরা পরস্পর-সংলগ্ন পাতাগুলিকে জুড়িয়া দেয়। ব্যবধান বেশী থাকিলে বারংবার সূতা বুনিয়া পাতলা কাগজের মত পর্দ্দা তৈয়ারী করে এবং ফাঁক বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে বহু পাতা পরস্পর জুড়িয়া দুই দিনের মধ্যেই তাহারা প্রকাণ্ড বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে। সূতায় বোনা পাতলা পর্দ্দার সাহায্যে বাসার অভ্যন্তরে অসংখ্য কুঠুরি নির্ম্মাণ করে। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। হাত-পা শূন্য বোলতা, ভীমরুল বা কোন কোন পিপীলিকার বাচ্চারা দেখিতে লম্বাটে কুলের বীজের মত। কিছু কাল অনবরত আহার করিবার পর গুটি বাঁধিবার সময় হইলেই ইহারা মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূতা বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় অথবা শরীরের চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় আবরণী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে। অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাদের পক্ষে এরূপ নিখুঁত ও বিচিত্র আকৃতির আবরণী নির্ম্মাণ করা যে বিস্ময়কর ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ভ্রমর মৃত কোন বৃক্ষকাণ্ডে লম্বা ছিদ্র করে অথবা ফাঁপা কোন বৃক্ষকাণ্ড নির্ব্বাচন করিয়া কচি পাতা সংগ্রহে বাহির হয়। গোলাপ বা অন্য কোন গাছের কচি পাতা ডিম্বাকারে কাটিয়া এক এক করিয়া নির্ব্বাচিত গর্ত্তে লইয়া আসে। এই পত্রখণ্ডগুলিকে রোলারের মত গোলাকারে মুড়িয়া ছিদ্রের মধ্যে পর পর অনেকগুলি কুঠুরি নির্ম্মাণ করে এবং প্রত্যেকটি কুঠুরিতে এক একটি ডিম পাড়িয়া রাখে। পত্রখণ্ডগুলি ভাঁজে ভাঁজে এমন ভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখে যে দেখিলে ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই।

আমাদের দেশে বহু জাতীয় কুমুরে পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহারা বাসা-নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করে। কেহ কেহ মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে; কিন্তু অনেকেই দেয়াল, কার্ণিশ বা বেড়ার গায়ে মাটি দিয়া বাসা তৈয়ারী করে। বহু দূর হইতে এক এক ডেলা নরম মাটি সংগ্রহ করিয়া মুখের সাহায্যে অতি অদ্ভুত কৌশলে একটি

কুঞ্জ পাখীর বাসা

বিভিন্ন জাতীয় প্রবাল-কীটের বাসা

সুড়ঙ্গের মত গড়িয়া তোলে। সুড়ঙ্গের উপরিভাগের কারুকার্য্যও বিচিত্র। একটি সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ শেষ হইলে মাকড়সা সংগ্রহে বাহির হয়। বাচ্চাদের একমাত্র খাদ্য মাকড়সা। দশ-পনরটি মাকড়সাকে অবসন্ন করিয়া সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে স্থাপন করে এবং সর্ব্বশেষে তাহাতে একটি ডিম পাড়িয়া মাটি দিয়া সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে পরস্পর গাত্র সংলগ্ন করিয়া তিন-চার বা ততোধিক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা মাকড়সা পূর্ণ করিয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়।

ভীমরুল, মৌমাছি ও বোলতার বাসা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাছে মানুষের শিল্পনৈপুণ্য অনেক ক্ষেত্রে হার মানিয়া যায়। আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় শুঁয়ো-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শরীরের চতুর্দ্দিকে গুটির মত আবরণ নির্ম্মাণ করে না। গাছের পাতা মুড়িয়া আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করে এবং পতঙ্গের রূপ ধারণ না-করা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে বসবাস করে। প্রথমতঃ পাতাটির উপরের দিকে, মধ্য শিরের একপাশে পাশাপাশি কাটিয়া, নিম্নের সম্পূর্ণ অংশ রোলারের মত মুড়িয়া সুতা দিয়া আটকাইয়া দেয়। পরে অপর দিকও পূর্ব্বের মত কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত রোলারের উপর জড়াইয়া সুদৃঢ় আবাসস্থল গড়িয়া তোলে। কাঠ-পোকার বাচ্চারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ পাতা কাটিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অন্যান্য শুঁয়ো-পোকারা সম্পূর্ণ পাতাটাকেই মুড়িয়া ফেলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঝুড়ি-পোকা নামে রকমারি অসংখ্য শুঁয়ো-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মথ-প্রজাপতির বাচ্চা। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহারা বিচিত্র আবাসস্থল তৈয়ারী করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য প্রাণীদের মত ইহাদের বাসস্থল এক স্থানে দৃঢ় সংলগ্ন নহে। তাহারা যে গৃহে বাস করে সেই বাসগৃহ লইয়াই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে গৃহের আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে বিভিন্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকার অভাব নাই। ঘরের দেয়ালে আমাদের দেশে চিড়া-পোকা নামে এক প্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে কাল্‌চে রঙের চিড়ার মত পদার্থটা এক স্থানে কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার পর ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিয়াছে। কালচে রঙের আবরণটা ছিন্ন করিলেই তাহার মধ্যে সুতার মত সরু একটি পোকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। চিড়ার মত পদার্থটাই তাহার বাসা। উহা সে নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। ছোলার মত আকৃতিবিশিষ্ট বড় ও ছোট আরও কয়েক রকমের ঝুড়ি-পোকা, পুরাতন গাছের গুঁড়ি বা বেড়ার গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, গোলাপ, করঞ্জা, রঙ্গন ও চায়ের গাছে ছোট ছোট কতকগুলি শুষ্ক কাঠি থাকে থাকে সজ্জিত অবস্থায় ডাল বা পাতার সহিত নোলকের মত ঝুলিতেছে। এগুলিও এক প্রকার ঝুড়ি-পোকার বাসা, পোকাটা বাসার ভিতরে আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং আহারান্বেষণে বাসা-সমেত

দক্ষিণ-আমেরিকার এক প্রকার বোলতার বাসা

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে; বনে-জঙ্গলে কোন কোন নিষ্কণ্টক বৃক্ষকাণ্ডে সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় যেন বড় বড় অসংখ্য কাঁটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই নজরে পড়িবে কাঁটাগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়াচড়া করিতেছে। ইহারাও এক জাতীয় ঝুড়ি-পোকা। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শরীরের চতুর্দ্দিকে আবরণ ত রহিয়াছেই, অধিকন্তু তাহাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার জন্য বাসাটিকে ঠিক কাঁটার আকার প্রদান করিয়াছে। আমাদের দেশে এক প্রকার জলচর ঝুড়ি-পোকা দেখা যায়—ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়, জলের উপর ইহারা ভাসিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ভালরূপ সাঁতার কাটিতে পারে না। গুটি বাঁধিবার কিছু কাল পূর্ব্বেই ইহারা শালুক-পাতার একাংশ অর্দ্ধ গোলাকার ভাবে কাটিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং অপর একটি পত্রের উপর টুকরাটিকে স্থাপন করে। অবশেষে তাহার একটি মুখ খোলা রাখিয়া চতুর্দ্দিক জুড়িয়া দেয় এবং ভিতরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। অবসরমত ধীরে ধীরে বাসাটিকে মূল পত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং বাসা সমেত আহারান্বেষণে জলের উপর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়।

পরিদৃশ্যমান কীট-পতঙ্গের কথা ছাড়িয়া আণুবীক্ষণিক কীটাণুদের শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। স্পঞ্জ, প্রবাল, সমুদ্র-পাখা ও কোন জাতীয় প্রোটোজোয়া আবাসস্থল নির্ম্মাণে যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা যে সকল বিচিত্র আকৃতির প্রবাল, স্পঞ্জ ও সমুদ্র-পাখা (চেপ্টা ও গোলাকার হাত পাখার মত দেখিতে এক প্রকার আণু-বীক্ষণিক সামুদ্রিক জীবের বাসা) দেখিতে পাই তাহারা সকলেই বিভিন্ন প্রকারের আণুবীক্ষণিক প্রাণীর বাসা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভীমরুলের বাসা

কঠোর-করুণ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নীলাকাশখানা জ্ব'লে পুড়ে গিয়ে
পাংশুটে লাল।
কখনো ওখানে খেলে কি সজল
মেঘের জাল?
চিল ডেকে সারা, চাতক কাতর,
শকুনি নাই।
আঁখি দিয়ে আর ও আকাশ নাহি
দেখিতে চাই।

সহসা একি এ?—ছুটে এল এক
বিরাট্ মেঘ;
নিয়ে এল হাওয়া, জগৎ-জুড়ানো
জলের বেগ।
আঁখি ধুয়ে গিয়ে হইল স্নিগ্ধ,
চাতক থামে,
চিল চুপচাপ ঘুরে ঘুরে ঘুরে
গাছেতে নামে।

সাহিত্যিক

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

পরম কাম্য বোধে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী যা সৃষ্টি ও সঞ্চয় করেছে অন্য দল মানুষ মুহূর্ত্তের নির্ম্মম ধ্বংস-লীলায় মাটির ঢেলার মত তাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করেছে— মানুষের ইতিহাসে এ ঘটনা নূতন নয়; উদীচীন বর্ব্বরেরা এমনি ক'রেই গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, তুর্কিদের আক্রমণে ইরাকের বোগদাদি সভ্যতা এমনি ক'রেই উৎসন্ন হয়েছিল। নর-নারীর সাধারণ শান্ত জীবনযাত্রা, তাদের গৃহস্থালীর ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ—যা মানুষের জীবনের পনরো আনা—চিরকাল বিজয়ী ও পলায়মান সৈন্যদলের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়েছে। বীরত্বের নামে সৈনিক ও সেনানায়কের লোভ ও নিষ্ঠুরতা সে জীবনকে ছিন্নভিন্ন করতে কোনও দিনই দ্বিধা করে নাই। এ নিষ্ঠুরতার উল্লাস যখন নরমুণ্ডে মঠ গড়া কি ঐ ধরণের চমক লাগান গল্পের উপাদান যুগিয়েছে তখনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভেসে উঠতে পেরেছে। তা না হ'লে হত্যা ক'রে হত হবার আশ্চর্য্য শৌর্য্য ও দেশের পর দেশ পিষে ফেলার অদ্ভুত রণকৌশলের বিচিত্র বর্ণনার এবং কবি-প্রশস্তির জয়ধ্বনির নীচে এ লোভ ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী চাপা পড়েছে। সুতরাং আজ পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ ব্যেপে যে যুদ্ধ চলেছে তার বিস্তার ও প্রচণ্ডতা যতই বেশী হোক, মানুষের ইতিহাসে তাকে অভূতপূর্ব্ব ভেবে হতবুদ্ধি হবার কারণ নেই। অতীতের যে শক্তিমান্ লেখকেরা পৈত্রিক বিষয় নিয়ে জ্ঞাতির সঙ্গে বিরোধে আঠার অক্ষৌহিণীর নিধন ভগবচ্চালিত ধর্ম্মযুদ্ধ ব'লে সর্ব্বলোকের প্রতীতি জন্মিয়েছে অত্যন্ত হালের প্রপাগাণ্ডার কৌশলও তাদের বেশী কিছু শেখাতে পারত না।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের সঙ্গে, বিশেষ যে মহাযুদ্ধ আজ পৃথিবী জুড়ে চলছে তার সঙ্গে প্রাচীন কালের যুদ্ধ-বিগ্রহের একটা বড় রকম প্রভেদ আছে। এ যুদ্ধ যুধ্যমান দেশের সকল লোকের শরীর ও মনের চেষ্টা নিঃশেষে দাবী করে। সকলকে বলে আর সব পরিত্যাগ ক'রে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—কেবল আমার সেবা কর। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এ যুদ্ধের প্রয়োজনে যা লাগে তা-ই কাজ, বাকী সব চেষ্টা অকাজ। এরই নাম 'টোটাল ওয়ার'। এ ডাকে যে সাড়া না দেয় হয় সে রাষ্ট্রের কাছে দণ্ড পায়, নয়ত কাপুরুষ বা দেশদ্রোহী ব'লে সামাজিক তাচ্ছিল্য ভোগ করে। হালের যুদ্ধের এই দাবীর কারণ অনেক। যুদ্ধের যারা নায়ক তারা শত্রুবধের কোনও জ্ঞাত মারণ-অস্ত্রই কোনও দিন বাদ দেয় না, প্রতি-মারণের ভয় নিতান্ত বিভীষিকা না হ'লে। গিবন দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন যে বারুদ যে-দেশেই প্রথম আবিষ্কার হোক যুদ্ধে তার ব্যবহার এত দ্রুত সমস্ত সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যা মানুষের পরম হিতকর বহু আবিষ্কারের অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু গিবনের বারুদ আজ ব্যবহার হয় আতশবাজিতে, যুদ্ধে নয়। আজকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের হাতে যুদ্ধের যে অস্ত্র ও উপকরণ দিয়েছে, এবং নিত্যনূতন দিচ্ছে, তার শক্তি ও বৈচিত্র্য অদূর প্রাচীনেরও স্বপ্নগম্য ছিল না, এবং তার ফলে যে বিস্ময়কর সৈন্যসংখ্যার সমাবেশ আজ সম্ভব ও অপরিহার্য্য হয়েছে অল্প দিন পূর্ব্বে তা মহা-প্রতিভাবান সেনাপতিরও কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এই অসংখ্য সৈন্যকে অসংখ্য রকম অস্ত্র ও উপকরণ দিয়ে যুদ্ধরত রাখতে প্রয়োজন হয় দেশের সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টার। দেশের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি যে-দেশ সম্পূর্ণ যুদ্ধের আয়োজনে লাগাতে পারে জয়ের আশা তার বেশী। যে-দেশ পারে না, ঢিলেঢালা যার ব্যবস্থা, তার পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু সমস্ত লোকের চেষ্টা ও চিন্তা যুদ্ধের আয়োজনে অনন্যকর্ম্মা রাখা সম্ভব নয় যদি যুদ্ধের উৎসাহ দেশের সকল স্তরে আগুনের মত ছড়িয়ে না পড়ে। অর্থাৎ যদি যুদ্ধোন্মত্ততা কেবল সৈন্যদের মধ্যে নয়, দেশের সকল লোকের মনে সঞ্চারিত না হয়। সুতরাং আজকের দিনে প্রত্যেক যুদ্ধকে রাষ্ট্রনায়কদের ক'রে তুলতে হয় একটা 'ক্রুজেড'। সুধু অস্ত্র গড়লে তাদের চলে না, লোকের মন গড়তে হয়। সেই জন্যই আসে স্থূল-সূক্ষ্ম নানা প্রপাগাণ্ডা,—যাতে সত্য-মিথ্যা, সাহস-ভয়, প্রীতি-ঘৃণা, বড় আদর্শ ও ছোট স্বার্থ সব মিশে এমন সম্মোহন সৃষ্টি করে যে মানুষকে যা ভাবতে বলা যায় সে তাই ভাবে, যেমন অনুভব করতে বলা হয় তেমনি অনুভব করে। এ কাজ যে সম্ভব হয় তার একটা কারণ বর্ত্তমান

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রপতি ও ধনপতিদের জনসাধারণের স্বার্থ পূর্ব্বকালের চেয়ে দেখতে হয় অনেক বেশী, তা সে দেশ পরম কাপিটালিষ্টই হোক আর চরম ফ্যাশিষ্টই হোক। সুতরাং দেশের এই নায়কেরা যখন দেশের লোককে ডাক দেয় সমস্ত দেশের হিতের নামে তার মধ্যে সে পরিমাণ সত্য থাকে মায়া সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, এবং এ সত্য যে-দেশে যত বেশী সে-দেশের লোকের সাড়াও তত বড়। অর্থাৎ বর্ত্তমান পৃথিবীর লোকের মন এ প্রপাগাণ্ডায় ধরা দেবার জন্য অল্পবিস্তর প্রস্তুত হয়েই আছে।

পৃথিবীর যুধ্যমান দেশগুলিতে এই হিপনটিজমে বেশীর ভাগ লোকের বুদ্ধি যখন মোহগ্রস্ত, অনুভূতি যখন বিকৃত, তখন সে-সব দেশের সাহিত্যিকদের পরীক্ষার সময়। আমাদের ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ এ অর্থে যুধ্যমান নয়, সুতরাং যুদ্ধের মত্ততা আমাদের নেই। প্রপাগাণ্ডার ফলও আমাদের মধ্যে ফলে সামান্য, কারণ এর মূলে সত্যের সে স্পর্শ নেই যা মিথ্যাতেও প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু আজ আমরা ভয়ে কাতর। আমাদের দেশ যুদ্ধের রঙ্গভূমি হ'লে আমাদের ধন-প্রাণ যে পিষে যাবে সেই চিন্তায় দেশ মুহ্যমান, এবং তার সঙ্গে আছে যে-সব দেশ আক্রমণে বা প্রতিরোধে প্রচণ্ডতা দেখাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে ঈষৎ ঈর্ষাযুক্ত শ্রদ্ধা—কাজ যা তা ওরাই করছে। আমাদের দেশেও সাহিত্যিকদের আজ পরীক্ষার সময়।

সাহিত্যের সৃষ্টি ও চর্চ্চাকে সোজাসুজি যুদ্ধের কাজে লাগান যায় না, এমন কি জীবনযুদ্ধের কাজেও নয়। সেই জন্যই প্রত্যেক দেশে এমন কাজের লোক অনেক থাকে যারা বিশ্বাস করে যে সাহিত্যের বেশীর ভাগ কতকগুলি লোকের বিলাসের খেয়াল মাত্র। যখন স্বাভাবিক শান্তির অবস্থা তখন এ খেয়াল বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ত্রাস ও বিপদের সময় এ খেয়ালের চর্চ্চা অসহ্য ও মারাত্মক। তুফানের সময় যখন পালের দড়িতে সকলের হাত প্রয়োজন তখন যে বাঁশী বাজাতে বসে তাকে জলে ফেলে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। আজ যখন জীবনের চাপ সকলের উপর প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন এ মনোভাব অনেকের মনেই দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যকে যদি এ-আর-পির প্রচারের কাজে লাগান যায় তবে বরং তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু এই মহাবিপদের দিনেও যা মুস্কিল-আসান নয় কি তার প্রয়োজন।

ব্যক্ত ও গোপন এই মনোভাবের মধ্যে সাহিত্যিকদের দিতে হবে আজ নিষ্ঠার পরীক্ষা। মনের এ বিশ্বাস আজ দৃঢ় করতে হবে যে সাহিত্য মনের খেয়াল নয়; আর যদি খেয়াল হয় তবে সেই খেয়াল যার প্রেরণায় মানুষ তার সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, বুনো মানুষ সভ্য মানুষ হয়েছে। শরীরের প্রয়োজনের যা একান্ত অতীত সেই সৃষ্টিকে নিজের সকল সৃষ্টির চেয়ে বড় মনে করেছে। জৈব প্রয়োজনের বিচারে এ ঘটনা অবোধ্য। সে বিচারে এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ ঘটেছে। কেন ঘটেছে সে প্রশ্ন হয়ত অর্থহীন। কিন্তু যখন ঘটেছে তখনি মানুষের মন সমস্ত সংশয় ছেদন ক'রে নিজের এই সৃষ্টিকে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ব'লে চিনতে পেরেছে। 'প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্ব্বাৎ'। সাহিত্য মানুষের এই ঊর্দ্ধগতি সভ্যতার একটা বড় অংশ। সভ্যতার এই ঊর্দ্ধ গতিকে মানুষের জীবনের ভার মাটিতে নামাতে চেয়েছে বার বার, প্রতি বার সভ্যতা জয়ী হয়েছে। এক জায়গায় ধ্বংস হ'লে অন্য জায়গায় তার গতি-লীলার আরম্ভ হয়েছে। আজকের যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনি একটা নীচু-টান। মানুষের সভ্যতা তাকেও কাটিয়ে উঠবে। দুপক্ষেই যারা সভ্যতা-রক্ষার নামে অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের চেষ্টায় নয়। মানুষের মনের গোপন তলে ঊর্দ্ধগতির যে শক্তি সঞ্চিত আছে তারই নিঃশব্দ প্রকাশে। সে শক্তি মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বীজকে অঙ্কুরিত করে।

আজ সাহিত্যিককে নিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে হবে নানা বিভীষিকা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি ও চর্চ্চা অব্যাহত রেখে। শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ও নির্যাতনে সভ্যতা-লোপের যে আশঙ্কা সেটাই বড় ভয় নয়। সব চেয়ে বড় ভয় যুদ্ধের মত্ততা ও ত্রাসে আমাদের মনে বড়-ছোট বিচারের বিভ্রম ঘটা। মানুষ যখন প্রবলের প্রচণ্ডতাকেই বড় জেনে মনে তাকে পূজা দেয় সভ্যতা-লোপের তখনি সব চেয়ে বেশী আশঙ্কা। বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই আশঙ্কা সব চেয়ে প্রবল। যুগে যুগে পৃথিবীর নানা দেশে মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়েছেন পৃথিবীর সাহিত্যিক-দের সেই ঋষি-ঋণ আজ শোধ দিতে হবে প্রবলকেই শ্রেষ্ঠ না মেনে। সভ্যতার যে চিরন্তন ধারা তাঁরা প্রবাহিত করেছেন আকস্মিকের উৎপাতের মধ্যে সে প্রবাহকে সচল রেখে। এ কাজ কঠিন। অন্য লোকের মত লেখকদের চিত্তও আজ বিক্ষিপ্ত। নিজের সৃষ্টির মূল্য বোধে ক্ষণে ক্ষণে মনে সংশয় জাগে। প্রপাগাণ্ডাকে মনে হয় সাহিত্য,—জীবনের সঙ্গে যার যোগ। কিন্তু এ চিত্ত-বিক্ষেপ সংযত করতে হবে, মনের সংশয় উঠতে হবে কাটিয়ে। সাহিত্য সৃষ্টির নামে প্রপাগাণ্ডা রচনা ক'রে

কাজের লোক সাজার প্রলোভনকে দমন করতে হবে। যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ তা কেবল আজকের দিনের জীবন নয়, চিরন্তন মানুষের চিরপুরাতন ও চিরনূতন জীবন। আজকের দিনের সাহিত্য আজকের দিনের জীবনই গড়বে, কিন্তু কেবল সেই জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে নয়। আজকের জীবনের পারিপার্শ্বিকে সেই সনাতন মানুষকে গড়বে চিরকালের মানুষ যার মধ্যে চিরপরিচিতকেই দেখবে।

আমাদের দেশের উপর প্রলয়ের টর্পেডো আজ উদ্যত। এর অবসানে আমরা ভেঙেচুরে কেমন গড়ন নেবো কে জানে। তবে নিদারুণ দুঃখের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে। বিপদের প্রতিকার-চেষ্টায় মনে যে উৎসাহের বল আসে আমরা তা থেকেও বঞ্চিত। কারণ প্রতিকারের চেষ্টা আমাদের হাতে নেই। এ দুর্দ্দিনে আমরা হয়ত কিছুই রক্ষা করতে পারব না, কিন্তু মনুষ্যত্বের গৌরবকে যেন রক্ষা করি। সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধ ও কণ্ঠনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলবে। কোনও ভয় বা লোভে আমরা যেন মিথ্যাকে সত্য, কুৎসিতকে সুন্দর না বলি। 'অব্রুবন বিব্রুবন বাঽপি নরোঃ ভবতি কিল্বিষী'। না-বলার পাপ যদি আমাদের স্বীকার করতেই হয়, মিথ্যা-বলার পাপ আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন আমরা সেই ভাষার লেখক। মানুষের আত্মার মহিমাকে আমরা নিজের মধ্যে খাটো হ'তে দেবো না। ঝাণ্ডা খাড়া রহে। *

* বীরভূম (নলহাটি) সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের উদ্দেশ্য ও রঘুবংশ

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

শ্রুতিতে কাব্যালাপ বর্জ্জনের আদেশ আছে; "কাব্যালাপঞ্চ বর্জ্জয়েৎ", অথচ শ্রুতিনির্দ্দেশচালিত হিন্দু-সমাজে কাব্যালোচনা বিশেষরূপেই চিরদিন হইয়া আসিতেছে। অনেক বিশিষ্ট কাব্যের টীকাকারগণ সেই জন্যই "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে কান্তা সম্মিততয়া উপদেশ যুযে" প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রুতির আদেশ যে অসৎ কাব্য সম্বন্ধে তাহাই জানাইয়াছেন। সৎ কাব্য আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে তাহা জানাইয়া তাহার সমর্থনও করিয়াছেন। কাব্যালোচনার লাভ যে মাত্র সাময়িক উত্তেজনা নয়, সে লাভ যে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন ও চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে হয় তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন; আনন্দের ভিতর দিয়া উপদেশ দানেই কাব্যের সার্থকতা।

অতীত কালের কাব্যরসিকগণ তাঁহাদের লিখনের মধ্যে সৎ ও অসৎ কাব্যের লক্ষণেরও একটা আভাস দিয়া গিয়াছেন। যে সকল কাব্যে এরূপ মহৎ ভাব সকল পরিস্ফুট হইয়াছে যাহা দ্বারা পাঠকগণ মনুষ্যত্বের ও মহত্বের পথে বহুদূর অগ্রসর হ'ন; যে সকল কাব্যে এরূপ মহৎ চরিত্রসকল চিত্রিত হইয়াছে যাঁহারা আদর্শরূপে আমাদের সংশয়সমাকুল, কণ্টকাকীর্ণ, বন্ধুর জীবনপথে অগ্রসর হইবার সহায়ক হন সেই সকলই সৎ কাব্য; আর যে সকল কাব্যে সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি রচিত হয়, মসীমলিন দুর্গন্ধ পঙ্ককে শ্বেতচন্দন পঙ্ক প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করা হয়, যে ভাষায় কাব্য রচিত সেই ভাষাভাষী জাতির অতীত, পৌর্ব্বাপৌর্য্য ও সঙ্গতি লঙ্ঘন করিয়া সংহারকে সংস্কার এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা নামে প্রচার করা হয় সেই সকলই অসৎ কাব্য।

একটা কথা উঠিয়াছে যে কাব্যের সার্থকতা আনন্দদানে; আনন্দ দানই কাব্যের উদ্দেশ্য, চিত্তোৎকর্ষ বা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নয়; কাব্য কোন দিন শিক্ষকের কার্য্য করে নাই, যদিই কোন দিন তাহা করিয়া থাকে এখন সে শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়াছে। যে-কাব্যে শিক্ষার ভাব যত কম, উপদেশের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, আর্টের হিসাবে তাহার আসন তত উচ্চে। বর্ত্তমানে যাহা সুরুচি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহার সীমা অতিক্রম না করিয়া বহুবিধ বিচিত্র যৌন সম্বন্ধকে আত্মভোলা প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি আখ্যা দিয়া যাহা কিছু বর্ণনা কর তোমার কাব্য

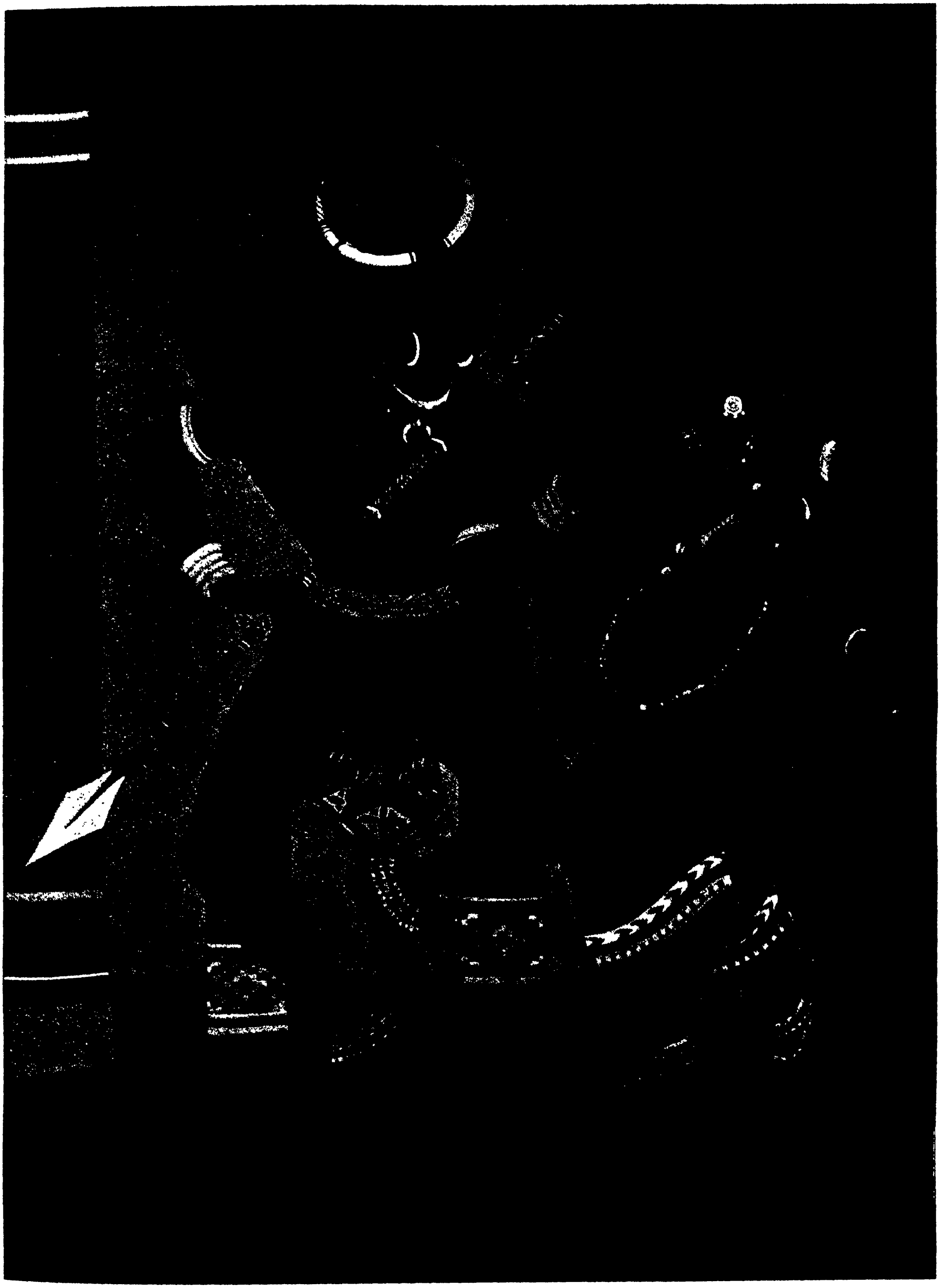

শিকারী-নৃত্য (মণিপুরী)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

উচ্চাঙ্গের আর্ট বলিয়া গণিত হইবে। ঐরূপ আর্টের সাধনায় ভাবের ঘূর্ণীপাকে যদি অনেকগুলি তরলমতি তরুণ-তরুণীর জীবনতরী ভাসাইতে-না-ভাসাইতেই কূলের কোলে ডুবিয়া যায়, যাহাদের তরী যৌবনের প্রায় পরপারে ভিড়িয়াছে তাহাদের মধ্যেও যদি কাহারও তরী ঐ ভাবঘূর্ণীতে হাবুডুবু খায়, যাহারা যৌবন নদীর পরপারে সাদা চুল ও ঠাণ্ডা ভাবের দেশে অনেক দিন হইতে বসিয়া আছে তাহাদেরও মধ্যে কেহ যদি ঐ ভাবঘূর্ণীর আকর্ষণে পরপার হইতে এপারে ফিরিবার জন্য তরী ভাসাইয়া দেয় তথাপি বলিতে হইবে উহা উচ্চাঙ্গের কাব্য, বড়গোছের আর্ট; ঐসব বিভ্রাট মাত্র হজম শক্তির অভাবেই ঘটে: তোমার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে বলিয়া কি পলান্নের বা রোহিত-মস্তকের নিন্দা করিতে হইবে?

চিত্তাকর্ষক বিবিধ উপমার বর্ণে উজ্জ্বলীকৃত যুক্তির দ্বারা এরূপভাবে ঐ কথাটার সমর্থন করা হয় যে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই সেকথা কতকগুলি উপমার উপর খাড়া হইয়া উঠে, সে উপমা কবিত্বপূর্ণই হউক বা কবিত্বহীনই হউক; তবে অনেকের অন্যরূপ ধারণা হইলেও অন্য অনেকের কাছে সেগুলির মূল্য বিশেষরূপেই কমিয়া যায়। ঐ অগ্নিমান্দ্যের কথার উত্তরে কেহ হয়ত বলিবে "আমি মন্দাগ্নি বলিয়া গুরুপাক আহারের দোষ দিতে যে পারি না তাহা সত্য; কিন্তু যদি মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই ঐ মন্দাগ্নি পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা রোগ কি স্বভাব বলিয়া ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য? কেহ কেহ ঐ গুরুপাক খাদ্য ম্যালেরিয়া-জীর্ণের ন্যায় অতি আগ্রহের সহিত আহার করে সত্য, তবে প্রকৃতি তাহাদিগকে যে পরিপাক শক্তিদানে কৃপণতা করিয়াছে তাহার অভাবে তাহারা নানারূপ ব্যাধিবিজড়িত হইয়া পড়িতেছে উপরন্তু বিকলবুদ্ধিপ্রসূত উদরলোলুপ আখ্যালাভ করিতেছে তাহাও ত অস্বীকার করা চলে না। পারাবতে উপলখণ্ড, কুক্কুরে অচর্ব্বিত আমমাংস ও অস্থি এবং মার্জ্জারে নখলোমসহ মূষিক উদরস্থ করিয়া পরিপাক করে বলিয়া যদি কোন মনুষ্য তাহাদের অনুকরণে ঐরূপ খাদ্যগ্রহণে অগ্রসর হয় তাহা হইলে লোকে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া নিন্দাই করে। স্বভাব এবং স্বভাবের যমজ জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কেহই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। ডাক্তারগণ বলেন যাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষে কেহ কোন দিন আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে নাই আমিষ খাদ্য তাঁহার দেহে স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্যই আনয়ন করে। হরিণশিশুকে আমিষ খাদ্যে এবং ব্যাঘ্রশিশুকে নিরামিষ খাদ্যে পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া বড় একটা শোনা যায় না।

আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরিতৃপ্তির জন্য প্রকৃতি তাঁহার আর্ট-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। চক্ষু রূপের পিপাসায় কাতর,—জলে, স্থলে, আকাশে রূপের চিত্রশালা উন্মুক্ত; কর্ণ সুস্বরের জন্য উৎসুক,—বিহগকণ্ঠে, নদীর গানে, পত্রের মর্ম্মরে প্রকৃতির সুমধুর ঐকতান বাদ্য অহর্নিশি বাজিতেছে; রসনা রসলোলুপ,—প্রকৃতির পাকশালায় চিরদিন বিবিধ রসের মিশ্রণে উপাদেয় ফল মোদক প্রস্তুত হইতেছে; নাসিকা সুগন্ধের তৃষ্ণায় তৃষিত, —জল, স্থল, গিরিগুহা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন সুগন্ধ কুসুমে সুশোভিত উপবন; ত্বক কোমল স্পর্শ পিয়াসী,—কোমলতম বায়ুরূপে প্রকৃতিজননী দিবারাত্রি সকলকে স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের অন্তর-ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য প্রকৃতিমাতা তাঁহার ভাণ্ডারে নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়ের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন; তবে সে সকল খাদ্য চিনিয়া বাছিয়া লইবার সৌভাগ্য সকলের নাই। প্রতিভাবান্ কবিগণই ঐ খাদ্যভাণ্ডারের হুজুরী; তাঁহারাই আবার ঐ মানসিক খাদ্য পানীয়ের পশারী; তাঁহারা প্রকৃতির গৃহ হইতে উপাদেয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে, রুচির ভিন্নতানুসারে ভিন্ন আধারে, ভিন্ন আকারে সাজাইয়া গুছাইয়া সেগুলি লোকসমাজে বিলাইয়া দেন। এই দেশকালপাত্রের ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্যের তারতম্যও কবিগণের আসনের উচ্চাবচতার একটি কারণ। যে-কবি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের গৃহে মাংসের ভার এবং শাক্তের গৃহে সব্জীর ডালি পৌছাইয়া দেন তাঁহার দান উপেক্ষিত হয়—তাঁহার শ্রম বিফল হয়। যিনি দ্রব্যগুলি যোগ্য স্থানে পৌছাইয়া দেন তাঁহার দানই সাগ্রহে গৃহীত হয় তিনি সফলশ্রম হন।

আমাদের অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়েব উপর পুনঃ পুনঃ কৃত-কর্ম্মের বা অভ্যাসের যে একটা প্রবল প্রভাব আছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। অভ্যাস আমাদের ইন্দ্রিয়-গণের রুচির মধ্যে যে একটা পার্থক্যের সৃষ্টি করে তাহা সকলেরই প্রতিদিনের লক্ষ্যীভূত বিষয়। মেছুনীর তার মালিনী সখীর বাড়ী রাত্রিবাসের গল্প এবং মুচিনাকা প্রভৃতি বিশেষণের বহুল প্রচলন পার্থক্যস্রষ্টা অভ্যাসেরই ঢোলসহরৎ। অভ্যাসের ফলে অন্তরেন্দ্রিয়ের চিন্তা ভাব রুচি প্রভৃতির যে নির্দ্দিষ্ট খাত প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যক্তি বা জাতির বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র। ব্যক্তি বা জাতি সকল

জিনিসেরই পরিমাপ করে, ঈপ্সিত অনীপ্সিত স্থির করে ঐ বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে মাপ করিয়া।

ভারতীয়গণ—যাঁহারা আর্য্যত্বের দাবী করেন তাঁহারা অবিমিশ্র আর্য্যই হউন বা আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণোদ্ভূত জাতিই হউন—সকলেই এক বহু পুরাতন বৈশিষ্ট্যের খাতে চালিত হইয়া আসিতেছেন। সেই খাতটি ভারতীয় সভ্যতা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রসমূহে। বেদ স্মৃতি পুরাণাদিতে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ উদ্ঘাটিত হইয়াছে সৌভ্রাতৃত্বের, পিতৃত্বের, মাতৃত্বের, পুত্রত্বের, পতিত্বের, পাতিব্রত্যের, বীরত্বের, প্রজারঞ্জনের, দাম্পত্য-প্রীতির, পারিবারিক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাবের, জন-প্রীতির, স্বদেশপ্রীতির, প্রতাপের, দয়ার এবং অন্যান্য শতবিধ ব্যাপারের যে আদর্শ স্থাপিত করা হইয়াছে ভারতীয় সমাজ আজ পর্য্যন্ত সেই ধ্রুব নক্ষত্রে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিয়া আসিতেছে। স্বচ্ছ পার্ব্বত্য নদী সাগরোদ্দেশে চলিতে চলিতে ঋজু কুটিল পথ, ঘূর্ণাবর্ত্ত, পঙ্কিলতার মধ্য দিয়া গেলেও সে যেমন তাহার সাগর-গমনোদ্দেশ্য লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না ভারতীয় আর্য্য সমাজও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিলেও তেমনই শাস্ত্র লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

হিন্দুশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাহার পার্থক্য একটি স্থানে সুপরিস্ফুট। হিন্দুশাস্ত্র মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বা গম্য স্থির করিয়াছেন বিশ্বাত্মায় জীবাত্মার যোগ বা মিলনে; কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন ঐ গম্য বহু জন্মের সাধনায় লাভ করিতে হইবে। হিন্দুর সমস্ত জীবন, জীবনের সকল খুঁটিনাটি ঐ ঈপ্সিত লাভের জন্য একান্ত সাধনা; হিন্দুর জ্ঞান চর্চ্চা—বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র তাহার ঐ গম্যলাভের সহায়; তাহার নিত্য কর্ম্ম, আহার, বিহার, যাগ, যজ্ঞ, আনন্দোৎসব সবই ঐ আদর্শে গঠিত। যে-জ্ঞানে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা ব্রহ্ম-সান্নিধ্যের সাহায্য করে না হিন্দু সে-জ্ঞানের চর্চ্চা বড় একটা করেন নাই। জড়বিজ্ঞান রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যা যাহার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় সংগ্রহ তাহা হিন্দুর অপরিজ্ঞাত না হইলেও বিশেষ আদৃত ছিল না। হিন্দুর গীতা "ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং"কে ঈপ্সিত লাভের সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের কাব্যও ঐ লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়াই চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। আমাদের কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দের সহিত উপদেশদান দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ ও চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন করা; শত ভাব তরঙ্গায়িত মানব-মনের এক বা ততোধিক বৃত্তির উদ্দীপনাদিই তাহার লক্ষ্য নহে।

গদ্যপদ্যময়ী ভাষারূপ বর্ণেই কবিগণ নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সফল করেন; উপমা, পদলালিত্য, অর্থগৌরব প্রভৃতির সমাবেশে কাব্যাঙ্কনকার্য্য পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলেন। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির কতকগুলি নির্দ্দোষ পিপাসার তৃপ্তির জন্য কবিগণ তাঁহাদের অঙ্কনকার্য্যে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। অলঙ্কার যেরূপ দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর করে, ঐ সকল কৌশলও সেইরূপ অঙ্কিত চিত্র সকলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া কাব্য-গুলিকে অধিক মনোজ্ঞ করিয়া তুলে। কাব্যে এইরূপ কৌশলই আর্ট। কাব্যের বহিরঙ্গে আর্টের কল্পনা ভ্রূর বাহিরে ভ্রূভঙ্গীর বা চক্ষুর বাহিরে কটাক্ষের কল্পনার ন্যায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

পুরাতন কবিগণের কাব্যে ঐরূপ কৌশলের অস্তিত্ব প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়। তাহারই মধ্যে একটি কৌশলের বিষয় যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই অদ্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে কবির কৌশলই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই ভারতেও কোন সময়ে কাব্যাদর্শ এরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে রঘুবংশকে চম্পূকাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার, "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং তস্যাপি টীকা সাপি পাঠ্যা" বলিয়া এই মহাকাব্যকে অনাদৃত করিবার লোকের অসদ্ভাব হয় নাই। সুখের বিষয় যাঁহাদের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা যায় এরূপ অনেক মনীষী রঘুবংশকে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যসমূহের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। কোন পূজ্যপাদ সুপণ্ডিতের নিকট কথা-প্রসঙ্গে রঘুবংশকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। রঘুবংশে কবি কি কৌশল অবলম্বন করিয়া একটি মহান্ আদর্শ চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জনগণের চিত্তোৎকর্ষ ও চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন রূপ কাব্যোদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন আমরা তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে মহাকাব্যের নায়ক কোন এক রাজা বা শ্রোত্রিয় হওয়া চাই; কিন্তু রঘুবংশে বহু রাজ-চরিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহা কি তবে পদ্যে ইতিহাস রচনা? রঘুবংশ কি রাজতরঙ্গিনীর অনুরূপ

পুস্তক ? তাহাও ত বলা চলে না। সূর্য্যবংশের আখ্যান-বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকির বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। কালিদাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্ব্ব সূরিগণের কৃতবাগ্‌দ্বারে রঘুবংশে প্রবেশের কথা ভক্তিভরে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ দেখিতে পাই বাল্মীকির বংশগণনা হইতে কালিদাসের বংশগণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালিদাসের গণনায় দিলীপের পুত্র রঘু বাল্মীকির গণনায় দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ এবং কুৎস্থের পুত্র রঘু—অর্থাৎ রঘু দিলীপের প্রপৌত্র। কালিদাসের গণনায় রঘুর পুত্র অজ, বাল্মীকির গণনায় রঘু ও অজের মধ্যে (১) প্রবৃদ্ধ কল্মাশপাদ (২) শঙ্খন (৩) সুদর্শন (৪) অগ্নিবর্ণ (৫) শীঘ্রগ (৬) মরু (৭) প্রশুশ্রুক (৮) অম্বরীষ (৯) নহুষ (১০) যযাতি ও (১১) নাভাগ এই একাদশ জন রাজার উল্লেখ দেখা যায়। এই পার্থক্য যে কালিদাসের অজ্ঞতা-প্রসূত তাহা যখন বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না তখন ইহা তাঁহার কাব্যোদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বলিয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত ইহাই ধরিয়া লইতে হয়। ঐ বংশগণনা-বিপর্য্যয়ই রঘুবংশ যে মহাকাব্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য লক্ষণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু মনীষী রঘুবংশকে মহাকাব্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

রঘুবংশে উনবিংশটি সর্গ রহিয়াছে। প্রথম নয় সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ ও দশরথের কথা; দশম হইতে পঞ্চদশ ছয় সর্গে শ্রীরামচন্দ্রের কথা এবং শেষের চারিটি সর্গে রামচন্দ্রের বংশধরগণের কথা। ইহাতেই মনে হয় রঘুবংশের স্বরূপতঃ নায়ক রামচন্দ্র; সর্ব্বগুণান্বিত রামচরিত্রকে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করাই রঘুবংশের মুখ্য উদ্দেশ্য; রামচন্দ্রের দেহ ও মনের সমঞ্জসীভূত পরিণতি হওয়ায় তিনি মহাশক্তিশালী বীর, প্রজারঞ্জক রাজা, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃ-বৎসল অগ্রজ, প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা, উদারহৃদয় সমাজরক্ষক। সুনিপুণ চিত্রকর যেরূপ কোন অনিন্দ্য সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমে তরুলতা, ফুল ফল, মৃগ, পক্ষী সমন্বিত একটি প্রতিবেশ ভূমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুইয়ের অধিক সুন্দরীর মূর্ত্তি রচনা করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য স্থানে চিত্রোদ্দিষ্টা সুন্দরীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলনার ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করেন কালিদাসও রঘুবংশে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। রামচরিত্রে যাবতীয় মানবীয় সদ্‌বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণপরিণতি বশতঃ তিনি যে কত বড় কত মহান্ তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই কবি তাঁহার পার্শ্বে দিলীপ, রঘু, অজ প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "দিলীপ, প্রভৃতি রাজগণে এক বা দুইটি গুণ বিকশিত হওয়ায় তাঁহারা যদি এত বড় হইয়াছেন তাহা হইলে রামচন্দ্র যাঁহাতে সর্ব্ববিধ সদ্‌বৃত্তির উচ্চতর পরিণতি দেখা যায় তিনি কত বড় তাহা অনুমান করিয়া লও"—কবি যেন রঘুবংশের পাঠককে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।*

* বিষ্ণুপুর সাহিত্য-সম্মেলনে গত ২৮শে অগ্রহায়ণ পঠিত।

বাংলা দেশে মূক-বধির শিক্ষা

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

মূক ও বধির বালকবালিকাদের জন্য বাংলা দেশে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় হইতেই এই বালকবালিকাদের মধ্যে শিক্ষাদান ও উন্নতির জন্য ব্যাপক চেষ্টার সূত্রপাত হয়। অল্প কয়েক জনের উৎসাহে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা বাংলা দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েক জন কর্ম্মী যাঁহারা নিজেদের জীবন দিয়া কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই আন্দোলনের গতিবেগ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথম পঁচিশ বৎসরে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরে আরও আটটি শিক্ষাকেন্দ্র বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সব বিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠাতাদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

স্থাঃ সময়	বিদ্যালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠাতাদের নাম
১৮৯৩	কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়	স্বর্গীয় অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত " " যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় " " শ্রীনাথ সিংহ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার
১৯১১	বরিশাল মূক-বধির বিদ্যালয়	স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯১৬	ঢাকা মূক-বধির বিদ্যালয়	রায় সাহেব সতীশ চন্দ্র ঘোষ
১৯২৩	চট্টগ্রাম মূক-বধির বিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র হাজারী স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘটক
১৯২৬	ময়মনসিংহ মূক-বধির বিদ্যালয়	স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৩১	রাজসাহী মূক-বধির বিদ্যালয়	স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘটক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মৈত্র
১৯৩৪	মুর্শিদাবাদ মূক-বধির বিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপালদাস নিয়োগী চৌধুরী
১৯৩৪	খুলনা মূক-বধির বিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়
১৯৩৬	বীরভূম মূক-বধির বিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৯৩৭	বগুড়া মূক-বধির বিদ্যালয়	মিঃ আব্দুল জব্বর শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী
১৯৩৯	কুমিল্লা মূক-বধির বিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিনোদ চক্রবর্ত্তী

এই তালিকা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে এই শিক্ষাদানের কাজ চলিয়াছিল একমাত্র জনসাধারণের উৎসাহে, অর্থে ও পরিশ্রমে। গবর্ণমেণ্ট প্রথম দিকে আর্থিক সাহায্য করেন নাই এবং পরেও কখন এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন নাই। কর্ম্মীবৃন্দের উৎসাহে ও পরিশ্রমে এই কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে এই সব ধরণের বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য কাজের যত প্রয়োজন আছে সেই অনুপাতে কাজ হইয়াছে অল্প। এদেশে যত মূক ও বধির বালকবালিকা আছে সেই তুলনায় এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা নগণ্য; সুতরাং এই কেন্দ্রগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে গঠন করিবার সুযোগ ও প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ঐ অঞ্চলের মূক-বধির বালকবালিকাদের সংখ্যা নিম্নতালিকায় দেওয়া হইল।

বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্রসংখ্যা	ঐ অঞ্চলের মূক-বধির বালকবালিকার সংখ্যা
কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়	২৩০	৫০০
বরিশাল মূক-বধির বিদ্যালয়	৩১	১৬৮৩
ঢাকা মূক-বধির বিদ্যালয়	৬০	১৭০০
চট্টগ্রাম মূক-বধির বিদ্যালয়	২২	১৪০০
ময়মনসিংহ মূক-বধির বিদ্যালয়	১৫	৯৩০
রাজসাহী মূক-বধির বিদ্যালয়	২০	১০০০
মুর্শিদাবাদ মূক-বধির বিদ্যালয়	১২	৮২৪
খুলনা মূক-বধির বিদ্যালয়	৭	৭০০
বীরভূম মূক-বধির বিদ্যালয়	৮	৭২০
বগুড়া মূক-বধির বিদ্যালয়	১৩	৭৭৩
কুমিল্লা মূক-বধির বিদ্যালয়	৮	১৫০০

শিক্ষার যে আয়োজন এই বিদ্যালয়গুলিতে করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য জনগণকে সজাগ করিতে হইবে। এই জন্য প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন। শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষগণ লোকশিক্ষার জন্য বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারেন। ভারতবর্ষের মূক ও বধির বালকবালিকাদের শিক্ষকদের যে সঙ্ঘ আছে (দি কন্‌ভেনশন অব দি টিচার্স অব দি ডেফ্ ইন ইণ্ডিয়া) তাহার সাহায্যেও এই প্রচারকার্য্য চালান যাইতে পারে।

লোকশিক্ষা ও প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসরই প্রবন্ধ-লেখক এই কাজের জন্য "বেঙ্গল এসোসিয়েসন অব দি ওয়ার্কার্স অব দি ডেফ" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, কাশিমবাজারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের তদানীন্তন এজেণ্ট, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির যে বিরাট্ সঙ্কল্প ছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক জন সামান্য চাকুরীজীবীর পক্ষে সম্ভব ছিল না;

কর্তৃপক্ষের উৎসাহও অতি ক্ষীণ ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই এই সমিতির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই সমিতি যে প্রারম্ভিক কাজ করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই এই উদ্দেশ্য লইয়াই এক নূতন প্রতিষ্ঠান শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নাম "দি কনভেনশন অব দি টিচার্স অব দি ডেফ্ ইন্ ইণ্ডিয়া"। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি কাজে অবতীর্ণ হয়।

১। ভারতবর্ষের মূক-বধির বালকবালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা।

২। সমাজে মূক ও বধিরগণ যাহাতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার পায় তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণের মন আকৃষ্ট করা।

৩। মূক ও বধিরগণের আইনগত অক্ষমতা দূর করা।

৪। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা সভায় মূক ও বধির বালকবালিকাদের শিক্ষকগণের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা।

৫। মূক ও বধির বালকবালিকাদের শিক্ষকগণের চাকুরীগত স্বার্থ রক্ষা করা।

৬। মূক ও বধিরদের লইয়া যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে যোগ স্থাপন করা।

এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে পরিশ্রমের প্রয়োজন। কন্‌ভেনশন এই উদ্দেশ্যে কি কি কাজ করিয়া থাকেন তাহা সম্পাদকের প্রতিবেদনে পাওয়া যাইবে।

একটা শিক্ষায়তন সফল করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈয়ারী করা প্রয়োজন এবং এই জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক রাখা দরকার। কিন্তু কলিকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সংখ্যা অল্প।

সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। দেখা গিয়াছে যে পর্য্যাপ্ত কর্ম্মী না থাকিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন আছে।

মূক ও বধির বালকবালিকাদের শিক্ষা দিবার নির্দ্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত ধারা আছে; সুতরাং অধ্যাপকগণেরও এই দিকে শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। যেসব শিক্ষক দক্ষ নহেন তাঁহারা এই কাজে বাধা-স্বরূপ। শিক্ষকদের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার উপায় আয়ত্ত করার প্রয়োজন আছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে যাহাতে এই কর্ম্মিগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহার জন্য কনভেনশন বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শিক্ষকগণের নিকট হইতে ভাল কাজ প্রত্যাশা করিলে আর্থিক অবস্থার কথাও চিন্তা করা দরকার। দরিদ্র ও অভুক্ত কর্ম্মীদের কাছ হইতে আন্তরিক কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে শিক্ষকদের অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক মূক ও বধির ছাত্রের জন্য বাৎসরিক ব্যয় করা হয় ১০০ টাকা—সেই স্থলে ইংলণ্ডে খরচ করা হয় ১০০ পাউণ্ড। আমেরিকার ক্লার্ক স্কুল ছাত্র-পিছু বাৎসরিক ব্যয় করেন ১১৪০ ডলার।

মূক ও বধির ছাত্রদের জন্য বাংলা দেশে যে ব্যবস্থা আছে তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অন্যতম কারণ আর্থিক অনটন।

এ দেশে গবর্ণমেণ্টের নিজের কোন বিদ্যালয় নাই। কোন কোন স্থলে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে এবং তাহারও পরিমাণ বিদ্যালয় হিসাবে কম বেশী হইয়া থাকে।

জনসাধারণ যে পরিমাণ সাহায্য করেন তাহার হিসাব মাথাপিছু ধরিলে বাৎসরিক হয় ৬৪ টাকা। এস্থলে একথা উল্লেখযোগ্য যে পিঞ্জরাপুলের প্রত্যেক জানোয়ারের জন্যও জনসাধারণ যে পরিমাণে অর্থব্যয় করেন তাহাও উল্লিখিত অর্থ অপেক্ষা বেশী।

মূক ও বধিরদের স্বাবলম্বী করিতে হইলে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র একমাত্র বিদ্যালয়েই কেন্দ্রীভূত করিলে চলিবে না। যাহাতে ইহারা পরে নিজেদের জীবিকা নিজেরাই উপার্জ্জন করিতে পারে সেজন্য হাতের কাজও শিখানো প্রয়োজন। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিল্পবিভাগ আছে, তবে সব জায়গায় করা সম্ভব হয় নাই। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই উন্নত ধরণের শিল্পবিভাগ থাকিবে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আশা করা যায় না। তবে ম্যান্‌চেষ্টার রয়াল স্কুলে যেরকম বন্দোবস্ত আছে আমাদের দেশেও সেইরূপ প্রবর্ত্তন করা চলিতে পারে। সেখানে প্রত্যেক ছাত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া শিল্পবিভাগে প্রবেশ করে। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়েও এ ব্যবস্থা করা যায়। অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে যাহাতে ছাত্ররা কলিকাতার স্কুলের শিল্পবিভাগে অন্ততঃ দুই বৎসর পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। এই ভাবে এখনকার মত আমাদের সমস্যা আমরা দূর করিতে পারি।

বুদ্ধ ও শঙ্কর

শ্রীঅনিলবরণ রায়

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।

গীতা ৫।২৪

যাহার অন্তরে সুখ, যাহার অন্তরে আরাম ও শান্তি, যাহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।

সাধারণ মানুষ বহির্মুখী, তাহার সুখের জন্য, আরামের জন্য, জ্ঞানের জন্য বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে; কিন্তু প্রকৃত সুখ ও শান্তি ও জ্ঞানের উৎস রহিয়াছে বাহিরে নহে অন্তরে, আমাদের আত্মার মধ্যে। কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেয়ো না রে কারও দ্বারে।
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ না নিজ অন্তঃপুরে।

সাধারণ মানুষ ইহা বুঝে না, সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাহ্য বস্তুকে সুখের আকর বলিয়া ধরিতে চায়, অধিকার করিতে চায়—এই ভাবেই আসে বাসনা এবং তাহা হইতে কাম ক্রোধের বিক্ষোভ, সুখ দুঃখ শুভ অশুভ, ভালমন্দের দ্বন্দ্ব। বাহ্য বস্তুর মধ্যে সুখ শান্তির আশা করা হইতেছে মরীচিকায় জলের আশা করার ন্যায় নিরর্থক। যোগীরা ইহা বুঝেন, তাই তাঁহারা বাহ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া অন্তর্মুখী হন, নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান করেন, ইহাই অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। এইরূপ যোগসাধনার দ্বারা যখন আমরা আত্মার চৈতন্যে প্রবেশ লাভ করি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হই—তখন আনন্দ ও শান্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, কারণ আনন্দ ও শান্তি হইতেছে অধ্যাত্ম চৈতন্যের অন্তর্নিহিত, দিব্য প্রকৃতির স্বরূপ—তাহা কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না।

সাধারণ মানুষ ইহা বুঝে না। সকল আনন্দের উৎস তাহার অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে, তাই তাহার মধ্যে আনন্দ ভোগের আকাঙ্ক্ষা এমন অসীম, অনিবার্য্য—কিন্তু নিজের মধ্যেই তাহার সন্ধান না করিয়া অজ্ঞানের বশে সে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়।

নিজ নাভি গন্ধে মত্ত মৃগ ইতস্ততঃ
ঘুরে মরে বনে বনে,
তেম্নি তোমায় হৃদে ধরে আকুল তোমার তরে
(আমরা) ঘুরে মরি ভব বনে।

যাঁহারা মানুষকে অন্তর্মুখী হইবার প্রেরণা দেন, পন্থা দেখাইয়া দেন তাঁহারাই মানুষের পরম সুহৃদ। ভারতের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ভারতবাসীর এই মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে, অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে যে পরম আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছেন।

ভারতে এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত, শেষ বয়সে মানুষ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মচিন্তায়, আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে—এই ভাবে অধ্যাত্ম জীবন বা মোক্ষের জন্য নিজকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবে—ইহাই ছিল ভারতের প্রাচীন বৈদিক আদর্শ। তবে ইহা সম্ভবতঃ আদর্শ মাত্রই ছিল, ইহার দ্বারা মানুষ বুঝিত যে অধ্যাত্ম জীবনই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, সাংসারিক জীবন মানুষকে কেবল সেই লক্ষ্যের জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তোলে। কার্য্যতঃ খুব কম লোকই শেষবয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিত। সংসারে থাকিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞাদি আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করাতেই মানুষের জীবন পর্য্যবসিত হইত। পূর্ব্ব-মীমাংসাকার জৈমিনি এমনও বলিয়াছেন যে, মুক্তি বা মোক্ষের জন্য ইহার অধিক আর কিছুই প্রয়োজন নাই—সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিলেই মানুষ ইহকালে সুখ ও শান্তি ও পরকালে পরম গতিও লাভ করিতে পারে।

বৈদিক যাগযজ্ঞের যে একটা নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, মানুষকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করা, অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা, মানুষ ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া যায়, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকেই সব বলিয়া মনে করে এবং এই ভাবে বৈদিক

ধর্ম্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেছে ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ বলিলেন, বাহিরের অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে, অন্তরের সাধনার দ্বারাই মানুষ পরম মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিবে আর সে আনন্দ মর্ত্ত্যে বা স্বর্গে কোন বাহ্য জীবনে নাই, তাহা আছে সেই বাহ্য জীবনের নির্ব্বাণ বা বিনাশে। মানুষ বেদের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পশু বলিদানের ন্যায় নৃশংস অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে, শাস্ত্রের অর্থ লইয়া নানা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া প্রকৃত সত্যকেই হারাইয়া ফেলে, তাই বুদ্ধ বেদাদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ প্রত্যক্ষ সাধনালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের আলোকেই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই এই সব বিষয়ে বুদ্ধের সহিত গীতার বেশই মিল রহিয়াছে। তবে গীতা বুদ্ধের ন্যায় বেদকে অগ্রাহ্য করে নাই, পরন্তু লোকে বেদের যে বিকৃত ব্যাখ্যা করে সেই বেদবাদেরই নিন্দা করিয়াছে। যখন বুদ্ধের ন্যায় কোন অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সম্মুখে বিদ্যমান থাকেন তখন শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে, মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ। কিন্তু, অন্যত্র মানুষকে শাস্ত্রের সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করিতে হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে হয়, কেবল মনে রাখিতে হয় যে শাস্ত্র কেবল সহায় মাত্র, উহার অপব্যবহার হইতে পারে, শাস্ত্রের নানা মত ও ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতে পারে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না, অতএব শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে নিজের অন্তরের আলোকের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, অন্তর্জ্যোতি হইতে হইবে, নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি উপলব্ধির আলোকে সকল সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধ নিজে কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিলেও, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার বচনগুলিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং সেইসব বচন লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে কত বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে, কত মত, কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বুদ্ধের ন্যায় গীতা বৈদিক যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই। তবে লোকে যে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া স্বর্গাদি ভোগ লাভের জন্য ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞ করে তাহারই নিন্দা করিয়াছে এবং যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞরূপে ভগবানে সমর্পণ করা যেন এই ভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি ও রূপান্তর সাধিত হয়। গীতা দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে—বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের সাধনার উপরেই জোর দিয়াছে। তথাপি গীতা বাহ্য অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে নাই—বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সাধনাতে সাহায্য হইতে পারে—এবং বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদির ইহাই সার্থকতা। কিন্তু সে-সব অনুষ্ঠান যদি বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহাদের উপযোগিতা নষ্ট হয়—তাই গীতা বাহ্যানুষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব অনাড়ম্বর করিতে বলিয়াছে। ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণই মুখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস, তাহারই প্রতীক স্বরূপ পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহাই ভক্তিভরে ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাহাই হয় যজ্ঞ।

বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁহার শিক্ষা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে লোক হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু সভ্যতার মূল উৎস বেদ ও উপনিষদে আস্থা হারাইতেছিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই হিন্দু দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে অনেক যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অধিক কি বলিব, এই বৌদ্ধমতের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনের নিমিত্ত যেদিক দিয়াই পরীক্ষা করা যায়, সর্ব্বপ্রকারেই ঐ মত বালুকা-স্তূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহার সপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ এই তিনটি বাদ উপদেশ করিয়া বুদ্ধদেব নিজের অসম্বদ্ধ প্রলাপিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব এই মত মুমুক্ষুদিগের সর্ব্বপ্রকারেই অগ্রাহ্য।"

কিন্তু বাস্তবিকই বুদ্ধ যদি অসম্বদ্ধ প্রলাপই বকিয়া থাকিতেন তাহা হইলে "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর" থাকিত না। এক শ্রুতি হইতে যেমন পরস্পরবিরোধী নানা হিন্দু দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই বুদ্ধের বচন হইতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ আপন আপন ব্যাখ্যা দিয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন—সে জন্য বুদ্ধকে দায়ী করা যায় না, মানুষের অজ্ঞ অসম্পূর্ণ বুদ্ধিই এই সব অসামঞ্জস্য ও বিরোধের জন্য দায়ী। আর বস্তুতঃ বুদ্ধ যে সাধনমার্গ দেখাইয়াছেন তাহা একেবারে নূতন কিছু নহে, তাহার মধ্যে আমরা সাংখ্যের জ্ঞান-যোগ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগকেই ভিন্ন রূপে দেখিতে পাই। বুদ্ধ কেন বেদকে স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। লোকে যাহাতে বৃথা তর্ক না করিয়া সহজ সরল সাধনার দ্বারা

আত্মোন্নতিতে অগ্রসর হয়—বুদ্ধ সেই শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছিলেন এবং তাহা ভারতবাসীর উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফল বহুপ্রসারী হইয়াছে। অতএব তর্কের জাল বুনিয়া বুদ্ধকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা বৃথা। গীতা সে চেষ্টা করে নাই। গীতা যেমন অন্য সকল মত ও সাধনার সারবস্তুটি গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধ মতেরও সারবস্তু গ্রহণ করিয়াছে, এবং এইভাবে গীতার মধ্যে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় হইয়াছে, এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" কথাটি উপর্য্যুপরি ব্যবহার করিয়া গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে।

গীতার ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলেই আমাদিগকে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। শঙ্করের প্রতিবাদ আমিই যে আজ প্রথম করিতেছি তাহা নহে তাঁহার সমসাময়িক মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি কত মনীষী যে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই—তাহাতে শঙ্করের অবমাননা করা হয় না। শঙ্কর পরম অধ্যাত্ম সত্যকে যেমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—অসাধারণ প্রতিভার সহিত তিনি তাহা সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন, মানুষ মূলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং এই উপলব্ধিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথা—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য আর কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের ফলে ভারতে বেদ উপনিষদে প্রচারিত এই সত্য ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল—পুনরায় যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় সে জন্য শঙ্করের কৃতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেই জন্য আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত করিতেছে। সকল মহাপুরুষই আসেন নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে, শঙ্কর তাঁহার কাজ প্রকৃষ্টভাবেই করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকার যুগের প্রয়োজন হইতেছে, শঙ্কর যে সত্যকে দেখিয়াছিলেন সেইটিকে আরও পূর্ণতর ভাবে দেখা। তিনি বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্ম; কিন্তু জগৎও ব্রহ্ম, সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম—ইহাও উপনিষদেরই বাণী, এই বাণীটির উপর তিনি সম্যক্ দৃষ্টি দেন নাই—তিনি বলিয়াছেন, জগৎ মিথ্যা। আমরা উপনিষদকেই অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, জগৎকে সাধারণতঃ আমরা যে চক্ষুতে দেখি, ভেদ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ, অনিত্যং অসুখং লোকং, ইহা মিথ্যা মায়া বটে—কিন্তু জগৎ মূলতঃ মিথ্যা নহে, ইহা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, সমস্তই ভগবানের বিভূতি, ভগবানের অংশ। গীতায় এই সত্যটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

শঙ্করের কাজ ছিল বাহিরের জগতের সত্যের সন্ধান করা নহে, অন্তর্জগতের সত্যের সন্ধান করা—ইহার জন্য মনকে বাহির হইতে ফিরাইতে হয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু বাহিরের জগৎকেই যাহারা পরম সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে সেই আসক্তি পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে, সেই জন্যই তাঁহাকে জগৎ মিথ্যা এই তথ্যটির উপরেই বিশেষভাবে জোর দিতে হইয়াছিল।* আর এই বিষয়ে বৌদ্ধেরাই পথ দেখাইয়াছিলেন। বাহ্যজগতের কোন অস্তিত্বই নাই, উহা শুধু মনের ভ্রম, উহা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক—এই মতটি বৌদ্ধগণই প্রথম প্রচার করেন। আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মসূত্রে এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে—ব্রহ্মসূত্র শ্রুতি প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জন্মাদস্য যতঃ; ব্রহ্মই এই জগৎ হইয়াছেন অতএব ইহা মিথ্যা হইতে পারে না।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

—ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

অর্থাৎ, বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থের মূলেও কোন বাহ্যবস্তু নাই, স্বপ্ন ও জাগরণ পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত মত অসিদ্ধ। স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহা নিদ্রাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞান পরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান ঠিক তাহার বিপরীত, তাহা কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না, অতএব উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শঙ্কর যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিলেও, "জগৎ মিথ্যা" এই মতটি তিনি প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্কর বৌদ্ধ মতের সহিত নিজ মতের একটি অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি বলিয়াছিলেন বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, উহা সত্য নহে—তবে তিনি বাহ্য জগৎকে একেবারে স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন মায়াশক্তি এই ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে। আমরা যখন বাহিরে শুক্ত্যাদি

* বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন, জগৎ সত্য; কেবল মানুষের মনে বৈরাগ্য আনয়ন করিবার জন্যই জগৎকে মিথ্যা বলা হয়।

দেখি, আমরা বাস্তবিকই বাহিরে একটা বস্তু দেখিতে পাই, স্বপ্নের ন্যায় তাহা আমাদের মনের সৃষ্টি নহে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাহা বিলীন হইয়া যায় না—কিন্তু ঐ বস্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই আছেন, বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া কিছুই নাই—তবে মায়াশক্তি একটা ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে—যেমন মরুভূমিতে জল না থাকিলেও, অনেক লোক একই সময় জাগ্রতাবস্থায় এক স্থানে জল রহিয়াছে বলিয়া দেখিতে পায়—তখন কিছুতেই সে দৃশ্যকে দূর করা যায় না। কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পরে আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়—অতএব তাহা সত্য বস্তু নহে, মায়া-সৃষ্ট বস্তু, মায়ার শেষ হইলেই তাহারও শেষ হয়। জগৎ রহিয়াছে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, কিছুতেই এই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, অতএব ইহা সৎ, কিন্তু মায়া দূর হইলে জগৎও লোপ পায়, অতএব ইহা অসৎ। তাই শঙ্করের মতে মায়া-সৃষ্ট জগৎ হইতেছে সৎ ও অসৎ উভয়ই। বৌদ্ধগণ বলেন জগৎ অসৎ, শঙ্কর বলেন জগৎ সৎ অসৎ দুইই।

কিন্তু এইরূপ একটা তর্কগত সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিলেও শঙ্কর জগৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন—সংসার মায়া, মিথ্যা—সংসার হইতে সরিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি—এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর যে প্রকারান্তরে বৌদ্ধ মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন এ-যুগে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার "অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থে ভাল ভাবেই তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন, সেখানে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতি ও যুক্তি অনুমোদিত প্রকৃত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "অবিদ্যাকে জগৎকারণ বলিতে গেলে যে পরিমাণে সৎ সেই পরিমাণে স্বগত ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং যে পরিমাণে অসৎ, সেই পরিমাণে বৌদ্ধবাদে উপনীত হয়।...জগৎ কখনও রচিত হয় নাই ইহা বলা, কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র, ইহা বলা, আর বৌদ্ধের মত জগৎ অসন্মূল বলা একই কথা।"

তবে শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিলেও, ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছেন, এইখানেই বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের বিশেষ প্রভেদ—কারণ বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্য শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে বুদ্ধ স্বয়ং ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ পালিপিটকে আমরা বুদ্ধের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহার নিকট পরাবিদ্যা অব্যাকৃত বস্তু অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ই নহে,—দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বুদ্ধাবিষ্কৃত যে চারিটি আর্য্য সত্যের উপর সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই :—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, দুঃখ নিবৃত্তিও সম্ভব, এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা, অর্থাৎ কামনা, বাসনা, desire। এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে এবং তাহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ কি, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে, কিছুই থাকিবে কি না—এ-সব সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছু না বলিলেও বৌদ্ধগণ নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের অথবা সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। অধ্যাপক শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ বলিয়াছেন,

"মহাযানী দর্শনের শূন্য কথাটি সাধারণতঃ void বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শূন্যবাদ সম্বন্ধে যে অনন্ত আলোচনা আছে তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে সর্ব্বসত্ত্বের অভাবের নামই শূন্য। শূন্য কথাটির প্রকৃত অর্থ গুণশূন্য। বেদান্তে যাহাকে নিগুণ বলা হইয়াছে, মহাযানী দর্শনে তাহারই নাম শূন্য, ব্রহ্ম ও শূন্য একই বস্তু—উভয়ের অর্থ Ding an sich বা স্বলক্ষণ বস্তু।"

জন্ম মৃত্যু দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যে পদ লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন তাহা অজাতম্, অভূতম্, অকলম্, অসংখতম্॥ (বিশুদ্ধিমাগ্‌গ, উদান ৮)। ইহা সর্ব্বসত্ত্বের অভাব নহে, ইহা বেদান্তেরই নির্গুণ ব্রহ্ম, কেবল বুদ্ধ ইহাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন নাই, ইহার কোন নামই দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে ইহা হইতেছে সর্ব্বদুঃখের মূল অহংবোধের নির্ব্বাণ; বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষত্ব অনাত্মবাদ। ধম্মপদে বুদ্ধদেব বলিতেছেন,

সব্বে সংখারা অনিচ্চা,
সব্বে সংখারা দুক্খা,
সব্বে ধম্মা অনাত্তা

নৈসর্গিক বস্তু মাত্রই সংখাত (conditioned or compounded) এবং তাহারা অনিত্য ও দুঃখময়। * কেবল নির্ব্বাণ অসংখাত। সুতরাং নির্ব্বাণ নিত্য ও অদুঃখময়। কিন্তু এই অসংখাত নির্ব্বাণও অনাত্ম।

এই অনাত্ম শব্দের অর্থ একেবারে বিনাশ বা সর্ব্বসত্তা-শূন্যতা নহে। আত্মা বলিতে বৌদ্ধগণ অহং (ego) বুঝিয়াছে—তাহাদের মতে কোন জীবাত্মা বা ব্যষ্টিগত সত্তা

* গীতাও ঠিক এইরূপ ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছে,
অনিত্যং অসুখং লোকম্।

(individual soul) নাই। আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা ভ্রম মাত্র এবং ইহাই সকল বাসনার কেন্দ্র ও দুঃখের মূল—সর্ব্বদা অনাত্মতা ধ্যানের দ্বারা এই অহংভাবের বিনাশ হইলেই নির্ব্বাণ বা দুঃখশোকশূন্য পরম শান্তিময় অবস্থা লাভ করা যায়। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি—বৌদ্ধ মতের সহিত শঙ্করের মতের মূলতঃ কোন ভেদই নাই, কারণ শঙ্করও ব্যষ্টিগত সত্তা স্বীকার করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিতে আর কিছুই নাই—আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রসূত, যখন এই অজ্ঞান দূর হইবে তখন জীবে আর ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ থাকিবে না।

বৌদ্ধগণ কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন না ইহা ধরিয়া লইয়াই শঙ্কর তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে "বৈনাশিক" বলিয়াছেন—কিন্তু আমরা উপরে দেখিলাম, বস্তুতঃ বৌদ্ধরা বিনাশবাদী বা উচ্ছেদবাদী নহেন। তাঁহারা বেদ ও উপনিষদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না এবং সেই জন্যই ব্রহ্ম শব্দটিও ব্যবহার করেন না—কিন্তু মূলতঃ তাহাদের মতও শ্রুতিরই অনুযায়ী, ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতা এই শ্লোকে নির্ব্বাণের সহিত ব্রহ্ম শব্দটি যোগ করিয়া দিয়াছে। শঙ্কর ইহা লক্ষ্য করেন নাই। গীতা কেন বার বার তিন বার এখানে নির্ব্বাণ শব্দটি ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিয়া ব্যবহার করিল শঙ্কর তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই—তিনি নির্ব্বাণ শব্দে শুধু সাধারণভাবে "মোক্ষ" বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্কর যতই বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদ করুন—মূলতঃ তাঁহার মতের সহিত বৌদ্ধ মতের বিশেষ কোন তফাৎই নাই, বিরোধ কেবল প্রধানতঃ ভাষা ও কথা লইয়াই। আর শঙ্কর যে দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে নিজ মত প্রবল ভাবে চালাইতে পারিয়াছিলেন—তাহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সেজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যানের জন্য ভারতে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ ইহাই হইতেছে খাঁটি আধ্যাত্মিকতা—সমস্ত বাহ্য বিষয়ে, বাহ্য বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া অন্তর্মুখী হওয়া, অন্তরের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান করা। পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুসরণে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই মত প্রচার করিয়াছে,—যীশুখ্রীষ্টেরও কথা, "The Kingdom of God is within you"। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা—"ঝড়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, মুনি তেমনই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার কি অস্তিত্ব থাকে?" (ধম্মপাদ—মাঘসুত্ত, ১০৭৭)। খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও শিক্ষা—"What is your life? for ye are a vapour that appeareth for a little while and then vanisheth away"—St. James IV. 14. কিন্তু খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও এই অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই—তাহা একটি ক্ষীণ ধারা রূপেই গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে, বিধাতার বিধানেই পাশ্চাত্য জগৎ বহির্মুখী হইয়াছে, জগতকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া এই জগতের জীবনকেই পূর্ণ ভাবে বিকাশ করিবার, ভোগ করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন আসিয়াছে একটা সমন্বয়ের যুগ।

ইহজীবনে দুর্গতির চরম সীমায় পৌছিয়া ভারতবাসী বুঝিতেছে যে, আধ্যাত্মিকতাই যথেষ্ট নহে, এমন কি অনেকে আধ্যাত্মিকতাকেই ভারতের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী করিতেছে। অন্য পক্ষে ভোগবাদ, জীবনবাদ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, পাশ্চাত্য জাতিকে কিরূপ দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মধ্যে গভীর ভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহা দেখিয়া এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতেছে, অনেকেই ভারতের বুদ্ধ ও শঙ্করের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। বস্তুতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতে শঙ্করের বেদান্ত মত যে আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে আমাদের দেশের আধুনিক দার্শনিকগণের শিক্ষা হইতেছে পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট, আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শঙ্করকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়াছেন, বস্তুতঃ বেদান্ত বলিতে তাঁহারা শঙ্করের মতই বুঝিয়া থাকেন—আমাদের দেশেও অনেকেই আজকাল তাহাই করিতেছেন।

কিন্তু আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই বেদান্তের একমাত্র ব্যাখ্যা নহে, আর গীতায় আমরা বেদান্তের যে রূপটি দেখিতে পাই, শঙ্করের মায়াবাদের সহিত তাহার মিল নাই। বস্তুতঃ শঙ্কর অপূর্ব্ব ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া মায়ার যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহা তাঁহারই নিজস্ব। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি ঈশ্বর ও জগতকে ভ্রান্তিবিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মকেই এই ভ্রান্তির আশ্রয় বলিয়া তিনি বৌদ্ধদের অসদ্‌বাদ পরিহার করিয়াছেন—এবং এই জন্যই মায়াকে সদসদ্রূপা ব্রহ্মশক্তিরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। ফল

হইয়াছে এই যে, জগৎ মিথ্যা বৌদ্ধদের এই কথা ভারতবাসী হয়ত প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্মের উপর মায়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া, শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা জগৎ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া সেই বৌদ্ধবাদই ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। আজ আপামর ভারতবাসী সেই বৌদ্ধ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে—এই সংসার মিথ্যা মায়া, মানবজীবনের যে পরম লক্ষ্য তাহা এই সংসারে নহে, এই সংসার ত্যাগ করিয়াই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পা ।

কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম আদর্শ নহে। সংসার ত্যাগ নহে, সাংসারিক জীবনকে গড়িয়া তোলা, দেবগণকে আহ্বান করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য গড়িয়া তোলা, ভিতরকে সমৃদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে বাহিরের জীবনকেও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা—ইহাই ছিল বেদের আদর্শ, এবং বৈদিক যজ্ঞ ছিল ইহারই প্রতীক্ ও সাধনা। শুদ্ধ আনন্দের সহায়ে সকল মর্ত্ত্যশক্তিকে জয় করিয়া লাভ করিতে হইবে শুদ্ধ মনের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা, শক্তির. জ্ঞানের, কল্যাণের মূর্ত্ত প্রকাশ—ইন্দ্রের বহুবিচিত্র পূর্ণতা। ঋগ্বেদের সূক্ত-গুলিতে ইহাই নানা ভাবে বলা হইয়াছে—

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ। ১।৫।১

"হে সখাবৃন্দ! প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বহিয়া লইয়া এস, এস এখানে। স্থিরাসনে উপবেশন কর। ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোল তোমাদের গান।"

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং
ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে। ১।৫।২

"যাবতীয় বৈচিত্র্য লইয়া ইন্দ্র পরম বিচিত্র, সকল কাম্যের তিনি বিধাতা পুরুষ। এক যোগে কর তবে রসের সৃষ্টি।"

স ঘা নো যোগ আ ভুবন স রায়ে স পুরন্ধ্যাং।
গমৎ বাজেভিরা স নঃ। ১।৫।৩

"আমরা যাহা কিছু অধিগত করি, তাহাতে তিনি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। তিনি মূর্ত্ত হইয়া উঠেন যেন আমাদের আনন্দ সম্পদে, আমাদের বহুল বুদ্ধিতে। তিনিই যেন আসেন আমাদের জন্য সকল পূর্ণ ঋদ্ধি লইয়া। (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)

এই সকল বেদমন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা হায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে বলেন বেদ আদিম অশিক্ষিত মানবের ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র তাহা নহে—বেদ হইতেছে শ্রেষ্ঠতম কাব্যের ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্যের প্রকাশ। আবার আমাদের দেশে বেদ যে কেবল বাহ্যিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতেও বেদকে ঠিকমত বুঝা হয় নাই। বেদে বাহ্য যজ্ঞের বর্ণনা ও নির্দ্দেশ অবশ্যই আছে—কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ ঐ সব বাহ্য যজ্ঞকে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীক রূপে ব্যবহার করিতেন—আর যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারা শুধু পরকালে স্বর্গসুখ কামনা করিতেন না, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ভিতর দিয়া যাহাতে এই পার্থিব জীবনই দিব্য জীবনে পরিণত হয়—ইহাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। লোকে ক্রমশঃ এই গূঢ় সত্যটি হারাইয়া ফেলে, গীতা যেমন বলিয়াছে, স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ। উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে, বাহিরের জীবন অপেক্ষা ভিতরের অধ্যাত্ম জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে উপনিষদের মধ্যেই সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। উপনিষদগুলিকেও তাহাদের যুগ অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগের উপনিষদগুলি বেদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী; সেখানে আত্মজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু পার্থিব জীবন ও কর্ম্মকেও অবহেলা করা হয় নাই। অন্তর্মুখী হইয়া, আত্মার সহিত এক হইয়া আত্মাকে জানিতে হইবে; এইরূপ অন্তর্জ্ঞানের সাধনার দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে আমাদের যে অন্তরাত্মা বা মূল সত্তা তাহাতে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত এবং ভগবানের সহিত এক, এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহারই আলোকে জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ শিক্ষা—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশা প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদগুলিতে আমরা এই শিক্ষাই পাই সেখানে জ্ঞান লাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত হইলে জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গো-ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, না, অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য আসিয়াছেন?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"উভয়মেব," —হে সম্রাট, আমি দুই চাই, উভয়মেব (বৃহদারণ্যক ৪।১)। অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করিয়া অনাসক্তভাবে সংসারের ভোগ ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শেষজীবনে সব ছাড়িয়া অনায়াসে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ খণ্ডে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের পর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবে। ঈশা উপনিষদে বলা হইয়াছে,

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিশেৎ শতং সমাঃ।

এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে।

কিন্তু পরবর্ত্তী উপনিষদগুলি উত্তরোত্তর সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। জাবালোপনিষদে বলা হইয়াছে, বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বা বাণপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

বুদ্ধ হইতেছেন এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। রাজার দুলাল সিদ্ধার্থ যুবতী স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন—ভারতের ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা. ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উপর ইহা যে কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা দুরূহ। উপনিষদের শিক্ষা কতকগুলি বিশিষ্ট সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণকে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। জনসাধারণ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ লইয়া, আচার-অনুষ্ঠান লইয়াই গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিত। এই জীবনে যে প্রকৃত সুখশান্তি নাই, রূপ, যৌবন, রাজার ঐশ্বর্য্য কিছুই যে মানুষকে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, সে তৃপ্তির জন্য সকল বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে, নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে—আধ্যাত্মিকতার এই মূল কথাটিই বুদ্ধ নিজ দিব্য ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের একটি বিপদ ছিল। আধ্যাত্মিকতা চাই-ই, কিন্তু তাহাই সব নহে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বাহিরের জীবনকেও অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে হইবে, এই দুঃখময় পৃথিবীতেই আনন্দের, শান্তির. প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে-এইটিই হইতেছে মানব-জীবনের পার্থিব জীবনের পূর্ণ আদর্শ, বেদে এই আদর্শই, সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুত্রেরা সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিলে, সংসার রক্ষা কে করিবে? আমরা দেখিতে পাই, গীতা এই বিপদটি পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে, এবং লোকে যাহাতে আধ্যাত্মিকতা লাভের আশায় সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়া সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত না করে সেই জন্যই অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্যাধি মৃত্যু জরা দেখিয়া সংসারের দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যৌবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রূপ দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ, সংসার-ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে আবার শেষ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও অর্জ্জুন বিভিন্ন ভাবে এই একই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—সন্ন্যাস বড় না কর্ম্মযোগ বড়? অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-যোগই অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াই সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অক্ষম বলিয়া, অযোগ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই পন্থা দেখাইয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যে, "তুমি আমার অতিশয় প্রিয়—তাই আমি তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান দিলাম, এখন আমার যে সর্ব্বগুহ্য বাক্য তাহা শ্রবণ কর।" (১৮।৬৩,৬৪)। ভগবানের যে অতিশয় প্রিয়, ভগবান যাঁহাকে প্রিয় সখা বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যোগ্য অধিকারী ব্যক্তি আর কে হইতে পারে? উপনিষদের বাণী,

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৩

"বিচার বা ধীশক্তি দ্বারা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, ভগবান নিজে যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন কেবল তিনিই ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকটিত হয়।"

অতএব অর্জ্জুনকে অযোগ্য পাত্র বলিয়া, জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা বৃথা। বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চান, সংসার ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চান, এবং অনির্ব্বচনীয় পরম সত্তার শুদ্ধ নীরব নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত জীবনের লয় বা নির্ব্বাণ করাকেই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করেন তাঁহাদের প্রতি গীতার সুস্পষ্ট বাণী হইতেছে এই যে, এইটিও একটি পন্থা কিন্তু এইটি হইতেছে দুষ্করতম পন্থা (৫।৬, ১২।৫), আর উপদেশের দ্বারা অথবা দৃষ্টান্তের দ্বারা কর্ম্মত্যাগের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরা হইতেছে অতিশয় বিপজ্জনক (৩।২০-২৬) -- পন্থা মহান্ হইলেও, মানুষের পক্ষে এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে (৫।২), আর এই জ্ঞান সত্য হইলেও ইহা পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান নহে। পরব্রহ্ম কেবল এক সুদূরবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তাই নহেন; তিনি এইখানে, এই বিশ্বের মধ্যেও রহিয়াছেন, দেব ও মানবের ভিতর দিয়া, সংসারে যত জীব আছে, যাহা কিছু আছে সবের ভিতর দিয়া তিনি নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে শুধুই নিশ্চল নীরবতার মধ্যেই নহে, পরন্তু এই জগতের মধ্যে জগতের সকল জীব, সকল আত্মা, সকল

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে পাইতে হইবে। হৃদয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ সবকিছুর ক্রিয়াকে তাঁহার সহিত পরমতম সমগ্রতম যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ অন্তর্জীবনের সমস্যা এবং বাহিরে কর্ম্মময় মানব জীবনের সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করিতে পারিবে। ভগবানের সাধর্ম্ম্য ভগবানের ভাব লাভ করিয়া সে যে পরমতম অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে উঠিবে তাহা যেমন জ্ঞান ও ভক্তির ভিতর দিয়া তেমনই কর্ম্মের ভিতর দিয়াও লাভ করিতে হইবে। অমৃতত্ব ও মুক্তি লাভ করিয়া, সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্ম্ম করিতে পারে এবং সেইটিকে পরমতম সর্ব্বতোমুখী দিব্য কর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে পারে,—বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে সকল কর্ম্ম ও জীবন ও ত্যাগের, সংসারের সকল প্রচেষ্টার চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

পলাতক

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

পনর বৎসর পরে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রাম যখন প্রথম ছাড়ি তখন বয়স বছর-বিশেক হইবে। আজ বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া শুধু নিজের গ্রামের সহিতই যে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম তাহা নয়, বাংলা দেশের সহিতই এক প্রকার সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে দিল্লীতে গিয়া সরকারী চাকুরীতে ঢুকিয়াছিলাম। আর আজ এই বাহান্ন বৎসরে লইলাম অবসর। অথচ গ্রামের নাড়ীর সহিত ছিল আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগ। জীবনের প্রথম কুড়িটি বৎসর পল্লীগ্রামেই কাটিয়াছে—পল্লীর শ্যামল বৃক্ষলতা, দিগন্তপ্রসারী মাঠ, বারোয়ারিতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, এবং এখানকার অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রা আমার মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে। দীর্ঘ ত্রিশটি বৎসরের উপরে শহরবাস করিয়াও তাহা একটুও মলিন হয় নাই। অথচ এমনি বিড়ম্বনা—সেই আমিই পনর বৎসর আগে ছোট মামার শেষ সময়ে মাত্র দিন-তিনেকের জন্য একবার নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার পর আর কোন বারই অবসর হইয়া উঠে নাই।

বড় ছেলেটিকে এবার দিল্লীতেই সরকারী চাকুরীতে ঢুকাইয়া দিয়াছি; তার পরেরটি কলেজে পড়ে—বাকী দুইটি সবেমাত্র নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। বড় ছেলে দুইটি পল্লীগ্রামের নাম শুনিলে মুখ বাঁকাইয়া বসে। ধানগাছে তক্তা হয় কিনা এমনই তাহাদের জ্ঞান। গ্রামে যাহারা বাস করে তাহারা মূর্খ বর্ব্বর, সমস্ত প্রকারের সভ্যতা ও ভব্যতালেশহীন ইহাই তাহারা ধারণা করিয়া লইয়াছে। কত বার কত ছুটিতে তাহাদিগকে গ্রামে পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তাহারা রাজী হয় নাই। প্রতি বারেই ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বড় বড় শহরে তাহারা ঘুরিয়া ছুটির আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। গৃহিণী পল্লীগ্রামের মেয়ে, কিন্তু পল্লীগ্রামের নাম তাঁহার নিকটেও করিবার উপায় নাই—হয়ত নাকি সুরে—"কাঁদা, মঁশা, ম্যাঁলেরিয়া" বলিয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যান।

এমনই আবেষ্টনীর মধ্যে আমি—পল্লীর পূজারী নীরবে আপন মনের দুঃখ আপন মনেই শেষ করি—বাহিরে তাহার প্রকাশটুকু করিতে পারি না।

বড় ছেলে দুইটি সৎস্বভাব। কলেজের 'কেরিয়ার' ভাল, কিন্তু তবু আমি মনে করি তাহারা মানুষ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই—জীবনের অনেক কিছু তাহাদের অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যে মূল দ্বারা রসধারা প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডে, শাখায় পল্লবে সঞ্চারিত হইয়া বাঁচাইয়া রাখে—সেই মূলের সহিতই যদি পরিচয় না হইল তবে বৃথায়ই শাখায় শাখায় বিচরণ করা। আজিও অবহেলিত পল্লীগ্রামই মানুষ দিয়া, খাদ্য দিয়া শহরকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে—যে মানুষ শহরে বিচরণ করে তাহার মূলসূত্র চিরকাল পল্লীতে, সুতরাং এই পল্লীকেই সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই থাকে, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারি না।

গৃহিণী বৎসরখানেক ধরিয়া বেরিবেরিতে ভুগিতে-

ছিলেন—যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হইল না, অবশেষে চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন—শহর ত্যাগ করিতে। সুতরাং স্বাস্থ্যের ভয় দেখাইয়া এবার গৃহিণীকে বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। বড় ছেলে দুইটি ত দিল্লীতেই থাকিবে; গৃহিণী ও ছোট ছেলে দুইটিকে লইয়া আমি গ্রামে ফিরিয়া আসিব ঠিক হইয়া গেল। অতিশৈশবে পিতামাতা দুই জনেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কাজেই আমি বরাবর মামার বাড়ীতেই মানুষ; মামার বাড়ী অবশ্য আমাদের নিজেদের গ্রামেই—এবং একই পাড়ায় একেবারে পাশাপাশি বাড়ী। ঠিক হইল আমি কিছু দিন পূর্ব্বে গিয়া মামার বাড়ীতে উঠিয়া নিজেদের পরিত্যক্ত ভিটায় ঘর-দোর তুলিয়া সমস্ত ঠিক্-ঠাক্ করিব, তাহার পর গৃহিণী ও ছোট ছেলে দুইটিকে দিল্লী হইতে গ্রামে লইয়া যাইব।

আজ দিন-পনর হইল গ্রামে আসিয়াছি। প্রথমে খানিকটা ভড়কিয়া গিয়াছিলাম—শৈশবের সেই গ্রাম আর যেন খুঁজিয়া পাইলাম না। পথঘাট সব জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, কত বড় বড় বাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্তু কয় দিনে এসব গা-সহা হইয়া গেল—বিশেষতঃ আমাদের পাড়াটির এখনও তত অবনতি হয় নাই। এই কয়টা দিনে মাটি তুলিতে, পুকুরের ধাপ দল পরিষ্কার করিতে, খড় ও কাঠের যোগাড় করিতে অন্ততঃ দুই তিন শত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।

সেদিন সকলেবেলা সবেমাত্র হাত মুখ ধুইয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়াছি, এমন সময় খুট্‌ করিয়া দরজার দিকে একটা শব্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখি একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলে ঘরে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না ইতস্ততঃ করিতেছে। ছেলেটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চাই তোমার?

ছেলেটি ঘাড় হেঁট করিয়া জবাব দিল—আপনাকেই।

আমি বলিলাম—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, কাছে এস।

ছেলেটি আমার নিকটে আগাইয়া আসিল। দিব্যি ছেলেটি—চোখ দুইটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল—মুখখানা ঢলঢলে—চুলগুলি কোঁকড়ান। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি?

ছেলেটি জবাব করিল অমিয়।

—কি চাই তোমার?

—আপনাকে একবার আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে—বাবা বার-বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

—ও যতীনের ছেলে তুমি! এক মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল—আমাদের যতীন—বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বরাবর আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছি। যতীন ছিল—ক্লাসের সেরা ছেলে—যেমনি লেখাপড়ায় তেমনি দুরন্তপনায়। বিপিন চক্রবর্ত্তীর বাগান হইতে একবার দল বাঁধিয়া সমস্ত নারিকেল চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সে-বার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি কারণে যেন আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য সদর রাস্তার উপরে অতি সুন্দর একটি 'গেট' সাজান হইয়াছিল। যতীনের এক বিপ্লবী দাদা অনেক দিন হইতে ফেরার ছিলেন—যতীনেরও যেন কেমন করিয়া ছোটবেলা হইতেই হইয়াছিল ইংরেজ-বিদ্বেষ। যতীনের নজর এই গেটটির উপরে পড়ে—যেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিবেন সেদিন সকালে দেখা গেল কে যেন গেটটি ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া রাখিয়াছে। হাই-স্কুলে যখন পড়ে তখন একবার পুলিসের সহিত মারপিট করিয়া কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়াছিল। যতীনের নাম করিতেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া যায়। যতীনের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত গাঢ়—রাস্তায় ঘাটে, খেলার মাঠে অনেক সময়ই আমাদের এক-সঙ্গে দেখা যাইত। তার পর এই সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন খবরই রাখি না—শুধু এইটুকু জানিতাম যে সে বরাবর গ্রামেই থাকে। গাঢ় বন্ধুত্বও সময়ের ব্যবধানে ক্রমে ক্রমে মনের কোণ হইতে একেবারে মিলাইয়া গিয়াছিল। ছেলেটিকে দুই হাত বাড়াইয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম—তোমার বাবা কেমন আছেন খোকা?

—বাবার যে অসুখ।

—কি অসুখ?

—কালাজ্বর, অনেক দিন ধরে ভুগছেন। বাবা ব'লে দিলেন আপনাকে অবিশ্যি একবার যেতে—তাঁর ত আর আসবার শক্তি নেই।

ছেলেটির সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিয়া আদর করিয়া বিদায় দিলাম—বলিয়া দিলাম বিকালবেলা নিশ্চয় যাইব। মনে হইল—সত্যই ত খুবই অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আজ পনর দিনের মধ্যে যতীনের সহিত একটিবারও দেখা করিয়া তাহার খবর লইতে পারিলাম না। তার পর তাহার এই অসুখ, সে মনে করিবে কি?

২

যতীনের বাড়ী মাইলখানেক দূরে। তাহাদের পাড়ায় ঢুকিয়া আর যেন বাড়ী চিনিয়া বাহির করিতে পারি না এমনই অবস্থা—অথচ ছোটবেলায় দিনের অধিকাংশ ভাগ কাটিত যতীনদের বাড়ীতেই। ত্রিশ বৎসর পরে সব যেন তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। এ পাড়াটায় যে এত জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। সিদ্ধান্তদের বাড়ীর পাশ ঘেঁষিয়া যে রাস্তা বরাবর স্টেশনের দিকে গিয়াছে তাহারই শেষপ্রান্তে যতীনদের বাড়ী। কি আশ্চর্য্য! সিদ্ধান্তদের বাড়ী পোড়ো হইয়া গিয়াছে। মস্ত পুষ্করিণী, দোতালা দালান সব যেন খাঁ খাঁ করিতেছে —বটপাকুড়ের গাছ দালানের সর্ব্বাঙ্গ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। নবীন সিদ্ধান্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রসমেত লোক ত বড়-একটা কম ছিল না? কিন্তু বাড়ীর এমন দশা হইল কেন? সমস্ত পথটাই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে যতীনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সে বাড়ীর চিহ্ন আর কোথাও নাই। বড় বড় খড়ের চৌরী ঘরই ছিল ছয়-সাতখানা—তাহার একখানারও চিহ্নমাত্র নাই। ভিটাগুলা জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে—মাত্র এক পাশে যে ছোট একটি একতালা দালান ছিল তাহাই কোন প্রকারে এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের বারান্দায় একটা মাদুরের উপরে বালিশ শিয়রে দিয়া যতীন শুইয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে চিনিতে ত পারিতামই না—এখনও রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম—এই সেই যতীন! মাথাটি তাহার যেন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, রুক্ষ চুলগুলি খাড়া হইয়া আছে, কণ্ঠ ও পাঁজরার সব হাড়গুলা গনিতে পারা যায়—পেটটি উঠিয়াছে অসম্ভব রকমের বড় হইয়া, দুইখানি পায়ের পাতাই জল লাগিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। যতীন কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—কে রবি? এস, ভাই ব'স। যতীনের পাশে বসিয়া তাহার রোগের কথা—চিকিৎসার কথা—আরও ভাল ডাক্তার আনাইয়া ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই সব আলোচনা করিতেছিলাম। কিন্তু দেখিলাম যতীন এসব কথা বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চিকিৎসার আর কি হবে ভাই—ও সবে আর দরকার নেই। তোমাকে সেজন্য ডাকিও নি। ডেকেছি অন্য প্রয়োজনে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে তাকাইলাম।

—তোমাকে গোটা-পঞ্চাশেক টাকা দিতে হবে ভাই। তুমি দিতে পারবে এবং দেবেও জানি, তাই চাইছি নইলে চাইতাম না। সমস্ত জমাগুলার চার সন ক'রে খাজনা বাকী—আর মাত্র কয়টা দিন সময় আছে—গোটা-পঞ্চাশেক টাকা না দিলে সবগুলোয় নালিশ হবে। তাহলে যে সংসারের সবাই না খেয়ে মরবে ভাই।

আমি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম—সে হবে সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু চিকিৎসারও একটা বন্দোবস্ত হওয়া ত দরকার, সেজন্যে না-হয় আরও কিছু দেব।

যতীন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—দেনা আর বাড়াতে চাই না ভাই, আর তাতে লাভও কিছু নেই। কথায় কথায়—আমার গ্রামে বাস করিবার কথায় সে মন্তব্য করিল—কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না ভাই, গ্রামে তুমি থাকতে পারবে না। আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—কেন? সে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—সে গ্রাম কি আর আছে? ত্রিশ বছর আগে যে-গ্রাম তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে সেই গ্রামের ছবিই হয়ত তোমাকে পাগল করেছে। কিন্তু সে গ্রাম আর নাই—সারা গ্রাম জঙ্গলে ভরে উঠেছে। চন্দনায় আর স্রোত থাকে না, কার্ত্তিক মাস আসতে না আসতেই শুকিয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস। আমি বলিলাম—কিন্তু তাই ব'লে সবাই যদি এমনি ক'রে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই—তাহলে কি দশা হবে বল ত? বরং এখানে থেকে যাতে গ্রামের উন্নতি হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত নয়?

—না পালিয়ে উপায় নেই ভাই। বাঁচতে হবে ত—অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে ত? আর ব্যক্তিগত ভাবে এর উন্নতির চেষ্টায়ও কোন ফল হবে না। এর পিছনে চাই রাজশক্তি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যতীনের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আমাদের পাড়ায় আসিয়া ঢুকিতে একেবারে তরল অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গেল। পথে জনমানবের সাড়া নাই—গা যেন কেমন ছম ছম করিতে লাগিল। এত দিন শহরবাসের ফলেই কি এই দুর্ব্বলতা—ভাবিয়া ঠিক পাইলাম না। হঠাৎ রাস্তার মোড়ে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম—মনে হইল কে যেন রাস্তার পাশে বসিয়া বমি করিতেছে। কাছে আগাইয়া আসিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ হারাধন শিকদার একেবারে রাস্তার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়াছেন, বমনের বেগে তাঁহার সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। দুই হাত দিয়া তাঁহাকে

জড়াইয়া ধরিলাম। বমনের বেগ কমিলে তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন —কে রবি? আমাকে একটু ধ'রে বাড়ীতে দিয়ে এস ভাই। হঠাৎ এমন হইল কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জবাব দিলেন—মাঝে মাঝে এ রকম তাঁহার হইয়া থাকে। কাছেই তাঁহার বাড়ী, কোন প্রকারে ধরিয়া লইয়া গেলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—বাতির আলো হারাধনের উপরে পড়িতেই একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম—এ কি তাঁহার সারা দেহে যে রক্ত! আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—রক্ত এল কোত্থেকে?

হারাধন নির্ব্বিকার চিত্তে জবাব দিলেন—রক্তবমিই ত করলাম ভাই—কাসিটা যখন বাড়ে তখনই মাঝে মাঝে এ রকম হয়। এতক্ষণে নিজের দেহের দিকে তাকাইয়া দেখি আমার জামার দুই হাতায় চার-পাঁচ স্থানে রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে সারা গা ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল—কথাটি না কহিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। পাশেই সতীশ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারি। সতীশ ডাকিয়া বলিল—রবিদা নাকি, কোত্থেকে এলেন? তাহার কথায় জবাব না দিয়া বলিলাম—হারাধন শিকদারের কি হয়েছে বল ত? রাস্তার পাশে বসে রক্তবমি করছিল।

—থাইসিস। আজ কত দিন ধরে ভুগছে।

আর কথাটি না কহিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়—মনে হইতেছিল হাত দু'খানা জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে ঢুকাইয়া দিই। বাড়ী আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া—ফিনাইল দিয়া ভাল করিয়া হাত ধুইয়া স্নান করিয়া তবে কতকটা স্বস্তি বোধ করিলাম।

৩

পরের দিন সকালে উঠিয়া টাকা লইয়া যতীনের বাড়ীতে গেলাম। টাকা কয়টি হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া যতীন একটি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পর বলিল—একটা বৎসরের মত নিশ্চিন্ত ভাই—খামারে যা চারটি ধান হয় তাই দিয়েই সংসার চলে। ইহার পরে আরও কিছুক্ষণ দম লইয়া পুনরায় আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভাই টাকা কয়টি তোমাকে হয়ত আর দেওয়া হয়ে উঠবে না। আমি এ প্রসঙ্গ থামাইয়া দিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু যতীন বাধা দিয়া বলিল—আমাকে বলতে দাও ভাই। এ কয়টি টাকা তুমি লোকসান করতে পারবে—আমি জানি। মনে কর—সেই যে এক দিন বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুর বিপদেই টাকা কয়টি সাহায্য করলে। আজ না বললে আর বলতে পারব না ভাই—আর যে বেশী দিন আমি বাঁচব না, এ আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম—চুপ কর ভাই, আমি বলছি—তুমি নিশ্চয় বাঁচবে—তোমার যাতে ভাল চিকিৎসা হয় সে বন্দোবস্তও আমি দু-এক দিনের মধ্যেই করব।

যতীন দুই চক্ষু আমার মুখের পানে তুলিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—আর কেন বোঝা বাড়াবে ভাই?

বিকাল বেলা সতীশ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়া বলিলাম—তোমাকে একবার ভাল ক'রে যতীনকে দেখতে হবে সতীশ।

সতীশ বলিল—কিন্তু বিশেষ কিছু ফল আর হবে ব'লে মনে হয় না রবিদা!

—তুমি কি সত্যি একেবারে আশা ছেড়েছ সতীশ?

সতীশ ম্লান হাসিয়া জবাব দিল—জানেন ত আশা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ছাড়তে নেই। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল—যতীনদার সারাটা জীবন পরের জন্যে খেটেই গেল—এই যে গ্রাম এর জন্যে কি না তিনি করেছেন। অথচ আজ তিনিই গ্রামে একঘরে।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম —বল কি সতীশ?

সতীশ বলিল—আপনি বুঝি এর কিছুই খবর রাখেন না রবিদা?

আমি বলিলাম—কই কিছুই জানি না ত।

—যতীনদা যে কি, সে এক মুখে বললে শেষ হবে না রবিদা। জানেন ত যতীনদা বিধবা বিয়ে করেছিলেন?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম—তাই নাকি? তাই বুঝি একঘরে।

সতীশ হাসিয়া বলিল—শুধুই কি তাই? শুনুন তবে —সেবার যতীনদা জেল থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছেন—ইচ্ছে ছিল মাসখানেক ছেলেদের নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে আবার এক দিন জেলে ঢুকে পড়বার জোগাড় করবেন। সেবারকার আন্দোলনে আমাদের দশ-পনরখানা গ্রামের মধ্যে যতীনদাই ছিলেন নেতা। কিন্তু জেলে যাওয়া তাঁর আর হ'ল না। এক দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা খেলার মাঠে ব'সে আছি—হঠাৎ যতীনদা এসে আমাদের চার-পাঁচ

জনকে মাঠের এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—এখানে ব'স্ তোরা কিছু কথা আছে।

আমরা বসলে বললেন—বাবলাডাঙ্গির তারিণী পালের মেয়ের কথা কিছু শুনেছিস তোরা?

পাশের গ্রাম বাবলাডাঙ্গি, সুতরাং কিছু কিছু কানে এসেছিল বইকি—কিন্তু বিশ্রী ব্যাপারটি কেউ মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। যতীনদা বললেন—শোন আমি বলছি। মেয়েটি আজ চার-পাঁচ বছর বিধবা হয়ে তার মার কাছে আছে। বয়স তার বছর কুড়ি-বাইশ। এদিকে ওদের পাড়ারই নীলমাধব মেয়েটির সর্ব্বনাশ করেছে—মেয়েটি আজ মাস-তিনেকের অন্তঃসত্ত্বা! ওদের দু-এক জন দূরসম্পর্কের আত্মীয় মিলে যুক্তি করেছে, মেয়েটিকে জোর ক'রে গাড়ীতে তুলে কলকাতার রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবে। চোখের আড়াল হ'লে ওদের সমাজের মর্য্যাদা ত বাঁচবে—তার পর মেয়েটির যা হয় হোক্। আমি এদিকে নীলমাধবকে খুঁজে বের করে—তাকে অনেক করে বুঝিয়ে ঠিক করেছি—ও মেয়েটিকে বিয়ে করবে। প্রথমে বিধবা-বিবাহের নামে পিছিয়ে গিয়েছিল, পরে ভাল ক'রে যুক্তিতর্ক দিয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে রাজী করিয়েছি। এদিকে কিন্তু গ্রামের সমাজপতিগণ একেবারে বেঁকে বসেছেন—বিধবা-বিবাহ কস্মিনকালে তাদের সমাজে হয় নি। সুতরাং মেয়েটিকে কোন প্রকারে চোখের আড়াল করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। মেয়েটির এক দূর-সম্পর্কের খুড়োর মর্য্যাদায়েই আঘাত লেগেছে সব চাইতে বেশী—তিনিই বেশী উদ্যোগী। এখন কথা হচ্ছে, বাবলা-ডাঙ্গিতে ওদের বিয়ে হবার উপায় নেই—মেয়েটিকে কোন প্রকারে আজ রাত্রেই আমাদের বাড়ীতে এনে ফেলা দরকার। আমি যদু চক্রবর্ত্তীকে ঠিক ক'রে রেখেছি, তিনিই করবেন পুরোহিতের কাজ-নীলমাধবও আমার বাড়ীতেই লুকিয়ে আছে। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে আর পায় কে।

আমরা ১৫।২০ জন যুবক একেবারে কোমর বেঁধে লাঠি ঠেঙা নিয়ে তৈরি হয়ে গেলাম। রাত্রি দশটার পরে এসে ডাকাতের মতো চড়াও হলাম তারিণী পালের বাড়ীতে। পাল্কী বেহারা নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু বেহারারা হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চাইলে না—অবশেষে তাদের কাছ থেকে দুখানা পাল্কী চেয়ে নিয়ে আমরাই চার জন ক'রে বেহারা হলাম। বুড়ী ও মেয়েটিকে যতীনদা পূর্ব্বেই ব'লে সব ঠিক করে রেখেছিলেন—আমরা যাওয়া মাত্র তারা সুড় সুড় ক'রে পাল্কীতে চেপে বসলো। আমরা লাঠি আস্ফালন করতে করতে নিজেদের গ্রামে ফিরে এলাম।

এদিকে কিন্তু ভীষণ অবস্থা—নীলমাধবকে আর এসে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বুঝা গেল সে পালিয়েছে। যতীনদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। পরের দিন মেয়েটির দূরসম্পর্কের কাকা মহকুমায় গিয়ে আমাদের পাঁচ-সাত জনের নামে একেবারে নারীহরণের মামলা দায়ের ক'রে দিয়ে এলেন—সঙ্গে সঙ্গে থানায় এল সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট। থানাওয়ালাদের সঙ্গে যতীনদার যা ভাব তা ত বুঝতেই পারছেন। বিকালবেলা আমরা সব ঘোঁট ক'রে বসলাম। বাড়ীতে অভিভাবকদের সে কি গালাগালি। যতীনদা অনেক ভেবে বললেন—এক মাত্র পথ আছে সতীশ। আমরা সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম—কি?

—মেয়েটিকে কোন প্রকারে কারু সঙ্গে আজ রাত্রেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে কোন উৎসাহের লক্ষণই প্রকাশ পেল না—এমন ন্যক্কারজনক কাজের মধ্যে কে এগিয়ে যাবে? যতীনদা কয়েক বার আমাদের দিকে তাকিয়ে—শেষে আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন, অবশেষে বললেন—বিয়ে আজই হবে সতীশ, তোরা সব রাত দশটার সময় এসে হাজির হবি। আমি যদু চক্রবর্ত্তীর বাড়ী চললাম। আমরা হতবুদ্ধির মত এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম—বিয়ে ত হবে কিন্তু বর কে?

যা হোক, রাত্রে আমরা সবাই গিয়ে হাজির হলাম। যতীনদা নিজে এসে বরের আসনে ব'সে পড়লেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—কি রে তোরা ফুর্ত্তি কর, তোরা যে সব বরযাত্রী, যদু চক্রবর্ত্তী মন্ত্র পড়ালেন—মেয়েটির মা করলেন সম্প্রদান। তার পর আর কেস চলল না। প্রমাণ হয়ে গেল যতীনদাকে মেয়ের মা নিজে কন্যাসম্প্রদান করেছেন। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সতীশ চুপ করিল। আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলাম—বল কি সতীশ, যতীন এমন একটা নোংরা কাজ ক'রে ফেললে।

সতীশ হাসিয়া বলিল—যতীনদা নীলকণ্ঠ—বিষ পান ক'রে হজম ক'রে ফেলেছিলেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, যতীনদা আজও চিরকুমার—বিবাহটা অভিনয় মাত্র।

· আমি বলিলাম—কিন্তু সেই যে অমিয় নামে ছেলেটি?

সতীশ বলিল—ঐ সেই ছেলে, ও কিন্তু যতীনদাকেই তার পিতা ব'লে জানে। সমস্ত ব্যাপারটি ভাল করিয়া

অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। না গ্লানিতে না আনন্দে সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল।

৪

পরের দিন পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া কি যেন করিতে-ছিলাম হঠাৎ নজরে পড়িল হারাধন শিকদার নির্ব্বিকার চিত্তে পুকুরের জলে নামিয়া স্নান করিতেছেন। দেখিবা মাত্র আমার মন একেবারে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ, থাইসিস্ রোগী এমনি করিয়া জলে নামিয়া রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে! অথচ আমাদের পাড়ায় এই একটি মাত্রই পুষ্করিণী—অনেকে ইহার জলই পান করে। ভাবিলাম, ইহার একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। কয়েক পা অগ্রসর হইলাম, আবার কি ভাবিয়া পিছাইয়া আসিলাম—কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে মনকে দৃঢ় করিলাম—যেখানে জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে এমন-ধারা সঙ্কোচ করিলে চলিবে কেন? হারাধন শিকদারকে বলিলাম—শিকদার মশাই একটি কথা। হারাধন আমার দিকে দুই চোখ তুলিয়া তাকাইলেন।

—দেখুন আপনার যা অসুখ তাতে পুকুরে নেমে স্নান না করাই উচিত।

শিকদার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—সেজন্যে ভেব না ভাই—ও আমার সহ্য হয়ে গেছে, আর যে গরমের দিন—অবগাহন স্নান না করলে কি শরীর ঠাণ্ডা হয়?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে সে জন্যে নয়, রোগটা ছোঁয়াচে কিনা—আর এই জলই ত পাড়ার সবাই ব্যবহার করে।

হারাধন এবার দুই চোখ কপালে তুলিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—বটে, বামুন মানুষ স্নান করলে তোমার পুকুরের জল হয়ে যায় অপবিত্র—আর সব মুচি মেথর স্নান করলে হয় পবিত্র, কেমন?

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—সে জন্যে নয়, রোগটা যে—

—রোগ? কার এ রোগ নাই শুনি—ও পাড়ার বনমালী, নিতাই পাল, এ পাড়ার আরও চার পাঁচটির যে বছরে দুই-এক বার ক'রে এমনি রক্তবমি হয়—তাদের বন্ধ কর দেখি। আর বেশী দূর কেন, তোমার বড়দাদার কি? গত বছর তার যে গলা দিয়ে এই সেরখানেক রক্ত উঠলো—সেটা কোন্ ভাল ব্যারাম শুনি?

হারাধন শিকদার আরও কত কি শ্রাব্য-অশ্রাব্য বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। আমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এতগুলি যক্ষ্মারোগী এই গ্রামে! আর বড়দার গলা দিয়ে রক্ত উঠেছে? বলে কি হারাধন শিকদার? আমি যে বড়দার ঘরেই একেবারে পাশের চৌকিতে বিছানা করিয়া শুইয়া থাকি। বড়দাকে কথাটি বলিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন—ও কি কিছু নয়? পিত্তি গরম হয়ে অমন হয়েছিল—খানিকটা ছাঁচি কুমড়ার জল আর দুর্ব্বার রস খেতেই সেরে গেছে।

আমি বলিলাম—বুকটা কি একবার ডাক্তার দিয়ে দেখিয়েছিলেন?

বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বললাম যে কিছু নয়—আবার ডাক্তার কেন?

শেষবেলায় যতীনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম—যে-গ্রামে সাধারণ স্বাস্থ্যের কথা যাঁহারা ভদ্র তাঁহাদিগকে বুঝান যায় না—নিজের পুকুরে যক্ষ্মারোগীকে স্নান করিতে নিষেধ করিলে উল্‌টিয়া সেই পাঁচ কথা শুনাইয়া দিয়া যায়—সেখানে যতীনের মত সাহসীই ত দরকার। সেই মেয়েটিকে অমনি করিয়া গ্রহণ করায় যে বুকের পাটা—তাহা এক যতীনেই সম্ভব। আবেগভরে যতীনের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—তোমাকে বাঁচতেই হবে ভাই—কাল মহকুমা থেকে ভাল ডাক্তার আসবে—সতীশের সঙ্গে আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি। এ গ্রামে যে তোমার মত লোকই চাই যতীন। আমরা ভীরু দুর্ব্বল—তুমি না থাকলে আমরা গ্রামে বাস করব কেমন ক'রে বলত?

যতীন ম্লান হাসিয়া বলিল—সে ভাবনা আর আমি রাখি না ভাই। আর যথার্থ মঙ্গল জোর ক'রে আমরা কেউই এদের করতে পারবো না—এদের ভেতর থেকে মানুষ গড়া চাই, সে মানুষ গড়তে পারে কেবল শিক্ষায়। শিক্ষা হবে সার্ব্বজনীন—যা রাজশক্তি ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ভাল ডাক্তার দেখাইয়াও কোন ফল হইল না—চার-পাঁচ দিন পরে যতীনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। সেদিন সারাটা বেলা যতীনের কাছে বসিয়া রহিলাম—সন্ধ্যাবেলায় যতীনের শেষনিশ্বাস পড়িল। সতীশ বরাবরই আমার সহিতই ছিল, কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া বলিল—রবিদা, এখন ত আর ব'সে থাকলে চলবে না—শেষ কাজটা ত করা চাই—হাঙ্গামা ত বড় কম হবে না। আমি জিজ্ঞাসু মুখে তাহার দিকে

তাকাইতে সে বলিল—যতীনদা যে একঘরে, লোক জোগাড় করতে বেশ একটু বেগ পেতে হবে।

আমি বলিলাম—যতীন যে চলে গেল, তবু একঘরে? এখনও কেউ আসবে না?

সতীশ বলিল—এত বেগ পেতে হ'ত না, যতীনদারও এক দল শিষ্য ছিল যারা তাঁর কথায় প্রাণ দিতে পারত কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাদের আটকে রেখেছেন। আপনি বসুন—আমি যাচ্ছি—একটু বেশী রাত হ'লে বিচলিত হবেন না। রাত্রি দশ-এগারটার সময় সতীশ দশ-বার জন লোক লইয়া আসিল। কাঠ চিড়িয়া অন্যান্য সমস্ত জোগাড় করিয়া শ্মশানে যাইতে আরও দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সমস্ত শেষ করিয়া ফিরিতে বেলা অন্ততঃ সাত-আটটা বাজিয়া গেল। মন এত খারাপ হইয়া গেল যে আর কথাটি পর্য্যন্ত যেন বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। একটা দিনে সমস্ত গ্রামটায় যেন আমার নিশ্বাস আটকাইয়া আসিতেছিল, স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখি বড়দা আমার বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছেন, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত গা শিহরিয়া উঠিল। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বাইরে একজন ইটের কন্‌ট্রাক্টর ব'সে আছে রবি—তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

আমি বলিলাম—ইট আর আপাততঃ আমার চাই নে বড়দা, তাকে যেতে বলে দিন।

বড়দা অবাক্ হইয়া বলিলেন—এই যে পরশু বললে এক লাখ ইট নেবে—তাই ত আমি তাকে খবর দিয়েছি।

—আপাততঃ বন্ধই থাক দাদা!

—কিন্তু কলকাতায় যে সিমেণ্টের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।

—সে আমি গিয়ে তাদের নিষেধ ক'রে দেব।

—তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছ নাকি?

—না, আজ বিকালের গাড়ীতে দিল্লী যাব।

—হঠাৎ দিল্লী? অন্য সব কাজকর্ম্ম?

—সবই বন্ধই রইল।

বড়দা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তবে কি গ্রামে থাকবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলে নাকি?

আমি কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিলাম—এখনও ঠিক ক'রে বলতে পারছি না—হয়ত তাই হবে।

বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোমার মতির কোন স্থিরতা নাই দেখছি, এতগুলো টাকা মিছেই খরচ করলে!

আমি কথাটি না কহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং পরক্ষণেই দিল্লীতে আমার শিশুপুত্র দুইটির কথা মনে হইতেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বিকালবেলা এক প্রকার পলাইয়া স্টেশনে আসিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম।

নন্দলাল বসু ও ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিক সঙ্কট

শ্রীতারাপ্রসাদ বিশ্বাস

সে অনেক দিনের কথা নয় যখন ভারতীয় চিত্রকলা বৈদেশিক মোহের রাহুগ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন গৌরবময় যুগের আদর্শ সাম্‌নে রেখে নব নব রূপসৃষ্টির পথে যাত্রা করেছিল। রূপদেবতার আশীর্ব্বাদ সেদিন সে পেয়েছিল; তাই সেদিনকার নানা প্রতিকূল সমালোচনায় বন্ধুর দুর্গম পথের মধ্যে দিয়ে গিয়েও সে আজ সুযশের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছে এদেশে এবং বিদেশে। সে সঙ্কট-দিনের অবসান হয়েছে সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা শিল্পের দিক থেকে এবং শিল্পীদের দিক থেকে আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তার যাত্রাপথ হয়ে উঠেছে সংশয়সঙ্কুল—মেঘ উঠে দিগন্ত থেকে দিগন্তে অন্ধকার বিস্তার করতে উদ্যত। আগের দিনের সেই সঙ্কটময় ক্ষণে রূপতীর্থের যাত্রীদলের অগ্রণী ছিলেন চিত্রীগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর কলমের ছবি এবং লেখা অবিশ্বাসীর—বৈদেশিক মোহাচ্ছন্ন স্বদেশীয়দের বিদ্রূপের যথোচিত উত্তর দিয়েছিল। তাঁর প্রদত্ত বাগীশ্বরী বক্তৃতা, তৎকালীন প্রবাসী, ভারতী, বিচিত্রা, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানা প্রবন্ধ এবং

আলোচনা দেশের মনের হাওয়া দিয়েছিল বদ্‌লে। দেশের জনসাধারণে—সকলে আন্তরিকভাবে না হ'লেও—মৌখিক শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন ভারতশিল্পের প্রতি—অবনীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি।

আজ যে সঙ্কট দেখা দিল সেটা বিশেষ ক'রে আভ্যন্তরীণ; সেটা বর্ত্তমান শিল্পধারা এবং শিল্পীদের কেন্দ্র ক'রে। এই সঙ্কট প্রত্যেকের, অন্ততঃ যাঁরা শিল্পানুরাগী—যাঁদের দেশের শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ আছে, তাঁদের মনে বেদনা জাগাবে মনে হয়।

শিল্প দেশের অন্তরের সামগ্রী,—তার কৃষ্টিসাধনার প্রাণ-স্বরূপ। অতীতের নামহীন শিল্পীদের প্রাণের ছোঁয়াচ লেগে যে আগুন জ্বলেছিল দক্ষিণ-ভারতের পাহাড়ের গুহায় গুহায়—যাঁদের হাতের পরশে সামান্য একতাল মাটি প্রাণ পেয়ে নটরাজ-মূর্ত্তিতে ছন্দে দুলে উঠেছিল—তাঁদের সেই প্রাচীন ধারার রক্ষক এবং বাহক দেশের বর্ত্তমান শিল্পী সমাজ—বিশেষ ক'রে তরুণ শিল্পিগণ। তাঁদের সেই জ্বালানো আলো থেকে আমরা আলো জ্বালিয়ে নিয়ে পথ দেখে চলেছি—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একথা মনে ক'রে এক দিন সুযোগ বু'ঝে চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলাম। সে দিনের তাঁর কথায়—তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণে আমার মনের ধাঁধা গিয়েছিল কেটে। মনে হয়েছিল তাঁর বাণী ভারতশিল্পের এই সংশয়সঙ্কুল তিমির রাত্রে নবসূর্য্যোদয়ের আশ্বাসবাণী—তিমিরক্ষণের দীপবর্ত্তিকা।

তাঁকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছিলেন, "প্রধান জিনিস হচ্ছে—প্রতিভা। প্রতিভা না থাকলে উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি হয় না। আর দ্বিতীয় জিনিস হ'চ্ছে, প্রকৃতির রূপের জ্ঞান অর্থাৎ ষড়ঙ্গ অনুসরণ ক'রে যে জ্ঞান হয়। (ষড়ঙ্গ,—রূপভেদাঃ, প্রমাণাণি, ভাব, লাবণ্যযোজনম্, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ)। এ দুটোর কোনটাও না থেকে অনেকে তথাকথিত শিল্পী নামে পরিচিত হচ্ছেন—ছেলেমানুষি ও খেলো জিনিসের সৃষ্টি করছেন।

"আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে 'মর্ডার্ণ' কথাটি। এই কথাটির আড়ালে আর্টের বাজারে অনেক বাজে জিনিস চ'লে যাচ্ছে, এবং যখন দেখি তথাকথিত আর্টের সমঝদারগণ সে সবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন তখন মন নিরাশায় ভরে ওঠে। আরও খানিকটা ক্ষতি করেছে কমার্শিয়াল আর্ট। জনমত এই—আজকের এই ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসাসংক্রান্ত অন্যান্য প্রকারের প্রচারকার্য্যের জন্য কমার্শিয়াল আর্ট জানা নিতান্তই দরকার,—কিন্তু তা ব'লে ওটাকে ভাল শিল্পসৃষ্টি ব'লে চালান যায় না।

"প্রথমে আমি ইণ্ডিয়ান আর্টে 'মডার্ণিজম্' সম্বন্ধে কিছু বলব। শিল্পীকে—তা তিনি যতই প্রতিভাশালী হোন না কেন, দেশের প্রাচীন শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে।—পুরোনো শিল্পধারার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে—তার গৌরবের কথা জান্‌তে হবে। তার পর নিজ নিজ রুচির পথে নিজের স্বকীয়তা দ্বারা নব নব রূপের মধ্যে দিয়ে কল্পনাকে প্রকাশ করতে হবে। ভাল শিল্পী হ'তে হ'লে রূপ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান যে দরকার সেটা আর পুনর্ব্বার উল্লেখ না-ই করলাম। দেশের প্রাচীন শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় যত বেশী চাক্ষুষভাবে হবে ততই শিল্পীর পক্ষে লাভ। সে সহজে বুঝতে পারবে অতীতের রত্নভাণ্ডারে কি সঞ্চিত আছে আমাদের জন্যে—নতুনদের জন্যে। হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তার মহিমা। তোমরা সুযোগ পেলেই অজন্তা, কোণারক, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি সব দেখে এস—বুঝতে পারবে আমাদের দেশের শিল্পীরা কি ক'রে গেছেন। অবশ্য প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা ও তার রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্যেই মৌলিক ছবি সৃষ্টি করার গুপ্ত কথা নিহিত আছে। তথাপি traditional ছবি ভাল ক'রে না দেখার দরুন সৃষ্টির মধ্যে অর্ব্বাচীনতা ও পাগলামি প্রকাশ পাবে—গভীরতার অভাব দেখা দেবে।

"অনেকে বলেন আমার ছবি অনেক রকমের টেকনিকে আঁকা, যেন একটা ধারাবাহিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি ওটা সবসময়ে পরীক্ষা হিসেবে ত করি নি। ওটা নানা টেকনিক্ এবং ঐতিহ্য অনুশীলন করার ফলে নতুন কল্পনার সময় তার ছাপ এসে যায়। আর কোন্ ঐতিহ্যের কতটা প্রভাব তা ত বিশ্লেষণ করা যায় না। কেবল কোন টেকনিক্‌কে উদ্দেশ্য ক'রে কাজ করাতে আমি লজ্জা অনুভব করি। একটা কথা এখানে বলি—প্রকৃতির রূপের বিষয়-জ্ঞানের সাধনাতে ও ঐতিহ্যমূলক উৎকৃষ্ট শিল্পের অনুধাবন করাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি। এই বিষয়ে আমি চিরদিন ছাত্র হিসাবে থাকতে পরম গৌরব বোধ করব।"

এখানে আমি বলেছিলাম, "আপনার সম্প্রতি আঁকা বুদ্ধের জীবনচরিতের ছবিগুলি দেখেছি, তাতে আমার মনে হ'ল বারহুতের ছাপ আছে।"

"থাকতে পারে—হয়ত আছে, কিন্তু যদি থাকে, সেটা এসে গেছে আমার অগোচরে। আমি বারহুতের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না যখন ওগুলো এঁকেছিলাম।

তোমার কাছে শুনলাম—এবার আমি ওগুলো মিলিয়ে দেখ্‌ব।

"ধর না কেন, আমাদের দেহরক্ষার জন্য নানা জিনিস খেয়ে থাকি—দুধ, মাছ, তরিতরকারী ইত্যাদি। মনে কর কারুর সঙ্গে লড়াই হ'ল এক জনের। এক জন তাতে হেরে গিয়ে গা ঢাকা দিল।—যে জিতলো তাকে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'মশায়, আপনি দুধ খেয়েই বা কোথায় জোর পেয়েছেন আর মাছ মাংসেই বা শরীরের কোন্‌খানটা বেশী কার্য্যক্ষম হয়ে এক্ষেত্রে কাজ দেখিয়েছে?' তাহ'লে তিনি তার উত্তরে কী বলবেন?

"আর্টের ব্যাপারেও এই রকম। যদি ধর অজন্তা-পদ্ধতিতে আঁকব ব'লে আরম্ভ করা যায় তা হ'লে সেটা নিছক 'কপি' হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা বেশী। তাই বলছিলাম—যাঁরা পুরনোকে ভালভাবে জেনেছেন এবং তার মধ্যে নতুনকে দেখেছেন আর নতুনেরও খবর রাখেন—মডার্ণ কিছু তাঁদেরই তুলিতে এসে ধরা দেবে।

"অবশ্য আজকের দিনে য়ুরোপীয় চিত্রকলার ধারা নানা 'ইজিমের' মধ্যে দিয়ে চলেছে কিন্তু সেটা বস্তুর রিয়ালিটি বোধ ও রূপের জ্ঞান শিক্ষাকে ফাঁকি দেবার জন্য নয়। ঐ জ্ঞান পুরাদস্তুর আয়ত্ত ক'রেই তাঁরা ওসব সৃষ্টি করছেন। ঐ জ্ঞান অর্জ্জন না ক'রে যদি পাশ্চাত্যের অতি আধুনিকের নকল করতে যাই—সেটা হবে বদহজমের মত। অবশ্য পাশ্চাত্য চিত্রকলার গ্রহণীয় যা-কিছু—তা এদেশের শিল্পী সম্যক্‌ বিচার ক'রেও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিলে অবশ্যই উপকৃত হবেন—উৎকর্ষের ছাপ লাগবে তাঁর কাজে।"

আর বললেন, "বাস্তবিক মনে কষ্ট হয় যখন দেখি দেশের কোন কোন শিল্পী নিজেকে ভোলাবার জন্যে য়ুরোপীয় মডার্ণ মাষ্টারদের নাম ঘন ঘন আওড়ান—এবং ছবিও যথার্থই ঐ সব পাশ্চাত্য শিল্পীদের সৃষ্টির স্বধর্ম্মী এবং সমশ্রেণীর মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তারিফও মেলে উদাসীন শিল্পভক্তদের কাছ থেকে। নিজের দেশের ভাল শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় এবং তার গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করা নিজেকে—এঁদের অসাধ্য হবে।"

তার পর কমার্শিয়াল আর্টের কথা পাড়লুম। নন্দলাল বললেন, "আমার মতে ও জিনিসটা আলাদা শেখবার দরকারই করে না।—বিশেষ ক'রে পাঁচ বছর সময় ওর পেছনে ব্যয় করার পক্ষে আমি ত কোনও সুযুক্তি খুঁজে পাই না। যাঁদের রুচি আছে—শিল্পীজনের

চিত্রাঙ্কনরত নন্দলাল

ফটো: লেখক

উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে—রূপের জ্ঞান যাঁদের আছে—এমন যে কেউ কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে ভাল কাজের দ্বারা নাম কিনতে পারবেন;—এ সম্বন্ধে আমার কোথাও সন্দেহ নেই। শিল্পশিক্ষায়তনে আলাদা বিভাগ খোলার বিশেষ দরকার করে না—বিশেষ ক'রে পাঁচ বছরের জন্য। আমি মাঝে অনেকের অনুরোধে কলাভবনে ওর একটা বিভাগ খুলেছিলাম—কোর্স করেছিলাম দু-বছরের। সাধারণ-ভাবে পাঁচ বছর শেখার পর আরও দু-বছর কমার্শিয়াল আর্ট শিখতে পারত। তাতে দেখেছিলুম দু-বছরই ওর পক্ষে বেশী। যে পাঁচ বছর ড্রইং, পেণ্টিং ইত্যাদি শিখলে তার পক্ষে ছ-মাসই যথেষ্ট ওর টেকনিক্যাল দিকটা আয়ত্ত ক'রতে। দেখতে পাচ্ছি যাঁদের সামান্য একটু ড্রইং জানা আছে, তাঁরাও কমার্শিয়াল আর্টে বেশ ক'রে যাচ্ছেন—বাজারে তাঁদের নামও হচ্ছে। বিলিতী মাসিকের সহায়তায় তাঁরা কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে পথ রচনা ক'রে চলেছেন। অথচ এর জন্য এই সব তথাকথিত শিল্পীদের অন্তরে কোন বেদনাবোধ নেই। তাঁরা যদি সত্য সত্যই শিল্পী হ'তেন—যে শিল্পীর ধর্ম্ম সৃষ্টি করা—তাহ'লে তাঁরা কখনই এমন কাজ করতে পারতেন না। মনে রাখতে হবে শিল্পীর প্রধান সাধনা হচ্ছে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা, বস্তুর বাহ্যিক রূপের জ্ঞান ও তার reality বোধ (বা বস্তুত্ব বোধ)—বস্তুর প্রাণের গতিভঙ্গি জানা; দেহীর দেহরক্ষার জন্য যেমন খাদ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন, তেমনই শিল্পীর পক্ষে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ

করার প্রাত্যহিক প্রয়োজন আছে। এক দিন ফাঁক রেখে গেলে শিল্পী হিসেবে দুর্ব্বল হয়ে পড়তে হয়। মহাপ্রাণ প্রকৃতি থেকেই প্রাণের সন্ধান মিলবে।"

খানিক বাদে জিজ্ঞেস করলুম প্রাচীর-চিত্র (fresco-painting) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল এ সম্বন্ধে কিছু জানবার।

উত্তরে বললেন,—"হাঁ, ফ্রেস্কো-পেন্টিং সম্বন্ধে অনেক শিল্পশিক্ষার্থীর কৌতূহল আছে শেখবার এবং তাঁদের কৌতূহল বিশেষ ক'রে নানা রকম পদ্ধতিকে কেন্দ্র ক'রে। যেমন—কি ভাবে জয়পুরী প্রথায় ক'রতে হয়—ইটালীয়ান Wet process-ই বা কি রকম,—egg tempera র ধরণটা কি?—ইত্যাদি। কিন্তু ফ্রেস্কোর গোড়ার জিনিস হ'চ্ছে, যে চেপ্টা দেওয়ালের ছবি হ'চ্ছে তার সেই চেপ্টা ধর্ম্ম ও ছবির উদ্দেশ্য বজায় রাখা আর তার composition—তার treatment. যে কোন ছোট কার্টুনকে দেওয়ালের ওপর বড় করলেই তাকে ফ্রেস্কো বলা যেতে পারে না—তাকে enlarged ছবি বলা যেতে পারে।

"আগের কথার সূত্র ধরে বলছি ফ্রেস্কোর গোড়ার কথা হ'চ্ছে ছবির treatment। কোন্ দেওয়ালে কি ভাবে বিষয়বস্তুটিকে রূপদান করলে মানাবে সেটা সর্ব্বপ্রথম চিন্তনীয় বিষয় শিল্পীর। গ্রাউণ্ডের কথা শিল্পীর না ভাবলেও চলে;—ওর জন্যে ত কারিগর আছে। জয়পুরী প্রথায় যদি ফ্রেস্কো আঁকতে হয় বিশেষ ক'রে অনেকখানি জুড়ে, তবে তার জন্য ঠিকমত গ্রাউণ্ড তৈরি করা বোধ হয় কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয় শিল্পীর চেয়ে সাধারণ জয়পুরী কারিগর ভাল জানে। ফ্রেস্কো-পেন্টিঙের এ সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিশেষ ঝোঁক না দিয়ে শিল্পীর উচিত ফ্রেস্কোর কার্টুনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—তার প্রতি অধিকতর যত্ন এবং মনোযোগ দেওয়া। যার গুণেই ছবিকে ফ্রেস্কো-পেন্টিং ব'লে চিহ্নিত অভিহিত করা যেতে পারবে—সত্যিকার প্রাচীর-চিত্রের গুণ সমন্বিত হবে সে।"

খানিক বাদে বললেন, "এ সব ত গেল শিল্প ও শিল্পীদের সমস্যা নিয়ে। তার পর দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। এ দুয়েরও সুস্পষ্ট প্রভাব আছে আর্টের ক্ষেত্রে—একথা ভুললে চলবে না। প্রথমে ধরা যাক্, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া। শিল্পী আশা করে দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা। জনগণের পক্ষে সহানুভূতি জানান কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করা নির্ভর করে তাঁদের রুচি এবং আর্থিক অবস্থার ওপর। জাতি হিসেবে আমরা দরিদ্র, তবে এই দুর্ভাগা দেশেও কয়েক জন ধনী এখনও আছেন। কিন্তু তাঁদের রুচির উন্মেষ এখনও হয় নি—এখনও ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা হয় নি।

"রাজনৈতিক প্রভাব। আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। বিদেশী শাসনের বজ্র-চাপ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করি। পরাধীন ব'লে আমাদের মনোভাবও আজ বিকৃত।—দেশের শিল্পের গৌরব ক্ষুণ্ণ, সে জন্য। বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে এত প্রবল আসক্তি! ওদেশের জনসাধারণের দেশের শিল্প ব'লে গভীর অকৃত্রিম দরদ আছে অন্তরে অন্তরে এবং শিল্পের রসবোধ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। আমাদের পরাধীন দেশে যাঁদের বিশেষ প্রতিভা আছে তাঁরাই কোন রকমে বেঁচে থাকেন, তাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।"

শেষ হ'ল কথা। এর মধ্যে হয়ত সত্যের কঠোরতা আছে কিন্তু কৃত্রিমতার লেশ নেই। দেশের শিল্প ও শিল্পীদের—বিশেষ ক'রে তরুণ শিল্পীদের জন্য গভীর সহানুভূতি ফুটে উঠেছিল তাঁর কথায়। বুঝেছিলাম—দরদের সুগভীর উৎস আছে তাঁর অন্তরে আজকের ও আগামী দিনের অনামী শিল্পীদের জন্য। আধুনিক অনেক শিল্পীই ইন্‌স্পিরেশন পান নন্দলালের সৃষ্টি থেকে। তাই আশা করা যায়, তাঁর প্রাণের বাণী তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করবে—দেশের শিল্পীদের কঠোর সাধনাপথে তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাথী হিসেবে পাবে।

বল কাহাকে বলে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পৃথিবীতে আমাদের চারিদিকে নিরন্তর দেখতে পাচ্ছি বলের উৎসব চলেছে। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে যে অসীম বল বিধৃত হ'য়ে রয়েছে তা আমরা অনুমান করতেও পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে নিরন্তর পৃথিবীর উপরে অপ্রমেয় বৈদ্যুতিক শক্তি বর্ষিত হচ্ছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ এত অধিক যে, আমাদের রসায়নশালায় সেই পরিমাণ শক্তি নির্ম্মাণ করা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট। অথচ এ শক্তি কোন স্থান থেকে আস্‌ছে তা আমরা জানি না। বৈশাখী মেঘে যখন প্রচণ্ড ঝড় চারদিকে ধূলিধ্বজ পাকিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে' চলে তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উন্মূলিত হয়ে যায়। বনস্পতির পত্রে ও পল্লবে, শাখায় ও প্রশাখায় সমস্ত বনানী আকীর্ণ হয়ে যায়। প্রবল ঘূর্ণীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভূমিগর্ভে যখন প্রচণ্ড বাষ্পের সৃষ্টি হয় তখন তার প্রসারণের চেষ্টায় সমস্ত মেদিনী কম্পিত হয়ে ওঠে, পর্ব্বতে মহাশৃঙ্গ স্খলিত হয়ে পড়ে, ভূমিতল বিদীর্ণ হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়, নগরের পর নগর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মহাসাগরের জলরাশি যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে, তখন সেই প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মানুষের হৃদয় ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠে। জলীয় বাষ্প দিয়া মেঘ তৈরি হইয়াছে। সেই মেঘের সঙ্গে মেঘ জ'মে যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তখন সৃষ্টি করে বজ্র। এতটুকু জলীয় বাষ্পের প্রসারণ শক্তি বড় বড় মালগাড়ী টেনে নিয়ে যায়। পৃথিবীর চারিদিকে তাই আমরা নিরন্তরই দেখতে পাচ্ছি বলের খেলা। সূর্য্যমণ্ডল থেকে আলোকের রশ্মি নিয়ে ছুটে আসছে বলের রশ্মি। এই বল যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত হচ্ছে পত্রে, পল্লবে, বনস্পতিতে, মহামহীরুহে। সঞ্চিত হচ্ছে ধানের ক্ষেতে, নানা ফসলের মাঠে। সেখান থেকে প্রাণিপুঞ্জ নিরন্তর বল আহরণ করছে। সেই বল সংধারিত হচ্ছে আমাদের পশুযন্ত্রের মধ্যে। এই পশুযন্ত্রের ব্যবহার ক'রে আমরা তৈরি করি নানা মহাযন্ত্র। সেই মহাযন্ত্র ব্যবহার ক'রে প্রকৃতির শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করি, আমাদের মঙ্গল সম্পাদন করি, এবং প্রকৃতির অনুকরণে চারিদিকে ধ্বংস-কবন্ধের নৃত্য লাগাইয়া দিই। প্রকৃতি যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করে, তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আমরা নানা উপায় আবিষ্কার করেছি, কিন্তু আমরা যে ধ্বংসের সৃষ্টি করি তাহার হাত থেকে আমাদের বাঁচাবার কোন উপায় নাই। আমরা আকাশে হাজার হাজার মাইল উড়ে যেতে পারি। আমরা সমুদ্রের তলা দিয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করতে পারি, ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে আমরা দ্রুতবেগে আমাদের যন্ত্রে আরোহণ ক'রে ধাবমান হ'তে পারি। আমরা আকাশমণ্ডলের ভিতর দিয়া পৃথিবীময় বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারি। এক দিন এমন ছিল যেদিন প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ ভয়ার্ত্ত হয়ে থাকত। সেই প্রকৃতির নানা শক্তিকে নানা দেব-দেবীরূপে কল্পনা ক'রে নানা কাল্পনিক উপায়ে তার সন্তোষবিধানের চেষ্টা করত। ভূত, প্রেত, পিশাচ নানা অশরীরী শক্তির কল্পনা ক'রে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত। গ্রীষ্মে বর্ষায় আর্ত্ত হয়ে মানুষ বৃক্ষকোটরে বা পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় নিত। তার পর অনেক কাল চলে গিয়েছে, মানুষ ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করতে শিখেছে। কবে কোন্ বন্যজন্তুদের পাবে তার অপেক্ষায় তাকে বসে থাকতে হয় না, বন্যজন্তুকে বধ করতে তার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে হয় না। দূর হতে তীর মেরে বন্যজন্তু বধ করতে পারে এবং কৃষি ক'রে বৎসরের আহার ঘরে জমাতে পারে, অশ্ব মহিষ গরু প্রভৃতিকে সে নিয়ত তার কাজে লাগাচ্ছে। এমনি ক'রে মানুষ ক্রমশই সভ্যতার পথে অগ্রসর হ'তে লাগল, কিন্তু সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়ার কৌশলটি দিয়ে প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেছে। তাই সমস্ত পশুজগৎ রইল পিছনে পড়ে; মানুষ উৎপন্ন হ'ল সকলের পরে এবং সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। এই কৌশলটি মানুষের বুদ্ধি। এই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ যখনই বিপদে পড়েছে তখনই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোন-না-কোন শক্তি সে আবিষ্কার করেছে। মানুষ বুঝতে

পেরেছে প্রকৃতির কোন্ শক্তি কেমন ক'রে কাজ করে। মানুষ ইহাও বুঝেছে যে প্রকৃতির মধ্যে কোনও খামখেয়ালী নাই। আজ যে কারণে যেটি ঘটছে কাল সেই কারণ উপস্থিত হ'লে, এবং তার বিরোধী কিছু না থাকলে, কালও সেই কারণে সেই কার্য্য হবে। প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়মে মানুষ যখনই আস্থাবান হ'তে পারল তখন হ'তে তার দূর হ'তে লাগল দেবদৈত্যকে সন্তুষ্ট করবার অভ্যাস। এর পূর্ব্বে মানুষ মনে করত যে প্রকৃতির পিছনে যে শক্তি আছে তাহাও মানুষের মত খামখেয়ালী ; স্তবস্তুতি করলে যেমন মানুষ খুশী হয় প্রকৃতির পিছনে যে নানা শক্তি কাজ করছে তাকেও স্তব-স্তুতিতে খুশী এবং অসম্মানে রুষ্ট করা যায়। এবং এই ধারণা তাদের মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। কিন্তু মানুষ দেখল যে তার দেহযন্ত্রের মধ্যে এমন একটি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে যার সহিত প্রকৃতির একটা বিরাট পার্থক্য আছে। মানুষের মধ্যে আছে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা স্বতন্ত্র।

এমনি ক'রে মানুষ আবিষ্কার করল, যে সমস্ত শক্তির সঞ্চয় রয়েছে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে। তার দেহটাও বহিঃপ্রকৃতির একটা অংশ এবং এই দেহটাকে নিয়েই সে বহিঃপ্রকৃতির সহিত তার সংযোগ সাধন করতে পারে। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে তার সাধনার একাগ্রতার দ্বারা সে প্রকৃতির ভিতর থেকে তার গোপন তথ্যগুলি একটি একটি ক'রে বাহিরে আন্‌ছে। তার দেহযন্ত্রের সাহায্যে এবং পশুবলের সাহায্যে সে অনেক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে। এবং তার দ্বারা আপনাদের বল শতগুণ কোটিগুণ বৃদ্ধি করেছে। প্রকৃতির থেকে গোপন রহস্য নিয়ে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে খাটিয়েছে প্রকৃতির বলের বিরুদ্ধে। এমনি ক'রে প্রকৃতি যা তার কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছিল, প্রকৃতি যা তাকে দিতে চায় নি সে তা প্রকৃতির কাছ থেকে আহরণ করেছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে প্রকৃতি এখনও তার গোপন রহস্য উন্মোচন করেন নি। কোন দিন উন্মোচন করবেন কি না এখনও তার কোনও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। এই মূল রহস্যগুলি হচ্ছে রোগ, জরা ও মৃত্যু। এইগুলির রহস্য যদি বা মানুষ কিছু জানতে পেরে থাকে তথাপি নিজেদের ইচ্ছামত এইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সে লাভ করতে পারে নি। যত দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি মানুষের বলের একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। যত দূর দেখা যায় বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যেমন দেখতে পাই প্রাকৃতিক বল, আণবিক বল বা বৈদ্যুতিক বল, মানুষের মধ্যে তেমনি একটি স্বতন্ত্র বল আছে, তাকে বলা যেতে পারে বুদ্ধিবল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বলের কথাও না স্বীকার ক'রে পারা যায় না, সেটি হচ্ছে প্রেমের বা আনন্দের বল। মানুষ যদি বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতির রহস্য আয়ত্ত করতে না পারত এবং আয়ত্ত করেও সেটাকে কাজে খাটাতে না পারত তবে সে কিছুতেই প্রকৃতির কাছ থেকে বল আহরণ করতে পারত না।

এই প্রসঙ্গেই কথা উঠতে পারে যে বল কাহাকে বলে। সেই শক্তিকেই বল বলা যায় যা দ্বারা আমরা বহিঃপ্রকৃতির উপর কিংবা বহিঃস্থিত প্রাণিপুঞ্জের উপর আমাদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারি। শুধু তাই নয়, তাহা অপেক্ষাও পরম বল শুধু তাকেই বলা যায় যা আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তি রয়েছে তাকে আমাদের ইচ্ছার অনুকূল ক'রে তুলতে পারে, এবং সেগুলিকে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে পরিনিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পারে। শক্তি মাত্রকেই আমরা বল বলি না। সূর্য্যের আকর্ষণে সমস্ত গ্রহপুঞ্জ তার চারিদিকে ঘুরছে। গ্রহদের আদিম স্বাভাবিক গতিতে তারা সূর্য্য থেকে দূরে ছুটে যেতে চায়। সূর্য্য তার প্রবল শক্তি দ্বারা তাদের আকর্ষণ করছে। এই দুই শক্তির জমা খরচে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার ফলে গ্রহগুলি সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরতে থাকে। এখানে সূর্য্য গ্রহদের উপর প্রভুত্ব করতে চায় না। গ্রহেরা তার চার দিকে প্রদক্ষিণ ক'রে যে চাটুকারের মত নিরন্তর তার স্তবস্তুতি করছে—এ কথা উপমা হিসাবে বা রূপক হিসাবে সত্যও হ'তে পারে, কিন্তু তথ্যের উপরে এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু একটি বাঘ যখন গোয়ালে প্রবেশ ক'রে গরুটি পিঠে ক'রে নিয়ে যায় তখন সে প্রকাশ করে তার বল। বাঘের ইচ্ছা আছে। সে খেতে চায়। সেই জন্য সে তার মাংসপেশীর যান্ত্রিক বল প্রয়োগ ক'রে গরুদিগকে তার প্রাতরাশের জন্য নিয়ে যায়। এই জন্য যেখানে আমরা প্রকৃতি সম্বন্ধে "বল" শব্দ ব্যবহার করেছি সেখানে আমাদের ব্যবহার করা উচিত ছিল "শক্তি" শব্দ। সেই শক্তিকেই বল ব'লব যার পশ্চাতে আছে ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছার দ্বারাই আমরা আমাদের দেহযন্ত্রটিকে প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে লাগিয়ে দিই

এবং সেই উপায়ে আমরা প্রকৃতির শক্তিকে আবার ভোগের উপকরণরূপে ব্যবহার করি। মানুষ প্রকৃতি থেকে তার ভোগ্য আহরণ করে। এর মূলে রয়েছে তার ইচ্ছা-শক্তি। ইচ্ছা যখন দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রযুক্ত হয় তখন সেই প্রয়োগ-শক্তিকেই আমরা বলি বল। এই ইচ্ছার পিছনে রয়েছে মানুষের আদিম কালের কামনা। মানুষের দেহযন্ত্রের নানা অভাবের পীড়ায় প্রণোদিত হয়ে আমাদের ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আপনাকে বলরূপে পরিণত করে। অভাবের তাড়নায় ও ভোগ্য বস্তুর বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে মনুষ্যসমাজ সেই অভাব পূরণ করবার জন্যে যে জাতীয় বল প্রয়োগ করে থাকে এবং এই উপলক্ষ্যে বলে বলে যে সংঘাত হয় তাহাকে ইংরাজিতে বলে Economic force। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এই জাতীয় বলের সংঘর্ষেই মানুষের ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছে। দেহযন্ত্রের মধ্যে যে অভাবের পীড়া দেখা যায় সেটি প্রাকৃতিক শক্তির অপচয়জনিত। প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে একটা নিয়ম দেখা যায় যে অপচয় হ'লেই সেখানে একটা উপচয়ের চেষ্টা ঘটে। তা না হ'লে প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে না। কোনখানে যদি অত্যন্ত গরমে হাওয়া পাতলা হয়ে ওপরে উড়ে যায় এবং সে জায়গাটা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ফাঁকা হয়ে আসে, তবে দিগন্ত থেকে হাওয়া ছুটে আসে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে। চারদিকে একটা সমতা রক্ষা হ'লে ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমে যায়। বসন্ত কালের প্রারম্ভে যখন গাছের পাতা ঝরে যায় তখন নূতন কিশলয় অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। শুধু তাই নয়। হয়ত মুকুলে গাছটি ছেয়ে যায়। কৃষ্ণচূড়া গাছে দেখেছি, যখন তার পাতা ঝরে যায় তখন তার সমস্ত দেহ লাল ফুলে সজ্জিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন তার লাল চেলীর বসনে পুষ্পশয্যার দিন এসেছে। মানুষের দেহের মধ্যেও প্রকৃতির এই প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সে পরিচয়ের পশ্চাতে আছে জৈব ধর্ম্ম, ইচ্ছা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হওয়ার সম্ভাবনা কল্পনা করলে বা ভোগ্য বাসনার পরিতৃপ্তির অভাব হবে এমন সম্ভাবনা দেখলে মানুষের ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেই ইচ্ছাকে বলে পরিণত করে এবং এমনি ক'রে মানুষ বহিঃপ্রকৃতির ওপর বল প্রয়োগ ক'রে তার খোরাক আদায় ক'রে নেয়। শুধু বহিঃপ্রকৃতির উপর নয়, অন্য মানুষও যখন তার ভোগ্য বস্তু দখল ক'রে রেখেছে ব'লে সে জানে তখন সে লেগে যায় তার সঙ্গে লড়াই করতে। এমনি ক'রে হয় মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব। কিন্তু মানুষ মনুষ্য সমাজে বাস করে, তাই অপর মনুষ্যকে প্রকৃতির উপাদানের মত নিজের ভোগে নিযুক্ত করতে চায়। সেই জন্য সে ইচ্ছাকে বুদ্ধির আলোতে না চালিত ক'রে বুদ্ধিকে চালাতে চায় ইচ্ছার দাস ক'রে। এই স্থলে মানুষের আদিম বর্ব্বরতা তার সভ্যতার চৈতন্যকে হনন করে। কারও দাস হবার জন্য বুদ্ধির সৃষ্টি হয় নি। বুদ্ধি প্রদীপের ন্যায় পথ দেখাবে এবং সেই আলোতে আমরা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করব এই হচ্ছে বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার সম্বন্ধ। ইহার ব্যত্যয় ঘটলে একটা মহামারী কাণ্ড উপস্থিত হয়, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত ঘটে, মানুষ চূর্ণ হ'তে থাকে। এই ঘটনা ঘটে আসছে আদিম কাল থেকে, তবু মানুষ কিছুতে তাকে চালাবার সহজ মন্ত্র শিখতে পারে না। বলের ব্যবহারে অনেক অকল্যাণ হয় দেখে অনেক মনস্বী লোক বলেছেন যে বল পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমার কাছে এ কথা সমীচীন ব'লে মনে হয় না। যিনি সাধু, যিনি পরহিত-ব্রতী, যিনি জগতের মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁর বলের আবশ্যক। বলের কামনায় কোন দোষ নেই, কিন্তু কি জন্য বল কামনা করি সেটি বিচার ক'রে দেখা কর্ত্তব্য। আজকালকার দিনে হিট্‌লার, মুসোলিনী, ষ্টালিন প্রভৃতির অপ্রতিহত শক্তি দেখে অনেকের একথা মনে হ'তে পারে যে একটি সমগ্র জাতির উপর বল প্রয়োগ করবার ক্ষমতার মত এমন আদর্শ বলপ্রয়োগক্ষেত্র আর নেই। কিন্তু এই সমস্ত দণ্ডধর যেমন নিজের জন্য বল চেয়েছেন তেমনি তাঁরা বল চেয়েছেন রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু বলশালী হয়ে সেই রাষ্ট্র সেই বল কি ভাবে প্রয়োগ করবে সেদিকে তাঁদের কোন ঔৎসুক্য নেই। তাঁরা বল চেয়েছেন বলের জন্য। আমাদের পুরাণে অনেক দৈত্য ও রাক্ষসের উপাখ্যান আছে। সেখানে দেখতে পাই যে তাঁরা কঠোর তপস্যা করেছেন সমস্ত প্রাণিকুলের উপর অখণ্ড বল প্রতিষ্ঠার জন্যে। সমস্ত ভুবনের মঙ্গলের জন্য তাঁরা বল চান নি, বলের গৌরবের জন্য তাঁরা বল চেয়েছেন। সেই জন্য পুরাণ-কাররা তাঁদের দৈত্য বা রাক্ষস ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা অনেকেই বলের পথে অমরত্বের প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে এমনি দুর্দ্দমনীয় বল তাঁদের হবে যার ফলে কেউ তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। বিধাতা কোন দিন সে প্রার্থনা মঞ্জুর

করেন নি। কারণ, বলকে যখন বলের জন্য লাভ করতে চাই তখন সে বল আপন প্রভাবে তার প্রতিপক্ষ বলের সৃষ্টি ক'রে আপনাকে ধ্বংস করে।

ইচ্ছার ফল তখনই তার পূর্ণ শক্তি লাভ করে যখন সে অনুপ্রাণিত হয় প্রেমের বলের দ্বারা, কারণ নরসমাজে প্রেমের বল যেমন ওজঃসম্পন্ন তেমন আর কোন বলই নয়। যখন আমরা প্রাকৃত শক্তির উপর আধিপত্য করতে চাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত ইচ্ছার বল আপনাকে সার্থক করতে পারে। কিন্তু যখনই আমরা মানুষের চিত্তের উপর আমাদের চিত্তের আধিপত্য বিস্তার করতে ইচ্ছা করি তখনই দেখি যে প্রাকৃত শক্তির দ্বারা এই আধিপত্য বিস্তার সম্ভব নয়। অনেক বড় বড় দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তি শুধু এই জন্যেই প্রজাপুঞ্জের নিকট নিজেদের শক্তি ব্যর্থ করেছেন। তাঁরা প্রজাদের নিরস্ত্র করেছেন, হৃতধন করেছেন, তাদের শরীরের উপর অসীম প্রভুত্ব করেছেন, তবু বিপদের সময় বিপর্য্যস্ত হয়ে দেখেছেন যে তাদের তাঁরা জয় করেন নি। হৃদয়কে যে পর্য্যন্ত জয় করা না যায় সে পর্য্যন্ত মানুষকে সম্পূর্ণ জয় করা যায় না। এই হৃদয় বস্তুটি ফুলের গন্ধের ন্যায় একরূপ অশরীরী। লাঠি দিয়ে ফুলের পাঁপড়ির উপর প্রচুর প্রহার করলে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তা আর মৃদুমন্দ গন্ধ বিকীরণ করবে না। সে গন্ধটুকুকে পেতে হ'লে কোমল ভাবে যেতে হবে সেই ফুলের নিকট, কঠিন স্পর্শে তাকে বিব্রত না ক'রে বন্ধুভাবে দাঁড়াতে হবে তার পাশে, তবেই সে গন্ধ পাওয়া যাবে। তেমনই মানুষের চিত্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হ'লে বিনম্র ভাবে যেতে হবে তার নিকট, সম্ভাষণ করতে হবে প্রেমের মাধুর্য্যে, তার মঙ্গল বিস্তার করতে হবে প্রেমের ঔদার্য্যে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আত্মাকেই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য। এবং এই আত্মাকে লাভ করতে পারি আমরা যে শক্তির দ্বারা তাকে বলা হয়, বল। সেই জাতীয় বল না থাকলে মানুষের আত্মাকে আমরা লাভ করতে পারি না, আমাদের আত্মাকেও লাভ করতে পারি না। বর্ত্তমানে ইউরোপে ও জাপানে আমরা পার্থিব বলের ঔদ্ধত্য প্রত্যক্ষ করেছি। এই সকল তথাকথিত শিক্ষিত জাতিরা বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত হলেও আদিম বর্ব্বরতার মোহে এমনই সমাচ্ছন্ন যে মানুষের মধ্যে বলের যে একটি বিশেষ প্রকাশ আছে, সে প্রেমের প্রকাশটিকে তাঁরা কার্য্যতঃ অস্বীকার ক'রে চলেছেন। শুধু তাই নয়, বলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তাঁদের বিপর্য্যস্ত ধারণার অন্ত নেই। তাঁরা এটুকু মানেন যে বলের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করা, কিন্তু তাঁরা এই সহজ তথ্যটুকু উপলব্ধি করেন না যে বলকে বলশালী হ'তে হ'লে নিজের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করা তার প্রধান কাজ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে রুশোর ন্যায় চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন :

"Love of power in the widest sense is the desire to be able to produce intended effects upon the outer world, whether human or non-human"

তাঁহার এই সঙ্গে বলা উচিত ছিল যে বল প্রয়োগের আর একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে আপন অন্তরের মধ্যে। মনুষ্যত্বের পদবীতে আরোহণ করতে হ'লে মানুষকে এখানেই প্রথম বল প্রয়োগ করতে হয় এবং এইখানে বল প্রয়োগ করেই সিদ্ধকাম হওয়া সবচেয়ে কঠিন। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "অসংশয়ং মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্, তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।"

মানুষ যখন তার অন্তরস্থ আদিম বর্ব্বরতাকে দমন করতে পারে তখনই তার চৈতন্যে আত্মার আনন্দমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হয়ে ওঠে, তার বল সিদ্ধ ও সফল হয়ে ওঠে ভুবনের মঙ্গল কার্য্যে ও তার মৈত্রীতে। আপাততঃ দেখলে মনে হয় যারা প্রচণ্ড বোমার সাহায্যে পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করতে পারে তারাই বুঝি বলবান। কিন্তু ইতিহাস তাদের বর্ব্বরতাকে ধূলিময় ক'রে ধূলায় লুটিয়ে দেবে। মানুষের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারই যদি বলের লক্ষণ হয়, তবে তাঁরাই যথার্থ বলিষ্ঠ যাঁরা প্রেমের মন্ত্রে বিশ্বভুবনকে দীক্ষিত করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের সমস্ত জীবনের বাণী প্রেমের মিলনের জন্য সঞ্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য এই শুভ অবসরে আমরা প্রণাম করি ভগবান্ বুদ্ধকে, ভগবান্ যিশুকে এবং আমাদের পুণ্যস্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে, যিনি তাঁর সমস্ত জীবন এই একটি মন্ত্রের সাধনে ব্যয় করেছিলেন।

"এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়"

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণীর কথা প্রায় কখনো বল্‌তেন না বললেও চলে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'প্রবাসী'তে "সংসারী রবীন্দ্রনাথ" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাতেই বাঙালী পাঠকসমাজ প্রথম কবিজায়ার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করে। "মংপুতে" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর যে অংশ 'প্রবাসী'র বর্তমান সংখ্যায় বেরিয়েছে তাতে এক জায়গায় (২২৬ পৃষ্ঠায়) কবি-গৃহিণীর প্রসঙ্গ আছে। কবি বলছেন :—

"তখন অবশ্য তিনি ছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁৎখুঁতে ছিলাম না। আধুনিক ভাবে আমাদের বিবাহ হয় নি ত, কিন্তু কিছুই এসে যায় নি তাতে। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি ত চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হতে। বিশেষ ক'রে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল কাজ করবার। কিন্তু সে ত হ'ল না, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হ'ল।"

"আপনার খুব অভাব বোধ হয় নি ?"

"ঐ যে বললুম, চিরদিন আমি একটা জায়গায় উদাসীন নিরাসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। তা ছাড়া, যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আমার এক মুহূর্ত্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন সুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে। কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র ক'রে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায় ? মেজমেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়, তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হ'ত শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছুটোছুটি চলেছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হ'ত জান, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে; ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলার জন্যই, এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়। সে ত আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সেইটেই সবচেয়ে কষ্ট ত যে, এমন কেউ নেই যাকে সং বলা......[যায়]।"

যাকে সব বলা যায় এমন মানুষের অভাব খুব বড় অভাব—যদিও সব মানুষ এ অভাব অনুভব করে না। স্ত্রী স্বামীকে সব কথা বলতে পারেন, স্বামীও স্ত্রীকে সব কথা বলতে পারেন, যদি দম্পতির উভয়ে পরস্পরের সম্পূর্ণ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। কিন্তু এরূপ দম্পতি সংসারে খুব বিরল না হ'লেও বিরল! যে স্বামী স্ত্রীকে সব কথাই বলতে পারেন এবং যাঁর স্ত্রী তাঁর সব ভাব ও চিন্তার অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। রবীন্দ্রনাথের সেই সৌভাগ্য হ'য়েছিল, কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানি বা না জানি, তাঁকে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ সব কথা বলতে পারতেন ও বলতেন, কেবল এর থেকেই বুঝতে পারি বিধাতা তাঁকে কিরূপ মহত্ত্বের উপাদানে গড়েছিলেন এবং তাঁর জীবন দীর্ঘতর হ'লে তিনি জনসমাজে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। যাঁর ভাবনা চিন্তা কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের জন্যে নয়, এমন কি শুধু নিজের দেশের জন্যেও নয়, সারা জগতের কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তায় যাঁর হৃদয় মন আলোড়িত হ'ত, তাঁর ভাব ও চিন্তার, সাধনার ও তপস্যার, আনন্দ ও বিষাদের গুরুভার শুধু চিন্তাতেও গ্রহণ ও বহন সামান্য কাজ নয়।

এরূপ মহিলাকে রবীন্দ্রনাথ যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তার ৩৬খানি রক্ষিত হয়েছিল। সেইগুলি "চিঠিপত্র" নাম দিয়ে বিশ্বভারতী সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্য হাজার হাজার চিঠির মত এগুলিও কখনও ছাপা হবে এ ভেবে তিনি লেখেন নি। এই জন্য এইগুলিতেও তাঁর অন্তরের সরল প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এর কোন কোনটিতে সাধারণ গৃহস্থের শাকবেগুনের কথা যেমন আছে, রসিকতা যেমন আছে, মৃণালিনী দেবীর থেকে দূরে থাকবার সময় প্রত্যহ চিঠি না পেলে যেমন উদ্বেগ অভিমান ও প্রেমরোষের প্রকাশ আছে, তেমনি ব্যক্তিগত আদর্শের, দাম্পত্য আদর্শের, সন্তানপালনের আদর্শের, সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের কর্তব্যের উচ্চ কথাও সেইরূপ আছে। সব কথাই অবস্থাবিশেষে ঘটনার স্রোতে স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়েছে।

রক্ষিত ও প্রকাশিত এই ৩৬খানি চিঠির মধ্যে প্রথম চিঠিটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এবং শেষটি ১৯০১ সালে লেখা। অর্থাৎ চিঠিগুলি কবি তাঁর ২৯।৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখেছিলেন।

আমরা বলেছি, কোন কোন চিঠিতে সাধারণ গৃহস্থের

শাকবেগুনের কথাও আছে। যেমন শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে আছে :—

"তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছগুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারবে না। চালানের সঙ্গে তোমার শাক কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কুমড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ—তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুমকো, মেদি খুব ফুটছে। হাস্নু-ও-হানা ফুটছে কিন্তু গন্ধ দিচ্চে না, বোধ হয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকে না।"

"পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সাম্‌নে আকের ক্ষেত খুব বেড়ে উঠেছে, চতুর্দিকের মাঠ শেষ পর্য্যন্ত শস্যে পরিপূর্ণ—কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আসব না শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।"

অনেক চিঠির অনেক অংশ হিউমারের স্নিগ্ধ রশ্মিতে উদ্ভাসিত। যেমন নিম্নোদ্ধৃত অংশটি :—

"কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছি, এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখলুম না। তাকে গতকল্য কাশীতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার খাট বিছানা তেমনি পড়ে রয়েছে, আল্‌নায় তার অত্যন্ত ময়লা কাপড় ঝুলছে। কিন্তু সে নেই। হায়!"

কিংবা প্রথম চিঠির এই বাক্যগুলি :—

"দেখ চ, বসে বসে কত উপার্জনের উপায় করচি! সকালে উঠেই বই লিখতে বসেছি তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ! ছাপাবার সমস্ত খরচ না উঠুক নিদেন দশ-পঁচিশ টাকাও উঠবে। এই রকম উঠে পড়ে লাগ্‌লে তবে টাকা হয়! তোমরা ত কেবল খরচ কর্ত্তে জান—এক পয়সা ঘরে আন্‌তে পার?"

মজঃফরপুরে বড়মেয়ে ও বড়জামাইকে দেখতে গিয়ে লিখেছিলেন :—

"তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হ'য়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে বাঙালীরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্চে—শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না—মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে—নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। শরৎ ত ভীড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হ'ল।......আমি তাই মনে স্থির করেছি তোমার বুদ্ধিতে আর চল্‌ব না—আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্‌চে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধ হয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।"

স্বদেশে বিদেশে কবিকে দেখবার জন্যে যত জায়গায় অসম্ভব ভীড় হয়েছে, সর্বত্রই বোধ করি তিনি ঢাকাই ধুতি পরে দর্শন দিতেন বলে!

আর একটি চিঠিতে কবি লিখছেন :—

"তোমাদের ওখেনে শীত নেই? আমাকে ত শীতে ভারি কাঁপিয়ে তুলেছে। কেবল কাল রাত্তিরে কোন্ একটা বদ্ধ জায়গায় নৌকো রেখেছিল আর সমস্ত পর্দা ফেলেছিল—তাই গরমে জেগে উঠেছিলুম—তার উপরে আবার কানের কাছে এক দল লোক সেই একটা ছুটো রাত্তিরে গান জুড়ে দিলে 'কত নিদ্রা দিবে আর উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে'। প্রাণপ্রিয়ে যদি কাছাকাছির মধ্যে থাক্‌ত তা হ'লে বোধ হয় চেলা কাঠের বাড়ি পিটোত। মাঝিরা তাদের ধমকে থামিয়ে দিলে, কিন্তু আমার মাথায় ক্রমাগতই ঐ লাইনটা ঘুরতে লাগ্‌ল 'উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে'—"

স্বদেশে বিদেশে বার বার অনেক বার ভ্রমণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ছিলেন। তাই তাঁর একবার বিলাত-যাত্রার পথে লেখা একটি চিঠিতে এই কথাগুলি পড়ে বেশ মজা লাগ্‌ল :—

"আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।"

পৃথিবীতে যথার্থ সুখী হবার উপায় সম্বন্ধে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হ'লে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই—বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি ক'রে নেওয়া যেতে পারে। এক্‌লা ব'সে ব'সে সঙ্কল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব—অবিচলিত ভাবে আপনার কর্তব্য করে যাব—তার পরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না—কত দূর কৃতকার্য হ'তে পারব জানি নে। প্রতিদিন নিরলস হ'য়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পায় না—যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ ক'রে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠতে থাকে—সেটা যে কিছুই নয় এই রকম ভাব্‌তে চেষ্টা করা উচিত—তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব—যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই।"

এই ধরণের কথা আর একটি চিঠিতে আছে।

"যাই হোক সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়। যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোটবৌ—ওতে মন্দ বই ভাল হয় না। প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে অথচ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—আমি নিজে ভারি অসন্তুষ্টস্বভাব, সেই জন্যে আমি অনেক অনর্থক কষ্ট পাই—কিন্তু তোমাদের মনে অনেকখানি প্রফুল্লতা থাকা ভারি আবশ্যক। নইলে সংসার বড় অন্ধকার হয়ে আসে। যা চেষ্টা করবার তা যত দূর সাধ্য করব—কিন্তু তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান ত ভাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমার নিজেকে

ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না—তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটা দূর ক'রে দিয়ো, কিন্তু তুমি আবার তাতে যোগ দিয়ো না।"

ছেলেমেয়েদের গান শেখাবার একটা হদিস একখানি চিঠিতে আছে।

"বেলির সঙ্গে খোকা কি গান শিখবে না? তার গলা কি রকম ফুটবে? কেবল সা রে গা মা না শিখিয়ে তার সঙ্গে একটা কিছু গান ধরানো ভাল—তা হলে ওদের শিখতে ভাল লাগবে—নইলে ক্রমেই বিরক্ত ধরে যাবে। মনে আছে ছেলেবেলায় যখন বিষ্ণুর কাছে গান শিখতুম তখন সা রে গা মা শিখতে ভারি বিরক্ত বোধ হত। যেদিন সে নতুন কোন গান শেখানো ধরাত সেই দিন ভারি খুসি হতুম। তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধতে আরম্ভ করে দাও না। তার পর বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামীস্ত্রীতে দুজনে মিলে বাদ্‌লায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে। কি বল?"

১৮৯৮ সালের জুন মাসে শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠি ভারি সুন্দর। তার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম্ম—এই হল জীবনের সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তা হলে তোমার জীবন সাম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক। ভাই ছুটি—মনকে যথেচ্ছা খুঁৎখুঁৎ করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই স্বেচ্ছাকৃত। আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ করো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি একথাগুলি বলচি।"

এর পরই কবি অল্প বয়সের ও বেশি বয়সের দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তার একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে সেই নির্ম্মল শান্তি এবং সুখই সংসারের আর সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়—আজকাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত জাগ্রত হয়ে আছে।

"স্ত্রী পুরুষের অল্পবয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে, কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়—সেই জন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জ্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি যাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয়, তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না—কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্য্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্ম্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।"

এর পর কবি তাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে তাঁর হৃদ্গত আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন :—

"আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তুমি তার থেকে একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জ্জনা এবং দুঃখ-স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।

"আজ কাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত ও প্রসন্ন হোক, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক—এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেই জন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লী-গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি—সেখানে কোন মতেই লাভ ক্ষতি আত্মপরকে ভোলবার যো নেই—সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষকালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না। এখানে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা তত শক্ত নয় যে—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।"

আমার দেহ যে আমি নই, এই ধারণা দৃঢ় করে যে দুঃসহ দৈহিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং ঐ ধারণা যে উচ্চ সাধনার ভিত্তি, তার সন্ধান কবির একটি চিঠি থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন—

"একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলুম সেই অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়—যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম—ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখতে লাগলুম—আশ্চর্য্য ফল হল—শরীরে কষ্ট হতে লাগল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একটা নতুন পথ পেলুম।

"এখন আমি সুখ দুঃখকে আমার বাইরের জিনিষ এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেক সময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি—তার মত শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় আর নেই। কিন্তু বারম্বার পদে পদে এইটেকে মনে এনে সকল রকমের অসহিষ্ণুতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই—মাঝে মাঝে ব্যর্থ হ'য়েও হতাশ হ'লে হবে না—ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোন মতেই নষ্ট হতে দিলে চলবে না—কারণ এমন লোকসান আর কিছুই নেই—এ যেন দু-পয়সার জন্যে লাখ টাকা খোয়ানো। গীতায় আছে—লোকে যাকে উদ্বেজিত করতে পারে না এবং লোককে যে উদ্বেজিত করে না—যে হর্ষ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত সেই আমার প্রিয়।"

প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার দুঃখকে চিঠি সুখে পরিণত করতে পারে।

"দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি—দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিষটি অল্প বলে তার দামও বেশি—দুটো চারটে কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়; তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। দেখাশোনার অনেক কথাবার্তা ভেসে চলে যায়—যত খুসি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই তার প্রত্যেক কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না। বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র—তার মধ্যে এক রকমের নিবিড়তা গভীরতা এক প্রকার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার কি তাই মনে হয় না?"

ছেলেদের জন্যে উদ্বেগের কথা কয়েকটি চিঠিতেই আছে। সন্তানেরা মনের মত হয়, কোন্ বাপমা তা না চান? কিন্তু উদ্বেগ বৃথা।

"ছেলেদের জন্যে সর্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হ'য়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে—ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র -ওদের সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই—আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্যে কাতর ভাবে সস্পৃহ ভাবে অপেক্ষা করব না,—ওরা যে রকম মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে—আমরা সে জন্য মনে মনে কোন রকম অতিরিক্ত আশা রাখব না। আমার ছেলের উপর আমার যে মমতা, এবং সে সব চেয়ে ভাল হবে বলে আমার যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটা অহঙ্কার থেকে হয়। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমাদের নেই। কত লোকের ছেলে যে কত মন্দ অবস্থায় পড়ে, আমরা তার জন্যে কতটুকুই বা ব্যথিত হই?..."

এই রকম কথা কবি ১৮৯৯ সালে লিখেছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি শিলাইদহ ত্যাগ করে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন সেখানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ চলছে। এই সময় তিনি শিলাইদহ থেকে সহধর্মিণীকে যে চিঠিখানি লেখেন, প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে সেইটি শেষ চিঠি। তাতে শিলাইদহ ছেড়ে যেতে হবে ব'লে মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি লিখছেন:—

"রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে চাই—সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্র সাধন করতেই হবে—যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে।......ছেলেদের নিজের হাত থেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই—তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দশের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে ভূষিত করে তুলুন। এই আমার কামনা—আমরা আমাদের সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে কঠিনভাবে সংযত করে ঈশ্বরের নিগূঢ় ধর্ম্মনিয়মের যেন সহায়তা করি—পদে পদেই যেন তাকে প্রতিহত করে আপনার অভিমানকেই অহোরাত্রি জয়ী করবার চেষ্টা না করি।"

১৯০১ সালেই শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে আছে:—

"আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়—আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে—তাছাড়া অনন্ত নক্ষত্রলোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়সার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়, দেখতেও পাওয়া যায় না।"

শান্তিনিকেতন কেন যে কবির এত প্রিয় ছিল, ১৯০১ সালের জুলাই মাসে লেখা একখানি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

"আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এ রকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না। •আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদিজননীর কোলে স্তনপান করচি।"

কবির ব্যক্তিগত দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শের আভাস অনেক চিঠিতে পাই। সে সম্বন্ধে দুখানি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়—তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করি নে—কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে—আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নাই—সুতরাং সে বিষয়ে কিছুমাত্র খুঁৎখুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর—আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।"

"আমার ইচ্ছে কোন কথাটি না কয়ে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে নিয়মমত হয়ে যায়—আয়োজন বেশি না হয় অথচ সমস্ত বেশ সহজে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পন্ন হয়—বেশ নিয়মে চলে অথচ অল্পে চলে ও নিঃশব্দে চলে।...

"...কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না—জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গাম-হুজ্জুতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে—আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেললে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেলতে হয়, সামান্য জিনিষেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।"*

* "চিঠিপত্র"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৯। মূল্য এক টাকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'ভদ্রলোক' মিঃ এমারির 'এক কথা'

'ভদ্রলোক' মিঃ এমারির 'এক কথা'র বার বার পুনরাবৃত্তি করতে মাথা ঘামাতে হয় না, খরচও হয় না। অধিকন্তু তিনি প্রধানতঃ এই রকম গৎ আওড়াবার জন্যেই যেন মোটা মাইনে পান বোধ হয়। আমাদের কিন্তু তাঁর 'এক কথা'র বার বার আলোচনায় অন্ততঃ কাগজ বরবাদ হয়।

গত ৪ঠা জুন তিনি অক্সফর্ড যুনিয়নে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে অন্যান্য রকমের সাম্রাজ্যগঠনের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগঠন পন্থার তুলনা করেন। রয়টার বলছেন, তিনি বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের সংশ্রবেই ঐ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,

> "আপাত দৃষ্টিতে অধীন দেশগুলার উপর প্রভুত্ব করার রীতি কিংবা ফেডারেশনের রীতির চেয়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রিক আত্মশাসন (অর্থাৎ ডোমীনিয়ন ষ্টেটস) প্রদান পন্থা নৈরাশ্যজনক রূপে দুর্বল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কাজ করতে অসমর্থ মনে হতে পারে; কিন্তু দুটো মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সামনে কে বলতে পারে যে, ব্রিটিশ পন্থা নিষ্ফল হয়েছে?

সত্যিই ত! মালয় ও ব্রহ্মে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন থেকে ব্রিটিশ পন্থার জয়জয়কার ঘোষণা করছে।

ইংরেজিতে যে "চীক্" কথাটার মানে গণ্ডদেশ, তার আর একটা মানে আছে। সেই অর্থে মিঃ এমারির খুব চীক্ আছে—তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে উঠে ডোমীনিয়নত্ব প্রদান রূপ সাম্রাজ্যগঠন পন্থার প্রশংসা করেছেন, অথচ ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন নয়, এবং চার্চিল-এমারির আমলে বা তাঁদের মত রাজপুরুষদের বা কোনো ব্রিটিশ রাজপুরুষদের আমলে ভারতবর্ষ স্বশাসন **বকশিশ** পাবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মিঃ এমারি মনে করেন, ভারতবর্ষ কতকগুলা সর্ত ব্রিটেনের মনের মত রকমে পালন করলে কোনো অনির্দিষ্ট যুগে ডোমীনিয়ন হবে, এই প্রতিশ্রুতিই ডোমীনিয়ন হবার সমতুল্য—যদিও সেই সর্তগুলা **ব্রিটেনের সন্তোষজনকরূপে** পালন অসম্ভব। এহেন প্রতিশ্রুতিটাকে আসল জিনিসের সমান ধ'রে নিয়ে তিনি বলেছেন :—

> "প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত এবং অকপটভাবে পোষিত আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ ডোমীনিয়নগুলির মত সম্পূর্ণ ও সর্তবিহীন স্বাধীনতা পাবে এবং অন্য ডোমীনিয়নগুলির সঙ্গে স্বাধীন সাহচর্য্য রক্ষা করতে পারবে।"

ভাল কথা; কিন্তু কখন? তা ছাড়া, ভারতবর্ষ ত এখন আর ডোমীনিয়ন স্টেটস্ চাচ্ছে না; পূর্ণ স্বরাজ চাচ্ছে। ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের স্তোক-বাক্যের এখন আর কোন মূল্য নাই।

অতঃপর মিঃ এমারি বলছেন :—

> "আমরা ভারতবর্ষকে একতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আইনের রাজত্ব দিয়েছি। আমরা তাকে গণতান্ত্রিক স্বশাসনের দাবী হৃদয়াবেগ সহকারে করতে অনুপ্রাণিত করেছি।"

ব্রিটেন ভারতবর্ষকে একত্ব দিয়েছে, এ কথা কি অর্থে ও কতটুকু সত্য, তার আলোচনা অনেক বার করেছি। এ বিষয়ে ব্রিটেনের কৃতিত্ব যতটুকু, তা সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত পৃথক্ নির্বাচন, এবং তথাকথিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব নষ্ট করছে, এবং ব্রিটেনের অনুমোদিত এবং বোধ হয় ব্রিটিশ প্ররোচনাজাত পাকিস্তান-পরিকল্পনা আরও নষ্ট করছে।

ভারতবর্ষের **মধ্যে** অনেক বৎসর যুদ্ধ হয় নাই এই অর্থে এ কথাটা সত্য যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষকে আভ্যন্তরীণ শান্তি দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক ভারতীয়েরা শান্তি ভোগ করে নি, করছে না। ঢাকার কয়েকটা "দাঙ্গা"র মত "দাঙ্গা," চট্টগ্রামের "দাঙ্গা," সিন্ধু দেশের সক্করের "দাঙ্গা" ও হুর উপদ্রব, পঞ্জাবের বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাইরের দস্যুদের উপদ্রব, ইত্যাদি দ্বারা শান্তি নষ্ট হয়েছে। বার বার নানা 'বে-আইনী আইন' জারী এবং বিনা বিচারে হাজার হাজার লোকের কারাদণ্ড, ও পঞ্জাবের সামরিক আইনের আমলের নানা কাণ্ড মিঃ এমারির আইনের রাজত্বের দাবী অপ্রমাণ করছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে আইনের রাজত্ব সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু বে-আইনী আইনের রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের জনগণকে গণতান্ত্রিক স্বশাসনের দাবী করতে ইংরেজরা যদি জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্বক অনুপ্রাণনা দিয়ে থাকেন, তা হ'লে জিনিসটি ভাল ও তাঁদের অনুমোদিত বলেই সে রকম অনুপ্রাণনা দিয়ে থাকবেন। তাই যদি হয়, তা হ'লে তাঁরা যে-জিনিসটি চাইতে শিখিয়েছেন, সেটি দিতে এত অনিচ্ছা, এত কৃপণতা, এত কালবিলম্ব কেন? তাঁরা যদি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্বক অনুপ্রাণনা দিয়ে থাকেন,

তা হ'লে দাবী করবার সময় এসেছে, অনুকূল অবস্থা এসেছে জেনেই, দাবী করতে শিখিয়েছেন। তবে এখন নানা রকম ওজর আপত্তি ও সর্তের অবতারণা কেন?

মিশর, জাপান, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত তুর্কমেনিস্তান, আজরবৈজান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশকে কি ব্রিটেন স্বশাসনের গুণ শিখিয়েছিলেন? প্রকৃত কথা এই যে, যুগধর্মে পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের মনে স্বশাসনের অভিলাষের উৎপত্তি। সেই অভিলাষ উৎপাদনে ইংরেজি সাহিত্যের আংশিক কার্য্যকারিতা থাকতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বশাসন-অভিলাষ উৎপাদনের কৃতিত্বের সম্পূর্ণ প্রশংসাটা ইংরেজরা চান, কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ করতে চান না।

অতঃপর মিঃ এমারি বলছেন :—

"যে প্রশ্নের উত্তর পেতে এখনও বাকী আছে সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের নেতাদের সেই পরমতসহিষ্ণুতা এবং রফা করবার প্রবৃত্তি আছে কিনা যা না থাকলে স্বশাসন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করবে এবং বাইরের থেকে বিপদ ডেকে আনবে। বস্তুতঃ সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতবর্ষ গিয়েছিলেন। আপাততঃ যে উত্তর পাওয়া গেছে, তা অনুৎসাহজনক হলেও আমি আশা করি, শীঘ্র বা বিলম্বে ভারতবর্ষ ঠিক্ উত্তর দিবে।"

ভারতবর্ষেব নেতাদের পরমতসহিষ্ণুতা এবং রফা করবার প্রবৃত্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইংরেজরা যদি তাঁদের প্ররোচনা থেকে উৎপন্ন দাবী কিম্বা ভারতবর্ষের একত্ববিনাশক দাবী সম্বন্ধে রফা চান, তা হ'লে তাঁদের সে আশা কেমন ক'রে পূর্ণ হ'তে পারে? সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপস্ প্রকারান্তরে ভারতীয় নেতৃবর্গকে পাকিস্তানের দাবীতে রাজী করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে যে একত্ব দিয়েছেন ব'লে ইংরেজরা অহঙ্কার করেন, ঐ দাবীতে রাজী হ'লে সেই একত্ব নষ্ট হ'ত, ভারতবর্ষের ভারতবর্ষত্ব লোপ পেত, স্বাধীন ভারতের আশা স্বপ্নে ও কল্পনায় পর্য্যবসিত হ'ত। সুতরাং পাকিস্তান-পরিকল্পনায় রাজী না হওয়ায় প্রমাণ হয় না যে, আমাদের নেতাদের পরমতসহিষ্ণুতা বা রফার প্রবৃত্তি নাই। রফা সেই সব বিষয়ে হ'তে পারে, যেগুলা একান্ত আবশ্যক নয়। কেউ যদি বলে, "আমার মতে তোমার মরা উচিত," এবং যদি আমি সেই ব্যক্তির মত অনুসারে মরতে রাজী না হই, তা হ'লে সে ব্যক্তি কি বলতে পারে, "তুমি ভারি একগুঁয়ে হে; সামান্য মরা বই ত নয়—প্রাণত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে রফা করতে পারলে না?" ব্রিটিশ প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাকিস্তানীরা ও তাদের মুরুব্বি মিঃ এমারিও বলতে পারেন, "ভারতীয় নেতারা রফা করতে পারে না; কেন না তারা এমন একটা প্রস্তাবে রাজী হ'ল না যাতে ভারতবর্ষের দফা রফা হ'ত বলে তারা মনে করে।"

যাই হোক, মিঃ এমারি সর্ স্টাফোর্ডের ভারতবর্ষ আসবার আসল উদ্দেশ্যটা বলে ফেলেছেন।

ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের স্বশাসন দেবার ইচ্ছা ঘোষণাটা যে অকপট, এটা বার বার ব'লে মিঃ এমারি সেই অকপটতায় যারা বিশ্বাসী ছিল তাদেরও মনে কেবল সে বিষয়ে সন্দেহই জাগিয়ে তুলছেন। যারা এই অকপটতায় কোন কালেই বিশ্বাসী ছিল না, তাদের ত কথাই নাই।

মিঃ এমারির শেষ কথাটা বেশ আমোদজনক। তার ভিতর দিয়ে 'ব্রিটিশ নব-রুশাতঙ্ক ফুটে বেরচ্ছে। রয়টার তার করছেন—

মিঃ এমারি তাদিকে একটা সাবধান বাণী শুনিয়েছেন যারা এই বেকুবী বিশ্বাস পোষণ করে যে, অন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিকতা বিশ্বশান্তির আগমন ঘোষণা করবে। (ব্রিটেনে) গবন্মে‍ণ্টবিরোধী সমাজতান্ত্রিকদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্জাতিক ও শান্তিকামী বটে, কিন্তু তারা ক্ষমতা পেলে (অর্থাৎ তারাই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে গবন্মে‍ণ্ট নামধের হলে), তাদের সমস্ত ঝোঁকটা হবে স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) ও অন্যকে বাদ দিয়ে স্বার্থসাধনে ব্যস্ত, এমন কি অন্যকে আক্রমণও তারা করতে পারে।"

এটা হচ্ছে কতকটা বর্তমান গবন্মে‍ণ্টবিরোধী ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক দলের দোষ উদ্ঘাটন এবং কতকটা 'বৌকে মেরে ঝিকে শেখান' নীতি অনুসারে রাশিয়াকে প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। কারণ, রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী (Socialist & Communist) দল এখন ক্ষমতাশালী, তাঁরাই রাশিয়ার গবর্ন্মেণ্ট গড়েছেন। স্টালিন কিছু দিন আগে বলেছেন, "আমরা ন্যাশন্যালিস্ট, আমাদের দেশের কোন অংশ কাউকে নিতে দেব না; কিন্তু অন্য কোন দেশও আমরা নিতে চাই না।" মিঃ এমারির উক্তিতে কি এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে যে, "স্টালিন যাই বলুন, রাশিয়ার বর্ত্তমান বিপদ কেটে গেলে রাশিয়া অন্য দেশ—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ—আক্রমণ করতে পারে, অতএব, হে ভারতীয় সোভিয়েট বন্ধুরা, তোমরা সাবধান হও।"

—

"আরও অন্ন উৎপাদন কর"

"আরও অন্ন উৎপাদন কর," ভারতবর্ষের সর্বত্র সরকারী লোকেরা এই রব তুলেছেন; বঙ্গেও তুলেছেন। ভালই করেছেন, কিন্তু শুধু রব তুললে হবে না। তাঁদের উৎসাহবাণী অনুসারে লোকে যাতে কাজ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

বেশী অন্ন উৎপাদন করতে হ'লে, যে-সব জমিতে চাষ হয়, তার ফলন বাড়াতে হবে। যেখানে দশ মণ ধান হয়, সেখানে পনর-কুড়ি মণ উৎপন্ন করতে হবে। তার মানে উৎকৃষ্টতর বীজ, যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টতর সার, দরকার মত যথেষ্ট জলসেচন—এবং মোটের উপর বৈজ্ঞানিক সর্ববিধ উপায় অবলম্বন। যে-সব জমিতে বৎসরে একটা ফসল হয়, সেখানে অন্ততঃ দুটা ফসল উৎপন্ন করতে হবে। নূতন ফসল প্রবর্তনেরও চেষ্টা করতে হবে।

এমন বিস্তর জমি আছে যাতে এখন চাষ হয় না। যে-সব জমি পতিত থাকে, সেই সকল জমিতে চাষ করতে হবে। তা করতে হ'লে সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত সর্বাগ্রে দরকার হবে। তার পর বীজ সার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলায়—বিশেষতঃ বাঁকুড়ায়—জলসেচনের ব্যবস্থা করলে খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'তে পারে।

চষা এবং পতিত উভয় রকম জমির জন্যে এই সব রকম ব্যবস্থা করবার কি চেষ্টা গবর্ন্মেণ্ট করছেন, জানতে ইচ্ছা করে। আকাঁড়া চালের ভাত খেলে কিংবা ফেনসইতে ভাত খেলে কিছু সাশ্রয় হয় বটে, কিন্তু অধিকতর অন্ন উৎপাদনের সমস্যার সমাধান তার দ্বারা হবে না। যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হ'লেও হবে না। উৎপাদকের ও বঙ্গের অন্য সকলের মঙ্গলের জন্যে রপ্তানীনিয়ন্ত্রণও করতে হবে।

—

নূনের ন্যূনতা নিবারণ সমস্যা

কাঁথী অঞ্চলে গিয়ে মন্ত্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন, নূন আরো উৎপন্ন কেমন ক'রে হ'তে পারে। সর্বসাধারণ অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলের প্রত্যাশা করবে।

—

"স্টাণ্ডার্ড ক্লথ"

"স্টাণ্ডার্ড ক্লথ" নামক সস্তা টেকসই কাপড়ের কথা অনেক দিন থেকে শুনছি, কিন্তু জিনিসটি এখনও চক্ষুগোচর হয় নি। কাগজে দেখলাম, বাংলা-সরকার বিবেচনা করছেন, কোন্ কোন্ ব্যবসাদারদের মারফৎ জিনিসটি ক্রেতাদের প্রাপ্য করবেন। বিবেচনার সত্বর অবসান এবং সুচিন্তিত কার্যপ্রণালীর আরম্ভ বাঞ্ছনীয়। জিনিসটা শেষ পর্যন্ত লাভখোরদের হাতে না পড়ে।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশগুলির পুনরুদ্ধার

ব্রিটিশ সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষীয় কেউ কেউ এই ইচ্ছা বা প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছেন যে, জাপান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে যে অংশ দখল করেছে, তার উদ্ধার করতে হবে। সেগুলোকে জাপানী প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা এই ইংরেজদের সঙ্গে একমত কিন্তু তাঁরা যদি এই চান (সম্ভবতঃ তাঁদের ইচ্ছা এইরূপ) যে, সেই দেশগুলি জাপানী প্রভুর অধীন না থেকে আগেকার মত ব্রিটিশ প্রভুর অধীন থাকবে, তা হ'লে আমরা সে ইচ্ছাকে ন্যায়সঙ্গত ও সাধু মনে করি না। তাঁরা বলতে পারেন, মালয় ও ব্রহ্মের পক্ষে স্বশাসনের চেয়ে ব্রিটিশ শাসন ভাল; কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্বজনমত তা নয়। নিরপেক্ষ বিশ্বজনমত সর্বত্র স্বশাসনের পক্ষপাতী। মালয় ও ব্রহ্মের লোকেরাও স্বশাসন চায়।

ইংরেজরা ত এত দিন ব্রহ্মের ও মালয়ের প্রভু ছিলেন, সেই প্রভুত্ব থেকে তাঁরা অপর্যাপ্ত ধন লাভ করেছেন। ঐ দুই ভূখণ্ড থেকে মানবিক সমুদয় উপদ্রব থেকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য তাঁরা পালন করতে পারেন নি। তাঁরা বলতে পারেন, এখন সাবধান হয়ে গেছেন, আবার ঐ দুই দেশের প্রভু হ'লে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বাস্তবিক আত্মরক্ষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ রক্ষাব্যবস্থা কিছু হ'তে পারে না। বর্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়া ও চীন নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অনতিক্রান্ত শৌর্যের সহিত আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে—তাদের রক্ষা অন্য কোন দেশ করছে না, বিশেষ রকম আনুকূল্যও এ পর্যন্ত তারা পায় নি। স্বাধীন ও স্বশাসক বলেই তারা এমন অটল প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও বীরত্ব দেখাতে পারছে। ব্রহ্ম ও মালয় রাশিয়া ও চীনের মত বড় ও অগ্রসর দেশ নয় বটে, কিন্তু তারা স্বশাসক হ'য়ে যদি স্বশাসক ভারতবর্ষের ও স্বাধীন চীনের সঙ্গে সংঘবদ্ধ (federated) হয়, তাহ'লে তাদের রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হবে।

ব্রহ্ম ও মালয় জাপানের কবল থেকে মুক্ত হ'লে তখন তাদের ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠবে। জাপানের কবল থেকে উদ্ধার তাদের কেমন করে করা যায়? এখন প্রশ্ন এই।

কেবলমাত্র বাইরের থেকে বিদেশী সৈন্য এনে এ কাজ করা যাবে না। মালয় ও ব্রহ্মের ইংরেজ প্রভুরা ঐ দুই দেশের মানুষগুলিকে যুদ্ধ করতে শেখান নি, তার কোন সুযোগ দেন নি। সেই ভ্রমের প্রতিকার করতে হবে।

তাদিকে বিশ্বাস করতে হবে। এবং তার দ্বারা তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তা হ'লে তারা জাপানকে কোন প্রকার সাহায্য দেবে না। ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখ থেকেই জানা গেছে, ব্রহ্মদেশের এক-দশমাংশ লোক জাপানের পক্ষে এবং তারা জাপানের সাহায্য করেছে, এক-দশমাংশ ইংরেজের পক্ষে, বাকী শতকরা ৮০ জন ইংরেজ বা জাপানী কারো পক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়।

ব্রহ্ম ও মালয়ের বিশ্বাস ও সাহায্য অর্জন করতে হ'লে এখন থেকেই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তাদের পুনরুদ্ধারের পর তারা স্বাধীন দেশ ব'লে পরিগণিত হবে, ন্যূনকল্পে ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলির মত স্বশাসক ব'লে স্বীকৃত ত হবেই। নতুবা তারা ইংরেজের পক্ষে হবে না। জাপানীরা যদি তাদের এই স্তোকবাক্য না বলত যে তাদিকে স্বাধীন করা হয়েছে বা হবে, তা হ'লেও ব্রিটেনের পক্ষে তাদের স্বাধীনতা বা স্বশাসন অধিকার স্বীকার ন্যায্য ও আবশ্যক হ'ত।

যথেষ্টসংখ্যক সৈন্য, তাদের যথেষ্ট যন্ত্রসজ্জা, যথেষ্ট আকাশযান এবং যথেষ্ট রণতরী-বল না থাকায় ব্রিটেন ব্রহ্মে ও মালয়ে পরাজিত হয়েছে। ঐ দুই দেশের পুনরুদ্ধার করতে হ'লে যুদ্ধায়োজনের এই সব দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে।

রেঙ্গুন যখন জাপানের হাতে পড়ল, তখন সমুদ্রপথ দিয়ে ব্রিটিশবাহিনীর আরও সৈন্য ও নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ পাবার উপায় হ'তে পারত যদি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের মধ্যে যাতায়াতের রেলওয়ে বা ভাল পাকা রাস্তা থাকত। কিন্তু ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীর মালিকদের স্বার্থপরতায় এরূপ কোন স্থলপথ এখন নাই। ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের পুনরুদ্ধার করতে হ'লে এরূপ স্থলপথ নির্মাণ অবিলম্বে আবশ্যক।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তারা যেমন বড় বড় আদর্শের অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে আপনাদের অধীন দেশগুলির অবস্থা পরিবর্তিত রাখতে চান, ডাচ্, ফরাসী ও বেল্‌জিয়ান কর্তারাও সেই রকম চান।

কিন্তু যুদ্ধের ফল যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে, তা এখনও সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং "কালনেমির লঙ্কাভাগ" সদৃশ কিছু না ক'রে যুদ্ধে জয়লাভেই সম্পূর্ণ মন দিলে ভাল হয়।

—

যুদ্ধের পর কি হবে তার জল্পনা

যুদ্ধশেষ হ'য়ে গেলে পৃথিবীর সব দেশের ও সব জাতের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কি রকম হবে, তা নিয়ে কোন কোন স্বাধীন দেশের কোন কোন লোক নানা কল্পনা জল্পনা করছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষমতাশালী তাঁরা সাধারণ ভাবে কেবল কয়েকটা সূত্র নির্দেশ করছেন, এক একটা দেশ এমন কি এক একটা মহাদেশ ধ'রে কিছু বলছেন না। আমেরিকার দেশপতি রুজভেল্ট চার (?) রকম মুক্তি বা স্বাধীনতার (freedomএর) কথা বলেছিলেন। যেমন, ভয় থেকে মুক্তি (freedom from fear), অভাব থেকে মুক্তি (freedom from want), প্রকাশ্যসভায় একত্র মিলিত হবার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of association and of expression of opinion), ইত্যাদি। কিন্তু আমেরিকার মিতা ব্রিটেনের জমিদারি ভারতবর্ষে তাঁর এই ফতোআ খাটবে কি না বলেন নি। আটলান্টিক চার্টারটাও ভারতবর্ষে খাটবে কি না, তা বলেন নি।

মোটের উপর কর্তারা নিজেদের ও নিজেদের মিতাদের স্বার্থ বেশ বজায় রেখে কথা বলছেন। তাঁদের মতলবে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের আপাততঃ না থাকলেও তাঁরা জেনে রাখুন আমরা মানুষ চিনি, জা'ত চিনি, ছেঁদো কথার ভিতরে কি আছে বুঝতে পারি।

অতএব যদি কিছু বলতেই হয়, খুলে বলুন; সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ও তার প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করতে চান বলুন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি করতে চান বলুন। স্তোকবাক্যের দ্বারা কাউকে ঠকাতে চেষ্টা করবেন না—সেরকম চেষ্টা করলে নিজেই ঠকতে হবে। এবং আবার বলি "কালনেমির লঙ্কাভাগ" করবেন না।

—

চীনে জাপানীদের বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার

জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করায় তাদের ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ এবং বড় একটা মহাজাতির বাসভূমি, বৃহৎ চীন দেশ ও চৈনিক জা'তকে অপরাজিত রেখে তারা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চায় না, নইলে ত এখন এসে পৌঁছেছে আসাম-সীমান্তের খুব কাছে। দুটো বড় দেশ ও মহাজাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানর চেয়ে একটার বিরুদ্ধে চালান সুবিধাজনক। সেই জন্যে বোধ হয় জাপানীরা আগে চীনকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও কাবু ক'রে পরে ভারতবর্ষে পদার্পণ করতে চায়। চীন-অভিযান শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্যে তারা চীন-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার

করছে। কিন্তু জাপানীদের এ রকম অমানুষিক নৃশংস যুদ্ধ নূতন নয়। চীন-কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে জাপানীরা হাজার বার বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে। গ্যাস-আক্রমণ প্রতিরোধের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও চীন পাঁচ বৎসর লড়ছে, পরেও লড়বে! ইটালী গ্যাস ব্যবহার ক'রে আবিসীনিয়া দখল করেছিল; জাপান সে-উপায়ে চীন দখল করতে পারবে না। ধন্য চীনের প্রতিজ্ঞা ও বীরত্ব।

দেশপতি রুজভেল্ট শাসিয়েছেন যে, জাপান যদি গ্যাস প্রয়োগে নিবৃত্ত না হয়, তা হ'লে জাপানেও বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দেওয়া হবে। পৈশাচিক বর্বরতার উত্তরে পৈশাচিক বর্বরতার ভয় প্রদর্শন ধর্মবুদ্ধিসম্মত মনে হচ্ছে না; কিন্তু জাপানকে নিবৃত্ত করবার উপায়ান্তর নির্দেশ করতেও আমরা পারছি না।

—

প্রস্তাবিত হিন্দুবহুবিবাহনিষেধক আইন

হিন্দু আইনকে 'সংহিতাবদ্ধ' (codify) বা আধুনিক আইনের ধারায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্যে যে রাউ কমীটি (Rau Committee) নিযুক্ত হয়েছে, তাঁরা হিন্দু বিবাহের প্রথা, রীতি ও ব্যবস্থাগুলিকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা তিনটি পরিবর্তন করতে চান। তাঁরা সগোত্র বিবাহ, অবশ্য একটা সীমার বাইরে, চালাতে চান। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অনেক লোকের গোত্র এক, দেখা যায়। তাদের কোনকালে কোন রক্তসম্পর্ক ছিল মনে হয় না। কিন্তু একই বর্ণের, যেমন ব্রাহ্মণদের, মধ্যে যারা সগোত্র, তাদের সকলের মধ্যে শতাধিক বৎসর পূর্বেও কোন রক্তসম্পর্ক ছিল, তা প্রমাণ করা অসম্ভব বা কঠিন। তারা সগোত্র বলেই তাদের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, যদিও জ্ঞাতিদের মধ্যে তা নিষেধ করবার পক্ষে জৈববিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি আছে। অবশ্য, যারা জ্ঞাতি নয় অথচ সগোত্র, তাদের মধ্যে বিবাহ প্রচলনের অনুমতিই আইন দ্বারা দিবার প্রস্তাব হচ্ছে; এরূপ বিবাহ করতেই হবে এমন অসঙ্গত প্রস্তাব কেউ করছে না।

রাউ কমীটি অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করতে চান। '৭২ সালের তিন আইন অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ হ'তে পারে, কিন্তু এরূপ বিবাহ হিন্দুবিবাহ নহে, হিন্দু কোন গ্রহ-পূজা আদি অনুষ্ঠান সহকারে ঐ আইন অনুযায়ী সিবিল বিবাহ হয় না। রাউ কমীটি প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠানসহকৃত অসবর্ণ বিবাহও আইনসিদ্ধ করতে চান। অবশ্য কাহাকেও অসবর্ণ বিবাহ করতে বাধ্য করা এই প্রস্তাবিত আইনের অভিপ্রায় নয়।

রাউ কমীটি হিন্দু আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সহকৃত সমুদয় বিবাহ একপত্নীক করতে চান। এখন সিবিল বিবাহ একপত্নীক বটে, কিন্তু তা হিন্দুবিবাহ ব'লে পরিগণিত নয়। সমুদয় হিন্দু আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সহকারে সাধারণতঃ যে সমুদয় হিন্দুবিবাহ হয়, সেগুলিকেও রাউ কমীটি একপত্নীক করতে চান, এক পত্নী জীবিত থাকতে অন্য পত্নী গ্রহণ বে-আইনী করতে চান। সামাজিক হিতের নিমিত্ত, পারিবারিক শান্তির জন্য, এবং নারীর ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ও আবশ্যক। পুত্রের জন্য ভার্য্যা আবশ্যক, পুত্রের পিণ্ড পাওয়া আবশ্যক, তা না পেলে পুন্নাম নরকে যেতে হবে, যাঁরা মানেন, তাঁদের এতে আপত্তি হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ড কোন পরলোকগত আত্মাকে খেতে দেখি নি, পুন্নাম নরকের অবস্থান কোন ভূগোল-খগোলে পাওয়া যায় না। তা হ'লেও অন্য কারণে দেশে পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু নারীত্বের অবমাননা দ্বারা কতকগুলি পুরুষশৃগাল বাড়িয়ে কি ফল?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুবিবাহ বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। উপন্যাসে, নাটকে ও ছোট গল্পেও এর অনিষ্টকারিতা দেখান হয়েছে। ছেলেদের ও মেয়েদের—বিশেষতঃ মেয়েদের—শিক্ষার বিস্তার বহুবিবাহ কমবার একটা পরোক্ষ কারণ হয়েছে। তার উপর আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকেরই পক্ষে বহুবিবাহ অসম্ভব ক'রে তুলেছে। তা হ'লেও বহুবিবাহ-নিষেধক আইনের প্রয়োজন আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক স্থলে দেখা গেছে—বিশেষতঃ বঙ্গের বাইরে ও অবাঙালীর মধ্যে যদিও বাঙালী একেবারে বাদ যায় না, শিক্ষিত পুরুষরা এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছে এবং উচ্চশিক্ষিতা নারী বিবাহিত ও সপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করেছে। এ কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নয়, ধনের ও পদের মোহে বা কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে এটা ঘটেছে।

একটা কথা উঠেছে, বর্তমান যুদ্ধে খুব পুরুষক্ষয় হচ্ছে, অতএব পুরুষদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে বহুবিবাহ দরকার হ'তে পারে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধেও ইয়োরোপে খুব পুরুষক্ষয় হয়েছিল, অথচ সে মহাদেশে বহুবিবাহবিধায়ক আইন জারি হয় নি। প্রাকৃতিক কোনও অজ্ঞাত নিয়মে দেখা যায়, বড় বড় যুদ্ধ হয়ে গেলে তার পর স্ত্রীশিশুর

চেয়ে পুরুষশিশুই জন্মে বেশি। সেই নিয়ম অনুসারে এখন এবং ভবিষ্যতেও পুরুষ জন্মাতে পারে বেশী।

তা ছাড়া ভারতবর্ষে ত এখনও যুদ্ধে লোকক্ষয় এবার বিশেষ কিছু হয় নি। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথার সপক্ষে কোন কু-যুক্তিতর্ক উত্থাপন অসাময়িক ও অনাবশ্যক।

—

পাকিস্তান নিয়ে দুই বৈবাহিকের কলহ

পঞ্জাবের, বাংলার, সিন্ধুর বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন কংগ্রেসী নেতা যদি মুসলিম লীগের (অর্থাৎ মিঃ জিন্নার) পাকিস্তানী কুমতলবে সায় দিতে কংগ্রেসকে বলতেন, তা হ'লে তার এক রকম মানে হ'ত; কিন্তু যে মান্দ্রাজ প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় খুব কম এবং যেখানে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপিত হয়ে হিন্দুদের অকল্যাণ হতেই পারে না, সেখানকার অন্যতম প্রধান কংগ্রেস-নেতা শ্রী চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচার্যের কংগ্রেসকে পাকিস্তানী ধুয়ায় সায় দিতে বলার অর্থ অন্য রকম। কি রকম, তা পাঠকেরা অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।

রাজাগোপাল আচার্যের আন্দোলনে একটা ফল হয়েছে এই যে, কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানী কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদ সে দলের নন।

পাকিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা দু-দিক দিয়ে হ'তে পারে; দুই দিক দিয়েই হয়েছে। এক, পরিকল্পনাটার আবশ্যকতা এবং কল্যাণকরতা বা অকল্যাণকরতা। দেখান হয়েছে যে, এটা অনাবশ্যক, বরং অন্যদের কথা দূরে থাক্, এর দ্বারা মুসলমানদেরও উপকার হবে না—সমগ্র ভারতবর্ষের ত নয়ই। পাকিস্তান-পরিকল্পনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় আলোচ্য এই যে, সমস্ত বা অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান ইহা চায় কি না। সবাই যে চায় না ইহা ত সুস্পষ্ট। সাড়ে চার কোটি মোমিনরা চায় না, কংগ্রেসী মুসলমানরা দু-চার জন বাদে কেউ চায় না, জামিয়ৎ-উল-উলেমা চায় না। এতে মনে হয় যে, অধিকাংশ মুসলমানও এটা চায় না। কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'তে হ'লে সাবালক সব মুসলমানের ভোট নেওয়া যেতে পারত। কিন্তু রাজাজী তা করেন নি। তিনি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মত ধরে নিয়েছেন যে, জনাব জিন্নার যা আব্দার সব মুসলমানের দাবীও তাই।

এখন কথা হচ্ছে, সব মুসলমান বা অধিকাংশ মুসলমান যদি পাকিস্তান চাইত, তা হ'লেই কি জিনিসটা কল্যাণকর হ'ত? নিশ্চয়ই না। মহাত্মা গান্ধী যে বলেছেন, ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করতে চাওয়া ও করা পাপ, তা সত্য কথা।

কিন্তু পরিকল্পনাটা কল্যাণকর হোক বা না হোক, সব বা অধিকাংশ মুসলমান সেটা চাইলে কি করবে? এ প্রশ্নের উত্তর কি?

আমরা বলি, সব বা অধিকাংশ মুসলমান যা চায় নি, বা চায় ব'লে প্রমাণ হয় নি, তা তারা চাইলে কি করা যাবে এ রকম প্রশ্ন তোলা চুলকে' ব্রণ তোলার মত। এর উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। পার্লেমেণ্টারি ভাষায় বলব, প্রশ্নটা উঠছে না (The question does not arise)। এ রকম প্রশ্ন নষ্টামিশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ মিশ্চিফ-মেকারদের কুকর্ম।

সব বা অধিকাংশ মুসলমান চাইলেও (না-চাইবার মত সুবুদ্ধি তাদের আছে) আমরা পরিকল্পনাটাতে সায় দিতাম না। জানি যে, সেক্ষেত্রে সফল গৃহযুদ্ধ ভিন্ন পাকিস্তানী খণ্ডীকরণ বন্ধ করা যেত না। গৃহযুদ্ধে সায় দিতাম কিনা, সে প্রশ্ন does not arise, উঠছে না। কিন্তু একটা বড় নজির আছে। আমেরিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলা নিগ্রোদাসত্ব বজায় রাখবার জন্যে উত্তরের রাষ্ট্রগুলির থেকে আলাদা হ'তে চেয়েছিল। যুদ্ধ দ্বারা সেই পৃথক্ হওয়াটা বন্ধ করা হয়। তার ফল ভালই হয়েছে।

ভারতবর্ষের ক্রীতদাসত্ব বজায় রাখবার জন্যে যাঁরা এর খণ্ডীকরণ চান, তাঁরা এই নজিরটার কথা ভেবে দেখবেন। গান্ধীজীর বৈবাহিক রাজাজী ন্যাশন্যাল গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্যেই নাকি জনাব জিন্নার প্রস্তাবে কংগ্রেসকে রাজী হ'তে বলেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির মতে ভারতীয় নেশ্যন (Indian Nation) ব'লে কোন পদার্থই নেই। তিনি চান ভারতবর্ষে অন্ততঃ দুটা নেশ্যনের প্রতিষ্ঠা। এ হেন ব্যক্তিকে খুশি ক'রে ন্যাশন্যাল গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা অতি অদ্ভুত প্রস্তাব! ঐক্যবদ্ধ নেশ্যনই যদি না রইল, তবে ন্যাশন্যাল বিশেষণ-বাচ্য জিনিসটা থাকে কোথায় বা আসে কোথা থেকে? রাজাজীর মতে জনাব জিন্নার আব্দারটা কথায় মেনে নিলেই চলবে, তিনি কার্যতঃ ভারতবর্ষকে ভাগ করতে চাইবেন না। 'রাজাজী' খুব মানুষ চেনেন বলতে হবে!

—

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ স্মারক ফণ্ড

দু-বছরেরও অধিক আগে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের

মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ তাঁর কয়েক বন্ধু পাঁচ লক্ষ টাকা তুলবার জন্যে একটি আবেদন করেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সম্পর্কেই এণ্ড্রুজ সাহেব ভারতবর্ষে তাঁর কাজ করেছিলেন। সেই জন্যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যার যোগ থাকবে এমন কাজে ও প্রতিষ্ঠানে ঐ টাকা লাগাবার সংকল্প করা হয়। আবেদনের ফলে ৬০,০০০ টাকা উঠেছিল। এই টাকা ভারতবর্ষের সব দিক্‌ থেকে প্রধানতঃ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের অল্পবিত্ত লোকেরা পাঠিয়েছিলেন। ৫ লাখ টাকা উঠতে বিলম্ব দেখে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে আট দিন অর্থ সংগ্রহ করতে মনস্থ করেন। সেখানে আট দিনেই তিনি বাকী ৪,৪০,০০০ টাকা তুলতে পেরেছেন। বোম্বাইয়ের লোকদের বদান্যতার জন্যে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই প্রশংসাভাজন ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কিন্তু যা বোম্বাইয়ের লোকদের গৌরবজনক, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের, লোকদের সে বিষয়ে কর্তব্যে অবহেলা অগৌরবের কারণ হয়েছে। এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ যা-কিছু করা হবে, তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকেও সম্মান দেখান হবে। এবং উভয়েরই প্রধান কার্যক্ষেত্র বাংলা দেশ। অথচ বাংলা দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া দূরে থাক্‌, উল্লেখযোগ্য কিছুই করে নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কল্‌কাতার টাউন হলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে যে সভা হয়েছিল, তাতে নিযুক্ত নিখিলভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমীটি কত টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছেন এখনও জানা যায় নি।

দীনবন্ধু স্মারক ফণ্ডে যাঁরা টাকা দিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "আমি সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছি, যে তাঁরা এর চেয়ে ভাল কাজে কখনও টাকা দেন নি।" "I am quite clear that they have never given to a better cause")। গান্ধীজী আরো বলেছেন, "শান্তিনিকেতনে যত টাকাই দাও না কেন, অত্যন্ত বেশী দেওয়া হয়েছে বলা যায় না" ("You can never give too much to Santiniketan")।

"এটা একটা অত্যন্ত দুঃখকর ব্যাপার যে ধনী লোকেরা যাঁরা শান্তিনিকেতন থেকে এত লাভবান্‌ হয়েছেন তাঁরা শান্তিনিকেতনের পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করেন না। কবি সর্বকালের জন্য ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর একটি কল্যাণকর সম্পত্তি, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানটিকে পাকা ভিত্তির উপর স্থাপন করা বিত্তশালী লোকদের কর্তব্য"।

"It is a tragedy that worried men, who have gained so much from Santiniketan, do not appreciate its full worth. The Poet is an asset for India and for the world for all time, and it is the duty of monied men to put his institution on a sound basis."

এক জনের আপত্তি এবং গান্ধীজীর তার সমুচিত জবাবও 'হরিজন' কাগজে বেরিয়েছে।

"But," some one said, "we are in the midst of turmoil. These are not times for money collections. Can't we wait until we have won our freedom?"

"Rabindranath could not wait to come to the world until freedom was won," said Gandhiji in a neat retort.

তাৎপর্য্য। কেউ একজন বললেন, "আমরা এখন ভারি গণ্ডগোলের মধ্যে রয়েছি। অর্থসংগ্রহের সময় এটা নয়। আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না কি?"

গান্ধীজী পরিপাটী প্রত্যুত্তর দিলেন :—

"স্বাধীনতা লব্ধ হবার পর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আসতে অপেক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ পারেন নি।"

—

রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতিসভা

মহাপুরুষদের স্মৃতিসভা তাঁদের জন্মদিন অনুসারে হ'তে পারে, আবার মৃত্যুদিন অনুসারেও হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা তাঁর জন্মদিন অনুসারে নানা স্থানে হয়ে গেছে। আবার আগামী ৭ই আগস্ট তাঁর মৃত্যুর তারিখেও অনেক জায়গায় হবে। আমরা বাঙালীরা এরূপ সভা করতে এবং কবির সম্বন্ধে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে পশ্চাৎপদ নই। বাংলা দেশ থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে যে খুব কম টাকাই দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জীবিতকালেও বিশ্বভারতীতে বাংলা দেশ যে সামান্যই দিয়েছে, তার মানে এ নয় যে, সভায় সমবেত লোকেরা, কবিতালেখকেরা ও প্রবন্ধ-রচয়িতারা কবিকে শ্রদ্ধা করেন না;—তার মানে সম্ভবতঃ এই যে, বঙ্গের গণ্যমান্য ও বিত্তশালী লোকেরা তাঁর মূল্য বোঝেন না। গান্ধীজী অবশ্য বিত্তশালী লোকদিগকেই টাকা দিতে বলেছেন, কেন না বেশী টাকা তাঁরাই দিতে পারেন। কিন্তু অল্পবিত্তেরাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু করতে পারেন। সবাই সাধ্যমত দু আনা চার আনা এক আধ টাকা দিলেও—এমন কি একটা 'পয়সা-ফণ্ড' করলেও, অনেক লক্ষ টাকা হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা একাধিক বার লিখেছিলাম, সবাই রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ একখানা ক'রে বই কিনলেও বিশ্বভারতী উপকৃত হবেন, এবং ক্রেতা-পাঠকরা ত আনন্দিত ও উপকৃত হবেনই। যত সভা করা হয়, তার অন্য ব্যয় কমিয়ে বিশ্বভারতীতে কিছু কিছু টাকা পাঠান যেতে পারে, এবং উৎকৃষ্ট কবিতাদির লেখকগণকে রবীন্দ্রনাথের কোন-না-কোন পুস্তক পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। আমাদের এই ইঙ্গিত অনুসারে অন্ততঃ এক জায়গায় কাজ হয়েছে

দেখছি। শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর উদ্যোগে মধুপুরের বাঙালীদের কবির জন্মদিনে তাঁর স্মৃতি-উৎসবে অন্যূন চল্লিশ টাকা দামের রবীন্দ্র-গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছিল। তেইশ জন শিল্পীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আগামী ৭ই আগস্টে যত সভা হবে, তার উদ্যোগ-কর্তারা অন্ততঃ এই ভাবে বিশ্বভারতীর সহায় হ'তে পারেন।

—

গেরিলা যুদ্ধ শিখতে পঞ্জাব ও নাসিক যাত্রা

খবরের কাগজে দেখলাম, অনেকগুলি বাঙালী যুবক গেরিলা যুদ্ধ শিখবার জন্যে লাহোর গেছেন; কেউ কেউ মহারাষ্ট্রদেশের নাসিকস্থিত ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়েও গিয়ে থাকবেন।

বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল বঙ্গেই এই রকম শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করলে অনেক বেশী যুবক শিখতে পারে।

—

বৃহত্তম বিলাতী কন্‌ভয় এদেশে পৌঁছেছে

রণতরী দ্বারা সুরক্ষিত হ'য়ে যে-সব মানুষবাহী ও মালবাহী জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তাদের সমষ্টিকে কন্‌ভয় বলে। বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে বিলাত থেকে গত মে মাসের গোড়ার দিকে জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ চালাবার সব রকম সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ, সমরসজ্জা-নির্মাতা শিল্পী, শুশ্রূষাকারিণী প্রভৃতি নিয়ে একটি কন্‌ভয় ভারতবর্ষ পৌঁছেছে। এ-যাবৎ যত কন্‌ভয় এদেশে এসেছিল, এটি তার মধ্যে নাকি বৃহত্তম। আমেরিকা থেকেও অনেক সৈন্য ও সরঞ্জাম এসেছে এবং পরে আরও আসতে পারে।

বিলাত ও আমেরিকার থেকে যা এবং যারা এসেছে ও আসবে, তার ও তাদের দ্বারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ ও ব্যর্থ করবার চেষ্টা সুষ্ঠুতর রূপে হ'তে পারবে। সুতরাং এদিক দিয়ে আলোচ্য ও পরবর্তী কন্‌ভয়গুলির বিরুদ্ধে কিছু বলবার নাই। কিন্তু ব্যাপারটির অন্য একটা দিক্ আছে।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত লোকসংখ্যার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। ভারতবর্ষের এমন কোন প্রদেশ নাই যার অধিবাসীরা ঐতিহাসিক কোন-না-কোন সময়ে—এমন কি ব্রেটিশ রাজত্বকালেও যুদ্ধে শৌর্য না দেখিয়েছে। সুতরাং এদেশের রক্ষাকার্যের জন্য যথেষ্ট সৈন্য এদেশেই পাওয়া যেতে পারত এবং এখনও পারে।

তার পর যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যবিধ সরঞ্জামের কথা। এই সব প্রস্তুত করতে হ'লে যে-যে রকমের কাঁচা মাল দরকার হয়, পৃথিবীর কোন দেশেই তার প্রত্যেকটি পাওয়া যায় না, কোন-না-কোন জিনিস অন্য দেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ভারতবর্ষেও প্রধান প্রধান কাঁচা মাল পাওয়া যায়, কিছু অন্য দেশ থেকে আনা দরকার হ'তে পারে, যদি এদেশেই নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করবার কারখানা স্থাপন করা যায়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষাগ্রহণ করতে সমর্থ কারিকর মিস্ত্রী মজুরও যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে—তা যে-কারণেই হোক, এই দুর্দশা অগৌরবকর।

গৌরববোধ অগৌরববোধ মানসিক ব্যাপার। কিসে গৌরব হয়, কিসেই বা অগৌরব হয়, বস্তুতান্ত্রিকরা ("realists") বা কেজো রাষ্ট্রনীতিবিশারদরা ("practical politicians") অদৃশ্য অস্পৃশ্য সে রকম কোন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী না-ও হ'তে পারেন। কিন্তু ভারতীয়েরা বিদেশে এ-যাবৎ যেরূপ উপেক্ষিত অনাদৃত লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, এই দুর্দশার ফলে হয়ত তার চেয়েও বেশী অপমানকর ব্যবহার তারা ভবিষ্যতে পাবে—"তোমরা নিজের দেশ রক্ষা করতে পার না, তোমরা আবার কিসের মানুষ?" এই হবে বিদেশীদের মনের ভাব।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকরা এতেও বিচলিত না হ'তে পারেন। সেই জন্যে আর একটা কথা বলি। যুদ্ধের শেষে ব্রিটেনকে খুব বেশী ঋণ শোধ করতে হবে। ভারতবর্ষে কলকারখানা ও বাণিজ্য তার একটা প্রধান উপায় হবে। এখনই ত যুনাইটেড্ কিংডম কমার্শ্যাল কর্পোরেশনকে (United Kingdom Commercial Corporation) ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক এরূপ অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যা ভারতীয় বণিকরা পায় না। এই বিলাতী কর্পোরেশনের সমস্ত মূলধন ব্রিটিশ রাজকোষ জুগিয়েছে। অন্যান্য বিলাতী কোম্পানীকেও এই রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ও হবে। আমেরিকা যে সাহায্য করছে, তার বিনিময়ে আমেরিকানরাও এদেশে বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক সুবিধার কিছু ভাগ নিশ্চয়ই চায়। এই সব সুবিধা বিদেশীরা যতই পাবে, আমাদের ভারতীয়দের ভাগ ততই কমে যাবে।

অতএব, কন্‌ভয় এখন একটা অভয়ের কারণ হ'লেও ভবিষ্যদ্‌ভয়েরও পরোক্ষ একটা কারণ।

—

রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ

রবীন্দ্রনাথের যে "চিঠিপত্র"গুলির পরিচয় এবার একটি প্রবন্ধে দিয়েছি, তা পড়তে পড়তে অনেক বার মনে হয়েছে, শিলাইদহের কুঠি এখন অন্য লোকের হাতে। বাঙালীরা অন্ততঃ এইটি বর্তমান মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রবীন্দ্র-স্মৃতিমন্দির রূপে রক্ষা করুন না? কয়েক হাজার টাকা হ'লেই কাজটি হয়। বাঙালী এমন ধনী বিস্তর আছেন, যাঁরা একা একাই এই কয়েক হাজার টাকা দিয়ে চিরস্মরণীয় হ'তে পারেন। কে হবেন?

—

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কংগ্রেসী উপায়

নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির গত অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাবটি প'ড়ে বুঝা যায় যে, যদি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের বাঞ্ছিত জাতীয় গবর্মেণ্ট (National Government) স্থাপনে রাজী হতেন, তা হ'লে কংগ্রেস-নেতারা ঐ গবর্মেণ্টের অঙ্গস্বরূপ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত যথোচিত সশস্ত্র আয়োজন করতেন—জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ দ্বারা দেশ রক্ষা করতে সমগ্র মহাজাতিকে আহ্বান করতেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই আহ্বানে লক্ষ লক্ষ লোক সাড়া দিত।

কিন্তু জাতীয় গবর্মেণ্ট গঠিত না-হওয়ায় কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সমর-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারেন নি। তা না পারলেও কংগ্রেসীরা সরকারী সমর-প্রচেষ্টায় কোন প্রকার বাধাও দিচ্ছেন না এবং দিবেন না। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি অহিংস অসহযোগ (Non-violent Non-Co-operation) দ্বারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। জাপানীরা ভারতবর্ষে বা তার কোন অংশে এসে পড়লে, সমগ্র দেশ বা তার কোন অংশ দখল করলে, কংগ্রেসীরা জাপানী হুকুম তামিল করবেন না, জাপানের কোন অনুগ্রহ চাইবেন না, জাপান-প্রদত্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন উৎকোচের প্রলোভনে তাঁদের পদস্খলন ও নৈতিক পতন হবে না। যদি জাপানীরা তাঁদের ঘর-বাড়ী ও ক্ষেতখামার নিতে চায়, প্রাণ যায়, তাও স্বীকার তাঁরা সেগুলি দিবেন না। বলা বাহুল্য, এ রকম বীরোচিত আচরণ করতে সমর্থ কংগ্রেসীর অভাব হবে না। কিন্তু তার ফলে কি বিজয়ী জাপানীদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে? তারা আগে কোরিয়ায় এবং পরে ও এখন লক্ষ লক্ষ কোরীয় ও চৈনিকের প্রাণবধ করেছে ও ধনসম্পত্তি জমিজায়গা নিয়েছে। এদেশেও জোর ক'রেই নেবে। ভারতীয় মনুষ্যরক্ত দেখে তাদের মন গলবে না, টলবে না। এ রকম যুক্তি উত্থাপিত হ'তে পারে যে, কোরিয়ায় ও চীনে তথাকার অধিবাসীরা জাপানী হিংসার উত্তরে সহিংস উপায়ই অবলম্বন করেছে, সুতরাং জাপানীদের হৃদয় পরিবর্তনের কোন কারণ বা অবসর ঘটে নি; কিন্তু অহিংস প্রতিরোধ করলে তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি জাগ্রত হ'তে পারে। পারেই না, তা কেমন ক'রে বলব? কিন্তু নিশ্চয়ই পারে, কিংবা খুব সম্ভব পারে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশে আমাদের অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা নাই। কিন্তু রক্তাক্ত যুদ্ধে জয়ী হয়ে যারা দেশ দখল করে, তাদের সুপ্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি জান্তব বা পাশব বৃত্তিগুলাকে পরাস্ত সদ্য সদ্য করবে, আমাদের এখনও সে বিশ্বাস জন্মে নি। এই কারণে আমরা মনে করি না যে, দরকার হ'লে কংগ্রেসী অংহিস অসহযোগ এক্ষেত্রে ঈপ্সিত ফল উৎপন্ন করবে।

আর একটি কারণে আমরা কংগ্রেসী প্রস্তাবটিকে কার্যকর মনে করি না।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্যে যা করা উচিত ও আবশ্যক, তাকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিরোধকারীদের প্রথম চেষ্টা এরূপ হওয়া উচিত ও আবশ্যক যাতে বহিঃশত্রুরা মাতৃভূমির কোন অংশে পা ফেলতে না পারে—ডাকাত ঘরের মধ্যে ঢুকে আড্ডা গাড়লে তাকে তাড়ান কঠিন, তাকে ঢুকতে না দেওয়াই উচিত। সেই জন্যে আমাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া চাই জাপানীদিগকে এরোপ্লেন-প্যারাশুট হ'তে ভারতের মাটিতে নামতে না দেওয়া, যুদ্ধজাহাজ থেকে সমুদ্রতটে নামতে না দেওয়া, এবং স্থলপথে কোথাও আসতে না দেওয়া। এই তিন রকম কাজ অহিংস অসহযোগ দ্বারা হ'তে পারে না। শত্রুর সঙ্গে অহিংস অসহযোগ চলতে পারে শত্রু দেশের মধ্যে এসে পড়লে। নিজেদের এরোপ্লেনে আকাশে উঠে জাপানী বিমানবাহিনীর সঙ্গে, নিজেদের জাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে জাপানী রণতরীর সঙ্গে, এবং নিজেরা দল বেঁধে খালি হাতে স্থলপথে গিয়ে জাপানী স্থলসৈন্যের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করবার কল্পনা কংগ্রেস করেন নি। জল-স্থল আকাশমার্গে জাপানীদের ভারত-প্রবেশ নিবারণ করতে হ'লে যোদ্ধা ও বোমারু এরোপ্লেন, এরোপ্লেনধ্বংসী কামান, রণতরী, এবং স্থলসৈন্য চাই।

শত্রু দেশের মধ্যে এসে পড়লে তখন অহিংস অসহযোগ চলতে পারে বটে। তার ফলাফলের আলোচনা আগে করেছি। কিন্তু এটি আক্রমণ প্রতিরোধের দ্বিতীয় ভাগ ও অধ্যায়। প্রথম ভাগ ও অধ্যায় শত্রুর পায়ের দ্বারা জন্মভূমির মাটি কলুষিত হ'তে না দেওয়া। তার কোন উপায়ের ব্যবস্থা কংগ্রেসী প্রস্তাবে নাই।

—

"চারণ"

"চারণ" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের চতুর্থ কবিতা-পুস্তক। তিনি দার্শনিক বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তিও অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর "চারণ" গ্রন্থখানি লোকপ্রিয় হবে। কারণ এতে গল্পের রস আছে। এর কবিতাগুলি শ্রুতিমধুর এবং অনুপ্রাণনাপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর অনেক কবিতা যেমন আবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, এর অনেক কবিতাও সেইরূপ আবৃত্তির জন্য ব্যবহারযোগ্য। চারণ শব্দের একটি অর্থ কুলকীর্তিগায়ক। দাসগুপ্ত মহাশয় কুলকীর্তি ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে গেয়েছেন। তাঁর কবিতার নামগুলি থেকেই তা বুঝা যায়। যথা—কর্ণ ও ভার্গব, কর্মদেবী, শিখ বালক, প্রভু বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, প্রতাপ ও ভীমসা, গায়ক তানসেন, দাদু, কর্ণ, সনাতন, মনসুর, অর্জুন ও দুর্যোধন, তিমুর, বুদ্ধ ও সুজাতা, প্রতাপসিংহ, সন্ধ্যা, কুরেশ, সিকন্দর শা, ভক্ত হরিদাস, বৈরাম, গুরু অর্জ্জুন, শ্রীচৈতন্য, কাশীদাস, ঋষি ভরত।

—

রমাপ্রসাদ চন্দ

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ একজন সুপণ্ডিত মনীষী হারিয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাসে তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন ও গভীর জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি গবেষকও ছিলেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজেও এ বিষয়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে বহু বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করেছিলেন এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান মুজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ভারতীয় ললিতকলার—বিশেষতঃ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের—তিনি জ্ঞানবান্ সমালোচক ছিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও তার মুজিয়ম স্থাপনে এবং তার গোড়াকার সময়ের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর হাত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিষয়ে সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পরামর্শ নিতেন। পাণ্ডিত্যে নির্ভুল তথ্যে উপনীত হবার তাঁর ঝোঁক ছিল। শ্রীযুক্ত (পরে ও এখন সর্) অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন যুক্তপ্রদেশে গাজীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করতেন, তখন চন্দ মহাশয় সেখানে শিক্ষকের কাজ করতেন। উভয়ের মধ্যে তখন পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। চন্দ মহাশয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বন্ধুত্বে অচঞ্চল ছিলেন। তিনি যখন গাজীপুরে শিক্ষক ছিলেন, সেই সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে তাঁর ইতিহাসানুরাগ এবং খাঁটি তথ্যে ও সত্যে উপনীত হবার দিকে ঝোঁকের কথা লিখেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি বিস্তারিত ও প্রামাণিক জীবনচরিত লিখবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, সেজন্য তিনি অধ্যয়নও অনেক করেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সহযোগিতায় তিনি রামমোহন-সম্পৃক্ত অনেক সরকারী কাগজ ও চিঠিপত্র উৎকৃষ্ট একটি ভূমিকা সমেত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ কয়েক বৎসর হৃদ্‌রোগে ভোগায় রামমোহনের জীবনচরিত লিখবার ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি।

—

বৈমানিক অফিসার কল্যাণরঞ্জন দাস

এলাহাবাদের নিকটবর্তী ভামরাওলি এরোড্রোম থেকে বিমানে আকাশে উড়তে গিয়ে বৈমানিক অফিসার কল্যাণরঞ্জন দাসের এরোপ্লেনটা নষ্ট হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরূপ মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয়। তিনি অতিশয় দক্ষ, সাহসী, অভিজ্ঞ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি বৈমানিক ছিলেন। এসব গুণে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল না। তিনি মিশর, লিবিয়া, ইরিট্রিয়া, জাভা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা দেশে বিমানযুদ্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গের উপকূল-রক্ষী বৈমানিকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরূপ বীর যুবকের মৃত্যু যুদ্ধে হ'লেও শোচনীয় হ'ত, কিন্তু যে অঞ্চলে যুদ্ধের নামগন্ধও নাই, সেখানে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয়। তাঁর এরোপ্লেনটি নূতন ছিল কি? না বহু বৎসরের পুরাতন? যদি পুরাতন ছিল, তা হ'লে সম্প্রতি মেরামত হয়েছিল কি? মেরামত হয়ে থাকলে, মেরামতকারীরা কি এটিকে ব্যবহারযোগ্য বলেছিল? না, অব্যবহার্য বলেছিল? এই সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা আর না ঘটে, এবং এই বিমান-দুর্ঘটনায় কারো দোষ থাকলে তার সমুচিত তিরস্কার বা অন্য দণ্ড হয়। মৃত্যুকালে

বৈমানিক অফিসার কল্যাণরঞ্জন দাস

কল্যাণরঞ্জনের বয়স ২৫ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য এবং আসাম ও বঙ্গদেশের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসের পুত্র।

—

কয়েক জন কম্যুনিষ্টের মুক্তি

বাংলা দেশের জেল থেকে ১১ জন কম্যুনিষ্টের মুক্তি হয়েছে। তার চেয়ে অনেক অধিকসংখ্যক লোকের উপর যে-সব নিষেধ ছিল সেগুলা তুলে নেওয়া হয়েছে। যা হয়েছে, তা ভালই হয়েছে। কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সরকারী নিষেধাধীন লোকদের নিষেধ প্রত্যাহার রাজনৈতিক পলিসি হিসাবে আরও ব্যাপক হওয়া উচিত।

—

যুক্তপ্রদেশে দমননীতি

যুক্তপ্রদেশে দমননীতি চলছে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা আবুল কলাম আজাদ তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত কংগ্রেসের মুখপত্র ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের জমানৎ ৬০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, এবং ১২০০০ টাকা নূতন জমানৎ চাওয়া হয়েছে (তা দেওয়াও হয়ে গেছে)। যে প্রবন্ধগুলির জন্যে ৬০০০ বাজেয়াপ্ত ও আবার ১২০০০ নেওয়া হয়েছে, যুক্তপ্রদেশের প্রেস-পরামর্শদাতা কমীটি সেগুলি পড়ে বলেছিলেন সেগুলি নির্দোষ, কিন্তু গবন্মেণ্ট তাঁদের কথা শোনেন নি!

এলাহাবাদে কংগ্রেস আপিস খানাতল্লাস ক'রে পুলিস শুধু নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমীটির নিষিদ্ধ প্রস্তাব দুটি নিয়ে যায় নি, অন্য কাগজপত্র, এমন কি আপিসের টাইপরাইটার এবং সাইক্লোস্টাইলও নিয়ে গেছে! প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী রাফী আহমদ কিদোয়াঈ ও শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালীবালকে গবন্মেণ্ট ছয় মাসের কম আগে জেল থেকে খালাস দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদিকে বিপজ্জনক লোক ব'লে সরকার গ্রেপ্তার করেছেন। অন্য অনেক কংগ্রেস কর্মীকেও গ্রেপ্তার করেছেন। অথচ তাঁরা কেবল কংগ্রেস-উপদিষ্ট আত্মরক্ষা (self-protection) ও আত্মসম্পূর্ণতার (self-sufficiencyর) কাজই করছিলেন। গবন্মেণ্টের মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়াটা কি যুক্তপ্রদেশের গবন্মেণ্টের মতে রাজদ্রোহের সামিল?

—

পল্লী-উন্নয়ন ও আগামী সঙ্কট

সম্প্রতি কলিকাতায় চিনির দর কুড়ি টাকা মণ হইয়া গিয়াছিল ও সে দরেও চিনি পাওয়া যায় নাই। আটা ও লবণ মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। পোড়া কয়লা আবার এক টাকা আট আনা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে (৬ই জুন, ১৯৪২)। কাপড়ের দাম এখন (৬ই জুন, ১৯৪২) যত চড়িয়াছে যুদ্ধঘোষণার পর কখনও তত হয় নাই অথচ তুলার দাম আরও পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল অসুবিধার কতকটা যুদ্ধকালে অনিবার্য্য ও অনেক অংশ সরকারের অব্যবস্থার জন্য হইয়াছে। এখন বলিয়া নহে, কোনও কালে সরকারকে যুক্তিপ্রদর্শনে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, সরকারের অর্থনীতি যদি সঙ্গতভাবে পরিচালিত হয় তাহা হইলে ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে; পরন্তু যদি পরাধীন ভারতকে অযথা শোষণ করা হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও ইংরেজের নৈতিক অধঃপতন ও শক্তিহ্রাস অবশ্যম্ভাবী। এক পাটের ভিতর দিয়া বাংলাকে কি ভাবে শোষণ করা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি। রক্ষাশুল্কের সুযোগ লইয়া ইংরেজের যে-সকল শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানকার যৎসামান্য মজুরীতে অত্যধিক লাভ করিতেছে, তাহারও কয়েকটির কথা আমরা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় দেখাইয়াছি। ঐতিহাসিকরা দেখাইয়াছেন, ক্রীতদাসপ্রথা প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এখানকার পাটচাষী, কলের মজুর, অফিসের কেরাণী কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা পায় তাহাতে

তাহাদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রীতদাসদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। ভারতীয়দিগের কয়লার খনিতে মালগাড়ী দিবার বিষয়ে যে অন্যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পরে সংঘটিত হইয়াছিল, কুড়ি বৎসর পরে এবারও তাহা হইতেছে। আমরা কি তাহা নিবারণ করিতে পারিলাম? অনেক স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞের মতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টই ভারতের প্রতি সুবিচার করিবার ইংরেজের পক্ষে শেষ আন্তরিক চেষ্টা। অর্থনীতির নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে গত পঞ্চাশ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে আমরা কি পাইয়াছি? এক ব্যয়বহুল শাসনপ্রণালী নহে কি? এই খরচ যোগাইতে প্রজার প্রাণান্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত শ্রেণী সিভিল সার্ভিস বা রেলওয়ের উচ্চ বিভাগে কয়েকটা বেশী পদ পাইয়াছি বটে, বড় বড় ব্যবস্থা-পরিষদের জাঁকজমক দেখিয়া তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জনে আমাদের উৎসাহ নিঃশেষ করিয়াছি; কিন্তু যে অবিচারের জন্য দেশের কোটি কোটি সাধারণ লোক কখনও মাথা তুলিতে পারিল না, তাহা নিবারণের কোনও শক্তি আমরা পাইয়াছি কি? চল্লিশ বৎসরের চেষ্টায় 'অসভ্য জাপান' রুশকে পরাভূত করিয়াছিল। বহির্ম্মুখ আন্দোলন কম করিয়া আমরা এত দিনে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারিতাম নাকি? সমগ্র ভারতের উপর দৃষ্টি ধীরে ধীরে ছড়াইয়া দিলে উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা কোথায় দেখিতে পাইতেছি? আধুনিক শ্রমশিল্পে বোম্বাইওয়ালারা ভারতের অগ্রণী। কিন্তু বোম্বাই শহর ছাড়িলেই গ্রামবাসীর দারিদ্র্যের মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য চক্ষুর সমক্ষে প্রতিভাত হয়। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধার নিকটে আমরা দেখিয়াছি এক মাইল দুই মাইল অন্তর কোনও বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাটীর সংলগ্ন কূপের চারি পার্শ্বে কৃষক কত কষ্টে জল তুলিয়া তরকারির চাষ করিতেছে। ধনীরা যদি অধিক সংখ্যায় গ্রামে বাস করিতেন, তাহা হইলে এই সকল কূপের সংখ্যাও অধিক হইত। এই দরিদ্র দেশে অন্নবস্ত্রের কষ্টের ও স্বাস্থ্যহীনতার হ্রাস করিতে না পারিলে অপর কোনও উন্নতির চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইতে বাধ্য। "গঠনমূলক কার্য্য" কথাগুলি শ্রুত হইবার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারীকে এবং বীরভূম জেলার একটা গ্রামাঞ্চলকে উন্নত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীরবে গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহার তুলনা ভারতবর্ষে কম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পানিহাটী গ্রামে তিন মাসে সাড়ে চারি শত লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরবৎসর ঐ স্থানে গোপালবাবুর উদ্যমে প্রথম ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠিত হয়। আজ বাংলার প্রায় পাঁচ হাজার গ্রামে অনুরূপ সমিতি স্থাপিত হইয়া বহু গ্রামকে ম্যালেরিয়াশূন্য করিয়াছে। তিনি নিজে তাঁহার ছয়খানি বাগানে তরিতরকারির চাষ করেন। তাঁহার গোশালায় প্রত্যহ ছয় মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। তাঁহার ক্ষেতে যে ডাল চাষ হয় তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা স্বহস্তে তাহা জাঁতায় ভাঙেন। মহাত্মা গান্ধী নিখিল-ভারত কাটুনি সঙ্ঘের দ্বারা গ্রাম-উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা আরও পূর্ব্ব হইতে আরও ব্যাপক ভাবে আরও বিভিন্ন দিক্ দিয়া হওয়া উচিত ছিল।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশ, জাপানীরা আসামের নিকট ভারত-সীমানার কুড়ি মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আসাম ও বঙ্গদেশ যে আক্রান্ত হইবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না। এখনও যদি আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি গ্রামে উৎপন্ন না করি ও গ্রামগুলিকে বাসযোগ্য করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করি তাহা হইলে আগামী সঙ্কটে বঙ্গদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। সুখের বিষয়, অনেক গ্রামে কিছু কিছু কাজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামে এক উকিল ভদ্রলোক গমের চাষে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে আক, সরিষা ও কাপাসের চাষ বাড়াইতে হইবে। কৃষির উপযুক্ত অনেক জমি পতিত রহিয়াছে। এগুলিতে চাষ করিতে হইবে। সরকারের নিকট কোনও সাহায্যের আশা না করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে হইবে। বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে নৌকাভাবে তিন টাকা মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে; সেইরূপ চাউলের দর কলিকাতায় ছয় টাকা বার আনা। সরকার সমস্ত নৌকা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন আর সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা কলিকাতায় বসিয়া তারস্বরে বলিতেছেন, "অধিক খাদ্য উৎপন্ন কর।" চাষী যে চাষ করিয়াছে তাহাতেই যদি মার খায়, তাহা হইলে সে কোন্ উৎসাহে অধিক চাষ করিবে? সরকারের দিকে চাহিয়া আমরা বহু সময় নষ্ট করিয়াছি। আসন্ন বিপদের সময়ে আর কেন?

৬ই জুন, ১৯৪২। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

দরিদ্রের কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুলতা কর, এম-এ

কতদিন কতজনের কাছেই না শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ ধনীর কবি, দরিদ্রের তিনি কেহই নন্‌। বর্ত্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজের পীড়নে দরিদ্রের বুকে যে ব্যথা ঘনিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে রূপ দিতে পারেন নি। সাম্যবাদী রাশিয়া যেমন সর্ব্বহারা কাব্যের সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্রকাব্যে তাহা নেই।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁদের সত্যকারের পরিচয় আছে, যাঁরা এই অপূর্ব্ব কাব্যকে যথার্থ ভাবে অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন এ অভিযোগ কতদূর ভ্রান্ত।

দরিদ্রের কথা, ব্যথিতের ব্যথা কত ভাবে কত রূপেই না বিশ্বকবির কাব্যসুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে যায় সেই দরিদ্র উপেনের কথা, পৃথিবীতে যার সম্বল ছিল মাত্র "দুই বিঘা ভূঁই", আর সব জমি তার ঋণে বিক্রী হয়ে গেছল। অবশেষে বাবুর বাগানের সৌষ্ঠব বাড়ানোর জন্য তার সেই সামান্য জমিটুকুরও প্রয়োজন হ'ল। অসৎ উপায়ে। বাবু দরিদ্র উপেনের জমিটুকু গ্রাস করলেন।

করিল ডিক্রী, সকলি বিক্রী মিথ্যা দেনার খতে।

তখন কবি দরিদ্র উপেনের মুখ দিয়ে যে-উক্তি বার করেছেন তা জগতের সকল ধনীর বিরুদ্ধে সকল দরিদ্রের চির-অভিযোগের বাণী।

এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

তারপর মনে পড়ে সেই পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার কথা। যার পরিচয় হ'ল—

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর
যা কিছু হারায়, গিন্নী বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর।"

কর্ত্তাও এই ভৃত্যের উপর কম বিরক্ত নন্‌, কিন্তু কি করবেন তাকে ত্যাগ করা যায় না।

এক বৎসর বাবু তীর্থযাত্রা করলেন, কেষ্টা তাঁর সাথী হ'ল। তারপর দূর প্রবাসে যখন তিনি দুরন্ত বসন্ত রোগের তাড়নায় মৃতপ্রায়, যখন বন্ধুবান্ধব—

বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।

তখন সেই দুঃখের দিনে দরিদ্র কেষ্টা তাঁকে এক নতুনরূপে দেখা দিল।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন।"

সেদিন দরিদ্র ভৃত্য ও ধনী প্রভুর মধ্যে আর কোন ব্যবধান রইল না। তখন সে বন্ধু, আত্মীয়ের চেয়েও পরমাত্মীয় হয়ে উঠল।

বাংলা-দেশের নানা আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কবি কত শত লুকানো বেদনার সন্ধান পেয়েছেন। স্নানযাত্রার মেলার হর্ষ-হিল্লোলের মাঝে কবির চোখ পড়েছে সেই দুঃখী বালকটির দিকে যে—

ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি.
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষ হারা
নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

শারদ লক্ষ্মীর মধুর আগমনের সঙ্গে যখন সারা বাংলায় দুর্গোৎসবের সমারোহ জেগে উঠেছে, তখন সেই আনন্দোৎসবের মাঝখানে কবি দেখতে পেয়েছেন কাঙালিনী মেয়েকে।

হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।

এই কাঙালিনী মেয়ে জন্মাবধি মা-হারা। আজ সে সকলের কাছে শুনছে যে "মা এসেছে ঘরে"। তাই সে "মা কেমন দেখতে এসেছে।"

কিন্তু বিশ্বজননীকে দেখে তার আশ মিটল না। তার বালিকা-হৃদয় থেকে অভিমানক্ষুব্ধ উক্তি বেরিয়ে এল—

বলে, 'মাগো এ কেমন ধারা?
এতো বাঁশী এত হাসিরাশি,
এতো তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন।'

সবশেষে কবি বলেছেন—

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,

দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

শুধু কবিতার মধ্য দিয়া নয়, কতশত গল্পের মধ্য দিয়া কত শত গানের মধ্য দিয়া কবি তাঁর এই ব্যথাকাতর দরদী হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

দরিদ্র কাবুলিওয়ালা যে প্রতিদিন পথে পথে ফিরি ক'রে বেড়ায় তার মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন এক স্নেহবুভুক্ষু পিতৃহৃদয়। কবি দেখালেন যে স্নেহের ক্ষেত্রে দরিদ্র পিতা ও ধনী পিতার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই।

'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে দরিদ্রা বালিকা রতন দুঃখের দিনে পোষ্টমাষ্টারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল স্নেহব্যাকুলা ভগিনী-রূপে তাঁর রোগশয্যাকে সে তার স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে মধুর করে তুলল। কবি পোষ্টমাষ্টারের চোখ দিয়ে দর্শককে দেখালেন যে দরিদ্রা দাসীর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে জননী ও ভগিনীর স্নেহ।

তার পর গানের কথা। গীতাঞ্জলীর কত শত গানের মধ্য হতেই না কবির ব্যথাকাতর হৃদয়ের সুর বেজে উঠেছে। বাংলা দেশের হতভাগ্য অস্পৃশ্যদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা লক্ষ্য ক'রে কাতর কবি গেয়েছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হ'বে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

উদারপ্রাণ বিশ্বকবি ভারতের জাতীয় গান গাইতে গিয়েও আহ্বান করেছেন ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে।

তিনি বলেছেন—

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান-ভার।

দরিদ্র চাষী, অভাগা দিনমজুর, এদেরও দুঃখব্যথা কবির চক্ষু অতিক্রম করে যায় নি। সমাজের মুকুটমণি ব্রাহ্মণকে আহ্বান ক'রে কবি বলেছেন—"বেরিয়ে এস, তোমার ঠাকুর মন্দিরে নাই, তিনি নেমে এসেছেন চাষী মজুরের নিত্যশ্রমের মাঝখানে।"

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে'।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
*   *   *
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করচে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ,
খাটচে বারো মাস।
রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয়রে ধূলার পরে।"

এমন কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবান খুঁজে পেয়েছেন এইসব বঞ্চিত অভাগাদের মাঝখানে। বারবার ক'রে তিনি বলেছেন ভগবানকে পূজা করতে হ'লে এই সব-হারাদের পূজা করতে হবে।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

এই পৃথিবীতে কবি যে স্থান প্রার্থনা করেছেন তা হ'ল—

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে।

অসংখ্য গান, কবিতা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বকবির যে ব্যথাকাতর হৃদয়ের পরিচয় পাই তার মধ্যে কিন্তু বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর কাব্যে তিনি প্রচার করেন নি সাম্যবাদীদের সম-অধিকারের কথা কিংবা দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখে অভিভূত হয়ে রচনা করতে বসেন নি শোকগাথা। অর্থাৎ বাহিরের দিক দিয়ে তিনি সব-হারাদের সুখদুঃখের বিচার করেন নি। তিনি প্রবেশ করেছেন দরিদ্রের অন্তরলোকে দরদী বন্ধুরূপে। তাদের মধ্যে তিনি দেখেছেন সুখে দুঃখে স্পন্দিত মানব হৃদয়ের বিচিত্র রহস্য। তাদের অন্তরের সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য তিনি উন্মুক্ত করে ধরেছেন তাঁর কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। সবহারাদের অন্তরলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন এক বিরাট মানবহৃদয়, অনন্ত যার ঐশ্বর্য্য, বিপুল যার মহিমা, সুখে দুঃখে আঘাতে বেদনায় যাহা নিরন্তর স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ছে।

তাঁর কাব্যসুরে এই কথাই বার বার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে হৃদয়ের দানে ধনী ও দরিদ্রের কোন ভেদ নাই। রাজনীতিক ও সমাজনীতিকদের সঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এইখানেই। তাঁদের দৃষ্টি বাহিরের, কবির দৃষ্টি অন্তরের।

সিঙ্গাপুরের একটি দৃশ্য

প্রাচ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান ও সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্বের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এক দিকে এবং অন্য দিকে জার্ম্মানী ও ইটালীর মধ্যে শত্রুতায়। তাহার পর অন্য নানা জাতির দুই পক্ষে যোগ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ইংলণ্ড প্রায় একেলা এবং অন্য দিকে জার্ম্মানী ও ইটালী। এই সময়, ফ্রান্সের পতনের পর বেশ কিছু দিন ইংলণ্ড অতি দুরূহ অবস্থার ভিতর দিয়া চলে। দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ হয় জার্ম্মানী অতর্কিত ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে। ইহার ফলে ইংলণ্ড হাঁফ ছাড়িবার ও বলগঠনের সময় পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতম শত্রুর বিষম বলক্ষয়ের দরুন যুদ্ধজয়ের ক্ষীণ আলোকের আভাস পায়। রুশ জাতীয় দলের উপর দিয়া এই মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতম ঝড় যখন প্রায় ছয় মাস বহিয়াছে, তখন সোভিয়েটের পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই সকলের —এমন কি তাহার মিত্রপক্ষের বিশেষজ্ঞদিগেরও—ধারণা হয়। সেই ধারণার বশে জাপান মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তিপুঞ্জের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্ব্বের আরম্ভ। আরম্ভের মুখে জাপানের আক্রমণের যেরূপ প্রসার এবং প্রচণ্ড গতি দেখা যায় তাহাতে পাশ্চাত্য রণবিশারদগণের প্রায় সকল অভিমত ও যুক্তির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়।

পাশ্চাত্য যুদ্ধবিশারদগণের মতে হাওয়াই ও মানিলার মার্কিন যুদ্ধপোতশ্রেণী এবং হংকঙে এ ইংলণ্ডের দুর্গমালা ও পোতাশ্রয় জাপানের দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালনার পথে দুস্তর বাধা ছিল। জাপান প্রথম অতর্কিত আঘাতেই পার্ল হারবারের মার্কিন নৌবহরকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাহার পরই একসঙ্গে ফিলিপাইনের মার্কিন ঘাঁটি ও হংকঙের ব্রিটিশ দুর্গমালা আক্রমণ করে। এই আক্রমণ একাধারে অতর্কিত এবং অতি প্রবল বল-প্রয়োগ সহকারেই হয়। পার্ল হারবারের আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিন নৌবহরকে ক্ষীণবল ও কার্য্যে অক্ষম করিয়া দেওয়া এবং জাপানের এই উদ্দেশ্য কিছু কালের মত সফল হয়।

হংকঙের ব্রিটিশ পোতাশ্রয় ও দুর্গমালা সিঙ্গাপুরের

বিরাট্ নৌঘাঁটি ও দুর্গ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু গত বৎসরের মধ্যভাগে সেখানে কানেডিয়ান এবং ভারতীয় সেনা প্রেরণ করিয়া এবং নানা প্রকার অস্ত্রসম্ভার পাঠাইয়া তাহার স্থিতি দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা হয়। সে-সকল কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই হংকঙ জাপানী সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অতি অল্পকাল-ব্যাপী অবরোধের পরই প্রবল যুদ্ধের ফলে বিজিত হয়। হংকঙের পরে মালয় উপদ্বীপে জাপানী অভিযান ক্রমেই তীব্রতর রূপ ধারণ করে এবং এখানেও অল্প দিন যুদ্ধের পর সিঙ্গাপুর অবরুদ্ধ, সম্মুখ সমরে আক্রান্ত এবং বিজিত হয়। তাহার পর জাপানের সেনানায়কগণ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া প্রথমে ব্রিটিশ তাহার পর চীনা ও ব্রিটিশ দুই সেনাদলকেই হটাইয়া প্রথমে দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশ এবং রেঙ্গুনের পতনের পর উত্তর-ব্রহ্মদেশ এবং উত্তর-পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশ এবং চীনসীমান্ত অঞ্চলও অধিকার করিয়া বসে।

চীনকে 'গান-বোট' উপহার-দান উৎসব।
এডমিরাল চেন শাও-কোয়ান, লেফটন্যান্ট-কর্নেল জে. এম্ ম্যাকহিউ এবং ব্রিগেডিয়ার গর্ডন ই. গ্রিমডেল

অন্য দিকে দ্বীপময় ভারতের দ্বীপমালাও জাপানের হস্তগত হয় এবং ফিলিপাইন-রক্ষক মার্কিন ও ফিলিপিনো সৈন্যগণও পাঁচ মাস ধরিয়া অসীম শৌর্য্যের সহিত লড়িবার পর পরাস্ত হয়। তাহার পর জাপানের সমস্ত সামরিক শক্তি এখন চীন দেশের বিরুদ্ধে প্রযোজিত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই জাপান দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত-মহাসাগরের পূর্ব্বাঞ্চল অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অধিকার করে। মধ্যে এরূপ সময়ও দেখা গিয়াছিল যখন অনেক বিশেষজ্ঞের মতেও এরূপ ধারণা হয় যে, জাপানের অগ্রগতি আরও বহুদূর প্রসারিত হইবে। সম্প্রতি প্রবাল সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মিড্‌ওয়ে দ্বীপের নিকটে যে দুইটি নৌযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, এত দিনে জাপানের অভিযানের মুখে প্রবল বাধা-দানের শক্তি যুক্ত জাতীয় দলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

জাপানের এইরূপ অদ্ভুত অগ্রগতির নানা প্রকার কারণ দেখান হইয়াছে এবং পরেও হইবে। তাহার মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপাদান এখনও সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় নাই। সুতরাং এই আশ্চর্য্য বিজয়-অভিযানের মূলে কতটা এক পক্ষের অবহেলা এবং বুদ্ধিবিভ্রাট এবং অন্য পক্ষের কতটা সমরকৌশল এবং যুদ্ধক্ষমতা আছে তাহার বিচার করা বৃথা। সিঙ্গাপুর স্থলপথে ও আকাশপথে অতি প্রচণ্ড ভাবে আক্রান্ত হইতে পারে, একথা আগে কেহ বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখে নাই এবং রেঙ্গুন শত্রুহস্তগত হইলে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধসম্ভার ও সৈন্যপ্রেরণের কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও কেহ বিচার করে নাই। এইরূপ নানা কথা এখন প্রকাশিত হইতেছে।

আসলে জাপানী বায়ুযুদ্ধাস্ত্র এবং বায়ুযানবাহী যুদ্ধপোত প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত-মহাসাগরের নৌবলের স্থিতির বিষম প্রভেদ ঘটাইয়াছে। জাপানের স্থল ও নৌবাহিনী-দ্বয়ের বায়ুসেনানীগণের কার্য্যক্ষমতা ও ক্ষিপ্রকারিতা যুক্ত-জাতীয় দলের অজ্ঞাত ছিল। এখন তাহাদের বিক্রমের বিষম পরিচয় পাইবার পর পূর্ব্বকৃত অবহেলার প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছে। প্রবাল সাগর ও মিড্‌ওয়ে দ্বীপের যুদ্ধের বিবরণ সম্যক্ ভাবে প্রকাশিত হইলে বোধ হয় দেখা যাইবে যে এত দিনে যুক্তজাতীয় দল বায়ুযুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ুযুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করার ফলেই জাপানী নৌবল এই দুই স্থানে সফল হইতে পারে নাই। এইরূপে এশিয়ার অন্যান্য রণাঙ্গনেও বায়ুবলের বৈষম্যের প্রতিকার হইলে পরেই জাপানের শক্তি পরীক্ষা যথাযথ ভাবে হইবে। নহিলে

পূর্ব্বাবস্থাই চলিবে, কেননা জাপান কোনও শক্তির পূর্ব্বকীর্ত্তি বা নামযশের ভয়ে বিচলিত হইবে না তাহার প্রমাণ যথেষ্টই দেখা গিয়াছে। তবে সম্প্রতি যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এত দিনে প্রতিকারের চেষ্টা পূর্ণ উদ্যমেই হইতেছে।

* * * *

রুশ-রণক্ষেত্রে অতি বিচিত্রভাবে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন চলিতেছে। কখনও সোভিয়েট দল প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগে দূরদূরান্ত বিস্তারিত শত্রুব্যূহের এক অংশ বিধ্বস্ত করিতেছে, কখনও বা জার্ম্মান ও তাহাদের সহকারী দল অতি প্রবল আক্রমণে রণক্ষেত্রের অন্য এক অংশ অধিকার করিতেছে। বসন্তকালীন বিরাট্ অভিযানের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও অক্ষশক্তির প্রচণ্ডতম আঘাত খণ্ড-যুদ্ধেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বোধ হয় মার্শাল টিমোসেঙ্কোর খারকভ অঞ্চলের অভিযান অন্য দিকে সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অক্ষশক্তির বসন্তকালীন অভিযানের সূচনায় অশেষ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিমান হইতে রেঙ্গুনের দৃশ্য

সোভিয়েটের সৈন্যবল এখনও পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে মনে হয়। যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ কি আছে বুঝা যায় না, কিন্তু জার্ম্মানগণ যেরূপে অতি অল্প প্রসারের রণক্ষেত্রের উপর আক্রমণ চালাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাহারা সমস্ত রণাঙ্গনে বা তাহার বিশেষ বিস্তৃত অংশের উপর সৈন্যবল বা অস্ত্রবলের প্রাধান্য অতি গুরু পরিমাপে স্থাপিত করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা সৈন্য ও অস্ত্র ক্ষিপ্র স্থানান্তর করার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া স্থলবিশেষে সোভিয়েট দলকে ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ইহাও হইতে পারে যে, এইরূপে "বড়ের চাল" চালিবার পর যখন সোভিয়েট দল অপেক্ষাকৃত হীন স্থিতিতে আসিবে তখনই অক্ষশক্তির সম্পূর্ণ রণবল প্রযুক্ত হইবে। ব্রিটিশ বায়ুশক্তির জার্ম্মানীর উপর শক্তিশালী অভিযানের পাল্টা জবাব না দেওয়ার কারণ স্বরূপে জার্ম্মানীতে বলা হইয়াছে যে রুশ-অভিযান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেদিক হইতে বায়ুযুদ্ধাস্ত্রের স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। ইহার অর্থ জার্ম্মানীর "হাওয়াই বহরে"র অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ রুশ-অভিযানের জন্য রাখা হইয়াছে। অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রেরও বোধ হয় ঐরূপই ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাৎ অক্ষশক্তিপুঞ্জ সোভিয়েট রণক্ষেত্রে প্রলয়কারী দাবানল জ্বালাইবার সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছে, এখন সুযোগের প্রতীক্ষাই চলিতেছে।

সোভিয়েটবাহিনী বিগত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যে নিদারুণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রবলতম সমরসংঘাত সহ্য করিয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন নাই। উহা অপেক্ষা বহু ক্ষীণ আক্রমণে ফ্রান্স, হলাণ্ড ও বেলজিয়ামের পূর্ণ সৈন্যবল এবং ব্রিটেনের দেশান্তরী সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখন অবস্থা অন্য রূপ যদিও সোভিয়েট বিষম ক্ষতিগ্রস্ত। জার্ম্মানীও এখন গত বৎসরের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন নহে এবং রুশদলের শীত অভিযান চালনার ফলে তাহার সৈন্যদলের বিশিষ্ট অংশ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং রণক্লিষ্ট হইয়া আছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যদি পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রবল বা প্রবলতর ঝঞ্ঝাবাত সোভিয়েট সমরাঙ্গনে বহিয়া যায়, তবে রুশসেনার পৌরুষ এবং তাহাদের উচ্চতম পরিচালকগণের অটুট সংকল্প তাহাতে ভাঙিয়া পড়িবে না। বিপদের সম্ভাবনা আছে অস্ত্রের সরবরাহে। যদি ব্রিটেন ও আমেরিকা এদিকে সাহায্য দানে সক্ষম ও সচেষ্ট থাকে, তবে জার্ম্মানীর চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। অক্ষশক্তি এখন চেষ্টা করিতেছে ককেশসের দ্বার ভাঙিয়া মহামূল্য তৈলের আকরগুলি হস্তগত করিতে। কিন্তু সে পথ দুর্গম গিরিমালায় বেষ্টিত,

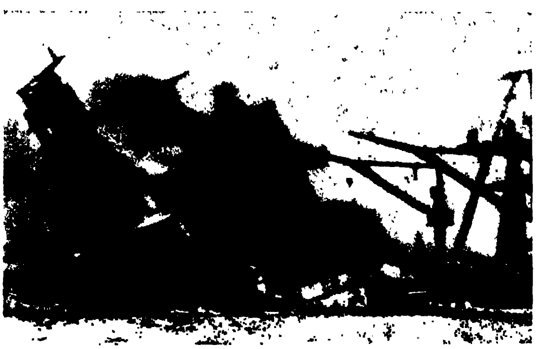

পার্ল হারবারে নিমজ্জিত মার্কিন রণপোত এরিজোনা

যেখানে যন্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা সৈন্যদলের সম্মুখযুদ্ধই অধিক কার্য্যকরী।

* * *

লিবিয়ায় যন্ত্রযুদ্ধ এখন চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখানে ভারতীয় সেনাদলের বীরত্বের কিছু সংবাদ আমাদের দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানকার পরিস্থিতির বিশেষ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে না। যন্ত্রযুদ্ধে এখনও অক্ষশক্তিদ্বয় আক্রমণ চালাইতেছে। এরূপ যন্ত্র-যুদ্ধাস্ত্রের আক্রমণ ও যন্ত্রশকটবাহিত সৈন্য পরিচালনায় যুদ্ধের পরিস্থিতির অতি দ্রুত পরিবর্ত্তন সম্ভব, সুতরাং দূর হইতে কোনও বিচার সম্ভব, নহে যতক্ষণ ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকে। শত শত বর্গমাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে কোনও পক্ষ দুই দশ মাইল অগ্রসর বা পশ্চাদ্‌পদ হইলেও তাহা হইতে যুদ্ধের ফলাফল বিচার সম্ভব নহে। এইমাত্র বলা চলে যে, এখন পর্য্যন্ত কোনও দিক অন্য পক্ষের উপর বিশেষ অধিকার লাভে সফল হয় নাই (১২-৬-৪২)। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। অন্য দিকে শাহারা মরু অঞ্চলের গ্রীষ্ম ঋতু অল্প দিন পরেই যুদ্ধের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবেই। সুতরাং এখানে উভয় পক্ষই যারপরনাই চেষ্টা করিবে যাহাতে শেষ মীমাংসা দ্রুত হয়।

জাপান এখন চীনদেশেই পূর্ণ অভিযান চালাইতেছে। শরৎকালের শেষ দিক পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে যুদ্ধচালনা অতি দুরূহ ব্যাপার। সেই অবসরে যদি স্বাধীন চীনকে সম্পূর্ণ পরাজিত না হউক অতি ক্ষীণবল করা যায়, তবে জাপানের প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের অভিযানের পথ বহুভাবে সরল হইয়া যায়। তিন দিক হইতে চীনদেশের উপর এরূপ ব্যাপক আক্রমণের কারণ ইহাই। এরূপ প্রবল আক্রমণ ইতিপূর্ব্বে হয় নাই এবং এখন চীনদেশে বাহির হইতে সহায়তা প্রেরণের পথও অতি সঙ্কীর্ণ। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের অবস্থা সুবিধাজনক নহে। চীনা সৈন্যের বীরত্বের বা তাহাদের রণনায়কগণের দৃঢ়চিত্ততার নূতন পরিচয় কিছুমাত্র প্রয়োজন নহে। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি অতি দুরূহ এবং তাহার প্রতিকারও অতি কঠিন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ইহাও সত্য যে প্রতিকারের পথ না আবিষ্কার করিতে পারিলে যুক্তজাতীয় দলের অবস্থার উন্নতির পথে সাংঘাতিক বাধা পড়িবার সম্ভাবনাও আছে।

ভারত ও ব্রহ্মদেশের পরিস্থিতি এখন সাধারণের নিকট প্রচ্ছন্ন। ব্রহ্মদেশে জাপানী দল যুদ্ধব্যবস্থায় ব্যস্ত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এখানেও তাহার "পাল্টা জবাব" দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

ডক্টর গ্রেডির মার্কিন মিশন স্বদেশে গিয়া এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহাও জানাইয়াছেন। এই মতামত ও প্রস্তাবগুলির একটি চুম্বক মাত্র এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা আছে সে সকলই যে-কোন ভারতীয় ঐ সকল বিষয়ে চর্চ্চা করেন তাঁহাদের জ্ঞাত ও সমর্থিত। তবে যে-সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্য এ দেশের কর্ণধারদিগের মতিভ্রমের সুযোগে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা তাহাদের নিকট ঐ মতামত বিশেষ অপ্রিয় হওয়াই সম্ভব।

রেবাউল পোতাশ্রয়

মানিলা নগরের এক পল্লী

ককেশস। টিফ্লিসের দৃশ্য

দারিয়াল গিরিসঙ্কট। ককেশস

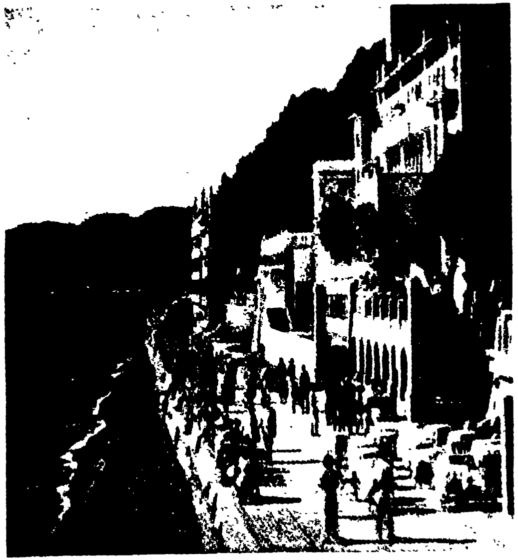

কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব উপকূলের একটি সাগর-স্নানের স্থান

কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সোচির দৃশ্য

ককেশস। স্বানেটা উপত্যকা

ইয়াংসী নদের প্রহরী স্বাধীন চীন-সেনা

বাথ নগরীর দৃশ্য। এখানে জার্ম্মান বায়ুবহর "পান্টা" আক্রমণ করিয়াছে

চুংকিঙে আন্তর্জাতিক মহিলা-দিবস, ত্রয়স্ত্রিংশৎ বার্ষিক উৎসব

উৎসবের সভানেত্রী মাদাম চিয়াং কাই-শেক

একটি বালিকা বক্তৃতা দিতেছে

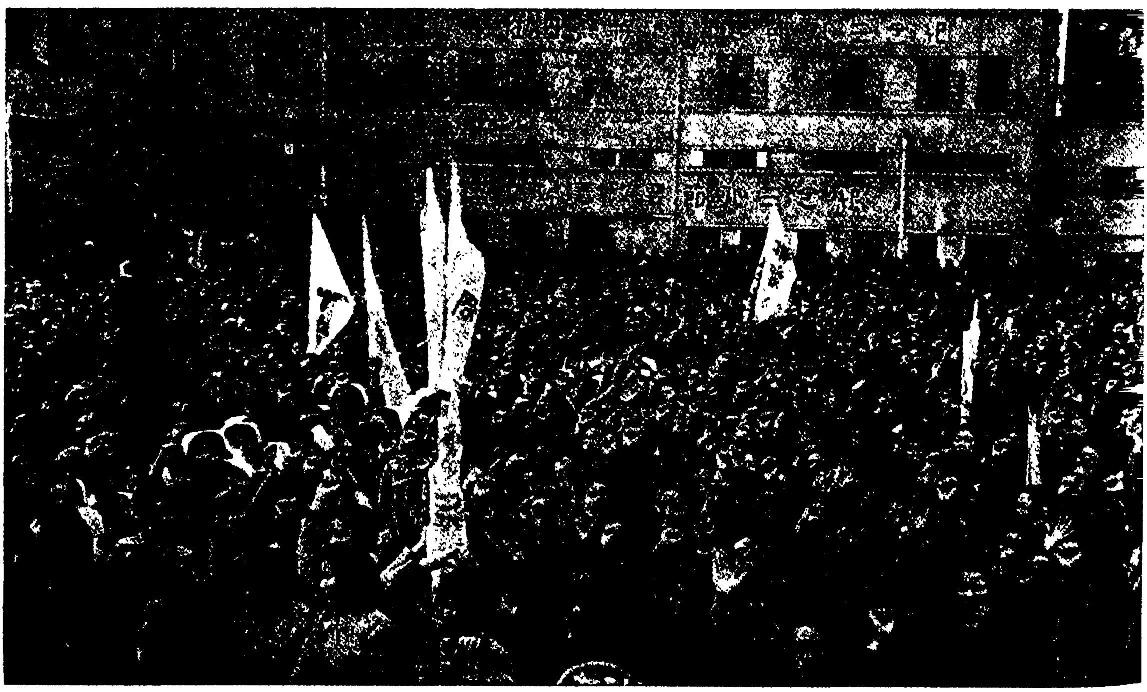

উৎসবে সমবেত সহস্র সহস্র নারী মাদাম চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে

মহিলা-সংবাদ

কুমারী প্রীতি সেন এ বৎসর নিউদিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় 'মডার্ণ' এবং 'ক্লাসিকাল' উভয় সঙ্গীতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। পূর্ব্বেও তিনি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কাপ

কুমারী প্রীতি সেন

এবং স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। প্রীতি সেনের কনিষ্ঠা ভগিনী উক্ত অনুষ্ঠানে 'মডার্ণ' এবং 'ক্লাসিকাল' উভয় সঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পাটনা বি. এন্. কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চিন্ময়ী সেনগুপ্ত এ-বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ পরীক্ষায় ছাত্রীদের

শ্রীমতী চিন্ময়ী সেনগুপ্ত

মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী চিন্ময়ী প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

দিশারি*

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমার সাধন সাধায়ে বাঁধন কাটাও বন্ধু, মুক্তি ভায়,
তোমার কিরণে রজনী-জীবনে আনো
নবারুণ সরলতায়।
শিশুসম আজি তব আঁখি যাচি, সে-চাহনি বিনা
আশা কোথায়?
তব বরাভয় বিনা কোথা জয়?—তবু মাতি
বৃথা অহমিকায়!
এসো এসো কাছে অন্তরমাঝে শুনাও যে-বাঁশি
ডাকিছে—"আয়!"
কণ্টকবনে নিশীথ-মরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়॥

করি অপরাধ, দিনে আসে রাত, করকা
মর্ম্মকলি ঝরায়,
মুরলীর ব্যথা বাজে কানে সদা, প্রাণে তো তেমন
বাজে না হায়!
তুমি দিতে চাও, মন যে উধাও দিকে দিকে
মোহ-মুখরতায়,
তাই তব সুর লুকায় সুদূর অন্তরালের প্রহেলিকায়।
এসো এসো কাছে অন্তরমাঝে শুনাও যে-বাঁশি
ডাকিছে—"আয়!"
কণ্টকবনে নিশীথ-মরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়॥

জগতে ঘনায় করাল মায়ায় হিংসা-তুফান কৃষ্ণকায়,
পূজারিণী তারা মেঘে হয় হারা, শান্তির পথে
ভ্রান্তি ধায়।
হৃদয়ের আলো জ্বালো বঁধু জ্বালো হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রেমদিশায়,
তব ওঙ্কার দীপঝঙ্কার উঠুক মন্দ্রি' মূরছনায়।
এসো এসো কাছে অন্তরমাঝে শুনাও যে-বাঁশি
ডাকিছে—"আয়!"
কণ্টকবনে নিশীথ-মরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়॥

হে অপরাজেয়, তোমার পাথেয় বিনা কি পান্থ
পারানি পায়?
পুঞ্জ আঁধারে অকূল-পাথারে অচিন অশনি-শঙ্কী ছায়।
সুন্দর ধরা হোক কলস্বরা তব মন্দির-বন্দনায়,
ভুলি মোরা যত কাছে এসো তত অহেতু-
করুণা-মধুরিমায়।
এসো এসো কাছে অন্তরমাঝে শুনাও যে-বাঁশি
ডাকিছে—"আয়!"
কণ্টকবনে নিশীথ-মরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়॥

---

* ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার"—গানটির সুরে ও ছন্দে।

পুস্তক পরিচয়

নির্বাণ—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর লিখিত। এই বইখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিনের কথা তাঁহার সেবিকাদের মধ্যে এক জন ও অন্যান্য দুই-এক জন ভক্ত ইতিপূর্ব্বে লিখেছেন। এ বইখানি তার পুনরাবৃত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার ইতিহাসের অনেক কথা সাধারণে এখনও জানেন না, তার ভিতর কিছু কিছু তথ্য আমরা এই সুলিখিত বইখানিতে পাই। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর মাসে কবি যখন কালিম্পঙে পীড়িত হয়ে পড়েন, তখন দার্জ্জিলিঙের ডাক্তার অপারেশন করতে বলেন। আমরা জানতাম না যে তখন প্রতিমা দেবীই একলা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে অপারেশন বার ঘণ্টার মত স্থগিত রাখেন। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের "ভবিতব্য কখনও এইভাবে শেষ হতে পারে না, তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, তা এত সহজে নিঃশেষ হবার নয়।" ডাক্তার ভয় দেখিয়ে বাঙালী মেয়েকে তাঁর বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেন নি। প্রতিমা দেবী কলিকাতায় ফোন ক'রে ডাঃ জে. এন. মজুমদারের পরামর্শ মত হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সে রাত্রির সঙ্কট কাটিয়ে তুলতে পারেন।

রোগের ইতিহাস ছাড়া এ বইখানিতে কবির কয়েকটি সুন্দর ও অপ্রকাশিত চিঠি আছে। কবি বার বার বাড়ী বদল করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একখানি চিঠিতে তাঁর কল্পিত একটি বাসভবনের অপূর্ব্ব চিত্র দেখতে পাই। পরে এই চিঠিখানিই পুনশ্চ কাব্য গ্রন্থে "বাসা" নামে রূপান্তরিত হয়।

প্রতিমা দেবী ত্রিশ বৎসর রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নিকটে থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি গৃহী, কবি ও কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচয় যে এই দীর্ঘকালের ভিতর পেয়েছেন তা এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি পড়লেই বুঝা যায়। প্রতিমা দেবীর বাংলা রচনাভঙ্গী সুন্দর, মন ভক্তি ও স্নেহে অনুকূল। সুতরাং তাঁর নিকট আমরা একটি বৃহত্তর ও বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক দাবী করতে পারি। আশা করি তিনি আমাদের নিরাশ করবেন না।

শ্রীশান্তা দেবী

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের সাহিত্যের সহিত জীবনের সুসঙ্গতি নাই। সাহিত্য ও জীবন যাঁহাদের এক হইয়া গিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই কবি। কাব্য সম্পর্কে কবিদের ধারণা সাহিত্যে চিরকৌতূহলের বস্তু। মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ বা শেলীর কাব্যবিচার আমাদের মনে নূতন আলোর সন্ধান দেয়। ম্যাথু আর্ণল্ডের কাব্য ও কাব্যালোচনা অনেকের কাছে সমান আকর্ষণের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কাব্যবিচারক, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক। অভিজ্ঞতার নিরিখে সত্যকে পরীক্ষা করিয়া বিচারের দ্বারা তিনি সাহিত্য-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার সাহিত্যের ব্যাখ্যা শ্রেষ্ঠ সমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে। "পরিশিষ্ট" লইয়া 'সাহিত্যে' চৌদ্দটি প্রবন্ধ আছে :—সাহিত্যের তাৎপর্য্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্য্য-বোধ, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি. বাংলা জাতীয় সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কবিজীবনী, পত্রালাপ, সাহিত্য সম্মিলন ও সাহিত্য-পরিষৎ। প্রতি প্রবন্ধেই সাহিত্যের সহিত মানবমনের তত্ত্ব অপূর্ব্ব ভাষায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রতি প্রবন্ধে কবির উপলব্ধ এবং বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্রের মত মনকে সজাগ, সক্রিয় ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা" (সাহিত্যের সামগ্রী)। "সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।...বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে-আকার ধারণ করিতেছে, যে-সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র ও সেই গানই সাহিত্য" (সাহিত্যের তাৎপর্য্য)। "যেমনটি ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।...কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে" (সাহিত্যের বিচারক)। "মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে" (সাহিত্যের বিচারক)।

সৌন্দর্য্যবোধের মত জটিল তত্ত্বও সুষমাপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর গুণে সরল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। "পরিণামে সৌন্দর্য্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে।...কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী।" "বিশ্বসাহিত্যে" কবি বলিতেছেন, "গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব।" "সাহিত্যসৃষ্টি"তে তিনি বলিতেছেন, "সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।" 'বাংলা জাতীয় সাহিত্যে' তিনি বলিতেছেন. "নানা মানবমনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানব সাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না।" প্রবন্ধগুলি ১৩০১ হইতে ১৩১৫ সালের মধ্যে লেখা। এগুলিতে সাহিত্যবস্তুর ব্যাখ্যা ও আলোচনাই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে করিয়াছেন। পরবর্ত্তী রচনায় সাহিত্য-রূপের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

মডার্ণ কবিতা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ৮৫ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রঙীন প্রচ্ছদপট। দাম এক টাকা আট আনা।

মডার্ণ বলিতে আজকাল একটি বিশেষ ধরণ বুঝায়। এই বিশেষ ধরণ ও ভঙ্গী কাহারও মনে ভীতি, কাহারও মনে আনন্দ উৎপাদন করে। অতীত সম্পর্কে বর্ত্তমান—ভাল ও মন্দ দুই হইতে পারে। কাল প্রবহমান। এখনকারও নয় তখনকারও নয়—প্রগতি সর্ব্বকালের। সাম্প্রতিকতা যখন ফ্যাশনের পরিমাপক হয় তখন তাহার বিশেষ মূল্য থাকে না। 'মডার্ণ কবিতা' একখানি কবিতার বই। পুস্তকে সতেরটি কবিতা আছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন সাধারণতঃ অন্য ধরণের কবিতা লেখেন। এই পুস্তকে তিনি ইচ্ছা করিয়াই মডার্ণ ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, "বর্ত্তমান পরিবেশ সম্পর্কে কবির যে এটিটিউড বা ভাবধারণা, এ কবিতাগুলির উদ্ভব হয়েছে তারি থেকে।... আজকের দিনের এ ভাঙনের স্রোতে গতিবেগ আছে কিন্তু প্রাণবেগ নাই।" তৎসত্ত্বেও লেখক সহানুভূতির সহিত 'মডার্ণ' চিত্র আঁকিয়াছেন। মডার্ণের প্রতি লেখকের মমত্ব ও বেদনাবোধ দুইই আছে। গোড়ার কবিতাটি পুস্তকের পূর্ব্বাভাস—Heineএর একটি কবিতার অনুসরণে রচিত। 'মডার্ণ বয়' ও 'মডার্ণ গার্ল' অধুনিকের মানসিক ঔদাসীন্যের ছবি।

'জেলাসি'র গোড়ার লাইন দুটি এই—

"টাইগার হিলে সূর্য্য-উদয় দেখিতে দেখিতে আমার মনে
সোনালি রঙের ঢেউ খেলে গেল, জানিনাক কোন্ শুভক্ষণে।"

'প্যারাডাইস রিগেন্ড্'-এর শেষটি এইরূপ—

"আমার হারানো পৃথিবীতে ফের পড়ুক চাঁদের আলো,
ভরা জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া বেড়াক খুশীর বিহ্বলতা।"

'রোমান্সে' আছে, "সজল হাওয়ায় মেঘের মায়ায় ঘন হয়ে ওঠে দিন।"

'কনফেশনে' লেখক বলিতেছেন,

"আমার এ পানপাত্র একাধারে অমৃত গরল
ফেনায়ে উঠিছে নিত্য, সুখে দুঃখে মন্থর বাতাস,
ছায়া ভাসে, কান্না ভাসে, স্মৃতি মোর তরঙ্গ তরল,

ক্যালকেমিকো প্রসাধনী স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহায় !

মার্গো সোপ

সুগন্ধি টয়লেট্ সাবান। তনুদেহ বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও চিরসুন্দর ক'রে তোলে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল। চুল ঘন, কালো ও কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

লা

লাইম্ ক্রীম্ গ্লিসারীন্। অবাধ্য চুল সংযত করে

রেণুকা

নিমের সুগন্ধি টয়লেট্ পাউডার। সৌন্দর্য্যকে সমুজ্জ্বল ক'রে তোলে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এপারে নির্ম্মম ধরা, পরপারে রঙীন আকাশ।"

লীলাচঞ্চল ছন্দ 'মডার্ণ কবিতা'কে উপভোগ্য করিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মজা নদীর কথা—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

মজে-আসা নদীর মত একটা মুমূর্ষু জাতির ইতিহাস লইয়া উপন্যাস-খানি রচিত। সেই জাতি বাঙালী।

আজ মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন কেরাণীর-জীবন। আর সাধারণত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই জাতির মেরুদণ্ড বলিয়া বাঙালী জাতটাকেই মোটামুটি কেরাণীর জাত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লেখক এই কেরাণী-জীবনের আশা-নিরাশা বেদনা-ব্যর্থতা নিপুণ লিপি-কুশলতার সঙ্গে দেখাইয়াছেন। দিনানুদিন জাতীয় জীবনের একটা অংশ মৃত্যুর গড্ডলিকা-প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে—ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অশুচি আলোচনা, অবিচার আর হীন তোষামোদে নিয়তই সেই প্রবাহে বিষবাষ্প উঠিতেছে। যাহারা বহিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলেই গা ভাসাইয়া বহিয়া চলিয়াছে—কোথায় যে চলিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ নাই, বুঝিবা ইচ্ছাও নাই।

ওরই মধ্যে আবার দু একটি তরুণ চিত্তে প্রশ্ন জাগে, পরিণাম-চিন্তা আসে, বিদ্রোহ মাথা তোলে। উপন্যাসের নায়ক অমিয় এই শ্রেণীর মানুষ। অমিয়র এক পাশে আছে বিশ্বজিৎ, অপর দিকে আছে বীরেন। প্রাণের আনন্দ অভিযানে বিশ্বাসী বলিয়া বিশ্বজিৎ বাঁচিয়া গেল। বীরেনও এ-জীবনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল না, তবে সে আশ্রয় লইল মৃত্যুর।

গভীর দরদের সহিত কেরাণী-জীবনের সবটা দিক দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় খানিকটা উপলব্ধি করিয়াও লেখক তাঁহার চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন:—ব্যথায় নিরাশায় অথচ তাহারই মধ্যে এক ধরণের দার্শনিক আত্মসমর্পণে সব চরিত্রগুলি সজীব।

বইখানিতে তর্কের ঝাঁঝ বোধ হয় একটু বেশী, কিন্তু মনে হয় না-হইয়া উপায় ছিল না। বইখানি শুদ্ধ রসের পরিবেশনের জন্য নয়, একটা মহত্তর উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য যে ধারা অবলম্বন করা দরকার লেখককে তাহা করিতেই হইয়াছে! এক ধরণের পাঠক আছে যাহারা প্লটের মোড় বাছিয়া বাছিয়া শুধু পাতা উল্টাইয়া যায়। রামপদবাবুর এ বই তাহাদের জন্য নয়। একথা বলিয়া দেওয়াই দরকার।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানদাসরচিত যশোদার বাৎসল্যলীলা—শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, সম্পাদিত। বাণীসদন, কলিকাতা।

যশোদার নিকট হইতে আশানুরূপ নবনীত না পাইয়া মাতার প্রতি

কৃষ্ণের অভিমান, সেই প্রসঙ্গে তাঁহার গৃহত্যাগ ও পাষাণমূর্ত্তিধারণ এবং শ্রীদাম সুদাম কর্তৃক অভিমানমোচন—ইহাই আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত অপরিচিতপূর্ব পালার বর্ণনীয় বিষয়। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত কুড়িটি পদ ইহাতে আছে। ভণিতার মূল্য যাহাই হউক না কেন এবং এই জ্ঞানদাস খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসই হউন বা অখ্যাতনামা অর্বাচীন কোন কবিই হউন, পদগুলি আবেগময় ও রসপূর্ণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। অন্য পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইতে পারিলে হয়ত ইহাদের সমাধান সম্ভবপর হইত। পদ-গুলির মধ্যে যে সমস্ত অপ্রচলিত শব্দ আছে তাহাদের কতকগুলির অর্থ গ্রন্থশেষে দেওয়া হইয়াছে। অর্থ সর্বত্র সংশয়মুক্ত নহে। পঞ্চম পদের 'সাজ' শব্দের যে অর্থ সম্পাদক করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উহার প্রকৃত অর্থ 'সদ্যঃ বা টাট্‌কা'। সমস্ত অপ্রচলিত শব্দের একটি সূচী গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করিলে ভাল হইত। তৎসম শব্দগুলির বানান গ্রন্থকার শুদ্ধ করিয়া দিলেও কয়েকটি অশুদ্ধি গ্রন্থমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। ষোড়শ পদে 'শ্রীরামের কাঁধে' স্থলে 'শ্রীদামের কাঁধে' ও বিংশ পদে 'কি গুণে কয়্যাছ যশ' স্থলে 'কি গুণে কর‍্যাছ বশ' পাঠ সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বোমা ও ব্যারিকেড—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

জগতের কোন-না-কোন স্থানে গত কয়েক বৎসর যাবৎই যুদ্ধ চলিয়াছে। গ্রন্থকার আবিসিনিয়া ও চীন যুদ্ধ (যাহা এখনও শেষ হয় নাই) সম্বন্ধে গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সেদিনকার স্পেন-বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া লেখা। স্পেনের সমাজতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সমর্থক বহু বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক ও সাংবাদিক ঐ সময় স্পেনে যায় ও নানাভাবে স্পেনকে সাহায্য করে। এমন কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক ও সাংবাদিক লেখকের এই যুদ্ধ-উপন্যাসে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতীয় সুব্রত, রুশ তাতিয়ানা, স্পেনিশ পোর্সিয়া প্রভৃতির চরিত্র বেশ পরিস্ফুট। সুব্রত ও পোর্সিয়া প্রীতি-বন্ধনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল ও একখানা আশ্রিতবাহী জাহাজে উভয়ে স্পেন ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু যে নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উঠিতে হয় সেই নৌকা হইতে পোর্সিয়া স্বদেশীয়দের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করিয়া তাহা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুব্রত হতভম্বের মত তাকাইয়া রহিল। পোর্সিয়ার স্বদেশপ্রেম প্রশংসার্হ বটে, কিন্তু কাহিনীর এরূপ নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে যেন ইহার অনেকখানি হানি ঘটিয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সোনার কপাট—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। দাম চার আনা।

কামাক্ষীপ্রসাদের রোমাণ্টিক মন 'সোনার কপাটে'র স্বপ্নে বিভোর। আমরা সে সোনার কপাট রুদ্ধ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিলাম। অতি-আধুনিক কবিদের অনেকের বিদ্যা আছে, মাঝে মাঝে সুন্দর চরণ-বিন্যাসের ক্ষমতা আছে, কিন্তু রচনায় পারম্পর্য্য বা ভাবসঙ্গতি—এক অংশের সহিত অন্য অংশের যোগ—রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের মনে যদি বা ঐরূপ কিছু থাকে, লেখায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে না। আধুনিক কবিরা নাকি সৎসাহসী, তবে তাঁহারা মনের কথা খুলিয়া বলেন না কেন? বাস্তবতা, রিরংসা, রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা—কিছুতেই আমাদের আপত্তি নাই; শুধু গোঁজামিলে আপত্তি। রোমাণ্টিক ভঙ্গী আর বাস্তবতার অভিমান, এ স্বতোবিরোধিতা কেন? আলঙ্কারিক ভাষায়, এই 'অনৌচিত্য' কেন? আর, "ইন্দ্র তার বজ্রচালক (আমরা আরো চালাক)", "হাসিকান্নায় নিজেকে রান্না ক'রে সুস্বাদু করা"—এই সব অর্থহীন অনুপ্রাসের ঝোঁক রসসৃষ্টির সহায় নয়। কামাক্ষীপ্রসাদ মনেপ্রাণে স্বপ্নবিলাসী, কিন্তু নানা জনের নানা ভাব ও ভঙ্গী তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া দিতেছে। নিজের পথ খুঁজিয়া পাইলেই তিনি সকলকে তৃপ্তি দিতে পারিবেন।

গোধূলিরাগ—শ্রীতারাপদ রাহা। কথা-ভবন, ২৭।২।৩ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ক্ষুদ্র উপন্যাস। রচনাভঙ্গী সুন্দর। বৃদ্ধ কুমারেশ ধনী, নাতি ও নাতনী লইয়া তাঁহার সংসার। পৌত্র সোমেশ শকুন্তলাকে বিবাহ করিবে আশ্বাস দিয়া সহসা বিলাতে চলিয়া গেল এবং অন্য মেয়েকে বিবাহ করিল। কুমারেশ বেদনা বোধ করিলেন। শকুন্তলা মাঝে মাঝে আসিয়া বৃদ্ধের সেবাযত্ন করিত। এমনি করিয়া জীবনের অন্তসন্ধ্যায় কুমারেশের মনে একটি মধুর স্বপ্ন ঘনাইয়া আসিল,—এ কি প্রেম? মানব-মনের জটিল গ্রন্থি কে মোচন করিবে?........সোমেশ আসিতেছে শুনিয়া শকুন্তলা চলিয়া গেল। তাহারই জন্য প্রতীক্ষারত কুমারেশের মৃত্যুতে উপন্যাসের অবসান।

উড়কি ধানের মুড়কি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। কবিতা-ভবন। ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। দাম চার আনা।

কয়েকটি ছোট কবিতার সমষ্টি। কবির অবসরের খেয়াল, যেন ফুরফুরে হালকা খই, কিন্তু তাহা উড়িয়া যায় নাই, মিষ্টরসে পাক করিয়া জমাইয়া কবি তাহা পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি ভারি সুন্দর। লেখক কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর হন নাই, কিন্তু তিনি নির্ভীক। "স্বর্গের নাম সুন্দরী, আর মাইনের নাম কার্ত্তিক"—বিবাহ ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত আমরা অহরহই মানিয়া চলিতেছি। 'গেরিলার গান' ও 'নিধিরামের নিবেদনে' বিদ্রূপের আড়ালে অনেক ভাবিবার কথা আছে। আমরা অনেকে আশা করি, সরকার আমাদের অস্ত্র দিবে, আর তাহা লইয়া আমরা শত্রু তাড়াইব। ইংরাজকে তাই বলি—"দিয়েছ তো যা চেয়েছি সব, হে আমার পরম বান্ধব। বাকী ছিল ভাই, রাইফেলটাই।" আমাদের বিশ্বাস অপরিসীম। 'পোড়ামাটি' ও 'পারিবারিক' উপভোগ্য। দেশে দেশে আজ ভাঙনের তাণ্ডব। কবির মনে তাই ব্যাকুল প্রশ্ন: "সকলেই যদি ভাঙনের তাণ্ডবে, স্বেচ্ছায় রত রবে, তবে, সৃজনের কাজ করবে কে আজ ভবে?"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর পরে ও পুনর্জন্মবাদ—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬২এ , বেনারস সিটী। মূল্য দুই টাকা।

এই লেখকের অপর গ্রন্থ 'ইহলোক ও পরলোক' আমরা ইতঃপূর্ব্বে (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭) সমালোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থও এই একই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব গ্রন্থে 'প্রেততত্ত্ব' সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে অনেকগুলি ভৌতিক ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে। প্রেততত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের মতের পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যেসব কাহিনী এই বইয়েতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি পড়িতে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক। ইহা বলার অর্থ এই নয়, যে, এগুলি উপন্যাসের মতই অলীক। তবে প্রমাণ সম্বন্ধে আদালতের একটা নিয়ম আছে যে, যে-সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহার সাক্ষ্যের প্রামাণ্য অত্যন্ত কম। প্রদত্ত বিবরণগুলির সাক্ষীদের সম্বন্ধেও অন্ততঃ দুই-এক জায়গায় এই কথা বলা চলে। ইহা দ্বারা আমরা বলিতে চাই না যে, বিবরণগুলি সব অবিশ্বাস্য।

লেখক প্রবীণ ব্যক্তি, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ নিতান্ত অবিশ্বাসীর পক্ষেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া দুষ্কর।

আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু তাহাকে ধ্বংস করে না, তাহার একটা অবস্থান্তর ঘটায় মাত্র,—ইহা বিশ্বাস করিলে মৃত্যুভয় কমিয়া আসিবে। ইহাও একটা কম লাভ নয়। জীবনকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি মাত্র মনে করা কোন কোন দার্শনিকের মতে উচ্চ আদর্শ। সেই জন্য আত্মার অমরত্বের কথা দর্শনও আলোচনা করিয়া থাকে। এই হিসাবে প্রেততত্ত্বকে দার্শনিক গবেষণার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়ায় লাভ বই লোকসান নাই।

অনেক পাঠকই এই বইখানা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বনযূথী—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৯৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

বয়সে তরুণ হইলেও সরোজরঞ্জন কবি হিসাবে সাময়িক পত্রিকা পাঠক-সমাজের নিকট অপরিচিত নহেন। 'বনযূথী' তাঁহার কবিতার প্রথম সংকলন-গ্রন্থ। বইখানি পড়ার পর প্রথমেই কবির ভাষার শুচিতা মনকে মুগ্ধ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কবিকুলের জন্য যে অতুলনীয় কাব্যৈশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহার উত্তরাধিকার অর্জন করা যেমন গৌরবের, তেমনি তাহা সাধনা-সাপেক্ষ। সরোজরঞ্জন সে সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দের হাত সুন্দর, শব্দচয়নে মাধুর্য আছে। 'সনেট'-গুলির রূপায়নে মিলের পর্যায় এবং 'অষ্টক' ও 'ষড়ক'-বিন্যাস নিখুঁৎ।

ভাবের দিক দিয়া কবিতাগুলি প্রকৃতি ও জীবন—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। জীবনসম্পর্কেও তাঁহার উদার প্রীতি এবং অফুরন্ত আশ্বাস কবিতাগুলিকে সরসতা দান করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁহার প্রীতির সম্পর্কটা বড়ই মধুর। কবি বনযূথীকে ভালবাসেন, কারণ—

তোমার মৃদু গন্ধখানি
আমার মনে দেয় যে আনি'
হারানো কোন্ দিনের বুকে লুকানো কোন্ আশা!
না-পাওয়া মোর কোন্ সে প্রিয়ার
পুলক-ভরা ভীরু হিয়ার
ছলনাহীন স্নিগ্ধ করুণ লাজুক ভালবাসা।

কিশোর প্রাণের অনুরূপ কল্পনা-সুন্দর অনুভূতিতে সমস্ত গ্রন্থখানি ওতপ্রোত হইয়া আছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীশুকদেব কথামৃত, প্রথম ভাগ—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ১৯সি, সিমলাই পাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার গুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশে আবির্ভূত প্রভুপাদ শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী মহোদয়ের উপদেশবাণীগুলি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, এই আদর্শ ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের প্রাণস্পর্শী উপদেশবাণীগুলি পাঠ করিয়া অনেকে উপকৃত হইবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

সপ্তলা—আশু মুখোপাধ্যায়। "প্রকাশ ক'রেছেন"—শ্রীসতীশ-কুমার মণ্ডল। ১২৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

'সপ্তলা' সাতটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নেহাৎ কাঁচা হাতের লেখা। ছোট গল্পের রচনা-কৌশল এখনও লেখকের আয়ত্ত হয় নাই। ভাষাও অধিকাংশ স্থলে খাপছাড়া ও অর্থহীন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'দেবতা' গল্পের আরম্ভ:—

"উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যই ঘুরে বেড়ানো এবং সেটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই—এইটিই এর বিশেষত্ব, যেমন সকল জিনিসেরই থাকে।"

এই জাতীয় বিশ্লেষণে গল্পগুলি পরিপূর্ণ। গল্প সাতটি পুস্তকাকারে প্রকাশের লোভ সংবরণ করিলেই লেখক ভাল করিতেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

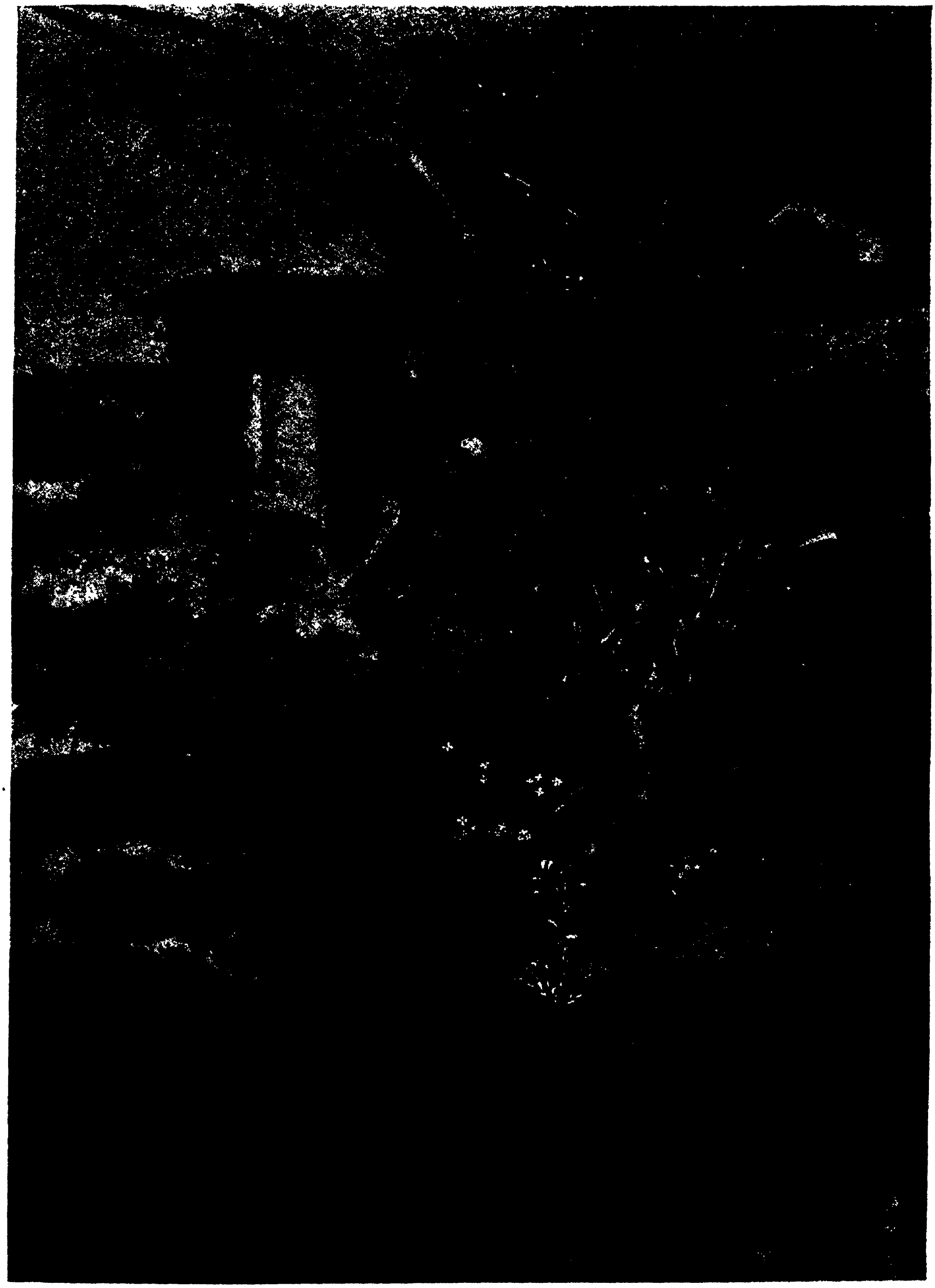

পুষ্প-চয়ন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৯

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের লোক-দেখান সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যসংখ্যা আরও বাড়ান হয়েছে। কিন্তু এতে ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলই সন্তুষ্ট হয় নাই—তথাকথিত মডারেটরাও নয়। সন্তুষ্ট না হবারই কথা। কারণ, সদস্যসংখ্যা যতই বাড়ুক, শাসন-পরিষদের ক্ষমতা আগেকার মতই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রইল। লণ্ডনস্থিত ভারতসচিব আগেকার মতই সর্বময় কর্তা—ডিক্টেটর বললেও চলে—রইলেন। তার নীচে ডিক্টেটর রইলেন বড়লাট। পরিষদের সব সদস্য যদি একমত হন, যা হবার সম্ভাবনা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব বা কম, তা হ'লেও বড়লাট ও ভারতসচিব সেই মত অনুসারে চলতে বাধ্য আগেও ছিলেন না, এখনও হলেন না।

তার পর দেখা যাচ্ছে, সমুদয় সদস্যপদগুলি ভারতীয়-দিগকে দেওয়া হ'ল না। কয়েক জন সদস্য ইংরেজই রইলেন। অধিকন্তু ভারত-প্রবাসী ইংরেজ বণিক্‌দলের একজন প্রতিনিধি বেন্থল সাহেবকে খুব একটা দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া হ'ল। তারা ত ভারতীয় কোন দল নয়, কেন তাদের একজনকে এত বড় কাজের ভার দেওয়া হ'ল? ডাঃ আম্বেড্‌করকে সদস্যপদ যদি দেওয়া হয়ে থাকে তিনি 'অস্পৃশ্য'দের একজন ব'লে, তার মানে বুঝি। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে "জাতীয় গবর্মেণ্ট" ("National Government") প্রতিষ্ঠার অজুহাতে একজন বিদেশী বণিক প্রতিনিধিকে শাসন-পরিষদে ঢুকালেন, তা নিছক ফাঁকি ও কামুফ্লাজ্—কেন না বেন্থল সাহেব ভারতীয় নেশ্যনের কেউ নন।

জাতীয় গবর্মেণ্ট গঠন করতে হ'লে শাসন-পরিষদের সব সদস্য ভারতীয় হওয়া ত চাই-ই, কিন্তু শুধু তা হলেই হবে না। ভারতীয় সদস্যরা ভারতীয়দের নির্বাচিত লোক হওয়া চাই, বড়লাটের বা ভারত-সচিবের মনোনীত হ'লে চলবে না। তার পর চাই এই ব্যবস্থা ও রীতি, যে, ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদের সমুদয় বা অধিকাংশ সদস্য যা স্থির করবেন, সেই নির্ধারণ অনুসারে রাষ্ট্রীয় কাজ চলবে।

এ রকম কিছুই করা হয় নাই। তা না ক'রেও ব্রিটেন আমেরিকার অনেক লোককে—আশা করি সবাইকে নয়—বুঝাতে পারবে যে, ভারতবর্ষকে জাতীয় গবর্মেণ্ট দেওয়া হয়েছে! কিন্তু ভারতবর্ষের কাউকে এ রকম ঠকান যায় নি, যাবেও না। ভারতবর্ষের কাউকেই যে ঠকান যায় নি, আপাততঃ ব্রিটেন তা গ্রাহ্য না করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় ও ভারতের বাইরের জাগতিক ঘটনা তাকে গ্রাহ্য করিয়ে ছাড়বে। ভারতের বাইরের জাগতিক ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা এখন ভারতীয়দের নাই, কিন্তু ভারতের মধ্যেকার ভারতীয় ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা যে আছে, মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস তা প্রমাণ করতে পারবে। প্রবল কোন দেশকে বা জাতিকে তর্কযুক্তি দ্বারা কাবু করা যায় না, তাকে কার্যতঃ আয়ত্তের মধ্যে আনবার একমাত্র উপায়

দুরতিক্রম্য ঘটনা, এবং সে-রকম ঘটনা সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে ঘটান যায়। অহিংস উপায়ে সে রকম কিছু ঘটাতে হ'লে নেতৃত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পিত হওয়া উচিত, ও হবে।

—

সামরিক দপ্তর ও যুদ্ধেতিহাস-পণ্ডিত সর্ ফিরোজ খাঁ নূন

ইংরেজরা এই ব'লে আমেরিকার লোকদের বোকা বোঝাবার চেষ্টা করবে যে, দেশরক্ষা অর্থাৎ সামরিক দপ্তরের ভার এক জন ভারতীয়ের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানকার খুব কম লোকই খুঁটিয়ে দেখবে যে, ঐ দপ্তরের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বিষয় তার ভিতর থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে অন্য কারো কারো হাতে দেওয়া হয়েছে যারা ইংরেজ।

আমাদের এই রকম একটা ধারণা আছে—এবং সেটা বোধ হয় ঠিক্ ধারণা—যে, যারা সৈনিক কর্মচারী (officer) ও সেনানায়ক হ'তে চায়, ভিন্ন ভিন্ন কোন কোন দেশের সামরিক ইতিহাস অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করা (অর্থাৎ military history master করা) তাদের শিক্ষার একটা অঙ্গ। সেনানায়ক না হয়েও যাঁরা সমর-বিভাগের কর্তা হন—আগে যেমন লয়েড জর্জ হয়েছিলেন এবং এখন যেমন চার্চিল, তাঁদেরও নানা দেশের প্রসিদ্ধ অভিযান (campaign) যুদ্ধ (battle) প্রভৃতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সর্ ফিরোজ খাঁ নূনের এই জ্ঞান কেমন টনটনে ও খাঁটি, তার কিছু প্রমাণ আমরা "প্রবাসী"র আগেকার এক সংখ্যায় দিয়েছি। তিনি তাঁর "ইণ্ডিয়া" নামক বইয়ে লিখেছেন, ক্লাইব পলাশীতে যুদ্ধ করেছিলেন ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লেক্সের সঙ্গে, সিরাজের সেনাপতিদের সঙ্গে নয়! সে যুদ্ধটা হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডুপ্লেক্স্ তার কয়েক বৎসর আগেই কিন্তু ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলেন! নূন সাহেব আরও লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের ফলে দেশের বাণিজ্য ফরাসীদের হাতে না গিয়ে ইংরেজদের হাতে গিয়েছিল; তার ফলে দেশটাই যে ইংরেজদের হাতে গিয়েছিল, তা তিনি লেখেন নি!

সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁর বিদ্যের দৌড় এত দূর তিনিই হলেন বড়লাটের শাসন-পরিষদে সামরিক বিভাগের কর্তা! নূন্ সাহেব এর আগেও যে-যে বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি; অধিকন্তু তিনি ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ব্রিটেনের স্বার্থানুকুল এবং ভারতের স্বশাসনক্ষমতার বিরোধী প্রচারক (propagandist) ছিলেন। তাঁকে নূতন কাজের ভার দেওয়ার কারণও বোধ হয় তাই।

তা হলেও কিন্তু বলা চলবে না, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। কেন না, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো মোটেই হবুচন্দ্র নন; তিনি সুচতুর।

—

সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকাদিবসে রুজভেল্টের প্রার্থনা

গত ১৪ই জুন সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকাদিবস (United Nations Flag Day) অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার কয়েকটি বাক্য এই :—

"Our earth is but a small star in the great universe, yet of it we can make, if we choose, a planet unvexed by war, untroubled by hunger or fear, undivided by senseless distinctions of race, colour or theory."

তাৎপর্য। বৃহৎ বিশ্বে আমাদের পৃথিবীটি একটি ক্ষুদ্র তারকা মাত্র; তথাপি, আমরা যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরা ইহাকে যুদ্ধ দ্বারা অনুদ্বেজিত, ক্ষুধা বা ভয়ের দ্বারা অনার্ত্ত, এবং মূঢ় জাতিভেদ, বর্ণভেদ বা মতবাদ ভেদ দ্বারা অবিভক্ত একটি গ্রহে পরিণত করিতে পারি।"

যিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন তিনি সেই আমেরিকারই রাষ্ট্রপতি যেখানে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সামাজিক মর্য্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার কার্যতঃ শ্বেতকায়দের চেয়ে অনেক কম, যেখানে এখনও প্রতি বৎসর কোথাও-না-কোথাও উন্মত্ত শ্বেত জনতা কর্তৃক কৃষ্ণকায় নিগ্রো নিহত (lynched) হয় এবং হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তি হয় না, যেখানে এশিয়ার লোকদের স্থায়ীভাবে বসবাস ও পৌর অধিকার লাভের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রার্থনা অকপট ভাবেই ক'রে থাকবেন, কিন্তু তিনি ভেবে দেখেন নি যে যাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই, ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন না।

তিনি তাঁর প্রার্থনা এই ব'লে আরম্ভ করেন, "God of the free, we pledge our hearts and lives today to the cause of all free mankind," "হে স্বাধীনদের পরমেশ্বর, আমরা আজ সমুদয় স্বাধীন মানুষের কল্যাণ-সাধন ব্রতে আমাদের হৃদয় ও জীবন সঁপে দিচ্ছি।" ঈশ্বর কি তবে অধীনদের পরম দেবতা নন্? তাদের কল্যাণার্থ কি দেহ-মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া উচিত নয়? কিন্তু রুজভেল্ট যে অধীন জাতিদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন এমন নয়। কারণ তাঁর এই প্রার্থনাটিতেই অন্যত্র আছে,

We are all of us children of the earth—grant us that simple knowledge. If our brothers are oppressed, we are oppressed. If they hunger, we hunger. If their freedom is taken away, our freedom is not secure."

তাৎপর্য। আমরা সকলেই পৃথিবীর সন্তান—আমাদিগকে এই সহজ জ্ঞান দাও। আমাদের ভাইয়েরা যদি অত্যাচরিত হয়, তবে আমরাও অত্যাচরিত হই। তারা ক্ষুধার্ত হলে আমরাও ক্ষুধার্ত হই। যদি তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, তা হলে আমাদেরও স্বাধীনতা নিরাপদ নয়।

পরাধীনদের চিন্তাও যখন তাঁর মনে রয়েছে, তখন তিনি যে ঈশ্বরকে স্বাধীনদের পরমেশ্বর ব'লে সম্বোধন করেছেন তার মানে বোধ হয় এই যে, পরমেশ্বর মানুষ মাত্রকেই স্বাধীন ক'রে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কতক মানুষ দুর্বৃত্ততা বা মোহবশতঃ অন্য কতকগুলি মানুষকে নিজেদের পদানত করেছে।

ঈশ্বর স্বাধীন পরাধীন সব মানুষেরই পরম দেবতা। স্বাধীনদের উপর তাঁর আদেশ, নিজে স্বাধীন থাক ও পরাধীনের পায়ের বেড়ি ও মনের বেড়ি ভেঙে দাও; পরাধীনদের উপর তাঁর আদেশ, দেহ-মন-প্রাণে স্বাধীন হও ও মুক্ত থাক।

—

রুজভেল্টের স্বাধীনতা চতুষ্টয়

সম্মিলিত জাতিদের পতাকাদিবসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীনতা-চতুষ্টয়ের কথা বলেন। তাঁর মতে বাক্যের (অর্থাৎ মনের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের) স্বাধীনতা, ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা, অভাব হইতে মুক্ত থাকা এবং ভয় হইতে মুক্ত থাকা, এই চারি প্রকারের স্বাধীনতা ও মুক্তি সাধারণ মানুষের সাধারণ অধিকার, এবং এগুলি সূর্য্যালোক ও বাতাসের মত মানুষের আবশ্যক। এই সবগুলি থেকে বঞ্চিত করলে মানুষের প্রাণ যায়। এগুলির কোন অংশ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করলে মনুষ্যত্বের একটা অংশও শুকিয়ে যায়। মানুষদিগকে এই স্বাধীনতাচতুষ্টয় পূর্ণমাত্রায় প্রচুর পরিমাণে দিলে তারা নূতন যুগে প্রবেশ করবে, যে যুগ সকল যুগের সেরা। মানবজাতির এই সাধারণ সম্পত্তি থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত সকল মানুষকে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের প্রাপ্য এই ধন ফিরে দেবার মত শক্তি, জনবল ও ইচ্ছা সম্মিলিত জাতিদের আছে।

এগুলি রুজভেল্টের কথা। তাঁদের যদি এই শক্তি, জনবল ও ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে সেই শক্তি জনবল ও ইচ্ছা ভারতবর্ষের হিতার্থ এখন প্রযুক্ত হচ্ছে না কেন? যদি পরে হয়, কখন হবে? আটলাণ্টিক সনদটা ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য ব'লে রুজভেল্ট কেন ঘোষণা করেন নি?

—

"ওঃ ! ঐ সৈন্যগুলা"

মহাত্মা গান্ধী ৫ই জুলাইয়ের ইংরেজী 'হরিজন' পত্রিকায় "Oh ! The Troops" ("ওঃ ! ঐ সৈন্যগুলা") শিরোনাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার তাৎপর্য নীচে দেওয়া গেল।

"একজন ইংরেজ সৈন্যও যেখানে থাকবে না, এরূপ এক স্বাধীন ভারতের মনোরম চিত্র এঁকে দিলাম ব'লে আমাকে খুব ভুগতে হচ্ছে। কোনও কোনও অবস্থায় যে ইংরেজ সৈন্যগণ, এমন কি, মার্কিণ সৈন্যগণও ভারতে থাকতে পারে, আমার প্রস্তাবের মধ্যে এ কথাটা এখন আবিষ্কার ক'রে আমার বন্ধুরা গোলে পড়ে গিয়েছেন। আমি বৃথাই তর্ক করছি যে, মিত্রপক্ষের সৈন্য যদি ভারতে থাকে তবে থাকুক, কিন্তু ভারতের লোকের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যে বা ভারতীয়দের খরচায় থাকতে পারবে না। তাদিগকে থাকতে হ'লে স্বাধীন ভারতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মিত্র রাষ্ট্রবর্গের খরচায়, একমাত্র জাপানের আক্রমণ রোধ করা এবং চীনকে সাহায্য করার জন্য থাকতে হবে। এ যুক্তিটা কেউ মানতে চাচ্ছেন না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যদিগকে ভারতে অবস্থান করতে দিতে রাজি না হওয়ার অর্থ হচ্ছে চীন এবং ভারতবর্ষকে জাপানের হাতে তুলে দেওয়া ও মিত্রশক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত করা। এমন কল্পনা করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং আমার একমাত্র উত্তর হচ্ছে—আমি সৈন্যদের অবস্থানে সম্মত আছি, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায়। তারা অবস্থান করবে স্বাধীন ভারতের অনুমতিক্রমে, তারা আমাদের প্রভুরূপে থাকতে পারবে না। থাকতে হ'লে আমাদের বন্ধুরূপে থাকতে হবে। এবং তাদের নিজের খরচে থাকতে হবে।

আমি যে প্রস্তাব করেছি তা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে সকল ভয় ও অবিশ্বাস পরিহার করতে হবে। আমাদের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে মিত্র সৈন্যদের অবস্থানে আমাদের ভয় বা সন্দেহের কোনও হেতু থাকবে না।

আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমার প্রস্তাবটা বড় কঠিন প্রস্তাব। মিত্রসৈন্যেরা ভারতে থাকলেও হয়ত সেই প্রস্তাব গৃহীত হবে না। সুতরাং আমার প্রস্তাবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল দিকটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার সময় এখনও আসেও নাই, অত মাথা ঘামান সঙ্গতও নয়। ব্রিটেন যদি অকপটে ভারতের প্রভুত্ব ত্যাগ করতে পারে এবং সেই ত্যাগজনিত সকল পরিণতি বরণ ক'রে নিতে পারে, তবে তা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান শতাব্দীর একটা ঘটনার মত ঘটনা হবে। এমন কি তাতে যুদ্ধের গতিরও পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। তার পর যদি মিত্র-পক্ষের সৈন্যরা ভারতে থাকে তা হ'লেও সেই ত্যাগের মহিমা ও মূল্য খর্ব্ব হবে না, কেননা সে ক্ষেত্রে তারা জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যই ভারতে থাকবে। জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে মিত্রমণ্ডলের যেরূপ স্বার্থ, ভারতবর্ষেরও সেরূপ স্বার্থ আছে। অধিকন্তু আমার প্রস্তাব গৃহীত হ'লে সৈন্যদের ব্যয় বাবদ ভারতবর্ষকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।

আমার প্রস্তাবের তাৎপর্য এই :—

(১) ভারতবর্ষ ব্রিটেনের নিকট সমস্ত আর্থিক দায় হ'তে মুক্ত হবে।

(২) বৎসর বৎসর গ্রেটব্রিটেন যে শোষণ ক'রে থাকে, তা সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি বন্ধ হবে।

(৩) নূতন গবর্মেণ্ট যে সমস্ত কর বজায় রাখবেন বা ধার্য করবেন, তা ছাড়া সমস্ত কর বন্ধ হবে।

(৪) যে একটা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুত্ব জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর চেপে থেকে দেশের সাহসিকতম ও শ্রেষ্ঠ লোককেও কাবু করে রেখেছে, সেটা অপসারিত হবে।

(৫) এক কথায় ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে, কেন না আমি অহিংসার দ্বারাই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করবার আশা করব। এই অহিংসা অসহযোগের রূপ ধরবে না। ভারতের দূতবর্গ চক্রশক্তির নিকট যাবেন শান্তি ভিক্ষা করতে নয়, তাদিগকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে যুদ্ধের দ্বারা সম্মানজনক শান্তি অর্জন সম্ভব নয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংহত ও ফলপ্রদ বলের দ্বারা ব্রিটেন যে লাভ করছে সেই লাভের লোভ যদি সে পরিহার করতে পারে, তবেই তা সম্ভব হবে। হয়ত এর কিছুই হবে না। আমি গ্রাহ্য করি না। বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখার যোগ্য। এজন্য দেশের সর্বস্ব পণ করা সঙ্গত।

ব্রিটেন ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলি পৃথিবীতে স্বাধীনতা স্থাপন করবার জন্যই যুদ্ধ করছে, তাদের এই উক্তি যদি অকপট হয়, তা হ'লে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে তাদের সকলেরই রাজী হওয়া উচিত। ব্রিটেন রাজী না হ'লে এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যাবে যে, সে যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরেও ভারতবর্ষকে পদানতই রাখতে চায়।

স্বাধীন ভারত ও পূর্ণ অহিংসা

ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবার পর তার সমুদয় রাষ্ট্রীয় কার্য পূর্ণ অহিংসা অনুসারে চালান হবে কি না, গান্ধীজী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, যে, তিনি যদি তখন বেঁচে থাকেন তা হ'লে পূর্ণ অহিংসা যথাসম্ভব চালাবারই চেষ্টা করবেন, এবং সেইটিই হবে পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন ও নূতন জীবনধারা প্রবর্তনকল্পে ভারতবর্ষের কর্তব্যসাধন। তার পর তিনি বলেন :—

"I expect that with the existence of so many martial races in India, all of whom will have a voice in the government of the day, the national policy will incline towards militarism of a modified character."

তাৎপর্য। ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধপ্রিয় জাতি আছে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় তাদের সকলেরই হাত থাকবে, সুতরাং আমার মনে হয় যে, ভারতীয় মহাজাতির পলিসিতে সামরিক ব্যবস্থার আবশ্যকতা কতকটা পরিবর্তিত আকারে মেনে নেওয়া হবে।

তবে গান্ধীজী এও বলেন, যে, স্বাধীন ভারতে পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী ও তার সমর্থক একটি প্রবল দলও থাকবে।

লণ্ডনে "চীনকে নমস্কার" সভা

লণ্ডন, ৮ই জুলাই

চীন-জাপান যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিকীতে লণ্ডনে "চীনকে নমস্কার" সভার অনুষ্ঠান হয়। মিত্ররাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করেন। সভাগৃহ জনপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সভাপতি লর্ড মর্লি বলেন যে, রুশিয়ার সাহায্যে চীন প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্যকে আটক করে রেখেছে। সেখানে চীনই যুদ্ধ চালাচ্ছে। ভবিষ্যতে যে শান্তি-সন্ধি হবে তার সর্ত শুধু ইংরেজ ও আমেরিকানরা স্থির করবে না, তার ভার থাকবে ভারতীয় চীনা, রুশ, আমেরিকান ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের হাতে।

পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ শিনওয়েল বলেন যে, ব্রিটেন চীনকে সমরাস্ত্র ও বিমান দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তির মৌখিক উচ্ছ্বাসের কোনই মূল্য নাই। আমরা শুধু ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন চাই না।

একজন শ্রোতা এই সময় বাধা দিয়ে বলেন, "করার চেয়ে বলা অনেক সহজ"। মিঃ শিনওয়েল তখন উত্তর দেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা যাবে বলে যে জাতি বিশ্বাস করে না, সে জাতি জয়লাভের যোগ্য নয়।

ব্রহ্ম পুনরধিকার আবশ্যক

চীনা রাষ্ট্রদূত ডাঃ ওয়েলিংটন কু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "ব্রহ্ম পুনরধিকার করতেই হবে। সুদূর প্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা সম্পর্কে ঠিক ষ্ট্রাটিজির অর্থাৎ রণকৌশলের উহা এক অত্যাবশ্যক অংশ। উহা যে সম্মিলিত জাতিসমূহের সুপ্রীম কম্যাণ্ডের অর্থাৎ সর্বোচ্চ সেনাপতি সমষ্টির দৃষ্টি এড়ায় নাই, এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। ব্রহ্মকে পুনরুদ্ধার করা হ'লে চীনকে ঘাঁটি ক'রে এমন সংগ্রাম চালান যাবে যে, জাপান তার দখলীকৃত দেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে এবং সোভিয়েট যদি আক্রান্ত হয়, তা হ'লে তাকে সাহায্য দান করবার মত উপযুক্ত সমরসজ্জায় চীনকে সজ্জিত করা যাবে। সম্প্রতি যে ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান দল পাঠান হয়েছে, তাতে চীনের খুব সাহায্য হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য অস্ত্র বিশেষতঃ ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের অত্যন্ত প্রয়োজন।"—রয়টার

শান্তি-সন্ধির সর্ত নির্ধারণে ভারতবর্ষেরও হাত থাকবে, এ খুব ন্যায্য কথা। কিন্তু বস্তুতঃ সে হাত-থাকা কেবল কথার কথা হবে, যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন না-হয়, অধীন ভারতবর্ষের পক্ষে প্রভু ব্রিটেনের কোন শ্বেত বা অশ্বেত রাজপুরুষ সন্ধি-সর্তের আলোচনায় যোগ দিলে ও সন্ধিপত্রে দস্তখত করলে, তাকে ভারতবর্ষের যোগ দেওয়া বলা একটা প্রহসন হবে এবং তাতে ভারতবর্ষের অপমানই হবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই-ই, এবং এখনই তা অত্যাবশ্যক হয়েছে, সম্মিলিত মিত্রশক্তিদের জয়লাভের পক্ষেও তা অত্যাবশ্যক।

ব্রহ্ম পুনরধিকারের সমর্থন আমরা করি এই অর্থে যে, তাকে জাপানের অধীনতা থেকে মুক্ত করা হবে কিন্তু তাতে

ইংরেজ প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হবে না, প্রত্যুত ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হবে। এই রকম প্রতিশ্রুতি মিত্রশক্তিবর্গ এখনই দিলে ব্রহ্মদেশের লোকদের সাহায্য মিত্র-শক্তিবর্গের কাজে তাঁরা এখনই পেতে পারবেন।

—

"উচ্চ রাজনীতি" ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

দেশের প্রধান সমুদয় সংবাদপত্র কল্‌কাতা থেকে প্রকাশিত হয়, এবং সেগুলিতে প্রধানতঃ "উচ্চ রাজনীতি" ("high politics") লেখা হয় এবং "উচ্চ রাজনৈতিক" সংবাদ প্রকাশিত হয়। দেশনায়কেরাও প্রধানতঃ "উচ্চ রাজনীতি" লইয়া ব্যস্ত থাকেন। এর খুব প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু দেশে যতগুলি জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও য়ুনিয়ন বোর্ড আছে, তাদের কাজেরও খুব সমালোচনাও আবশ্যক। এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বৎসরে বহু কোটি টাকা আদায় ও ব্যয় করেন। তাহার সদ্ব্যয়ের উপর দেশের খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, জলপথ ও স্থলপথের যথেষ্টতা এবং সুবিধা ও অসুবিধা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। অতএব এরা নিজেদের কাজ ঠিকমত করছেন কি না, সেদিকে দৃষ্টি দেশের প্রধান কাগজগুলিকে রাখতে হবে। তা করবার মত যথেষ্ট সহকারী সম্পাদক রাখা ও কাগজে জায়গা দেওয়া কঠিন। কেবল বা প্রধানতঃ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য-কলাপের আলোচনা করবার জন্যে কাগজ প্রতিষ্ঠা করা ও চালানও কঠিন। এ সবই সত্য কথা। কিন্তু কাজটি হওয়া চাই। এই জন্য এ বিষয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জেলা বোর্ড প্রভৃতির কাজ যে সর্বত্র ঠিকমত হয় না, তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের কাছ থেকে।

—

বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের দোষ উদ্‌ঘাটন

বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের সমালোচনা ও দোষ উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত সম্প্রতি বাঁকুড়ায় যে একটি সভার অধিবেশন হয়েছিল, তার নিম্নমুদ্রিত রিপোর্ট "বাঁকুড়া দর্পণ" কাগজ থেকে নেওয়া হ'ল।

বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের কার্য্যাবলী আলোচনা করিবার জন্য এবং এই জিলার বিভিন্ন স্থানে সেস-দাতাগণের সমিতি প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এই শহরে নূতনগঞ্জ মহল্লাতে নূতন বাজারে ২৭শে জুন তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময়ে একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ রায়, বাবু রামরঞ্জনী চক্রবর্ত্তী, বাবু নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু, বাবু ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল. প্রমুখ বহু গণ্যমান্য উকীল, মোক্তার এবং ব্যবসায়িগণ সভাতে উপস্থিত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সবজজ এবং উচ্চ সেসদাতা বাবু বরদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং বাবু গোষ্ঠবিহারী মিত্র, বি এল, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় উকীল ও বক্তা বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার ইচ্ছা অনুসারে বৈদ্যনাথবাবু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম তিনি প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের বাৎসরিক আয় একণে প্রায় চারি লক্ষ টাকা। ইং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের নিয়মানুযায়ী যদি এই সমস্ত টাকা সতর্কতার সহিত ব্যয় করা যায়, তবে এই জিলার কৃষিকার্য্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই জিলার দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট বহু পরিমাণে তিরোহিত হইবে। যাহাতে জনসাধারণ উক্ত আইনের বিধানগুলি জানিতে পারেন এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা সহজে জিলা বোর্ডকে এবং সরকারকে জানাইতে পারেন তজ্জন্য জিলার বিভিন্ন স্থানে সেস-দাতাগণের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে বর্ত্তমান জিলা বোর্ডের কার্য্যের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আলোচনা হইয়াছে। সম্প্রতি স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি পত্র ছাপান হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে জিলা বোর্ডে লক্ষাধিক টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং অপব্যয় হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে স্কুলসমূহে নিয়মিতরূপে সাহায্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। বাবু বিনয়কৃষ্ণ রায়, বোর্ডের একজন ভাইস-চেয়ারম্যান জিলা বোর্ডের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া স্থানীয় তৃতীয় মুনসেফি আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ মোকদ্দমা দরখাস্ত করিয়া উঠাইয়া লয়েন। এই সকল কারণে জনগণের মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু বলেন এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অতি সত্বর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহার পর তিনি প্রস্তাব দুইটি উপস্থাপিত করেন। প্রথম প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে উপরোক্ত কারণে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অবিলম্বে জিলা বোর্ডের কার্য্যাবলী নিয়মিতরূপে হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানের ফলে যদি বুঝিতে পারা যায় যে বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন, তবে জনসাধারণকে তাহা জানাইয়া তাহাদের মনের বিক্ষোভ বিদূরিত করা। কিন্তু অপর পক্ষে অভিযোগগুলি যদি মূলতঃ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইনের ১৩১ ধারা মতে বর্ত্তমান বোর্ডকে অবিলম্বে বাতিল করা এবং সুবিধামত সময়ে নূতন বোর্ডের স্থাপন জন্য আদেশ দেওয়া বিধেয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্থির হয় যে সেস দাতাগণ এবং জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসনের আইনটির উপকারিতা বুঝাইবার জন্য সভা আহ্বান করা কর্ত্তব্য এবং বিভিন্ন স্থানে সেস-দাতাগণের সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এই আন্দোলনটি উপযুক্ত রূপে চালাইবার জন্য স্থানীয় উকিল, মোক্তার এবং ব্যবসায়িগণ মধ্যে কয়েক জনকে এবং "বাঁকুড়া দর্পণে"র সম্পাদককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত করা হয়।

উক্ত উভয় প্রস্তাবই সভাপতি বৈদ্যনাথ বাবু উপস্থাপিত করেন এবং বাবু গোষ্ঠবিহারী মিত্র এবং বাবু ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয়গণ সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সমর্থন করেন এবং তৎপরে উহা সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে গৃহীত হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয়কে বলা হয় যে তিনি যেন প্রস্তাবগুলির নকল সরকার বাহাদুরকে এবং সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর বরদা বাবু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভার কার্য্যের অনুমোদন করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষ হইতে বাবু রামরঞ্জনী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। রামরঞ্জনী বাবু সভার অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব অনুসারে প্রস্তাবগুলি সমেত সভার কার্য-বিবরণ কোনো রাজপুরুষকে যথাযোগ্য পত্র লিখে পাঠান হয়েছে কি না, আমরা জানি না। আশা করি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে এবং বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষকুমার বসু মহাশয়কে পাঠান হয়েছে। তাঁরা এ বিষয়ে কি করলেন, তার খবর রাখতে হবে, এবং খবর জানবার জন্যে দরকার হ'লে তাগিদ দিতে হবে।

তিনটি প্রস্তাবেরই আমরা সমর্থন করি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাকে পূর্ণ ফলপ্রদ করতে হ'লে একটি খবরের কাগজ আবশ্যক। যদি "বাঁকুড়া-দর্পণ" এর জন্যে যথেষ্ট জায়গা দিতে পারেন, ভালই। নতুবা নূতন একটি কাগজ প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক।

—

হুগলী জেলা বোর্ড

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা হুগলী জেলা বোর্ডের বার্ষিক ছাপা রিপোর্ট এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৩৪৯ সালের বার মাসের সুন্দর দেওয়াল-পঞ্জিকা পেয়েছিলাম। বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের কথা লিখ্‌তে গিয়ে সম্মুখে ঝুলান হুগলী বোর্ডের দেওয়াল-পঞ্জিকাটির কথা মনে পড়ল। তাতে দেখ্‌ছি, হুগলী জেলা বোর্ড ১৯৪২-৪৩ সালে ৫,০৭,০০০৲ টাকা আয়ব্যয়ের বজেট করেছেন। বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের আয় প্রায় ৪ লাখ টাকা এবং ঘাট্‌তি শুনছি এক লাখ। সুতরাং হুগলী জেলা বোর্ড যত খরচ করেন, বাঁকুড়ার বোর্ডও প্রায় তাই করেন। সেই ব্যয়-গুলি সদ্ব্যয় কি না দেখতে হবে। কিন্তু এই বোর্ডের কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই, এর কোন রিপোর্ট ছাপা হয় কি না জানি না। এর আয়ব্যয়ের বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানতে পারলে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। হুগলীর বজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বাবতে এই রকম:—শিক্ষা ৯৪২০০; চিকিৎসা ৭৮৭০০; সাধারণ স্বাস্থ্য ৫৩৪০০; রাস্তা ও সাঁকো ১৬৪০০০; ইমারৎ, জল-সরবরাহ, এবং কর্মচারী-আদির বেতনাদি ৪৯০০০; য়ুনিয়ন বোর্ডগুলিকে সাহায্য ৩০৪০০; অন্যান্য বাবতে ৩৩৩০০; বিবিধ ৬০০০।

যাঁরা বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, তাঁরা এই বোর্ড কিসে কত খরচ করেছেন, তার খাঁটি খবর সংগ্রহ করুন। পরে তা হ'লে তার সঙ্গে হুগলী বোর্ডের খরচের তুলনা করা যেতে পারবে। আমরা হুগলী বোর্ডের খরচের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারব। হুগলীর কথাই লিখছি এই জন্যে যে, তার মুদ্রিত রিপোর্ট পাওয়া যায়, এবং তার ব্যয় বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের ব্যয়ের চেয়ে বিশেষ বেশী নয়।

—

পাটকল কম চালাইবার নির্দ্দেশ

সম্প্রতি ইংরেজ বণিক্ সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল' লিখিয়াছেন যে, মার্কিন টেক্‌নিক্যাল মিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে ভারত-সরকার ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন নামক ইংরেজ পাটকলওয়ালাদের সমিতিকে পত্র লিখিয়াছেন যে, পাটকলগুলির কাজ কমাইতে হইবে। উদ্দেশ্য, ইহাতে যে-সকল মালগাড়ী পাটকলের কয়লা বহনে ব্যাপৃত থাকে তাহাদের অনেকগুলি যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। সাধারণভাবে এই প্রস্তাবে আপত্তি করা যাইতে পারে না; কারণ যুদ্ধজয় সকল সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। তবে দেখিতে হইবে এই নূতন নিয়মের কুফল ভারতীয় মালিকদের পাটকলগুলির উপর যাইয়া না পড়ে। আমরা জানি অতীতে এই পাটকলগুলির সহিত ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের অনেক বিরোধ চলিয়াছিল। সর্ জন্ এণ্ডার্সন যখন অল্পদিন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অর্ডিনান্স প্রয়োগ করিবেন এই ভয়ে ভারতীয় মালিকরা ইংরেজদের নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া অল্প সময় কল চালাইতে স্বীকৃত হন। তাহার পর ভারতীয় মালিকের ছোট ছোট কয়েকটি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা উপরের নিয়মে বাধ্য না থাকায় কারখানা আইনে যত ঘণ্টা চালান যায় চালাইতে থাকে। এসোসিয়েশন তখন ভারত-সরকারকে অনুরোধ করেন যাহাতে এগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অধিক না চালায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দুইবার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর নূতন ভারত-শাসন আইনে বাংলায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয় এবং এই মন্ত্রি-মণ্ডল অর্ডিনান্সের দ্বারা জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের বহু-দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। সুতরাং এ আশঙ্কা স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, যুদ্ধের অজুহাতে আমাদের

পাটকলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটান যাইতে পারে। এই কলগুলির অধিকাংশ ছোট। যদি তাহাদিগকে বড় কলগুলির সঙ্গে এক নিয়মে অল্প সময় চালাইতে বলা হয় তাহা হইলে তাহাদের খরচ তোলাও অসম্ভব হইবে। ইহাতে হাতে না মারিয়া ভাতে মারা হইবে। সমস্ত পাটকলে যত তাঁত আছে, এই ছোট কলগুলিতে তাহার শতকরা তিন চারি ভাগের অধিক নাই। সুতরাং এগুলিকে দেশবাসীর উদীয়মান শিল্পপ্রচেষ্টা মনে করিয়া কোনও বাঁধাবাঁধির ভিতর না ফেলিলে সরকারের বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। পাটকলগুলি কম চলিলে পাটচাষীর যে সমূহ ক্ষতি হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলা-সরকার ভারত-সরকারের কথা শুনিয়া পাটচাষ বাড়াইয়া যে ভুল করিয়াছেন তাহার কথা আমরা গত মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন তাঁহাদের উচিত ভারত-সরকারকে কৃষকের ক্ষতিপূরণ করিতে রাজী করান; কিন্তু অব্যবহৃত পাটের মূল্য দিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারেরও নাই এই কথা বুঝিয়া বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল যদি কাজ করিতেন তাহা হইলে অগণিত বাঙালী প্রধানতঃ মুসলমান কৃষকের অনেক দুর্দ্দশা নিবারিত হইত।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু মুসলমানের ঐক্য—না, সকল ভারতীয়ের ঐক্য ?

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশেও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা প্রায়ই আলোচিত হয় এবং তার অল্পবিস্তর কেজো ও অকেজো চেষ্টাও হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব এবং দেশের উন্নতি সম্বন্ধে উভয়ের আদর্শের ঐক্য যে একান্ত আবশ্যক, তাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আমরা সম্পূর্ণ সমর্থনই করি। কিন্তু আমরা এর চেয়ে বড় এবং সর্বব্যাপক একতা চাই। ভারতবর্ষে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, মুসলমানদের সংখ্যা তারই নীচে। কিন্তু কেবল হিন্দু ও মুসলমানই ভারতবর্ষের অধিবাসী নয়। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ছাড়া আদিবাসী, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি আছে। সকলকে নিয়ে ভারতীয় মহাজাতি। এক সময়ে হিন্দু মহাসভা এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন যে, যে-কোন ভারতবাসী ভারতবর্ষে উৎপন্ন কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। হিন্দু মহাসভার সভ্যদের মধ্যে এখনও এই সংজ্ঞা চলিত আছে কি না জানি না। এই সংজ্ঞা অনুসারে সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি আদিম নিবাসী এবং জৈন বৌদ্ধ শিখ ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষে উৎপন্ন ধর্মে বিশ্বাসী সমুদয় ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে যাই হোক, কার্যতঃ এরা হিন্দু ব'লে স্বীকৃত হয় না ব'লে আমরা তাদের আলাদা উল্লেখ করছি। সে যাই হোক, হিন্দু এবং সকল সম্প্রদায়ের অ-হিন্দু সকলকে নিয়ে ভারতীয় মহাজাতি বা নেশ্যন, এবং তাঁদের সকলের ঐক্য চাই। জাতীয় ঐক্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেমন সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমানের কথাই ভাবি—বিশেষ. ক'রে আইনসভা-আদিতে আসন, মন্ত্রিমণ্ডলে আসন এবং চাকরির বাঁটোআরা বিষয়ে—অন্য সব বিষয়েও যদি তাই করা হ'ত, তা হ'লে কি হ'ত তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কংগ্রেস অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন চান। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে যদি কেবল হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিই দৃষ্টি রাখা হ'ত, তা হ'লে পারসী দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজশাহ মেহতা, ও দীনশাহ এদুলজি বাচা এবং ব্রাহ্ম আনন্দমোহন বসু ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে কংগ্রেসের সভাপতি করা চলত না; ইংরেজ যাদের করা হয়েছিল, তাদিকেও করা চলত না।

বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। যদি এমন একটা অলিখিত নিয়ম থাকত যে, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কেবল হিন্দু ও মুসলমান করবে এবং সেই নিয়ম পালন করতে সকলকে বাধ্য করবার ক্ষমতা কোন নৃপতি, রাষ্ট্রপতি বা দেশনায়কের থাকত, তা হ'লে য়ুরোপীয় যারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন তাঁদের সেবা থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হ'ত, খ্রীষ্টিয়ান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেবা থেকে বঞ্চিত হ'ত, এবং রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্রাহ্ম সাহিত্যিকদের সেবা থেকে বঞ্চিত হ'ত। কিন্তু সুখের বিষয় এ রকম কোন নিয়ম কোন কালে ছিল না এবং এ রকম নিয়ম চালাবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, থাকতে পারে না, ও নাই। কেবল বা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানের কথা ভাবায় দেশ নানা দিকে অহিন্দু ও অমুসলমান যোগ্য লোকের সেবায় বঞ্চিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পঞ্জাবের কথা ধরুন। কোন-না-কোন সময়ে সেখানে যোগ্যতম ১২ জন লোকের মধ্যে ছয় জন শিখ থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দু নন মুসলমানও নন ব'লে তাঁদের সকলকে বাদ দিয়ে তাঁদের চেয়ে কম যোগ্য হিন্দু বা মুসলমানের দ্বারা কাজ চালাতে হ'তে পারে; শিখরা পঞ্জাবে প্রবল ব'লে হয়ত

বা একজন শিখকে নেওয়া হ'তে পারে। কিন্তু তা হ'লেও বাকী ৫ জন যোগ্যতম শিখের যোগ্যতার সদ্ব্যবহার হ'তে পারে না।

বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায় যে, মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে ও অন্য নানাবিধ কাজে অহিন্দু ও অমুসলমান খুব যোগ্য লোকেরও স্থান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। মন্ত্রিসভার সভ্যদের মধ্যে অদলবদল ত অনেক বার হ'ল কিন্তু তাঁকে ত একবারও নেওয়া হ'ল না, নেবার নামও করা হ'ল না। কেননা তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। অথচ তাঁর রাজনীতিজ্ঞান খুব আছে, সাধারণ জ্ঞান খুব আছে, জনহিতৈষণা খুব আছে, বাগ্মিতাও আছে, এবং সময় ও শক্তি দেশহিতার্থে নিয়োজিত করবার সুবিধা ও সুযোগও তাঁর আছে।

এইরূপ নানা বিষয় বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, সাম্প্রদায়িক কোন কিছুর চিন্তা না ক'রে কেবল যোগ্যতা বিবেচনা ক'রে মানুষের শক্তিকে জীবনের নানা কার্য্যক্ষেত্রে কাজে লাগালে সর্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় এবং সুবিচারও হয়। তাতে সংখ্যায় ক্ষুদ্রতম কোন সম্প্রদায়ের লোকও, আমরা অবহেলিত হচ্ছি, মনে ক'রে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে না।

ব্রিটিশ গবন্মে'ন্ট নিজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এদেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা নানা দিকে চালাচ্ছেন। অজুহাতটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা। কিন্তু তা করতে হ'লে সকলের চেয়ে সংখ্যালঘু যে সম্প্রদায় শ্রেণী বা জা'তের লোক, তাদের প্রতিই ত বেশী অনুগ্রহ দেখান আবশ্যক। তা কিন্তু করা হয় না।

ব্রিটিশ জাতি এদেশে যাই করুন, নিজের দেশে লোকের বিরাগভাজন ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ের যোগ্য লোককেও বঞ্চিত করেন না। বিলাতে ইহুদীরা সংখ্যায় খুব কম, এবং তথাকার প্রধান অধিবাসী খ্রীষ্টিয়ানদের বিরাগভাজন। তথাপি ইহুদী ডিজরেলি প্রধান মন্ত্রী, ইহুদী মণ্টেগু ভারত-সচিব, ইহুদী লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন। সেখানে রোমান কাথলিকরা সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ প্রটেষ্টাণ্টদের বিরাগভাজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোমান কাথলিক লর্ড রিপনকে ভারতবর্ষের বড়লাট করা হয়েছিল।

সাবাস সর্ আজিজুল হক্

লণ্ডনে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার সর্ আজিজুল হক্ সম্প্রতি লিভারপুল বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয়, তার সভাপতিরূপে তথাকার লর্ড মেয়র বলেন :—

"যে দেশের লোকদের মধ্যে অনেক রকম ধর্ম প্রচলিত আছে এবং যেখানে লোকেরা অনেক ভাষায়—মোটামুটি ২০০ ভাষায়—কথা বলে, সর্ আজিজুল হকের ভারতবর্ষের মত সেই রকম দেশের প্রতিনিধির কাজ করা ভয়ানক কঠিন।"

সর্ আজিজুল হক্ বিলম্ব না ক'রে তখুনি উত্তর দেন :—

"হাঁ, ভারতবর্ষে নানা রকম ভেদ—ধর্মভেদ, ভাষাভেদ ইত্যাদি—আছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন্ দেশ একেবারে ভেদবিহীন? আমাদের দেশটা খুব বড়, সুতরাং আমাদের দেশে অনেক ভাষা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মনে রাখবেন, ভারতীয়েরা তাদের নানা ভাষা ও নানা ধর্মমত সত্ত্বেও মূলতঃ এক জাতি।"

ইংলণ্ডের লোকেরা বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সবাই শোনে ও বলে ভারতবর্ষের নানা ভেদ ও বৈচিত্র্যের কথা, মৌলিক ও ভিত্তিগত একত্বের কথা বড়-একটা শোনে না, বলেও না। এ অবস্থায় সর্ আজিজুল স্পষ্ট সত্য কথাটা শুনিয়ে দিয়ে শ্রোতাদের উপকার করেছেন। তিনি মুসলমান ব'লে তাঁর মুখ থেকে এমন কথা বেরনর একটা বিশেষ মূল্যও বিলাতে আছে। সেখানে এই রকম কথা ও বিশ্বাসই প্রচলিত যে, মুসলিম লীগই সব মুসলমানের মুখপাত্র এবং সব মুসলমানই মনে করে যে তারা একটা আলাদা নেশ্যন। সর্ আজিজুলের মত উচ্চপদস্থ মুসলমান সেই মিথ্যা কথার মূল ছেদন করেছেন।

"পুণ্যস্মৃতি"

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "No man is a hero to his valet; অর্থাৎ কোনো মানুষ যত বড় হোন না কেন নিজের খানসামার কাছে তিনি মহামানব নন। এই কথাটার উত্তরে বলা হয়েছে, কোনো বড়লোকই তাঁর খানসামার কাছে যে মহামানব নন, তার কারণ এ নয় যে তিনি মহামানব নন, তার কারণ এই যে খানসামা খানসামাই অর্থাৎ মহত্ত্ব বুঝবার ক্ষমতা তার নাই। ("It is not because the hero is not a hero but because the valet is only a valet.") কিন্তু যাই বলা হোক, অনেক ক্ষেত্রে কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে দেখা যায়। তার কারণ, অনেক মানুষের দুটা রূপ আছে, একটা পোষাকী ও একটা আটপৌরে। পোষাকী যে রূপটা, তাতে অনেকে খুব মহৎ মানুষ ব'লে প্রতীত হ'তে পারেন, কিন্তু আটপৌরে রূপটাতে তাঁদের আসল ক্ষুদ্র স্বরূপটা ধরা পড়ে যায়, বোঝা যায় যে, তাঁরা বাস্তবিকই ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্র

মানুষ। কেন না, অনেক স্থলে এই ইংরেজী কথাটা সত্য যে, "Familiarity breeds contempt" ("ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মে")।

খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কোন মানুষকে জানলেও, তাঁর দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম চালচলন প্রভৃতির খুঁটিনাটি জানলেও যদি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা না জন্মে বরং তাঁর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা বাড়তেই থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে তিনি প্রকৃতই মহৎ।

রবীন্দ্রনাথ এই রকম মানুষ ছিলেন।

তাঁর মহৎ গুণাবলী ও মহৎ ব্যক্তিত্ব এরূপ ছিল যে, তাঁর কথা ভাবতে গেলে কোন খুঁতের কথা মনেই আসে না।

তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার শুনবার জানবার ফলস্বরূপ তাঁর কোন জীবনচরিত এখনও প্রকাশিত হয় নি, কখনও হবে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর প্রকাশিত কোন কোন চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে তাঁকে কিছু জানা যায়, তাঁর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কথাবার্তা সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার থেকে কিছু জানা যায়, শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর "নির্ব্বাণ" থেকে কিছু জানা যায়, "পুণ্যস্মৃতি" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি "প্রবাসী"তে বেরিয়েছিল তার মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এবং আছে "মংপুতে" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে।

"পুণ্যস্মৃতি" পুস্তকের আকারে ছাপা হচ্ছে, খুব শীঘ্র প্রকাশিত হবে। "প্রবাসী"তে এর যতটুকু বেরিয়েছিল, সমগ্র বইটি তার তিন গুণেরও অধিক বড়। এর থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা জানা যায়—তিনি শান্তিনিকেতনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কিরূপ পরিশ্রম ক'রে শিক্ষা দিতেন এবং জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণ করতেন—এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত কোন পুস্তকে তা নাই। তাঁর অনেক কথাবার্তা এতে আছে। শান্তিনিকেতনের সাবেক অধ্যাপকেরা ও প্রাক্তন ছাত্রেরা এতে কবির সেই আটপৌরে মনোজ্ঞ রূপটি দেখতে পাবেন যার সঙ্গে তাঁর পোষাকী রূপের কোন প্রভেদ নাই। সেকালের শান্তিনিকেতনের অনেক ছাত্রছাত্রীর ও অন্য অনেকের উল্লেখ এতে আছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আগামী প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভায় নূতন কিছু জানতে শুনতে বলতে চান, তাঁরা এই বইয়ে তা পাবেন।

এই পুস্তকের লেখিকা তাঁর ডায়েরিতে যেমন কবির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বিস্তর কথা লিখে রেখেছিলেন, আমরা সকলে তা করি নি ব'লে অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু গতানুশোচনা বৃথা।

—

লম্বা কোঁচা পরিহার

১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে মহাযুদ্ধ হয়, তার ফলে অন্য কোন কোন দেশের মত বিলাতে কাপড়ের কমতি ঘটে। তার ফলে পুরুষদের হাঁটু পর্য্যন্ত পাজামা ('shorts') বেশী প্রচলিত হয় এবং মেয়েদের ঘাঘরাও (skirts) হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। তাতে তাঁদের ভব্যতার হানি হয় নি। আমাদের দেশে কাপড় এখন বড় দুর্মূল্য হয়েছে, কাপড়ের কমতিও এ রকম হয়েছে যে গরীব লোকেরা ছেঁড়া কাপড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় পুরুষদের লম্বা কোঁচার মোহ ছেড়ে দেওয়াই উচিত। হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত কোঁচা গেলেই যথেষ্ট। স্বর্গগত গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারীদের যেসব প্রতিজ্ঞা করাতেন তার মধ্যে একটি ছিল, "কোঁচা দুলাইব না।" তিনি নিজেও কোঁচা দুলাইতেন না। মহাত্মা গান্ধী ত যথাসম্ভব খাট ধুতিই পরেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য অনেকেও তাই করেন। তাতে তাঁদের ভব্যতা নষ্ট হয় না।

আমাদের দেশে অনেক ভারতীয় ভদ্রলোক হাঁটু পর্য্যন্ত পা জামা পরেন। খাট ধুতি পরতে তাঁদের কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

আমাদের মেয়েরা তাঁদের শাড়ী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন তাঁরাই নিজে তা স্থির করুন। মেমসাহেবদের স্কার্ট যত খাট, তত খাট শাড়ী পরতে কেউ রাজী হবেন না, আমরাও রাজী হ'তে বলছি না। কিন্তু মাটিতে লোটান শাড়ী প'রে মেঝের ও রাস্তার আবর্জনা ঝাঁট দেবারও কোন প্রয়োজন আছে মনে করি না।

—

সম্পাদকীয় নানান্ জবাবদিহি

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করলে কি হ'ত, সে-বিষয়ে তাঁর একটি কবিতা আছে। কালিদাস বা অন্যান্য প্রাচীন কবি ও নাট্যকারদের কালে যদি কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের জন্ম হ'ত—অবশ্য যদি কল্পনা করা যায় যে সেকালে ছাপাখানা ও মাসিক পত্র ছিল—তা হ'লে কি কি ব্যাপার ঘটতে পারত, সে-বিষয়েও কিছু জল্পনা করা যেতে পারে।

আমরা কোন জা'তকেই নীচ জা'ত ও সেই জা'তের লোকদের ছোটলোক মনে করি না। যে-সব লেখক সমাজচিত্র হিসাবে এই সব জা'ত ও তাদের লোকদের কথা গল্পে লেখেন, তাঁদেরও এই সকল জা'তকে অপমান করবার কোন দুরভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তাঁদের গল্প

ছাপবার 'অপরাধে' সম্পাদককে মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়ে থাকে।

কালিদাস প্রভৃতির কালে জন্মিলে এমন ঘটতে পারত যে, তখনকার কোন কল্পিত মাসিক পত্রে সংস্কৃত নাটক ছাপা হ'লে কোন ছিঁচকাঁদুনে বামুন সম্পাদকের নামে এই অভিযোগ করতে পারত যে, "মশায়, আপনারা যে-সব নাটক ছাপেন, তার বিদূষকরা সাধারণতঃ পেটুক বামুন এই রকম দেখা যায়; বামুনদের উপর আপনাদের এত বিদ্বেষ কেন? বামুন ছাড়া অন্য কোন জা'তের লোক কি পেটুক ও হাস্যাস্পদ ভাঁড় হ'তে পারে না?" কোন ছিঁচকাঁদুনী শিক্ষিতা তরুণীও এই রকম নালিশ সম্পাদকদের নামে করতে পারতেন, যে, "মশায়, আপনারা যে-সব নাটক ছাপেন তাতে দেখা যায়, যে, পুরুষেরা কথা বলছেন সংস্কৃত ভাষায়, স্ত্রীলোকেরা বলছেন প্রাকৃত ভাষায়; সব পুরুষরাই কি সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত আর স্ত্রীলোকেরা সবাই অশিক্ষিত ও সংস্কৃত বল্‌তে অসমর্থ ছিলেন? স্ত্রীলোকদের উপর আপনাদের নাট্যকারদের ও আপনাদের এত অবজ্ঞা কেন?"

'কালিদাসের কালে'র কল্পিত সম্পাদকেরা এই রকম কল্পিত নালিশের কি জবাব দিতে পারবেন, তার আলোচনা করব না। কিন্তু সম্পাদক ছাড়া অন্য লোকদিগকেও সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবিচারের নালিশের জবাব দিতে হয়েছে। গুরুগোবিন্দ সিংহ ও শিখদের সম্বন্ধে গান্ধীজী কি বলেছিলেন না-বলেছিলেন, তার কৈফিয়ৎ তাঁকে এই সে-দিন দিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও শিখদের এই রকম একটা অভিযোগ হয়েছিল এবং তাঁকে তার জবাব দিতে হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, কোন কোন মুসলমান হিন্দু লেখকদের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ আনেন। গত চৈত্রের প্রবাসীতে একটি পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জন সমালোচক কোনও মোগল রাজনন্দিনীর উল্লেখ ক'রে দু-একটা এ রকম শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন, যাতে কয়েক মাস পরে এক মুসলমান ভদ্রলোক গবেষণা ক'রে সমালোচক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে একটা লম্বা চিঠি লিখেছেন। আমরা সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ ছাপি না; ছাপলে বর্তমান ক্ষেত্রে সমালোচক মশায় সমুচিত জবাব দিতে পারতেন। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর এমন কিছু নয়, যাতে এ রকম বাদ-প্রতিবাদ ছেপে পরোক্ষভাবে একটা সাম্প্রদায়িক কলহের সম্ভাবনা ঘটান যায়। মোগল রাজনন্দিনীকে অপমান করা বা তাঁর সম্বন্ধে কোন অশিষ্ট ইঙ্গিত করা সমালোচক মশায়ের অভিপ্রেত ছিল না, থাকতে পারে না। তথাপি আমরা স্বীকার করি, যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের অতিরিক্ত অভিযোগপ্রবণতা বিবেচনা ক'রে আমরা ঐ ক'টা শব্দ তুলে দিয়ে লেখাটিকে পান্‌সে ক'রে দিলে জবাবদিহি হ'তে হ'ত না। তা যে করি নি, এই ত্রুটি স্বীকার করছি।

অভিযোগপ্রবণ মুসলমানেরা মনে রাখবেন, বিদেশী কোন কোন লেখক এবং এই-দেশী কোন কোন সেকালের মুসলমান ফারসী লেখক মোগল অন্তঃপুরের এমন অনেক বর্ণনা করেছেন যার পুনরুল্লেখ অসমীচীন হবে। সমালোচক মশায় সে রকম কিছু বলেন নাই, ইঙ্গিতও করেন নাই।

শেক্সপিয়র তাঁর একটি নাটকে ইহুদী শাইলকের চিত্র এঁকেছেন ব'লে ইহুদীরা শেক্সপিয়রের বিরুদ্ধে স্থায়ী জেহাদ ঘোষণা করেন নি। গত কোন কোন শতকের ইংলণ্ডীয় রাজ-অন্তঃপুরের কুকাহিনী ইংরেজরা নিজে এবং অন্যেরাও বর্ণনা ও উল্লেখ করেছে ও ক'রে থাকে। তার মধ্যে এ কথাও উঠেছে ও কখন কখন উঠে থাকে যে, লর্ড বেকন্ রাজ্ঞীবিশেষের পুত্র। ইংরেজরা এসব আলোচনাকে একটা গুরুতর অভিযোগ ও কলহের কারণে পরিণত করে না। তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

—

"বাংলা গদ্যে চার যুগ"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষের "বাংলা গদ্যে চার যুগ" গ্রন্থখানির একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যিকগণকে গদ্য রচনা সম্বন্ধে তাঁদের ন্যায্য প্রশংসা দিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক কারণে কোন সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করেন নি। বিদেশী যাঁরা বাংলা গদ্যের জন্যে কিছু করেছেন, তাঁদেরও যথাযোগ্য উল্লেখ এতে আছে। অবশ্য তিনি প্রধান প্রধান লেখকদের কথাই বলেছেন। কারো উল্লেখ বা কারো অনুল্লেখ, কারো বা নামমাত্র উল্লেখ এসব সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যই হবে। এমনও হ'তে পারে যে, তিনি অপ্রধান দু-এক জনকে যে স্থান দিয়েছেন, ততটা উচ্চস্থান তাঁদের প্রাপ্য নয়। কিন্তু কোন ধর্ম-সম্প্রদায়কে বা সভাকে খাট করবার অভিসন্ধি তাঁর বইয়ে পাওয়া যায় না।

সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা অবশ্য তাঁর গ্রন্থের প্রধান গুণ নয় অন্য নানা গুণও আছে।

চল্লিশ বৎসর ধ'রে 'প্রবাসী' নানা রকম যে-সব গদ্য রচনা ছেপে আসছে, তার কোন প্রকার ভালমন্দ উল্লেখ তিনি না-করায় তাঁর পুস্তকখানির অসঙ্কোচ প্রশংসা করবার খুব সুযোগ আমরা পেয়েছি।

—

কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ তাঁর গ্রন্থে কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য সম্বন্ধে অনেক ন্যায্য কথা লিখেছেন কিন্তু তিনি যে তাঁর গদ্যকে 'কেবল ধর্মবিষয়ক' ব'লেছেন, এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক্ নয়। সত্য বটে, তাঁর নাম দিয়ে যা-কিছু বেরিয়েছে তা ধর্মবিষয়ক। কিন্তু "সুলভ সমাচার" কাগজে তাঁর এমন অনেক লেখা বিনা নামে বেরিয়েছে যা নিশ্চয়ই তাঁর লেখা এবং যা ধর্মবিষয়ক নয়। 'প্রবাসী'তে আমরা তাঁর এ রকম কিছু লেখা উদ্ধৃত করেছিলাম। "সুলভ সমাচার" থেকে তাঁর লেখার সংগ্রহ পুস্তকের আকারেও বেরিয়েছে।

—

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"র একাদশ খণ্ড

যুদ্ধজনিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যে বিশ্বভারতী নিয়মিত রূপে "রবীন্দ্র-রচনাবলী" প্রকাশ ক'রে আসছেন, তার উল্লেখ ও প্রশংসা আগে একাধিক বার করেছি; আবার করছি।

আষাঢ় মাসে যে একাদশ খণ্ড বেরিয়েছে, তার কাগজ ছাপা সম্পাদন প্রভৃতি আগেকার খণ্ডগুলিরই মত উৎকৃষ্ট।

এই খণ্ডে সাতখানি ছবি আছে। ছবিগুলি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। প্রথমে আছে 'গীতাঞ্জলি'-রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ। তার পর সপরিবারে রবীন্দ্রনাথ। ইহাতে আছেন কন্যা মীরা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কন্যা মাধুরীলতা দেবী। তৃতীয় ছবি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা। চতুর্থ ছবি সাহিত্যিকবর্গসহ রবীন্দ্রনাথ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের পাদমূলে উপবিষ্ট আছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক)। পঞ্চম ছবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের সুধীসমাজ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা। ষষ্ঠ ছবি "ডাকঘর"-অভিনয়ের শেষ দৃশ্য। সপ্তম ছবিতে আছেন আশুতোষ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

এই খণ্ডে রচনা আছে কবিতা ও গান বিভাগে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি; নাটক ও প্রহসন বিভাগে অচলায়তন ও ডাকঘর; উপন্যাস ও গল্প বিভাগে দুই বোন; এবং প্রবন্ধ বিভাগে স্বদেশ। তদ্ভিন্ন গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে। গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হইতে অনেকগুলি গানের মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, মুদ্রিত পাঠ হইতে সেগুলি অনেকাংশে পৃথক্। এই গানগুলির সংখ্যা তিন।

গীতালির পাণ্ডুলিপি থেকে তার সাতটি গানের মূল পাঠগুলি মুদ্রিত হয়েছে। মূল পাঠ মুদ্রিত পাঠ থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র।

"স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গীতালি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত "আশীর্বাদ" কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত।" এই কবিতাটির মূল পাঠ গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

"গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির পাণ্ডুলিপি পুস্তকে, সমসাময়িক কালে রচিত আরও কয়েকটি গানের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি গান ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই; কয়েকটি গান বিভিন্ন গানের সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন খণ্ডে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। 'অল্পসময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া' রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই একাদশ খণ্ডে সংযোজন বিভাগে সেগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।

"অচলায়তন" নাটক প্রকাশিত হবার পর অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই দুই সমালোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে দুখানি চিঠি লিখেছিলেন, এই একাদশ খণ্ডে সেই দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। দুটি চিঠিই দীর্ঘ, এবং বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথেরই যোগ্য।

দুই বোন উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি উদ্ধৃত হয়েছে।

—

"গীতাঞ্জলি"

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"তে কবির সমস্ত লেখাই সংগৃহীত হয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর প্রত্যেক পুস্তকেরই স্বতন্ত্র মুদ্রণ আবশ্যক। পৃথিবীতে যত বড় লেখক জন্মেছেন, তাঁদের সকলের যেমন সমগ্র গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হয়ে এক বা একাধিক খণ্ডে ছাপা হয়, প্রত্যেকটি বহিও সেইরূপ আলাদা ছাপা হয়। কোন পাঠক যদি কোন গ্রন্থকারের একটি কোন বই পড়তে চান, তাঁকে সমগ্র গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতে বা হাতড়াতে বাধ্য করা উচিত নয়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সমষ্টি যেমন ছাপা হচ্ছে, সেই রকম তাঁর বইগুলিও যে আলাদা আলাদা ছাপা হচ্ছে, এ ব্যবস্থা খুব সমীচীন।

সুপ্রসিদ্ধ "গীতাঞ্জলি"র চতুর্থ সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম প্রকাশ হয় ১৩১৭ সালে, তার পর দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ হয় ১৩২১ সালে। পুনর্মুদ্রণ হয় ১৩২৮, ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩২ সালে। তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৩৩৪ সালে। তার পুনর্মুদ্রণ হয় ১৩৩৭, ১৩৪৩ ও ১৩৪৬ সালে।

—

সরকারী গ্রাম উজাড় প্রভৃতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাব

সরকারী আদেশে গ্রাম উজাড় এবং জমি ঘরবাড়ী যানবাহন লওয়া সম্বন্ধে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমীটি নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব ধার্য্য করেছেন :—

"বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ এসেছে যে, অনেক স্থানে গবর্ন্মেণ্ট যথোচিত সময় এবং খেসারত না দিয়ে লোককে গ্রাম জমি এবং বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দিয়েছেন; যে সমস্ত স্থানে নৌকা না হ'লে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অসম্ভব, সেরূপ স্থানে পর্য্যন্ত নৌকা দখল ক'রে বিনষ্ট করেছেন এবং জনসাধারণের কি প্রয়োজন তার প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি, সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি সংশ্লিষ্ট লোকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছেন। ওয়ার্কিং কমিটি আশা করেন যে, গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে লোকদের অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন এবং লোকেরা ক্ষেত্রানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করবে। কিন্তু কোনও আদেশ অমান্য করা বা কোনও ব্যবস্থার প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত করার আগে সর্ব্বপ্রকারে আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা ক'রে নিতে হবে।

বাস্তুত্যাগ বা অন্য কোনও আদেশের ফলে যে-ক্ষেত্রে সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে কোনও ভূসম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হবে, সে-ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে। ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার সময় জমি এবং শস্যের মূল্য, অসুবিধা, অন্যত্র যাবার ব্যয়, অন্যত্র জমি সংগ্রহে ও বাসস্থাপনে অসুবিধা ও বিলম্বের কথা ধরতে হবে। যে-ক্ষেত্রে খেসারতের পরিমাণ সম্বন্ধে বাস্তুচ্যুত লোকদের এবং কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ সম্ভব হবে না সে-ক্ষেত্রে বিষয়টির মীমাংসার ভার একটি ট্রাইব্যুনালের উপর দিতে হবে। গবর্ন্মেণ্ট যে টাকা দিতে প্রস্তুত, সে টাকা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে, ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করলে চলবে না। মালিকের সম্মতি ব্যতীত বা যথোচিত ক্ষতিপূরণ না ক'রে কোনও লোকের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার বা হস্তান্তরাদিতে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলবে না। যদি কোনও নৌকা রিকুইজিশন করা হয় তবে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের মীমাংসা না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও নৌকাই দেওয়া হবে না। চার দিকে জলবেষ্টিত যে-সমস্ত স্থানে নৌকা ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব, সেখানে নৌকা মোটেই দেওয়া উচিত হবে না। মাছ ধ'রে যে-সমস্ত জেলে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাদের নৌকা নিতে হ'লে নৌকার মূল্য দিতে হবে, তদুপরি বৃত্তিচ্যুত হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সাইকেল, মোটর গাড়ী, অন্যান্য যানবাহন 'রিকুইজিশন' করা হ'লে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবী করা হবে এবং ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা দেওয়া হবে না।

যুদ্ধের দরুন নুন দুষ্প্রাপ্য হয়েছে এবং তার দুর্ভিক্ষ হবে ব'লে মনে হয়। সুতরাং সমুদ্রকূলে নুন সংগ্রহ করতে, প্রস্তুত করতে, এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে দেবার সুবিধা দেওয়া উচিত। লোককে নিজেদের তথা গৃহপালিত পশুাদির জন্যে বিনা আবগারি শুল্কে নুন প্রস্তুত করতে দেওয়া উচিত।

আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সম্বন্ধে কমীটির অভিমত এই যে, নিজেদের এবং প্রতিবেশীদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই জন্মগত অধিকার; এই অধিকারে কেহ বাধা দিলে সেই বাধা অগ্রাহ্য করতে হবে।"

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি যে পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। কিন্তু সরকারী যে-সব লোকের উপর সরকারী হুকুম তামিল করবার ভার থাকে, তাদের মধ্যে এমন লোক থাকা সম্ভব যারা ডেকে আন্‌তে বললে বেঁধে আনে। সুতরাং সরকারী রেকুইজিশ্যন অনুসারে কাজ করবার ও করাবার জন্যে তারা বলপ্রয়োগ করতে পারে। এরূপ বলপ্রয়োগ না করবার হুকুম গবর্ন্মেণ্টের দেওয়া কর্তব্য। এবং কংগ্রেসের সভ্যদের এবং অন্য দেশহিতৈষী লোকদের চেষ্টা করতে হবে, যে, সরকারী কোন কোন লোক বলপ্রয়োগ করলেও, বেসরকারী লোকেরা যেন অহিংস থাকে।

—

পঞ্জাবে বিক্রয়কর সম্বন্ধে জনমতের জয়

"ভারত" লিখছেন :—

পঞ্জাব হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পঞ্জাবের ব্যাপারীগণ বিক্রয়করের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করিবার জন্য যে সত্যাগ্রহ করিয়া দলে দলে কারাবরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, সংঘবদ্ধ সেই জনমতের চাপে অবশেষে পঞ্জাব সরকারকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্যাপারীমণ্ডলের নায়ক লালা বিহারীলাল চনন ব্যাপারীমণ্ডলের এক সাধারণ

সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিকন্দর বলদেব প্যাক্টের পর ব্যাপারীগণের মন হইতে অসন্তোষ দুরীভূত করিয়া পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার উন্নতি বিধানের জন্য লালাজী স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁর সহিত যে আলোচনা চালাইতেছিলেন তাহা সফল হইয়াছে। লালাজীর যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পঞ্জাব সরকার ব্যাপারীগণকে বিক্রয়কর হইতে রেহাই দিতে সম্মত হইয়াছেন, ১৯৪১-৪২ সালের জন্য কোনও ট্যাক্স আদায় করা হইবে না এবং পূর্ব্ববৎসর যে আট লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ আদায় করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যর্পিত হইবে। যখন এই করের ভার পীড়ন বলিয়াই জনসাধারণ মনে করিল এবং এই কর দিতে প্রজাসাধারণের যে ঘোর আপত্তি আছে তাহা যখন সভা সমিতি করিয়া জ্ঞাপন করা হইল, তখন পঞ্জাব সরকার নরম হন নাই এবং প্রতিবাদিগণের যুক্তির মধ্যে কোনও সার আছে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। নিরুপায় হইয়া ব্যাপারীমণ্ডল সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন ও দলে দলে ব্যাপারীগণ ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন বহু জননায়ক কারাবরণ করেন, তবুও সরকার অচল অনড় রহিলেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ জনমতের চাপ যে বহুদিন ঠেকাইয়া রাখা চলে না তাহা ক্রমে ক্রমে পঞ্জাব সরকার উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং ব্যাপারীগণ-প্রবর্ত্তিত বিক্রয়করের বিরোধী আন্দোলনকে প্রশমিত করিবার জন্য রফা-নিষ্পত্তির চেষ্টায় রত হইলেন। পরিশেষে জনমতের সম্পূর্ণ জয়ই হইল, ব্যাপারীমণ্ডলের নায়ক লালা বিহারীলাল চন্নন ব্যাপারীদিগের দাবী সম্পূর্ণভাবে আদায় করিয়া সংঘবদ্ধ জনমতের জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। এই বিজয়গৌরবের জন্য আমরা লালাজীকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি পঞ্জাব সরকারের যে শিক্ষা আজ হইল তাহা হইতে অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারও সাবধান হইবেন ও সংঘবদ্ধ জনমতকে পদদলিত করিয়া চলিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে সরকার জনগণেরই প্রতিনিধি এবং জনমত উপেক্ষা করা প্রতিনিধির পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে।

বাংলা দেশেও বিক্রয়-করের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও প্রতিবাদ-সভা হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ হওয়া দূরে থাক, একজন ব্যাপারীও সত্যাগ্রহ ক'রে জেলে যান নাই। বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে কোন প্রকারে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয় নি। সুতরাং করটা উঠে যাবার কোন সম্ভাবনা হয় নি, উঠে ত যাই-ই নাই।

—

প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবার্ষিকী দিবস

আগামী ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট, রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রার প্রথম বার্ষিকী দিবস। সেই দিন সারা দেশে নানা স্থানে তাঁর স্মৃতিসভা হবে। নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মারক প্রতিষ্ঠা কমীটির কলিকাতাস্থ সভ্যেরা সেই দিন কলকাতায় যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করবেন। তাঁরা বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটিকে সব স্কুল কলেজ সেই দিন বন্ধ রাখতে অনুরোধ করবেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণকে সেদিনকার সব অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য।

আমরা আগে আগে যে বলেছি, এইরূপ অনুষ্ঠানের অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ক্রয় ও প্রচারে অধিক পরিমাণে টাকা খরচ করা উচিত, সেই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করছি। রবীন্দ্রনাথের ভাল জীবনচরিতও এই সময় পঠিত হওয়া উচিত—যদিও তিনি লিখে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।" তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কোন জীবন-চরিতে নাই, তা তাঁর সম্বন্ধে (তাঁর কোন প্রকার রচনা সম্বন্ধে নয়) লিখিত বহু প্রবন্ধে এবং "নির্ব্বাণ" ও "পুণ্যস্মৃতি" পুস্তকদ্বয়ে পাওয়া যাবে।

—

ফরোআর্ড-ব্লক বেআইনী ঘোষণা

ভারতরক্ষা আইনের নিয়মাবলীতে একটি নূতন নিয়ম যোগ ক'রে সেই অনুসারে ফরোআর্ড-ব্লককে বেআইনী ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। সুভাষবাবু এই ব্লক স্থাপন করার পর থেকে যত দিন তিনি এদেশে ছিলেন তত দিন এই ব্লকের বিরুদ্ধে কোন বেআইনী কাজ করার অভিযোগ হয় নাই। তিনি অজ্ঞাতবাস করবার পরও এর বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ হয় নি। সুতরাং এখন এই ব্লককে বে-আইনী ঘোষণা করার প্রয়োজন, সার্থকতা বা ন্যায্যতা বোঝা গেল না। সরকারী এই হুকুম সমর্থনও করতে পারা গেল না।

নূতন নিয়মটি কিরূপ অর্গ্যানিজেশ্যানের (মণ্ডলী সংঘ প্রভৃতির) বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে, তাদের বর্ণনার এক অংশে আছে যে,

"(b) that the persons in control thereof have or have had, associations with persons concerned in the government of any State at war with His Majesty,"....

তাৎপর্য। মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত কোন রাষ্ট্রের গবর্ন্মেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত যেসব অর্গ্যানিজেশ্যানের (মণ্ডলী সংঘ ইত্যাদির) নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিদের সংসর্গ আছে, বা ছিল,...

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট একটি অর্গ্যানিজেশ্যান। ইহার নিয়ন্ত্রক পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে এক সময়ে কোন কোন শত্রু-নেতার সংসর্গ ঘটেছিল। কিন্তু তা ব'লে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বেআইনী অর্গ্যানিজেশ্যান ঘোষিত হবে না!

—

বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদ ও নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

১৯৪০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাহৃত হয়ে তার জায়গায় একটি নূতন বিল পেশ হওয়ায় গত ১১ই

জুলাই বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদের অধিবেশনে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। নূতন বিলটি যে কোন কোন বিষয়ে পুরাতন বিলটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা স্বীকৃত হয়, কিন্তু এর আরও উৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক ও সাধ্য, বলা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এক এক ধর্মসম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি মনোনয়নের বিরুদ্ধে পরিষদ আগে যে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন, সেই মত তাঁরা এখনও দৃঢ়তার সহিত পোষণ করেন, বলা হয়েছে। পরিষদ নূতন বিলে কি কি পরিবর্তন ও উন্নতি চান, তার একটি ফর্দ দিয়েছেন।

এইগুলি গবর্মেণ্টের কাছে পেশ করা হয়ে থাকবে।

বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদ তার গত অধিবেশনে যে-সব মত প্রকাশ করেছেন, তা ঠিক্। কিন্তু এই রকম মত প্রকাশই যথেষ্ট নয়। ১৯৪০ সালের বিলটার বিরুদ্ধে যে-রকম আন্দোলন হয়েছিল, ১৯৪২ সালের বিলটার আপত্তিজনক ব্যবস্থা ও ধারাগুলার বিরুদ্ধেও সেইরূপ সারা বাংলা দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিষবৃক্ষের বীজ এই বিলেও আছে। তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বর্তমান মন্ত্রিসভায় প্রভাবশালী হিন্দু সদস্য আছেন মনে ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকা মহা ভ্রম হবে। দেশহিতৈষীরা সজাগ ও সতর্ক হোন ও থাকুন।

বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদ ইংরেজী ও বাংলায় নূতন বিলটা যদি শিক্ষিত সাধারণের সহজলভ্য করতেন, তা হ'লে ভাল হ'ত।

—

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কংগ্রেসের কর্তব্য

গান্ধীজী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ভারতবর্ষের প্রভুত্ব থেকে স'রে পড়তে যে অনুরোধ করেছেন, সে বিষয়ে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির কোন সভ্যের তাঁর সহিত মতভেদ নাই। কোন কোন সভ্যের যে মতভেদ আছে ব'লে খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে, তা কেমন ক'রে এবং কয়টি ও কি কি ধাপে ধাপে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে হবে, সেই বিষয়ে।

ওআর্কিং কমীটির নির্ধারণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমীটি দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

যদি অনুমোদিত নির্ধারণ অনুসারে দেশব্যাপী আইন-অমান্য প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তা হ'লে মহাত্মা গান্ধী পুনর্বার কংগ্রেসের নেতৃত্ব, নামে এবং কাজে, গ্রহণ করবেন ব'লে অনুমিত হয়েছে।

এই বিষয়ে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির নির্ধারণ প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় ছেপে তার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি না বুঝা যাচ্ছে না। সম্ভব হ'লে নির্ধারণটি, মন্তব্য সমেত বা বিনা মন্তব্যে, ছাপা হবে।

—

"ব্রিটনেরা কভু হবে না দাস"

ইংরেজী "হরিজন" পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় গান্ধীজী লিখেছেন—

"In their schools the rulers teach us to sing 'Britons never shall be Slaves.' How can the refrain enthuse their slaves? The British are pouring blood like water and squandering gold like dust in order to preserve their liberty. Or, is it their right to enslave India and Africa? Why should Indians do less to free themselves from bondage?"

তাৎপর্য। তাদের ইস্কুলগুলাতে শাসকরা আমাদিগকে গাইতে শেখান, "ব্রিটনেরা কভু হবে না দাস।" এই ধুয়ায় তাঁদের দাসদের মন কেমন ক'রে উৎসাহদীপ্ত হ'তে পারে? ব্রিটিশ জা'ত তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে রক্ত ঢালছে জলের মত, সোনা অপব্যয় করছে ধূলার মত। ভারতবর্ষকে ও আফ্রিকাকে দাসত্ব শৃঙ্খল বদ্ধ করা ও রাখাটা কি তাদের একটা ন্যায্য অধিকার? দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্যে ভারতীয়দের কেন কম চেষ্টা করা কর্তব্য?"

—

খাদ্যসমস্যা

দেশে শুধু যে চাল ও ময়দার দাম বেড়েছে তা নয়; নুন চিনি গুড় প্রভৃতির দাম ত বেড়েইছে, সাধারণ শাকসব্জীর দামও খুব বেড়েছে। গবর্মেণ্ট দেশস্থিত এবং বিদেশ থেকে এদেশে আনীত সৈন্যদের আহার্য্য যোগাচ্ছেন এবং বিদেশে যে-সব সৈন্য আছে তাদের জন্যও খাদ্য পাঠাচ্ছেন। অন্য দিকে বিদেশ থেকে যত খাদ্যদ্রব্য আমদানী হ'ত, তার আমদানী খুব কমে গেছে। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে খাদ্য আমদানী রপ্তানী খুব সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই সব কারণে সব খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব বেড়ে গেছে, এবং বেশী দাম দিয়েও অনেক জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থার উদ্ভবের জন্য গবর্মেণ্ট অনেক অংশে দায়ী। সুতরাং প্রতিকারও গবর্মেণ্টকে খুব অবহিত হয়ে সহানুভূতির সহিত করতে হবে। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলে চলবে না; দেখতে হবে সেই দামে লোকে জিনিস পাচ্ছে কিনা। দেখতে হবে প্রত্যেক স্থানে যথেষ্ট খাদ্য আছে কিনা; না থাকলে আমদানী করাতে ও করতে হবে, উৎপাদন করাতে ও করতে হবে।

এই সঙ্কট অবস্থায় খাদ্য-ব্যবসাদারদেরও বিশেষ কর্তব্য আছে। তাঁরা অবশ্য লোকসান দিয়ে জিনিস জোগাতে

পারেন না। কিন্তু অতিরিক্ত লাভের আশা তাঁদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত। বণিকের একটি প্রতিশব্দ "সাধু"। প্রকৃত বণিক্ যাঁরা, সাধুতা তাঁদের ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ামক।

সেকালে সাধারণ গৃহস্থের ভিটায় ২।৪ হাত জমি থাকলেও তাতে নানা রকম তরকারির গাছ লাগান হ'ত। যাঁরা এই সাবেক চাল বজায় রেখেছেন, তরকারির দুর্মূল্যতা এখন তাঁদের কম গায়ে লাগবে। অন্য গৃহস্থেরা এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে লাভবান হবেন।

—

বর্ধমানে ট্রেন দুর্ঘটনা

বর্ধমানের মত বড় ও আলোকিত স্টেশনে গত ৭ই জুলাই রাত্রি ৯টার সময় দুটা ট্রেনে ধাক্কা লেগে অনেক লোক হত ও আহত হওয়া যেমন দুঃখকর তেমনি বিস্ময়-জনক ব্যাপার। আশা করি এই দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ কিছু না ঘটে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

—

ঢাকায় খুনাখুনি পুনরাবির্ভাব ও বন্ধ

কয়েক দিন পূর্বে ঢাকায় আবার যে খুনাখুনি আরম্ভ হ'য়েছিল, কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করতে পেরেছেন জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল।

বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বৃদ্ধির ও স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে, এটা দুর্বৃত্তদের সহ্য হচ্ছে না—তাদের বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে।

—

এমারির "ভারতবর্ষ ও স্বাধীনতা"

ভারত-সচিব এমারি সাহেব ভারতসচিবরূপে যতগুলি বক্তৃতা ক'রেছেন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম দেওয়া হয়েছে, "ভারতবর্ষ ও স্বাধীনতা"।

কথিত আছে, একদা এক আইরিশ বালককে সাপ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। সে শুধু লিখেছিল—"There are no snakes in Ireland," "আয়ার্ল্যাণ্ডে সাপ নাই।"

এমারি সাহেব যদি এই মিতভাষী প্রতিভাশালী বালকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে লিখতেন, "Freedom is not for India," "স্বাধীনতা ভারতবর্ষের জন্য নয়," কিংবা "There is no freedom in India," "ভারতে স্বাধীনতা নাই," তা হ'লে মন্দ হ'ত না। জানি, ঐ রকম দু-একটা বাক্য মুদ্রিত করলে একখানা বই হয় না। কিন্তু এমারি সাহেব পুনরাবৃত্তিবিশারদ এবং ইংরেজী ভাষায় সমার্থক শব্দ প্রচুর আছে। সুতরাং তিনি প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ঐরূপ এক-একটি বাক্য বা তার এক-একটি শব্দ কিম্বা "Slavery is India's birth-right," "Thraldom is India's heritage," এই রকম বাক্য বা তার অন্তর্গত এক-একটি শব্দ ছেপে দিলে একটি বই হ'তে পারত। কিন্তু তিনি তা না ক'রে, বাগ্‌জাল বিস্তার ক'রে ব্রিটিশ শাসকরা বরাবর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে কিরূপ উৎসুক, সে বিষয়ে কত চেষ্টাই যে ক'রেছেন করছেন তার অন্ত নাই, স্বাধীনতার ইচ্ছাটাই যে ব্রিটিশ শাসকদের চেষ্টায় ভারতীয়-দের মনে জন্মেছে, ইত্যাকার ইত্যাদি কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখেছেন। বইটার ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন, রয়টার দয়া ক'রে তা টেলিগ্রাফ ক'রে ভারতীয় দৈনিক-গুলির মারফতে ভারতীয় জনগণকে জানিয়েছেন—বইটি ত ভারতের লোকেরা দাম দিয়ে কিনবে না! আসলে এ রকম বই প্রধানতঃ ইংরেজবন্ধু আমেরিকানদের জন্যে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। তাদের ত জানা উচিত, ইংরেজ শাসন অভিশপ্ত ভারতের প্রতি বিধাতার বর।

এ বই, অবশ্য, ভারতীয়দেরও কাজে লাগতে পারে। ভারতসচিব কত প্রকারে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, তা বের করবার জন্যে এখন আর পুরাতন দৈনিক কাগজের নথি ঘাঁটতে হবে না, এই বইটা দেখলেই চলবে।

ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন, তার জবাব আগে আগে দেওয়া হয়েছে; পুনরাবৃত্তি করব না।

—

ফুটবলে ঈষ্ট বেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়নত্ব লাভ

আমরা নিম্নমুদ্রিত সংবাদ প'ড়ে খুশি হয়েছি। ঈস্ট বেঙ্গল দলকে অভিনন্দিত করছি।

> বিশেষ জনমণ্ডলী সমক্ষে শনিবার ২৬শে আষাঢ় ক্যালকাটা মাঠে ঈষ্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ নিষ্পত্তির খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় ঈষ্টবেঙ্গল দল তাদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলকে এক গোলে পরাজিত ক'রে বহু আকাঙ্ক্ষিত 'চ্যাম্পিয়ন' আখ্যা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এই খেলায় ঈষ্টবেঙ্গল দল যেরূপ খেলেছে তাতে তাদের পক্ষে বেশী গোলের ব্যবধানেই বিজয়ী হওয়া উচিত ছিল। মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক আশাতীত ভাল খেলে দুইটি নিশ্চিত গোল বাঁচাতে সমর্থ হওয়ায় তাদের পক্ষে একাধিক গোলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় নাই।
>
> ঈষ্টবেঙ্গল দলের এখনও একটি ম্যাচ খেলা বাকী আছে। ঐ ম্যাচে

তারা পরাজিত হলেও তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে কোন বাধা হবে না।

—

চীন-জাপান যুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসর

পাঁচ বৎসর পূর্বে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই চীনদেশ আক্রমণ করে। তখন জাপান মনে ক'রেছিল ও ব'লেছিল যে, কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ সাবাড় করতে পারবে, কিন্তু চীনের অনতিক্রান্ত স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সাহস ও রণদক্ষতায় জাপান সে-কাজ পাঁচ বৎসরেও করতে পারল না। এখন যুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসর চলছে। জাপান মধ্যে মধ্যে জিতছে বটে, কিন্তু চীন নানা তুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক স্থলে জাপানকে পরাস্ত করছে এবং জাপানের অধিকারভুক্ত অনেক জায়গা আবার দখল করছে। চীনের জয় সুনিশ্চিত।

—

সিন্ধুদেশে হুর-উপদ্রব

সিন্ধুদেশের গবর্মেণ্ট ক্রমশঃ হুর-উপদ্রব দমন করতে সমর্থ হচ্ছেন। তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

আরো কিছু

শ্রীউমা দেবী

আরো কিছু অনুরাগ আনো ও নয়নে।
নিবিড় আকাশতলে হাসিখুশী তারা জ্বলে,
জড়াও নিবিড়তর নিশীথ-শয়নে;
আরো কিছু অনুরাগ আনো ও নয়নে।

তুমি তো জান না, হায়, কেমনে যে কেটে যায়
সারা দিন কাজে কাজে এঘরে ওঘরে,
নামিতে সাঁঝের ছায়া ঘনায় বিধুর মায়া,
—গলানো সোনার মধু কোমল কেশরে—
শত আশা শত সুখ শত সাধে উন্মুখ
অবোধ শিশুর মত জাগে হিয়াতলে;
তাদের ফিরিয়া চাও, সকরুণ ছুঁয়ে যাও
রঙীন রেণুর দল মনের কমলে।
এসো ঘনতর হ'য়ে নিশীথ-শয়নে,
কিছু আরো অনুরাগ আনো ও নয়নে।

বেশী কিছু বড় সাধ এ মানসে নাই;
ছোট খাট সুখদুখ, সকাতর ভীরু বুক,
ছোট আশা পূরণের খুশীটুকু চাই।
বেশী কিছু বড় সাধ এ মানসে নাই।
আনন্দ-উচ্ছ্বাসী ফুটিয়া উঠুক হাসি
আরো কিছু রাঙা হ'য়ে অধরের কোণে,
আধ-আলো আধ-ছায় ঘন সুখ-বেদনায়
ঘনতর ছায়া আনো ও দুই নয়নে।

কিছু কোমলতা আরো পরশনে দিতে পারো,
কিছু মধু ঢালো আরো আলাপের সুরে,
আরো কিছু দৃঢ়তর বাহুর বাঁধন কর,
আনো অ-লোকের ছবি এ-লোকের পুরে।
এসো ঘনতর হ'য়ে নিশীথ-শয়নে,
কিছু আরো অনুরাগ আনো ও নয়নে।

তার পরে ভোর হ'লে রাঙা মেঘদলে
শতসুখ-উৎসুক ভুবনের ভরা বুক
ছলো ছলো যবে চায় নীলাকাশতলে
ভোরবেলা আকাশের রাঙা মেঘ দলে,—
তোমার গরবখানি পরানে জাগিবে জানি,
বাহিবে সোনার তরী কূলে না ভিড়ায়ে,
তুমি যা দিয়েছ মোরে তার শতগুণ ক'রে
খুশী মনে আমি তাই দিব গো ফিরায়ে।
এ ভুবন ঘুরে ঘুরে কাঁদে যেন কাছে দূরে,
তোমার পরশ-মণি লুকানো কি আছে?
যখন যেদিকে চাই তখনি দেখিতে পাই,
কী যেন আকুল হয়ে চায় মোর কাছে।
এসো ঘনতর হ'য়ে নিশীথ-শয়নে,
কিছু আরো অনুরাগ আনো ও নয়নে।

মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

৪

"সেই লেখাটাকে ভাগ করলুম—এখন মন দিয়ে পড়, তার পর যদি খুব কষ্ট না হয় তা হ'লে কপি কর। না না, থাক্, তোমায় বড্ড খাটাচ্ছি। তোমরা হ'লে সুকুমারী, তোমাদের দিয়ে কি এই সব দেড় গজ লম্বা কবিতা নকল করান উচিত! আচ্ছা দাও একবার প'ড়ে দিই। জান এখানে এসে অনেক দিন পর আবার আমি এমন ক'রে পড়ে শোনাই। এক টুক্‌রো লেখা হ'লেও ডাকি তোমাদের। ওখানে আজকাল আর এ হয় না। আসেন সন্ধ্যেবেলা পাঁচ জন ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা হয়, প্যোলিটিকাল তর্ক, সাহিত্য-আলোচনাও হয়, কিন্তু সে অন্য রকম। সেখানে দিনগুলো এ রকম ছুটিতে-পাওয়া-দিন নয়। যখন লিখি, ডেকে পাঠাই বাঙালকে দিই কপি করতে। কিন্তু লিখেই কাউকে ডেকে পাঠান শোনাবার জন্য, সে আর ত হয় না আজকাল। যাক্, লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুষ।" "আজ সন্ধ্যেবেলা কি পড়বেন?" "যা তোমরা অনুমতি করবে।" "বাঃ, আপনার স্বাধীন ইচ্ছা যা বলবে তাই ত।" "না, এ বিষয়ে আমার স্বাধীন ইচ্ছা নয়, সে কেবল কতটুকু খাব, ঘরে বসব না বারান্দায় বসব, সে সম্বন্ধে। এখানে তোমরা শ্রোতা, স্বাধীন ইচ্ছা তোমাদের পক্ষে।" "আজ তা হ'লে কবিতা পড়তে হবে।" "পড়ব, আর তোমাকে ঠকাব, জিজ্ঞাসা করব কোথা থেকে কোন্‌টা বলছি।" "কখনই পারবেন না, আপনাকে ঠকাতে পারি বরং। আচ্ছা বলুন,

চাহে নারী তব রথ সঙ্গিনী হবে—
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে—

কোথায় আছে?" "এ আবার কোথা থেকে জোটালে? স্বপ্নেও মনে পড়ে না যে আমি লিখেছি। নিশ্চয় তোমার অতিপ্রিয় কোন আধুনিক কবির লেখা।" "আহা তা হ'লে ত কথাই ছিল না, আধুনিক কবিদের মাথায় ক'রে নাচতুম।" "দেখ অতটা ক'রে কাজ নেই, সেটা আমার আবার সহ্য হবে না!" "কেন আপনার 'বিচিত্রিতা' মনে নেই? ওতেই ত আছে—

কুমার তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।"

"এই বইটা একটু আড়ালে রয়ে গেছে তা জানি, লোকে একে বেশী চেনে না, আমারও ভাল ক'রে মনে পড়ে না। তোমাকে আর আমার বড়কর্ত্তাকে ঠকান শক্ত।" খুকু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল "দাদু গান কর"। "এই দেখ কাণ্ড, তোমার কন্যার ভাষার পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, হয় চকোলেট দাও, নয় গান কর। কি গান করব তোমার মনের মত?···কেন 'নয়ন আপনি ভেসে যায়'···না, এ গানের এখনও তোমার সময় হয় নি, কিছু দেরি আছে, এ এখন তোমার মায়ের অবস্থা। গেয়ে চললেন—"যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে মনে পড়ে না গো কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়···চারি দিকে সব মধুর নীরব কেন আমার পরাণ কেঁদে মরে।

কেন মন কেন - এমন করে, কেন নয়ন, আপনি ভেসে যায়। কি অত মুহ্যমান হয়ে ভাবছ কি?" "আশ্চর্য্য লাগছে, আপনি যে আমাদের এই ঘরে এই চৌকিতে ব'সে গান করবেন কোন দিন স্বপ্নেও আশা করি নি। কল্পনা করতুম, সে কল্পনা সার্থক হবে কে জানত?" "কি আর করবে বল দুঃখ ক'রে, আগে যা মনেও করা যায় না এমন অনেক শোচনীয় ঘটনা ঘটে যায় জীবনে!" "বেশ আমি কি তাই বললুম?" "কি ক'রে বুঝব বল তোমার মনের কথা, সে-সব যে দেবা ন জানন্তি কত খরচ করাচ্ছি, আজ একটা ছবি এঁকে দিয়ে তোমার আজকের ঋণ শোধ করবই এই আমার প্রতিজ্ঞা!" "ছবি পেলে ত ভালই, কিন্তু ঋণশোধের অত ইচ্ছে কেন? না-হয় একটু ঋণীই রইলেন।" "সে হয় না, জান না সবাই বলে কবিরা বড় অহঙ্কারী।" "যারা বলে তারা কি আর কবি কখন দেখেছে?" "কেন তুমি যে কবিকে দেখেছ তার অহঙ্কার নেই মনে কর? জান না এক সময়

আমার স্বদেশবাসীরা আমায় খুবই অহঙ্কারী বলত। এবং তার মধ্যে একটু সত্যতাও আছে, আমি কোনদিনই কারুর সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতুম না। ভদ্রলোকেরা এলেন, আলাপ-আলোচনা, গল্প-সল্প, এ সবই ভাল লাগে, কিন্তু একটু দূরত্ব আছে আমার স্বভাবের ভিতরে চিরকাল। আমাদের বাঙালীদের যে স্বভাব 'এই যে দাদা আসুন আসুন একটু তামাক ইচ্ছে হোক,' এ কোন দিন করি নি। ফস্ ক'রে দাদা দাদা ক'রে যে গায়ে পড়ে আত্মীয় হয়ে ওঠা আমার দ্বারা সে-সব চলত না। বিশেষ ক'রে আমাদের সময়ে এই রকম গদ্‌গদ্ ভাবে আলাপের প্রথা ছিল। আমি চিরদিন দূরেই রইলুম, মনে প্রাণে স্বদেশী হ'তে পারি নি, ইচ্ছেও করি নি!" একটুক্ষণ চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগলেন, তার পর আবার বললেন, "মনে আছে সেই প্রথম স্বদেশী যুগে, নেমেছিলুম ত কাজে, কিন্তু টিকতে পারলুম না। গদগদ সেন্টিমেণ্টালিজ্‌মে ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমেই আবিল হয়ে উঠল। ধিক্কার এল মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠতেন, 'মাটি ত নয়, মা'টি', কেঁদে ভাসায় আর কি! অসহ্য হয়ে উঠত আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠ, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময়ে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই দেখতে লাগলুম কত মৌখিক কত ব্যর্থ এ সব গদগদ বক্তৃতা! জান, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের সময়, তখনও এদেশে ভাল ক'রে খবর পৌঁছয় নি, আমি বোধ হয় চৌধুরীদের ওখান থেকে খবর পাই, ভাল ক'রে মনে নেই, কিন্তু শুনে যে একটা প্রবল অসহ্য কষ্ট হয়েছিল সে আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হ'তে লাগল এর কোন উপায় নেই, কোন প্রতিকার নেই, কোন উত্তর দিতে পারব না, কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয়, তাহ'লে জীবনধারণই যে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই রাত্রেই ঐ চিঠি লিখলুম, রাত চারটের সময় চিঠি শেষ ক'রে তবে আমি শুতে যেতে পেরেছিলুম। কাউকে বলি নি এ বিষয়ে, রথীদেরও না। জানি এ সব ব্যাপারে বেশী পরামর্শ কিছু নয়, পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়। মনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে যা হোক একটা কিছু তার এখুনি করা চাই। সেই সময়ে আমি ——কে বললুম যে এ ব্যাপার নিয়ে আপনি একটা দেশব্যাপী আন্দোলন এখনই সুরু করুন। কিন্তু তখন তাঁর ——এর সঙ্গে কোন সুবিধের পরামর্শ চলছিল। সেটা নষ্ট করতে চাইলেন না, পরে অবশ্য এই ব্যাপারকেই প্রধান প্ল্যাটফর্ম্ম ক'রে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কি যে আশ্চর্য্য লেগেছিল আমার! তার পর ——কে বললুম যে একটা প্রোটেষ্ট মিটিঙের ব্যবস্থা কর, আমিও বলব তোমরাও বলবে। সে বললে, "আপনিই করুন, আমরা না-হয় সভায় উপস্থিত থাকব।" একে কি বলতে চাও? এই সব হ'ল পোলিটিশিয়ানদের পলিটিক্স! সুবিধে বুঝে বুঝে চলতে হবে, এর সঙ্গে কখনো মন মেলাতে পারি নি। অবশ্য এ সব প্রোটেষ্ট মিটিঙে যে বিশেষ কিছু ফল ছিল তা নয়, তবু অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাসময়ে না করলে সেটা নিজের প্রতিও অন্যায়। যখন প্রতিবাদ মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তখন চুপ ক'রে থাকব কারণ সেইটেই সুবিধের, তার পর দরকার-মত সুযোগ-মত প্রতিবাদ করব, এ আমার দ্বারা হবার নয়। সেই জন্য সেই রাত্রেই ঐ চিঠি না লিখে আমার পরিত্রাণ ছিল না, নিষ্ফল বেদনা আমার মনকে চেপে ধরেছিল। তার হাত থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই তখন ছিল না। ওদের ওটা খুব অপমান লেগেছিল। ইংরেজ রাজভক্ত জাত। রাজাকে প্রত্যাখ্যান, সেটা তাই অত আঘাত দিয়েছিল ওদের। আমি আগেই তা জানতুম এবং সেই জন্যেই লিখেছিলুম। কিছুই ত করতে পারব না কত ব্যর্থ কত সামান্য আমাদের এসব নিষ্ফল প্রোটেষ্ট। তাই ভেবেছিলুম আমার সাধ্যে যতটুকু আছে যা করাতে সব চেয়ে বেশী লাগাতে পারি তাই করব। দেখলুম অনেক দিন পর্য্যন্ত ওদেশেও ওরা ভুলতে পারে······ ও কেও অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালে? তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী?" "অত কবিত্বময় কেউ নয়, আমি।" "ও তাই বল মাসী, তাহলে ত বলা উচিত ছিল, 'আকুল কেশে কে আসে চায় ম্লান নয়নে, ও কে চির বিরহিণী'।" "বাঃ আজ আলো জ্বালা হয় নি কেন, কেউ আসে নি এখনও? আজ পড়া হবে না নাকি?" "নিশ্চয় হবে, তোমার ধ্যান ভঙ্গ হবে, মৃগচর্ম্ম ছেড়ে এই মরলোকের অভাজনদের কথা মনে পড়বে তবে ত? তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি যে।" সে দিন পড়া হ'ল ঝুলন, সুপ্রভাত আর তপোভঙ্গ।

আলো জেলে দেওয়া হয়েছে, শুভ্র চুলের উপর আলো প'ড়ে ফিরে আসে তার আভা। কাব্যগ্রন্থটা হাতে নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে একটু একটু হাসছেন, "আজ যদি

তোমায় জব্দ না করি, আচ্ছা বল—'উদয়শিখরে সূর্য্যের মত, সমস্ত প্রাণ মম, চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম'।" "আহা,

অগাধ অপার উদার দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা
তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা!

এ ত মানসীর, সবাই বলতে পারে!" মাসীর ততক্ষণ ভয় ঢুকে গেছে, "আমি এসব পরীক্ষার মধ্যে নেই।" "না মানসী চলবে না, ওটা আমারই ভুল হয়েছিল, এ সোজা। আচ্ছা বল শীগ্ গির বল,

দেখিতে দেখিতে মোর লাগিল নেশার ঘোর
কোথা হতে মনচোর পশিল আমার বক্ষে
যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভুতে পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া আর বুঝি নাই রক্ষে!

কোথায় আছে?" "এ আবার কোথায় আছে? মনচোর-টোর যত সব সেকেলে কথা, এ কখনও আপনার লেখা নয়!" "তা ত বলবেই, হেরে গিয়ে এখন লেখার দোষ, মনচোর একেবারে সেকেলে কথা হয়ে গেল, এ যুগে আর ওসব উৎপাত নেই বলতে চাও? যাক হ'ল ত এবার দর্পচূর্ণ। এই দেখ এমন কিছু অখ্যাত বই নয়, চিত্রা! বলতে বলতে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন, হঠাৎ গম্ভীর গর্জ্জনে পড়ে উঠলেন:—

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা

* * * *

ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা।

এ নিজের মনের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ, সেই যুদ্ধতে, সেই দ্বন্দ্বতে আছে আনন্দ। জাগ্রত হয়ে উঠেছে প্রাণ, সহস্র চিন্তায় কর্ম্মে সে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চায়। আর স্বপ্ন শয়ন নয়। বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা। প্রাণকে আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা নয় emotional intellectual দ্বন্দ্বর মধ্যে জীবনকে পাওয়া, নিজের সঙ্গে নিজের সেই লীলাতেই আত্ম-পরিচয়ের আনন্দ, জীবনের সার্থক জাগরণ।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে
......
এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতন ভরে
শয়ন পরে
ব্যথা পাছে লাগে দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে
......
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ
আলস রসে
আবেশ বশে
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার
......
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে।

অধিকাংশ জীবনই ত এই, কি বল? বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ! নিত্য অভ্যাসে বাঁধা একঘেয়ে জীবন! তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা। একবার এমনি ক'রে পড়ে গিয়ে শেষে সম্পূর্ণটা পড়লেন। পড়তে পড়তে উত্তেজিত ভাবে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, পায়ের উপর থেকে চাদর স্খলিত হয়ে পড়ে গেল। এক হাতে বই ধরে আছেন আর এক শুভ্র দীর্ঘ বাহু ছন্দের তালে তালে উত্তেজিত ভাবে নাড়ছিলেন ঘরের অল্প আলোতে দেওয়ালের উপর সে হাতের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওঠা-নামা করছিল, সে ছবি এখনও দেখতে পাই, গম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি ছিল সে কণ্ঠস্বরে—

দে দোল দোল
দে দোল দোল
এ মহাসাগরে তুফান তোল
বঁধুরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল
কি হিল্লোল!"

পড়া শেষ হয়ে গেলে ফেলে দিলেন বই মাটিতে। "এই লও." সবাই চুপ ক'রে বসে রইলুম। পাশের টেবিল থেকে পূরবী তুলে নিয়ে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন, তার পর হঠাৎ পড়তে সুরু করলেন—

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুত বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি
অন্ধতামস গেছে কি না ছুটি
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রা জড়িমা মাজিয়া।

সেই গম্ভীর স্বর আজও কানে আসে—

বাজে রে গরজি বাজে রে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন মাঝে রে
চমকি জাগিয়া পূর্ব্ব ভুবন
রক্ত বদন লাজে রে।

আর মনে পড়ে মন্ত্রের মত উচ্চারিত সেই বাণী যে বাণী একদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রাণ শত শত আত্মত্যাগী বীর দেশপ্রেমিকের ধমনীতে

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

সেই বই থেকেই একটু পরে পড়েছিলেন 'তপোভঙ্গ'। "যাই বল, কুমারসম্ভবের ওই একটি স্বর্গ ছাড়া আর কোনোটা সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। ওই একটি স্বর্গই ভালো, খুব ভাল —

ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ—।

কিন্তু ভাল নয় ঐ হিমালয়ের বর্ণনা তা বলতেই হবে। এত আর্টিফিশিয়াল, ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, কি করেই বা মহাকবি লিখলেন, কি করেই বা লোকের ভাল লাগত এত, বিশেষ ক'রে যাঁরা কাব্যরসিক। কি না 'ভিন্ন শিখণ্ডীবর্হঃ'! কী কবিত্ব, ময়ুরের পুচ্ছ চেরার মতই অতি সূক্ষ্ম কবিত্ব। যত ধনরত্ন, কিন্নরকিন্নরী এই কি হিমালয়ের বর্ণনা! সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যই বড় বেশী রকম আর্টিফিশিয়াল, ইনিয়ে বিনিয়ে আর বানিয়ে বানিয়ে লেখা। এক শকুন্তলা বাদ দিলে বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যিকারের ভাল জিনিস খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। ঐ আর একটা বই আমার ভাল লাগত বসন্তসেনার গল্পটা, বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাব আছে ওটাতে। ধর না এই রতিবিলাপ। সে কি সাংঘাতিক বিলাপ, এত বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না কি ক'রে লোকের ভাল লাগত। একটা ছোট কবিতা মনে পড়ে কার লেখা জানি নে, তার বক্তব্য হচ্ছে সে নায়িকা আয়নায় মুখ দেখে না, কারণ মুখ দেখলেই ত চাঁদ দেখা হয়। আর চাঁদ বিরহিণীদের পক্ষে একেবারে মারাত্মক কি না! চাঁদ আর মলয়সমীরণ একেবারে চলবে না। বিরহিণীদের একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হবে তা হ'লে। এ সবও কবিতা হায় রে।" "কাল কিন্তু আপনাকে শকুন্তলা পড়তেই হবে। আমরা মোটেই আপনার কাছে সংস্কৃত পড়া শুনি নি।" "ও বাবা, তোমার বাবা টের পেলে কি হবে, তিনি বলবেন, অনধিকার প্রবেশ। আমাদের দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয় মোটেই, আমার পিতৃদেবের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাঙালীর সংস্কৃত পড়া অস্তুত্তর সাং দিশি দেবতাত্তা, হিমালয় নাম্ নগাধিরাজ, এই ত? আর একটা দেখি কেউ উচ্চারণ করতে পারে না. বিশেষতঃ বাঙালরা, অমৃতকে বলবে 'অম্রিত'! 'পিত্রি-মাত্রি' আর একটা আছে 'আব্রিত্তি' কখনও শুনি নে কেউ বলে আবৃত্তি সবাই বলবে 'আব্রিত্তি'। তুমি কি বল, নিশ্চয় 'অম্রিত' বল?" "কখনই নয়, দেখবেন পরীক্ষা ক'রে।" "এখন আর হবে না, সাবধান হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার তা হলে উচ্চারণ বৃত্তান্ত ছেড়ে কাচের ঘরে গেলে হয়। হ'ল ত তোমাদের আশ মিটিয়ে কবিতা-পড়া।" "তা হ'লে এর পর থেকে এক দিন গল্প এক দিন কবিতা পড়া হবে।" "আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা, যা বলবে তাতেই প্রস্তুত, রয়েছি তোমাদের অধীনস্থ। এখন তা হ'লে চল যাই স্বস্থানে।" "আর এখন কাচের ঘরে গিয়ে কি হবে, এইবারে শুয়ে পড়ুন।" "উঁহুঁ সে চলবে না, এ সব বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, সম্পূর্ণ স্বাধীন।" এখন ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে আমাদের এই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কি ক'রে তাঁর কাছে লেখা শুনতে চাইতুম, সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতুম কি সাহসে! আর উনিও যে অত খুশী হয়ে শোনাতেন সেও আশ্চর্য্য! এক দিন কথায় কথায় সে কথা বলেছিলুম। হেসে বললেন, "জান না শ্রোতা যত অর্ব্বাচীন হয় আমার তত সুবিধে, তত কম ধরা পড়ে ফাঁকি! আসল কথা কি জান, কবিতার প্রধান কাজই হচ্ছে খুশী করা। পড়ে যদি আনন্দ পাও সেই ত যথেষ্ট। কবিতাকে প্রধান বোঝা উপভোগের দ্বারা, কারু সেটা হয় কারু বা হয় না, তার উপরে আর তর্ক চলে না। যে কবিতা পারে গ্রহণ করতে যার মন রসসিক্ত হয় তার হয়, যার হয় না তাকে তর্ক ক'রে বোঝান চলে না, আর বুঝিয়েই বা লাভ কি! তাই বলছি পড়ে যদি আনন্দ পেয়ে থাক, সেই ত যথেষ্ট। তারও চেয়ে বেশী একটা কিছু প্রত্যাশা ক'রে হা-হুতাশ করবার দরকার কি!" "কিন্তু অনেকে যে বলেন আমাদের এই ভাল লাগা যে ভাল লাগায় আমরা রাতের পর রাত কবিতা পড়ে কাটাতে পারি, যে ভাল লাগা সকল রকম অবস্থাতেই মনের প্রধান আশ্রয়, সে নির্ব্বোধের উপভোগ মূল্যহীন, যদি না কবির বক্তব্যই বুঝতে পারি।" "যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতভেদ। কবির বক্তব্য চুলোয় যাক্, পাঠকের মনের উপর সে অনায়াসে নূতন রূপ নিতে পারে। বোঝা অনেক রকম আছে, যাঁরা খুঁচিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে

ক'রে বোঝেন তাঁদের বোঝা কবিতা বোঝা নয়—কবিতাকে সত্যি সত্যি বুঝতে হ'লে তার সমগ্র রূপকে গ্রহণ করার, ভাল লাগার, বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষমতা থাকা চাই। মর্ম্মব্যবচ্ছেদ যত প্রবল হয়ে ওঠে কবিতা তত ব্যর্থ হয়ে যায়। যত মাটি করে এই অধ্যাপকের দল যারা কবিতার নোট লেখে আর ক্লাসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে। 'কবি বলিয়াছেন—' আহা, কবি যা বলিয়াছেন তা ত কবিতাতেই আছে, আর যদি না বলিয়া থাকেন তবে সেটা জুড়ে দিয়ে লাভ কি? প্রত্যেকটি কথা তারা খুঁটিয়ে দেখে কোন্‌টি কেন বলিয়াছেন তার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, যে তাৎপর্য্য একমাত্র তাঁর ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন রকমেই মনে আসত না কি দরকার সে ব্যাখ্যা দিয়ে আমার? আমার কাছে আমার ব্যাখ্যা আছে। টীকা লেখবার কোন দরকার হয় না। কবিতা যদি ভাল কবিতা হয় তা হ'লে সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তার মধ্যেই আছে তার ব্যাখ্যা, রসের ব্যাখ্যা, আনন্দের ব্যাখ্যা। তাকে গ্রহণ করবার জন্য scan করবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তবে যদি কেউ বলেন সমালোচনার কি কোন মূল্য নেই, নিশ্চয় আছে, সমালোচনার মূল্য খুবই আছে কিন্তু নোটের বা explanation-এর কোন মূল্য নেই। যথার্থ সমালোচনা সে ত এক পৃথক্ সাহিত্য, সেও সৃষ্টিকার্য্য। তার মূল্য কম নয়, কিন্তু তাই বলে যে কবিতার রস পেতে হ'লে আগে পণ্ডিতের কাছ থেকে পাঠ নিতে হবে তার কোনো মানে নেই, সে একেবারে ভুল কথা। আমি ত দেখি, তোমরা যারা unsophisticated তারা যেমন ক'রে রস পাও, যারা বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকে তাদের সে মন নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা কোনো কালে ছিল না। আসল কথাই হচ্ছে মনের দরদ দিয়ে অনুভূতি দিয়ে একে গ্রহণ করতে হয়—'কবিতা কোমল বনিতা যদি সা দুর্জ্জনহস্তে পতিতা, প্রতিপদ ভগ্না সংশয় মগ্না'।

"তোমাদের এই মেদিনীপুরের বাবুর্চিরা কি আর শুক্ত রাঁধতে পারে, ওসব এদের কর্ম্ম নয়। আজকাল তোমাদের উপকরণ অনেক বেশী, আয়োজন সৌখিন রকমের কিন্তু আগে যেমন হ'ত এখন আর হয় না। ওই ত সেদিন কচুর মুড়কী করল কিন্তু আগে যেমন হ'ত তেমন হ'ল কি?" "তার কারণ আছে আপনার ভিতরে। সে মুড়কী বোধ হয় এই রকমই ছিল কিন্তু দূরের দিনগুলোর স্মৃতি ভাল কিনা তাই মনে হয় শুক্তও বুঝি ভাল।" "তা হ'তে পারে, অসম্ভব নয়, কারণ আমার ভিতরে। সেই যে তেতালার ছাদে নতুন বৌঠানের হাতের রান্না, সে মনে হ'ত একেবারে অমৃত। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে খোঁচাতেন। সেটা যে স্নেহ তা ত বুঝতুম না। লজ্জা পেতুম, দুঃখ হ'ত, মনে হ'ত কি ক'রে এমন হব যে আর কোনো দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না। সবাই খেতে বসেছি। হঠাৎ তিনি বলতেন, 'দেখ দেখ রবি কি রকম ক'রে খায়, ঠিক ওনার মত ক'রে।' কি লজ্জাই পেতুম তখন। অথচ সেটা কম্প্লিমেণ্ট, ওনার মত ক'রে খাওয়া খুবই বড় কম্প্লিমেণ্ট। 'রবি সব চেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভাল নয়। গলা যেন কী রকম, ও কোনো দিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ঢের ভাল গায়।' অথচ এ সবই ছলনা, মনে মনে বলতেন তার উল্টো। তিনি ত কখনো স্বীকার করতেন না যে আমি লিখতে পারি বা কোনো কালে পারব। বিহারীলাল ছিল তাঁর আদর্শ। শুধু একটিমাত্র গুণ আমার স্বীকার করতেন যে, আমি ভাল সুপুরি কাটতে পারি। 'রবি কী চমৎকার সুপুরি কাটে!' ওটা অবশ্য ছিল কাজ আদায়ের ফন্দী। আচ্ছা আজকাল তোমাদের কি সুপুরি-কাটা উঠে গেছে? এখন যেমন দেখি পশম আর কাঠি নিয়ে তোমাদের হাত চলছেই, তখন তেমনি জাঁতি আর সুপুরি হাতে হাতে ঘুরত। যাক্, আমি তাঁর ইচ্ছে মত সুপুরি কাটায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারলুম না। ইস্কুল থেকে ফিরে যদি দেখতুম তিনি বাড়ী নেই, ভারি দুঃখ হ'ত। তিনি বলতেন, বাঃ, তোমার জন্য কি আমি আত্মীয়তা লৌকিকতা ছেড়ে দেব নাকি। খুব আব্দার করেছি তাঁর কাছে। তার পরে শেষ হয়ে গেল সেই তেতালার ছাদের পালা। একটার পর একটা পালা চলেছে জীবনের। নূতন নূতন পর্ব্ব। এখন দূরের থেকে দেখতে আশ্চর্য্য লাগে। বারে বারে দৃশ্য পরিবর্ত্তন, নূতন নূতন পালার, এখন সামনে এগিয়ে আসছে চরম যবনিকা। আর তাই যদি হয় তা হ'লে শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিপদর হাতের অমৃত এই বেলা খেয়ে নাও গে।"

বল ও সমাজ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে এই একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যে আত্মরক্ষা ও সন্তান রক্ষা এই দুটো ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়ে গেলে আর কোন বিষয়ে তা'দের নূতন নূতন চাওয়া গজিয়ে ওঠে না। অজগর সাপ হয়তো একটা ছাগল গিলে ফেল্‌ল, কিন্তু তারপর তা'র আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে অসাড় হয়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে, শুয়ে' থাকে। পাখীরা ভোরে উঠে' গান গায়, তারপর বের হয় আহারের সন্ধানে। দ্বিপ্রহরে হয়তো বা করে বিশ্রাম, নয়তো বা আহার দুষ্প্রাপ্য হ'লে তা'রই সন্ধানে হয় অপেক্ষা ক'রে থাকে শিকারের, নয় অনুসন্ধান ক'রে ফেরে তা'র গতি, বৈকালে নিবাস-নীড়ে ফিরে' আসে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক অভাবের তাড়নায় তা'রা কাজ করে, আর সে উত্তেজনার অভাব হ'লে তারা কোন কাজ করে না। মানুষের মধ্যেও নিম্নস্তরে এরূপ পশুধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখান যেতে পারে, যা'রা একান্ত ক্ষুৎপিপাসার তাড়না না হ'লে কাজ করতে চায় না; ক্ষুৎপিপাসার কথঞ্চিৎ উপশম ঘট্‌লে কাজ না ক'রে বরং দু' এক দিন উপোস চালাতে তারা প্রস্তুত থাকে। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে এক হপ্তা কাজ ক'রে সেই হপ্তার বেতনের সঞ্চয়ের ওপর তারা হয়তো আরও দু'হপ্তা কাটিয়ে দেয়, তারপর একান্ত যখন কোন উপায় না থাকে তখন এসে কাজে লাগে।

কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে কেবল মাত্র ক্ষুৎপিপাসা প্রশমনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম আবশ্যক তা'র শত গুণ, এমন কি সহস্র গুণ পরিশ্রম কর্‌তে তা'রা কুণ্ঠিত হয় না। তা'দের শুধু আহার হ'লে চলে না, তা'দের আবশ্যক হয় আহারের নানারূপ বিলাস। বস্ত্রের উদ্দেশ্য লজ্জানিবারণ নয়, সৌন্দর্য্যের প্রসার বৃদ্ধি। চার হাত ঘ'রের মধ্যেই একটা মানুষ শুয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা'দের বাসস্থানের জন্য আবশ্যক হয় বহু সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রকোষ্ঠের। আবার বাড়ীর চেয়ে তা'দের বাগান আরও হয় বড়। প্রয়োজনের অন্ত আছে, কিন্তু বাহুল্য ও শোভা-বৃদ্ধির অন্ত নাই। তা'রা কেবল নিজেদের অন্নপানের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করে না, কিন্তু আত্মীয়স্বজন, সুপোষ্য, কুপোষ্য, অপোষ্য বহু মৎকুণ জাতীয় জীবেরা তাদের আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরে রেখে যেতে চায় তা'রা অপরিমেয় সম্পত্তি ও ভোগের উপকরণ, তাদের সন্তানসন্ততিরা যা'তে স্বচ্ছন্দে বিনা পরিশ্রমে ভোগবিলাস ক'রে কাল কাটা'তে পারে। সেই সন্তানসন্ততিরা যদি যথার্থ মানুষ হয় তবে তা'রা ভোগবিলাসে দিন কাটায় না, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের অবসর নিয়ে তারা চেষ্টা করে সেই ধনকে বাড়া'তে, এবং এম্‌নি ক'রে বংশানুক্রমে ক্রমশঃ ধনবৃদ্ধি কর্‌তে থাকে। এমন লোক অতি বিরল যে বলে, আমার যথেষ্ট ধন আছে, আমার আর ধনের আবশ্যক নেই। একেই বলে—"ধনৈষণা"। এই ধনৈষণার কোন অন্ত নেই, কোন সীমা নেই। শুধু ধন নয়, সমস্ত বিলাসোপকরণের সম্বন্ধেই একথা বলা যেতে পারে।

ধন সম্বন্ধে যে-কথা বলা গেল, যশ বা গৌরব সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে। যাঁ'রা মহত্তর ব্যক্তি তাঁ'রা চান যশ ও গৌরব। তাঁ'রা হয়তো অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন, বহু ধনের তাঁ'দের লিপ্সা নেই; বড় বাড়ী ও বড় বাগানের প্রতি তাঁ'দের কোন লোভ নেই। কটি থেকে আজানু অধিক বস্ত্রের তাঁ'দের কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু তাঁরা চান কোন একটা মহৎ কাজ ক'রে, দেশের বা দশের মহা উপকার ক'রে একটা চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যেতে। ধনলিপ্সু যেমন ধনাহরণের জন্যে সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে নিরন্তর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকে, অসাধারণ মানুষেরা অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জনের জন্যে সেই রকম নিরন্তর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকেন। কেহ জীবিকার জন্যে পরিশ্রম করলে আমরা তা'দের সম্বন্ধে অনুশোচনা ও মমত্ব প্রকাশ ক'রে থাকি, ব'লে থাকি—দু'মুঠো খাবার জন্যে বেচারা দুপুর রোদে কি পরিশ্রম করছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে দু'মুঠো খাবারের অভাব হয়েছে বলেই তারা শরীরটাকে নাড়াচাড়া করছে; সে দু-মুঠো খাবারের অভাব না থাকলে তা'রা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ীতে ব'সে থাকতো এবং অবসরবিনোদনের জন্য আশ্রয় নিত

মধুকমস্তের। কিন্তু যে ধন শুধু ব্যাঙ্কেই জমা থাকবে, যে ধনের একটি ন্যূনতম ভগ্নাংশও ভোগের জন্য ব্যয় হবে না, সেই ধন আহরণের জন্য এক শ্রেণীর লোকেরা কি না পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছে! শিকন্দর শাহ্ ছিলেন রাজপুত্র। তাঁ'র অন্নপান, ভোগবিলাসের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সে সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে দেশের পর দেশ জয় করবার জন্যে কত পরিশ্রম, কত কঠিন ক্লেশ তিনি সহ্য করেছিলেন। এত কষ্টলব্ধ বিজয় তিনি ভোগ করতে পারলেন না, প্রত্যাবর্তনের পথেই তিনি পঞ্চভূতে বিলয় প্রাপ্ত হলেন। আজ যদি আমরা গৌরব ক'রে বলি যে শিকন্দর শাহ্'র ন্যায় বীর দুর্লভ, তবে সে কথা শুনে' আনন্দ অনুভব করবার জন্যে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন না। কিন্তু এই ভবিষ্যতের কীর্ত্তি তিনি তাঁ'র চোখের সামনে এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে তা'র জন্যে তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। নিউটন ছিলেন কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। অন্নবস্ত্রের কোন ক্লেশ তাঁ'র ছিল না। কেন কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি লিখতে গেলেন Principia Mathematica? মানুষ যেমন ধনের জন্য, কীর্ত্তির জন্য, নিরন্তর পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি সে পরিশ্রম করতে পারে নিরন্তর সত্য আবিষ্কারের জন্য, বিদ্যার জন্য। সমস্ত প্রতিভাবান লোকেরাই তাঁ'দের ইচ্ছা পূরণের জন্য অসীম পরিশ্রম স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। কার্লাইল ব'লে গিয়েছেন যে ধৈর্য্যের সহিত অক্লান্তভাবে অসীম পরিশ্রম করবার ক্ষমতাকেই বলে, প্রতিভা। লেওনার্ডো ডা ভিঞ্চি পৃথিবীর একজন অতি বিখ্যাত শিল্পী। তিনি তাঁ'র Treatise of Painting নামক গ্রন্থে ব'লে গিয়েছেন যে সেই ব্যক্তিই চিত্রী বা রূপদক্ষ হ'তে পারে যে চিত্রের ঈষন্মাত্র ভ্রম সংশোধনের জন্য পরমানন্দে অসীম পরিশ্রম স্বীকার করতে পারে। কথিত আছে যে তিনি যখন তাঁ'র "Last Supper" চিত্রটি আঁকেন তখন চিত্রটির পরিকল্পনা করবার জন্যে বর্ণপটের সম্মুখে তুলি হাতে করে' সাত দিন ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন। তবেই দেখা যায় যে মানুষ কি ধনাহরণের জন্য, কি কীর্ত্তির জন্য, কি প্রতিষ্ঠার জন্য, কি জ্ঞানের জন্য, কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হয় না।

উপনিষদে আছে যে যাজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁ'র দুই পত্নী কাত্যায়ণী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে তাঁ'র ধন বিভাগ ক'রে দিয়ে প্রব্রজ্যার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন তখন মৈত্রেয়ী তাঁ'কে বলেছিলেন—ধনে যখন অমৃতত্ব লাভ করা যায় না তখন ধনে আমার প্রয়োজন নেই।

"কিমহং তেন কুর্য্যা যে নাহং মৃতা স্যাম্"। 'অত্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে 'আত্মন্' শব্দ। আমাদের আত্মার মধ্যে নিরন্তর প্রসুপ্ত রয়েছে একটা গতিস্বভাব, সে কোথাও থামতে চায় না। শ্রেষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত হয় তাঁ'র আত্মাতে, তা' সংক্রান্ত হয় আত্মার বাধাহীন গতিধর্ম্মে, তাঁ'র মহত্বে, তাঁ'র বৃহত্বে। তাই মানুষের মধ্যে ইচ্ছা তা'র দেহধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে নিরন্তর ধাবিত হ'তে থাকে একটা অনির্দ্দেশ্য ক্রমপ্রসারী দিগন্ত লোকে। মানুষ তা'র ইচ্ছাকে ছোটাতে গিয়ে দেখে যে সে ছুটেছে রামধনুর দেশে, যতই চক্রবালরেখার সে নিকটবর্ত্তী হ'তে চায় ততই সে রেখা দূর হ'তে দূরতর, দূরতম দেশে প্রসারিত হয়, তাকে কিছুতেই বাহুবন্ধনে বেষ্টন করা যায় না। তাই মানুষ বলেছে, আমার তেমন বস্তুতে প্রয়োজন নেই যে বস্তু কখনও ক্ষয় হবে, ধ্বংস হবে। সে চায় অমরত্ব। এরই প্রতিবিম্ব পড়েছে মানুষের ধনৈষণায়, মানুষের বিবিদিষায়, মানুষের কীর্ত্তিলিপ্সায়, সৌন্দর্য্যলিপ্সায়। তাই মানুষ চায় যে সে এত ধন অর্জ্জন করবে যে ধনের কখনও ক্ষয় হবে না, যে ধনের কোন সীমা থাকবে না। সে এমন কীর্ত্তি অর্জ্জন করতে চায় যে কীর্ত্তি স্থায়ী থাকবে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ"। এমন গৌরব সে পেতে চায় যার প্রতিস্পর্দ্ধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকবে না। সে চায় এমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে যে আদর্শের কাছে তা'র সমস্ত সৃষ্টি নিরন্তর ম্লান ব'লে মনে হয়। মহাসার্থকতার মধ্যে দাঁড়িয়েও ব্যর্থতার হাহাকারে সে নিরন্তর আপনাকে পীড়িত করতে থাকে। শ্রীচৈতন্য ছিলেন ভক্তের চূড়ামণি। কিন্তু 'আরো প্রেম, আরো প্রেম' ব'লে তিনি সারা জীবন কেঁদে কাটালেন, কিন্তু তাঁ'র আশাপূর্ণ হয় এমন প্রেম তিনি পেয়েছেন ব'লে কখনও ম'ন করতে পারলেন না। মানুষের চাওয়া নিরন্তর ছুটে' চলেছে তা'র মুঠার নাগালের বাইরে। মানুষের মধ্যে, তা'র অধ্যাত্ম স্বভাবের মধ্যে, রয়েছে যে সীমাহীন গতিশীলতা, সীমাহীন ব্যাপ্তি, তাকেই বাহন ক'রে ছুটে' চলেছে তা'র চাওয়া। সে চলেছে তা'র মহাব্যাপ্তির অভিযানে, আর তা'র 'ছোট আমি'টা তা'র পেছনে ছুটতে ছুটতে চলেছে তা'র অনুরাগে। দিন যখন চলে' গেল তখন নানা রঙে অনুরাগবতী অভিসারিকা সন্ধ্যা তা'র পেছনে ছুটতে ছুটতে এলেন। অনাদিকাল থেকে তিনি ছুটছেন তা'র পেছনে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দিবসকে তিনি আলিঙ্গনবদ্ধ করতে

পারলেন না। মানুষের 'ছোট আমি' ছেড়ে দিয়েছে তা'র ইচ্ছাদূতীকে 'বড় আমি'র সন্ধানে। সে দূতী তা'কে ধরেছে, কিন্তু 'বড় আমি' তার ঘোড়া থামায় নি। তাই ইচ্ছাদূতী ছুটে চলেছে তা'র সঙ্গে সঙ্গে, সে ইচ্ছা গিয়েছে তা'র নাগালের বাইরে। তাই সে পারে না তা'র ইচ্ছাকে থামা'তে, নিজেও পারে না থামতে। 'বড় আমি'র সঙ্গে সে আছে প্রেমে বদ্ধ হ'য়ে। সে প্রেমের টান নিরন্তর আকর্ষণ করছে তার অন্তরের নাড়ীকে। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, সে মনে করে,—এক দিন আমি পা'বই পা'ব আমার সার্থকতা সেই 'বড় আমি'র সংস্পর্শে। তাই সে ছুটতে থাকে জীবন তুচ্ছ ক'রে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে, সেই 'বড় আমি'র পেছনে।

অন্য আকাঙ্ক্ষাগুলির কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আর একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বলের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অন্য অনেকগুলি আকাঙ্ক্ষা যেমন আত্মস্থ, অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশের জন্য, আত্মপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত, বলের আকাঙ্ক্ষা তেমন নয়। যে মনে করে আমি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করব, সাহিত্য সৃষ্টি করব, দর্শন বিজ্ঞান সৃষ্টি করব, আমার আত্মার অমরত্ব লাভ করব, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক হ'ব, সে তা'র নিজের অধ্যাত্ম স্বভাবকে, তা'র প্রকাশের বেদনাকে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধতর লোকে প্রেরিত করতে থাকে। তা'তে তা'র ইচ্ছার সঙ্গে এবং তা'র পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন আঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ধনৈষণা, গৌরব বা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বললিপ্সার সঙ্গে জড়িত। বলের কোন মূল্যই নাই, যদি তা'র কোন প্রয়োগের ক্ষেত্র না থাকে। বলের প্রধান উদ্দেশ্য পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও প্রাণী ও মনুষ্যবর্গের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, সেগুলিকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত বা প্রবর্ত্তিত করা। কাজেই, বল ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রধানতঃ মানুষের বাইরে ভৌতিক ও প্রাকৃতিক লোকের ওপরে। অর্থ অর্জ্জনের সঙ্গে বলের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। বলের দ্বারা অপরের অর্থ কেড়ে নেওয়া যায় এবং অর্থের দ্বারা বল আহরণ করা যায়। কেড়ে নেওয়ারও প্রকার ভেদ আছে। গভীর জলে থাকে মাছ, লোক লাগিয়ে, বেড়াজাল ফেলে, হৈ চৈ করে' আমরা সে মাছ ধরতে পারি। আবার নিতান্ত গোবেচারী নিরীহ লোকের ন্যায় সুগন্ধি চার ফেলে' বড়শীতে ছাতুর টোপ দিয়ে একটি ছায়াকুঞ্জের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে বকতপস্বীর ন্যায় নিস্পন্দভাবে ব'সে থাকতে পারি; যথা-সময়ে প্রলুব্ধ মাছেরা টোপ গিলে' ফাৎনায় নাড়া দিলে অনায়াসে তা'কে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে পারি। পীতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ জাতিরা আমাদের বিলাসের আমদানী ক'রে বড় বড় দোকানে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রেখে' আমাদের সেখানে প্রলুব্ধ করে। আমরা নব নব বিলাসের দ্রব্যে অভ্যস্ত হই এবং তাঁ'দের টোপ গিলে, যখন ফাৎনায় নাড়া দিই তখন তাঁরা অনায়াসে আমাদের খেলিয়ে ডাঙায় তোলেন। বেড়াজাল ফেলে' মাছ ধরলে তাকে বলা যায় হিংসা, কিন্তু ছিপ হাতে যে বাবুটি পুকুরপাড়ে ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকেন তা'কে অহিংস না ব'লে উপায় কি? এরই নানা প্রকারভেদে অর্থ শোষণের প্রক্রিয়া চলেছে। এই অর্থ শোষণের কাজে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। সে জন্যও আবশ্যক বলের ও প্রতিষ্ঠার, এবং অর্থ শোষণের কিঞ্চিন্মাত্র অসুবিধা ঘটলে ফোঁস ফোঁস শব্দ ক'রে আপনাদের বিষ-দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, কোন সময় বা চাটুতা করা, কোন সময় বা অন্য নীতি অবলম্বন করা। কিন্তু এ সকলেরই প্রধান ভিত্তি বল। যাঁ'রা বল অর্জ্জন করেছেন তাঁ'রা যন্ত্রদেবতার কল্যাণে প্রভূততম উৎপাদন শক্তিও অর্জ্জন করেছেন। এই উৎপন্ন বস্তু নানা স্থানে ব্যাপ্ত করবার যানবাহনেরও ব্যবস্থা তাঁ'দের আছে। তাই তাঁ'রা অনায়াসে নানা স্থানে উৎপন্ন দ্রব্য ছড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে অর্থ সঞ্চয় করেন। যেদেশে যাঁদের আধিপত্য সে-দেশে অপর লোক যা'তে অর্থ সঞ্চয় করতে না পারে সে জন্য অপরের পণ্যকে মহার্ঘ্য করবার জন্য নব নব শুল্কনীতি অবলম্বন করা হয়। এই জন্য ঘটে জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য। সে মনোমালিন্য সমাধানের উপায়, বল। আবার বিবিধ বস্তুজাত উৎপন্ন করতে হ'লে প্রয়োজন কাঁচামালের, কাজেই এই সমস্ত কাঁচা মাল যেখানে পাওয়া যায় সেই সমস্ত দেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রয়োজন ঘটে। এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য্য। এ বিষয়েও চরম নির্ণায়ক হচ্ছে বল। বর্ত্তমান কালে এশিয়াতে যত কাঁচা মাল পাওয়া যায় আমেরিকা ছাড়া অন্যত্র তা' পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া এশিয়া বেওয়ারিশি, এর নানা স্থানে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তার ক'রে আসছে। সকলেরই চেষ্টা এশিয়া-গাভীকে সকলে মিলে দোহন করবে। আর কিছুদিন এইরূপ দোহন করলে বাঁট দিয়ে রক্তস্রাব আরম্ভ হ'বে। ধনৈষণার সঙ্গে যেমন বলের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ তেমনি বলের প্রসিদ্ধিতে যে প্রতিষ্ঠা ঘটে সেই প্রতিষ্ঠা রাখতে গেলেও আবশ্যক হয় বলের। বর্ত্তমান যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্ব থেকে আপন প্রসিদ্ধির গর্ব্বে ইংলণ্ড যে রকম হুমকী ছাড়ছিল অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই হুমকী ইংলণ্ড বলের দ্বারা সমর্থন করে নি। যখন ইতালী

আবিসিনিয়া গ্রাস করল তখন ইংরেজ দিলে হুম্‌কী। মুসোলিনী মানলে না সে হুম্‌কী। ইংলণ্ড রইল চুপ ক'রে। জার্ম্মাণী পর পর চুক্তিভঙ্গ করতে লাগ্‌ল, ইংলণ্ড প্রতিবারই দিতে লাগ্‌ল হুম্‌কী, কিন্তু কাজের সময় পেছিয়ে গেল। এমন কি, বিশ্বস্ত চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়ে এল নিরাশ্রয় ক'রে। ১৯৩৯-এ যখন ইতালী ও জার্ম্মাণীতে গিয়েছিলুম তখন এটা একটা ওদেশে জনশ্রুতিতে পরিণত হ'য়েছিল যে চেম্বারলেন সাহেবের ছাতিটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেড়ে না নিচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজ যুদ্ধে নামবে না। ইয়োরোপে এ রকম একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ইংরেজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় এবং সেজন্য গুরুতরভাবে আত্মস্বার্থে আঘাত না লাগলে ইংরেজ কখনও যুদ্ধে নামবে না। এ ধারণার সত্যতা দিন দিনই প্রমাণ হ'তে লাগল যখন জার্ম্মাণী হুম্‌কীর পর হুম্‌কী দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে লাগ্‌ল, আর ইংরেজ লাগল পিছু হঠ্‌তে। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর বিশ্বাস ছিল যে সবই যখন ইংরেজ ছেড়ে দিল তখন পোলিশ করিডর নিয়ে সে আর হাঙ্গামা বাধাবে না, কেবলমাত্র ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ক'রেই নিবৃত্ত হ'বে। এ বিশ্বাস না থাকলে জার্ম্মাণী কখনও যুদ্ধে নাম্‌ত না।

কার্ল মার্কস্‌ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা কিছু দিন ধ'রে এই কথাই ব'লে আসছেন যে অর্থ নৈতিক স্বার্থের সংঘাতেই সমাজের ক্রমবিবর্ত্ত হয়ে' আসছে। এই অর্থ নৈতিক সমস্যার দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটেছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমশঃ গড়ে' উঠেছে দুটো প্রধান শ্রেণী, ধনিক ও শ্রমিক। এদের দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমশঃ ধনিক শ্রেণী লোপ পেয়ে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী টিঁকে থাকবে এবং সকল দ্বন্দ্ব লোপ পা'বে। ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি যা-কিছু মানুষ গ'ড়ে তুলেছে সমস্তই অর্থ নৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে, বা ধনৈষণার দ্বন্দ্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রধান কথাই হচ্ছে অর্থ সম্বিভাগের বৈষম্য, অর্থাৎ কেউ বা ধনৈষণার প্রবল তাড়নায় প্রভূততম অর্থ সঞ্চয় করেছে, কেউ বা অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে মরে' যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা যদি শুধু অর্থ সম্বিভাগের বৈষম্য নিয়েই ঘট্‌ত, তবে তার মীমাংসা কি স্বদেশে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এত দুর্ঘট হয়ে' উঠত না। কোন যুদ্ধ বাধলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এমন একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয় যে সকলেরই ধনৈষণার বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু মার্কস্‌ প্রভৃতিরা এখানে ভুল করেছিলেন। ধনৈষণার সঙ্গে জড়িত হয়ে' আছে বলৈষণা। ধনে ও বলে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ।

ধনী হ'লেই লোকে বলী হয়। সে বল যে কেবলমাত্র চাতুষ্পার্শ্বিক নরনারীর ওপর প্রযুক্ত হয় তা' নয়। প্রসিদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও দেখা গিয়েছে যে, যা'রা ধনী তা'রা রাষ্ট্রকে তা'দের অনুকূলে সঙ্গোপনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে এবং রাষ্ট্রের বল আপনাদের অনুকূলে ব্যবহার করবার বন্দোবস্ত করতে পায়। ধনের দ্বারা বল হয় বলে'ই ধনী হয় অত্যাচারী এবং অবিবেচক। ধনী চায় প্রতিষ্ঠা এবং গৌরব, সে চায় ধনাহরণের ক্ষেত্রের ওপর আধিপত্য। কাজেই সমাজবৈষম্য ও রাষ্ট্রবৈষম্যের গৌণ কারণ ধন সম্বিভাগের অব্যবস্থা, ইহা স্বীকার করলেও তা'র মূল কারণ হচ্ছে বলবৈষম্য ও বলৈষণা। ফাসিস্ত, নাৎসী ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নেতারা সমাজের ব্যক্তিবর্গের বল আত্মসাৎ ক'রে তা'দের সমস্ত বল নিজেদের বলৈষণা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরেজ যে যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকখানি পরিমাণে নিরুদ্যম ছিলেন ও সমরোপকরণ সংগ্রহে উদাসীন ছিলেন তা' বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি দেখে'ই বোঝা যায়। জার্ম্মাণীর চুক্তিভঙ্গের পর চুক্তিভঙ্গ সহ্য ক'রে ইংরেজ এ বিস্ময় উৎপাদন করেছে যে, বরাবর তাল গিলতে অভ্যস্ত হয়ে' হঠাৎ একটি 'কুইনিনে'র বড়ি গিলতে সে এত বিদ্রোহ করল কেন! তা'র মূল কারণ অর্থ নৈতিক সমস্যা নয়, গণতন্ত্র-বাদের ফাসিস্তবাদের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা নয়, তা'র মূল কারণ হ'ল মানভঙ্গের আশঙ্কা। চিরকাল ধরে' এই প্রসিদ্ধি আছে যে ইংরেজ বলবান্‌। বলপ্রসিদ্ধি থাকলে বল না থাকলেও চলে। শোনা যায় যে কোন প্রত্যুৎপন্নমতি লোক ছাতার বাঁটকে পিস্তল ব'লে ভয় দেখিয়ে বল্লম-সড়কীধারী ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজের বল থাক্‌ বা না থাক্‌, কিন্তু তার বলপ্রসিদ্ধি নষ্ট হ'লে সে এক দণ্ডও টিঁকতে পারে না। এই জন্য বে-ইজ্জৎ হবার চরম মুহূর্ত্তে ইংরেজকে বাধ্য হয়ে' যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। এই যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রধান কারণই প্রতিষ্ঠা-ভঙ্গ-ভয়। বলপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই বল লাভ ও ধন লাভ হয়। আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, উৎকট বলৈষণাই সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের গতি মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে। বলৈষণা ও বল প্রতিষ্ঠৈষণাই কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, মুখ্যতম প্রযোজক।

[বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

জমিদার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার দুইখানি জমিদারী চিঠি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বিশ-বাইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, একজন খ্যাতনামা বঙ্গসন্তান রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে সকলকে প্রায়ই বলিতেন, "আপনারা প্রভাত রবির কোমল কিরণেই মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখেন নি। তা যদি দেখতে চান ত একবার তাঁর জমিদারীতে গিয়ে দেখে আসুন।" রবীন্দ্রনাথের জমিদারীরই প্রজা, প্রবীণ সুপণ্ডিত ব্যক্তির এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া তখন মনে সত্যই একটু সন্দেহ জাগিত, তবে কি কবি রবীন্দ্রনাথ আর জমিদার রবীন্দ্রনাথে সামঞ্জস্য নাই!

লোকমুখে, গল্প-উপন্যাস ও নাটকে জমিদারের কঠোরতার ও অত্যাচারের কত দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়া থাকি। সেগুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে কিন্তু অসম্ভব যে নয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। জমিদারের প্রতাপে 'বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়', তাঁহার কোপে পড়িলে প্রজাকে ধনেপ্রাণে ধ্বংস পাইতে বা দেশছাড়া হইতে হয়। দুর্ব্বিনীত প্রজাকে কঠোর হস্তে শাসন করিতে জমিদার যে কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না—এ সকল কথা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু সকল জমিদারই যে প্রজাপীড়ক বা প্রজার সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন তাহা নহে। প্রজাদের মঙ্গলার্থে নানা বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান করিয়া, তাহাদিগকে সস্নেহে পালন করিতেছেন বা করিয়া গিয়াছেন এমন জমিদারের দৃষ্টান্তের অভাবও এদেশে নাই।

জমিদার প্রজাপালক ও স্নেহশীল হইতে পারেন, কিন্তু জমিদারী সুপরিচালনা ও রক্ষার জন্য তাঁহাকে আবশ্যকমত কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও হয়ত জমিদার হিসাবে সময়ে সময়ে প্রজাদের উপর কঠোর ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমেই যে ভদ্রলোকের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি বহুদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা এখন আমার পক্ষে সমীচীন হইবে না। তবে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেই অন্যায় সন্দেহের জন্য, আজ কবিগুরুর এই স্মৃতি-তর্পণ সভায় আমি অকপট চিত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

জমিদারী রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জ্জিত নয়। তিনি বাংলার এক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রজাদের মঙ্গলসাধনে অবহিত থাকিয়া, কঠোরতার লেশমাত্র বর্জ্জন করিয়া জমিদারী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বৈষয়িক বিশেষ কোন হানি ঘটে নাই।

জমিদারসুলভ নানারূপ কঠোর মনোবৃত্তি হইতে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ বাহ্যিক জমিদারী আড়ম্বরের প্রতিও তাঁহার সবিশেষ বিরাগ ছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা দেবী "প্রবাসী" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"ঝাড়লণ্ঠন-ঝোলানো বৈঠকখানা, বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুম, পত্নীর গা-ভরা গহনা, আলমারী-ভরা বারানসী, বোম্বাই, রেশমী শাড়ী, বনিয়াদি ঘরের উপযোগী ঘরভরা রূপার বাসন, ব্যাঙ্কে জমান মোটা সংখ্যার টাকা, ঘরের দেওয়াল কেটে বসানো সিন্দুকে তাড়াবাঁধা কোম্পানীর কাগজের স্তূপ এর কোন কিছুই ছিল না কবির কোনদিন।" "কবির কন্যারা তৎকালীন প্রচলিত ধারায় লোরেটো বেথুনে পড়ে নাই, পুত্র সেণ্টজেভিয়ার্স প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হয় নাই। নিজের আদর্শের আবেষ্টনে কবি তাদের মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকে।"

"সাধারণ লোকেদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্যে কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব—না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মত অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য।"

জমিদারী বাহ্যাড়ম্বর ও বিলাসিতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইলেও জমিদার রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গুজবের অভাব ছিল না। বিগত বর্ষে কবির জন্মদিনে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী "রূপ ও রীতি" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই-একটি আজগুবী কিম্বদন্তি শুনেছি। তিনি নাকি সোনার ফরসিতে তামাক খান, মুক্ত গলিয়ে চূণ ক'রে, সেই চূণে

তাঁর পান সাজা হয় এবং তিনি গোলাপ জলে স্নান করেন। এ সবই বিশ্বাস করা যেতে পারত, যদি তাঁর জীবন-স্মৃতিতে তাঁর বাল্যকালের আহার-বিহারের কথা তিনি লিপিবদ্ধ না করে যেতেন। যাঁরা পান তামাক খাওয়াকে চরিত্রহীনতার লক্ষণ মনে করেন, তাঁরা শুনে আশ্বস্ত হবেন যে, রবীন্দ্রনাথ তামাক খান না, আর তাঁকে পান খেতেও কখন দেখি নি। এ সব কিম্বদন্তির মূল এই যে, রবীন্দ্রনাথ বড় মানুষের ঘরে জন্মেছিলেন।"

এইরূপ ধরণের আজগুবি কথা আরও অনেকের হয়ত শুনা আছে।

শহরবাসী অন্যান্য জমিদারদের মত তিনি দুই-চারি দিনের জন্য নিজ জমিদারীতে যাইয়া উৎসবে, আনন্দে ও শিকারে সময় কাটাইয়া কখনও নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজাদের মধ্যে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ ও সুখদুঃখের সহিত নিজেকে বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়াছিলেন। কিসে যে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে রবি-বাসরের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে বাস করেছিলাম, তখন আমি গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই সব গ্রামবাসীরা যে কত বড় অসহায় তা আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে সুখ অনুভব করেছিলাম যে আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা—দেশের ধাত্রী পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে, গ্রামের লোকেদের স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায় ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা একে একে প্রকাশ করেছিলাম।"

"সে-সময় থেকেই আমার মনে এই ভাব হয়েছিল, কেমন করে এই সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত, এই যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই যে এরা এক বিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি কোন প্রতিকারের উপায়ই নেই। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখ-দুর্দ্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কি ভাবে কেমন ক'রে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।"

জমিদার রবীন্দ্রনাথ সে সময় কেবল কবিসুলভ চিন্তারাজ্যে থাকিয়াই নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি বক্তৃতায় আমাদের শুনিয়েছিলেন—

"আমার অন্তর্নিহিত গ্রাম সংস্কারের আভাস সে সময় হ'তেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দুধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব অভিযোগ, সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে।—ভেবেছি এই যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের অত্যুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে? পারব না কি একে উত্তীর্ণ হতে?—সে-সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মত এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল, যে কোন দায়িত্বই হউক না কেন, তাই গ্রহণ করব। এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব অভিযোগ জানাত, কোন সঙ্কোচ বা ভয় তারা করত না। আমি সে সময়ে সম্পত্তিতে গিয়ে কর্ম্মীদের ডেকে এনে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।"

প্রজাদের তথা দরিদ্র, অসহায়, অভুক্ত গ্রামবাসীদের দুঃখে একান্ত ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীনিকেতনে" রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই প্রকৃত পল্লীহিতকর মহৎ অনুষ্ঠানের বিষয় আজ কাহারও আর অজানা নাই।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজের কর্ম্মচারীদের, তাঁহারা আত্মীয় বা অনাত্মীয় যাহাই হউন না কেন, কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তিন-চার বৎসরকাল ঠাকুর স্টেটের ম্যানেজারী করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—

"বিষয়কর্ম্মে যারা লিপ্ত তাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হয়, কিন্তু এজাতীয় সন্দেহ তাঁর মনে এক দিনের জন্যও স্থান পায় নি। তাঁর মনের মত তাঁর চরিত্রও অসাধারণ উদার। এই বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে তাঁকে হয় ত কোন কোনও স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁর মন কখনও মলিন হয় নি।"

আদর্শ জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের ত্রুটিবিচ্যুতি যে কিরূপ ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া অন্তরে সদাই তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিতেন এবং নিজ কর্ম্মচারীদেরও ঐরূপ করিতে উপদেশ দিতেন, তাহা তাঁহার জমিদারী-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। পত্রখানি ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন ম্যানেজার (অধুনা পরলোকগত) জানকীনাথ রায় মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছিলেন।

(১)

বোলপুর

আশিষঃ সন্তু

কর্ম্মের নিয়ম অনুসারে ** কে যেভাবে চালনা

করিতে হইবে তাহা দৃঢ়ভাবেই স্থির করা আবশ্যক—সে সম্বন্ধে আমি কোন শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোন কাজ না করা হয়। স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তিও স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে সেস্থলে দুর্ব্বলপক্ষের বেলায় চাতুরী দেখিলে আমরা যে রাগ করি—সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্ব্বলতার প্রতিই রাগ। কারণ, এই * * ই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোন কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়, এমন স্থলে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না—তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

* *কে আমি তোমাদেরই কাছে ফিরাইয়া দিব—নিজে কোন হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্ত্তব্য বোধ করিবে তাহাই করিবে—কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। * * যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার জন্য চেষ্টা করিত—আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য আমি তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে এ আমি সঙ্গত মনে করি না।

আমি খেজুরে গুড়ের কথা ত বলি নাই। আমি আখের গুড় চাহিয়াছিলাম। যদি ভাল গুড় থাকে তবে কিছু পাঠাইয়া দিবে। ইতি ১৮ই আষাঢ়, ১৩১৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মচারিগণের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধ দেখা দিলে জমিদার রবীন্দ্রনাথ কঠোরতার দ্বারা কখনও তাহার সমাধান করিতেন না। উপদেশ দ্বারাই সে ত্রুটির তিনি সংশোধন করাইয়া লইতেন এবং কৃতকার্য্যতায় বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উন্নততর পথের সন্ধান জানাইয়া দিতেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম হিতৈষী উপদেষ্টা—গুরু। নিম্নে তাঁহার লিখিত আর একখানি পত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(২)

বোলপুর

আশিষঃ সন্তু

* বোলপুরে আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—*এর বিরুদ্ধে তোমার মনে বিকার দেখা দিয়াছে। এবং সেই বিকার যথোচিত উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া *কে তুমি তোমার সহায় করিয়াছ।

কর্ম্মক্ষেত্রে কেহই আঘাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে না। পূর্ব্বেও তোমাকে অনেকের কাছ হইতে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছে—ঈশ্বরের কৃপায় সে সমস্তই তুমি কাটাইয়া চলিতে পারিয়াছ।

আমি জানি ধর্ম্মে তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ভগবানের প্রতি তোমাব লক্ষ্য স্থির করিয়াছ—এই জন্য তুমি যখন বিচলিত হইয়া সরল পথ পরিত্যাগ কর তখন তাহাতে আমি বিস্মিত হই। তুমি *কে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই, তাহার মধ্যে গূঢ় বিদ্বেষের ভাষা আছে। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইল *ও সদর হইতে কোনো অত্যুক্তির দ্বারা তোমার মন কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

সকল অবস্থাতেই তুমি তোমার উদারতা রক্ষা করিবে, ক্ষমা করিবে, বিচলিত হইবে না, তোমার সেই শক্তি আছে তোমার পদও সেইরূপ। *কে তুমি যে পত্র যেভাবে লিখিয়াছ তাহাতে * খুসি হইয়াছে সন্দেহ নাই; তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ইহাতে তোমার মর্য্যাদা হানি হইয়াছে। যেখানে তুমি আমাকে পত্র লিখিবার অধিকারী সেখানে *কে দলে টানিয়াছ ইহা তোমার পক্ষে অগৌরবকর। *কে ডাকিয়া তাহাকে যদি তিরস্কার করিতে সেও তোমার উপযুক্ত হইত।

* সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা জন্মিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে * চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিও না। সংসারে কোথাও কোনো পাপ উঠিতেছে যদি দেখ তবে বাহির হইতেই তাহা মুছিয়া ফেলিবে—তৎক্ষণাৎ তাহার যাহা উচিত প্রতিকার তাহা সারিয়া একবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে—তাহাকে নিজের মনের মধ্যে কোনো মতেই তুলিয়া রাখিবে না। তোমার এই কর্ম্মক্ষেত্রই কি তোমার চিরজীবনের ক্ষেত্র? এইখানকার বাধাবিঘ্ন মান অপমান রাগদ্বেষ ঈর্ষাই কি তোমার চিরদিনের? প্রতিদিনের আবর্জ্জনা প্রতিদিন ঝাঁট দিয়া ফেল। কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে তোমার কোনো ক্ষুদ্রতার সহায় করিও না—তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতা দূর না হইয়া কেবলি প্রশ্রয় পাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও ক্ষুদ্রতার বন্ধুরা যখনি সুযোগ পাইবে তখনি তোমার শত্রু-

পক্ষের সহিত যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না—ইহাদের সঙ্গে কেবল মাত্র কর্ম্মের সম্বন্ধ রাখিবে, হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিবে না।

আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এরূপ পত্র লিখিতে পারিলাম। তোমার চিত্ত নির্ব্বিকার থাকে ইহাই দেখিতে আমার আনন্দ। তুমি যে কাজ লইয়া আছ সেই কাজের চেয়েও বড় হইয়া থাকিবে। তুমি ত কেবল জমিদারীর ম্যানেজার নও, তুমি মানুষ—মনুষ্যত্বে ভূষিত—কাহারও প্রতিকূলতাতেও সে কথা কোনো দিন ভুলিও না। নিজের আত্মাভিমানে আঘাত পাইয়া অন্যকে অবিচার করিও না—কারণ, তাহা হইলেই নিজের যথার্থ গৌরব হারাইবে। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আমি তোমাকে এই যে পত্র লিখিলাম ইহা তোমার প্রতি রাগ করিয়া লিখি নাই—আমি তোমার কল্যাণকামনা করিয়াই লিখিয়াছি। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে এবং আমি তোমাকে বাহিরের শত্রুতা হইতে অনেকবার রক্ষা করিয়াছি—এবার ভিতরের প্রবলতর শত্রুর সম্বন্ধে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

এই পত্রখানিও পূর্ব্বোক্ত জানকীনাথ রায় মহাশয়কে লিখিত। নিজ ম্যানেজারকে কোন জমিদার যে এরূপ-ভাবে পত্র লিখিয়া থাকেন বা লিখিতে পারেন তা আমার ধারণাতেই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রাবলীর ন্যায় তাঁহার লিখিত বৈষয়িক পত্রগুলিও অমূল্য। রবীন্দ্রনাথ সকল দিক দিয়াই এক আদর্শ পুরুষ ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ আর জমিদার রবীন্দ্রনাথে কোনখানেই অসামঞ্জস্য নাই।

[রবি-বাসরের ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশনে পঠিত।]

জানা ও অজানা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

বরষাকালের প্লাবনধারায়, জীবন চলেছে ছুটে'
ফুল কদম্বে, রূপের ফোয়ারা, ধেয়ে যায় লুঠে' লুঠে',
মরণ এসেছে, হানিয়াছে বাজ, গম্ভীরে গেছে ডেকে'
নিদাঘকালের তপ্ত বায়ুতে, ধূলির পুঞ্জে হেঁকে'।
তবু এই কথা সত্য জানি যে, জানি যে অসংশয়,
জীবনে-মরণে মহারহস্য, পায় তা'র পরিচয়।
গগনে গগনে কিরণের লেখা, আগুনে উঠেছে জ্বলে'
দহন অনিল দোল খেয়ে ফেরে, দিবসে দণ্ডে পলে।
তবু তারি লাগি' পাতার আঙুল, প্রসারিয়া থাকে শাখী!
তীব্র দহনে কোটরে কোটরে, কাঁপিছে নীরবে পাখী!

তবু রহস্য-মন্ত্র তাহার, হেথায় কেহ কি জানে;
মন্ত্রণা শুধু গম্ভীর করি' রহস্য তা'র আনে'
প্রাণ-পবনের উচ্ছ্বাস ভরে, নিঃশ্বসি' ওঠে ধরা
সকল প্রাণের লহরে লহরে, রয়েছে প্রাণের ভরা।

প্রশ্ন ওঠে যে এ মহাভুবনে, প্রাণের কি পরিচয়?
কেন জড় ভূতে অজর অমর হয়েছে প্রাণের জয়।
প্রতিটি প্রাণের পশ্চাতে হেরি, একটি নিয়ম বাঁধা
ফোটার সহিত চলিয়াছে ঝরা, হাসির সহিত কাঁদা।
সীমা অসীমার ভাষায় সকল করে যে হেঁয়ালিময়,
অসীমা সীমার প্রান্ত প্রদেশে, নাহি জানি পরিচয়।

জানার প্রান্তে অজানা লোকের অজানা হাতের লিখা,
জানার বক্ষে হঠাৎ জাগিয়া, দিয়ে যায় রাজটীকা।
জানা-অজানার ছন্দের মাঝে, জনম-মরণ আছে
দিন-রজনীর ধাওয়া-ধাওয়ি চলে, একে অপরের পাছে।
জানা-অজানার কোথা খেলাঘর, কেন এ হাসির মেলা,
তারি সাড়া উঠে সকল ভুবনে, সকাল সন্ধ্যাবেলা।
জানা-অজানায় চলেছে মিলন, এই ভুবনের মাঝে
তাই অজানার বুকের কাঁপন, ফুটিছে জানার কাজে
জনমে-মরণে একটি ছন্দ, একটি তারেতে বাজে
জানা-অজানার সেই সঙ্গীত, বিশ্বধারার মাঝে॥

বাউরীদের উৎসব

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

কয়লাকুঠিতে বছর কয়েক থেকে আমার আশেপাশে আমি যা দেখেছি এবং কুলীকামিনদের মুখে যা শুনেছি, শুধু তাই অবলম্বন ক'রেই আমি এই প্রবন্ধ লিখছি। এর মধ্যে ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্বালোচীর উপকারী তথ্য কতটা আছে তা ঠিক বলতে পারি না। কয়লা-কুঠিতে সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউরী, ডোম, ধাঙড়, ভুঁইয়া প্রভৃতি নানা জাতি কাজ করে। এদের মধ্যে নানা উৎসব প্রচলিত আছে—যেমন সাঁওতালদের প্রধান উৎসব হ'ল বান্ধা ও ছাতা পরব, বাউরীদের ভাদু ও তুষু পূজা ইত্যাদি। আর কতকগুলি উৎসব—যেমন কালীপূজা, মনসাপূজা—প্রায় সকলেই পালন করে।

এদের ভিতর বাউরীদের উৎসব বিষয়ে দু-একটি কথাই আমি বলব। আমি এ সব কথা বেশীর ভাগই সংগ্রহ করেছি বাড়ীতে যে-সব কামিন কাজ করতে আসে তাদের কাছ থেকে। বাড়ীর কাজ সাধারণতঃ বাউরী কামিনরা করে আর কথাও তারাই একটু বলে। অন্য সব জাতি একটু গোপনতাপ্রিয় লাজুক ধরণের—তাদের নিজেদের বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলে কিছুতেই কিছু বলে না। বাউরীরাও অবশ্য প্রথমে বলতে চায় না, তবে অনেক অনুরোধের পর বলে, আর একবার লজ্জার বাঁধন কেটে মুখ খুলে গেলে তখন আর কোন সঙ্কোচ থাকে না।

এই বাউরীদের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম—বাংলা দেশের এই কয়টি মাত্র জেলায় দেখা যায়, আর দেখা যায় বিহারের মানভূম জেলায়। বাংলা দেশের আর কোথাও এদের নাম শোনা যায় না, তবে পূর্ব্ববঙ্গে "বুনো" ব'লে এক সম্প্রদায় আছে তাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, রীতিনীতি সবকিছুর সঙ্গে এদের অনেক মিল দেখা যায়। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ এদের বাঙালী হিন্দু ব'লে মনে করেন কিন্তু অনেকে আবার বলেন যে ওরা সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির মত আদিম জাতি। আজকাল অনেকের ধারণা এই যে ওরা খুব সম্ভব আদিম ও বাঙালী হিন্দুদের মিশ্রিত সঙ্কর জাতি—হয়ত এই মতটাই প্রকৃত সত্য হ'তে পারে। সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল, কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গরু খায় এবং বিধবা-বিবাহের ও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রচলনও দেখা যায়।

বাউরীদের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের আশ্চর্য্যভাবে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। সব জায়গায় সব অবস্থায় ওরা সমানভাবে খাপ খেয়ে যায়। এই জন্য ওদের মধ্যে কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। ওদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও কোন একটা বিশেষ ধারা দেখা যায় না। ওরা যাদের যা পায় সুবিধামত তাই নিজেদের ব'লে গ্রহণ করে। ওদের উৎসবগুলির অনুষ্ঠান-প্রণালী লক্ষ্য করলে এবং ছড়াগুলি শুনলে একথা বেশ ভাল করে বোঝা যায়।

বাউরীদের প্রধান দুটি উৎসব হ'ল ভাদু পরব ও তুষু পরব। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে—ওদের পরব দুটির সময়-নির্ব্বাচন। একটি যখন চাষ শেষ হয়ে গেছে—দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের পর বিশেষ কোন কাজ হাতে নেই—এদিকে ভরা ক্ষেতের দিকে চেয়ে মন আশা ও আনন্দে ভরপুর তখন, আর একটি যখন ধান কাটা হ'য়ে ঘরে তোলা হ'য়ে গেছে—ঘরে প্রচুর সম্ভার অভাবের তাড়না নেই আর—মনে নিশ্চিন্ততার প্রশান্তি তখন।

ভাদুপূজা

কয়লাকুঠির বাউরীদের মধ্যে ভাদুপূজার প্রচলনই খুব বেশী দেখা যায়। যারই একটু সঙ্গতি আছে সে-ই ভাদুপূজা করে, অনেক সময় তিন-চার জন মিলেও করে। ভাদুপূজাটি বিশেষ ক'রে কুমারীদেরই, তবে বিবাহিতা মেয়েরাও করে দু-এক সময়। ভাদ্র মাসের প্রথমেই কুমোর-বাড়ী থেকে প্রতিমা গ'ড়ে নিয়ে আসে। প্রতিমা অবস্থা অনুসারে ছোট-বড় হয়। প্রতিমার চার পাশে ছোট ছোট আরও নানা

মূর্ত্তি থাকে—একবার দেখেছিলাম চালচিত্রের জায়গায় ঘড়ি আঁকা আছে, আর একবার দেখেছি এরোপ্লেন। মোটের উপর যা-কিছু নূতন জিনিস পায় তাই দিয়েই সাজায়—ভাদুর চার পাশে ফিউজ-হয়ে-যাওয়া ইলেক্‌ট্রিক বাতি অনেক দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিমার চার পাশে কাগজের ফুল, লতাপাতাও অনেক থাকে।

এক মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ভাদুকে ফুল দিয়ে সাজান হয়—ভাদুর সামনে প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়, চালভাজা, বুটভাজা ইত্যাদির নৈবেদ্য দেওয়া হয় এবং পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলে ভাদুর সামনে নাচগান করে। ভাদ্র-সংক্রান্তির আগের দিন সারা রাত ভরে নাচগান করে—তার নাম হ'ল ভাদুজাগরণ। পরদিন সকালে যার যা ভাল কাপড় গয়না থাকে তাই প'রে, সেজেগুজে, ভাদুকেও সাজিয়ে নিয়ে সকলে মিলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এ বিষয়ে এদের খুব সম্ভ্রমবোধ দেখা যায়। যেখানে ভাদুর সম্মান হবে না ব'লে ওদের মনে হয় সেখানে কিছুতেই যায় না। সব জায়গায় ঘোরা হয়ে গেলে আমাদের সব প্রতিমার মত ভাদু-প্রতিমাকেও জলে ভাসিয়ে দেয়।

ভাদুকে নিয়ে বেড়ানর সময় ওরা "ভাদুগান" ব'লে প্রচলিত যে কতকগুলি গান আছে তা ছাড়া স্থান-কাল-উপযোগী কতকগুলি গান তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে তৈরি করেও গায়, আবার রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা থেকেও গান করে। এই তিন রকম গানেরই কিছু কিছু নমুনা দিলাম।

ভাদু গান

১। কুথা হ'তে এলে ভাদু কুথা তোমার ঘরবাড়ী
গাছতলাতে চল ভাদু তোমায় বাতাস করি।

২। বাবুদের ফুলের বাগান
এই বাগানে ঢুকলে পরে ঠাণ্ডা হবে ভাদুর প্রাণ।

৩। ফুলেরি আয়না ফুলেরি বিছানা
ফুলেরি ভাদু মশারি,
বাগানে বাগানে বেড়িয়া বেড়িয়া
মালা গাঁথি ভাদু তোমারি।

৪। হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেনে মাখ না
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা চলে না।

৫। মাগো আমি রইতে নারি নারি গো পরের ঘরে
পরের মাকে মা বলিতে দুগুণ আগুন যায় জ্বলে।

৬। এত দিন কি রাখতে হয় মা ভাদুপুজার সময় হ'ল
এত দিন কি রাখতে হয় মা! আর ত আমি রইব না।

৭। ভাদু আমার মান করেছে মানে গেল সারা রাত
থালে করে নে লো মিঠাই, চল যাব মান ভাঙ্গাতে।

৮। ভাদ্র মাসের গাদ জনাই খোলায় দিলে খই ফুটে
এমনি আমার দিবা নিশি ভাদুর লাগি মন কাঁদে।

৯। ছেলে ছেলে কর ভাদু ছেলে তোমার হবে না
পরের ছেলে ধরে মার ছেলের বেদন জান না।

১০। একটি আমার সাধের ভাদু না পাঠাব শ্বশুর-ঘর
মাঝ ঘরে হিন্দোলা দিব খেলতে ডাকবো পাড়ার লোক।

স্থানকালোপযোগী গান

১। ধরেছে আম জাম কিচিমিচি বাদাম
চল গো দেখিয়া আসি ফুলের বাগান।

২। মা গো আমি ফুল পাতাবো ফুলকে আমি কি দিব
আশ্বিন মাসে পরব এলে ফুলকে দিব ফুলেল তেল

৩। মোর অমলি মা মরেছে মোর মরণ কেনে হ'ল না
কপালে কলঙ্ক ছিল জলে ধুয়া গেল না।

৪। ইচড়ি মাছে বুড়া ঝিঙ্গা মেচলো না
ও ভাদুর গাল দিও না
আর এমন করিব না।

৫। বড়বাবু ঘোড়ায় চড়ে মাইনিংবাবু জল ধরে
গোমস্তাকে শুধায়ে আস রবল বিকায় কি দরে।

৬। ওগো ওগো বড়বাবু বড্ড তোমার নাম শুনি,
নাম শুনে এনেছি ভাদু ইনাম বকশিশ দাও তুমি।

রামায়ণ-গান

১। রামকে মানুষ করেছি এই দুখ পাবার লাগে
সেই রাম আমার বনে গেল পাঁজরে খুন লাগায়ে।

২। সীতা মলে সীতা পাব ভাই মলে ভাই কোথায় পাব।
যারে সীতা অশোক-বনে ভাই নিয়ে ভাই বনে যাব।

৩। অশোক-বনে পাতের কুঁড়া সীতা পাতা কাটিছে
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে।

৪। সীতা হরে নিলি রাবণ সীতা রেখো যতনে
দিবা নিশি প্রাণ কাঁদিছে দেবর লক্ষ্মণ বিনে।

৫। রাম নাকি রে যাবি বনে মাকে কেন বল না,
মায়ের মন কি প্রবোধ মানে হে রাম বনে যেও না।

৬। রাম নাকি রে যাবি বনে হাতে লয়ে গণ্ডীবাণ,
এ গণ্ডীবাণ যে ভাঙ্গিবে তারে করিবে সীতাদান।

আগেই বলেছি যে বাউরীদের গ্রহণক্ষমতা খুব বেশী—তারা রামায়ণ থেকে নিজেদের উপযোগী ক'রে এই ছড়াগুলি বেঁধে নিয়েছে। অবশ্য অর্থের চেয়ে ছন্দের দিকেই

ওদের ঝোঁক বেশী। অনেক গানেরই বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না—যেন কোন রকমে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে কতকগুলো বেশ ভালও আছে, যেমন—

সীতা মলে সীতা পাব, ভাই মলে ভাই কোথার পাব
যা রে সীতা অশোক-বনে, ভাই নিয়ে ভাই বনে যাব।

এটা ত যেন বাল্মীকির—

"দেশে দেশে কলত্রানি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর"

এর প্রায় ভাবানুবাদ।

কৃষ্ণলীলার দু-একটা গানও ওদের ভিতর শোনা যায়, যেমন—

বাশরী বাজিল লো যমুনার কিনারে,
চললো জলকে য'ই

ইচ্ছা হয় মা কুলে কালী দিয়ে
কালার সঙ্গে চলে যাই।

একটি ডালে দুটি পাখী
বসে তোমরা করছ কি
আর ডেক না সোনার কোকিল,
কেষ্টহারা হয়েছি।

তুষু পূজা

তুষুপূজাও প্রায় ভাদুপূজারই অনুরূপ। তবে ইহাতে প্রতিমার বদলে দুখানি সরার প্রয়োজন হয়। পৌষ মাসের প্রথমেই দুইখানি সরা আনিয়া একখানির ভিতর মাষকলাই, মুগকলাই, চা'ল প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য রাখে এবং অপর সরাটি দিয়ে সেটির মুখ ঢেকে দেয়। তার পর সরার গায়ে চা'লের গুঁড়ি, সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে চিত্তির করে। সরা দুখানি ঘরের কুলুঙ্গীতে রাখা হয়। যাদের ঘরে কুলুঙ্গী থাকে না তারা চৌকী বা পিঁড়ির উপরেও রাখে। ভাদুর মত এই সরার কাছেও রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ ও নৈবেদ্য দেওয়া হয়, গান করা হয়। তার পর সংক্রান্তির আগের রাত্রে "জাগরণ" পালন করে এবং পরদিন সকালে সরা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শেষে জলে বিসর্জ্জন দিয়ে দেয়।

কয়লাকুঠিতে তুষুপূজার চেয়ে ভাদুপূজারই প্রচলন বেশী, সেই জন্য তুষুপূজার গান বেশী পাই নি। কয়েকটি গান আবার ঠিক একই—খালি তুষু ও ভাদু অদল-বদল ক'রে বসান। যে কটা গান সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। তুষু তুষু করি আমরা তুষু নাই মা ঘরে গো
কে তুষুকে নিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।
কাজ কি আমার ফুলের মালা বিনা ফুলে মালা গো।

২। তুষুর দুয়ারে ত ছড়া ঝাঁট পড়ে,
তাও নাই তুষুর ঘুম নাই ভাঙ্গে।

৩। একটি ফুলের জন্য তুষু করেছিলে অভিমান,
তোমার দুয়ারে দিব পারিজাত ফুলের বাগান।

৪। তুষুর দুয়ারে যে ঘোড়া ছটফট করে,
তাও নাহি তুষুর ক্ষিধা নাই ভাঙ্গে।

৫। দেবী না হ'লে নাচবেক কে?
সর্দ্দারকে জ্বর হয়েছে ছড়া দিবেক কে?

৬। তিরিশ দিন রাখলাম মাকে তিরিশ সল্‌তে দিয়ে গো
আর রাখিতে নারলাম মাকে মকর আইছেন নিতে গো।

৭। এত দিন রাখলাম মাকে মা বলে ত ডাকলে না,
যাবার সময় নগড় নিলে মা না হ'লে যাব না।

বাউরীদের বিয়ে

এবারে বাউরীদের বিয়ের বিষয় দু-একটা কথা বলব। কয়লাকুঠিতে একটা জিনিস দেখেছি। শুধু বাউরীদের কেন, অন্য সব জাতেরই—কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভুঁইয়া, ধাঙ্গড়, দোসাদ—সকলেরই বিয়ে বেশীর ভাগ হয় ফাল্গুন মাসে, আবার এদের ভিতর ধাঙ্গড়দের ত নাকি ফাল্গুন মাসে ছাড়া বিয়ে হয়ই না। একটু লক্ষ্য করলে অসভ্য, অনুন্নত জাতিদের ভিতর এইরূপ সহজ সৌন্দর্য্যবোধ ও স্বাভাবিক রুচিজ্ঞানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বসন্তের প্রথমে বৃক্ষলতায় যখন আতাম্রহরিৎ নবপল্লব, শিমুল-পলাশের মাথায় যখন অপরূপ রঙের সমারোহ, শাল মহুয়ার মদির গন্ধে যখন বাতাস ভারাক্রান্ত, আমের ডালে ডালে যখন অজস্র বউল, পাখীদের ভিতর যখন নবনীড়রচনার ব্যাকুল ব্যস্ততা—দুটি তরুণ প্রাণের প্রথম মিলনের পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর কি আছে? আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে ওদের বিয়ে প্রায় শুক্লপক্ষেই হয়, অবশ্য সেটাই নিয়ম কি না তা আমি জানি না; খুব সম্ভব এ সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নেই, তবে শুক্লপক্ষই অধিকতর প্রশস্ত।

বাউরীদের বিয়ে হয় প্রধানতঃ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে—এই জন্য ওদের বিয়ের একটা খুব সাধারণ গান হ'ল:—

আম পাকাতে চিঁড়া ভিজাতে হে
(বর বা কনের নাম) বিধুর বিয়া লাগে গেল হে।

আর একটা প্রচলিত গান:—

আজ আমাদের ছোট বুনের বিয়া লো—
ছোট বুনের—

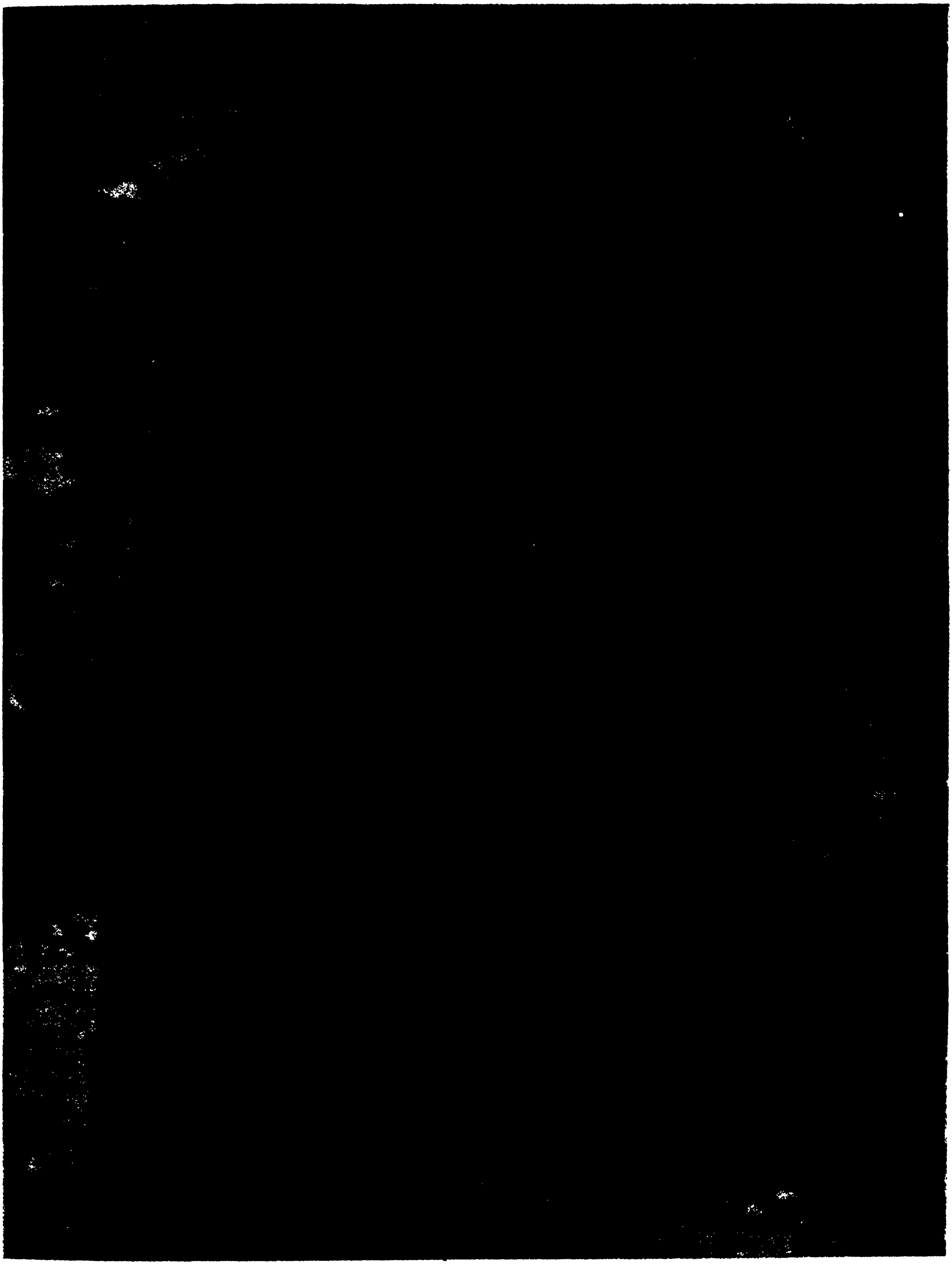

কালো মেয়ে

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কনের নিজের বড় বোন অথবা পাড়াপড়শী সঙ্গীসাথীরা মিলে বিয়ের অনেক আগে থেকেই কনেকে ঘিরে নেচে নেচে এই গান করে।

বাউরীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা-বিবাহ দুয়েরই বহুল প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়ের মান আছে খুব। "বিয়ালা বৌ" অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী প্রায় দেখা যায় না বলিয়াই বোধ হয় সমাজে "বিয়ালা বৌ"-এর সম্মান ও প্রতিপত্তি খুব বেশী।

বিবাহ-বিচ্ছেদ এদের মধ্যে পুরোপুরিভাবেই বর্ত্তমান, অর্থাৎ বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মনোমত অন্য স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করতে পারে। বাউরী-সমাজে এর প্রচলিত নাম সাঙ্গা। সাঙ্গারই খুব বাহুল্য এদের ভিতর। সাঙ্গার এত বেশী প্রচলন হওয়ার একটা প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। ওদের বিয়ে হয় খুব ছোটতেই—কাজেই মেয়ে অনেক সময় শ্বশুরঘরে যেতে চায় না—তার বর তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে সাঙ্গা করে—বড় হয়ে সেও মনোমত পতি নির্ব্বাচন ক'রে নেয়। কিছু দিন ঘর করার পর পরস্পরের মধ্যে মিল না হ'লেও সাঙ্গা করে। এই সাঙ্গাকে ওরা এত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে নেয় যে দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। সব অবস্থায়, সব সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নেবার ও মানিয়ে নেবার যে বিচিত্র মনোবৃত্তি এদের জন্মগত তার ফলেই বোধ হয় সম্ভব হয় এটা। এদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সাঙ্গার অনুষ্ঠানও অতি সহজ ও সরল। সভ্য জগতের বহু জটিলতা, বিচিত্র বিধিনিষেধ অনুষ্ঠান কোন কিছুরই বালাই নেই। মনের মিল হ'ল কি হ'ল না সেইটাই বড় কথা। বিবাহ-বিচ্ছেদের মত গুরুতর ব্যাপারের উপযুক্ত কারণ ঘটেছে কি না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—"মিলছে না ত কি হবেক"—এই যথেষ্ট যুক্তি।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গ্রামের দশ জন গণ্যমান্য লোকের সামনে স্বামী স্ত্রীর হাতের লোহা খুলে নেয়—তা হলেই হ'ল বিবাহ-বিচ্ছেদ। খরচের মধ্যে খালি যে যার গ্রামের লোকদের পাঁচ সিকা ক'রে দেয় মদটদ খাবার জন্যে। বিচ্ছেদের পর বিয়ের অনুষ্ঠানও প্রায় অনুরূপ—ঐ দুই গ্রামের লোকের সামনে বর বধূকে লোহা পরিয়ে দেয় এবং উভয় পক্ষ আপন আপন গ্রামবাসীদের পাঁচ সিকা দেয়। উপরন্তু বরকে কনের জন্য পণ দিতে হয় বার টাকা এবং কনে ও কনের মাকে দুখানা শাড়ী দেয়। সাঙ্গার পণ বার টাকা কিন্তু আসল বিয়ের পণ অনেক কম। আগে ছিল মাত্র পাঁচ সিকা, এখন হয়েছে পাঁচ টাকা।

এবারে আসল বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা বলা যাক। বিয়ের দিন বিকাল বেলায় ওরা আমাদের মতই বাড়ী বাড়ী জল সইতে যায়, তার পর সকলে মিলে গান গাইতে গাইতে বাঁধে অথবা জোড়ে যায়। সেখানে কনের ভগ্নীপতি—না থাকলে ভাই একটা ছুরি দিয়ে জল কেটে দেয়, তার পরে খুব নাচগান হয়। সেখানে বেটাছেলে কেউ থাকে না—একটিমাত্র লোক জল কেটে দিতে যায়—তা সেও তার পরেই চলে আসে। মেয়েরা বাড়ী ফেরবার পথেও গান করতে করতে আসে। কিন্তু বাড়ী এসেই গান থামায়। তার পর অবস্থা অনুযায়ী আলো ও বাজনা নিয়ে বর আসে। বিয়ে দেয় সাধারণতঃ "মাঝি"-অভিহিত এক ব্যক্তি—সেও বাউরী, তবে সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য একজন মোড়লগোছের লোক আর কি।

তবে দু-এক সময় বামুন-পুরুতকেও বিয়ে দিতে দেখা যায়। যদি কোন ছেলে বা মেয়ে ঠাকুরদেবতার "দোর ধরে" অনেক মানসিক ইত্যাদির পর দৈবকৃপায় জন্মগ্রহণ করে তা হ'লে তাদের বিয়ের সময় এরা বামুন-পুরুত খোঁজে। যেমন, যে কামিনটার কাছ থেকে আমি এই সব বিবরণ সংগ্রহ করেছি সে আমাকে বলল, "তোমাকে আর কি লুকাব মা—আমার বিধু এই কালীরই দেওয়া তাইতেই উয়ার বিয়াতে বামুন আনতে হয়েছিল"—তবে এজন্য সেই ব্রাহ্মণকে বেশ কিছু ঘুষ দিতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণকে এর জন্য সমাজে যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হয়। সাধারণতঃ খুব গরীব ব্রাহ্মণরাই এসব করতে রাজী হয়।

কন্যা সম্প্রদান করে বাপ কি কাকা। বরের বাড়ী থেকে একটা জলের হাঁড়ি আসে, কনের বাড়ীও একটা জলের হাঁড়ি থাকে, সে দুটো বদলাবদলি হয়—আমাদের টোপর বদলানর মত আর কি। ওদের বিয়ের একটা প্রধান মন্ত্র হ'ল

অরণ্যের ফল
পুষ্করিণীর জল,
বেনারির পাতা
অমুকের পুত্ত্র অমুকের কন্যে—

বিয়ের পর আমাদেরই মত বাসর হয় বোন, ভাজ, সখী, ঠাকুমা, দিদিমা সব নিয়ে। বাসি বিয়ের দিন মেয়ে শ্বশুরঘরে যায়। সেখানে উঠোনে একটা ছোট্ট পুকুর কাটা থাকে, তার ভিতর শালুক ফুল এনে রাখা হয়—সামনে থাকে শিলনোড়া—বরকনেকে সেখানে এনে বসানো হয়। তার পর এয়োরা মিলে কড়িখেলা করায়, সেই পুকুরের

জলে বরকনেকে পরস্পরের কড়ি খুঁজে বার করতে হয়। তার পর এক ঘটি জল দু-জনের মাথায় ঢেলে দিয়ে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু বিয়ের একটা প্রধান অঙ্গ সিন্দুর বা লৌহদান হয় নি। সেটা হয় গ্রামের ষোলো-আনির সামনে। বর পাইতো ক'রে সিন্দুর দিয়ে দেয় এবং ষোল-আনির সম্মতিক্রমে লোহা পরিয়ে দেয়।

বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ী যায়, তার দু-দিন বাদে কনের মা-বাপ বরকনেকে আবার তাদের বাড়ী নিয়ে আসে, বাড়ী ঢুকবার আগে বর ও কনে দু-জনের কোলে দুটি ছোট ছেলে দেওয়া হয়। আট দিন শ্বশুরবাড়ী কাটিয়ে বর কনেকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

পণপ্রথা ওদের মধ্যেও আছে, তবে আমাদের উল্টো,—আমাদের সমাজে মেয়ের বাপকে পণ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, আর ওদের দেশে মেয়ের বাপ পণ পায়, যদিও সে পণ সামান্যই, আর মেয়ের মা পায় শাড়ী। বিয়ের বেলায় কোন কোন মেয়ের মা-বাপ পণ না নিলেও সাঙ্গার বেলায় সকলেই নেয়।

সমাজে সাঙ্গার এত বেশী প্রচলন থাকার জন্যই বোধ হয় এ সম্বন্ধে এদের মনে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকে না। স্ত্রী স্বামীর সামনেই

"ও মা মনে নেয় দোসরা করে নিক, আমিও নিব দোসরা করে তার কি আছে—"

আর একবার দেখেছি দুই জোড়া দম্পতি এক জায়গায় ব'সে গল্পগুজব করছে যাদের সম্বন্ধ পূর্ব্বে অন্য রকম ছিল অর্থাৎ অদলবদল ক'রে সাঙ্গা হয়েছে। একজন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তার ঈর্ষ্যা হচ্ছে নাকি, তাতে সে হেসে উত্তর দিল, "বিয়ের কি আছে—উয়ারও হইছে, আমারও হইছে—ভালই হইছে।" তার অতীত ও বর্ত্তমান উভয় স্বামীর সামনেই অকুণ্ঠিত চিত্তে সে এই কথা ব'লে গেল। ওরা এত সহজে যে কি ক'রে একজনকে ছেড়ে অন্যের পত্নীত্ব গ্রহণ করে সে সত্যই আশ্চর্য্য। অতি তুচ্ছ কারণেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়, আবার দু-জনেই সাঙ্গা করে। মনে হয় ওদের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিগুলি কি এখনও ভাল ক'রে পরিস্ফুট হয় নি? কিন্তু তাও ত ঠিক বলা চলে না—কি জানি?

সাঙ্গা বেশীর ভাগই হয় মেয়েদের ছেলেপুলে হবার আগে। ছেলেপুলে হবার পর আর সধবা অবস্থায় বড়-একটা কেউ সাঙ্গা করে না। তবে বিধবা হ'লে যে না করে তা নয়, সেই সব ক্ষেত্রে ছেলেপুলেদের প্রায়ই খুব কষ্ট হয়। এই সব ক্ষেত্রে ছেলেরা বড় হ'লে কিন্তু নিজের বাপের ঘরেই ফিরে আসে।

অসম্পূর্ণ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

এস মোরা চলে যাই বহু দূরে আঁধার নির্জ্জনে
কানন-কুসুম-গন্ধী বায়ু যেথা বহে উদাসীন,
তোমার আঁখির আর নক্ষত্র-আলোকে অতিক্ষীণ
অসম্পূর্ণ পরিচয় দু-জনার পাব দুই জনে।
নীরব নক্ষত্ররাজী মহাবেগে আবর্ত্তিবে নভে,
অন্তরে বাসনা-ফল্গু আবর্ত্তিবে দ্রুততর বেগে;
বাণীহারা দুই হিয়া হাতে হাতে সব কথা কবে,
নিষ্পলক শুকতারা এ ছবি হেরিবে রাত জেগে।

নিশীথ নৈঃশব্দে ডুবি অনভ্যস্ত যৌবনের ভাষা
দু-জনে মরিব খুঁজি—অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ফুটিবে না
নিরুদ্ধ প্রাণের সুর; তাই আর বলাই হবে না
ছিল মনে কত দুঃখ, কত সাধ, কত ভালবাসা।
রাত্রির শিশির আর দুটি ব্যর্থ নয়নের নীরে
সিক্ত বাস, সিক্ত আঁখি শূন্য গেহে যাব দোঁহে ফিরে।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৬

এক দিন রামচন্দ্র বড় গোল বাধাইল। বৈকালে লক্ষ্মণ আসিয়া দোরগোড়ায় একটা গামছা বাঁধা পুঁটুলি ও ছোট একটা মাটির ভাঁড় নামাইয়া দিয়া বলিল, মাংস পাঠিয়ে দিলেন বাবু, রাত্তিরে চার জন বাবু খাবেন।

শুনিয়া যোগমায়ার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দুপুর হইলেও বা কথা ছিল! কালি-দিদিকে ডাকিয়া মাংস রান্নার একটা ব্যবস্থা করা যাইত। একজন নয়, দুইজন নয়—একেবারে চার জনকে নিমন্ত্রণ। জানি না, রামচন্দ্র কি মনে করিয়াছে? যোগমায়াকে পাঁচজনের সামনে অপ্রস্তত করাই বোধ করি তার ইচ্ছা। ভাঁড়ের দই ঢাকিয়া রাখিয়া গামছা খুলিল যোগমায়া। বড় আধখানা মানকচুর পাতায় এক পাতা মাংস—সের তিন-চার হইবে হয়ত। গামছার আর একপ্রান্তে একরাশি পিঁয়াজ ও আদা। এই এত মাংস রাঁধিতে বাটনাও ত চাই এক এক তাল। ধনে, হলুদ, জিরেমরিচ, আদা, পেঁয়াজ, গরম মশলা, লঙ্কা। এত মাংস যোগমায়া কোন দিন রাঁধে নাই, নূনের আন্দাজ ঠিক হইলেই না রক্ষা! না, রামচন্দ্রের কোন হিসাবজ্ঞান নাই, এমন বিপদে ফেলিবার কি দরকার?

কোমরে আঁচল জড়াইয়া যোগমায়া বাটনা বাটিতে লাগিয়া গেল। সে কাজ শেষ হইতেই সন্ধ্যা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আপিস বন্ধ করিয়া রামচন্দ্র ভিতরে আসিয়া বলিল, তোমার একটু কষ্ট হবে, মায়া। কিন্তু ওরা রোজ যে করে বলে, এক দিন বোয়ের হাতে মাংস খাওয়াও—মাংস খাওয়াও—। আজ বললাম, আচ্ছা নেমন্তন্ন রইল।

যোগমায়া আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢাকিয়া তুলসীতলায় যাইতে যাইতে বলিল, ওঁরা কি ক'রে জানলেন যে, আমি ভাল মাংস রাঁধতে পারি? তুমিই বলেছ নিশ্চয়।

হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্র বলিল, তা সেদিনকার মাংস যা চমৎকার হয়েছিল। গল্প করেছিলাম কি না।

যোগমায়া বলিল, তোমাদের পোষ্টাপিসে মাংস রান্না আর বোয়ের গল্প হয় খালি, নয়?

রামচন্দ্র বলিল, তা হয় বৈকি। যারা মাংস খায় আর যাদের বউ আছে তারা সেই সব গল্প করতেই ভালবাসে।

যাও। এখন আমি কি করি বল ত। তোমার মাংস রাঁধি, না লুচি বেলি—না লুচি ভাজি।

লুচি বেলে দেব'খন।

থাক্, তুমি যা রাঁধুনি—তা মাছের ঝোল—

না গো, না, জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখে বিশ্বকর্ম্মাকে মন্দ কারিগর ঠাউরো না। লুচি বেলে আজ সে কলঙ্ক ভঞ্জন করব।

বেশ!

কিন্তু রামচন্দ্রের সাহায্য যোগমায়াকে লইতেই হইল। না লইলে উপায়ই বা কি। ময়দা টানিয়া লেচি কাটিয়া দিল রামচন্দ্র। লুচি বেলার একটা কৌশল আছে, বেলনের চাপে লুচি চাকীর উপর আপনি গোল হইয়া উঠিবে। রামচন্দ্র একখানা লুচি বেলিতে গিয়া চাকিতে এমন চ্যাপ্টাইয়া গেল যে, নখ দিয়া চাঁচিয়া তবে চাকি পরিষ্কার করিতে হইল। আর একখানা আট কোণ মেলিয়া না পরোটা, না লুচি হইয়া যোগমায়ার হাস্যকৌতুক বৃদ্ধি করিল শুধু। এবং হাসিতে হাসিতেই যোগমায়া তাহার হাত হইতে বেলন কাড়িয়া লইয়া বলিল, তুমি বরং ওঘরে আসন-টাসনগুলো পেতে রাখ গে।

এমন সময় লক্ষ্মণ আসিয়া ডাকিল, মাষ্টারমশায়, হারমোনিয়ম নিয়ে এলাম, বাঁয়া তবলা আনতে গেল ভুবন। কোথায় রাখি বলুন?

যোগমায়া বলিল, বাড়ির মধ্যে গান বসিও না যেন।

রামচন্দ্র বলিল পোষ্টআপিসের মধ্যে শতরঞ্চি পেতে দে। দুটো তাকিয়া বালিশ—আর এক ডাবর পানও রেখে আয় ওখানে। আর দেখ—তামাক টিকে সব ঠিক আছে কিনা?

বাড়ির ভিতরে আসন ও গ্লাস পাতিয়া ব্যবস্থা করিল

রামচন্দ্র, বাহিরে শতরঞ্জি বিছাইয়া আসর বসাইল লক্ষ্মণ। হৈ হৈ করিতে করিতে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র ছুটিয়া ওধারে গেল। খানিক পরে হারমোনিয়মের সুর ও তবলার চাঁটির আওয়াজ পাইয়া যোগমায়া কান খাড়া করিয়া রাখিল ওদিকে। এখনই গান আরম্ভ হইবে।

তখন মাংস ফুটিতেছে, লুচি পরে ভাজিলেই হইবে। আর সমস্ত ভাজা, ডাল, চাট্‌নি, তরকারি নামিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের জানালা দুয়ার বন্ধ করিয়া যোগমায়া অতি সন্তর্পণে পোষ্টআপিসের সংযোগস্থল সেই দুয়ারগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বাজখাঁই গলায় এমন গান ধরিয়াছে। দুয়ারের ফাঁক হইতে যোগমায়া দেখিল, মাথা নাড়িয়া, সারা দেহ দোলাইয়া—এ ধার হইতে ও ধারে হেলিয়া রামচন্দ্র তবলায় চাঁটি মারিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে বাহির হইতেছে, বাঃ, বেশ—সাবাস্!

কি সে অঙ্গভঙ্গি! অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া যোগমায়া গান শুনিতে লাগিল। কোঁকড়া চুল—ফরসাগোছের একটি ছোকরা একধারে বসিয়াছিল, এইবার বাজখেঁয়ে গলার লোকটি হারমোনিয়ম তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার শ্যামাপদর একখানা হোক।

শ্যামাপদ ছোকরাটি লাজুক। মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, বিপিনদার হোক—বলাইদার হোক—তার পর আমি। আমার গান শুনলে কি আর ভাল লাগবে আপনাদের?

গোলগাল বেঁটে একটি লোক—তাকিয়ার উপর ভর দিয়া প্রায় শুইয়াছিল। এইবার সে সোজা হইয়া বসিয়া হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, বিলক্ষণ! চাঁদের কাছে জোনাকি! বলে হিল্লী দিল্লী লাহোর মেরে এসে—শ্যামাপদ এখন বিপিনদা, বলাইদাকে দিচ্ছ ঠেকিয়ে? হারমোনিয়ম প্যাঁ পোঁ করলেই যদি গাইয়ে হওয়া যেত—হা—হা—

যোগমায়ার মনে হইতেছিল, দুইটি তাকিয়া ওদিকটায় উপরি উপরি কে রাখিয়া দিয়াছে বুঝি! কিন্তু তাকিয়া হঠাৎ হাসির ধমকে বেশি রকমেই নড়িয়া উঠাতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

শ্যামাপদই গান ধরিল। মিথ্যা বলে নাই তাকিয়া। কি মিষ্ট—সরু গলা। পুরুষের যে এমন সুন্দর গলা হয়—যোগমায়ার ধারণা ছিল না। গান থামিলেও সে তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গত ফেলিয়া রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বিপিনবাবু, আপনি একটু ঠেকা দিন ততক্ষণ—আমি দেখে আসি ওদিকের কত দূর।

সাঁ করিয়া সরিয়া গেল যোগমায়া। তাড়াতাড়ি খুন্তি দিয়া একখানা মাংস তুলিয়া দেখিল, হাড় হইতে মাংস ছাড়িয়া আসিতেছে। দুই কোয়া রশুন ঘিয়ে ভাজিয়া মাংসটা সাঁতলাইয়া লইতে পারিলেই—

কি গো, কত দূর? রামচন্দ্র আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল।

এই মাংস সাঁতলেই—লুচি ভাজি।

বেশ বেশ, আর কিছু—

হাঁ গা, গাইছেন উনি কে? বেশ গলাটি।

ওর নাম শ্যামাপদ ঘোষাল। ক'লকাতার সখের থিয়েটারে গান গায়—ভারি চমৎকার গায়। ওই যে মিত্তির—মোটা মত—বেঁটে মত—ওই ধারে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিল, ওরা এখানকার বড়লোক কি না, নাম বিপিন—ওরই বাড়িতে এসে উঠেছে। এখানকার সখের থিয়েটারে পার্ট করবে ব'লে। বিপিনবাবুই ত বললে শুধু খাওয়া আর নেমন্তন্ন খাওয়া—কেমন যেন দেখায় মাষ্টার, একটু গান বাজনার আয়োজন কর। তাই ওকেও বললাম।

আর দু'জন কে আছেন?

একজন বলাইবাবু, মানে—ওই পোষ্টআপিসের সামনের বাঁড়ুজ্জে বাড়ির। বড় কন্ট্রাক্টার ও। বেশ রোজগার করে। আর একজন রমেশবাবু—আমার কেরানী গো।

তুমি কিন্তু ওঁদের সঙ্গে খেতে বসো না যেন, পরিবেশন করবে।

তা জানি। তোমায় ও কঠিন কাজটা করতে হবে না।

আহারের ডাক পড়িতেই সকলে গল্প করিতে করিতে বাড়ির মধ্যে আসিলেন। পাতে লুচি ও পটোল ভাজা দেওয়া হইয়াছে। মুগের ডালও দেওয়া হইল। তার পর আলুর দম ও মাংস। উঁহাদের খাওয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—যোগমায়ার বুকের গোড়ায় ততই ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র বার তিনেক চাখিয়া মাংসের সুখ্যাতি করিয়াছে, যোগমায়াও গোপনে একবার চাখিয়া বিশেষ কিছু খুঁত ধরিতে পারে নাই। কিন্তু সকলের রুচি ত সমান নহে। কেহ বেশি মিষ্ট খায়, কেহ চড়া ঝাল ভালবাসে। আর মাংসই যদি খারাপ হয় ত সারা কুষ্টিয়া শহরে তাহার আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। এমনও অকর্ম্মা বউ পোষ্টমাষ্টারের!

স্বামী ওঘরে রহিয়াছেন, উঁহারাও হাসি গল্প থামাইয়া

আহার করিয়া চলিয়াছেন। কান পাতিয়া যোগমায়া মাংসের হাড় চিবাইবার কুড়মুড় শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল, একটুও প্রশংসা-ধ্বনি কিন্তু শোনা গেল না। নিজের অক্ষমতার জন্য যোগমায়ার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময় রামচন্দ্র খালি জামবাটি হাতে বাহির হইয়া আসিল। যোগমায়া ততক্ষণে দাওয়া হইতে নামিয়া রান্না ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়াছে।

বাটি নামাইয়া রামচন্দ্র বলিল, আর একটু মাংস দেও ত।

যোগমায়া অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল হয় নি বুঝি?

হাঁ, তাই ত ওঁরা আর একটু চাইলেন। মাংস লইয়া সে অগ্রসর হইতেছিল—যোগমায়া খপ করিয়া তাহার জামার পিছন দিকটা চাপিয়া ধরিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল, সত্যি বল না?

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিল, খারাপ হ'লে কেউ আবার চেয়ে নেয়? নাঃ, তুমি ভারি বোকা! খুব ভাল হয়েছে। একটু সরিয়া আসিয়া গলা নামাইয়া বলিল, এত ভাল হয়েছে যে ওদের বউরা সব হেরে গেল আজ।

অবশ্য রান্না উৎরাইবার একমাত্র হেতু যোগমায়ার রন্ধন-নৈপুণ্য নহে—হরিঠাকুর না যোগমায়ার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া রান্নাটিকে ভাল ভাবে উৎরাইয়া দিয়াছেন।

প্রশংসার ধ্বনি যোগমায়ার বুকে বড় বিপ্লবই তুলিল। পা যেন তার আর মাটিতে ঠেকে না, মন কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে।

উঁহারা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, যাত্রাগানের আসর হ'লে বউদিকে একখানা সোনার মেডেল দিয়ে যেনাম, মাষ্টার। চমৎকার রাঁধেন উনি।

রামচন্দ্র আসিয়া বলিল, শুনলে? আর অ-চাকিয়ে বলে করবে আমায় ঠাট্টা?

যোগমায়া বলিল, আর আমি বুঝি চাকি নি মাংস?

ও হরি, আমার আগে পেসাদ করে বসে আছ। দাঁড়াও মাকে চিঠি লিখছি।

লেখ না, রাঁধতে রাঁধতে সবাই অমন চেখে থাকে। না চাখলে কেউ রান্না শিখতে পারে নাকি?

বটে! রান্না শেখার প্রধান গুণ হচ্ছে চুরিবিদ্যা! তা কি ক'রে জানব বল।

এস, খাবে এস।

আমি কিন্তু ভাজাভুজি কিছু খাব না, শুধু মাংস।

মাংস তো বেশি নেই। কালিদির জন্যে এক বাটি রেখেছিলাম—তাও শেষ হয়ে গেল।

বল কি! চার সের মাংস চার জনে উড়িয়ে দিলে! উঃ, খাইয়ে বটে।

যোগমায়া বলিল, যারা গিন্নী তাদের ভাগ্যে এমনই হয়। নাও, বস।

রামচন্দ্র বলিল, তুমিও বস, রাত অনেক হয়েছে।

তা হোক্। তোমার পাতে খেয়ে একেবারে হেঁসেল তুলে তবে ওঘরে যাব।

তবে মাংস আরও খানিকটা উঠিয়ে রাখ। নিজে রেঁধে নিজে একটুও চাখবে না বুঝি?

চাখি নি বুঝি? আঃ, আবার তুলছো কেন? ওই বাটিতেই থাক, আমি খাব'খন।

যোগমায়া যখন হেঁসেলপাট তুলিয়া এঘরে আসিল, তখন পোষ্টআপিসের ঘড়িটায় টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

দিন দুই পরে রামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইল বিপিনবাবুর বাড়ি। সন্ধ্যার পরেই রামচন্দ্র বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, ফিরতে রাত হবে একটু, গান বাজনা আছে। পোষ্টআপিসের বাইরের বারান্দায় ভুবন রোজ শুয়ে থাকে—আজও থাকবে। যদি ভয় করে—

যোগমায়া কহিল, তুমি যাও।

তবে না হয় ঘরে খিল লাগিয়ে শোও, আমি ডাকলে দুয়োর খুলে দিও। তিন বার না ডাকলে যেন খুলো না দুয়োর।

তিনবার ডাকবে কেন?

মানে আছে, এসে বলবো।

ঘরে আলোই জ্বলুক—আর খিল আঁটাই থাক—ভয়-ভয় করে না বুঝি? স্টেশনের আদালত প্রাঙ্গণের ঝাউ-গাছগুলির শোঁ-শোঁ শব্দ এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যায়। মাঠের ওপারে বার দুই শেয়াল ডাকিয়া উঠিল, ডুমুর গাছে পাখীর ডানা ঝাপটানির শব্দও কয়েকবার শোনা গেল। আর শোনা যায়—লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। আজ মাসখানেক হইতে একটা পেঁচা আসিয়া পোষ্টআপিসের কার্ণিসের উপর বসিয়া সারারাত ডাকিতে থাকে। ঘুমের ঘোরে সে ডাক শুনিলে—কচি ছেলের চাপা কান্নার মত শুনায়। লক্ষ্মী-পেঁচা নাকি ভাল, তাই কেহ ওটিকে তাড়ায় না।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, চারিদিকে জ্যোৎস্না। গ্রীষ্ম-

কালের জ্যোৎস্নার একটা ভুবন ভুলানো রূপ আছে। উঠানে দাঁড়াইয়া কিংবা খোলা জানালা দিয়া সে রূপ দেখিলে যে-কেহ মোহিত হইয়া যায়। চাঁদের কাছ বরাবর ছুটি পাখী একই সময়ে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। না কি—চখাচখি। চাঁদের সুধাপান করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করে। যোগমায়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। গরম হইলেও হাতপাখা রহিয়াছে তো। ডুমুর গাছের তলাটায় যা অন্ধকার। বিরল পত্রের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নারেখা গাছতলায় পড়িয়াছে—পিসিমা যেন লক্ষ্মীপূজার আলপনা দিয়াছেন উঠানে। কিন্তু শুধু আলপনা দেওয়ার কথা নয়, হঠাৎ ওদিকে চাহিলে মনে হয়—সাদা থান কাপড় পরিয়া কে যেন ডুমুর তলায় দাঁড়াইয়া আছে। এবং এই জানালার পানেই সে তাকাইয়া আছে।

ঘরের আলোটায় দম দিয়া যোগমায়া কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। এবং সেলাই করিতে করিতেই খাটের পায়ায় ঠেস দিয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

খটাখট কড়া নাড়ার শব্দে যোগমায়ার ঘুম ভাঙিল।

রামচন্দ্র বলিয়া গিয়াছে—তিনবার না ডাকিলে যেন দুয়ার না খোলে। কিন্তু এ ঘর হইতে বাহির হইতে যোগমায়ার যতখানি সময় গেল, তাহারই মধ্যে রামচন্দ্র অন্তত বার-আষ্টেক ডাকাডাকি করিল। খুব জোরে নহে, খুব আস্তেও নহে।

ওগো শুনছ? ওগো দুয়োর খোল। মায়া—মায়া—

যোগমায়া দুয়ার খুলিলে রামচন্দ্র বলিল, ডেকে ডেকে গলা ভাঙবার জো—আচ্ছা ঘুম যা হোক।

অপ্রতিভের হাসি হাসিল যোগমায়া।

একটু রাত হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্যামাপদ গেয়েই চলেছে—ক্লান্তি নেই। খানিক পার্টও বললে। কলকাতায় নতুন থিয়েটার খুলেছে, লীলাবতী না কি পালা—শ্যামাপদ চমৎকার পার্টও বলে।

হাত-পা ধুইয়া বলিল, তুমি খাও নি? আরে এ কে, সব দুয়োর-জানলা বন্ধ যে! ভয় করছিল বুঝি?

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, অজানা জায়গা, যদি চোর আসে?

জানালার গরাদে গ'লে চোর আসবে! টাকাকড়ি নয়, তা হ'লে সে যদি তোমাকেই চুরি করত, মায়া? ভাগ্যিস জানালা বন্ধ ছিল!

ঘুমচোখে রামচন্দ্রের পরিহাস যোগমায়া ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। খাটের মশারিটা ফেলিতে ফেলিতে বলিল, রাত হয়েছে, শোও।

তুমি খেয়ে নিয়েছ তো? নাও নি? সে কি!

না, আমার ভাল খিদে নেই। ওবেলার জল-দেওয়া ভাত আছে, মাছভাজা আছে—

তাড়াতাড়ি জামার পকেটে হাত দিয়া রামচন্দ্র বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমার জন্যে একটা ভাল জিনিস এনেছি। ইস্, পকেটে চেপ্টে রস লেগে গেছে। কাল জামাটায় একটু সাবান দিয়ে দিয়ো তো।

ওটা কি?

নারকুলে সন্দেশ নয়—ছানার ভাল সন্দেশ। কলকাতার এক কারিগর এসেছে, মিত্তিরদের জন্যে তৈরি করলে আজ।

তা পকেটে কি ব'লে আনলে? লজ্জা করল না তোমার!

লজ্জা করলো বলেই তো পকেটে পুরে আনলাম। মিত্তির ও ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক জোড়া সন্দেশ আমার হাতে দিয়ে বললে, নতুন জিনিস—বউদিদির জন্যে নিয়ে যাও। পাছে আর কেউ দেখে বলেই তো পকেটে পুরলাম।

ছাঁদা বেঁধেছ বল।

তা বামুন মানুষ—ছাঁদা বাঁধায় আমাদের লজ্জা নেই।

দু'টো আমি খাব না, কাল একটা তুমি জলখাবার খেয়ো বিকেলে।

এক পেট সন্দেশ খেয়েছি, ওটুকু যদি তুমি না খাও তো সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, কথাই কইব না।

স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া যোগমায়ার চোখ দুটিতে আবেশ ঘনাইয়া উঠিল। এত ভালবাসে রামচন্দ্র তাহাকে! ক্রমশঃ

কুটীর-শিল্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ, এফ্ সি এস, এম সি এস

যুদ্ধ ভারতের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও মালমসলা ভারতে উৎপাদন করা যায় কি না—এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এক টেকনিক্যাল মিশন ভারতে আসিয়াছে, মিশনের তদন্তও সমাপ্ত হইয়াছে। গৃহস্থের খাদ্যোপযোগী ও ব্যবহারোপযোগী শিল্পদ্রব্য কোথায় উৎপন্ন হইতেছে, কি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা দ্বারা দেশের লোকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রক্ষা পাইবে কি না, তাহারও খোঁজখবর চলিতেছে। তৈল, লবণ, বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধপত্র, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, রেলের এঞ্জিন, মালগাড়ী পর্য্যন্ত সমগ্র দ্রব্যেই ভারত যদি স্বাবলম্বী হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির এক বৃহৎ দুশ্চিন্তার ভার লাঘব হইত—ইহা সকলেই এক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। ইংলণ্ড-আমেরিকার সহিত ভারতের সরবরাহের পথ বন্ধ হয় নাই, তাহা খোলাই আছে। এই অবস্থাতেও এক্ষণে ভারতের প্রয়োজনীয় সামরিক ও অসামরিক দ্রব্যের জন্য আমাদের উদ্বেগের অবধি নাই; আমাদের জীবনসংগ্রাম এতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই জীবনসংগ্রাম যুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। পরে আমাদের জীবনসংগ্রামের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন থাকিবে কি না, তাহা পরের কথা, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। খাদ্যোপযোগী ও ব্যবহারোপযোগী শিল্পদ্রব্যের প্রয়োজন পূর্ব্বেও আমাদের ছিল, এক্ষণে যেরূপ আছে। প্রচলিত কুটীর-শিল্পসমূহকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে, নূতন নূতন দ্রব্যের কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করিতে আমরা শিক্ষিত-সম্প্রদায় ব্যক্তিগত ভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নূতন করিয়া কোন চেষ্টার সূত্রপাত করি নাই।

এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব বিপুল পরিমাণে রহিয়াছে। স্বাধীন দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার মূলে গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য, নির্দ্দেশ, পরিকল্পনা, আইনকানুন ইত্যাদি প্রথমেই দৃষ্টিতে পড়ে। ভারতের শিল্পপতিগণ দেশে নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া হয়রান হইয়াছেন। দেশের কুটীর-শিল্পের শিল্পিগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সময়োচিত সাহায্য ও উৎসাহ লাভেও হতাশ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রকার মনোভাবের সমালোচনা তীব্র ভাবে করা হইয়াছে, এক্ষণেও করা হইতেছে। যে-সমস্ত দ্রব্য কুটীর-শিল্পে উৎপাদন করা যায়, তাহার উৎপাদনে দেশকে ঐ বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিবার যে-সমস্ত নিয়মানুগ উপায় আছে, তাহা কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা এক্ষণেও আছে এবং তাহা লাগানও হইতেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ভাবে আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিবার কি কিছুই নাই?

পরিবারগত বা সমাজগত ব্যাপারে অপরের কর্ত্তব্য-চ্যুতি প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে। তাহার জন্য আমরা নিজেরা কর্ত্তব্যচ্যুত হই না—যদি তাহার সহিত আমাদের স্বার্থের প্রশ্ন থাকে বা তাহার জন্য আমাদের দরদ থাকে। গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ত্তব্য না করিলে কখনও এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে যে, আমাদেরও কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। সেই কর্ত্তব্য পালনে যতটা সম্ভব আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। খাদি-প্রতিষ্ঠান বা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে যে-সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা তাহাদের নিজেদের চেষ্টার ফলেই হইতেছে। স্বদেশী যুগে বাংলায় যে শিল্পপ্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে সরকারী অনুপ্রেরণা বা সাহায্য ছিল না, কিন্তু তাহা সার্থক হইয়াছিল। কেহ বলিতে পারেন, ঐ জাতীয় চেষ্টার গোড়ায় রাজনৈতিক চেতনা থাকা প্রয়োজন। স্বদেশী যুগে তাহা ছিল। ভাবের আধিক্যে বাস্তবকে হারাইয়া ফেলা উচিত নহে। যিনি ঐ কথা বলিবেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজের জীবনসংগ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। কত বাধা-বিঘ্নকে তাঁহার অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজে অবাক্ হইয়া যাইবেন। তিনি দেখিবেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রামের গোড়ায় কোন রাজনৈতিক চেতনা নাই, আছে ঔদরিক চেতনা, সংসার প্রতিপালন করিবার চিন্তা। যে-সমস্ত কুটীর-শিল্প এক্ষণেও দেশে কোন মতে টিকিয়া আছে বা যে-সমস্ত কুটীর-শিল্প নূতন প্রবর্ত্তিত

হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের চালকগণের উদরের চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই চলিতেছে। তাঁহারা মরিয়া হইয়া সেই শিল্প চলমান রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি তাঁহাদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের সংগ্রামক্ষেত্রের আয়তন বাড়াইয়া দিয়া তাহার সুফলের অংশীদার হইতে পারি, তবে তাহার মূলে আমাদের উদরের চেতনাও প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কুটীর-শিল্পে আত্মনিয়োগ করার অর্থ কখনও ইহা নহে যে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ পেশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কুটীর-শিল্পের উপযোগী নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের সহিত সাধারণ শিল্পিগণ পরিচিত নহেন। গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের কারখানা ও গবেষণাগারে যে-সমস্ত পরীক্ষা ও গবেষণা হইতেছে, তাহাতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার উন্নত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের সহিত শিক্ষিত লোক যে-ভাবে সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন, সাধারণ লোক সে-ভাবে পারিবেন না। কাঁচা মাল বা কৃত্রিম মাল সংগ্রহ, বাজার সৃষ্টি, নূতন নূতন নক্‌শা বা ডিজাইনের উদ্ভাবন, পারিপার্শ্বিক লোকের পছন্দ, তাহাদের মধ্যে নূতন চাহিদার সৃষ্টি, প্রচারকার্য্য, সংবাদপত্রের সমর্থন লাভ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত লোক নূতন নূতন ভাবে চিন্তা করিতে পারিবেন, বিশেষজ্ঞের সাহায্য বা পরামর্শ লইতে পারিবেন, সাধারণ লোক তাহা পারিবেন না। তাঁহারা নিজ নিজ পেশা বজায় রাখিয়া অপর লোক দ্বারা কাজ চালাইবেন, বাড়ীর একটা অংশ ঐ কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। তাহাতে তাঁহাদের বেকার আত্মীয়জন কাজ পাইবে, শিল্পীর বংশানুক্রমিক সুপ্ত শিল্প-নৈপুণ্য জাগরিত হইবে। তাহা দ্বারা তাহাদের সংসারে সামান্য আয় বৃদ্ধি ঘটিলেও দেশের মহা উপকার সাধিত হইবে।

অতীন্দ্রিয়ের যাদু

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এই জীবনের যাত্রাপথের চিন্তা এবং কল্পনারি ছবি
ক্ষণে ক্ষণে হচ্ছে মনে সৃষ্টি এবং লয়,
অনন্ত এই আকাশ-সাথে বন্দী সদা অসীম মানবমন
লয়ের ছলে কল্পনা তার আঁকাই সেথা রয় ?
কল্পনা ও অকল্পনার অঙ্কিত সেই সচল মনের ছবি
মনের মহাআধার-কমল মাথার মণি-তলে,
রহস্যেরি মতন ওরে পরাণ লভি জীবনদেহের মতো
ঘুমের কোলে স্বপন হয়ে জলে।
অকল্পনা রইলো যাহা নিত্য তাহার রঙীন ছবিগুলি
বাইরে থেকে মনের মাঝে আসে,
চিন্তা এবং কল্পনাতে নেইকো তারা,মনের মাঝে তবু—
ছায়ার মতো সদাই এসে ভাসে।
লক্ষ তাহার রঙীন ছবি স্বপন-ফিতায় সবাক ছবির মতো
সচল হয়ে করছে আনাগোনা,
জাগ্রতে যা সত্যি ছিল মিথ্যা হ'ল নিদ্রাযাদুলোকে
সত্যি হ'ল মিথ্যা ও কল্পনা।

ঘরঘরাঘর বন্‌বনাবন্ ঘুমের ঘোরে স্বপ্নেরি 'কল' চলে
সবাক্ ছবির যাদুর পুরী ঘুম,
জাগ্রতেরি পর্দ্দা ঠেলে এই জগতের অসীম জীবন সেথা
মনের মুখে দেয় গো এসে চুম।
আলোর মতন সত্যি এবং আঁধার সম ওপার লোকের ছবি
তাহার মাঝে দেখ্‌নু আমি ছাপা,
এই নিখিলের বাস্তব এবং কল্পনারি রহস্য যা-কিছু
জাগ্রৎ এবং স্বপন-মাঝে রইলো হয়ে চাপা।
সেই স্বপন আর জাগ্রতেরি নিত্যকালের তীর্থ যে গো তুমি
এই মানুষের চেতন মাথা রহস্যেরি সম,
জাগ্রৎ এবং স্বপ্নলোকের চিত্রচলার যন্ত্র তুমি ওগো
বিশ্বে তুমি সবার সেরা তোমায় নমো নমঃ।
সব চেয়ে এই রহস্য যে বিশ্বে যত বিজ্ঞ নরনারী
মাথার তলায় দেখলো নিখিলপ্রাণ,
কিন্তু কেহই দেখলো-নাকো তাদের মাথার তপনমণির তলে
কেমন ক'রে ছদ্মবেশে রইলো ভগবান্!

রবীন্দ্র-সাহিত্যে জাতীয়তা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সান্যাল

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে
দেখো না আমায় বাহিরে!
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে!
*　　*　　*
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।"

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বকবি বলেই জানি। জীবনের প্রাগুষায় যে অতুলনীয় কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ও স্ফুরণ হয়েছিল, কাব্যের যে কুসুমকোরকটি ফুটি ফুটি করছিল, ক্রমে তা জীবন-সায়াহ্ন পর্য্যন্ত রূপায়ন নিল সাহিত্যের শতদলে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' যে প্রতিভা জীবনতরঙ্গে উচ্ছল হয়েছিল, 'মৃত্যু'তে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। সাম্য ও মৈত্রীর গান তিনি গেয়ে গেলেন জীবনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত, তার সুরের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয় ও মনের গোপন কুঠুরিগুলোর রুদ্ধ দ্বারে হানল আঘাত, অর্দ্ধচেতন ও অচেতন প্রাণকে জাগিয়ে তুলল শতাব্দীর গাঢ় ঘুমঘোর থেকে। অন্তঃপুরের মধ্যে আমরা এত দিন গোপনে ও নিঃশব্দে চলাফেরা করছিলুম, বাইরের যে একটা আলাদা জগৎ তার সম্পূর্ণ নূতন বৈশিষ্ট্যে, স্বাতন্ত্র্যে, ভাবে ও ভাষায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যেখানে চলছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের উন্মাদ সংঘাত, সেখান থেকে ভেসে আসছে জীবনের উচ্ছল কলকোলাহলের ধ্বনি, তার খবরটা আমাদের কাছে ছিল এত দিন অজানা।

কিন্তু দরজায় হঠাৎ ধাক্কা লাগতেই খুলে পড়ল অন্ধ-যুগের জীর্ণ বাঁধন—একসঙ্গে আলোর মেলা এত ভীড় ক'রে এসে জুটল যে, প্রথম আলোর ছটায় আমাদের চোখ গেল ঝলসে। সুরের আলোয় আমাদের সামনে ভেসে উঠল নূতন জগতের অচেনা পথ। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলুম কবির স্বর্গীয় সুরের মূর্চ্ছনায়। সমস্ত জাতিকে সুরের নেশায় মাতাল ক'রে, সমগ্র জগৎকে কাব্যের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে তিনি চললেন অনন্ত, অসীমের দিকে। তাই সুদূরের পিয়াসী কবি সমস্ত বাধা বিপদ তুচ্ছ ক'রে আমাদের মনকে, জাতিকে, এমন কি সারা দুনিয়াকে পর্য্যন্ত তাঁর যাত্রা-পথের পথিক ক'রে নিলেন। এ

"যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

কার সাধ্য যে কবির এই আকুল পথ-চলার নেশাকে রোধ করে? তাই তিনি আমাদের জীবনকে জীবনভোর তাঁর কাব্যের রসে অভিসিঞ্চিত ক'রে গেছেন।

"আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা!"

কবির এই 'পাগল-পারা' ভাব আমাদের মনকেও নিয়ে গেছে সুদূরের মায়ায়। বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁকে বিশ্বকবি, সত্যদ্রষ্টা ঋষি ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছি।

কিন্তু এই জানার মধ্যে মস্ত এক ভুল রয়ে গেছে। কবিকে কতটুকু আমরা জানি! কবিকে জানতে গেলে শুধু তাঁর জীবন-চরিতে জানা যাবে না। "কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।" কবিকে জানতে হ'লে তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সমুদ্রের মন্থন প্রয়োজন। এই মন্থনে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ দিক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা, যে-ধারাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর কবি-জীবনের অভিব্যক্তি। এই বিশেষ ধারাটিই রূপ নিয়েছে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে জাতীয়তা'য়। এই বিশেষ সুরটি যে তাঁর জীবন-নাট্যের প্রচ্ছদ-পট আবৃত ক'রে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সুরের রেশটা টেনে গিয়েছে তা ক'জনের চোখে পড়ে? সুরের সেই বিচিত্র ধ্বনি, সাহিত্যের সেই অভিনব, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য যখন আমাদের সম্মুখে তার সমস্ত পাতাটা মেলে দাঁড়ায়, তখন আমরা দেখি আর এক রবীন্দ্রনাথকে। এ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নয়, এ হচ্ছে ধ্যানমগ্ন যোগীর অদ্ভুত ছবি, মুক্তি-মন্ত্রের সাধক কবি, জাতীয় জীবন উদ্বোধনের প্রভাত-রবি। তাঁর এই ভাবকে অবলম্বন ক'রে কাব্যে, উপন্যাসে, গীতি-কবিতায়, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, ছোট গল্পে ও পত্রে যে সুমহান্ সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছে তাহাই জাতীয় সাহিত্য।

কবির সাহিত্যে এই জাতীয়তার উদয় হয়েছে তাঁর শিশুকাল থেকেই। কারণ, তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন জাতীয় আন্দোলনের মেঘে বাংলার আকাশ ছিল ঘোলাটে। তিনি নিজেই প্রকাশ করে গেছেন—ভাব-প্রবাহের ত্রিবেণী-সঙ্গমে এক বৈপ্লবিক আবর্ত্তের মাঝে তাঁর আবির্ভাব। এই ত্রিধারা—ধর্ম্ম, সাহিত্য ও জাতীয়তা। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হন তাঁর জ্যোতিদাদার সংস্পর্শে। এ সময়ে জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করবার জন্য 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে 'হিন্দু-মেলার উপহার' নামে তিনি এক কবিতা লেখেন। অতি অল্প বয়স থেকেই কবির চিত্ত কি রকম জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা তাঁর এই কবিতাটিই প্রমাণ করে। তিনি লিখলেন—

"হিমাদ্রিশিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতবায়।"

ভারতের ঘোর দুঃখে তিনি বীণার ঝঙ্কারে জাতিকে উদ্বোধিত করতে আবার গাইলেন—

"ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেন রে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।"

এই যুগের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর বয়সে লিখছেন—

"দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' আর তার পরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার * * * * গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়' গণদাদার লেখা 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে', বড়দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'।" তাই দেখতে পাই যে জাতীয় আন্দোলন যখন সমগ্র জাতির জীবনের এক কোণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, যখন জাতীয় জীবনের মুক্ত-ধারা সহস্র বাহু মেলে দিকে দিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশকে প্লাবিত করে নি, তখন থেকেই শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছে জাতীয়তার অমৃতময় স্পর্শ, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখনীর মুখে।

এই জাতীয়তার স্বরূপ তিনি তাঁর সাহিত্যে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তাঁকে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ইতিহাসের এক বিরাট্ অংশ রয়ে যাবে অসম্পূর্ণ। যদিও তিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আপন-ভোলাভাবে নিজেকে ঢেলে দেন নি, কিন্তু সময়ের আবহাওয়ায় যে-সব আন্দোলন কূল ছাপিয়ে ভারতের দুয়ারে এসে পড়েছে, সেগুলির সমালোচনা থেকে বিরত হওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। ভারতের সুদিনে যেমন তিনি দিতেন উপদেশ এবং চালিয়ে নিতেন সমগ্র দেশকে তাঁর লেখনীর সাহায্যে, তেমনি দুর্দ্দিনের ঘনঘোর অন্ধকারে তিনি আশার আলো জেলে দাঁড়াতেন সবার পুরোভাগে। বিদেশীর দ্বারা দেশের অপমান তাঁকে যেমন দগ্ধ করেছে, জাতীয়তার নামে মূঢ় অন্ধতার সমর্থনও তাঁকে তেমনি আঘাত করেছে। তাই দেশের অপমানে তিনি শ্লেষপূর্ণ প্রবন্ধ 'জুতা-ব্যবস্থা'য় এক দিকে যেমন বিদেশীর উপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তিনি দেশবাসীর উপর বর্ষণ করেছেন জ্বালাময় তিরস্কারের বৃষ্টি।

কর্ম্মের সাধনাকেই কবি জীবনের প্রধান এবং পরম সত্য ব'লে জেনে নিয়েছেন! 'অকর্ম্মা' এবং 'গলাবাজী-সার'দের উপর তাঁর কিরূপ বীতশ্রদ্ধা প্রকট হয়েছে তা তিনি 'চেঁচিয়ে বলা' প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশমাতৃকার পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মন্ত্র উচ্চারণ করলে সিদ্ধবস্তু লাভ করা যায় না, বাক্‌সর্ব্বস্ব এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে সফলতার রথ আপনি এগিয়ে আসে না, সিদ্ধি ও সাধনার পূর্ণ বিকাশ আসে বিরামহীন, শ্রান্তিহীন কর্ম্মের মধ্যে। তাই তীব্রভাবে তিনি লিখছেন—"দেশহিতৈষিতা, আলো জালিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তত ক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে। কিন্তু যখন চোঙ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশছাড়া হইতে হয়।" * * * "এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগিনীগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে। আমার মতে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও কাজ অনেক দেখে।"

দেশকে আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে তাঁর প্রয়াস

যে কি ঐকান্তিক ছিল, তা সত্যই মনকে শ্রদ্ধায় ভরে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই 'ন্যাশনাল' কথাটি আদৌ মনঃপূত নয়। এই ইংরেজী ন্যাশনাল কথাটির নামের দোহাই দিয়ে আমরা দেশবাসীকে গোলক-ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিই, আর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পাকা রাজপথ অনায়াসে বেঁধে ওঠে। কিন্তু গোড়াতেই গলদ। তাই তিনি ন্যাশনাল ফণ্ড সম্বন্ধে লিখছেন—"গোড়াতেই ইহার নাম হইয়াছে National fund ইংরাজীতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে।" লেখকের মতে এই ধারণার কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নাম দিলেন ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি। এই প্রবন্ধে এই মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা ক'রে, ভারতীয় জীবনকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করে গ'ড়ে তুলবার জন্য সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে আমাদের সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তুললেন –"আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ... ... ভিক্ষুক মানুষের মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই। ... ... ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।"

সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি তখন দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে দেশের মাটির দিকে সকলের মন আকর্ষণ করলেন। তিনি জানেন—'কুসুমের কারাগারে' যেখানে জীবন বদ্ধ সেখানে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। 'এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়'। তাই মাটির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। কুসুমশয্যা ছেড়ে দেশের মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য দেশবাসীকে তিনি আকুল আবেগে ডাকলেন—"ফিরে চল, মাটির টানে।" দেশকে তিনি যে কি গভীর ভাবে ভালবাসতেন, মানুষের মনের মধ্যে যুগযুগান্তর ধরে বাসা বাঁধবার আশা যে কিরূপ প্রবল ছিল, তিনি চাইতেন না যে সকলে তাঁর কথা ভুলে যাক, তার প্রকাশ সত্যই প্রাণকে আকুল করে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়মাঝে যদি স্থান পাই।"

একবার পুনায় কংগ্রেসের অধিবেশনে বাঙালী যোগ দেয় নি। বাঙালীর এই নিরুদ্যম ও ঔদাসীন্য তাঁকে নির্মম ভাবে আঘাত করেছিল। আমরা ভারত-মাতাকে চিনতে পারি নি এই ছিল তাঁর ক্ষোভের বিষয়। তাঁর লেখনীর মুখে তখন বেরিয়ে পড়ল—

"কেন চেয়ে আছ গো মুখপানে
এরা চাহে না তোমায় চাহে না যে
আপন মায়েরে নাহি জানে।"

তাই গভীর দুঃখে তিনি গাইলেন—"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।" 'আহ্বান গীত' কবিতায় বাঙালীর জন্য তাঁর নিবিড় বেদনা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কই রে বাঙালী কই।"

দেশবাসীর এই সনাতন মনোভাবে "কখনও তাঁহার কণ্ঠ গভীর বেদনাপূর্ণ লজ্জায় ক্ষীণ হ'য়ে নিখাদে নেমে পড়েছে, কখনও তাঁদের মনুষ্যত্বহীনতার ক্ষোভে কণ্ঠে তাঁর আকাশের বজ্র উদ্যত হ'য়ে উঠেছে; গভীর দুঃখে অশ্রু-আবিলতাভরা কণ্ঠে যখন বলেছেন,—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।'

সে কি জাতির প্রতি অভিসম্পাত? কখনও নয়! এ যে সত্যদ্রষ্টার সত্য দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত, বাস্তবের নগ্ন-মূর্ত্তির প্রকাশ শিহরণ।

'সাত কোটি বাঙালীরে হে বঙ্গ-জননী!
রেখেছ বাঙালী করে; মানুষ করো নি।'

এ যে কত বড় অরুন্তুদ মর্ম্মজ্বালার আর্ত্ত অভিব্যক্তি, তা যার মধ্যে স্বাজাত্যবোধ কিছুমাত্র আছে, সে-ই জানে।"

আবার 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে কোন এক আঘাতজনিত ক্ষুব্ধতা তাঁর বেদনাকাতর কোমল চিত্তকে স্পর্শ করেছে।

কোথাকার বেদনা যেন তাঁকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। তাই তার দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি বলছেন—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে"

কারণ, যারা নীরবে দুঃখ ভোগ করছে তাদের

"মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

নানা বিপর্য্যয়ে পর্যুদস্ত ভারতের মুখে ভাষা ফোটাতে এসে তিনি দেখলেন যে ভারতের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে ধূমায়িত হচ্ছে, আগুন এখনও জ্বলে উঠে

নি। আমরা দেশের লোককে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না, নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটির প্রহসন নাট্যে জগতের সামনে হয়েছি হাস্যাস্পদ। আমাদের মধ্যে আবার জাতীয়তাবোধ আসবে কোথা থেকে? তাই কবির ভাষায়—

"স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়দের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জন্তে বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি।"

সে জন্য আমাদের বিরোধ আর জাতীয় দৈন্য যে কোথায়, কবি তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে জাতির একত্বই যে জাতির মুক্তির কারণ তা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা ক'রে বললেন,—

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে, সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহারা সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিতে এবং জেলখানা আপন লৌহ-বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে, কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই চারি জন লোকও যখন শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণটুকু তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র,' 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে কত সুন্দর ও চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

জাতীয় জীবনের উদ্বোধনে ভারতকে মুক্তির সাধনা করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই। দুর্য্যোগের ঘনঘটা যখন ভারতের বুকে নেমে এসেছে, তখন তিনি শুনিয়েছেন সকলকে তাঁর মুক্তির গান। সেই সময়ে ভারতের যে ছবি তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিয়েছিল, তা ছিল ভারতের নিজস্ব সত্যকারের রূপ। ভারতীয় তপোবনের আদর্শে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে নিঃশব্দ, নিরলস কর্ম্মসাধনায় যে অপূর্ব্ব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য জাগ্রত ছিল, সেই বৈশিষ্ট্যেই তিনি ভারতের জাতীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছিলেন। সেই বৈশিষ্ট্যকে বরণ ক'রে মুক্তি-মন্ত্রের সাধক হ'তে উদাত্তকণ্ঠে তিনি গেয়ে উঠলেন—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যু বরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।"

এই মুক্তির সাধনার সঙ্গে আবার তিনিই করেন বাংলায় বীরপূজার প্রবর্ত্তন। কারণ, তিনি মনে করতেন যে এই বীরপূজার ঢেউয়ে বাংলায় জাতীয়তার যে বান আসবে, তার পলিমাটির উপর গড়ে উঠবে শত শত বাংলার কর্ম্মী। যুগের সমস্ত আগাছা ছাড়িয়ে, বনস্পতির ন্যায় উর্দ্ধে বিরাজ করবে বাংলার নির্ভীক স্বাধীনচেতা সন্তান। অন্য সব দেশের সঙ্গে স্বাধীনতার বিজয় অভিযানে এগিয়ে চলার পথে নূতন প্রেরণায় তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর কবিতা 'শিবাজী উৎসবে' শিবাজীর নামে বাঙালীকে উদ্বোধিত করলেন—

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজী!
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

লর্ড কার্জ্জনের সময়ে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমর অবদান চিরস্মরণীয়। এই সময়ের জাতীয় সঙ্গীতগুলি ভাবের দ্যোতনায় বাংলার যুবককে যে কি এক নূতন শক্তি, নূতন উৎসাহ ও কর্ম্ম-প্রেরণা যোগাত, তা সত্যই ছিল বিস্ময়ের বস্তু। যখনই জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যখনই কোন অবিচার দেশের মাথার উপর নেমে এসেছে, তখনই তিনি গম্ভীর জলদ মন্দ্রে দেশকে, জাতিকে আহ্বান ক'রে, সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন—

"যদি মান পেতে চাও প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।'

তাঁর এই ডাক কোন দিন ব্যর্থ হয় নি। সমগ্র দেশ অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করেছে। এই ভাবে তিনি নিরাশার বুকে আশা, দুর্ব্বলের হৃদয়ে বল সঞ্চার করতেন। তাঁর 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,' 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,' প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানগুলি সত্যই বাংলার যুবক-সম্প্রদায়ের মনে আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে দিত, জীবনকে তুচ্ছ ক'রে ঝড়ের বেগে ছুটে চলত তারা মরণের সিংহদ্বার-পথে। 'শিকলদেবীর পূজাবেদী'র সামনে আত্মাহুতি দেবার জন্য এই যে উন্মাদ প্রয়াস, এর পিছনে ছিল কার অনুপ্রেরণা?

দেশবাসীকে তাই চিরদিন তিনি বজ্রকঠোর কণ্ঠে এগিয়ে চল্‌তে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

আগে চল্, আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

এই ভাষার মধ্যেও আমরা পাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সেই প্রলয় মেঘের গর্জ্জনধ্বনি—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

আবার 'রাখি-বন্ধন' উৎসবের সৃষ্টিও করেন রবীন্দ্রনাথ। যখন বাংলাকে ভাগ ক'রে ফেলা হ'ল তখন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দেশব্যাপী এই সরকারী ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রে রাখি-বন্ধন উৎসব পালন করে। এই বিশেষ দিন ও উৎসবকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত রচনা করেন তার মধ্যে ধ্বনিত হ'ল আশা ও দুরাশার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বলদর্পিত সরকারকে উদ্দেশ ক'রে যেমন তিনি বললেন—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন্ শক্তিমান"

তেমনি সেই সঙ্গেই—

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
তত্তই মোদের বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
তত্তই মোদের আঁখি ফুটবে।"

গান গেয়ে আমাদের মনের মধ্যে এনে দিলেন দেশপ্রেমের কূলপ্লাবী বন্যা।

যখনই জাতীয় জীবনের স্রোতে ভাটা পড়েছে, যখনই সংস্কারের ঝড়ের ধুলা-বালিতে অন্ধ হয়ে দেশবাসী ভুলে গেছে তাদের মাতৃভূমিকে, তখনই ভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত 'জন-গন-মন-অধিনায়কে'র কবি ভারতকে জাগিয়ে তুলবার জন্য দেশমাতৃকাকে আকুলভাবে ধ্যান করেছেন—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র
অরুণ বরণ।"

তাই দেশবাসীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য তিনি আবার ডাক দিলেন, সুপ্ত জাতির চেতনা ফিরিয়ে আনলেন,

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যা'ক
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

দেশের মুক্তি-সাধনায় নবীন বাংলার নবীন যুবককেই তিনি আহ্বান করলেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

*   *   *

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরদিন কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন, বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো তোর আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তার দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় দেখতে পাই। জাতীয় উদ্দীপনায় ভারতকে জাগাতে তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই জাতীয়তা সম্বন্ধেই আমেরিকায় বক্তৃতা করতে গিয়ে সেখানে যে বাণী উচ্চারণ করলেন তা সত্যই সাধারণ মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়। আমেরিকায় 'Cult of Nationalism' সম্বন্ধে বক্তৃতায় বললেন—'ন্যাশনালিজম অপদেবতা, ইহার সমক্ষে জীব বলি দিও না।' অথচ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভারতকে সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে তিনিই নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভালভাবে জানেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে যাঁদের পরিচয় নিবিড়; তাঁরা জানেন, রবীন্দ্রনাথের মতে 'ভারতের জাতীয়তা'য় এবং য়ুরোপের 'জাতীয়তা'য় প্রভেদ কত অসীম!

রবীন্দ্র-সাহিত্যে জাতীয়তার যে আদর্শ ফুটে উঠেছে, তা সত্যই অতুলনীয়। তিনি দেশপ্রেমে বিভোর হয়ে, দেশের উন্নতির জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। সর্ব্বকালের সর্ব্বযুগের মানুষকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন তাঁর স্বদেশভক্তিতে—

"নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত ল'ব শিক্ষা।"

দেশের দারিদ্র্য তাই তাঁর চিত্তকে ব্যথাতুর ক'রে তুলেছে—

"দীনের এ পূজা দীন আয়োজন
চির দারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে।"

কবির কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার কখনও নীরব হয় নি। জাতীয় সঙ্গীতের উদ্বেল ধারা যখন 'বাঁধন-হারা বৃষ্টি-ধারা'র ন্যায় তাঁর সমস্ত অন্তর প্লাবিত ক'রে কুলুকুলু তানে জাতীয়

জীবন-সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছে, তখন তিনি সব ভয়, ডর, লাজ-লজ্জাকে তুচ্ছ ক'রে নির্ভীক চিত্তে গেয়ে উঠেছেন—

"মাতিয়া যখন উঠিছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ
উথলি যখন উঠিছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর ?"

জাতীয়তার পবিত্র সৌধ নির্ম্মাণে কাউকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না। দেশজননীর পূজায় কখনও কি উচ্চনীচ ভেদ আছে ? তাই উচ্চনীচের ব্যবধানের অভ্রভেদী প্রাচীর তিনি ধূলিসাৎ করলেন। ছোট-বড়র পার্থক্য ধরণীর ধূলার সঙ্গে মিশে গেল। তিনি জানতেন যে ছোট ছোট বালুকণার সমষ্টিতেই গড়ে ওঠে বিশাল মরুভূমি, ছোট ছোট জলকণায় সৃষ্টি হয় অকূল, অসীম, অনন্ত মহাসমুদ্র। তাঁর এই জাতীয় জাগরণের গান যদি এক জনেরও প্রাণে সাড়া আনতে পারে, একজনও যদি তাঁর বীণার ঝঙ্কারে প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে মুক্তি-মন্ত্রের দীক্ষা নিতে আসে, আশা-নিরাশার এই দ্বন্দ্বে তাই তিনি গাইলেন—

"যদিও জননি ! যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান ?"

এই জাতীয় জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন ভারতের আসল রূপ। তাঁর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠল ভারতের উজ্জ্বল ছবি পরাধীন ভারতের আসন্ন গৌরবমূর্ত্তিকে তাঁর কল্পনার রথে চড়িয়ে। তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেলেন তা ভারতের প্রাণশক্তিকে চিরদিন অমৃতরসে সঞ্জীবিত করবে ; নিরাশার ঘোরে আশার আলো জ্বালিয়ে পথ দেখাবে।

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিতে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।"

তাই তাঁর আশাকে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে সফলতায় ভরে তুলতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—

"বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।"

জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত কুয়াশা-জাল কেটে গিয়ে যে সুন্দর ও মহিমান্বিত ভারতের স্বপ্নোজ্জ্বল ছবি ভেসে উঠেছিল তার সম্পূর্ণ বাস্তব মূর্ত্তি যদিও তিনি দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু নূতন যুগের প্রভাতসূর্য্য ভারতে পূর্ব্বাশার দিক্‌চক্রবালে যে উদিত হয়েছে, তার সুন্দর অভিব্যক্তি তাঁর অন্তরের মাঝে জ্বালিয়ে দিয়েছিল অনির্ব্বাণ আলোকের হোম-বহ্নিশিখা। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের স্তূপকে বিদীর্ণ ক'রে, মৃত্যুকে ধ্বংস ক'রে, জাতীয়তার মন্ত্রে জীবনের বেলাশেষে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ ক'রে রুদ্রকণ্ঠে তিনি নবযুগের প্রভাতসূর্য্যকে আহ্বান ক'রে গেলেন—

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয় !
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য্য এসেছ রুদ্রসাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হউক লয়।
তোমারি হউক জয়।"*

* গত ১৩ই-১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত পাবনা জেলা ছাত্র-ছাত্রী কৃষ্টি সম্মিলনীতে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত।

এই প্রবন্ধ রচনাতে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'রবীন্দ্র-জীবনী,' ১ম ও ২য় খণ্ড হইতে বহু সাহায্য পেয়েছি।

দু-শ বাইশ নম্বর

(আসলে বাইশ)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

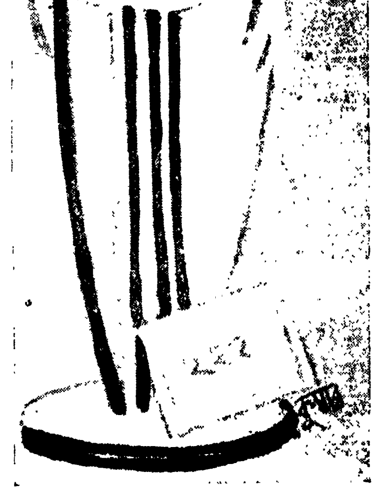

সৃষ্টির কারখানায় বাইশ নম্বর মানুষটির পরিকল্পনা করা হ'ল পরম যত্নে, কারণ তাকে হ'তে হবে রাজপুত্র। তার মর্মস্থলে বপন করা হ'ল রাজোচিত যত বৃত্তির বীজ, তার দেহে দেওয়া হ'ল অতুলনীয় রূপ এবং তার ব্যক্তিত্বে মারা হ'ল আভিজাত্যের ছাপ।

এ হেন মানুষটির জন্ম নেবার কথা ছিল অনন্তপুরের রাজপুরীতে পাটরাণীর কোলে, কিন্তু সৃষ্টির কারখানার ডেলিভারী ডিপার্টমেণ্টের ব্যস্তবাগীশ কেরানীর ভুলে বাইশ নম্বর টিকিটের জায়গায় পেলে দু-শ বাইশ নম্বরের টিকিট এবং জন্ম নিলে কলকাতার পঞ্চানন দত্তের লেনের ৩৩।৩ নং দোতলা বাড়ীটায়।

এক পৌষ সায়াহ্নে দু-শ বাইশ নম্বর (আসলে বাইশ) ভূমিষ্ঠ হ'ল। যেখানে তিন-শ দামামা, পাঁচ-শ জয়ঢাক ও কয়েক হাজার ঢোল বাজবার কথা ছিল সেখানে বাজল একটি মাত্র শাঁখ; যেখানে লক্ষ লক্ষ প্রজা উল্লসিত হবে সেখানে উল্লসিত হলেন ঠাকুরমা, আর পিসীমা, বাবা, মা আর দুই দিদি।

শশিকলার মত দু-শ বাইশ নম্বর দিনে দিনে বাড়ে। যে-মুখের হাসিতে ফাঁসির দণ্ড মাফ হয়ে যাবার কথা, সে মুখের হাসিতে কেবল পিসীমা মাঝে মাঝে মালা জপ্‌তে ভুলে যান; যার কান্নায় জমজমাট রাজসভা ভেঙে দিয়ে মহারাজ উষ্ণীষ সামলাতে সামলাতে অন্দরমহলে ছুটে আসবেন, তার কান্নায় কি না পিতা শ্রীহরিচরণ রায় হুঁকো রেখে বৈঠকখানা থেকে ধীরে-সুস্থে উঠে আসেন।

কিছু কাল পরে সুরু হ'ল চলি-চলি পা-পা। তার টলে টলে চলা দেখে বিস্ময়ে পঁচিশটা দাসীর বাক্ রোধ হ'ল না বটে, তবু সে চলা বাল-রাজকুমারেরই উপযুক্ত। মাটির পুতুল আর কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করে দু-শ বাইশ নম্বর (আসলে বাইশ)। মাটির পুতুলের মাথায় অভ্যাস করে পদাঘাত এবং কাঠের ঘোড়ার উপর পরীক্ষা করে বল।

ক্রমে আসে কৈশোর, দৌরাত্ম্যে ছোট্ট বাড়ীখানা কাঁপতে থাকে। বেরালটাকে দোতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চায়ের পেয়ালার উপর মার্বল দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে,

ছাদের কার্ণিসের উপর ব'সে নির্ভয়ে হাসতে থাকে। খেলে সে রাজপুত্রের খেলা, চলে সে রাজপুত্রের চালে, ছোটকে সে বড় ক'রে দেখে, সাধারণ তার কাছে অসাধারণ, পড়বার ঘরখানা তার মতিমহল, ছাদের একটা কোণ তার গুলবাগিচা, সিঁড়ির নীচে অশ্বশালা, আলমারির পিছনে অস্ত্রাগার।

দিন যায়—দু-শ বাইশ নম্বরের সুরু হয় শিক্ষা। দেখা যায় সকল বিদ্যাতেই তার বিরাগ, অনুরাগ এক যুদ্ধবিদ্যায়, অথচ বাংলার বিদ্যালয়ে ও-বিদ্যার স্থান নাই। ও-দিকে সৃষ্টির কারখানার পরিকল্পনা মত তার সুরু হয়েছে রণ-কণ্ডূয়ন। অবশেষে প্রকৃতি করল এ সমস্যার সমাধান—দু-শ বাইশ নম্বর হ'ল সাহিত্যিক-ধনুর্ধর। এই নবীন সব্যসাচীর বাণ খেয়ে কত প্রবীণ সাহিত্যরথী ধুলোয় গড়াগড়ি গেল, এর যুক্তির লগুড়াঘাতে কত প্রাচীন মতবাদ গুঁড়ো হ'ল।

ইতিমধ্যে যৌবন এসে গেছে দু-শ বাইশ নম্বরের জীবনে। পাখীরা গান গায়, সে যেন তাকেই খুশী করবার জন্যে, ফুল ফোটে সে যেন তাকেই প্রফুল্ল করবার জন্যে, আকাশে মেঘ ঘনায় যেন তাকেই উদাস করবার জন্যে। মনে হয় তার যেন সে হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র পুরুষ। পঞ্চানন দত্তের ছোট ও সরু গলিটা ছোট এবং সরু ব'লে মনে হয় না, যেন তা এক বৃহৎ রাজপথ, সেই পথ দিয়ে সে যখন সগৌরবে চলে তখন দু-পাশের বাড়ীগুলোর আধখোলা জানালার আড়াল থেকে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে থাকে—কারু খুলে পড়ে কবরী, কারু ছিঁড়ে যায় মুক্তামালা। কেউ হয় বিবশা, কেউ ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস।

আভিজাত্যের নিদর্শন যে রসবোধ তা জাগে তার প্রাণে, সৌন্দর্য্যের পূজা করতে সে লজ্জিত হয় না। দ্বাদশী পুঁটিকে সে ভারতচন্দ্র প'ড়ে শোনায়, চতুর্দশী রমাকে সে 'আধুনিকতম বাংলা কবিতা' উপহার দেয়, পঞ্চদশী প্রমীলার পায়ে দেয় পুষ্পাঞ্জলি, ষোড়শী সুমিত্রা সেনের ব্যাল্‌কনির নীচে ঊর্দ্ধ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, অষ্টাদশী অমিয়া মিত্রের জুতো কিনে এনে দেয় বুকে ক'রে, সপ্তবিংশতিতমা প্রতিমা মুকার্জ্জি (বিবাহিতা, দু-শ বাইশ নম্বরের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়) তার গতজন্মের প্রিয়া।

একদা পুঁটির বেদরদী দাদা তাকে সদর দরজা দেখিয়ে দেয়, রমার মামা আধুনিকতম বাংলা কবির ভাষায় গালাগালি করে, প্রমীলার বাবা বাসা বদলান, সুমিত্রা সেনের ব্যাল্‌কনি থেকে পড়ে একপাটি পাদুকা, আর প্রতিমার স্বামী তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটাবার উপক্রম করে—গতজন্মের নয়, এ জন্মেরই।

সে মর্ম্মাহত হয়, ভেবে পায় না তার ভুল কোথায়। ভুল সে করে নি, ভুল করেছে পুঁটির দাদা, রমার মামা, প্রমীলার বাবা, প্রতিমার স্বামী; কারণ সে ত অন্যান্যের মত দু-শ বাইশ নম্বর নয়, সে যে অনন্য বাইশ নম্বর।

মা বলেন ছেলের বিয়ে দাও, বাবা বলেন আগে উপার্জ্জন করুক। সমস্যা দেখা দেয় আবার। সৃষ্টির

কারখানায় তাকে আয় করবার উপযুক্ত ক'রে তৈরি করা হয় নি, করা হয়েছে ব্যয় করবার উপযুক্ত ক'রে। কথা ছিল জমার দিক্‌টার ভার নেবে অনন্তপুরের প্রজারা, খরচের ভার নেবে সে, কিন্তু দৈবক্রমে অনন্তপুরের কোষাগার রইল অনন্তপুরে, আর সে রইল কলকাতায় পঞ্চানন দত্তের লেনে।

উপার্জন সে করতে পারল না। কিন্তু তাতে আট্‌কালো না বিয়ে। এক দিন গোধূলি লগ্নে বিশালগড়ের রাজকন্যার বরমালায় অলঙ্কৃত হবার কথা ছিল যার গলা, হালিশহরের সাধারণ সরলা হ'ল তার গলগ্রহ।

স্ত্রীর হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ ক'রে হতাশ হ'ল সে। ভেবেছিল একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান যেখানে পাবে, বাধবে সংগ্রাম, চল্‌বে প্রেমের প্রতিযোগিতা, শেষ অঙ্কে হবে তার জয়। কিন্তু সরলার হৃদয়রাজ্য যে জনশূন্য— সন্দেহ করবার মত শুকনো ফুলের মালা বা ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো বা সামান্য পদচিহ্নও নাই। সে রাজ্যে প্রথম পুরুষ প্রবেশ করল সে।

যে-নারী-হৃদয়ে প্রেমের দ্বন্দ্ব নাই, আজকালকার বাজারে সে-হৃদয় যে একেবারে অচল! বউ তার পছন্দ হ'ল না।

দিন যায়, হঠাৎ এক দিন দু-শ বাইশ নম্বরের হ'ল পিতৃবিয়োগ। প্রজাদের জয়ধ্বনির মধ্যে হ'ল না তার অভিষেক, রত্নসিংহাসনে করল না সে আরোহণ, পাওনাদারের চীৎকারের মধ্যে বসল গিয়ে বাপের শূন্য বেণ্টউডের কেদারায়।

তবু সে বসার মধ্যে থাকে একটা মহিমান্বিত ভঙ্গী।

অনন্তপুরের কোষাগারের দ্বার উন্মোচন সে করে না, হরিচরণ রায়ের টিনের ক্যাশ-বাক্স খুলে সে পায় পাঁচ টাকা তের আনা তিন পয়সা।

কালক্রমে দু-শ বাইশ নম্বরের হয় একটি ছেলে, সে তার নাম রাখে বিক্রমাদিত্য।

দিন যায়।

দারিদ্র্যের পেষণে তার সে পরমসুন্দর দেহ ভেঙে যায়, ললাটে পড়ে রেখা, চুলে ধরে পাক। আগেকার মানুষটিকে প্রায় চেনা যায় না, কেবল কথায় কিছু কিছু ধরা পড়ে। গলির মোড়ে চায়ের দোকান। সকাল বিকেল সেখানে সে সভা বসায়। চা খায় এক পেয়ালা, বিড়ি টানে অনেকগুলো এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে সে বলে তার বংশের অতীত গৌরবের কথা—তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোনার দেউল, তার প্রপিতামহের হাতীশালায় ছিল দু-শ দশটা হাতী। শ্রোতারা কানাকানি করে, কেউ বলে 'লোকটা মহা চালিয়াৎ আর মিথ্যাবাদী, হরিচরণ রায়ের চোদ্দ পুরুষের খবর রাখি—হাতী কখন চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ।' মূর্খ শ্রোতারা জানে না সে হরিচরণ রায়ের চোদ্দ পুরুষের কথা বলে না, বলে অনন্তপুরের রাজবংশের কাহিনী, সে যে দু-শ বাইশ নম্বর নয়—সে হচ্ছে আসলে বাইশ নম্বর।

মুক্তি-অভিসার

শ্রীজীবনময় রায়

বন্দী ছিলেম সুপ্তিশয়ানে সুখে গৃহকোণে ;
বাতায়ন পথ খুলিয়া একদা হেরি—
চারিদিকে মোর মহাপ্রলয়ের রক্তবহ্নি
অযুত লেলিহ শিখায় ফেলেছে ঘেরি ;
কোথা আশাপথ ! সম্মুখে সুধু মরু-প্রান্তর
মৃত্যু-ধূসর করাল রসনা মেলি ;
পরপারে তার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ক্রূরপারাবার
প্রলয়গর্জ্জে উঠিতেছে উদ্বেলি।

* * *

১

নয়ন আমার পথপানে চায় নিত্য,
কোথা পথ ! ওগো কোথা পথ ?
শুধু চলি পথে পথে মুক্তি-ব্যাকুল চিত্ত।
সঙ্গী আমার নাই থাক কেহ,
বাঁধিতে পারে নি মোরে এই গেহ ;
পথ জনহীন, রুদ্র এ দিন,
সেই ত পরম বিত্ত।
সম্মুখে দূর দুর্গম পথে
মরণ করিছে নৃত্য।

২

ব্যাপি ধূ ধূ মরু সারা পথ আজ শূন্য ;
চলি মুক্তির অভিসারে—আমি একা চলি—চলি তূর্ণ।
ধরণীর বুকে জ্বলে বালুকণা,
গগনে গগনে আগুনের ফণা,
সঙ্কটময় পথ নিশ্চয়
তাহে নহে মন ক্ষুণ্ন ;
যদি দুর্গম হবে না অগম—
চিত্ত পাথেয় পূর্ণ।

৩

দেহ আজি মোর বাধা নহে নহে বন্ধ ;
মুক্ত চিত্ত অদীন—চিত্ত অজেয়, সত্যসন্ধ।
যাহা কিছু আছে সব প'ড়ে থাক,
পিছনে মরুক পিছনের ডাক,
মন চলে ছুটি, মানে না ভ্রূকুটি,
নাহি দ্বিধা নাহি দ্বন্দ্ব ;
নহে নহে ভীত, দেশকালাতীত
লভেছে অমৃত ছন্দ।

৪

বিদ্যুৎ অসি ঝলসিছে দিক্ প্রান্তে,
ঝঞ্ঝা দারুণ হানিছে—ঝঞ্ঝা মাতিছে বনে বনান্তে ;
কে রুধিবে এই ঝটিকার শ্বাস ?
তরুণ গরুড়—নব বিশ্বাস।
সম্মুখে হেরি বনান্ত ঘেরি
রুদ্রকালের নৃত্য ;
সেই দুর্জ্জয় সাথে পরিচয়
মাগে দুর্দ্দম চিত্ত।

৫

ঘুচিয়াছে ভয়, জানি নিশ্চয়
পাব সে পরম মুক্তি ;
বাধা থাকে থাক চলিব দলিয়া
লক্ষ হিসাব-যুক্তি।—
পথে বিভীষিকা ক্রূর অকরুণ,
মরু-মরীচিকা, জলদ-অরুণ,
ঝঞ্ঝাধাত্রী গহন রাত্রি,
ভীরু পথিকের উক্তি,
সবারে হানিব, কিছু না মানিব
লভিব অমোঘ মুক্তি।

৬

সম্মুখে পথ দীর্ঘ গগন রুদ্র,—
দলি বাধা চলি, চলি নির্ভয়, চলি একা,
আমি মানি না নিজেরে ক্ষুদ্র
থাক্ গৃহধন তুচ্ছ এ কায়া,—
মণি-পিঞ্জর-বন্ধন-মায়া ;
দুর্জ্জয় আমি, ব্রাহ্মণ আমি,
নহি আমি নহি শূদ্র ;
আমি. করিব তরণ পলকে মরণ
জ্বলন-জালা সমুদ্র।

বাংলা ভাষায় শব্দের গ্রহণ ও বর্জ্জন

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

আমরা আজকাল নানান বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করছি; সেই সব বিদ্যার সামান্য কিছুও যদি মাতৃভাষায় ব্যক্ত করতে যাই, তা হ'লে বাংলা ভাষায় শব্দের অভাব আমাদের নজরে পড়ে। আজকাল আবার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের হিড়িক পড়েছে, তাই সেই অভাবের বহর যে কত বড়, সে সম্বন্ধে আমাদের হুঁস হয়েছে,—অভাব দূর করবার জন্য পরিভাষা গঠন করা হচ্ছে, অর্থাৎ ইংরেজী প্রমুখ বিদেশী ভাষার শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গঠন করা হচ্ছে। আমাদের বিদ্যার দৌড় মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে আমরা যে আজ এই বাধা পাচ্ছি তার কারণ দেশজ বিদ্যার সঙ্গে আমাদের—দু-দশ জন বাদে—কাহারও বিশেষ পরিচয় নাই। আমরা 'ফিলসফি'তে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করি, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রটা বিশেষজ্ঞের জন্য তুলে রাখি; কিন্তু হওয়া উচিত, ঠিক বিপরীত— 'ফিলসফি'টা বিশেষজ্ঞের জন্য সরিয়ে রেখে, দর্শন শাস্ত্র সাধারণ শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করি। অথচ দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দেশজ জ্ঞানভাণ্ডার দুষ্প্রাপ্য হয় নি।

পরিভাষা গঠনে দেশজ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণ বিশেষ দরকার; কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও তার বর্ণমালা ছেড়ে ইংরেজী তর্জমা অথবা রোমান অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ভাষার উপরেই যদি আমরা নির্ভর করি, তা হ'লে সমূহ ক্ষতি হবে। সাহেব-পণ্ডিতদের পুস্তক যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা এই কথা বলেন। যেসব সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দের আদ্যবর্ণ 'চ'—যথা 'চার্ব্বাক'—ম্যাক্‌স্‌মুলার সাহেব তাঁর পুস্তকে 'ক (k),' দিয়ে সেই সব শব্দ আরম্ভ করেছেন; সাহেব বোধ হয় কোন 'নেটিভ্'কে দিয়ে পাঠকার্য্য এবং অন্যান্য কার্য্যও সমাধান করতেন, আর সেই দেশী লোক কর্ত্তৃক লিখিত 'সি-এচ্ (ch)'-এর উচ্চারণ 'চ'-এর বদলে 'ক' মনে ক'রে সেই সব শব্দের আদিতে 'সি-এচ্ (ch)' তুলে দিয়ে 'কে(k)' বসিয়েছেন। এই সব সাহেব-পণ্ডিতদের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যদি সংস্কৃত হ'তে বাংলা পরিভাষা সংগ্রহ করি, তা হ'লে পরিভাষাটা "না ঘরকা, না ঘাটকা" হওয়াই সম্ভব। সাহেব-পণ্ডিতগণ যে বাঙালী ও অন্যান্য দেশী লোকের বিদ্যার উপরে কলম চালাইয়া তাহা নিজের নামে প্রচারিত হ'তে দিতেন, এই কথা ১৩৩৮ সনের 'পঞ্চপুষ্প'—দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত "আমাদের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে ৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখে গেছেন—

> "অনেকে মনে করেন, পুরাতন শিলা-লিপি পাঠ, এ বিদ্যা সাহেবরা জানিতেন; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে, তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি; উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ সাহেবের শিলা-লিপিগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন।"

তন্ত্র শাস্ত্রের যেসব ইংরেজী পুস্তক আর্থার্ অ্যাভালন্ সাহেবের নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত, আমি জানি—সেগুলির প্রায় সবই ৺অটলবিহারী ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত।

পরিভাষা গঠনে আর একটা দিক্ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি। মিস্ত্রী ও শ্রমজীবীরা তাদের কথায় দু-দশটা পরিভাষা ব্যবহার করে; এরা ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানে না, তাই এদের পরিভাষা সহজ ও সরল। বছর দুই পূর্ব্বে এই শ্রেণীর দু-জন ইলেক্‌ট্রিক্ মিস্ত্রী কাজ করছিল, তাদের কাছ থেকে ক'টি শব্দ শিখলাম—বিজলী তার='ইলেক্‌ট্রিক্ লাইন বা ওআইরিং', গরম তার='পসিটিভ্ লাইন', ঠাণ্ডা তার='নেগেটিভ লাইন', মরা তার='ডিস্‌কনেক্‌টেড্ লাইন। ইমারতী কাজে 'কন্‌ক্রীট্', 'ফেরো কন্‌ক্রীট্' প্রথা ইতিমধ্যে ধনী-নির্ধন সকলের কাছেই পরিচিত ও আদৃত হয়েছে; আমরা সকলেই জানি, ইংরেজীতে নিরক্ষর রাজমিস্ত্রীরা এই প্রথাকে 'জমাটি কাজ' বা 'ঢালাই কাজ' বলে,—গাঁথুনী কাজের বদলে 'কন্‌ক্রীটে'র কাজ হ'লে তারা জমাটি কাজ বলে, যেমন—জমাটি দেওয়াল, জমাটি থাম,—আর অন্যত্র কন্‌ক্রীটের কাজ হ'লে তারা 'ঢালাই কাজ' বলে, যেমন—ঢালাই ছাদ, ঢালাই মেঝে। যাঁরা এই সব মিস্ত্রী ও শ্রমজীবীদের সহিত বিশেষ-

ভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা যদি এই সব শব্দ সংগ্রহ করেন, তা হ'লে খুবই ভাল হয়। বিলম্বে এই সুযোগ নষ্ট হবে; কারণ ভৃত্যবর্গের (চাকরবাকর—'মিনিয়াল্‌স্') মধ্যে প্রাথমিক ইংরেজী জানা লোকের খুব আমদানী হচ্ছে, ইহাদের মুখে ইংরেজী বুক্‌নীর অভাব হয় না। আমার ভৃত্যটি খামের ওপরে ইংরেজীতে লেখা নাম ঠিকানা কোন রকমে পড়তে পারে, হিন্দী রামায়ণের যুক্তাক্ষর-কণ্টকিত অংশ পশ্চিমা দ্বারবানরা যেমন ভাবে পড়ে; এই বিদ্বান্‌ ভৃত্যের মুখে ইংরেজী শব্দের অভাব হয় না—ঠিক্‌ 'টাইমে গেছলাম, 'পিক্‌চার্‌'টা পড়ে গেছল, 'নিউস্‌-পেপারের' দামটা কি দেবো ইত্যাদি। হপ্তাখানেক আগে ফিরিওয়ালার কাছে আম দর করেছিলাম—সে আমার দর শুনে বললে—"আপনি 'লাষ্ট্‌ ইয়ার' (গত বছর)-এর দর বলছেন।"

ইংরেজী ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিগণের কাছ থেকে কেমন সহজ ও সরল পরিভাষা পাওয়া যায়, তার নমুনা আমি অন্য ক্ষেত্রেও পেয়েছি। সেকেলে এক পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আছে; তাঁর কথায় কতকগুলি শব্দ লক্ষ্য করেছি। তিনি 'ব্রাহ্মণ বর্ণ', 'কায়স্থ বর্ণ' বলেন—'জাত' বোঝাতে 'জাতি' বলেন না; 'ইংরেজ জাতি', 'হিন্দু জাতি' বলেন—দেশের মুসলমানকে 'মুসলমান ধর্ম্মী' বলেন, বাহিরের মুসলমানকে 'মুসলমান জাতি' বলেন। এক দিন বললেন—"খবরের কাগজের 'স্তবকে' (কলাম্‌=column) এটার 'পাতি' (রিপোর্ট্‌=report) পালাম না।" 'নিষ্ঠা শব্দটা দিয়ে তিনি নানা ভাব ব্যক্ত করেন—'স্বদেশ-নিষ্ঠা, 'জাতি-নিষ্ঠা', 'সময়-নিষ্ঠা', 'নীতি-নিষ্ঠা' ইত্যাদি। 'মিটিং (meeting)' শব্দটার প্রতি তাঁর বেশ টান আছে, কিন্তু 'একজাই' শব্দটাও বলতে শুনেছি। পণ্ডিত মহাশয়টির কথার ভিত্তিতে আমি কতকগুলি শব্দের তালিকা দিচ্ছি—স্বদেশ-নিষ্ঠা=patriotism, জাতি-নিষ্ঠা=nationalism, সময়-নিষ্ঠা=punctuality, নীতি-নিষ্ঠা=discipline, নিয়ম-নিষ্ঠা=regularity. নিয়ম-নিষ্ঠিত=regular, নিয়মানুযায়ী=regularly, জাতি=nation, বর্ণ, জাত=caste, সম্পাদকীয় স্তবক=editorial column, কার্য্য-পাতি=আমরা যাকে 'কার্য্য-বিবরণী' বলি, পাতিদার=reporter, পাতিকৃত=reported, একজাই=মিটিঙ, meeting; মেলা=মিলা, চোখ মেলিয়া দেখা, একত্রিত হওয়া, খুঁজিয়া পাওয়া—সুতরাং 'এক্‌জিবিসন' (exhibition) শব্দের প্রতিশব্দ 'প্রদর্শনী' না হয়ে 'মেলা' হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত নয় কি? আমি এখানে আরও কতকগুলি ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতি-শব্দ দিচ্ছি—cause=হেতু; reasoning=কারণ; doubt=সংশয়, অনিশ্চিত জ্ঞান; suspicion=সন্দেহ, অনিশ্চিত নিরূপণ; genus=সামান্য; species=বিশেষ; conversation=আলাপ; discussion=জল্পনা; debate=আলোচনা; argument=বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক; deception=প্রতারণা; False reasoning=ছল; leap year=অতিবর্ষ; rationalism=যুক্তিনিষ্ঠা।

আর একটা কথা।—আমরা বিবিধ উপায়ে বাংলা ভাষায় নূতন নূতন কথা আমদানি করতে সচেষ্ট, কিন্তু কত কথা বর্জ্জন করছি, সেদিকে আমাদের হুঁস নেই। বেশী দিনের কথা নয়, নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর কলকাতায় যে কয়েক দিন সর্ব্বপ্রথম উদয় হয়েছিলেন, তখন তাঁর নৃত্য দেখবার জন্য একদিন রঙ্গমঞ্চ-গৃহে নিজের জায়গায় বসে এক বাঙালী তরুণীকে সূক্ষ্ম কণ্ঠে বলতে শুনেছিলাম—"টাকুর-ঝি, হিয়ার ইস ইয়োর সিট (ঠাকুর-ঝি, এই যে তোমার জায়গা)" এখন আর 'ঠাকুর-ঝি' সম্বোধন শোনা যায় না,—তাই, 'টাকুর-ঝি' শব্দটাও বোধ হয় লুপ্ত হয়েছে। 'দিদিমণি', 'দিদিভাই', 'দিদিবাবু' 'দিদিরাণী', 'দিদিবিবি' শব্দগুলো এখন ইংরেজী 'সিষ্টার' ও 'সিষ্টার-ইন্‌-ল' বলতে যাঁদের বুঝায়, যথা—বড়বোন, বৌদি, ঠাকুর-ঝি, শ্যালিকা, শালাজ প্রভৃতি সকল আত্মীয়ার প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে; ফলে 'দিদিবিবি' বললে, লোকটি শ্যালিকা অথবা শ্যালিকার উদ্দেশ্যে কথা বলছেন, তা ঠিক করা একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে,—'দিদিভাই' বললে, লোকটির বড়-বোনকে বুঝব, না, তাঁর বৌদিকে বুঝব! 'ঠাকুমা' ও 'দিদিমা' শব্দ দুটো লুপ্তপ্রায় হয়েছে; ঠাকুমা ও দিদিমা আজকাল সমভাবেই দিদিমণি, দিদিভাই হয়েছেন! পূর্ব্বে শ্বশুরকে 'ঠাকুর', আর শাশুড়ীকে 'ঠাকরুণ' বলা হ'ত,—এখন তাঁরা 'বাবা', 'মা' হয়েছেন। ভাশুর ও দেবরকে এখন আর যথাক্রমে 'ব'ঠাকুর' ও 'ঠাকুর-পো' বলা হয় না; দাদাবাবু, দাদাভাই, ক দাদা, খ দাদা ইত্যাদি সম্বোধনে তাঁরা সমভ্রাতা হ'য়েছেন। ননদাই এখন আর 'ঠাকুর-জামাই' নহেন,—তিনি ও ভগ্নীপতি দু'জনেই এখন 'জামাই বাবু'। পিতৃস্বসা ও মাতৃস্বসাকে এখন অনেকে 'পিসিমা' ও 'মাসিমা' না ব'লে 'মা-মণি', 'মা-জী' বলতে আরম্ভ করেছেন। ভাই ও বোনের শ্বশুরকে 'তালুই মশাই', আর শাশুড়ীকে 'তালুই-মা' বলা হ'ত। এখন এই দুটো

শব্দ লুপ্ত। এই ভাবেই আমরা আমাদের ভাষার একটা বিভাগে শুধু শুধু হেঁয়ালী বা জটিলতার সৃষ্টি কর্‌ছি।

আমাদের অনেকের ধারণা, "মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন" করা এবং তৎ ভাষাতে নূতন শব্দ গঠন করার সুখ্যাতির ষোল আনা বুঝ আমাদের যুগের প্রাপ্য; কিন্তু ঠিক তা নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "বীটন্ সোসাইটি"র এক অধিবেশনে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' পাঠ করেছিলেন; এই প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিষয় দুইটির পক্ষে বিশেষ ভাবে ওকালতী করেন; উক্ত বিষয় দুইটি সফল করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহাও তিনি বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর এই প্রস্তাবটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন; ইংরেজী ১৮৬৩ সনে পুস্তিকাটি "তৃতীয় বার মুদ্রিত" হয়,—এই তৃতীয় সংস্করণ হ'তে দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।—

"সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না, অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।" "ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাংলা, প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা যে মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।"

পরীর পরিণাম

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"জানালা খুলিয়া তাকাবে না কিগো মিসেস্ জিল্?"
বাগান হইতে মাথা দুলাইয়া কহিল পরী;
"জানালা খুলিয়া তাকাতে পারো না, মিসেস্ জিল্?"
কহিল সে পরী স্নিগ্ধ হাসিতে বাগান ভরি।

বাতাস নিথর, চেরী-শাখাগুলি কাঁপে না আর,
জানালার নিচে লতাঝোপ তাও থির নিসাড়,
জানালা-বাহিরে তাকালো না ফিরে মিসেস্ জিল্,
বাগানের পানে আঁখি মেলিল না, হাসিল পরী।

"কি করেছে ওরা, কি করেছে হায়, মিসেস্ জিল্?"
ফুলবনে চাহি' উজ্জ্বল চোখে কহিল পরী।
"কোথায় তোমায় লুকায়ে রেখেছে মিসেস্ জিল্?"
মেঘের মতন লঘু পায়ে নাচি কহিল পরী।

রাতের চাদরে ঢেকে গেল ধীরে পাহাড়-তল
কালো কারখানা, উপরে উজল তারার দল,
হিমেল কুটীর, কহিল না কথা মিসেস্ জিল্,
বাগান করিয়া পরিহাস রাখি গেল সে পরী।*

* ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার হইতে।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ

১

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নানা ভাবে দেখা যাইতে পারে। তাঁহাকে বলিতে পারি সাহিত্যিক, সাধক, শিক্ষক, কর্ম্মী, বিষয়ী, দেশপ্রেমিক, মানবহিতৈষী, অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ। রবীন্দ্র-কাব্যও তেমনই নানা শ্রেণী ও স্তরে বিভক্ত করা যায়। তেমনভাবে বিভাগ করিলে আমার কাজ সহজ হইত। বলিতে পারিতাম রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি, বসন্তের কবি, শরতের কবি। বলিতে পারিতাম রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য, কথাকাব্য, নাট্যকাব্যের কথা। তাঁহার কাব্যজীবনের যুগবিভাগ করিতে পারিতাম। তাঁহার গাথা ও গদ্যকবিতা লইয়া আলোচনা করিতে পারিতাম। তাঁহার ছন্দ, উপমা ও শব্দসম্ভার সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিতাম। এমন বিশাল তাঁহার রচনাবলী যে খণ্ডভাবে দেখিলেই রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে একটি প্রবন্ধের মধ্যে দেখিতে গেলে বালুকণার মধ্যে সারা সৃষ্টিকে, শিশিরবিন্দুর মধ্যে সূর্য্যকে দেখিতে হয়। তবুও সমগ্রভাবে দেখায় লাভ আছে। দূর হইতে হিমালয়ের অজস্র বৈচিত্র্য—তাহার অধিত্যকা, উপত্যকা, গুহা, গহ্বর, হ্রদ, অরণ্য—হয়ত সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয় না। তবুও চোখে পড়ে হিমালয়ের এক সমগ্র ছবি।

বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রপূর্ব্ব কাব্য এক নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মানসিক জাগরণের ফলে এক নূতন আশা, নূতন আনন্দ এবং নূতন বেদনা জাতির মনকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। মহাকাব্য ও দেশাত্মবোধের কাব্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মধুসূদন রচনা করিলেন মহাকাব্য। পুরাণে আছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মানুষ এখনকার চেয়ে আকারে-প্রকারে বড় ছিল। সুদূর অতীতকে আমরা দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখি। দূরবীক্ষণে দূরের বস্তু বড় দেখায়। মহাকাব্যে মানুষ মানসিক-দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়। সেখানে যেন সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখ নাই। মহত্তর সমাজের বৃহত্তর সুখ-দুঃখ লইয়া বিরাট্ সব মানুষ মহাকাব্যে লীলা করে। জাতীয়তার কাব্য মহামানবের কাহিনী নয় বটে, কিন্তু সেখানেও আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার স্থান নাই। জাতির বৃহত্তর বেদনার মধ্যে ব্যক্তি-মানসের সূক্ষ্মতর সুখ-দুঃখ লুপ্ত হইয়া যায়। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তার কবি। রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হইলেন, একটিমাত্র কবি তখন আপনার মধ্যে বিভোর হইয়া আপনার সুরে বাঁশী বাজাইতেছিলেন। তিনি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। শান্তগতিতে তাঁহার কাব্য-তরণী ভাসিয়া যাইতেছিল, পূরবীর সুরে বাঁশী বাজিতেছিল।

"গঙ্গা বহে কুলু কুলু যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝীরা নিমগ্ন গানে ঝুমুর পূরবী গায়।"

সেই সুর মানুষের ব্যক্তি-মানসের সুর। সেই সুরে আকৃষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথ মানুষের অনাবিষ্কৃত-মানসরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মানসরাজ্য গহনতলে অবস্থিত। গীতিকবিতার রাজ্য মনের অতল-তলের পাতালপুরী।

"আঁধার পাথার-তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক-মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা?"

ব্যক্তি-মানসের নব নব সুর তাঁহার বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। একদা মহাকাব্যরচনা ছিল তাঁহার মনের অভিলাষ। তাহা আর হইয়া উঠিল না।

"আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে;
ঠেকল কখন তোমার কাঁকণ-
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
কীর্ত্তি-কলাপ।"

২

সাহিত্য ও কলার এমন কোন অংশ নাই, রবীন্দ্রনাথের

করস্পর্শে যাহা অলঙ্কৃত হইয়া মনোহর হইয়া ওঠে নাই। ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পলেখক, নাট্যকার, গীতকার, হাস্যরসরচয়িতা, শব্দতাত্ত্বিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রশিল্পী—তিনি সবই। কিন্তু মূলতঃ তিনি কবি। রবীন্দ্রনাথের সকল রচনা কাব্যধর্মী।

মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কে এবং মানবের সহিত জগৎ ও প্রকৃতির সম্পর্কে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবরাশি সঞ্জাত হয়। সংসারযাত্রার প্রয়োজনে তাহার কিছু কথায় ও কাজে প্রযুক্ত হয়, স্মরণের সীমায় কোন-কোনটি লুকোচুরি খেলে, মনের অতলে অনেক ভাব চিরতরে মগ্ন হইয়া যায়। সঞ্চিত ভাবরাশিপূর্ণ মন স্থির জলের মত। গতি না আসিলে তাহা তরঙ্গিত হয় না, বেগ না আসিলে তাহা প্রবাহিত হয় না।

কাহারও অনুভূতি গভীর, কাহারও নয়। আমরা ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসি, আমাদের মনকে—সাগরের বিশালতা অভিভূত করে, শারদ-জ্যোৎস্না নন্দিত করে, সূর্য্যাস্ত রঞ্জিত করে। এ-সমস্ত সকলের মনেই যে রেখাপাত করে তাহা নয়। যাহার অনুভূতি গভীর তাহার কবিত্ব আছে, কবি-ভাব আছে। এমন অনুভূতিশীল মন সংসারে সুলভ নয়। কবিত্ব তাই দুর্লভ।

কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।

অর্থাৎ, অনুভূতিশীল মন মানুষকে ভাবুক করে। ভাবুকের প্রতি পূর্ব্বে 'নীরব কবি' কথাটি প্রযুক্ত হইত। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে। যে-কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব।" (সাহিত্যের সামগ্রী)।

অর্থাৎ কি-না কবি-ভাব বা কবিত্ব দাহ্য পদার্থ, প্রকাশ-ক্ষমতা দাহিকা শক্তি।

প্রকাশের অভাবে অনেক ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রকাশের অভাব দুঃখের কারণ। রজনীর মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

"......প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না। সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না।......দুঃখ যে কখনও প্রকাশ করিতে পারিলাম না এ দুঃখ কে বুঝিবে?"

প্রকাশে অক্ষমতা শক্তির অভাব। "শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা"। যাহা প্রেরিত করে, অনুপ্রাণিত করে, প্রকাশ করে তাহাই শক্তি। সকল বাধা অপসারিত করিয়া উৎসমুখে উৎসারণের মত শক্তি কবিত্বকে উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত, মুক্ত, সার্থক করিয়া তোলে।

"ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা—আঘাতে আঘাত কর্।"

বাঁধন ভাঙিয়া যায়, প্রাণের সাধন সাধ্য হয়, হৃদয়ের মুক্তধারা বহিতে থাকে।

"মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।"

এই শক্তির অভাবে গ্রে দু-একটি অপূর্ব্ব কবিতা লিখিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এই প্রাণদায়িনী প্রেরণা-বিধায়িনী শক্তির বলে ত্রিশ বৎসর বয়সে মরিয়াও শেলী অমর।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে এই সুদুর্লভ শক্তির অজস্রতা উপলব্ধি করি। সেই শক্তি যেন অন্তরমাঝে বসিয়া মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লয়। "মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ।" সেই শক্তির প্রেরণায়

"যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুধাবার তরে।"

৩

পুরাণে শুনি, কঠোর তপস্যায় দেবতার আসন টলিত। দেবতা অবতীর্ণ হইলে ভক্ত অমরত্বের বর প্রার্থনা করিত। অধিকাংশকেই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হইলে প্রকৃত তপস্বীর সন্তোষ নাই। "যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" যাহাতে অমরত্ব না পাইলাম তাহা দিয়া কি করিব?

মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা অমরত্বের সাধনা। "কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।"

কালিদাস বাঁচিয়া নাই এ-কথা কি বলিতে পারি? হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, চিত্তে চিত্তে তাঁহার অনুভূতি সঞ্চরণশীল, কাব্যপিপাসু প্রতি মনে কালিদাস সজীব।

চণ্ডীদাস আমাদের মধ্যে নাই এ-কথা কে বলিবে? যখন শুনি,

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

তখন চণ্ডীদাসের আকুলতা—আমাদের আকুলতা, বিশ্বমানবের আকুলতা হইয়া ওঠে; পঞ্চ শত বর্ষের

ব্যবধান কাটিয়া যায়, আমরা চণ্ডীদাসের কালের এবং তিনি আমাদের কালের প্রতিবেশী হইয়া উঠেন।

ঋষির সাধনা অমৃতের সাধনা। কবির সাধনাও তাই। যে, ঋষি উপলব্ধির আনন্দে, হৃদয়ের পূর্ণতায় বলিয়া উঠিলেন,

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

"দিব্যধামের অধিবাসী অমৃতের পুত্রগণ শোন শোন", সেই ঋষি কবি।

রবীন্দ্রনাথ অমৃতের পুত্র। তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। কার্লাইল বলিয়াছেন, "Shakespeare and Dante have, if not deified, been canonised." বলি বলি করিয়াও কার্লাইল বলিতে পারিলেন না কবিরা দেবত্বে উপনীত হইয়াছেন। আমরা জানি, কবিরা অমর, রবীন্দ্রনাথ অমর, তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

এগুলি শুধু কথার কথা নহে। কেন বলিলাম তাহা বলিতেছি।

৪

সমুদ্র-মন্থনে শ্রী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, হস্তে ছিল তাঁহার অমৃত কলস।

হৃদয়-সমুদ্র মন্থনে কাব্যলক্ষ্মীর উদয় হয়, তিনি বিতরণ করেন অমৃত।

সুধার সঙ্গে বিষ যে না ওঠে এমন নয়, জগতের কল্যাণ-দেবতা আপনার মধ্যে সে হলাহল সংহরণ করিয়া লন। কিন্তু সে অন্য কথা।

হৃদয়-সমুদ্রের কথা বলিতেছিলাম।—কাব্য হৃদয়ের লীলা। যেখানে জ্ঞান সেখানে আলোক, সেখানে আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়। যেখানে সুখ-দুঃখ ভালবাসা, সেখানে অনুভূতির কথা। সেখানে আমাদের হৃদয়ের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

"হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।" (সাহিত্যের তাৎপর্য্য)

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ হাসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"
(প্রভাত উৎসব)

"হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল।"
(সাহিত্যের তাৎপর্য্য)

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

"মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।"
(সাহিত্যের সামগ্রী)

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের নয়, বিশ্বজনের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছেন।

হৃদয়ের বৃত্তি—স্নেহ, প্রীতি, করুণা, মমতা, সহানুভূতি, দেশাত্মবোধ, মানবহিতৈষণা, বিশ্বপ্রেম। এই হৃদয় হইতেই আনন্দ ও বেদনা সমুত্থিত।

রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী মেয়ে', 'তারকার আত্মহত্যা' হইতে 'বৈষ্ণব কবিতা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'পতিতা', 'প্রেমের অভিষেক', 'শিশু'র কবিতাগুলি, 'ভারততীর্থ', 'সাজাহান', 'শেষ বসন্ত' পর্য্যন্ত এই হৃদয়ের গান। অথবা এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হৃদয়-সঙ্গীত নয়, তাহা কাব্যই নয়।

মানব-হৃদয় সমুদ্রের মত বিশাল এবং গভীর। সেই অতল-তলে কি অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, কি অশান্ত আকাঙ্ক্ষা, কত আশ্চর্য্য ভাব, কত অভূতপূর্ব্ব আবেগ, কত অপরিচিত চিন্তার ধারা, কত ভয়, কত বিস্ময়, কত ব্যাকুলতা, কত বৈচিত্র্য লুক্কায়িত আছে, তাহা কে বলিবে! রবীন্দ্রনাথ সেই হৃদয়-সাগরের রহস্য-সন্ধানী। কাব্য সেই গহন-তলে গাহনের কাহিনী।

"যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কী বা কাজ তীরে ফেলে এস আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গ রাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে
কুলু কুলু কলভাষে কত কি ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।"

এ যে হৃদয়-যমুনা, এর "নাহি তল নাহি তীর।"

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়-নীরে,
তল তল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।"

৫

অজ্ঞাত-শক্তির প্রেরণা হৃদয়কে উৎসারিত করে। এই শক্তি যাঁহার আছে, সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁহার বুদ্ধির নবনবোন্মেষ দেখিতে পাই। নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ এই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির

অধিকারী ছিলেন, কেন-না তাঁহার শুধু কবিত্ব—কবি-ভাব ছিল না, তিনি ছিলেন শক্তির আধার যে-শক্তি মনের অগোচরে অন্তর-সঞ্চিত ভাবরাশিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া হৃদয়কে উচ্ছ্বলিত, তরঙ্গিত, বেগবান, খরস্রোত করিয়া তোলে।

এই হিসাবে তিনি যেন অপরূপ এক সঙ্গীত-যন্ত্রের মত। অজ্ঞাত শক্তির স্পর্শ অকস্মাৎ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করে।

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে,
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।"

"Make me thy lyre even as the forest is."

প্রতিভায় সৃষ্টির নবনবোন্মেষ।

"প্রতিভা মনের এক বলবতী বৃত্তি; প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নবনবত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার তাহার উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম।"

ইহা Shairp-এর সংজ্ঞা।

"Genius is some strong quality of the mind aiming at and bringing out some new and striking quality in nature."

কার্লাইল—infinite capacity for taking pains*—অসীমক্লেশস্বীকারের ক্ষমতাকে প্রতিভা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিভা তপোবল; ক্লেশ যে সহ্য করিতে পারে না প্রতিভার অধিকারী সে নয়।

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
উর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখিতে পাই সৃষ্টির নবনবোন্মেষ, দেখিতে পাই প্রকৃতির নূতনতর বৈশিষ্ট্য, এবং যে-তপস্যায় ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন আনন্দমন্দাকিনী-ধারাকর্ষী সেই তপঃপ্রভাব।

ছন্দোবাণবিদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকির কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষা ও ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন।

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্-অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি।"

৬

অসীম কামনা এবং অগাধ আকাঙ্ক্ষা মানবকে নূতন সন্ধানে ব্রতী এবং নূতন জীবনে দীক্ষিত করিতেছে। যে-শক্তি আমাদের প্রেরিত করে, উদ্বুদ্ধ করে, চঞ্চল করে, সঞ্চালিত করে, কামনায় তাহার উৎপত্তি। সৃষ্টির মূলে কামনা। সৃষ্টিরহস্যের কথা বলিতে গিয়া ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে ঋষি বলিতেছেন,

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"
"কামনার হ'ল উদয় অগ্রে যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।"

চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যিনি বসিয়া থাকেন তিনি যোগী, কবি নহেন।

সন্ন্যাসী করেন ত্যাগ। সংসার হইতে বিমুখ হইয়া তিনি কামনা পরিহার করেন। কবি বলেন,

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। ....
.... ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

"মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্য্যচর্চ্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।—এ ত ঠিক কথা। সৌন্দর্য্য ত চাই, আত্মহত্যা ত সাধনা হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য।" (সৌন্দর্য্য বোধ)

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী, কামনার কবি। সে কামনা প্রবল, কিন্তু উদ্দাম নহে, শুদ্ধ সংযত সমাহিত।

"যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছে প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।" (সৌন্দর্য্য বোধ)

কবি নিষ্কাম নয়, নিরাসক্ত নয়। রূপরসগন্ধবর্ণ-স্পর্শশব্দের মধ্যে যে-আনন্দ সেই আনন্দকে অমৃত করিয়া তোলাই কবির কাজ।

নারী কামনার প্রতীক।

"পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

সে পুরুষের কামনার ধন। সে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।

"তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূলতত্ত্বটি তিনটি অপূর্ব্ব কবিতায় অপূর্ব্বভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনটি তিন যুগের—একটি কৈশোরান্তে, একটি যৌবনে, আর একটি পরিণতবয়সে

* প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কার্লাইল transcendent capacity of taking trouble—এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকদের রচনায় সংজ্ঞাটি পূর্ব্বোক্ত রূপ ধারণ করিয়াছে।
—লেখক।

রচিত। প্রথমটি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", দ্বিতীয়টি "উর্ব্বশী", তৃতীয়টি "তপোভঙ্গ"।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" কবিজীবনের নবজাগরণ। ইহাতে তাঁহার প্রাণের অগাধ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

"ওরে অগাধ বাসনা অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই,
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"

"আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণা গান ;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।

তিনি করুণার গান গাহিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ব্যক্তিজীবন বিশ্বজীবনে মিশিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে "সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীত" ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বলিতে পারি কোন কবির অভিলাষ এমন করিয়া জগতে সার্থক হয় নাই।

"সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিক মত দেখাই হয় না।......সাহিত্যে বিশ্বমানবই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।" (বিশ্ব সাহিত্য)

"উর্ব্বশী" দেশকালপাত্রে অবস্থিত নয়। সে পার্থিবও নয়, স্বর্গেরও নয়, সে স্বপ্নের—কি-না জীবনের যে প্রদেশ বাস্তব নয় জীবনের সেই প্রদেশের।

"অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিনী
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী।"

তাহার সহিত কাহারও বস্তুগত জাগতিক সম্পর্ক নাই।

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী ;
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি !"

অনাদি যুগ হইতে মানুষ তাহাকেই চাহিয়া আসিতেছে। তাহার আবির্ভাবে জীবন অপূর্ব্ব আনন্দে এবং তীব্র বেদনায় ভরিয়া যায়।

"আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।"

সকলে তাহাকে কামনা করে, তাহার কাম্য নাই ; সে সকলের প্রিয়, তাহার প্রিয় নাই।

"যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি !"

জীবনের অনন্ত কামনায় তাহার অবস্থিতি। সে সলজ্জ নয়,—অকুণ্ঠিতা, অনবগুণ্ঠিতা।

"মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

তার পর "তপোভঙ্গে"র কথা। জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছিয়া যৌবনের বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা দিনগুলিকে যখন মনে পড়ে তখন মহাকালকে সম্বোধন করিয়া কবি বলেন,

"যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়াছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।"

সেদিন ডম্বরু-শিঙ্গা কাড়িয়া লইয়া, হে সন্ন্যাসী, আমি যে তোমায় মনের মত করিয়া সাজাইয়াছি। তোমার কমণ্ডলু মাধুর্য্যরভসে ভরিয়া দিয়াছি। আমার যৌবন-বসন্তের দিনে তোমাকে ঘিরিয়া কি বসন্তের আবির্ভাব হয় নাই ?

"বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হ'ল অবসান।"

কিন্তু বসন্তের অন্তর্ধানে সব কি বিলুপ্ত হইয়া গেল ?

"নহে নহে, আছে তারা, নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে।"

আবার তপোমগ্ন হইয়াছ।

"জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি'।"

কবি কামনার দেবতা। সে কামনার চরিতার্থতায় বিশ্ব আনন্দে ভরিয়া যায়।

"হেন কালে মধু মাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সে দিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমালা-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" যে আকাঙ্ক্ষা দুরন্ত আবেগে প্রবহমান হইয়াছিল, হৃদয়ের অতল হইতে উত্থিত হইয়া যে কামনা "উর্ব্বশী"র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মূর্ত্ত হইয়াছিল, "তপোভঙ্গে"র আরাধনা, বিদ্রোহ, আনন্দ, আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণপরিসমাপ্তির মধ্যে তাহার সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। কৈশোর, যৌবন ও চিরন্তন কাল—তিনটি কবিতার মধ্য দিয়া বাসনার সোনার সূত্রে মণিমালার মত গাঁথা হইয়া গিয়াছে।

৮

এই জীবন এক পরম অন্বেষণ। কি চাই জানি না, কেন চাই জানি না, কাহাকে চাই তা-ও জানি না। অথচ যাহা চাই তাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরি। কি সে তাহা বলিতে পারি না, তবু জানি তাহাকে খুঁজিতেই হইবে, নহিলে আমাদের চরিতার্থতা নাই।

আমি কহিলাম "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী?"
সে কহিল "আমি যারে চাই তার
নাম না বলিতে পারি।"

যাহা চাই তাহা কি সুখ, তাহা কি ঐশ্বর্য্য, তাহা কি জয়গৌরব, তাহা কি যশোসৌরভ, তাহা কি স্বর্গ?

"এ সবে আমার কোন সুখ নাই" কহে বিরহিনী নারী।

এই অন্বেষণ আমাদের প্রকৃতিগত। তাই রূপকথার রাজপুত্র যাত্রা করে বিজন দ্বীপের ঘুমন্তপুরীর কোন্ অজানা রাজকন্যার অন্বেষণে।—রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হয়, দুঃসাহসী গুপ্তধনের সন্ধানে ফেরে, কৌতূহলী দেশাবিষ্কারে অভিযান করে, জ্ঞানী করে গবেষণা, বিজ্ঞানী করে তত্ত্বান্বেষণ, ধার্ম্মিক খোঁজে মুক্তির পথ, মধ্য যুগের নাইটেরা বাহির হয় পবিত্র পানপাত্রের সন্ধানে—in quest of the Holy Grail, এবং "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর"। কিন্তু

"যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।"

তবু অন্বেষণে ক্ষান্তি নাই, চলার বিরাম নাই। নিরুদ্দেশ আমাদের যাত্রা।

"আর কত দূর নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"

এ কী তৃষ্ণা? এ কিসের আকাঙ্ক্ষা?

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

এ কি সুদূরের পিপাসা?

"আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী।"
"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।"

রবীন্দ্রনাথ এষণার কবি। এই অন্বেষণ কাহার জন্য? কখনও সে মানসী, কখনও অপরিচিতা, কখনও জীবন-দেবতা। শুধু ফাল্গুন-ফুল-উৎসবে নয়, "পৌষ-প্রখর শীত-জর্জ্জর ঝিল্লীমুখর রাতে"ও সে কবিকে আহ্বান করে। তার পর মরণের পরপারে বিবাহ-বাসরে যখন সেই রহস্যময়ী অবগুণ্ঠন তোলে তখন কবি বলিয়া উঠেন, "এখানেও তুমি জীবন-দেবতা!"

"গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
এত দিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্য নব।" (জীবন-দেবতা)

তবু তোমার অন্ত পাওয়া গেল না।

অগ্রদূত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বড়দা টেলিগ্রাম করিয়াছেন, 'পঁচিশে অবশ্য পৌছান চাই।' হেতু বুঝিলাম না। এই ত দিন-সাতেক হইল ফিরিয়াছি, ইহারই মধ্যে কি এমন জরুরি কাজ পড়িল? অসুখ-বিসুখের ধরণের টেলিগ্রাম নয়। বড়দার মেয়ে খুকীর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল—হয়ত তাহাই পাকাপাকি এবং দিন স্থির হইয়াছে।

টেলিগ্রামটি চব্বিশে সকাল নয়টায় পাঠান হইয়াছে, আমি পাইলাম পঁচিশে বেলা দুইটায়; পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ আপিসের পাঁচ মাইল দূরে বাস করার এই সুবিধা! এবার নাকি লাইন খারাপ হইয়াছিল। রেল-স্টেশন বাসা হইতে দেড় মাইল দূরে; সাইকেল, গো-যান অনুপায়ে পদব্রজে যাইতে হয়। ট্রেন দুটা দশ মিনিটে ছাড়ে,—দশ মিনিটের মধ্যে গোছগাছ করিয়া উড়িয়া গিয়াও ট্রেন ধরা সম্ভবপর নয়। অথচ যেমন করিয়া হোক যাইতেই হইবে। না গেলে বড়দা হয়ত অবস্থা বুঝিয়া, মনে কিছু না করিতে পারেন; কিন্তু বৌদিদি জীবনে আর মুখ-দর্শন করিবেন না।

এক উপায় আছে—সোজা গিয়া একেবারে ঘাটের গাড়ী ধরা। মাইল-তিনেক পথ, গাড়ীও পৌনে চারটায় ছাড়ে; তার উপর ব্র্যাঞ্চ লাইনের গাড়ী,—ধীরে, সুস্থে, সময় ও ইচ্ছামত যায় আসে; তাড়াহুড়ার, সময়-অসময়ের কোন বালাই নাই।

বাহির হইবার সময় দেখা গেল সাইকেলটি অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। অগত্যা চাকরের মাথায় সুটকেসটি চাপাইয়া হাঁটিয়াই রওনা হইয়া পড়িলাম।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি, বর্ষা এখনও নামে নাই—প্রচণ্ড গরমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে। বিহারের ধূলি ধূসরিত উত্তপ্ত পথ দিয়া একটি ছেঁড়া ছাতার আচ্ছাদনে আকাশের অগ্নিবৃষ্টি হইতে কোন প্রকারে মাথা বাঁচাইয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চলিয়াছি। মাইল দুই যাইবার পর হঠাৎ চারি দিক অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিল,—যেমন প্রবল বাতাস তেমনই ধূলাবালি উড়িবার ধুম। জামা কাপড় ছাতা সামলাইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বৃষ্টি নামিল। শুধু বৃষ্টি হইলেও বা কথা ছিল—এই ঝড় এবং বৃষ্টিতে পথ চলা বেজায় কষ্টকর হইয়া পড়িল। অথচ সময়ও বেশী নাই। উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া, ভিজিয়া কোন প্রকারে স্টেশনে পৌছিয়াছি, গাড়ীটি ছাড়িয়া দিল। স্টেশনমাষ্টার গার্ড সাহেব সকলেই চেনা—হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ চেঁচামেচির মধ্যে মরি-বাঁচি করিয়া দৌড়াইয়া সামনের গাড়ীতেই চড়িয়া পড়িলাম। চাকরটা বার দুই আছাড় খাইয়া সুটকেসটি কোন গতিকে গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল।

দুই হাতে বুকটা চাপিয়া জোরে জোরে খানিক নিশ্বাস ফেলিয়া একটু ধাতস্থ হইলে, বসিবার জায়গা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি ফিমেল ইণ্টারে চড়িয়া পড়িয়াছি। একটি বৃদ্ধা, একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক ও দুটি তরুণী—একটি বিবাহিতা বলিয়া মনে হইল। আধাবয়সী স্ত্রীলোকটির এবং বিবাহিতা তরুণীটির কোলে দুটি কচি। একটি দু-তিন বৎসরের ফুটফুটে মেয়ে বৃদ্ধার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া এবং একটি বছর-সাতেকের নাদুস-নুদুস হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলে,—একমাত্র মেল-মেম্বার ও এতগুলি অবলার অভিভাবক—অবিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে কি একটা ব্যাপার লইয়া চাপা-লড়াই করিতেছে।

আমার অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিতে উঠিয়া পড়াটা ইহারা ঠিক পছন্দ করেন নাই—সকলের মুখেই সেই রকম ভাব—এবং সকলেই কেমন যেন হক-চকাইয়া গেলেন।

বৃদ্ধাটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, ছেলেটি অবাক্ হইয়া এবং বছর-তিনেকের মেয়েটি কেমন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, বাকী সকলে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন।

অত্যন্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তিনটি বেঞ্চির—দুটি জুড়িয়া উহারা বসিয়া—বাকীটাতে তাঁদেরই মালপত্র রাখা। দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটিতে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, স্থানও নাই অথচ প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবেই যাইতে হইবে। একে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপর,—থাক্‌গে—এই ভাবেই চলিয়া যাইবে ভাবিয়া দ্বারে ঠেস্ দিয়া মুখটা বাহির করিয়া দাঁড়াইলাম।

মিনিট দুই পরে ছেলেটি কাছে আসিয়া বলিল, "এগুলো সরিয়ে দিচ্ছি, বসবে ?"

মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "না থাক, তোমায় সরাতে হবে না, আমি সরিয়ে নিচ্ছি।"

"তা হ'লে নাও না—দাঁড়িয়ে আছ কেন ?" বলিয়া একটু থামিয়া হঠাৎ হাততালি বাজাইয়া নাচিয়া উঠিল—"ও বুঝেছি—লজ্জা করছিল বুঝি ? তুমি কি মেয়েমানুষ ?"

পিছনে চাপা হাসির গুঞ্জরণ শুনিয়া ঘাড় আর ফিরাইতে পারিলাম না।

হাস্যকম্পিত স্বরে "মণ্টু" ডাক শুনিয়া বুঝিলাম, অবিবাহিতা মেয়েটি ডাকিতেছে। হাততালি এবং নাচ থামাইয়া মণ্টু বলিল, "কি কি ?"

অপেক্ষাকৃত কঠিন স্বরে মেয়েটি বলিল, "মা ডাকছে—এদিকে এস।"

মণ্টুর মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার অবস্থা বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার হাতটি ধরিয়া, ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ করিবার চেষ্টায় বলিলাম, "এস মণ্টু, জিনিসপত্র সরিয়ে একটু জায়গা ক'রে দু-জনে ব'সে পড়া যাক্।

সোৎসাহে মণ্টু আমার সাহায্যে লাগিয়া গেল। করিতে অবশ্য কিছুই হইল না—শুধু 'এটা সরিয়ে দি—এটা ওখানে রাখি' করিয়া বার-কয়েক লাফালাফি করিল।

চাপা গলায় বলিলেও মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—"দেখলে মা, ছেলের চালাকি,—ডাকা হ'ল শুনতেই পেলেন না—যেন কত কাজই করছেন। ভারি অসভ্য হয়ে গেছে—দেখ না আবার কি ব'লে বসে।"

বোধ করি মা-ই হইবেন, বলিলেন, "কানটা ধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে আন্‌ত গৌরী, সব ভীরকুটি বের ক'রে দিচ্ছি বাঁদরের।"

বাঁদরটি বোধ হয় এ সব ষড়যন্ত্র শুনিতে পায় নাই—গৌরী আসিয়া কানটি ধরিতেই "ভ্যাঁ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"বা রে আমি কি করেছি—আমি ত শুধু—দেখ না—অ্যাঁ অ্যাঁ—"

তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিতেই কানটি হস্তমুক্ত হইল। বলিলাম, "ছেড়ে দিন—ছেলেমানুষের কথা কি ধরতে আছে ?—এস মণ্টু, কাঁদতে হয় না, তুমি না পুরুষমানুষ ?"

হাসিয়া সকলেই মুখ ফিরাইলেন। মণ্টুর কান্না তখনও থামে নাই, তাহাকে কোলে লইয়া বসিলাম।

বৃদ্ধা খ্যাঁক-খ্যাঁক করিয়া উঠিলেন, "ও ছুঁড়ির ত ওকে পেলেই হয়, কান টানতে গেলি কেন ? কি এমন পাপ করেছে শুনি ?—আদিখ্যাতা—" কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া—"মাণিক—এস ত দাদা—আমার কাছে এস, ধন আমার !"

মাণিকের গালে মাথায় হাত বুলাইয়া ততক্ষণে ঠাণ্ডা করিয়াছি।

মণ্টুর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়া গেল।

"তুমি ত আমার চেয়ে বড়, ছোড়দির চেয়েও, তা হ'লে তোমায় দাদা বলা উচিত।"

"বেশ ত ; কিন্তু তুমি যে আমায় মেয়েমানুষ বলছিলে ?"

"তা বলব না বা—তুমি মেয়েদের গাড়ীতে চড়লে কেন ? দাদু ত চড়ে নি ?" বোধ করি নিজের কথা মনে পড়িতেই একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমিও দাদুর সঙ্গে অন্য গাড়ীতে যাচ্ছিলাম—ঐ যে উনি—যেতে দিলেন না !" বলিয়া ছোড়দিকে দেখাইল।

আমাদের আলাপ বেশ নিম্নস্বরেই চলিতেছিল। হঠাৎ বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে দু-জনেই সচকিত হইয়া উঠিলাম, "ভিজে কোলে ব'সে ব'সে কত বকবকানি মণ্টি, তোমারও বাপু কেমন ধারা—ভিজে সপ্‌সপে জামা-কাপড় এঁটে রইলে ; ছেলেটাকেও—শেষে ঠাণ্ডা-মাণ্ডা লাগুক—একেই ত নানান্‌খানা নিত্যি লেগেই আছে।"

লজ্জিত হইয়া তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া বলিলাম, "তুমি ওদিকে যাও মণ্টু, এখানে সব ভিজে, তোমার কষ্ট হবে।"

মণ্টু করুণ নেত্রে আমার দিকে একবার চাহিয়া রাগত ভাবে গট্‌গট্ করিয়া মার কাছে গিয়া বলিল, "কোথায় ভিজেছে আমার জামা—দেখ ত।"

বৃদ্ধা ততক্ষণে তার প্যাণ্ট ও শার্টে হাত বুলাইয়া ভিজিয়াছে কি না দেখিতে গেলেন। মণ্টু ঝট্‌কা মারিয়া তাঁর হাত সরাইয়া বলিল, "সব ভিজে গেছে না ? কচি খোকা যেন আমি।"

ছোড়দি বলিল, "কচি খোকা নয় ত কোলে চড়তে গিয়েছিলি কেন,—পাশে ত অত জায়গা ছিল বসতে পারিস্ নি ?"

"বেশ করেছি, খুব করেছি, তোর তাতে কি ?—তুই ব'স গে যা না—"

"দেখছ মা—আমি মারব কিন্তু" বলিয়া রাগ এবং লজ্জায় আরক্ত বদন লুকাইবার জন্য জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইল।

মা মণ্টুকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কি অসভ্যতা হচ্ছে মণ্টু, বাইরের লোক দেখলে তোমার কি বাড়াবাড়ির আর শেষ থাকে না? অমন করলে আমি ভারি রাগ করব কিন্তু।"

মণ্টু আদর কাড়াইয়া বলিল, "আমি ত কিছু করি নি মা, ব'সে ব'সে গল্প করছিলাম শুধু।"

মা, "অত বড় ছেলে, ও রকম ক'রে কোলে চড়লে উনি কি মনে করবেন বল ত? যাও।"

বিবাহিতা তরুণীটি বলিলেন, "তোমার চেয়ে কত বড়, ওঁকে 'তুমি' 'তুমি' বললে ভাল দেখায়? ছিঃ।"

মণ্টু, "আচ্ছা এবার আপনি বলব বলিয়া তাঁহার কাছে আর একটু ঘেঁষিয়া বলিল, আমায় একটা পান দেবে দিদি?"

ছোড়দি মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "বকা ছেলের মত পান খেয়ে ঠোঁট লাল না করলে চলছে না বুঝি?"

মণ্টু ফাটিয়া পড়িবার আগেই দিদি বলিলেন, "তুই বড্ড ওর পেছনে লাগিস গৌরী,—রাগাস ব'লেই না যা-তা বলে তোকে।" মণ্টুকে "আচ্ছা পান দিচ্ছি—ওঁকে জিগেস করো দিকিনি—পান খাবেন কিনা।"

"পান খাবেন?" লাফাইয়া আসিয়া মণ্টু বলিল।

"তা হ'লে ত বাঁচি—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে" হাসিয়া বলিলাম, "এক গ্লাস জল যদি খাওয়াতে পার আরও ভাল হয়।"

"দিচ্ছি" বলিয়া মণ্টু সোরাই হইতে জল গড়াইতে গিয়া সোরাইটা প্রায় উল্টাইয়া ফেলিয়াছিল, ছোড়দি কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে—অকম্মার ধাড়ি।"

বৃদ্ধা খিঁচাইয়া উঠিলেন, "তুই বা ধিঙ্গী ব'সে ব'সে দেখছিস কি? ছেলেমানুষ, ও কি পারে নাকি? গতর একটু নাড়তে পারিস নে; কেবল টিপ্পনি কাটছেন। জল গড়িয়ে নিজে দিলে ক্ষয়ে যাবি নাকি?"

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভিজে গায়ে এক এক ঘণ্টা ব'সে রইলে—তার ওপর ঠাণ্ডা জল খেতে হবে, ধন্যি ছেলে বাপু। কেন কাপড়-চোপড়গুলো বদলে নিতে পার না? গপ্পই হচ্ছে—মণ্টি আর তুমি সমান নাকি?"

লজ্জিত ভাবে বলিলাম, "ধুলোবালি ঘাম ও বৃষ্টির জলে অবস্থা যা হয়েছে ভাল ক'রে স্নান না ক'রে বদলানো বৃথা, একেবারে গঙ্গাস্নান করেই বদলে নোব।"

ছোড়দির হাতের জল এবং মণ্টুর আনা পান খাইলাম।

পাশে বসিয়া মণ্টু বলিল, "আপনার নাম কি?"

—কেন?

—বা রে নইলে কি ব'লে দাদা বলব?

—তোমার কটি দাদা আছেন?

—কেন বড়দা আছেন—মেজদা আছে—আর নেই।"

—আমি তাহলে ছোড়দা হলাম—কেমন?

একটু চিন্তা করিয়া মণ্টু বলিল, তুমি বামুন ত?

চিন্তার মাঝে আবার "তুমি"-তে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, তোমরা?

—আমরা বামুন।

—বেশ, আমিও যদি তাই হই?

আনন্দে হাততালি দিয়া মণ্টু বলিল, বা তাহলে ত ভালই হয়। আচ্ছা তুমি কোথায় যাবে?

—তোমরা?

—ভাগলপুর।

—আমিও যদি যাই?

"বা রে তাহলে ত খুব মজা হয়—সত্যি যাবে? মাকে বলি"—বলিয়া ছুটিয়া মাকে গিয়া বলিল, মা ছোড়দাও ভাগলপুর যাবে—আমাদের সঙ্গে।

তাহার আনন্দ দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ট্রেন ঘাটে থামিতেই ছাতা আর সুটকেসটি লইয়া চট করিয়া নামিয়া পড়িলাম। জানালায় মুখ বাড়াইয়া মণ্টু বলিল, "বা রে চলে যাচ্ছ যে একলা।—আমাদের সঙ্গে যাবে না?"

বলিলাম, "স্টীমার ছাড়তে এখনও অনেক দেরি আছে—আমি ততক্ষণ নেয়ে ধুয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে আসি।"

ইত্যবসরে পাওয়ারফুল চশমা চোখে, মোটা বেতের ছড়ি হাতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সোরগোল করিয়া কুলি ডাকিয়া হন্তদন্ত করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাকে প্রায় ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "হাটো হাটো এ জনানী গাড়ী হ্যায়"—মণ্টুকে লক্ষ্য করিয়া—"মণ্টে নেমে পড় চটপট—তোমরা সব নেমে পড়—দেরি নেই,—গৌরী, বুলিকে তুই কোলে নে—এই কুলি—কেয়া দেখ্‌তা—মাল উতারো জলদি—" বলিয়া মণ্টুর দিকে হাত বাড়াইলেন।

গোলমালের মধ্যে আমি সরিয়া পড়িতেছিলাম—মণ্টুর চীৎকারে ফিরিলাম—"ছোড়দা দাঁড়াও,—দাদু, আমি ছোড়দার সঙ্গে যাব।"

"কে ও?" বৃদ্ধ মণ্টুর হাতটি টানিয়া ধরিয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"ন্যা ন্যা ছোড়দাফোড়দার সঙ্গে যেতে হবে না—" বলিয়া চশমার ভিতর ও উপর দিয়া আমার

আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার-কয়েক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এ গাড়ীমে থা ? স্যুটকেস তুমরা হ্যায় ?"

তাঁহার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি এবং হিন্দী বলিবার ধরণ দেখিয়া, কোন প্রকারে হাস্য সম্বরণ করিয়া সবিনয়ে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যুটকেসটি আমারই। তাড়াতাড়িতে এ গাড়ীতে চ'ড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, গার্ড সাহেব আমায় চেনেন।"

"ও আচ্ছা যাও যাও" বলিয়া জিনিসপত্র ছেলেমেয়ে লইয়া পূর্ব্ববৎ চেঁচামেচিতে মন দিলেন।

পাশের গাড়ীতে আমার জিনিস দুটি একজনের জিম্মায় রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গেলাম।

স্নানান্তে প্রস্তুত হইয়া গাড়ী হইতে নামিবার মুখে দেখি, বাক্সের উপর একটি ছাতা রাখা। গাড়ীতে বিশেষ কেহ নাই সকলেই প্রায় নামিয়া গিয়াছে, স্টেশনেও প্রায় লোকজন নাই বলিলেই চলে। স্টেশনমাস্টার টেবিলের উপর একটি বড় খাতা খুলিয়া, কানে কলম গুঁজিয়া একটি টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। দেখিলে মনে হয় নিবিষ্ট চিত্তে খাতাটি পরীক্ষা করিতেছেন। বারান্দায় রাখা একটি পিঠ-ভাঙ্গা বেঞ্চের সামনে গুটি দুই বিনা-টিকিটের যাত্রীকে আগলাইয়া, বেঞ্চের পায়ায় ঠেস দিয়া কুলি বা পয়েন্টস্‌ম্যান গোছের একটি লোক ঢুলিতেছে।

প্রথমে মনে হইল ছাতাটি রাখিয়া কেহ হয়ত কাছে-পিঠে কোথাও গিয়া থাকিবেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া সে-রকম কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিব এমন কেহ নজরে পড়িল না। ছাতাটি পরীক্ষা করিয়া দেখি—একেবারে নূতন, লেডিস্ ধরণের হইলেও ওরকম গোল বাঁটের ছাতা আজকাল মেয়েপুরুষ সকলের হাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের শতচ্ছিদ্র ছাতাটি উহার নিকট বড়ই বেমানান বোধ হইল। একবার মনে হইল এটা রাখিয়া ওটা লইয়া নামিয়া পড়িলে কেমন হয়,—যেন অন্যমনস্ক ভাবে অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিনে দুপুরে তাই বা হয় কি করিয়া! ভাবিলাম স্টেশনে জিম্মা করিয়া দিই, আবার মনে হইল আমার কি দায় পড়িয়াছে। পা বাড়াইয়াই মনে হইল, যদি কেহ ভুলিয়া স্টীমারে চলিয়া গিয়া থাকে,—সেখানে লইয়া গেলে, পাইয়া সে খুশী হইবে। অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে দু-হাতে দুটি ছাতা লইয়া নামিয়া পড়িলাম। খানিকটা পথ হাঁটিয়া স্টীমার চড়িতে হয়,—দু-ধারে পান-বিড়ি মিঠাই পুরীর দোকান, কোন কোন দোকানে সামান্য ভিড় রহিয়াছে, কেহ কেহ জলযোগ করিতেছে, কেহ বা বিশ্রাম করিতেছে। রৌদ্র বেশ কড়া রহিয়াছে, নিজের ছাতাটি খুলিয়া মাথায় দিয়া অপরটি এবং স্যুটকেসটি হাতে ঝুলাইয়া চলিলাম। কয়েক পা চলিয়াই মনে হইল নূতন ছাতা থাকিতে পুরানো ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিতেছি—দেখিয়া লোকে কি ভাবিবে, অথচ নূতনটি খুলিতে সঙ্কোচ ও লজ্জা হইল। খানিক দূর অগ্রসর হইতেই মনে হইল, দু-ধারের লোক যেন আমার দিকে অবাক্ বিস্ময়ে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—লোকটা দু-দুটা ছাতা লইয়া যায় কোথায়! একটা যদি কাগজেও মোড়া থাকিত, লোকে ভাবিতে পারিত নূতন কিনিয়াছি। ভারি অস্বস্তি বোধ করিলাম। কিছু একটা ভুলিয়াছি—এই ভাবে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ফিরিয়া, মাস্টার মশাইকে জাগাইয়া বলিলাম, ও মশাই, একটি ছাতা গাড়ীতে পড়ে ছিল,—কেউ ভুলেছে হয়ত, এলে দিয়ে দেবেন।"

লোকটি বাঙালী, বিশ বছরের উপর এইখানে আছেন—বয়স পঞ্চাশের উপর। হাসিয়া বলিলেন, "ঐ ছেঁড়া ছাতাটি রেখে আর কি হবে বলুন, কেউ ফেলে দিয়েছে হয়ত—আপনি আবার কুড়িয়ে নিয়ে এলেন।"

লজ্জায় যেন মরিয়া গেলাম। বলিলাম, "না মশাই ছেঁড়াটি আমার—এই বয়সে সতেরটি ছাতা ট্রেনে হারিয়েছি, সেই জন্যে নেহাৎ দায়ে না পড়লে ছাতা আর নিই না, সময়-অসময়ের জন্যে এই ছেঁড়াটি নিয়েই মাথা বাঁচাতে হয়। "এইটি ছিল গাড়ীতে" বলিয়া অন্যটি দেখাইলাম।

ভদ্রলোকও লজ্জায় পড়িলেন, সামলাইয়া বলিলেন, "তা আর কি হয়েছে,—এত বার হারিয়েছেন, এবার না হয় একটা লাভই হ'ল। দিন, বরং ছেঁড়াটাই না-হয় ডিপজিট থাক্।"

ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ জানাশুনা থাকিলেও কাজটা কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিল। আবার বলিতে লজ্জা নাই,—একটু লোভও হইল।

একটু ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম, "কে জানে, বুদ্ধিমান চাকর হয়ত আমারটাই গাড়ীতে রেখে দিয়ে গেছে। তাই যদি করবি ত এটা নিয়ে যা,—তা নয়;—এখন দু-দুটো ছাতা নিয়ে আমি কি করি বলুন দেখি? যাক্—আপাততঃ এখন ওটা এখানেই থাক—সত্যি সত্যি আমার কি না, না-জেনে নেওয়াটা ঠিক হয় না,—শেষে অন্য কারুর হ'লে, চোরদায়ে ধরা না পড়ি। ওটা ডিপজিটই রাখুন,— ফিরে গিয়ে জেনে নিয়ে আনিয়ে নোব বরং,—কি বলেন? এখন হারাবার জন্যে এইটাই সঙ্গে থাক।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, কেন অতশত বাখড়া

করবেন,—ডিপজিট করলেই আবার চার গণ্ডা পয়সা। গচ্ছা লাগবে মিছিমিছি! আমি বলছি—ও আপনারই, চাকরটাই ভুলে গেছে—নইলে এদেশের লোক ছাতাটাতা বিশেষ হারায় না—হারাতে দেখি, লোটা, ছেঁড়া গামছা কিম্বা নাগরা জুতো।

আমিও হাসিয়া বলিলাম, যাক্ গে পয়সা, কি আর করা যাবে। হারালে, এই যুদ্ধের বাজারে দু-টাকা আড়াই টাকা জলে যাবে মশাই।—আপনি রেখেই দিন।

"তা হ'লে চলি আমি,—নমস্কার, এখনও টিকিট কেনার পর্ব্ব বাকী আছে।" বলিয়া কোন কথা উঠিবার আগেই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মিনিট পাঁচের মধ্যেই স্টীমার ছাড়িল।

আমাকে দেখিয়া মণ্টু ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বা বা! এতক্ষণে আসা হ'ল, স্টীমার ছেড়ে যেত যদি।"

আমি হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সকলে যেদিকে বসিয়াছিলেন, সেদিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম দুটি বেঞ্চ জুড়িয়া সকলে বসিয়াছেন—মণ্টুর ছোড়দি শুধু বুলিকে কোলে লইয়া রেলিং ধরিয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া।

মণ্টু চেঁচাইল, "দাদু ছোড়দাকে ধরে এনেছি দেখ।"

দাদু একবার ভ্রূকুটিসমেত আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন মাত্র। মুখের ভাব দেখিয়া খুবই বিরক্তবোধ হইল।

সুটকেসটি সেখানে রাখিয়া আমি মণ্টুকে লইয়া অন্য দিকে যাইবার উপক্রম করিতেই বৃদ্ধ রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "যেদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করিস নে মণ্টে, চুপ ক'রে এদিকে এসে ব'স্—শেষে একটা বিভ্রাট বাধাবি।"

তীক্ষ্ণস্বরে বৃদ্ধা বলিলেন, "তুমি আর ব'ল না—বিভ্রাট বাধাতে তোমার জুড়ি আছে? যখনই কোথাও যাবে এত তাড়াহুড়ো চেঁচামেচি করবে যে, এটা ভাঙবে ওটা হারাবে,—একটা-না-একটা কিছু ঘটবেই। আমি তখনই বলেছিলাম নরু সঙ্গে থাক্—তা না—হ'ল এখন?"

মণ্টু ততক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে—

"ভাগলপুরে কেন যাবে?"

"বেড়াতে" একটু থামিয়া বলিলাম, "তোমরাও বুঝি বেড়াতে যাচ্ছ?"

"বেড়াতে কেন—আমরা এখন সেখানে থাকব। ছোড়দির বিয়ে হবে কি না,—আমরা সবাই আগে যাচ্ছি—দাদা, মেজদা বিয়ের সময় আসবে—এখন ছুটি নেই। বাবার জ্বর হয়েছে কি না—তাই দাদুর সঙ্গে যাচ্ছি—জ্বর সারলেই বাবাও আসবেন।"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"ডাক্তার।"

"দাদারা কোথায় থাকেন?"

"বড়দা কলকাতায় চাকরি করেন, মেজদা পাটনায় থাকে—মাষ্টার।"

"ও তা তোমার ছোড়দির বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করবে না?"

"নিশ্চয়ই করব—আমি এখুনি মাকে বলছি দাঁড়াও" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই তাহাকে আটকাইয়া বলিলাম, "থাক্ থাক্ এখন থাক্—তোমার দাদু রাগ করবেন।"

"উঁহু" ভ্রূ-কুঁচকাইয়া মণ্টু বলিল, "দাদু না,—ছোড়দি মারবে,—বিয়ের কথা ব'লে ক্ষ্যাপাই কি না"—হাসিয়া "আচ্ছা আমি মাকে চুপি চুপি বলব।"

এদিকে ওদিকে একটু ঘুরিয়া বলিলাম, "চল মণ্টু ওপরে—চা খাওয়া যাক।"

"মাকে ব'লে আসি" বলিয়া ছুটিল।

চা খাইতে খাইতে আরও নানা গল্পগাছা হইল। সারা দিনের ছুটাছুটি ও ক্লান্তির পর স্নান করিয়া নিদ্রায় আমার চোখ জুড়িয়া আসিতেছিল, মণ্টু আজে বাজে কত কি বকিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আমায় ধাক্কা দিয়া বলিল, "ঘুমচ্ছ ত?"

হাই তুলিয়া বলিলাম, "দুটো পান খাওয়াতে পার ভাই?"

চিন্তিত হইয়া মণ্টু বলিল, "পারি ত, কিন্তু দাদু যে আসতে দিচ্ছে না, মাকে ব'লে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি,—তুমিই নীচে চল না।"

"আমার আর নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না। থাক গে, তুমি ব'স।" নীচে হইতে ডাক আসিল, "মণ্টে, ও মণ্টে, কোথায় গেলি রে—"

"ঐ দাদু খুঁজছে আবার। দিদিদেরও সঙ্গে নিয়ে আসি—তা হ'লে দাদু বলবে না কিছু—না? অমনি পানও আনব।" মণ্টু নামিয়া গেলে আমিও একটি আরাম-চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া লম্বা হইলাম।

স্টীমারের গম্ভীর 'ভোঁ'-এ চট্‌কাটা ভাঙিয়া যাইতেই ধড়মড়িয়া উঠিয়া দেখি, চেয়ারের হাতলে দু-খিলি পান এবং পানের বোঁটায় করিয়া একটু চূণ রাখা। সে দুটির সদ্গতি করিয়া নীচে নামিয়া দেখি, স্টীমার প্রায় খালি,

মণ্টুদের কেহ নাই,—বেঞ্চের উপর শুধু আমার স্যুটকেস ও ছাতাটি রাখা।

ধীরে সুস্থে নামিলাম—মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজিয়াছে, গাড়ী রাত্রি আটটায়। স্টেশনে এতক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা বেজায় কষ্টকর। মণ্টুদের দেখিতে পাইলাম না। ওয়েটিং-রুমে আস্তানা লইয়াছেন নিশ্চয়! আবার গিয়া উহাদের সঙ্গে ভিড়িলে বড় গায়ে-পড়া ভাব দেখাইবে। স্টেশনের বাহিরে চা ও সরবতের দোকানে জিনিসগুলি রাখিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিতেছি;—ভাগলপুরগামী একটি ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়া তাহাতে একটি সীট জোগাড় করিয়া চড়িয়া পড়িলাম।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছাইলাম। বাড়ী ঢুকিতেই খুকীর সঙ্গে প্রথমে দেখা। মোটরের শব্দে বোধ করি কে তাহা দেখিতে আসিতেছিল,—আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া ছাতা ও স্যুটকেসটি হাতে লইয়া বলিল, "কার গাড়ী কাকা?"

"ও ট্যাক্সি" বলিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম—খবর সব ভাল ত রে? বড়দা কোথায়?

—কি জানি, বাবা এখনি কোথায় বেরোলেন, মা জানে বোধ হয়।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রে খুকী, হঠাৎ টেলিগ্রাম গেল কেন?

খুকী কিছু বলিবার আগেই বৌদি ছুটিয়া আসিলেন, বোধ হয় রান্নাঘর হইতে আমার গলার স্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন, "ঠাকুরপো নাকি? এ যে মেঘ না চাইতে জল,—এমন অসময়ে যে?" খুকী অন্যত্র সরিয়া গেল!

অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

—খবর ভাল ত? অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ব'স।

কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমাদের ব্যাপার কি বল ত? কোথাও কিছু নেই হুট্ ক'রে টেলিগ্রাম ক'রে সুস্থ মানুষকে ব্যস্ত ক'রে তোলা? কি যে ভাল বোঝ জানি নে,—হয়েছে কি শুনি? বেলা দুটো থেকে সুরু ক'রে আর এখন পর্য্যন্ত, ঠিক পাগলের মত ছুটোছুটি, লাফালাফি করিয়ে আধমরা ত করেছ। অযথা এ কষ্ট দিয়ে কি লাভ হ'ল?

বৌদি ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "বড্ড কষ্ট হয়েছে না? আচ্ছা ব'স ব'স,—খুকী, একটা পাখা দিয়ে যা না রে—আর চট্ ক'রে তোর কাকাকে একটু চা"—আমায় বলিলেন, "আগে একটু সরবত ক'রে দিক, কেমন?"

আমি কোন কথা বলিলাম না। পাখা লইয়া আমায় বাতাস করিতে করিতে বৌদি বলিলেন, "জামাটামা খুলে ভাল হয়ে ব'স না ভাই—অত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই।" একটু থামিয়া ঠোঁটের কোণে হাসি টিপিয়া বলিলেন, "কিন্তু টেলিগ্রামের কথা, সত্যি বলছি, আমি ত কই কিছু জানি নে; বিকেলের দিকে একবার বললেন বটে প্রভাস আজ আসবে বোধ হয়—আমি মনে করলাম এমনিই বলছেন।

হাসিয়া পাখাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলাম—ঢের হয়েছে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে আর দিতে হবে না। তুমি আবার জান না, বড়দা দিনে ক'বার নিশ্বাস ফেলেন তা শুদ্ধ জানতে তোমার বাকী থাকে?

"জানি ত বেশ", হাতটা আমার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "পাখাটা কেড়ে নিলে কেন?"

—পরের হাতে হাওয়া খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।

"আচ্ছা গো আচ্ছা—এবার নিজের হাতেই হাওয়া খেও মিষ্টি লাগবে" উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—একটু ব'স, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একবার দেখে আসি। শুধু হাওয়া খেলেই আর চলবে না।

এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলাম। বলিলাম—আচ্ছা সে দেখা যাবে। বড়দা কোথায়?

হাসিয়া বৌদি বলিলেন, "তা আমি কি জানি বাপু, আমি কি তোমার দাদার প্রাইভেট সেক্রেটারী, যে কোথায় যাচ্ছেন কি করছেন, সব হিসেব রাখতে হবে! বেরোবার সময় জিগেস করতে গেলাম, ধমক দিয়ে বললেন, যেখানে খুশী যাই না কেন তোমার কি? ড্রাইভারকে বলতে শুনলাম, বাজারের দিকে যাব—তেল আছে ত; স্টেশনেও একবার যেতে হবে" বলিয়া আঁচলে মুখ চাপিলেন।

জলযোগাদি সারিয়া ওদিকের বারান্দায় একটু গড়াইয়া ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বড়দা ফিরিলেন। তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, শুনছ—কই প্রভাস ত এল না? কেলেঙ্কারী হ'ল দেখছি, টেলিগ্রাম কি পেল না নাকি? মহা বিভ্রাট বাধাল। আমি জানি আজকালকার ছেলেছোকরারা ঐ রকমই দায়িত্বজ্ঞানহীন—

বৌদি বোধ করি মজা দেখিতেছিলেন। বড়দা চেঁচাইয়া চলিলেন, "এখন কি করা যায়—ভদ্রলোকদের কি বলা যায় বল দেখি? অপদস্থ হওয়া? তোমার যেমন কাণ্ড, আমি তখনি বারণ করেছিলাম, জোর-জার ক'রে কাজ নেই,—যত সব মেয়েলী কাণ্ড,—সামলাও এখন?

এর মধ্যে আর দিনও নেই যে কোন-রকমে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায়—ছি-ছি—"

আমি আসিয়া প্রণাম করিতেই—অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এই ত—কখন এলি? কই ট্রেনে ত খুঁজে পেলাম না?"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, "ওর কি আর তর সইছিল? ট্যাক্সি ক'রে আগেভাগে ছুটে এসেছে।"

বড়দা, "বেশ বেশ, তা তুমি আমায় ত কিছু বললে না?"

"তুমি আর আমায় বলতে দিলে কই—বাড়ী ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই ত চীৎকার ঝঙ্কার সুরু ক'রে দিলে।"

আহারের সময় বড়দা শুধু একবার বলিলেন, "কালকের ব্যাপার চুকতে বেলা হয়ে যাবে, ওকে দুধ মিষ্টি-টিষ্টি একটু বেশী ক'রে দিও।"

আহারাদির পর শুইবার সময় বৌদি আসিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও ঠাকুরপো, আমি শেষরাত্রে তোমায় চা খাইয়ে দোব, আশীর্ব্বাদের সময় বেলা সাড়ে দশটা;—তোমার কষ্ট হবে তা না হ'লে।"

কোন কথা না বলিয়া শুধু তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,"অমন ক'রে তাকিয়ে রইলে যে—রাগ হয়েছে বুঝি?"

শান্ত কণ্ঠে বলিলাম, "সে অবসরই বা দিলে কই? অতর্কিতে এ ভাবে গ্রেপ্তার হবার কল্পনাও ত করি নি কখনও -এখন অহিংসা ভিন্ন আর উপায় কি বল? কিন্তু এ সবের কোনই প্রয়োজন ত ছিল না বৌদি, সময়ে জানালেই পারতে।"

আঙ্গুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে একটু যেন লজ্জিত ভাবে বৌদি বলিলেন, "উনি সেই কথাই বলেছিলেন—আজকালকার ছেলে নিজে দেখে শুনে করুক বাপু, শেষে সারা জীবনের কলঙ্কের ভাগী না হ'তে হয়;—আমিই জেদ ধরে এত কাণ্ড করলাম, মেয়েটি হাতছাড়া হবার ভয়ে। তোমার ধনুক-ভাঙা পণ ত আমি জানি—আমারই ভয় হ'ল, পাছে তুমি বেঁকে ব'স।" একটু থামিয়া বলিলেন, "যা কিছু সব আমিই করেছি, দোষ বল, ঘাট বল সবই আমার,—তোমার দুটি হাতে ধরি ভাই--" কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

ব্যস্তভাবে বলিলাম, "পাগলের মত এ সব তুমি কি বলছ বৌদি—"তোমাদের ওপর আমি কি কখনও কোন কথা কয়েছি—না তোমাদের অমতে কোন কাজ করেছি!"

বৌদির মুখখানি হাসি-খুশীতে ভরিয়া উঠিল, আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাঁচলুম, বাবাঃ যা ভয় হয়েছিল আমার—" বলিয়া আঁচলে বাঁধা এক টুকরা কাগজ আমার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "এই নাও, হস্তাক্ষর।" দেখিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বলিলাম, "এ যে চোখে না দেখে, বাঁশী সোনার মত হ'ল; ওতে লাভ?"

"লাভ নেই ত স্বচক্ষে দেখবে চল—তাতেও প্রস্তুত আছি।"

"তার কোনই প্রয়োজন নেই—সবটুকুই তোমার পছন্দসই যখন হয়েছে, তখন ওটুকুর জন্যে—কি বা যায় আসে বল?"

"ঠিক ত? আচ্ছা বেশ, এতটা ভরসাই যখন আমার ওপর রাখলে, আমিও বড় গলা ক'রে বলছি—কোন দিকেই ঠকবে না তুমি,—দেখে নিও।"

হাসিয়া বলিলাম, "সমস্ত রাত ধরে ঐ সবই শোনাবে, না ঘুমতে দেবে?"

"ঘুমোও না ভাই—বাঁশী শুনতে শুনতে" বলিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে সমস্ত ঘরখানি মুখরিত করিয়া চলিয়া গেলেন। কাগজের টুকরাটি পড়িয়া দেখি—"শ্রীমতী প্রমীলা দেবী" লেখা, হস্তাক্ষর চলনসই।

পরদিন বিকালের দিকে যাইবার আয়োজন করিতেছি, বৌদি আসিয়া বলিলেন, "মোটে ত সাতটা দিন মাঝে, একটা দিন থেকে গেলে চলত না ঠাকুরপো?"

"অপ্রয়োজনে থেকে লাভ?"

বাহির হইবার মুখে বড়দা বলিলেন, "আসবি কবে?"

"শনিবারে।"

ব্যস্তভাবে বৌদি বলিলেন, "বা রে একেবারে অমন দিন মাথায় ক'রে এলে চলবে কেন—দু-দিন আগে এসো—কাজকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ব্যাপার—দিন হাতে থাকা ভাল।"

বড়দা—"তা শুক্রবার এলেই চলবে—তাই আসিস,—কটা দিন একটু সাবধানে থাকিস।"

ঘাটের স্টেশনমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মশাই, ছাতাটার কোন গতি হ'ল?"

চশমাটা নাকের ডগায় টানিয়া আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "আর গতি—একেবারে ব্রাহ্মণেভ্যঃ হয়ে আছে, এর চেয়ে আর কি সদ্গতি হ'তে পারে বলুন? নিন প্রণামী ও দন্তখৎটা সেরে নিন্।"

"শনিবারের বারবেলা, দিনটা সুবিধের নয় মাস্টার-মশাই,—আর বাসায় গিয়ে একবার দেখতেও হবে

জিনিসটা সত্যি আমার কি না—কাল বরং চাকরটাকে পাঠিয়ে দোব।"

চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া ভ্রূদ্বয় এবং কপাল কুঁচকাইয়া বলিলেন, "অবাক্ করলেন স্যার—এতে আবার দিনক্ষণ দেখা—এত ইতস্ততঃ করা—"

মুখের কথা কাড়িয়া বলিলাম, "একটা দিন বইত নয়।—সন্দেহটা দূর ক'রে নেওয়া ভাল নয় কি?"

ছোট্ট একটি নিশ্বাস চাপিয়া তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

পরদিন ছাতাটি আনাইয়া লইলাম।

একটি প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিতে গিয়া কলমটি খুঁজিয়া পাইলাম না। যাইবার সময় সঙ্গে লইয়াছিলাম বলিয়াই মনে পড়িতেছে। অথচ পকেটে স্যুটকেসে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। টেবিল, আলমারি, র্যাক প্রভৃতি সম্ভাবিত স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। মনে হইল, হয় ওখানে ফেলিয়া আসিয়াছি, না-হয় পথেই হারাইয়াছি। পথে হারানো বিচিত্র নয়। বরং খুবই সম্ভব, কেন না কোথাও যাইতে গেলেই জুতা, ছাতা, চশমার খাপ, মনিব্যাগ বা কলম, একটা-না-একটা কিছু আমার হারাইবেই। সেবার প্রায় আশী-টাকাসমেত মনিব্যাগটি হারানোয় বৌদি বলিয়াছিলেন, "এর চেয়ে যে নিজেকে হারানো সহজ ছিল ঠাকুরপো।"

সখের কলমটি হারাইয়া মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

দিন-চারেক পরে একটি রেজিস্ট্রি করা পার্শেল পাইলাম; প্রেরক করুণা চ্যাটার্জি, চার্চ রোড, ভাগলপুর। খুলিয়া দেখি ভিতরে আমার কলম ও একখানি চিঠি।

কোন সম্বোধন নাই,—মাত্র এই লেখা:—

আপনি যখন ডেক-চেয়ারে ঘুমচ্ছিলেন, পান দিয়ে আসবার সময় মণ্টু বোধ হয় খেলার ছলেই আপনার পেন্‌টি পকেট থেকে খুলে এনেছিল। কাউকে কিছু বলে নি, ওয়েটিং-রুমে তার পকেটে ওটা যখন আবিষ্কার করা গেল, তখন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনাকে কোথাও পাওয়া গেল না। মারও বকুনি খেয়ে মণ্টুর দুর্গতির এবং আমাদের লজ্জার সীমা রইল না। ভাগ্যে আপনার স্যুটকেসের কভারে আপনার নাম ঠিকানা লেখা ছিল, তাই ফেরত পাঠিয়ে আমরা দায় থেকে উদ্ধার পেলাম। নইলে চিরদিন ওটা হয়ত কলঙ্কের বোঝা হয়ে আমাদের মাথায় চেপে থাকত। মণ্টু ছেলেমানুষ, তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, এটা হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন, নইলে এ লজ্জা থেকে আমরা কোনদিন নিষ্কৃতি পাব না।

কলমটি হারিয়ে আপনার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল আমি খুবই বুঝতে পারছি, কেন না ঐ দিনই আমারও একটি খুব প্রিয় জিনিস হারিয়েছে। এবার জন্মদিনে মাসীমা আমায় একটি ছাতা উপহার দিয়েছিলেন, নিজ হাতে তিনি তাতে আমার নাম লিখে দিয়েছিলেন,—মাস দুই হ'ল তিনি মারা গেছেন,—সেই ছাতাটি দাদু সেদিন গাড়ীতে ফেলে এসেছেন। বৃষ্টি পড়ছিল ব'লে তিনি আমাদের মেয়ে গাড়ীতে চড়িয়ে ছাতাটি মাথায় দিয়ে অন্য গাড়ীতে যান—হড়বড়ে মানুষ, নামবার সময় ভুলে গেছেন। স্টীমার ছাড়বার পর মনে পড়ল। মাসীমার দেওয়া জিনিসটা হারিয়ে ভারি মনটা খারাপ হয়ে গেছে, তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত এত দুঃখ হ'ত না।

যা হোক, হারানো কলমটি পেয়ে আপনি নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছেন—আপনার ভাগ্য ভাল। আমার কপালে ছাতাটি ফিরে পাওয়া নিতান্ত দুরাশা।

মণ্টুর ওপর রাগ ক'রে আপনারও যেমন কোন লাভ নেই—দাদুর ওপর রাগ করাও আমার বৃথা। একজন কচি খোকা আর একজন বুড়ো খোকা। আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

মণ্টুর ছোড়দি।

ছাতাটি খুলিয়া দেখি, ভিতরে রেশমের রঙীন সূতায় নানা প্রকার ফুল পাতা আঁকা এবং একপাশে সুন্দর অক্ষরে 'গৌরী' লেখা।

হাতটা যেন অসাড় হইয়া গেল। প্রথমেই মনে হইল বৃদ্ধ স্টেশন-মাষ্টার যদি খুলিয়া দেখিয়া থাকেন, ছি ছি, আমাকে কি মনে করিলেন? কে জানে, দেখিয়াই হয়ত ঐ ভাবে রসিকতা করিয়াছেন। হায় হায় ছাতাটি লইয়া সোজা স্টীমারে গিয়া চড়িলে ব্যাপারটি কি চমৎকার হইত! মণ্টুর ছোড়দি বুলিকে কোলে লইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া হয়ত নীরব অশ্রু মুছিতেছিলেন, ছাতাটি সামনে ধরিলে সে মুখখানি কেমন হাস্য-বিকশিত হইয়া উঠিত। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের উপর ভারি রাগ হইল।

যা হোক, পরদিন ছাতাটি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিব স্থির করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। চিঠির উত্তর ত একটা দিতে হইবে; কিন্তু উত্তর দিতে গেলেই নানা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে,—কোথায় পাইলাম, কেমন করিয়া পাইলাম, এত দেরি হইল কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বখেড়া। অতশতর কি প্রয়োজন, শুধু ছাতাটি পাঠাইয়া দিব।

পরদিন, পাঠাইবার সময় মনে হইল, কাল ত যাইতেছি—নিজে হাতে করিয়া ফেরত দিলে ঢের ভাল দেখাইবে। দেরির জন্য একটা কোন অজুহাত দেখাইলেই চলিবে।

বেশ করিয়া কাগজে মুড়িয়া ছাতাটি সঙ্গে নিলাম।

গাড়ী ঘাটের যত নিকটে যাইতে লাগিল, মনে মনে ততই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। স্টেশন-মাস্টারটিকে কি করিয়া এড়ান যায়।

হা অদৃষ্ট—গাড়ী থামিতেই একেবারে সামনাসামনি দেখা। কোঁচার খুঁটে চশমা মুছিতে মুছিতে বলিলেন—সেটাও গেছে নাকি? আবার একটা নতুন দেখছি—বরাতে সইল না?

হাঁ না কোন জবাব না দিয়া মুখে একটু ভদ্রতার ভাব ফুটাইয়া কোনরকমে সরিয়া পড়িলাম।

ছাতাটি নিজে হাতে দিবার যে আগ্রহ মনকে উৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছিল, বাড়ী পৌঁছাইয়া তাহা যেন অনেকটা দমিয়া গেল।

বাসুদেব পুরাতন ভৃত্য, এখানকার লোক, বহুদিন বাঙালী বাড়ী চাকরি করিয়া বেশ বুদ্ধি পাকাইয়াছে এবং বাংলা বলিতে শিখিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম—বাসুদেব, চার্চ রোডের করুণাবাবুর বাড়ী চেন?

"আজ্ঞে হ্যাঁ", বাসুদেব যেন গলিয়া গেল।

একটা কাজ করতে হবে,—এই ছাতাটি তাঁদের বাড়ী দিয়ে আসতে হবে। তাঁদের বাড়ীর কেউ গাড়ীতে ফেলে এসেছিলেন, একজন পেয়ে আমায় দিয়েছেন। যার-তার হাতে দিও না যেন, পরের জিনিস,—পারবে?

"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পারব—রোজই ত ওনাদের বাড়ী দু-একবার যেতে হয়,—এখনি দিয়ে আসি।" হাসিয়া বলিল- বকশিশ নোব।

—না না, ওসবে কাজ নেই,—আর আমার নাম-টাম বলো না যেন। কেউ জিগেস করে, বাবুর কাছে একজন দিয়ে গেছে— ব'লো।

এক গাল হাসিয়া বাসুদেব ছাতা লইয়া হেলিয়া-দুলিয়া প্রস্থান করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাসুদেব গম্ভীর বদনে ছাতাটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তাঁরা নিলেন না, এই চিঠি দিলেন।

বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে ফেরত দিলে? কা'কে দিয়েছিলি?

কোন কথা না বলিয়া বাসুদেব চিঠিটা আমার হাতে দিল।

সবিস্ময়ে এবং সকৌতুকে সেটি পড়িলাম—

"ধন্যবাদের সঙ্গে ছাতাটি ফেরত পাঠালাম। সময় পার হ'য়ে গেলে জিনিস ফিরিয়ে দেবার কোন মূল্য থাকে না ব'লে ওটি গ্রহণ করবার ইচ্ছে আর নেই। কলমটি ফেরত পেয়ে ছাতাটি ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা হবার মর্ম্ম বোঝা শক্ত নয়। আপনার ছাতাটির কথা ভেবে মনে হয় 'ওটার প্রয়োজন আমার চেয়ে আপনারই বেশী।—কিছু মনে করবেন না।

বাসুদেব কিছুতেই নিয়ে যেতে রাজী হচ্ছিল না,—অবশেষে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। যথেষ্ট পুরস্কার সে বেচারা পেয়েছে,—অযথা তিরস্কার আর তাকে করবেন না—দোষ তার নয়—চিঠি কে লিখেছে, বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। ইচ্ছা হইল বাসুদেবকে খুব ঘা-কতক কসাইয়া গায়ের জ্বালা জুড়াই। নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়া সে সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল। অযথা চেঁচামেচি করিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া রাগ ও অপমান আপাততঃ পকেটস্থ করিতে হইল। কি স্পর্দ্ধা, কি ধৃষ্টতা! মনটা বেজায় খিঁচড়াইয়া রহিল। ভাবিলাম এখন থাক—এদিকের কাজ মিটিলে, নিজে গিয়া ফেরত দিব এবং খুব কড়া কড়া দু-চার কথা শুনাইয়া ছাড়িব।

... ...

ইহার পরের ব্যাপার খুবই সংক্ষিপ্ত। কল্পনা ও বাস্তব, স্বপ্ন ও সত্যের মধ্য দিয়া কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল ঠিক ঠাহর পাইলাম না।

বিবাহের পর প্রমীলাকে এ বাড়ীতে নিরিবিলিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গৌরী থেকে প্রমীলা হ'লে কখন?"

সলজ্জ হাসিয়া সে বলিল, "কলম হারিয়ে ছাতাটি পেলে যখন।"

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিলাম," কিন্তু ওটি ফেরত দেবার অর্থ?"

মুখ চোখ লাল করিয়া বলিল, "অগ্রদূত! ফিরিয়ে নিলে ওটির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হ'ত নাকি?"

"কিন্তু তার আগেই মণ্টু ত ছোড়দা পাতিয়ে বসেছিল।"

"সে ধরতে গেলে দাদুই ত ছাতাটি হারিয়ে বসেছিলেন তা হ'লে" বলিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

অবাক হইয়া তাহার দুষ্টুমি-হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া আছি,—মণ্টু খুব সোরগোল করিয়া চীৎকারে বাড়ী

ফাটাইয়া, ছাতা হাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে ঢুকিল, "ও ছোড়দি, এই দেখ তোমার ছাতা—" মণ্টু ছোড়দির সঙ্গে আসিয়াছিল।

আঁচলে মুখ ঢাকিয়া সে বলিল, "কোত্থেকে পেলি রে?"

"ঐ আলমারির মাথায় ছিল—বল পাড়তে গিয়ে দেখি কাগজে মোড়া—"

খপ্ করিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, "আলমারির মাথায়, কাগজে মোড়া? শালা কলম চোর?"

কয়েক সেকেণ্ড হতবুদ্ধির মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া, এক ঝাঁকি মারিয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া, ছাতাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বলে দোব মাকে, আমায় গালাগাল দিয়েছ—বলে দিচ্ছি—" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল।

দু-জনে খুব হাসিয়া উঠিলাম। অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আদর করিয়াও কেহই তাহাকে থামাইতে পারিল না। অগত্যা বাসুদেব তাহাকে ও-বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। ইহার পর বহুদিন সে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।

মণ্টুর কান্নাকাটিতে আমি লজ্জিত হইয়া পড়ায়, গৌরী হাসিয়া বলিল, "ও সব কিছু নয়—আসলে মার জন্যে মন কেমন করছিল আর কি।"

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, "তোমার কারুর জন্যে মন কেমন করছে না ত?"

ওদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমার মন কেমন করবার জিনিসটি যে কাছেই রয়েছে—"

ছাতাটি কুড়াইয়া লইয়া কোলের কাছে টানিয়া গোল মাথাটিতে আদর করিবার মত হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, এইটি ত?

"আহা" বলিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ চাপিতে গৌরী আমার কোলে মুখ লুকাইল।

বাংলা বানানের নিয়ম

শ্রীকুঞ্জলাল দত্ত, এম-এ, বেদান্তশাস্ত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাংলা বানানের নিয়ম"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সর্ব্বপ্রথম নিয়মটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। উক্ত নিয়মানুসারে রেফের পর সর্ব্বত্র ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জ্জিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা 'লেখা ও ছাপা সহজ হয়' বটে, কিন্তু বিশেষ কারণে, আমার মনে হয়, অন্ততঃ একটি স্থলে দ্বিত্ব-রক্ষা অপরিহার্য্য; অন্যত্র বর্জ্জন বা বিকল্প বিধান চলিতে পারে। সেইটি হইল 'য'-এর দ্বিত্ব সম্পর্কে। 'য' বাংলাতে 'জ'-এর মত উচ্চারিত হয়। সুতরাং উচ্চারণের দিক্ হইতে দেখিলে আচার্য্য, কার্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি শব্দে বস্তুতঃ 'য'-এর দ্বিত্ব হয় নাই। এই শব্দগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে আচার্জ্য, কার্জ্য, ধৈর্জ্য প্রভৃতি। যদি সংস্কৃতের মত বাংলাতেও 'য'-এর উচ্চারণ 'ই অ' হইত, তাহা হইলে উক্ত বানানগুলিতে দ্বিত্বরক্ষার প্রয়োজন হইত না। বাংলাতে 'য'-এর সংস্কৃত উচ্চারণ না হওয়ার দরুনই 'য়' বলিয়া পৃথক্ একটি বর্ণ স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য, কার্য্য, প্রভৃতি শব্দে য-ফলা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মাবলীতে যখন উচ্চারণ-বাধা উপেক্ষা করা হয় নাই, তখন উক্ত নিয়মাবলীর এই প্রথম সূত্রটি ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ভাবে সংশোধিত হওয়া বিধেয়,—'র্য্য' ব্যতীত অন্যত্র রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।

"প্রবাসী"-সম্পাদক মহাশয়সহ সুধীগণের নিকট আমার নিবেদন, 'র্য্য'তেও দ্বিত্ব বর্জ্জন করিয়া আমরা আমাদের আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, কার্য্য প্রভৃতির অঙ্গহানি করিব কি না, এই বিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন।

বিচিত্র জীব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্যশিশু প্রথমতঃ মাতৃমুখের সহিত পরিচিত হয়। তার পর ক্রমশঃ অন্যান্য মানুষের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। একমাত্র মনুষ্য-মূর্ত্তির সহিত পরিচিত বলিয়া মনুষ্যেতর অন্যান্য জীবজন্তুর বিভিন্ন আকৃতি

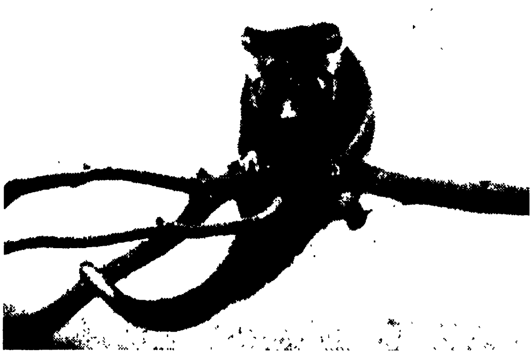

অপোসাম লেজের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে

দর্শনে শিশুর মনে বিস্ময় জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। বুদ্ধিবৃত্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাগল, গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আকৃতি-বৈচিত্র্যে শিশু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ অদ্ভুত মনে হইয়াছিল সচরাচর দৃষ্টিগোচর হওয়ার ফলে সেগুলি আর তাহার নিকট তত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। জীবজগতের বৈচিত্র্য-অপরিসীম। এই বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মানুষ কতকগুলি জীবকে স্বাভাবিক বা সাধারণ আবার কতকগুলিকে অদ্ভুত বা অসাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ যে সকল জীবজন্তুর সহিত আমাদের অহরহ পরিচয় ঘটে তাহারা মানুষের তুলনায় অদ্ভুত বা বিচিত্র হইলেও ভূয়োদর্শনের ফলে আমাদের নিকট অসাধারণ বলিয়া মনে হয় না এবং কস্মিন্‌কালেও যাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় নাই অথবা সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট জন্তু জানোয়ার হইতে যাহারা কোন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদিগকেই আমরা অদ্ভুত বা বিচিত্র বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এক জাতীয় জীবের নিকট অপর জাতীয় জীব স্বভাবতঃই বিচিত্র বা অদ্ভুত। কিন্তু এ স্থলে এই সাধারণ বৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করিব না। হরিণের শিং, হাতীর শুঁড়, রাজহাঁসের গলা, ময়ূরের পুচ্ছ বিচিত্র বা অদ্ভুত হইলেও ভূয়োদর্শনের ফলে আর অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না; কাজেই এই ধরণের পরিচিত জন্তু-জানোয়ারের কথা বাদ দিয়া যাহারা আকৃতিগত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে এবং সচরাচর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই এরূপ কয়েকটি প্রাণীর বিষয় আলোচনা করিতেছি।

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া ক্রমবিকাশের ফলে জীবজগতে অভাবনীয় বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টার ফলেই জীবজগতে এই বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঘটিতেছে। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি বিধানের নিমিত্ত জীবজগৎ বিভিন্ন ধারায় ক্রমশঃ তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়াই চলিয়াছে এবং যত দিন এ জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে তত দিন এইরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেই থাকিবে। কোন জীব অনুকূল আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে হয়। যাহারা স্থান ত্যাগ করিয়াও অনুকূল অবস্থায় পড়ে তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তীদের আকৃতি, প্রকৃতি

অণ্ডজ অথচ স্তন্যপায়ী প্রাণী—হংস-চঞ্চু

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারে ; কিন্তু যাহারা দৈবাৎ অথবা বাধ্য হইয়া প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে তাহারা জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রবল চেষ্টার ফলে কালক্রমে উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আকৃতি ও প্রকৃতিগত এমন পরিবর্ত্তন আত্মপ্রকাশ করে যাহাতে তাহারা নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এই ভাবেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও অক্ষমের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই জীবজগতে

বোর্ণিও দ্বীপের অদ্ভুত বানর

বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করে। অবস্থান্তরে পতিত হইবার পর পূর্ব্বপুরুষ হইতে অধস্তন বংশধরদের ক্রমপরিবর্ত্তনের ধারাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ না-থাকায় অধস্তন পুরুষের কোন কোন জীবকে অভিনব বা আকস্মিক আবির্ভূত প্রাণী বলিয়া মনে হয়। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলেই জীবজগতের এই ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই অভাবনীয় জীববৈচিত্র্য যে একই জীবন-প্রবাহের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তাহা

নাকেশ্বরী বানর

নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এ স্থলে আলোচ্য বিচিত্র জীবজন্তুরাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে সাধারণ জীব হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই বিভিন্ন উপজাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ এমন বিসদৃশ আকৃতি পরিগ্রহণ করিয়াছে যে, চেহারা দেখিলে স্বভাবতঃই তাহাদিগকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। হাতীর নাক শুঁড়ের আকার ধারণ করিয়াছে—ইহা বিস্ময়ের বস্তু হইলেও দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া আর বিস্ময় জাগে না। কিন্তু এস্থলে লম্বা নাকওয়ালা যে-কয়টি জানোয়ারের ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়বোধ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতীয় ছোটবড় অনেক রকম ইঁদুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সকলেরই মুখাকৃতির একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এস্থলে যে ইঁদুরটির ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার মুখটা যেমন সুঁচালো, নাকটাও তেমনই, সাধারণ ইঁদুরের নাকের চেয়ে অনেকটা লম্বা হইয়া গিয়াছে। এই

শিংওয়ালা টিকটিকি

নাকেশ্বরী বহুরূপী

নামক এক প্রকার অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। ইহাদের সর্ব্বশরীর পশমের মত ঘন রোমে আবৃত। মুখখানা দেখিতে সাধারণ জানোয়ারের মত নয়, ক্রমশঃ সূচালো হইয়া কতকটা হাতীর শুঁড়ের মত হইয়া থাকে। এই শুঁড়ের প্রান্তভাগেই নাসারন্ধ্র এবং ছোট্ট একখানি মুখ রহিয়াছে। মুখে দাঁত নাই। সাপের মত লিক্‌লিকে লম্বা জিহ্বার সাহায্যে পিপীলিকা ধরিয়া খায়। প্রোএকিড্‌না রাত্রিচর প্রাণী এবং প্ল্যাটিপাস্ নামক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত ডিম পাড়িয়া থাকে। বৃহদাকৃতির পিপীলিকাভুক নামক জানোয়ারগুলির আকৃতিও প্রোএকিড্‌নার মতই অদ্ভুত। মুখখানা শুঁড়ের মত সূচালো। সূচালো মুখ গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া লিক্‌লিকে জিহ্বার সাহায্যে পিপীলিকা ধরিয়া উদরস্থ করে। ইহাদের লেজের লোমগুলি প্রায় ষোল-সতের ইঞ্চি লম্বা; কিন্তু পাখীর পালকের মত কেবল উভয় দিকে বিস্তৃত হইয়া

নাকেশ্বরী ইঁদুরের নাক বৃদ্ধি ত জীবন-সংগ্রামে কি সুবিধা হইয়াছে পরিষ্কাররূপে তাহা জানিতে না পারা গেলেও ইহারা যে ইঁদুর জাতের মধ্যে এক অপূর্ব্বদর্শন প্রাণী এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বোর্ণিও দ্বীপে এক প্রকার অদ্ভুত নাকেশ্বরী বানর দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় গোলাকার চোখ এবং পাখীর ঠোঁটের মত লম্বা নাকের জন্য ইহাদিগকে অতি অদ্ভুত দেখায়। তাহার উপর, মুখের চতুর্দ্দিকের লোমগুলি যেন পট্টী বাঁধা। মুখের সমরেখা হইতে নাকটা প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে। নাকটার নীচের দিক্ প্রায় সমতল। নাসারন্ধ্র দুইটি নিম্নদেশে অবস্থিত। নিউগিনিতে প্রোএকিড্‌না

গণ্ডারের মত শিংওয়ালা বহুরূপী

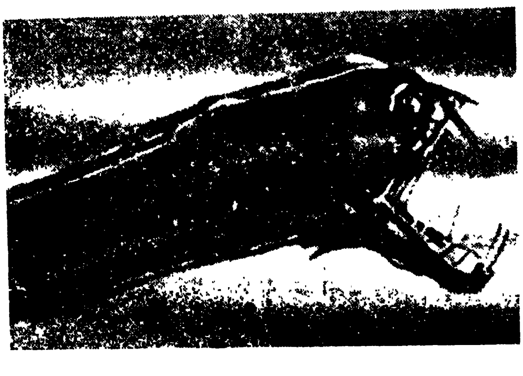

রাক্ষুসে বানমাছ

পাখার আকার ধারণ করে। শুইবার পর লেজটির সাহায্যে শরীর আবৃত করিয়া রাখে এবং সময় সময় পাখার মত বাতাস করিয়া শরীর ঠাণ্ডা করে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় আর্ডভার্ক নামক এক প্রকার অদ্ভুত রাত্রিচর জানোয়ার দেখা যায়। ইহাদের মুখ অসম্ভব রকমের লম্বা ও সূচালো, আর্ডভার্ক উইপোকা খাইয়াই

গাছের ডালে বসিয়া কোয়ালা রোদ পোহাইতেছে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পায়ের ধারালো নখরের সাহায্যে উইয়ের ঢিবির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া সুচালো মুখটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, গর্ত্তে মুখ প্রবেশ করাইবার সময় লম্বা কান দুইটি পিছনের দিকে ঘাড়ের উপর চাপিয়া রাখে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভূঁই-শূকর বলা হয়।

বানর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কত যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি স্বভাবতঃই অদ্ভুত। কয়েক জাতীয় বানর আবার আকৃতি ও গঠন-বৈচিত্র্যে এই সাধারণ অদ্ভুতত্বকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বোর্ণিও দ্বীপের এক প্রকার লম্বা হাতওয়ালা বানরের ছবি হইতেই তাহাদের গঠন-বৈচিত্র্যের বিষয় উপলব্ধি হইবে। হাত দুইখানি দেহ হইতে এতই লম্বা যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়—লম্বা হাতেরই ইহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন। লম্বা

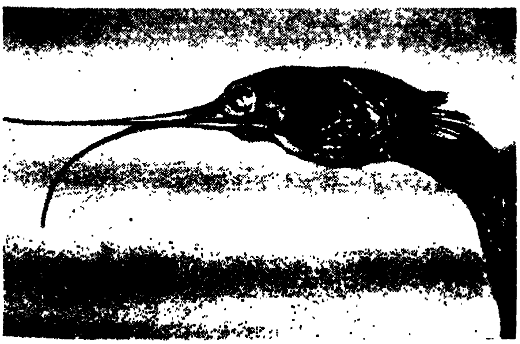

পাখীর মত ঠোঁটওয়ালা বাদবাহ

হাতের সাহায্যে ইহারা ক্ষিপ্রগতিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপনীত হইয়া চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। দক্ষিণ-আমেরিকায় এমাজন নদীর ধারে সাকি নামক এক প্রকার অদ্ভুত বানর বাস করে। ইহাদের সর্ব্বশরীর কালো লোমে আবৃত; কিন্তু মুখখানি সাদা, মুখের আকৃতি—ছাঁটা দাড়ী-গোঁফওয়ালা বয়স্ক লোকের মুখের মত। লেজটি আরও অদ্ভুত। আর কোন বানরের এরূপ স্তূপীকৃত ঘন লোমওয়ালা লেজ দেখা যায় না। চেহারা দেখিতে ভীষণ হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা অনেকটা নিরীহ প্রকৃতির জানোয়ার। চীন ও তিব্বতে আর এক প্রকার অদ্ভুতাকৃতির বানর দেখা যায়। ইহাদের মুখের মধ্যে উপরের ঠোঁটটাই

শ্বেতমস্তক বেল-গার্ড

যেন অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। নাকের মধ্যস্থল অসম্ভব নীচু হইয়া মুখের সঙ্গে সমতল হইয়া গিয়াছে। নাসারন্ধ্রের স্থানটি কেবল ছোট্ট একটি ঢিবির মত উঁচু হইয়া আছে।

বন্য বরাহ যেমন কদাকার তেমনই ভীষণ দর্শন। আফ্রিকার জঙ্গলে অদ্ভুত এক প্রকার বন্য বরাহ দেখা যায়। আকৃতির ভীষণতায় সাধারণ বরাহেরা ইহাদের তুলনায় নগণ্য। ইহাদের মুখের দুই দিকে হাতীর দাঁতের মত এক

এক জোড়া শক্ত বাঁকানো দাঁত বাহির হইয়া থাকে। পিছনের দাঁত দুইটি গালের চামড়া ভেদ করিয়াই বাহিরে আসে। দাঁতগুলি বাঁকাভাবে বাড়িতে বাড়িতে অনেক সময় কপালের হাড় স্পর্শ করে। চক্ষুর নিম্ন ভাগে অপরিণত শৃঙ্গের মত দুই দিকে দুইটি শক্ত পদার্থ বাহির হইয়া মুখাকৃতিকে আরও ভীষণতর করিয়া তোলে। গায়ে লোম নাই; কিন্তু ঘাড়ের কাছে কতকগুলি শক্ত লম্বা কেশর বাহির হইয়া থাকে।

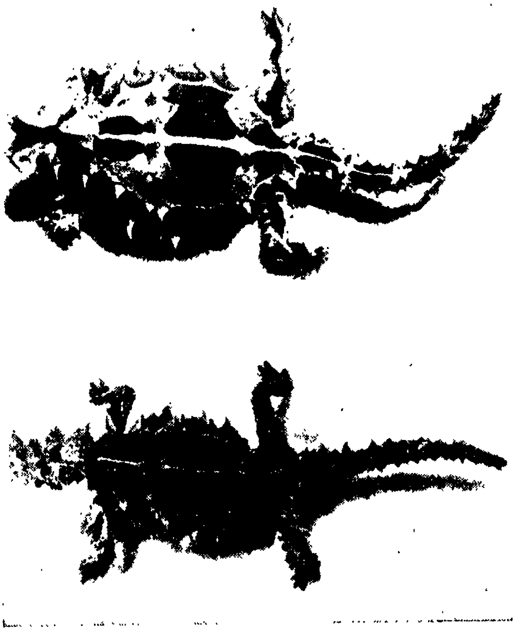

কণ্টকাবৃত টিকটিকি

পূর্ব্ব-অষ্ট্রেলিয়ায় কোয়ালা নামক বৃক্ষচারী এক প্রকার অদ্ভুত জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা ভল্লুকের মত। ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের পত্রপল্লবই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কচি পাতার সন্ধানে অধিকাংশ সময়েই ইহারা গাছের আগ্‌-ডালে বিচরণ করিয়া থাকে। কোয়ালা দিনের বেলায় বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া থাকে; কিন্তু গাছের ডালে সুবিধামত বিশ্রামস্থল পাইলে সময় সময় আরামে বসিয়া রৌদ্র উপভোগ করে। কোন কারণে উত্যক্ত হইলেই অতি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার সুরু করিয়া দেয়।

কাঙ্গারু অতি অদ্ভুত জানোয়ার, বিশেষতঃ তাহাদের বাচ্চা বহন করিবার রীতি আরও অদ্ভুত। কিন্তু বাচ্চা

বৃহদাকৃতি পিপীলিকাভুক্

বহনকারী জানোয়ারদের মধ্যে অপোসামও কম অদ্ভুত নহে। ইহারা অবশ্য কাঙ্গারুর মত থলির মধ্যে বাচ্চা বহন করে না; কিন্তু তিন-চারিটি বাচ্চা পিঠে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে বসিয়া লেজের সাহায্যে পিঠের উপরে প্রসারিত মায়ের লেজ শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। অপোসাম লেজের সাহায্যে বৃক্ষের ডাল হইতে বাচ্চা সমেত অনায়াসে ঝুলিয়া থাকে এবং তদবস্থায় দোল খাইতে খাইতে লাফাইয়া অন্য ডালে উপস্থিত হয়।

জৈব-বিবর্ত্তনের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু নামক প্রাণীরা ক্রমবিকাশের ধারার একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ। অণ্ডজ প্রাণী স্তন্যপায়ী প্রাণীতে রূপান্তরিত হইবার পথে যত রকমের অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, ভূস্তরে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণের অস্তিত্ব থাকিলেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জ্ঞাপক এরূপ জীবন্ত প্রমাণ খুব কমই মিলিয়া থাকে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় অভিব্যক্ত জীবজন্তু জীবন সংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরীভূত দুই-একখানা অস্থি-

প্রোএকিড্‌না নামক পিপীলিকাভুক্

পঞ্জর কদাচিৎ তাহাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। হংসচঞ্চু, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছিল। যে কারণেই হউক তাহার বংশধরেরা আজও পৃথিবীর এক কোণে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের শরীর ও লেজ লোমে আবৃত; কিন্তু মুখটি অবিকল হাঁসের ঠোঁটের মত। পায়ের আঙ্গুলগুলিও হাঁসের পায়ের মত পাতলা চামড়ায় পরস্পর সংলগ্ন। ইহারা ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর তাহাদিগকে স্তন্য পান করায়।

দক্ষিণ-আমেরিকার সাকি নামক বানর

দুই জোড়া দাঁতওয়ালা বন্য বরাহ

গঠন ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে পাখীদের মধ্যে অসংখ্য রকমারি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় সুদৃশ্য পাখীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র ঠোঁটের অদ্ভুত গঠনের ফলেই কতকগুলি পাখীকে অতীব অদ্ভুত বা বিসদৃশ মনে হয়। আফ্রিকায় এক জাতীয় সারস দেখা যায়, তাহাদের ঠোঁট দেখিতে অনেকটা জুতার মত, সুবৃহৎ জোড়া ঠোঁটের জন্য ধনেশ পাখীকেও অতি অদ্ভুত দেখায়। কয়েক জাতীয় ধনেশ পাখী অবশ্য দেখিতে মন্দ নহে। কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকায় একজাতীয় ধনেশ পাখীর ঠোঁটের গড়নে উহাকে অদ্ভুত বা অসাধারণ মনে না করিয়া উপায় নাই। কাঠ-ঠোকরা পাখীরা যেমন হাতুড়ির মত ঠোঁটের ব্যবহার করিয়া থাকে ইহারা কিন্তু সেরূপ কিছুই করে না। মোটের উপর অত বড় ঠোঁট তাহাদের কি প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় নাই। বিভিন্ন জাতীয় টুকান পাখীর ঠোঁটও শরীরের তুলনায় অসম্ভব বড় হইয়া থাকে। ঠোঁটের বিশালত্বে পাখীগুলিকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।

শ্বেতবর্ণের বেল-বার্ড এক অপূর্ব্ব পাখী। ইহাদের উপরের ঠোঁটের গোড়ার দিকে লম্বা দণ্ডের মত একটি সূচ্যগ্র পদার্থ জন্মায়। এই সূচ্যগ্র দণ্ডটিকে ইহারা ইচ্ছা মত উন্নত বা অবনত করিতে পারে। কিন্তু আর এক জাতীয় শ্বেত-মস্তক বেল-বার্ডের ঠোঁটের উপর একটি এবং মুখের দুই ধারে দুইটি লম্বা লম্বা সূচালো দণ্ড বাহির হইয়া থাকে। কাঁটার মত তিনটি দণ্ড থাকার ফলে মুখখানাকে অতি অদ্ভুত দেখায়।

স্বর্গীয় পাখীর পালকের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। ইহাদের

নাকেশ্বরী ইঁদুর

আর্ডভার্ক নামক পিপীলিকাভুক জানোয়ার

মধ্যেও বিভিন্ন জাতীয় রকমারি পাখী দেখা যায়। এক জাতীয় স্বর্গীয় পাখীর মস্তকের তিন দিকে পালকগুচ্ছ ছত্রাকারে সজ্জিত। এজন্য ইহাদিগকে ছত্রমস্তক বলা হয়। গলার নীচেও মাছের লেজের আকৃতিবিশিষ্ট উজ্জ্বল একটা পালকের আস্তরণ থাকে। পাখীগুলির অপূর্ব্ব পালক-সজ্জা ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তন অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রম-পরিণতির ফলে টিকটিকি ও গিরগিটি জাতীয় অনেক প্রাণীও অতি অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছে। বহুরূপীর মুখের আকৃতি প্রায় গোলাকার; কিন্তু কয়েক জাতীয় বহুরূপীর আকৃতি সাধারণ বহুরূপী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাদের কাহারও মুখ সুচালো এবং নাকটা সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া আছে। কাহারও মুখের সম্মুখভাগ হইতে গণ্ডারের মত দুইটি খড়্গ বাহির হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণের জন্যই অস্ত্রগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছে। আবার কাহারও নাকের ডগায় বিচিত্র আকৃতির ফলক। কিন্তু উহারা সকলেই অতি নিরীহ প্রকৃতির জীব; কোন কারণেই উহাদিগকে এই অদ্ভুত অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতে দেখা যায় না। দক্ষিণ- ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েক জাতীয় কণ্টকাবৃত টিকটিকি দেখা যায়। সাধারণ টিকটিকির সহিত মোটামুটি একটা দৈহিক সামঞ্জস্য থাকিলেও ইহাদের কণ্টকাকীর্ণ মুখাকৃতি দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। আসলে কিন্তু ইহারা নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী; পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়াই উদর পূরণ করে। কাহাকেও আক্রমণ করে না। কণ্টকগুলি আত্মরক্ষার অস্ত্রবিশেষ। দক্ষিণ- ও মধ্য- আমেরিকার কণ্টকাবৃত টিকটিকিগুলির আকৃতিও ভীতি উৎপাদক; কিন্তু কণ্টকাকীর্ণ বর্ম্মটাকে আক্রমণের জন্য দূরে থাক্, আত্মরক্ষার জন্যও ব্যবহার করে না। আক্রান্ত হইলে চক্ষুর কোণ হইতে অতি সূক্ষ্ম ধারায় শত্রুর প্রতি রক্ত ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে আর কিছু না হউক, আক্রমণকারী ভীতিবিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার উগ্র বিষধর রিংহল্‌স্ কোব্রা অনেক দূর হইতে শত্রুর চোখে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিষ নিক্ষেপ করে। ইহার ফল অতি মারাত্মক হইয়া থাকে।

মাছের মধ্যেও রকমারি অসংখ্য। বিভিন্ন জাতীয় অদ্ভুত মাছ যে কত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। এ স্থলে দুই-একটির বিষয় উল্লেখ করিতেছি মাত্র। সাপের মত আকৃতিবিশিষ্ট বাণ মাছগুলিকে অন্যান্য মাছের তুলনায় অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। ছোট, বড় বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হরেক রকমের বাণ মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাদের মুখাকৃতি সুচালো। কিন্তু গভীর সমুদ্রে পাখীর মত ঠোঁটওয়ালা এবং এক প্রকার রাক্ষুসে বাণ দেখা যায়। ইহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া বাণ মাছ বলিয়া মনেই হয় না। রাক্ষুসে বাণের তীক্ষ্ণ দন্তসমন্বিত বিরাট্ মুখখানা দেখিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। গভীর জলের অপর বাণ মাছটির মুখের সম্মুখে লম্বা ঠোঁট গজায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কিছু দূর সমান্তরালে অগ্রসর হইবার পর ঠোঁট দুইটির প্রান্তভাগ দুই দিকে বাঁকিয়া গিয়া পরস্পর তফাৎ হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত গভীর সমুদ্রের কণ্টকাবৃত কট্‌কটে মাছ, বিভিন্ন জাতীয় ব্যাং-মুখো মাছ, শঙ্কর মাছ এবং সাগর-অশ্বের অদ্ভুত আকৃতি লোকের মনে স্বভাবতঃই বিস্ময়

চীন দেশের অদ্ভুতাকৃতি বানর

উদ্রেক করিয়া থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় অদ্ভুত আকৃতির অক্টোপাস, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীগুলিও কম বিস্ময়ের বস্তু নহে। কাঁকড়াদের মধ্যে গেছো-কাঁকড়া, লাল-কাঁকড়া, রাজ-কাঁকড়া, সন্ন্যাসী-কাঁকড়া এবং বিরাট্ আকারের জাপানী-কাঁকড়ার আকৃতি, প্রকৃতি অতি অদ্ভুত।

প্রাণী-জগতের অসংখ্য অদ্ভুত বৈচিত্র্যের মাত্র কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইল। কীটপতঙ্গের মধ্যেও এইরূপ অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু অদৃশ্য বা আণুবীক্ষণিক প্রাণী-জগতের আকৃতি-বৈচিত্র্য সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত; দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

মহিলা-সংবাদ

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ইরিগেশন রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত বসুর মধ্যমা কন্যা কুমারী ইরা এ বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালযের আই-এস্‌সি পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আই-এ, আই-এস্‌সি উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আই-এস্‌সি বিভাগের চিকিৎসা গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও শ্রীমতী ইরা দ্বিতীয় হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কুমারী ইরা বসু

পিছন ফিরে চাইবো না

শ্রীকমলরাণী মিত্র

চলার পথে পিছন ফিরে চাইবো না,
ঘরের পানে মাটির টানে উজান-তরী বাইবো না।
নিরুদ্দেশের নেশায় মেতে
কূল হারাবো যেতে যেতে,
পরাজয়ের ক্ষতির ভয়ে করুণ গীতি গাইবো না॥

ঝড় উঠেছে আকাশ জুড়ে,
বিপদ ঘনায় কাছে দূরে,
বুক পেতে আজ বজ্র ধ'র;
মরণ-ভয়ে ধাইবো না।
পিছন ফিরে চাইবো না।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

কলিকাতার ছোট একটি গলি। গলিটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। ইহারই দক্ষিণ দিকের সারিতে দোতলা-তেতলা বাড়ীগুলি উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া যত দূর চোখ যায় চলিয়া গিয়াছে। উত্তরে কতকটা স্থান লইয়া বড় একটা বস্তি। তার পর কিছু ফাঁকা জায়গা -গাড়োয়ানেরা এখানটায় গাড়ীর মহিষ ও গরুগুলিকে রাত্রির জন্য বিশ্রাম করাইয়া লয়। সমস্ত স্থানটা সব সময়ই কাদা ও গোবরে লেপটিয়া রহিয়াছে। তাহার পর পুনরায় এপাশের সহিত পাল্লা দিয়া দুই-তিনতলা বাড়ীর শ্রেণী উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এবার জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই আষাঢ়ের ঘন ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ এই সাত-আট দিন, দিনরাত্রি অনবরত টিপ্-টিপ্ বৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় সব সময়ের জন্য ধূলায় ও পিচের রঙে মিশিয়া একটা বিশ্রী কাল রঙের কাদা জমিয়া আছে,—পা দিতে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, কাপড়চোপড়ে লাগিলে আর উঠিতে চাহে না। সমস্ত আকাশ সব সময়ের জন্যই যেন মুখ ভার করিয়া অসন্তুষ্টি জানাইতেছে। এমনি দিনে মন একেবারে মরিয়া থাকে—না-থাকে কোন কাজে উৎসাহ, না-থাকে কোন আনন্দবোধ। মানুষ আলোর পিয়াসী। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে মানুষ আলোর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। অন্ধকার তাহার নিকট মৃত্যু, কিন্তু আলো তাহাকে মুগ্ধ করে—তাহাকে জীবন দেয়।

এমনি এক বাদলা-দিনে সন্ধ্যার আগে আগে নিরাপদ ত্রস্তপদে আসিয়া এই বস্তির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। নিজের ঘরের দুয়ার খুলিয়া দেখে আর কেহ এখনও ফেরে নাই। পায়ের রবারের জুতা খুলিয়া কাদা ধুইয়া লইয়া পকেট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর.বাহির করিল। দুইটি ঠোঙা অন্য দুইখানি তক্তাপোষের উপর রাখিয়া নিজে একটি খুলিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত চানাচুর চিবাইতে লাগিল।

একটু পরে প্রবেশ করিল অবনী। আসিয়াই ধপ্ করিয়া নিজের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া হাঁফ ছাড়িল। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল রে অবনী, তোর খবর কি?

—আর বলিস নে—যত সব ছোটলোক বলে কি না সকাল বিকাল দু-ঘণ্টা ক'রে চার ঘণ্টা পড়াতে হবে, মাইনে দেবেন আট টাকা। এদিকে ছাত্রছাত্রীসংখ্যা কমপক্ষে পাঁচটি, তার উপরে উপরিও দুই একটা আছে। আমি ত দিয়ে এলাম মুখের উপর জবাব!

—আচ্ছা বেশ করেছিস্ এখন হাতে মুখে জল দিয়ে ঐ চানাচুর কটা চিবো দেখি।

অবনী হাত মুখ ধুইয়া চানাচুর কয়টি মুখে দিতেই তাহার মনের সমস্ত উত্তাপটুকু একেবারে শেষ হইয়া গেল।—"তা যাক্ গে—আমি আর ও টিউশনি করবোই না ঠিক করেছি বুঝলি না নিরাপদ?"

নিরাপদ হাসিয়া বলিল—তা ত বুঝলাম কিন্তু কোন কর্ম্মটি করা হবে শুনি!

—কেন ব্যবসা করব। আজ আমার চোখ খুলেছে। বিকালবেলা বৌবাজার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল যামিনীর সঙ্গে। যামিনীর বাড়ী আমাদের গ্রামে, ম্যাট্রিক পাস ক'রে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়, সকলে মনে করল ছোঁড়াটা বয়ে গেছে। কিন্তু আজ দেখি কি—বৌবাজারের বড় একটা দোকানের বারান্দায় দিব্যি এক স্টেশনারী দোকান ফেঁদে ব'সে আছে। ও বললে প্রথম পাঁচ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। এখন তার মূলধন দাঁড়িয়েছে দু-শ টাকা, মাত্র বছর-দেড়েকের মধ্যে। আমি ত তখন থেকেই ঠিক করেছি যে এবার ব্যবসা করব।

কথা শেষ করিয়া অবনী নিরাপদের মুখের দিকে তাকাইল সমর্থনের আশায়, কিন্তু নিরাপদ কোন উৎসাহই দিল না। বলিল—তাই বুঝি আটটা টাকা মনে লাগল না, ভদ্রলোকের মুখের উপরে জবাব দিয়ে এলি? কিন্তু ব্যবসা না শিখলে ব্যবসা করা যে কত মুশকিল তা ত তুই জানিস নে। আর টাকা আসবে কোথা থেকে শুনি? মূলধন?

অবনী বলিল—কেন? আমি বেশী টাকা চাই নাকি, মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে দেবো 'স্টার্ট'।

নিরাপদ বিশেষ গম্ভীর ভাবে বলিল—কিন্তু তা ত হ'ল—পরেশের ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে বাইরে গেছে, সে এ মাসের মাইনে পাবে না। আমার মাইনে পেতে এখনও দশ-পনর দিন বাকী—তুই বেকার। হাতে আছে মোট ছয় টাকা সওয়া চার আনা। এদিকে আমরা তিনটি প্রাণী, পাঁচ টাকা কোথায় পাবি বলত?

অবনী এবার একেবারে দমিয়া গেল। বলিল—তা হ'লে কাল আবার সে ভদ্রলোকের কাছে কি যেতে বলিস যদি টিউশনিটা হয়?

—যেতে পারিস তবে হবে কি না কে জানে।

অবনী মুখ চূণ করিয়া বসিয়া রহিল। নিরাপদ কুঁজা হইতে খানিকটা জল ঢালিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া শুইয়া পড়িল। আজ এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ধরিয়া বর্ষণ ক্ষান্ত ছিল বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আবার পশ্চিম-আকাশ কাল করিয়া বাতাস ও বৃষ্টি একসঙ্গে আরম্ভ হইল। ঝড় যাহা আরম্ভ হইল তাহার বেগ বড় কম নয়। নিরাপদ উঠিয়া বসিয়া বারে বারে বাইরের দিকে তাকাইতে লাগিল। পরেশ এখনও ফিরে নাই। এই ঝড়-জলে কোথা আছে, কি করিতেছে, ভিজিয়া বোধ হয় একাকার হইয়া গিয়াছে—ভাবিয়া সে উতলা হইয়া পড়িল।

কিন্তু অবনী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—দেখেছিস নিরাপদ, পরেশ লক্ষ্মীছাড়া এখনও এল না—এই ঝড়ের মধ্যে না জানি কোথায় আছে।

নিরাপদ কথা না বলিয়া রাস্তার দিকের ক্ষুদ্র জানালাটার ভিতর দিয়া রাস্তার উপরে দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমনি করিয়া পর-পর যখন ঘণ্টা-তিনেক কাটিয়া গেল তখন অবনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, গায়ে ভাল করিয়া কাপড় জড়াইয়া বলিয়া উঠিল—আমি যাই নিরাপদ, দেখে আসি—একা একা কোথায় না জানি কি করছে।

ঝড়-জল তখনও বেশ চলিতেছে—একটু বেগ কমিয়াছে মাত্র। নিরাপদ তাহার হাত ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া বলিল—তুই কি পাগল হলি নাকি? কোথায় এখন খুঁজে তাকে বের করবি শুনি?

—কিন্তু তাই ব'লে এমনি ক'রে কি ক'রে ব'সে থাকি?

—তা ছাড়া উপায় নেই—রাস্তায় কোন গাড়ী-বারান্দার তলায় হয়ত দাঁড়িয়ে আছে, ঝড় থামলে আপনি আসবে। কিন্তু আমি ভাবছি জলে ভিজে শেষটায় কোন অসুখ-বিসুখ ক'রে না বসে।

অগত্যা অবনী থামিল। দুই বন্ধু রাস্তার দিকে তাকাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এখন ঝড়-জল থামিয়া গিয়াছে। ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে মাত্র। এমন সময় রাস্তার জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে পরেশ ফিরিয়া আসিল। অবনী তাহাকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল—কোথায় ছিলি বল্‌ত, আমরা এদিকে ভেবে মরি।

পরেশ তখন দিব্যি আপন মনে গানের কসরৎ করিতেছিল—"ওগো তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে..."

নিরাপদ উঠিয়া আসিয়া পরেশের জামা-কাপড় পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহা বিলক্ষণ ভিজিয়া গিয়াছে। পরেশের একটা গেঞ্জি ও কাপড় আগাইয়া দিয়া বলিল—নে কাপড়-জামা আগে ছেড়ে ফেল। ভিজে একাকার হয়ে গেছিস।

—ওরে বাপ রে তোরা দেখি আমাকে একেবারে কচি খোকাটি পেয়ে গেলি। ভিজতে আমার আরাম লাগে। মেঘের ডাক শুনলে গান গাইতে ইচ্ছে হয়।

নিরাপদ হাসিয়া বলিল—তা জামা-কাপড় ছেড়ে যত ইচ্ছা হয় গান গা, আমাদের কারু আপত্তি নাই। তবে আজ রাত্রে আর পেটে কিছু পড়বে না—আজ হরিবাসর।

অবনী বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়ই নয়। তোরা ততক্ষণ গল্প কর্—আমি খিচুড়ী রান্না ক'রে ফেললাম ব'লে। এই বাদলা দিনে বেশ হবে।

পরেশ হাসিয়া বলিল—সে দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর দয়া।

অবনী ডাল চাল লইয়া মহা উৎসাহে স্টোভ ধরাইতে লাগিয়া গেল।

২

নিরাপদ, অবনী ও পরেশ, তিন পরম বন্ধু। ছয় বৎসর আগে হয় ইহাদের পরস্পর পরস্পরের পরিচয়। মফস্বলের এক কলেজে ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া আসিয়া একই ক্লাসে প্রবেশ করে। অবনীর বাড়ী ফরিদপুরে, নিরাপদর নদীয়ায়, আর পরেশ থাকিত পাবনার মফস্বলে। ক্লাসে ঢুকিয়া ইহারা তিন জনে কেমন করিয়া যে একসঙ্গে এমন করিয়া প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িল তাহা ইহাদের নিকটও কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই বা মুখ ফুটিয়াও কেহ কোন দিন প্রীতির কথা কাহাকেও বলে নাই, অথচ তিনটি

প্রাণী দিনে দিনে পলে পলে হইয়া উঠিয়াছে—যাহাকে বলে এক মন এক প্রাণ। দুই বৎসর পরে তিন জনেই যখন আই-এ পাস করিয়া বি-এ ক্লাসে ঢুকিয়াছে এমনি সময় দেখা গেল তাহাদের তিন জনের নামে পুলিসের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। রাজনৈতিক মামলা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া তিন বন্ধুকে অনেক কষ্ট দিয়া অবশেষে মুক্তি দিল। কিন্তু ইহার পর আর কাহারও কলেজে পড়া সম্ভব হইল না। অবনী নিজেই সংসারের অভিভাবক, তাহার ঘাড়ের উপর বৃদ্ধা মা ও এক অবিবাহিতা ভগ্নী, অবস্থা সচ্ছল নহে, কাজেই কাজকর্ম্মের কিছু চেষ্টা দেখা দরকার। পরেশের সংসারে আপনার বলিতে বিশেষ কেহ নাই। সে কাহারও তোয়াক্কা রাখিত না, পড়াশুনার ধার সে বড় একটা কোন দিনই ধারিত না। সাহিত্যসেবা লইয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাইত—কাজেই সেও পড়া ছাড়িল। নিরাপদ বড়লোকের ছেলে। কিন্তু সংসারে পিতা বাঁচিয়া নাই, মায়েরও মৃত্যু হইয়াছে তাহার শৈশবে। কাকীমা করিয়াছেন তাহাকে মানুষ—তাঁহাকেই সে মা বলিয়া জানে, কাকা নিজে বড় পুলিস অফিসার। তাই তিনি মনে করিলেন রাজনৈতিক ছোঁয়াচ লাগিয়া ভাইপোর জাতি গিয়াছে। সেই হইতে ভাইপোও খুড়ীর ধার ধারিত না, খুড়াও ভাইপোর কোন সংবাদ লইতেন না, কাজেই নিরাপদরও পড়া ছাড়িবার অসুবিধা কি?

অতঃপর কিছু দিন নানা গবেষণার পর তিন বন্ধু মিলিয়া কলিকাতায় আসিয়া এই আস্তানা গাড়িয়াছে। ইহারা তিন জনে মিলিয়া যেন একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার। নানা দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া এই একই খোলার ঘরে তাহারা পর পর চারিটি বৎসর কোন প্রকারে কাটাইয়া দিয়াছে।

কলিকাতার উপায়হীন শিক্ষিত লোকের এক মাত্র উপায় ছাত্র পড়ান। নিরাপদ, অবনী ও পরেশ তিন জনে একসঙ্গে কোন দিনই টিউসনি পায় নাই। কোন সময় না কোন সময়, কাহারও না কাহারও বসিয়া থাকিতে হইয়াছেই। তবু খাওয়া-দাওয়ার খরচ ও ঘরভাড়া দিয়াও ইহাদের তহবিলে মাঝে মাঝে কিছু জমিত। নিরাপদ ও পরেশের বাড়ীর ভাবনা নাই, মাঝে মাঝে অবনীর বাড়ীতে কিছু পাঠাইতে হয়। পরেশের জন্য একটা চাকরির উমেদারী করিয়া এইবার প্রায় কুড়িটি টাকা বৃথা খরচ হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর নিরাপদ পড়িয়াছিল কঠিন অসুখে, ঔষধ ও পথ্যের খরচেও বড় কম যায় নাই। তবু এত দিন ইহাদের ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে চার মাস হইতে অবনী ও পরেশ আছে বসিয়া, নিরাপদ একটি দশ টাকা বেতনের টিউশনি করিতেছে মাত্র। কাজেই সাবেক তহবিল যাহা ছিল তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়া ইহাদের একেবারে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করিয়া ফেলিয়াছে।

কত দিন পরে সূর্য্য যেন আজ নূতন করিয়া উঠিয়াছে। এ কয় দিনের যত মলিনতা, যত ক্লেদ সব আজ নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। আজ আশেপাশে সর্ব্বত্রই যেন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এ কয় দিনের বাদলার জন্য যে প্রাণ মুষড়াইয়া ছিল তাহা আজ নূতন উদ্দীপনায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

রাস্তার ওপাশের একটি বাড়ীতে বিবাহ—সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। পরেশ এই সকাল বেলাতেই বিছানায় কাত হইয়া সানাইয়ের সুরে মাতিয়া উঠিয়াছে। অবনী মাটির উনানে আঁচ দিয়া রান্না চড়াইবার জোগাড় করিতেছে। নিরাপদ ছেলে পড়াইতে গিয়াছে, দশটার আগে ফিরিবে না।

সারা বস্তিটিও আজ কর্ম্মপ্রেরণায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পাশের ঘরে থাকে এক খোট্টা আর তাহার স্ত্রী। স্ত্রীটি যাঁতায় ডাল ভাঙিয়া দেয়, পুরুষটি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ডাল বিক্রি করে, ইহাই তাহাদের উপজীবিকা। এ কয় দিন বাদলার জন্য তাহাদের কাজ বন্ধ ছিল। আজ তাহারা পূর্ণোদ্যমে যাঁতা ঘুরাইতে লাগিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটির নাম—মণিয়ার মা। মণিয়া কিন্তু বাঁচিয়া নাই। কোন্ কালে দুই বৎসরের শিশু ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু মণিয়ার মা—সে মাতৃত্বের উপাধিটুকু ত্যাগ করিতে পারে নাই।

মণিয়ার মা সময়-অসময় বাবুদের সংসারে যথাসাধ্য কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়, খাতির করিয়া চলে। গত বৎসর আবার মণিয়ার মা অসুখে পড়িলে এই বাবুরাই তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়া তোলে। সেই হইতে মণিয়ার মা বাবুদের একান্ত অনুগত হইয়া আছে। তার ওপাশে থাকে চার-পাঁচজন লোক, তাহার মধ্যে জনতিনেক যখন যে জিনিসের সুবিধা পায় ফেরী করিয়া বিক্রি করে, দুই জন বার মাস করে চানাচুর বিক্রি। ইহারা সকাল বেলা বাহির হইয়া যায়, আর ফেরে রাত্রি ন-টা দশটায়। তাহার পর রুটি আর ডাল তৈরি করিয়া আহার শেষ করে। এই ফেরীওয়ালাদের পাশের ঘরে সম্প্রতি একটি নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। স্বামী আর স্ত্রী, মাত্র দুইটি প্রাণী। স্বামীটি

কোন কারখানায় কাজ করে,—সারাদিন কাজ করিয়া সন্ধ্যা বেলা ফিরিয়া আসে।

চেহারা ও হাবভাবে তাহাদিগকে নেহাৎ ছোটঘরের বলিয়া মনে হয় না। মেয়েটির নাম মালতী—অল্প বয়স, দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। মণিয়ার মা বউটির সহিত ইহারই মধ্যে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। সে-ই মাঝে মাঝে আসিয়া বাবুদের কাছে তাহার গল্প বলে। বউটি নাকি বড় ভালমানুষ। মণিয়ার মাকে নানী বলিয়া ডাকে। কিন্তু পুরুষটিকে সে পছন্দ করে না—বলে মেয়েটির সহিত তাহাকে নাকি মোটেই মানায় নাই।

বেলা নয়টা প্রায় বাজিয়া গিয়াছে, পরেশ তবুও ঠিক একই ভাবে শুইয়া আছে—ওপাশের বাড়ীতে তখনও সানাই বাজিয়াই চলিয়াছে, অবনী কি একটা তরকারি নামাইয়া ভাত চড়াইতেছে, এমন সময় কিসের একটা গণ্ডগোল শুনিয়া পরেশ উঠিয়া বসিল। ঠিক তখনই বাহির হইতে মণিয়ার মা ডাকিতে লাগিল "বাবুজী, এ বাবুজী, জল্‌দি ইধার আইয়ে।" তখন ওধার হইতে গণ্ডগোলের পরিবর্ত্তে একটি স্ত্রীলোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পরেশ বাহির হইয়া আসিতেই মণিয়ার মা তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল—নূতন ভাড়াটিয়াদের ঘরের দিকে; পরেশ যাহা শুনিল তাহার মর্ম্ম এই—কয় দিন হইতেই নাকি জন দুই খোট্টা ফেরীওয়ালা বউটিকে নানা প্রকার কুৎসিত ইসারায় ইঙ্গিত করিতে থাকে। আজ কোথায়ও কেহ নাই ভাবিয়া ফেরী-ওয়ালা দুই জন বউটির ঘরে ঢুকিয়া একেবারে তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দেয়।

পরেশ দেখিল তখনও বউটির ঘরের বারান্দায় খোট্টা দুই জন দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া কি যেন বলিতেছে আর হাসিতেছে। রাগে পরেশের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা পরেশকে বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না।

পরেশের ধমক তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাকেই বরং দুই-একটা অপমানসূচক কথা শুনাইয়া দিল। হঠাৎ পিছন হইতে অবনী গর্জ্জিয়া বলিল, "এই নিকাল আভি।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে অবনীকে তাহাদের এক জন কি একটা গালি দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অবনী তাহার কপালে এমন এক ঘুষি বসাইল যে লোকটি ঘুরিয়া একেবারে নীচে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় ফেরীওয়ালা আসিয়া অবনীর হাত টানিয়া ধরিল কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়, তাহার পর সেও ঘুষি খাইয়া একেবারে ঘুরিয়া গিয়া পড়িল। তাহার মাথা ফাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। গণ্ডগোল শুনিয়া রাস্তার পুলিস ও বস্তির যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। মণিয়ার মা ও বউটি এই গণ্ডগোলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ব্যাপার যে এত দূর গড়াইবে ইহা তাহাদের ধারণার অতীত।

ব্যাপারটির এখানেই শেষ হইল না। পুলিস চার জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। মণিয়ার মা ভয়ে বিস্ময়ে কাঁদিয়া ফেলিল। ঘণ্টাখানেক পরে নিরাপদ ফিরিয়া আসিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ঘরের দরজা বন্ধ। উনানের উপরে হাঁড়ির ভাত ফুটিয়া ফুটিয়া পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অবনী বা পরেশ কাহাকেও কোথাও দেখা গেল না।

মণিয়ার মা বাহিরে গিয়াছিল—কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা তাহাকে শুনাইল। সমস্ত শুনিয়া নিরাপদ বাক্স খুলিয়া যে কয়টি টাকা ছিল সঙ্গে লইয়া থানার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

৩

নিরাপদ, অবনী ও পরেশ যখন থানা হইতে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা চারটা বাজিয়া গিয়াছে। সারা দিন অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় অবনীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছে। নিরাপদ ও পরেশ হইয়াছে গম্ভীর ও বিষণ্ণ। কাকে সারা ঘরময় ভাত ডাল ছিটাইয়া একাকার করিয়া রাখিয়াছে। আবার এখন সব বাসন-কোসন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া তবে পাকের জোগাড় করিতে হইবে।

অবনীর আজ আর উৎসাহ নাই। এই কাজটিতে কোন দিনই তাহার আলস্য ছিল না, কিন্তু এই বিশ্রী ব্যাপারে তাহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে আর সহজে তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ ফিরিয়া পাইতে-ছিল না। অবনী একান্ত অসাড়ের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল। পরেশ হাত পা ধুইবার জন্য কলে গেল আর নিরাপদ গেল দোকানে কিছু খাবার আনিতে। বাবুদের সাড়া পাইয়া মণিয়ার মা ছুটিয়া আসিল। এতক্ষণে তাহার দেহে প্রাণ আসিল।

নিরাপদ দোকান হইতে খাবার আনিয়া তিন জনে ভাগ করিয়া কিছু জলযোগ করিল। এদিকে মণিয়ার মা বাসন-কোসন ধুইয়া সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার করিয়া উনানে আঁচ ধরাইয়া দিল।

তখন নিরাপদ গেল পাক করিতে। পরের দিন

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া পরেশ দেখিল—মণিয়ার মা বিষণ্ণ মুখে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই —আজ তিন দিন হইতে ওপাশের ঘরের পুরুষটি বাড়ী ফিরিতেছে না। এদিকে ঘরে চাল-ডাল কিছুই নাই এবং মেয়েটির হাতে টাকা-পয়সা কিছু না-থাকায় কাল সারাটা দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। রাত্রে মণিয়ার মাকে সে তাহার সহিত শুইবার জন্য ডাকিয়া লয়। কিন্তু এখন সমস্যা এই যে, গত রাত্র হইতে মেয়েটির জ্বর—বুকে পিঠে বেদনা। তাই বাবুরা যদি না দেখে তাহা হইলে সে বেচারীর উপায় হইবে কি?

কিন্তু গতকল্যের ব্যাপারে পরেশের মন বড় ভাল ছিল না—কোথাকার কে একটি মেয়ে—তাহার স্বভাব-চরিত্রই বা কেমন, কিছুই না জানিয়া কি দুর্ভোগই না তাহারা ভুগিল। তাই সে তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, "তার আমরা কি করব মণিয়ার মা—হাসপাতাল আছে যেতে বল।" কিন্তু কেমন করিয়া যে মেয়েটি একা একা হাসপাতাল যাইবে, কেমন করিয়া ভর্ত্তি হইবে পরেশ তাহার কিছুই চিন্তা করিল না।

এদিকে ঘরের ভিতরে অবনী ও নিরাপদ সবই শুনিতেছিল, অবনী বাহির হইয়া বলিল—তোর কি মাথা খারাপ হ'ল পরেশ? মেয়েছেলে কেমন ক'রে একা-একা হাসপাতালে যাবে? গাড়ীভাড়া দেবে কে? আর গেলেই যে হাসপাতালে নেবে তারই বা ঠিক কি? আহা বেচারী আজ দুই দিন উপবাসী। স্বামীটি কি চামার—আজ তিন দিন কোথায় কোন্ আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে নিরাপদ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আনা-কয়েক পয়সা মণিয়ার মার হাতে দিয়া বলিল—তুমি এই দিয়া কিছু ফল আর বার্লি আনিয়া মেয়েটির খাবার জোগাড় কর—তার পর ওষুধপত্রের ব্যবস্থা আমরা করছি। মণিয়ার মা হাত পাতিয়া পয়সা লইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

অবনী নিরাপদর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—সাধে কি তোকে আমরা এই সংসারে কর্ত্তা ব'লে মানি, এমনি সব দিক বিবেচনা ক'রে চলিস্ ব'লেই না?

নিরাপদ হাসিয়া বলিল, "নে এখন পাগলামী রাখ!" তার পর পরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল—"পরেশ তোর সেই ডাক্তার বন্ধুটির কাছে এবার একবার যা—তাকে এনে মেয়েটিকে দেখা। বিনা ভিজিটে হবে না?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হইবে।

অবনী গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—দেখলি পরেশ, নিরাপদর সব দিকে সব সময় কেমন নজর থাকে?

পরেশ হাত মুখ ধুইয়া ডাক্তার-বন্ধুর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল, নিরাপদ গেল ছাত্র পড়াইতে। ঘণ্টাখানেক পরে পরেশ ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মণিয়ার মাকে ডাকিয়া ডাক্তারকে রোগী দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া নিজে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মিনিট পনর পরে ডাক্তার যখন রোগী দেখিয়া বাহিরে আসিল, তখন তাহাকে একটু চিন্তিত দেখা গেল।

পরেশ কাছে আসিয়া বলিল—কি, কেমন দেখলেন?

ডাক্তার বলিলেন—বড় সুবিধের নয়। নিউমোনিয়া, লেফ্ট সাইডে ত সেট্ করেছেই, রাইট-সাইডেও সেট্ করবে ব'লে মনে হচ্ছে। বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, দুই-তিন দিন "ওয়াচ" না করলে কত দূর গড়াবে কিছুই বলা যায় না।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা পরেশদের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। খাটে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া পরেশের হাতে দিয়া বলিল, "রোজ দিনে রাতে পাঁচ বারের ওষুধ রইল, আর একটা ইন্‌জেকসনের ওষুধ, সেটাও ঐ সঙ্গে এনে রেখ, আমি ওবেলায় এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে যাব, একটা ক'রে বোধ হয় রোজই দিতে হবে।" পরে আরও কিছু কিছু উপদেশ দিয়া ডাক্তার বিদায় লইল, ঔষধপত্র আনিয়া সকল ব্যবস্থা করিতে পরেশের বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্যের জীবন ও মৃত্যু

শ্রীসুশোভন দত্ত

আকাশে যে অসংখ্য তারা দেখতে পাই তাদের প্রত্যেকে ছোটবড় এক একটি সূর্য্য। এই অসংখ্য সূর্য্য থেকে নিরন্তর আলো ও তাপ বেরিয়ে অনন্ত শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কতকাল এ ব্যাপার চলে আস্‌ছে! এর কি কোন আদি-অন্ত নেই? এ অফুরন্ত তেজের* (Energy) উৎস কোথায়?

আলো ও তাপ বেরিয়ে আসা বন্ধ হলেই তারার মৃত্যু। আমাদের সূর্য্য থেকে কোনও দিন আলো ও তাপ বেরিয়ে আসা বন্ধ হ'লে সেদিন তারও মৃত্যু হবে। নিরালোক পৃথিবীর বুকে সেদিন সব জীবনীশক্তি অচল হয়ে যাবে। এ বিপদের আশঙ্কা আছে কি না—কবে তা ঘটতে পারে—এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে সূর্য্যের জীবনীশক্তির উৎসের সন্ধান ও মাপ নেওয়া দরকার। প্রতি মুহূর্ত্তে সূর্য্যের কতটা আলো ও তাপ পৃথিবীতে এসে পড়ে সহজেই তার পরিমাপ করা যায়। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্তের মধ্যে প্রতি দিন ছোট একটা বাড়ীর উঠানে সূর্য্যের যে আলো ও তাপ এসে পড়ে, কয়লা জ্বালিয়ে তা উৎপাদন করতে হ'লেও বেশ কিছু টাকার কয়লা জ্বালান দরকার। সমস্ত পৃথিবীতে কি পরিমাণ আলো ও তাপ সূর্য্য থেকে আসে এর থেকেই তার একটা আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যের আলো ও তাপের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পড়ে—বাকী সবটাই অনন্ত শূন্যে ছড়িয়ে যায়। সূর্য্যে কি প্রচণ্ড তেজের উৎসই না আছে!

কোনও জিনিস জ্বালিয়ে তাপ উৎপাদন করা যায়—এ হ'ল আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় কতকগুলি রাসায়নিক সংযোগের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সূর্য্য থেকে নিয়ত যে-পরিমাণ তাপ বেরিয়ে আসে, কোনও সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ততটা তাপ পাওয়া যেতে পারে না। সূর্য্যের আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত যে-পরিমাণ তাপ সূর্য্য থেকে বেরিয়েছে, কয়লা জ্বালিয়ে তা উৎপাদন করতে হ'লে সূর্য্যের ওজনের কয়েক লক্ষ কয়লার সূর্য্য জ্বালান দরকার। তা ছাড়া সূর্য্যে কোনও জিনিসের জ্বলে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়লা জ্বললে কার্ব্বন ও অক্সিজেন সংযোগে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। অন্যান্য জিনিস জ্বললেও এ রকমের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। কিন্তু সূর্য্যের তাপমাত্রা খুব বেশী হওয়াতে সেখানে এ রকমের রাসায়নিক সংযোগ ঘটা সম্ভব নয়। কথাটা একটু হেঁয়ালির মত শোনায়, কিন্তু বাস্তবিক বেশী উত্তাপের জন্যই সূর্য্যে কোনও জিনিস জ্বলে যাওয়া সম্ভব নয়। সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হচ্ছে প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি। সূর্য্যের ভিতরে তাপমাত্রা অনেক বেশী—ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় দুই কোটী ডিগ্রি। উত্তাপে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, কিন্তু খুব বেশী উত্তাপে সব যৌগিক পদার্থই বিযুক্ত হয়ে কতকগুলি মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। সূর্য্যের যা তাপমাত্রা তাতে শেষোক্ত ব্যাপার ঘটাই সম্ভব। কার্ব্বন ও অক্সিজেন সংযোগে সেখানে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি কখনও হয় না—কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড নিলে তাই তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত হয়ে কার্ব্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হবে। বাস্তবিক সূর্য্যের গঠনোপাদান বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্রধানতঃ কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। কোনও যৌগিক পদার্থের ক্ষণিক অস্তিত্বও সেখানে সম্ভব নয়। তা হ'লে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সূর্য্যের তাপসৃষ্টির প্রশ্নই উঠতে পারে না। সূর্য্যের দেহের সংকোচনের ফলে সূর্য্যের তাপসৃষ্টি হচ্ছে এ ব্যাখ্যা কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু উত্তাপ এ ভাবে সৃষ্টি হ'তে পারে বটে, কিন্তু সূর্য্য থেকে যে-পরিমাণ তাপ বেরিয়ে আসে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। অনেক জল্পনা-কল্পনা ক'রেও কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যের আলো ও তাপের উৎপত্তির কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

পরমাণুর (atom) আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে গত বিশ বছরের গবেষণার ফলে পরমাণু-কোষের (nucleus) মধ্যে এক বিরাট্ তেজের উৎসের সন্ধান মিলেছে। আঘাত-সংঘাতে পরমাণু-কোষ ভেঙে-চুরে গেলে অনেক সময় এ লুকান তেজের কিছু অংশ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। বিশাল সূর্য্য থেকে অনুক্ষণ আলোর ও তাপের রূপ নিয়ে যে অজস্র

* আলো ও তাপ তেজেরই রূপান্তর মাত্র।

তেজ বেরিয়ে আসছে, তার উৎসের সন্ধান মিলেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কতকগুলি পরমাণু-কোষের পরস্পরের আঘাত-সংঘাত এবং ভাঙা-চোরার মধ্যে।

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক্। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ভাঙা-চোরার ফলে পরমাণু-গঠনের কয়েকটি মূল উপাদানের সঙ্গে আমাদের ক্রমে ক্রমে পরিচয় হয়েছে। ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর। এরা হচ্ছে ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎকণা—ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের প্রায় দু-হাজার ভাগের এক

লর্ড রাদারফোর্ড

ভাগ। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন নিয়ে লর্ড রাদারফোর্ড প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে গবেষণা আরম্ভ করেন। সে সময়ে প্রোটনের সন্ধান মিলে। প্রোটনের ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। এরা ইলেক্‌ট্রনের সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীতধর্ম্মী (positive) বিদ্যুৎবাহী। দশ বছর আগেও আমাদের ধারণা ছিল, পরমাণু-গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন—বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু-কোষে বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন সমাবেশ হয় এবং কোষের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন কক্ষে কতগুলি ইলেক্‌ট্রন ঘুরতে থাকে। গত কয় বছরের মধ্যে পরমাণু-গঠনের আরও কয়েকটি মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরমাণু-কোষ সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অনেক বদলেছে। ছ-সাত বছর আগে পজিট্রনের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায়—এরা হচ্ছে ইলেক্‌ট্রনের বিপরীতধর্ম্মী (positive) বিদ্যুৎকণা—ওজন ইলেক্‌ট্রনেরই সমান। পরে আবার এক শ্রেণীর ভারী ইলেক্‌ট্রনের (heavy electron বা meson) সন্ধান মিলেছে। এদের ওজন সাধারণ ইলেক্‌ট্রনের দেড়-শ দু-শ গুণ—কিন্তু এরা ইলেক্‌ট্রনের সমপরিমাণ বিদ্যুৎবাহী। পরমাণু-গঠনের আরও এক মূল উপাদানের সন্ধান মিলেছে ক-বছর আগে—সে হচ্ছে নিউট্রন। নিউট্রনের ওজন প্রোটনেরই প্রায় সমান, তবে নিউট্রনে পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ কোনও রকম বিদ্যুৎ থাকে না। একটি ইলেক্‌ট্রন ও একটি প্রোটন সংযোগে একটি নিউট্রন, এবং একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রন সংযোগে একটি প্রোটন পাওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিকদের বর্ত্তমান মত হচ্ছে সব পদার্থের পরমাণু-কোষ গঠনের মূল উপাদান কতগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর-কোষ হচ্ছে সাধারণ একটি প্রোটন—হিলিয়াম কোষে আছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সমষ্টি—এলুমিনিয়াম কোষে আছে ১৩টি প্রোটন ও ১৪টি নিউট্রন। আরও ভারী পদার্থের পরমাণু-কোষে আরও বেশী সংখ্যায় প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ভর করে তার পরমাণুর বাইরের কক্ষে কটি ইলেক্‌ট্রন আছে কিংবা তার কোষে কটি প্রোটন আছে তার উপর (এ দুয়ের সংখ্যা সমান, কারণ সাধারণ অবস্থায় কোনও পরমাণুতে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ বিদ্যুতের আধিক্য থাকে না) কিন্তু আণবিক ওজন নির্ভর করে কোষে কতগুলি নিউট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি আছে তার উপর। মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কোষে নিউট্রনের সংখ্যা ঠিক সমান থাকে না—ফলে তাদের আণবিক ওজনেও কিছু তফাৎ ধরা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন ওজনের এই পরমাণু-গুলির রাসায়নিক প্রকৃতিতে কোনও তারতম্য দেখা যায় না। এদের বলা হয় আইসোটোপ (isotope)। প্রত্যেক অক্সিজেন-কোষে ৮টি প্রোটন থাকে—নিউট্রনের সংখ্যা কোনটিতে ৮, কোনটিতে ৯, কোনটিতে ১০ পর্য্যন্ত হ'তে দেখা যায়। অবশ্য খুব বেশীর ভাগ অক্সিজেন পরমাণু কোষে ৮টি নিউট্রন থাকে—৯ কিংবা ১০টি পাওয়া যায় কদাচিৎ। ফলে ১৬, ১৭ ও ১৮ এই তিন আণবিক

ওজনের অক্সিজেন আইসোটোপ পাওয়া যায়, কিন্তু এদের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ এক রকমের। অনেক মৌলিক পদার্থের বেলাতেই এ ব্যাপার ঘটে। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বে ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান মিলেছে, কিন্তু প্রায় ৩০০ রকম আইসোটোপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এর মধ্যে অনেক আইসোটোপই ক্ষণস্থায়ী। তাদের পরমাণু থেকে স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থের মত তেজ বিকীরণ হয় ও আপনা থেকেই তারা অন্য কোনও স্থায়ী পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। পরমাণু-কোষের নিউট্রন ও প্রোটনগুলি দৃঢ়বলে পরস্পরকে ধ'রে রাখে। কোন পরমাণু-কোষে কয়টি নিউট্রন-প্রোটন আছে জানা থাকলে সে নিউট্রন ও প্রোটন সমষ্টির ওজন কত হওয়া উচিত খুব সহজেই হিসাব ক'রে বলা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। কতকগুলি নিউট্রন ও প্রোটন একত্র হয়ে একটি পরমাণু-কোষ গঠিত হ'লে সেটির ওজন সেই নিউট্রন ও প্রোটন সমষ্টির ওজনের চেয়ে সামান্য কম হয়। দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন সংযোগে হিলিয়াম-কোষের সৃষ্টি হয়। রেডিয়াম প্রভৃতি স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থ থেকে যে আলফা-কণা নির্গত হয় তা হচ্ছে সাধারণ হিলিয়াম-কোষ। সোজা গণনায় যা হওয়া উচিত, হিলিয়াম-কোষের ওজন তার চেয়ে শতকরা এক ভাগ কম। বিজ্ঞান—জড়ের

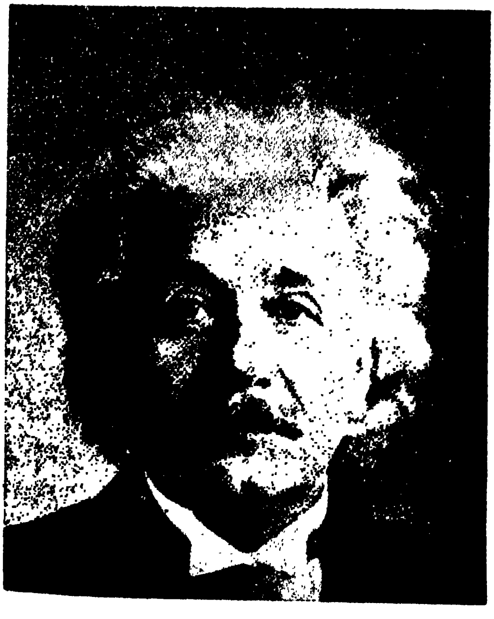

অধ্যাপক আইনষ্টাইন

(matter) বিনাশ স্বীকার করে না। নিউট্রন-প্রোটন সংযোগে কোষ গঠনের সময় এই যে সামান্য জড়ের বিলোপ হ'ল তা তেজের আকারে রূপান্তরিত হয়। অধ্যাপক আইনস্টাইন জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তর সম্ভব, এ মত প্রথম প্রচার করেন। কি পরিমাণ জড়ের বিলোপে কতটা তেজ সৃষ্টি হয় তাও তিনি গণনা ক'রে দেখিয়েছেন। দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন সংযোগে একটি হিলিয়াম-কোষ বা আলফা-কণা সৃষ্টি করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি তেজ সৃষ্টি হবে। সূর্য্যের ভিতরে এ রকমের সৃজনক্রিয়া অনবরত চলছে, তারই ফলে পাওয়া যায় এক অফুরন্ত তেজের উৎস।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড প্রথম স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থ থেকে নির্গত আলফা-কণার আঘাতে নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙেন। পরে আরও কোন কোন পদার্থের পরমাণু তিনি ভাঙতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর আগে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেন্স (Lawrence) সাইক্লোট্রন (cyclotron) নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু ভাঙাচোরার কাজ অনেক সোজা হয়ে এসেছে। বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক গবেষণাগারে এ যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু ভাঙাচোরা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা চলেছে। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজেও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ করেছেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন-কোষ বা প্রোটনকে প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়ে বন্দুকের গুলির মত বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায়। এ আঘাতের ফলে পরমাণু-কোষ ভেঙেচুরে তাদের রূপান্তর ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরমাণু-কোষের অন্তর্নিহিত তেজের কিছু অংশ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে না হয় সাইক্লোট্রনের সাহায্যে খুব দ্রুত গতিবেগশীল প্রোটন পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে আঘাত ক'রে পরমাণু-কোষের রূপান্তর ঘটিয়ে নূতন কোষ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সূর্য্যের ভিতরে আপনা থেকেই অনুক্ষণ এ রকম ভাঙাচোরা ও রূপান্তর-প্রক্রিয়া ঘটে কেন ও কি ক'রে?

উত্তাপের জন্য সূর্য্যে কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না—সবাই বাষ্পীয় রূপ ধারণ করে। বাষ্পীয় অবস্থায় পরমাণুগুলি খুব দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায়—প্রতি মুহূর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বার সংঘর্ষ ঘটে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর

গতিবেগ বাড়ে—পরস্পর সংঘর্ষও বেশী হয়। সাধারণ অবস্থায় এ রকম সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর বিশেষ কোনও রকম বিকৃতি বা রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু সূর্য্যের ভিতরে অবস্থাটা অসাধারণ এবং সেখানে একটু অদ্ভুত রকমের ব্যাপার ঘটে। সূর্য্যের একেবারে ভিতরে তাপমাত্রা হ'ল প্রায় ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটী) ডিগ্রি। এত বেশী তাপমাত্রায় কোন পরমাণুর স্বাভাবিক রূপ থাকে না। তাপমাত্রা খুব বেশী বাড়লে পরমাণুর বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায়, এ মত (Saha's ionisation theory) অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা

প্রায় বিশ বছর আগে প্রথম প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে সূর্য্যের ভিতরের তাপমাত্রা পৌঁছাবার অনেক আগেই পরমাণু-কোষগুলি সম্পূর্ণরূপে ইলেক্‌ট্রনের খোলস মুক্ত হয়। সূর্য্যের ভিতরে তাহলে থাকে কতকগুলি ইতস্ততঃ ধাবমান পরমাণু-কোষ এবং কতগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন। প্রচণ্ড উত্তাপহেতু পরমাণু-কোষগুলির নিয়ত সংঘর্ষের (thermo-nuclear collisions) ফলে কোষগুলির রূপান্তর ঘটে এবং তাদের অন্তর্নিহিত তেজের কিছু অংশ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই হ'ল সূর্য্যের তেজের উৎস। কিন্তু হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম খুব উত্তপ্ত অবস্থায় (কয়েক লক্ষ ডিগ্রিতে) রাখলে তাদের কোষগুলির সংঘর্ষের ফলে ক্রমে ক্রমে তারা হিলিয়াম-কোষে রূপান্তরিত হবে। এ রূপান্তরের ফলে কিছু আণবিক তেজ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তা থেকে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি হবে। তাপের ফলে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কোষগুলির সংঘর্ষ আরও দ্রুত হবে এবং হিলিয়াম-কোষে রূপান্তরও দ্রুততর হবে। একবার বাইরের তাপ দিয়ে সুরু ক'রে দিলে রূপান্তর-প্রক্রিয়া আপনিই চলতে থাকে—আর বাইরে থেকে উত্তাপের যোগান দিতে হয় না। আদিতে সূর্য্য মহাশূন্যে বিরাট্ বাষ্পীয় পদার্থের সমষ্টিরূপে জীবন সুরু করেছিল। শৈশবাবস্থায় স্বীয় দেহের সংকোচনের ফলে সূর্য্যের তাপের সৃষ্টি হ'ত। তাপমাত্রা যথেষ্ট বাড়ার পরে পরমাণুগুলি বাইরের ইলেকট্রনের খোলসমুক্ত হ'ল, পরস্পর দ্রুত সংঘর্ষে তাদের রূপান্তরও সুরু হ'ল। রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আণবিক তেজ বেরিয়ে আসা আরম্ভ হ'ল। ফলে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হ'তে লাগল এবং সূর্য্যের দেহের সংকোচনও বন্ধ হয়ে গেল। এই হ'ল সূর্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা—একে বলা যায় সূর্য্যের যৌবন।

কিন্তু সূর্য্যের এ যৌবন কি অনন্ত? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কোন কোন পরমাণু-কোষের সংঘর্ষ ও রূপান্তরের ফলে সূর্য্যের যে তেজ সৃষ্টি হচ্ছে তা তলিয়ে দেখা দরকার। সূর্য্যের ভিতরে অবিরাম হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি চলছে—তার ফলে সূর্য্যের তেজবিকীরণ সম্ভব। চারটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রনের (যা দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটনের সমান) সংযোগে একটি হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতগুলি বিভিন্ন কণার একত্র সম্মিলন ও সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই হয়। সূর্য্যের হিলিয়াম-কোষ-সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বেশ একটু দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেটের (Bethe) গবেষণার ফলে সূর্য্যে কি ভাবে অবিরাম হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয় তা মোটামুটি জানা গেছে। কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন

কোষের সংঘর্ষে এ প্রক্রিয়ার সুরু—পর পর আরও অনেক-গুলি সংঘর্ষ এবং ভাঙাচোরার পরে চারটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন সংযোগে একটি হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয় এবং কার্ব্বন-কোষ অক্ষতদেহে ফিরে আসে।

হাইড্রোজেন-কোষের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পরমাণু-কোষের ক্রমিক রূপান্তর ঘ'টে কি ক'রে হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয়, পাশের চিত্র থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১২ ওজনের কার্ব্বনের* সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন-কোষ বা প্রোটনের সংঘর্ষের ফলে ১৩ ওজনের স্বতঃবিকীরণকারী নাইট্রোজেন সৃষ্টি হয়। এই নাইট্রোজেন থেকে আপনিই বেরিয়ে আসে কিছু তেজ ও একটি পজিট্রন, ফলে পাওয়া যায়—১৩ ওজনের কার্ব্বন। এর সঙ্গে আর একটি প্রোটনের সংঘর্ষ ও সংযোগের ফলে কিছু তেজ সৃষ্টি হয় এবং একটি ১৪ ওজনের নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। আবার একটি প্রোটনের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সংযোগের ফলে পাওয়া যায়—১৫ ওজনের স্বতঃবিকীরণকারী অক্সিজেন—তা থেকে বেরিয়ে আসে কিছু তেজ ও একটি পজিট্রন এবং ফলে থাকে একটি ১৫ ওজনের নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেনের সঙ্গে আবার একটি প্রোটনের সংঘর্ষ ও সংযোগের ফলে সৃষ্টি হয় কিছু তেজ এবং একটি ১২ ওজনের কার্ব্বন এবং একটি ৪ ওজনের হিলিয়াম। এই সমস্ত প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন ধাপে ৪টি প্রোটন সংযোগ করা হয়েছে এবং ২টি পজিট্রন বিযুক্ত হয়ে গেছে। কোন পরমাণু-কোষ থেকে একটি পজিট্রন বিযুক্ত করা ও সেই পরমাণু-কোষে একটি ইলেকট্রন সংযোগ করার ফল একই, কারণ ইলেকট্রন ও পজিট্রন সমপরিমাণ বিদ্যুৎবাহী কিন্তু বিপরীতধর্ম্মী বিদ্যুৎকণা। তা হ'লে বলা যেতে পারে, উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেকট্রন সংযোগে একটি হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে তাপসৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে কার্ব্বন—সূর্য্যেও তাপসৃষ্টির মূলে পরোক্ষভাবে কার্ব্বনের সহায়তা দরকার। সূর্য্যের গঠনোপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার শতকরা এক ভাগ কার্ব্বন। সূর্য্যের যা তাপমাত্রা, তাতে এ পরিমাণ কার্ব্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন-কোষের সংঘর্ষের ফলে উপরিউক্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় কতটা আণবিক তেজ বেরিয়ে আসবে তা গণনা ক'রে বলা যায়। অধ্যাপক বেটে

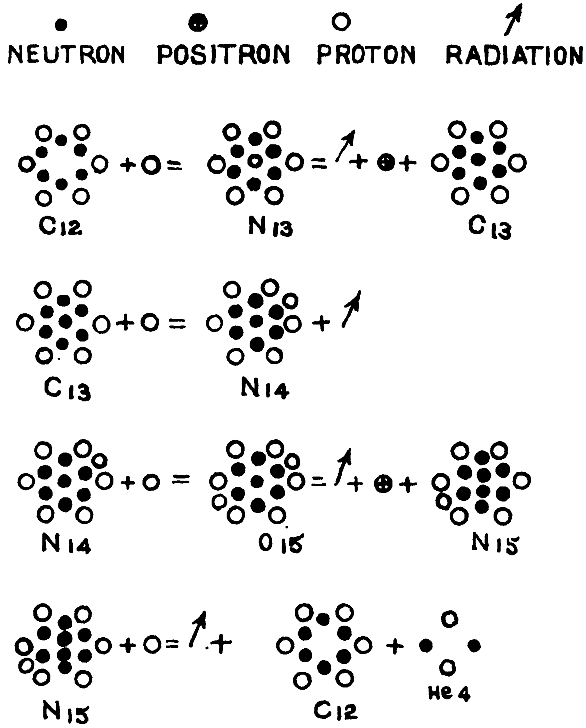

কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন কোষের সংঘর্ষের ফলে কোষের বিভিন্ন রূপান্তর। সর্ব্বশেষে কার্ব্বন-কোষ অক্ষতদেহে ফিরে আসে ও নূতন হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি হয়।

গণনা ক'রে দেখিয়েছেন এ প্রক্রিয়ায় যে আণবিক তেজ মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসবে তা থেকে সূর্য্যের সমস্ত আলো ও তাপ পাওয়া যেতে পারে। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'তে কিন্তু লাগে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর। সংঘর্ষের ফলে আজ যেসব কার্ব্বন-কোষের রূপান্তর সুরু হ'ল, বারে বারে রূপ পরিবর্ত্তন ক'রে তারা আবার তাদের পূর্ব্বের রূপ ফিরে পাবে এবং অক্ষত দেহে দেখা দেবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পরে। সমস্ত কার্ব্বন অক্ষত দেহে ফিরে আসে ব'লে সূর্য্যে কার্ব্বনের কমতি কোন দিন ঘটবে না। কিন্তু ক্রমে হাইড্রোজেন-কোষের কমতি ঘটতে থাকবে। তাতে আশঙ্কা হয় সূর্য্যের তেজ-বিকীরণের ক্ষমতাও কমে যেতে থাকবে। অধ্যাপক গ্যামো (Gamow) আশ্বাস দিয়েছেন বর্ত্তমানে এ আশঙ্কার কারণ নেই। উল্টে বরং বলেছেন হাইড্রোজেন কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের আলো ও তাপ এখনকার চাইতে বেশ কিছু বেড়ে যাবে। ব্যাপারটা তিনি এ ভাবে বুঝিয়েছেন।—সূর্য্যে হিলিয়াম-কোষ সৃষ্টি কত দ্রুত হবে তা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর—

* এক্ষেত্রে কার্ব্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বলতে তাদের পরমাণু-কোষ বুঝান হয়েছে। ১২, ১৩ প্রভৃতি সংখ্যা আণবিক ওজন নির্দ্দেশ করছে।

প্রথমতঃ কতগুলি বিভিন্ন কোষ সেখানে আছে এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে তাপমাত্রা কত। কোষের সংখ্যা বা তাপমাত্রা যে-কোনটা বাড়লেই হিলিয়াম-কোষে রূপান্তর দ্রুততর হ'তে থাকে। হাইড্রোজেন-কোষ কমে হিলিয়াম-কোষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হবে। আলো ও তাপ বইবার ক্ষমতা সব জিনিসের সমান নয়—হিলিয়াম এ বিষয়ে হাইড্রোজেনের চাইতে নিকৃষ্ট। হিলিয়ামবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের ভিতরের তাপ হিলিয়াম-স্তর ভেদ ক'রে আগের মত সহজে বেরিয়ে আসতে বা সূর্য্য থেকে ছড়িয়ে যেতে পারবে না। ফলে সূর্য্যের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং হিলিয়াম-কোষসৃষ্টিও দ্রুততর হ'তে থাকবে।

ফলে তাপসৃষ্টি আরও বেশী হবে। অধ্যাপক গ্যামোর গণনায় সূর্য্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়ার আগে সূর্য্যের তেজ বিকীরণের ক্ষমতা এখনকার চাইতে প্রায় শতগুণ বেড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কিছু ব্যাসবৃদ্ধিও হবে। তার পর অবশ্য সংকোচন আরম্ভ হবে।

সূর্য্যের আলো ও তাপ শতগুণ বেড়ে গেলে পৃথিবীর উপরের তাপমাত্রাও অনেক বেড়ে যাবে। অবস্থাটা কল্পনা করা ভয়াবহ। সাগর মহাসাগর শুকিয়ে যাবে— চার দিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর ধূ-ধূ করবে। কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে কি না বলা কঠিন। তবে গত কয়েক লক্ষ বছরে সূর্য্যে হাইড্রোজেন কমেছে মাত্র শতকরা এক ভাগ এবং তার ফলে পৃথিবীর উপরের তাপমাত্রা বেড়েছে মাত্র দু-চার ডিগ্রি। সুতরাং আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর উপরের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতে বিবর্ত্তনের ফলে আরও তাপসহ প্রাণীর উদ্ভব হওয়া সম্ভব। তবে বর্ত্তমান যুগের মানুষ কেন, প্রাণী-জগতের উচ্চ স্তরের কোনও জীবই সে অবস্থা পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না।

সূর্য্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হ'লে অবশ্য তার তেজের উৎসও ফুরিয়ে যাবে। তখন ধীরে ধীরে সূর্য্যের সংকোচন আরম্ভ হবে। পরে উজ্জ্বলতা কমে আসবে - ক্রমে সূর্য্য মৃত্যুপথে অগ্রসর হবে। মৃত্যুর পরে সূর্য্যের শেষ অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে? মনে আসে চাঁদের কথা—অবশ্য তার চেয়েও অনেক বিশাল—তাপলেশহীন গোলাকৃতি এক প্রস্তরখণ্ড। সূর্য্য পৃথিবী বা চাঁদের মত শীতল হয়ে গেলেও তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্য রকমের হবে। সব বস্তুপিণ্ডেরই একটা আভ্যন্তরীণ চাপ আছে। এই চাপের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুপিণ্ডের আয়তনের উপর। পৃথিবীর ভিতরের পদার্থের উপর যে আভ্যন্তরীণ চাপ পড়ে তা ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের বহু লক্ষ গুণ বেশী—ঠিক মাঝখানে চাপ পড়ে প্রায় দুই কোটী গুণ বেশী। আরও বড় বড় গ্রহে এ চাপের মাত্রা আরও বেশী। সূর্য্যের ভিতরে ঠিক মাঝখানে কয়েক-শ কোটী গুণ বেশী চাপ পড়ে। যে-কোন পদার্থের উপর এই পরিমাণ চাপ পড়লে তাদের পরমাণুর বাইরের ইলেক্‌ট্রনের খোলসগুলি ভেঙেচুরে যায়। সাধারণ অবস্থায় একটি কোষের চার দিকে ঘূর্ণায়মান কটি ইলেক্‌ট্রন নিয়ে এক-একটি পরমাণু থাকে, কিন্তু এত বেশী চাপ পড়লে পরমাণুর সাধারণ সে রূপ আর থাকে না—থাকে ইলেক্‌ট্রন-খোলসমুক্ত কতকগুলি পরমাণু-কোষ এবং ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন। সূর্য্য পৃথিবী বা চাঁদের মত শীতল হয়ে গেলেও অত্যধিক আভ্যন্তরীণ চাপের জন্য সূর্য্যের ভিতরের পদার্থের অবস্থা দাঁড়াবে এ রকম। তাপমাত্রা খুব বাড়লে যেমন পরমাণুর বাইরের খোলসের ইলেক্‌ট্রনগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পরমাণু-কোষ ইলেক্‌ট্রন-খোলসমুক্ত হয়ে পড়ে তেমনি খুব বেশী চাপ পড়লেও পরমাণুর বাইরের ইলেক্‌ট্রনের খোলস ভেঙেচুরে পরমাণুকোষ ইলেক্‌ট্রন-খোলসমুক্ত হয়ে পড়ে। কত চাপে পরমাণুর এ বিকৃতি ঘটতে পারে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডি. এস্. কোঠারী প্রথম তা গণনা ক'রে বের করেন। চাপের মাত্রা পৃথিবীর উপরে বায়ুর চাপের ১৫ কোটী গুণ বেশী হ'লে সাধারণ পদার্থের পরমাণুর এ রকম বিকৃতি সুরু হবে। আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ জুপিটারের ভিতরে চাপের মাত্রা এর কাছাকাছি। শীতল অবস্থায় জুপিটারের চাইতে বড় যে-কোন গ্রহ, সূর্য্য বা তারার ভিতরে আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে পদার্থের পরমাণুর এ রকম বিকৃতি ঘটবে। তাদের আয়তনও অনেক ছোট হয়ে যাবে, কারণ ইলেক্‌ট্রন-খোলসহীন পরমাণু-কোষ সাধারণ পরমাণুর তুলনায় আকারে বহু গুণে ছোট। শীতল অবস্থায় জুপিটারের চাইতে বড় বস্তুপিণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকা সম্ভব নয়। মৃত্যুর পরে সূর্য্যের আকারও জুপিটারের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে যাবে। হয়ত আমাদের পৃথিবীর আকারের কাছাকাছি দাঁড়াবে।

সূর্য্যের এ স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে এখনও অনেক দেরি। কয়েক কোটী বৎসরের ব্যবধানে সূর্য্যের আয়ুর কমতি কিছু ধরা পড়বে। কিন্তু এ স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়া আর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই কি?

আকাশের এক কোণে হঠাৎ একটা তারার উজ্জ্বলতা খুব বেড়ে গেল—এ রকম ব্যাপার মধ্যে মধ্যে বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ে। এদের বলা হয় নোভা (nova)। কখনও কখনও কোন তারার উজ্জ্বলতা কয়েক লক্ষ গুণ বেড়ে যায়—কখনও কোটী গুণ পর্য্যন্ত বাড়তে দেখা যায়। আবার অল্প দিনের মধ্যে উজ্জ্বলতা কমে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কি আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে এ ব্যাপার ঘটে তা আজও ঠিক জানা যায় নি। এক-একটি নোভার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়। সূর্য্যেরও হঠাৎ এক দিন এ রকম আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটবে না, এ কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। তা যদি ঘটে, তা হ'লে কি হ'ল বুঝতে পারার অবকাশ আর আমরা পাব না।

প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী ও সৌরজগতের আর সব গ্রহ-উপগ্রহ নিমেষমধ্যে সূক্ষ্ম বাষ্পে পরিণত হবে। সেদিন দূরদূরান্তরে মহাশূন্যে আর এক সৌরজগতের এক গ্রহে কোন বৈজ্ঞানিকের দূরবীণে হয়ত দূরাকাশে আর একটি নূতন নোভার সন্ধান মিলবে। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টি থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার শুধু এইটুকু মাত্র চিহ্ন রইবে।

বাঙালী ব্যাঙ্ক ও আর্থিক পরিকল্পনা

শ্রীশক্তিব্রত সিংহরায়, এম্-এসসি

বাংলা দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বাংলা, ইংরেজী খবরের কাগজে নূতন ব্যাঙ্ক কিংবা পুরনো ব্যাঙ্কের নূতন শাখা উদ্বোধনের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। দেশী দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে যাহা আয় হয় তাহার বেশ একটা মোটা অংশ যে বাংলার ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি জোগাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুই-চারিটি ব্যাঙ্কের আশাতীত সাফল্যে রুদ্ধ দ্বার যেন খুলিয়া গিয়াছে আর বাঙালী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে। ছোট ছোট মহকুমা শহর, লোকসংখ্যা পাঁচ-সাত হাজার, তাও নিতান্ত গরীব, এরূপ জায়গায়ও পাঁচ-সাতটি ব্যাঙ্ক দেখা যায়।

বর্ত্তমান জগতে শিল্প-বাণিজ্যের মূলে থাকে সুগঠিত ব্যাঙ্কিং। ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। সুতরাং বাংলা দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসার দ্রুত প্রসার দেখিলে মনে হয় যে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যেও বুঝিবা জোয়ার আসিয়াছে বা আসিতেছে। মৃতপ্রায় জাতির পক্ষে এই কল্পনা স্বভাবতই আনন্দদায়ক। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই প্রসার কতটা ভিত্তি-হীন এবং অচিরেই ব্যাঙ্কিং বিপর্য্যয় ঘটা খুব বিচিত্র নহে। ছোট ব্যাঙ্কের ছোট ছোট শাখা অফিসগুলির আয়-ব্যয়ের দিকে তাকাইলে ইহা আর একটু ভাল বুঝা যাইবে। এরূপ অফিসের আয়-ব্যয় মোটামুটি এই কয় ভাবে হইতে পারে।

আয়—লগ্নি টাকার উপর সুদ, চেক্ ভাঙাইবার ও ড্রাফ্‌ট বিক্রির কমিশন, বিল আদায়ের কমিশন ইত্যাদি;

ব্যয়—আমানত টাকার উপর সুদ, কর্ম্মচারীদের বেতন, স্টেশনারি, ডাকখরচা, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি।

লগ্নি দিবার সময় প্রথমেই দেখিতে হয় যে, যখনই ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইবে অতি অল্প সময়ে এবং অতি অল্প আয়াসে টাকাটা আদায় হয়। এই কারণেই ব্যাঙ্কের লগ্নি দিবার ক্ষেত্র নিতান্তই সংকীর্ণ। ছোট ব্যাঙ্কগুলি আমানত টাকার উপর যে হারে সুদ দেয় তাহারও কম সুদে বড় ব্যাঙ্কগুলি এরূপ ক্ষেত্রে লগ্নি দিতে প্রস্তুত। সুতরাং ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক সময় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লগ্নিই দিতে হয়। সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের তহবিলে আমানতের অন্ততঃ শতকরা চল্লিশ ভাগ নগদ ও গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটি ইত্যাদিতে থাকা উচিত। ছোট ব্যাঙ্কগুলির খরচা অনুযায়ী আমানত টাকা খুবই কম। উপরোক্ত ভাবে টাকা রাখিলে লোকসানের মাত্রা খুবই বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমানতের প্রায় সবটাই লগ্নি কারবারে খাটাইতে হয়।

কমিশন বাবদ আয়—যাহা বড় বড় ব্যাঙ্কের আয়ের একটি বিশিষ্ট অংশ, ছোট ব্যাঙ্কগুলি আয়ের দিকে তাহাকে কোন স্থান দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া এখন এরূপ অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এই আয় হইতে এই কারবারে ব্যবহৃত

স্টেশনারি ও ডাকখরচাই পোষানো দায়। অনেক স্থলে হয়ত ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন হিসাবেই এই কারবার চালান হয়। কারণ ব্যাঙ্কে লোকের আসা-যাওয়া হইতে জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে ব্যাঙ্ক বেশ চলিয়াছে।

ব্যয়ের দিকে আগেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমানত টাকার উপর অতি উচ্চ হারে স্থদ দেওয়া হয়। অফিস করিতে হইলেই একজন ম্যানেজার, একজন একাউনটেণ্ট, একজন কেশিয়ার, দু-একটি চাপরাশি রাখিতে হয়। বেতন ভিন্ন ব্যাঙ্কের সম্মান ইত্যাদি রাখিবার জন্য অনেক ছোট ছোট শহরেও ম্যানেজারকে মোটর দিতে দেখা যায়। অনেক নিতান্ত নগণ্য অফিসও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য টেলিফোন রাখে। স্টেশনারি খরচা নিতান্ত সামান্য নয়, কারণ কাগজপত্রের উপর ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা নির্ভর করে। স্থতরাং চেষ্টা চলে ব্যাঙ্কের নগণ্যতা যাহাতে ঢাকা যায় তার ড্রাফ্‌টের ও চেকের চেহারায়। আয়ের অনুপাতে বাড়ীভাড়া, ডাকখরচা ইত্যাদিও কম নয়।

বিজ্ঞাপন ব্যবসার মূল, স্থতরাং ব্যাঙ্কের অবস্থা যেরূপই হউক বড় বড় হরফে ইংরেজী, বাংলা সমস্ত দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেই হইবে। কোন কোন সময় দেখা যায়, আদায়ীকৃত মূলধন যাহাই হউক আর ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা থাকুক বা না-থাকুক, ব্যাঙ্কের জন্য স্থরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ব্যাঙ্কের স্থদৃঢ়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ দ্বিধা বোধ করেন না।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি কষ্টোপার্জ্জিত এবং অনেক স্থলেই অতি প্রয়োজনীয় স্থখ-স্থবিধা হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত ধন লইয়া এরূপ ব্যবসায়ের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইতে পারে ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই এই সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া নূতন ব্যাঙ্কিং আইনের খসড়া করিয়াছে। নূতন আইনের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক সমালোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা প্রসার লাভ করুক বা না-করুক আমানতকারীর টাকা লইয়া যাহাতে কোন রূপ বিপদজনক কারবার করা সম্ভব না হয় এবং ব্যাঙ্কিং আইনের হঠাৎ কোন আমূল পরিবর্ত্তনের দরুন বর্ত্তমান আমানতকারিগণ যাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে।

এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়িত্ব জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া আমানতকারীদের। দুই-একটি ব্যাঙ্কের আশাতীত সাফল্যে বাঙালী ব্যাঙ্কের উপর কিছু আস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ইহা সূচনা মাত্র। স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার আগে এখনও অনেক বড় রকমের কাটছাঁটের প্রয়োজন হইবে। জনসাধারণের বিশ্বাসের স্থবিধা লইয়া এ সময়ে অনেকেরই ব্যাঙ্ক-পরিচালক হইবার প্রয়াস পাওয়া স্বাভাবিক। উচ্চ হারে স্থদের লোভে অনেকেই এরূপ ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখেন এবং তজ্জন্যই এরূপ উদ্যোক্তাগণ নূতন ব্যাঙ্ক খুলিতে সাহস পান। অবশ্য নূতন ব্যাঙ্কিং আইন পাস হইলে এরূপ পথ আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে আশা করা যায়।

বাঙালী-পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান অতি অল্পই আছে। স্থতরাং যে দুই-একটি ব্যাঙ্ক একটু বেশী আমানত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাদের টাকা সন্তোষজনক ভাবে খাটাইতে না পারিবার সমস্যা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। পাটের কল, চায়ের বাগান, চিনির কল ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ব্যবসাই বিদেশীয়দের হাতে। বাঙালী-পরিচালিত চায়ের বাগান কিছু কিছু আছে বটে এবং ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, যে দুই-একটি ব্যাঙ্ক মাথা চাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া এই একমাত্র সম্বলের উপর নির্ভর করিয়াই। এখন অবশ্য কিছু কিছু কাপড়ের কল, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী ইত্যাদি হইয়া এই ব্যাঙ্কগুলিকে পুষ্ট করিতেছে, তবুও বোম্বাইয়ের দেশীয় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় এ সমস্ত ছেলেখেলা। বোম্বাইয়ের দেশীয় পরিচালিত এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের প্রত্যেকটির মূলধনের সঙ্গে বাঙালী-পরিচালিত বিভিন্ন যৌথ-প্রতিষ্ঠানের মূলধনসমষ্টির তুলনা চলে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিপুষ্ট। বাংলা দেশের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলি ইউরোপীয়ান পরিচালিত এবং ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কেরই পৃষ্ঠপোষক।

বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক যেরূপ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এগুলিকে পোষণ করিবার শিল্প-বাণিজ্য কোথায়। উচ্চ হারে টাকা আমানত লইয়া তদোধিক উচ্চ হারে নিরাপদ ভাবে কোথায় কি ভাবে টাকা খাটাইয়া ব্যাঙ্ক লাভবান হইবে বুঝা দুষ্কর। অনেকে হয়ত আশা করেন যে এই ব্যাঙ্কগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবে, স্থপরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান কখনও উচ্চ হারে টাকা ধার লইবে না। আর যে প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ হারে টাকা ধার লয় সেগুলির পক্ষে ব্যাঙ্কের স্থদ দিয়া বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন। তাহাদের অনেককেই শেষ

পর্য্যন্ত কারবার গুটাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। শতকরা কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিবে কি না-করিবে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভবিষ্যতের সংস্থান লইয়া এরূপ পরীক্ষা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এরূপ ব্যাঙ্কগুলি দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে আসিলে দেশের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই হইবে বেশী।

যে দুই-চারিটি ব্যাঙ্ক কিছু বেশী আমানত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সুপরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের অভাবে তাহাদের টাকা নিরাপদে খাটাইবার সমস্যার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই ব্যাঙ্কগুলির সমান তালে শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে না। উপযুক্ত ভাবে টাকা খাটাইতে না পারিয়া যেটুকু অপরিসর জায়গা আছে তাহাতেই অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা করিয়া নিজেদের অনিষ্টসাধন করিতেছে। সুপরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

বাংলা দেশের ইউরোপীয় যৌথ কারবারের দিকে লক্ষ্য করিলে একটা আশ্চর্য্য জিনিস চোখে পড়ে। যদিও কোটি কোটি টাকা চা, পাট, কয়লা ইত্যাদি ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং যদিও হাজার হাজার ইউরোপীয় নিযুক্ত রহিয়াছে, মাত্র কয়েকটি ইউরোপীয়ান ফার্ম্মের কয়েক জন লোক দ্বারা এই বিরাট্ শিল্পবাণিজ্যের-পরিচালনা হইতেছে। অর্থাৎ এ সমস্ত কারবারের উদ্যোক্তা এবং পরিচালকের সংখ্যা খুবই কম, প্রায় আঙুলে গোনা যায়। একই ফার্ম্ম, যথা—এনড্রু ইউল কোম্পানী, জেমস্ ফিন্‌লে কোম্পানী ইত্যাদি কোটি কোটি টাকার মূলধন পাট-কল, কয়লার খনি, চিনির কল, চা-বাগান ইত্যাদিতে পরিচালনা করে। বোম্বাইয়ের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকমণ্ডলীর উপর দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি লোকের নাম প্রায় সমস্ত কারবারের সঙ্গেই জড়িত। যে-কোন দেশের পক্ষেই বোধ হয় ইহা খাটে যে, বৃহৎ শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তার সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই হয়; সমাজতন্ত্রবাদী দেশেও বোধ হয় এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বাঙালী যৌথ কারবারের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, উদ্যোক্তা প্রায় ঘরে ঘরে। কয়েকটি শহর আছে যেখানে অধিকসংখ্যক বাড়ীর উপরেই যৌথ কোম্পানীর রেজেষ্ট্রিকৃত অফিস বলিয়া সাইন্‌বোর্ড ঝুলান আছে। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে যে-পরিমাণ বাঙালী দেশে ও বিদেশে সাধারণ ও অর্থকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছে, যে-কোন দেশের পক্ষেই তাহা গৌরবের বিষয় হইত। সুযোগের অভাবে ইহাদের মধ্যে অনেককে বাধ্য হইয়া শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা হইবার বৃথা প্রয়াস করিয়া নিষ্ফল জীবন কাটাইতে হইয়াছে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে ঘরে-বাহিরে অকারণ দোষারোপ বড় কম সহ্য করিতে হয় নাই। এই প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি পৃথিবীর যে-কোন দেশের সঙ্গে হয়ত যাহার তুলনা চলে, একমাত্র উদ্যোক্তার অভাবে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে তাহা বিনাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ছিল এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়, আর তাহার বেশী আশাও করা যায় না। আর উদ্যোক্তা যাঁহারা হইতে পারিতেন তাঁহাদের পক্ষে এই যুব-শক্তির সঙ্গে সমান তালে চলা সম্ভবপর হয় নাই। বিদেশী ব্যাঙ্কে ও কোম্পানীর কাগজে টাকা রাখিয়া সুদ গোনা, কিছু জমিদারি কিনিয়া নিজের ও পারিবারিক সম্মান বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি লইয়াই তাঁহারা ছিলেন। অর্থহীন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের তাঁহারা সহানুভূতি দূরে থাকুক তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখিতেন। আজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নূতন সুযোগ উপস্থিত। কংগ্রেসের ভারতীয় পরিকল্পনা সমিতি এ বিষয়ে পথ কিছু সুগম করিয়া দিবে আশা করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে ও অবস্থার পার্থক্য অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্বতন্ত্র পরিকল্পনার প্রয়োজন। বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষিত বেকার শ্রেণী, যাহার সহিত অন্য কোন প্রদেশের এখনও তুলনা চলে না। শিল্প-বাণিজ্যে যে-কয়জন বাঙালী সাফল্য লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের এ বিষয়ে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আর বাঙালী যে দুই-একটি ব্যাঙ্ক একটু সাফল্য লাভ করিয়াছেন সেই ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকগণ, এই উভয়ে মিলিয়া নির্দ্ধারণ করুন বাংলা দেশের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভবপর। শিল্প-বাণিজ্য-নেতাগণ নির্দ্ধারণ করিবেন কোন্ কোন্ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান তাঁহারা নিজেরা স্থাপন করিয়া সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে পারিবেন, আর ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ নির্দ্ধারণ করিবেন যে এরূপ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে আমানত টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে সেখানে খাটান সম্ভব হইবে কি না। একা কোন ব্যাঙ্কের এই ব্যাপারে অগ্রসর না হইয়া দুই তিনটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অংশ ধার্য্য করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইবে। গবর্ণমেণ্টের হাত এই কাজে যত কম থাকে ততই ভাল, কারণ আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট অগ্রণী হইয়া এরূপ ধরণের কাজে হাত দিয়া

বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যতটা হাত দিবে, ব্যবসায়ী মহল ততটাই দূরে সরিয়া যাইবে। তবে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি একজন থাকা দরকার যাহাতে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিবেচনা করা সহজ হয়। কাগজের মিল, উন্নত ধরণের কাচের কারখানা, কৃত্রিম রেশমের কারখানা, বাইসিকেলের কারখানা আপাতদৃষ্টিতে এরূপ অনেক কিছুই মনে হয় যাহা অতি সুন্দরভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। আর বাংলা দেশে কি এমন কয়েক জনও নাই যাঁহাদের শিল্প-বাণিজ্যে গভীর অভিজ্ঞতা আছে ও বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অর্থশালী, যাঁহাদের উপর দেশের লোকের পূর্ণ আস্থা আছে, যাঁহারা দেশ-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত, এরূপ পাঁচ-সাত জনই যথেষ্ট। ইঁহাদের ও ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের সমবেত চেষ্টায় বাংলার বেকার-সমস্যা, ব্যাঙ্ক-সমস্যা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইয়া বাংলার শ্রী ফিরিতে পারে। এই দুই শ্রেণী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সমবেত-ভাবে একের সহিত অপরের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। অনেক সময় শিল্প-বাণিজ্য-নেতাগণ ব্যাঙ্ক-পরিচালকদিগকে রক্ষণশীল, অদূরদর্শী ইত্যাদি সংজ্ঞা দিয়া নিজেরাই ব্যাঙ্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। একই ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্যাঙ্ক ও তদর্থ পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান চালাইলে ব্যাঙ্কের আমানতকারী ও শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এই উভয়ের স্বার্থ সমভাবে রক্ষা করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

ভাষায় জুলুম

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বাংলা পাঠ্য পুস্তকে আর্বী, ফার্সী, উর্দ্দু প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহৃত হওয়াতে ভাষার উপর যে "জুলুম" করা হইতেছে সেই সম্বন্ধে কিছু কাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। এই "জুলুম" যে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিদ্যালয়গুলিতেই চলিতেছে তাহা নহে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পাঠ্য পুস্তকেও ভাষার এই নিষ্ঠুর নিপীড়ন অবাধে চলিতেছে।

"গ্রানাডার শেষবীর" নামক একখানা বাংলা পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪৩ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্রুতপঠন পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী পুস্তকখানির লেখক। নিম্নে পুস্তকখানি হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকগণ ইহা হইতেই পুস্তকখানিতে কিরূপ "জগাখিচুড়ী" ভাষার ব্যবহার হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

৩ পৃ.—"রাজদম্পতি মুরসরহদ্দের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।"

৭ পৃ.—"যেসব বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষেরা স্পেন জয় করেছিলেন তাঁদের পবিত্র খুন আজও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত।"

'খুন' শব্দের এরূপ (অপ)প্রয়োগ আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোমলমতি কিশোর বালকদিগকে 'খুন' (intellectual murder) করিতেই হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষের মাথায় এই 'খুন' কেন চাপিয়া বসিল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

৯ পৃ.—"সামান-সরঞ্জাম সংগ্রহের এবং ফৌজের জন্য লোক সংগ্রহের ভার দেওয়া হইল।"

এ যাবৎ 'সাজসরঞ্জামের' কথাই শুনিয়া আসিতেছে; 'সামান-সরঞ্জাম' এত দিন কোথায় ছিল?

১০ পৃ.—"মুসা সহরময় রোঁদ দিতে লাগলেন।" "অবলা নারীরা তাঁকেই তাদের আল্লাহপ্রেরিত রক্ষক স্থির করে তাঁর মঙ্গলের জন্য মোনাজাত করতে লাগল।"

১৫ পৃ.—"আর রসদ সম্ভারের যে সব ছোট ছোট কাফেলা তারা দেখতে পেলেন।"

১৬ পৃ.—"রাণী ইজাবেলা মহা জাঁকজমকের সঙ্গে সভাসদ এবং অমাত্য সমভিব্যাহারে বিরাট জলুস করে তাতে প্রবেশ করলেন।"

সেদিন জনৈক মৌলবী সাহেব বক্তৃতায় বলিতেছিলেন, "এই পরম রমণীয় স্থানে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়া মাঝে মাঝে 'কেলা' গাছ লাগাইলে

আলেকজাণ্ড্রিয়ায় নেপোলিয়ন (১৭৯৮)
কলসনের চিত্র হইতে

ভোক্রক (১৯৩৭)

মেদিনা নগরী

কায়রো

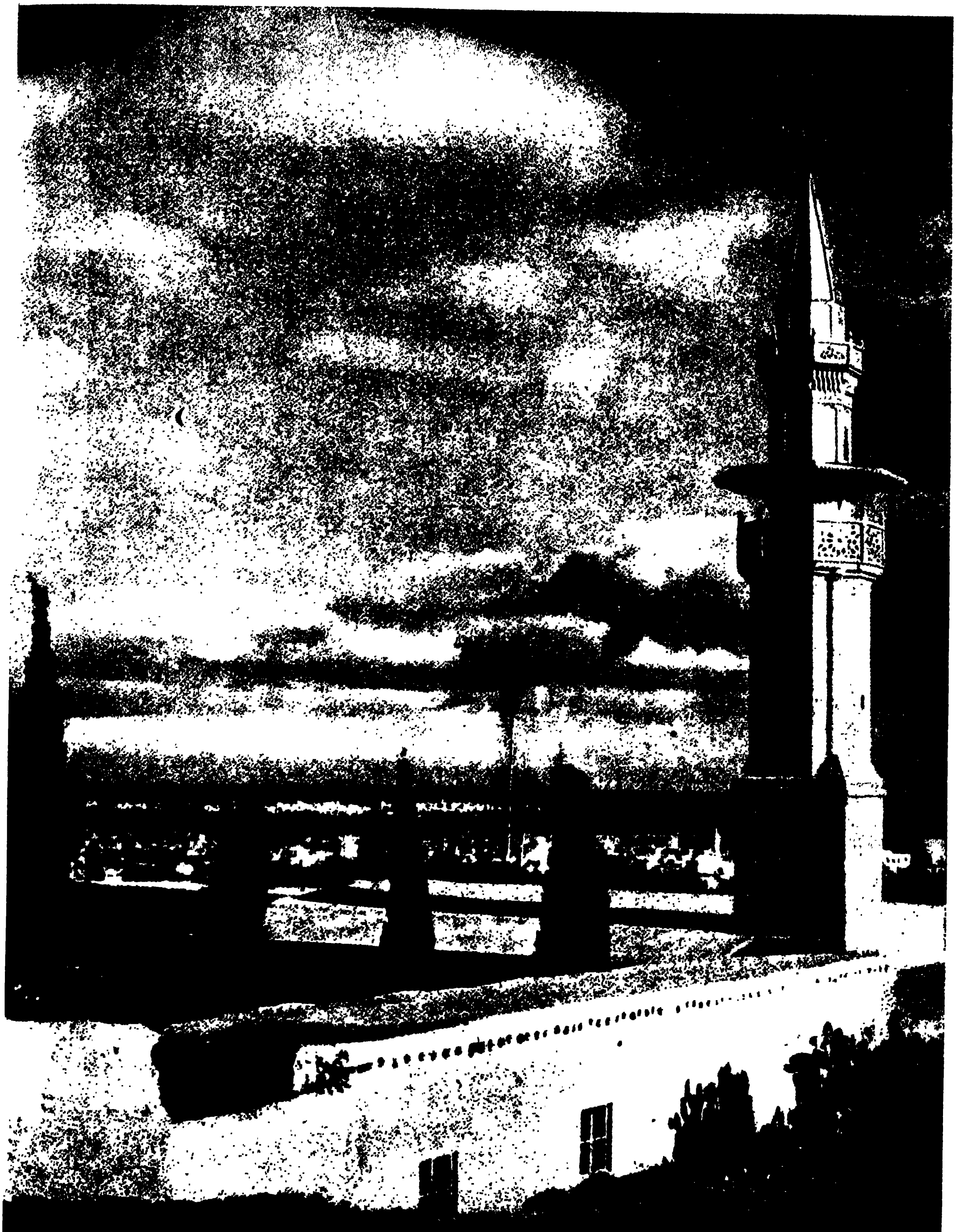

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস

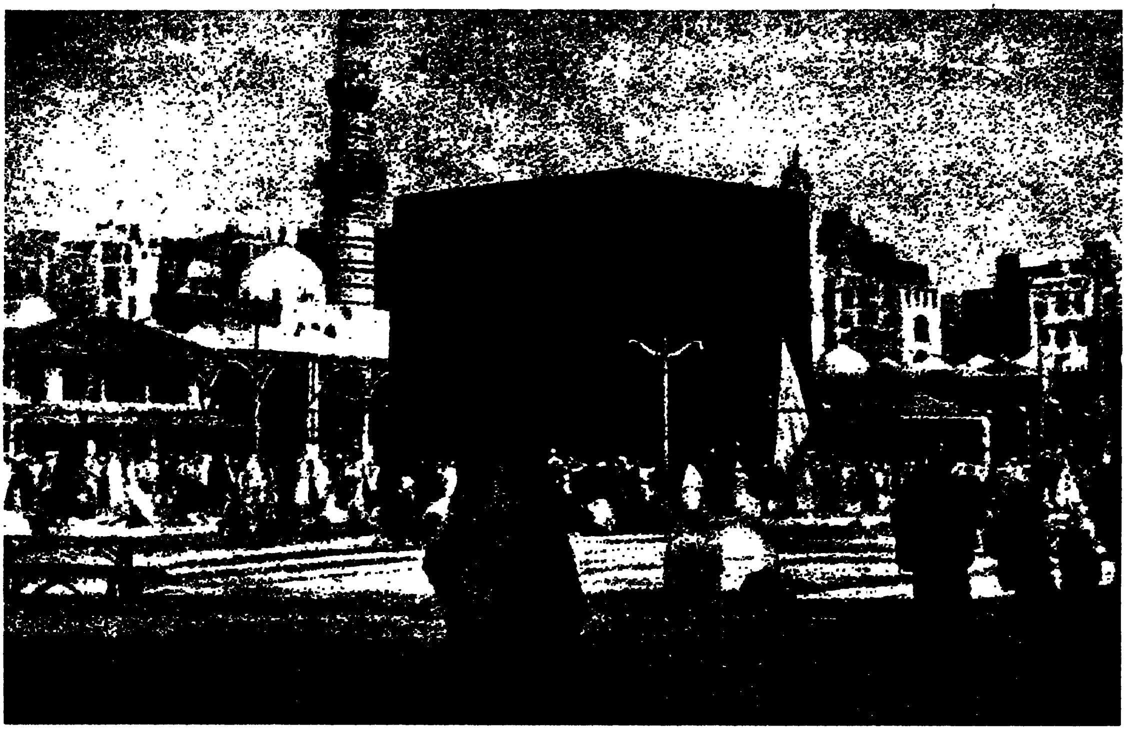

মক্কা। পবিত্র প্রাঙ্গণ

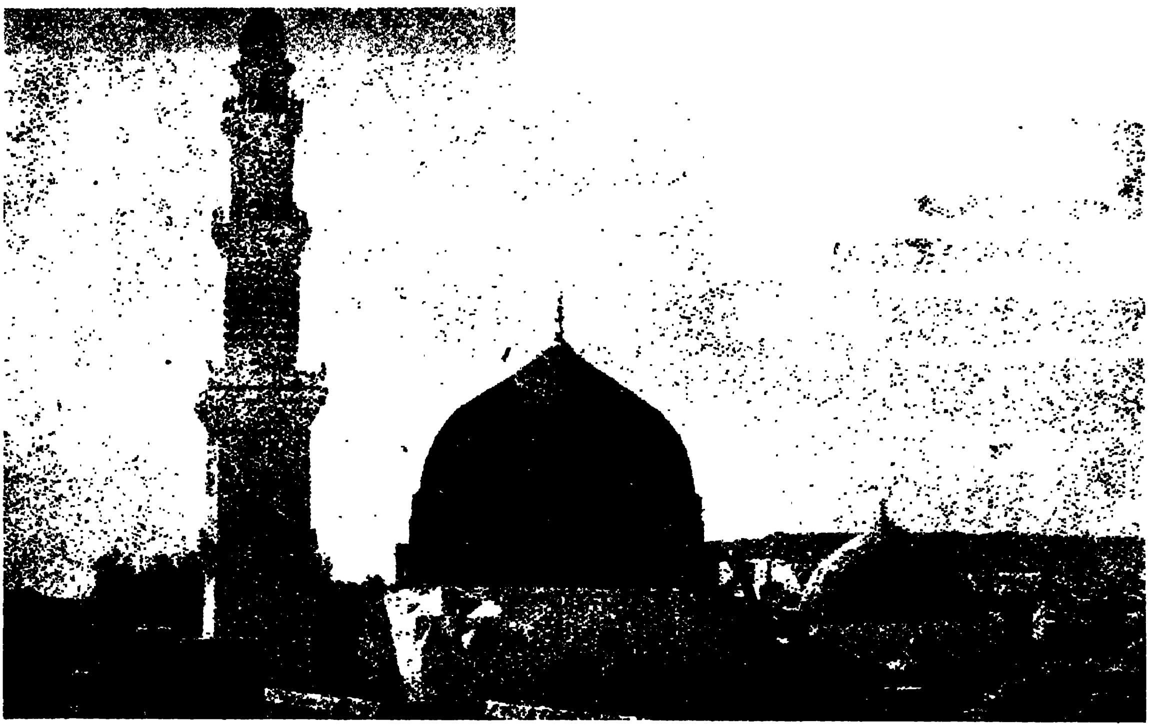

মেদিনা। মহম্মদের সমাধির উপরে নির্ম্মিত মসজিদ

ভাল হয়। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত পথিকের 'গতর' শীতল 'পানির' হাওয়ায় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।" ভাষাটা কিরূপ শুনায়?

১৭ পৃ.—"উভয় দলের ঘোড়ারা নিজেদের গৌরব এবং খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখবার জন্য বীরত্বের যুদ্ধকৌশলের চূড়ান্ত কসরৎ সব দেখাতে লাগল।"

১৮ পৃ.—"আমাদের বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করিবার মত সৎসাহস তাঁর নাই।"

৩৮ পৃ.—"হুজুরের বরকতেই এ যুদ্ধে আমি এই অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছি।"

৩৯ পৃ.—"মানুষ কিংবা পশ্বাদির আহারের জন্য তৃণ-খণ্ড পর্য্যন্ত ছাড়বেন না—সব বরবাদ করে আসবেন।"

৪০ পৃ.—"রাজাও অবিলম্বে বিশ্রাম করতে গেলেন—মোরগের ডাকের সঙ্গে যাতে উঠতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে।"

মোরগ ভিন্ন অন্য পাখীর ডাক বোধ হয় অচল।

৪১ পৃ.—"কাউণ্ট অবিলম্বে তাঁর এবং তাঁর চাচাতো ভাই ডন আলোনজোভিমাণ্টিমেয়রের অনুচরদের নিয়ে শিবিরকে পরিবেষ্টিত করলেন।"

৪৮ পৃ.—"আর তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করছিল।"

৫৬ পৃ.—"প্রধান প্রধান সেনানী, কেল্লারক্ষক এবং বিভিন্ন কবিলার শেখ এবং আলেম ফকিহ্ প্রভৃতির তিনি এক সাধারণ সভা ডাকলেন।"

৫৭ পৃ.—"এমন এক সময় ছিল যখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে সাত হাজার ঘোড়া পাঠাতে পারতুম।"

এখন হইতে ক্ষেত্রগুলিকে সব 'ময়দান' করিতে না পারিলে ভাষার সৌষ্ঠব কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

৫৮ পৃ.—"শত্রু অবরোধ জারী রাখবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প।"

এত দিন শমনজারী, ডিক্রী জারী প্রভৃতির কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। যাহা হউক, এখন অবরোধ-জারীর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

৬৪ পৃ.—"তক্‌দীরের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই। তক্‌দীরের ফলকে অতি স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে।"

৬৬ পৃ.—"শত্রু-বাহিনীর অর্দ্ধেক সংখ্যাকে তিনি নিপাতে পাঠালেন।"

সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের নিপাতের ব্যবস্থা করলে মন্দ কি?

"আনন্দবাজার", "ভারত" প্রভৃতি পত্রিকা পুস্তকখানির ভাষা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত। যেভাবে আর্বী, ফার্সী প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া লেখক বাংলা ভাষাকে পীড়া দিয়াছেন তাহাতে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ব্যাকরণগত অশুদ্ধি আছে (প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদিগকে এরূপ অশুদ্ধি সংশোধন করিবার জন্য প্রশ্ন করা হয়), যেমন ৬৩ পৃ.—"আমাদের অন্তর অশ্রু-বর্ষণের জন্য সৃষ্টি (?) হয় নি; রক্ত-বর্ষণের জন্য সৃষ্টি (?) হয়েছে।" ৮ পৃ.—"তাদের সাহস এবং পৌরষের বিষয় (?) সন্দেহ পোষণ করবার কি যুক্তিযুক্ত কারণ আছে?" কিন্তু আমরা এসব সামান্য ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতেছি না। আমরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে "মোকাবেলা" করিতে চাই, যদি কোন প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী উক্ত লেখকের অনুকরণে নানারূপ দুর্ব্বোধ বিদেশী শব্দ যথেচ্ছ-ভাবে "জলুস" ক'রে ব্যবহার করিয়া তাহার রচনা-শৈলীর "চূড়ান্ত কসরৎ" দেখায়, তবে কি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের "বরকতে" পরীক্ষা "ময়দানে" অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিবে, না হতভাগ্য যুবক এক দিন "মোরগের ডাকের সঙ্গে সকালে" উঠিয়াই গেজেটে দেখিতে পাইবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাদের 'পবিত্র খুন' আজও যাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত তাহারা তাহার উত্তরপত্র "সব বরবাদ" করিয়া দিয়া তাহাকে "নিপাতে" পাঠাইয়াছেন?

আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট "বিভিন্ন কবিলার শেখ এবং আলেম ফকিহ্ প্রভৃতি" এই সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত নির্দ্দেশ দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত ও বাধিত করিবেন।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুশদেশে জার্ম্মান গ্রীষ্ম-অভিযান প্রায় পাচ সপ্তাহ যাবৎ চলিয়াছে। প্রথম মুখে যে-সকল স্থলে সোভিয়েটের দৃঢ় সংরক্ষিত দুর্গ বা সেনাকেন্দ্র ছিল সেগুলির উপর আক্রমণ চলে। এইরূপে সিবাস্টোপোল, কুপিয়ানস্ক, কুরুস্ক, ইত্যাদি অধিকার করার পর ডন নদের অববাহিকার উপরের অংশে সৈন্য চালনা আরম্ভ হয়। তাহার পর ডন নদ লঙ্ঘন, মস্কৌ-রস্টভ রেলপথ অবরোধ হয়, এখন সুদীর্ঘ রণক্ষেত্রে প্রায় ২০ লক্ষ সৈন্য পরস্পরের বল পরীক্ষায় রত রহিয়াছে। এবারের অভিযানে গত বৎসরের মত বিদ্যুৎবেগে প্রচণ্ড আক্রমণ, ব্যূহভেদ এবং দ্রুতবেগে বহু দূরব্যাপী বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধশকটের জালক্ষেপন ইত্যাদি "ব্লিট্‌স্‌ অভিযানে"র অবতারণা এখনও দেখা যাইতেছে না। এবার জার্ম্মান সেনানায়কগণ বিপক্ষের শক্তিকেন্দ্রের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ করিয়া তবে সৈন্যচালনা করিতেছে, কেননা মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সেনাদলের পৌরুষ ও তাহাদের অধিনায়ক-গণের কূট যুদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় তাহারা যথেষ্টই পাইয়াছে। সুতরাং এই বারের অভিযান গত বৎসরের অনুরূপ প্রথম দিকে হইবে না মনে হয়। গত বারের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সেনাদলের পরাজয় ও ধ্বংস সাধন, যাহাতে শক্তিহীন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রবল বিজেতার পদানত হয়, যেরূপ ফ্রান্সে ঘটিয়াছিল। এখন ঐরূপ "সস্তায় কিস্তিমাৎ" পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া রীতিমত যুদ্ধ-কৌশল এবং শস্ত্রবল প্রয়োগে জয় লাভের চেষ্টা চলিতেছে।

জার্ম্মান সেনাবাহিনীর পশ্চাতে তাহাদের যুদ্ধসম্ভার ও সৈন্যবলের চলাচলের ব্যবস্থা খুবই ভাল। পোলাণ্ড ও অধিকৃত রুশদেশের রেলপথ ও যানবাহন চলাচলের অন্য ব্যবস্থা জার্ম্মান সামরিক পূর্ত্ত ও এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্ত্তা—সম্প্রতি এরোপ্লেনের দুর্ঘটনায় হত—ডক্টর টট্ (Todt) সম্পূর্ণ সংস্কার এবং স্থানে স্থানে পুনর্গঠন করিয়া দেওয়ায় এখন নাৎসী রণচালকগণ রুশ রণপ্রান্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি দ্রুত সৈন্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রেরণ করিতে পারে। ইহার ফলে ঐ রণক্ষেত্রের যে-কোন অংশে জার্ম্মানগণ সহসা শক্তির অনুপাতের প্রবল ভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। এইরূপে পূর্ব্বপরিকল্পিত স্থানে প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া সংখ্যা ও শক্তিলঘিষ্ঠ সোভিয়েট সেনার ব্যূহভেদ ও দুর্গনাশই বর্ত্তমান অভিযানের প্রধান রণকৌশল। রুশ সেনাদলের চলাচলের পথ ও ব্যবস্থা দুইই জার্ম্মান অপেক্ষা হীনতর। যুদ্ধশকট, এরোপ্লেন এবং অন্য অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতিপূরণও যথেষ্ট হয় নাই বলিয়া এখন সোভিয়েটের সামরিক শক্তি জার্ম্মানগণের সমতুল নহে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের যুদ্ধসরঞ্জাম নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ঘোষণার শব্দে চতুর্দ্দিক আলোড়িত, কিন্তু তাহার কতটা রুশসেনার হস্তগত হইয়াছে সে বিষয়ে যেটুকু আভাস কমন্স সভার বিতর্কে পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। অবশ্য রুশদেশে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থায় বাধার অন্ত নাই এবং ক্রমেই তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে রুশরাষ্ট্রের শস্ত্র-নির্ম্মাণকেন্দ্রগুলির অর্দ্ধেকের অধিক শত্রুদলিত ভূখণ্ডে ছিল এবং যেগুলি আছে তাহা বহুদূরে স্থিত এবং সে সকল অঞ্চলে মাল-সরবরাহের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। সুতরাং সোভিয়েটের সম্মুখে অগ্নি-পরীক্ষা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বর্ত্তমান অভিযানে জার্ম্মানীর প্রধান লক্ষ্য ককেসাস্ অঞ্চলে তৈল-খনি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা ঐগুলি জার্ম্মান দলের অধিকারে আসিলে সোভিয়েটের যুদ্ধ চালনায়, বিশেষতঃ যুদ্ধশকট এবং এরোপ্লেন চালনায়, বিষম অন্তরায় ঘটিবে। মস্কৌ-রস্টভ রেলপথ যুদ্ধের ঝটিকার আবর্ত্তের মধ্যে আসায় ককেসাসের রক্ষণাবেক্ষণও দুরূহ হইবে, ওদিকে সিবাস্টো-পোল এবং কর্চ উপদ্বীপ নাৎসীদল অধিকার করায় কৃষ্ণ-সাগরস্থ সোভিয়েট নৌবলও কিছু মাত্রায় বলহীন ও আশ্রয়ভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মান অভিযানের প্রথম অংশে ককেসাস্ অঞ্চলকে সাহায্যকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করার চেষ্টাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেটা সফল হওয়ায় এখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্য বাহিনীকে সুদূর বিস্তৃত রণাঙ্গনে ব্যাপক আক্রমণ প্রতি-রোধ করিবার জন্য যুদ্ধদানে বাধ্য করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

আমেরিকার বৃহত্তম গতিশীল কামান

অন্য রণক্ষেত্র হইতে সাহায্য প্রেরণ যাহাতে সম্ভব না হয় সেই জন্য বিভিন্ন স্থলে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে এক দিকে সোভিয়েট সেনাদলগুলি স্থাণু হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে, অন্য দিকে রুশরাষ্ট্রের চরম সমরপরিষদ শক্তির অনটন এবং সৈন্যচালনার ব্যবস্থার প্রতিকূলতার দরুণ বিব্রত হইবে। ইয়োরোপে দ্বিতীয় সমারঙ্গনের সৃষ্টি হইলে জার্ম্মান রণচালকগণ অনুরূপ অবস্থায় পড়িবেন এবং দ্বিতীয় সমারঙ্গনের পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবিত হয়। তাহার সূচনা কবে হইবে জানা নাই।

মিশরের রণক্ষেত্রে এবং ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ নৌকেন্দ্র মাল্টায় অক্ষশক্তির আক্রমণ ইয়োরোপে দ্বিতীয় সমরাঙ্গন প্রতিষ্ঠায় প্রবল বাধা দিয়াছে সন্দেহ নাই। মাল্টায় ক্রমাগত বায়বীয় অস্ত্রের প্রয়োগের ফলে অক্ষশক্তির ভূমধ্য-সাগরের উপর দিয়া নৌচালনা সম্ভব হইয়াছে। এবং তাহার ফলে জেনারেল রোমেলের সৈন্যবাহিনীতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় লিবিয়ার যুদ্ধ এখন মিশরের যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। আফ্রিকায় অক্ষশক্তির প্রধান উদ্দেশ্য সুয়েজ যোজক পার হইয়া "নিকট প্রাচ্য" অঞ্চলের মুসলমান দেশগুলিতে অগ্নি প্রজ্জ্বালন। বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সমর-পরিষদ লরেন্স প্রমুখাৎ কয়েকটি সুদক্ষ লোকের সাহায্যে এমির ফৈজলের অধীনে আরব জাতিগুলিকে তুর্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থা এইবার বিপক্ষ দল করিতে প্রস্তুত। সুতরাং এখন মিশর ও সুয়েজ যোজক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার চরম কেন্দ্রস্থল। এখানকার যুদ্ধের ফলাফলের উপর মিত্রপক্ষের ভাগ্যনির্ণয় অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

এই অঞ্চলের যুদ্ধে প্রথম দিকে যাহা ঘটিয়াছে তাহার কারণ নির্ণয়ের সময় এখনও আসে নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে মিশর সীমান্ত পার হইয়া জেনারেল রোমেলের সৈন্যদল যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহাদের যুদ্ধচালনা দুরূহতর হইবে। এখন যে অবস্থায় উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে সঠিক যুদ্ধের অবস্থা বিচার করা সম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধের প্রধানতম প্রচেষ্টা চলিতে থাকে উভয় পক্ষের সেনা-বাহিনীর পশ্চাতে, যেখানে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত মেরামতের এবং নূতন সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভারের আমদানীর কাজ চলিতেছে। যে দল প্রথমে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে তাহারই অবস্থার উন্নতি সম্ভব। মিশরের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত, যদি ঝড় পুনর্ব্বার পশ্চিম সীমান্তের দিকে যায়, তবে দেশে শান্তি সংরক্ষণ সহজ হইবে, নহিলে অক্ষশক্তির প্ররোচনায় অশান্তির সংক্রামণ অসম্ভব নহে। মিশরের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যক্রম নির্ণয় এখন সুকঠিন। তবে মনে হয় শান্তি রক্ষার চেষ্টাই এখন চলিবে এবং সময় পাইলে নাহাস পাশা তাহাতে সফল হইবেন।

চীনদেশে জাপানী বেড়াজালের প্রসার আরও কিছু বাড়িয়াছে। জাপান এখন তাহার অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাহার পরিস্থিতি সুদৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছে। এই অধিকৃত অঞ্চলগুলির সহিত জাপানের যোগাযোগ-সূত্র প্রধানতঃ সমুদ্রপথে। যে সমুদ্র-অঞ্চলের ভিতর দিয়া জাপানী সৈন্য ও পণ্যবাহী জাহাজগুলি যাতায়াত করে তাহার বাহিরের দিক ফরমোজা, ফিলিপিন, ষ্ট্রাটলি, হোনান, দ্বীপময় ভারত ইত্যাদি দ্বীপমালাবেষ্টিত। এই দ্বীপমালা সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ঐ সমুদ্রপথের উপর আক্রমণ চালান প্রায় অসম্ভব। ভিতরের দিক হইতে ঐ অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করার পথ ভারত ও চীন হইতে গিয়াছে। চীন দেশের সমুদ্রকূলেস্থিত বন্দর ও বায়ুযুদ্ধ-কেন্দ্রগুলি হইতে জাপানের সমুদ্রপথ বিশেষ ভাবে বিপন্ন করা যায়। সেই রূপ প্রবল ভাবে বায়ুযুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হইলে জাপানের পক্ষে সুদূর জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও ব্রহ্মদেশে জাপানী পণ্যবাহী ও সৈন্যবাহী জাহাজের চলাচল রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এবং জাপানের পক্ষে ঐ যোগসূত্র ছিন্ন হওয়া অতি সাংঘাতিক বিপদ। সুতরাং এখন জাপানের প্রথম লক্ষ্য ঐ সমুদ্রপথের চতুর্দ্দিক শত্রুশূন্য করা। এইরূপ উদ্দেশ্যেই জাপানের নূতনতম চীন-অভিযান কিছু অসংলগ্ন ভাবে পরিচালিত হইতেছে মনে হয়। কোনও আক্রমণই স্বাধীন চীনের এলাকার ভিতরে সেরূপ ব্যাপক ভাবে

ভ্লাডিভষ্টক বন্দর

চালিত হইতেছে না। সমুদ্রের উপকূলে যেখানে যেখানে ভবিষ্যতে শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারিত সেইগুলি অধিকার এবং সে সকল অঞ্চলের সহিত স্বাধীন চীনের যোগ পথ ছিন্ন করিবার জন্য কয়েকটি খণ্ড অভিযান চলিয়াছে।

অভিযান যে ভাবেই চলুক, ইহার ফলে চীন বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে সংযোগহীন হইয়া পড়িতেছে এবং এই-রূপ আক্রমণ আরও কিছুকাল চলিলে স্বাধীন চীন এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে যে যে পথে আদানপ্রদান ও চলাচল ছিল সে সকলেরই দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ স্বাধীন চীনের অবরোধ শুধু বহির্জগতের দিক হইতেই নহে, অধিকৃত বা অসংযুক্ত চীনের দিকেও প্রসারিত হইবে। এই লৌহ আবেষ্টনী হইতে বাহিরের দিকে যাইবার পথ ইহার পর দুইটি মাত্র থাকিবে। একটি তিব্বতের উত্তর দিয়া মঙ্গোলিয়ার পাশের রুশ এলাকার সহিত, অন্যটি তিব্বতের ভিতর দিয়া ভারতের সহিত। দুই পথই সুদীর্ঘ এবং দুর্গম, সুতরাং তাহা দ্বারা চীনসেনার ভরণ-পোষণ ও অস্ত্র সরবরাহ অসম্ভব। আকাশ-পথ এখনও আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা পণ্য বা গুরুভার অস্ত্র বহন অসম্ভব এবং পরে উত্তর-ব্রহ্মে জাপানী এরোড্রোম স্থাপিত হইলে সে পথে চলাচলও বিপৎসঙ্কুল হইবে।

জাপানের এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অভিযানের উদ্দেশ্যও এই পরিকল্পনার অনুযায়ী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া ভূমিখণ্ডে এরোপ্লেন চালনার প্রধান অন্তরায় প্রশান্ত মহাসাগরের সহস্র যোজনব্যাপী জলরাশি। উত্তর-আমেরিকা হইতে সাইবেরিয়ার পথে এরোপ্লেন প্রেরণের একটি সহজ পথ ঐ এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া চলিতে পারে। সে পথে এলাস্কা হইতে ভ্লাডিভষ্টক বা কামস্কাটকা উপদ্বীপের কোনও বন্দরে এরোপ্লেন প্রেরণ সহজ। অন্য দিকে এলুশিয়ানে এরোপ্লেনের ঘাঁটি স্থাপিত হইলে জাপানের সমুদ্রপথ এবং জাপানের বড় বড় নগরীগুলি সবই বায়ু পথে আক্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং এলুশিয়ানের এক অংশ অধিকার করিয়া জাপান শুধু নিজের এলাকা বিপদ্ মুক্ত করে নাই, অন্য দিকে আমেরিকার সহিত এশিয়ার যোগপথও ভাঙিয়া দিয়াছে।

চীনের অবরোধ এখন প্রায় সম্পূর্ণ। ইহার ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র এবং অতি আবশ্যকী নানা প্রকার দ্রব্যের অভাবে চীনের শক্তি নাশ হওয়া সম্ভব। জাপান এখন বিরাট সমর-অভিযানে নিজের বলক্ষয় করিতে প্রস্তুত নহে, কেননা সে জানে যে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জীবন-মরণ-সংগ্রামে তাহাকে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই লিপ্ত হইতে হইবেই। সে যুদ্ধে জাপানের শক্তির শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রযোজিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এখন জাপানের পক্ষে একমাত্র উপায় অবরোধ দ্বারা চীনকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলা। যত দিন বর্ম্মা রোড উন্মুক্ত ছিল তাহার মধ্যে চীন দেশে যে পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ সম্ভব ছিল, তাহার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রেরিত হয়—ইহা চীন দেশ হইতে ঘোষিত হয়। এইরূপ হওয়ার মূলে আছে মিত্রশক্তি-পরিচালকগণের মধ্যে কয়েক জনের সেই অদ্ভুত ও বিপরীত মনোবৃত্তি যাহার প্রভাবে মালয় ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপময় ভারত অতি সহজে জাপানের হস্তগত হয়। দূরের জিনিষ ছোট দেখায় ইহা সকলেই জানে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে ছোট না হইতেও পারে একথা বিচক্ষণ লোক মাত্রেই ভাবে। জাপান যে

সাড়ে চার বৎসর ব্যাপী প্রচণ্ড ও নির্ম্মম যুদ্ধেও স্বাধীন চীনকে দমন করিতে পারে নাই ইহার কারণ যে চীনসেনা ও তাহাদের পরিচালকগণের অদম্য শৌর্য্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা —জাপানের শক্তির অভাব নহে—একথা পাশ্চাত্য সমর-বিশারদগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে নাই, যত দিন না জাপান তাহার শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছিল।

চীন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে মিত্রশক্তি দলের একমাত্র ভরসা ভারতবর্ষ। সেখানেও বিশেষ সাহায্য না পাইলে মিত্রদলের যুদ্ধপ্রচেষ্টার পথে অশেষ বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হইতে বাধ্য। একথা যে মিত্রদলের জানা নাই তাহা নহে, তবে স্বার্থ অতি সাংঘাতিক রোগ এবং এই রোগের প্রথম লক্ষণ দৃষ্টিশক্তি লোপ।

ভারতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং দেশের লোকের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের নিকট সম্বন্ধ আছে একথা অতি মূর্খ ভিন্ন সকলেরই স্বীকার্য্য। এ দেশের মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহার বর্ণনার কোনই প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সম্পর্কে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে জাপানের ব্রহ্মদেশ জয়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল ঐ দেশের এক প্রবল অংশের মানসিক বিক্ষোভ। সেনাপতি এলেকজাণ্ডার বলিয়াছেন যে ঐ দেশের মাত্র এক-দশমাংশ লোক সচেষ্ট ভাবে ব্রিটিশ দলের বিপক্ষতা করিয়াছে। ইহা গণিত শাস্ত্রমতে সামান্য ব্যাপার মাত্র কিন্তু বাস্তবিক অতি সাংঘাতিক ব্যাপার। অতি শিক্ষিত ও সুসভ্য দেশের সমস্ত অধিবাসিগণের শতকরা ৪০ জনের অধিক যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগ দেয় কি না সন্দেহ। সচেষ্ট ও সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে যোগ যে-দেশে শতকরা ১৪জন দেয় সে দেশে অতি প্রবল সমর-প্রচেষ্টা চলে। সুতরাং ব্রহ্মদেশের শত করা দশ জন জাপানের দিকে সচেষ্ট ভাবে যোগ দেওয়ার অর্থ কি তাহা বলা বাহুল্য। ব্রহ্ম. মালয় ও দ্বীপময় ভারতের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মানসিক অবস্থার প্রতি অবহেলা কেন করা হইতেছে তাহা মহাজ্ঞানী উচ্চতম অধিকারীবর্গই বলিতে পারেন। দৈহিক অবস্থার বিষয় বলা তো বাহুল্য। যে-দেশে কোটী কোটী লোক সুদিনেও দুই-বেলা খাওয়া বা লজ্জানিবারণের বস্ত্র পায় না সে-দেশের বর্ত্তমান নিদারুণ দুর্দ্দিনে কি হইতেছে তাহা দেশবাসী মাত্রেই জানে। শস্য আছে অথচ বাজারে তাহা অগ্নিমূল্য। লুব্ধ তস্করের দল দুই হাতে ঘুষ দিয়া দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিয়া যাইতেছে। দেশে হইতেছে কেবলমাত্র উচ্চবেতনভোগী অকর্ম্মণ্য—বা তাহা অপেক্ষাও হেয়—সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি। নির্দ্ধারিত মূল্যে কোনও দ্রব্য পাওয়া যায় না বা পাইলে তাহা ভেজালে পরিপূর্ণ। দেশে লোক ও পণ্যের চলাচলের অশেষ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের ফলে খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রের অভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তাহার ফল কি হইবে তাহা নির্ণয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

* * * *

আজকার সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন গড়ে দৈনিক ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ডলার যুদ্ধে ব্যয় করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ যে ভরোনেজ ও ডন নদের অববাহিকায় রুশ সৈন্য জীবনমরণ পণ করিয়া জার্ম্মান অগ্নিক্ষেপী অস্ত্র এবং বিরাট বর্ম্মাবৃত যুদ্ধরথ বাহিনীর অতি প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এবং কিয়াংসী ও চিকিয়াং অঞ্চলে অতি অল্প অস্ত্র সম্বলিত চীনা সৈন্য অভিনবতম অস্ত্রে সুসজ্জিত জাপানী সেনাকে প্রাণ-পণে বাধা দিতেছে। যুদ্ধে যদি অক্ষশক্তি পরাজিত হয়, তবে তাহা হইবে এইরূপ অসীম পুরুষকার ও অচল সং-কল্পের ফলে, আমেরিকা দৈনিক ১৫০০০ কোটী ডলার ব্যয় করিলেও তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিবে না। এই যুদ্ধে যদি কিছু নূতন সংজ্ঞা পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তবে তাহা অর্থবলের অকিঞ্চিৎকারিতা। "দেউলিয়া" জার্ম্মানী ও ইটালী এবং সম্বিৎবিহীন জাপান নইলে কি করিয়া এখনও লড়িয়া চলিতেছে।

রুশযুদ্ধে জার্ম্মানবাহিনী এখনও মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সেনাদলকে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। ইহার অর্থ এই-মাত্র যে স্টালিনগ্রাড বা রস্টভ—এমন কি ককেসাস্ অঞ্চল—যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িলেও রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের শেষ হইবে না। তবে তাহার ফলে সোভিয়েটের শক্তি ক্ষীণ হইবে। যত দিন সোভিয়েট গণসেনার পৌরুষ ও শৌর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন নাৎসী দলের সোভিয়েট বিজয়স্বপ্ন আকাশ কুসুমমাত্র থাকিবে। চীন ও জাপান সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়।

দেশ-বিদেশের কথা

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট ষাণ্মাসিক নীট লাভ হইয়াছে ২৩,০০,৯৪৭ টাকা। ইহা হইতে প্রত্যেক অংশীকে শতকরা ৮ টাকা হিসাবে লাভ দেওয়া হইবে মোট ৬,৭২,৫২৮ টাকা, বাকী ১৬,২৮,৪১৯ টাকা পরবর্ত্তী ষাণ্মাসিক হিসাবভুক্ত করা হইবে। বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই দেশী ব্যাঙ্কটির এরূপ উন্নতি বিশেষ আনন্দের বিষয়।

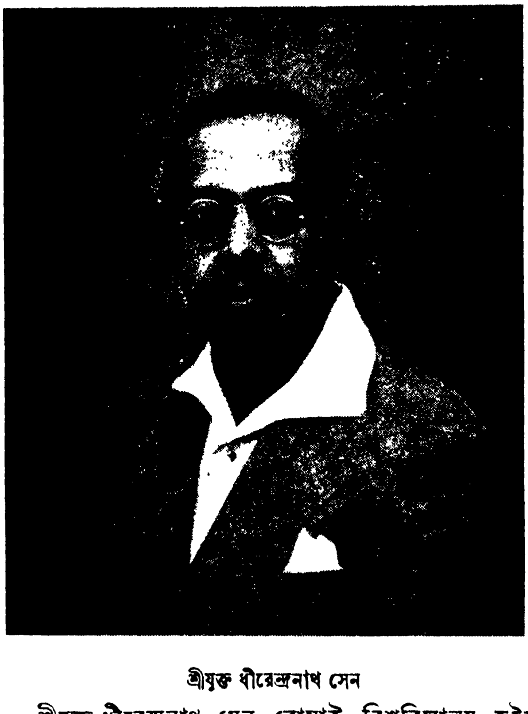

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণাকরিয়া পিএইচ্-ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে এরূপ উপাধি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথম পাইলেন। সেন-মহাশয় গত উনিশ বৎসর যাবৎ কোলাপুরস্থ রাজারাম কলেজে অধ্যাপকতা কর্ম্মে ব্রতী আছেন।

ডাঃ এস্. সি. দাস

নাগপুরস্থ রবার্টসন মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ এস্. সি. দাস এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটি হইতে এফ-আর-এস্-ই উপাধি পাইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে তিনিই প্রথম এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

গীত-বিতানে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ৩১শে মে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ১ নং চৌরঙ্গী টেরেস ভবনে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সভানেত্রীত্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও কর্ম্মি-গণের দ্বারা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এই প্রতিষ্ঠান ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা ক'রে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন সারগর্ভতায় ও মৌলিকতায় সেটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বরকমে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

এই সঙ্গীত সায়াহ্নিকায়, আবৃত্তি করেছিলেন—ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ গুহঠাকুরতা ও কুমারী সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ। শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল এক আনা। শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অভিধানের ৮৬তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ 'শীর্ষ', শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭৩৬। যুদ্ধজনিত ব্যয়বাহুল্য ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং ইহার মুদ্রাঙ্কন প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। ইহা তাঁহার একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরিতে, সর্বসাধারণের নিমিত্ত অভিপ্রেত লাইব্রেরিগুলিতে এবং বৃহৎ পারিবারিক লাইব্রেরিসমূহে রক্ষণীয় ও ব্যবহার্য।

স্মৃতিতর্পণ। স্বর্গগত রসরঞ্জন সেনের জীবন-কথা, কবিতা ও প্রবন্ধাবলী। বরিশাল আর্ট প্রেসে শ্রীসুকুমার দাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

পরলোকগত রসরঞ্জন সেন বরিশালের বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের পরম-শ্রদ্ধাভাজন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ও জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অসামান্য সমন্বয় হইয়াছিল। এই পুস্তকখানিতে তাঁহার জীবনকথা আছে ও একখানি ছবি আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার লেখা কতকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা ইহাতে আছে। "ভাবের গভীরতা, জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও সাধননিপুণতা প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছে।" কবিতাগুলি "সান্নিধ্যলাভসাধনপ্রয়াসী, চরণে আশ্রয়কামী, মিলনতৃষিত, বিরহকাতর চিত্তের মর্মের বাণী।" সেগুলির ভিতরে "আকাঙ্ক্ষা ও পিয়াসা এবং ভাব ও ভক্তি হৃদয়ের সরল স্বচ্ছন্দ আবেগে বহিয়া গিয়াছে।"

পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন রসরঞ্জনের আত্মীয় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, এবং তাঁহার আত্মীয়া শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস তাঁহার "মহাপ্রস্থানে" কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় প্রভৃতির শ্রদ্ধাঞ্জলি ইহাতে আছে। পরিশিষ্টে রসরঞ্জনের জামাতা সুধীরকুমার ও কন্যা কমলার জীবনকথা মুদ্রিত হইয়াছে।

রসরঞ্জনের যশ সমগ্র দেশব্যাপী ছিল না, তিনি বিশেষ করিয়া বরিশালেরই ছিলেন, কিন্তু তথাকার অন্যতম রত্ন ছিলেন।

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। কাপড়ের বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

সৌন্দর্য্যবোধের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মুদ্রিত হইলে তাহা ১২০০ পৃষ্ঠা হইবে। বর্তমান বহিখানি তাহারই একটি অধ্যায়। বৃহৎ বহির একটি অধ্যায় হইলেও ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার বহু তত্ত্ব ইহাতে সুশৃঙ্খলভাবে এবং পাণ্ডিত্যসহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাখ্যা যথাসম্ভব বিশদ করা হইয়াছে। গ্রন্থে যে-সকল সংস্কৃত ও ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সর্বত্র তাহার অনুবাদ বা তাৎপর্য্য দিলে এবং সমুদয় ইউরোপীয় নাম বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলে ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকেরা এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি পাঠের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারিতেন। ইহাতে যে-সকল তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে পারা যাইবে না। দুই-একটির আভাস দিবার নিমিত্ত পুস্তকখানি হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, গ্রীকদের মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণের যেরূপ যথাযথ অনুকরণের দিকেই প্রধান দৃষ্টি ছিল, ভারতবর্ষের চিত্রনির্ম্মাণ পদ্ধতিতে তাহা ছিল না। এক দিকে যেমন ছিল যথাযথের দিকে দৃষ্টি, অপর দিকে তেমনি ছিল জীবনের ও ভাবের অভিব্যক্তি, আর এই দুইটিকে প্রকাশ করা হইত রচনাসন্নিবেশে, দেশবিনিবেশব্যবস্থায় ও অন্তরঙ্গ প্রকৃতির আনুষঙ্গিক অভিব্যক্তিরূপে। ভারতবর্ষীয় চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্য্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট মান রক্ষিত হইত। এই মানকে বলা হইত 'তাল'। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্যকেই তালের প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং উত্তর কালে Leonardo da Vincia (লেনার্দো দা ভিঞ্চির) গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনিও মস্তিষ্কের প্রমাণকেই আদিমানরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই তুলনায় অবয়ববিশেষের মান গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"...এই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় চিত্র বা ভাস্কর্য্যপদ্ধতিতে আর একটি বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় চতুর্থ শতক হইতেই ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি প্রধানতঃ দ্যোতনামূলক করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। দ্যোতনা বলিতে ইংরেজীতে যাহাকে significance বা suggestion বলে তাহাই বুঝি। অর্থাৎ চিত্রের মধ্যে এমন কিছু ভাষা রাখিতে হইবে এমন কিছু ইঙ্গিত রাখিতে হইবে যাহা দ্বারা বিশিষ্ট মনোভাবকে নির্দ্দিষ্টরূপে বুঝানো যায়।"

গ্রন্থখানি চিত্রশিল্পীদের উপযোগী, আবার অন্য যাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টির ঐশ্বর্য্যের সহিত পরিচিত হইতে চান তাঁহাদেরও উপযোগী।

শিশুভারতী — নবম ও দশম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২০১ হইতে ৩৬০০, এবং দশম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬০১ হইতে ৪০০০। পৃষ্ঠাগুলি প্রবাসীর মত।

অনেক বৎসর পূর্বে এই 'ছেলেদের বিশ্বকোষ'খানি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এত দিনে সম্পূর্ণ হইল। আসল গ্রন্থের কিছুই আর অপ্রকাশিত নাই। এখন বাকি আছে কেবল 'বিস্তারিত ভূমিকা ও সূচী'। তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

শিশুভারতী যখন প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইহার কাগজ, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই যেরূপ উৎকৃষ্ট ছিল, শেষ দুই খণ্ডেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট আছে। সুপণ্ডিত লেখকদিগের রচনায় আগে যেমন ইহা সমৃদ্ধ ছিল, শেষ দুই খণ্ডও সেইরূপ সমৃদ্ধ আছে। ইহাতে নিবদ্ধ রচনাগুলি কি কি বিষয়ে, তাহা সাধারণভাবে নিম্নমুদ্রিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

অজ্ঞাতের সন্ধানে, অর্থনীতি, অমর জীবন, আকাশের কথা, আদি মানব, আলো, আবহবিদ্যা, আমাদের দেশ, ইসলামের ইতিহাস, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, উড়োজাহাজ, কল-কারখানা, কবিতা-চয়ন, কি ও কেন, ক্রীড়াজগৎ, গল্প ও কাহিনী, ডাকঘরের কথা, জাতীয় সঙ্গীত, জীবজগৎ, দর্শন, দেশবিদেশের কথা, নারী-জগৎ, পৃথিবীর ইতিহাস, বয়স্কাউট-বাঙ্গালার ইতিহাস; ব্যায়াম-বিধি, বিশ্বসাহিত্য, বেতার বার্ত্তা, ভারত,

কথা, ভারতের রেলপথ, ভারতের গিরিমন্দির, রেলের কথা, শরীর ও স্বাস্থ্য, শিক্ষার কথা, সাহিত্য, সীবন শিল্প।

এই জ্ঞানভাণ্ডারের নাম শিশুভারতী দেওয়া হইয়া থাকিলেও ইহা প্রাপ্তবয়স্কদেরও পাঠ্য। তাঁহারাও ইহা হইতে বিস্তর জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা অনেক স্থলে কাহারও সাহায্য না লইয়া, আবার অন্যত্র শিক্ষক, গুরুজন ও অভিধানের সাহায্যে সানন্দে লিখিত বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। এই বহুব্যয়সাধ্য মানসিক ভোজের আয়োজন করিয়া ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস বাঙালী ছেলে-মেয়েদের ও তাহাদের অভিভাবকবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বাংলা গদ্যের চার যুগ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্. এ., পিএইচ্. ডি., অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। রয়্যাল আট পেজি ৩০৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই।

অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক রীতি অনুসারে লিখিত। তিনি বাংলা গদ্যকে প্রধানতঃ চারিটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—রামমোহন যুগ, তত্ত্ববোধিনী যুগ, বঙ্কিম যুগ, রবীন্দ্র যুগ। প্রত্যেক প্রধান যুগ ভিন্ন ভিন্ন পর্বে বিভক্ত। এই রূপ বিভাগের সমর্থক কারণ, যুক্তি ও প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। রামমোহন যুগের বিষয় বলিবার পূর্বে তিনি যুগবিভাগ ও আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করা আবশ্যক। তাহার পরবর্তী অধ্যায়গুলি এই রূপ :—

২। প্রাগ-আধুনিক বাংলা গদ্য (১৫৫০—১৭৫০)। ৩। প্রাগ্-আধুনিক বাংলা গদ্য (১৭৫০—১৮০১); নবযুগের সূত্রপাত। ৪। **রামমোহন যুগ** (১৮০১—১৮৪৩); ফোর্ট উইলিয়ম পর্ব (১৮০১—১৮১৫)। ৫। সংস্কার উদ্যোগের পর্ব (১৮১৫—১৮২৯), (ক) রামমোহনের গদ্য। ৬ (খ) স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক (১৮১৭—১৮২৯)। ৭ (গ) সংবাদপত্র (১৮১৮-১৮২৯)। ৮। সাময়িক পত্র পর্ব (১৮২৯ ১৮৪৩); (ক) সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও দৈনিক পত্র। ৯। (খ) স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক (১৮২৯—১৮৪৩)। ১০। **তত্ত্ববোধিনী যুগ** (১৮৪৩—১৮৭২); দেবেন্দ্র-অক্ষয় পর্ব (১৮৪৩—১৮৫৫); (ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১। (খ) অক্ষয়-কুমার দত্ত। ১২। (গ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩। (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; (ঙ) তারাশঙ্কর তর্করত্ন। ১৪। রাজেন্দ্রলাল-প্যারীচাঁদ পর্ব (১৮৫৫-১৮৭২); (ক) রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৫। (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৬। (গ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৭। ওয়েঙ্গার লং ও অপর খৃষ্টান লেখকগণ। ১৮। বঙ্কিমচন্দ্র—প্রথম উপন্যাসত্রয় (১৮৬৫—১৮৬৯)। ১৯। **বঙ্কিম যুগ** (১৮৭২—১৮৯২)।

২০। বঙ্কিমচন্দ্রের কতিপয় সহযোগী ; (ক) কেশবচন্দ্র সেন, (খ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ, (গ) রমেশচন্দ্র দত্ত, (ঘ) মীর মশারফ হোসেন। ২১। **রবীন্দ্রযুগ** (১৮৯২—বর্ত্তমান কাল), সাধনা-বঙ্গদর্শন পর্ব (১৮৯২—১৯১৪)। ২২। সবুজ পত্র পর্ব (১৯১৪—বর্তমান কাল)। ২৩। রবীন্দ্রযুগের মুখ্য গদ্যলেখকগণ ; (ক) স্বামী বিবেকানন্দ, (খ) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (ঘ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। ২৪। উপসংহার।

গ্রন্থকারের মতে প্রাগ্-আধুনিক বাংলা গদ্যের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন আহোমরাজকে লিখিত একখানি চিঠি সবচেয়ে প্রাচীন। তিনি সেই চিঠির নিম্নমুদ্রিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।"

ইহার সহিত আধুনিক গদ্যের কোন মূলগত প্রভেদ নাই।

গ্রন্থকার এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "কেশবচন্দ্রের গদ্য রচনা কেবল ধর্ম্মবিষয়ক ব'লে" ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সুলভ সমাচারে অন্যান্য বিষয়েও লিখিতেন এবং তাহার কিছু কিছু নমুনা প্রকাশিতও হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে বাংলা গদ্যের উপকারক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা তিনি পান নাই।

গ্রন্থকারের সহিত আমরা সামান্য কোন কোন বিষয়ে একমত না হইলেও তাঁহার বইখানি যে প্রামাণিক, খুব উৎকৃষ্ট, মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

ঙ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত ও শ্রীবিভূতিভূষণ রায় কর্ত্তৃক গীতা প্রচার কার্য্যালয়, ১০৮।১১ মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাধারণের জন্য ১৷৹ এবং গ্রাহকদের জন্য ৸৹।

আলোচ্য গ্রন্থে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক হইতে ২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে, যদিও ২৭ ও ২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। ইহা গ্রন্থকারের ধারাবাহিক গ্রন্থের ৭ম খণ্ড, ইহাতে ৪৯৩ পৃষ্ঠা হইতে ৬০৪ পৃষ্ঠা আছে।

গ্রন্থকার এই খণ্ডে সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহা সকল লোকের ও সকল কালের উপযোগী। এই ব্যাখ্যায় তিনি বৈদিক আদর্শের মূল সত্যটি প্রচার করিয়াছেন।

গীতা সংসারকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন না, কিন্তু সংসারে থাকিয়া সংসারের ভোগসুখ এমন ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে এই সংসারেই মানুষ দিব্য জীবন লাভ করিতে পারে এবং এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

গীতা সন্ন্যাসকে নিন্দা করেন নাই কিন্তু তাহার উচ্চ সার্থকতা প্রদান করিয়াছেন। বাহ্য সন্ন্যাস সন্ন্যাস নহে, চাই ভিতরের ত্যাগ। ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করিতে হইবে। ঈশোপনিষদেও আমরা এই শিক্ষাই পাই।

আলোচ্য খণ্ডে গ্রন্থকার 'নির্ব্বাণ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম কি, তাহা অতি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। গীতার কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারই এই বিষয়টি আলোচনা করেন নাই।

'নির্ব্বাণ' শব্দটি গীতায় পাঁচ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—২।৭২, ৫।২৪, ২৫, ২৬ এবং ৬।১৫, কিন্তু এই পাঁচ স্থানেই 'নির্ব্বাণ' শব্দটি 'ব্রহ্ম' শব্দের সহিত যুক্ত আছে। গ্রন্থকার বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এইরূপ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা অতি সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে গীতার উদার সমন্বয়মূলক শিক্ষায় বুদ্ধের শিক্ষাও অবহেলিত হয় নাই। গীতা যেমন অন্য সকল মত ও সাধনার সারবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই বৌদ্ধ মতের সারবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ভাবে গীতার মধ্যে বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতের সমন্বয় করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের অভিনব ব্যাখ্যা গীতার সার্ব্বজনীন শিক্ষাকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

জাগরণ—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৵০।

যুক্তাক্ষরহীন সহজ শব্দে রচিত কয়েকটি গল্প। "বিহার জনশিক্ষা সমিতির পাঠাগারসমূহে কতকগুলি কাহিনীর বই রাখার দরকার বুঝিয়া এই বইখানি লেখা হইয়াছে। কাহিনীগুলির ভিতর দিয়া সমবায়ের ও লেখাপড়া শেখার উপকারিতা, কৃষিজাত জিনিষ কি ভাবে বেচিলে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, মজুরদের সুখসুবিধা কিরূপে বাড়ানো যায়, এই সব বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।" রচনা উদ্দেশ্যমূলক হইলেও হৃদয়গ্রাহী। বিহারীদের ঘর-সংসারের ছবি গল্পগুলিতে বেশ ফুটিয়াছে।

দারিদ্র্যমোচন — শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রবন্ধের বই। ভাষা সহজ। প্রবন্ধের বিষয়—'আমরা কেন গরীব ?' 'সমবায় ঋণদান সমিতি', 'গো-জাতির উন্নতি', 'সার', 'ইক্ষুর চাষ', 'আলু', 'তামাক', 'বন', 'কয়লা' ও 'দেশের লোক'। দেশের কোথায় কি হয় না-হয়, শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা কোনখানে কিরূপ, এইরূপ অনেক তথ্য বইখানিতে আছে। জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বইয়ের প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্য্য—শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও ও শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বেশী আলোচনা হয় নাই, অথচ এই সাহিত্য বাঙালীর একান্ত প্রিয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের 'শিল্পচাতুর্য্য' সম্বন্ধে বেশী কথা নাই ; গ্রন্থকারদ্বয় জানাইয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকিবে। ইহাতে 'বড়দিদি', 'গৃহদাহ', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'মামলার ফল', 'পণ্ডিত মশাই', 'দেবদাস', 'আঁধারে আলো' এবং 'রামের সুমতি'র কয়েকটি নারীচরিত্র সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় সম্পূর্ণ নূতন কথা বলিয়া তাক লাগাইতে চেষ্টা করেন নাই, সহজ ভাবে প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত

প্রমথ চৌধুরী ভূমিকায় বলিয়াছেন: "লেখকদ্বয় সাহিত্য-জগতে অপরিচিত হ'লেও তাঁদের ভাষা অকৃত্রিম, সহজ ও স্বচ্ছ। সুতরাং যাঁরা শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের অনুরাগী, তাঁরা এ পুস্তক পড়ে খুশী হবেন।" আমরা তাঁহার মন্তব্যের অনুমোদন করি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তুর্কী বীর কামাল পাশা—রেজাউল করীম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১ শারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। পৃ. ৮২ মূল্য ।৵৹।

বইখানির প্রথম চারি পরিচ্ছেদে ৩৭ পৃষ্ঠার মধ্যে আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের জীবন ও কীর্তি-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে, ৩৮ হইতে ৮২ পৃষ্ঠার মধ্যে তুরস্কে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য, মাদাম হালিদা এদিব, তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অধিকারের স্বরূপ, ও তুরস্কে ভাষা বিপর্যয়—এই চারিটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। অল্প কথায় তুরস্ক সম্পর্কে এই সব দিকের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পক্ষে পরিশিষ্ট অংশ সুলিখিত। তবে প্রথম অংশে কামাল আতাতুর্কের জীবনী আর একটু বিস্তৃত আকারে সম্পূর্ণ হইলেই ভাল হয়।

নারী—শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ। সরস্বতী লাইব্রেরি, কলেজ স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা। ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

ইহাতে ত্রয়ী, ভারতীয় সভ্যতা ও নারী, বিবাহ-সমস্যা, শাঁখা-সিঁদুর-ঘোমটা, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, মেয়েদের শিক্ষা, নারীর মাতৃত্ব ও মাতৃত্বের শিক্ষা, নারী ও উপার্জন, আধুনিক প্রেমের কথা এবং নারী-জীবনের প্রকৃত সমস্যা—এই দশটি নিবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মনস্বিনী লেখিকা তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে বহুপ্রচলিত মাতৃত্ব, পাতিব্রত্য প্রভৃতি গাল-ভরা কথার সারবত্তা বিচার করিয়াছেন। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নারী-জীবনের অন্যান্য সমস্যারও আলোচনা করা হইয়াছে। লেখিকার রচনা প্রাঞ্জল, বক্তব্য সর্বদা যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থিত; কোথাও অসংযত উচ্ছ্বাস নাই। বিদ্রোহের সুরে লেখা হইলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বইখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন। আধুনিক নারী-সমাজে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

আমরা কোন্ পথে? (প্রথম ভাগ)।—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ। ঢাকা, সাধনা ঔষধালয় হইতে প্রকাশিত। ৩৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৷০।

এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ রসায়নশাস্ত্রের-অধ্যাপনা করিয়া এবং 'সাধনা' ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। নিজের শক্তি দ্বারা যাহারা জীবনে কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিতই শ্রবণ করিতে হয়। সেই কারণে এই বইখানা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আমরা পাঠ

করিয়াছি। লেখকের সহিত আমাদের পূর্ব্ব-পরিচয় ও বন্ধুত্ব বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; সুতরাং তাহার আর উল্লেখ করিব না।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সন্নিবেশ ইহাতে রহিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে জানাইয়াছেন যে, পুস্তকটির একটি অখণ্ড রূপ আছে, এবং ক্রমশঃ শেষ প্রবন্ধের দিকে অগ্রসর হইলে উহার অখণ্ডত্ব প্রকাশ পাইবে; আর সমালোচক ও পাঠককে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন, "তাঁহারাও যেন বিচ্ছিন্ন মনে পুস্তকখানা পাঠ করিবেন না।" কিন্তু আমরা যে এরূপ অখণ্ডত্ব আবিষ্কার করিতে পারি নাই, এই অক্ষমতার কথা স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না। 'আয়ুর্ব্বেদ' ও 'ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার', 'কাব্যে রবীন্দ্রপরিচয়' ও 'প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট', 'বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীচরিত্র' ও 'ভগবান্ বুদ্ধ' কি করিয়া যে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি অখণ্ড বস্তুর সৃষ্টি করে, ঠিক ধরিতে পারি নাই। খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে অবশ্যই ছায়াপথের নীহারিকামণ্ডল আর অজীর্ণরোগের ভাস্কর লবণের মধ্যেও একটা সম্বন্ধ ভাবা যায়। কিন্তু এই ভাবেই কি জগতের লোক সব জিনিসের সম্বন্ধ দেখিয়া থাকে?

'নব্য ভারতের স্রষ্টাবৃন্দে'র একটি তালিকা দিতে গিয়া গ্রন্থকার পাঁচ জনের নাম করিয়াছেন—রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। "মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও অগাধ প্রেমে যিনি স্বতঃ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে (৩৫২ পৃঃ) দেখা যাইতেছে, একজন ছাড়া নব্য ভারতের স্রষ্টারা সবই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বাংলা দেশে আর সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান জন জন্মিয়াছেন পাবনায়!

অর্থ, অর্থাভাব, কদর্থ ও বিপরীতার্থ মিলাইয়া লেখকের ভাষা পাচনের কটু-অম্ল-তিক্ত-মধুর রসের মত এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করিয়াছে। যথা, ১৯ পৃষ্ঠায়—"বিষয় বা বস্তুমাত্রেরই যে কারণ আছে, যে কারণ তত্ত্বের অনুশীলনে বিষয় বা বস্তুর প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়, তাহা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমাভ্যুদয়ের সহিত একেবারে বিলীন হইয়া যায়।" মানে কি? কারণ কোথায় লয় পাইল? ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি কারণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই? অন্যত্র (৪৬ পৃষ্ঠায়) দেখিতে পাই—"ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে মানবের সকল কৃতিত্বকে ছাপাইয়া যে শোভমান কদর্য্যতা নগ্ন হইয়া উঠে, তাহা যুদ্ধ।" যাহা কদর্য্য, তাহাও কি 'শোভমান'? "প্রফুল্ল, নয়ান বৌ, সাগর বৌ ব্রজেশ্বরের সপত্নী। শ্রী, দেবী, নন্দা—সীতারামের সপত্নী। সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী—নগেন্দ্রের সপত্নী। ভুবনেশ্বরী, ললিতলবঙ্গলতা—রামসদয় বাবুর সপত্নী। (১৯২ পৃষ্ঠায়)। 'সপত্নী' মানে কি? পুরুষেরও সপত্নী হয়?

"এই ত্যাগ আসে যোগ হইতে। যেমন, কলিকাতায় সুবৃহৎ ব্যবসায় পাতাইয়া তাহাতে যোগ দেওয়া গেল, গ্রামের ক্ষুদ্র মুদীখানা দোকানের বন্ধন ত্যাগ করিয়া" (২৩৭ পৃষ্ঠা)। বন্ধন ত্যাগের ও যোগসিদ্ধির ইহাই কি উপমা?

"ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাষ্ট্রধর্ম্মের বিরোধিরূপে প্রতীয়মান মহাত্মাজীর অহিংসা-তত্ত্বের প্রবেশ যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগসন্ধিকে অতিক্রম করিয়া কালপটে যে নবযুগ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহার অভিবাদনায় ভারতবাসীর সংবৃদ্ধি-সাধন-বোধ-সঞ্জাত আত্মসংগঠন-পরিকল্পনামূলে ভারতে যে নব আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তোলা যাইতে পারে, তৎরাষ্ট্র-গঠন-প্রয়াসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে তাহাও বাধাপ্রাপ্ত হইবে না।" (৩২৮ পৃষ্ঠা) অর্থের চেয়ে শব্দ এখানে অনেক বেশী। "........দৃষ্টান্ত পরিস্থাপন করাই তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক চাহিদা।" (৩৫১ পৃষ্ঠা)। 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থে 'চাহিদা' শব্দের ব্যবহার আছে? আর দৃষ্টান্ত দিব না। লেখক পণ্ডিত এবং কৃতী লোক আর একটু যত্ন লইলেই বইখানা ভাল হইত।

কিছু কাল যাবৎ সমালোচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, ইহা দ্বারা মিত্রলাভের চেয়ে 'সুহৃদ্‌ভেদ'ই হয় বেশী। বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে গেলে অসত্য সমালোচনা করিতে হয়; আর, অপ্রিয় সমালোচনা বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটায়। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা আরিস্ততলের (Aristotle) একটি উক্তি—"a friend is dear, but truth is dearer."

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সায়ম্—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সারস্বত মন্দির, ১ নং রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে নানা ছন্দে গ্রথিত আটত্রিশটি কবিতা আছে। শব্দযোজনার নৈপুণ্য, ছন্দোমাধুর্য্য এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্য থাকায় গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথের অনুভূতি যে গভীর, 'সায়মে'র কবিতাগুলি তাহা প্রমাণ করিতেছে। অধিকাংশ কবিতায় লিরিক সৌন্দর্য্য এবং রসপ্রকর্ষ আছে। কতকগুলি কবিতার ভিতর বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিগূঢ় মিলন ঘটিয়াছে।

কোন কোন কবিতায় বেশ হিউমার আছে। 'কচি ডাব' উপভোগ্য হইয়াছে। 'জংশন ষ্টেশনে' ও 'বসন্ত' শীর্ষক কবিতার ভিতর সাম্প্রতিক রীতিগত প্রকাশ ভঙ্গিমার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে (যেমন, 'নিঝুম্‌ঝাট প্রকাণ্ড আকাশ')—আঙ্গিকের দিক দিয়াও সাম্প্রতিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু। পত্রোপন্যাস। সুশীল রায়। প্রকাশক—শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৭-৭ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

শ্রীমতী পঞ্চমীকে লিখিত পত্রে লেখক (অর্থাৎ নায়ক) কৌমুদী নাম্নী একটি মেয়ের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। স্বভাব-দুর্ব্বল নায়ক বিজন ও অত্যাচারী পুরুষ শিকারী মিলিয়া মেয়েটির জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। শেষে বীভৎস হত্যার কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। করুণ রস জমাইবার প্রচেষ্টায় বীভৎস মৃত্যুই যে একমাত্র উপায়—এটি লেখক হয়ত ভুলিতে পারেন নাই। তাই নানা অবাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া অতি দ্রুত এই ভাবে কাহিনীর উপসংহার করিতে হইয়াছে। তা ছাড়া শ্রীমতী পঞ্চমীকে লিখিত পত্র স্থানে স্থানে এরূপ দীর্ঘ বাক্‌বাহুল্যে ভারাক্রান্ত যে, মূল কাহিনীর অনুসরণে বাধা জন্মায়। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লেখকের ভাষার স্বচ্ছতা আছে, লেখার মধ্যে দরদী মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সুষ্ঠু কল্পনার প্রসার ও বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হইলে লেখক ভবিষ্যতে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

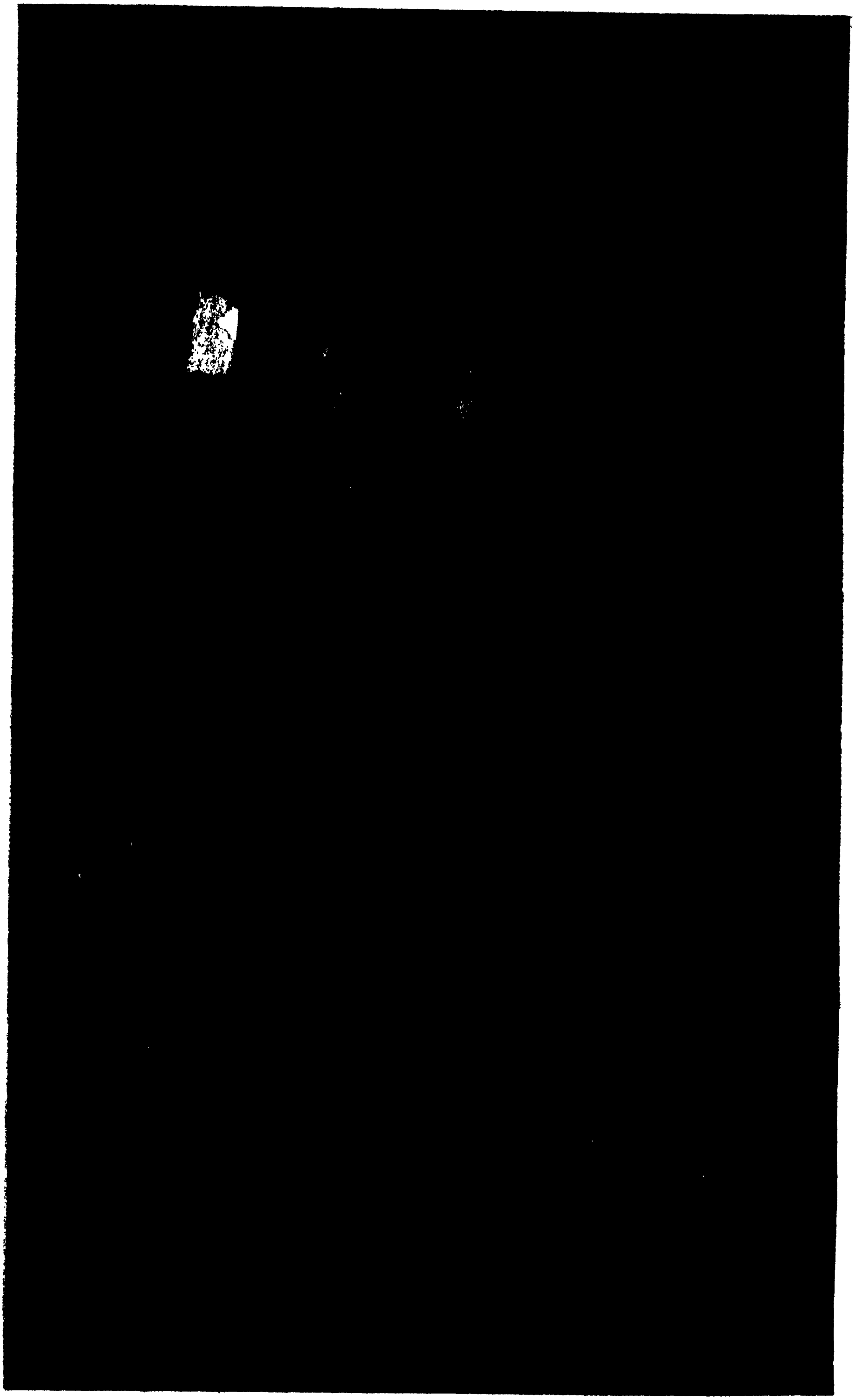

বাউল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীবি. কর্ম্মকার

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৯

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও শক্তি অপসারণের দাবী

এখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষিত হোক এবং ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও শক্তি অপসারিত হোক, এই দাবী ক'রে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ব্ধর্দায় যে দীর্ঘ প্রস্তাব ধার্য করেন, কল্‌কাতার দৈনিকগুলিতে তা ৩০শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়। শ্রাবণের "প্রবাসী"র ছাপার কাজ তখন শেষ হ'য়ে আসছিল এবং ঐ মাসের প্রবাসী ৩১শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়। সেই জন্যে প্রস্তাবটি ও তার উপর কোন মন্তব্য শ্রাবণের "প্রবাসী"তে প্রকাশ করতে পারি নি। আমাদের নিয়ম অনুসারে দুর্গাপূজার ছুটির আগে আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা প্রকাশ করবার নিমিত্ত আমরা ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিন সংখ্যা নির্দিষ্ট তারিখের আগে প্রকাশ ক'রে থাকি। আমাদের সেই রীতি অনুসারে প্রবাসীর বর্তমান ভাদ্র সংখ্যা নির্দিষ্ট তারিখের কয়েকদিন আগে বেরচ্ছে। কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির ব্ধর্দার প্রস্তাবটির বিষয়ে আমরা দু-চার কথা বলতে চাই। আগে নির্ধারণটির মর্মানুবাদ নীচে দেওয়া হচ্ছে।

দিনের পর দিন যে-সব ঘটছে এবং তার ফলে ভারতের জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা লাভ করছে তাতে কংগ্রেসের সভ্যদের এই অভিমত দৃঢ়তর হচ্ছে যে, অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক। উৎকৃষ্টতম বিদেশী শাসনও স্বতঃই অশুভকর এবং পরাধীন জাতির পক্ষে স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর বলেই নহে, পরন্তু পরাধীন ভারত নিজেকে রক্ষা করতে এবং লোকক্ষয়কারী এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে কার্যতঃ কোনও অংশ গ্রহণ করতে পারে না বলেই ব্রিটিশ শাসনের এই অবসান কামনা করা হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় কেবলমাত্র ভারতের স্বার্থের খাতিরেই নহে, অধিকন্তু বিশ্বের নিরাপত্তা এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ, যুদ্ধবাদ ও অন্য যে কোন আকারের সাম্রাজ্যবাদের ও এক জাতির উপর অপর জাতির আক্রমণ অবসানের জন্যও ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক।

বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভের পর কংগ্রেস বিশেষ বিবেচনা সহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত না করবার নীতি অনুসরণ করে আসছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হবার ঝুঁকি নিয়েও কংগ্রেস এই আশায় একে ইচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষণাত্মক ও সীমাবদ্ধ করেছিলেন যে, বিব্রত না করবার এই নীতি শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যথোচিতভাবে তার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবেন এবং জগতের সর্ব্বত্র মানব জাতির যে স্বাধীনতা বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভারতবাসী যাতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারে তার জন্য গণ-প্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করবেন। কংগ্রেস আরও আশা করেছিলেন যে, ভারতের উপর ব্রিটেনের আধিপত্য যাতে দৃঢ়তর হ'তে পারে এমন কিছুই করা হবে না।

এই সকল আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। নিষ্ফল ক্রিপস্ প্রস্তাবসমূহে যত দূর সম্ভব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় নি এবং ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশের প্রভুত্ব শিথিল হবে না। স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনাকালে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ জাতীয় দাবীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ন্যূনতম অধিকার লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নাই।

এই আশাভঙ্গের ফলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অশুভেচ্ছা দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বেড়ে এবং জাপানী বাহিনীর সাফল্যে উল্লাস ক্রমশঃ বাড়ছে। ওআর্কিং কমীটি এই পরিস্থিতি বিশেষ আশঙ্কাজনক বলে বিবেচনা করেন, কারণ

এর প্রতিরোধ না হ'লে আক্রমণ ঘটলে নিষ্ক্রিয়ভাবে তা' মেনে নেওয়াই হবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কমীটির অভিমত এই যে, আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে, কারণ আক্রমণকারীকে মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ভারতীয় জনসাধারণের অধঃপতন এবং অধীনতা অব্যাহত রাখা। মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে যে অবস্থা ঘটেছে ভারতবর্ষে তা যাতে না ঘটে, তার জন্যে কংগ্রেস উদ্বিগ্ন ও ব্যগ্র এবং জাপানী বা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক ভারত আক্রমণ বা অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি গঠন করতে ইচ্ছুক। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অশুভেচ্ছাকে কংগ্রেস সদিচ্ছায় পরিণত করবে এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের স্বাধীনতা লাভের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও তজ্জনিত দুঃখ-কষ্ট-ভোগে ভারতবর্ষকে ইচ্ছুক অংশীদার করবে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতার গৌরব অনুভব করতে পারে, তবেই এ সম্ভবপর হবে।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতি হেতু তা সম্ভবপর হয় নি। বৈদেশিক প্রভুত্ব ও হস্তক্ষেপের অবসানের পরই শুধু বর্ত্তমান অবাস্তব অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়ে বাস্তব অবস্থা আসবে এবং ভারতের সকল দলের সমস্ত লোক ভারতের সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হবে এবং একটা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করবে।

বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য মূলতঃ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ ও ব্রিটিশ সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই ঐ সকল দলের কাজ ফুরাবে। দেশীয় নৃপতিগণ, জায়গীরদার, জমীদারগণ, বিত্তবান এবং অর্থবান সকলেরই অর্থসম্পদের যোগান দিয়া থাকে ক্ষেতের চাষী এবং কারখানা বা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত মজুরগণ। বস্তুতঃ প্রকৃত ক্ষমতা এবং কর্ত্তৃত্ব উহাদের হাতেই তুলে দিতে হবে।

ভারত হতে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমুদয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, দেশের দায়িত্বসম্পন্ন পুরুষ ও নারীগণ একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সম্মিলিত হবেন। এই সাময়িক গবর্ণমেণ্টই গণপরিষদ আহ্বানের পরিকল্পনা রচনা করবেন। এই গণ-পরিষদই পরে ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিবৃন্দ পরে উভয় দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্দ্ধারণে ও পর-আক্রমণ-প্রতিরোধের একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মিত্রভাবে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তার ব্যবস্থা-কল্পে মিলিত হয়ে আলোচনা করবেন।

জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যে পুষ্ট হয়ে ভারত পর-আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হয়, কংগ্রেসের এইটিই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা।

কংগ্রেস ভারত হ'তে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণের প্রস্তাব করলেও গ্রেট ব্রিটেন বা মিত্রশক্তিসমূহকে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে কোন প্রকারে বিব্রত করা বা জাপান কিম্বা এক্সিস পক্ষভুক্ত অপর কোন শক্তিকে ভারত-আক্রমণে বা চীনের উপর চাপ দেওয়ায় উৎসাহিত করার কোন অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। মিত্রশক্তিসমূহের প্রতিরোধক্ষমতা কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায়ও কংগ্রেসের নাই। কাজেই, জাপান বা অপর কোন শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ বা চীনকে সাহায্য করবার জন্য মিত্রপক্ষ যদি ভারতে সশস্ত্র বাহিনী রাখতে চান, তাতে কংগ্রেস সম্মত আছে।

ব্রিটিশ শক্তির ভারত হ'তে অপসারণের প্রস্তাব দ্বারা কখনও ইহা মনে করা হয় নি যে, ভারত হ'তে সমুদয় ব্রিটিশ নরনারী চলে যাবে; এবং যারা ভারতকে তাদের দেশ মনে করবে এবং তার নাগরিকরূপে বাস করবে এবং অন্যান্যদের সমান হয়ে থাকবে অন্ততঃ তাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই এ রকম কিছু মনে করা হয় নি। যদি শুভেচ্ছার সহিত এই অপসারণ হয় তা হ'লে তার ফলে ভারতে দৃঢ় অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আক্রমণকে বাধা দিতে ও চীনকে সাহায্য করতে এই গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত জাতিসমূহের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনে যে বিপদাশঙ্কা আছে, কংগ্রেস তা জানেন ও মানেন। যা হোক, স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান সঙ্কটজনক সময়ে দেশকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এবং আরও বহু গুণে গুরুতর ঝুঁকি ও দুর্য্যোগ 'হ'তে পৃথিবীর স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য যে কোন দেশকে এই প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং কংগ্রেস তার জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেও তাড়াতাড়ি কিছু করতে চান না এবং সম্মিলিত জাতিসমূহ অসুবিধায় পড়তে পারে এই প্রকার ব্যবস্থা এড়াবার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন।

কংগ্রেস ব্রিটিশ শক্তির নিকট এখানে উত্থাপিত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আবেদন করছেন এই প্রস্তাব শুধু ভারতের স্বার্থে নহে পরন্তু স্বাধীনতার এবং যে স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত জাতিসমূহ সংগ্রাম করছেন বলে ঘোষণা করছেন তারই স্বার্থে। যদি এই আবেদন ব্যর্থ হয়, তা হলে ভারতীয় জনগণের মনের শক্তির দৌর্ব্বল্য ও আক্রমণকে বাধা দেওয়ার শক্তির দৃঢ়তার যে অভাব বর্ত্তমানে দেখা দিচ্ছে, তাকে উদ্বেগের সহিত না দেখে কংগ্রেস থাকতে পারেন না।

এই অবস্থায় কংগ্রেস অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ১৯২০ সাল হইতে অহিংস উপায়ে যে শক্তি সংগ্রহ করছেন তা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন। কংগ্রেস ১৯২০ সালে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য অহিংস পন্থাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই প্রকার বিরাট ও ব্যাপক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী রূপেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

এই সকল সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর এবং ভারতের জনগণ ও সম্মিলিত জাতিসমূহের জনগণের নিকট এর সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব আছে, এই হেতু ওআর্কিং কমিটি এই প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট এটি প্রেরণ করছে। এই উদ্দেশ্যে আগামী ৭ই আগষ্ট বোম্বাইতে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হবে। —এসোসিয়েটেড প্রেস।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির এই নির্দ্ধারণ, প্রকাশিত হবা মাত্র, তারযোগে বা বেতার-বার্তাবহযোগে, ইংলণ্ড আমেরিকা চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। যথাযথ প্রেরিত হয়েছিল, না সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত আকারে প্রেরিত হয়েছিল, বলা যায় না। কিন্তু দেখা গেল, ব্রিটেনের সব কাগজ প্রস্তাবটির তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছে এবং আমেরিকার দৈনিক কাগজগুলিও তাই।

বিলাতী কাগজগুলির বিরোধিতা সহজেই বুঝা যায়, কারণ সেখানকার অধিকাংশ মানুষের মত অধিকাংশ কাগজ ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের একটা মৌরুসি জমিদারী মনে করে। বিলাতী শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রবাদীরা ও তাদের কয়েকটা কাগজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমর্থন ক'রে আসছে বটে, কিন্তু সেটা বাচনিক সমর্থন, এবং তাদের সমর্থিত স্বাধীনতা অনির্দিষ্ট সুদূর ভবিষ্যতের জিনিষ।

সম্ভ সম্ভ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে কারো সম্মতি নাই; সেটা বিলাতের কেউ কল্পনাও করে নাই। এই জন্যে বিলাতী কাগজগুলার বিরোধিতা সহজে বুঝা যায় বলেছি।

আমেরিকার লোকেরা আপনাদের স্বাধীনতা ভালবাসে এবং মুখে সকল মানুষের স্বাধীনতার সমর্থন করে। কিন্তু তারা নিজের দেশে (ইউনাইটেড্ স্টেটসে) পুরুষানুক্রমে তথাকার অধিবাসী নিগ্রোদের স্বাধীনতা ও সমান অধিকার এখনও কার্য্যতঃ অস্বীকার ক'রে আসছে, এবং এশিয়ার জনগণকে সেদেশে অবাধে যেতে ও তার পৌর অধিকার পেতে দেয় না। ভারতবর্ষের লোকরা যে স্বাধীনতার যোগ্য হ'তে পারে, এ ধারণা সেখানকার অধিকাংশ লোকের নাই। শুধু সাধারণ আমেরিকান্‌রা নয়, আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় লোকদেরও, যেমন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টেরও, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত কম এবং অজ্ঞতা অত্যন্ত বেশী। ইংরেজরা যা বলে লেখে এবং বলায় লেখায়, তারা তাই অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে নেয়। এ অবস্থায় আমেরিকাতে যে কংগ্রেসের প্রস্তাবটির বিরোধিতা হয়েছে তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। অবশ্য সেখানে বিশ্বমানবের, সুতরাং ভারতীয়দেরও স্বাধীনতার প্রকৃত সমর্থক লেখক-লেখিকাও আছেন;—যেমন শিকাগোর "য়ুনিটি" কাগজটির সম্পাদক মিঃ জন্ হেন্স্ হোম্‌স্, নোবেল-প্রাইজ-পুরস্কৃতা বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী পার্ল বাক্ ইত্যাদি। তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রকৃত সমর্থক, এবং সমর্থন করছেনও। প্রাতঃস্মরণীয় ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সম্ভ সম্ভ স্বাধীনতা লাভের দাবী সমর্থন করতেন।

চীনের কাগজগুলির সুর বিলাতী ও আমেরিকান কাগজগুলার মত কংগ্রেসবিরোধী নয়। কংগ্রেস যদি "অহিংস আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা" আরম্ভ করতে বাধ্য হয়, তা হ'লে গবর্ন্মেণ্টকে বিব্রত হ'তে হবে এবং যে মনোযোগ ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ চালাবার কাজে প্রযুক্ত হবার কথা, তার কতকটা সত্যাগ্রহীদের দিকে বিক্ষিপ্ত হবে, চীনের কাগজগুলি এক দিকে একথা উপলব্ধি করছে বটে; কিন্তু তারা এও স্বীকার করছে যে, কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমাতে চাচ্ছে না। বিলাতী ও আমেরিকান্ অনেক কাগজ যেমন, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট দৃঢ় ও কড়া শাসন চালাবে, এই রকম ভয় দেখাচ্ছে, চীনের কাগজগুলি তা করছে না; তারা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয়কেই মৈত্রীর পথে সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করতে পরামর্শ দিচ্ছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দি। 'চায়না টাইম্‌স্' এই রকম বলেছেন, "মিত্রশক্তিদের মধ্যস্থতায় ভারতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। ব্রিটেনকে তার পলিসি বদলাতে পরামর্শ দেওয়া অন্য মিত্রশক্তিদের কর্তব্য, এবং সে-রকম পরামর্শ দিবার অধিকারও তাদের আছে।" ঐ কাগজটি ভারতবর্ষকেও (অর্থাৎ কংগ্রেসকেও) তার নির্ধারণ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছে। তার মতে "মিত্রশক্তিদের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস রাখা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের উচিত এবং মিত্রশক্তিদের সকলের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান তাদের খোঁজা উচিত।" 'কুও মি কুং পাও' নামক কাগজটি এক দিকে বলেছে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চক্রশক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সকল মিত্রশক্তির যুদ্ধের পথেই এখন অর্জ্জিত হ'তে পারে, অন্য দিকে তেমনি রফার আশা প্রকাশ করছে এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকগণকে ব্রিটিশ পলিসি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

কংগ্রেসের বিদেশী সমালোচকদের অনেকের সমালোচনা পড়ে মনে হয়, তারা কংগ্রেসের সমগ্র প্রস্তাবটি আগাগোড়া পড়ে নি, কিম্বা সেটি অ-সংক্ষিপ্ত অ-বিকৃত অবস্থায় তাদের কাছে পৌঁছে নি। প্রস্তাবটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, জাপান জার্মেনী প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি ভারতবর্ষের যাতে বাড়ে সেই জন্য কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চায়, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমেরিকান প্রভৃতি সৈন্যদল ভারতবর্ষে থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় কংগ্রেসের কোন আপত্তি নাই, এবং ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতবর্ষ থেকে অপসারিত করার মানে এ নয় যে, সমুদয় ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চ'লে যাক্। অথচ বিদেশী প্রতিকূল সমালোচকেরা কল্পনা করেছেন, যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবে জাপান, জার্মেনী প্রভৃতি উৎসাহিত হবে, মহাত্মাজী অহিংস সত্যাগ্রহ দ্বারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না, ইত্যাদি! সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে যখন কংগ্রেস-নেতাদের কথাবার্তা চলছিল, তখন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বহু নিযুত ("many millions") স্বেচ্ছাসৈনিক ("Volunteers") সংগ্রহ ক'রে বিরাট বাহিনী গঠন করবার প্রস্তাব করেন। সর্ স্টাফোর্ড তাতে রাজী হন নি। অর্থাৎ কংগ্রেস চেয়েছিল ভারতবর্ষের সৈন্যদল আরও খুব বড় করতে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধি সর্ স্টাফোর্ড তা চান নি। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, স্বাধীন ভারতে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্যে দরকার হ'লে তিনি কন্স্‌ক্রিপ্‌শনের পক্ষপাতী, অর্থাৎ সাবালক সক্ষম সমুদয়

পুরুষকে আবশ্যক হ'লে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য করার পক্ষপাতী। সুতরাং অহিংস অসহযোগ দ্বারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে, কংগ্রেস এ রকম মনে করেন নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীন ভারতবর্ষের চেয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষে সৈন্যের সংখ্যা খুব বেশী হবারই সম্ভাবনা, কমবার সম্ভাবনা নাই। (১৮ই—১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, লিখিত)

—

বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-পরিকল্পিত গণ-আন্দোলন অবাঞ্ছনীয়

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সফলকাম না হ'লে, তবে গণ আন্দোলন আরম্ভ করবেন কিনা বিবেচনা করবেন, এই রকম স্থির ছিল, কিন্তু গান্ধীজী প্রভৃতি গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং অশান্ত জনতার উপর পুলিসের গুলিতে মানুষ হতাহত হওয়ায় এখন গণ-আন্দোলন নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়। অন্য পরিস্থিতিতে তা উচিত হ'ত কিনা সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করছি না।

—

ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন এখনি স্বাধীনতা চান

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের একটা প্রতিশ্রুতি আছে যে, যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হ'লে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন মর্যদা দেওয়া হবে। সেই জন্যে কংগ্রেসের বিরোধী বিদেশী ও দেশী সমালোচকেরা বলছেন, ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি যখন রয়েছে, তখন সদ্য সদ্য স্বাধীনতা চাইবার এবং তা না পেলে সত্যাগ্রহ করবার কথা তুলবার আবশ্যক কি? তার একটা উত্তর ত কংগ্রেসের ওর্ধার প্রস্তাবের মধ্যেই রয়েছে। দেশের লোকে স্বাধীনতা পেলে জাপান বা অন্যান্য শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ভারতীয়দের উৎসাহ বাড়বে, সৈন্য বাড়বে, যুদ্ধার্থে দান বাড়বে, যুদ্ধসরঞ্জাম উৎপাদন বাড়বে, ইত্যাদি। সেই জন্য সদ্য সদ্য স্বাধীনতা চাওয়া হচ্ছে। স্বাধীন রাশিয়ান, স্বাধীন চীনা, স্বাধীন আমেরিকান, স্বাধীন ব্রিটন স্বাধীন ব'লে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের উৎসাহের সীমা নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে ভারতীয়দেরও উৎসাহ অসীম হবে। তখন ভারতবর্ষের বর্তমান দশ-বার লক্ষ সিপাহীর জায়গায় এক কোটি সিপাহীও দরকার হ'লে অবিলম্বে সংগৃহীত হবে। আমাদের অনুমান কংগ্রেসের মত এইরূপ।

সদ্য সদ্য স্বাধীনতা কংগ্রেস কেন চাচ্ছেন, তার অন্যান্য কারণ, আমরা যতটুকু বুঝেছি, বলছি।

ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষকে এক রকম স্বরাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভারত-সচিব ও ভারতের বড়লাট, পার্লেমেণ্ট কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। আমরা একাধিক বার "প্রবাসী"তে প্রমাণসহ লিখেছি, পার্লেমেণ্টের উভয় কক্ষে বিনা-প্রতিবাদে ইতিপূর্বে ঘোষিত হ'য়ে গেছে যে, অন্যে পরে কা কথা, ব্রিটেনের নৃপতির কোন প্রতিশ্রুতিও পার্লেমেণ্টের অভিমতের বিরুদ্ধ হ'লে পার্লেমেণ্ট তা মানতে বাধ্য নয়—এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পার্লেমেণ্টের মত ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সুতরাং ভারত-সচিব ও বড়লাটের প্রতিশ্রুতি পার্লেমেণ্ট যে রক্ষা করবেন, তার স্থিরতা নাই। গত মহাযুদ্ধের সময়ও এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ পক্ষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তখন প্রতিশ্রুত ডোমীনিয়ন স্টেটসের পরিবর্তে ভারতবর্ষ পেয়েছিল রৌলট আইন, জালিয়ানওআলাবাগের কাণ্ড এবং পঞ্জাবে সামরিক আইন।

ব্রিটিশ পক্ষ থেকে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের নয়। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু-মহাসভা প্রভৃতি চান পূর্ণ স্বরাজ। সুতরাং কংগ্রেস স্বরাষ্ট্রিক স্বরাজের (Dominion status-এর) প্রতিশ্রুতিতে কেমন ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন?

প্রতিশ্রুতিটা সর্তসাপেক্ষ অঙ্গীকার, সর্তশূন্য অঙ্গীকার নহে। সব সর্তের বিচার না ক'রে দু-একটা কথা বলছি। একটা সর্ত এই যে, ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল এবং সব শ্রেণী ও ধর্মসম্প্রদায় একমত হ'লে তবে ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি পালিত হবে এবং ভারতীয়েরাই নিজেদের স্বরাষ্ট্রিক স্বরাজ্য অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে পাবে। কিন্তু অনৈক্যের উচ্চ মূল্য দিতে সমর্থ ও সর্বদা প্রস্তুত তৃতীয় পক্ষ ভারতবর্ষে বিদ্যমান থাকতে সব দল একমত হ'তে পারে ব'লে কংগ্রেস বিশ্বাস করেন না।

যে ক'টি দল এখন আছে, যদি মনে করা যায় যে, সেগুলি একমত হ'য়ে যেতে পারে, তা হ'লেও অনৈক্য-সৃষ্টিবিশারদ তৃতীয় পক্ষের কল্যাণে প্রভেদবাদী দু-একটা ভুঁইফোড় দলের আবির্ভাব হ'তে কত ক্ষণ? সুতরাং সব দলের ঐক্য হওয়ার সর্তটা এমন একটা সর্ত যা পালন করা ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতবর্ষে কায়েম থাকবার সময় অসম্ভব। তার পর, ব্রিটিশ পক্ষ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে এটাও কি বলেন নি যে, তাঁরা দেশী নৃপতিদের সঙ্গে যে-সব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রে নৃপতিদের তদনুযায়ী স্বার্থ ও অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কিনা

দেখবেন? সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থ এবং ইউরোপীয় চাকুরেদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা, তাও দেখবেন, ব'লে রাখেন নি কি? অর্থাৎ স্বরাজটা নামে মাত্র ভারতীয়দের পরিকল্পিত ও অনুমোদিত হবে, বাস্তবিক সেটা তৈরি হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কারখানায়।

—

কংগ্রেস কি হঠকারী?

কংগ্রেস হঠাৎ চরমপন্থিতা ক'রে স্বাধীনতা চেয়ে বসেছেন, এমন কথা কোন সত্যপ্রিয় লোক বলতে পারেন না। তাঁরা যে জাতীয় গবর্মেণ্ট (National Government) কয়েক মাস আগে চেয়েছিলেন, তা পূর্ণস্বরাজের চেয়ে অনেক কম। তার পর, সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁরা যা পেলে গ্রহণ করতেন, তাও স্বাধীনতার চেয়ে কম। এখন অ-কংগ্রেসী অনেক নেতা যে সব প্রস্তাব গবর্মেণ্টের ও কংগ্রেসের কাছে উপস্থিত করছেন, কংগ্রেসও ত আগে মোটামুটি ঐ রকম জিনিসই চেয়েছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষ তখন তা দিতে রাজী হন নি।

কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতাবাদী। তাঁরা আগে আগে পূর্ণ-স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু চেয়ে জা'ত খুইয়েছেন অথচ তাতে তাঁদের পেট ভরে নি।

—

কংগ্রেসের চাপ ও গবর্মেণ্টের চা'ল

গবর্মেণ্ট দু-দু বার বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্যসংখ্যা বাড়ালেন, কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতাটা ভারতসচিব ও বড়লাটের হাতেই রইল; যদি শাসন পরিষদের ভারতীয় ও ইংরেজ সব সদস্য কোন বিষয়ে একমত হ'য়ে একটা কিছু নির্ধারণ করেন, তাও চূড়ান্ত হবে না। তাও ভারত-সচিব ও বড়লাট মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন না। শাসন-পরিষদটার সম্পূর্ণ ভারতীয়তাপাদনও (Indianization-ও) হয় নি। একজন ভারতীয় মানুষ দেশরক্ষা-সদস্য (Defence Member) নামতঃ হয়েছেন বটে, কিন্তু দেশরক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ প্রধান সেনাপতির হাতেই আছে এবং ঐ বিভাগের অন্য কোন কোন প্রধান কাজ বেন্থল সাহেবের হাতে গেছে। ভারতীয় দেশরক্ষা-সদস্য সর্ ফিরোজ খাঁ নূন ভারতীয় বাহিনীতে একটা সিপাইও বাড়াতে পারেন না। তা ছাড়া, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর প্রভৃতিও ইংরেজ সদস্যের হাতে আছে।

এ সব সত্ত্বেও যাঁরা কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিতে আপ্যায়িত ও সন্তুষ্ট হ'য়ে কংগ্রেসের উপর মুরুব্বিয়ানা চা'লে অনেক সলা-পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ কেউ বা কংগ্রেসকে গালমন্দও দিচ্ছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, গবর্মেণ্ট যা কিছু করছেন তা কংগ্রেসের চাপটা বিদ্যমান আছে ব'লে করছেন।

—

ভারতবর্ষের নিজস্ব সামরিক শক্তি

স্পষ্ট ক'রে খুলে না বললেও দেশী-বিদেশী অনেকেরই মনে এই সন্দেহ ও প্রশ্নটা জাগছে যে, যদি ব্রিটিশ প্রভুশক্তি ভারতবর্ষ থেকে সরে পড়ে, তা হ'লে জাপানের আসন্ন-প্রায় আক্রমণ কেমন ক'রে প্রতিরোধ করা যাবে।

স্বাধীন চীন নিজের জোরে লড়ছে, স্বাধীন রাশিয়া নিজের জোরে লড়ছে, স্বাধীন আমেরিকা নিজের জোরে লড়ছে। সন্দেহটা এই যে, স্বাধীন ভারত নিজের জোরে লড়তে পারবে কি না। এক দিক দিয়ে তার উত্তর গান্ধীজী ও কংগ্রেস-নেতারা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লেও ব্রিটিশ, আমেরিকান ও চৈনিক বাহিনী স্বাধীন ভারতের বন্ধুরূপে এদেশে থেকে জাপান ও অন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারেন। সে ভাবে তাঁরা যদি লড়েন, তা হ'লে ত কোন মুস্কিলই নাই। অবশ্য ব্রিটেন বিশ্বস্বাধীনতার জন্যে লড়বার কথা বলা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের জন্যে না-লড়তে পারেন। আমেরিকা এবং চীনও বলছেন যে, বিশ্বস্বাধীনতার জন্যেই তাঁরা লড়ছেন ও লড়বেন। কিন্তু তাঁরাও যদি স্বাধীন ভারতের জন্য না লড়েন, তা হ'লে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে?

তা হ'লে তখন থাকবে কেবল ভারতীয় সিপাইরা, এখন যেমন আছে, এবং তাদের সংখ্যাও খুব বাড়াতে পারা যাবে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও বল্‌ছেন যে, ভারতের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যা ও সামরিক শক্তি বাড়ান যায় ও বাড়ান আবশ্যক, এবং বাড়াচ্ছেনও। ব্রিটিশশাসিত ভারত ও স্বাধীন ভারতে প্রভেদ এই হবে, যে, স্বাধীন ভারতে পুরাতন ও নূতন সিপাইরা কেবল বা প্রধানতঃ বেতনের জন্য যুদ্ধ না ক'রে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করবে। এতে তাদের মনে ও বাহুতে নূতন শক্তির আবির্ভাব হবে।

সেনানায়কের কাজ কারা করবে? এর উত্তর, দেশী সেনানায়কেরা করবেন। গত মহাযুদ্ধের সময় দেশী রাজ্য-সমূহ থেকে যত সিপাই ইরাকে ও ইউরোপে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন তাদের ভারতীয় সেনানায়কেরা; এবং জার্ম্যানরা যখন বেছে বেছে ইংরেজ

অফিসারদের গুলি করতে লাগল এবং অন্যান্য কারণেও ইংরেজ-অফিসার-সংখ্যায় কমতি পড়তে লাগল, তখন ব্রিটিশ-ভারতের সিপাইদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা দেশী অফিসাররাই করেছিলেন। এই উভয়বিধ দেশী অফিসার ইংরেজ অফিসারদের চেয়ে কম রণদক্ষতা দেখান নাই।

অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও জোগাড় কেমন ক'রে হবে? কিছু অস্ত্রশস্ত্র বর্তমানেই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। এই সবের উৎপাদন খুব বাড়াতে পারা যাবে। ভারী ভারী অনেক অস্ত্রশস্ত্র চীন যেমন বিদেশ থেকে কিনত এবং এখনও কেনে, আমাদেরও তাই করতে হবে। টাকা পেলে আমেরিকা—এমন কি ব্রিটেনও, ভারতবর্ষকে কেন ভারী ভারী অস্ত্র দেবে না? যদিই না দেয়, ভারতবর্ষ দেশটা বড়, তার কোন কোন অংশ দখল করতে শত্রুর সময় লাগবে, ইত্যবসরে আমরা সব রকম অস্ত্রশস্ত্রই তৈরি করবার আয়োজন করতে পারব। এই রকম অবস্থা সুবৃহৎ চীন দেশে চ'লে আসছে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ দখল ক'রেছিল ক্রমে ক্রমে। তাতে সময় লেগেছিল এবং অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল, প্রত্যেক যুদ্ধেই যে ইংরেজরা জিতেছিল, এমন নয়; অনেক যুদ্ধে তারা হেরেওছিল। তার মানে এই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হবার আগে এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইংরেজদের তাৎকালিক যুদ্ধশক্তির প্রায় সমান যুদ্ধশক্তি ছিল। ভারতবর্ষের সকল অংশের যুদ্ধশক্তি যদি কেন্দ্রীভূত ও একীভূত হ'ত, তা হ'লে হয়ত বা তা তাৎকালিক ব্রিটিশ যুদ্ধশক্তির চেয়ে অধিকও হ'তে পারত। কিন্তু যা হয় নি, তার কথা ভেবে কোন লাভ নাই। যা ছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের লোক ইংরেজদের সঙ্গে প্রায় সমানে সমানে লড়েছিল কিছুকালের জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীন হ'লে তার যুদ্ধশক্তি খুব বাড়তে পারে।

—

"প্রত্যেক জাপানীর প্রতি" গান্ধীজী

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির ওর্ধা প্রস্তাবে যদিও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আততায়ীর (এখন জাপানের) আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ইচ্ছা, উৎসাহ ও শক্তি বাড়াবার জন্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবী করা হচ্ছে, তথাপি ব্রিটেনের ও আমেরিকার অনেক কাগজ লিখেছে যে, ঐ প্রস্তাবটিতে জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি চক্রশক্তি খুশি হবে। তাদের এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান সমালোচকদের ভুল ভেঙে দেবার নিমিত্ত গান্ধীজী "প্রত্যেক জাপানীর উদ্দেশে" একটি জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, জাপানের বর্তমান সামরিক প্রচেষ্টার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী এবং জাপান ভারতবর্ষের দিকে বা ভারতবর্ষে এলে যেন কোন সাহায্যের আশা না করে, বরং তার আক্রমণ প্রতিরোধ করবারই যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

গান্ধীজীর জ্ঞাপনীটিতে বিন্দুমাত্রও তিক্ততা নাই। পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের সমকক্ষ হবার জাপানের ইচ্ছার তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু চীনের প্রতি তার ব্যবহারের খুব নিন্দা করেছেন।

—

স্বাধীন ভারতে সব দলের ঐক্য হবে কিনা

স্বাধীন ভারতে সব দলের ঐক্য হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশিত হয়েছে। সন্দেহ অবশ্যই হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসের এই বিশ্বাস ঠিক্ যে, ঐক্য যদি হয় তবে স্বাধীন ভারতেই হবে, বিদেশী প্রভুর অধীনস্থ ভারতে হবে না।

ঐক্যের পরিবর্তে গৃহসংঘর্ষ বা গৃহযুদ্ধ যে হ'তে পারে না, তা নয়, এবং তা ঘটলে ভারতীয় কোন-না-কোন দল প্রবলতম হ'তে পারে। অবশ্য ভারতে কোন গৃহযুদ্ধ না হ'লে, এমন কি অহিংস আইন-লঙ্ঘন অভিযানও না হ'লে, আমরা খুশিই হব।

—

"টাকার শিকলে বাঁধা পড়া"

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে, এবং তারও আগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় থেকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহৎ প্রতিষ্ঠানটির জন্যে কত চেষ্টাই না করেছেন জীবনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত! অথচ তিনি "টাকার শিকলে বাঁধা পড়া"র ভয় বরাবর করতেন। আমেরিকায় তিনি বিশেষ কিছু না-পাওয়ায় তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেখুন এই না-পাওয়ার থেকেও তিনি কেমন সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছেন:—

> একটা কথা মনে করে আমি সান্ত্বনা পাই। এখান থেকে তেমন মোটা যদি কিছু পাওয়া যেত তাহলে টাকার শিকলে এদের সঙ্গে আমরা বড়ো বেশিরকম বাঁধা পড়তুম। সর্ব্বদাই ওদের নজরে ও বিচারাধীনে থাকতে হোত। অথচ আমাদের দেশে যোগ্য লোকের ও ব্যবস্থার এত বেশি অভাব যে বেশী নজর সয় না। এখনি য়ুরোপে ও এখানে এত আমাদের পরিচয় ছড়িয়ে পড়েচে যে ভয় হয় মান রক্ষা করব কি করে? এদের কি দেখাতে কি দিতে পারি। ট্রাপের মত ছেলে মাঝে মাঝে আসবে তাদের কি শেখাব, কি দেব, কোথায় রাখব—কি আছে আমাদের। এখনো দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে থেকে কাজ করা আমাদের দরকার। বিশ্বের সামনে দাঁড়াবার দিন আসে নি।

তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তাহলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে। আমার বিশ্বাস যদি আমরা বড়ো অঙ্কের টাকা পাই তাহলে আরো বড়ো করেই আমাদের অযোগ্যতা প্রমাণ হবে। (রথীন্দ্রনাথকে লিখিত "চিঠিপত্র"।)

কবি যে লিখেছেন, কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি ও উদ্যম থাকে, এবং বেশি টাকা পেলে বেশি অযোগ্যতা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে, এ খুবই সত্য। এই জন্য শ্রীনিকেতনে এলমহার্ষ্ট-দম্পতি যে প্রভূত বার্ষিক সাহায্য করে আসছেন এবং সম্প্রতি এণ্ড্রুজ-স্মারক ফণ্ডে যে পাঁচ লক্ষ টাকা উঠেছে, তাতে আনন্দ ও আশঙ্কা উভয়েরই কারণ আছে।

—

বারুনপুরে রবীন্দ্র-রচনাবলী

বারুনপুরে আগমনী সাহিত্য-সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন, গত বৎসর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আপনার বক্তৃতার মধ্যে যে আবেদন জানাইয়াছিলেন তদনুযায়ী এখানে বর্ত্তমানে আট জন গ্রাহক নিয়মিত রবীন্দ্র-রচনাবলী কিনিতেছেন।"

এই রকম 'আবেদন' আমরা প্রবাসীর পৃষ্ঠায় এবং অনেক জায়গায় বক্তৃতায় ক'রে আসছি। অন্ততঃ বারুনপুরের মত ছোট একটি জায়গাতেও সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে জেনে উৎসাহিত ও খুশি হয়েছি। রবীন্দ্র-নাথের গ্রন্থ কিনে পড়লে ক্রেতা-পাঠক আনন্দিত ও উপকৃত হন এবং বিশ্বভারতীরও সাহায্য হয়।

—

শ্রীনিকেতন কর্মীদের শ্রেণীবিভাগ ও বেতন নির্ধারণ

গত ১৪ই জুন বিশ্বভারতীর সংসদের যে অধিবেশন হয়, তাতে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের শ্রেণীবিভাগ ও বেতন বৃদ্ধির হার ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। তাতে দেখছি শ্রীনিকেতন-সচিবের বেতন রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা—১০।৩—২১০—২৫০। এইটি সর্বোচ্চ পদ। অন্য সব পদগুলিতে যিনি যিনি নিযুক্ত আছেন, সংসদের কার্য-বিবরণে তাঁদের নাম দেওয়া আছে। এইটিতে কারো নাম নাই। তাতে অনুমান হয়, এইটিতে পরে কর্মী নিযুক্ত হবেন বা হয়েছেন। এইটির জন্যে খুব অভিজ্ঞ এবং শক্তিমান ও কর্মিষ্ঠ লোক পাওয়া আবশ্যক। এ রকম লোক পাবার জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বা হবে কিনা, জানি না। বাংলা দেশের অনেক জেলার—প্রায় সব দিকেরই—অভিজ্ঞতা শ্রীনিকেতনের ভূতপূর্ব কর্মী শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছিল। তাঁর আত্মোৎসর্গে, যোগ্যতায় ও কর্মিষ্ঠতায় রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর পদত্যাগের পর তাঁর মত একজন লোক পেলে ভাল হয়। তিনি বাংলা দেশের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সর্বোচ্চ ও মোটা বেতনের পদ ইন্সপেক্টর-জেনার্যালের পদ পুরা পেন্স্যন পাবার বয়সের আগেই ছেড়ে দিয়ে শ্রীনিকেতনের কাজ করতে এসেছিলেন। শুনেছি তাঁকে মাসে এক শত টাকা ভাতা শ্রীনিকেতন দিতেন। সেটি অবশ্য তাঁর আকর্ষণের জিনিষ ছিল না—সরকারী চাকরীতে তিনি তার অনেকগুণ বেশী বেতন পেতেন। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা এবং জনসেবার সুযোগ পাবেন সেই আশায়।

—

দেশী নাম ও পদবীর বিলাতী বিকৃত রূপ

দেশী কতকগুলি পারিবারিক পদবীর বিলাতী বিকৃত রূপ ইংরেজীতে চলে গেছে। যেমন মুখোপাধ্যায়-মুখুজ্যে হয়েছে মুখার্জি বা মুখের্জি বা মুকের্জি, চট্টোপাধ্যায়-চাটুজ্যে হয়েছে চাটার্জি বা চ্যাটার্জি, ইত্যাদি। আমরা অনেকে ছেলেবেলায় পুরা বা সংক্ষিপ্ত দেশী পদবীটির পরিবর্তে বিলাতী বিকৃত রূপটা গ্রহণ ক'রে ফেলেছিলাম। তার পর আর স্ব-রূপ গ্রহণ করি নি। এটা যে একটা ত্রুটি তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল বাংলা খবরের কাগজেও কেন চাটুজ্যে না লিখে চাটার্জি বা চ্যাটার্জি লেখা হয় বুঝতে পারি না। ছাপার অক্ষরে চ্যাটার্জি ছাপতে যত হরফ ও জায়গা লাগে চাটুজ্যে ছাপতে তার চেয়ে বেশী লাগে না। বাংলায় চাটুজ্যে মুখুজ্যে ইত্যাদিই লেখা উচিত—যদি পুরা চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি লিখবার জায়গা ও ফুরসৎ না থাকে। বাঁড়ুজ্যে ছাপতে গেলে চন্দ্রবিন্দু এবং 'ড়'-এর নীচেকার উকার ভেঙে যাবার ভয় আছে বটে। কিন্তু যদি বাঁড়ুজ্যে লেখা সেই কারণে না হয়, তা হলে শুধু 'বন্দ্যো'তেও চলতে পারে। কিন্তু বিলাতী 'ব্যানের্জি' বা তদ্রূপ কিছু চালান কোন মতেই উচিত নয়। আমরা যত দূর জানি, একমাত্র পরলোকগত উমাকালী মুখুজ্যে (হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল) ইংরেজীতেও Mukhujjye লিখতেন। নাম সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে বাংলা 'রাখহরি বসু' ইংরেজী অক্ষরে হন R. H. Basu বা Bose; কিন্তু এই নামটি বাংলা অক্ষরে সংক্ষেপে লিখতে গেলে তাকে আমরা আর্ এইচ্ বোস্

কেন লিখ্‌ব? লেখা উচিত র. হ. বসু; কেননা আর্‌ এইচ্‌ ত বাংলা বর্ণমালার অক্ষর নয়।

আমরা বাঙালীরাই যে এই রকম বিকৃতি করি তা নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও এই রোগে আক্রান্ত। বোম্বাইয়ে 'ঠাকুরে' একটি পারিবারিক পদবী, কিন্তু কেউ কেউ তাকে বিকৃত করে ইংরেজীতে 'Thackeray' লেখেন। আর একটা পদবী "ঠাকুরসী"। কেউ কেউ তাকে বিকৃত ক'রে ইংরেজীতে লেখেন 'Thackersey'।

—

সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে পশুপক্ষীর নাম

প্রাচীন কোন কবির মহাকাব্য নাটক প্রভৃতিতে যত বেশী পশুপক্ষীর নাম পাওয়া যায়, প্রকৃতির সহিত তাঁর তত বেশী ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও পরিচয় অনুমিত হ'তে পারে। ডক্টর সত্যচরণ লাহা "কালিদাসের পাখী" নামক গ্রন্থে কালিদাসের গ্রন্থসমূহে যত পাখীর উল্লেখ আছে, সমুদয় একত্র সংগৃহীত করেছেন। অন্য সংস্কৃত কবিদের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এরূপ কিছু করেছেন কিনা জানি না।

বাংলা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অন্ততঃ বড় বড় লেখকদের গ্রন্থাবলীতে কোন্‌ কোন্‌ পাখীর উল্লেখ আছে, তার তালিকা প্রস্তুত হ'লে পরে বোঝা যেতে পারে প্রকৃতির সহিত কোন্‌ লেখকের সংস্পর্শ ও পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ। কোনো পাখীর বা পশুর উল্লেখ থাকলে যদি তার স্বভাবের ও অভ্যাসের উল্লেখ থাকে, তবে তা বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক্‌ কিনা তারও বিচার হ'তে পারে।

আমাদের একটা সন্দেহ আছে, যে, আধুনিক বাংলা কবি ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকদের গ্রন্থে 'ইতর' প্রাণীরা বড়-একটা স্থান পায় নি। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সংস্পর্শ ও পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। পশুপক্ষীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, চালচলন ও স্বভাব তাঁরা যথেষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করেন নি, তাতে রসও পান নি। আমাদের এ সন্দেহ অমূলক হ'লে সুখের বিষয় হবে।

—

জাপানের সত্যবাদিতার পরখ

জাপান একটা রব তুলেছে যে, সে এসিয়াকে ইয়োরোপের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত ক'রে "এসিয়া এসিয়ার জন্যে" এই নীতির প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জাপানের প্রকৃত দুরাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে প্রথমে এসিয়ায় নিজের প্রভুত্ব স্থাপন ক'রে সমস্ত পৃথিবী জয় করা, সে কথা সে বাক্যে প্রকাশ করতে চায় না, যদিও তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে। সে আগেই কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ফর্মোজা এবং চীনের কতক অংশ দখল ক'রেছিল। পরে জাভা, বোর্নিও, মালয় ও ব্রহ্মদেশ নিয়েছে এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউ-জীল্যাণ্ড প্রভৃতি আক্রমণ করছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার অভিপ্রায় ও আয়োজনও তার আছে। "এসিয়া এসিয়ার জন্যে" তার ঘোষিত এই রবের মানে যে এসিয়া জাপানের জন্যে তার এই সব প্রমাণ সত্বেও যদি মনে করা যায় যে, সে সত্য কথাই বলছে, সে এসিয়ার পরাধীন দেশগুলিকে পাশ্চাত্য প্রভুত্ব থেকে মুক্ত ক'রে স্বাধীন ক'রে দিতে চায়, তা হ'লে তার অকপটতা অন্ততঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অকপটতা, একটি উপায়ে পরীক্ষিত হ'তে পারে।

ব্রিটেন যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জাপানকে বলেন, "তুমি ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রে দেবার জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে এদেশে লড়তে আস্‌ছিলে; এখন আমরা নিজেই এই দেশকে স্বাধীন ক'রে দিলাম, তোমাকে এর জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না, তুমি বাড়ী ফিরে যাও," তা হ'লে জাপানের পক্ষ থেকে যে রকম উত্তর পাওয়া যায়, তা কৌতূহলের বিষয়।

—

হংকংএর ভারতীয়েরা "ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে" যোগ দিতে বাধ্য!

রয়টার চুংকিং থেকে এই খবরটি পাঠিয়েছেন:

CHUNGKING, July 30.

Indian nationals in Hongkong have been virtually conscripted for military service by the Japanese, while a large number of Indian soldiers have been transferred to Canton where they are being used for sentry and guard duties in order to release Japanese for frontline service, according to Mrs. Gaston, a Hongkong-born Indian woman, who recently arrived at Kweilin from the British colony.

All Indian students, businessmen and police have been compelled to register for military service and are liable to be called up any moment. They are also compelled to join the Hongkong branch of the Indian Independence League.

Those failing to comply are unable to obtain their national certificates which are issued to citizens other than British, Americans, Dutch and certain South American States and entitle them to ration cards for rice and flour.—*Reuter.*

তাৎপর্য্য। হংকংএ-জাত মিসেস্‌ গ্যাষ্টন নাম্নী এক ভারতীয় স্ত্রীলোক কোয়েলিনে এসে পৌঁছেছে এবং তার কাছ থেকে জানা গেছে যে, হংকং-নিবাসী ভারতীয়গণকে কার্য্যতঃ সামরিক কাজ নিতে বাধ্য করা হয়েছে, এবং বহুসংখ্যক ভারতীয় সিপাইকে ক্যাণ্টনে সান্ত্রী ও পাহারাওয়ালার কাজ করতে পাঠান হয়েছে—সেই সব কাজ যে-সব জাপানী সৈনিক

ক'রত তারা প্রেরিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়বার জন্যে। সমুদয় ভারতীয় ছাত্র, ব্যবসাদার ও পুলিসের লোককে সামরিক কাজের জন্যে জোর ক'রে রেজিষ্টরিভুক্ত করা হয়েছে—যে কোন মুহূর্ত্তে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আহূত হতে পারে। **তাদের সকলকে বাধ্য করা হয়েছে "ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের" হংকং শাখায় যোগ দিতে।**

ব্রিটিশ, আমেরিকান, ডাচ্ এবং কোন কোন দক্ষিণ-আমেরিকান রাষ্ট্রের ছাড়া অন্যান্য দেশের নাগরিকগণকে চাল ও ময়দা পাবার জন্যে টিকিট দেওয়া হয়। ভারতীয়েরা ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের হংকং শাখায় যোগ না দিলে তারা ঐ টিকিট পায় না।

জাপানীদের তামাশাটা মন্দ নয়! তোমরা জাপানীরা করবে ভারতবর্ষ জয়, তাই ক'রে ভারতীয়দের গলায় ফাঁস পরাতে চাও; কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই কাজের জন্যেই ভারতীয় সিপাই ও অন্য লোকদের বাধ্য করছ সামরিক কাজ করতে; তার উপর বলছ ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে যোগ না দিলে চাল ময়দা পাবার টিকিটের অভাবে উপবাসী থাকতে হবে!

—

"অস্পৃশ্যদের অবস্থা দাসের অধম"

রয়টার নিম্নমুদ্রিত খবরটি সরবরাহ করেছেন।

New York, July 29.

Mr. Gandhi's attitude was denounced in a broadcast from New York on Monday night by James Gerard, former United States Ambassador in Germany. He declared, "Hindus who keep their forty million untouchables in worse than slavery will appeal here in vain for our interference in Mr. Gandhi's back-stabbing campaign."

He accused Mr. Gandhi of preparing to hinder the British and Americans in their defence of India against the Japanese.—*Reuter.*

তাৎপর্য্য। জেম্‌স্ জেরার্ড নামক একজন আমেরিকান পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে যুনাইটেড্ ষ্টেট্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে এক বেতার বক্তৃতায় গান্ধীজীর ভাবগতিকের তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি বলেন, "হিন্দুরা যারা তাদের চারি কোটি অস্পৃশ্যগণকে দাসত্বের চেয়ে অপকৃষ্টতর অবস্থায় রাখে, তারা বৃথাই এখানে আবেদন করবে মিঃ গান্ধীর পৃষ্ঠদেশে ছোরা মারার অভিযানে আমাদের হস্তক্ষেপের নিমিত্ত।"

তিনি মিঃ গান্ধীর নামে এই অপবাদ দেন যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার নিমিত্ত ব্রিটেন ও আমেরিকানরা যে চেষ্টা করছে, তিনি (গান্ধীজী) তাতে বাধা উৎপন্ন করছেন।

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মিঃ জেরার্ডের শেষোক্ত অভিযোগ যে মিথ্যা, তা আগেই অন্য প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে, নূতন ক'রে দেখান অনাবশ্যক।

আজকাল ব্রিটিশ বক্তারা ও কাগজওয়ালারা কেউ কেউ ভারতবর্ষে "অস্পৃশ্য"দের সংখ্যা দশ কোটি বলছেন। মিঃ জেরার্ডকে ধন্যবাদ যে, তিনি বলেছেন চার কোটি। প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বস্তুতঃ দক্ষিণ-ভারতেরই কোন কোন অংশে আছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও গান্ধীজীর চেষ্টায় তা কমে আসছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কংগ্রেসের একটি প্রধান কাজ। "অস্পৃশ্য"দের মানবোচিত অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কোন কোন দেশী রাজ্যে আইন প্রণীত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হয়েছে। প্রকৃত "অস্পৃশ্য"দের সংখ্যা চার কোটি নয়, দশ কোটি ত নয়ই। বিদেশীরা—বিশেষতঃ ইংরেজরা ও ইংরেজ-প্রভাবিত অন্য বিদেশীরা—মনে করে যে, তফসিলভুক্ত জা'তরা (scheduled castes) এবং "অস্পৃশ্য"রা এক। বস্তুতঃ তা নয়। এমন বিস্তর জা'তকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তফসিলভুক্ত করা হয়েছে যারা কোনকালে "অস্পৃশ্য," এমন কি অনাচরণীয়ও, ছিল না। আজকাল সর্ব্বত্র রেলগাড়ীতে, ট্রামে, বাস্‌এ মেথরেরাও অন্য সকলের সঙ্গে যাতায়াত করে।

হিন্দুমহাসভাও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য করেছেন।

আমরা একজন মানুষেরও বিন্দুমাত্রও অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার বিরোধী। অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা যা আছে, তা খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে অত্যুক্তি ক'রে হিন্দুসমাজ যতটা দোষী নয়, তাকে ততটা দোষী করা সাতিশয় নিন্দনীয়।

নিগ্রোরা এক সময়ে আমেরিকায় যে-রকম দাস ছিল ও পশুর অধম ব্যবহার পেত, ভারতবর্ষের "অস্পৃশ্য"রা সে-রকম দাস নয়, ও সে-রকম ব্যবহার পায় না। আমেরিকায় আইন অনুসারে দাসত্ব রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তাদের রেলগাড়ী আলাদা, গির্জা আলাদা, গোরস্থান আলাদা, হোটেল আলাদা, ইস্কুল কলেজ আলাদা, জনতা কর্ত্তৃক উত্তেজনাবশে নিগ্রো নিহত (lynched) হ'লে তার শাস্তি কচিৎ হয়। শ্রীমতী পার্ল বাকের মত জগদ্বিখ্যাতা লেখিকা এই সেদিনও ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকায় নিগ্রোরা শ্বেতকায়দের সমতুল্য ব্যবহার পায় না। সেই দেশেরই একজন লোকের পক্ষে ভারতবর্ষের হিন্দুদের এবং বিশেষ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা হাস্যকর।

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত, কিন্তু এখনও অনিশ্চিত, অভিযান পৃষ্ঠদেশে ছোরামারার অভিযান নয়; এই **অহিংস** অভিযানকে যদি সশস্ত্র কিছুর সঙ্গে তুলনা করতেই হয়, তা হ'লে একে সম্মুখ যুদ্ধ বললেই সত্য কথা বলা হয়। অবশ্য এ অভিযান না হ'লেই আমরা সুখী হব।

—

সপ্রু-জয়াকরের মধ্যস্থতা

আগে কোন কোন বারের মত বর্তমান সঙ্কটেও, সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু এবং ডক্টর মুকুন্দরাম রাও জয়াকর কংগ্রেস ও গবর্মেণ্টের মধ্যে আপোষে একটা কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা কন্‌ফারেন্স ডাকলে মহাত্মাজী তাতে উপস্থিত থাকতে রাজী হয়েছেন।

এইরূপ কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির ফলে যদি ভারতবর্ষের অভীপ্সিত রকম স্বরাজ পাওয়া যায়, তা হ'লে খুবই সুখের বিষয় হবে।

—

স্বরাজভবন থেকে গৃহীত কাগজপত্র প্রকাশ

গত এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার কোন কোনটির প্রকাশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। সরকার খানাতল্লাসি ক'রে সব প্রস্তাব সাইক্লোষ্টাইল, টাইপরাইটার এবং কার্যবিবরণের খসড়া, প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে যান। এত দিন পরে ভারত-গবর্মেণ্ট সেই খসড়া প্রকাশ করেছেন। কোন সভায় যে-যা বলেন, তা লিখে নেবার পর ও বক্তাদের দৃষ্টি ও বিবেচনার পর ঠিক্ প্রতিবেদন ব'লে গৃহীত হ'লে তবে তা প্রকাশযোগ্য হয়। যুক্ত-প্রদেশের পুলিস যে খসড়া বাজেয়াপ্ত করেন, তা সে-রকম অনুমোদিত প্রতিবেদন নয়। তা প্রকাশ ক'রে গবর্মেণ্ট যদি কংগ্রেসে মহাত্মাজী, এবং ওআর্কিং কমীটির সভ্যদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি কমাতে চেয়ে থাকেন, তা হ'লে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। মহাত্মাজী প্রভৃতি গবর্মেণ্টের এই কাজটির তীব্র নিন্দা ক'রেছেন এবং বলেছেন এতে তাঁদের কারো কিছু ক্ষতি হয় নি, শুধু গবর্মেণ্টের স্বকৃত আত্মসম্মানহানি হয়েছে।

গবর্মেণ্ট দ্বারা এই কাগজগুলি প্রকাশিত হওয়ার ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে যাই মনে করা হোক, কাগজগুলি প'ড়ে বোঝা যায়, যে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি গান্ধীজীর গ্রামোফোন নন্, তাঁরা নিজেরা তর্কবিতর্ক ক'রে নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন—গান্ধীজী তাঁদের হিট্‌লার-বৎ ডিক্টেটর নন, তাঁরা তাড়াতাড়ি লঘুচিত্ততার সহিত তাঁদের এলাহাবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি, তার সপক্ষে বিপক্ষে যা কিছু বলা যেতে পারে, বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন; কমীটি গবর্মেণ্টেরই মত আক্রমণ-কারীকে বাধা দিতে ব্যগ্র ছিলেন; আমেরিকান্ প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যদলকে ভারতরক্ষার জন্যে ডাকা ও আনা হচ্ছে অথচ ভারতবর্ষের নিজের প্রভূত জনবলের পূর্ণ সাহায্য এই কাজের জন্য গবর্মেণ্ট নিচ্ছেন না দেখে কমীটি বেদনা বোধ করেছিলেন; ব্রিটনরা তাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাক কমীটি এটা চান নি, চেয়েছিলেন ভারতরাষ্ট্রের চূড়ান্ত শাসনশক্তি ব্রিটেনের হাত থেকে ভারতবর্ষের হাতে আসা; এবং অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিজের মত যাই হোক, কংগ্রেস স্বাধীন ভারত-বর্ষ রক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রহণ ও ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করবেন না, কমীটির আলোচনা ও প্রস্তাব থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।. কংগ্রেসের মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন আক্রমণকারীর হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই যদি ব্রিটেনের এবং তার মিত্র আমেরিকা ও চীন প্রভৃতির উদ্দেশ্য হয়, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের অধীন রাখাটাই উদ্দেশ্য না হয়, তা হ'লে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের বুঝাপড়া ও আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা অসম্ভব ছিল না।

—

২২শে শ্রাবণের ছুটি

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অঙ্গীভূত ও অনুমোদিত সব শিক্ষালয় ছুটি দিয়ে খুব সমীচীন কাজ ক'রেছেন। সরকারী স্কুল-কলেজগুলিরও ছুটি হয়েছিল।

এই একটি দিন যে দেশের ছেলেমেয়েরা নানা রকম অনুষ্ঠান ক'রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করবার সুযোগ পেল, এটি খুব সন্তোষের বিষয়।

—

জগতে ভারতের বার্তা প্রচারের অসুবিধা

সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ রেডিয়োর সাহায্যে আমেরিকায় কংগ্রেসকে খাটো করবার চেষ্টা করেছেন। জার্মেনীতে আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত মিঃ জেরার্ড্ নিউ ইয়র্কে বেতারে হিন্দুদের ও মহাত্মা গান্ধীর গ্লানিকর বক্তৃতা দিয়েছেন। দেশী বিদেশী সমালোচকরা যদি ঠিক্ ঠিক্ সত্য কথা ব'লে সমালোচনা করেন, তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকে না, কেন-না ভুলচুক সকলেরই হ'তে পারে। কিন্তু তথ্যকে বিকৃত ক'রে প্রচার করা সাতিশয় নিন্দনীয়।

বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে জগৎকে যা বলেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্যও বিশ্ববাসীকে শোনাবার অধিকার ও

সুযোগ আমাদের থাকা উচিত। কিন্তু ক্রিপ্‌স্, জেরার্ড, প্রভৃতি যা বলেছেন, তার উত্তর ত ভারতীয় কোন নেতা বেতারে দিতে পারেন না—বেতারের কেন্দ্রগুলি সব গবর্ন্মেণ্টের এবং গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় নেতারা ও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অবশ্য আমাদের পক্ষের কথা বলেছেন। কিন্তু সেগুলি বিদেশে পৌঁছা না-পৌঁছা গবর্ন্মেণ্টের মর্জ্জির অধীন। টেলিগ্রাফ করলে টেলিগ্রাফ আফিস তা না-পাঠাতে পারে। ছাপা বা হাতে-লেখা আকারে কিছু পাঠাতে গেলে তা সেন্সরের কৃপার অধীন, ডাকঘর তা না পাঠাতে পারে। অতএব, ভারতবর্ষকে বিশ্বজনের নিকট অনেক নিন্দাবাদ কার্য্যতঃ নিরুত্তর হ'য়ে শুনতে হয়।

সান্ত্বনা এই যে, বিধাতা যথাকালে সত্যকে জয়যুক্ত করেন।

—

ভারতে বহু আমেরিকান্ সংবাদদাতার উপস্থিতি

আমেরিকায় ঠিক্ খবর, বিলম্বে হ'লেও, পৌঁছবার একটা আশা আছে। প্রধানতঃ কংগ্রেস নানা রকম আন্দোলন করায়, আমেরিকার লোকেরা ভারতবর্ষের কথা পূরোপূরি জানতে চায়; তারা রয়টারের পটভূমিকা-বিহীন, খাপছাড়া, সংক্ষিপ্ত ও অধিক স্থলে একপেশে সংবাদে সন্তুষ্ট নয়। আমেরিকার লোকেরা যা চায়, আমেরিকান্ সংবাদপত্রগুলাকে তা জোগাতে হয়। সেই জন্যে দেখা যাচ্ছে, ১৫।২০টা আমেরিকান্ সংবাদপত্র স্থায়ী ভাবে এদেশে নিজেদের সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছে। তারা কেউ কেউ, কখন সোজা উপায়ে, কখন-বা নানা কৌশলে, সত্যি খবর পটভূমিকাসমেত আমেরিকায় পাঠায় এবং তা সেখানে প্রকাশিত হয়।

—

ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী

রাশিয়ান্‌রা অসীম স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস ও শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করছে বটে, কিন্তু জার্ম্মানদের চাপে অনেক জায়গায় তাদিকে হটে যেতে হচ্ছে। তাদের অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়ে উঠছে। এই জন্যে তারা চাচ্ছে ইয়োরোপে জার্ম্মেনী যেমন রাশিয়াতে রাশিয়াকে আক্রমণ করছে, মিত্রশক্তিরা সেই রকম জার্ম্মেনীকে আক্রমণ করুন জার্ম্মেনীতে কিম্বা জার্ম্মেনীর অধিকৃত ইয়োরোপের কোন অংশে। মিত্রশক্তিরা সেই রকম আক্রমণ করলে, জার্ম্মেনী তার সমস্ত যুদ্ধশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না ক'রে মিত্রশক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত অঞ্চলে তার কিছু অংশ প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। তা হ'লে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মেনীর চাপ কমবে এবং সম্ভবতঃ রাশিয়া জার্ম্মেনীকে হটিয়ে দিতে পারবে। ব্রিটিশ এরোপ্লেন ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় জার্ম্মেনীর নানা নগরে ও কারখানায় বোমা ফেলে সেগুলাকে বিধ্বস্ত করছে বটে, কিন্তু সেই সব নগর রক্ষার নিমিত্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত জার্ম্মান কোন সৈন্যদলকে রাশিয়ার থেকে সরিয়ে আনা আবশ্যক হচ্ছে না, সুতরাং রাশিয়ার উপর জার্ম্মান চাপ কমছে না।

রাশিয়া ইয়োরোপে জার্ম্মেনীবিরোধী দ্বিতীয় রণাঙ্গনের যেমন দাবী জানিয়েছে, সেই রকম দাবী ব্রিটেনে ও আমেরিকায় কোন কোন সভাসমিতির ও শ্রেণীর লোক জানিয়েছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গনে জার্ম্মেনীকে আক্রমণ যে মিত্রশক্তিদের অভিপ্রেত নয়, তা:নয়। কিন্তু তা তাঁদের অভিপ্রেত হ'লেও তাঁদের সৈন্যবল এবং সমরসরঞ্জাম এখন বোধ হয় তার পক্ষে যথেষ্ট হয় নি। হ'লেই তাঁরা এই কাজে নামবেন।

—

রাশিয়ার পরাজয় হ'লে মিত্রশক্তিদের ঘোর বিপদ

রাশিয়া যদি জার্ম্মেনীর দ্বারা পরাজিত হয়, তা হলে জার্ম্মেনী রাশিয়ার সমুদয় খনিজ তেল এবং যুদ্ধের জন্যে আবশ্যক অন্য নানা জিনিসের সুবিধা পাবে এবং মিত্রশক্তিরা সেই সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। অধিকন্তু এখন জার্ম্মেনীর যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও প্রভূত অস্ত্রবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত ও প্রযুক্ত আছে, সেগুলার সাহায্যে জার্ম্মেনী, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ দখল করতে অগ্রসর হবে। এদিকে জাপান দ্বিগুণ উৎসাহে চীনকে বিধ্বস্ত ও দখল করবার কাজে এবং ভারত-আক্রমণের কাজে লেগে যাবে। এখনই ত কাগজে দেখা যায়, জার্ম্মেনীর দ্বারা রাশিয়ার পরাভব শীঘ্র ও নিশ্চিত ঘটাবার জন্যে রাশিয়াকে আক্রমণ করবার অভিপ্রায়ে জাপান মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে দশ লক্ষ সৈন্য জমায়েৎ করেছে।

অতএব মিত্রশক্তিদের সৈন্যবল এখন খুব বাড়া আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধের সরঞ্জাম বাড়াতে হ'লে কাঁচামাল সংগ্রহ ক'রে কারখানায় অস্ত্রশস্ত্রাদি যত সময়ে বাড়ান যায়, এক একটা দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তার সৈন্যবল বৃদ্ধি তত শীঘ্র হয় না। যদি কোন দেশের মাতৃত্বের বয়সের সব

স্ত্রীলোককে শুধু জননীত্বের কাজেই লাগান যায়, এবং নূতন শিশুদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করবার সামর্থ্য সেই দেশের থাকে, তা হ'লেও যুদ্ধ করবার বয়সের পুরুষের সংখ্যা বাড়াতে ন্যূনকল্পে ১৮।১৯।২০ বৎসর লাগবে। এই কারণে, মিত্রশক্তিরা এখন সদ্য সদ্য যদি তাঁদের সৈন্যবল বাড়াতে চান, তা হ'লে সৈন্য সংগ্রহের প্রধান দেশ এখন ভারতবর্ষ। চীনও খুব বড় ও জনবহুল দেশ বটে; কিন্তু চীন ইতিপূর্বে ও ইতিমধ্যেই নিজের বাহিনী যথাসম্ভব বড় করেছে। শোনা যায় ভারতবর্ষের বাহিনীতে সাড়ে বার লক্ষ সৈন্য আছে। কিন্তু সব প্রদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করলে ভারতীয় বাহিনীর সিপাইয়ের সংখ্যা ২।৪ কোটিও হ'তে পারে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ২।৪ কোটি যুবক পাওয়া অসম্ভব হবে না।

—

"বিদ্যাপতি"

"স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে [এবং স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায়] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদন পরলোক-গত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আরম্ভ ও অংশতঃ সমাপ্ত ক'রে যান। যা বাকী ছিল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র তা শেষ ক'রে দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থখানির সমালোচনা পরে প্রকাশিত হবে। গ্রন্থখানি খুব বড়। বহু বিদ্বান ব্যক্তির পরিশ্রমে যা প্রস্তুত হয়েছে, বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তার সমাদর হওয়া উচিত।

—

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

স্বর্গত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রণীত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত "আচার্য্য কেশব-চন্দ্র" গ্রন্থ দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তার পরিচয় যথাসময়ে প্রবাসীতে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এটিতে আছে "কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম"। প্রকাশক লিখেছেন :—

> আচার্য্য কেশবচন্দ্রের এই অংশটি "ধর্ম্মতত্ত্বে" ১৮৩০ শকের ১লা চৈত্র হইতে ১৮৩১ শকের ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অষ্টাদশ সংখ্যায় ত্রয়োদশটি প্রবন্ধে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র-র পরিশিষ্ট" নামে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয় নাই।"

আগে প্রকাশিত তিন খণ্ডের মত এই খণ্ডটিও উপদেশ-প্রদ ও উপাদেয়।

—

ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা কি চান

অন্যতম কম্যুনিস্ট নেতা পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর সাম্প্রত একটি বক্তৃতায় বলেছেন, কম্যুনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতে জাতীয় গবর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠা চান। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত পি. সি. জোশীও ঐরূপ কথা বলেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যখন এক, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও সংঘর্ষ কেন অবশ্যম্ভাবী হবে?

—

"পুণ্যস্মৃতি"

শ্রীমতী সীতা দেবী প্রণীত "পুণ্যস্মৃতি" গত ২১শে শ্রাবণ প্রকাশিত হয়েছে। এর কিছু পরিচয় শ্রাবণের প্রবাসীতে দেওয়া হয়েছে। "প্রবাসী"র পাঠকেরা এর আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ প্রবাসীতেই পড়েছেন। তার সঙ্গে অবশিষ্ট প্রায় তিন-চতুর্থাংশ যোগ ক'রে বইটি ছাপা হয়েছে।

—

"মংপুতে"

"প্রবাসী"তে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী "মংপুতে" শীর্ষক যে অপূর্ব রচনাগুলি প্রকাশ করছেন, সেগুলি পূজার ছুটির আগেই পুস্তকের আকারে বেরবে আশা করা যাচ্ছে। বইটির ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে। "প্রবাসী"তে যা বেরিয়েছে এবং যা আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত বেরবে, সমস্তই বইটিতে থাকবে, তা ছাড়া অপ্রকাশিত আরও পর্ব থাকবে। রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনা কথাবার্তা সম্বলিত এরূপ দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই।

—

কংগ্রেসের দাবী ও হিন্দু মহাসভা

গত ১৮ই শ্রাবণ পুণার এক বক্তৃতায় হিন্দু-মহাসভার সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর জানিয়েছেন কি কি সর্তে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করতে পারেন। সর্তগুলি মোটামুটি এই :—

মহাজাতি হিসাবে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও অবি-ভাজ্যতা সমর্থক দ্ব্যর্থবিহীন স্পষ্ট ঘোষণা কংগ্রেসকে করতে হবে; আইন-সভাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধির সংখ্যা তাদের লোক সংখ্যার অনুযায়ী হবে, এই নীতির সমর্থন ও অনুসরণ করতে হবে; সরকারী সব চাকরিতে কেবল যোগ্যতা বিবেচনা ক'রে লোক নিয়োগ করা হবে, এই নীতির সমর্থন ও অনুসরণ করতে হবে।

হিন্দু-মহাসভার এই দাবীগুলি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। অবস্থা-বিশেষে ও স্থল-বিশেষে নির্দিষ্ট পরিমিত অল্প কালের জন্যে শেষ দুটি দাবী সম্বন্ধে সামান্য কিছু রফা সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রথম দাবীটি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও রফা হ'তে পারে না।

—

ভারতের অখণ্ডত্ব ও কংগ্রেস

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে গৃহীত শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের প্রস্তাবে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব ও অবিভাজ্যতা সমর্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু মনে হয় কংগ্রেস এ বিষয়ে হিন্দু মহাসভার মত দৃঢ় নন।

কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কিছু দিন আগে বলেন যে, মুস্লিম লীগের ও কংগ্রেসের কয়েক জন প্রতিনিধি একটা মিটমাট সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। ক্রিপ্স্ সাহেব যখন দিল্লী এসেছিলেন তখন দিল্লীতে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি একটি প্রস্তাব ধার্য করেন। তাতে এই কথা আছে:

"Nevertheless the Committee cannot think in terms of compelling any territorial unit against its declared and established will to remain within the Indian Union."

তাৎপর্য। তা হ'লেও, যুক্ত ভারত রাষ্ট্রের কোন খণ্ডকে তার ঘোষিত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে বাধ্য করবার অনুকূল চিন্তাকে কমীটি মনে স্থান দিতে পারেন না।

হায়দরাবাদের ডাক্তার সৈয়দ আবদুল লতিফ মৌলানা আজাদকে ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যদি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা মিটমাটের সর্ত আলোচনা করবার নিমিত্ত মিলিত হন, তা হ'লে দিল্লীর প্রস্তাবের উক্ত অংশ এলাহাবাদে গৃহীত লালা জগৎনারায়ণ লালের প্রস্তাব দ্বারা নাকচ হয়ে গেছে মনে করা হবে, না মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা অবাধে যে-কোন প্রস্তাব (যেমন পাকিস্তানের প্রস্তাব) বিবেচনার্থ উপস্থিত করতে পারবেন। মৌলানা আজাদ এবং পণ্ডিত নেহরু উভয়েই বলেছেন, দিল্লীর উক্ত প্রস্তাবাংশ এখনও বলবৎ আছে, অর্থাৎ এখনও পাকিস্তানের প্রস্তাবও বিবেচিত হ'তে পারে। ডাক্তার সৈয়দ আবদুল লতিফের চিঠির পণ্ডিত নেহরুর জবাবের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

The Congress position in regard to the proposal to divide up India into two or more parts is that any such division will be exceedingly harmful to both parts as well as to India as a whole. I am personally convinced that probably our Muslim friends in the north-west of India will suffer most from such a division. India, as it is, contains nearly all the important elements and resources that can make her a strong and more or less self-sufficient nation. To cut her up will be, from the economic point of view as well as others, a fatal thing breaking up that natural economic unity and weakening each part. The north will suffer most from this because it is industrially not so advanced, nor does it contain some of the essential raw-materials that are so necessary for a modern nation.

Thus, generally speaking, the Congress stands firmly for the unity of India and a federation with a great deal of autonomy for the units. For this objective it works. Nevertheless at Delhi, it made it perfectly clear that if any territorial unit was emphatically and clearly of the opinion that it should break with the Indian Union, it should not be compelled to act contrary to its wishes. Naturally, this would not be welcomed by us and it would inevitably depend on certain geographical and other factors. That decision of the Congress Working Committee stands and nothing has been said or done to modify or vary it in any way.

ভারতবর্ষকে ভাগ করার বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত পণ্ডিত নেহরু এতে জানিয়েছেন। ভাগ করলে ভাগগুলা এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হবে, বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতবর্ষের এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের খুব অনিষ্ট হবে, জবাহরলাল তাও বলেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন অংশ যদি আলাদা হ'তে চায়, তা হ'লে তাকে বাকি অন্যান্য অংশের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করার সপক্ষে তিনি নন। ভারতবর্ষের কোন অংশ ("any territorial unit") কথাগুলির মানে কি? ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট দেশটাকে যে-সব প্রদেশে ভাগ করেছেন, সেগুলা ত স্বাভাবিক ভাগ নয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আগে আগে আমরা বিস্তারিত ভাবে বলেছি। এখন পুনরুক্তি করব না। এখন কেবল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার এ বিষয়ে মনের ভাবের পার্থক্যের উল্লেখ করছি। হিন্দু মহাসভা ভারতবর্ষের বর্তমান অখণ্ডত্ব রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত, বলেছেন। কংগ্রেসের মনের ভাব তা নয়। আমেরিকার য়ুনাইটেড্ স্টেটসের অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য সেখানে ভীষণ গৃহযুদ্ধ হয়েছিল এবং যুদ্ধের ফলে অখণ্ডত্ব রক্ষিত হয়েছিল। সেই অখণ্ডত্ব এখনও আছে এবং তাতে য়ুনাইটেড্ স্টেটসের মঙ্গল হয়েছে ও বল বেড়েছে। য়ুনাইটেড্ স্টেটস্ স্বভাবতঃ একা নয়। ঐ যুক্তরাষ্ট্রের যে যুক্ততা ও একত্ব তা মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম যুক্ততা ও একত্ব। তা-ই রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এবং যুদ্ধ হয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের মত মহান্ মানবপ্রেমিক, মহান্ স্বাধীনতাভক্ত ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে। অন্য দিকে, ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ ভৌগোলিক একটি দেশ, যার একত্ব এই সেই দিনও বিদেশী ডিউক অব্ গ্লস্টার লক্ষ্য ও ঘোষণা ক'রে গেছেন। এই বৃহৎ দেশ প্রাচীন

কাল থেকে ভারতবর্ষ ব'লে বিদিত—যদিও এর ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলাদা আলাদা নাম ছিল ও আছে। সেইগুলির মধ্যে ভেদ ইহার দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক বার এর পরাধীনতার কারণ হয়েছে। আগে মধ্যে মধ্যে এর একরাষ্ট্রতাও ঘটেছিল। আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলে আবার এর একরাষ্ট্রতা ঘটেছে। ইংরেজরা নিজেদের সুবিধার জন্যে "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" নামক পদার্থ দিয়ে এবং পাকিস্তানী প্রস্তাবে প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে সেই একরাষ্ট্রতা নষ্ট করতে চায়। ভারতভক্ত কারও এই বিনাশের কাজে সায় দেওয়া উচিত নয়। চিন্তাশীল মুসলমানেরাও সায় দেন না।

—

কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে ক্রিপ্‌স্ সাহেবের বিবৃতি

কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্বন্ধে সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ গত ২১শে শ্রাবণ (৬ই আগস্ট) একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তার প্রধান দুটি কথা, এই দাবীর দরুন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মনোভাবের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই এবং ভারতকে স্বাধীনতা দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তাঁর বিবৃতিটি লম্বা। তিনি খুব বড় ব্যারিস্টার ছিলেন, সুতরাং বাগজাল বিস্তার ভাল ক'রেই করেছেন। তাঁর বিবৃতিটির সব কথা পরীক্ষা করবার দরকার নাই। গোড়াতেই তিনি যা বলেছেন, তার উপর কিছু মন্তব্য করলেই চলবে। তিনি বলেছেন, তিনি যে ঘোষণাবাণীর খসড়া নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তদনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষ যুদ্ধান্তে পাবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন স্বাধীনতা দাবী করা অনাবশ্যক, তাতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বিচলিত হবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ—তিনি যে ঘোষণাবাণী নিয়ে এসেছিলেন, সেইটাকেই যে ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলই সন্তোষজনক মনে করে নি। তার পর প্রতিশ্রুতিটির কথা। ভারতবর্ষকে ব্রিটেন বা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যত প্রতিশ্রুতি ইতিপূর্বে দিয়েছিলেন, সেগুলি কি পালিত হয়েছিল যে এটি হবে ব'লে মেনে নেওয়া যায়? তদ্ভিন্ন এটি ত পার্লেমেণ্টের প্রতিশ্রুতি নয়। পার্লেমেণ্টই সর্বেসর্বা। পার্লেমেণ্ট নিজের কৃত আইন বা নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু মানতে বাধ্য নয়। সুতরাং এই প্রতিশ্রুতিটা যে পার্লেমেণ্ট রক্ষা করবে, তার স্থিরতা কি?

—

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব

গত ২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগস্ট, বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি ওআর্কিং কমীটির নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন—

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিবেচনার জন্য যে-সকল বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা এবং তাদের পরবর্তী ঘটনাবলী, যথা—যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মুখপত্রদের উক্তিসমূহ ও ভারতে এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশে যে সকল সমালোচনা ও মন্তব্য হয়েছে, ঐ সকল বিশেষভাবে বিবেচনা করে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি ওয়ার্কিং কমীটির উক্ত প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করছেন এবং এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, পরবর্তী ঘটনাবলীতে উক্ত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অধিকতর বৃদ্ধি করেছে এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ রাখে নাই যে, ভারতের জন্য এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান অত্যাবশ্যক। ভারতে ব্রিটিশ শাসন চলতে থাকলে ভারতের অবস্থার অধিকতর অবনতি হবে, ভারত অধিকতর দুর্ব্বল হয়ে পড়বে এবং ক্রমেই আত্মরক্ষার এবং জগতের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সহায়তায় ভারতের সামর্থ্য অধিকতর পরিমাণে হ্রাস পাবে।

চীন ও রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি

কমীটি চীন ও রাশিয়ার অবস্থা খারাপ হচ্ছে দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণে তাদের বীরত্বের প্রশংসা করছেন। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রামরত এবং পর-আক্রমণপীড়িত রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই, এই সব বর্ত্তমান বিপদের প্রতি লক্ষ্য রেখে মিত্রশক্তিবর্গের অনুসৃত নীতির ভিত্তিমূল পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, কেননা সেই নীতিই বার-বার মারাত্মক ব্যর্থতা ডেকে আনছে। ঐ নীতি, উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করে চললে ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিবর্ত্তিত করতে পারা যাবে না, কেননা অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ঐ নীতির উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থার মধ্যে ব্যর্থতাই অন্তর্নিহিত। ঐ নীতির ভিত্তি স্বাধীনতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অধীন এবং উপনিবেশ-সমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারা এবং ব্যবস্থা-সমূহ অব্যাহত রাখার প্রতি লক্ষ্য রেখেই উক্ত নীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যের আধিপত্য শাসকের শক্তি বৃদ্ধি না ক'রে শাসকের পক্ষে ভার এবং অভিশাপ স্বরূপ হয়ে পড়েছে। আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন লীলাভূমি ভারত এই সমস্যার চরম পরিণতিতে পৌঁছেছে, কেননা ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নেই ব্রিটেনের এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের বিচার হবে এবং এশিয়ার ও আফ্রিকার জনগণের অন্তর আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে। সুতরাং এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং অবিলম্বে তার সমাধান আবশ্যক। এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সাফল্যনির্ভর করছে। নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বতন্ত্র ভারত তার সর্ব্বশক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগ ক'রে এই সাফল্য সুনিশ্চিত করবে। যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর শুধুই যে এর বিশেষ প্রভাব হবে তা নয়, সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানব সমাজ সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন করে তাদিগকে অর্থাৎ ভারতের মিত্র রাষ্ট্রসমূহকে পৃথিবীর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব অর্পণ করবে। ভারত দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ

থাকতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের এই কলঙ্ক সম্মিলিত জাতিসমূহের ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

সুতরাং বর্ত্তমান বিপদের দিনে ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশ্বাস বা নিশ্চয়তা দ্বারা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হবে না বা বর্ত্তমান বিপদের প্রতীকার হবে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বাস দ্বারা জনগণের মনের উপর প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। লক্ষ লক্ষ লোকের সে প্রেরণা ও শক্তি অবিলম্বে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করতে পারে। জনগণ একমাত্র এখনই স্বাধীনতা লাভ করলেই সে শক্তি স্ফুরিত হতে পারে।

সুতরাং ভারত হতে ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের জন্য যে দাবী করা হয়েছে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ ক'রে তা পুনরুত্থাপন করছেন। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে এক সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হবে এবং স্বতন্ত্র ভারত সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্ররাষ্ট্রে পরিণত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচেষ্টায় তাদের সুখদুঃখের সমান অংশীদার হবে। একমাত্র এ দেশের প্রধান পার্টি ও দলগুলির সহযোগিতায়ই সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হতে পারে। সুতরাং ভারতের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই গবর্ণমেণ্ট গঠিত হবে ও তা এক মিশ্র গবর্ণমেণ্ট হবে। এই গবর্ণমেণ্টের প্রথম কার্য্য হবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মিত্রশক্তিবর্গের সহিত সহযোগিতায় সর্ব্বপ্রকারের হিংস ও অহিংস উপায়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা। ক্ষেত্রে কারখানায় এবং অন্যান্য স্থানে যারা পরিশ্রম করে মূলতঃ সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার তাদেরই হবে এবং সাময়িক গবর্ণমেণ্ট তাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করবেন।

গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা স্থির করবেন এবং সেই গণপরিষদ ভারত-শাসনের জন্য সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করবেন। কংগ্রেসের মতানুসারে সেই শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হবে। যে সকল রাষ্ট্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, তাদিগকে যত অধিক সম্ভব স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যা অবশিষ্ট থাকবে, যে সকল রাষ্ট্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, সেই ক্ষমতা সেই সকল রাষ্ট্রে বর্ত্তিবে। পারস্পরিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আক্রমণ প্রতিরোধরূপ সাধারণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতা করবার জন্য ঐ সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা ভারতের সহিত সম্মিলিত জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের বিষয় স্থির করবেন। স্বাধীনতা লাভ করলে ভারত জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা পুষ্ট হয়ে, কার্য্যকরভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।

ভারতের স্বাধীনতা, এশিয়ার বৈদেশিক শাসনাধীন অন্যান্য সকল জাতির স্বাধীনতার প্রতীক এবং অগ্রদূত হবে। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরান ও ইরাক অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এই কথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে হবে যে, যে-সকল রাজ্য এক্ষণে জাপানের কর্তৃত্বাধীনে আছে, অতঃপর তাদিগকে অন্য কোনও ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীনে বা কর্তৃত্বাধীনে রাখা হবে না।

বর্ত্তমান সঙ্কট মুহূর্ত্তে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রধানতঃ ভারতের স্বাধীনতার এবং ভারতরক্ষার সহিতই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কমীটির অভিমত এই যে, জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্নতির জন্য বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের মৈত্রীবন্ধন একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভিত্তিতে আধুনিক জগতের সমস্যাসমূহের সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে। এই ধরণের বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠিত হ'লে, যাদের দ্বারা সঙ্ঘ গঠিত, সেই সকল জাতির স্বাধীনতা নিরাপদ হবে। আক্রমণ প্রতিরোধ, এক জাতি কর্ত্তৃক অন্য জাতিকে শোষণ, সংখ্যালঘিষ্ঠের সংরক্ষণ, অনগ্রসর অঞ্চল ও অধিবাসীদের উন্নতিবিধান এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য জগতের যাবতীয় সম্পদ বিনিয়োগকল্পে সঙ্ঘ গঠন প্রভৃতি এই বিশ্বরাষ্ট্র গঠন দ্বারা সুনিশ্চিত হবে। এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠিত হ'লে জগতের সকল রাষ্ট্রে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর হবে। তখন আর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর কোনটিরই প্রয়োজন হবে না। তখন বিশ্বরাষ্ট্ররক্ষিবাহিনী জগতের শান্তি রক্ষা করতে এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।

এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে স্বাধীন ভারত সানন্দে যোগদান করবে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানে সমমর্য্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতা করবে।

যে-সকল জাতি ফেডারেশনের মূলনীতিতে বিশ্বাসী হবেন তাঁদের সকলেরই তাতে যোগদানের অধিকার থাকবে; কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনায় প্রারম্ভে মাত্র সম্মিলিত জাতিসমূহ নিয়ে এই ফেডারেশন গঠিত হবে। বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'লে যুদ্ধের উপর, এক্সিসপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের জনগণের উপর এবং ভবিষ্যতে যে শান্তি স্থাপিত হবে তার উপর ওর বিশেষ ফল হবে।

কিন্তু কমীটি দুঃখের সহিত উপলব্ধি করছেন যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান কঠোর এবং শোকাবহ শিক্ষা এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান বিপদ সত্ত্বেও অতি অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। বর্ত্তমান দুর্দ্দৈব প্রতীকারার্থে এবং ভারতের আত্মরক্ষা এবং চীন ও রুশিয়ার দুর্দ্দিনে তাকে যাতে সাহায্য করতে পারা যায়, মূলতঃ তজ্জন্য ভারতের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হ'লেও পরিষ্কার দেখা যায়, এই দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া ও বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহের বিপক্ষচালিত সমালোচনাবলী ভারতের দাবীর বিরোধিতা করছে।

চীন ও রাশিয়ার স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান এবং উহা রক্ষা করতেই হবে। চীন ও রাশিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিরোধ ক্ষমতা যাতে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়, তজ্জন্য কমীটি উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভারতের এবং এই সমস্ত জাতির বিপদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন এবং বৈদেশিক শাসন নেওয়ার ফলে শুধুই যে ভারতের আত্মরক্ষার ও প্রতিপক্ষকে বাধা দানের ক্ষমতার হ্রাস পেয়ে ভারতের অবনতি হচ্ছে তা নয়, এক্ষণে ক্রমবর্দ্ধমান বিপদ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না, সম্মিলিত জাতিসমূহের জনগণের মঙ্গলের জন্যও কিছু করা হচ্ছে না। গ্রেট ব্রিটেন এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশে ওয়ার্কিং কমীটি যে আবেদন প্রচার করেছিলেন, তৎসম্পর্কে এ যাবৎ কোনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। বৈদেশিক মহলে ওয়ার্কিং কমীটির আবেদনের যে সমালোচনা করা হচ্ছে, তার থেকে ভারত ও পৃথিবীর প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে তাঁদের বিরুদ্ধতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্ত বৈদেশিকদের প্রভুত্ব করার মনোভাব এবং জাতিগত শ্রেষ্ঠতার মনোভাবেরই নিদর্শন এবং নিজেদের দাবীর ন্যায্যতা ও নিজেদের শক্তি সম্পর্কে যাঁরা সজ্ঞান, সেই গর্ব্বিত জাতি কখনও উহা সহ্য করতে পারে না।

বিশ্বস্বাধীনতার খাতিরে এই শেষ মুহূর্ত্তে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের নিকট পুনরায় নূতন ক'রে এই আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু কমীটি মনে করেন যে, যে সাম্রাজ্যবাদী এবং কর্ত্তৃত্বশীল গবর্ণমেণ্ট জাতির উপর আধিপত্য করছে এবং জাতিকে

তার নিজের এবং মানব জাতির স্বার্থসাধনের জন্ত কাজ করতে দিচ্ছে না সেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জাতির নিজস্ব ইচ্ছাকে ব্যক্ত করবার প্রচেষ্টা হতে কমীটি জাতিকে আর বাধাদান করতে পারেন না। স্থতরাং গত ২২ বৎসর শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দেশ যে অহিংস শক্তি অর্জ্জন করেছে, দেশ যাতে সমগ্রভাবে সেই শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তজ্জন্ত কমীটি স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের যে অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অহিংস পন্থায় যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে গণআন্দোলন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করছেন। এই সংগ্রাম অনিবার্য্যরূপে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবে সেই সমস্ত পন্থায় জাতিকে পরিচালিত করবার জন্ত তাঁকে অনুরোধ করছেন।

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাগ্যে যে সমস্ত বিপদ এবং দুঃখকষ্ট ঘটবে তাঁদিগকে সেই সমস্ত বিপদ এবং দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হবার, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সজ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবার এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিক হিসাবে তাঁর (গান্ধীজীর) নির্দ্দেশ পালন করবার জন্যে অনুরোধ করছেন। তাঁদিগকে অবশ্যই এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় আসতে পারে যখন আর আমাদের জনগণের নিকট নির্দ্দেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হবে না এবং কোন কোন কংগ্রেস কমীটি কাজ চালাতে পারবেন না। যখন এইরূপ অবস্থা ঘটবে তখন যে-সমস্ত নরনারী এই আন্দোলনে যোগদান করবেন তাঁদের প্রত্যেকেই সাধারণ নির্দ্দেশাবলীর গণ্ডীর ভিতরে থেকে নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যাবেন। স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় তৎপর প্রত্যেক ভারত-বাসীকেই তাঁর নিজের পথপ্রদর্শক হয়ে যে বন্ধুর পথের কোথাও বিশ্রামের স্থান নাই এবং ভারতবর্ষের মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর যে পথের অবসান হয়েছে সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের ভাবী শাসনব্যবস্থা কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করবার পর উপসংহারে সুস্পষ্টভাবে সকলকে এই কথা জানিয়ে দিতে চান যে গণ-আন্দোলন আরম্ভ ক'রে এর দ্বারা কংগ্রেসের জন্ত ক্ষমতা লাভ করবার কোন উদ্দেশ্য নাই। ক্ষমতা যখন হস্তগত হবে তখন তা ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারণের হাতেই থাকবে।—এসোসিয়েটেড প্রেস।

—

কংগ্রেসের দাবীতে ভারত-সরকারের সাড়া

কংগ্রেসের দাবীতে ভারত-সরকার খুব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সাড়া দিয়েছেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি কর্ত্তৃক ওআর্কিং কমীটির প্রস্তাব অনুমোদিত হবার খবর নিউ দিল্লীতে ৮ই আগষ্ট পৌঁছবা মাত্রই সেই রাত্রেই, ও রকম দাবী যে বিবেচিতই হতে পারে না, সপারিষদ বড়লাটের এই মর্ম্মের এক রিজল্যুশন প্রকাশিত হয়েছে।

"To a challenge such as the present," declares the resolution, "there can only be one answer. The Government of India would regard it as wholly incompatible with their responsibilities to the people of India, and their obligations to the Allies, that a demand should be discussed, the acceptance of which would plunge India into confusion and anarchy internally and would paralyse her effort in the common cause of human freedom."

—

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির গ্রেপ্তার

আমরা মনে করি গবন্মেণ্ট মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে এখনই গ্রেপ্তার ক'রে ভুল ক'রেছেন। ভবিষ্যতে কি অবস্থা ঘটত এবং তখন গ্রেপ্তার করা উচিত হ'ত কি না, সে বিষয়ে আমরা মত প্রকাশে অসমর্থ।

—

বিশ্বপথিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

১লা বৈশাখ, ১৩২২

কল্যাণীয়াসু

মীরু,

তোরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্।

এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হ'য়ে গেল—মনটা তাতেই পূর্ণ হ'য়ে আছে।

কোথাও যাব-যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময়ে আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বার বার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষ কালে স্পষ্ট বুঝেছি বিধাতা আমাকে গৃহস্থঘরের জন্যে তৈরি করেন নি। বোধ হয় সেই জন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোন জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারি নি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে আমিও তাকে বরণ করে নেব। তোরা কিছু ভাবিস নে—আমার যা কাজ সে আমাকে করতেই হবে—আরাম করা বিশ্রাম করা লোকলৌকিকতা করা বিধাতা আমার জন্যে কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না। অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্ব্বলোকের মাঝখানে চললুম—তোদের জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ রইল – সুখের আশীর্ব্বাদ নয় কল্যাণের আশীর্ব্বাদ।

বাবা।

এই চিঠিখানি আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত। ১৯১৩ সালে কবি দ্বিতীয় বার আমেরিকায় যান।

মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

৫

"এ ছবি দিয়ে কি হবে, কোথা থেকে জোগাড় হ'ল? স্বয়ং মানুষটা ত ঘরেই রয়েছে তবে এত ছবির উপর লোভ কেন?" "আহা, আসল মানুষ আর ক'দিন বা আমার ঘরে থাকবেন, পালাই পালাই ত সুরু হয়েছে।" "ও সে ত সুরু হয়েছে এক যুগ হয়ে গেল, কিন্তু পালাতে পারছে কই? দেশ শুদ্ধ লোক ভাবছে, বিশেষ ক'রে কবিরা, যে আর কত দিন? মেয়াদ পার ক'রে দিয়েও এমন জায়গা জুড়ে ব'সে থাকলে অন্য লোকদের চলে কি ক'রে? এ একেবারে বাড়াবাড়ি অন্যায় রকম বেঁচে থাকা!" "আঃ আপনার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করব আমি।" "উঃ কি আরাম পাব তা হ'লে, মনে করতেও আনন্দ হয়।" ছবিটা নিয়ে দেখছেন। "বিনা কলমে কি রকম ক'রে লেখা যায় সে শিক্ষা ত আজও আমার হয় নি।" তাড়াতাড়ি কলমটা এনে দিলুম। লিখে পড়লেন :—

"চলে যাবে সত্তা রূপ সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে
রেখে যাবে মায়া রূপ রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

কেমন, ঠিক হয়েছে ত? কি করবে সে মায়া রূপ দিয়ে, আলো আর ছায়া? কত অটোগ্রাফই লিখেছি জীবনে, অটোগ্রাফের হরির লুট।" "আমায় কিন্তু কখনো দেন নি।" "বটে, আর যে তিন-শ চিঠি লিখলুম।" "চিঠি! কোথায় চিঠি! খানতিনেক বড়জোর!" "অয়ি অনৃতবাদিনী, আমি চিঠি লিখতে পারি নে বলতে চাও? এই যে মাসী, কি তুমিও একটা ছবি এনেছ নাকি? তোমার ভাগ্নীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে, উনি বলতে চান উনি আমার চেয়ে অনেক ভাল চিঠি লিখতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার কি বিচার বল?" "বাঃ! কখন তা বললুম।" "বল নি হয়ত, কিন্তু বলতে কতক্ষণ? কল্পনাশক্তি নেই আমার! কবিখ্যাতি বজায় রাখতে হ'লে কত হিসেব ক'রে চলতে হয়। তার চেয়ে মাসী তুমি ব'সো, তোমার একটা ছবি আঁকা যাক্। ভাগ্যিস শেষজীবনে এই দেবী আমায় ধরা দিলেন, জীবনের একটা নূতন পর্ব্ব রচনা হ'ল। নূতন রকম ক'রে জগতকে দেখলুম আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে। আমার ছবি এ দেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না। প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভাল দেখতে কি না, দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কি না। সে দেখা কেমন ক'রে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই। ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সেই জন্যেই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাই নে। প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমার ছবি দেখবার মত ক'রে।"

সে সময়ে এখানে বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে, জুন মাস, নানা রকম কীট-পতঙ্গের উপদ্রব সুরু হয়েছে, সন্ধ্যে হলেই বড় বড় গুবরে পোকা উড়ে আসত, মাসী আবার সে-গুলোকে বড় ভয় পেতেন। একদিন সকাল বেলা রস নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মাসীও প্রণাম করতে এসেছেন, "দেখ মাতৃস্বসা এক সময়ে আমি একটু জ্যোতিষ চর্চ্চা করতুম, স্পষ্ট দেখছি আজ তোমার কপালে কিছু বিপদ আছে।" "কী বিপদ বলুন?" "তাও কি বলা যায়, তবে ঘটবে একটা দুর্ঘটনা।" মাসী ত সারাদিন প্রশ্ন ক'রে ফিরতে লাগল "কী হবে?" তখন সন্ধ্যেরাত্রি, আমাদের আহারের সময় হয়ে এল, আমি ওঁর ওষুধ দেব ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি, হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ও জিনিস-পত্রর লণ্ডভণ্ড শব্দ শুনে খাবার ঘরে এসে দেখি মাসী একটা চৌকির উপর দণ্ডায়মান, খাবার টেবিল তোলপাড়, আর কবি যাঁদের বলতেন তিন কর্ত্তা—বড়কর্ত্তা, ছোট-কর্ত্তা আর গৃহকর্ত্তা, তাঁরা একটা প্রকাণ্ড গুবরে পোকা নিয়ে হৈ হৈ ক'রে খেতে সুরু করেছেন। তখন প্রকাশ হ'ল ওটা চকোলেটের গুবরে পোকা দার্জ্জিলিং থেকে বড়কর্ত্তা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, তার পর পূর্ব্ব পরামর্শমত মাসীর প্লেটে ন্যাপকিনাবৃত হয়ে অপেক্ষা করছিল। এ ঘরে এসে দেখি আপন মনে খুব হাসছেন। "মাতৃস্বসা, বলেইছিলাম আজ তোমার বিপদ আছে।" "কী আশ্চর্য্য আপনিও এ পরামর্শে ছিলেন?" "তাই ত এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তোমরা যেন আবার এসোশিয়েটেড্ প্রেসে খবর দিও না, তাহলে কবি-সম্রাটের গুরুত্বটা একেবারে কমে যাবে, বিশেষ ক'রে

আমাদের এই গুরুতে পাওয়া দেশে। আচ্ছা আমি যদি তোমাদের গুরু হয়ে খুব উচ্চাসনে ব'সে দুটি একটি উপদেশ দিতাম তাহলে কে বঞ্চিত হ'ত তাই ভাবি। যারা নিজেদের একটা মইয়ের উপর তোলে কতটা যে বঞ্চিত হয় জানে না।"

তিনি সমস্ত দেশের যথার্থ গুরু ছিলেন। সমস্ত দেশকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন নির্ম্মল পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির মধ্যে, রসের আনন্দানুভূতির মধ্যে। তাঁর শিক্ষায়, তাঁর কথায়, তাঁর চিন্তায় লালিত হয়ে আমরা অনেক বেশী মানুষ হয়ে উঠেছি, কিন্তু তিনি কখনো নিজেকে উঁচু মঞ্চে তুলে উপদেশ বর্ষণ করেন নি। মানুষের হৃদয়ে সখা হয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন, সখা হয়ে তিনি গ'ড়ে তুলেছেন আমাদের; তাই তিনি যথার্থ শিক্ষক, যথার্থ গুরু। এমন অনায়াসে তিনি শিশুর মত খুশী হতেন, যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, লিখেছেন গভীরতম তত্ত্ব তখনও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সহজে ফিরে আসতেন আমাদের মধ্যে। কিছু তিনি সরিয়ে রাখতেন না, কিছু বাদ দিতেন না, যা তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্য তাও হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। এমন ব্যবহার করতেন যে আমরা অনায়াসে সব বিষয়ে তর্ক বাদপ্রতিবাদ করতুম, যেন উনি আমাদেরই এক জন। এই ঘটনা দূর থেকে মনে করলে তখনও আশ্চর্য্য লাগত, এখনও লাগে। তাই আজ মনে হয় তিনি শুধু পরম পূজনীয় গুরুদেব নন, শুধু মহা প্রতিভাশালী কবি নন, মানুষের হৃদয়ের সখা তিনি। আমরা তাঁর সেই কৌতুক-স্নেহোজ্জ্বল সহাস্য আনন্দময় মূর্ত্তি দেখেছি, এই আমাদের জীবনের সব চেয়ে আনন্দ, সব চেয়ে গৌরব, সব চেয়ে গভীর আশীর্ব্বাদ।

একটা বিষয় আমার অপটু ভাষায় লিখে বোঝান সম্ভব নয়, কিন্তু সে আমাদের প্রত্যহের অনুভবের গোচর ছিল। তিনি সর্ব্বদাই সকলের সঙ্গে সকল বিষয়ে আলাপ করতেন, তুচ্ছতম ঘটনাতেও কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, আমাদের প্রত্যহের সুখদুঃখ সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সবই তাঁর পরিচিত ছিল, কিন্তু তবু তিনি যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দূরে চলে যেতেন, সেটা অনুভব করেছি। এখনি কোন বিষয়ে কথা কইলেন সহজ কৌতুক হাস্যপরিহাস, পর-মুহূর্ত্তে যখনই স্তব্ধ হলেন তখনই সে যেন অন্য মানুষ। যেন একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল তার ওপারে গভীর অজানা রহস্যকে আড়াল ক'রে। আমাদের এমন স্নেহের স্থান ছিল যে আমরা সকল সময়ই তাঁর সঙ্গে সকল বিষয়ে কথা বলতাম, কিন্তু তবু আমার অন্তত এমন বহুবার ঘটেছে যে কিছুতেই কোন্ কথা বলতে পারি নি অনেক-ক্ষণ, প্রয়োজনীয় কিছু থাকলেও না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে ব'সে অনুভব করেছি সেই প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয়ের দূরত্ব। এখন বুঝতে পারি এসব কথা লিখে বোঝান কত অসম্ভব।

তাঁর কথা যে কিছুই লেখা হ'ল না শুধু তাই নয়, কারণ তাঁর কথা আমরা কতটুকুই বা জানি? তবু তাঁকে আমরাই যতটুকু দেখেছিলাম, যেমন ক'রে দেখেছিলাম, তাও বলা হ'ল না। মুখের দু-একটা কথা লিখে রাখা যায়, কিন্তু কতটুকু সে? নীরবতায় যে এক প্রকাণ্ড প্রকাশ সে কেবল অনুভূতির মধ্যে। তাই তাঁর কাছে এসে তাঁকে জীবনে লাভ করার যে উপলব্ধি সে প্রকাশ্য নয়, অতি গভীর তার অনির্ব্বচনীয়তা। তিনি যে কবি, প্রত্যেকটি দিনের তাঁর যে গভীর কবিত্ব, যে রসস্নিগ্ধ অভিব্যক্তি, যে নিস্তব্ধ শান্তি, আমরা অনুভব করেছিলুম, ভেবেছিলুম তা ধরে রাখব কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না।

"এখুনি তোমার কর্ত্তৃপক্ষ এসেছিলেন, তাঁকে কয়েকটা কথা বেশ বুঝিয়ে বললুম, তা সে এমন নীরবে থাকে যে রাজী হ'ল কি না বোঝা গেল না। তাকে বললুম কিছু দিন ছুটি নিয়ে সবাই মিলে চল শান্তিনিকেতনে, শান্তিনিকেতনে এইবারে সুরু হবে ঘনঘটা তা জানো, সে দেখবার মত। যখন অন্ধকার ক'রে ছুটে আসে ঘন কালো মেঘ, চারি দিকের তৃষিত মাটি শ্যামল হয়ে ওঠে, সে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। আর আমরাও কিছু কিছু আতিথ্য করতে পারি, নিশ্চয় বলছি বৌমার তত্ত্বাবধানে আরামেই থাকবে।" "এ সব কথা উঠছে কেন, কোনো খবর এল? যাবার সময় হয়ে এল নাকি?" "না না, এখনও জানি নে, তবে যেতে ত হবেই এক দিন। এসেছি যখন, তখন যেতেও হবে, নইলে কুইনীন বানানো সুরু করতে হয়। কাগজে বড় বড় অক্ষরে বেরুবে 'ভারত-সরকারের অসামান্য চাতুরী, মংপুতে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে রবীন্দ্রনাথ বন্দী!' হায় রবীন্দ্র কবীন্দ্র ব'লে কত লোক কবিতা লিখবে, রামানন্দবাবুকে আবার সেগুলো ছাপাতে হবে, এ কি ভাল হবে? এত হাঙ্গামা? কি ভাবছ কি?" "আমরা যদি আপনার কোন রকম আত্মীয় হতাম, কত ভাল হ'ত তাই ভাবছি।" "কেন, কী জন্যে? আত্মীয় না হওয়ায় কী ক্ষতি হয়েছে? এত কবিতা প'ড়ে এই তোমার বুদ্ধি? আত্মীয় হ'লেই কি আত্মীয় হওয়া যায়? তার চেয়ে এই যা হয়েছ সে ঢের ভাল, কাছে থাকলেই যদি সব চেয়ে বেশী পাওয়া হ'ত তা হ'লে ত

মহাদেব আমাকে সব চেয়ে বেশী পায়! প্রথম যাদের মধ্যে জীবন সুরু করেছিলাম তাদের থেকে ভেসে চলে এসেছি, আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনই ত অনাত্মীয়ে ভরা, কিন্তু তারা ত অনাত্মীয় নয়। যাদের মধ্যে জন্মেছিলাম, দূরে চলে এসেছি তাদের থেকে। তোমরা যারা পর তারা যখন নিকটে আস, এত অকারণ অহৈতুক স্নেহ আন, সে ত আমি অবহেলা করি নে, খুব বড় জায়গা দিই তাকে। সে স্নেহ সে গভীর শ্রদ্ধা আমি বিশ্বমানবের দান ব'লে গ্রহণ করি। বিগলিত হয়ে যায় হৃদয়, বুঝতে পারি নে কেন পাই। তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক, নালিশ করবার কিছু নেই আমার সেই জন্য দেখ ত কত অনাবশ্যক চিঠি লিখি, কেউ যদি আমার এক লাইন লেখা পেয়ে খুশী হয় তাকে ফেরাই কি ক'রে বল? আমার কর্ত্তারা তা বোঝে না, অবশ্য ক্লান্ত শরীরে অনেক সময় নষ্ট হয় এসব কাজে—তা জানি, কিন্তু আমি ফেরাতে পারি নে। কেউ যদি দেখা করতে আসে, ফস্ ক'রে বলা যায় না যে সময় নেই। যে গভীর স্নেহ তোমরা উপহার দাও, আমি সত্যিই জানি নে সে কেন—সে কি আমি বড় কবি ব'লে? আমি যদি ভাল কবিতা লিখি, তাতে তোমাদের কী? জীবনে পেয়েছি অনেক দেশে-বিদেশে। প্রশংসা-পত্র অভিনন্দন এসব অনেক কবির ভাগ্যে জোটে। নোবেল প্রাইজের মূল্যও নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু এই অহৈতুক গভীর স্নেহ এ অমূল্য, এ দুর্লভ, কখনো মনে ক'রো না যে আমি তা বুঝি নে।" "অনেক দিন আগে আপনাকে একটি মেয়ে কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন, আপনি চিনতেন না তাঁকে, আপনার উত্তরের সঙ্গে সে লেখাটা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখাটা ভাল হয়েছিল যদিও, আমার মনে নেই, কিন্তু উত্তরটা মনে আছে,

সুন্দর ভক্তির ফুল নিভৃতে অলক্ষ্যে তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে
হে শোভনে, আজি এই নির্ম্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েছ দক্ষিণা মোরে কবির গভীর পুরস্কার
লহ আশীর্ব্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দন বন সৃষ্টি কর সুধাস্নিগ্ধ সুরে।
বঙ্গের নন্দিনী তুমি প্রিয়জনে কর আনন্দিত
প্রেমের অমৃত তব মনে ঢেলে দিক গানের অমৃত।

মনে পড়ে আপনার?" "একটু অস্পষ্ট মনে হয়। ভাল ত লেখাটা। তোমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় ত মন্দ নয়!"

কুয়াশায় আচ্ছন্ন চতুর্দ্দিক। ঘোর বর্ষা নেমেছে, অন্ধকার ক'রে ঢেকে গেছে সামনের "ঢালু গিরিমালা—", পাশের ঝরণাটা কলধ্বনি ক'রে ছুটে নেমে যাচ্ছে। কবি ব'সে আছেন স্তব্ধ হয়ে—দূরে প্রসারিত দৃষ্টি। উনি যখন চুপ করে ব'সে থাকতেন, সে এমন চাঞ্চল্যহীন গভীর চুপ করা যেন চারি দিকে সৃষ্টি হ'ত নৈস্তব্ধ্যের পরিমণ্ডল—পা হয়ত ঈষৎ নাড়িয়ে চলতেন এক রকম ভাবে, তা ছাড়া সব স্তব্ধ, যেমন ব'সে আছেন তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। বোধ হয় একটুও নড়বার দরকার হ'ত না। পিছনে আমরা দু-জনে বসেছিলুম, আমি আর মাসী। রেশমের মত চুলের উপর আলো পড়েছে, কি রকম আশ্চর্য্য সিল্কের চাইতেও মসৃণ চুল ছিল তাঁর। "কি গো, তোমরা এত গোপনীয় হয়ে উঠলে কেন? সামনে এসে ব'সো—বাজাও না, কী তোমাদের রেকর্ড আছে?" সেদিন অনেকগুলো গানের রেকর্ড বাজান হয়েছিল, প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে নিজেও গাইছিলেন—গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব—বাইরে এই লীলাই ত এখন চলেছে? জটার গভীরে লুকালে রবিরে ছায়াপটে আঁকো এ কোন ছবিরে? সেদিন আর একটা গান বাজান হয়েছিল—আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান। গ্রামোফোন বন্ধ হবার পর নিজেই সম্পূর্ণটা গাইলেন,

তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে।

সুরকে ত ধরে রাখা যায় না, তাই সেই সন্ধ্যার মাধুরী হারিয়ে গেল। মাসী বললে, "সত্যি মনে পড়বে?" উনি ঈষৎ মধুর হেসে ফিরে তাকালেন—স্নেহস্নিগ্ধগভীর সে দৃষ্টিপাত। "তা পড়বে, সত্যিই পড়বে। এই সামনের পাহাড়ের বুকে সবুজ বন্যা, ওই উদ্ধত গাছ, দূরের পথে পাহাড়িয়াদের যাতায়াত, সিঁড়ির টবের জিরেনিয়াম, সন্ধ্যেবেলা আলো জেলে ইঙ্গিত, সবই মনে পড়বে। মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, জানি মংপু আমার মনে থাকবে।

সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে
বর্ষা-মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে।"

"এইমাত্র মনোমোহন এসেছিলেন, আলুর সাহায্যে আমায় বুঝিয়ে গেলেন যে সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে খুব ভাল, সব চেয়ে ভাল, তার অল্প পরেই নাকি চেরি-ফুল ফোটে তোমাদের পাহাড়ে! Cherry ripe Cherry ripe Cherry ripe a full and fair one come and try! চেরী ফুল যখন ফোটে তখন তোমাদের সুসজ্জিত অরণ্যানী দেখবার মত হয়। তোমার বাড়ীতে আছে চেরী-গাছ?" "বাড়ীতে আছে, সে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু রাস্তার দু-ধারে

যে গাছের সারি একসঙ্গে সব ফুটে ওঠে। "হ্যা একসঙ্গে না হ'লে চেরীর রূপ ফোটে না। সে সময়ে ঘরে আগুন জ্বালো logfire থাকে ব'লে? আসা যাবে সেপ্টেম্বরে, দেখব মংপুর মেঘমুক্ত অবগুণ্ঠনহীন মুখ।" "কিন্তু আপনার আবার আসার সম্ভাবনা নাকি খুবই কম। আপনার কাছে এ জায়গা পুরানো হয়ে গেছে। যেমন বাড়ীঘর পুরানো হয়ে যায় আপনি ঘর বদল করতে ভালবাসেন, তেমনিই আপনার চার পাশে যারা থাকে তারাও নাকি পুরানো হয়ে যায়, একথা সত্যি?" "মনোবিকলন কি একেই বলে? এ সব কথারও তুমি উত্তর দিতে পার না? পুরানো হয়ে যাওয়াটা ত একটা fact, সে ত অস্বীকার করা চলে না। তাই ব'লে পুরানো হলেই মূল্য কমে একথা কে বলবে! মানুষ আর বাড়ী কি এক? মানুষ ত অচল পদার্থ নয়! তার মন নড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেটা চৌকি টেবিল দরজা জানলার চাইতে অল্প একটু অন্য রকম, একথা বল না কেন? •তোমাকে সবাই ক্ষ্যাপায় আর তুমি ক্ষ্যাপো। শোন কেন কথা! আমি সেপ্টেম্বরে আসবই।" বহুবার বহুস্থানে একথা শুনেছি, কবি স্বভাবতই অসহিষ্ণু, দীর্ঘদিন তাঁর প্রিয় কেউ থাকে না, আজ যাকে পছন্দ করেন কাল তাকে সরিয়ে দেন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়, অবিশ্বাসের পাত্রকেও তিনি বিশ্বাস করতেন সেই ছিল তাঁর অভ্যাস, পরে হয়ত ভুল ভাঙত। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে অসহিষ্ণু তিনি ছিলেন না। তিনি যে যথার্থ কবি তাই তিনি সৃষ্টি করতেন মানুষকে, তাদের মন খুঁজে বের করতে জানতেন। যে রকম অবাঞ্ছিত অযোগ্যদেরও প্রশ্রয় দিতেন ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। আমরা সাধারণতঃ যতটুকু শিক্ষা বা সংস্কৃতি লাভ করেছি, তার চেয়ে সামান্য একটু নিম্নস্তরের মানুষদের কতটুকু সময় সহ্য করতে পারি? আমাদের মধ্যে যাঁর বিদ্বান্ ব'লে খ্যাতি তিনি মূর্খকে দূরে রাখেন—যাঁর ধারণা তিনি সাহিত্যিক বা কাব্যরস-পিপাসু, যারা সে সব বোঝে না খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটায় তাদের তিনি কি চোখে দেখেন? যাঁরা দেশের কাজে নেমেছেন বা সেজন্য এতটুকু ত্যাগ করেছেন তাঁরা আমাদের মত গৃহজীবী লোকদের কি স্থান দেন? কিন্তু তিনি? যদি পার্থিব দিক থেকে দেখা যায় তাহলে বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিবারে আভিজাত্যের উচ্চশিখরে রাজকীয় তাঁর আবির্ভাব। যদি রূপের কথা ভাবা যায়—এত রূপও যে মানুষে সম্ভব তা কে জানত? ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ। অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য, অপার্থিব মধুময় কণ্ঠস্বর, তবে সে কথাও থাক কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি প্রতিভার যে উচ্চলোকে তিনি ছিলেন, সেখান থেকে তাঁর চার পাশের সমতল কত নীচু তা ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়, তবু সেই উচ্চ শিখর থেকে তিনি ত তাঁর চার পাশের নিম্নভূমির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নি। যেমন তুষারাবৃত হিমালয়ের হৃদয় ভেদ ক'রে নদী বয়ে আসে, তেমনি তাঁর হৃদয়ের উৎস থেকে গভীর করুণা, মমতাময় অন্তর্দৃষ্টি, অন্তহীন স্নেহধারা, নিয়ত প্রবাহিত হয়ে যেত, এটা একটা কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা নয়, সম্পূর্ণ সত্য। বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি জানতেন অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে তাঁর নিজের কতখানি এবং কি প্রকারের প্রভেদ, কিন্তু সে প্রভেদ তাঁকে দূরে রাখত না। হৃদয়ে নিয়ত মিলিত হতেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সর্ব্ব রকমে অনেক নিকৃষ্ট। সেটা তাঁর একটা ইচ্ছাকৃত অবতরণ ব'লে মনে হ'ত না, সেইটাই তাঁর স্বভাব। মানুষকে তিনি গ্রহণ করতেন। তুচ্ছতম লোকও যে তুচ্ছ নয়, অসম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে যে-মানুষ ঘরের কোণে তুচ্ছ হয়ে আছে সেও যে অসামান্য তাকেও উদ্ঘাটিত করতেন, সে উদ্ঘাটন শুধু কাব্যের কল্পলোকে নয়, জীবনে প্রত্যহের ব্যবহারে। তা যদি না হ'ত, কি ক'রে তিনি আমাদের মত মানুষের নিয়ত সঙ্গ সহ্য করেছেন? সহ্য করেছেন বললে মিথ্যে বলা হবে, খুশী হয়ে গ্রহণ করেছেন। আমরা চলে গেলে তাঁর খুব খারাপ লাগত, আমরা কাছে এলে তিনি খুশী হতেন, এ যে কত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা, আজ তা মনে হয়। সামান্যতম মানুষের সুখদুঃখও তাঁর জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করত। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ তাঁর কাছে পুরানো হয়ে যেত। যে-মানুষ নিজের কাছেও পুরানো হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, যার জীবন তাঁর কাছে এলে সেও রসসিক্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠত।

আজ মনে পড়ে কত দিন কত অন্যায় রকমে আমরা তাঁর সময় নষ্ট করেছি, তাঁকে বিরক্ত করেছি, কিন্তু কখনো অসন্তুষ্ট হন নি। সহস্র লোকের সহস্র রকম আব্দার সহ্য ক'রেও এত কাজ করবার অপর্য্যাপ্ত সময় তিনি কোথা থেকে পেতেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। এখনই একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এক দিন শান্তিনিকেতনে একটা খুব দরকারী লেখা লিখছেন, আমি তাঁর চেয়ারের পিছনে মাটিতে আমার চিরকালের অভ্যস্ত জায়গায় নিবিষ্টমনে মাসিক পত্রিকা পড়ছি, হঠাৎ মনে হ'ল ঘরে কেউ ঢুকলেন।

"এই যে এসো।" তিনি ত আসলেন, তার পর প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ধ'রে চলল আশ্চর্য্য রকম বকুনি। কবির কাছ থেকে কিছু শুনতে বা জানতে এসেছেন ব'লে মনে হ'ল না, নিজের কাজ সম্বন্ধে জানাতে এসেছেন, যত দূর সম্ভব নীরস হয়ে উঠেছিল সে বর্ণনা। কিন্তু তাঁর শ্রোতা অবিচলিত ধীর ভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর চালিয়ে গেলেন। একটু বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতার চিহ্নমাত্র অনুভব করি নি। যাবার সময় আগন্তুক বললেন, "ভাগ্যে আপনার সেক্রেটারী-দের হাতে পড়ি নি, তাহলে ত তিন মিনিটের কড়ারে আসতে হ'ত।" ভদ্রলোকটির পায়ের শব্দ অপসৃত হ'লে বললেন, "ওগো অন্তরালবর্ত্তিনী, লেখাটা ত হ'ল না আজ, তুমি কেন আমায় রক্ষা করলে না?" "আমি কি ক'রে রক্ষা করব, যারা রক্ষা করবার অধিকারী তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ত শুনলেন! আপনি বললেন না কেন যে আপনার কাজ আছে।" "কাজ যে আছে সে ত বলাই বাহুল্য। ভদ্রলোক ত স্বচক্ষেই দেখলেন যে কাজ করছি। তবে কি জান, আমার বিশেষ ক্ষতি হয় না, যখন দেখি এমন কথা চলছে যা শোনবার মত নয়, আমি মনকে switch off ক'রে দিই, আমার মনে মনে অন্য কাজ চলতে থাকে, কিছু বাধা হয় না। এই যেমন ধর—যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যায়, অর্দ্ধেক শুনতেও পাই নে, কি করি তখন? মনকে switch off ক'রে দিই, সে চলে যায় নিজের কাজে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা বলি। একবার কলকাতার বাড়ীতে বিচিত্রায় গল্প পড়া হ'ল। সভা ভাঙতে বেশ একটু রাত্রি হয়ে গেছে। তার পর একে একে সকলের দেখাসাক্ষাৎ শেষ করতে করতে কবির খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। যা হোক সকলে চলে যেতে উনি খেতে বসেছেন—তখনই এক ব্যক্তি এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। কবির একটি অভ্যাস ছিল যে বাইরের লোকজন উপস্থিত থাকলে তাঁর খাওয়ার অসুবিধা হ'ত। তাঁর অভ্যাসের আভিজাত্য অন্য রকম ছিল। চাকরের দ্বারা স্নান অনাবৃত দেহে তেল মাখা ইত্যাদি দূরে থাক, অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত লোকজন উপস্থিত থাকলে তিনি খেতেও চাইতেন না। তাই লোকজন থাকলে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও আমরা আহার্য্য নিয়ে উপস্থিত হতুম না। এই ছোটখাট বিষয়গুলো সামান্য অভ্যাস মাত্র, কিন্তু অসামান্য এদের ব্যঞ্জনা, এরা নির্দ্দেশ করে তাঁর অন্তরের ও ব্যবহারের সূক্ষ্ম আভিজাত্য। যাক, সেদিনের কথা বলছিলুম খাবারও উপস্থিত হয়েছে সে ভদ্রলোকও এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই ব্যক্তিটির একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে তিনি অকারণ নিতান্ত অবাঞ্ছিত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন। ঠিক যে তাঁর কোন ত্রুটি ছিল বা ভদ্রতার অভাব ছিল তা নয়, কিন্তু একটা কি রকম অস্বস্তিকর উপস্থিতি। যাক, তিনি ত দাঁড়িয়েই রইলেন, কোন বক্তব্য নেই, কোন কারণ নেই, তবু তিনি রইলেন, সকলে ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে উঠছি, রাত্রি অনেক হয়ে গেল, অনিয়ম হ'ল ভাল ক'রে খাওয়াই হ'ল না, আমাদের মনোভাব যদিও মৌখিক প্রকাশ করি নি, তবু একেবারে গোপন করেছি বলা চলে না। সে ভদ্রলোক সম্ভবত কিছুই বোঝেন নি, অব্যক্ত মনোভাবের স্পর্শ পাবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি সকলের থাকে না, কিন্তু কবি ত সবই বুঝতে পারছিলেন। বহুক্ষণ পরে তিনি চলে গেলেন। "তোদের এই বড় দোষ যে তোরা অসহিষ্ণু, যাকে ভাল লাগে তাকে ত সবাই সহ্য করতে পারে, কিন্তু যে অবাঞ্ছিত যে বেচারাকে কেউ চায় না, কারু ভাল লাগতে পারে না, হোক না সেটা তার নিজের মূঢ়তার জন্যই—তাকে যদি স্থান না দিতে পার সেটা অত্যন্ত অকরুণ। ও কি কম বেচারা ভাব ত? নইলে উপেক্ষা বুঝতে পারে না। যাকে ভাল লাগে তাকে কাছে ডাকা এমন কিছু বেশী কথা নয়, কিন্তু যে অযোগ্য তাকেও একটু স্থান দিতে হয়!" এই তাঁর ভর্ৎসনা বহুবার স্মরণ করেছি জীবনে যখনই স্বভাবের ঔদ্ধত্য মানুষের প্রতি অবহেলা এনেছে, কানে আসে সেই স্মরণীয় বাণী—যে অযোগ্য তাকেও একটু স্থান দিতে হয়!

প্রাচীন ভারতে নারীর সম্পত্তিতে অধিকারঃ কন্যা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ বৈদিক যুগে, নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার ছিল কিনা—প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন স্বতঃই এসে পড়ে। নারীর সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে সমগ্র আলোচনা তিন ভাগে ভাগ করা চলে:— ১। কন্যার অধিকার, ২। পত্নীর অধিকার ও ৩। মাতার অধিকার। এ প্রবন্ধে আমরা কেবল কন্যার অধিকার বিষয়ে আলোচনা করব, পত্নী ও মাতার অধিকার বিষয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। পুনরায় কন্যার অধিকার-বিষয়ক আলোচনাও দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে। ১। ভ্রাতৃমতী কন্যা, ২। ভ্রাতৃহীনা কন্যা। পুনরায় প্রশ্ন উঠে—বিবাহিতা কন্যা ও অবিবাহিতা কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার-বিষয়ে কোনও তারতম্য ঘটে কিনা।

ভ্রাতৃমতী কন্যা।

ভ্রাতৃমতী কন্যারও যে পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার ছিল, সে বিষয়ে কতিপয় প্রমাণ বেদে ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

১। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে[১] আমরা দেখতে পাই "অমাজু" অর্থাৎ অবিবাহিতা পরিণতবয়স্কা কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার দাবী করছেন।

২। যাস্কের নিরুক্তে[২] দেখা যায়—একদল ঋষির মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার অধিকার সমান; পুত্র এবং কন্যা সমান ভাগে পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত ক'রে নেবে। যাস্ক বলেন[৩]—একটি ঋক্[৪] ও শ্লোক[৫] থেকে ইহা বিশেষ ক'রে প্রতিপন্ন হয়। এই উদ্ধৃত ঋক্ থেকে দেখা যায় যে পুত্র ও কন্যা উভয়েই মাতা ও পিতার প্রতি অঙ্গ থেকে জাত, হৃদয় থেকে সমুদ্ভূত ব'লে, ফলতঃ স্নেহ ব্যাপারে উভয়েরই সমান অধিকার বলে—সম্পত্তিতেও উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে। উদ্ধৃত শ্লোকটি মনুর মতানুযায়ী; এ শ্লোকটি যাস্ক উদ্ধৃত করেছেন, সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন কোনও ঋষির কৃত শ্লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ থেকে দেখা যায় যে—কোনও কোনও ঋষি ভগিনী ও ভ্রাতার পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকারের বিধান করেছিলেন বৈদিক যুগে।

৩। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে লৌকিক বিধি-ব্যবস্থার একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। এদিক থেকেও ভগিনীর সম্পত্তিতে অধিকার-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যেমন—শতপথ ব্রাহ্মণে দেখতে পাই[৬]—রুদ্রের ভগিনী অম্বিকা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সাকমেধ যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে লৌকিক বিষয়েও ভগিনী ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দাবী করতেন।

৪। শুক্র-স্মৃতি অতি উপাদেয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে শুক্রাচার্য্য বলেছেন যে পিতা যদি নিজের জীবদ্দশায় স্বকীয় সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দেন, তা হ'লে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও কন্যার পুত্রগণের মধ্যেই তা ক'রে দেবেন; স্ত্রী ও পুত্রদের সমান ভাগ; কন্যা পাবেন সম্পত্তির অর্দ্ধেক এবং দৌহিত্র পাবে তার অর্দ্ধেক ভাগ। পিতা যদি স্বয়ং সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিয়ে না যান, তা হলে সম্পত্তি ভাগ ক'রে নেওয়ার সময় ভাইয়েরা মাকে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ এবং ভগিনীকে মায়ের থেকেও অধিক সম্পত্তি প্রদান করবেন।[৭]

১। ২, ১৭, ৭:—
অমাজূরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বো যেন মামহ॥

২। যাস্ক এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন ঋগ্বেদের ৩, ৩১, ১, ঋকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। নিরুক্ত ৩, ৪। যাস্ক এ ঋকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর মতের উল্লেখ করেছেন।

৩। অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রা দায়াদা ইতি, তদেতদৃক্‌শ্লোকাভ্যামভ্যুক্তম্।

৪। অঙ্গাদঙ্গাৎসম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে ইত্যাদি।

৫। অবিশেষেণ পুত্রানাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।

৬। ২. ৬. ২. ৯.

৭। সমান-ভাগা বৈ কার্যাঃ পুত্রাঃ স্বস্য চ বৈ স্ত্রিয়ঃ।
স্বভাগার্দ্ধহরা কন্যা দৌহিত্রস্তু তদর্দ্ধভাক্॥
মৃতাধিপে তু পুত্রাদ্যা উক্ত-ভাগহরাঃ স্মৃতাঃ।
মাত্রে দদ্যাচ্চতুর্থাংশং ভগিনৈ্য মাতুরধিকম্॥
শুক্র-স্মৃতি, ৪, ৫, ২৯৯—৩০০

৫-৬। বিষ্ণু[৮] এবং নারদও[৯] এ মতের অনুমোদন করেন, তবে বিবাহিতা হওয়ার পরে কন্যার আর পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না—এ উভয় ঋষির মত।

৭। শুক্রচার্য্যের অনুমোদিত পদ্ধতি যে সমাজে পিতারা মেনে চলতেন—তার প্রমাণ আছে। মহীশূরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে মাচি নামক জনৈক পিতা ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্ত্তী সময়ে স্বকীয় সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে বিভক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। মাচির দৌহিত্রেরা তাঁর পৌত্রগণের সম্পত্তি অন্যায্যভাবে দাবী করায় যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, তার আপোষনিষ্পত্তি নির্দেশের নিমিত্ত উক্ত শিলালিপি খোদিত হয়।[১০]

উপরিলিখিত প্রমাণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে ভারতীয় ঋষিদের মধ্যে কেও কেও কন্যাদের সম্পত্তিতে, এমন কি, ভ্রাতার সমান অধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করেছিলেন। অন্যান্য কয়েক জন ঋষি তাঁদের ভ্রাতার সমান অধিকার প্রদান না করলেও—সম্পত্তির কিছু ভাগ প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক জন ঋষির বিধানমতে অবিবাহিতা ভগিনীর পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে।

যে-সব ঋষি পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার পূর্বোক্ত প্রকারের অধিকার মেনে নেন নি, তাঁরাও কিন্তু কন্যাদের পৈতৃক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন নি। কারণ, তাঁরা বিধান করেছেন যে তাঁর বিবাহের সময় তাঁর ভ্রাতারা স্বকীয় সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ খরচ করবেন।[১১] যদি একাধিক ভগ্নী থাকেন, তা হ'লেও সমগ্র সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ভ্রাতা বা ভ্রাতারা তাঁদের বিবাহে খরচ করবেন।[১২] সুতরাং হিন্দু ঋষিদের বিধান মতে ভগিনীদের বা কন্যাদের সম্পত্তিতে অধিকার নেই—এ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। হিন্দু ঋষিরা বরং নিয়ম করেছেন যে যদি পৈতৃক সম্পত্তি নাও বা থাকে, তা হলেও ভ্রাতা ভগিনীর নিমিত্ত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিনিময়েও তাঁর বিবাহ প্রদানে কুণ্ঠিত হবেন না।[১৩] স্বকীয় পৈতৃক সম্পত্তির সমান অংশ দিয়ে ত বটেই।[১৪] বাস্তবিক সর্বতোভাবে ভ্রাতা ও ভগিনীর স্নেহের বন্ধন যে অতি সুন্দর ও সুদৃঢ় ছিল, তার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান।

ভ্রাতৃহীনা কন্যা

১। বৈদিক যুগে অভ্রাতৃকা দুহিতা পুত্রের মতই—"পুত্রিকা" হয়ে—পিতার জন্য ধর্ম-কৃত্যাদি সমস্ত করতে পারতেন। সুতরাং পুত্র ও পুত্রিকার মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হ'ত না। কন্যা নিজেই পিতার "পুত্রিকা" হ'তেন অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকারে পুত্রের স্থান অধিকার করতেন এবং পিতার জন্য সমস্ত ধর্মকৃত্য সম্পাদন করতেন। পুত্রিকা—পুত্রের অর্থাৎ ঈদৃশ কন্যার পুত্রের ঐ জন্য প্রয়োজন হ'ত না। বশিষ্ঠ তাঁর ধর্মশাস্ত্রে[১৬] দায়াধিকারী হিসাবে "তৃতীয়ঃ পুত্রিকা"-এ বলেছেন, তৃতীয়ঃ পুত্রিকা—পুত্রঃ বলেন নি। পরবর্ত্তী যুগেও কন্যাই "পুত্রিকা" হয়েছেন, দেখা যায়। রাজ-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে—রাজা জয়াপীড়ের পত্নী কল্যাণ দেবী তাঁর পিতার পুত্রিকারূপে সমাদৃতা হ'তেন। কন্যার সমাদর পরিবারে কত অধিক ছিল, তা স্থানান্তরে দেখান হ'য়েছে।[১৭] ফলে দত্তক পুত্র নেওয়ার প্রথা তখনও সমাজে তত সমাদৃত হয়ে উঠেনি।[১৮] পুত্র না থাকলেও পিতার ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারাদি নিয়ে মনোব্যথার কোনও কারণ ছিল না—দুহিতা পুত্রেরই সমান ছিল সর্বতোভাবে। এ "পুত্রিকা" স্বয়ং পিতার ধর্মকৃত্যাদি না করলেও নিজের পুত্রের দ্বারা তা' সম্পাদন করাতে পারতেন, পিতার পক্ষে ধর্মফল তুল্য ব'লে পরিগণিত হ'ত। সুতরাং ভ্রাতৃহীনা কন্যা পুত্রিকা হিসাবে সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হতেন।

২। ভ্রাতৃহীনা কন্যা যে পিতার উত্তরাধিকারিণী হতেন, তা ঋগ্বেদে[১৯] থেকেও জানা যায়। ভ্রাতৃহীনা

৮। ১৭, ৪,—
মাতরঃ পুত্র-ভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ। অনূঢ়া দুহিতরশ্চ।

৯। ১৩, ৩—
জ্যেষ্ঠায়াংশোঽধিকো দেয়ঃ কনিষ্ঠায়াবরঃ স্মৃতঃ।
সমাংশ-ভাজঃ শেষাঃ স্যুরপ্রত্তা ভগিনী তথা।

১০। *Epigraphia Carnatica*, VI, Mudgere. No. 24.

১১। তুলনা করুন—যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১২৪
অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্বসংস্কৃতৈঃ।
ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশং তু তুরীয়কম্।
মনু ৯, ১১৮ও দেখুন।

১২। স্মৃতি-চন্দ্রিকা, ব্যবহার-কাণ্ড, পৃ. ৬২৫।

১৩। অবিদ্যমানে পিত্রার্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারাঃ ভ্রাতৃভিঃ, ইত্যাদি—নারদ ১৩, ১৪।

১৪। যদি সংস্কার-পর্য্যাপ্তমপি পিতৃ-ধনং নাস্তি, তদা পুত্র সমভাগিতৈব দুহিতৄণাম্। বীর-মিত্রোদয়, ব্যবহার-প্রকাশ, পৃ. ৫৮২।

১৬। ১৭, ১৫।

১৭। 'প্রবাসী', ১৩৪৮, চৈত্র, "বৈদিক সংস্কারে কন্যা : পুংসবন"

১৮। ন হি গ্রভায়ারণঃ সুশবোঽন্যোদর্যো মনসা মন্তবা
উ—ঋগ্বেদ, ৭, ৪, ৮।

১৯। ১, ১২৪, ৭—অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাম্।

কন্যা পুত্রিকারূপে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তখনকার দিনে তাঁকে কেও বিয়ে করতে চাইত না। কারণ তাঁকে শ্বশুরকুলের চেয়েও পিতৃবংশের কাজের দিকে মনোযোগী হ'তে হ'ত বেশী; এমন কি, স্বীয় পুত্রকেও পিতৃ-কার্যার্থে সমর্পণ করতে হ'ত। ভ্রাতৃমতী কন্যারও সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার থাকায় স্বভাবতঃই কেও আর ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহ ক'রে ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাইত না।

পরবর্তী যুগে, এমন কি, ভ্রাতৃহীনা কন্যাকেও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে সত্য,[২০] কিন্তু বেশীর ভাগ ধর্মোপদেষ্টাই কন্যার উত্তরাধিকার অনুমোদন করেছেন, এ অবশ্য স্বীকার্য। এ বিষয়ে ব্যাসদেব অতি উদাত্তকণ্ঠে স্বীয় মত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—কন্যা ও পুত্র সমান আদরের; সুতরাং পুত্র না থাকলে কন্যাই সম্পত্তি পাবে—বাইরের লোক কিসের জন্য সম্পত্তি পাবে, তারা কিসের জন্য কন্যার থেকে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে দাঁড়াবে?[২১]

অন্যত্র তিনি বলেছেন—যাই হোক্ না কেন, অভ্রাতৃকা কন্যা অন্ততঃ অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারিণী হবেনই।[২২] কৌটিল্যও বলেছেন যে পুত্র ও কন্যা উভয়েই তুল্যরূপে বংশরক্ষার কারণ বলে পুত্রের অভাবে কন্যাই সম্পত্তির অধিকারিণী।[২৩] যাজ্ঞবল্ক্য,[২৪] বৃহস্পতি,[২৫] নারদ[২৬] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্মার্তদের অনেকেই বলেছেন যে কন্যা ও পুত্র তুল্যরূপে স্বীয় শরীর থেকে জাত, উভয়েই আত্মস্বরূপ; সুতরাং কন্যার জীবিতাবস্থায় অন্যেরা কিসের জন্য সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসবে—কোন্ অধিকারে?

কোন কোন স্মার্ত কন্যার সম্পত্তিতে অধিকার বিবাহের পূর্ব সময় পর্য্যন্ত[২৭] বা কেবল স্বকীয় জীবনকাল পর্যন্ত—এ সব বাধ্যবাধকতামূলক আইন-কানুন করবার চেষ্টা করেছেন। তবে অতি পরবর্তী কালেও কন্যা স্বীয় অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন নি। ভ্রাতৃহীনা কন্যার বিনা বাধ্যবাধকতায় সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকার বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে এখনও চলছে।

এ প্রসঙ্গে ইহা বলা যেতে পারে যে যে-দিন থেকে নারীদের স্বকীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলেছে, তখন থেকে ভারতবর্ষের অধঃপতন সুরু হয়েছে। ঠিক কখন থেকে এ প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তা বলা শক্ত। ইহা সত্য যে বৈদিক সাহিত্যের কোথাও নারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়মূলক কোনও উক্তি নেই। তৈত্তিরীয় সংহিতার[২৮] "স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া আদায়াদী:"—এই শ্রুতিতে "দায়" শব্দের অর্থ মোটেই সম্পত্তি নয়। সোম—যজ্ঞ বিষয়ক এই শ্রুতিতে "দায়" শব্দের অর্থ সোম, সম্পত্তি নয়। সুতরাং মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার নেই, ঈদৃশ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। পরাশর-মাধবীয়ে[২৯] মাধবাচার্য এ কথাই ত বলেছেন। অপরার্কও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির (২, ১৩৬) ব্যাখ্যাকালে বলেছেন যে এ শ্রুতির এ অর্থ নয় যে নারীরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। অথচ হরদত্ত প্রভৃতি স্মার্তেরা[৩০] এ শ্রুতির জোরেই নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ক'রে দিলেন। পরবর্তী স্মার্তেরা শ্রুতির কদর্থ এ রকম মাঝে মাঝে করেছেন মেয়েদের বেলায় বিশেষ ক'রে, না হয়—রঘুনন্দন কি ক'রে ভাবলেন যে ঋগ্বেদের "ইমা নারীরবিধবাঃ" প্রভৃতি ঋকে সতীদাহের অনুমোদন রয়েছে—সমগ্র বৈদিক

২০। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কন্যার নাম বশিষ্ঠ (১৫, ৭) ও গৌতম (২৮, ২১) উল্লেখ করেন নি; মনুও দেখুন—৯, ১৮৫। আপস্তম্ব ২, ১৪, ২-৪—"পুত্রাভাবে যঃ প্রত্যাসন্নঃ সপিণ্ডঃ। তদভাবে আচার্যঃ। আচার্যাভাবে অন্তেবাসী হৃত্বা ধর্ম-কৃত্যেষু যোজয়েৎ, দুহিতা বা।" সপিণ্ড, আচার্য ও শিষ্য—এঁদের মধ্যে কেও না কেও থাক্তেন নিশ্চয়; সুতরাং আপস্তম্বের বিধানানুসারে কন্যার পক্ষে সম্পত্তি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

২১। মহাভারত—১৩, ৮০, ১১।

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ।
দুহিতাঽন্যত্র জাতাদ্ধি পুত্রাদপি বিশিষ্যতে।

২২। অভ্রাতৃকা সমগ্রার্হা চার্ধার্হেত্যপরে বিদুঃ। মহাভারত, ১৩.৮৮.২২।

২৩। ৩.৫

২৪। ২.১৩৫

২৫। ২৫.৫৫

২৬। ১৩.৫০

২৭। পুত্রাভাবে তু দুহিতা তুল্য-সন্তান-কারণাৎ।
পত্নী পত্যুর্ধনহরী যা স্যাদব্যভিচারিণী।
তদভাবে তু দুহিতা যদ্যনূঢ়া ভবেত্তদা।

যাজ্ঞবল্ক্য-টীকা (২.১৩৫-১৩৬); মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত কাত্যায়নীয় মত।

২৮। ৬.৫.৮.২

২৯। তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৫৩৬—"যা চ শ্রুতিঃ—তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদা ইতি সা পাত্নীব্রত-গ্রহে তৎপত্ন্যা অংশো নাস্তীতি এবংপরা। ইন্দ্রিয়-শব্দস্য 'ইন্দ্রিয়ং বৈ সোমপীথঃ' ইতি সোমে প্রয়োগ-দর্শনাৎ।" এ শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থ পাওয়া যায় সায়ণভাষ্যে (১.৪.২৭)—"তস্মাল্লোকে স্ত্রিয়ঃ সামর্থ্য-রহিতা অপত্যেষু দায়ভাজো ন ভবন্তি।"

৩০। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র—২.৬.১৪.১ এবং গৌতম-ধর্মসূত্র ২৮,২১। সরস্বতী-বিলাস, ২১ এবং ৩৩৬। বীরমিত্রোদয়, জীবানন্দ-কৃত সংস্করণ, পৃঃ ৬৭৩

মৃত শিশু ও শোকাতুরা জননী

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

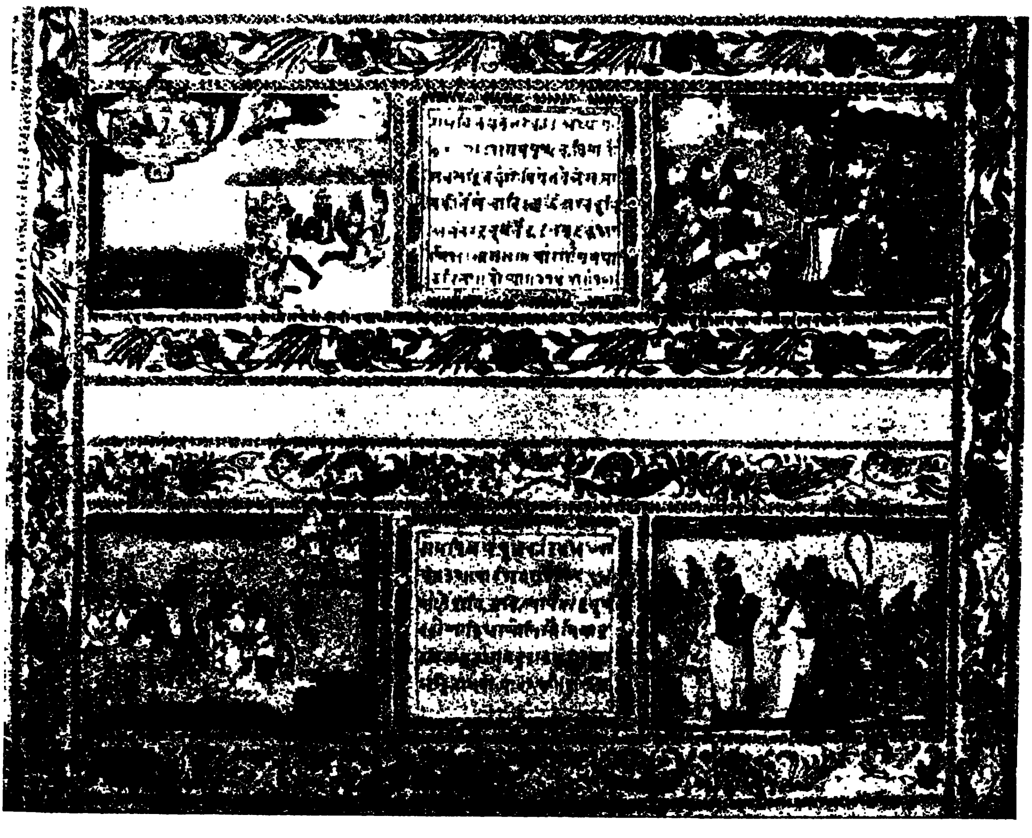

তাঞ্জোর চিত্রকলা

সোমনাথের মন্দিরে উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তি

সোমনাথের মন্দিরের কারুকার্য্য-খচিত একটি প্রবেশ-দ্বার

সাহিত্যের কোথাও এ প্রথার অনুমোদনমূলক কিছু প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও। শতপথ ব্রাহ্মণের ৪, ৪, ২ শ্রুতিতে দায় শব্দের অর্থ[৩১] সম্পত্তি নয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে স্মার্তেরা এ শ্রুতির উপর কিছুই নির্ভর করেন নি।

আজ দেশের সে শুভদিন এসেছে—যখন দিকে দিকে নারী-জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আইনজ্ঞেরাও কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারাদি বিষয়ে চিন্তা করছেন। বঙ্গদেশে কন্যাদের সম্পত্তি-বিষয়ক যা বিধান আছে, তার চেয়ে অনুকূল বিধান তাঁদের জন্য হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত; বেদে যা'র অনুমোদন আছে, পরবর্তী স্মার্তেরাও যার বহুল অনুমোদন ক'রে এসেছেন, সভ্রাতৃকা বা ভ্রাতৃহীনা কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে এ অধিকার বিবৃদ্ধি বিষয়ে হিন্দুদের যে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, তা বলা বাহুল্য।

৩১। ন আত্মনশ্চ শিষত ন দায়স্ত চৈশত।

দুরাশা

শ্রীসাধনা কর

পঞ্চাশ পেরিয়ে অম্বিকাচরণের দোতলা দালান উঠল। ঠিক দোতলা বলা যায় না, নীচে তিনখানা এবং উপরে একখানা মাত্র চিলেকুঠরি, তার পরেই চওড়া ছাদের ঢালু সিমেন্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। বাড়িটা ছোট, কিন্তু সুদৃশ্য সুরুচিপূর্ণ। পূর্ব-বাংলার শেষ প্রান্তের কোন এক শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে খোলা মাঠ, সেখানে শহরের কলরবহীন নির্জনতা, সেখানে শহরের একান্ত সান্নিধ্যের সহজ সুবিধা। নূতন একটা পত্তনি বসছে, আশেপাশে উঠছে দুয়েকখানা বাড়িঘর, তারই মধ্যে অনেক দূরদূরান্তর থেকে চোখে পড়ে অম্বিকাচরণের বাড়ি। চারিদিকে খানিকটা ক'রে জমি রেখে বড় বড় জানালা দরজা দেওয়া লালচে সুন্দর বাড়িটা নূতন সূর্যের মত মাথা তুলে দেখা দিয়েছে। সবাই মনের ঈর্ষা চাপা রেখে বলে—বেশ করেছেন মশাই, ভাল করেছেন।

—হ্যাঁ ভাই, প্রৌঢ় অম্বিকাচরণের চোখমুখ ওঠে প্রদীপ্ত হয়ে, বলেন—এতদিনে তুললাম একটা। আর কতকাল পরের বাসায় ভাড়াটে খাটব। সারাক্ষণই শুধু ভয়, দিলে বুঝি তুলে। তা ছাড়াও নানা ঝঞ্ঝাট। নিজের বাড়িতে নিশ্চিন্দি।

—তা ঠিক, তা ঠিক—সায় দেয় সবাই—বেশ করেছেন মশাই, একটা কাজের মত কাজ। তা খরচা পড়ল কত?

অম্বিকাচরণ মাথা নেড়ে পায়চারি করতে করতে বলেন—তা পাঁচ-সাত হাজার পড়েছে বইকি। আমি একটু পাকাপোক্ত করালাম, ছেলেমেয়ের সখ, তারা একটু ফ্যাশান করালে…এই করেই বুঝলে না অনেকটা খরচ হয়ে গেল। নয় ত বিরিঞ্চি আরও কমে ক'রে দেবে বলেছিল।

সকলে আশ্চর্য হয়ে বলে—তা বাড়ি আন্দাজে এ ত খুবই কম। আজকালের বাজার…বেশ, বেশ।

সামনে সবাই উৎসাহ দেখায়, আড়ালে করে আলোচনা—বুড়ো এত টাকা জমালে কখন হে। মোটে ত স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, টাকা পঞ্চাশ পান, তাতেই তুলে ফেললেন এত বড় বাড়ি! এদিকে খাইয়ে ত কম নয়, ঘেটের তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে, নিজেরা দুজন। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজেও পড়াচ্ছেন…।

—অমনিই জমায় হে—কথা কেড়ে বলে ওঠে কেউ—সবাই জমায়। বুড়ো কম কিপ্‌টে আর কম ঘুঘু? সারাদিন স্কুলের খাটুনি তার উপরে হাটবাজার, গরুর সেবা, মায় বাগান করা অবধি নিজের হাতে করছে। কোমর বাঁকিয়ে কেঁদে-কোকিয়ে অস্থির—কিছু নেই, সংসারে অভাব-অনটন, পাঁজরার হাড় গেছে ভেঙে—ওদিকে ব্যাপার দেখ! আমাদের মত উড়োনচণ্ডীরা কি পারে কিছু করতে। আমাদের দশটা চাই ঝি-চাকর, চাই ফ্যান, লাইট, বড় বড় বাড়ি…কি জানি বাপু পারিই নে এ সব ছাড়তে।

আরেকজন সায় দেয়—তা যা বলেছ। আমাদের সঙ্গে দশটা বাজে খরচ। বুড়ো চিরটাকাল: ছোট বাসায় যেমন তেমন ভাবে কাটিয়ে এবার সুখে থাকবে। হাড়ভাঙা খাটুনি সার্থক হ'ল বুড়োর।

এমনি নানা আলোচনাই চলে। অম্বিকাচরণের বাড়িতেও এ নিয়ে কম কথা হয় না। স্ত্রী বলেন—তোমার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক্। দুটো মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি, ছেলে তিনটেকে মানুষ করা, বুড়ো বয়সে.ত আর পেন্‌সেন্ মিলবে না—কোন ভাবনা চিন্তা করলে না, তুলে রাখলে একটা বাড়ি, সব খরচা করে।

অম্বিকাচরণ তৃপ্তির হাসি হাসেন, বলেন—বুঝবে না, তুমি বুঝবে না, কত বড় দায় আমার চুকেছে। মানুষের জীবন, কখন আছি, কখন নেই। তার পরে, ছেলেমেয়েগুলি পরের বাড়িতে ঠাঁই না পেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াত যে।

স্ত্রী ভোলেন না, বলেন—বেশ ত, কাঁচা বাড়ি করলে কোন দোষ ছিল না। এদিকেও কিছু বাঁচত। আসল কথা, তুমি কোন দিনই কারুর কথা শুনলে না, সব নিজের মতলব মত। লোকে ভাববে কত টাকাপয়সা ওদের। বিপদে পড়ে একজনের কাছে গেলে, পাবে আর সাহায্য? তুলে রাখলে কিনা লোকের দেখবার মত একটা পাকা বাড়ি!

এইখানেই অম্বিকাচরণের একটু দুর্বলতা। অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেন—আর যে যাই বলুক শ্যামের মা, তুমি বোলো না। সারাজীবন মরলাম খেটে খেটে, পাঁজর ভেঙে রোজগার করলাম টাকা, এবার শেষবয়সে একটু সুখ ভোগ করতে দাও। নিজের পাকাবাড়িতে, খোলা হাওয়ায় খাটুনির শেষে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসবো বিশ্রাম করতে, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী সবাই বসবে কাছে, গল্প-গুজব গান-বাজনা খবরাখবর কিছু হবে, তার পরে নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম। ওগো, পরের বাড়িতে অনেক ঝঞ্ঝাট ত সয়েছ, এবার নিজের বাড়িটাকে খেটেখুটে সাজিয়েগুছিয়ে তোলো ত। দেখবে কত শান্তি, কত আনন্দ!

চোখে-মুখে দীপ্তি ফুটে বেরোয় অম্বিকাচরণের। তিনি মাথা নীচু ক'রে বাড়ির চারদিকে পায়চারি করতে থাকেন। পঁচিশ বছর আগে নদীতে যখন ভেঙে নিল তাদের সাতপুরুষের বাড়ি, বাবা তাঁর তীব্র দুঃখে ব'লে উঠেছিলেন—পথের ভিখারী রে, পথের ভিখারী হলাম একেবারে। আপন বলতে এতটুকু মাটিও আর রইল না।

এখনও মনে লেগে রয়েছে কথাটা। বিশেষত বাড়ি ভাঙার পরে পাত্‌না দিয়ে দিয়ে এ-জায়গায় সে-জায়গায় যত দিন থাকতে হয়েছে বড় কষ্টে গিয়েছে দিনগুলি। অম্বিকাচরণ তখনই বি-এ পাস ক'রে চাকরি নিয়ে চ'লে আসে এই শহরে। তার পরে এই পঁচিশ বছর,—এইখানে সেই এক মাষ্টারীতেই কেটে গেল দিনগুলি। ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নানা ঝঞ্ঝাট সয়ে অম্বিকাচরণ নাজেহাল। সেবার এক বাড়িওয়ালা ছিল উপরে, নীচের তলায় ভাড়াটে তারা। দেয়ালের গা ঘেঁষেই ছিল একটা আম গাছ, অম্বিকাচরণের ছেলে বুঝি গাছে উঠে পেড়ে এনেছিল ক'টি কাঁচা আমের গুটি। তাই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। অম্বিকাচরণ বাড়ি ছিলেন না, ফিরে এসে শুনলেন বাড়িওয়ালার স্ত্রী বলছে—বাড়ি ভাড়া দিয়েছি ব'লে গাছও ভাড়া দিই নি! আমার ছেলেদের নজির দেখান হচ্ছে, বলি আমার ছেলেরা খাবে না? তাদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের গাছ। তোদের মত ত পরের বাড়িতে থেকে না ব'লে পরের গাছের ফল খেতে যায় নি।

বাড়িওয়ালার বউটা মুখরা স্বভাবেরই ছিল, বাড়িওয়ালা এসে যদিও এই বলেই শেষটা নিয়ে ছিল মিটমাট ক'রে, তবু কথাটা চট্ ক'রে ঘা মেরেছিল অম্বিকাচরণের মনে। বিশেষত যাদের সত্যি কোন জিনিস থাকে না, তাদের এতটুকু কথাই আঘাত দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এ সব ছাড়াও ভাড়া নিয়ে ঘর-দুয়ার সারান নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। বাড়ি বদলাতে হ'লেই ছোট ছেলে শুধু বলতো—সবারই বাড়ি-ঘর আছে, নেই শুধু আমাদের। এ-বাড়ি ও বাড়ি,—কেবল ঘুরেই বেড়াই।

স্তোক দিয়ে অম্বিকাচরণ বলতেন—হবে হবে, আমাদেরও হবে। পাকা দালান-কোঠার বাড়ি!

ছেলে আনন্দে বলতো—সত্যি, কবে বাবা?

এমনি ক'রেই চলে এসেছে এত দিন। অত্যন্ত গোপন মনে অম্বিকাচরণ আঘাতগুলিও যেমন রাখতেন পুষে, তেমনি জাগিয়ে রাখতেন একটি ইচ্ছা—পাকা বাড়িতে শান্তিতে আনন্দে দিন কাটাবেন। প্রতিদিন স্কুলের পথে যেতে যেতে মাথা নীচু ক'রে কত ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত এ চিন্তাটাও। এমনি ভাবে, পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ একদিন পথের এক ভাঙার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে কোমরে লাগে চোট। সেই থেকে অম্বিকাচরণ একটু কোমর বাঁকিয়ে হাঁটেন। তবু স্কুলের কাজ, গরুর সেবা এবং হাটবাজার করা তাঁর বাদ যায় না। দুটি ছেলে আর

মেয়ে-একটি পড়ে কলেজে, আর-দুটি ছেলেমেয়ে ছোট, স্কুলের সীমায় তাদের গণ্ডী বাঁধা। এমনি সময়ে একদিন অম্বিকাচরণ বেড়াতে গেলেন ক'লকাতা, এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধু বালীগঞ্জে নূতন বাড়ি তুলেছে, প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, মহা সুখ। অম্বিকাচরণের চোখটা জ্বালা করল। মুখে হেসে বললেন—বেশ করেছ হে, সুন্দর বাড়িঘর। বুড়ো-বয়সে এতেই শান্তি, এতেই আনন্দ।

বন্ধু বললেন—হ্যাঁ ভাই, ভাড়াবাড়িতে মর্যাদা থাকে না। তা তুমিও তুলে ফেল না একটা।

অম্বিকাচরণ হাসলেন—পাগল, ছা-পোষা পঞ্চাশ টাকা মাইনের স্কুল-মাষ্টারের অত সখ করতে নেই।

বন্ধু বললেন—না হে, বাড়ি করতে খুব বেশী লাগে না আজকাল। আর তা ছাড়া, বিরিঞ্চি গুপ্ত, যে আমার এ বাড়ি তৈরি করলে, শুনলাম সে তোমারই ছাত্র ছিল। তুমি বললে হয়ত অল্প খরচেও ক'রে দিতে পারে। ক'রে ফেল হে, ক'রে ফেল,—অম্বিকাচরণের পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন—পাঁজর যখন ভেঙেছই তখন টাকাগুলো দিয়ে একটু সুখ ভোগই করে যাও। ছেলেমেয়ে মানুষ হয়েছে, তাদের ভাবনা তারা ভাববে এখন।

অম্বিকাচরণ কিছু বললেন না, হেসে চলে এলেন। মনের মধ্যে কথাগুলি জ্বলতে লাগল এবং হঠাৎ সেই সময়েই ইন্‌সিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে তুষের আগুন একেবারে ধাঁ ধাঁ ক'রে জ্বলে উঠল। ডাকালেন বিরিঞ্চিকে, বললেন—গুরু-দক্ষিণা চাইছি নে, দক্ষিণা আমি দেব, তবে অল্প খরচে আমায় একটা বাড়ি তুলে দাও।

রাজি হ'ল বিরিঞ্চি। কিন্তু শুধু পাঁচ হাজার নয়, একেবারে কুড়িয়ে-কাচিয়ে শেষ সম্বল অবধি দিয়ে সাত হাজারে বাড়ি তৈরি হ'ল। অম্বিকাচরণ কিন্তু খুব খুশী। তার পঁচিশ বছরের এই পাঁজর-ভাঙা খাটুনি সম্পূর্ণ সার্থক মনে করলেন। সন্ধ্যার সময় বারান্দায় ইজি-চেয়ারে এসে বসেন, সামনের বাগানে ফুটে ওঠে নানা-রঙা গন্ধ-পুষ্প, লতাবাহার, দূর-দূরান্তরে ধূ-ধূ করা ধানের ক্ষেত মিশেছে গিয়ে রেল-লাইনে। অম্বিকাচরণ স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ডাকেন—রমা, এস ত মা তোমার সেতারটা নিয়ে। ওরে তোরা আয় গান করবি।

ছেলেমেয়ে এসে কাছে বসে, অনেক রাত অবধি গান-বাজনা পড়া-শুনা গল্প-গুজব করে। স্ত্রী এসে ডেকে নিয়ে যান খেতে। গভীর রাত্রে বাড়ি নিঝুম হয়ে যখন আলোগুলি একে একে নিবে যায়, দূর থেকে শোনা যায় এগারটার মেল ট্রেনের হুস হুস শব্দ, তীব্র সার্চ-লাইটের আলো প'ড়ে বাড়িটা ছবির মত ক্ষণিকের জন্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অম্বিকাচরণ আধোঘুমে আবেশভরা চোখে চেয়ে বলেন—কী আরাম, কী আনন্দ বলতো। অনেক অনেক দিনের সাধ আমার পূরল। ভয় নেই তোমার, আমারও আছে ভবিষ্যতের ভাবনা। এখনো আরও বছর-পাঁচ চাকরীর মেয়াদ। অত কেন, দু বছর পরে শ্যাম পাশ করে চাকরি করবে, সে-ই তখন কর্তা। আমি নিশ্চিন্তে নাতি-নাতনী কোলে ক'রে বারান্দায় ব'সে দিনভোর গল্প করব। শান্তির নীড় হয়ে উঠবে বাড়িটা।

* * *

খুব বেশী নয়, বছরতিনেক পরে যখন অম্বিকাচরণের সুখস্বপ্ন শান্তির নীড় সম্পূর্ণ হবার সময় এল ঠিক সেই সময়েই ঝাপটা এলো উল্টা দিক থেকে। শ্যাম এম্‌-এ পাস করে ভাল চাকরী পেয়েছে, মেয়েও পাশ করে বেরুলো। মেজো ছেলে পড়াশুনায় ভাল, স্কলারশিপ নিয়ে সে তখন কলেজে! অম্বিকাচরণের বয়স হয়েছে, চেহারা এসেছে ভেঙে। বারান্দায় ব'সে তখন তিনি সত্যি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনী দেখবার আশায় ব্যস্ত; এমনি সময়ে পশ্চিমে উঠল ঝড়, তার ধাক্কা এসে লাগল পূর্বাকাশে। ঘোলাটে হয়ে উঠল সারা জগৎ। পূর্ব-বাংলার ক্ষুদ্র শহরটাও বাদ গেল না। অম্বিকাচরণ সকাল সন্ধ্যা পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে বারবার চান বাড়িটার দিকে, মুখ শুকিয়ে ওঠে। আপন মনেই বলেন—এত সাধের বাড়িঘর, জায়গা-জমি, সব দিতে হবে ছেড়ে, নষ্ট হয়ে যাবে সব। "হাঁ রে রমা, যেতে হবে চলে?"

—কি করবে বাবা, সবাইকেই ত যেতে হবে। তাদেরও ত কত ক্ষয়ক্ষতি। সবার মধ্যে তোমার জিনিসটাকে ভাবো না কেন?

—তা ত জানি, অম্বিকাচরণ দ্রুতপায়ে পায়চারি করতে করতে হাসেন ম্লান হাসি—কথা কি জানিস?—সবার ক্ষয় বুঝি, ক্ষতি বুঝি, পরের দুঃখ বুঝি, কষ্ট বুঝি, তবু নিজের এতটুকু ছেড়ে দিতে বড় কষ্ট। জানিস এর প্রত্যেকটি ইট আমার প্রত্যেক দিনের রক্ত-জল-করা পয়সা দিয়ে তৈরি।

ছেলেরা বলে—তোমার ত শুধু বাড়ী, ওদের যে ধন-সম্পত্তি সমাজ-সংসার সব চুরমার হয়ে যাচ্ছে?

অধৈর্যের সঙ্গে অম্বিকাচরণ ব'লে ওঠেন,—পাপ, জমে-ওঠা পাপ!

অম্বিকাচরণ অনবরত শুধু এ-ঘর ও-ঘর এ-ছাদ ও-ছাদ বাগান জমি ঘুরে বেড়ান। রাত্রিবেলা স্তব্ধ হয়ে ব'সে

থাকেন বারান্দায়। ভাবতে ভাবতে বলে ওঠেন—ভাঙা পাঁজর ভেঙে দেবে আরও। কিন্তু পারবে কি, সারা-জীবনের পরিশ্রম দিয়ে যতটা সুখশান্তি গড়ে তুলেছিলাম, দিতে পারবে কি তার এতটুকু গ'ড়ে?

শ্যাম সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কেন পারবে না বাবা, মানুষই পারে, মানুষই পারে না আবার।

তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে অম্বিকাচরণ বলেন—পারবে বলিস্? এই যে এত ভাঙা-পাঁজরের স্তূপ জমল, আবার ঠিক ক'রে তুলতে পারবে তা?

ছেলে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বললে—ঠিক করতে পারুক বা না পারুক, তবু যুগ যুগ ধরে মানুষ ত সেই আশাই ক'রে এসেছে বাবা। তাদের শেষ কামনা, শেষ সাধনা ত তাই—শান্তি, আনন্দ। কিন্তু মানুষ পারছে না, বারে বারে সে ব্যর্থ সেখানে। তুমি তোমার সারাজীবনের স্বপ্ন, সারাজীবনের পরিশ্রম দিয়ে গ'ড়ে তুললে এই বাড়ি, এত শান্তি, আনন্দ। ওরা তার চেয়েও বেশী পরিশ্রমে, কতজনের জীবনপাত করা সাধনায় তৈরি ক'রে তুলেছে এই মারণ-অস্ত্র। ধ্বংস ক'রে দিল—যেটুকু সুখশান্তি গ'ড়ে উঠেছিল পৃথিবীতে! আজ যতখানি অমানুষিক ক্ষমতা দিয়ে ওরা ধ্বংসের সৃষ্টি করছে ততটা ক্ষমতা যদি শান্তি আর আনন্দ গড়বার কাজে লাগাতো, আজ পৃথিবী হ'ত স্বর্গ। কিন্তু হ'ল না, হবে না। সেখানে মানুষ অভিশপ্ত, মানুষ পরাজিত। আপনি সৃষ্টি ক'রে আপনি ধ্বংস করছে তাকে। তবু যুগে যুগে তার স্বপ্নে তার কল্পনায় গভীর দুরাশা; সে গ'ড়ে তুলবে স্বর্গ, পৃথিবীতে আনবে আনন্দ, শান্তি,—আনবে নবযুগ।

শ্যামের যৌবনোদ্দীপ্ত সুন্দর মুখে রাঙিয়ে উঠল প্রথম আলোর অরুণ রশ্মি। অম্বিকাচরণ চেয়ে চেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভাবেন, তাঁর মুখে ফ্যাকাশে অনির্ভরযোগ্য করুণ হাসি; শেষবেলাকার সূর্য যেমন সাময়িক একটু উজ্জ্বল হয়ে যায়। বলেন—ওরে আশা-ভরসা, সুখ-স্বপ্ন তোদের—যাদের আছে সময়; পারে এসেছি, আমাদের যে দিন গেছে, আমার মত এই বয়সে পৃথিবীর উপরে যারা হারিয়েছে ভরসা, তাদের কোথায় বা আশা, কিসের বা আদর্শ! আমাদের যা যাবে তা যাবেই, তাকে নিয়ে কল্পনা গাঁথবার সামর্থ্য আমাদের যে আর নেই!

* *

বাড়ি ছেড়ে এক দিন যেতেই হ'ল, তিন দিনের নোটিশে শহর একেবারে খালি। বড়ছেলে কাজ করে যেখানে, সেখানে গিয়ে অম্বিকাচরণ বাসা বাঁধলেন। স্ত্রী তবু পাড়া-পড়শীর কাছে দুঃখ ক'রে কেঁদেকেটে হাল্কা করলেন মন, অম্বিকাচরণ আপন মনে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াতে লাগলেন সারা দিনরাত। তীব্র উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা ক'রে থাকেন কাগজের আশায়। কাগজওয়ালাকে দেখা গেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর দেহ-মন, কিন্তু কাগজটা খুলে পড়বার সাহস হয় না। ডাক দেন মেয়েকে—রমা, আয় ত মা, প'ড়ে শোনা একটু কাগজটা। চশমাটা ত সামনে দেখছি নে।

রমা আগা থেকে গোড়া অবধি প'ড়ে শোনায় খবর। আশঙ্কিত মনে শুনতে শুনতে সবটা যখন হয়ে যায় শেষ, অম্বিকাচরণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন—এখনও তবে আসার দেরী আছে?

হাসে রমা, বলে—তোমার বাড়িটাই ত তাদের এক মাত্র লক্ষ্য নয় বাবা, ওদিকের সব ঘাঁটি আগলে তাদের সুবিধামত তারা আক্রমণ করবে? তা ছাড়া কোন্ দিক্ দিয়ে আসবে তারই বা ঠিক কি?

অম্বিকাচরণের মুখে একটু দীপ্তি ফুটে বেরোয়, বলেন—আর নাই যদি আক্রমণ করে। ধর্, এমনও ত হ'তে পারে!

সবাই হাসে। শ্যাম বলে—তা ঠিক। ওসব থাক্, চল বাবা, ঘুরে আসবে শহরটা। তুমি ত সব এখনও দেখ নি।

ছোট মেয়ে উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ বাবা চল। তার পরে বাড়ি এসে নূতন কেনা রেকর্ডগুলো চালানো যাবে। আর সেই যে বলেছিলেম হেনার দিদির কথা, আজকে তাঁরা নদীর ধারে বেড়াতে আসবেন, হেনা বলেছে।

স্ত্রী বললে—যাও না গো, দেখে এস না গিয়ে মেয়েটি। সুশ্রী সুন্দরী যদি হয়, বউ করতে আপত্তি কি। শ্যামও ত যাচ্ছে, বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য ক'রে আসবে'খন।

অম্বিকাচরণ তাড়া খেয়ে উঠে পড়েন। নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে দিন গড়ে উঠছে এ'খানে।

মাসখানেক পরে, হঠাৎ এক দিন শোনা গেল চাটগাঁয়ে বোমা পড়েছে। সবার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—এইবার বাংলা। পুব দিক্ থেকেই ত দেখছি আক্রমণটা হচ্ছে।

অম্বিকাচরণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উৎকণ্ঠায় তাঁর কাটে না আর দিনক্ষণ। শ্যাম সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ভাবনা ক'রে আর কি করবে বাবা, বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে আমরা তিন ভাই-ই চাকরি ক'রে তোমায় কত বাড়ি তুলে দিতে

পারব। যাক্ না যুদ্ধটা থেমে, এ সব জায়গায় কী সস্তা জমি, একটা বাড়ী কি আর না-তুলব ভেবেছ?

ছেলের আশাভরা মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্যে অম্বিকাচরণ আপন দুঃখটা ভুলে যান। খোলা জানালা দিয়ে দূর দূরান্তর দেখতে দেখতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মনটা।

* *

কিন্তু আসামে বোমা পড়বার আগেই হঠাৎ নোটিশ এসে উপস্থিত অসামরিক লোকদের ছেড়ে দিতে হবে এ জায়গা। সামনেই কোথায় বসবে বিমানঘাঁটি। শ্যামের আপিস উঠে গেল কাশী। আবার তাড়াহুড়া, গোছানো সংসার ভেঙে-চুরে বাঁধা-ছাঁদা ক'রে ছুটতে হ'ল সেখানে।

ট্রেনের কামরায় অত্যন্ত ভীড়। অসম্ভব যাত্রী উঠছে প্রত্যেক স্টেশনে। পাশে বসে কাগজ পড়ছিলেন এক ভদ্রলোক, অম্বিকাচরণ তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—খবর কি মশাই।

—আর খবর! জার্মানীর অবস্থা কাহিল। হিটলার বক্তৃতা করেছেন,—জার্মানীর সমস্ত নরনারী ছোটবড় নির্বিশেষে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। তার উপরেই সমস্ত ক্ষমতা দিতে বলেছে সবাইকে। তবেই তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করবেন, আনবেন আনন্দ, শান্তি। বৃহৎ জার্মানীর অনেক স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন দেখছি।

কৌতূহলী হয়ে আরও দু-চার জন শুনছিল কথা, এক জন ব'লে উঠল—তার পরে!—তার পরে, এত বড় স্বপ্ন যখন সামনে তখন জান-প্রাণ ধন-সম্পত্তি তুলে দিতে আর আপত্তিটা কি?—বিশেষত যখন শত্রু-মিত্র সবাই বলছে বিশ্বের নব-বিধান হবে, পৃথিবীতে স্বর্গ আসবে নেমে। তা, এখন তো আপাতত চল তোমরা স্বর্গে!

—স্বর্গের রাস্তা তৈরি করতে? না এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে!—এক ফচ্‌কে ছোক্‌রা ভীড়ের থেকে ফোড়ন কেটে উঠল। হা-হা ক'রে একটা হাসির রোল পড়ল। কাগজ-পড়া ভদ্রলোক হেসে বললেন—তা যা বলেছ, স্বর্গের রাস্তাই তৈরি হচ্ছে!—মড়ার স্তূপে!

অম্বিকাচরণ আবার বললেন—যুদ্ধের খবর কি মশাই।

—বিশেষ কিছু ত দেখছি নে এদিকে। তবে সব নিয়ে রুশ-রণাঙ্গনে বসন্ত-অভিযানের আর বেশী বাকী নেই। এবার একেবারে শ্যেন-ভুজঙ্গে মরণ-আলিঙ্গন।

ট্রেন এসে থামল একটা ছোট স্টেশনে। প্রকাণ্ড একটা ভীড় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাশের দু-তিনটে গ্রাম খালি করা হচ্ছিল। যত ছেলেমেয়ে, বুড়ো-যুবা, লাটবহর, মালপত্তর। মেয়েরা ঘন ঘন মুছছে চোখ, ছোটদের চোখে ভীতি-বিহ্বলতা, কোলের ছেলে কেঁদে অস্থির। বুড়ো, যুবাদের বিরক্তি, মুখ খিঁচুনি, হুড়োহুড়ি—বিষম ব্যাপার বেধে উঠল। ট্রেন-যাত্রিগণ ঔৎসুক্যে ঝুঁকে পড়েছিল, কেউ বা নির্বিকার বসে রক্ষা করছিল আপন আপন স্থান, সম্পত্তি। অম্বিকাচরণের কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে উঠল এসে একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক, সঙ্গে মা, স্ত্রী, দু-তিনটি ছেলেমেয়ে। বছর পাঁচ-ছয়েকের মেয়েটির পায়ে একটা ভারী বাক্স চাপা প'ড়ে থেঁৎলে গেছে খানিকটা। পড়ছে রক্ত, মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ঝুড়ির থেকে পড়ে ভেঙে গেছে কোলের শিশুর দুধ-খাওয়াবার বোতলটা। মা শুধু সেই কথাই বার বার বলছিলেন—ওরে বোতলটা যে ভেঙে গেল, ছেলে দুধ খাবে কেমন ক'রে। গীতার পা'টাকে একটু বেঁধে নিলে হ'ত···।

ভদ্রলোক বিরক্তস্বরে বললে—ওসব থাক্ এখন। দেখছ না কি ব্যাপার! আগে ওখানে পৌঁছে নি তার পরে নিশ্চিন্তি মনে করা যাবে ওসব। ওর পায়ে অমনি একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখ।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—না-খাওয়া, না-ঘুম; দু-তিন দিন ধ'রে এই যে ঝঞ্ঝাট! এত দিনের বাড়ী-ঘর রইল, গোয়াল গরু রইল···তবু যদি প্রাণটা বাঁচিয়ে ভালোয় ভালোয় থাকা যায় ওখানে, তবেই শান্তি। ও-জায়গাটা নিরাপদ তো রে?

অম্বিকাচরণ কৌতূহলে এদের কথাগুলি শুনছিলেন, হঠাৎ শুকনো হেসে বললেন—যাচ্ছেন কোথায় আপনারা? আজকাল কি নিরাপদ ব'লে কোনো স্থান আছে। এই ত এক জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে এসে আরেকখানে বাঁধলাম বাসা, ছিলাম নিশ্চিন্তে, পড়ল তাড়া, আবার পালাচ্ছি। সেখান থেকেও যে হবে না পালাতে, কে বলবে। আজকাল আর শান্তি!—আর আশ্রয়!

আধা-বয়সী ভদ্রলোক গাঁয়ের সাদাসিধে জীব, ভীত-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে বললে—তা তো ঠিকই। কিন্তু তবু তা সেই আশায়ই···

কথা তার আর হ'ল না শেষ, ট্রেন ছাড়বার হুইস্‌ল্ তীক্ষ্ণ আওয়াজে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর ভীড় যেন উত্তাল সমুদ্রের মত উঠল উদ্বেল হয়ে। অর্ধেক

লোক পেরেছে উঠতে, তাদের চেঁচামেচি, উঠতে পারে নি যারা, তাদের ঠেলাঠেলি—প্রচণ্ড রোলে আকাশ-বাতাস মুখর। কারুর ট্রাঙ্ক গেল প'ড়ে, চেপ্টা হ'ল সুট্‌কেস, কত শিশি-বোতল ভাঙল, হাত-পা ছড়ল, কাপড় ছিঁড়ল, কারু ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে। শুধু একটু স্থান, একটু শান্তি, মানুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা তাদের তুললে পাগল ক'রে। দুর্নিবার দুরাশায় সবাই তখন ট্রেনে চাপতে মেতে উঠেছে।

ফচ্‌কে ছোক্‌রাটা মুখ বাড়িয়ে দেখে দেখে হেসে বললে—সুরু হবে বুঝি বিশ্বের নব-বিধান, তাই যত পুরনো বিধান ভাঙছে!

—স্বর্গ নেমে আসছে হে, পৃথিবীতে স্বর্গ! স্বর্গে যাবার মহড়া চলছে,—বুঝছ না?—কাগজ-পড়া ভদ্রলোক বলতে বলতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

কলরবমুখর জনতার চাপে হতভম্ব হয়ে রইলেন অম্বিকাচরণ। কোথায় রইল তাঁর বাড়ির চিন্তা, বাঙ্ক থেকে পতনোন্মুখ একটা ভারী ট্রাঙ্কের তলা হ'তে নিজের কেশবিরল মস্তকটি বাঁচাতেই তিনি তখন ব্যস্ত।

অমরনাথে বাঙালী যাত্রী

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

জ্যৈষ্ঠ মাস—লাহোরে পাথরফাটা রোদ। পিপাসায় পৃথিবীর কণ্ঠ শুষ্ক। নীচে ধূলি, উপরে আঁধি। চক্ষু ত অন্ধ হইয়াছেই—হৃদয়েও আঁধি লাগিয়াছে। সবুজের চিহ্নও কোথায় নাই। বরফ, ঘোল, সরবৎ, শিকাঞ্জবি খাইয়া কোন প্রকারে প্রাণ টিকিয়া আছে। কচি শসা আনে সবুজের বুক হইতে সাদর নিমন্ত্রণ। ধরা পাঠাইয়া দেয় তার নিগূঢ় হৃদয়ের উচ্ছলিত রসের জীবন্ত স্পর্শ তরি-তরমুজে। গৃহে রোগিণী আছেন। ভাবিলাম যে এবার দেশভ্রমণ, তীর্থদর্শন ও স্বাস্থ্যলাভ একসঙ্গে করিতে হইবে। হাতের কাছে কাশ্মীর—এ সুযোগ জীবনে দুবার আসিবে না। ভূ-স্বর্গ দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিব। প্রথম বয়সে কাশ্মীরের অনেক স্বপনও দেখিয়াছি। মনে পড়ে টমাস্ মূরের ভেল অব্ কাশ্মীর। সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। কাশ্মীরের নীল হ্রদ, তার মাঝে উড়ন্ত দ্বীপ, তারি মধ্যে আবার একটি নর ও একটি নারী, বুকে বুক দিয়া, নিরন্তর, নিরবধি। কিন্তু এ অবেলায় সে কথা কেন?

সুতরাং ঠিক হইল এবার কলেজ বন্ধ হইলে কাশ্মীর ভ্রমণ ও অমরনাথ দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে হইবে। এখানকার সেচ-বিভাগের গবেষণাধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীকান্ত বসু মহাশয়ও সপরিবারে যাইবেন স্থির করায় উৎসাহ বাড়িয়া গেল।

ছুটি হইতেই জম্মুর পথে কাশ্মীর চলিলাম। লাহোরের মাছি, মশা, ধূলি ও শুকনো পাতা বহু দূর সঙ্গে সঙ্গে চলিল অতীত জীবনের স্মৃতির ব্যথার মত। চেনাবের দুর্গম গিরিপথ বহিয়া অবশেষে যখন বানিহাল গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিলাম, তখন হঠাৎ সম্মুখে যে অপূর্ব্ব শোভা উদ্ভাসিত হইল তাহা জীবনে ভুলিব না। যেন মরুভূমির উপকূলে শ্যামল স্বর্গ! যেদিকে চাই প্রকৃতি যেন সবুজের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। গিরিনদীর স্নিগ্ধ রজতকান্তি আমাদের পিপাসাক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দিল। ক্ষণিকের জন্য ভ্রম হইল যেন সারা বাংলা দেশটা কোন যাদুমন্ত্রে বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে হিমালয়ের অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াছে। সেই কচি ধান, সেই দৃষ্টির অতীত সীমা পর্য্যন্ত সবুজ মাঠ। নদনদী খাল প্রণালী। আকাশের গাঢ় নীল, জলের সেই রূপালি শোভা। ধানের ক্ষেতে হাঁটু জলে অনাহারক্ষীণ কৃষক, ছোট ছোট গরু ঘোড়া। মনে হইল বহুকাল পরে বাংলার শীতল বুকে আবার বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে ক্ষণিকের ভুল। আমার ভাব দেখিয়া পথের ধারে পপ্‌লারতন্বীরা অভিজাত সুন্দরীর মত আকাশের দিকে মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া তাচ্ছিল্যভরে হাসিল। উইলো বধূ লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল—সারা অঙ্গে কৌতুকের পুলক ঢেউ খাইয়া গেল। শহুরে বড়বাবুর মত দুগ্ধঘৃতপরিপুষ্ট চেনার আমাকে বাঙাল ভাবিয়া হাসিতে গিয়া বিরাট ভুঁড়িতে খোঁচা খাইয়া থতমত খাইয়া গেল।

তখন প্রভাত-সূর্য্যের রশ্মিমালা শৈলশিখরে পড়িয়াছে। দেখিলাম গিরিরাজও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছেন। বুঝিতে দেরি হইল না যে ইহা বাংলা দেশ নহে।

অবশেষে শ্রীনগরে পৌঁছিলাম। আসিবার সময় দেখিলাম জাফরানের ক্ষেত উঠিয়া গিয়াছে। আর ঝিলামও এখানে আঁকা-বাঁকা খাপে-ঢাকা তরোয়ালের মত নয়। বরং মনে হইল যেন ভাগীরথীর কূল বহিয়া চলিয়াছি। অপর দিকে গিরিরাজ যেন সহস্র হাত বাড়াইয়া দিয়া শৈল-নন্দিনীকে বুকে ধরিতে ছুটিয়াছেন। এই সেই শ্রীনগর—ভূ-স্বর্গের রাজধানী শ্রীনগর! কিন্তু কোথায় সেই মরকত-কুঞ্জ, পারিজাত-মন্দার বীথিকা? শৃঙ্গারোৎসবমত্ত প্রকৃতির শ্রীঅঙ্গে কেন এই কুষ্ঠের ক্ষত? কেন এই ক্রূর পরিহাস?

শ্রীনগরে আসিয়া মনে হইল যেন লাহোরের সিটিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রাণ ফোঁপাইয়া বলিল, পরিত্রাহি, পরিত্রাহি। বন্ধুদের আসিতে দেরি আছে ভাবিয়া একটু দেশ দেখিতে লাগিলাম। প্রথমে গেলাম গুলমার্গ—ইউরোপীয়দের ইলিসিয়াম। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে নয় হাজার ফুট উঁচুতে উঠিয়াও মাছি ও ধূলার হাত হইতে নিস্তার পাইলাম না। বৃষ্টির অভাবে গুলবাগানের গুল মরিয়া গিয়াছে। আলপাথরের বুক খাঁ-খাঁ করিতেছে। খিলনমার্গে বিল ধরিয়া আছে। যেখানে যত বরফ ছিল গরমের ছুটি পাইয়া সব পঞ্জাবে নামিয়া গিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এখানে নাই বলিয়া গৃহিণীর খেদের সীমা নাই। আমার দুঃখ যে এই অসময়ে আসিয়া একটা সুখস্মৃতিও আনিতে পারিলাম না। বহু দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে বার্চ্চহিলের বিশ্রামকুঞ্জে দর্শকদের ভাব প্রকাশের জন্য একটা খাতা দেখিয়াছিলাম। একজন দর্শক কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া চিত্তের উচ্ছ্বাস ধরিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বিউটিফুল, ম্যাগ্নিফিসেণ্ট, ওয়াণ্ডারফুল, মোর ওয়াণ্ডারফুল দ্যান দি ইডেন গার্ডেনস্!" হায়! ভগবান্ আমায় এমন একটা কথাও দিলেন না! যাঁহারা গুলমার্গের কথায় পাগল হন তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

মন বলিল এবার আরও উত্তরে চল। অমরনাথের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্রীনগর হইতে ষাট মাইল দূরে পহেল গামে (৭২০০ ফুট) গিয়া ডেরা বাঁধিলাম। এখানেও কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার-শোভা নাই বলিয়া আমাদের প্রথম প্রথম খেদের অন্ত ছিল না। ধীরে ধীরে সে ভাব কাটিয়া গেল। দুই ধারে ঘর্ঘরমুখর গিরিনদী সরীসৃপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিম্নাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, মধ্যে উপত্যকা। নদীর দিকে তাহারই একটি কিনারায় তাঁবু ফেলিলাম, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতমালা, পাইন-বনের নিত্য সনসনানি। পূর্ব্ব-গগনের সূর্য্য ধুঁকাইয়া ধুঁকাইয়া পাহাড় বহিয়া উঠে। আবার সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে পশ্চিম-পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইয়া যায়। রাত্রির গাঢ় নীল আকাশ হইতে নামিয়া আসে একটা নিবিড় শান্তি। তরল কুয়াশার মসলিন পর্দ্দা সরাইয়া চাঁদ আসে আমাদের ঘরে। এইভাবে দিন যায়, রাত্রি আসে। বাংলার কবিকে ধন্যবাদ, যিনি এই অপূর্ব্ব শোভার দিকে চাহিয়া লিখিয়াছেন,

"সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে, সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে।
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে ডুবালে সে সুধা-সরসে।"

অন্ধকার রাত্রিতে সহস্র তারকা পাঠাইয়া দেয় তাহাদিগের নীরব প্রসন্নতা। মন গাহিয়া উঠে—

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে, আপন আমার আপ্‌নি মরে লাজে।

কবির কবিতা কত চিরপরিচিত সৌন্দর্য্যকে নূতন করিয়া দেখায়—কত অদেখা রূপের অবগুণ্ঠন তুলিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করে। পৃথিবীর যেখানে যত বিচিত্র শোভা দেখিয়াছি তাঁহারই ভাষায় পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগ করিয়াছি। পহেলগামে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার দুঃখ ভুলিলাম। প্রকৃতির নব নব লীলা দেখি আর বিশ্বের যেখানে যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে গ্রথিত করি। আবার নূতন করিয়া উপভোগ করি। আমাদের কবির অমর বাণীর মধ্য দিয়া নব নব রূপের সন্ধান পাই। প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

পহেলগামে আসিয়া দেখি যে সারা পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। কিছু দিন যাইতে-না যাইতে আমাদের আনারকলি বাজারও এখানে আসিয়া বসিল। পঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, মাদ্রাজী, বাঙালী—একটা যেন নিখিল-ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এখানে যে কয়জন বাঙালীর সঙ্গে নূতন পরিচয় হইল, তাহার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দিনাজপুরের জমিদার কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ, মহাশয়। ধন, আভিজাত্য, প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা, বৈষ্ণবোচিত বিনয়, সকল গুণ তাঁহাতে একাধারে সমাবিষ্ট। তাঁহার প্রীতি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আতিথ্য আমাদের বিদেশবাসের দুঃখ লাঘব করিল।

অবশেষে প্রবল বর্ষা মাথায় করিয়া সপরিবারে ডাঃ বোস আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমাদের পাশে তাঁবু বাঁধিলেন। যাত্রার আর বেশী বাকী নাই। পূর্ণিমার

দিন অমরনাথের উৎসব। ছড়ি তাহার আগেই ছাড়িবে। ভারতের নানা স্থান হইতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সমাগত হয়। পহেলগামে ভিড় জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে বর্ষারও প্রবল ঘনঘটা। আমরা ঠিক করিলাম যে ছড়ির ভিড়ে যাইব না। বরং যাত্রা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমরা ফিরিয়া আসিব। কিন্তু বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ নাই। ডাঃ বোসের ছুটি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বন্ধু-কুমারীরা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের উদ্যোগ-পর্ব্ব চলিতে লাগিল। পাঁচ-ছয় দিনের মত চাল, আটা, ডাল, তরকারি, ডিম, রুটি, ঘি, মাখন, এমন কি পাঁচ-ফোড়নটি পর্য্যন্ত কিনিতে বাকী রহিল না। কেননা, পহেলগাম ছাড়িলে কিছুই পাওয়া যাইবে না। লাকড়িও নয়। অবশেষে এক দিন বিকেল ৪টার সময় বর্ষা শান্ত হইয়া আসিল। আকাশে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পাণ্ডুর মেঘগুলি অপারেশন-টেবিলে ক্লোরো-ফর্ম্মাবিষ্ট রোগীর মত অসাড়ভাবে শুইয়া রহিল। ঘোড়া আগে হইতেই ঠিক ছিল। বৃষ্টি থামিতে-না-থামিতে সকল পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দ্বিধাক্লিষ্টচিত্তে আমরা পাড়ি দিলাম। মতলব সেই রাত্রিতে আট মাইল দূরে চন্দনবাড়ী ফাঁড়িতে রাত্রি যাপন করিব।

আমাদের রসদ, তাঁবু, লাকড়ি ও কয়লা লইয়া চলিল পাঁচটি ঘোড়া। আমাদেরও প্রত্যেকের একটি করিয়া ঘোড়া। সঙ্গে ভৃত্য ও সহিস দশ-এগার জন। আমাদের ক্যারাভ্যানের দিকে চাহিয়া মনে হইল যেন আমরা উত্তর মেরু আবিষ্কার করিতে চলিয়াছি। রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল। চড়াই ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছি। বাম দিকে পাহাড়, ডাহিনে বহু নীচে শেষনাগের জলোচ্ছ্বাস।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে',
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।

এই নদীর যেখানে শেষ সেইখানে আমাদের যাইতে হইবে। কিন্তু সেখানেও আমাদের যাত্রা শেষ হইবে না। পাইন-বনের ঘন শ্যামল রূপ পথের দুই ধারে। পাইনকোণের উপর দিয়া মচ্ মচ্ করিয়া চলিয়াছি। ফুলের সৌরভে চিত্ত ভরপুর। গিরিনদী কত বিচিত্ররূপে আমাদিগকে আবাহন করিতেছে। কত পাষাণ-কারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার চলার পথে। কত রামধনু অর্দ্ধ পথে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, জলধারা কখন উদ্বেল, উদ্দাম, শিলায় শিলায় নৃত্যশীলা। কখন বা শান্ত, ধীর গ্রাম্যবধূর মত লজ্জাজড়িত চরণে বনপথে প্রবাহিতা, বনফুলের ঘোমটা টানিয়া। এ চলার শেষ নাই—

লোক আসে লোক যায়
আমরাই শুধু চলি নিরবধি।

যাইবার পথে প্রত্যেকটি কুসুমকলি চুম্বন করিয়া যায়। দুই তীরে কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্র তরঙ্গের আনন্দ-দোলায় রাত্রিদিন দোলে।

রাত্রির অন্ধকারে বনপথ বহিয়া চলিয়া প্রায় আটটার সময় চন্দনবাড়ী (৯৫০০ ফুট) পৌঁছিলাম। কুয়াশায় কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আকাশে সপ্তমীর চন্দ্রমা ম্লান, ভীত। যাত্রা উপলক্ষে দু-একটি দোকান ও হোটেল খুলিয়াছে। রেস্ট-হাউস নামধেয় আশ্রয়-ভবন যেখানে মানুষ ও ঘোড়া কোলাকুলি করিয়া শুইয়া থাকে তাহারই সন্ধানে ঘুরিতেছি। এমন সময় এক সহিস দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া বলিল, "এক মায়ী গির গেয়ী"। আমি ভাবিলাম বুঝি নদীর জলে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দেখি আমাদের এক জনের (নাম নাইবা করিলাম) ধর্ম্মপত্নী ধরাতলে পতিতা। শঙ্কিত সহিসকুল চারিপাশে দণ্ডায়মান। অদূরে অশ্বপুঙ্গব নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তৃণসেবনে ব্যাপৃত। মহিলার ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন দুনিয়ার দিকে শেষ বিদায়ের চাহনি চাহিয়া আছেন। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে রেস্টহাউসে আনিয়া শোয়ান হইল। মনে মনে ভাবিলাম বুঝি পাণ্ডবের স্বর্গারোহণ পালার প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। চোট বেশ লাগিয়াছে, বিশেষ করিয়া অচেনা অন্ধকার নির্জ্জন এই গিরিপথে। বুঝিলাম পরদিন প্রভাতে ডেরাভিমুখে ফিরিতে হইবে। কিন্তু গরম ফুল্‌কা ও কুক্কুট-মাংস উদার ভাবে উদরস্থ করিয়া মহিলা উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন যে যাহাই ঘটুক তিনি ফিরিবেন না। পরদিন যাওয়া হইল না। প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম ডাঃ বোস চিন্তাকুলভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘের রেস্ দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরই বর্ষা আরম্ভ হইল। সম্মুখে শিশুঘাটীর চড়াই—খাড়া দেড় হাজার ফুট উঁচু। বানরের মত ঝুলিতে ঝুলিতে চড়িতে হইবে। স্থানীয় দোকানীরা বার বার নিষেধ করিল। পরে পূর্ত্ত বিভাগের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনিও যখন সেই কথাই বলিলেন, তখন থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া নদীপারে বনবিভাগের বাংলোর আশ্রয়ে যাইব স্থির করিয়াছি এমন সময় এক ইংরেজ

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় হইল। একই পথের পথিক। আমরা যুবককে ডাকিয়া গরম গরম খিচুড়ী খাওয়াইলাম ও শীঘ্রই মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। সারাদিন ও রাত্রি বাংলোতে খুব আনন্দে কাটান গেল। পর দিন দিবা পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ক্যাপ্টেন সাহেব পথ ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে যাইব কি ফিরিব এই ভাবিতে ভাবিতে যেই দেখিলাম আকাশে ক্ষীণরশ্মিরেখা, অমনি আমরাও বাহির হইয়া পড়িলাম। বল্লমের উপর ভর দিয়া মিনিটে তিন কদম চলিয়া অবশেষে আমরা পিশুঘাটীর দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ জয় করিলাম। রাস্তা আরও সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠিল। শেষনাগের উচ্ছল জলরাশি বঙ্কিমগতিতে বহু নীচে দিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বরফের পুল। নীচের দিকে চাহিতেও ভয় করে।

ঘোড়ার অনেক লেজ কান মলিয়া, অনেক তোষামোদ করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় তৃতীয় পাড়াও শেষনাগ হ্রদতীরে (১১৭৩০ ফুট) আসিয়া পৌছিলাম। হ্রদের অনির্ব্বচনীয় শোভা আমাদের সকল কষ্ট হরণ করিল। স্থিরগম্ভীর বারিপুঞ্জ—যেন দ্রবীভূত মরকত। চারি পার্শ্বে হরিদ্রাক্ত পুষ্পের দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গ। পূর্ব্ব তীরে পঞ্চশিখর শৈলমালা হিমানীর কিরীট পরিয়া কোন অনাদিকাল হইতে কাহার অপেক্ষায় নির্ণিমেষ চাহিয়া আছে।

সৌভাগ্যক্রমে এখানেও একজন লোক দু-তিন দিন হইল খাবারের দোকান খুলিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে বলিতেছি তাহার কারণ আমাদের রান্নার সময় নাই, কেননা, সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে চতুর্থ পাড়াও পঞ্চতরণীতে পৌছিতে হইবে। ভৃত্যও ক্লান্ত। সর্ব্বোপরি আমাদের বাসনের অভাব। যাত্রার সময় আমরা সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, এমন কি দিয়াশলাইটি পর্য্যন্ত এক ডজন আনিয়াছি। কিন্তু রাঁধিয়া ঢালিবার বাসন ভুলিয়া আসিয়াছি। রাঁধিবার পাত্রও একটি। চন্দনবাড়ীতে চাহিয়া-চিন্তিয়া কাজ চালাইয়াছি। শ্রীযুক্তা বসুজায়া টিপটু হইতে ডিমের তরকারি পরিবেশন করিয়া সুনিপুণ গৃহিণীপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। এখানে মাটির বাসন পাইবারও সম্ভাবনা নাই। এক একটি করিয়া রাঁধিয়া তাহা খাইয়া ফেলিয়া দ্বিতীয়টি রাঁধা ছাড়া উপায় নাই। যাহা হউক, পুরী ও কড়মের শাক পাওয়া গেল। ক্ষুধা-বোধও ছিল না। অনেক চেষ্টা করিয়া দুধ পাওয়া গেল না। বিলাতী দুধ আমরা ব্যবহার করিব না ঠিক করায় এই বিপত্তি। চন্দনবাড়ীর পর কিছু পাওয়া যায় না জানিতাম। আহার শেষে আবার যাত্রা সুরু হইল। এ দিকে আকাশের মূর্ত্তি ক্রমেই ভীতিজনক হইয়া আসিল। সন্ধ্যার আগে দু-হাজার ফুট উঠিতে হইবে। সম্মুখে বায়ুযান তার পর মহাগুণ গিরিসঙ্কট।

শেষনাগের পর গাছপালা শেষ হইয়া গেল। দুধারে শুধু কচি ঘাস, লাল ও হল্‌দে ফুলের ঢেউ। জুনিপার গুল্মের ঝাড় বিনয়ের ভারে প্রায় মাটি ছুঁইয়া আছে। দূরে খাড়া উলঙ্গ পোড়ামাটি রঙের পাহাড়। কোন অজানা কাল হইতে গ্লেসিয়ার বহিয়া বহিয়া স্রোতধারার প্রবহমান চিহ্ন সারা অঙ্গে ধারণ করিয়া আছে। ঘর্ষণে ঘর্ষণে শীর্ষদেশ তীক্ষ্ণ হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে মনে হয় যেন কত না মূর্ত্তির অসমাপ্ত কাঠাম খাড়া হইয়া আছে। বুঝি বা যেন কোন অনৈসর্গিক ভাস্করের রচনাশালা। তরল উড়ন্ত মেঘের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দেখিয়া মনে হইল যেন একটা সীমাহীন চন্দ্রচাল বিরামবিহীনভাবে চলিয়াছে—যেন অগণিত দেব ও অসুর অমরার সংগ্রামক্ষেত্রে ধাবমান। সকলের মাঝখানে দেখিলাম একজন বিরাট্ পুরুষ ঊর্দ্ধ নভোমণ্ডলের দিকে দেখাইয়া বলিতেছে—"তমেব বিদিত্বা-তিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" অনাদি যুগ হইতে যেন বলিয়া আসিয়াছে।

বায়ুযান পর্ব্বতের (১২৮৫০ ফুট) শিখরদেশে দারুন শীতে আমাদের হাত-পা জমিয়া গেল। বৃষ্টি আসিল কিন্তু পড়িল তুষার। মনে হইল যেন আমাদের যাত্রা সার্থক হইয়াছে, যেন অমরধাম হইতে দেবতারা লাজবৃষ্টি করিতেছেন। সেই শুভ্র পবিত্র স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের সকল কালিমা ধুইয়া গেল। মহাগুণ গিরিবর্ত্ম (১৩৮৫০ ফুট) উত্তীর্ণ হইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। তরল রৌদ্রে প্রকৃতি উজ্জলা হইল। এবার নামিবার পালা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঞ্চতরণীর কূলে (১২০০০ ফুট) গিয়া পৌছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার বৈতরণীকূলে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"এ কি সেই বৈতরিণী যাহার জলে সকল জ্বালা জুড়ায়?" বঙ্কিমচন্দ্র যদি পঞ্চতরণীর শোভা দেখিতেন! চারিদিকে গিরিপ্রাচীর ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে চলিয়া গিয়াছে। অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা তুষারশীর্ষ শৈলমালার শিরে হীরকমুকুট পরাইয়া দিয়াছে। গলিত হিমস্রোতে দাবানল জ্বলিয়াছে। মধ্যে শ্যামল নবদূর্ব্বা-দলের গালিচা। তাহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত পাঁচটি

স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলধারা। যদি এই জলে একবার স্নান করিতে পারিতাম, তবে বুঝি সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত!

সন্ধ্যা আসিল। নীল আকাশে চন্দ্রাতপে অযুত আঁখি জ্বলিয়া উঠিল। সূর্য্য কখন অস্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু পশ্চিম গগনে আলোর প্লাবন তখনও শেষ হয় নাই। চন্দ্রালোকে নিখিল বিশ্বে উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। স্তব্ধের সহিত স্তব্ধের নীরব রভসালাপ চলিয়াছে। দূরে তুষারমণ্ডিত শৈলচূড়ায় চন্দ্র আসিয়া ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য চন্দ্রমৌলি ধূর্জ্জটির ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তিটি সেই আদিম কবিকে যেমন করিয়া রোমাঞ্চিত করিয়াছিল তেমনিভাবে হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইল। প্রকৃতির সেই গোপন-লীলা-কুঞ্জের দ্বারে আমরা কয়জন নরনারী অপরাধীর মত পড়িয়া রহিলাম।

শীতে, ক্লান্তিতে ও আবেগে রাত্রিতে ঘুম হইল না। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে আমাদের আবার যাত্রা সুরু হইল। সহিসেরা বলিল যেন আজ আমরা কোনরূপ আমিষাহার না করি। পুরুষেরা কোন নিয়ম মানিল না। মহিলারা কেমন যেন অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সংযতাহার করিলেন। অতি কষ্টে গত সন্ধ্যায় ভেড়ার পাল হইতে দুধ সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা কাজে লাগিল। সম্মুখে ভৈরবঘাটীর (১৪৩৫০ ফুট) দুর্গম গিরিবর্ত্ম। দু হাজার ফুট চড়িতে হইবে। এমন সংকীর্ণ ও সোজা খাড়া পথ যে নীচের দিকে তাকাইতে মাথা ঘুরিয়া যায়। কত বার মনে হইয়াছে যে এই বুঝি অনন্তের পথে ঘোড়া ছুটাইলাম। কিন্তু এই সব পার্ব্বত্য ঘোড়া মানুষের চাইতে সাবধান। তাই বাঁচিয়া গেলাম। অবশেষে অমরগঙ্গার উপকূলে অবতীর্ণ হইলাম। নদীর জল গত রাত্রির দারুন শীতে বরফ হইয়া গিয়াছে। হাঁটিয়া পার হইলাম। কিছু ক্ষণ পরে দূর হইতে অমরনাথের গুহা দৃষ্টিগোচর হইল। ক্লান্ত দেহ আর চলিতে পারে না। অমরগঙ্গার উৎসমুখে আসিয়া কাচশুভ্র তুহিনশীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া মনে হইল যেন কোন মৃতসঞ্জীবনীর বলে দেহের শক্তি ফিরিয়া পাইলাম। গুহাপথে কপালে বিভূতি মাখিলাম।

দর্শন হইল। যাত্রাপথে কবিতার পুলকস্পর্শ বহু বার হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু দর্শনটিই হইল একমাত্র গদ্য। অমরনাথের গুহা (১২৭৩০ ফুট) সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নয়। মনুষ্যহস্তের ক্ষতচিহ্ন সারা অঙ্গে বিদ্যমান। হরপার্ব্বতী না রূপী, না অরূপী। রূপ আসিয়া যেন অরূপের কূলে ভয়ে ভয়ে তরী লাগাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলিলেন যে গুহা চূণের পাথরে নির্ম্মিত। বরফের জলে চূণ গলিয়া গুহাকোণের দুটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ক্ষরিত হয়, তাই জমা হইয়া এই দুই লিঙ্গের সৃষ্টি হয়। লিঙ্গ বলাও ঠিক হইবে না। যেন মাখা সিমিণ্টের দুটি পাঁজা। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি। এইটুকু রহস্য বুঝিলাম না। সর্ব্বশেষে সবুজ পারাবতরূপী রুদ্রগণের দর্শন পাইয়া আমাদের যাত্রাফল সফল হইল। শুনিলাম যে হর যখন পার্ব্বতীকে অমরজ্ঞান দিতেছিলেন সেই সময়ে রুদ্রগণ সেই রহস্য গোপনে শুনিয়াছিল বলিয়া এই শাস্তি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাদপপক্ষীবিহীন এই দেশে এই কপোতমিথুন কোথা হইতে আসিল? বাঁচেই বা কি ভাবে? এই দুটি রহস্য আছে বলিয়াই মার্ত্তণ্ডের পাঁচ-শ ঘর পুরোহিতের অন্ন সংস্থান হয়।

অমরগঙ্গার তীরে বসিয়া আছি। অদূরে অমরাবতীর শুভ্রশোভা। হৃদয় এই ধূমাকীর্ণ, কল-কলঙ্কিত জগৎ হইতে অতীতের সোপান বহিয়া কোন এক সুদূর সন্ধ্যার নীরব তপোবনে চলিয়া গিয়াছে। মনে বিস্ময় জাগিল, কে সেই অজানা প্রেম-বুভুক্ষু সন্ন্যাসী কবি যাঁহার তৃষার্ত্ত হৃদয় প্রকৃতির এই গোপন অভিসার-মন্দিরে স্বীয় অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার রঙ দিয়া হরপার্ব্বতীর এই অনৈসর্গিক প্রেম-চিত্র আঁকিয়াছে? কোন গৃহহারা এই তুষার মরুর মাঝ-খানে স্বামী-স্ত্রী, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা দিয়া এমন সুখের সংসার রচনা করিয়াছেন? কোন প্রেমাকুল যোগী হৃদয়ের অর্দ্ধদমিত ক্রন্দন মথিত করিতে না পারিয়া এই আত্মভোলা, প্রেমপাগল সন্ন্যাসীকে গৃহী করিয়াছেন? রতি ও বিরতি, প্রেম ও ত্যাগ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহার অতৃপ্ত প্রেম কি শান্তি পাইয়াছিল?

বহুকালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। অমরগঙ্গার জলধারার পথ বহিয়া আবার আমাদের নীচে নামিতে হইবে। স্বপ্নের আর সময় নাই। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। সহিসেরা অসহিষ্ণু, অশ্বের গতিবেগ একবারে হ্রস্ব। পুরুষেরা যদি না হাঁটেন তবে অশ্বের অশ্বলোকপ্রাপ্তি হইবে। আমরা হাঁটিয়াই অর্দ্ধেক পথ আসিলাম। পথের দুঃখের কথা আর নাই বলিলাম। মহিলারা শুধু মূর্চ্ছিত হইলেন না। আমরাও আড়ষ্ট দেহভার বহন করিয়া আবার ডেরায় ফিরিলাম। ক্লেশের কথা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু হৃদয়ে জাগিতেছে একটা নিবিড় স্পর্শের স্মৃতি।

আরও খাদ্য উৎপাদন করুন

রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

যদিও কবিরা আমাদের দেশকে "সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা" আখ্যা দিয়াছেন তথাপি দুঃখের কথা এই যে, বাংলায় যে সকল খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাহা এদেশের অধিবাসীদিগের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। "বিলাতী" খাদ্যের কথা দূরে থাকুক, এদেশের জনসাধারণের কেবলমাত্র প্রাণধারণের জন্য যে সকল সাধারণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাহারও অধিকাংশ বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলায় বৎসরে গড়ে ৪ কোটি ১২ লক্ষ মণ চালের অভাব হয় এবং তাহা প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থান হইতে আনিতে হয়; যদি ধরা যায় যে, বৎসরে মাথাপিছু গড়ে ৬ মণ চালের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই পরিমাণ চালের অভাবের জন্য প্রায় ৬৮ লক্ষ লোকের আহারের অভাব হয় এবং বাহির হইতে এই পরিমাণ চাল সরবরাহ না হইলে এই ৬৮ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া যাইবে। ৬৮ লক্ষ লোক বাংলার লোক-সংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ। ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে? বিধাতা বাংলাকে প্রচুর খাদ্য-উৎপাদনের অনুকূলে মাটি ও আবহাওয়া সম্বন্ধে বহু প্রাকৃতিক সুবিধা দান করা সত্ত্বেও যে বাঙালী তাহার প্রধান খাদ্যশস্যগুলিও জন্মাইতে পারে না, এ লজ্জায় বাঙালীর মাথা হেঁট হওয়া উচিত।

নেপিয়ার ঘাস—একবার লাগাইলে চার-পাঁচ বৎসর থাকে; সাড়ে তিন ফুট লম্বা হইলে বর্ষাকালে এক মাস অন্তর কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যায়

কেবল ইহাই নহে। অন্যান্য যে-সকল খাদ্যদ্রব্যের অভাবে বাংলার লোক বাঁচিতে পারে না, তাহাদের জন্যও বাঙালী ঠিক এই ভাবেই বাহিরের সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, যথা—চিনি, ডাল, সরিষা, আলু, গম, মসলা, পেঁয়াজ, ডিম ইত্যাদি। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই সকল জিনিস আমদানী হয়।

বাংলায় প্রত্যেকটি খাদ্যদ্রব্য কি পরিমাণে আমদানী করিতে হয় তাহার সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা হইতে নিম্নে বর্ণিত যে-বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা হইতে এই বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই হিসাবও যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যাহা হউক, এদেশ ওদেশের অধিবাসীরা যে এত দরিদ্র তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই নিঃস্ব দেশে কি বিরাট্ অপচয়।

হরিয়ানা ষাঁড়

জিনিসের নাম	দাম	কোথা হইতে আসে
চাল (৫কোটি মণ)	১৪ কোটি টাকা	বর্ম্মা, শ্যাম এবং পাটনা, (প্রধানতঃ বর্ম্মা)
গম (১২ লক্ষ মণ)	৫০ লক্ষ „	যুক্তপ্রদেশ ও পাটনা
লবণ (৮০ লক্ষ মণ)	২ কোটি „	পশ্চিম ভারতবর্ষ
চিনি (৫০ লক্ষ মণ)	৫ কোটি „	যুক্তপ্রদেশ ও বিহার
ঘি (৭ লক্ষ মণ)	৩ কোটি „	যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা এবং নেপাল
সরিষার তেল (২০ লক্ষ মণ)	৩ কোটি টাকা	যুক্তপ্রদেশ ও পাটনা
মসলা	৪০ লক্ষ „	সারা ভারতবর্ষ
পেঁয়াজ	২৫ লক্ষ „	পাটনা এবং যুক্তপ্রদেশ
আলু (৬০ লক্ষ মণ)	২ কোটি „	বর্ম্মা, যুক্তপ্রদেশ, পাটনা এবং আসাম
চীনাবাদাম	১০ লক্ষ „	মাদ্রাজ
মাখন	২৫ লক্ষ „	যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও পাটনা
ফল (টাট্‌কা)	১ কোটি „	পাটনা, আসাম, সিঙ্গাপুর, বিদেশ
ঐ (শুষ্ক)	২০ লক্ষ „	আরব, পারস্য এবং আফগানিস্থান
ডিম	২।০ কোটি „	বর্ম্মা এবং বিদেশ
মাছ	১ কোটি „	বর্ম্মা এবং বিদেশ

যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে "খাদ্য উৎপাদন" সম্বন্ধে বাংলা দেশকে স্বাবলম্বী করা যায় কি না? ইহার উত্তরে বলা যায় যে "করা যায়।" তবে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে যাবতীয় খাদ্য-শস্যের ফলন বাড়াইতে হইবে। কিন্তু যে আদিম পদ্ধতিতে আমাদের দেশে চাষ-আবাদ এখনও চলিতেছে, তাহার দ্বারা ইহা কখনই সম্ভব নহে। আমাদের উন্নত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এবং উন্নত শ্রেণীর (ক) বীজ, (খ) সার, (গ) গবাদি পশু এবং (ঘ) কৃষি-যন্ত্রাদির উপরই ইহা নির্ভর করে।

ইহাদের মধ্যে বীজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এবং বোধ হয় ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, বীজের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই "কৃষির সৌধ" নির্ম্মিত হয়। যে-বীজ হইতে ফলন বেশী হয় সেই বীজের প্রবর্ত্তনই আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির সহজ ও প্রত্যক্ষ উপায়। বিশেষতঃ বাংলায়, যেখানে জোত জমা খুব খণ্ড খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত এবং যেখানে কৃষকদের উন্নত যন্ত্রপাতি বা অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিবার সঙ্গতি নাই, সেখানে উক্ত উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। সুতরাং যদি স্থানীয় বীজের পরিবর্ত্তে কেবল উন্নত শ্রেণীর বীজের সাহায্যে বিঘাপ্রতি এক মণ ধান বা গম বা কয়েক মণ গুড় বেশী পাওয়া যায়, ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কৃষকও উপলব্ধি করেন যে, ইহার জন্য তাঁহাকে কোন অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে না বা চাষের প্রণালীর কোনও পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে না, অথচ তাঁহার শস্যের ফলন বাড়িতেছে। এই উদ্দেশ্যেই কৃষি-বিভাগ প্রথম হইতেই এ প্রদেশের সমস্ত প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য এবং আয়কর শস্যের উন্নত শ্রেণীর বীজ আবিষ্কারে রত আছেন।

শস্যের ফলন বাড়াইতে হইলে মাটিতে সার না দিলে চলে না; কিন্তু রাসায়নিক সার কিনিবার সামর্থ্য কৃষকদের না থাকিলে সে সার কিনিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। কৃষকদের বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, আগাছা, জঙ্গল, আবর্জ্জনা প্রভৃতি পচাইয়া এক প্রকার মূল্যবান জৈব সার প্রস্তুত হয়, উহা গোবর সার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা সহজেই এবং প্রায় বিনা খরচেই প্রস্তুত করা যায়; কৃষককে কেবল একটু পরিশ্রম করিতে হয় মাত্র। কিন্তু তাহার প্রতিদানে যথেষ্ট সুফল পাওয়া

যায়। চীন দেশে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত এই সারের দ্বারা মাটির উৎপাদিকা শক্তি বহু শতাব্দী যাবৎ অটুট রাখা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিষ্টার এইচ. পি. ভি. টাউনএণ্ড, সি-আই-ই, আই-সি-এস, লিখিত "ইন্দোর কম্পোষ্ট" নামক এক পুস্তিকায় চীনে এইরূপ সারের প্রস্তুত-প্রণালীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তিকা পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ হইতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

হরিয়ানা ষাঁড় ও দেশী গরুর দ্বারা উৎপন্ন বাছুর

এইরূপ আর একটি মূল্যবান সার কচুরিপানা হইতে প্রস্তুত করা যায় এবং এই ভাবে কচুরি পানার ব্যবহার হইলে শত্রুর ধ্বংস এবং মাটির তেজবৃদ্ধি দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। ইহার জন্যও একটু পরিশ্রম ছাড়া কৃষকের বিশেষ কোন খরচ নাই।

সবুজ সারের সাহায্যে মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করাও একটি খুব সহজ ও সস্তা উপায়।

কৃষিকার্য্যে গরুর কত প্রয়োজন তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সকল প্রদেশের মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গরুর জন্য বাংলার বিশেষ অখ্যাতি আছে। জমি চাষ করার জন্যই হউক অথবা দুধ দিবার জন্যই হউক বাংলার গরুর অবনতি একটা জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাঙ্গল টানার পক্ষে বাংলার গরু অক্ষম এবং দুধ দিবার পক্ষে অতিশয় হীন; এখানকার দুধেল গাইকে দৈনিক এক সেরের বেশী দুধ দিতে বড় একটা দেখা যায় না। ইহা সকলেই জানেন যে, গরু যত সুস্থ ও সক্ষম হইবে চাষের কাজও তত ভাল হইবে এবং ফলে বেশী ফসল পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু দুই জোড়া রুগ্ন অক্ষম গরু পালন করার চেয়ে এক জোড়া সুস্থ সবল গরু পালন করা লাভজনক। উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বারা স্থানীয় গরুর প্রজনন খুবই দরকার, কিন্তু কেবলমাত্র এই উপায়ের দ্বারা গোজাতির উন্নতি সাধন হইবে না। প্রজননের সঙ্গে সঙ্গে গরুর খাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং সকল ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ঘাসের চাষ বাড়িলে গরুর খাদ্যের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

এইরূপে কৃষিযন্ত্রাদি যত উন্নত হইবে চাষ তত ভাল হইবে এবং ফসলও বেশী হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সকল যন্ত্রের দ্বারা আমরা চাষ করি তাহা খুব আদিম ধরণের। কৃষি-বিভাগ বাংলার অবস্থার উপযোগী উন্নত ধরণের লাঙ্গল এবং নিড়ানী যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

এখন দেখা যাউক বাংলা দেশকে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য সম্বন্ধে কত পরিমাণে স্বাবলম্বী করা যাইতে পারে। কৃষি-বিভাগ আউশ এবং রোয়া-আমন এই দুই শ্রেণীর ধানেরই এমন উন্নত জাত বাহির করিয়াছেন, যেগুলি স্থানীয় ধানের অপেক্ষা একর প্রতি গড়ে তিন মণ বেশী ফলে। এ প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নানা অবস্থার মধ্যে সেগুলি সমানভাবে উপযোগী না হইতে পারে; কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বাংলার স্বাভাবিক ধানের চাষের পরিমাণ ২৪০ লক্ষ একর জমির অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ কৃষি বিভাগের ধানের উপযোগী, তবে আমরা ন্যায্যতঃ গড়ে তিন মণ হিসাবে ২৪০ লক্ষ মণ বেশী ধান পাইবার আশা করিতে পারি। অর্থাৎ বাহির হইতে যে ৪১২ লক্ষ মণ চাল আমদানি হয় তাহার স্থলে ১৬০ লক্ষ মণ চাল (৩ মণ ধান হইতে ২ মণ চাল হিসাবে) বেশী উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, কৃষি বিভাগ ৮০ লক্ষ একর জমি আবাদের মত বীজ সরবরাহ করিতে পারিবেন ইহা আশা করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক কৃষককে তাঁহার নিজের প্রয়োজন মত বীজ উৎপাদন করিতে হইবে। কৃষকদের এই বিষয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-বিভাগ এ বৎসর ব্যাপকভাবে বীজ-বিতরণ পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এই পরিকল্পনা

উন্নত ধরণের লাঙ্গল—ইহার দ্বারা চাষ করিলে মাটি একেবারে উল্টাইয়া যায়

রহিয়াছে। এই জমির অধিকাংশ আবাদ করিয়া আরও অধিক পরিমাণ ধান জন্মাইতে পারা যায়। সুতরাং ধানের জন্য এ প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল করা কঠিন ব্যাপার নয়।

আমাদের অন্যান্য একান্ত আবশ্যক খাদ্যসামগ্রী সরিষার তেল, ডাল, গম এবং আলু। আমাদের প্রতিদিনের রন্ধনকার্য্যে মসলারও আবশ্যক হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে বাহির হইতে এই সকলের আমদানী করিতে হয়। এই সকল শস্যের সবই "রবি খন্দে" জন্মায় এবং ইহাদের "চৈতালী" শস্য বলে। রবিশস্যের চাষ এ প্রদেশে কত দূর অনাদৃত বা অবহেলিত তাহা শুধু ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে বাংলায়

অনুসারে কৃষকদের এক মণ বীজের দাদনের পরিবর্ত্তে ধান কাটার পর ১ মণ ১০ সের ধান ফিরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে সংগৃহীত ধান পর বৎসর ঠিক এই সর্ত্তে নূতন এলাকায় বিতরিত হইবে। ইহাতে বীজ সরবরাহ বাড়িবে এবং আপনা হইতেই নূতন নূতন অঞ্চলে বিভাগীয় ধানের প্রসার হইবে। কৃষকদের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

ইহা ছাড়া উল্লিখিত যে-কোন সার ব্যবহার করিলে এবং উন্নত বলদ ও কৃষি যন্ত্রাদির দ্বারা চাষ করিলে ধানের ফলন বাড়িতে পারে এবং মোটামুটি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহার দ্বারা প্রতি একরে দেড় মণ ধান বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই হিসাবে ২৪০ লক্ষ একর জমি হইতে ৩৬০ লক্ষ মণ ধান বা ২৪০ লক্ষ মণ চাল বেশী সরবরাহ হইতে পারে। খাল অঞ্চলে সময় মত জল সেচন করিলেও ধানের ফলন বাড়িতে পারে। এই সকল উপায়ে মোট ঘাঁট্‌তি ৪১২ লক্ষ মণ ধানের স্থানে আমরা ৪০০ লক্ষ মণ ধান বেশী উৎপাদন করিতে পারি। এইরূপে উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার এবং জমিতে খুবই সহজসাধ্য সার প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমান আবাদী জমি হইতেই ঘাঁট্‌তি ধানের প্রায় সবই উৎপাদন করিতে পারা যায়। তার পর এ প্রদেশে আবাদের যোগ্য প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমি পতিত পড়িয়া

আবাদী জমির শতকরা প্রায় ২০ ভাগে রবিশস্যের চাষ হয়, যদিও রোয়া-আমন ধান কাটার পর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে ইহার চাষ চলিতে পারে। জাতির কি বিরাট্ অপচয়! এ অপচয় নিবারণ করা যায় এবং উল্লিখিত অনেক খাদ্যশস্য ও অন্যান্য রবিশস্যের বিষয়ে এ প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল করা যাইতে পারে। অবশ্য "রবি" খন্দে খাদ্যশস্যের চাষে বিবেচনার সহিত সার প্রয়োগ ও জল সেচন করিতে হয়, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোবর বা আবর্জ্জনা-পচানো সার থাকিলে সারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। জলসেচন ব্যাপারেও কৃষকদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সে অসুবিধা দূর করা সম্ভব। কৃষি-বিভাগ গম, বুট এবং অন্যান্য ডাল-শস্যের উন্নত জাতের বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন; এই সকল উন্নত বীজ সংগ্রহ করা এবং বোনা কৃষকের উচিত।

কিন্তু দেশকে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সমাজের সমবেত চেষ্টা, একটি সুচিন্তিত কার্য্য-পদ্ধতি এবং উন্নত কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যেক গ্রামে ব্যাপকভাবে প্রদর্শন ও প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন। আশা করা যায় "অধিক খাদ্য উৎপাদন করুন" প্রচেষ্টার দ্বারা অন্ততঃ কিছু স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

রামচন্দ্রের সান্ধ্য ভ্রমণ প্রাত্যহিক হইয়া দাঁড়াইল। মিত্র-পরিবার কুষ্টিয়ার মধ্যে ধনে ও মানে বিখ্যাত। বিপিনবাবু সেই বংশের বড় সরিক; যেমন আমুদে লোক তেমনই দরাজ হাত। পাঁচ জনকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ও খাওয়াইতে তিনি পটু। রাত্রির খাওয়াটা রামচন্দ্র প্রায়ই ওখান হইতে সারিয়া আসে। যোগমায়ার রুটি তরকারি প্রায়ই নষ্ট হয়। ঘুঁটে বেচিতে আসিয়া এক দিন কেষ্টর মা বাসি তরকারি খাইয়া পরদিন বলিয়াছিল, আহা তোমাদের আন্না অমত্ত মা-ঠাক্‌রোণ। কত তেল—ঘি—মশলা দিয়ে আঁধ। আর আমাদের? জল-আছড়ানো আন্না খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। কাল তোমার হাতের অমত্ত খেলাম, আহা কত দিনের অরুচি, মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। আহা!

কথার সঙ্গে কেষ্টর মা অনবরত জিহ্বা ও তালুর সংযোগে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করিয়া নিজের দুর্ভাগ্য কি তরকারি পাওয়ার আনন্দ কোন্‌টা প্রকাশ করে—ঠিক বুঝা যায় না।

যোগমায়া খুশী হইয়া বলে, আজও একটু বাসি ডাল, ডালনা আছে, নেবে?

নেব না, সে কি বউমা। তোমাদের হাতের আন্না খাওয়া ত আমাদের ভাগ্যির কথা। আহা, আন্না ত নয়—

বাসি তরকারির লোভে কেষ্টর মা প্রত্যহই একবার নিজের দুঃখের কথা জানাইতে আসে। আত্মীয়তা দেখাইয়া বলে, পোড়া-ঝোড়া থাকলে—এই কড়া—কি বোক্‌নো—কি তাওয়া আমায় ব'লো, মেজে দিয়ে যাব, বউমা। বলে কত জন্মের পুণ্যিতে তবে বাম্‌ভোনের সেবা করবার ভাগ্যি হয়। ব'লো বউমা, নজ্জা ক'রো না। কেষ্টর মা থাকতে তোমার ভাবনা কি। ব'লো।

রাত্রিতে ভুবন ওধারের বারান্দা হইতে মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। কখনো শিয়াল তাড়াইবার অছিলায়, কখনও পাখী তাড়াইবার অছিলায়; কখনও বা পথ দিয়া কেহ গেলে চীৎকার করিয়া ওঠে, কেডা যায় গো? কেডা?

যোগমায়া এখন অল্প জানালা খুলিতে পারে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিলে—ততটা আর ভয় করে না। তা ছাড়া, প্রাত্যহিক অভ্যাসে সবই সহিয়া যায়। পেঁচাটা আজকাল ঘুৎকার করে না, শৃগালের প্রহর-ঘোষণা কান-সহা হইয়া গিয়াছে। শুধু কান-সহা নয়, সন্ধ্যা হইতে দুইবার শৃগাল ডাকিবার পর রামচন্দ্র ফিরিয়া আসে বলিয়া সময় নিরূপণের আগ্রহে সে ডাক যোগমায়াকে খানিক ভরসাও দেয়। ডাক শেষ হইবার কিছু পরে রামচন্দ্র ঠুক্‌ ঠুক্‌ করিয়া দুয়ারে আওয়াজ দেয় ও ডাকে, ঘুমুলে নাকি?

রামচন্দ্র প্রায়ই ওখানে রাত্রির আহার সারিয়া আসে বলিয়া যোগমায়া দুপুরের রান্না সারিয়া সেই উনানেই খানকতক রুটি সেঁকিয়া রাখে। আলাদা বাটিতে রাখা তরকারিগুলি আর একবার গরম করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখে, এবং রামচন্দ্র আসিবামাত্রই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আহার সারিয়া লয়। শুইয়া শুইয়া রামচন্দ্র গান-বাজনা, থিয়েটারের পালা ও কে কেমন পার্ট করিল এই সব গল্প করে। সে সব গল্প শুনিতে ভালই লাগে যোগমায়ার। অথচ রাত বেশী হইলে—স্বামীকে ঘুমাইবার জন্য তাড়া দিয়া সে আলোটা নিবাইয়া দেয়।

দশহরার আগের দিন কালিতারা বেড়াইতে আসিয়া বলিল, কাল নাইতে যাবে, ভাই? এ দেশে ত গঙ্গা নেই, তবু নদীতে ছান করলে নাকি আদ্দেক পুণ্যি।

তিন-চার মাস এখানে আসিয়াছে—কেমন যে কুষ্টিয়া শহর যোগমায়া দেখে নাই। পোষ্ট আপিসের প্রাচীর-বেষ্টিত কোয়ার্টার সীমায় সেই যে বন্দিনী হইয়াছে আর বাহির হইতে পারে নাই। বাহির হইবার কথাই তার মনে হয় নাই। বাপের বাড়ির এক জীবন; শ্বশুরবাড়ির জীবন তাহা হইতে স্বতন্ত্রতর; আর বাসার জীবন আর এক রকমের। এখানে মাথার উপরে শাসন করিতে বা

নির্দ্দেশ দিতে কেহ নাই, তবু গুটিপোকায় যেমন জাল রচনা করিয়া তারই মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, তেমনই সংসারের ছোট-খাটো কাজে ডুবিয়া বা মাতিয়া বাহিরে যাইবার কথাটাও যোগমায়া ভুলিয়াছে। কুষ্টিয়া শহরে প্রথম পদার্পণের সেই নিশুতি রাতটি—জনমানবহীন মাঠ পার হইয়া সেই বাসায় আসা, অগোছালো বাসায় কোন রকমে আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগন্ত ভাবে কাটাইয়া দেওয়া—শহরের সেই রূপটিই তার মনের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ঐ বাবুই পাখীর বাসাগুলি নূতন, ডুমুর গাছটাও। তা ছাড়া উপরের ঐ খণ্ডিত নীল আকাশ, সেই অন্ধকার, জ্যোৎস্না, সেই শাক-সিম আনাজপাতি, মাছ বা কেষ্টর মার মধ্যে নিজের গ্রাম বা শ্বশুরবাড়ির ছবিটিই সে দেখিতে পায়। একই লোক পোষাক বদল করিয়া কখন রাজা সাজিতেছে, কখনও বা অমাত্য।

স্নানের কথায় যোগমায়ার বহির্মুখী বৃত্তিগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। একে একে বাপের বাড়ির কলমি ডোবা, বৈঁচি ঝোপ, আমবাগান—ময়রা বাড়ি যাইবার ধুলাভরা পথ সব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঘাড় নাড়িয়া সে সম্মতি দিল।

দশহরায় উনুন জালিতে নাই। বাড়িতে নাই বলিয়া বাসাতেও যোগমায়া সে পাট করিবে না। এক বেলার জন্য ইলিশ মাছ ভাজা ও পান্তা ভাত, আর এক বেলা দুধ চিঁড়ার ফলার। দুধ গরম করিবার জন্য উঠানে খান দুই ইঁট পাতিয়া লইলেই চলিবে।

ঘোমটার ফাঁকে পথ দেখিয়া যোগমায়া ও কালিতারা স্নান করিতে চলিল। লক্ষ্মণ পিওনের বৃদ্ধা দিদি ইঁহাদের পথ-প্রদর্শিকা হইল। অবশ্য কালিতারা বারকয়েক নদীতে স্নান করিয়া পথঘাট ভাল করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে। তবু বউমানুষ ত! স্বদেশ বা বিদেশ সব জায়গাতেই একজন অভিভাবক নহিলে চলে না।

ঢালু নদীতীর; এখানে ওখানে বালির পাহাড়। খুব চওড়া নহে, কিন্তু লম্বায় যেদিকটা পদ্মার পানে চলিয়া গিয়াছে—সেদিকের যেন শেষ নাই। সূর্য্যের কিরণে জল চিক্‌চিক্ করিতেছে, চিক্‌চিক্ করিতেছে বালুরাশি। আর নদীতীরে বালুরাশির উপর রূপার পাহাড়। রূপার পাহাড় নয়—ইলিশ মাছ। এত মাছও নদীতে আছে?

যোগমায়া বলিল, এত মাছ কে খায়, ভাই?

কালিতারা বলিল, কত তো লোক আছে। শুনেছি রেলে ক'রে কলকাতায় নাকি চালান যায়।

একটি স্থুলাঙ্গী বর্ষীয়সী বিধবা মালা জপ করিতে করিতে শুধাইলেন, তোমরা কাদের বাড়ির বউ গা? চিনতে ত পারছি নে।

গামছা-পরিহিত একজন শ্যামাঙ্গী বিধবা উত্তর দিলেন, ইনি ত কেরানীবাবুর বউ, আর উটি বুঝি নতুন পোষ্ট মাষ্টারের?

বর্ষীয়সী বলিলেন, বামুন ত তোমরা?

কালিতারা বলিল, ইনি বামুন, আমরা কায়েত।

তাই বল। ওদিকে একটু সরে দাঁড়াও ত মা। নেয়ে-ধুয়ে বামুনের ছেয়াটা আর মাড়াব না। তোমার কোলে বুঝি ঐ ছেলে? আর হয় নি? তোমার? হয় নি? ওমা!

কালিতারা সেদিক হইতে সরিয়া আসিতেই একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। নামেই সে বিধবা। কালিতারা না বলিয়া দিলে, যোগমায়া বুঝিতেই পারিত না। পরনে তার এক ইঞ্চি চওড়া কালো-পাড় ধুতি, গলায় হারের মতই চিক্‌চিক্ করিতেছে কি একগাছা, হাতে মুড়কি মাদুলি না লবঙ্গফুল কি যেন রহিয়াছে! পান খাইয়া ঠোঁট দুখানি টুক্‌টুকে করিয়াছে মেয়েটি। আর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে।

কালিতারাকে দেখিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এই যে শ্যামা-ঠাকরুণ, এতক্ষণে উদয় হ'লে?

কালিতারার কুঞ্চিত ভ্রূ দেখিয়া যোগমায়া বুঝিল—সম্বোধনে সে প্রীতিলাভ করে নাই।

কোন উত্তর না দিয়া কালিতারা মুখ মচ্‌কাইয়া একটু হাসিল মাত্র।

বলি, এটি কে? পোষ্ট মাষ্টারের বউ? সেই যে ছোক্‌রা মত পোষ্ট মাষ্টার রোজ আমাদের বাড়ি গিয়ে বাঁয়া তবলা পেটেন? উঃ, সে যা ঘাড় নাড়া আর হাত নাড়ার ভঙ্গি! খিল্ খিল্ করিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ও-পাশের মালাজপ-রতা বিধবাটির মন্তব্য শোনা গেল: মরণ, বিধবা মানুষের অত হাসি কেন বাপু! অত রং-ঢংই বা কেন!

মেয়েটি মুখরা। ঘাড় ফিরাইয়া টপ্ করিয়া জবাব দিল, লক্ষ্মীপেঁচা দেখেছ ভাই, শ্যামা-ঠাকরুণ? উই দেখ। বলিয়া আঙুল দিয়া ইসারা করিয়া কৌতুকভরে সে চোখ উল্টাইয়া দিল।

কালিতারা ও যোগমায়া এবং যাঁহারা সে কথাটা শুনিল ও মেয়েটির ভঙ্গি দেখিল—তাহারাই হাসিয়া উঠিল। স্থূলকায়া বর্ষীয়সী বুঝিলেন, তিনিই উঁহাদের

হাসি-তামাশার লক্ষ্যস্থল। সবেগে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি এই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, কি বললি, চামচিকে কোথাকার, আমি লক্ষ্মীপেঁচা?

চারিদিকে হাসির হুল্লোড়ে বিধবা যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। হাত নাড়িয়া ও গলা চড়াইয়া বলিলেন, মিত্তির বাড়ির মেয়ে ব'লে তোকে ভয় ক'রে চলতে হবে নাকি? তোর খোসামোদ করব নাকি? ওলো ছক্কাওয়ালি, যার কপাল পুড়েছে—তার অত ভাবন কেন? তার আবার বেশ-বিন্যেস কেন? কার মন ভোলাবার জন্যে—

নদীর তীরে অবিলম্বে দুইটি দল গড়িয়া উঠিল, এবং যে-সব পারিবারিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল—তাহার সিকি অংশ সত্য হইলে দুই পক্ষেরই এ-গাঁয়ে মুখ দেখানো দুষ্কর। কিন্তু নদীর তীরে ও দৃশ্য নূতন নহে। কাহারও কাপড় গায়ে ঠেকিয়া গেলে, স্নানকালে গামছার জল গায়ে লাগিলে বা কাহারও কোন মন্তব্য শুনিলে দুই পক্ষের মধ্যে এমনই কলহ বাধিয়া যায়। দুই পক্ষই দুই পক্ষের কলঙ্কের রাশি উদ্‌ঘাটিত করিয়া লোকচক্ষে পরস্পরকে খাটো করিয়া বিজয়ের তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

এত যে ঝগড়া হইয়া গেল—পূর্ণিমা গায়ে মাখিল না। পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার সঙ্গে এক দিন আলাপ করে আসব ভাই। তোমার বরটিকে দেখেছি—দাদার বৈঠকখানায় ব'সে বাজনা বাজান। বেশ সুন্দর বর। বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল।

কালিতারা ফিরিবার সময় যোগমায়ার কানে কানে বলিল, ঐ যে বুড়িটা ওকে গাল দিলে—সব মিথ্যে নয় ভাই। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্তির নাকি ভাল নয়।

পূর্ণিমা কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার একটু আগেই বাসায় আসিয়া হাজির। নদীর ঘাটের মূর্ত্তি হইতে এ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। কোঁচাইয়া কাপড় পরিয়াছে—গায়ে একটা পাতলা জামা দিয়াছে—ধোপদস্ত কালাপাড় কাপড়ের আঁচলে রিং-সমেত এক গোছা চাবি বাঁধিয়াছে। মুখেও কি যেন মাখিয়াছে—সাদা সাদা গুঁড়া। মোট কথা, সুন্দরী সাজিবার একটা স্বেচ্ছাকৃত উদ্যোগ মেয়েটির মধ্যে পরিস্ফুট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাকটা ঈষৎ খাঁদা, দেহটি ক্ষয়া গোছের, ঠোঁট দু'খানি অতিরিক্ত পান খাইয়া কালো হয় নাই, এবং দাঁতগুলিও সাদা চক্‌চকে আছে। এবং সেই লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁটে সর্ব্বক্ষণই একটি মিষ্ট হাসি লাগিয়া আছে। সবশুদ্ধ মিলিয়া মেয়েটিকে সুন্দরীই বলা চলে।

হাসিতে হাসিতে সে বলিল, নতুন লোক এলো গো, বৌদি।

যোগমায়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এখনই স্বামী আপিস হইতে আসিবেন, সন্ধ্যা দেখাইতে হইবে। কম্বলের আসনখানি পাতিয়া দিয়া বলিল, বসুন।

বসব বলেই ত এলাম। দাদা আসেন নি এখনও আপিস থেকে? ভ্যালা আপিস যা হোক্! বউদি একলাটি মুখ বুজে পড়ে রইলেন বাসায়, দাদা করছেন আপিস। সখ ক'রে এ কষ্ট সইবার দরকার কি!

যোগমায়া বলিল, সখ ক'রে কেন? চাকরি—

হাঁ গো, চাকরি সবাই করে। কত মাষ্টারই ত দেখলাম। খুট্ খুট্ ক'রে বাড়ির মধ্যে আসছেই—আসছেই। পানটি নেবার ছুতো ক'রে, জলটি খাবার ছুতো ক'রে—।

যোগমায়া অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল।

অথচ দাদাও তো তোমায় খুব ভালবাসেন। রাত দশটা বাজতে না-বাজতে বাজনার তাল কেটে যায়। উস্‌খুস্ করতে থাকেন খালি।

আপনি বুঝি অত রাত জেগে রোজই গান শোনেন?

কি করি বল, নেই কাজ ত খই ভাজ। যখন কলকাতায় ছিলাম—কি আমোদেই যে দিন কাটতো! গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ? তাঁরা কেমন থিয়েটার খুলেছেন,—কত নতুন নতুন পালা হয় সেখানে। কলকাতা বেশ জায়গা ভাই।

কুষ্টেও তো শহর।

কলকাতার কাছে! চাঁদের কাছে যেন টিমটিমে তারাটি। সেখানে ট্রাম গাড়ি চলে—ঘোড়ায় টানে, রাস্তায় আলো জ্বলে।

তন্ময় হইয়া যোগমায়া সেই বড় শহরের গল্প শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা আসিয়া গেল, তবু তার হুঁস নাই। অন্য বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হইতেই চমকিত হইয়া যোগমায়া বলিল, আপনি বসুন একটু—আমি সন্ধ্যেটা দেখিয়ে নিই।

যোগমায়া সন্ধ্যা জ্বালিতে গেল, ওদিকে আপিসের দুয়ার ঠেলিয়া রামচন্দ্র প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, মায়া, ব'সে কেন?

পূর্ণিমা উঠিয়া হাসিয়া বলিল, মায়া নয়, দাদা—আমি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল।

রামচন্দ্র কি বলিবে—কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। ঘরে আবছা অন্ধকার। মানুষ স্পষ্ট দেখা যায় না। অথচ দাদা বলিয়া ডাকিতেছে এই অপরিচিতা তরুণী—কে এ তরুণী?

পূর্ণিমা রামচন্দ্রের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, বিপিনবাবু আমার বড়দা। আপনি আমায় চেনেন না—আমি আপনাকে চিনি। আমাদের বৈঠকখানায় ব'সে রোজ আপনি বাঁয়া-তবলা বাজান।

ওঃ, আপনি—

বাঃ রে, আপনাদের দেশে ছোট বোনকে বুঝি আপনি বলে ডাকে। আমাদের এখানে কেউ ছোটকে মান্য ক'রে কথা বলে না।

কিন্তু—

আচ্ছা, হাত মুখ ধুয়ে জিরোন। খানিকক্ষণ ব'সে না হয় গল্প করে যাব আপনার সঙ্গে। বউদি সন্ধ্যে দেখাতে গেছেন—আলো নিয়ে এলেন বলে।

ছোট বোন! রামচন্দ্র পা ধুইবার কালে আপন মনেই বলিল, বয়সে কমলার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে কিন্তু কমলার সঙ্গে মিল ওর কোথাও নাই। কমলার রহস্য-প্রিয়তা ও বাক্‌পটুতা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রগল্‌ভতা নাই। বাক্‌-বাহুল্যে সে এমন কৌতুকময়ীও নহে।

যোগমায়া আলো জ্বালিয়া ওঘরে গিয়া বসিল। রামচন্দ্রও মাদুরের এক প্রান্তে আড়ষ্ট হইয়া বসিল।

পূর্ণিমা বলিল, বাঃ রে, যাকে উপলক্ষ্য ক'রে আলাপ জমলো—তিনিই সরে গেলেন। এখনও সেকেলে বুড়িদের মত তোমার লজ্জা কেন, বউদি? এঘরে আসবে না?

যোগমায়া এ ঘরে আসিল না। যোগমায়া আসিল না—কাজেই একা রামচন্দ্রের সঙ্গে কতই বা গল্প করিবে পূর্ণিমা। একাই সে বকিয়া গেল, একাই মতামত প্রকাশ করিল—রামচন্দ্র শুধু নিরপেক্ষ শ্রোতার মত হুঁ—হাঁ দিয়া বসিয়া রহিল।

উঠিবার সময় পূর্ণিমা বলিল, দেয়ালের সঙ্গে কথা কয়ে সুখ নেই। এবার যেদিন আসবো—তোমার ঘোমটা আর দাদার মুখের কুলুপ দুই ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ! যেমন দাদা—তেমনি বউদি, দুই সমান। উচ্চ হাসির রোল তুলিয়া পূর্ণিমা অন্ধকার পথে বাহির হইয়া গেল। এমন মূঢ় রামচন্দ্র যে অন্ধকার পথে তরুণীকে খানিকটা আগাইয়া দিবার কথাও বলিতে পারিল না।

যোগমায়া এঘরে আসিলে রামচন্দ্র বলিল, উনি কখন এসেছিলেন?

সন্ধ্যের একটু আগে। বেশ লোক।

তোমার ত সব জিনিসই বেশ। মেয়েছেলে অত ফাজিল হওয়া ভাল নয়।

যোগমায়া কথা কহিল না। পূর্ণিমার চালচলনের অসামঞ্জস্য তাহার মনেও অল্প অল্প বিঁধিতেছিল। তবু প্রাণের আনন্দে ভরপুর মেয়েটিকে সে প্রাণ খুলিয়া নিন্দাও করিতে পারিল না। গোরাই নদীর ঘাটে আজ সকালের ঘটনাটি বাদ দিলে—রহস্যপ্রিয় পূর্ণিমাকে ভালই লাগে। ও যেন খানিকটা কমলা ঠাকুরঝি, খানিকটা রাধারাণী আর খানিকটা অতি চঞ্চল দমকা চৈত্রবায়ু দিয়া গড়া।

যে আচরণ একের পীড়া জন্মায়—অন্যের তা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে।

জামা ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রামচন্দ্র বলিল, আজ আর যাব না ভাবছি।

কেন, শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে? যোগমায়ার শঙ্কিত কর রামচন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিল।

রামচন্দ্র সেই হাতখানি টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিল, হাঁ। ওর সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল, গেলেই আবার বকবে ত।

বকলেই বা। ছোট বোন যদি দৌরাত্ম্যই করে—

না মায়া, ওকে ছোট বোন ব'লে ঠিকমত ভাবতে পারছি না। ওকে দেখলে—কেমন যেন আমার ভয় হয়।

ভয়! যোগমায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ও কি ভূত-পেত্নী নাকি? আসুক কাল—

ভূত-পেত্নীকেও আমার ভয় হয় না, মায়া। কিন্তু ওরা কলকাতায় গেছে অনেকবার—শহুরে বাতাস ওদের গায়ে লেগে আছে, আমাদের ঘরে ওরা যেন ঠিকমত মানায় না।

তোমার বন্ধু ত খিরিষ্টান নন?

বিপিন! না, হিন্দুই বটে, তবে মতামতগুলো ওদের কেমন কেমন। আমাদের ঘরে হ'লে কি এই অন্ধকারে ও বেড়াতে আসতে পারত? আমাদের ঘরের মেয়েরা কি জামা গায়ে দেয়, না জুতো মোজা পরে?

কই ঠাকুরঝি ত জুতো পরে আসেন নি।

আসেন নি, কিন্তু ওদের বাড়িতে ওরা জুতো পায়ে দেয়; বিপিনবাবুর বউ শুনেছি পাস-করা মেয়ে।

পাস করা? সে কেমন গো?

তোমার আমার মতই দেখতে। দুটো হাত—দুটো পা।

যাও, তোমার সব তাতেই ইয়ে। কিন্তু রাগ করিয়া যোগমায়া চলিয়া যাইতে পারিল না, রামচন্দ্র বাহুর শৃঙ্খলে ততক্ষণে তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছে।

সত্যি আজ বেরুবে না?

না।

তবে আমায় ছেড়ে দাও, এ বেলা দু-একখানা তরকারি রাঁধি।

না, আজ খাওয়ার ইচ্ছে কি গান-বাজনার ইচ্ছে হচ্ছে না, মায়া। খালি তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছে।

দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে একান্ত করিয়া পাওয়া এই একটি সন্ধ্যা যোগমায়ার বুকের মণিহারে মুক্তার মত গাঁথা হইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বর্ষাকাব্য

শ্রীসুলতা কর, এম-এ

প্রখর গ্রীষ্মের তাপ জুড়িয়ে দিয়ে বৎসরে বৎসরে বর্ষা নেমে আসে ভারতের দিগন্তকে আবিষ্ট ক'রে। ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা ভুলে যাই এত দিনের দাবদাহ। শ্যামল হয়ে ওঠে তরুলতা, কূলে কূলে ভরে ওঠে রৌদ্রশুষ্ক স্রোতস্বতীর ক্রোড়, মাঠে মাঠে দুলে ওঠে সবুজ ধানের শীষ।

কোন্ অতীত কাল হ'তেই না বর্ষার গান গেয়ে চলেছেন ভারতের কবিরা। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ গান রচিত হয়েছে বর্ষা ঋতুকে ঘিরে। কবি কালিদাস নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের মুখ দিয়ে বর্ষার যে গান গেয়েছেন, তার মাদকতা আজও আমাদের মনে গাঁথা হয়ে আছে। রামগিরি পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ব্বাসিত যক্ষ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে যে সমগ্র ভারতের উপর দিয়ে বর্ষার নবীন মেঘ ছুটে আসছে, কি তার সমারোহ, কি তার রূপ। সে ভাবল এই ত আমার দূত হবার উপযুক্ত। মেঘকে ডেকে বলল, "বন্ধু, তুমি যাও, অলকার প্রাসাদে বিরহে ব্যাকুল প্রিয়াকে আমার কুশল সংবাদ দিয়ে এস। ব'লে এস তাকে যে বিরহের দুঃখ-রজনীর অবসানে মিলনের যে আনন্দ তাই স্মরণ ক'রে ধৈর্য্য ধরে থাক। বিরহে ব্যাকুল তোমার প্রিয় সুদূর রামগিরি থেকে এই বার্ত্তা তোমায় পাঠিয়েছে।"

কিন্তু মেঘ কি শুধুই যক্ষের বিরহ-ব্যথা দূর করবার ভার নিয়েছে? সমগ্র ভারতের অসংখ্য নদনদী, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আর বিরহতপ্ত কত শত তরুণ-তরুণীর অন্তর যে তারই প্রতীক্ষায় জেগে রয়েছে। যক্ষ এদের কথাও ভোলে নি। তাই পূর্ব্বমেঘে দেখি যক্ষ মেঘকে পথের বার্ত্তা ব'লে দিচ্ছে। সে বলছে—বন্ধু তুমি বিন্ধ্যপাদমূল চুম্বন ক'রে যে শীর্ণা রেবা নদী বয়ে যাচ্ছে তাকে ভরিয়ে দিয়ে যেও, চর্ম্মণ্বতী নদী তোমাকে আহ্বান করছে তাকে আলিঙ্গন কর, শীর্ণাদেহা বিরহিণী সিন্ধু তোমার জন্যে শুকিয়ে মরছে তাকে প্রেমধারায় সিক্ত কর।

তোমার গর্জ্জন ধ্বনি শুনে ভূঁইচাঁপারা মুখ তুলে চাইবে, সদ্যফোটা কুর্চ্চি ফুলের গন্ধে কাননভূমি ছেয়ে যাবে।

তোমায় দেখে বলাকারা দল বেঁধে উড়বে, চাতক-পাখীরা নববারিধারা পান করবে।

দশার্ণ দেশ তোমায় পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তার কুঞ্জবনে কেতকী ফুল ফুটবে, পাকা জামের চিকণ-কালো রং দেখে তোমার চোখ জুড়াবে।

হে মেঘ, তুমি যখন নীচে পাহাড়ের গায়ে বিশ্রাম করবে তখন দেখবে যে সেখানকার সুন্দরীরা ফুল চয়ন ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের মুখে তোমার স্নিগ্ধসজল ছায়া বিছিয়ে দিও।

যদিও একটু ঘুরপথ হবে, তবু তুমি নগরীশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনীকে দেখে যেও। নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকারে উজ্জয়িনীর রাজপথে অভিসারিকারা প্রিয়-উদ্দেশে চলেছে, হে মেঘ তখন তুমি সরে দাঁড়িও। গর্জ্জন ক'রে তাদের

ভয় দেখিও না, বারিধারা বর্ষণ ক'রে তাদের বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রো না।

এমনই ভাবে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাতে দেখাতে অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে নিয়ে গেল।

কবি যক্ষকে বিশ্বের বিরহী হিয়ার প্রতীকরূপে দাঁড় করিয়েছেন। তার দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া নিখিল বিরহী হিয়ার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

কালিদাসের পর কত দিন কেটে গেল। তার পরে এলেন বৈষ্ণব কবিরা। তাঁরা এসেছিলেন ভগবানের বন্দনা-গান গাইতে। কিন্তু বর্ষা যখন এল তখন তার মোহময় আবেশ বর্ষাপ্রিয় কবিদের মনের মধ্যে কি ঝঙ্কারই না বাজিয়ে তুলল। তাঁরা ভগবানের এক বিশেষ রূপ আর বিশেষ প্রকাশ দেখলেন বর্ষার আবেষ্টনের মাঝখানে। বিরহ-ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে এক বর্ষা-রজনীতে কবি বিদ্যাপতি গাইলেন—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
* * *
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

সখী আমার দুঃখের অন্ত নাই। আজ এই ঘোর বর্ষা-রজনীতে আমার গৃহ শূন্য। শত শত বজ্রপাতের শব্দে মত্ত হয়ে ময়ূর নাচছে, ভেকেরা আনন্দিত, ডাহুকী উৎফুল্ল, কিন্তু আমার হৃদয় যে ব্যথার ভারে ফেটে যায়। এই ঘোর অন্ধকার যামিনীতে, বিদ্যুৎ-পঙ্‌ক্তি অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছে। কবি বিদ্যাপতি গাইছেন—ওগো, কেমন ক'রে তুমি এমন দিন রাত্রি হরি বিনা কাটাবে?

বর্ষার আর এক দুর্য্যোগময়ী রাত্রে কবি গোবিন্দদাস গাইলেন—

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।

আজ এই ঘোর বর্ষা-রজনীতে হে সুন্দরী রাধা কেমন ক'রে তোমার হরির কাছে অভিসারে যাবে? হরি রয়েছেন মানস সুরধুনীর তীরে। তাঁর কাছে যেতে হবে, কিন্তু আজ যে ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজ পড়ছে, শুনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

প্রখর দ্বিপ্রহরকেও বর্ষার মায়ায় মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা। সেই অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাধা চলেছেন অভিসারে। কবি গোবিন্দদাস গাইলেন—

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি।
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার।
চলু গজ-গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার।

আজ এই বর্ষার দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের জ্যোতি কই? দিন কি রাত্রি বোঝা যাচ্ছে না। জলদ এমন অন্ধকারে দশ দিক্ ঢেকেছে যে কাছের লোক দেখা যায় না। এমন দিনে হরি-অভিসারে চলেছেন গজ-গামিনী রাধা। তাঁহার গতি কোন বাধা মানছে না, তাঁহার ব্যাকুলতার সীমা নাই।

বৈষ্ণব কবিদের যুগ কেটে গেল। বহু দিন পরে আবার বর্ষার চিরনবীন গান ধ্বনিত হয়ে উঠল বাংলার কবির কণ্ঠে।

বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগে হিংসা-কলুষভরা রক্ত-পিচ্ছিল ধরণীতে বর্ষার কি অপূর্ব্ব গানই না গাইলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। বর্ষার প্রিয় কবি তিনি।

আষাঢ়ের নবীন মেঘ দেখে তাঁর মন নেচে উঠেছে ময়ূরের মত—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

বর্ষা-ঘেরা বাংলার রূপ দেখে তিনি গাইছেন—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।

গম্ভীরনিনাদী মেঘকে সাদর আহ্বান জানিয়ে তিনি ডাকছেন—

এস হে এস সজল ঘন,
বাদল বরিষণে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।

মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তিনি গাইছেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবন বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

এই সমারোহভরা বর্ষার দিনে কবির মেঘদূতের কথা মনে পড়ল, তিনি বললেন এস সেদিনের মত ক'রে বর্ষাকে অভিনন্দন জানাই।

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিনী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।

উদাস বর্ষা-সন্ধ্যায় তাঁর মনে কোন এক অজানার ব্যথা ঘনিয়ে উঠছে।—

আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
গেলরে দিন ব'য়ে।
বাঁধন হারা বৃষ্টি-ধারা
ঝরচে র'য়ে র'য়ে।"

শ্রাবণের ধারাপাতের ছন্দেতে তিনি তাঁর চির-প্রিয়তমের চরণধ্বনি শুনছেন।—

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

এমনি ভাবে আমরা দেখি যে সুদূর অতীতে কালিদাস মেঘদূতে যে বর্ষাকাব্যের সূচনা করলেন, তারই ধারা যুগ যুগ ধ'রে বয়ে চলল।

বৈষ্ণব কবিরা এক সুরে গাইলেন বর্ষার গান, রবীন্দ্রনাথ গাইলেন আর এক সুরে।

নব নব বৈচিত্র্যে ভরে উঠল বর্ষাকাব্য, কিন্তু ধারা তার থামল না।

পরমাত্মীয়

শ্রীগোপাললাল দে

জননীর কোলে দেখি ধরণীর আলো,
সেই জননীরে শতেক নমস্কার;
তিলে তিলে পান করিলাম সুধাধার।
আজো সেই স্বাদ রসনায় মোর জাগে,
স্বপনে তাঁহার স্নেহ পরসাদ লাগে,
প্রাণে দেয় ঝঙ্কার;
মোর জননীরে শতেক নমস্কার।
হেন জননীও যবে রে ছাড়িয়া যায়,
দিনেকের তরে ছাড়ে নাক গ্রামখানি,
জননীও যদি ভুলি কোন দিন ভাই,
শ্যামলী সে গ্রাম কভু ভুলিব না জানি!

কত স্মৃতি-ঘেরা পিতৃভবনখানি,
সবে নিশিদিন স্নেহ অঞ্চলে ঢাকে,
শীতাতপবারি দুর্য্যোগ-দিনে রাখে।
শৈশব-খেলা নব-যৌবন লীলা,
তারই কোণে কোণে কঠিন তারে যে ভোলা,
ছেড়ে যাই পিছু ডাকে,
দুঃখ বিপদ দুর্য্যোগ দিনে রাখে।

ঝঞ্ঝা প্লাবনে শত্রু আক্রমণে,
যদি বা অনলে টুটে চির-চেনা ঘর,
শেষ আশ্রয় চিরদিন দেয় পথ;
কে ভুলিবে তার অনন্ত পরিসর?

জীবনের পথে হেরি কত নরনারী,
কেহ দেয় হাসি কেহবা মিষ্টবাণী,
কেহবা স্নেহের জোগায় পরশখানি।
হিসাব করিয়া নিজে নিরাপদ রাখে,
বন্ধুরে দিতে পরে যদি কিছু থাকে,
তবে তাই দেয় আনি,
তবু ভালবাসি, দাম আছে তার মানি।
কিন্তু যে জনা মুহূর্ত্ত ভাবিল না,
যাহা কিছু তার তুলে দিল মোর হাতে,
তাহারে ভুলিব? হেন দিন যদি আসে,
মোর নিশ্বাস ভুলি যেন সেই সাথে!

দুঃস্বপ্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সীমার সহিত বিজয়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণটা হয়ত সামান্যই, কিন্তু বিজয় ইহাকে সামান্য ভাবিতে পারিতেছে না। সে মনে করে সীমার ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কথাটা এমন কিছুই নয়, কারণে-অকারণে এই ধরণের কথা হামেশাই লোকে বলিয়া থাকে, কিন্তু বিজয় কথা কয়টির সহজ অর্থ করে নাই। মানুষ মরিতে কখন চায়? সম্মুখে চলিবার পথ যখন চতুর্দ্দিক দিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়···যার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের কোন পথ নাই···যে সকল দিক দিয়া নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে···সে। সীমা কেন এ কথা বলিবে! এই সেদিনে তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। জীবনের সত্যিকারের প্রথম সোপান। এর পরে কত অগণিত দিন তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনকে তাহারা উপভোগ করিবে—উপভোগ করিবে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। চলিতে হইবে কত পথ বাহিয়া···সহজ এবং পিচ্ছিল। আনন্দকে বরণ করিয়া লইবে, দুঃখকে করিবে জয়··· গ্লানিকে জমিতে দিবে না। দুঃসাহসীর ক্ষিপ্রবেগে তাহারা অগ্রসর হইবে—নইলে জীবন আর কাহাকে বলে। বিজয়ের ইহা শুধু কল্পনা নয়, নিজেও সে কতকটা এই ধরণের। তার জীবনের অতীতের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইলে এমন বহু ঘটনা চোখে পড়িবে।

সুঠাম দোহারা চেহারা বিজয়ের। উন্নত নাক—আয়ত চোখ। চোখে আছে দৃঢ় সজাগ চাহনি, চলায় বলায় আছে সহজ সংযত ভাব। মোটের উপর সারা দেহ জড়াইয়া বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে। উচ্ছ্বাসের অভাব নাই, কিন্তু কোথাও আধিক্য দেখা যায় না। বিজয় সাধারণের মধ্যে একটু আলাদা ধরণের। বন্ধুমহলে এর জন্য অনেকেই তাহাকে ভুল করিত। অনেকের মতে বিজয় আত্মম্ভরী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। নিতান্তই রক্তমাংসে গড়া একটি মানুষ, কেবল তার চতুর্দ্দিকে স্বরচিত একটা আবরণ রহিয়াছে। এই আচ্ছাদনের আড়ালের মানুষটিকে যে চিনিয়া লইয়াছে সে-ই বিজয়কে জানে। ওর চারিত্রিক ছোট বড় কোন কথাই তার অজানা থাকে না। সেখানেও সাধারণের চেয়েও প্রাণখোলা—তাদের চেয়ে ঢের বেশী সহজ এবং স্বাভাবিক।

মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মনোভাবটাও একটু আলাদা ধরণের। যাহা ঠিক প্রত্যাশিত না হইলেও বলিবার মত কিছু নাই। তাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা দেখাইতে ওর কুণ্ঠা নাই, সংসর্গকেও এড়াইয়া চলিত না, কিন্তু আগ্রহের সহিত কোথাও মাখামাখি করিতে দেখা যাইত না। একটা সম্মানজনক ব্যবধান হইতে সান্নিধ্য বাঁচাইয়া চলাফেরা করিত। এর কারণ এ নয় যে মেয়েদের সংসর্গকে সে ভয় করে, বরং তাদের সামাজিক জীবনের অপরিসর গণ্ডী সম্বন্ধে ও সব সময়েই সচেতন। মানুষের মুখের বিষকেই সব চেয়ে বেশী ভয়। বিজয় অবশ্য এসব গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কেবলমাত্র বিজয়কে লইয়াই সংসার নয়, এ কথা সে জানে এবং জানে বলিয়াই তার এই সাবধানতা। তা ছাড়া সে একটু বিশেষ রকম ভাবপ্রবণ। যতখানি নরম ঠিক সেই পরিমাণে শক্ত।

বিজয় অতি অকস্মাৎ যেন তার অতীতে ফিরিয়া গেল। বর্ত্তমান জীবনের নূতন চেতনার মাঝে পুরাতন নিতান্তই মুছিয়া যাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু সহসা নাড়া পাইয়া এক নিমেষে মন তার সজাগ হইয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে সে সীমাকে কহিল, কিন্তু কেন শুনতে পাই কি? কিসের জন্য বেঁচে থাকার উপর তোমার বীতশ্রদ্ধা। বিজয় একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, উত্তর দেবে না ঠিক করেছ কিন্তু তা হলেও আমি বুঝি। তোমার স্বামী সম্বন্ধে যেমন কল্পনা করেছিলে, এখানে এসে হয়ত তার ব্যতিক্রম দেখেছ—তাই।

সীমা অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। মাত্র কয়েক মাস হইল এ বাড়ীতে আসিলেও সীমা তার স্বামীকে চিনিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সহজভাবেই সে কহিল, বলতে আমার ভাল লাগে তাই।

বিজয় আর এক দফা বাজিয়া উঠিল, এ সব কথা আমি পছন্দ করি না।

সীমা বিজয়ের অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল, তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি করি।

বিজয় পাশ ফিরিয়া শুইল। মনে তার প্রলয় নৃত্য সুরু হইয়াছে। এমনি একটি সাধারণ মেয়ে তার জীবন-সঙ্গিনী, ইহাকে লইয়াই গোটা একটা জীবন তাহাকে কাটাইতে হইবে। অথচ তার কল্পনা···তার স্বপ্ন এক দিন এই সীমাকে ঘিরিয়াই মূর্ত্তি লইয়াছিল। বিজয়ের কল্পনা এক সময় কত বিচিত্র পথেই না আনাগোনা করিত। সীমাকে কেন্দ্র করিয়াই বিজয় সর্ব্বপ্রথম নিজেকে যাচাই করিল। এবং অনুভব করিয়াছিল যে, সংসারে বাঁচিতে হইলে নারীর প্রয়োজন আছে। আর তার মত বেপরোয়ার সীমার মত মেয়েরই প্রয়োজন। নইলে তার জীবনে এমন কত সীতা, সতী, রুনু, বেণুর আবির্ভাবই ঘটিয়াছিল— বিজয় তাদের এক দিনের জন্যও চাহে নাই, চাহিবার স্পৃহাও মনে উদয় হয় নাই। ওরা নিতান্তই সাধারণ, ডাকিতেই কাছে আসিত, সহজেই নিজেদের প্রকাশ করিয়া বসিত। ওরা দুরূহ নয়, সহজ, নিতান্ত একদৃষ্টিতে বোঝার মত। ওরা অনায়াস—বিজয়ের দৃষ্টি তাই আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তার মনে হইল যে মূলতঃ সব মেয়েই সমান···নিতান্তই সাধারণ সংসারের জীব, শুধু চলাফেরার ব্যবধানে বুঝিতে ভুল করা।

দূর ছাই, বিজয় এ সব কি ভাবিতেছে। সীমার মরিতে চাওয়ার মধ্যে এ অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িতেছে কেন? অকস্মাৎ বিজয় পাশ ফিরিয়াই উঠিয়া বসিল এবং সীমাকে টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল, আমি যা পছন্দ করি না তা তোমার করা কি উচিত?

সীমা কহিল, আর আমি যা ভালবাসি তাতে বাধা দেওয়াই বুঝি তোমার খুব উচিত কাজ? কিন্তু যেভাবে ঝাঁকি দিয়েছ তাতে মরতে আমার দেরি হবে না। কাজটা তুমিই খানিক এগিয়ে দিতে পারবে। উঃ হাত দুটো তোমার লোহার তৈরি যেন। সীমা তার গায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বিজয় একবার আড়চোখে নিজের পেশল বাহু দুখানির প্রতি দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া মৃদু লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, ঠিক বুঝতে পারি নি। তা ব'লে তুমি এত দুর্ব্বল হবে কেন?

সীমা একটু গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তা বটে—তোমার মত হওয়াই উচিত ছিল। এটাও বোধ করি আমার মস্তবড় একটা অপরাধ?

সেই স্বামী-স্ত্রীর মামুলী কলহ। সীমার প্রতি বিজয় কঠিন হইয়া উঠিতে যত্নবান হইয়া ওঠে, কিন্তু অভদ্র মনটা বারে বারেই নরম হইয়া পড়ে কেন? তার এই দুর্ব্বলতায় বিজয় নিজেকেই অভিযুক্ত করে। কোথাকার কে একটা মেয়ে, না হয় জানা-শোনাই ছিল অথবা ঘটা করিয়া বিবাহই হইয়াছে, তাই বলিয়া সে ত আর মাথা বিকাইয়া দেয় নাই! না না, বিজয় কিছুতেই এমন করিয়া তার স্বভাবের অপমৃত্যু ঘটিতে দিবে না।

বারটা বাজিল। এরই মধ্যে সে মধ্যরাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সীমা কিছুক্ষণ হইল শুইয়া পড়িয়াছে— হয়ত ঘুমাইয়াছে। সীমাকে ঘুমাইলে বেশ লাগে। ওর সত্যিকারের রূপ—কৃত্রিমতাহীন···সহজ সরল। একটু আগেও যে অমন মুখরার মত টগবগ করিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক এই মুহূর্ত্তে কে সে কথা বিশ্বাস করিবে? কে বলিবে এই নিরীহ বৌটি অত কথা জানে। বিজয় উঠিয়া গিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া আসিল। তাহারও ঘুমের প্রয়োজন আছে। বিজয় শুইয়া পড়িল।···কিন্তু মন তার স্টীমারের সন্ধানী আলোর মত চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তেই সে তার বাল্যজীবনের কতকগুলি ছোটখাট ঘটনার মধ্যে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। মাত্র বার বছর বয়সের বালক বিজয় তাদের গ্রামের বাড়ীতে মনুদির আঁচল ধরিয়া বায়না ধরিয়াছে সে যেন তার ব্রতশেষে সবচেয়ে সেরা ফুলের গুচ্ছটি তাকে দেয়। মনুদি বলে, ওটা যে জলে ভাসিয়ে দিতে হয় বিজু। তুমি তুলে নিতে পার ত নিও। বিজয় সাঁতার জানে না এ কথা মনুদির জানা, তাই হয়ত এই ছলনা। কিন্তু বিজয় বলে, সে জল থেকেই তুলবে। ঐ ফুলের গুচ্ছটা তবুও তার চাই। জলে তাহাকে নামিতে হয় নাই, মনুদি এমনিতেই দিয়াছিল। ছেলেমানুষ বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ —ব্রতর নিয়ম পালন তার মাথায় থাক। তা ছাড়া ঐ অতটুকু ছেলে দুঃসাহসের তার অন্ত ছিল না···রুণ্টির জন্য বনবাটালি আনিতে গিয়া মারিয়া আনিল এক কেউটে সাপ। ওরা সকলে ভয়ে কাঠ। তার ছেলেবেলার গল্প মনুদি তাকে বহু বার করিয়াছে। নইলে এত কথা হয়ত আজও তার এমন সুস্পষ্ট মনে থাকিত না। বিজয়ের মা সেদিন চোখের জলে হাসিয়া মনুদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এমন ডাকাত ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাই বল ত মা মনু? গাঁয়ে বড়-একটা আসা-যাওয়াও নেই···থাকাও হয় না, আর এ দস্যিছেলের ত জ্ঞানগম্যি ব'লেও কিছু নেই। জলেই রেখে যাই, কি সাপের মুখেই রেখে যাই তা ভগবান্ জানেন।

ভগবানের মনের কথা বিজয়ের জানিবার কথা নহে,

ও বিষয়ে তার কৌতূহলও ছিল না, কিন্তু সাঁতার বিজয় অল্পদিনেই আয়ত্ত করিল। সকলে ত আর মনুদির মত ভালমানুষটি নয়। বিজয়ের মা প্রমাদ গণিলেন।

জলে যদি একবার বিজয় নামিল তবে উঠিবার নামও নাই। মা আসিয়া ধমকাইলে জলের উপর প্রচণ্ড দাপাদপি করিয়া মার কণ্ঠকে চাপা দেয়…খোশামোদ করিলে হাত তালি দিয়া হাসে—মা শেষ পর্য্যন্ত সখেদে নিজের মৃত্যু কামনা করিতেন। বিজয় উঠিয়া আসিত। মা বলিতেন তার জ্বালায় এক মুহূর্ত্ত তিনি শান্তি পান না। নিবারণ পণ্ডিত নাকি সাতখানা করিয়া মার কাছে লাগাইয়া গিয়াছেন। বিজয়ের সেদিনে কিছু প্রহার অদৃষ্টে জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও পাঠশালায় যাইবার সময়কার পেটের ব্যথা এবং মাথাধরার বিরাম ঘটে নাই। এর পরে এক দিন আবার তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেও তাহারা শহরেই ছিল, কিন্তু সেদিন শহর তার কাছে বড় বিশ্রী লাগিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ বিজয়ের গ্রামের পাঠশালা-প্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, মা খুব হাসিয়াছিলেন কিন্তু গ্রামে আর তাহারা ফিরিয়া যায় নাই।

বিজয়ের হঠাৎ ভারি হাসি পাইল—সে নিজের বিছানায় শুইয়া আছে, পাশে স্ত্রী সীমা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কোথায় গেল তার বাল্য-জীবনের মধুর স্মৃতি, আর কোথায় সে! জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। আলনায় পাশাপাশি সাজান রহিয়াছে শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, ড্রেসিং-টেবিলের উপর রূপ-সজ্জার নানা উপকরণ। তার স্বপ্ন… বিজয়ের অতীত জীবনের বর্ত্তমান পরিণতি। স্থূল অখণ্ড বাস্তবতার।

বিজয়ের চোখে ঘুম নামিয়া আসিতে চায়, কিন্তু মন তার অতীতের স্বপ্নে জড়ান। বার বছর বয়সের ছোট গণ্ডিটুকু ছাড়াইয়া সে আসিয়া কলেজ-জীবনে উপস্থিত হইয়াছে। জীবনের সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের একটা দিক্‌। পৃথিবী ঠিক যেন মাটির পৃথিবী নয়। মনের আনাচকানাচ পর্য্যন্ত এক বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মনের নৌকায় পাল তুলিয়াছে, নদী ছাড়াইয়া নৌকা তখন মাঝ-সমুদ্রে। কূল নাই তাই অনন্ত আশা…বিরাট্‌ হইবার বৃহত্তর সম্মুখ। তলাইয়া যাইবার মত প্রশস্ত গভীরতা। কিন্তু কলেজে আসিয়া কয়েক মাসেই সে তার মত পরিবর্ত্তন করিল। তার কল্পনার সহিত এতটুকু মিল নাই, প্রতি পদে তাকে হঁোচট খাইতে হয়। কিন্তু জীবনের উচ্চাভিলাষ পরিপূরণের পথ নাকি ঐ একটাই, বাবা একথা বহু বার বলিয়াছেন। মা বলেন, ছেলের তার অন্ততঃ তিনটে পাস দেওয়া চাই। মানুষ হওয়া চাই। কিন্তু মানুষ হইয়া ওঠা আর পরীক্ষা পাস করার সত্য সম্বন্ধটা যে-দিনে সে অনুভব করিল, সেই দিনই সে তার মাকে হাসিয়া বলিয়াছিল, তিনটে পাস ক'রে একটা মস্তবড় চাকরি করাও চাই ত মা?

মা একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, নইলে আর লেখা-পড়া কেন? মাকে বিজয় দোষ দেয় নাই কিন্তু মনে মনে সে বেদনা অনুভব করিত, পাস করা আর চাকরি করা। বাঙালীর জন্মগত অধিকার 'হাতে কলম' কেন লাঠি হইতে দোষ কি? কিংবা অন্য কিছু? মার সঙ্গে সে ঝগড়া করিত। মা হাসিয়াই বিজয়ের যুক্তিতর্ক চাপা দিতেন।

বিজয়ের মনে পড়িল সে-দিনের প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের কথা। কলিকাতা শহরে অতবড় মাতামাতি তৎপূর্ব্বে আর হইয়াছে বলিয়া বিজয়ের জানা ছিল না। যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ তেমনি মেঘে-বিদ্যুতে সজ্জিত তীব্র বৃষ্টি। বিজয় তখন তার মায়ের কোলের কাছে শুইয়া কলেজ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছিল। এমনি সময় প্রকৃতির দুর্য্যোগ। বিজয় হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল। মা বলিলেন, কোথায় যাস্‌ বিজু? এক মুহূর্ত্ত কি চুপ ক'রে থাকতে পারিস না? বিজয় মার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতে তিনি পুনশ্চ একই প্রশ্ন করিলেন। বিজয় হাসিমুখে বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, বাইরে বেড়াতে—

মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর কি মাথা খারাপ বিজু? এই দুর্য্যোগে যে কুকুর বেরাল পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস পায় না।

বিজয় তেমনি হাসিমুখে বলিল, বেড়াবার সত্যিকারের আনন্দ ত এমনি দিনেই মা…তা ছাড়া আমি ত আর তোমার কুকুর বেরাল নই।

মা মুখ করিয়া বলিলেন, তোর ফাজলাম রেখে দে বিজু। কিন্তু বিজয় সে কথা কানে তোলে নাই। ততক্ষণে সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাহির ওকে প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করিয়াছে। বিজয়ের খামখেয়ালি স্বভাব তাই দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। বিজয়ের মোটর-বাইকের কর্কশ শব্দ হয়ত তার মায়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ওর মনে কেমন এক প্রকার উৎকট আনন্দ। জল এবং ঝড় ঠেলিয়া বিজয় উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের পাগল প্রকৃতির সহিত তার মনের কোথায় যেন

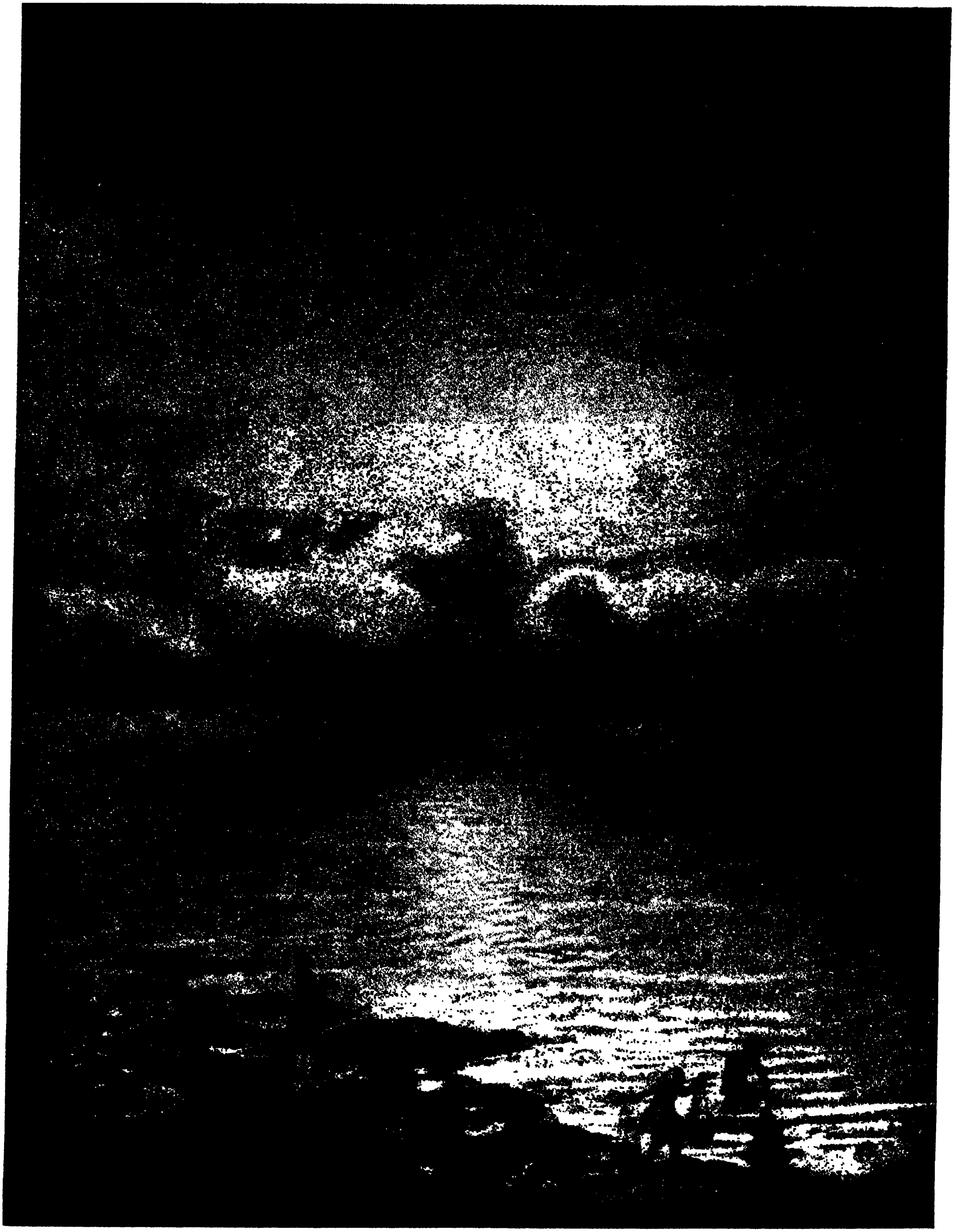

গোধূলি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীরামনারায়ণ নন্দী

এক গভীর যোগ রহিয়াছে। বিজয় সেদিন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনটাকে এমনি কতকগুলি খেয়াল-খুশী দিয়াই সে ভরিয়া রাখিয়াছে যেখানে ও উন্মুক্ত, স্বাধীন, অব্যাহত, কিন্তু তবুও তাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। প্রকৃতি তার ছন্নছাড়া হইলেও রক্তের মধ্যে রহিয়াছে ঘোরতর সাংসারিক সুপ্ত বাসনা যাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে সংসারের আবেষ্টনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। বিজয় ফিরিয়া আসিলে মা অনেক অনুযোগ করিলেন চোখের জলে। বিজয় শুধু হাসিয়াছিল। মা দুঃখ পাইয়াছেন, ইহা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াই এই হাসি। অদ্ভুত অমানুষিক অনুভূতি। কিন্তু সেদিন আজ আর নাই। তার সহস্র উৎপাতেও আর কেহ তেমন করিয়া চোখের জল ফেলিতে আসিবে না। মা তার বহুদিন গত হইয়াছেন···

বিজয় চমকাইয়া উঠিল। তার অন্যমনস্কতার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। চোখের সম্মুখেই মৃতা মাতার ফটোখানি। বিজয় উঠিয়া বসিল। লুব্ধ কাঙাল দৃষ্টিতে ছবিখানি দেখিতে লাগিল। ছবির চোখে মুখেও যেন বিগত দিনের স্নেহ-করুণার সুস্পষ্ট আভাস। ঐ চোখে এক দিন ভালবাসা টলমল করিত। যেদিন ঐ দেহে প্রাণ ছিল, সেদিনের কত কথাই আজ মনে পড়িতেছে। আশ্চর্য্য, মার কথা ঠিক এমনি করিয়া ইতিপূর্ব্বে বিজয় আর ভাবিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না, অথচ নিজেকে লইয়া এই যে সহস্র রকমে চিন্তা করা, এই যে ভাঙিয়া গড়িয়া যাচাই করা এ সকলের মধ্যেই যে তার মায়ের কল্যাণ হস্তের স্পর্শ রহিয়াছে। এ কথাটা আজ এই নির্জ্জন রাতে বড় বেশী করিয়াই সে অনুভব করিতেছে। মনে পড়িল মার ভবিষ্যৎ সংসার রচনার কাল্পনিক সুখ-স্বপ্নের কথা। মা বলিতেন, তাঁর বিজুর জন্য তিনি দেখে শুনে একটি কাল বৌ আনবেন। বিজয় তখন ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া হাসিত। বস্তুত হাসাটা বিজয়ের পক্ষে খুব বেশী অস্বাভাবিক ছিল না। মোটামুটি বিজয়ের চেহারা ভালই·· যাহা লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছু না থাকিলেও নিজের সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা বিন্দুমাত্র অশোভন নয়। বিজয়ের মুখের বাঁকা হাসি তার মার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বলিতেন, কাল মেয়ের বুঝি বিয়ে হয় না?

বিজয় হাসিয়া বলিত, তা না হ'লে যে কালর প্রশ্নই পৃথিবী থেকে উঠে যেত মা। মা উৎসাহিত হইয়া বলিতেন, তবে আবার অত কথা কেন? জানিস কাল মেয়েই ভাল হয়, তাদের রূপের গর্ব্ব থাকে না।

বিজয় গম্ভীর গলায় বলিয়াছিল, আমার মা কিন্তু কাল নয় আর সুন্দর কই তাঁকে ত কোনদিন এ নিয়ে গর্ব্ব ক'রতে দেখি নি। বলিয়া বিজয় হাসিয়াছিল। মা হঠাৎ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলেন। বিজয় যে এমন মুখের উপর তার মার সঙ্গেই তুলনা করিয়া বসিবে ইহা তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন। কিন্তু বুক তাঁর ভরিয়া উঠিয়াছিল, তিনি গভীর গলায় বলিয়াছিলেন, হতভাগা একেবারে পাগল···কথার যদি কোন বাঁধন থাকে! এই ভাবেই তিনি তখনকার মত প্রসঙ্গটা চাপা দেন।

ঘটনা হিসাবে ইহার কতখানি মূল্য তার চুলচেরা হিসাব আজ বিজয় করিতে বসে নাই, কিন্তু সীমার প্রতি চোখ পড়িলেই তার মার কথাগুলি মনে পড়ে। সীমা কাল।

বিজয় একবার মুখ ফিরাইয়া সীমার প্রতি চাহিল—অকাতরে ঘুমাইতেছে। সবল আশ্রয়ে ভীরু আশ্রিতা যেন। পরিপূর্ণ নিঃশঙ্ক একখানি মুখ। বিজয়ের স্ত্রী সীমা। সম্পূর্ণ তাহার···এ কথা সে আজ চীৎকার করিয়া বলিতে পারে, কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বেও এই সত্য তাদের কাছে ছিল নিছক কল্পনা—প্রকাশ্য আলোচনায় ছিল চূড়ান্ত নির্লজ্জতা।

নিজের অজ্ঞাতে বিজয়ের একটি নিঃশ্বাস পড়িল। সেই বিবাহ তাকে করিতেই হইল—যদিও মন তার আজিও বন্ধনকে তেমন করিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। সে যে বিবাহিত এ কথাটাও মাঝে মাঝে ভুলিয়া যায়। এমন হয়ত চিরদিন থাকিবে না···সংসারের নাগপাশ তাকে কুক্ষিগত করিবে···এই আবেষ্টন হইতে তার উদ্ধার নাই···মুক্তি নাই। ইহাই ত পৃথিবীর নিয়ম···প্রকৃতির প্রতিশোধ। আর আর দশ জনার মত সেও হয়ত তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবে, কিন্তু এই চলার সূচনাটা দুই দিন পূর্ব্বে হইলে কি এমন তার অসাধারণত্ব লোপ পাইত? বিজয় নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর নাই। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষকে অনেক কিছুই করিতে হয়, অনেক কিছু মানিয়া লইতেও হয়। বিজয় নিজেকে নিজে বুঝাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার এই যুক্তি যে নিতান্তই আত্মবঞ্চনার সস্তা আয়োজন এ কথা সে-ই সকলের চেয়ে বেশী জানে, নইলে সীমার সাধারণ দুইটা কথা লইয়া এত বড় কথা ও চিন্তার সমুদ্র মন্থন করিতে হইত না। ইতিমধ্যেই সে সংসারকে ভালবাসিয়াছে, তাই তার সুখ-দুঃখ, তার ভবিষ্যতের নিষ্ঠুর কল্পনাও তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

ডুবিতে সে বসিয়াছে, দুই দিন পরে হয়ত একেবারেই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পাম্পিং স্টেশনের ঘণ্টাবাদক দুইটা বাজাইল। সীমা নির্ব্বিকার চিত্তে ঘুমাইতেছে। বিজয়ের চোখে ঘুম নাই। তার ইচ্ছা হইতেছিল, সীমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দেয়। স্বার্থপর তার চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়া নিজে বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে বিরত থাকিতে হয়। সারাদিন খাটিয়া একটু ঘুমাইতেছে। কাল আবার ভোর পাঁচটায় উঠিতে হইবে। বিজয়ের হাতে রহিয়াছে আটটা পর্য্যন্ত।

আবার সেই সংসারের বেড়াজাল—মামুলি। সেই চিরদিনের পুরাতন অথচ দুর্নিবার আকর্ষণ। আশ্চর্য্য, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও এই বিজয় ভাবিতেছিল, সে সংসারকে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু যে জীবটিকে ঘিরিয়া তার সংসারের সূচনা, তার সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বেশ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে ত?

বিজয় অত্যন্ত সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—শয়ন-কক্ষসংলগ্ন ছোট বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। কতকগুলি কাক একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিয়াছে···হয়ত আচমকা ঘুম ভাঙিয়া ভ্রমে পড়িয়াছে। আশেপাশের বাড়ীগুলিও সব জ্যোৎস্নায় মাখামাখি। একটি চমৎকার পরিবেশ। অচেতন বাড়ীগুলি স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে। ছেলে-বেলায় ঠাকুরমার কোলে শুইয়া শুইয়া শুনিয়াছে ঐ তারার ইতিহাস। ওরা নাকি স্বর্গের দূত। মা বলিতেন মানুষ মরিয়া তারা হয়। কি যে হয় আর কি যে হয় না তাহা আজিও বিজয়ের অগোচর, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে মার কথাটাই যেন সত্য রূপ ধরিয়া তার মনকে নাড়া দিতেছে। তার মা হয়ত ঐ অসংখ্যর মধ্যে একটি তারা—তাঁর বিজয়ের বর্ত্তমান পরিণতি দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বাতাসে ভর করিয়া ভারি মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ বিজয়ের নাকে আসিল। সীমার গাছগুলিতে ফুল ধরিয়াছে। কাল ছিল কুঁড়ি···কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হইয়াছে ফুল। রূপে রসে পরিপূর্ণ একটি গোটা বস্তু। এমনিই হয়। স্বভাবের ধর্ম্মই বুঝি এই।

বিজয় পুনরায় তার শয্যায় ফিরিয়া আসিল। আর কতক্ষণ সে এমনি জাগিয়া কাটাইবে। যেন এই জাগিয়া থাকাটা তার ইচ্ছাকৃত। বিজয় চোখ বুজিল এবং এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পর?

তার পর সুরু হইল তার বর্ত্তমান জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতি। বিজয়কে যেন আর চিনিবার উপায় নাই। তার চেহারায় নাই লালিত্য···মুখে নাই হাসি। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে এক নূতন জগতে টানিয়া আনিয়াছে। নিজের চেয়ে সংসার হইয়াছে বড়। তার প্রয়োজনের দাবী মিটাইয়াই কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। দিনের পর দিন শুধু আত্মনিপীড়ন—কিন্তু এই বোধশক্তিও যেন তার দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আল-নায় ঐ যে ছিন্ন ময়লা পাঞ্জাবীটা ঝুলিতেছে ওটা বিজয়ের। আজও সযত্নে সে উহাকে ব্যবহার করিয়াছে। নূতনের একটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু ছোট ছেলেটার স্কুলের বেতন ততোধিক প্রয়োজন। তদুপরি দুই-দুইখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি আসিয়াছে। লৌকিকতা রক্ষা করিতে হইবে। কাল বরং ঐ পাঞ্জাবীটাই সে একটু সাবান-কাচা করিয়া লইবে। সীমা একটু সেলাই করিয়া দিলেই চলিবে—কতটুকুই বা ছেঁড়া। আর জুতা জোড়া! ঘুমের ঘোরেও বিজয় চাঞ্চল্য অনুভব করিল। সে কি হইয়া গিয়াছে। এ কি বিজয়, না তার প্রেতমূর্ত্তি? জীবনের রসে পরিপূর্ণ সুন্দর দুর্দ্দাম বিজয় কোথায় আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছে। মুখে তার হাসি নাই—প্রশান্ত উদাস ভাব··· সংসারের চাপে ক্লিষ্ট চোখের চাহনি, তবুও এই সংসারকে ঘিরিয়াই তার উদ্যম। এর প্রতিটি খুঁটিনাটির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া বিজয় হয়ত এই আবেষ্টনীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে। নিজেকে মারিয়া সে তার সত্তাকে বাঁচাইয়া তুলিতেছে।

সীমার কানের পাশের চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। মুখটা তুবড়াইয়া কানের পাশ হইতে চোখের কোণ পর্য্যন্ত হাড়খানা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। তার অমন ভাসা ভাসা চোখ দুইটাও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর গায়ের রং যা এক সময় ময়লাই ছিল ইদানীং রক্তাভাবে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সীমার রূপের প্রয়োজন বিজয়ের কাছে ফুরাইয়া গিয়াছে। সে এখন তার সত্য-কারের সহচরী। সীমার বাঁচিয়া থাকাটাই বিজয়ের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর অন্যথায় কি হইতে পারে এ কথা ভাবিতেও সে ভয় পায়। কিন্তু ভাবিবার দিন বুঝি তার শিয়রে আসিয়া ইতিমধ্যেই উপস্থিত হইয়াছে। সীমা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বিজয়ের চেতনা যেন অসাড় হইয়া পড়িতেছে, তবুও সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে খাড়া করিয়া রাখিল। ঘরময় ওরা কারা?

যারা চোখের জলে ভাসিতেছে? তারই ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী। ঐ বৃতারই শাখা-প্রশাখা। নাই শুধু প্রধানা যে, সে। সেই ফুলশয্যা-রাত্রির কচি ছোট মেয়েটি কবে এত বড় হইল। আগাগোড়াই একটা স্বপ্ন। বিজয় ভাবিতে গেলেই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। আর বুঝি সে সোজা হইয়া চলিতে পারিবে না। তার খেলাও ফুরাইয়াছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান নাতিকে ভগ্নকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, তার ঠাকুরমাকে যেন তার খাটে ক'রেই নিয়ে যাওয়া হয়। বিজয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। ঐ খাট-খানি সীমার বড় আদরের ছিল…তাদের বিবাহ-বাসরের নীরব সাক্ষী—ফুলশয্যা-রাত্রির নিঃশব্দ শ্রোতা।

বিজয় নীরবে বসিয়া আছে। গ্রীক ভাস্করের খোদাই-করা মূর্ত্তি যেন। বড়মেয়ে কি বলিতে আসিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেই কাঁদিয়া ভাসাইল। বিজয় ধীরে ধীরে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। যে-বন্ধনকে বিজয় উপেক্ষা করিত সেই বন্ধন আজ তাহাকে কোথায় টানিয়া আনিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বিজয়ের চোখে জল নাই। স্থির নিশ্চল। সীমার ফুলশয্যার খাটে অসংখ্য ফুলের মাঝে আজ তাকে বিজয় আবার নূতন চোখে দেখিল। ফুলশয্যা আর মৃত্যুবাসর। চমৎকার সমন্বয়। বিজয় উদ্‌ভ্রান্তের মত চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। আর বুঝি নিজেকে সে অবরোধ করিতে পারিবে না…

একটা আচমকা ধাক্কায় বিজয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘর রোদে ভরিয়া গিয়াছে। সে তার শয্যায় শুইয়া আছে। চোখ দুইটা একবার ভাল করিয়া রগড়াইয়া চোখ চাহিতেই কাউচে উপবিষ্ট সীমাকে চোখে পড়িল। নিবিষ্ট মনে সে কি সেলাই করিতেছে।

কি বিশ্রী স্বপ্ন…বিজয়ের বুকের মধ্যে এখনও বেতালা শব্দ হইতেছে, বিজয় উঠিয়া বসিল। খাটের স্ক্রুগুলি বোধ হয় ঢিলা হইয়া গিয়াছে—ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ হইল। সীমা মুখ তুলিয়া চাহিয়াই হাতের সেলাই-করা বস্তুটি লুকাইয়া ফেলিল।

বিজয় একটু বিস্মিত হইল এবং বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটিতেই নামিয়া আসিয়া সে সীমাকে টানিয়া তুলিল। তার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়িল গোটা দুই ছোট পেনি এবং ওরই উপযুক্ত একখানি ছোট কাঁথা।

বিজয় সবই বুঝিল, তবুও প্রশ্ন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সীমা চোখ তুলিল না। মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, যাও আর অসভ্যতা করতে হবে না। বলিয়া সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিজয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কিছুক্ষণ পূর্ব্বের স্বপ্নটা আদ্যোপান্ত সজীব হইয়া তার চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিলাভ করিতেছে। তেমনই ভয়াবহ কঠিন, অথচ সহজ সত্য, এবং স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরসময় দাশ

জীবনের পিছে মৃত্যু ফিরিছে জানি,
মরণের বাড়া সত্য কিছুই নয়;
তবু গাহি মোরা চির-জীবনেরি জয়,
ভাঙনের কূলে তবু বাঁধি ঘরখানি।

অবশেষে এ-ও জগতে সত্য হ'লো!
রবি-হীন হ'য়ে তেমনি জগৎ আছে!—
বলাকারা উড়ে দূর নীলিমার কাছে,
ভাঙনে যখন ঘরখানি ভেঙে প'ল!

হায়! কবি হায়! একদা তোমারি চোখে
ধরণীরে মোরা দেখেছিনু সুন্দর
তুমিই শিখালে মোদের কুটীর ঘর
কত বিচিত্র নিয়ত দুঃখে সুখে!

কণ্ঠ তোমার থেমে গেছে চির-তরে,
পৃথিবীর পথে বাজিবে না তব বীণ;
তবুও চলিবে এই মত চিরদিন
জীবনের স্রোত ধরণীর ঘরে ঘরে!

শিশুদের চিত্রশিক্ষা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিক্ষার উন্নতির জন্য আমাদের দেশের শিক্ষানায়কগণ ভাবিতেছেন; শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কত আলোচনা চলিতেছে, এবং সময় সময় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরীক্ষণ পরিবর্ত্তন চলিতেছে। শিক্ষার নব্য নীতি গ্রহণে যে উন্নতি সাধিত হইতেছে না তাহা নহে। শিক্ষা জিনিসটা সচল ব্যাপার, যেমন মানুষের মন সচল। জাগতিক ব্যাপারে নিত্যনিয়ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। জগতের এই চলমান চিন্তা-প্রবাহ এবং ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে খাপ খাইয়া শিক্ষানীতি সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশ অধিক সচল; সেজন্য সেখানকার শিক্ষানীতিও আমাদের দেশ হইতে অধিক সচল। তাহারা এক জায়গায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায় না; নানা পরীক্ষণের ভিতর দিয়া এক নব্য নীতিকে গ্রহণ করে। শিক্ষাকে সমগ্র ভাবে যেমন দেখা হইয়াছে তেমনি প্রত্যেকটি বিষয়ের,—ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়, শুধু চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে। আমাদের দেশে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে, হয়ত বা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে; কিন্তু চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু মাত্র উৎকর্ষ সাধন হয় নাই। শিশুদের শিক্ষার ভিতর চিত্র একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, অথচ এই বিষয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি একেবারে উদাসীন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার কত উন্নতি হইয়াছে, একটা উদাহরণ দিই। আমরা বাল্যকালে চোখের জলে ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। অ, আ, ক, খ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ফলা বানান যুক্তাক্ষর পর্য্যন্ত প্রথম কলাপাতে খাগের কলমে মক্‌শ করিতে হইয়াছে, তার পর পাইয়াছি বই ও খাতা। ইংরেজী পড়িয়াছি মারের স্পেলিং বুক। ভাষার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, দিনের পর দিন অর্থশূন্য শব্দ মুখস্থ করিতে হইয়াছে—বি, এল, এ ব্লে; সি, এল, এ, ক্লে। এখনকার শিশুরা অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত হয় শব্দের, এবং শব্দের সঙ্গে বাক্যের সহিত। শিক্ষাটা এখন শিশুর মনে অর্থহীন বোঝা-স্বরূপ চাপিয়া থাকে না। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক চিত্রশিক্ষা; গত ত্রিশ বৎসরের শিক্ষা-প্রণালী অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, বিশেষ কিছু অদলবদল হয় নাই। তাহাদের সেই মান্ধাতার আমলের চিত্রপুস্তক আছে। (মান্ধাতার আমলে অবশ্য এখনকার অপেক্ষা ভাল চিত্রপুস্তক ছিল; হ্যাভেল সাহেবের চিত্রপুস্তক তখন ইস্কুলে প্রচলিত ছিল। এই বইয়ের ড্রয়িংগুলি নন্দলালবাবুর আঁকা। ভারতীয় প্রাচীন চিত্র অবলম্বনে এসব আঁকা ছিল। এখন সে বই পাওয়া যায় না। এই বই অধুনা বাজারে প্রচলিত যে কোন ড্রয়িং-বুক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।)

এখন ড্রয়িং-বুকে কি থাকে আঁকা? চায়ের পেয়ালা, কেটলি, ছুরি, কাঁচি, হাঁস প্রভৃতি। ড্রয়িং-ক্লাস ছেলেদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিজনক। এজন্য শিক্ষাপ্রণালী এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের দোষ দেওয়া যায়। ক্লাসটা যদি চিত্তাকর্ষক না হইল, ছেলেরা শিখিবে কি করিয়া? ছেলেরা এ বিষয়টা যেন ফাঁকি দিতে পারিলেই বাঁচে। বিষয়ের আভিজাত্য হিসাবে মইয়ের উচ্চ ধাপে হইল ইংরেজী, আর চিত্র সর্ব্বনিম্নে—একমাত্র ড্রিল হয়ত চিত্রের নীচে স্থান পাইতে পারে। অনেক ইস্কুলে হয়ত ড্রয়িং-মাষ্টার এবং ড্রিল-মাষ্টার এক ব্যক্তি, এটা কি শব্দ-সাদৃশ্যের জন্য? ড্রয়িং-মাষ্টারের স্থান ইস্কুলের শিক্ষকদের সর্ব্বনিম্নে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ না হইলে শিক্ষণীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা কি করিয়া হইবে?

শিক্ষাপ্রণালীতে অন্যান্য বিষয়ে শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করার যত প্রয়োজন, চিত্রবিষয়ে আরও প্রয়োজন। একজন ছাত্রকে বলা হইল, চায়ের কেট্‌লি আঁক; তার চায়ের কেট্‌লি আঁকার ইচ্ছা নাই, সে চায় আঁকিতে নদী দিয়া একটা নৌকা যাইতেছে, গাছে একটা পাখী বসিয়া আছে, এমনি কিছু। কাজের ভিতরে শিশু তার মন ও কল্পনার প্রসার পায় না বলিয়া ক্লাসটা তার কাছে হইয়া উঠে বিরক্তিজনক।

ছোট ছেলেদের দেখা যায় ছবি আঁকার চেয়ে মডেলিঙের দিকে বেশী ঝোঁক। তারা চায় কাদা

ঘাঁটিয়া খেলা করিতে। এই স্বাভাবিক ইচ্ছাকে শিক্ষাপ্রণালীতে কাজে খাটানো উচিত। ড্রয়িং-মাষ্টারের কর্ত্তব্য ড্রয়িং শেখানো নয়, কিন্তু ছবি আঁকা ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক করিয়া শিশুদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা।

শিশুদের মন কতকটা পৃথিবীর আদিম জাতির মত। বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তর-যুগের আদি মানবের যে মনোবৃত্তি, আধুনিক যুগের আদিম বর্ব্বর জাতির মনোবৃত্তিও প্রায় তদ্রূপ। প্রথম তাহাদের মনের বিকাশ লাভ করিয়াছে শিল্পে। হাতীর দাঁতে, বল্গা হরিণের শিঙে, পাথরে তারা মূর্ত্তি গড়িয়াছে, পাথরের গায়ে তারা ছবি আঁকিয়াছে। শিল্পে প্রথম আগন্তুক জানোয়ার, মানুষেরা ছবিতে আসিয়াছে পরে। শিশুদের দেখা যায়, তাহাদের মানুষ অপেক্ষা পশুপক্ষীর প্রতি ঔৎসুক্য বেশী। প্রথম জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জন্তুজানোয়ার দেখিলে জিজ্ঞাসা করে, এটা কি, ওটা কি? কোন সুন্দর রঙীন জিনিস দেখিলে হাত বাড়ায়। ছবির বই পাইলে তাহারা পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতে ভালবাসে এবং বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়া অঙ্কিত বিষয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। সুন্দর বস্তুকে ভালবাসা, সুন্দর চিত্রকে ভালবাসা শিশুর একটা সাধারণ মনোবৃত্তি। প্রত্যেক শিশুর ভিতরেই একজন আর্টিষ্ট আছে; ড্রয়িং-ক্লাসের যাঁতাকলে পড়িয়া এই আর্টিষ্ট সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর সহজে তাহার উন্মেষ হয় না। পরীক্ষার পড়া, পাস, তার পর দশটা-পাঁচটা আপিস—আমাদের জীবনের একঘেয়ে কাজের ভিতর সুন্দরের পূজার আসন কোথায়? শিশুকালেই ইহার বীজ রোপিত হওয়া উচিত। সকল ছাত্রই যে আর্টিষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু তাহার এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যে, সে একখানা সুন্দর চিত্র বা মূর্ত্তি ভালবাসিতে শিখে, তাহার রুচি যেন মার্জ্জিত হয়। যাহার জীবনে সৌন্দর্য্যের রুচি নাই, শিল্পের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত যে, সে একটা বড় আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইল।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিশুর শিক্ষাপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে না। শুধু মোটামুটি কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। প্রথমতঃ, চিত্রপুস্তক, এবং সিলেবাস। আমি মোটেই ইহার অনুমোদন করি না। ধরা যাক, ছয় বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল বৎসরে ম্যাট্রিক শিক্ষা সমাপ্ত করিতেছে। শিশুদের প্রথম দেওয়া উচিত অবাধ স্বাধীনতা—তাহাদের ড্রয়িং শেখান উচিত নহে। তাহাদের হাতে রং—প্যাসটেল, ক্রেয়ন অথবা জল রং ছাড়িয়া দিয়া বলা উচিত, ছবি আঁক, তোমাদের যা খুশী। ঘর-বাড়ী, নৌকা, গাড়ী, পশুপক্ষী কত রকমের ছবি তারা কল্পনার সাহায্যে আঁকিবে। তাহাদের পার্সপেকটিভ, আলোছায়া সেখানে বাতুলতা মাত্র। ঘটি বাটি পেয়ালা যদি আঁকাইতে হয়, তবে তাহাদের ছবি না দেখাইয়া বস্তুগুলি দেখান উচিত। ছাত্রেরা মন হইতে অথবা বস্তু দেখিয়া আঁকিবে, কখনও ছবি দেখিয়া নহে। শিক্ষক বোর্ডে আঁকিয়া দেখাইতে পারেন, রঙীন খড়ি দিয়া। পেনসিল-ড্রয়িং অপেক্ষা রঙের কাজে শিশুরা অধিক আনন্দ পাইবে। নীচের ক্লাসে মডেলিঙের দিকে খুব ঝোঁক দিতে হইবে। ড্রয়িং-ক্লাসের জন্য স্কুলে একটি আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়; ড্রয়িং-ক্লাসের সময় ছেলেরা নিজ নিজ ক্লাস হইতে আসিয়া এখানে কাজ করিবে। দেওয়ালে টাঙান থাকিবে দেশী বিলাতী ওস্তাদদের আঁকা ভাল ছবি। শুধু তাহা নহে, ক্লাসটিকে একটি ছোট-খাট যাদুঘরে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে; আলমারিতে বা তাকের উপর থাকিবে নানা রকমের রঙীন মাটির, অথবা কাঠের দেশী পুতুল। মানুষের এবং পশু-পক্ষীর খেলনা থাকিবে। মাটির হাঁড়ি, কলসী, ঘট প্রভৃতিও থাকিবে। এ-সব সংগ্রহ করিতে বিদ্যালয়ের অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না। এগুলি হইতে ছবি আঁকিতে হইবে।

ছাত্রদের দশ-বার বৎসর বয়স হইতে শিক্ষক মহাশয় একটু-আধটু শিক্ষা দিতে পারেন। শিক্ষকের শুধু ড্রয়িং ও পেন্টিঙের বিদ্যা জানা থাকিলে চলিবে না। তাহার কল্পনা এবং মৌলিকতা থাকা চাই। ছেলেরা চারি দিকে যাহা দেখে, ছুটির সময় ভ্রমণে বাহির হইলে, সে-সব বিষয়ে আঁকিবে। ভাল ভাল ছেলে যাহারা, শিক্ষক মহাশয়কে তাহাদের বাছিয়া লইতে হইবে। অন্য ছেলেদের অপেক্ষা তাহাদের উন্নততর বিষয়ে কাজ দিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে তাহারা আঁকিতে চেষ্টা করিতে পারে। হাত দোরস্ত বা ড্রয়িং পাকা করার জন্য বয়স্ক ছেলেরা বস্তু দেখিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে ড্রয়িং এবং রঙে জ্ঞান জন্মিবে। কোন বস্তুর আকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইবে। মাটির পাত্র অথবা চীনা মাটির রঙীন পটারি, শাক, সব্জি, ফুল, ফল প্রভৃতি আঁকিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে still life painting তাহারই খুব সহজ বিষয় দিতে হইবে। প্রকৃতি হইতে আঁকার অভ্যাস করিবে—ফুল, লতা, গাছ প্রভৃতি। খাঁচায় করিয়া কোন

পাখী ক্লাসে রাখা যাইতে পারে, দেখিয়া আঁকিবে। কোন পশু-পক্ষীর চিত্রপুস্তক হইতে নকল না করিয়া জীবন্ত প্রাণী দেখিয়া আঁকার চেষ্টা করা উচিত।

ইহার পরের স্তরের কাজ আসিবে নকল করা ; প্রাচীন চিত্র বা আধুনিক দেশীয় ওস্তাদদের ভাল ছবি নকল করিতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম হইতে ড্রইং-বই, বা অন্য কোন ছবি নকল করিতে দিলে ছেলেদের কল্পনা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুসন্ধিৎসা বাড়িবে না। ছেলেদের উৎসাহ দিলে দেখা যাইবে, তাহারা নিজেরাই কাজ করিয়া যাইতেছে, শিক্ষকের সাহায্যের অপেক্ষা বিশেষ করিবে না। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের ছবিতে যত সম্ভব কম সংশোধন করিয়া দিবেন, মুখে সব বুঝাইয়া দিবেন। ছেলেদের ছবিতে নিজে না দেখাইয়া মাঝে মাঝে ছেলেদের সম্পূর্ণ একখানা ছবি আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাহাতে ছেলেরা ড্রইং ও পেন্টিঙের হদিস পাইবে। ছেলেরা যদি একবার উৎসাহ পায় এবং ছবি আঁকার স্বাদ পায়, তখন তাহারা অন্য কাজ না করিয়া এ কাজেই লাগিয়া থাকিবে। ছবি আঁকার এমনি একটি আকর্ষণী শক্তি আছে।

ছেলেদের মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী শিল্পীদের ছবির বই দেখাইতে হইবে। যদি বছরে দুই-এক দিন কোন বিশেষজ্ঞকে নিমন্ত্রণ করিয়া আলোকচিত্রের বা এপিডায়েস্কোপের সাহায্যে আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়, তবে ইস্কুলে আর্ট সম্বন্ধে একটি অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়তা করিবে।

চোখের সঙ্গে যাহাতে হাতের নিপুণতা জন্মে, সেজন্য কিছু কারুকর্ম্ম ইস্কুলে চালান যাইতে পারে। চিত্রের সঙ্গে চলিতে পারে লিনোকাট। লিনোলিয়াম নামক রবারের উপর ছবি খোদাই করিয়া ছাপিবে। এ কাজ সহজ, ছেলেরা নিজেদের আঁকা ছবি নিজের হাতে ছাপিতে নিশ্চয়ই খুব আমোদ অনুভব করিবে। কম দামের মাটির ঘট, সরা প্রভৃতি নানা রঙে চিত্রিত করা যাইতে পারে ; ইহাতে ছেলেদের ডিজাইন করার ক্ষমতা জন্মিবে। এ সকল কাজ মনকে খুব হালকা করিয়া দিবে, এবং ছেলেরা এ সব কাজে খেলার মতই উৎসাহ বোধ করিবে। এ ধরণের কাজ হইতে থাকিলে দেখা যাইবে, তাহারা ড্রইং-ক্লাস ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না।

আলঙ্কারিক পরিকল্পনার দিকে মেয়েদের বিশেষ করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত, কারণ সেটা বাঙালীদের গৃহকর্ম্মে নিত্য প্রয়োজনীয় ; যেমন, পিঁড়ি চিত্র করা, উৎসবে আলপনা দেওয়া, টেবিলের ঢাকনি, বা ব্লাউজের উপর কোন সূচিকর্ম্ম করা। মেয়েদের আলঙ্কারিক কাজে নৈপুণ্য থাকিলে, এসব কাজ সহজে পারিবে। বিদ্যালয়ের উৎসবে আলপনা চালাইয়া দেওয়া উচিত। অধুনা দেখা যায়, সঙ্গীতের একটা চাহিদা হইয়াছে, সকল মেয়েই কিছু-না-কিছু গান বাজনা শিখিয়া থাকে, কিন্তু ছবি আঁকার চাহিদা তেমন করিয়া হয় নাই। আমাদের জীবনে এ জিনিসের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

বাংলা দেশে নূতন প্রণালীতে কোথাও চিত্র শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা জানি না, কিন্তু বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতা হইতে অগ্রণী। ১৯২৯ সনে আমি বোম্বাই ভ্রমণ করি। বোম্বাইয়ের ফেলোশিপ স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী নূতন ধরণের। চিত্র সম্বন্ধেও এ বিদ্যালয় যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকে এবং শুধু চিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্যই একজন খ্যাতনামা বাঙালী চিত্রকর নিযুক্ত আছেন। শুনিতে পাই, পরে বোম্বাইয়েতে এ জাতীয় আরও বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, যেখানে চিত্রকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য একটা কথা বলিতে চাই, কলিকাতার সকল বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কলিকাতার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রের একটি বাৎসরিক প্রদর্শনী করিতে হইবে। এই ভাবে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন বিদ্যালয়কে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। কলিকাতার মাঝামাঝি, ধর্ম্মতলা অঞ্চলে, কোথাও প্রদর্শনী হইবে, পূজার পূর্ব্বে। পূজার পূর্ব্বে এজন্য যে বড়-দিনের বন্ধে হয় বড় চিত্র-প্রদর্শনী, তখন এ প্রদর্শনী করিলে ইহার প্রাধান্য চলিয়া যাইবে, সেজন্য পূর্ব্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মতলা অঞ্চলে হইলে, উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের সকল বালক-বালিকার প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হইবে। ক্যাটালগ, ছাপা, ছবি টাঙান প্রভৃতি ব্যাপারে খরচ পড়িবে পাঁচ শত টাকা। চিত্রকরদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ছবির বই ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম পুরস্কার দিতে হইবে; এজন্য লাগিবে, আরও পাঁচ শত টাকা। এই হাজার টাকা তোলা আমার মনে হয় খুব কঠিন ব্যাপার নহে। কলিকাতার সব স্কুল যদি পঞ্চাশ টাকা করিয়া চাঁদা দেয়, তবে এ টাকা সহজে উঠিয়া যাইতে পারে। প্রদর্শনীর তালিকায় থাকিবে চিত্রকরের নাম, বয়স ও স্কুলের নাম।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

৪

পরের দিন সকালে অবনীর এক আত্মীয় তাহার জন্য একটা টিউশনি ঠিক করিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। একটি ছোট ছেলেকে পড়াইতে হইবে, কিন্তু সম্প্রতি ছাত্রের পিতা পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যাইতেছেন। মাসখানেক পরে স্কুল খুলিলে আবার তিনি ফিরিয়া আসিবেন। অবনীকেও তাই যাইতে হইবে তাঁহার সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে। অবনী মাসিক মাহিনা পাইবে পনর টাকা।

সুতরাং অবনীকে তখনই রাজী হইতে হইল। এবং ঠিক হইল বিকালে যাইয়া সে অন্যান্য কথাবার্ত্তা সব ঠিক করিয়া আসিবে। এদিকে পরেশ পড়িল একেবারে অকূল সাগরে। পরের দিন অবনী কলিকাতা ত্যাগ করিল। নিরাপদ ভবানীপুরে তাহার মাসীর বাসায় গেল কিছু দিনের জন্য। তাহার মাসীর কঠিন অসুখ, একটু আরাম না হইলে হয়ত সে ফিরিবে না। পরেশ একা। কখন বা সে পাক করিবে, কখন বউটির জন্য ঔষধপত্র আনিবে, আর কখন দিবে ডাক্তারকে খবর।

হাতে টাকা-পয়সা যাহা ছিল সবই শেষ হইয়া গিয়াছিল। গতকল্য নিরাপদ মাহিনা পাইয়াছে তাহা হইতে অবনী লইয়াছে দুই টাকা, নিরাপদ নিজের কাছে রাখিয়াছে তিন টাকা আর বাকীটা ধরিয়া দিয়াছে পরেশকে। এই টাকা কয়টি দিয়া সে কি করিবে? বউটির ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পথ্য কিনিতে হইবে এবং তাহাদের দুই জনের এক মাসের খোরাকীও চালাইতে হইবে। ডাক্তার বন্ধুটি আজিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "বিশেষ ভয় নাই তবে খুব সাবধান হওয়া দরকার। বুকে একটা মালিশ ও সেক দিতে হইবে।" মণিয়ার মা ঔষধ খাওয়ায়, বুকে মালিশ করে, কিন্তু সেক দিবার সময় একা একা পারে না। পরেশকে গিয়া বসিতে হয়। সে আগুনের উপরে গরম ফ্লানেলের টুকরা ধরিয়া গরম করিয়া মনিয়ার মার হাতে দেয়, মনিয়ার মা বুকে চাপিয়া ধরে।

স্বামীটি এখনও ফিরে নাই, একটা খবর পর্য্যন্ত দেয় নাই। পরেশ মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেছিল— একবার তাহাকে পাইলে হয়। খুব ভাল করিয়া দিবে শুনাইয়া। দায়িত্ব লইতে যদি না পারে, তবে বিবাহ করা কেন?

আহা! তাহারা না থাকিলে মেয়েটির কি হইত কে জানে? তবু যা হোক মণিয়ার মা আছে বলিয়া রক্ষা— তাহা না হইলে তাহার যে কি বিপদ হইত। মেয়েটিকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে এ কয়দিন সে বড় একটা যায় নাই, কারণ ওসব মণিয়ার মা-ই করে। পরেশ এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে বড়-একটা আসে নাই। কাজেই তাহার এত সঙ্কোচ হয় যে সে তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। এমন কি এ কয়দিনে এই অসুস্থ মেয়েটির মুখের দিকেও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারে নাই।

অসুখ যতটা মনে করা গিয়াছিল ততটা বাড়িল না, চার-পাঁচ দিন পরেই ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিল। সে-দিন সকালে মণিয়ার মা যেন কোথায় গিয়াছে, বউটি একা একা বিছানায় পড়িয়া ছিল। এমন সময় পরেশ আসিল অবস্থার কথা শুনিতে, সে ডাক্তারের কাছে যাইবে। কিন্তু মণিয়ার মাকে না পাইয়া সে ঘরে যাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল।

এমন সময় বউটি ডাকিল—নানী নানী ও নানী!

পরেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কাকে ডাকছেন, মণিয়ার মাকে ত দেখছি না, কোথায় যেন গেছে।

বউটি পরেশকে দেখিয়া কোন রকমে কাপড়ের একটা কোণ তুলিয়া লইয়া মাথার উপরে একটু আবরণ টানিয়া দিল। পরেশ বলিল, "চাচ্ছিলেন কিছু?" "হাঁ, একটু জল।" "আচ্ছা দিচ্ছি।" বলিয়া পরেশ একটা কাপ্ লইয়া এদিক-ওদিক করিতে লাগিল। মেয়েটি বলিল, "ঐ যে ঐ কোণে একটা কুঁজোয় জল আছে।" পরেশ কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া কাপটি মেয়েটির হাতে তুলিয়া দিল। এতক্ষণ পরে এইবার সাহস করিয়া পরেশ মেয়েটির মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে পারিল।

মুখখানি পরেশের নিকট বড় করুণ—বড় সুন্দর লাগিল। মেয়েদের মুখ যে এত সুন্দর, তাহাতে যে একটা আকর্ষণী শক্তি থাকিতে পারে তাহা পরেশ জানিত না।

তাহার বয়স এই ছাব্বিশ বৎসর। যৌবন আসিয়া তাহার দেহ ও মনকে নাড়া দিয়াছে, তাহার শত বাসনা, তাহার অভাব ও ক্ষুধা পরেশের মনকেও যে পীড়িত না করিয়াছে এমন নয়। কিন্তু নারী যে এই অবস্থাটায় মানুষের মনকে কত দূর বিভ্রমে টানিয়া লইতে পারে, সে খেয়াল তাহার কোন দিনই ছিল না।

এই রুগ্ন মেয়েটির রূপ তাহার প্রবৃত্তি ও লালসাকে উলঙ্গ করিয়া জাগাইয়া তোলে নাই সত্য, কিন্তু মানুষের যে অভাববোধ চিরন্তনী তাহাকেই সে জাগাইয়াছে। যৌবনে মানুষ সঙ্গী চায়, ভাগাভাগি করিয়া জীবনটাকে বহন করিয়া চলিতে চায়—অর্দ্ধাঙ্গিনী চায়! তাই একাকীত্ব মানুষের নিকট লক্ষ্মীছাড়ার নামান্তর। মানুষ যেদিন প্রথম ঘর বাঁধিতে শিখিল, সেদিন প্রথম সে চাহিয়াছিল নারী, তার পর পুত্র-কন্যা-পরিপূর্ণ সংসার।

আবার নারীই প্রথম উচ্ছৃঙ্খল পুরুষকে—উদাসীন পুরুষকে—শৃঙ্খলায় আনিয়া গৃহবাসী সংসারী করিয়া নিজে সেই পরিপূর্ণ সংসারের সম্রাজ্ঞী হইয়া বসিয়াছে। কয়েক দিন হইল মেয়েটি অন্নপথ্য করিয়াছে। এ কয়দিন পরেশই তাহাকে দুটি মাছের ঝোল ভাত রান্না করিয়া দিয়াছে।

সেদিন সকালবেলা পরেশ রান্না চড়াইয়া দিয়া কলতলায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখে মেয়েটি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার চড়ান ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিয়া ঘুঁটিতেছে। পরেশ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল—"এ কি অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনাকে বাইরে আসতে কে বলল?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আপনার কিন্তু ভয় নাই, আমি ভাল জাতের মেয়ে—আমার হাতে খেলে জাত যাবে না।"

পরেশ হাসিয়া ফেলিল, "বেশ, সে কথা কে বলছে বলুন ত? জাত আমার কারু হাতে খেলেই যায় না। কিন্তু আপনার যে অসুখ!"

—মেয়েমানুষের আবার অসুখ! পাড়াগায়ের বাড়ীতে হ'লে এত দিন কবে ঘর নিকুতে বাসন ধুতে লেগে যেতাম। তা ছাড়া আমি ত এখন ভাল হয়ে গেছি।

—কে বলেছে আপনি ভাল হয়ে গেছেন? ডাক্তার বলেছে আরও—

মেয়েটি বাধা দিয়া বলিল, "ডাক্তারেরা ওরকম ব'লে থাকেন। কিন্তু আপনার লজ্জা করে না?"

পরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন?

—আপনি আমার চেয়ে কত বড়—কেমন বড় নন্?

—তা সাত-আট বছরের বড় হব বইকি?

—তবে যে আমাকে আপনি ব'লে ডাকেন—তুমি বলতে পারেন না?

পরেশ এবার হাসিয়া বলিল, "ওঃ এই কথা—বেশ এখন থেকে তাই বলব।"

—আমিও বলব, পরেশ-দা—কেমন?"

—বেশ তাতেও রাজী। কিন্তু মালতী তুমি এখন উনুনের কাছ থেকে উঠে এস, আমি ভাতটা নামিয়ে ফেলি।

মালতী হাসিয়া বলিল, "বাঃ এবার দেখছি ডবল প্রমেশন। আপনি থেকে তুমি—তার পর আবার মালতী! ডবল প্রমোশন"

—তুমি ইংরেজী জান মালতী?

—হেঁ, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা আবার ইংরেজী জানে।

—না, তুমি লেখাপড়া বোধ হয় ভালই জান।

—বেশ আপনি যদি মনে করেন ভালই।

একটু পরে পরেশ বলিল—তোমাকে ক'দিন ধ'রে একটা কথা বলবো বলবো করছি মালতী।

মালতী উৎসুক নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইল,—কি কথা!

—আজ বার-চোদ্দ দিন তোমার স্বামীর দেখা নাই, লোকটা কোথায় গেল কি হ'ল কিছুই ত বুঝছি না—সে দিন মণিয়ার মা বলেছিল তোমাকেও নাকি কিছু ব'লে যায় নি। এদিকে তোমাকেও ত সেজন্য তেমন চিন্তিত মনে হয় না। তোমার এত বড় অসুখ গেল—মণিয়ার মা না থাকলে কি হ'ত বল ত? কিন্তু সেজন্যে তোমাকে এক দিনের জন্যও একটু ভয় পেতে দেখলাম না।

—মণিয়ার মা উপলক্ষমাত্র। ভগবান্ আমার ভয় নিবারণ করেছেন আপনাকে পাঠিয়ে। কিন্তু আপনি ত বেশ—আমি অসুস্থ মানুষ আর কতক্ষণ এমনি আগুনের কাছে বসে থাকবো বলুন ত—রইল আপনার ভাত—ধ'রে যাবে দেখবেন।—বলিয়াই মালতী সকল প্রশ্ন এড়াইয়া ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পরেশ কতক্ষণ তাহার দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া রান্নায় মন দিল।

আরও পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। মালতী পরেশের হেঁসেল বুঝিয়া লইয়াছে। তাহাকে আর পাকের ত্রিসীমানায়ও আসিতে দেয় না। পরেশের ভালই হইয়াছে। সে আরাম করিয়া দিবানিদ্রা দিয়া ও রাত-দিন খাতা কলম লইয়া সাহিত্যচর্চ্চায় দিন কাটাইতেছে।

সেদিন সকালে মেয়েটি ঘরের এক পাশে রান্না চড়াইয়া দিয়াছে—পরেশ নিজের খাটের উপরে কি যেন একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল এমন সময় মালতীর মুখের দিকে তাহার নজর পড়িল। মালতীর মাথার কাপড় প্রায় ঘাড়ের কাছে নামিয়া আসিয়াছে—সিঁথি ও গুচ্ছগুচ্ছ চুল একেবারে আবরণহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কাল বোধ হয় সে পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়াছিল, আজিও তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাহার সিঁথির উপরে নজর পড়িতেই পরেশের মন কেমন করিয়া উঠিল। —সেখানে সিঁদুরের রেখা মাত্র নাই, সিন্দুর-রেখা বাঙালী হিন্দুর নিকট স্বামীর মঙ্গলের চিহ্ন। ইহা তাহাদের মজ্জাগত সংস্কার। সিন্দুরবিহীন সমস্ত কেশবিন্যাস পরেশের নিকট শ্রীহীন মনে হইল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মালতী, তুমি বলতো ধীরেনবাবু কোথায় চাকরি করেন। আমি এখনই যাচ্ছি একবার খোঁজ ক'রে আসি। এমনি চুপচাপ ক'রে থাকা ত ভাল দেখায় না।" বলিয়া পরেশ উঠিয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে মালতীর মুখ বোধ হয় বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—পরেশ-দা আপনি কি পাগল হলেন নাকি? এখন কোথায় পাবেন তাকে খুঁজে? তা ছাড়া সে কোথায় কাজ করে সে ঠিকানাও আমি জানি নে।

—তার মানে? তোমার ভয় করে না মালতী!

—কিসের ভয়? এখন দুটো ভাতের ভয় এই ত? কিন্তু যিনি আমাকে এত বড় একটা অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলেন, তিনি দুটো ভাতের যোগাড়ও ক'রে দিতে পারবেন। আর বেলা করবেন না—এখন স্নান করতে যান—আমার রান্না হয়ে এল।

—কিন্তু তুমি কি তোমার স্বামীর আর খোঁজ করতে চাও না মালতী?

—না, খোঁজ করলেও বোধ হয় তাকে আর পাওয়া যাবে না।

—আর পাওয়া যাবে না?

—না।

—তার মানে?

—আমি আর কিছু জানি নে যান, বলিয়া মালতী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ ব্যাপারটির বিন্দু-বিসর্গও ধারণায় আনিতে পারিল না।

বিকেলের দিকে পরেশ যখন বেড়াইয়া ফিরিতেছিল, তখন দেখে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাদের ঘরের সম্মুখে রাস্তার উপরে বাড়ীর নম্বর খুঁজিতেছেন। পরেশকে বস্তির ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটি ডাকিলেন, "মশায় একটু শুনবেন?" পরেশ ফিরিয়া বলিল, কেন?

—আপনি কি এখানে থাকেন?

—হাঁ।

—এটা কি চব্বিশ নম্বর?

—হাঁ, এই সবটাই চব্বিশ নম্বর।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে, ভিতরে আসতে পারি?

—বেশ আসুন।

লোকটি আসিয়া পরেশের খাটের উপরে বসিয়া পড়িলেন।

পরেশ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলতে চান?

বৃদ্ধলোকটি একবার বড় করিয়া শ্বাস টানিয়া লইয়া, ভাল করিয়া একটু পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিলেন—হাঁ বলছি—উঃ পা-দুটো একেবারে ধরে গেছে, সেই কখন থেকে পথে পথে ঘুরছি, একে এই বুড়ো বয়েস তাতে বাতের শরীর। বসো বাবাজী বসো, তুমি বললাম কিছু মনে করো না যেন।"

"না না, মনে আবার করব কি?" এই বলিয়া পরেশ বৃদ্ধের পাশে বসিল। পরে বৃদ্ধ গলা একটু খাট করিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবাজী, এখানে ধীরেন দাস নাম ক'রে কেউ থাকে? নৈহাটীর ওদিকে বাড়ী, অল্প দিন হ'ল এসেছে।"

—ধীরেন? ধীরেন দাস? চেহারা কেমন বলুন ত?

—লম্বা ঢেঙ্গা চেহারা—রং ফর্সা, কপালের উপরে আড়াআড়ি ভাবে একটা কাটা দাগ আছে।

মালতীর স্বামীর নাম ধীরেনবাবু পরেশ জানিত, এখন মনে পড়িয়া গেল—সেই ত তাহা হইলে—তাহার কপালের উপরে এমন একটা কাটা দাগ আছে যাহা তাহার মুখের দিকে চাহিলেই সকলের নজরে পড়িবে। পরেশকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—তবে তোমাকে খুলেই বলি বাবাজী—সে এই হতভাগারই সন্তান। মালতী নামে বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে আজ মাসখানেক হ'ল গৃহত্যাগ করেছে। আমি ভাবলেম ও-ছেলের আর মুখ দর্শন করব না—মরুগ গিয়ে যেখানে খুশী। কিন্তু এখনও যে সে হতভাগার মার মৃত্যু হয় নাই—তার জন্তেই ত শেষকালে বৃদ্ধ বয়সে এই পথে পথে ঘুরে মরছি—আমার এক আত্মীয় খবর দিয়েছেন সে নাকি এই ঠিকানায় থাকে।

ধীরেন দাস, তাহার চেহারার বর্ণনা, মালতী,—না

আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পরেশের সমস্ত চিন্তা-শক্তি সহসা যেন ওলটপালট হইয়া গেল। মালতী,—এই কয়েক দিনের পরিচয়ে মেয়েটিকে সে মনে মনে কত না ভালবাসিয়াছে—তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গী—তাহার সারল্য পরেশের প্রাণে একটা অনাস্বাদিত নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। আর সেই মালতী এই—এত নীচ!

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন—তুমি যদি একটু খোঁজ ক'রে দেখতে বাবাজী, তবে বড় উপকৃত হতাম।

পরেশ কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—এ বস্তীতে কত লোক থাকে তার ত ঠিকানা নাই—আপনি বরং কাল একবার আসবেন আমি খোঁজ নিয়ে রাখব। পরেশ মালতীর মুখ হইতে একবার তাহার নিজের পরিচয় শুনিয়া লইতে চায়। তার আগে কোন কথা বলা হয়ত তাহার ঠিক হইবে না। এই চিন্তাই সে করিল।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ বিদায় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ সহসা পরেশের সকল উৎসাহ, সকল আনন্দ যেন কোথায় উড়িয়া গেল।

মালতী ভাল হোক, মন্দ হোক, তাহার কি? কয়-দিনের পরিচয়—সে পরিচয়ের দাবীই বা কতটুকু! কিন্তু কেন যে তাহার মন এমন খারাপ হইয়া গেল তাহা পরেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মানুষ যাহাকে ভালবাসে, সে হীন নীচ, তাহা ভাবিতে পারে না—স্বীকার করিতে কষ্ট পায়।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, মালতী পরেশের ঘরে আসিয়া বাতিটি জ্বালিয়া দিতেই পরেশের উপরে তাহার নজর পড়িল,—এ কি এমন একলাটি অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। আমি ভাবলেম আপনি বুঝি এখনও ফেরেন নি।

পরেশ কি জবাব দিবে সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না।—"এ কি চুপ ক'রে রইলেন যে—মুখে কথা নাই কেন? শরীর ভাল আছে ত?" মালতী পরেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরেশ ক্ষণকাল চোখ তুলিয়া মালতীর দিকে তাকাইল, তার পর বলিল—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মালতী, বল সত্য বলবে!

—বাপ রে আপনি যে-পরিমাণ গম্ভীর হ'য়ে ভূমিকা করছেন, তাতে ব্যাপারটি যে খুব গুরুতর এতে আর সন্দেহ নেই। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে। বলিয়া মালতী হাসিয়া ফেলিল।

পরেশ বলিল, "হাসির কথা নয় মালতী, ব্যাপারটি সত্যই গুরুতর, শুনলে তোমার হাসি এক মুহূর্ত্তে নিবে যাবে।" কিন্তু তবু মালতীর হাস্যোচ্ছল তরল কণ্ঠ নীরব হইল না। সহসা পরেশ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা মালতী, সত্য বল ত—ধীরেনবাবু কি তোমার স্বামী?

এ প্রশ্ন মালতী আশা করে নাই। কিছুক্ষণ পরে বিহ্বলতা কাটাইয়া লইয়া বলিল, "তা বেশ আমার পরিচয় এক দিন আপনাকে দেব দেব মনে কচ্ছিলাম—আজই শুনুন—তার পর ঘৃণা-প্রশংসা সে আপনার অভিরুচি। ধীরেনবাবু আমার স্বামী নন সত্যি। আমাদের বাড়ী নৈহাটী। ধীরেনবাবু আমার প্রতিবেশী, কিন্তু অনেক দিন থেকেই কলকাতায় থাকেন। অনেক দিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়। তার পর হঠাৎ সে সম্বন্ধ ভেঙে যায়। বাবা এক ষাট বছরের বুড়োর কাছ থেকে তিন-শো টাকা ঘুষ খেয়ে আমাকে দিতে গেলেন তারই হাতে সঁপে। আমার মা নাই পরেশ-দা—মা থাকলে এমনি কখনও হ'তে পারত না। আমি কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না কি করব। এক বার ভাবছিলাম আফিং খেয়ে মরি, আর এক বার ভাবছিলাম জলে ডুবে মরি, কিন্তু মরবো বললেই ত আর মরা যায় না। এমন সময় এক দিন ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। ধীরেনবাবু বললেন—মালতী চল, আমরা পালিয়ে যাই কলকাতায়। সেখানে আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে সংসার করতে থাকব। কেউ আর আমাদের খোঁজ পাবে না। পরে কিছু দিন গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বিয়ে হ'লে আর লোকলজ্জার কিছু থাকবে না। অনেক ভেবে শেষে ধীরেনবাবুর কথায়ই সম্মত হলাম। বিয়ের তিন দিন আগে এলাম আমরা কলকাতায় পালিয়ে। ভাবছেন ধীরেনবাবুকে আমি ভালবাসতাম কি না! ভাল-বাসতাম কি না-বাসতাম তা এখন ঠিক ক'রে বলতে পারব না। হয়ত বাসতাম, হয়ত বাসতাম না। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডটিও যে বড় অবলম্বন! কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো কলকাতায় এসে। আসলে বিয়ে করতে তার ইচ্ছে ছিল না। স্বভাব-চরিত্রও তার ভাল নয়। সে চেয়েছিল আমার সর্ব্বনাশ করতে। কিন্তু পরেশ-দা তুমি কি বিশ্বাস করবে? বলিয়া তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে ছোট একখানা ছোরা বাহির করিয়া পরেশের সম্মুখে ধরিল। এরই ভরসায় আমি বাড়ী ছেড়ে অচেনা অজানা পথে পা বাড়িয়েছিলাম। সেদিন যখন ধীরেনবাবু জোর করতে এল তখন এরই ইঞ্চি-দুই তার হাতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে ত তিনি

আর এখানে আসেন না। যদি সেদিন এই রক্ষক আমায় না বাঁচাত তাহলে আজ হয়ত মালতী ব'লে কেউ থাকত না। লোকে আমায় যাই মনে করুক, আমি কিন্তু জানি অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করে নি।" কথা শেষ করিয়া মালতী পরেশের মুখের দিকে তাকাইল। পরেশ বিহ্বলের মত তাকাইয়া ছিল।

মালতী বলিল—পরেশ-দা, আমার বিচার আপনার উপরে রইল, আমি ন্যায় করেছি কি অন্যায় করেছি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

পরেশ বলিল—আজ নয় মালতী—আজ আমি কিছুই বলতে পারব না। সমস্ত ব্যাপারটা আমায় ভাল ক'রে ভাবতে দাও। ক্রমশঃ

রাজহংস উড়ে গেল মানসের পারে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রাজহংস উড়ে গেল মানসের পারে।
এসেছিল প্রভাতের আলো-অন্ধকারে
কোন্ দূর হতে বহি' পক্ষপুটে তার
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রবাহ ঝংকার ;
ডেকে ডেকে জাগাইল নরনারী সবে
আলোর আনন্দ-লুটে প্রভাত-উৎসবে।
চলে আর বলে যেন মরাল গমনে—
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।
যাত্রা তার হ'ল শুরু কত দেশে দেশে
কত-সে দশার্ণ ঘাট, মাঠ বন শেষে—
ভেসে চলে রাজহংস, আলো-ছায়া লেগে
সোনার তরীটি যেন চলে বায়ুবেগে।
কত উচ্চ জনপদ, কত হাটঘাট,
ছেড়ে কথা-কাহিনীর কত রাজ্যপাট,
ক্রমে আসে সমতলে নিরালা পল্বলে ;
সুবিচিত্রা পল্লীগ্রাম হরিতে শ্যামলে
শোভা পায়, দেখে তার নরনারী ক'টি
ছোট ভাই নিয়ে ঘাটে দিদি মাজে ঘটি।
চলে রাজহংস তীরে জাগায়ে কল্পনা ;
শোনে কোনো রসিকের ক্ষণিক জল্পনা,
মনে মনে জাগে কারো সুদূর স্মরণ ;
গতিভঙ্গে পিছে তার রেখে সে মরণ—
সম্মুখে জীবনে পশে শিশুর হরষে ;
নৃত্যে গানে খেয়া জমে সুদূর দরশে।
ক্রমে শোনে সাগরের বিপুল আহ্বান,
নিখিল প্রাণের স্বাদে উদ্বেলিত প্রাণ,—
ঘাটে ঘাটে যাত্রা সারে ; জাগায়ে বিস্ময়
দৃষ্টিতে মিশায়ে নেয় হাসি অশ্রুময়
দ্বন্দ্ব-সম্মিলনে ক্ষুব্ধ জীবলীলাচ্ছবি,
প্রকৃতি, ভাণ্ডার খুলে ধ'রে রত্ন সবি—
ছয়টি ঋতুর দানে,—জমা দিনে দিনে
তৃণে পুষ্পে স্পর্শ তার, হংস নেয় চিনে'।
ধূলিতে আকাশে জলে করে সে বিহার,
উড়ে চলে মেরুদেশে, জমেছে নীহার
যেথা ; যায় পূর্বে ও পশ্চিমে হেথাহোথা ;
যতই ফুরায় পথ বাড়ে যে আরো তা।
দিনের আলোক ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ,
পুরবীর ছন্দে শেষ রাগিণীর বীণ
বাজে,—শুনে' রাজহংস চায় ফিরে ফিরে,
মনে পড়ে যায় বুঝি মানসের নীরে
মুক্তির অবাধ লীলা,—কোন্ পদ্মবন,—
সুধাগন্ধে আমোদিত সকল ভুবন !
পরিশেষে ফিরে গতি, পুনশ্চ গতিতে
আবার সে সামান্যের স্বাদ নিতে নিতে
একটি মানুষ দেখে, কোপাইতে নামে,
শ্যামলী ধরায় মজে বিহার-আরামে।
পত্রপুটে ঝিলিমিলি দিগন্তের সোনা,
লেগেও বা থাকে কিছু আবর্জনা লোনা
মাটির সংস্পর্শে এসে ; জলকাদা-ছোঁয়া
মালিন্য যা জমে, সব হয়ে যায় ধোয়া
দিন প্রান্তিকের সেই স্বর্ণআলো-স্নানে ;
নাগিনীরা নেমে আসে আঁধারের টানে ;
তারি মাঝে সেঁজুতির আলোটুকু জলে
শঙ্খ সানাই বাজে, মিলে অস্তাচলে
সৌর শেষলেখা,—পক্ষে আভা নিয়ে তার
উড়ে গেল রাজহংস, শুভ্র, লঘুভার॥

বর্তমান শিল্পে শ্রমিক ও তাহার মনস্তত্ত্ব

শ্রীশান্তি দেবী, বি-এ

অক্ষমকে ক্ষমতাবানের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেই হইবে, প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এই নিয়মবশতই যুগে যুগে কত প্রাণীর বিনাশ এবং উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসারেই মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার অবস্থার উন্নতি করিয়া জীবনযুদ্ধে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ আমরা সভ্যতার এমন এক সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছি যাহা আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্পনার অতীত ছিল।

বিজ্ঞানই এই কল্পনাতীত পরিবর্তনের বাহক। সে-ই আনিয়াছে নব নব বিরাট্ আবিষ্কার যাহার দ্বারা কত বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং এখনও প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। বাষ্পচালিত জাহাজ ও ট্রেন এবং বিদ্যুৎচালিত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ক্রমে দূরকে নিকট করিয়া এক বিরাট্ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সৃষ্টির সূচনা করিল। অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাইবার ও সংবাদ আদান-প্রদান করিবার এই সহজ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে লাগিল। কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা শতগুণে বাড়িয়া গেল, গ্রাম্য কৃষক এবং শিল্পী দেখিল তাহার সম্মুখে এক বিরাট্ ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে; তখন কি করিয়া বেশী জিনিস তৈয়ারী করিবে ইহাই হইল তাহাদের ভাবিবার বিষয়। আবার বিজ্ঞান আসিল তাহার নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে। তখন অনুসন্ধান চলিতে লাগিল প্রকৃতি কোন্ দেশে, কোথায় কি সম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াছে। ধনী ব্যক্তিগণ লাভের আশায় তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনরাশি ঐ সব কার্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, এক নূতন যুগের উদয় সম্ভাবনায় আকাশ লাল হইয়াছে—ইহাই শিল্প-বিপ্লব যুগের সূচনা। ক্রমশঃ জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি ছাড়া আরও অনেক সখের জিনিস প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমাদের জীবন হইয়া উঠিল আরামপ্রদ কিন্তু জটিল। বর্তমান শিল্পের যুগে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশই শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে সংযুক্ত। বহু লোকের এক নূতন ধরণের জীবনযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে কারখানা-জীবন বলা যাইতে পারে।

উত্তরোত্তর শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কল-কারখানাগুলির উৎপাদন-শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজন হইল। টেলর, গ্যাণ্ট, ইমার্সন, গিলব্রেথ প্রভৃতি মার্কিন মনীষিগণ এই ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন; এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ কারখানাগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে জিনিস তৈয়ারী করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহারা বুঝিলেন ইহার একটা সীমা আছে। কারণ বর্তমান শিল্প বহুলাংশে যন্ত্রের উপর নির্ভর করিলেও সর্বাংশে করে না। ইহারও মূলে রহিয়াছে মানুষ। এই মানুষের কথাটা চিন্তা না করিলে যন্ত্র যত উন্নত প্রকারেরই হোক এবং তাহাকে চালাইবার পদ্ধতি যত অভিনবই হোক্ না কেন, তাহার সম্পূর্ণ সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না। এই জন্যই শিল্পজগতে আর একটি নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হইল—"শ্রমিকের মনস্তত্ত্বের অনুশীলন এবং শিল্পপরিচালনায় তাহার প্রয়োগ।"

প্রথমে যখন শ্রমিকগণ মালিকদের ক্রীতদাস ছিল এবং তাহার পরেও যখন গর্বিত মালিকগণ তাহাদের সামান্য বেতনপ্রত্যাশী জন্তুমাত্র মনে করিতেন, তখন এ বিষয়টি কোন আমল পায় নাই। বিশেষজ্ঞগণের গভীর চিন্তা-প্রসূত কোন পরামর্শই দম্ভভরা মালিকগণ কানে তুলিতেন না। পরিবর্তনের সকল আবেদনই প্রত্যাখ্যাত হইত। কিন্তু অবস্থা বদলাইতে লাগিল। নূতন মালিক আসিয়া পুরাতনের জায়গায় বসিতে লাগিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন যে শ্রমিকগণ যন্ত্রের অংশ মাত্র নহে, তাহারাও মানুষ। তাহাদের মনকেও সাধারণ সুখ-দুঃখ দোলা দিয়া যায়। তখন তাঁহারা বিশেষজ্ঞগণের মতামতের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। ইহার ফলে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের হিতসাধন উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইন্‌ডাসট্রিয়াল সাইকোলজি ইহাদের অন্যতম। ক্রমে এই বিষয়টি শুধু শিল্পের সহিত সম্বন্ধযুক্ত লোকেরই নহে, অন্যান্য বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি-

গণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। চার্লি চ্যাপলিন কয়েক বৎসর ব্যাপী বহু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার "মডার্ন টাইমস" নামক ফিল্মে দেখাইলেন, মানুষের মনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বিরাট্ কারখানায় যেসব বিরাট্ যন্ত্রদানব অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে চলিতে মানুষের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়।

কারখানা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি তাহার অভ্যন্তরস্থ কলকব্জাগুলিকে—শ্রমিকদের কথাটা আমাদের কাছে হয় গৌণ। কিন্তু কারখানায় নির্বিবাদে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করিতে গেলে শুধু তাহার যন্ত্রের উন্নতি নহে, তাহার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা আনয়ন করা সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শ্রমিকদের ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে তাহাদেরও অংশ আছে, এবং তাহাদের সুখ-সুবিধার প্রতি মালিকের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইহাতে তাহাদের মন সুস্থির হয় এবং তাহারা কার্যে প্রেরণা পায়। ইহার অভাবই ধর্মঘট এবং ঐ প্রকার সকল গণ্ডগোলের মূল। শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে কি চাহে তাহা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ গসলিঙের (Mr. Gosling) অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি হইতে বুঝা যায়—

"We workmen do not ask that we should be admitted to any share in what is essentially the employer's own business, that is in those matters that do not concern us directly, in the industry or employment in which we may be engaged. We do not seek to sit on the Board of Directors or to interfere with the buying of materials or of selling the product. But in the daily management of the employment in which we spend our working lives, in the atmosphere, and under the conditions in which we have to work, in the conditions of remuneration, and even in the manners and practices of the foreman with whom we have to be in contact, in all these matters, we as workmen, have a right to a voice—even to an equal voice with the management itself.

মর্মার্থ:—যে প্রতিষ্ঠানের কার্যে আমরা নিযুক্ত আছি তাহার এমন সব ব্যাপার যাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই যাহা মালিকের একান্ত নিজস্ব বিষয়, তাহার কোন অংশ লইবার অধিকার, আমরা শ্রমিকগণ, দাবী করি না। আমরা পরিচালকমণ্ডলীর আসনে বসিতে বা উপাদান ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু যে কর্মে আমরা কর্মজীবন অতিবাহিত করি তাহার আবহাওয়া এবং অবস্থা, তাহার ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা, এমন কি যে কর্মচারীর সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট তাহার আচার-ব্যবহার, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা অনুভব করি শ্রমিক হিসাবে আমাদের কথা বলিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার কর্তৃপক্ষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

শ্রমিকদের সন্তোষের জন্য কি কি প্রয়োজন তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া যাক্।

১। বিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার মত উপার্জন।

২। যুক্তিসঙ্গত ও নির্দিষ্ট কর্মক্ষণ।

৩। তাহাদের দুর্ঘটনাপূর্ণ অনিশ্চিত কর্মজীবনের এবং কর্মান্তে গ্রাসাচ্ছাদনের মত কিছু সংস্থান।

৪। যে শিল্পে তাহারা নিযুক্ত আছে তাহার আর্থিক লাভের একটা ন্যায্য অংশ।

ইহার কতকগুলি এখন গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন (Workmen's Compensation Act ও Factory Rules Act) এবং আজকালকার প্রায় সকল কারখানায় মালিকগণই তাঁহাদের লভ্যের কিছু অংশ শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, ডাক্তারী সাহায্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু মুশকিল হয় ছোটখাট মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাপারগুলি লইয়া যেগুলি তুচ্ছজ্ঞানে একেবারে উপেক্ষিত হয়। যদিও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় এইগুলিই হইতেছে সুচারুরূপে কার্য আদায় করিবার প্রধান ও একমাত্র উপায়। মনস্তত্ত্বের আলোচনা যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ যে কত বিস্ময়কর, তাহা খুব কম লোকই অনুধাবন করিতে পারেন।

এই সকল "তুচ্ছ" বিষয়ের একটি হইতেছে, "কার্যের বৈচিত্র্যহীনতা এবং তজ্জাত বিরক্তি"। আধুনিক কারখানায় শ্রমিকদিগকে যে-সকল বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইতে হয় ইহা তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। আধুনিক কারখানাগুলি যেরূপ উন্নত ধরণের কলকব্জায় সমৃদ্ধ, তাহাতে সাধারণ শ্রমিকের নিজে মাথা খাটাইয়া করিবার কিছু থাকে না। সেও যেন যন্ত্রের একটি অংশ। এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে বৈচিত্র্য বা আনন্দ কিছুই নাই। এই সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবার অভিপ্রায়ে আজকালকার কোন কোন কারখানায় শ্রমিকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মনের উপযোগী কার্য করিতে দেওয়া হয়, ইহাতে সে সেই কার্যের দুরূহতা উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং দেখা গিয়াছে যে-কাজটি সর্বাপেক্ষা নীরস বলিয়া কুখ্যাত, তাহাতে এই নিয়মানুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন সরস কার্যের সহিত তাহার কার্য বদলাইতে চাহে না। এবং ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, এই রীতিতে লোক

নিযুক্ত করিলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।

এই সমস্যা সমাধানের আর একটি উপায় হইল কার্যের জন্য সুন্দর একটি আবেষ্টনীর সৃষ্টি করা। আত্মীয় অথবা বন্ধু শ্রমিকদের এক জায়গায় কাজ করিতে দেওয়া উচিত, ইহাতে তাহারা তাহাদের কষ্টসাধ্য ও বিরক্তিকর কার্যের ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্পগুজব করিয়া নূতন উৎসাহ লাভ করিতে পারে। এমন কি কারখানায় সর্বাপেক্ষা বিকট শব্দপূর্ণ অংশেও প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্য মাত্রই শ্রমিকের মনে উদ্যম সঞ্চার করে দেখা গিয়াছে। অবশ্য এই উপায়ে যাহাতে শ্রমিকগণ কাজে বিশেষ ফাঁকি না দেয় তাহার প্রতি তাহাদের উপরিস্থিত কর্মচারিগণ লক্ষ্য রাখিবেন।

কারখানায় ঘরগুলি দেখিতে সুন্দর হওয়া উচিত। সেগুলি করিবার সময় যেমন সুবিধার দিকটা দেখিতে হয়, তেমনি তাহার সৌন্দর্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যন্ত্ররাজের পূজায় যেন সুকুমার শিল্পকে একেবারে উপেক্ষা না করা হয়। উপযুক্ত আলো-বাতাসের অভাবে শুধু যে কাজেরই অসুবিধা হয় তাহা নহে, শ্রমিকের মনও তাহাতে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইয়া থাকে। উজ্জ্বল রঙের চিত্রাদি রাখা বেশ ভাল। যেখানে সম্ভব সেখানে ছোট ছোট গাছ ও ফুল সাজাইয়া রাখা উচিত। কারখানার মধ্যে রাস্তার ধারে বা তাহাদের সঙ্গমস্থলে ছোট একটু বাগান, ঝরণা বা ছোট পাহাড়ের মত করিয়া রাখিলে লোকের মন ভাল থাকে। এই ধরণের শিল্পসম্মত আবহাওয়ায় উপযুক্ত সুবিধা ছাড়া আরও একটি সুবিধা এই যে ইহাতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কারখানায় কাজ করিতে আকৃষ্ট হয়।

আর একটি কর্তব্য হইল কার্যকালে শ্রমিকদের ভাল আহার্যের বন্দোবস্ত করা। এই জন্য কারখানা দ্বারা পরিচালিত ক্যান্‌টিন্ বা হোটেল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শহরে রাস্তার ধারে যে তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল দেখিতে পাওয়া যায় এগুলি সেইরূপ হইলে চলিবে না। ইহাকে শুধু খাদ্যের দোকান মনে করিলে ভুল হইবে। ইহাকে এমন একটি জায়গা করিয়া তুলিতে হইবে যেখানে খাইতে আসিয়া শ্রমিক তাহার দেহে মনে নূতন বল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহার কার্যে ফিরিয়া যাইতে পারে। সকালের কাজে তাহার যে শক্তির ক্ষয় হইয়াছে তাহার যেন সম্যক্ পূরণ হয়। আবেষ্টনী হইবে কারখানা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুন্দর এবং আনন্দদায়ক, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। সাদা পরিষ্কার টেবিলে অল্প মূল্যে ভাল খাদ্য পরিবেষণ করিবে ভদ্র সুসজ্জিত পরিবেষক। শ্রমিক পরিশ্রমের বোঝা নামাইয়া দিয়া প্রফুল্ল হইবে।

ইহা ছাড়াও প্রত্যেক কারখানায় তাহার নিজস্ব ছোট-খাট অসুবিধা আছে, সেগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রতিবিধান করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি লক্ষ্য করিবার জন্য ডিসিপ্লিনারিয়ান নামে একটি বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়।

উর্দ্ধতন কর্মচারিগণ যাহাতে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধায় থাকিয়া আপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন কর্তৃপক্ষের সে-দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কিন্তু ইহাও অবিসংবাদিত সত্য যে, কাজে মনোযোগী যোগ্য শ্রমিক না পাইলে তাঁহারা নিরন্তর বাধা পাইয়া থাকেন এবং তাহাতে বিরক্ত হইয়া ভাল কাজ করিবার আশা ছাড়িয়া দেন। এই ভাবে দেখা যায় মানুষের মনের খুঁটিনাটি ব্যাপার শুধু শ্রমিকের সুখ-দুঃখের মধ্যেই নিবদ্ধ নাই; সমগ্র কারখানায় বিভিন্ন অংশের কার্যের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া শিল্পের উপর ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আমাদের ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে হয়ত ঐ সকল ব্যবস্থা কাহারও কাছে অসম্ভব বিলাসিতা ও বাহুল্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার যুগে জগতের মাঝে স্থান করিয়া লইতে হইলে আমাদের পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না। জামশেদজী টাটা-প্রতিষ্ঠিত এ দেশের সর্ববৃহৎ কারখানায় ঐরূপ কতকগুলি ব্যবস্থা কি ভাবে প্রযোজিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমে খাদ্যের কথা ধরা যাক্। বিরাট্ কারখানায় কোম্পানী-পরিচালিত চার-পাঁচটি হোটেল আছে। ব্যবসা করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, শ্রমিকদের যথাসম্ভব অল্প মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করাই তাহাদের লক্ষ্য। এই জন্য বাহিরের যে কোন দোকান অপেক্ষা তাহারা এখানে সস্তায় ভাল খাবার পাইয়া থাকে। এবং খাইবার জন্য তাহাদের কিছু অবসরও দেওয়া হয়।

কোন এক বিভাগে শ্রমিক রমণীদিগের সুবিধার্থে একটি বড় স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ তৈয়ারী হইয়াছে। মায়েরা কাজ করিতে আসিবার সময় শিশুদের লইয়া আসে ও ঐ গৃহে রাখিয়া দেয়। সেখানে একটি উচ্চ বেতনে নিযুক্ত নার্স তাহাদের তত্ত্বাবধান করে, তাহাদের জন্য কর্তৃপক্ষ দুধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মায়েরাও কার্যের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া তাহাদের স্তন্যপান করাইয়া যাইতে পারে।

কর্মাবসানে মায়েরা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্নানের জায়গায় স্নান করিয়া ছেলেকোলে গৃহে ফেরে। কারখানায় সকল বিভাগেই এখন এইরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইতেছে।

আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণ এবং তাহার কবল হইতে সহকর্মীকে উদ্ধারকার্যে শ্রমিকদের উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর একটি বিরাট্ প্রদর্শনী হইয়া থাকে। শ্রমিকরা উক্ত বিষয়ের ছবি আঁকিয়া ও মূর্তি গড়িয়া পুরস্কার পায়। ইহা ছাড়াও মাঝে মাঝে একটি "নো এ্যাকসিডেন্ট উইক" নির্ধারণ করা হয়। ঐ সপ্তাহে যে-বিভাগে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেই বিভাগের শ্রমিকদিগকে এক দিন সিনেমা দেখান হয়। ও সেই বিভাগকে একটি বড় রৌপ্যনির্মিত কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়।

আরও একটি সুন্দর নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি যে যন্ত্রে অথবা যন্ত্রের অংশে কার্য করে তাহার কোন উন্নতি সাধনের উপায় যদি তাহার মনে উদয় হয়, তবে সে তাহা লিখিয়া সেই স্থানে রক্ষিত একটি বাক্সে ফেলিয়া দিতে পারে। যে নিরক্ষর সে তাহার বক্তব্য সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা লিখাইয়া লইতে পারে। এই সব লেখাগুলি কর্তৃপক্ষের নিকট যায় এবং ইহার মধ্যে যেগুলি সত্যই কার্যকরী হয় তাহার উদ্ভাবক পুরস্কৃত হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক স্বেচ্ছায় কার্যে মনোযোগ দেয় এবং সে যে যন্ত্রের অংশমাত্র নহে তাহা ভাল ভাবে বুঝিতে পারে।

কর্তৃপক্ষের সৌন্দর্যের প্রতিও দৃষ্টি আছে, মাঝে মাঝে সুন্দর ফুলের বাগান, কৃত্রিম ঝরণা, পাহাড় প্রভৃতি চোখে পড়ে।

কোম্পানীর সাম্বৎসরিক লাভের একটা নির্দিষ্ট অংশ (Profit-sharing Bonus) ছোট বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক কর্মচারীকে দেওয়া হয়। আবার যাহারা বিপৎসঙ্কুল এবং শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা তাহাদের বেতনের অতিরিক্ত মাসিক বোনাস্ হিসাবে বেশ কিছু টাকা পাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রভিডেন্ট ফণ্ড ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা থাকায় কর্মাবসানে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তারও অনেকটা উপশম হয়।

কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদিগের জন্য বিনা ব্যয়ে ডাক্তার, ঔষধ, অল্প ভাড়ায় বাড়ী, অল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, শ্রমিকদের বাসস্থানের নিকটে মাঝে মাঝে বিনামূল্যে 'টকি শো' প্রদর্শন, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার প্রতি এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। শ্রমিকগণ সংখ্যায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যখন ক্রমশঃ সমাজের একটা অঙ্গবিশেষ হইয়া পড়িল তখন তাহাদের সর্বপ্রকার উন্নতি এখন শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, একান্ত আবশ্যক। যে-যুগে দেশের সকল লোকই তাহাদের ক্ষমতার উপযুক্ত এবং রুচিসম্মত কার্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং দিনান্তে অতি শ্রান্ত ও বিরক্ত না হইয়া ঘরে ফিরিবে, অবসর সময়টুকু আপন আপন ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের বিদ্যার সাধনায় নিয়োজিত করিবার মত শক্তি ও উদ্যম তাহাদের অবশিষ্ট থাকিবে এবং সুবিধাও পাইবে, আমরা সেই আনন্দময় যুগের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুক নেত্রে ভবিষ্যের পানে চাহিয়া থাকিব।

চিত্রভানু

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বেলা শেষের রবি—
চিত্রভানু নামটি তোমায় দিল সে কোন্ কবি।
ঠিক-সে ছবির মতো,—
বর্ণে বর্ণে বিচিত্রিত অস্ত-আকাশগত
তোমার সে-রূপখানি,—
দৃষ্টি হ'তে সুধা ক্ষরে,—হরে ধরার গ্লানি।

আধেক তোমার নয়নপাতে দূর ওপারের মায়া,-
আধেক চোখে মাটির টানের ছায়া।
অসীম যে তার সীমাহীনের অতল কালো বুক
মেলে দিয়ে ওপারে উৎসুক।
এই দিকেতে ছোট্ট সন্ধ্যামণি,—
মাটির হয়ে, পাপড়িতে লয় তোমার পরশমণি॥

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও নার্সিং

সিষ্টার তরু ঘোষ

পৃথিবীময় যুদ্ধের তাণ্ডবলীলার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন সেবা-শুশ্রূষার কথা স্বভাবতই আমাদের মনে হয়। পূর্ব্বে দেশময় শান্তির সময় না বুঝতে পারলেও আজকাল আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, সেবাধর্ম্ম স্ত্রীজনসুলভ সকল ধর্ম্ম হ'তেই উৎকৃষ্টতর এবং এই সেবাধর্ম্মের ভিতরেও স্ত্রীলোকেরা যে প্রয়োজনবোধে সময়বিশেষে অতি শক্ত হ'তে পারে তারও পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে ভাল নার্স হ'তে হ'লে চাই অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এবং বাইরের নম্র কোমল ব্যবহারের আবরণ দিয়ে ঢাকা মনের দৃঢ়তা। আজ যে-পর্য্যায়ে সেবাধর্ম্মকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কারণ খুঁজতে গেলেই আমাদের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে, তাঁকে আর্ম্মি মেডিক্যাল সারভিসের প্রতিষ্ঠাত্রী বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল হয়ত কোন মেয়ে সেবাধর্ম্মে দীক্ষিতা হ'তে চাইলে বড়জোর তার বাপ, মা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু যে-সময় ও যে-অবস্থার ভিতর এই মহিলা এই ব্রতকেই নিজের আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছিলেন তখন সমাজের কাছে এটি ছিল অতি ঘৃণ্য জিনিস। আজ থেকে শত বৎসর আগে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সময় মেয়েদের স্বাবলম্বিনী হওয়ার কথাই চিন্তার বাইরে ছিল এবং তখনকার দিনে নার্স বলতে বিশ্রী, কদাকার, অশিক্ষিতা, ছোট জাতের বৃদ্ধাই বোঝাত। কাজেই ফ্লোরেন্স স্বাবলম্বী হবে এই কথা শুনেই তাঁর পিতা-মাতা আঁৎকে উঠেছিলেন এবং যখন শুনতে পেলেন তিনি নার্সের জীবনকেই নিজের আদর্শ ক'রে নিতে চাইছেন তখন তাঁদের ভয়ের সীমা ছিল না। ফ্লোরেন্স যখন সল্সবেরী হাসপাতালে কয়েক মাস শিক্ষানবিশীর জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পৃথিবীময় সেবাব্রতী ভগ্নীদের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, তখন সকলের কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদই হ'তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে প্রেরণা ছিল তা-ই তাঁকে শত বাধা-বিঘ্নের ভিতরেও অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত ক'রে তুলত। বাহ্যদৃষ্টিতে ফ্লোরেন্স চমৎকার "সোসাইটি গার্ল" ছিলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর মনে ছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞান, হাসপাতাল এবং সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য জানবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলতা।

ফ্লোরেন্সের ভিতর স্ত্রীচরিত্রসুলভ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ই জাগ্রত ছিল এবং তিনি ভালবাসায়ও পড়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি সুন্দর একটি সংসারও গড়তে পারতেন, কিন্তু তিনি ভালবাসার পথকে গ্রহণ না ক'রে ভিন্ন পথে চলতে সুরু করলেন। ভবিষ্যতের সুনাম, যশ—এ সবের আশা নিয়ে তিনি তখনকার দিনের ঘৃণ্য নার্সিং-জগতে নেমে আসেন নি। সময় সময় তিনি কত দূর হতাশ হয়ে পড়তেন তার পরিচয় তাঁরই লেখা ডায়েরীর একটি পংক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি। তিনি তাঁর ডায়েরীতে এক জায়গায় লিখেছিলেন—"আমার এই একত্রিশ বৎসর বয়সে আমি মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই বরণীয় ব'লে মনে করি না।" এর পরেও তিন বৎসর কেটে গেলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তিনি স্বমতে আনতে পেরেছিলেন এবং চৌত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি হার্লি ষ্ট্রীটে একটি নার্সিং-হোমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন।

এখানে ঠিক এক বৎসর থাকতে-না-থাকতেই ক্রীমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সর্ব্বত্যাগী সাধনার ক্ষেত্র উপস্থিত দেখে তিনি বালাক্লাভার যুদ্ধ এবং লাইট্ ব্রিগেডের আক্রমণের ঠিক দশ দিন পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর তারিখে স্কুটারীর হাসপাতালে এসে পৌছলেন।

স্কুটারীতে এসে তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি দেখলেন ব্রিটিশ সেনামণ্ডলীর মেডিক্যাল অর্গানাইজেশন্ ভেঙে গেছে। আর্ত্ত, পীড়িত, সৈনিকের চিকিৎসা বা শুশ্রূষার দিকে কারও নজর নেই। সেবা-শুশ্রূষার জিনিসপত্রেরও দারুন অভাব—আবহাওয়াও অতি জঘন্য। এর ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অদম্য কর্ম্মশক্তি নিয়ে আমাদের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল—পুরুষসুলভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য সৈনিকদের—তাদের তৈরি ময়লা, নোংরা আবহাওয়ার ভিতর নারীসুলভ সর্ব্বকর্ম্মের সেরা সুকোমল সেবাধর্ম্মে দীক্ষিতা এই মহিলার যুদ্ধ চলল—তিনি পরিষ্কার করতে

সুরু করলেন সমস্ত জঞ্জাল—তাঁরই অনুগামিনী আধুনিক যুগের নার্স অর্থাৎ আমাদের জন্য একটি পরিষ্কার রাস্তা তৈরি করবার উদ্দেশ্যে।

জিনিসপত্রের অভাব অনটন এবং আর্ম্মি মেডিক্যাল বোর্ডের অবহেলার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের ব্যবহার ও দৃঢ়তার দ্বারা নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। বোর্ড বা কমীটি ফ্লোরেন্সের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হতেন বটে, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ও কাজ দেখে প্রতিবাদ করবার শক্তি কারও বিশেষ ছিল না। সেই সুবিধায় ফ্লোরেন্স আর্ত্তের খাদ্যের ও জামা-কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। কিন্তু এ সব গুণের জন্য তাঁকে 'লেডী উইথ্ দি ল্যাম্প' আখ্যা দেওয়া হয় নি। যখনই যেখানে কোন রোগীর অবস্থা অতি সঙ্গীন হ'য়ে পড়ত তিনি ঠিক সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থির, ধীর ভাবে রোগীর প্রাণে সাহস ও উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যবহারে অতি শীঘ্রই আর্ত্ত সৈনিকেরা তাঁকে সম্মানের চক্ষে দেখতে সুরু করলেন। নীরব নিস্তব্ধ ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে প্রদীপহস্তে তিনি যখন হেঁটে চলে যেতেন, তখন এই সমস্ত আর্ত্ত সৈনিক তাঁর ছায়ার উদ্দেশ্যে চুম্বন দ্বারা নিজেদের ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান জানাত। রোগীর নিকট তিনি স্থির ধীর বিশ্বাস নম্রতা ও দয়ার মূর্ত্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন অথচ উপরওয়ালাদের নিকট সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিচিতা হলেন—সবাই তাঁকে এক-গুঁয়ে বলেই চিনতে লাগল।

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁহার মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কারের মালা গলায় প'রে ইংলণ্ডে ফিরলেন এবং জগতের সবার কাছে "লেডী উইথ দি ল্যাম্প" এই আখ্যা লাভ করলেন।

এর পরেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন এবং নার্সিং-বিভাগের যত দূর সম্ভব উন্নতি ক'রে গেছেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে আমরা "লেডী উইথ দি ল্যাম্প" ভাবে দেখতে পাই, কিন্তু প্রকৃত প্রদীপ ছিল তাঁর অন্তরের ভিতরের কর্ম্মশক্তি ও অনুপ্রেরণা যার জন্য তিনি সামাজিক বাধা-বিঘ্নের ভিতর এগিয়ে পথ সুগম ক'রে দিতে পেরেছেন। আজ হাসপাতালে বা বাইরে যখনই যে কোন আর্ত্ত পীড়িতকে আমরা শুশ্রূষার দ্বারা একটু আরাম দিই, সেইখানেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অশরীরী শক্তি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের উৎসাহ দেয়।

আধুনিক নার্সিঙের সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ভিতর দিয়েই হয়েছে বলা যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ আবহাওয়া, নিদারুণ অভাব অনটন এবং স্বনামধন্য ইংরেজ মহিলা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আজিকার দিনের নার্সিঙের অভ্যুত্থান ও সংস্কার হয়েছে বলতে পারা যায়—আজ আমরা পৃথিবীতে আমাদের পবিত্র সেবাব্রতের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। যুদ্ধশেষে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামানুকরণে যে নার্সিং স্কুল স্থাপিত হয়েছে এতে তাঁর মহৎ কাজের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত ক'রে তাঁর দেশবাসী তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতাই তাঁকে যুদ্ধশেষে শান্তির সময়কার নার্সিং বিষয়ে আবশ্যক জিনিসপত্রের দিকে সজাগ ক'রে তুলেছিল। নাইটিঙ্গেলের পর যাঁরা সেবাব্রতী হয়ে এই বিভাগে এসেছেন তাঁদেরও এই রকম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে। এক একবারের যুদ্ধ,—যদিও ভয়ঙ্কর এবং হৃদয়বিদারক হয়েছে—তবুও সার্জ্জিক্যাল, মেডিক্যাল এবং নার্সিং বিষয়ে নিত্য নূতন আবশ্যক অতি উপকারী তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে সেবাধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজ ক'রে এসেছেন তাঁরা ইস্পাতকে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়ার মতই পরীক্ষিত হয়ে এসেছেন বলা যেতে পারে।

আজ আমাদের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে—ভাবতে হবে যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ছোট্ট প্রদীপ পুনরায় আমাদের হাতে এসে পড়েছে। এত কাল যুদ্ধকালীন বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলী আমরা বই পড়ে জানতে পেরেছি ও শুনে এসেছি, এখন আমাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহস, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং উৎসাহ নিয়ে—মনের ভিতর আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাইটিঙ্গেলের প্রদীপ জ্বেলে আর্ত্তের পাশে দাঁড়াতে হবে। ভারতীয় সেবাব্রতী মহিলাদের ভিতর এই জাগরণ দেখলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আত্মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন এবং আমাদেরও সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া সার্থক হবে।

কোকিলের জন্ম-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উচ্ছ্বাসের ফলে বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করিলেও কোকিল-কণ্ঠকে সুধাবর্ষী বলিয়া কবিরা বোধ হয় অতিশয়োক্তি করেন নাই। যাহার সুমধুর কণ্ঠে জগৎ মুগ্ধ তাহার জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যাঁহারা এ বিষয় সম্যক অবগত নহেন

একটা মেঠো-পিপিট কোকিল-শাবককে আহার করাইতেছে

তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কোকিল-শাবক পরের বাসায় প্রতিপালিত হয়—ইহাই চিরপ্রচলিত প্রবাদ। অপরের দ্বারা প্রতিপালিত হয় বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই কোকিল আমাদের দেশে পরভৃৎ নামে পরিচিত। একথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন যে, বাচ্চা প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিবার পর নিজেদের বাচ্চা মনে করিয়া কাকেরা তাহাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করে; কিন্তু কি কৌশলে প্রত্যেকটি স্ত্রী-কোকিল সন্তান-পালনের গুরু দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাইবার মত দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করে এবং কাক ব্যতীত অপরাপর পাখীর বাসায়ও তাহারা ডিম পাড়ে কি না—এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের নির্ভরযোগ্য, অবিসম্বাদী অভিজ্ঞতার বিবরণের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। সাধারণতঃ লোকের ধারণা—ডিম পাড়িবার সময় হইলেই কোকিল-দম্পতি তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে কাকের বাসার সন্ধানে বাহির হয়। কাককে ডিমে তা' দিতে দেখিলেই পুরুষ-কোকিলটি তাহাকে আক্রমণ বা বিরক্ত করিতে চেষ্টা করে। তখন কাক বা কাক-দম্পতি শত্রুকে তাড়া করিয়া যায়। কোকিল ক্রমশঃই দূরতর স্থানে উড়িয়া যাইতে থাকে। তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া কাকেরা তাহাদের বাসা হইতে অনেক দূরে উপনীত হয়। এই সুযোগে স্ত্রী-কোকিল তাহাদের বাসায় আসিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। দৈবাৎ এরূপ কোন ঘটনা দৃষ্টে অথবা কাক ও কোকিলের বর্ণ সামঞ্জস্যে এরূপ ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বর্ণসামঞ্জস্যের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায়—পুরুষ-কোকিল ও কাকের পালকের বর্ণ প্রায় একই রকমের হইলেও স্ত্রী-কোকিলের দেহবর্ণ সম্পূর্ণ পৃথক্। স্ত্রী-কোকিলের পালকের বর্ণ ধূসর এবং বুক ও লেজের পালক সাদা সাদা দাগে বিচিত্রিত।

যাহা হউক, আমাদের দেশের মত ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও কোকিলের অভাব নাই। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে ঐ দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা উহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে কোকিলের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। তবে কোকিল যে অপরের বাসায় ডিম পাড়ে—এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কোকিল অপর পাখীর বাসায় বসিয়া ডিম পাড়ে না।

স্ত্রী-কোকিল বাসা হইতে ডিম মুখে লইয়া সে-স্থলে নিজের ডিম পাড়িয়া রাখিতেছে

মাটিতে ডিম পাড়িয়া তাহা ঠোঁটে করিয়া অপরের বাসায় রাখিয়া আসে। কোকিলকে ঠোঁটে করিয়া ডিম লইয়া যাইতে অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়াই যে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুসংখ্যক কোকিলের জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ এড্‌গার চান্স দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন যে, কোকিল নিজের ডিম ঠোঁটে করিয়া অপরের বাসায় রাখিয়া আসে না, অপরের বাসায় প্রবেশ করিয়াই ডিম পাড়িয়া যায় এবং বাসার মালিকের একটি ডিম ঠোঁটে করিয়া পলায়ন করে। বহু পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানের ফলে তিনি এই রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইলেও অনেকেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই।

এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণ ধারণা যেমন—কোকিল একমাত্র কাকের বাসাতেই ডিম পাড়ে, ঐ দেশীয় লোকেরা কিন্তু সাধারণতঃ ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করিত। সুবিধা পাইলে বড়ই হউক, কি ছোটই হউক, যে-কোন পাখীর বাসাতেই কোকিল তাহার ডিম রাখিয়া আসে—ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে, পরে অবশ্য এ ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই চান্সের অভিজ্ঞতার বিষয় প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলিলেন যে, যদি বাসায় প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়িবার কথাই সত্য হয়, তবে রেড্-ওয়ারব্‌লার নামক ক্ষুদ্র পাখীর অপল্‌কা বাসায় সে প্রবেশ করে কিরূপে? কেহ কেহ বলিলেন—রেন্ ও চিফ্‌চ্যাফ্ নামক পাখীর বাসায়ও কোকিল-শাবক প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের বাসার ক্ষুদ্র দ্বারপথে কোকিলের ন্যায় বৃহদাকার পাখীর প্রবেশ অসম্ভব ব্যাপার। কেহ কেহ আবার চান্সের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি স্ত্রী-কোকিলের ডিম পাড়িবার অবস্থার যথাযথ আলোকচিত্রের প্রমাণ উপস্থিত করা প্রয়োজন। কারণ, তিনি হয়ত কয়েকটি কোকিলকে বাসাতেই ডিম পাড়িতে দেখিয়াছেন; কিন্তু এমন অনেক কোকিল থাকিতে পারে যাহারা মাটিতে ডিম পাড়ে এবং ঠোঁটে করিয়া তাহা অপরের বাসায় রাখিয়া আসে।

এই সময়ে প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ অলিভার পাইক মিঃ চান্সের সহিত একযোগে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে

পালক-মাতা ওয়ারব্‌লার কোকিল-শাবককে খাওয়াইতে খাওয়াইতে যেন হার মানিয়া গিয়াছে

ক্ষুদ্রকায় পালক-মাতারা বৃহদাকার কোকিল-শিশুর পিঠের উপর উঠিয়া খাবার মুখে তুলিয়া দিতেছে

প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বহু ক্লেশে চলচ্চিত্র-ক্যামেরার সাহায্যে ডিম পাড়িবার পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং পালক পিতা-মাতার আশ্রয়ে কোকিল-শিশুর ব্যবহার সম্পর্কিত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক অপূর্ব্ব ছবি তুলিতে সমর্থ হন। বিভিন্ন স্থান হইতে, পাঁচটি কোকিলের, নির্ব্বাচিত বাসার অদূরে অলক্ষিতে অবস্থান, পরে বাসায় আগমন, ডিম অপহরণ এবং অপহৃত ডিমটিকে মুখে রাখিয়া ডিম পাড়িবার পর পলায়ন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারের নিখুঁৎ ছবি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব উক্তি নির্ভুল প্রমাণ করেন। কোকিলের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিষয় এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদের অপূর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণের ফলে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরে আরও অনেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

ওয়ার্‌ব্‌লারের বাসায় কোকিল-শিশু। পালক-মাতা খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে

কোকিলের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের উক্তিই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ডিম পাড়িবার ব্যাপারটা আগাগোড়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা কেহই কোকিলকে বাসা ব্যতীত অন্যত্র ডিম পাড়িতে দেখেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোকিল অন্ততঃ ছয়টি বিভিন্ন জাতীয় পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া তাহাদের দ্বারাই বাচ্চা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে। এই পাখীগুলির অনেকেই কিন্তু কোকিল অপেক্ষা যথেষ্ট ক্ষুদ্রকায়। বড়ই হউক, কি ছোটই হউক অনাবৃত বাসায় ডিম পাড়িতে কোকিলকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; কিন্তু কোকিল অপেক্ষা

উড়ন্ত স্ত্রী-কোকিল

ক্ষুদ্রকায় কতকগুলি পাখী আবৃত বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহাদের প্রবেশ-পথও থাকে অতিশয় ক্ষুদ্র। সুবিধা পাইলেই কোকিল তাহাদের বাসায় ডিম পাড়ে। বাসার অভ্যন্তরে সে প্রবেশ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু দুই পায়ের নখের সাহায্যে প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্ব আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঐ স্থানেই ডিম পাড়িয়া যায়, ডিমটি গড়াইয়া গিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হয়। অনেক সময় এরূপ বাসার প্রবেশ-পথে কোকিলের ডিম আটকাইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতেও বুঝা যায় তাহারা বাসা ছাড়া অন্য কোথাও ডিম

পাড়ে না। কারণ ঠোঁটে করিয়া ডিম আনিয়া কোকিলের মত সুচতুর পাখী যে তাহা যথাস্থানে না রাখিয়া প্রবেশ-পথে রাখিয়াই পলায়ন করিবে ইহা মোটেই সম্ভব নহে।

এক সময়ে মিঃ পাইক ও মিঃ চান্স পিপিট-জাতীয় কোন ছোট পাখীর বাসার আশেপাশে একটি স্ত্রী-কোকিলের আনাগোনা দেখিয়া লতাপাতা ও কাঁটার সাহায্যে বাসাটিকে সুদৃঢ়ভাবে আবৃত করিয়া এমন একটি ক্ষুদ্র পথ রাখিয়া দেন যাহার ভিতরে ঠোঁটের সাহায্যেই মাত্র বাহির হইতে ক্ষুদ্র ডিম প্রবেশ করান সম্ভব। সঙ্গোপনে অবস্থান করিয়া তাঁহারা কোকিলটার কার্য্য-প্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোকিলটা আসিয়া প্রথমেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বাসার নিকটেই খানিকটা সমতল স্থান ছিল, অনায়াসেই সেই স্থানে ডিম পাড়িয়া ঠোঁটে করিয়া ভিতরে রাখিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ কিছুই করিল না। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল—বাসার মধ্যেই ডিম পাড়া। বাসার উপরের লতাপাতাগুলি তার পর সে কয়েক বার এদিক ওদিক পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অবশেষে বাসার উপর বসিয়া ঠোঁটের সাহায্যে কণ্টকাবৃত লতাপাতাগুলির

কোকিল-শাবকের সহিত অন্য শাবকের দ্বন্দ্ব আরম্ভ

কোকিল-শাবক আহার করিতেছে

একাংশ ফাঁক করিয়া গলাটাকে ভিতরে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঁটার ঘায়ে মাথা ও গলার কয়েকটা পালক ছিঁড়িয়া গেলেও কোনক্রমে গলাটা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাসার ভিতরে যাইবার পথ করিয়া লইল। একটু দম লইবার পর পুনরায় ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া পিপিটের একটি ডিম তুলিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পর প্রায় দশ-বার সেকেণ্ডের মধ্যেই একটি ডিম পাড়িয়া পলায়ন করিল।

অনেক সময় তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন—ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে কোকিলটি আসিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসার নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় হইবা মাত্রই ডানা না কাঁপাইয়া, যেন কতকটা পিছলাইয়া পড়িবার ভঙ্গীতে উড়িয়া বাসার উপর উপস্থিত হয় এবং কালবিলম্ব না করিয়া বাসার মালিকের একটি ডিম মুখে তুলিয়া লয়।

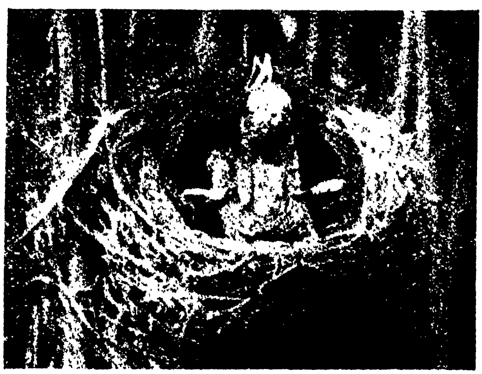

কোকিল-শাবক অন্য বাচ্চাটির পেটের নীচে ঢুকিয়াছে

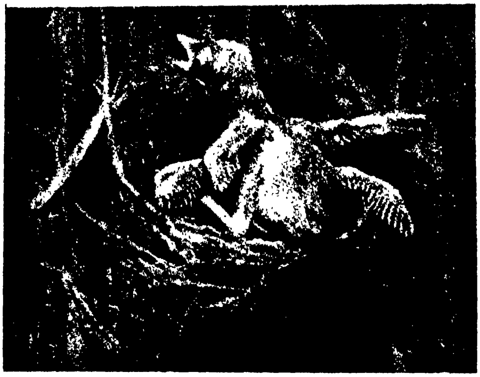

কোকিল-শাবক বাচ্চাটিকে পিঠে তুলিয়া লইয়াছে

অপহৃত ডিমটি মুখে করিয়াই সেস্থলে নিজে একটি ডিম পাড়ে এবং তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়ন করে। এই সমস্ত কাজ শেষ করিতে তাহার আট-দশ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। পলায়ন করিবার পর কোন সুবিধাজনক স্থানে উপবেশন করিয়া উর্দ্ধমুখে অপহৃত ডিমটাকে বেমালুম গিলিয়া ফেলে। ডিম পাড়িবার প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই সে অনাহারী কাজেই ডিমটাকে সে রাক্ষসের মতই উদরস্থ করে।

কোকিল সাধারণতঃ এক দিন অন্তর একটি করিয়া, মোট পাঁচটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি কাকের ডিম অপেক্ষা ছোট। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—জ্ঞাতসারে ডিম বিনষ্ট বা অপহৃত হইলে কোকিল অতিরিক্ত ডিম পাড়িয়া বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার পর শীত ঋতুর আগমনের পূর্ব্বেই তাহারা দেশত্যাগ করে। বিভিন্ন বাসায় ডিম পাড়িলেও ডিমের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া যায় না।

বহুবিধ পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে, অপর পাখীর ডিম চুরি করিয়া খাইতে কোকিলের মত ওস্তাদ খুব কমই দেখা যায়। ডিম পাড়িবার সময় নিজের ডিমের স্থান করিবার জন্য অপরের ডিম ত চুরি করেই, অন্য সময়েও বিভিন্ন পাখীর বাসায় ডিমের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ডিমের সন্ধান পাইলেই সুযোগমত চুরি করিয়া খোলাসমেত উদরস্থ করে। এই কারণেই কোকিলকে অনেক সময় ডিম মুখে করিয়া উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা লক্ষ্য না করিলে ইহা নিজের ডিম কি চুরি-করা ডিম তাহা বুঝিবার উপায় নাই। খুব সম্ভব, এই জন্যই ঠোঁটে করিয়া বাসায় রাখিবার কথাটা প্রচলিত হইয়াছিল।

কোকিলের ডিম পাড়িবার কৌশল অপেক্ষাও ইহাদের শাবকগুলির ব্যবহার অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক। ডিম পাড়িবার প্রায় তের দিন পর ডিম ফুটিয়া কোকিলের বাচ্চা বাহির হয়। চোখ বন্ধ বাচ্চাটি প্রথম দিনে কালো এক খণ্ড মাংসপিণ্ডের মত দেখায়। ডিম হইতে বাহির হইবার পর প্রথম দিনে ব'চ্চাটি তাহার অপর সঙ্গীদের বা অপর ডিমগুলি সম্বন্ধে উদাসীনই থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় দিনের অবসানে অথবা তৃতীয় দিনের প্রারম্ভে দৃশ্যতঃ অসহায় বাচ্চাটি যেন বংশগত সংস্কার বশে অপূর্ব্ব শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। বাসায় অবস্থিত অন্যান্য ডিম কিম্বা বাচ্চাগুলি ভবিষ্যতে তাহার আহার্য্য পদার্থের অংশভাগী হইয়া উদর পূরণের পরিপন্থী হইবে—ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। কাজেই আপাতঃপ্রতীয়মান অসহায় কোকিল-শাবক অদ্ভুত কৌশল ও অপূর্ব্ব শক্তিবলে বাসার অন্যান্য ডিম অথবা বাচ্চাগুলিকে বাসা হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। যাঁহারা স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখেন নাই—তাঁহাদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করাই মুশকিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এইরূপই ঘটিয়া থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

ডিমগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া তার পক্ষে অতি সহজ কাজ। বাচ্চাটা প্রথমে ডিমের নীচের দিকে ধীরে ধীরে তাহার অপরিণত ডানাটিকে ঠেলিয়া দেয়। তার পর ডিমটিকে পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া দুই পায়ের উপর উচু হইয়া দাঁড়ায় এবং অতি সহজেই এক দিকে গড়াইয়া ডিমটিকে বাসার বাহিরে ফেলিয়া দেয়। একটির পর একটি করিয়া এইভাবে সে বাসার সমস্ত ডিম নষ্ট করিয়া ফেলে। বাসায় ডিমের পরিবর্ত্তে বাচ্চা থাকিলে তাহাকে একটু বেগ পাইতে হয়। কিন্তু বেগ পাইতে হইলেও সে ভবিষ্যৎ

বাচ্চাটিকে বাসার ধারে ঠেলিয়া ফেলিতেছে

বাচ্চাটি বাসা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে

কণ্টক দূর করিতে বিরত হয় না। প্রথমে সে অপর বাচ্চার পেটের নীচে ঢুকিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বাচ্চাটা সহজে তাহাকে তাহার পেটের নীচে ঢুকিতে দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই কোকিল-শাবকের শক্তি! কিছু ক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে নিরীহ বাচ্চাটির নীচে ঢুকিয়া তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া লয়, এবং ডিম ফেলিবার কৌশলে তাহাকে বাসার ধারে গড়াইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। বাচ্চাটা কিন্তু বাসার ধারটা পায়ের নখে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কোকিল-শাবক তাহার অপরিণত ক্ষুদ্র ডানার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। তখনও চোখ ফোটে নাই—এরূপ কোকিলের বাচ্চা তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর অপর বাচ্চাকে পর্য্যন্ত এরূপে ফেলিয়া দিয়া বাসার মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করে। বাসা হইতে যাবতীয় ডিম বা বাচ্চা বাহিরে ফেলিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত সে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকে না। এই সকল আপদ দূর করিবার পর শান্ত, সুবোধ শিশুটির মত সে বাসার মধ্যে অবস্থান করে। বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য পক্ষি-দম্পতি এই সময় অতি অল্প সময় ব্যবধানে অনবরত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে থাকে। কোকিল-শাবক পালক-পাখীর বাসায় বসিয়া একাই সেই সমস্ত খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করে। এরূপ প্রচুর আহার না পাইলেও তাহার চলে না। কারণ কোকিল-শাবক অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রায় দিন-দশেকের মধ্যেই তাহার শরীর সম্পূর্ণরূপে পালকে আবৃত হইয়া যায়। শরীরের আয়তন বৃদ্ধি হেতু ক্ষুদ্র বাসায় আর তাহার স্থান সংকুলান হয় না। তথাপি তাহার মধ্যেই কোন রকমে আর কয়েকটা দিন কাটাইয়া দেয়। তার পর ডানা মেলিয়া উড়িবার চেষ্টা করে। ভালরূপে উড়িতে না পারিলেও এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া বেড়াইতে থাকে। অন্যান্য পাখীর বাচ্চারা যেমন আহার্য্য বস্তুর জন্য মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোকিলের বাচ্চা কিন্তু তাহার বিপরীত ব্যবহারই করিয়া থাকে। সে নিজের ইচ্ছামতই ছুটাছুটি করে; পালক পিতামাতা সারাদিন তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া তাহার আহার যোগাইতে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পালক-পিতামাতার সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমেও তাহাদের তুলনায় অসম্ভব বৃহদাকৃতির বাচ্চার উদরপূর্ত্তি হয় না। সারাদিনের চেষ্টায় উভয়ে তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিয়া অবশেষে অনেকটা যেন হাল ছাড়িয়া দেয়। বাচ্চাটা তখন প্রায়ই গাছের সর্ব্বোচ্চ ডালে অনাবৃত স্থানে বসিয়া অতি উচ্চ সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে অদ্ভুত এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দের এক অপূর্ব্ব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য পাখীরা তাহাদের বাচ্চাদের জন্য খাবার লইয়া যাইবার কালে এই অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং সমস্ত আহার্য্য বস্তু তাহার মুখে গুঁজিয়া দেয়। যেন কোন যাদুবলে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়। বিভিন্ন পাখীরা তাহাদের নিজের বাচ্চার কথা ভুলিয়া এ ভাবে বার-বার কোকিল-বাচ্চাকে খাওয়াইতে থাকে। হেজ্-স্প্যারো নামক ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার পাখীর প্রতিপালিত একটি কোকিল শাবককে মিঃ পাইক এইরূপ, অন্ততঃ

বাচ্চাটি ইচ্ছামত ছুটাছুটি করিতেছে

চৌদ্দটি বিভিন্ন পিপিটের দ্বারা প্রতিপালিত হইতে দেখিয়াছেন। পালক পিতামাতারা বাচ্চার উদর পূরণে অসমর্থ হইলেও একেবারে সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। মাঝে মাঝে খাবার আনিয়া খাওয়াইতে কসুর করে না। কিন্তু বাচ্চার শরীর তখন এত বড় যে, ক্ষুদ্রকায় পালক-পিতামাতা আর তাহাকে ডালে বসিয়া খাবার মুখে গুজিয়া দিতে পারে না। কাজেই তাহাদিগকে বাচ্চার পিঠের উপর বসিয়াই তাহার মুখে খাবার তুলিয়া দিতে হয়। পালক-পিতামাতা হয়ত ভাবে, তাহাদের বাচ্চাটা এত বড় হইল কিরূপে? অথবা বাচ্চার বৃহদাকৃতি দেখিয়া হয়ত তাহাদের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে এবং সেই জন্যই নিজেদের আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়াও সারাদিন তাহার খোরাক যোগাইতে ব্যাপৃত থাকে। কোকিল-শাবক পালক-পিতামাতার সংগৃহীত কীট-পতঙ্গ খাইয়াই বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু পিতামাতার সহিত ঘোরাফেরা না করায় কোথা হইতে কি কি আহার্য্য বস্তু সংগৃহীত হয় তাহা মোটেই শিক্ষা করে না। এ জন্য পরিণত বয়সে সে সহজ-লভ্য বৃক্ষের ফলমূলাদি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। অবশ্য পরের বাসা হইতে ডিম চুরির ব্যাপারটা বোধ হয় সংস্কার-বশেই আয়ত্ত করিয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" দ্বিতীয় পুস্তক

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের যে-সব চিঠি বিশ্বভারতী সম্প্রতি "চিঠিপত্র" নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন, তার প্রথম পুস্তকটিতে তাঁর সহধর্মিণীকে লেখা ৩৬টি চিঠি ছিল। তার পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি। গত (শ্রাবণ) মাসে "চিঠিপত্র" নামের দ্বিতীয় পুস্তক বের হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্র-নাথকে লেখা পঞ্চাশটি চিঠি আছে। কবির অন্যান্য চিঠির মত এই চিঠিগুলি থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং নানা-বিষয়ক আদর্শ ও মতের পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্রকে কবি কোন কোন চিঠিতে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি ব্যক্তিগত হ'লেও অন্যদের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ। "চিঠিপত্র" দ্বিতীয় পুস্তকের প্রথম চিঠিটি হ'তে এই রকম শিক্ষাপ্রদ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

আশা করি তোর পড়াশুনা বেশ ভালই চলিতেছে এবং তুই সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পালন পূর্ব্বক সংযতভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছিস। কি নিয়মে ও কিরূপ ভাবে তোর চলিতেছে এখনো তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই। আমার ইচ্ছা তুই দিবারাত্রি বিদ্যালয়েই থাকিস। শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে তোর যাতায়াত থাকিলে মন বিক্ষিপ্ত হইবে। তুই বিদ্যালয়ের ছাত্র একথা কিছুতেই বিস্মৃত হইবি না।' সম্মুখে আপাতত কোন পরীক্ষা দিবার উত্তেজনা নাই বলিয়া যদি স্বাধীন ভাবে চলিস্ ও শিথিলভাবে পড়াশুনা করিস্ তবে নিজের পরম ক্ষতি করিবি। এত দিন যেমন ভাবে নিয়ত পাঠাভ্যাস করিয়াছিস্ তেমনি ভাবেই করিতেই হইবে।...

স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার উন্নতি সাধন ও সকল প্রকার মন্দ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার বয়স তোর হইয়াছে এখন নিজের ভার তুই নিজে গ্রহণ করিবি এই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। আমার এখন সকল দিক হইতে অবকাশ লইবার সময় হইয়াছে—আমার সংসারের মঙ্গল এখন তোর উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। তোর দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা, তোর চরিত্রবল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এখন আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবে। ভালমন্দের আদর্শ তোর নিজের মনের মধ্যে সুদৃঢ় করিয়া রাখিস্—অন্য লোকে কি বলে কি করে তাহাতে যেন তোকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া দেয়। এখনকার বাবুয়ানার বিলাসিতার ধনাভিমানের মোহ তোকে যেন স্পর্শ না করে। তোর জীবনযাত্রা যেন বেশ সাদাসিধা হয়—রাজবাড়িতেই তোর নিমন্ত্রণ থাকুক আর দীনদরিদ্রের কুটীরেই তুই পদার্পণ করিস্ সর্ব্বত্রই বিনা আড়ম্বরে যাইতে তোর যেন লজ্জাবোধ না হয়। বাহিরে বিরলতা ও অন্তরে পরিপূর্ণতা ভারতবর্ষের আদর্শ—সেই আদর্শ তোকে গ্রহণ করিতে হইবে।

নিজেকে হাল্কা করিস না—যাহা-তাহা ও যে-সে তোকে যেন বিচলিত না করে যখন যাহার কাছে থাকিস্ তখন তাহারই মত হোস্‌নে—তোর নিজের মধ্যে নিজের যেন একটা প্রতিষ্ঠা থাকে।

এ পর্য্যন্ত নানাভাবে আমাদের পরিবারে মহত্বের আদর্শ বিরাজ করিয়া আসিতেছিল আমাদের বাড়ীর এখনকার ছেলেদের মধ্যে তাহা নষ্ট হইবার দিকে যাইতেছে। আমাদের পারিবারিক মর্য্যাদা বহন করিবার উপযুক্ত ছেলে এখন আর দেখি না—...স্বদেশকে মহৎ ভাবে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা, শিক্ষা বা ক্ষমতা কাহারো দেখিনে। আমাদের পরিবারকে এই অধোগতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অতএব এখন-কার দলে না মিশিয়া গিয়া মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে মহৎ ভার গ্রহণের সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য শিক্ষা চাই, চেষ্টা চাই, সংযম চাই, ত্যাগ স্বীকার চাই—বাহিরের সংসর্গে দৃষ্টান্তে অবিচলিত থাকিয়া অধ্যবসায়ী হওয়া চাই। আমাদের দেশ মহৎ, তুই যে পরিবারে জন্মিয়াছিস্ সেও মহৎ, আমাদের ঋষি পিতামহগণ মহৎ এই

কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নিজেকে যোগ্য করিবার চেষ্টা করিস্—ঈশ্বর তোর সহায় হইবেন। ইতি তা জ্যৈঃ

দেশের কাজ করতে গিয়ে জেলে যাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত একটি চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে।

Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাক্‌ব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় স্বরূপ হয়ে উঠ্‌চে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না। দু-চারজন ক'রে জেলে যেতে যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে—বিশেষ কিছু মনেই হবে না। যেমন আমাদের ম্যালেরিয়া আছে—মাঝে মাঝে ভুগ্‌চি, মাঝে মাঝে সারচে, মাঝে মাঝে মরচিও—জেলখাটাও আমাদের ভদ্রসমাজের তেমনি একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনিবার্য্য আধিব্যাধির মধ্যে গণ্য হয়ে উঠ্‌বে।

বাংলা দেশে বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোম্পানি খোলা সম্বন্ধে কবির মতের এখনও মূল্য আছে—যদিও এখন অনেক বাঙালী আগেকার চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় কোম্পানি খোলা হয়েছে কোনোটাই সুবিধাজনক হয় নি। তার প্রধান কারণ, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যায় না। আমরা যে কোনো কাজই করি না কেন, তাতে যতই টাকা ঢালি এবং ব্যবস্থা যতই পাকা হোক উপযুক্ত লোক কোনোমতেই পাইনে। এই জন্যে গোড়ায় অল্পস্বল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করার সুবিধা এই যে, প্রথমেই বেশি লোকের দরকার হয় না, আগাগোড়া সমস্ত কাজই স্বচক্ষে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে লোক তৈরি করে তোলা যায়। সকল কাজেরই গোড়ার দিকে অনেকটা সময় পরীক্ষায় ব্যয় করতে হয়—কাজের সমস্ত আটঘাট বুঝে নিতে ও বেঁধে নিতে প্রথমটা কিছুকাল লাগেই—যে সব দেশে টাকা স্বচ্ছল তারা দু-দশ বৎসর বসে থেকে বা লোকসান দিয়েও ক্রমে যদি তিন-চার পার্সেণ্ট মুনফা দেখাতে পারে তাহলে ঠাণ্ডা থাকে—কিন্তু আমাদের দেশে কারো সবুর সইবে না—যেদিন টাকা ফেল্‌বে তার পরদিনেই লাভের জন্যে হাত পাতবে—কিছুদিন যদি মুনফা বন্ধ থাকে তাহলে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মাতে থাকবে, লোক বদলাতে চাইবে, নানা উৎপাত করবে। যারা বেশি টাকা শেয়ার নেয়, তারা সর্ব্বদাই কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে চায়। এই রকমে ইস্কুল থেকে আরম্ভ করে ব্যবসা পর্য্যন্ত কোনো কাজ আমাদের সুশৃঙ্খলে হবার যো নেই।...

এখন আমার মনে আর সন্দেহমাত্র নেই যে, আমাদের দেশে যদি কোনো কাজকে সফল করতে হয় তবে একলা ছোটরকম করে আরম্ভ করে লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলাই তার প্রকৃষ্ট উপায়। সেইটেই স্বাভাবিক পন্থা। বিশেষত যাদের অর্থাভাবে কৃপণের মতই কাজ করতে হবে—যাদের কার্য্যশিক্ষার ক্ষতি বহন করবারও ক্ষমতা নেই।...

অল্প আরম্ভ থেকে ক্রমে ক্রমে একটা কাজকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলাতেই যথার্থ শিক্ষা আছে। প্রথমেই অনেক টাকা মূলধন নিয়ে তার রীতিমত মুনফা জোগাতে গলদঘর্ম্ম হতে হবে—ভারতবর্ষের অবস্থা শিখে নিতে যে সময় লাগ্‌বে সে সময়টা বড় মূলধন ত বসে থাক্‌তে চাইবে না।

চাষাদের কোন কোন 'কুটীর-শিল্প' শেখাবার কথা তিনি ত্রিশ বৎসরেরও আগে ভাবতেন।

তারপরে এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস—অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সানকির জিনিষ ব্যবহার করে এরা যদি সেই রকম মোটা গোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তাহলে উপকার হয়।

আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আন্‌তে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়।

যাই হোক ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্—ভুলিস্‌নে।

দেওঘরে জমি নিয়ে সেখানে তাঁর "রুগ্ন ছাত্রদের একটা বায়ু পরিবর্ত্তনের জায়গা" করবার ইচ্ছা কবির এক সময়ে হয়েছিল।

জাপান থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন :—

এখানে সবাই বলচে আমি আমাতে এবং আমার কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতায় জাপানে একটা নতুন স্রোত বইবে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরা সেই আশা করচেন। আমার বক্তৃতায় সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। এখানকার আর্টস্কুলে মুখে মুখে আর্ট সম্বন্ধে একটা বলেছিলুম। সেই তোদের পাঠাচ্চি। প্রমথকে দিস্ সবুজপত্রে যেন তর্জ্জমা করে ছাপায়। এবং ইংরেজিটা Modern Reviewতে যেন ছাপাস্‌নে। ওটা বড় করে বক্তৃতা লিখব।

জাপান থেকে লেখা আর একটি চিঠিতে তিনি নববঙ্গের চিত্রকলা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন আমাদের চিত্রশিল্পীদের এখনও তাতে মন দেওয়া আবশ্যক।

আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বরাবর আমার মনে হয়েচে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশপাশের বাজে জিনিষ নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপসা কিম্বা পাঁচমিশেলি রং চং দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দলাল যদি আসত তাহলে এখানকার এই দিকটা বুঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খুবই দরকার আছে, নইলে আমাদের আর্ট একটু কুণো রকমের হবার আশঙ্কা আছে। গগন অবনরা ত কোথাও নড়বে না কিন্তু নন্দলালের কি আসবার সম্ভাবনা নেই?

ঐ চিঠিতে জাপানী মেয়েদের সম্বন্ধে এবং "খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল" খোলা সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।

তিন চার দিনের জন্যে এখানে একটি মেয়ে ইস্কুলের আতিথ্য ভোগ করে এসেচি। আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেচে। জাপানী মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েচে। আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখি নি। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্চে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল খুলব। আমেরিকায় বই বিক্রি করে যদি যথেষ্ট টাকা পাই এবং যদি আবার দেশে ফিরি তাহলে এই আমার কাজ হবে।

আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন:—

বক্তৃতার ঝড়ের মুখে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার agent দুই পুরুষে এই কাজে নিযুক্ত—সে বলে, এত লোককে দিয়ে তারা বক্তৃতা করিয়েছে কিন্তু কখনো এমন লোকের ভিড় ওরা দেখেনি। জায়গার অভাবে লোক ফিরে ফিরে যাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে ঠিক সময়েই বিধাতা আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে আমার আইডিয়া গভীর ভাবে কাজ করবে বলে বোধ হচ্চে। তাদের উৎসাহ দেখলে আমার আনন্দ হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এই চিঠিটিতে বিশ্বভারতীর প্রধান আদর্শের কথা রয়েছে:—

আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করচি এই মনে করে যে, বিধাতার বাণী এদের কাছে বহন করবার আদেশ আমার উপরে আছে। তারপরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। এই জন্যেই বিধাতা কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এই পশ্চিমের ঘাটে আমার নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন আমার জীবনের এই অনপেক্ষিত ঘটনার মধ্যে তাঁর যে অভিপ্রায় আছে সে আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

"প্রবাসী"র প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন, "দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।" এই মর্ম্মের বাণী আমেরিকা হ'তে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে আছে। সেই বাণীর কিছু অংশ, সমস্তটি নয়, উদ্ধৃত করছি। সমগ্র বাণীটিই সকলের পঠনীয়।

আমার বাণীর পথ রোধ করবে এমন সাধ্য কারো নেই। সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েচি। এরাও ত সকলে আমাকে গ্রহণ করেচে—বরঞ্চ আমার নিজের দেশের লোকের চেয়ে এরা আমাকে বেশি করে আপন লোক বলে জেনেচে। পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জানচি। আমাদের বাংলা দেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেচে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিৎ। এইখানে রামমোহন রায় সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন—সেই প্রভাতের আলোকেই বাংলা দেশের নবজাগরণের প্রথম উষালোক। সেই আলোকে যে বিশ্বের সুর বেজেচে সেই সুরই আমাদের সুর—সেই সুরই মানব ইতিহাসের আসন্ন ভাবিযুগের সুর।

একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেচেন—সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলা দেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্ব্বজাতি সর্ব্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

ভৃত্যদের প্রতি তাঁর মনের ভাব ও তাদের প্রতি আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা তাঁর এই দীর্ঘ চিঠিটির এক জায়গায় আছে।

উমাচরণ বাঁচবে না আমি জানতুম তবু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ছোট বেলা থেকে ও আমাদের কাছে মানুষ হয়ে এসেচে, ওর জীবন আমার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। আমার সেবা ওর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে এসেছিল। আমাদের জীবনের দৈনিক তুচ্ছ ভারগুলি যারা বহন করে তারা আমাদের বোঝা কত হাল্কা করে দেয় তা তাদের অভাবে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারি। এবার দেশে ফিরে গেলে উমাচরণের অভাবে আমার জীবনযাত্রা কত দুরূহ হবে তা বেশ কল্পনা করতে পারচি। আমার নিজের প্রয়োজন যৎসামান্য কিন্তু সেই জন্যেই সেই প্রয়োজনগুলি সুসম্পন্ন না হলে জীবনের কল বিগ্‌ড়ে যায়। আমার কাছে কোনো অতিথি অভ্যাগত এলে উমাচরণের উপর ভার দিয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতুম—ও তাদের খাইয়ে দাইয়ে হেসে গল্প করে খুসি করে দিতে পারত। তা ছাড়া ও যতই দোষ অপরাধ করুক আমাকে অন্তরের সঙ্গে যত্ন করত। এই মমতা জিনিসটি ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়, নতুন চাকর যতই কাজের হোক্ এই জিনিসটি তার কাছ থেকে পাব না। মাইনে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় সেবা পাওয়া যায় না। যাক একরকম করে চলে যাবে।...

শান্তিনিকেতনকে সমস্ত ভারতের প্রতিষ্ঠান তিনি করতে চেয়েছিলেন এবং যথাসাধ্য করেওছিলেন।

এখন আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি শান্তিনিকেতন আজ সমস্ত ভারতের সামনে এসে পড়ল— এখন এর মধ্যে কিছুই এমন রাখা চলবে না, যা কুণো,—যাতে সমস্ত ভারতের মন পাওয়া যায় এমন একটি জিনিষ গড়ে তুলতেই হবে।

চীনদেশ থেকে লেখা একটি চিঠিতে সে দেশে একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠাবার কথা এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে।

এখানে খুব আদর যত্ন পাওয়া যাচ্চে। বেশ মনে হচ্চে এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে। শাস্ত্রীমশায়কে এখানে পাঠাবার দরকার আছে। আমাদের প্রস্তাব শুনে এরা ভারি খুসি হয়েচে। ওরাও এখান থেকে অধ্যাপক পাঠাতে সম্মত আছে। তাহলে বিশ্বভারতীতে

চীনীয় ভাষা শেখবার সুব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারানো সংস্কৃত বইয়ের তর্জ্জমারও সুবিধা হতে পারবে। এ সম্বন্ধে বীরলা ভ্রাতাদের সঙ্গে এখন থেকে আলাপ সুরু করিস্। শাস্ত্রীমশায় ছাড়া আর কারো দ্বারা কাজ হবে না। পীকিনে একজন খুব সংস্কৃত অভিজ্ঞ রাশিয়ান পণ্ডিত আছেন। আমাদের ওখান থেকে কোনো বাজে লোক এলে ধরা পড়বে। এই রুশীয় অধ্যাপক ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচিনাপল্লি হ'তে লেখা একটি চিঠির নিম্নমুদ্রিত অংশ এখনও অনুধাবনযোগ্য।

শান্তিনিকেতনের প্রতি দেশের দৃষ্টি যেরকম পড়েছে তাতে ওকে লক্ষ্মীছাড়া রকম করে রাখা আর চলবে না। আমার সঙ্গে তোরা কেউ এলে বুঝতে পারতিস দেশের উৎসাহ এবং শ্রদ্ধা কত বেশি। আমার এতে কেবলি মনে ভয় এবং লজ্জা হচ্চে—আনন্দ হচ্চে না। খুব ঘুরতে এবং খাটতে হচ্চে কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আমার আসা সার্থক হয়েচে। না এলে অন্যায় হত। শান্তিনিকেতন যদি সত্যকার জিনিস না হয় এবং স্থায়ী না হয় তবে মলেও আমার সে লজ্জা যাবে না। বাইরের লোকে ওকে যেরকম করে দেখচে আমাদের অধ্যাপকেরা এখনো সেরকম করে দেখতে পাচ্চেন না। সেই জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১লা ফাল্গুন।

১৯৩০ সালের ২৬শে মে তিনি অক্সফোর্ড থেকে লিখছেন।

Gilbert Murrayর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েচে। তাঁর সই নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে ভারত সম্বন্ধে একটা চিঠি শীঘ্রই বেরবে।... ভারতবর্ষে ঠিক কি রকম কাণ্ড হচ্চে বুঝতে পারচি নে। ঢাকায় খুনোখুনির জোগাড় হয়েচে দেখলুম। এটা সরকারী চাল বলে বোধ হচ্চে। আজ হাণ্ডেলের ওখানে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ।

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে কিরূপ ভাবিয়েছিল, আমেরিকার একটি চিঠিতে আছে।

ক্ষণে ক্ষণে মনে বৈরাগ্য আসে। বসে বসে ছবি আঁকব, অল্পস্বল্প যা পারি তাই কাজ করব, অধিক কিছুই আশা করব না। কিন্তু সংসার-যাত্রাকে অত্যন্ত সহজ করে আনতে হবে—সুন্দর অথচ সুলভ। এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েচে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগল না—ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেচে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। জীবন-যাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।

"জমিদারীর অবস্থা" সম্বন্ধে যা লিখেছেন, জমিদাররা তা পড়লে ভাল হয়।

জমিদারীর অবস্থা লিখেছিস্। যেরকম দিন আসচে তাতে জমিদারীর উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল এবার সেটা আরো পাকা হয়েচে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েচি।

আমাদের কলকাতার বাড়ি বিক্রি করা যদি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য না হয় তাহলে বেচে ফেলতে দোষ কি? তাহলে অনেকটা হাল্কা হওয়া যায়। আমার মনে পড়ে বাবামশায়ের কথা—এক দিন কত বড়ো ভরসা নিয়ে বিষয়স-ম্পত্তির পনেরো আনা বিক্রি করে দিয়ে সংসার-যাত্রাকে হঠাৎ কত ধাপ নীচে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা ছেলেবেলায় সেই কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ আলোতেই মানুষ হয়েছি। সংসারের উপকরণ যথেষ্ট সামান্য ছিল কিন্তু ভিতরের দিকে কোনো অভাব বোধ করি নি। আর একবার ঠিক তেমনি করেই বাইরের দিকের আসবাবকে কমিয়ে আনতে ইচ্ছে করে।

ঐ চিঠিতে "দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েচে" ব'লে তিনি যা লিখেছেন, তা আজ-কালকার দিন সম্বন্ধে আরো সুপ্রযোজ্য মনে হয়।

এদিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েচে। অনেক কিছু উলট্‌পালট্ হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবন-যাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো—তাতে দুঃখের ভার কমে যায়—বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—এখনি পাচ্চে, সঙ্কট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয় যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আল্‌গা করে দিই—টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।

শ্রীনিকেতনের কাজটি যে কত বড় তা তাঁর ঐ চিঠিতেই আছে—শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীরা তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন কিনা জানি না। যাঁরা করতেন তাঁদের কেউ কেউ পরলোকগত, কেউবা অবসৃত বা গৃহীতা-বসর।

এটা খুব করে বুঝেছি আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কি করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোট আকারে তারি নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত। যাই হোক কিছু মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্চি দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে—তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেচে। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩০।

১৯৩৫ সালের ৪ঠা জুন লেখা চিঠিটিতে শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কবি আরো যা লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সহিত—বিশেষতঃ শ্রীনিকেতনের সহিত—সম্পর্কযুক্ত সকলের তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে লেনার্ডের মন পূর্ব্ববৎ অনুকূল আছে শুনে যে সম্পূর্ণ খুসি হয়েছি তা বলতে পারিনে। অতি অনায়াসে ওর কাছ থেকে সাহায্য নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করাতে কর্ম্মকর্ত্তাদের ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই। নিজের উপার্জ্জন সম্বন্ধে যাদের কোনো আশঙ্কা নেই তারা কথায় কথায় বলে যেখানে শিক্ষাদানটা কর্ত্তব্য সেখানে আয়ের কথা ভাবা চলবে না। বাঙালীর অকর্ম্মণ্য মনোবৃত্তি ওখানে কেবলি প্রশ্রয় পেয়ে আসচে—নিজের আয়ের উপর নির্ভর করতে হলে যে চিন্তা ও চেষ্টার

দরকার সেটাই যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ সে কথা এরা কিছুতে বুঝবে না যে পর্য্যন্ত এরা বিপদে না পড়বে।

শান্তিনিকেতনের মাটির বাড়িটির উপর কবির খুব প্রাণের টান ছিল।

মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্ত্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে—রাত্রে আলো জ্বালিয়েও কাজ চলেছিল। গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সব চেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে। যে রাজমিস্ত্রি এই বাড়িটা বানাচ্ছিল সে নিজের একটা মাটির ঘর ফেঁদেছে, তার মানে ওর মনে বিশ্বাস হয়েছে এটা টঁ্যাকসই। আমার সব চেয়ে আনন্দ এই কথা ভেবেই। শান্তিনিকেতনের এই কীর্ত্তি ওর অনেক প্রয়াসের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করবে।

বিদেশ থেকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে তাঁর আঁকা ছবির বিদেশে আদরের কথা আছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "এখন আমার বিশ্বাস হয়েচে ছবি এঁকে আমার ভবিষ্যতের একটা রাস্তা খোলসা হবে।"

অনেক চিঠিতে দেখা যায় কবি নানা গুরুতর বিষয়ে পুত্রের পরামর্শ জানতে চাচ্ছেন। অনেক চিঠি থেকে বোঝা যায় তিনি রথীন্দ্রনাথকে কত বিশ্বাস করতেন, তাঁর উপর কত নির্ভর করতেন, তাঁর ভরসা কত রাখতেন। সুতরাং জীবনের শেষ কয় বৎসর যখন কবি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্বভারতীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করতে আর পারতেন না, তখন তার কাজ যদি ভালভাবে চলে থাকে, ও যে-পরিমাণে ভাল ভাবে চলেছিল, তার প্রশংসা বহু পরিমাণে রথীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। কিন্তু তার বিপরীত কিছু ঘটে থাকলে তার জন্যও রথীন্দ্রনাথ সেই পরিমাণে দায়ী।

বিরহিণী

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

দীপ্ত রবিকরে
ভেসে যায় বায়ুর সাগরে
নীড়ছাড়া পৃথিবীর পাখী
আকাশে একাকী।
ধরাতল ছাড়ি
দিয়াছে সে শূন্যমাঝে পাড়ি,
পৃথিবীর গেহ
বাঁধিতে পারে নি তার দেহ—

তাইত সে কার অভিসারে
ঘুরে মরে শূন্যের কিনারে।
স্মৃতি তার নিজবক্ষে আঁকি
ধরা তবু যায় তারে ডাকি—
তাই যবে কিসের উদ্দেশে
দূর পথে পাখী যায় ভেসে
ছায়া তার ঘুরে ঘুরে মরে
বিরহিণী ধরণীর পরে।

হিন্দুসমাজ ও 'তপশীলভুক্ত জাতি'

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

বিগত বাংলা ১৩৪৮ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'সেন্সাস ও তপশীলভুক্ত জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত সাতাত্তরটি জাতির নাম 'তপশীলে'র তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এবং ইহাও বলিয়াছি যে, উক্ত সকল জাতির কোন-কোনটির অধিকাংশ লোকের এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে ঘোর অনিচ্ছা ও আপত্তি রহিয়াছে। আর কোন-কোন জাতি এ সম্বন্ধে আদৌ কিছুই অবগত নহে। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঐ সকল জাতিকে উক্ত তালিকাভুক্ত করার সম্বন্ধে যে-সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলির যৌক্তিকতা যে ভ্রমপূর্ণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছি। 'তপশীলভুক্ত' হইবার জন্য কয়েকটি বিশেষ জাতির তপশীল-প্রিয় অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে-কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত হাস্যকর। অথচ যেন যন্ত্রচালিত কার্য্যের ন্যায় এই তালিকা-প্রস্তুতির কার্য্য নিঃশব্দে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে যত কিছু আপত্তি, আবেদন, নিবেদন ও প্রার্থনা করা হইয়াছিল সেগুলির প্রতি উপেক্ষার শর নিক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, ফলে 'বর্ণ-হিন্দু'দের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'তপশীলী' সম্প্রদায় আপন সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রগতির সকল ক্ষেত্রেই প্রতি-ক্রিয়াশীলরূপে 'তপশীলী'গণের অস্তিত্ব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা হিন্দু সমাজের আপন-জন বলিয়া পরিচিত হইবার দুর্ভাগ্যকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত কি হিন্দুসমাজ বাস্তবিক এতই দুর্ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, যেজন্য ইঁহারা পর হইয়া যাইতেছেন ও এমন কি ইঁহারা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন?

এই বাংলা দেশে কিছু কাল হইতে হিন্দুসমাজের নিম্ন-শ্রেণীদের কতকগুলির মধ্যে সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়াছে। তাঁহাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে, সাধারণের রজক ও নাপিতের সেবা লাভ করা, সাধারণের দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার অর্জ্জন করা এবং জল-চল হওয়া ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছেন তাহা দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলার এমন কোনও পল্লী নাই যেখানে এই আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবেশলাভ করে নাই; বাংলার এমন কোনও হিন্দু নাই যাহার হৃদয়ে এই আন্দোলনের তীব্র স্পন্দন অনুভূত হয় নাই। কত সভা-সমিতি ও বৈঠক-আদি যে হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই; কত কলহ-কোলাহল ও লাঠালাঠি যে চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও উচ্চশ্রেণীর লোকদের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সংঘর্ষ বাধিতেছে, কোথাও বা এক নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত অন্য নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও বিরোধ বাধিতেছে। এমন কি এই সকল ব্যাপার ইংরেজের আদালত পর্য্যন্তকেও বিব্রত করিতেছে। যাহাদের মধ্যে সত্যকার আত্মসম্মান-জ্ঞান সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা কখনই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। নিম্ন-শ্রেণীদের এই যে সামাজিক অধিকার লাভের প্রচেষ্টা ইহা উপেক্ষণীয় বা নিন্দার্হ নহে নিশ্চয়ই।

বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্ত্তমানের এই যে ঘোর ঘৃণার উদ্রেককারী উচ্চনীচ ভেদ ইহার আদি পত্তন বৌদ্ধ যুগের পরেই হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তৎপূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারিটি বর্ণের (জাতির নহে) বিদ্যমানতা ছিল। যাহারা জ্ঞানচর্চ্চা করিত তাহারা ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইত; যাহারা দেশরক্ষা ও লোকদিগকে শাসন-পালন করিত তাহারা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইত; যাহারা কৃষি-গোপালন-বাণিজ্য করিত তাহারা বৈশ্য নামে কীর্ত্তিত হইত; যাহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবকের কার্য্য করিত তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইত। ইহাদের পরস্পর সকলের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান এবং অন্নাহার চলিত। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে ইহারা সকলেই হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছিল। উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিও

জাতিভেদের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি জ্ঞানবাদী থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদের বিরোধী হইলেন না। তিনি বলিলেন—"ন মৃত্যুর্ণশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ।" যাহা হউক, বাংলার রাজা আদিশূরের সময়ে বাংলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় তিনি যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহার বহুদিন পরে সেন-বংশীয় রাজা বল্লাল সেন বাংলার হিন্দুসমাজকে অনেক ভাঙা-চোরা করিয়া পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুসমাজে উচ্চনীচ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। যে-সকল জাতি (এস্থলে জাতি অর্থে একই বৃত্তি অবলম্বী বা একই বংশের লোক সকলকে বুঝিতে হইবে) রাজা বল্লালের আদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল বা যাহারা কোনও প্রকারে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনাচরণীয় ও কেহ কেহ অস্পৃশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আর যাহারা তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহারা আচরণীয় ও স্পৃশ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ক্ষমতাপ্রিয় সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ নানা কারণে নানা প্রকার বিধিনিষেধ রচনা করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক জাতির কল্পিত জন্ম-কাহিনী সম্বলিত নব নব পুরাণ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। এই সকল জন্ম-কাহিনী উক্ত জাতিগুলির উচ্চতা নীচতা জ্ঞাপকরূপেই কল্পিত হইয়াছিল এবং ইহা দ্বারা জাতিভেদের সম্যক্‌রূপ সমর্থন করা হইয়াছিল। এই প্রকারে বাংলার হিন্দু-সমাজ-দেহে জাতিভেদের ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দুসমাজের সকল জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান, অন্নাহার ও জলগ্রহণ-প্রথা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও মানবতার সাম্য-সূত্রে আবদ্ধ হিন্দু-সমাজ বিভেদের খড়্গে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের দৃশ্যমান উচ্চ-নীচ, আচরণীয়-অনাচরণীয় ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ঘৃণ্য বৈতরণী-স্রোত এই সময় হইতেই বহিয়া আসিতেছে।

এই জাতিভেদ এবং ইহার কুফল যেমন সত্য, তেমনই আর একটি কথাও ইহার ন্যায় সত্য। অর্থাৎ এই প্রকার জাতিভেদের সৃষ্টি করিতে ও ইহাকে স্থায়ী রূপ দিতে দেশের এক শ্রেণীর লোক যেমন পূর্ব্বকালে বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলেন ও তাহার ফলে যেমন সমাজের মধ্যে নানাবিধ বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, তেমনই ইহার শোচনীয় কুফল দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ের এক শ্রেণীর লোকও এই জাতিভেদের সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদসাধন করিতে এবং জাতিভেদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জাতিগুলি সামাজিক অধিকার সকল প্রদান করিতে প্রচেষ্টা করি চলিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, মহাত্মা রাজা রামমোহ রায়, সিরাজগঞ্জ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায় ভট্টাচার্য্য, লেঃ কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা আই, এম, এস (অবসরপ্রাপ্ত), আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচ রায় ও স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ মনীষিগণ শেষোক্ত রূ প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক। আর্য্যসমাজ এবং হিন্দুমহাসভাও এ শেষোক্ত উদ্দেশ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমা সময়ে সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা, সর্ব্বজনীন ভোজ এবং সাধার দেব-দেবীর মন্দিরে সকল জাতির প্রবেশাধিকার প্রচলিত হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর কংগ্রেস কর্ম্মিগণ আজকাল নিম্ন-শ্রেণীদিগের পাকান্ন আহার সম্বন্ধে কোনও বাছ-বিচার করেন না। নর-সুন্দর সমাজ ও রজক-সম্প্রদায় নিজেরাই অগ্রণী হইয়া গ্রামাঞ্চলের অনেক স্থলে সর্ব্বসাধারণের ক্ষৌরকর্ম্ম ও বস্ত্রধৌতের কার্য্য করিতেছেন। শহর বাজারে ত এই দুই কার্য্য অবাধে হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিতপ্রধান স্থানগুলির শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীগণের প্রার্থনা অনুযায়ী শাস্ত্রোচিত উচ্চতা-জ্ঞাপক পাঁতি প্রদান করিয়া বিশেষ উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকল শ্রেণীর নিম্ন জাতিদিগের পৌরোহিত্য করিতেছেন। এই জন্য যদিও তাঁহারা অভিজাত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের চক্ষে পতিত ও হীন বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা যে এই কার্য্য করিতেছেন ইহা তাঁহাদের সৎসাহসেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার পুরীস্থ শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যে যে নির্ব্বিচারে উচ্চ-নীচ বহু জাতি একত্র ও এক পাতে বসিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। নৌকায়, রেলে, ষ্টীমারে ও হাটে-বাজারে সকলেই সকল জাতির স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন-আদি ভোজন করিয়া থাকে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ জাতিভেদের ধার ধারেন না। বৈষ্ণব-সমাজে, ব্রাহ্ম-সমাজে, আর্য্য-সমাজে, রামকৃষ্ণ-মিশনে ও হিন্দু-মিশনে জাতি-বিচারের বালাই নাই। বাংলা দেশের বর্ত্তমান সামাজিক আবহাওয়া যে ক্রমশঃ উদারভাবপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক দিকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীগণের উন্নয়নের প্রচেষ্টায়, আর অন্য দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিবর্ত্তনে

আজকাল জাতিভেদের কঠোরতা ক্রমশঃ শিথিলতর হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গসাহিত্যেও প্রভাবশালী লেখকগণ কর্ত্তৃক হিন্দু-সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীগণের প্রতি সহানুভূতি ও দরদপূর্ণ লেখাসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র, সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথিগণের এই সম্পর্কিত লেখাসকল উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণও এ সম্বন্ধে নীরব নহেন। তাঁহাদের লিখিত নাটকাবলীতে এই মানব-ঘৃণার প্রতি তীব্র কশাঘাত দৃষ্ট হয়। প্রহসন-রচয়িতারাও এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন।

জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে ও নিপীড়িত শ্রেণী-গণের প্রতি সামাজিক নির্যাতনের স্রোত বন্ধ করিতে উচ্চ-শ্রেণীদের মধ্য হইতে নানা প্রকার প্রয়াস চলা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ব্যবস্থাকে কায়েম করিবার জন্য যদি কোনও কোনও নিপীড়িত সমাজ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তাহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। বরং এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় জাতিভেদের কঠোরতা বাংলা দেশে বহু পরিমাণে শিথিলতাপ্রাপ্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের ন্যায় যুগ-প্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলা দেশের মাটিতে মানব-প্রেমের আবাদ অতি উচ্চস্তরে স্থানলাভ করিয়াছে। মান্দ্রাজের ন্যায় এখানে অস্পৃশ্য 'পারিয়া' জাতি নাই, সংযুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবের ন্যায় ইঁদারা হইতে জল তুলিবার অযোগ্য জাতি এখানে নাই। এখানকার নিম্ন-শ্রেণীরা অন্যান্য প্রদেশের নিম্নশ্রেণীদের অপেক্ষা নানা প্রকার সামাজিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের নিম্ন, নিম্নতর ও নিম্নতম স্তরগুলিতে অবস্থান করিয়া কিছু কিছু লাঞ্ছনা ও পীড়ন সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির এইরূপ দুরবস্থা পূর্ব্বকালে ছিল না। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে তাঁহাদের নিজেদের হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্ত্তনের অনিচ্ছাই এই দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। যদি রাজা বল্লাল সেনের সময়ে ঐ সকল জাতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নব-গঠিত হিন্দুসমাজের অঙ্গ পুষ্টি করিতেন, তবে এইরূপ দুর্দ্দশার পথ উন্মুক্ত হইত না। সুতরাং কেবল হিন্দু-সমাজের সমাজপতিদের উপর ক্রোধ বা অভিমান না করিয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের দুর্ব্বুদ্ধির কথাও স্মরণ করা উচিত। এক দিকে নিজেদের পূর্ব্বজগণের দুর্ব্বুদ্ধির কথা ও অন্য দিকে বর্ত্তমান সময়ের উচ্চশ্রেণীস্থ উদার-হৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মহান্ প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিলে ক্রোধ বা অভিমানের অবসর থাকে না। যদি এরূপ হইত, যে, হিন্দুসমাজের মধ্য হইতে নিপীড়িত শ্রেণীদের দুর্গতিমোচনের জন্য কেহ কখনও কোনও প্রকার চেষ্টা করিতেছেন না দেখা যাইত, তাহা হইলে রুষ্ট বা ক্ষুন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিত। শত শত বৎসরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় মনোভাবের পরিবর্ত্তন এক-মাত্র সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ সাপেক্ষ। যে-দেশের জন-সাধারণের শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ সে-দেশের লোকদের নিকট হইতে দ্রুততর বেগে সামাজিক অধিকারলাভের আশা করা যায় না। কিন্তু নিরাশ হইবারও ত কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় বাংলা দেশের কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর এরূপ কিছু করা সমীচীন মনে হয় না যদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের অঙ্গহানি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা 'তপশীলে'র তালিকায় নাম লেখাইয়া তাহাই করিয়াছেন। ইহা করিবার পূর্ব্বে সব দিক্ চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহারা ভালই করিতেন। হিন্দুর সংস্কৃতি ও শিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, হিন্দুর আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া, হিন্দুর দেব-দেবী ও তীর্থকে মান্য করিয়া, হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ ও মহোৎসব-কীর্ত্তন আদিতে আনন্দের অংশভাগী হইয়া—এক কথায় জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি হিন্দু থাকিয়া হিন্দুসমাজের ক্ষতিকর কিছু করিতে যাওয়া কখনই উচিত নহে।

১৯৩১ সালের বঙ্গীয় সেন্সাস রিপোর্টের ৪৯৭-৪৯৯ পৃষ্ঠায় 'ডিপ্রেসড্' শ্রেণীদের (ইহাদের সংখ্যা ৮৮টি) তালিকার 'বি'-গ্রুপে লিখিত নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, পুণ্ডরী, বাগদী ও শুঁড়ী প্রভৃতি ৪০টি জাতির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

"If a distinction is required it must be two-fold—first that in general, the numbers of the groups shown in statement No. XII b. are smaller and secondly, that the groups are on the whole more extensively Hinduised than those shown in this statement and have consequently been more completely absorbed in general body of Hinduism."

ইহার মর্ম্ম এই, যে, 'ডিপ্রেস্‌ড্' শ্রেণীগুলিকে যে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তন্মধ্যে 'বি'-গ্রুপের অন্তর্গত চল্লিশটি জাতির পার্থক্য 'এ'-'সি'-'ডি' গ্রুপগুলির অন্তর্গত অন্যান্য সাতচল্লিশটি জাতির সহিত তুলনায় দুই প্রকারে দেখান যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহারা তাহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা

ব্যাপকভাবে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই বিবৃতি হইতে এ কথাও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, শেষোক্ত সাতচল্লিশটি জাতি এখনও সম্পূর্ণরূপে হিন্দুসমাজ-ভুক্ত হয় নাই। সেন্সাস্-কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ অসাময়িক মন্তব্যের হেতু কি? এইরূপ পাঁতি দিবার জন্য সেন্সাস্-কর্ত্তৃপক্ষকে কে বা কাহারা অনুরোধ করিয়াছিল? "Mere enumeration"-এর ইহাই কি নমুনা? যাহা হউক, কতক-গুলি জাতির সংগঠন-ভিত্তিকে অনাবশ্যকভাবে এইরূপ খনন করিয়া দেখাইবার অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য ইহাদের রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের বনিয়াদের এই অপ্রার্থিত উলঙ্গ রূপ দেখাইবার প্রয়াস সেন্সাস্-কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে নিজেদের পূর্ব্ব রূপের কথা স্মরণ করেন, তবে সেন্সাস্-কর্ত্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিফল হইবে। সেন্সাস্-কর্ত্তৃপক্ষের মনোগত অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয়, যে, এইরূপ বর্ণনা দ্বারা 'বি'-গ্রুপের কতকগুলি জাতি আপনাদিগকে মূলতঃ হিন্দু নহে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা করিবেন তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবার পথে এই বিবৃতি কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করে নাই। যে-সকল জাতির সুবিধাবাদী ব্যক্তিগণ 'তপশীলে'র পক্ষপাতী হইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাঁহারা 'তপশীলভুক্ত' হইয়া নিজেরাই খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছেন কি না প্রণিধান করুন। 'তপশীলে'র সমর্থনের উদ্দেশ্যেই যে এই সকল বিবৃতি রচিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ রেগুলেশনের সপ্তম ধারা অনুযায়ী পুরী শহরস্থিত ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রচারিত সতেরটি জাতির মধ্যে শুঁড়ী, নমঃশূদ্র, বাগদী ও চামার জাতিদের নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল জাতি ব্যতীত পুরী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উক্ত ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী বলিয়া যে ষোলটি জাতির নামোল্লেখ আছে তন্মধ্যে পান, তিয়র ও বাউরী এই তিনটি জাতির নাম আছে। অথচ ব্যাপকভাবে হিন্দুকৃত ও হিন্দুসমাজের অঙ্গভুক্তিকৃত উপরি-কথিত বি-গ্রুপের জাতিগুলির সহিত এই শুঁড়ী, নমঃশূদ্র, বাগদী, চামার, পান, তিয়র ও বাউরী জাতিকে সেন্সাস্-রিপোর্টে একই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল বিভিন্ন উপাদানের জাতিগুলিকে 'তপশীলে'র তালিকায় প্রবেশ করাইয়া একটি অপূর্ব্ব 'জগাখিচুড়ী' প্রস্তুত করা হইয়াছে—যাহার সুমধুর ও রোচক আখ্যা হইয়াছে 'অহিন্দু'।

এক্ষণে কথা এই যে, বাংলার 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন কি না? সুবিধার স্রোতে ভাসমান হইতে গিয়া তাঁহারা কোন্ অঘাটে ভাসিয়া চলিয়াছেন তাহা কি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না? হিন্দুসমাজ শুধু তাঁহাদের প্রতিই কি অবিচার করিয়া চলিয়াছে? উচ্চশ্রেণিগণের প্রতিও কি করিতেছে না? তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, যে, সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দুসমাজের মধ্যেই এই অবজ্ঞার ভাব অল্প-বিস্তর পরিমাণে বিদ্যমান। পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বাংলার মৎস্যাশী ব্রাহ্মণগণের জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। বাংলা দেশে উচ্চশ্রেণীর এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কোনও শূদ্র জাতির পৌরোহিত্য করেন না; তাঁহারা কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ-আদির স্পৃষ্ট জল লইয়া সন্ধ্যা-তর্পণ করেন না; তাঁহারা ঐ সকল জাতির প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন না; তাঁহারা ঐ সকল জাতির গৃহ-দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন না ও উহাদের বাড়ীর প্রতিমাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করেন না; তাঁহাদের গৃহে ভোজন করিলে ঐ সকল জাতিকে স্বহস্তে এঁটো পরিষ্কার করিতে হয়; তাঁহাদের বাড়ীতে বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে গেলে ঐ সকল জাতিকে পৃথক্ আসনে উপবেশন করিতে হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাখাদি উচ্চশ্রেণি-গণেরই যদি এ জন্য আত্যন্তিক ক্ষোভের কারণ না থাকে ও হিন্দুসমাজের অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িবার প্রয়োজন-বোধ তাঁহারা না করেন, তবে নিম্ন-শ্রেণীরাই বা তাহা করি-বেন কেন?

আমরা উপরে যে-সকল কথা বলিলাম ইহা বলিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ এক ব্যাপার সম্পর্কে একবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলেই আমাদের বক্তব্যের আবশ্যকতা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন, "আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্য্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে কোথাও ধ্বনিত হ'তে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনার বিনাশ যখন আপনি ঘটাতে বসি তখন তাকেই বলি মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মারীকে

মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুবিষ আপনার মধ্যে থেকেই উদ্ভাবিত ক'রে তোলে তখনই পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আজ আমাদের। আমাদের দুঃখ, আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে। আমরা স্পর্দ্ধা ক'রে আত্ম-ঘাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্ব্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভ বুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা কর, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।" আমাদের এই উদ্যোগও 'তপশীল'-প্রিয়গণের শুভ বুদ্ধিকে আহ্বান করিবার জন্য। যিনি আমাদের এই দুর্য্যোগের দিনে নিষেধের বাণী বলিবার সাহস বুকের মাঝে দিয়াছেন, তিনি 'তপশীল'-প্রিয়গণের শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তুলুন।

আলোচনা

"বাংলা বানানের নিয়ম"

শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে "বাংলা বানানের নিয়ম" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত মহাশয় রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্য সব স্থানে দ্বিত্ব বর্জ্জিত হইলেও রেফের পর 'য'-এর দ্বিত্ব বর্জ্জিত হওয়া উচিত নয়। কারণ কার্য্য, আচার্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি শব্দের বাংলা উচ্চারণ কার্জ্য, আচার্জ্য, ধৈর্জ্য প্রভৃতি, কিন্তু কার্য, আচার্য, ধৈর্য প্রভৃতি নয়।

উচ্চারণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় "কার্য্য" প্রভৃতি শব্দের সাধারণত বাংলায় উচ্চারণ কার্জ্জো, আচার্জ্জো, ধৈর্জ্জো। উচ্চারণে 'জ'-এর দ্বিত্ব হয়, 'জ্য' উচ্চারণ বাংলায় হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দও বাংলায় 'ধর্ম্মো' প্রভৃতি রূপেই উচ্চারিত হয়। এ সকল স্থলে বস্তুতঃ ম প্রভৃতির দ্বিত্ব উচ্চারণের বেলায় হইয়া থাকে। পশ্চিমের লোকেরা যেভাবে 'কর্ম' উচ্চারণ করেন (একটি মাত্র 'ম' দিয়া) বাংলায় উচ্চারণ সেরূপ নয়।

এখন প্রশ্ন হইল 'ধর্ম্ম' প্রভৃতির সঙ্গে 'কার্য্য' প্রভৃতির তফাৎ কোথায় ?

আমাদের মনে হয় একমাত্র তফাৎ এই যে, 'ধর্ম্ম'-শব্দে মকারেরই দ্বিত্ব হয়, কিন্তু কার্য্য শব্দে 'য'-এর স্থানে আমরা 'জ' উচ্চারণ করি ও সেই 'জ'-এরই দ্বিত্ব হয় উচ্চারণে। কিন্তু বাংলায় ত সব 'য'-এরই উচ্চারণ 'জ' (যা'ব = জা'ব); দ্বিত্ব হওয়ার প্রশ্নে 'য'র উচ্চারণ কি হয় তাহা বিবেচ্য নহে। বাংলায় যেভাবে 'য'-এর উচ্চারণ হয় (= জ) সেই ভাবে উচ্চারিত 'য'-এর (= 'জ'-এর) দ্বিত্ব হয় কি-না তাহাই বিবেচ্য। এবং অন্যান্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্বের সহিত সেই ভাবে উচ্চারিত 'য'-এর (= 'জ'-এর) দ্বিত্বের কোন তফাৎ আছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে।

বস্তুতঃ তাহা নাই। আমরা 'কার্জো' বা 'ধর্মো' বলি না; কার্জ্জো বা ধর্ম্মো বলি। কাজেই উচ্চারণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বত্র দ্বিত্ব হয়। লেখা বা ছাপায় দিক দিয়া দেখিলে কোথাও দ্বিত্ব করা উচিত নয়।

"বাউরীদের উৎসব"

শ্রীঅসীমকুমার রায়

গত শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ "বাউরীদের উৎসব" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বলিবার মত বিশেষ কিছু না থাকিলেও বাউরীদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিবার মত কিছু নিশ্চয়ই আছে।

প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিবাহের মাস লইয়াই উহা আরম্ভ করা যাক্। উনি লিখিয়াছেন, "বাউরীদের বিয়ে হয় প্রধানতঃ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে।" আশা করি, সকলেই অবগত আছেন যে, চৈত্র মাস হিন্দুর বিবাহ-মাস নয়। বাউরী-সম্প্রদায়ও নিশ্চয়ই হিন্দুরই মধ্যে। তাহা হইলে তাহাদের বিবাহই বা কেমন করিয়া চৈত্র মাসে হইবে? বাউরীদের বিয়ে দেখা যায় ফাল্গুন মাসেই বেশী বটে, তবে তার জন্যে যে তাদের সৌন্দর্য্যবোধ বেশী তা নয়। "চাষবাসে"র দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে ওরা মেয়েছেলের বিয়ে দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেও ওরা বিয়ে দেয় না। কারণ তখন ঝড়-জল হয় আর তাতে ওদের বেশ একটু কষ্ট হয়। ওদের ঘর-দোর কম। আর বিয়ের সময় লোকজনের সমাগম হয় একটু বেশী রকমের। তাতে আবার যদি জলকাদা হয়ে যায় তা হ'লে বিয়েবাড়ী মোটেই জাঁকে না। এই জন্যেই ওরা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেও ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। এই গেল প্রথম ও প্রধান বক্তব্য। দ্বিতীয় কথা বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে; তাতে লিখেছেন, "স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গ্রামের দশজন গণ্যমান্য লোকের সামনে স্বামী স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে নেয়—তা হ'লেই হ'ল বিবাহ-বিচ্ছেদ।" কিন্তু নিয়ম হচ্ছে—বিবাহের সময় যে-কয়জন (সাধারণতঃ দশ জন) গণ্যমান্য (মুরুব্বি) লোক বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত থাকবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময়ও তাদের প্রত্যেককেই থাকতে হবে।

তৃতীয় কথা—বিয়ের পণ আগে পাঁচ সিকা ছিল বটে, কিন্তু এখন পাঁচ টাকা নয়; দশ টাকা হয়েছে। তবে কেউ কেউ আবার ছেড়েও দেয়, কিন্তু নিয়ে দশ টাকার কম নেয় না। শেষ কথা শুধু ভাদু ও তুযু এই দুটোই বাউরীদের প্রধান উৎসব নয়। মনসাপূজাও তাদের প্রধান উৎসবের মধ্যে একটি। আমাদের যেমন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, ওদেরও তেমনি মনসা-পূজা। আর তুযু-পূজা কেবল বাউরীদের মধ্যেই প্রচলিত আছে তা নয়; তুযু ভদ্রঘরের মেয়েতেও পুজে আর প্রায় ঐ সমস্ত গানই বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীজয়ন্তনাথ রায়

একদিন তুমি এসেছিলে—
বৈশাখের তপ্ত পথে আকাশের ঘনোজ্জ্বল নীলে
শস্যহীন শুষ্ক মাঠে তৃষাদীর্ণ আর্ত্ত এ নিখিলে
একদিন তুমি এসেছিলে।
দিগন্ত-বিস্তৃত ভূমি, শুষ্ক ধূলি, ঘূর্ণি বহে বেগে
দীপক-ডমরু বাজে প্রেতের নাচন উঠে জেগে
শীর্ণ শুষ্ক শাল, তাল রুক্ষ দেহে বনান্তের বুকে
তৃষ্ণাতুর কণ্ঠ মেলি আর্ত্ত চোখে চাহে উর্দ্ধমুখে
কালের ভ্রূকুটি আঁকা সায়াহ্নের দিগন্ত সীমায়—
আসন্ন প্রলয় জাগে, মেদিনীর বক্ষ শিহরায়
মূর্চ্ছাহত মূঢ় প্রাণ ভাবে বসি যুগান্তের পারে
রুদ্রের নর্ত্তনশেষে কোন্ বেশে দেখা দিবে দ্বারে
সুন্দরের নবরূপ! কোন্ পূর্ব্ব দিগন্তের শেষে
জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রালোক দেখা দিবে শান্ত মৃদু হেসে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে! আলোকের অসীম সঙ্গীত
সঙ্কেতিবে ভবিষ্যের কোন্ মহাপথের ইঙ্গিত
শূন্য হ'তে শুভ্র কর হানি।
সেই লগ্নে তুমি দেখা দিলে—
প্রলয়ের অবসানে পৃথ্বী যবে নিঃস্ব তিলে তিলে
শান্ত যবে নটরাজ নৃত্য আর ডম্বরুর মিলে
সেই লগ্নে তুমি দেখা দিলে।
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানবের কুটীর-প্রাঙ্গণে
হে কবি, দাঁড়ালে আসি, বাঁশী-হাতে আপনার মনে
সঞ্চারিতে প্রাণে প্রাণে প্রেমের বারতা! তারপর শেষে—
দীর্ঘযাত্রা অবসানে আর একদিন মৃদু হেসে
নিজেরে মিশায়ে দিলে নিঃশব্দের ধূলিরাশি মাঝে।
আসা ও যাওয়ার ফাঁকে যে ক'দিন হেথায় বিরাজে
তাই ভরে দিয়ে গেলে কী অমৃত সঞ্চারিয়া মনে
রূপ, রস, বর্ণে আঁকা কালজয়ী ছন্দের বন্ধনে।
তুমি চলে গেছ কবি তবু তুমি বেঁচে আছ আজো
দেহাতীত রূপ লয়ে হে অরূপ আজিও বিরাজো
নয়ন-সম্মুখে মোর! প্রভাতের বিহগ গাথায়
বর্ষা বসন্তের ছন্দে অরণ্যের পাতায় পাতায়
তোমার সঙ্গীত জাগে। প্রস্ফুটিত মল্লিকার বনে
যে-বারতা আনে সন্ধ্যা ক্লান্তনের দক্ষিণ পবনে
যে-বাণী কাঁপিয়া উঠে মালতীর লজ্জানত মুখে
যে-বাণী গুমরি উঠে কেতকীর কম্পমান বুকে
তারি মাঝে সুর হয়ে নিরন্তর জেগে আছো তুমি।
অসীম সমাধি-মগ্ন ধ্যান-মৌন শুব্ধ বনভূমি
যুগ-যুগান্তর ধরি একমনে শব্দহীন ভাবে
যে কঠোর মন্ত্র জপে শির তুলি উর্দ্ধ নীলাকাশে—
সে ধ্যানের মন্ত্র সাথে তোমার ধ্যানের ধ্বনি জাগে
অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরে। আজো শত রাগে, অনুরাগে
তুমি জেগে আছ কবি মরমের স্নিগ্ধ বেদনায়
প্রথম প্রণয়-ভীতা সচকিতা কিশোরী হিয়ায়
প্রেম-মঞ্জরীর রূপে! শ্রাবণের সজল নিশায়—
অভিসারিকারা যবে দীপ-হাতে পথে বাহিরায়
আসন্ন মিলনাশ্বাসে কম্পমান ভীরু হিয়া তলে
দুর্ব্বার প্রণয়াবেগে কামনার যে প্রদীপ জ্বলে
সিক্ত যূথী-বন হতে গন্ধ বায়ু যবে দেয় আনি
প্রাণের গভীর লোকে অকথিত চিরন্তন বাণী—
সেই অভিসার-লগ্নে অভিসারিকার হৃদিতলে
তুমি জেগে আছো কবি প্রণয় ছন্দের শতদলে
অস্ফুট গুঞ্জন গানে। বিশ্বজয়ী কালজয়ী কবি—
ধ্যানলোকে এঁকে গেছ জীবনের সব কিছু ছবি।
পৃথ্বী হ'তে মহাশূন্যে, মহাশূন্য হ'তে পৃথ্বী মাঝে
তোমার ধ্যানের ধ্বনি আজো তাই নিরন্তর বাজে
সব-কিছু কাজে।
কালচক্রে বৎসরের হোলো অবসান
আবার শ্রাবণ এলো। ঘন মেঘে ঘোষিছে আহ্বান
ধরণীর বর্ষ-অভিষেক। মৃত্তিকার দীর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ
মরুর দহন শেষে আকণ্ঠ ভরিয়া করে পান
নব সঞ্জীবনী ধারা। সদ্যোস্নাত শ্যাম তৃণদল
আবার তুলেছে শির ধরণীরে করেছে শ্যামল!
কেলি কদম্বের বনে আনন্দের ধ্বনি উঠে জাগি
সিক্ত-যূথিকার মন কোন দূরে হোলো যে বিবাগী
বাদল নির্ঝর গীতে। আজ মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
নিরুদ্দেশ যাত্রা তরে পথ তব লয়েছিলে চিনে
এরই মত আর একদিনে। সেইদিন ফিরি আরবার
স্মৃতির নিরুদ্ধ দ্বারে আঘাত হানিছে বারেবার
বর্ষণ-মুখর ক্ষণে। তবু এ সান্ত্বনা মনে জাগে
তোমার অদেহী রূপ আজো হেথা দীপ্ত অনুরাগে
রয়েছে সঞ্চিত। ধরণীর এ প্রাণ-উৎসবে
তুমি ছিলে, তুমি আছ, চিরদিন তুমি জেগে রবে।
আর তুমি জেগে রবে একান্তে নিভৃত এই প্রাণে
গো-ধূলির স্বর্ণালোক যেথায় গোপনে বহি আনে
সূর্য্যাস্তের দেশ হ'তে শব্দহীন মৌন তব বাণী
অলক্ষ্য ছন্দের গান নিত্য নব সুধা দেয় আনি
যে প্রাণের প্রান্তদেশে, ঘুচাইতে অজানার ভয়
ভুলাইতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ক্ষোভ, ক্ষতি, ক্ষয়।

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০শে নভেম্বর, ১৯৪১

অশান্ত,

বাংলা দেশে সার নাজিমুদ্দিন এণ্ড কোম্পানি আজ হিন্দুদের শোভাযাত্রা সম্পর্কে যা করছেন তার একটি বিলিতী নাম আছে। কিন্তু ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়েছে হালের জার্মানীতে বর্তমান মহাযুদ্ধের আসন্ন প্রাক্কালে। জার্মানীতে আবিষ্কৃত হ'লেও ইয়োরোপের সদা-জাগ্রত দু-একটি জাতির কাছে তা ধরা পড়তে বেশী দিন সময় লাগে নি। ঐ বিলিতী নামটা হচ্ছে war of nerves—বাংলা ক'রে বললে দাঁড়ায় স্নায়ু-সংগ্রাম। এই স্নায়ু সংগ্রামে যাঁরা পরাজিত হন তাঁদের স্নায়ুর অবস্থা এমনি দাঁড়ায়, প্রাণ এমনি তিক্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে যে তাঁদের মন কেবলি বলতে থাকে—"দুত্তোর ছাই, যা হোক্ একটা মিটমাট ক'রে ফেল্ রে বাপু—আর পারা যায় না!" এই স্নায়ু-সংগ্রামই আজ সার নাজিমুদ্দিন এণ্ড কোম্পানি হিন্দুদের শোভাযাত্রা সম্পর্কে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এবং এই যুদ্ধে প্রকাশ্য হতাহতের সংখ্যা আজ পর্যন্ত এক—এবং এই একের নাম হচ্ছে বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঙ্গ-সভ্যতার খপ্পরে প'ড়ে যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বি. সি. চ্যাটার্জি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করেন যে, এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে হিন্দুদের দাবী ন্যায্য এবং এক শ্রেণীর মুসলমানদের দাবী অন্যায়।

সুতরাং একটা ব্যাপার স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে যে আজ বাংলা দেশে এক শ্রেণীর মুসলমান অন্যায়কে গ্রহণ ক'রেও মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান আর এক শ্রেণীর হিন্দু ন্যায়কে অবলম্বন ক'রেও—যে-ন্যায়কে বহু মুসলমানও সমর্থন করেন—মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন না। এর শেষ ব্যাপারটাই যে মনুষ্য-সমাজের পক্ষে বৃহত্তর দুর্ঘটনা সে-সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কেননা, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে" এর ঐ শেষোক্ত ব্যক্তিই সমাজে অন্যায় অমঙ্গল দুষ্কৃতি ইত্যাদির জন্য বেশী দায়ী। কারণ মনুষ্যমণ্ডলীতে অন্যায়কারী বা দুর্জন চিরকালই আছে। এই অন্যায়কারীদের ব্যবসায় প্রধান প্রতিবন্ধক কল্যাণকামীদের ন্যায়ের সমর্থকদের অটুট অনমনীয় দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা। এই দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতাই সমাজে কল্যাণের আসন-রক্ষক। তাই বলছিলাম যে, সমাজে অন্যায় অমঙ্গলের জন্য বেশী দায়ী—"অন্যায় যে সহে।" ন্যায়ের সমর্থকদের পতনে মানবজাতির অধঃপতন।

এই কল্যাণকামীরা ন্যায়ের সমর্থকরা যদি আজ দুর্বল ক্ষণে স্নায়ুমণ্ডলীর অসোয়াস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে অন্যায়কারীদের অন্যায়ের আধাআধিও মেনে নেন, তবে কাল তাঁদের তা পুরোপুরিও মেনে নিতে হবে, কেননা, অন্যায় বস্তুটি কোন একটা বিশেষ স্থানে এসে থামে না। তা ক্রমাগত সুযোগ খোঁজে আরও অগ্রসর হ'য়ে যাবার।

সুতরাং কি নৈতিক দিক থেকে, কি ব্যবহারিক দিক থেকে অন্যায়কে মেনে নিতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপদেশ দেবেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিবিল ওআরের কথা তুলেছেন। কিন্তু সিবিল ওআর একা একা করা যায় না। তার জন্যে দু-পক্ষ প্রয়োজন। সুতরাং প্রশ্নটা মুসলমানের দিক থেকেও আছে। কিন্তু এক পক্ষ যদি সিবিল ওআরে ভয় পায় আর এক পক্ষ ভয় না পায়, তবে ভয়-পাওয়া পক্ষের শেষ গতি যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা অনুমান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আর বিশেষতঃ অন্যায় যারা করবে তারা সিবিল ওআর করতে দ্বিধা করবে না, ভয় পাবে না আর ন্যায়মাত্র দাবী যারা করবে সিবিল ওআরের নামে তাদের শরীর বেপথুমান মুখশ্রী পরিশুষ্যতি অবস্থা দাঁড়াবে, এটা কোন্ নীতিবিদ্ কোন্ সমাজপতির পরামর্শ!

সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্নায়ুমণ্ডলীর অসোয়াস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে যত বড় বড় গালভরা কথা বলেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন না কেন, সমস্যার শেষ সমাধান তাতে কখনও হবে না—এটা এক কলমে লিখে দেওয়া যায়। বরং সমস্যাটা আরও জটিল হ'য়ে ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাকবে। অন্যায়কারীরাই ন্যায্য দাবীর কাছে অবনত হবে, মানব সমাজে এই একটা শাশ্বত দিব্য রীতি আছে।

অনুমান হয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দিব্য রীতির বিশেষ কোন মূল্য দেন না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধ'রে নিয়েছেন যে সমস্যাটা কেবল শোভাযাত্রা নিয়েই বুঝি। কিন্তু তা যে নয় এটুকু বুঝবার ক্ষমতা যদি কারো না থাকে তবে ও সম্বন্ধে তাঁর কোন কথা বলবার অধিকারও থাকে না।

চ্যাটার্জি সা'হেব এই অধিকারের কথাও তুলেছেন। তিনি বলছেন যে তিনি হিন্দু, হিন্দু সভ্যতায় তিনি বিশ্বাস রাখেন। সুতরাং হিন্দু হিসেবে তাঁর বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকার আছে। ঐ অধিকারের কথাটা সত্য। কিন্তু অধিকারের অন্বর্থ অসীমতা নয়। সমাজে প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক গণ্ডিতে ঐ অধিকারের কোথাও একটা সীমারেখা আছেই। কোন হিন্দু গৃহস্থ বলতে পারেন—আমি আমার বাড়িতে ব'সে যা খুশি করব। কিন্তু তিনি যদি গাঁজা খেয়ে স্ত্রী-পুত্রকে সংহার ক'রে বলেন—আমি তান্ত্রিক সাধনায় মগ্ন আছি, তোমরা সবাই চুপ ক'রে থাক—তবে তাঁর সে অধিকার গ্রাহ্য হবেই না।

কিন্তু প্রশ্নটা কেবল শোভাযাত্রার প্রশ্নই নয়। এ প্রশ্নের আসল রূপটি হচ্ছে এই যে, ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এ-দেশের কতকগুলি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে সহজ হ'য়ে বসবাস করতে রাজি নয়। এবং রাজি যদি কোনকালেই না হয় তবে ব্যাপারটাকে আর কিছু দিয়েই সহজ ও সুস্থ ক'রে তোলা যাবে না। সুতরাং এই শ্রেণীর মুসলমানদের হিন্দুর শোভাযাত্রা বন্ধ করবার প্রচেষ্টার পিছনে যে মনোভাব আছে সেই মনোভাবের গভীর তলদেশে যে একটি বীজ আছে সেটি বিষবৃক্ষের বীজ। এই বীজটিকে অঙ্কুরিত হ'য়ে বাড়তে দিলে তা এক দিন সারা বাংলা দেশের আকাশ-বাতাসকে এমন বিষাক্ত ক'রে তুলবে যে তা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে। এই কথাটা মনে রেখো যে বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-সম্বন্ধ যে-ব্যবস্থা হবে সারা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের উপর, আজ হোক্ কাল হোক্, তার ছায়া তার ছাপ পড়া অনিবার্য। তিন কোটির উপর মুসলমান ভারতের আর কোন প্রদেশেই নেই। এমন কি কোনো খাস মুসলিম রাজ্যেও নেই। সে যা হোক, এই কারণে এ-সম্বন্ধে বাংলা দেশের দায়িত্ব খুব বেশী। কাজেই ঐ বীজটিকে অঙ্কুরিত হবার পূর্বেই বিনষ্ট করা দরকার—নইলে মহতী বিনষ্টি হবার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা। এই বিনষ্টির মধ্যে হিন্দুরাই খালি নষ্ট হ'তে থাকবে আর মুসলমানরা দিল্লীর তক্তভাউসের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে যাবে এই রকমের একটা ইলিউশন্ (illusion), গোলাপী শরবতের মতো মিষ্টি একটা মায়া-মরীচিকা কোনো কোনো মুসলিমের মনে আব্ছা আব্ছা ভাবে বাসা বেঁধে থাকতে পারে কিন্তু তাই বলেই সেটা সত্য নয়। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যদি আজ একটা নবশক্তি নবচেতনা নবউদ্দীপনা জেগে থাকে তবে সে নবশক্তি নব উদ্দীপনা কোনো দুর্ধর্ষ তাতার বা মঙ্গোল বা ইরান জাতির নবশক্তি নবউদ্দীপনা নয় তা নিতান্ত এই ভারতবর্ষেরই হিন্দু জাতির সগোত্র কতকগুলি লোকের, যদিও ধর্মে তাঁরা ইসলাম। দিল্লীর তক্তভাউস অধিকার করতে হ'লে কেবল হিন্দুকে হটালেই হবে না, ইংরেজের সঙ্গেও এঁদের লড়াই করতে হবে। কেননা, ইংরেজ জাতি যে হঠাৎ এক দিন কোনো এক শারদ্ বা বাসন্তী উষায় বুদ্ধ বা ক্রাইস্ট্ বা শ্রীচৈতন্য হ'য়ে উঠ্বে তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলিমদের শক্তির এমন কোন চমৎকারিত্ব দেখা যায় নি যাতে তাঁরা এক হাতে হিন্দুকে দাবিয়ে অন্য হাতে ইংরেজকে রুখতে পারেন। কোনো কোনো মুসলিম মনে মনে ভাবতে পারেন যে ইংরেজকে না হয় না-ই রোখা গেল কিন্তু হিন্দুদের নানা ভাবে জব্দ করতে পারলেই পরম লাভ। কিন্তু এই পরম বুদ্ধিমানদের সম্বন্ধে কোন কথা বলবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি নে।

সে যা হোক্, আমরা যে আজ ভারতীয় মহাজাতির অংশরূপে বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ ক্রীশ্চান মিলিয়ে এক বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ স্বচ্ছদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি বাঙালী জাতি গ'ড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখছি, সেই গড়বার কাজ থেকে "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে" এই দুই দলেরই খ'সে-পড়া প্রথম ও প্রধান দরকার। কেননা, এই গঠন-কার্য্যে নাজিমুদ্দিন এণ্ড কোম্পানি যত বড় অন্তরায় বি. সি. চ্যাটার্জির দল তার চাইতে কম বড় অন্তরায় নয়। নানা ছোট বড় অন্যায়ের বোঝা চাপিয়ে সমাজের কোন অংশবিশেষকে শক্তিশালী ক'রে তোলা যায় না। এবং হিন্দুরা যে বাঙালী জাতির একটা বিশিষ্ট অংশ এটা চক্ষুহীনেরও চোখে পড়া উচিত। স্বর্গত ব্যামফীল্ড্ ফুলার প্রমুখ ইংরেজ রাজপুরুষদের মুখে এমন কি এ-কথা পর্য্যন্ত শুনতে পার যে ঐ-ই একমাত্র দিককারী, সুতরাং চিন্তনীয় অংশ। সে যা হোক্, এক দিন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজকে লক্ষ্য ক'রে গান বেঁধেছিলেন—

"আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে"—

বাংলা দেশের হিন্দুরা বাংলা দেশের মুসলমানদের আরও ঢের বেশী যুক্তির সঙ্গে বলতে পারেন ওই কথা

"আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে।"

সুতরাং এক দিকে সার নাজিমুদ্দিন আর এক দিকে মিস্টার বি, সি, চ্যাটার্জি, এঁদের অপসারিত হওয়া দরকার আসল কাজ আরব্ধ হ'তে গেলে। এবং এই আসল কাজটা যে হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলন কোনো রকমের গোঁজা মিল নয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। আসলে বিবর্তনের পথে নাজিমুদ্দিনের দল ও বি, সি, চ্যাটার্জির দল এ দু-দলই বাতিল হ'য়ে যাবেই। এই সব কথা যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন তবে তাঁর বিবৃতি প্রকাশ করবার ইচ্ছা-তরঙ্গিণীতে ভাটা পড়বে ব'লে মনে করি। এবং আসল কাজেরও অন্তত একটা বাধা—প্রকাণ্ড বাধা – কম হ'য়ে যাবে।

চ্যাটার্জি সাহেব হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান কেউই আর কোন শোভাযাত্রা কোন ধর্মগৃহের কাছ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এমনি একটা আইন করবার প্রস্তাব ক'রে ভীষণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁর নিরপেক্ষতাটা একেবারে নিখুঁত হ'য়ে ওঠে নি। যেদিন তা হবে সেদিন তাঁর কাছ থেকে আমরা নিশ্চয় এমনি একটা আইন করবার প্রস্তাব শুনব যে স্কুল কলেজে আর হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান কেউই সরস্বতী পূজো করতে পারবে না।

ন্যায়টা হিন্দুর দিকেই আছে। এবং এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যে মনোভাব গজিয়ে উঠছে তা সমগ্র দেশের পক্ষে আত্মঘাতী, সে সম্বন্ধেও কোন ভুল নেই। এমন কি কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও ঐ মনোভাব আত্মঘাতী। কেননা, ঐ মনোভাবের সাদা ভাষায় আসল নাম হচ্ছে হিংসুটেপনা। আর হিংসুটেপনা যে মানুষের আত্মাকে জখম করে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। তবুও আজ এইখানে এইক্ষণে যে কোন রকমের একটা মিটমাট চাই-ই এটা জ্ঞানী বা দূরদৃষ্টির কথা নয়—এটা হচ্ছে দুর্বল স্নায়ুর অধৈর্য্য বা অসোয়াস্তি। অর্থাৎ জাতির মঙ্গল উদ্দেশ্য এর নয়—এর উদ্দেশ্য নিজের আরাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমস্ত ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় যেন তাঁর আত্মাপুরুষ বলছে—এ ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু এ তো বলিষ্ঠ কর্মীর কথা নয়, জীবন-সংগ্রামে পূর্ণভাবে সমর্থ ব্যক্তির কথা নয়—এটা জীবন-সংগ্রামে যে পরাজিত হ'য়েই আছে তার কথা; এখন নিমিত্তমাত্র সব্যসাচীই হোক বা মুসলমানই হোক। ইংরেজের মতো এমন একটা শক্তিশালী জাতির হাত থেকে ভারতবর্ষের মতো এমন একটা বৃহৎ ও রসাল সাম্রাজ্য খ'সে যাবার মুখে সব ব্যাপারটা জলের মত সহজ কিংবা বিয়ে-বাড়ীর মত আনন্দময় আর ভিয়ানের সুবাস পরিপূর্ণ থাকবে এটা দিবাস্বপ্ন দ্রষ্টার স্বপ্নমাত্র। সুতরাং মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর শোভাযাত্রার ঢাকের বাদ্য থামলেই সমস্ত দিক দেশ আকাশ বাতাস নিয়ে বিয়েবাড়ির মত আনন্দ-কোলাহল মুখর কিম্বা কৈলাস পর্বতের শিখরদেশের মত শান্তিময় হ'য়ে উঠবে এটা মনে ক'রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গভীর দৃষ্টির পরিচয় দেন নি। সুতরাং এ-সব ব্যাপারে যদি থাকতেই চান, তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি কিছু মনের বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন তবেই কিঞ্চিৎ কাজের মত কাজ হবে। আর তা যদি না পারেন তবে মৌন অবলম্বন ক'রে যদি মনে মনেও এই দৃঢ় সঙ্কল্প গ'ড়ে তুলতে পারেন যে অন্যায়কে আমি প্রশ্রয় দেব না, অন্যায়ের কাছে কখনও নত হব না তা হ'লেও তার একটা মূল্য ও সার্থকতা থাকবে। কেননা হিন্দুরা বিশ্বাস করে ও জানে যে স্থূল জগতের স্থূল সংঘর্ষের অন্তরালে সূক্ষ্ম জগতে কতক-গুলি সূক্ষ্ম শক্তির পরস্পরকে বিধ্বস্ত করবার একটা খেলা অবিরাম চলছে। আর শুধু হিন্দুরাই বা কেন, সমগ্র সভ্য মানব সমাজই ও ব্যাপার কতকটা জানে। তাই তো বলা হয় The pen is mightier than the sword—চিন্তা-শক্তি তরবারির শক্তির চাইতে বড়। চিন্তা-জগতেরও পিছনে আছে এক সূক্ষ্মতর শক্তির জগৎ—যে শক্তি-জগৎই হচ্ছে কর্ম-জগতের আসল কারখানা-বাড়ি। এইখানে যা সত্য হ'য়ে না উঠেছে চিন্তায় তা শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে পারে না এবং কর্মে তার ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা থাকে না। মনের সঙ্কল্পের এখানে একটা মস্ত বড় মূল্য আছে।

এই গেল তত্ত্বের দিক। এখন শোভাযাত্রার তথ্যের দিক অর্থাৎ ব্যবহারিক দিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতাকে একটা দিক থেকে হুঙ্কারী সভ্যতা নাম দেওয়া যেতে পারে—ইংরেজী ক'রে বললে যা দাঁড়ায় civilization of noises। এই দেখ না কেন সেকালে যুদ্ধ হ'ত বাণ চালিয়ে যা নিঃশব্দে এসে যোদ্ধাদের বুকে বিঁধত বা কানের পাশ দিয়ে চলে যেত, আর একালে যুদ্ধ চলে কামান থেকে গোলা চালিয়ে যা করতে হয় কর্ণপটহ প্রায় বিদীর্ণ ক'রে। সেকালে রাজা-রাজড়ারা চলতেন পাল্কিতে চ'ড়ে যা চলত নিঃশব্দে—

বাহকদের হাঁইহুই শব্দ ছাড়া যা প্রায় সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায়—আর একালে সাধারণ লোকরাও চলে রেলগাড়ির এঞ্জিন হাঁকিয়ে খটাখট খটাখট শব্দের এক তুমুল বিপ্লব তুলে মাটি কাঁপিয়ে বাতাসে ঝড় বইয়ে দিয়ে। সেকালে ঘরে ঘরে চরকা চলত যার কেবলমাত্র একটু ঘুর ঘুর শব্দ হ'ত যা শুনে কবি গান বাঁধবার প্রেরণা পায়

ভোমরায় গান গায় চরকায় শোন্ ভাই—

আর একালে যখন হাজার হাজার চরকা একসঙ্গে কারখানা-বাড়িতে চলতে থাকে তখন সে যে কী শব্দের ফলাহার, কী যে খটং খটং ঘটং ঘটং পটাশ পটাশ বেইং বেইং এর আনন্দ-কোলাহল তা কহতব্য নয়। তাই বলছিলাম যে বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতাকে একটা দিক থেকে civilization of noises হুঙ্কারী সভ্যতা নাম দেওয়া যেতে পারে।

এই হুঙ্কারী সভ্যতার হুঙ্কার সমূহ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বড় বড় শহরে রেলওয়ে প্ল্যাট্ফর্মে জাহাজঘাটায় কারখানা-বাড়ির সীমানায় আরও অমনি কোনো কোনো স্থানে।

এখন ধরো, কোনো ব্যক্তি যদি বড় শহরের বড় রাস্তার পাশে বা রেলওয়ে প্ল্যাট্ফরমে বা কোনো কারখানা-বাড়ির সীমানায় গিয়ে বলে—"এই আমি এইখানে প্রার্থনায় বসলাম, হে বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতা তুমি থেমে থাকো"—তবে সেটাকে একটা বিরাট্ রসিকতা বলেই মনে হ'তে থাকবে।

কিন্তু যদি দেখা যায় যে সেই রসিকতার পিছনে রয়েছে এক জোড়া রক্তচক্ষু এবং যুগল বাহুর কনুই পর্যন্ত গুটান আস্তিন তবে সেটাকে রসিকতা ব'লে ভুল করবার অবসর থাকে না। তখন মনে এই কথাটাই জাগতে বাধ্য যে, হয় ব্যক্তিটি পাগল আর নয় তো তাঁর বিশেষ কোন মতলব আছে। পাগলামি ও মতলববাজির মধ্যে মতলববাজিটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন হিন্দুর শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখা যায়।

ধরা যাক, কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মনে করা যাক একটি মসজিদ্ তারি পাশে। এখন এই রাজপথ সারা দিনমান এবং রাত্রিরও এক অংশ থাকে কলকোলাহল-মুখরিত। এই কলকোলাহলের একটা ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই ট্রামের শ্রবণ রঞ্জিনী ঘর্ঘর ধ্বনি ও ড্রাইভারের শ্রীচরণের বুট নিপীড়নে উদ্ভূত ক্ল্যাং ক্ল্যাং মধুর বোল—যা শুনে ঠিক বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে প'ড়ে যায় না। তার পর যত ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কারের হর্নের উদারার সা থেকে তারার নি পর্যন্ত নানা সুরের নানা পর্দ্দার নানা তালের প্রাণ জুড়ান সতর্কীকরণ। তার পর ডবল-ডেকার বাস্ ও আড়াই-টনী লরির আশপাশের বাড়ির ভিত-কাঁপানো গুম্ গুম্ আওয়াজ। আবার কখনো সখনো ফায়ার-ব্রিগেডের ঘণ্টার অবিরাম আর্তনাদ ও হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ্ মেলের ঘণ্টার অবিশ্রাম ব্যস্তবাগিশতা। এর উপর আবার থাকতে পারে চূড়ার উপর ময়ূর-পাখার মতো পাড়া-প্রতি-বেশীদের বাড়ির গ্রামোফোন রেডিও, কোন তন্বী তরুণীর হারমোনিয়াম শিক্ষার প্রথম পাঠ বা কোন বলিষ্ঠ-পেশী যুবকের কর্নেট শিক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। পূর্ব্বেই বলেছি যে হুঙ্কারী সভ্যতার এই সব হুঙ্কার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট জুড়ে থাকে সারা দিনমান ও রাত্রিরও এক অংশ এবং প্রতিটি দিন। অথচ এ-সবের কিছুতেই মসজিদের প্রার্থনার ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু কালেভদ্রে যদি হিন্দুর শোভাযাত্রা দু-চার মিনিট বা ঘণ্টার জন্যেও বাজনা বাজিয়ে চলে তবেই আর রক্ষা নেই—তখনই শুধু মুসলিমদের প্রার্থনা ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত হ'য়ে ওঠে; মসজিদের ইট পাথরগুলোও বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে! এ এক অদ্ভুত যুক্তি! তার চাইতেও অদ্ভুত চাতুরী!! তার চাইতেও অদ্ভুত বোকা বুঝ-দেওয়া!!!

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় যে পাগলের পাগলামি নয়। এ হচ্ছে মতলববাজের মতলববাজি।

কিন্তু নিশ্চয় জানি এই বাংলা দেশে এমন বহু মুসলমান আছেন যাঁরা পাগলও হন নি এবং যাঁরা মতলববাজও নন। এঁদেরই মনোভাব আজ সারা মুসলিম-সমাজে ছড়িয়ে যাওয়া, চারিয়ে যাওয়া দরকার এবং তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ও চারিয়ে যাবেই। কেননা, অযথা ঝগড়া করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বা প্রবৃত্তি নয়—উপরন্তু প্রতিবেশীর প্রতি সারা জীবন চোখ টেনে বড় ও রক্তবর্ণ ক'রে চেয়ে থাকা খুব আরামের নয়। কিন্তু আজ যদি মতলববাজদের কাছে ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক হিন্দুরা আত্মসমর্পণ করে তবে ঐ সুস্থ মনোভাব মুসলিম-সমাজে ছড়িয়ে ও চারিয়ে যাওয়ার পথে সবার চাইতে বড় বাধাটারই সৃষ্টি করা হবে।

আর যদি ধরেই নি যে আজ বাংলা দেশের সমগ্র মুসলিম-সমাজ অর্দ্ধেক পাগল আর অর্দ্ধেক মতলববাজে পরিণত হয়েছে (যা ধ'রে নেবার কোনো কারণই নেই) তবে হিন্দুর পক্ষে নির্ভুলভাবে তার মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াবার যুক্তি আরও প্রবল হয়েই ওঠে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে তো বটেই—ঐ মুসলিম-সমাজকেও বাঁচাবার জন্যে। কেননা, পাগল ও মতলববাজ এ দুয়ের কেউই কোন সমাজকে মহত্ত্বের পথে তো দূরের কথা স্বাস্থ্যের পথেও নিয়ে যেতে পারে না। ইতি হসন্ত

মহিলা-সংবাদ

শ্রীসারদাবাঈ মেহ্‌তা পুণা ও বোম্বাইয়ের শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য রূপে ইহার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কিছুদিন বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেটেরও সভ্য ছিলেন। গুজরাটে সর্ব্বপ্রথম যে দুইজন মহিলা বি-এ উপাধি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী সারদাবাঈ একজন। মহিলা-সমাজের কল্যাণকর বিবিধ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁহার যোগ আছে। নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের তিনি একজন উৎসাহী কর্ম্মী। আহ্‌মেদাবাদ মহিলা বিদ্যালয় এবং বরোদার চিম্‌নাবাঈ সমাজ তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বারডোলী সত্যাগ্রহের সময় তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এই সময় আপোষ-মীমাংসার জন্য বোম্বাই লাটসমীপে যে প্রতিনিধি-দল গমন করেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

শ্রীমতী সারদাবাঈ মেহ্‌তা

শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে জি-এ উপাধি-প্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ

ব্রহ্মাণ্ডে জীবের স্থান

শ্রীকমলেশ রায়, এম্-এস্‌সি

অধ্যাপক ফ্লিণ্ট্ দর্শনে দুঃখবাদ (pessimism) সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,—সুস্থ, কর্ম্মঠ ও মোটামুটি সফল জীবন নিয়ে কেউ-ই ভাবে না 'জীবনের প্রকৃত মূল্য কি?' ব্যর্থতা, শোক, তাপ আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে এই গভীর প্রশ্ন, এবং এর পরিণতি নৈরাশ্যবাদে।

দার্শনিক দুঃখবাদের মূল হয়ত এই, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে নির্লিপ্তভাবে, আশা-নিরাশার প্রেরণা ছাড়িয়ে কেবলমাত্র প্রকটিত সত্যের দাবিতে এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই তাও নয়।

মানব মনের প্রসার বিশ্বের দেশ-কালের মধ্য দিয়ে অসীমভাবে ব্যাপ্ত হ'তে চায়। বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে তার ব্যাপ্তি সুদূর অতীতে ও ভবিষ্যতে, নিকট ছাড়িয়ে দূরে বহু দূরে তার গতি,—কোন দিকেই কোন সীমা মান্‌তে সে রাজী নয়। তাই জড়বাদের সঙ্গে আদর্শবাদের এত বিরোধ। জড়বাদী বলেন, জীবনের স্ফুরণ ক্ষণিক; ব্যক্তিগত জীবনও ক্ষণিক, আবার, নিখিল বিশ্বের জীবন-ধারাও চিরন্তন নয়। আদর্শবাদী বিচলিত হয়ে ওঠেন; এই সুন্দর বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার অস্তিত্ব ক্ষণিক—অলীক? এই বিরাট্ মহান্ সত্তা কেবলমাত্র অণুপরমাণুর অন্ধ সংযোগ? নীতিবিহীন, পরিণামবিহীন, ঈশ্বরবিহীন ব্রহ্মাণ্ড—এ কি কোন প্রকারে সম্ভব? আদর্শ ও জড়বাদ, আস্তিক ও নাস্তিকবাদের অসংখ্য যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রশ্নটি জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে উঠেছে। জড়-জগতের চিত্র যেমন পরিস্ফুট, মানব-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাও তেমনি অনুপেক্ষণীয়। উভয়ের দাবি যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তবে ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। কিন্তু যদি তারা মূলতঃ অভিন্ন হয়, তবে হয়ত কোন দিন —যত দিন পরেই হোক্—বিশ্বতানের সেই অবিচ্ছিন্ন সুরের ঝঙ্কার মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে।

আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার কথা ছেড়ে দিলে, বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে এই কথাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে যে, জড়ের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে জীবনের আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, দেহ-বাহিত ভিন্ন 'মুক্ত-আত্মা'র কোনও পরিচয় নাই। স্বতন্ত্র দৈহিক ও মানসিক বিকাশের নাম জন্ম, এবং মৃত্যুই ব্যক্তিগত সত্তার পরিসমাপ্তি। জড় ও জীব পৃথক্ বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনপ্রকার গূঢ় সম্বন্ধ আছে, সন্দেহ নাই। জড়ের বিশেষ গঠন-প্রণালীতে জীবন-শক্তির আবির্ভাব হয়। 'জীবন' একটি বিশেষ দৈহিক অবস্থার ফল, যেমন—ফুলের সৌন্দর্য্য ফুলের বিশেষ সুষ্ঠু গঠনে, দলিত নিষ্পেষিত ফুল কর্দ্দমের তুল্য। ফুলহীন ফুলের সৌন্দর্য্য অলীক কল্পনা; তেমনি জীবহীন জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব।

জীবজাতি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অতিক্ষুদ্র এককোষিক জীবাণু ও জটিলতর বহুকোষিক জীব। মানুষ ও অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর জীবদেহ অসংখ্য কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। কোষগুলি অবশ্যই জীবিত, কারণ তাদের পুষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

এই সকল অসংখ্য কোষাদি গঠিত এক একটি ব্যক্তি এক একটি পৃথক্ জীবন-সত্তা। অর্থাৎ অগণিত কোষ-কণিকা দিয়ে যে একটি জটিল দেহধারী প্রাণী সৃষ্ট তার ব্যক্তিত্ব একটি মাত্র ধারায় প্রবাহিত। তার মৃত্যুতে এই ধারা শতধা বিভক্ত হয়ে নিম্ন হ'তে নিম্নতর প্রাথমিক অবস্থায় পর্য্যবসিত হয়। তখন সেই উন্নত জটিল ব্যক্তিত্বের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; ভগ্ন রাজপ্রাসাদের ইষ্টক-স্তূপের মতই তার পরিসমাপ্তি। আবার জীবাণুর মৃত্যুতে কেবলমাত্র কতকগুলি অণুপরমাণু অবশিষ্ট থাকে। এই সকল প্রাথমিক এককোষিক অবস্থায় কীটাণুর মানসিক বৃত্তি যত নগণ্যই হোক্ না কেন, অচেতন ধূলিরেণুর তুলনায় তার পার্থক্য প্রচুর। তবে এই স্থানেই আমরা জড়পরমাণু ও জীবাণুর কোনও প্রকার সহজ সম্বন্ধ-সেতু লক্ষ্য করবার আশা করতে পারি। কিন্তু জটিল বহু-কোষিকই হোক, বা সরল এককোষিকই হোক, জড় ও জীবের ব্যবধান দুস্তর।

কিছু কাল পূর্ব্বেও আমাদের ধারণা ছিল জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ একান্ত ভাবে মানুষের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত সাধনায় সেগুলির কিয়দংশ মানুষের করায়ত্ত হয়েছে। জড়জগৎ ও জীবজগতের রহস্য অনুধাবন করতে গিয়ে বর্ত্তমানে বাস্তবিকই জীববিজ্ঞানের

সঙ্গে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

আর একটি মূল্যবান কথা—জীবের উদ্ভব ও স্থিতি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ,—প্রধানতঃ উষ্ণতা, জল, বায়ু ইত্যাদির। কিন্তু নিখিল বিশ্বের মাঝে এই সকল সুযোগ্য অবস্থার সম্মিলন সমুদ্রের তুলনায় জলবিন্দুর সমানও নয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও জড়পিণ্ডের উষ্ণতা পরিমাপ করলে প্রায় ২৭০° সেণ্টিগ্রেড হ'তে আরম্ভ ক'রে লক্ষাধিক মাত্রা পাওয়া যাবে। কিন্তু সকল উষ্ণতামাত্রাই কি জীবের উপযোগী? বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের উষ্ণতামাত্রা প্রায় ১৫০°, নেপচুন ও প্লুটোর আরও কম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের উষ্ণত মোটামুটি ০°—৫০°। আবার সূর্য্যের উপরিতলের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০°, এবং নক্ষত্রাদির অন্তর্দ্দেশে কল্পনাতীত উত্তাপ। এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকল অংশই জীবসৃষ্টির পক্ষে হয় অত্যধিক তপ্ত, নতুবা অত্যধিক শীতল। বিশ্বের এক কোণে পৃথিবীর উপর কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি সঙ্গোপনে বাস করছে। এ যাবৎ পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও জীবের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এ কথা বোধ হয় অত্যন্ত নিশ্চিত যে, একমাত্র পৃথিবীর ন্যায় আবহাওয়াতেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর উদ্ভব হ'তে পারে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে কয়টি জড়পিণ্ডের উষ্ণতা পৃথিবীর সমান? অনন্ত বিশ্বে কয়টি পৃথিবী বা সৌরজগৎ আছে? এ পর্য্যন্ত কোনও নক্ষত্রকে সূর্য্যের ন্যায় গ্রহপরিবেষ্টিত দেখতে পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র আমাদের সূর্য্যের এই বিশেষত্বের অর্থ কি? এর কারণ, সৌরজগৎ যে উপায়ে সৃষ্ট হয়েছে, সেই কারণটি সংঘটিত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। লাপ্লাস প্রথমে বলেন যে আদিম সূর্য্যের আবর্ত্তনের ফলেই গ্রহপিণ্ডগুলির উদ্ভব হয়েছে। এই মতবাদ সত্য হ'লে প্রায় সকল নক্ষত্রকেই গ্রহ-উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত দেখা যেত, কারণ অন্যান্য নক্ষত্রও সূর্য্যের ন্যায় অল্পবিস্তর আবর্ত্তনশীল। পরে সর্ জেম্‌স্ জীন্‌স্ প্রমাণ করলেন, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। আদিম সূর্য্যের নিকট দিয়ে অন্য একটি নক্ষত্র চলে যাওয়ার ফলে তার মাধ্যাকর্ষণে গ্রহপিণ্ডের জন্ম হয়। এইরূপ যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এত অল্প যে, বিশ্বের আর কোথাও ঘটেছে কিনা সন্দেহ, দু-এক স্থানে ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে,—হয়ত আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে দূর-দূরান্তে। একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর জন্ম ও নক্ষত্র-নীহারিকাখচিত ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম প্রায় সমসাময়িক—মোটামুটি ২০০ কোটি বৎসর। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালেই কোনও সুযোগে সূর্য্য-নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণগত এই টাগ-অব্-ওয়ার খেলা সাঙ্গ হয়। বর্ত্তমানে নক্ষত্র, নীহারিকা প্রত্যেকের মধ্যেই বৈরাগ্যের ভাব দেখা যায়, সকলেই পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে দূরে সরে যাচ্ছে!

একটি প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। যদি কোথাও পৃথিবীর মত কোনও গ্রহ থাকে তবে সেখানেও জীবের অস্তিত্ব থাকবে কি? উষ্ণতা ও আবহাওয়া উপযুক্ত হ'লেই কি জীবের উদ্ভব হয়? অনেকে মনে করেন, উপযুক্ত আবহাওয়া থাকলেই আপনা হ'তেই অণুপরমাণুর বিশেষ সংযোগে প্রাথমিক জীবকোষাদির সৃষ্টি হবে, অনন্তর ক্রমবিবর্ত্তন-ধারা অনুসারে জটিলতর ও উন্নততর জীবের আবির্ভাব হবে। আবার অনেকে মনে করেন, সৌরজগৎ সৃষ্ট হবার জন্য যেমন অন্য একটি নক্ষত্রের আগমন-স্বরূপ একটি আকস্মিক কারণের প্রয়োজন হয়েছিল, অণুপরমাণু-সংযোগে জীবদেহ সৃষ্টি হবার জন্যও তেমনি কোনও প্রকার আকস্মিকতার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ অণুপরমাণু-সংযোগে জীবকোষাদি সৃষ্টির মূল রহস্য এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এখন দেখা যাক্, ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও পৃথিবীর ন্যায় আবহাওয়া আছে কি না এবং থাকলে সেখানে জীবাদি আছে কি না।

আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীর মত; শুক্র গ্রহটি উষ্ণতর এবং মঙ্গল গ্রহটি পৃথিবী অপেক্ষা শীতল। সেখানে অল্পাধিক জলবায়ুও আছে। এই কারণে গ্রহ দুটি প্রাণী-বাসের একেবারে অযোগ্য ব'লে মনে হয় না। শুক্র গ্রহে কীট-পতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর জীব এবং মঙ্গল গ্রহে উন্নত শ্রেণীর জীব থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই সেখানে জীবের চিহ্ন বুঝতে পারা যায় নাই।

একমাত্র পৃথিবীই হোক্, বা অন্য কয়েকটি স্থানেই হোক নিখিল বিশ্বের তুলনায় তার স্থান অতি নগণ্য। কেবল স্থানাধিকার ও অবয়বের দিক্ থেকেই নয় জড়-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মাদি পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় তার তুলনায় জীবজগৎ একটি অতি নগণ্য বুদ্বুদ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এর যেন কোনও সামঞ্জস্য নাই। নাক্ষত্রিক ব্রহ্মাণ্ডের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সর্ জেম্‌স্ জীন্‌স্ বলেছেন, জড়-ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ও আচরণ জীবের সম্পূর্ণ প্রতিকূল—এমন কি ভীতিপ্রদ! তার কাছে আমাদের জীবনের আশা-আনন্দ, ধর্ম্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-আদর্শ সবই অর্থহীন, এ সব

যেন তার ধারার বাইরে—আগাছার মত। আমাদের প্রতি তার ঔদাসীন্য অত্যন্ত পরিস্ফুট।

অবস্থার প্রতিকূলতায় যেমন ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে জীবের উদ্ভব হ'তে পারে নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে জীবলীলার অবসান হবে। জানি না প্রকৃতির এই ক্ষণিক লীলার অর্থ কি! হয়ত মন-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আপনাকে উপলব্ধি করতে চান। প্রকৃতির এইরূপ আত্মপ্রেমের মধ্য দিয়ে কোনও বিরাট উদ্দেশ্যের কি আভাস পাওয়া যায় জানি না। মানবজন্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যকে এই ভাবে চিত্রিত করতে যাওয়ায় কবিত্বের আভাস থাকতে পারে, তবে সত্যের দিকে কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় বলা কঠিন।

ব্রহ্মাণ্ডে জড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা অসম্ভব। ঈশ্বরবাদিগণ যেমন ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভু বলেছেন, কোন কোন জড়বাদী তেমনি জড় পরমাণুকে স্বয়ম্ভূ ও চিরন্তন সত্তা ব'লে ধরে নিয়েছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্তও সকলের ধারণা ছিল জড় ও শক্তি অবিনশ্বর এবং অসৃজনীয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত—উপযুক্ত শক্তির আলোক-রশ্মির সংঘর্ষ ও মিলনে জড়কণার সৃষ্টি হ'তে পারে। কে জানে আদি ব্রহ্মাণ্ড শুধুই আলোকময় ছিল কি না। অতি অল্প পরিমাণে এই জাতীয় উচ্চশক্তির আলোক রেডিয়াম হ'তে নির্গত হ'তে দেখা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে জড়ই (রেডিয়াম) হ'ল আদি উপাদান। তবে আরও উচ্চশক্তির আলোকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে;—এর নাম কসমিক্ রশ্মি বা ব্যোম-জ্যোতিঃ। এই আলোক কি ভাবে উৎপন্ন হয় তা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, আকাশে আকাশে এই সকল রশ্মির পরস্পর সংঘর্ষে আজিও জড়পরমাণু সৃষ্টি হচ্ছে। আবার ব্যোম-জ্যোতি সৃষ্টির কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন জড়পরমাণুবিলোপনে (annihilation of atoms) এই রশ্মি উৎপন্ন হ'তে পারে। এবিষয়ে আলোক ও জড় উভয়ের প্রাচীনত্বের দাবিই সমান। কিন্তু প্রকৃতির এই সকল কার্য্য চিরন্তন নয়। প্রকৃতির অসংখ্য ভাঙা-গড়া খেলার মধ্য দিয়ে এসে পড়ছে অপরিহার্য্য বিক্ষিপ্ততা, যার পুনঃসংস্কার অসম্ভব। অন্য দিকে নক্ষত্র-নীহারিকা-সূর্য্যের শক্তিক্ষয়ে তারা ক্রমশঃ স্তিমিত নির্ব্বাপিত হয়ে পড়ছে। চিরন্তন জীবনের স্ফুরণ এই বিশ্বে কিরূপে সম্ভব? ভবিষ্যতে ব্রহ্মাণ্ডে জীবলীলার পূর্ণাবসান আসবে।

এই ভাবে বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবনের কোনও স্থায়ী ও নিগূঢ় অর্থ অথবা প্রকৃতির কোনও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারা যায় না। অবশ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূলতঃ অন্ধ জড়পরমাণুর লীলাস্থল ব'লে প্রমাণিত হ'লে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবস্থানুযায়ী যেমন এক দিন জীবের সূচনা হয়েছে, তেমনি আবার এক দিন তাদের হবে নিঃশেষে পরিসমাপ্তি।

আত্মার চিরাবসান বা নির্ব্বাণের কথা একমাত্র বুদ্ধদেবই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তবে এই কারণে তিনি যে বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করেছেন তা মর্ম্মভেদী দুঃখবাদেরই নামান্তর। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যেও মহানির্ব্বাণের চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ কথা যদি নির্ভুল হয় তবে কয় জন এই নির্ম্মম সত্যকে অবিচলিত ভাবে মেনে নিতে পারবে? আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন বিশ্বের এই চিত্র হ'তে আপনাকে মুক্ত করবার জন্য মানব-হৃদয়ের ব্যাকুলতাই জাগিয়ে তোলে বিরাট্ আদর্শের চিত্র, ঈশ্বর হয়ে ওঠে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক।

পণ্ডিত জওআহরলাল

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিরাপদ বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলে
বাঁধো নি তরণী তব। মত্ত কোলাহলে
পাষাণে ভাঙিছে যেথা তরঙ্গ দুর্ব্বার
তরী নিয়ে সেথা যেতে আনন্দ তোমার।
বুনিতে জানো না মিথ্যা বচনের জাল,
রসনায় খেলে যায় খোলা তরোয়াল।
সত্য চাও—তাই নহ থিয়োরীর দাস
আকাশে তোমার নহে কুসুমের চাষ

বাস্তবের মৃত্তিকারে করিয়া স্বীকার
গগনে স্বপনজাল করেছ বিস্তার
পরিপূর্ণ বৈষ্ণবের লক্ষণ তোমাতে
বিপ্লবের বজ্র তাই তুলে নিলে হাতে
মানুষেরে ভালোবেসে। তপস্যা তোমার
সর্ব্বহারাদের মুক্তি। লহ নমস্কার।

বেঙ্গল-টাইম

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নিষ্প্রদীপ মহড়ার মধ্যযামে বাংলা-সময় দেখা দিলেন। নিষ্প্রদীপ শহরকে সুসহ করিবার কিংবা ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের হিসাবটাকে সহজ করিবার জন্যই যে বেঙ্গল-টাইমের পরিকল্পনা সেটি অনুমান করিয়া লইলেও—বাংলার অন্তঃপুরে বাংলা-সময় যে বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল, সে সম্বন্ধে অনুমানের অবসর মাত্র রহিল না।

আমার সংসারের কথাটাই বলি।

রাত্রিতে সুসংবাদটা শুনিয়া পত্নী নীরবে মাথা নাড়িলেন। অর্থাৎ সময় নাকি আবার বদলায়!

টাইম-পিসটা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—রাখ, আর রঙ্গ করতে হবে না।

—আঃ, বুঝছ না—কাল থেকে কলকাতার সময় আর থাকবে না, ছত্রিশ মিনিট আগে আপিস।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। মিনিটখানেক চাহিয়া যখন ওষ্ঠ কিংবা গুম্ফপ্রান্তে বিদ্রূপের কুঞ্চনরেখা বা চক্ষুতে ছদ্মগাম্ভীর্য্য আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, তখন সংশয়-কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন—হাঁ-গা, সত্যি?

সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কঠিন শপথ-বাণী উচ্চারণ করিলাম।

—ওমা, বল কি গো? এই বলে কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে ছুটোছুটি। আবারও আগে বেরুলে শরীরের আর থাকবে কি?

শরীরের ছিলই বা কি! শীতের আগমনে গোটাকতক জরাজীর্ণ জামা আঁটিয়া ও রিপু-অলঙ্কৃত পুরাতন জার্ম্মেনী আলোয়ানে বত্রিশ ইঞ্চি হাড্ডিসার বুকখানিকে কোনক্রমে ছত্রিশে দাঁড় করাইয়াছি। জোরে ঝড় উঠিলে পত্নী আমায় ন্যাড়া ছাদে উঠিতে বারণ করিতেন। উনপঞ্চাশ বায়ুর বেগ দেহের মধ্যেই ডিস্‌পেপসিয়ার কল্যাণে যা বহন করিতেছি, বাহিরে একটি বায়ুই খড়ের কুটার মত এই দেহকে উড্ডীয়মান করিবার পক্ষে যথেষ্ট! কিন্তু এইটিই নাকি কেরানীর শাশ্বত চেহারা। মসীধারণে মস্তিষ্ক আলোড়নেরই প্রয়োজন, পেশী সঞ্চালনের আবশ্যকতা নিরর্থক। সেই জন্য দেহটাকে বাদ দিয়া মাথাটাই জীবনী লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ দেহ নিরীহ বলিয়াই মাথাটা অধিকমাত্রায় সক্রিয়। এই মাথার মধ্যে যত কিছু দুশ্চিন্তার বাসা। জীবনধারণের দুশ্চিন্তাটা নিতান্ত গৌণ হইয়া গিয়াছে। সমাজ, সদাচার, ধর্ম্ম, ভগবান্, প্রগতি ইত্যাদির দুশ্চিন্তাই সর্ব্বদা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে।

এককালে পুরাতন সমাজের বিধানগুলিকে বিষবৎ জ্ঞান করিতাম। সমাজপতিদের রাক্ষস-জাতীয় জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। যে পল্লী-সমাজচিত্র আঁকিয়া বাংলার বহু লেখক আমাদের বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, সে বিভীষিকায় আজ আর শিহরিয়া উঠি না। তবু, রূপান্তরে আরও অনেক নূতন বিভীষিকায় আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি এবং সংস্কার-বিমুখ মন এক দিক হইতে মোড় ফিরিয়া রক্ষণশীলতার আর একটি ভিন্ন রূপে হিতকামীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু ভূমিকা আর দীর্ঘ করিলে বাংলা-সময়ে কুলাইয়া উঠিতে পারিব না। সুতরাং টাইম-পিসটার কাঁটা সরাইয়া ব্রাকেটের উপর রাখিয়া দিলাম। পত্নী আর প্রতিবাদ করিলেন না। বিস্ময়ও তাঁহার অচিরাৎ কাটিয়া গেল। কেরানীর স্ত্রী হইয়া অহরহ প্রতিবাদ করিলে চলে না—এটি তিনি ভাল রকমই জানেন।

পরদিন বুঝিলাম—আমার অসুবিধার চেয়ে তাঁহার অসুবিধাই বেশী হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ করিয়া শীত-প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা—কেরানীবধূ ছাড়া কোন মেয়েরই সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্লান্তির একটি স্পষ্ট ছায়া তাঁহার মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যথা অনুভব করিলাম।

বলিলাম—এত তরকারি রাঁধবার কি দরকার ছিল?

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে আলাদা ক'রে আবার রান্না করব নাকি?

—তবে অল্প রান্নাই ক'রো, ডালটা বাদ দিও।

—বেশি আর কি! ডাল না হ'লে ছেলেগুলো খাবে কি দিয়ে।

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, বাঙালী মেয়েরা সাধ্য ছাড়া আয়োজন করিবেই। আমরা যাহা দুঃখ মনে করি,

উহাদের সেইটাই সুখ। বরং একটি তরকারি পাতে কম দিবার যে বেদনা তাহা পরবর্ত্তী কয়েক দিনের মধ্যে উহাদের মন হইতে মুছিতে চাহে না।

পান মুখে পুরিতে না-পুরিতে বাহিরে হরেনের ডাক শোনা গেল—হ'ল দাদা? ন'টা বাজতে পাঁচ।

কোন রকমে কাছা-কোঁচা গুঁজিয়া জামাটা মাথা ও জুতাটা পায়ে গলাইতে গলাইতে পান-চর্ব্বণ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, যাই। স্ত্রীর পানে ফিরিয়া কহিলাম, কি কি আনতে হবে বল?

—আজ নয়, কাল বলব। মৃদু হাসিয়া স্ত্রী উত্তর দিলেন।

পথে তখন রীতিমত কেরানী-দৌড় আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলার নিজস্ব একটা সময় যুদ্ধের হিড়িকে ঠিক হইয়া গেল—অথচ বাঙালীরাই তাহা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এমন করিয়া কি পারা যায়? আমাদেরও সহ্যের ত একটা সীমা আছে। মানুষ না-হয় সময়কে অগ্রসর করিয়া দিল, প্রকৃতি সেই পরিবর্ত্তনে সায় দিবেন কেন? এক ঘণ্টা আগে ক্ষুধার উদ্রেক হইবেই বা কেন? সময় আগাইলেই ত সন্ধ্যা শীঘ্র করিয়া আসিবেন না। শীতকালের দীর্ঘতর রাত্রি; উঠিতে না-উঠিতেই ঘড়ির কাঁটা উদ্যত কষার মত মানুষকে শাসন করিতে থাকিবে। ছুট—ছুট—ছুট। অক্ষুধাগ্রস্ত ও অম্লপীড়িত কেরানীর আয়ু এই আঘাতে কি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে না? মহাবিপ্লবের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ এই ক্ষুদ্র বিপ্লবকে বরণ করিয়া লওয়া তাই দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। কেহ কেহ রহস্য করিলেন—আলস্যপরায়ণতার অপবাদ এত দিনে আমাদের ঘুচিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান!

পরিচিত সকলকে দেখিয়া ও সকলের অসুবিধাগুলি শুনিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলাম। নিজের কষ্ট তখনই অসহ্য ঠেকে যতক্ষণ সে নিজের স্কন্ধেই চাপিয়া থাকে। ভাগে যে দুঃখ ভোগ করা যায় তাহা সুখভোগেরই নামান্তর।

আপিস হইতে ফিরিবার সময় রৌদ্রস্নিগ্ধ আকাশ (শীতকাল বলিয়া) মাথার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাতের কলরব ও কর্ম্মতাড়নায় যে স্নেহের ধনগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার বা সোহাগ করিবার অবসর ঘটে না, বা সন্ধ্যার গাঢ় ধোঁয়ার মধ্যে অনুজ্জ্বল কেরোসিন আলোয় যাহাদের শীর্ণ মুখের ভাষা পাঠ করিবার উৎসাহমাত্র থাকে না—এতখানি বেলায় বাড়ি পৌঁছিয়া তাহাদের ভাল করিয়া দেখিবার আগ্রহে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বাংলা-সময় যত অশান্তিই বহিয়া আনুক—সংসারের সম্বন্ধটিকে মধুর করিবার আয়োজন তাহার আছে।

—বাবা, এত সকাল-সকাল যে বাড়ি এলে?

—কেন রে, আসতে নেই? ছোট খোকাকে কোলে তুলিয়া তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিলাম। ঐ একটু আদরেই সে কোলের উপর এলাইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া কহিল, আমায় একটা মোটর গাড়ি কিনে দেবে বাবা?

—দেব। তোর দাদারা কোথায়?

—খেলতে গেছে।

—দিদি?

—মিণ্টুদের বাড়ি তাস খেলতে গেছে।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবুরা কোথায় খেলতে যায়?

—কি জানি—গড়ের মাঠে না কোথায়; আসে সেই সন্ধ্যের পর। হাঁ, আমার কথা শোনে কি না?

—আর উমা বুঝি রোজ তাস খেলে মিণ্টুদের বাড়ি?

—শুনি ত তাই।

—না না, ওসব ভাল নয়। বারণ ক'রো।

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, তুমিই বলো। বলিয়া পিছন ফিরিতেই দিদি আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে, আজ যে সকাল-সকাল ফিরলি?

—সকাল-সকাল গিয়েছিলাম যে।

—তা অত সকালে যাওয়ারই বা দরকার কি? যত সব ম্লেচ্ছপনা! গজ গজ করিতে করিতে তিনি সন্ধ্যা দেখাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীমানেরা সশব্দ-আলোচনা করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই কণ্ঠ তাহাদের ক্ষীণ হইয়া গেল। জুতার চট্‌পট্‌ শব্দও আর শোনা যায় না। ঘ্রাণশক্তি মানুষেরও কম নহে।

ডাকিলাম, দেব, ন্যাড়া?

—বাবা ডাকছেন? বলিতে বলিতে শ্রীমানেরা দুয়ারের ওপিঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—রোজই বুঝি খেলতে যাস?

—রোজ? ঢোঁক গিলিয়া কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গিতে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই নরম সুরেই বলিলাম, সামনে পরীক্ষা, একটু পড়াশোনা না করলে—

ন্যাড়া দাদার আড়াল হইতে বলিল—মাস্টার মশায় যে বলেছেন রোজ খোলা মাঠে বেড়াতে।

দেবু বলিল, আপনাদের আজ কিসের ছুটি হ'ল বাবা?

ছুটির তথ্য বুঝিয়া তাহারা মুখ ভার করিয়া পাঠ্য

পুস্তক লইয়া বসিল। দিবসের প্রতি দণ্ডের হিসাব উহারাও রাখে। স্বাধীনতা-হীনতায় ক্ষুব্ধ হওয়া আশ্চর্য্যের নহে।

রাত্রির আহারে বাংলা-সময় অচল। হেঁসেলে প্রখরা এক বঙ্গললনার কর্ত্রীত্বে পূর্ব্ব সময়েরই আধিপত্য ঘোষিত হইতে লাগিল।

দিদি বলিলেন, রেখে দে তোদের আদিখ্যেতা। ভর-সন্ধ্যেবেলায় খেলে রাক্ষসের পেট ভরে। সন্ধ্যে না-হতেই সাতটা! পোড়াকপাল!

মনে মনে ত কর্ত্রীত্বে সুখী হইলাম না। দুই বেলার আহারে দীর্ঘচ্ছেদটা সুসহ নহে। আপিসের নিয়ম ও বাড়ির নিয়ম নিগড় রচনা করিয়া আমাদের সত্যই পীড়ন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুরালয়-যাত্রার দিন আসিল। পাঁজি আনিয়া দিদি বলিলেন—দেখ্ ত একটা দিন। খুকিকে ওরা অঘ্রাণের শেষেই নিয়ে যেতে চায়।

প্রায় শেষাশেষি একটা না-ভাল না-মন্দগোছ দিন পাওয়া গেল। বারবেলা কালবেলার ফাঁকে ক্ষণস্থায়ী মাহেন্দ্রযোগ এক রতি রহিয়া গিয়াছে। যোগিনীর হুড়াহুড়ি বিশেষ নাই।

দিদি বলিলেন, ওই ভাল। একটার সময় ত্রয়োদশী ছাড়বে, সর্ব্ব সিদ্ধি ত্রয়োদশী—যাত্রা ভাল। পাঁজি তাঁহার হাতে দিতেই বলিলেন, বেশ ভাল ক'রে দেখ দেখি—ত্রয়োদশী না ছাড়লে আবার বেগুন খেতে নেই তো।

মিনিট সেকেণ্ডের হিসাব মুখস্থ করিয়া দিদি উঠিলেন।

ইতিমধ্যে সময়টা ইস্ত্রি-ভাঙ্গা জামার মত গায়ে প্রায় লেপিয়া বসিয়াছে। অন্তঃপুর পক্ষ হইতে বিশেষ অনুযোগ আর শুনা যায় না। রাত্রির আহার-পর্ব্বটিও সন্ধ্যা-অভিমুখী হইয়াছে। দিদিই বরং তাগাদা দিয়া বলেন, ওমা রাত তিন প'র হ'ল—ওরা খাবে কখন।

এমনই যখন অবস্থা তখন রবিবারে কন্যার শ্বশুরালয়-যাত্রার দিন আসিয়া পড়িল।

এ বাড়িতে যতটুকু আয়োজন ও বিশৃঙ্খল হওয়া সম্ভব—সকাল হইতেই সুরু হইয়াছে। বেলা আটটার সময় জামাতা বাবাজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া হাতঘড়ি দেখাইয়া হুড়াহুড়িটা বাড়াইয়া দিলেন। ভাবানীপুরে তাঁহাদের বাড়ী; কাজেই কেল্লার তোপ তাঁহাদের ঘড়ির সেকেণ্ডের ঘরগুলিকে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সময়-নির্ণয়ে সহায়তা করে। আধ মিনিটের গোলমালে গ্রহগুলি ত কম অনর্থ-পাত করে না!

মেয়েরা কাজ আগাইয়া রাখে ও পিছাইয়া দেয়। বিদায়টা উহাদের কাছে—চিরবিদায়ের পটভূমিকা। সে পটভূমিকা তাই কারুণ্যে বিস্তৃত ও মঙ্গলাচরণে অলঙ্কৃত। যত বা চোখের জলে যাত্রাপথ পিছল হয়—তত বা মঙ্গলাচরণের অজস্রতায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। অপর পক্ষের তাগাদার আর অন্ত থাকে না। এবং শুভলগ্ন প্রায় শেষ করিয়াই তবে সীমন্তিনীরা বাহিরে পা ফেলিবার সুযোগ দেন। অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে খুকির দেবরের আধ মিনিট হিসাব লইয়া বচসার মুহূর্ত্তে—মাহেন্দ্রযোগের অন্তিমশ্বাসের সঙ্গে শুভযাত্রা করা হইল। অনেক অশ্রু অপব্যয়িত হইল এবং অনেক সান্ত্বনা চলন্ত গাড়ির চক্রতলে নিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর খানিক থমথমে ভাবের সঙ্গে দুঃখটা তরল হইয়া আসিতেই দিদি স্ত্রীকে আহারের তাগিদ দিলেন। আমরা পূর্ব্বেই ও কার্য্যটা সারিয়া রাখিয়াছিলাম।

আহারান্তে ও-বাড়ির খুড়িমা আসিলেন এবং গল্প জুড়িয়া দিলেন। গল্প আর কিছুই নহে, কি কি তরকারি রান্না হইল ও কাহার স্বাদ কেমন ইত্যাদির আলোচনা।

—তা কি রাঁধলি আজ? জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিদি বলিলেন, মেয়েটা বাড়ি থেকে গেল—কিছুই ভাল লাগল না খুড়ি। আলু, কপি, বেগুন দিয়া একটা ঝালের ঝোল—

—বেগুন? আজ তেরোদশী না?

—হাঁ, একটা অবধি ত্রয়োদশী ছিল।

—ছিল কি লো, এখনও যে আছে। পোড়া কপাল, ওই ঘড়ি নিয়ে তোরা চলিস! ভট্‌চাজ্জি মশায় বলেন, ও দেখে ক্রিয়া-কর্ম্ম হয় না। তাই তো নিজের ঘরে পুরোনো-সময়ের ঘড়ি একটা রেখেছি।

হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া দিদি অপরাধিনীর মত চুপ করিয়া রহিলেন।

খুড়িমা খুশী হইয়া বলিলেন, তা একটা প্রাশ্চিত্তির ক'রে ফেলিস। এক-শ আট তুলসী দিয়ে—পাঁচটি বেরাহ্মন ভোজন করিয়ে—

দিদি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ওটা আর দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন না। পরদিনই ঘড়িটা মেরামত করিতে দিয়াছিলাম। আপিসে লেট হইয়া কয়েক দিন অকারণ ছুটি কর্ত্তিত হইয়াছে, উপরি-পাওনা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ধমক। মনে করিতেছি বাংলা-সময়টাকে সাহেব মহল হইতে টানিয়া আনিয়া ভট্টাচার্য্যদের পুঁথির পাতায় আবদ্ধ করিয়া দিব।

পঞ্জিকাকারদের লিখিলে তাঁহারা কি আমাদের মর্ম্ম-ব্যথা বুঝিবেন না?

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজ সোভিয়েট রুশ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। শত্রুর সংগ্রামশক্তি যে-সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল সে-সময় রুশের মিত্রপক্ষ যথেষ্ট সাহায্য করিতে সমর্থ হয় নাই এবং সোভিয়েটের নিজের লোকক্ষয় বলক্ষয়ের উপর যুদ্ধসরঞ্জাম নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠানগুলির অর্দ্ধেকের উপর ধ্বংস হওয়ায় তাহার ক্ষতিপূরণই হয় নাই, বলবৃদ্ধি তো দূরের কথা। অবশ্য জার্ম্মান দলও এখন ১৯৪১-এর গ্রীষ্মের অভিযানে যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল এখন তাহা করিতে অক্ষম। কিন্তু তাহারা যুদ্ধযন্ত্র নির্ম্মাণ-কৌশলে এবং বহু লক্ষ রুমানীয়, হাঙ্গেরীয়, ইটালীয় ও শ্লোভাকীয় সৈন্যের যুদ্ধে যোগদানের ফলে অনেক পরিমাণে ক্ষয়শোধনে সমর্থ হইয়াছে। ফলে আপেক্ষিক শক্তিবৈষম্য বর্ত্তমান অভিযানের আরম্ভ কালেই জার্ম্মান দলের স্বপক্ষে ছিল। সেই শক্তি-বৈষম্যের প্রভাব এখন ক্রমেই বৃদ্ধিশীল। কেননা, বর্ত্তমান সংঘর্ষের ফলে জার্ম্মান দলের যদিও নিশ্চয়ই রুশ অপেক্ষা অনুপাতে অধিক লোকক্ষয় এবং যুদ্ধসরঞ্জাম ক্ষয় হইতেছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণও হইতেছে দ্রুততর বেগে। ইহারই ফলে সোভিয়েট সেনা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইতেছে এবং প্রতিপদেই তাহাদের যুদ্ধ চালনার বাধাও বাড়িয়াই চলিতেছে। এক-একটি রেলপথ যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের সমাগম কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থারও বিভ্রাট বাধিতেছে।

বর্ত্তমানে সোভিয়েটের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা যুদ্ধযন্ত্র। লোকবল এখনও ঐ দেশে যথেষ্টই আছে। কেননা, ১৯৩৮ সালের বিবৃতিতেই পাওয়া যায় যে সোভিয়েট দুই কোটি পুরুষকে সমর শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং লোকক্ষয় ৪০।৫০ লক্ষ হইলেও সৈন্যের সংখ্যায় সোভিয়েট এখনও সম্মিলিত অক্ষদলের সমকক্ষ। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে উপযুক্ত সমরোপকরণ না থাকিলে কেবল সংখ্যাধিক্য কোনও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। যুদ্ধের প্রসার সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলেই যুদ্ধাস্ত্র, স্থলে ও আকাশে, অত্যাবশ্যক সেকথা এখন সকলেই জ্ঞাত। এই যুদ্ধাস্ত্রই এখন যে রুশদেশে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মাণ করিবার উপায় নাই তাহাও কিছু অজ্ঞাত নয়। ভরসা ছিল যে, আমেরিকা ও ব্রিটেন প্যান্‌ৎসার ('ট্যাঙ্ক') ও অন্য বর্ম্মাবৃত যুদ্ধশকট এবং এরোপ্লেন সরবরাহ করিয়া সোভিয়েট গণসেনার বাহুবল বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু তাহারও বিশেষ কিছু হয় নাই। সোভিয়েটের নিজস্ব কারখানাগুলির প্রসারবৃদ্ধি কতটা হইয়াছে জানা নাই, কিন্তু তাহা সামান্য কয়েক মাসেই দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বাড়িতে পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায়। অন্য এক ব্যবস্থা হইতে পারিত দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রবর্ত্তনে; এই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের কথা আজ সাত-আট মাস কাল যাবৎ "বিবেচিত"ই হইতেছে। সুতরাং সেদিকেও কোনও প্রকার সুরাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না—অন্ততঃ পক্ষে নিকট ভবিষ্যতে।

সোভিয়েটের হাতে এখন রহিয়াছে দুইটি মহামূল্য সঙ্গতি। সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ হইল জনশক্তি। ইহা কেবলমাত্র লোক সমষ্টি নহে, এমন কি, সবল এবং যুদ্ধক্ষম লোকের সংখ্যাও নহে, ইহা স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্র-বাদী বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সম্মিলিত দৃঢ়সংকল্প ও যুদ্ধপ্রচেষ্টা। এইরূপ দৃঢ়সংকল্পের ফলেই নিঃসম্বল চীন সশস্ত্র জাপানের বিরুদ্ধে পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, শত্রুর আক্রমণ-কেন্দ্র হইতে বহুদূরে স্থিত প্রাকৃতিক দুর্গমালা। উত্তর-রুশ, সাইবিরিয়া, মধ্য এশিয়া—এই তিন অঞ্চলে রুশ অধিনায়কগণের শেষ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে পৌঁছাইবার পথ দুর্গম, প্রাকৃতিক বাধা যথেষ্ট এবং জার্ম্মান শিল্পকেন্দ্র ও সৈন্যদল গঠনের কেন্দ্রগুলি হইতেও সে সকল স্থান বহুদূরে স্থিত। জার্ম্মানী হইতে উরাল, বৈকাল হ্রদ বা সাইবিরিয়ায় অভিযান চালনা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই দুই সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়াই এখন রুশ সমরপরিষদের সকল দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইতেছে। রণকৌশলে জার্ম্মান রণনায়কদিগের সমতুল্য যুদ্ধপরিচালক সোভিয়েটের আছে। "মৃত্যুকাম" (der sterber) ফিডর ফন বক লোকক্ষয়-অস্ত্রের অপচয় সবকিছু উপেক্ষা করিয়া যে ভীষণ অভিযান চালাইয়াছে তাহাতে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সেনাগণ পশ্চাদপদ হইয়া চলিয়াছে, বহুবার রুশসেনার ব্যূহচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অনেক স্থলে সমূহ পরাজয়ও হইয়াছে কিন্তু এখনও সেই সেনা-সমষ্টি পরাস্ত বা বিধ্বস্ত হইয়া কোথাও অস্ত্রত্যাগ করে

নাই বা বিশেষ সংখ্যায় বন্দীও হয় নাই। এখনও সর্ব্বত্রই জার্ম্মানসেনার সম্মুখে টিমোশেঙ্কোর অমিততেজা রুশসেনা লড়িয়াই চলিয়াছে।

জার্ম্মান রণনায়কদিগের লক্ষ্যবস্তু ককেশাসের তৈলের আকর। ইহার ধ্বংসে রুশ যুদ্ধশকট ও বায়ুযান দুইয়েরই বিষম ক্ষতি হইবে সন্দেহমাত্র নাই। জার্ম্মানদলের লাভ কতটা হইবে তাহা বলা যায় না, তবে রুশদল যে তৈলের আকরগুলি ধ্বংস না করিয়া ছাড়িয়া দিবে তাহা কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।

ফন বকের অভিযান এখন কৃষ্ণসাগরের উপকূলের বন্দরগুলি এবং ককেশস পর্ব্বতমালার রেলপথগুলির দিকে চালিত হইয়াছে। অশ্বারোহী কসাকদল জার্ম্মান যন্ত্রশকট-বাহী সেনাকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার অর্থ এই যে ঐ সকল রণক্ষেত্রে রুশদলের যন্ত্রযুদ্ধের উপকরণ অল্পই রহিয়াছে এবং বলবৃদ্ধির উপায়ও যাহা আছে তাহা যথেষ্ট নহে। ককেশসের পর্ব্বতমালায় আশ্রয় লইলে রুশদল জার্ম্মান যন্ত্রচালিত বাহিনীগুলি হইতে আত্মরক্ষায় অধিকতর সমর্থ হইবে মনে হয়। তবে সে অবস্থায় সেনাদল বিভক্ত এবং আংশিকভাবে অবরুদ্ধ হইয়া পড়া সম্ভব। ককেশস হইতে খনিজ তৈল লইয়াই সমস্ত রুশ সেনাবাহিনীর যন্ত্রযুদ্ধের পনেরো আনা ব্যবস্থা হয়। তাহা অবরুদ্ধ হইলে অন্য অনেক প্রান্তে রুশসেনা বিপদগ্রস্ত হইবে। কৃষ্ণসাগরের উপর যে-সকল বন্দর হইতে তৈলবাহী জাহাজ এবং রেলগাড়ি খনিজ তৈল সরবরাহ করিত সেগুলির অধিকাংশের পথ রোধ হওয়ায় এখনই এ বিষয়ে সোভিয়েটের অশেষ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও খোলা আছে ভল্‌গা নদ। কৃষ্ণসাগরে যে রুশ নৌবহর আছে তাহার ককেশস পর্ব্বতমালার ওপারেও আশ্রয়স্থল আছে, তবে সেখানে মেরামতি কাজের বিশেষ ব্যবস্থা বোধ হয় নাই। এই নৌবহর যত দিন আছে তত দিন জলপথে কৃষ্ণসাগর দিয়া ককেশসের অঞ্চল আক্রান্ত হওয়ার ভয় কম। অন্য দিকে ভল্‌গা নদের পথে অস্ট্রাখান অঞ্চল দিয়া আক্রমণ চলিতে পারে যদি তাহা জার্ম্মানদিগের অধিকারে আসে। তবে ডন নদের বাঁক, স্টালিনগ্রাড নগর ও ভল্‌গা এই রক্ষার জন্যই রুশ দেশে পশ্চাৎগতি রোধের চরম চেষ্টা চলিতেছে। স্টালিনগ্রাড যন্ত্রযুদ্ধ শকট নির্ম্মাণের অন্যতম কেন্দ্র, যদিও আরও অন্য কয়েকটি কেন্দ্র সোভিয়েটের আয়ত্তে আছে কিন্তু তাহার কোনটি এত বড় বা সুগঠিত নহে।

রুশ রণক্ষেত্রের অন্যান্য স্থলের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই অভিযানের শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানদল অন্য দিকে আক্রমণকারী শক্তি বিভক্ত করিতে চাহে না মনে হয়। ইহাতেই মনে হয় ফন বকের অভিযানের উপর জার্ম্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ অনেকভাবেই নির্ভর করিতেছে। ফন বক সাফল্য লাভ করিলে সোভিয়েট পরাস্ত হইবে ইহা যদিও ঠিক নহে কিন্তু ঐরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে সোভিয়েটের যুদ্ধক্ষমতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

জার্ম্মানীর উপর বৈমানিক আক্রমণ বিরাট পরিমাপে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ফলাফল কি হইয়াছে তাহা এখন বলা কঠিন, কেননা, সেদেশ হইতে বাহিরে সংবাদ যাওয়ার পথ নানারূপে আটক করা আছে। তবে ঐ আক্রমণের ফলে রুশসেনার উপর চাপের কিছু লাঘব হইয়াছে মনে হয় না। জার্ম্মানীর সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ছিল বিরাট্, তাহার উপর বিগত শীতকালে আরও অনেক পরিমাণে সে সকলের ক্ষয় পূরণ ও কোন কোন বিভাগে পরিমাণ বৃদ্ধিও নিশ্চয়ই হইয়াছে। বর্ত্তমান অভিযানে জার্ম্মানীর যুদ্ধাস্ত্র ও লোকবল দুইই দ্রুত এবং বৃহৎ পরিমাণে নষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ক্ষতি এবং বৈমানিক আক্রমণের ফলে অনিষ্ট এই দুই মিলাইয়া জার্ম্মানীর যুদ্ধপ্রবাহে ভাটা যদি পড়িয়া থাকে, তবে তাহা এখনও জগতের দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং তাহা হওয়াও সময়সাপেক্ষ।

* * *

আফ্রিকার মরুভূমিতে যুদ্ধ এখনও চালমাৎ অবস্থাতেই রহিয়াছে। পরস্পরের মাল ও সৈন্যসরবরাহে বাধা দান, বৈমানিক আক্রমণ এবং মধ্যে মধ্যে গোলাবর্ষণ এই দুই পক্ষেরই প্রধান কার্য্য। ছোট ছোট শত্রুসন্ধানী সৈন্য-দলের চলাফেরা এবং অতি অল্প সীমাবদ্ধ সৈন্যচালনাও মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ এখন দুই পক্ষই শ্রান্ত ক্লান্ত এবং বলক্ষয়ে ক্লিষ্ট। এখনকার পরিস্থিতির সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে ব্রিটিশ দল জনারেল রোমেলের অগ্রগতি রোধে সমর্থ হইয়াছে যাহার ফলে মিশরে এখন ব্রিটিশ পক্ষের সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার অবস্থারই কিছু উন্নতি দেখা দিয়াছে। তবে জেনারেল রোমেল যত দিন মিশর এলাকার ভিতর আছে তত দিন ওখানকার পরিস্থিতির অকস্মাৎ পরি-বর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিবেই। অক্ষদলের সম্যক পরাজয় ও মিশর হইতে বিতাড়ন যতদিন না হয় তত দিন মিশর, সুয়েজ খাল ও আরবজগতে তুমুল ঝড়ের আশঙ্কা

থাকবেই। সুতরাং জেনারেল অখিনলেকের সম্মুখে এখনও যে অনেক সমস্যা আছে তাহা নিশ্চয়। মিশরে অক্ষদল আর অগ্রসর হইলে আরবজগতে দাবালন জ্বলা আশ্চর্য্য নহে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জেনারেল রোমেলকে আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অশেষ বাধাবিপত্তি ও সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়া আফ্রিকায় সৈন্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রেরণে অক্ষদল বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া আছে।

স্বাধীন চীনদেশের চতুর্দ্দিকে বেড়াজাল দিয়া ঘিরিবার চেষ্টা এখনও চলিতেছে। সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী এলাকায় এরোপ্লেন-ঘাঁটি দখল ও ধ্বংস করার কার্য্যে জাপানী সেনাদল এখনও ব্যস্ত। যদিও চীনদেশে অস্ত্রশস্ত্র যাহা পাঠাইবার কথা ছিল তাহার অতি সামান্য অংশই সেখানে পৌছিয়াছে তবুও চীন সেনা প্রাণপণ শক্তিতে বিপক্ষে চড়াওয়ের কাজে বাধা দিতেছে এবং শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল-গুলি পুনরধিকারের চেষ্টায় লাগিয়া আছে। এই বিষক্ষেয় কোন কোনও স্থলে চীনাসেনার শৌর্য্য আংশিকভাবে পুরস্কারও পাইয়াছে। যে সামান্য সাহায্য আমেরিকান বৈমানিক সেনাদল এখন চীনকে দিতে সমর্থ তাহারই বশে চীনদেশের নাগরিক ও সামরিক অবস্থার কতকটা হেরফের হইয়াছে মনে হয়।

জাপান এখন এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে নৌপথে চলাচল করিতে পারে। এই পথের বাহিরের দিক উত্তর-দক্ষিণে এলুশিয়ান, জাপান, ফরমোসা, ফিলিপাইন, মাইক্রোনেসিয়া, নিউ গিনি ইত্যাদি দ্বীপমালায় রক্ষিত এবং তাহার পর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দ্বীপময় ভারত এবং নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেষ্টিত। ভিতরের দিকে, অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের সমুদ্রপার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলিতে কোরিয়া হইতে আরাকান পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নিষ্কণ্টক করার চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে সে চেষ্টায় স্বাধীন চীন বাধাদানেও বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অধিকার সুদৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই তাহা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা এতদিনে দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের এলাকায় আমেরিকান ব্রিটিশ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত নৌবহর জাপানের অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। আক্রমণ সম্মিলিত জাতীয় দলের পক্ষে নূতন এবং ইহার ফলাফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবীর সাত সমুদ্রের উপরে এবং জলের নীচে যে অন্য এক প্রচ্ছন্ন কিন্তু অতি সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার বিশেষ খবর সম্প্রতি কিছু পাওয়া যায় নাই। গত জুলাই মাসে এই চোরা লড়াই অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। জাহাজের অভাবে রুশ ও চীনকে সাহায্যদান ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে এবং অতি শীঘ্র যদি সাবমেরিন-আক্রমণ নিরোধের ব্যবস্থা সফল না হয়, তবে পরিস্থিতি অতি গুরুতর দাঁড়াইবে। আমেরিকায় সহস্র কোটি ডলার ব্যয়ে যে সকল যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার বেশীর ভাগ যদি জাহাজের অভাবে রণক্ষেত্রে না পৌছায় বা জলের নীচে চলিয়া যায়, তবে ফল কি হইবে সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে প্রতিকারের চেষ্টা আমেরিকায় ও ব্রিটেনে দিবারাত্র চলিতেছে।

ব্রহ্মদেশে মেঘের আড়ালে কি চলিতেছে তাহার সঠিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। নয়া দিল্লী হইতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বোমাক্ষেপণকারী এরোপ্লেন-দলের অভিযান সম্পর্কে মাঝে মাঝে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাতে অল্পস্বল্প আভাস পাওয়া যায় এবং চুংকিং সম্মিলিত জাতির ও অন্য সংবাদকেন্দ্র হইতে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, জাপান এখন ব্রহ্মদেশে তাহার অধিকার সুদৃঢ় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত আক্রমণের কোনও চেষ্টা চলিতেছে কিনা জানা যায় নাই। তবে চীনকে বহির্জগতের সঙ্গে সন্ধি-বিচ্যুত করার চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নহে যদি আসাম অঞ্চলের পথঘাট যুদ্ধের আবর্ত্তের বাহিরে থাকে, সুতরাং সেদিকে আক্রমণ চালান জাপানী সমরপরিষদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে নিশ্চয়। এখন জাপানের প্রধান সমস্যা অধিকৃত বিরাট ভূমিখণ্ডের উপর তাহার পরিস্থিতি দৃঢ় সংযোজিত করা। সম্মিলিত জাতীয় দলের মধ্যে আমেরিকা অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত ও বিব্রত নহে এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র শক্তিসামর্থ্যে প্রবল। সুতরাং আজ না-হয় কালই সেদিক হইতে পাণ্টা চড়াওয়ের পালা আরম্ভ হইবেই এ কথা জাপানের জানা আছে।

ভারতবর্ষে আর এক নূতন পর্ব্বের আরম্ভ হইল। এই প্রকার পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার ফল কি হইবে তাহার আলোচনা বৃথা। এই মাত্র বলা চলে যে ফল যাহাই হউক তাহার দ্বারা যুদ্ধের অবসানের সময় আগাইয়া আসিবে না এবং ইহাও সত্য যে এদেশের ঘটনার প্রবাহের মুখ অন্য দিকে ফিরান অসম্ভব ছিল না। কাহার ঘটে বুদ্ধির অভাবে তাহা হইল না তাহার চর্চ্চা নিষ্ফল। এখন যে পরিস্থিতি তাহাতে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বলিতে ভরসা পাইবেন জ্যোতিষী ও গণৎকার।

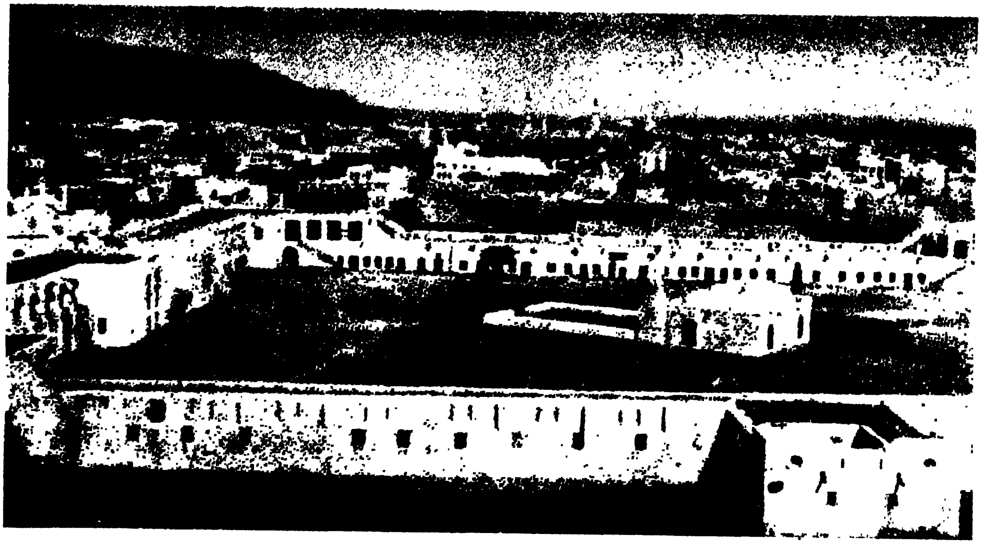

মদিনা। দুর্গ দেখা যাইতেছে

পানামা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য

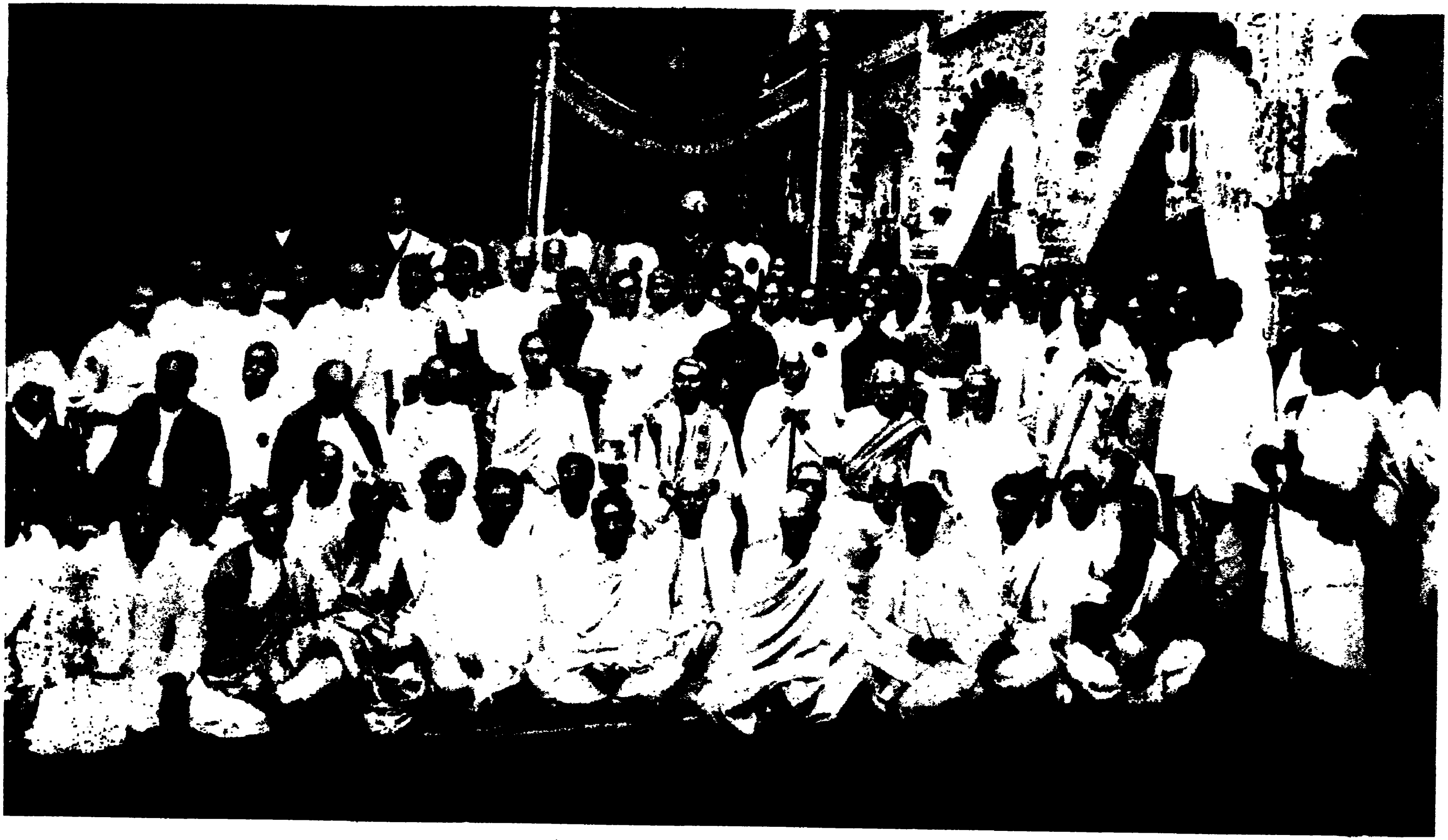

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন, ১৩১৪

চেয়ারে উপবিষ্ট, বাম হইতে—৪র্থ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ৬ষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭ম মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৮ম মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা), ৯ম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১০ম দেবেন্দ্রনাথ বসু

সম্মুখে উপবিষ্ট, বাম হইতে—১ম মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, ৩য় ব্যোমকেশ মুস্তফী, ৫ম অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৬ষ্ঠ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৭ম জগদানন্দ রায়, ৮ম কেদারনাথ মজুমদার, ৯ম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ১০ম শশধর রায়, ১১শ দুর্গাদাস লাহিড়ী, ১৪শ রামকমল সিংহ, ১৬শ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৭শ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সৌজন্যে

দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

কোলাপুর রাজারাম কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার বসু ১৯৪২ সালে সংযুক্ত প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ডের ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় সমগ্র যুক্তপ্রদেশে

শ্রীঅজয়কুমার বসু

প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীমান্ অজয় বোর্ডের হাই স্কুল পরীক্ষায়ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি

হুগলী জেলার আরামবাগ-নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ পালধি গত ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারী হিমালয়ের শ্রীকৈলাস ও মানস-সরোবরের পথে রামকৃষ্ণ তপোবনের ডাক্তার হইয়া যান। এ অঞ্চলে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী ডাক্তার। হাসপাতালের কাজ ছাড়া ডাক্তার পালধি এই পার্ব্বত্য প্রদেশের গ্রামে গ্রামে যাইয়া পাহাড়ীদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতেন ও ছাত্রদের নানা রকম ড্রিল করাইতেন।

তিনি ১৯৩০ সালের ১লা নবেম্বর শ্রীবদ্রীনাথের পথে বৈজনাথে স্থানীয় জেলাবোর্ডের হাসপাতাল খুলেন। এখানে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়া তিনি কতুর গ্রাম সুধার সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্যোগে বৈজনাথ ও ডাঙ্গুলী বাজারে দুইটি সাধারণ পাঠাগার, ফুটবল, ব্যাটমিণ্টন, প্রভৃতি খেলা হয়। গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের দ্বারা রাস্তা ও নোলা (পাহাড়ী কূয়া) পরিষ্কার করাইতেন। তাঁহার চেষ্টায় স্থানীয় হাসপাতালেরও নানাপ্রকার উন্নতি হয়।

১৯৩৩ সালের ১লা জুলাই কোলাঘাট হাসপাতালে তিনি বদলি হন। এখানে তাঁহার উদ্যোগে একটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুপ্রতিষ্ঠান, ব্যায়াম সমিতি স্থাপিত হয়। মাতৃমঙ্গল ও শিশু সমিতির জন্য একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা লোহাঘাটের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে। ডাক্তার পালধির চেষ্টায় ১৯৩৬ সালে স্বাস্থ্য-সমিতির দ্বারা রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত হয়।

স্থানীয় পার্ব্বত্যবাসীদের ঘরে ঘরে চাঁদা তুলিয়া ডাক্তার পালধি কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালের সংলগ্ন একটি সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও ইনি বক্তৃতা দেন। বার বৎসর এতদঞ্চলে কার্য্য করিয়া ডাক্তার পালধি পার্ব্বত্যবাসীদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছেন। শ্রীহেলা দেবী

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুর

চন্দননগর-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুর মহাশয় নিজ বাটীতে সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড কারমাই-

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুর

কেলের সময় তাঁহার বিশেষ কার্য্যদক্ষতার জন্য তিনি সরকারী উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং গোপনে বিস্তর দান করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও বন্ধুবাৎসল্য সর্ব্বজনবিদিত।

গীত-বিতান

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক অনুমোদিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৮ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পৌরোহিত্যে কার্য্য আরম্ভ করে। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও অধ্যাপক কালিদাস নাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্প্রতি আশুতোষ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রীদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার আয়োজন করিতে গীত-বিতানকে অনুমতি দিয়াছেন এবং কলেজ-ভবনে প্রতি সপ্তাহে এক দিন শ্রীযুক্তা কনক দাসের, শিক্ষকতায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত রবিবার ২রা আগষ্ট আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে গীত-বিতান কর্ত্তৃক বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সহযোগে এই উৎসব পরম উপভোগ্য হইয়াছিল। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও আবৃত্তি করেন ডক্টর কালিদাস নাগ ও প্রদ্যোত গুহ ঠাকুরতা।

ইসারা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা এসেছিলে মনভুলানো বেশে,
ভুবন ভরে অরুণ যেন স্বপ্নে রাঙায় তারে,
স্বপ্নে কথা কী যেন কয় ঈষৎ মধুর হেসে
স্বপ্ন-আঁখি রঙীন রাগে রাঙিয়ে গেল যারে।

সকালবেলা ফুটেছিল একটি রাঙা কুঁড়ি,
সদ্যজাগা ঘুমের তবু রং রয়েছে মনে,
সদ্যজাগা তোমার রাঙা-আঁখির স্বপন জুড়ি
কী যে মায়া ঝিমিয়ে পড়ে মনে, আমার মনে।

কাজের মাঝে মনের মাঝে বাড়লো আমার বেলা,
বিকেল হ'ল, সন্ধ্যে হ'ল, নামলো আঁধার রাতি,
রইলো তবু গগন জুড়ে সেই ইসারার খেলা,
তোমার চোখে আমার চোখে সেই ইসারার বাতি।

ঘন চুলের দৃশ্যপটে শীর্ণ তুলির আঁকা
নরম যেন কোমল যেন কচি মুখের রেখা,
অনর্থকের ছায়ায় ঘেরা ভঙ্গী খানিক বাঁকা,
খানিক কায়া খানিক মায়া রাতের চোখে দেখা।

ঘুমের ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে নিঝুম হ'ল রাতি,
ঝিমিয়ে এলো আমার মনে ক্ষীণ দিনের খেলা;
আধেক দিনে অযথা যে চোখের ছিল সাথী—
আধেক রাতে তারি দেখি চরম অবহেলা!

পুস্তক পরিচয়

ধর্ম্ম-সাধনা—শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠাঙ্ক ।/০+১১৩।

বইখানা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের "Tho Hindu View of Lifo" নামক ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সুতরাং ইহার সমালোচনা অনুবাদ হিসাবেই হওয়া উচিত।

এক-ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদের সময় অনুবাদকের শব্দ-মনোনয়ন এবং বাক্য-বিন্যাসে কতকটা স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাহা না হইলে অনুবাদ অপাঠ্য ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িতে পারে। এই স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। অনুবাদকের নিজেরই বুঝিতে পারা উচিত, ভাষার কতটা পরিবর্ত্তন ঘটাইলে উহা অনুবাদ না হইয়া সার-সংকলন হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, অনুবাদে একটু বেশী স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, নামেই গোলযোগ দেখিতেছি। 'ধর্ম্মসাধনা' বলিতে 'Hindu View of Lifo'-এর কাছাকাছি কিছু বুঝায় বলিয়াও ত মনে হয় না।

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এই নূতন নামকরণের একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। তাঁহার মতে অনূদিত মূল গ্রন্থের আলোচনা অসাম্প্রদায়িক; এবং রাধাকৃষ্ণণের মতে হিন্দুর ধর্ম্ম বলিতে কোনও একটি বিশিষ্ট দর্শনকে বুঝায় না, বুঝায় জীবনের একটা বিশিষ্ট ধারাকে; অতএব অনুবাদকের নামকরণ 'উপযুক্ত হইয়াছে'। (পৃঃ ।/০)

অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটি ঠিক ধরিতে পারিলাম না। তবে ইহা দেখিতেছি যে, যাঁহার গ্রন্থ অনুবাদের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে, তাঁহার নামকরণের প্রতি অনুবাদকের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। তাহা ছাড়া, হিন্দুর ধর্ম্ম যাহাই বুঝাক না কেন, উহার আলোচনায় 'হিন্দু' কথাটাই বাদ দিতে হইবে কেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

মূল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম অনুসারে অনুবাদক গ্রন্থের নাম দিয়াছেন। অনুবাদকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া মূল লেখক নিজে কি তাহা করিতে পারিতেন না? 'Roligious Experienco-এর অনুবাদে 'ধর্ম্ম-সাধনা' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'Experience' আর 'সাধনা' কি এক জিনিস?

লেখিকার প্রতি কোন অবিচার না করিয়া আরও দুইটি দৃষ্টান্ত লইতেছি। মূলে আছে—

("Is it a museum of beliefs, a medley of rites or a mere map, a geographical expression?")

অনুবাদ হইয়াছে—"হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কি শুধু অর্থহীন শব্দ বুঝিব, না কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান?" (পৃঃ ১)

মূলের ভাষার ওজোগুণ ও অর্থের অনেকখানি ইহাতে বাদ পড়িয়াছে।

আর এক জায়গায় আছে—

("Its past history encourages us to believe, etc., etc.").

ইহার অনুবাদ হইয়াছে—"অতীতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে, ইত্যাদি" (:পৃঃ ১১৩)। কেন? যদি বলিতাম—"ইহার অতীত ইতিহাস আমাদিগকে এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রোৎসাহিত করে যে,…", অথবা, "ইহার অতীত ইতিহাস হইতে আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে সাহস পাই যে…", তাহা হইলে মূলের কোন ক্ষতি না করিয়া অর্থ প্রকাশ করা হইত না কি?

মক্ষিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আর দোষোদ্‌ঘাটন করিতে চাই না। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা শেষ পর্য্যন্ত লেখিকার সঙ্গে আমাদের মতভেদমাত্রও মনে করা চলিবে।

মোটের উপর অনুবাদের ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রণীত এবং শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় শব্দকোষ শেষ হইতে চলিল। ইহার ৮৭তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ শব্দ "শ্যামসুন্দর" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭৬৮।

ড.

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। বুক ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ জীবনের কয়েকটি ঘটনা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচিত হইলেও ইহার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণতার ছবি রূপায়িত করিতে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একাধিক স্থানে বর্ণিত বিষয়ের সহিত স্থান-কালের কোনও নির্দ্দেশ না থাকায় বক্তব্য কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক স্থানে অনাবশ্যক অত্যুক্তি আছে। তবে মোটের উপর পুস্তকখানি ছোটদের বিশেষ উপযোগী হইলেও বড়রাও ইহাতে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইবেন।

কাঁচামিঠে—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ বিজয়ী, উল্কার আলো, মায়ামৃগ, সন্ধি বিগ্রহ, লীলা সোমেশ, মরণ দোলা, ভল্লু সর্দ্দার, ইতর-ভদ্র—এই আটটি ছোট গল্প ও একটি ক্ষুদ্র নাটিকা "দৈবাৎ" লইয়া রচিত।

সব লেখাগুলিই বিশেষ উচ্চ-শ্রেণীর। উল্কার আলো গল্পটির নায়িকা হৃদয়হীনা জ্বালাময়ী বিলু অনুরূপের উপর আশৈশব বহুবিধ উৎপাত করিয়া বিদায়-দিনে তাহার রহস্যময় হৃদয়ের ভালবাসার স্নিগ্ধোজ্জ্বল করুণ রূপটি যে চরম মুহূর্ত্তে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা পাঠকের মনে চিরন্তন হইয়া থাকিবে।

লঘু কৌতুকপূর্ণ ঘটনার সমাবেশে গল্প কয়টি সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই।

শ্রীকালীপদ সিংহ

সম্বন্ধনির্ণয়—প্রথম পরিশিষ্ট—পঞ্চম পরিশিষ্ট। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, চতুর্থ সংস্করণ। ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইহাকে এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা তেমন পরিচিত নহে, তবে এক যুগে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমাদর ছিল। মূল গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন সমাজের ইতিবৃত্ত ও বিবরণ সংকলিত হইয়াছিল। পরিশিষ্টে প্রধানতঃ কতকগুলি বংশলতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। পরিশিষ্টের আলোচ্য সংস্করণে অনেক নূতন বংশলতা সংযোজিত হইয়াছে এবং পুরাতন বংশলতাগুলির কালানুযায়ী সংশোধন ও সম্পূরণ করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশ ও ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফলে, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। তবে নির্ঘণ্টের অসম্পূর্ণতা ও বিষয় সন্নিবেশে সুশৃঙ্খলার অভাববশতঃ বিবরণগুলির মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করা অনেক স্থলে দুঃসাধ্য। তাহা ছাড়া, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় ইহাতে বাদ পড়িয়াছে।

বেদস্তুতি—অধ্যাপক শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়। মেদিনীপুর মূল্য এক টাকা।

শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮৭শ অধ্যায়ের নাম বেদস্তুতি। ইহাতে ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে গম্ভীর দার্শনিক আলোচনা আছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই অধ্যায়ের একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মূল শ্লোক, অন্বয়, শ্রীধর স্বামীর টীকা ও মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের সাহায্যে অসংস্কৃতজ্ঞের পক্ষেও এই দুরূহ গ্রন্থাংশের রহস্যবোধের পথ অনেকটা সুগম হইবে। ভূমিকায় নাতিবিস্তৃত ভাবে ভাগবতের প্রামাণ্য বিচার করা হইয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

মর্ম্মকথা ও মর্ম্মব্যথা—শ্রীকালাচাঁদ দালাল। প্রেম-নিকেতন, শান্তিপুর। মূল্য ।॰ আট আনা।

কবিতার বই। ইহা 'শিল্প' নহে, আত্মপ্রকাশ। মনের সরল ভাবগুলি কবি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। রচনার মধ্য দিয়া একটি অমায়িক হৃদয়ের সান্নিধ্য অনুভব করা যায়। শাদা ফুলে কবি পূজার ডালি সাজাইয়াছেন, তাহাতে রং না থাকুক, স্নিগ্ধ পবিত্রতা আছে।

পরিচিতি—শ্রীমল্লিকা মিত্র। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ফুলের মতন সাতটি ছোট গল্পের তোড়া। প্রথম গল্প 'ফুলের ভুল'। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ভূমিকায় বলেছেন, "'ফুলের ভুল' ছোট একটি যুঁই কুঁড়ির ফুটে উঠে আবার ঝরে পড়ার একটুখানি ইতিহাস। এক ফোঁটা চোখের জলের মত সেটি করুণ, আবার ভোরবেলাকার শিশির-বিন্দুর মতই ঝলমলে।" সব কয়টি গল্পই স্নিগ্ধ কবিত্বময়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক জাপান—আনোয়ার হোসেন। প্রকাশক—সুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই জাপানের শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চান। এই সহজ, সুপাঠ্য ও তথ্যবহুল পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহারা আধুনিক জাপান সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গীতায় জীবনবাদ—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম. এ. কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী। বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।॰।

গীতা একটি সমন্বয় গ্রন্থ। ইহাতে সকল মতবাদের সমন্বয় করা হইয়াছে। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে জীবনবাদের দিক দিয়া ভগবদ্গীতার আলোচনা করিয়াছেন।

আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, যাহার সমাধানের ইঙ্গিত পার্থ সারথি গীতাতে করেন নাই।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে দুঃখ, যে দৈন্য, যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তার প্রধান কারণ হইতেছে যে শ্রীভগবানের বাণীকে আমরা জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি নাই এবং আমাদের দীর্ঘ পরাধীনতা এই যুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিপদাপদের যুগে, ক্ষাত্রধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

গীতার বাণী—'মামনুস্মর যুধ্য চ'-ইহাই ক্ষাত্রধর্ম্মের মূল সূত্র। অতএব আমাদের ব্যষ্টিগত ও জাতীয় জীবনে চাই যথার্থ শক্তিপূজা অর্থাৎ

আত্মশক্তির উদ্বোধন। আমাদের পরাধীনতার অবসানের জন্য, আজ সমগ্র জাতির কর্ণে পার্থ সারথির পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হউক—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ', 'নাত্মানমবসাদয়েৎ'। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

সিরাজদ্দৌলা—শ্রীপ্রবোধ সরকার। দেশপ্রিয় লাইব্রেরী ১২৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

এখানি স্ত্রী-চরিত্র বর্জ্জিত ছোটদের ঐতিহাসিক নাটিকা, মাত্র এক অঙ্কে সাতটি দৃশ্যে সমাপ্ত। সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে আলোচনা ইদানীং প্রতি বর্ষে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভাদিতে সাধারণ ভাবে হইয়া থাকে। বিদেশী বণিক্ ও প্রভুত্বকামীদের হস্ত হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষার চেষ্টার কথা চলতি ইতিহাসে বিশেষ না থাকিলেও তাঁহার জীবনী পাঠকেরা সবিশেষ জানেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব তথ্য জানা গিয়াছে তার উপর ভিত্তি করিয়া লেখক এই নাটিকাটি রচনা করিয়াছেন। ছেলেরা ইহা পাঠ ও অভিনয় করিয়া এক দিকে যেমন আনন্দ পাইবে অন্য দিকে তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধও উদ্রিক্ত হইবে।

সুপর্ণা—চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৮-৪৯ সন। সম্পাদিকা শ্রীশান্তি বসু।

'সুপর্ণা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বার্ষিকী। ১৩৪৮-৪৯ সালের অন্যতম প্রধান ঘটনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমন। পাঁচটি প্রবন্ধে রবীন্দ্র-কাব্য ও জীবনের বিভিন্ন দিক চারি জন লেখিকা ও এক জন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের রাজনীতি', 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা,' 'শিশুমন ও রবীন্দ্র বর্ষাকাব্য', 'পুরস্কার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ', 'পঞ্চভূতের সভায় রবীন্দ্রনাথ',—কবিবরের জীবন ও কাব্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। ইহা ছাড়া বহু ছাত্রী ও খ্যাতনামা লেখকের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এই বার্ষিকীর আয়োজন খুবই প্রশংসনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মিটমাট—শ্রীযামিনীমোহন কর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৭৬পৃষ্ঠা; বারো আনা।

বিদেশী নাটকের বীজ অবলম্বনে রচিত তিন অঙ্কের প্রহসন। ভাষা সুন্দর; রচনায় মুন্সিয়ানা আছে।

অসমতল—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ। ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ নং কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৫ পৃষ্ঠা; এক টাকা।

উপন্যাস। কলেজি প্রেমের ফলে বিবাহ, তার পর এক ভুলের সূত্রে বিচ্ছেদ এবং উপসংহারে পুনর্মিলন। প্রথম দিকে অভিভাবকহীন নাবালক জমিদার-পুত্রের সম্পত্তিলোলুপ আত্মীয়-স্বজনদের ছবি ভালো হইয়াছে।

সামরী—শ্রীতারাপদ রাহা। দি পাবলিশার্স, ২৭।১।১-এম কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ১১৩ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

সুবিখ্যাত জর্মান গল্পলেখক লওনহার্ড ফ্রাঙ্ক বিরচিত উপন্যাস, 'কার্ল এণ্ড অ্যানার অনুবাদ। প্রশংসনীয়।

পণ্ডিচেরীর সাগরতীরে—মৃণাল ঘোষ, এম. এ.। 'নতুন পত্র' পাবলিশিং হাউস, ৪১।১, মিড্‌ল রোড, কলিকাতা। ৩০ পৃষ্ঠা, আট আনা।

সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-কাহিনী। আর্ট প্লেটে এগারখানি ছবি আছে।

(১) ডিহাং নদীর বাঁকে (২) রুদ্র-বসন্ত—অশোক-বিজয় রাহা। বিষ্ণুপুর-ভবন, শ্রীহট্ট। প্রত্যেকখানির মূল্য এক টাকা।

কিছুদিন পূর্ব হইতেই বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমণের একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। আধুনিক জীবন ও মননের অকৃত্রিম প্রকাশও কোন কোন নবীন লেখকের রচনায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে। বাংলা কাব্যের নবযুগারম্ভের এই রূপান্তর-লগ্নে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থদ্বয় পড়িয়া আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। আনন্দের কারণ,—মফঃস্বল শহরেও আজকাল প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির কবিতা সার্থক হইয়া উঠিতেছে চমৎকৃতির হেতু,—এই অনতিখ্যাত কবি শুধু সুনিপুণ ছন্দশিল্পীই নহেন তাঁহার কাব্যে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত তাজা প্রাণের পরিচয় আছে যাহা কলিকাতাবাসী তরুণ কবিদের রচনায় দুষ্প্রাপ্য।

প্রত্যেক প্রতিভাবান কবির সৃষ্টিতেই জীবন ও জগৎ জন্মান্তর গ্রহণ করে। প্রতিভার এই জন্মদান ক্ষমতা বর্তমান কবির রচনায়ও স্পষ্ট। এই জন্যই কবিতাগুলি স্থানে স্থানে আধুনিকপন্থী হইয়াও খাঁটি কবিতা হইতে পারিয়াছে। কবি জগৎকে নিজের চোখে দেখিয়াছেন, সেই জন্যই আমাদের চিরপরিচিত এই জগৎকে তাঁহার সৃষ্টিতে নূতন করিয়া দেখিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। গ্রন্থ দুইখানি যেন নবীন শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ দুইটি চিত্রশালা। বস্তুত, প্রকাশ-কৌশলের বৈশিষ্ট্যে, ভাব-কল্পনার নিজস্বতায় এবং উপমা-প্রয়োগের অভিনবত্বে রচয়িতা যে দক্ষতা ও কবিত্বকলার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আধুনিক অনেক কবিযশঃপ্রার্থীর কাব্যে দুর্লভ।

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে দুই-একটি কবিতার ভগ্নাংশ ইতস্তত উদ্ধৃত করিয়া এই নবীন কবির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হইবে না; কিন্তু এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, 'ডিহাং নদীর বাঁকে'র চিঠি, একটি সকাল, শিলং, নাগকন্যা, পক্ষিরাজ, যুঁইদির মেয়ে শেফালি, সমুদ্রশঙ্খ, মিশরের রাত, মৃত্যুমরু ও রাতের পাড়ি; এবং 'রুদ্র-বসন্তে'র মহাকাল, রাত্রিশেষ, সন্ধিক্ষণ, বর্ষা প্রভৃতি কবিতা বাংলার আধুনিক কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে। সুনিপুণ অন্ত্যমিলের ঐশ্বর্য্যে, এবং কল্পনার সার্বভৌম প্রসারতায় 'রাতের পাড়ি'র মত উৎকৃষ্ট কবিতা ইদানীং খুব বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

গল্প সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সংবর্দ্ধনা সমিতির পক্ষে। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যখন থেকে তিনি সাহিত্য পথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িক পত্রচালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর

মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। 'সবুজপত্রে' সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।

"প্রমথর গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেননা গল্প সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।"

এই স্বল্পপরিসর ভূমিকার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য এবং রচনাকলার যে চমৎকার এবং সুস্পষ্ট চিত্রটি এঁকেছেন, বর্ত্তমান ও উত্তরকালের সাহিত্যরসিকগণের মনে তা গভীর এবং উজ্জ্বলতর রেখায় অঙ্কিত হবে। বস্তুত প্রমথ চৌধুরী মশায়ের রচনা একদা আমাদের নয়ন মনকে অকস্মাৎ চমকিত করে দিয়েছিল তাঁর 'বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা'র দীপ্তিতে। এই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভার ভাস্বরতাই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বিস্ময়। এই বিস্ময়ের বিহ্বলতা অতিক্রম ক'রে প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করতে বাঙালী পাঠকের সময় লেগেছে এবং সে মূল্য এখনই নিঃশেষে নিরিখ করা হয়ে যায় নি। কিন্তু যতই তাঁর সাহিত্য-রসভাণ্ডারের দ্বার আমাদের চোখের সামনে একটু একটু ক'রে খুলেছে ততই তাঁর রচনার 'বৈশিষ্ট্যে' আমাদের মন উত্তরোত্তর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই বিশিষ্টতা তখনকার দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রায় একটি দুর্লভ বস্তু ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের নিখিলপ্লাবিনী প্রদীপ্তপ্রভায় অধিকাংশ ক্ষুদ্রতর জ্যোতিষ্কের ম্লানজ্যোতি প্রভাহীন হয়ে পড়েছিল। বর্ণবৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে সেই জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমজ্জমান হয়ে বিস্মৃতজগতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই যখন রবীন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রমথবাবু আপনার বর্ণবৈশিষ্ট্যে অথবা বর্ণনাবৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যগগনে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে গোচর করতে সমর্থ হলেন তখন তাঁকে অনন্যতার প্রাপ্য গৌরব দান করতে সাহিত্যরসিকেরা কুণ্ঠিত হন নি।

তখন কিন্তু প্রমথবাবুকে আমরা তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে "বীরবল" ব'লে চিনেছিলাম। তাঁর বৈদগ্ধ, তাঁর বিতর্কভঙ্গী, তাঁর বাক্‌চাতুর্য্য, শ্লেষপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রভৃতি আমাদের কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিল। এমন সময় চার-ইয়ারী-কথা 'সবুজপত্রে' যেন গল্প সাহিত্যের এক বিস্ময়পূর্ণ যুগান্তরকে আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করলে। তাঁর গল্প বলবার ধরণের মধ্যেও উপরোক্ত গুণগুলি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য তাঁর "আড্ডাধারী" ভঙ্গীটি আর সে আড্ডা বাগবাজারের গাঁজার কল্কের নয়, ফরাসী পেগ-এর অর্থাৎ সে আড্ডা বিদগ্ধজনের পরিপূর্ণ অবসরের আড্ডা। সে আড্ডায় রসিকত বাক্‌চাতুর্য্য, বাক্‌বিস্ফোরণ, এমনি কি লঘুতারও প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু তাতে রুচিবিকারের গন্ধমাত্র নেই। ঐ মার্জ্জিত রুচিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের

বিশেষ মর্য্যাদার বস্তু; আর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় যে বৈশিষ্ট্য যে স্বাতন্ত্র্য আছে তা নিয়েও সে সাহিত্য যে রবীন্দ্র-সাহিত্য সে ত জানা কথা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতযুগের কয়েকটি মুদ্রা (দোষ?) বা ভঙ্গী (mannerism)—(যা তাঁর যৌবনকালের যুযুৎসু মনের রচনার মধ্যে বহুলপরিমাণে দেখা যেত) সেগুলিকে চৌধুরী মহাশয় সুকৌশলে স্ব-ভঙ্গীতে পরিণত করেছেন। [ব্যঙ্গ-কৌতুকের যুগের রচনাগুলি দ্রষ্টব্য] সামান্য বিষয়কে অবলম্বন ক'রে গভীর তত্ত্ববিচারের ভঙ্গীর মধ্যে যে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস আছে সেটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে কয়েকটি আব্যিক্ষিকী শব্দে। যথা,—যেহেতু, অর্থাৎ, কারণ, অতএব, আর, তাতে, তার প্রমাণ, ফলে, সুতরাং, এবং, কেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাশালী লেখকের একটা সাময়িক মুদ্রাকে নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিণত করা অবশ্য একটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভারতী ও সাধনা যুগের বোধ করি শব্দটিকে নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিণত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের ছিল কল্পনা প্রসারিত করবার ভঙ্গী আর চৌধুরী মহাশয়ের ভঙ্গী বর্ণনাকে লজিক্যাল রূপ দেবার অর্থাৎ তাকিকতার।

প্রমথবাবুর গল্পের বেশীর ভাগেরই ধরণ গল্পের নয় কাহিনীর। অর্থাৎ আমাদের মনকে তা অবাস্তবের মাথায় সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের আকুলতায় উদাস করে না—তা আমাদেরই ইতিহাসের সম্ভাব্যতার মধ্যে আমাদেরই আশপাশের অতিরোমাঞ্চকর অথচ অনাবিষ্কৃত ঘটনার আঘাতে করে অভিভূত। তাঁর গল্প বলার চাল হচ্ছে মানসিক চিন্তার চাল—সে মনের চাল গজের নয় নৌকার, অর্থাৎ ভাষার ও ভঙ্গীর স্রোতে ভেসে চলার চাল আর সে নৌকা স্রোতের মুখে বাচাল বটে কিন্তু বানচাল নয়।

বিশেষ ক'রে গল্প লেখবার জন্যেই কোমর বেঁধে বসে যাওয়ার ভঙ্গী তাঁর নয়। বৈঠকী আড্ডা এমন কি লঘু ইয়ারকির অবসরে গল্প যদি গড়ে ওঠে ত বীরবলের ভাষায় 'তাঁর দু-আনা গল্প আর পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা তর্ক—অর্থাৎ বাকি।" ঐ "পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা"র বিস্রস্ততাই, দু আনা গল্পকে তার সংহত রূপ এবং বৈশিষ্ট্য দান করেছে—রসের মধ্যে রসবড়ার মত। বস্তু যখন মুখে গিয়ে পড়ে তখন ঐ এক কড়াই রসের কথা আর মনে থাকে না; শুধু রসনায় জেগে থাকে তার আস্বাদটুকু। অবশ্য প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার অর্থাৎ অবান্তর এবং অতিরিক্ত বাক্য এবং রসচর্য্যার যে দোষ তাও চৌধুরী মহাশয়ের গল্পের মধ্যে যে নাই তা নয়; আর তাঁর আশ্চর্য্য গল্পগুলি পাঠ ক'রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প পাঠের আনন্দ কখন কখন লাভ করলেও সমালোচকের দায়িত্ব হিসাবে দু-একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।

তাঁর অধিকাংশ রসিকতা punning-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সে punning এর অধিকাংশই চারুচাতুর্য্যপূর্ণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণশূন্য উপভোগ্য এবং কখন কখন একেবারে চমকপ্রদ। এবং যদিচ তাঁর লেখার মধ্যে রুচিবিকারের গন্ধমাত্র নেই ব'লে উল্লেখ করেছি তবুও এই punning-এর রসপ্লাবনে অন্ততঃ এক জায়গায় তিনি এই রুচিবিকার থেকে অব্যাহতি পান নি। [গল্পসংগ্রহ ৩৯৪ পৃঃ শেষ পংক্তি] দু এক জায়গায় নিজের রসিকতাকে বিশদ করবার চেষ্টা রসিক জনসুলভ বলে মনে হয় নি; যথা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ আর জজসাহেব যদি টিফিনের পরে নয়, পূর্বে জুরিকে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিতেন, তাহ'লে জুরি একবাক্যে আসামীকে not guilty বলত। জজ সাহেব নাকি টিফিনের সময় অতিরিক্ত হুইস্কি পান করেছিলেন।" [২৫৫ পৃষ্ঠা] অলমতিবিস্তারেণ।

কিন্তু এ সব অতি সামান্য কথা। আসল কথা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাংলা গল্প সাহিত্যে একটি নূতন এবং প্রাণবান ধারা সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত ধারার থেকে তার পার্থক্য যত কৌলীন্যও তত। অথচ তাঁর গল্প কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া বস্তু নয়; এমন কি তাঁর গল্পে একটি বিস্মৃত-প্রায় অগ্রগামী যুগের যে-সব চমৎকার চিত্র সন্নিবেশিত হ'য়েছে অন্যত্র তা সম্পূর্ণ দুর্লভ।

চার-ইয়ারী-কথা এবং আহুতি গল্পের কোন তুলনা নাই। অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তাদের মধ্যে অনেকগুলি বাংলা গল্প সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহের মধ্যে সমাদর লাভ করবে অথচ সেগুলিও প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গল্পগুলি প্রায় সর্ব্বত্র ভাষায়, বর্ণনায়, রসে, রসিকতায়, ব্যঙ্গে, কৌতুকে ঝলমল করছে। এ গল্পগুলি না পড়লে বাঙালী পাঠক বাংলা সাহিত্যের আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি উপাদেয় ভোজ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। অর্থাৎ নারকেলের শাঁসজলটি খাবেন বটে, কিন্তু ফোপরটি বাদ পড়বে।

শ্রীজীবনময় রায়

ক্ষণ-শাশ্বতী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এখানি কবিতার বই। অন্য সব কবিতার কথা স্বতন্ত্র, আমরা যাহাকে গীতি কবিতা বলি তাহার অধিকাংশই ক্ষণিকের কথা, এবং ক্ষণকে চিরন্তন করিবার চেষ্টার মধ্যেই সকল গীতি কবিতার জন্ম। অতএব এই অষ্টাবিংশতি গীতিকবিতা সম্বলিত পুস্তকে অর্পিত 'ক্ষণ-শাশ্বতী' নামের একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। "অক্ষয় হোক এই মুহূর্ত্ত যখন প্রেমের নেই প্রমাদ......এই মুহূর্ত্ত শাশ্বত ক'রে নাও তুলে নাও মৃত্যু-পার।" 'উৎসর্গে' লেখক বলিতেছেন,

'আমরা রচনা করি চির জীবনের জয়যাত্রা
সমাপ্ত হবে যাহা নর দেবতার নব তীর্থে।"

নীড় আমাদের আকর্ষণের বস্তু, কিন্তু আকাশের ডাকে আমাদের সাড়া দিতেই হইবে, পুস্তকে এই কথাটা নানা স্থানে বিভিন্ন ভাবে জগদীশ ভট্টাচার্য্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

"তবু সখি নীড় নহে, মোদের নিমন্ত্রণ আকাশে।'
"আজিকে আমার নীড়ে আকাশের এসেছে আহ্বান।"

প্রেমের কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,

"কে জানিত মোর প্রেম অসময়ে আসিবে গোপনে···
এমন কেন বা তার রীতি?"

বিরহের কথায় বলিতেছেন,

"মোদের বিরহ হেরি' বিরহের বেদনায় কাঁদিতেছে তারকা অগণ্য।"

'মুমূর্ষু পৃথিবী' কবিতাটি সুন্দর। সূর্য্যের বক্ষ হইতে ধরণীর বিচ্ছেদ, পৃথিবীর সুদূরে অপসরণ, সূর্য্যের আকর্ষণ, বিরহী প্রেমের সুশীতল বর্ষণ, ধরার শ্যামল সুষমা, তারপর মহাকালের প্রলয় ডম্বরুনাদ—একটি সুসংহত কবিতার মধ্যে ভাবগুলি সুনিবদ্ধ হইয়াছে।

"তুমি চলে যাও আমারি চলার বেগে
আমি চাই তোমা ঘিরিয়া রাখিতে আমার বক্ষমাঝে,
সৃষ্টির আদি হ'তে
চলিয়াছে এই তোমার আমার ধ'রে-রাখা চ'লে যাওয়া।"

"ক্ষণ-শাশ্বতী" কাব্যামোদী পাঠকের মনে আনন্দ দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

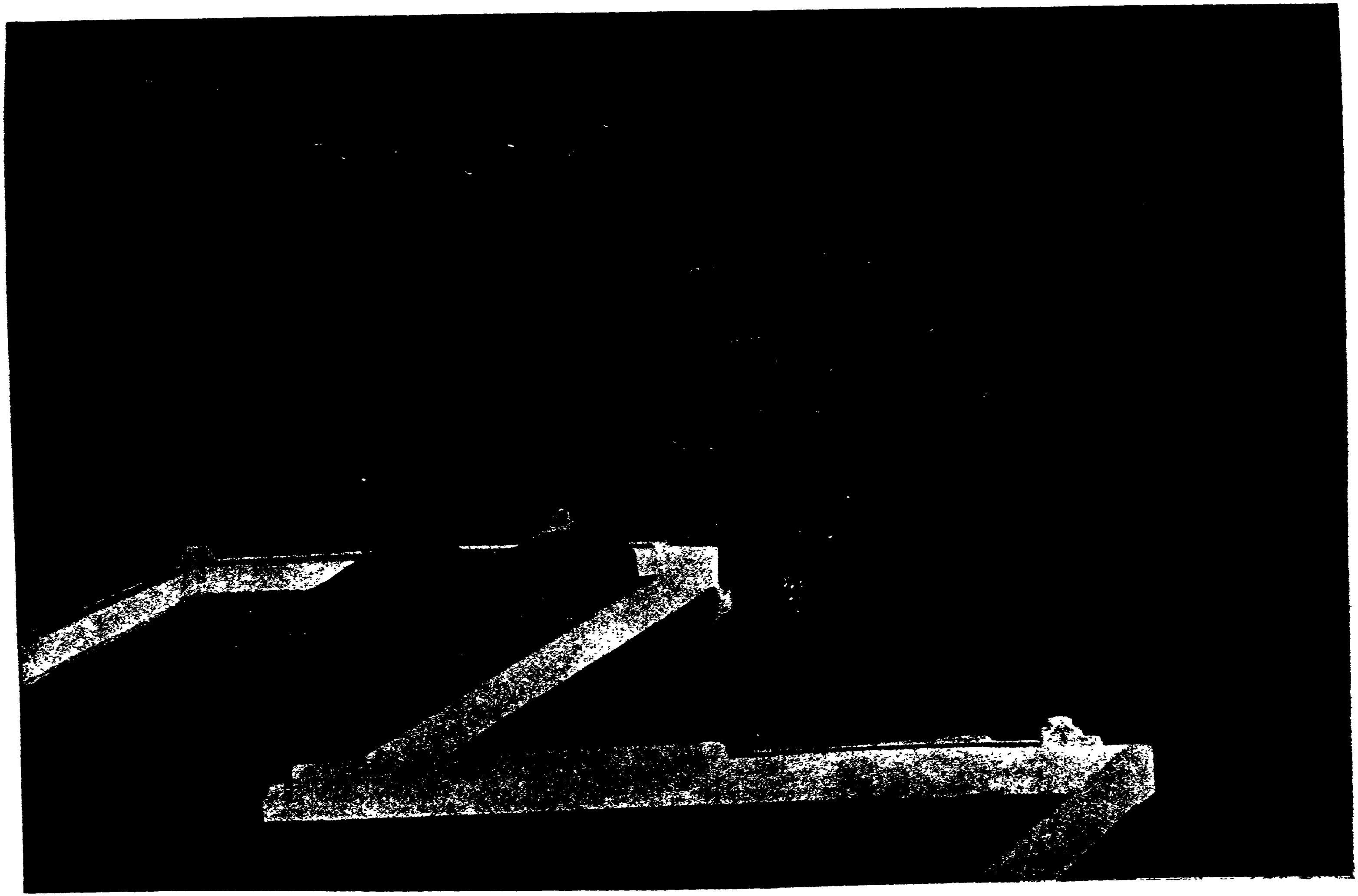

কবি

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪২শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

[বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

কবিতা-কণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষার নির্ঝরিণী রবিকর স্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা ॥

১০ ফাল্গুন, ১৩৩৮।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর-পুস্তক হইতে।

আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগল যাত্রী করিছ যাত্রা
নূতন তরণীখানি
নব জীবনের অভয়বার্ত্তা
বাতাস দিতেছে আনি।
দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ
অফুরাণ হ'য়ে রবে
সুখের দুখের যত তরঙ্গ
খেলার মতন হবে ॥

৫ জুন, ১৯৩৬।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ৺চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা
শ্রীমতী পুষ্পমালা দেবীর বিবাহ উপলক্ষে রচিত।

[বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

বাংলার ছাত্রদের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনাদের সমস্ত কথা আমি শুনেছি; কিন্তু আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেই কারণে আপনাদের সম্মেলনে আমি যেতে পারব না।

সব কাজেরই সময় আছে, আমারও যখন সময় ছিল কাজ করেছি। এখন আমার কর্ম্মক্ষেত্রে একটা সীমানার দাগ টেনে দিতে হচ্ছে।

আমি যে এখনো আছি এই আশ্চর্য্য। বাংলা দেশের পরমায়ুর তুলনায় আমার আজো বেঁচে থাকা অসঙ্গত। কিন্তু সে জন্যে আমি দায়ী নই।

মনুসংহিতার একটা বিধান আমি মানি। বয়স অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ এবং পরিশেষ আছে।

আপনাদের কাছে যেতে পারলুম না ব'লে মাপ করবেন। আপনাদের ছাত্র-সম্প্রদায়কে আমি আশীর্ব্বাদ করি। ছাত্ররা আমার প্রিয়। আমার এখানে যারা আছে আমার শুভ ইচ্ছার 'পরে তাদের যতখানি দাবী, এর বাইরে যারা আছে তাদেরও দাবী তার চেয়ে কম হবে কেন। বাইরের দিকে এখানে তাদের সকলের স্থান থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু এই আশ্রমেরই একটি অন্তরের দিক আছে সেখানে তাদের সকলের অধিকার।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বাংলার ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করি। তাদের সাধনা মহৎ হোক, দুর্গম পথে তারা মনুষ্যত্বের সিদ্ধিলাভ করুক।

গত ১৯৩১ সালের ৬ই মার্চ্চ কলিকাতায় নিখিলবঙ্গ ছাত্র-পরিষদের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করিবার জন্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে আনিবার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন গিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির দেখা পাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আগত কোন দেশনেত্রী তাঁহাকে দেশের কাজে যোগদান করিবার জন্য বারংবার তাগিদ দিয়া কবিকে উত্যক্ত ও উত্তেজিত করেন। অতঃপর ছাত্র-প্রতিনিধিদ্বয়ের সহিত তাঁহার অনেক আলাপ-আলোচনা হয় এবং তিনি তাঁহাদের সম্মেলনের প্রতি উক্ত বাণী লিখিয়া দেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে লেখাটি প্রাপ্ত।

[বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

আশীর্বাদ

["পুণ্যস্মৃতি" পুস্তকে (পৃ. ৪৮৮) লিখিত আছে, "আমার নব-বিবাহিতা ভ্রাতৃজায়াকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু লেখা ছিল না। বধূঠাকুরাণী এই সুযোগে বইগুলি উপস্থিত করিলেন, লিপিবদ্ধ আশীর্ব্বাদ পাইবার আশায়। তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল না। লোকে যেমন অবলীলায় নাম সহি করে, তেমনি অবলীলায় তিনি কয়েক লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন।" সেই কবিতাটি এই :]

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী কল্যাণীয়াসু

তোমাদের
মিলন হউক ধ্রুব,
জীবন শোভনশুভ,
ভুবন আনন্দসুধাময়,
লাভ কর নিত্য নিত্য
পুণ্য অমৃতের বিত্ত,
হোক্ সত্যসুন্দরের জয়।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু

আশ্রমে ফিরে এসেচি। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গৌহাটি, শিলেট ও আগরতলা ঘুরে এলুম। বলা বাহুল্য বক্তৃতার ত্রুটি হয় নি। দিনে চারটে ক'রে বেশ প্রমাণসই বক্তৃতা দিয়েছি এমন দুর্ঘটনাও ঘটেচে। এমনতর রসনার অমিতাচারে আমি যে রাজি হয়েছি তার কারণ ওখানকার লোকেরা এখনও আমাকে হৃদয় দিয়ে আদর ক'রে থাকে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। বুঝলুম কলকাতা অঞ্চলের লোকের মত ওরা এখনো আমাকে এত বেশি চেনে নি—ওরা আমাকে যা-তা একটা কিছু মনে করে। তাই সেই সুযোগ পেয়ে খুব কষে ওদের আমার মনের কথা শুনিয়ে দিয়ে এলুম। একটা গল্প আছে—একটি ছোট মেয়ে পশুশালা দেখ্‌তে এসেছিল। জিরাফের খাঁচাটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে এই বলে চলে এল—I simply don't believe it. খুব বেশি সমাদর পেলে আমারও ঠিক ঐ রকম মনের ভাবটা হয়। ভাবি, এ কখনো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এবারে এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলুম সেটা বিশ্বাস হ'ল।

ওরা সরল। ভাবলুম ওদের বোধ হয় বুদ্ধি কম, নইলে ভক্তি বেশি হবে কেন? যা হোক্ যখন কিছু বলবার ইচ্ছে হবে (বয়স বেশি হ'লে বাচালতা বাড়ে) তখন একদম শিলেট চাটগাঁ আসাম প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে হাজির হব, এই রকম স্থির করচি। তুমি যে লঙ্কাদ্বীপে গিয়েচ সে জায়গাটাও বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হবে না—অগ্নিকাণ্ড করবার পক্ষে, তা আমি বলচি নে। ওরা বোধ হয় অনেক খ্যাতনামাদের সম্পর্কে আসে নি, আর অনেক বক্তার অনেক বক্তৃতা শোনে নি, তাই ওদের মন তাজা আছে, কথার ভিতর দিকে যদি কোনো স্বাদ থাকে সেটা বোধ হয় এখনো পায়—অবশ্য তুমি ওদের জন্যে কিছু কাজ করতে পারবে বলে আশা হয়। বিদেশের ধুলোয় ওরা চাপা পড়ে গেছে, তুমি কোদাল হাতে ওদের বের ক'রে তোল—ওরা নিজেদের নিজেরা আবিষ্কার করুক—ওদের মধ্যে কি লিপি লেখা ছিল, সেটা পড়ুক, তার মানে বোঝবার চেষ্টা করুক। তুমি ঐতিহাসিক, ইতিহাসের সজীব ক্ষেত্রে এদের দাঁড় করাও, বুঝিয়ে দাও ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটা হচ্চে, "আত্মানং বিদ্ধি"। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীমতী শান্তা দেবীকে লিখিত]

Uplands, Shillong
22 May, 1927

কল্যাণীয়াসু,

কাল তোমাদের প্রবাসী আপিসের ঠিকানায় আমার নববর্ষের বক্তৃতাটা পাঠিয়েছি। এত দিনে পেয়ে থাকবে। তোমাদের আধুনিক ঠিকানা না জানা থাকাতে তোমাদের স্বহস্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারিনি। এখানে এসে প্রথম কয় দিন অসুখে পড়েছিলাম—আমি যদি বা সেরে উঠলাম পুপে পড়েচে। এই শিক্ষা হয়েছে যে পরিবর্ত্তন হলেই পরিশোধন হয় না। এখানে আর কিছু না হোক ঠাণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখরতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল সেটা সম্বন্ধে মত বদলানো উচিত বোধ করি। স্থান ভেদে জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবহারের অন্যথা হয়—ইংলণ্ডে যার মধুর স্বভাব ভারতবর্ষে তারই রুদ্রমূর্ত্তি। এইটে নিয়ে যদি পলিটিক্যাল আন্দোলন করা যায় তা হ'লে জ্যৈষ্ঠ মাসের পক্ষপাত দোষের শোধন হবে বলে কি মনে কর? এ বছরে আমি অপার্ব্বত্য বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের সঙ্গে নন্-কো-অপরেশন জাহির ক'রে চলে এসেছি, তাতে নিজেকে খুবই উন্নত বলে বোধ করচি—কিন্তু হায়, জ্যৈষ্ঠ অপেক্ষা করতে জানে—যেমনি নেমে পড়ব অমনি চেপে ধরবে। ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাশ্মীর-ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

১৯৩৯ এর মে মাসের শেষে আমরা পেশোয়ার গিয়ে ছিলাম। কাশ্মীরে যাবার পথেই পেশোয়ার দেখাটা সেরে নিয়েছিলাম। শ্রীনগরের শ্রীপ্রতাপ সিং কলেজে শিক্ষা বিভাগ থেকে অধ্যাপক নাগ মহাশয়কে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করাতেই এই সুযোগটা আমাদের হ'ল। পেশোয়ার থেকে ফিরে আমাদের শ্রীনগর যাবার কথা। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল। কাজেই ৩১শে মে ভোর না হ'তেই রাওল পিণ্ডিতে সাড়ে চারটার সময় স্টেশনের লোকেরা ডেকে আমাদের জাগিয়ে দিল। তারা বললে সাড়ে সাতটায় মোটর শ্রীনগরের পথে যাত্রা করছে। আপনারা ইতিমধ্যে স্নানাদি করে নিন। ওয়েটিং-রুমের গোসল-খানায় তারা স্নানাদির জন্য প্রচুর গরম জল দিয়েছিল। সমস্তই রাধাকিষেন কোম্পানীর মনীষীজির চেষ্টায় হয়েছিল। ইনি আমাদের বন্ধু অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু। একটু পরে তিনি স্বয়ং এসে আমাদের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে নিয়ে চা খাওয়ালেন। আজকেই আবার হোলকারের দলবল শ্রীনগরে চলেছে বলে তাঁরা বড় ব্যস্ত। বিচিত্র পোষাক পরে অনেক সাহেব মেমও চলেছে। কোনও বুড়ী মেম বাঁদিপোতার গামছার মত চৌখুপি স্কার্ট হাঁটুর এক বিঘৎ উপরে পরে উলঙ্গ পা বা'র করে মুখে রং মেখে সং সেজে কচি হবার চেষ্টা করেছেন; কোনও সাহেব গণেশের মত বিরাট্ ভুঁড়ির উপর হাফপ্যাণ্ট চড়িয়ে পায়ে কাবুলী জুতো পরে বাঘের মত কুকুর সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। এক সাউথ-ইণ্ডিয়ান দিশী সাহেব কেবলই মেয়েদের ওয়েটিং রুমে ঢুকছেন এবং নানা প্রকার প্রসাধন করছেন। ইচ্ছা ছিল সেইখানে বসেই চা খান, নিতান্ত আমি ঢুকে পড়ায় সে ইচ্ছাটা তাঁর পূর্ণ হ'ল না।

কাশ্মীর ও জম্মু স্টেটের মাপ মোট ৮৪,৪৭১ বর্গ মাইল। কাশ্মীর উপত্যকা খুব উর্ব্বর, এখানে ধান প্রচুর হয়, তাছাড়া নানা প্রকার ফলের চাষ এদেশে আছে। গম ও ভুট্টার চাষও কিছু হয়। এদেশের নিবিড় অরণ্য থেকে প্রচুর কাঠের চালান নানা দিকে যায়। তাছাড়া প্রধান ব্যবসায় পশম ও পশমী কাপড় (৩৪.৬৫ লক্ষ টাকার), ফল ও সব্জী (২৩.৫৭ লক্ষ টাকার) এবং রেশমশিল্প (১১.৮৮ লক্ষ টাকার)।

এদেশের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গুলমর্গ প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় আমরা যাই নি। গুলমর্গ ফ্যাশনেবল লোকেদের আড্ডা। সেখানে খুব বরফ পড়ে এবং স্কি ক্লব (Ski Club) আছে। অমরনাথ তীর্থের যাত্রীরা অগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর যান। পহলগাম থেকে ২৭ মাইল দূরে এই তীর্থ। এখান থেকে ঘোড়ায় যেতে হয়। অনেক বাঙালী বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে আসেন এবং এসে তীর্থের পুণ্যের চেয়ে কষ্টের স্মৃতিটি বড় করে মনে রেখে ফিরে যান। তবে যাঁরা বেশী কষ্ট পান নি সেই সব ভাগ্যবানেরা অমরনাথের পথের ও গুহার সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ৪০,২১,৬১৬। এখানে কাশ্মীরী, ডোগরী, পাঞ্জাবী, গোজরী এবং পাহাড়ী ভাষাভাষী লোকের বাস আছে। তবে মোটামুটি হিন্দী সকলেই প্রায় বোঝে। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। এখানে শিক্ষার প্রসার খুব হয় নি; তবে শ্রীনগর ও জম্মুতে দুটি কলেজ আছে। গত বৎসর ১৬৭ জন বি-এ পাস করে এবং ১২,৪৫ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। দুটি কলেজেই কিছু কিছু মহিলা ছাত্রী আছে।

এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোগল স্থাপত্য শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। হরওয়ানে কুশান যুগের মন্দির, খোদাই-করা টালি প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। কাশ্মীরে দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে। তীর্থ আছে, শিকার খেলা আছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে, স্থাপত্য ও চারুশিল্প আছে। সুতরাং শ্রীনগরে ব্যবসাদারের ঝাঁকের মত গাইডের ঝাঁকও পথে ঘাটে হোটেলে সর্ব্বত্র মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়।

মোটর ছাড়বার একটু আগে শুনলাম যে আমাদের সব জিনিষপত্র সঙ্গে দেবে না। ভারী জিনিষ সবই পর দিন বাসে আসচে। একথা আগে জানতাম না। সুতরাং

দরকারী কাপড়-চোপড় সবই বড় ট্রাঙ্কে দিয়েছিলাম। ওরা যদি এখানেই না বলে দিত তাহলে সেখানে গিয়ে মহা মুস্কিলে পড়তাম। অগত্যা শেষ মুহূর্ত্তে গুদাম ঘরে গিয়ে বাক্স আদায় করে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু তার থেকে বার করে নিলাম। তখন বেশ গরম ছিল, তবু পরে ঠাণ্ডা হবে বলে গরম কোটটাও সঙ্গে নিলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের একটা মোটরে চারজনকে সচরাচর যেতে হয়। গুদাম ঘরের কাছে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনিও আমাদের গাড়ীর যাত্রী, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, এখন লক্ষ্ণৌ-এর অধিবাসী হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে আর একজনের দেখা প্যাওয়া গেল, তিনি সহযাত্রিণী। একটি অল্পবয়স্কা আমেরিকান মহিলা জাভা বালি বেড়িয়ে ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছেন। হাতে যাভার এনামেল-করা আংটি, ভীষণ কথা বলেন। মেমটিকে সামনের সীট দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় তিনজনকে ভিতরে।

রাওলপিণ্ডি স্টেশন ছাড়বার পর মোটর দুপাশে লাল ইটের বাড়ীওয়ালা রাস্তার ভিতর দিয়ে চলল। ঘরবাড়ী শেষ হবার পর রাস্তাটা নীচের দিকে নেমেছে। রাওলপিণ্ডি সমুদ্র থেকে ১৬৭০ ফুট উপরে, পরের স্টেশনটি ১৯৪০ ফুট। কিন্তু এইখানে পথ অনেকখানি নেমে আবার উপরে উঠেছে।

কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরে চীনা ও রুশীয় তুর্কিস্থান, পূর্ব্বে চৈনিক তিব্বত, দক্ষিণে পঞ্জাব এবং পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশ। এই রাজ্যের উত্তর সীমান্তে ব্রিটিশ, চীন, রুশীয় ও আফগান রাজ্য মিলিত হয়েছে।

রাওলপিণ্ডির একটু পরেই কাশ্মীররাজের রাজ্য। সীমানায় একটি গেট আছে, তার ওপারে যেতে হলেই পয়সা লাগে। কাশ্মীরে ঢুকতে হলে যে মাশুল দিয়ে ঢুকতে হয় তা আমরা কোনও দিন জানতাম না, এমন কি মোটরে উঠবার সময়ও কেউ বলে দেয় নি। এখন দেউড়ির পাহারাওয়ালারা বললে, "মাথা পিছু ।৶১০ পয়সা দাও, না হ'লে ঢুকতে পাবে না।" আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি রাওলপিণ্ডিতেই পয়সা জমা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? একদল লোক হৈ হৈ করে খাতাপত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল। তারা দেখতে বেশ রাজপুত্রের মত, কিন্তু ব্যবহার কোটালের পুত্রের চেয়েও অনেক খারাপ। দেখাল—নোটিস বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিল না, একটা নোট দিলাম ভাঙিয়ে দিতে। তারা ৶৹

কাশ্মীরী সাধারণ স্ত্রীলোক

আনা রেখে ৯৴০ ফিরিয়ে দিল। গাড়ীতে বসে ত আর টাকা বাজানো যায় না, যা দিল তাই অম্লানবদনে ব্যাগস্থ করা গেল। তার পর গাড়ীর মুক্তি হ'ল।

দুদিকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে মোটর চলল। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা অনেক, কিন্তু বেশী বড় নয়। ছোট ছোট বাবলা গাছের মত গাছ। পাহাড়ের অন্য কোন রূপও নেই। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে ত দার্জ্জিলিঙের পথ অনেক সুন্দর। এখানে পর্ব্বত-রেখার সে জোরালো গতি কই? দার্জ্জিলিঙের পাহাড় যেন আকাশের গায়ে কোন মহাশক্তিশালী শিল্পীর সুদৃঢ় হাতের নির্ভীক টান! এ দিকের পর্ব্বতমালার রেখার সে গতি নেই। এখানে সেরকম আকাশস্পর্শী মহীরুহের নিবিড় অরণ্য নেই, সে রকম গভীর গহ্বর, নৃত্যশীলা নির্ঝরিণী, বিচিত্র বর্ণ ও রূপের ফার্ন পাতা কিছুই নেই। এত কষ্ট করে এসে কি আর দেখলাম? এই কি ভূস্বর্গের রূপ? (পরে অবশ্য ভূস্বর্গের সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেয়েছি।) দুপাশে পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে মধ্যে চাষবাস হচ্ছে। মাটির ও পাথরের বাড়ীর উপর চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ছাদ, ঢালু চাল নেই, কাঠের তক্তার উপর খড় বিছিয়ে তার উপর তুষ ও মাটি ইত্যাদি লেপে দিয়েছে। খড়ের গোছা চারপাশ দিয়ে একটু বেরিয়ে আছে। কোথাও ছাদের ওপর একহাত দেড়হাত লম্বা ঘাস গজিয়ে গিয়েছে।

রাওলপিণ্ডি থেকে ৩৭ মাইল পথ এলে মরি পাহাড়। এটা ৬৫০০ ফুট উঁচু। চেহারা পার্ব্বত্য দেশেরই মত। পাহাড়ে ঘন পাইন, ফর ও ঝাউগাছ, রং গাঢ় সবুজ।

শ্রীনগরে হাউস বোট ও শিকারা নৌকা

ধারে চায়ের দোকান, সরাই ইত্যাদি। ছোট ছেলেরা প্লেটে ক'রে ডিম বিক্রী করতে আসে, গাড়ী জল নেয়, ড্রাইভার একটু হাত-মুখ ধুতে নামে। এই সব কারণে গ্রামগুলিতে কয়েক মিনিট ক'রে গাড়ী থামে, একটু শান্তি ও বিশ্রাম পাওয়া যায়। সরাই-এর লোকদের ছেঁড়া নোংরা কাপড়-চোপড় এবং ভাঙাচোরা ঘর দেখে বোঝা যায় এরা অতি দরিদ্র। কারুর গায়ে পরিষ্কার কি নূতন কাপড় প্রায় দেখাই যায় না। এত দারিদ্র্য ও নোংরামি দেখে মনটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিল। আমাদের অবস্থা যখনই বেশী কাহিল হচ্ছিল তখনই ড্রাইভার মুখে-হাতে জল দেবার এবং ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়াবার জন্যেও মাঝে মাঝে নির্জ্জন জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাচ্ছিল।

এখানে আধুনিক ধরণের অনেক ঘরবাড়ী অছে। অনেক ভাল স্কুল ইত্যাদি আছে। কাশ্মীর রাজ্যের মাঝখানে এই স্থানটি ব্রিটিশ অধিকারের, এখানে ইংরেজ সৈন্যাবাস। জায়গাটি সুন্দর, ভাল করে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৭ মাইল দূরত্বেই এটি এত উঁচুতে উঠেছে যে এদিকে পথ ভীষণ খাড়া এবং ঘন ঘন বাঁক ফিরেছে। এত বার মোড় ফিরে এত খাড়া উঠতে গিয়ে গাড়ী ভীষণ দোলে এবং লাফায়। ঝড়ে পড়ে জাহাজও বোধ হয় এত দোলে না এবং লাফায় না। দুমাস ধরে জাহাজে দীর্ঘ পথ যাওয়া-আসা করেও আমি দোলানির জন্য কোনও কষ্ট অনুভব করি নি; কিন্তু এই পার্ব্বত্য পথে গাড়ীর ঝাঁকানি খেয়ে কয়েক ঘণ্টাতেই আমার যা অবস্থা হ'ল তাতে নূতন দেশ দেখার সমস্ত ইচ্ছাই লোপ পেয়ে গেল। আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোকটির অবস্থা আরও খারাপ। তিনি পকেটে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে চলেছেন, একবার করে খাচ্ছেন আর চোখ বুজে পড়ে থাকছেন। থেকে থেকে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন, "আপনি ডান দিকে তাকাবেন না, গহ্বরের দিকে তাকাবেন না, ওতে আরও মাথা ঘুরবে।"

পার্ব্বত্য দৃশ্যের কখন যে কি পরিবর্ত্তন হ'ল, বিশেষ কিছুই দেখলাম না, প্রায় চোখ বুজেই চললাম। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই! ভীষণ রোদে ছোট গাড়ীখানি তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, কে বলবে যে শীতের দেশে যাচ্ছি! মুখে ঘাড়ে কেবল রোদ পড়ছে আর ক্রমাগত পেট্রোলের গন্ধ উঠছে।

কয়েক মাইল অন্তর অন্তর ছোট ছোট গ্রাম, পথের

মাঝখানে আর একটা জায়গায় কাশ্মীর-রাজ্যের প্রহরীরা আমাদের গাড়ী আবার আটকে রাখল। ব্যাপার কি? না, আবার মাশুল দিতে হবে। এবার মাথাপিছু সওয়া-দুই টাকা অর্থাৎ মোট সাড়ে-চারি টাকা। প্রথম ঘাঁটিতে নোট ভাঙিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি পাঁচ টাকা বার করে দিলাম। কর্ত্তারা বললেন, "টাকা-গুলি খারাপ।" ভাল জালা! বললাম, "তোমাদের মাশুল আপিসই ত টাকা দিয়েছে।" কিন্তু সে কথা কে শোনে? আবার অন্য টাকা দিতে হ'ল।

চোখ বুজেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছিলাম। হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখলাম গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে ঝিলমের নৃত্যরত প্রকাণ্ড উচ্ছল জলস্রোত সুরু হয়ে গিয়েছে। দুই পাশে আকাশস্পর্শী প্রাচীরের মত পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এত বড় নদী বয়ে যেতে কখনও দেখি নি। নদী কখনও গভীর বিস্তৃত হয়ে ঢালু গর্ত্তের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে, কখনও ক্রমাগত ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে বাঁক ফিরে ফিরে অসংখ্য কঠিন পাথরের বুকে আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রে ঢেউয়ের মাথায় পুঞ্জীভূত শুভ্র ফেনা তুলে ছড়িয়ে চলেছে। নদীর উপর দিয়ে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাবার জন্য দড়ির লছমনঝোলা (সেতু), বাঁশের সাঁকো, আবার আধুনিক লোহা ও পাথরের ব্রীজ। পথের ধারের গাছগুলি খুব লম্বা, কিন্তু তাদের গুঁড়িগুলি

বেশী মোটা নয়; অথচ দেখলাম নদীর স্রোতে অনেক প্রকাণ্ড মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি ভেসে চলেছে। কোথাও স্রোতের গতির প্রখরতার অভাবে এবং জলের গভীরতার অভাবে অনেক কাঠ জমা হয়ে গিয়েছে। ঘন বর্ষায় যখন পাহাড়ের জল সজোরে নামবে তখন এই কাঠগুলি ভেসে বেরিয়ে যাবে। আগে দেখেছি এই সব কাঠই পঞ্জাবের ঝিলম স্টেশনে গিয়ে জমা হয়েছে। কাশ্মীরের উপর দিকের পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই গুঁড়িগুলি আসে। সেখানে এক একটি গাছের বেড় এক একটা ঘরের সমানও হয়, যদি তাদের তত দিন বাড়তে দেওয়া হয়।

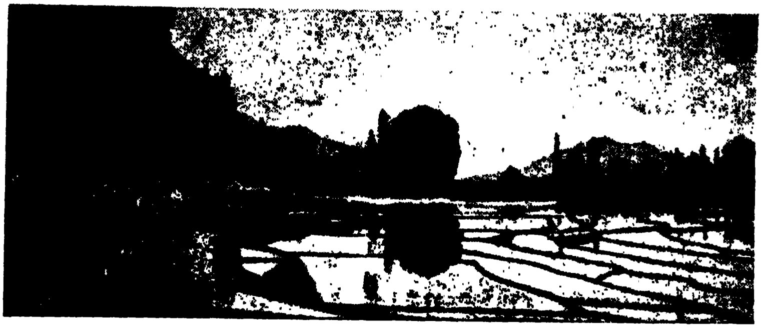

ধানের ক্ষেতে জল ধরা। কাশ্মীর

নদীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের পথের সৌন্দর্য্য বাড়তে থাকে। এখন আর সেই একটানা পাহাড়ের উপর কাঁটাবন নয়। মাঝে মাঝে পাহাড় গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে, তার উপর সুশুভ্র মেঘ দেবতাদের তোরণের পতাকার মত উড়ছে, পিছনে নীল আকাশ মার্জ্জিত ধাতু পাত্রের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। কোন কোন জায়গায় ভূমিকম্পে কি বর্ষায় পাহাড়ের গায়ের সবুজ আবরণ ও মাটির স্তূপ ধ্বসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে দানবরাজের বিরাট্ দুর্গ প্রাকারের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাড়া পাথর, কোথাও বেরিয়েছে বিরাট্ শঙ্খের গলার মত ঘোরান ঘোরান বাঁকা সব পাথর। যেখানে পাহাড়ের গায়ে মাটি আছে, সেখানে থাকে থাকে সিঁড়ির ধাপের মত সবুজ শস্যক্ষেত্র সাজান, নয়ত শস্যক্ষেত্রের মাটির উপর আল দিয়ে জল ধ'রে রাখার দৃশ্য। গিরিরাজের এই জলবিধৌত শ্যামল রূপ এক রকম, আবার তাঁর বিরাট্ অভ্রংলিহ সুকঠিন অস্থিপঞ্জরের রূপ আর এক রকম।

চাষবাসই এদেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা বলে এবং এদেশে উচ্ছল জলের ঐশ্বর্য্য অনন্ত বলে পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে কেটে অনেক জায়গায় জল বেঁধে রেখেছে। তবে দুঃখের বিষয় গিরিদুহিতাদের দান এই য জলধারা, ক্ষেতের ভিতর এদের নিয়ে আসার জন্য রিদ্র কৃষকদের কাশ্মীর মহারাজকে বহুৎ ট্যাক্স দিতে হয়। অনেকে বলেন কাশ্মীর এমন উর্ব্বর দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই রুন ট্যাক্সের জন্য এ দেশের অধিবাসীরা এত গরীব।

দুপুরে আমরা ডোমেলের ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম। সাহেব এবং বড়মানুষ যাত্রী অনেক এখানে আসে; তার উপর তখন লঞ্চ খাবার সময়; কাজেই এখানে বেশ ফিটফাট ভাল ডাকবাংলো আছে। তাতে ঘরও অনেক-গুলো। চাকর-বাকর সাধারণ ডাকবাংলোর চেয়ে অনেক বেশী। তাদের চেহারাও বেশ রাজপুত্রের মত। তবে মুখে বুদ্ধির চিহ্নমাত্র নেই, এই যা দুঃখ। অবশ্য রাজপুত্র হ'লেই সকলেই যে বুদ্ধিমান হয় তা বলছি না।

শরীর ভাল ছিল না ব'লে একটা ঘর দখল ক'রে শুয়ে পড়ে রইলাম। খানিক পরে যখন খাবার জন্যে উঠলাম, তখন দেখি এক দল হোমরাচোমরা কারা সব এসেছে। তাদের সঙ্গে মোটরকারই পাঁচ-ছয়খানা। আদত দল তিনটি মানুষকে ঘিরে। একটি অভিজাতবংশীয়া সুন্দরী ও সুসজ্জিতা মেয়ে, একটি আধুনিক কায়দাদুরস্ত প্যাণ্টালুন-পরা ক্ষীণাঙ্গী ও প্রায় কুশ্রী মেমসাহেব, এবং তৃতীয়টি মেয়েলি চেহারার ক্ষীণ দীর্ঘকায় একটি পুরুষ। পুরুষটি সাদা গেঞ্জির উপর সোনার গহনা-পরা। এক দল লোক বুকে হাত দিয়ে নীচু হয়ে তাঁদের আজ্ঞা শ্রবণ করছে আর হেঁট হয়ে বিদায় নিচ্ছে। ধরণে বোঝা গেল নিশ্চয় রাজা-রাজড়ার দল। শুনলাম পুরুষটি '—'এর নূতন রাজা এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই দেশীয় দুই রাণী। সত্য কি না জানি না। তাঁদেরও সেই দিনই আসবার কথা ছিল।

ডাকবাংলোটি ভারী সুন্দর জায়গায়; পাশেই অনেক নীচে গিরিখাতের ভিতর দিয়ে বিস্তৃত ঝিলম নদী নেচে চলেছে। এখানে নদী অনেকখানি চওড়া আর গভীর হওয়ায় স্রোত এবং ঢেউ তেমন আর জোরালো নেই; তবে সমতল ভূমির নদীর চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চয়। ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে একটা পথ মনে হচ্ছে নদী পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। বাংলোর আশেপাশে গাছপালা ঘনপত্রবহুল ও খুব বড় বড়। প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল ঝলমল করছে গলিত স্ফটিকের মত।

ডোমেল ডাকবাংলোতে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে এবং লঞ্চ খেয়ে আমরা আবার মোটরে উঠলাম। লঞ্চ ও বকশিশ নিয়ে চার টাকা আন্দাজ খরচ হ'ল। পার্শী, মারাঠি, কাশ্মীরী অনেক রকম পর্য্যটক সেখানে জুটেছে। এবার পথের সৌন্দর্য্য আর এক রকম হয়ে উঠল। "বরমুলা"র পর নদীর স্রোত অন্য দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু রাস্তার দুই ধারে সফেদা গাছের শোভা হয়ে উঠেছে অপরূপ। সারাপথই যেন একটা উদ্যানের পথ। বিপুলাকৃতি চেনার গাছ তার ঘনপত্রবহুল মাথা এক একটা সবুজ পাহাড়ের মত উঁচু ক'রে তুলেছে; সফেদার সুন্দর দীর্ঘ ঋজু দেহ আকাশমুখী হয়ে সোজা উঠেছে, একটা ডালপালাও পাশে হেলে না, সব উর্দ্ধমুখী। তারা যেন সারি সারি অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করতে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে সবুজ কার্পেটের মত ঘাসের মাঠ, তাতে রঙীন নক্সার মত কত ফুল ফুটে আছে। মাঠের এক ধাপ নীচে শস্যক্ষেত্রে অল্প জল আল দিয়ে বাঁধা। দূরে তুষারাবৃত বরফের পাহাড়ের সারি হীরকের মালার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। আমরা মাঝে মাঝে নেমে সেই সুন্দর মাঠে বসছিলাম।

শ্রীনগরের যত কাছে আসে মোটরের পথটির দুই পাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ততই বেড়ে ওঠে।

পথে আসতে আসতে প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। এগুলিকে লোকে বৌদ্ধ মন্দির বলে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন এগুলি ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হিন্দু মন্দির। শুনেছি পরিহাসপুর বলে এখানে একটি ভাল মন্দির আছে। এদেশে সন্ধ্যার পর অর্থাৎ সূর্য্যের আলো নিভ্‌বার পর যাত্রী, মোটর ও বাসের পথ চলা বারণ। সুতরাং দিনের আলো থাকতে থাকতেই আমাদের শ্রীনগরে পৌঁছতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৭৷৷টার পরেও শ্রীনগরে আলো থাকে। আমরা সেই সময় ১৯৬ মাইল দুর্ভোগের পর শ্রীনগরে পৌঁছলাম। পথ দেখে যত মুগ্ধ হয়েছিলাম শহরের শ্রী দেখে ততই নিরাশ হলাম। অতি সাধারণ এলোমেলো কতকগুলো ঘরবাড়ী ও রাস্তা। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না যে এই কি শ্রীনগর!

রাধাকিষেণের আপিসে গাড়ী দাঁড়াল। আমরা কোথায় যে উঠব তখনও কিছু ঠিক হয় নি। আমরা আপিসে বললাম, আমাদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু কর্ত্তাদের দুই ভাই বেরিয়ে এসে বললেন, "শিক্ষা বিভাগ থেকে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা নেডুস্ হোটেলে করা হয়েছে, সুতরাং আমরা আর কি করব? ওইখানেই আপনাদের যেতে হবে।"

অগত্যা আমরা সেইখানেই গেলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় জিনিষপত্র কিছুই পেলাম না। সাহেবী হোটেলের ডাইনিং-রুমে ডিনার খেতে যেতে হয়, সেই সময় মেমসাহেবদের যত সাজের ঘটা। আমি রাস্তার পোষাক বদ্‌লাবার জন্যে একটা মাত্র পোষাক এনেছিলাম, সেইটাই কাজ চালাল। সেদিন আবার ডিনারের পরে নাচ ছিল। মেমসাহেবরা খুব চটকদার ও দামী পোষাকে অর্দ্ধ দেহ অনাবৃত করে রংটং মেখে সব খেতে বসেছিলেন। জন দুই-তিন ছাড়া অধিকাংশের চেহারা প্রায় তাড়কা রাক্ষসীর মত। কিন্তু সেই রূপ দেখাবারই কি ঘটা! নেডুস্ হোটেল এখানকার সব চেয়ে বড় এবং ফ্যাশনেব্‌ল্ হোটেল। কাশ্মীর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বড়লোক সাহেব যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই প্রায় এখানে ওঠেন। কেউ কেউ ভাল হাউস-বোটে থাকেন, কেউ কোন ছোট বোর্ডিং-হাউসে কিংবা কারুর বাড়ী টাকা দিয়ে অতিথি হয়ে থাকেন। এ ছাড়া দিশী হোটেল অনেক আছে। বোটের উপর হোটেলও আছে। নেডুস্ হোটেল বোধ হয় মান্দ্রাজীদের কর্ত্তৃত্বে চলে। ম্যানেজার এবং বড় কর্ম্মচারীদের দেখলে তাই মনে হয়। খানসামা প্রভৃতি সব কাশ্মীরী। মনিব ও ভৃত্যদের চেহারা একেবারে উল্টো। অবশ্য চেহারায় মানুষের যোগ্যতা প্রকাশ পায় না। হোটেলে বড় ও ছোট সব রকম টেবিল পাওয়া যায়। আমরা একটি ছোট টেবিল বেছে নিলাম। হোটেলের দিশী অতিথিদের মধ্যে দেখলাম লাহোরের লেডি শাফি, তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী প্রভৃতি এবং কলিকাতার এক বাঙালী গুপ্ত দম্পতি। আর সবই সাহেব-মেম। এখানে দুই বার চা কেক প্রভৃতি ছাড়া তিন বার পুরা খাবার দেয়। ফলের দেশ বলে প্রত্যেক বারেই গুচ্ছ গুচ্ছ সুপক্ক ফল থাকে। খাওয়ার পরিমাণ এত বেশী যে আমাদের দুই জনের খাবার চার-পাঁচ জনকে দিলে আমাদের পক্ষে ঠিক হ'ত। সাহেব অতিথিই বেশী ব'লে মাংসের ঘটা বেশী। আমাদের ঘরে দুবার (ভোরে ও বিকালে) চা-রুটি কেক প্রভৃতি দিয়ে যেত। বাকি তিন বার ডাইনিং-হলে গিয়ে খাবার কথা।

আমরা ডিনারের পর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে শ্রীনগরের রাত্রির চেহারা দেখতে বেরোলাম। তখন বেশ ঠাণ্ডা, তবে অসম্ভব রকম নয়। সাহেব-মেমরাও অনেকে টাঙ্গা করে চলেছে। হোটেলের সামনের রাস্তাটি বেশ পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন, অদূরে তখ্‌ত-ই-সুলেমান পাহাড়.পাহাড়টি কাশ্মীর উপত্যকা হ'তে ঠিক হাজার ফুট উচ্চ। তার চূড়ায় একটি হিন্দু মন্দির আছে; সেটিকে অনেকে বলেন শঙ্করাচার্য্যের মন্দির। অনেকের মতে এটি ২০০০ বছরের পুরাতন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন মন্দিরের গঠন দেখে বোঝা যায় এখানে একটি বহু প্রাচীন মন্দির ছিল। পরে মধ্য যুগে সেই পুরাতন ভিত্তির উপর নূতন আর একটি মন্দির গড়া হয়।

উপরে যাবার জন্য পাহাড়ের গায়ে পথ কাটা আছে, পথে বৈদ্যুতিক আলো রাত্রে তারার মালার মত দেখাচ্ছে। নদীতে চাঁদের আলোয় শিকারা ও বড় বজরাগুলি যেন ছবির মত। চাঁদের আলোয় একটা ছবি আঁকা শিকারায় চড়ে ডাল হ্রদে একটু ঘোরা গেল। অস্পষ্ট আলোতে নূতন দেখা দেশের নূতন রকম নৌকায় চড়ে মনে হচ্ছিল বুঝি স্বপ্নে জাহাঙ্গীরের আমলে চলে গিয়েছি। কিন্তু শীতের হাওয়ায় শীঘ্র স্বপ্ন ভেঙে গেল।

নেডুস্ হোটেলের অনেকগুলি ছোট বড় কটেজ আছে। চেনার বাগানের মধ্যে এই রকমই একটি দোতলা কটেজের উপরতলায় আমাদের দুখানা ঘর দিয়েছিল। রাত্রে বেড়িয়ে এসে সেখানে ঢুকলাম। সারাদিনের গরম ও শ্রান্তির পর শীতে বেশ আরামে ঘুমনো গেল। ঘর দুটি কাশ্মীরী কালো কাঠের কাজে আগাগোড়া অলঙ্কৃত, শুতে যাবার আগেই তা লক্ষ্য করেছিলাম।

ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙল। অসংখ্য পাখীর দেশ। বাগানে কত যে শালিখ, ময়না, বুলবুল প্রভৃতি পাখী গান করছে তার ঠিক নেই। চড়ুই পাখীও আছে। আকাশ পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে সূর্য্যের আলো। তুষারাবৃত শুভ্র বরফের পাহাড় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেঘ কি কুয়াশার চিহ্ন নেই। দশটা বেলাতেও বরফের পাহাড় মেঘের আড়াল হয় নি। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে ১০০০।২০০০ ফুট উচ্চের যে-সব পাহাড় নিকটেই খাড়া হয়ে আছে, তাদেরও মাথায় সবুজের উপর সাদা সাদা বরফ:জমে আছে। আজ ১লা জুন, আজও গলে যায় নি।

থেকে থেকে দমকা হাওয়া এসে গাছগুলিকে দোলা দিচ্ছে; গাছের ফুল বৃষ্টির মত বাগানে ঝরে পড়ছে; এই বুঝি দেবতাদের পুষ্প বৃষ্টি। ধূলার মত ঝরে চূর্ণ ফুল পথে ও বাগান উড়ে বেড়াচ্ছে। কাল সন্ধ্যায় শ্রীনগরের বাজার দেখে নিরাশ হয়েছিলাম, আজ সকালে চেনার গাছের তলায় কাঠের বাড়ীর জানালা থেকে চূর্ণ পুষ্প ও পাখীর মেলার ভিতর দিয়ে বরফের পাহাড়ের শুভ্র সুন্দর রূপ দেখে মনটা খুসী হ'ল। সেদিনই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সৈয়দীন সাহেবের বাড়ীতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি অতি ভদ্র ও সুশিক্ষিত মানুষ, আমাদের অনেক যত্ন করলেন। তবে তাঁর স্ত্রী পর্দ্দানশীন, বাহিরে এলেন না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক, একজন মেমসাহেব ও ডা. জাকির হোসেন ছিলেন। চায়ের পর কলেজে অধ্যাপক নাগ মহাশয়ের বক্তৃতা ছিল।

শ্রীনগরে তখন বাঙালী বেশী কেউ ছিলেন না। সেখানকার টেকনিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বেঙ্গল মোটর কোম্পানীর নিয়োগী মহাশয় অনেক বৎসর সপরিবারে শ্রীনগরে আছেন। তাঁদের দুই পরিবারের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। তাঁরা আমাদের নানা বিষয়ে অনেক যত্ন ও সাহায্য করেছেন। ওঁরা না থাকলে বিদেশে অনেক রকম অসুবিধায় পড়তে হ'ত। ডাঃ শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া মজুমদার মহাশয়ার সঙ্গেও এক দিন দেখা হয়েছিল। তিনি তখন মোটর-দুর্ঘটনায় একটু আহত হয়েছিলেন।

মুখোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁদের স্কুল আমাদের দেখালেন। স্কুলটি প্রকাণ্ড সুন্দর বাগানের মধ্যে। বাগান করতে কাশ্মীরে বেশী কষ্ট পেতে হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তাই উদ্যান-রচনা করে রেখেছেন চারিদিকে। বুদ্ধিমান অল্পস্বল্প যাঁরা আছেন তাঁরা সে উদ্যানের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেন। সাধারণ কাশ্মীরবাসীর সেই বুদ্ধির অভাব বলে তারা স্বর্গে নরকরচনা করতেই বেশী পটু। বেচারীদের শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্যই অবশ্য এর জন্য প্রধানত দায়ী। টেকনিক্যাল স্কুলে ড্রয়িং, পেন্টিং, স্টেনসিলের কাজ, ভাস্কর্য্য এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ শেখানো হয়। আমি সেদিন একটা বাতিক ধরণের পাড়-আঁকা শাড়ী পরে গিয়ে-ছিলেম। ইস্কুলের মাষ্টার মশায়রা সেটা দেখে মহাখুসী। একজন ত "শাড়ী কে করেছেন, কেমন করে করেছেন, আপনি করতে পারেন কিনা," নানা প্রশ্ন সুরু করলেন। ড্রয়িং এবং পেন্টিং-এর ক্লাসে মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রী আছেন। এঁরা অধিকাংশই এখানকার খুব বড় বড় ঘরের মেয়ে। ছাত্রদের মধ্যে গরীব কারিগরের ছেলে এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর ছেলে সবই আছেন। এদেশে ঘরের চেয়ে বাহির এত সুন্দর এবং এ সময় ঠাণ্ডা এতই সামান্য যে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের আগে এবং পরে গাছতলাতেই বিশ্রাম ও গল্প করে। টেকনিক্যাল স্কুলেও একদিন নাগ মহাশয়ের বক্তৃতা হ'ল। কয়েকটি ছাত্রীও এসেছিলেন। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের গৃহিণীও কিছুক্ষণ পরে এলেন। ক্রমশঃ

[বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

জমিদার রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি চিঠি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রাবণের পত্রিকায় "জমিদার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার দুইখানি জমিদারী চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছি যে, 'কর্ম্মচারিগণের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধ দেখা দিলে জমিদার রবীন্দ্রনাথ কঠোরতার দ্বারা কখনও তাহার সমাধান করিতেন না, উপদেশ দ্বারাই সে ত্রুটির তিনি সংশোধন করাইয়া লইতেন এবং কৃতকার্য্যতায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উন্নততর পথের সন্ধান জানাইয়া দিতেন।' ইহার যথার্থতা উপলব্ধির জন্য পাঠকপাঠিকাগণকে রবীন্দ্রনাথের ১৩১৫ সাল ২৪শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত একখানি পত্র পূর্ব্বে উপহার দিয়াছি। এবার উহার পরবর্ত্তী পত্রখানি প্রকাশ করা হইল। এখানিও জমিদারীর ম্যানেজার জানকীনাথ রায় মহাশয়কে লিখিত।

(১)

ওঁ

বোলপুর

আশিষঃ সন্তু

আজ তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানিতাম যে ক্ষণিক ক্ষোভেই তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলে। আমার সে বিশ্বাস না থাকিলে আমি কখনই তোমাকে পত্র লিখিতাম না।

তোমার এবং ভূপেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমার জমিদারী কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরো একটি বিশেষত্ব আছে। আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভলোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্ম্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে—তোমাদের কর্ম্ম ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব। এই জন্যই তোমাদের চিন্তা ও ব্যবহার কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্ম্মের উপযুক্ত না হয় এই দিকে আমার দৃষ্টি আছে। তোমাদের মধ্যে ধৈর্য্য ক্ষমা উদারতার লেশমাত্র অভাব না হয়। তোমরা পরস্পরের সমস্ত ত্রুটি একেবারে ভিতর হইতে সংশোধন করিয়া লইবে—সে সংশোধন কেবলমাত্র ধর্ম্মবলেই হইতে পারে। সেজন্য প্রত্যহই ঈশ্বর প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া নিজের শক্তিকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। যখনি দেখিবে মনের মধ্যে কাহারো প্রতি গ্লানি আসিতেছে তখনি সতর্ক হইয়া সত্যপথে সরলপথে তাহার সংশোধন করিয়া লইবে। আবর্জ্জনা কদাচ মনের মধ্যে লেশমাত্র জমিতে দিবে না। তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্ম্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে। আমাদের লাভই কেবল দেখিবে না—সকলের মঙ্গল দেখিবে। সেই মঙ্গলে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া রাখিবে। অধীর হইয়ো না অসহিষ্ণু হইয়ো না—ঈশ্বরকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে শান্তম্ শিবম্ অর্থাৎ শান্তিময় মঙ্গলময় বলিয়াছে, তাঁহারই আদর্শে মনকে সর্ব্বদা শান্ত ও মঙ্গল করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে আর্থিক ও পারমার্থিক সকল কাজই ভাল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভূপেশ অক্ষয় সত্যকুমার প্রভৃতিকে লইয়া তুমি মাঝে মাঝে এমনভাবে একত্রে কর্ম্মের আলোচনা করিবে যাহাতে তোমার মন ও চেষ্টা তোমাদের কর্ম্মের চেয়েও অনেক বড় হইয়া উঠে। তোমরা যে কাজে আছ সে কাজ ত তোমাদের লক্ষ্য নহে তাহা তোমাদের পথ। অতএব লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া পথকে ঠিক করিয়া লইবে। এই সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি যথার্থ ধর্ম্মের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। বাধা বিস্তর—বারম্বার আঘাত পাইবে, ব্যাঘাত পাইবে, মাঝে মাঝে স্খলন হইবে কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইয়ো না, অবসন্ন হইয়ো না। সকলকে ধর্ম্মের নামে এক করিয়া

টানিয়া লও—তোমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর অবিচলিত হউক—ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক কল্যাণ-সূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার মঙ্গল কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করুন—কর্ম্ম তোমাদিগকে কোনোমতেই ক্ষুদ্র করিতে মলিন করিতে যেন না পারে। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া সবিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। আদর্শ জমিদার রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাসনা ছিল—'আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে।' তিনি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারেন নাই। প্রজাদের মঙ্গল যে জমিদারের উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে তিনি সদাই অবহিত ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের দ্বারাই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। নিজ কর্ম্মচারী-দেরও ঐ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়াছেন। প্রজাহিতৈষী জমিদারের ইহা অপেক্ষা যে আর কি বড় আদর্শ থাকিতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের লিখিত অনেকগুলি বৈষয়িক পত্র দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। কিন্তু অন্যায়কারী প্রজাদের প্রতি কোন পত্রেই তাঁহাকে রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। প্রজার ত্রুটি তিনি সকল সময়েই ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীদিগকেও সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। প্রজাদের উপর কোনরূপ অন্যায় করা হইলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইতেন এবং সেজন্য নিজেকেও পাপে লিপ্ত বলিয়া মনে করিতেন। প্রজার মঙ্গলসাধন তাঁহার নিকট বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই গণ্য ছিল।

কর্ম্মচারীদের নিকট রবীন্দ্রনাথ কেবল জমিদার ও অন্নদাতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাহাদের সকলের উপদেষ্টা ও গুরু। সকল কর্ম্মচারীকেই তিনি স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের দোষত্রুটি সহজেই ক্ষমা করিয়া অমূল্য উপদেশ দানে তাহাদিগকে সর্ব্বদা ন্যায় ও ধর্ম্ম-পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথ যখন নিজেরা জমিদারী পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন তখন ম্যানেজার জানকীনাথ রায়কে অবসর দেওয়া হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(২)

ওঁ বোলপুর

শুভাশিষাংরাশয় সন্তু

এক্ষণে যাঁহারা কর্ম্মের ভার লইয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তোমার পদ অনাবশ্যক বিধায় তোমাকে অবসর দিতেছেন ইহা আমার পক্ষে বেদনাজনক। তুমি চিরদিন কিরূপ সততার সহিত কাজ করিয়াছ এবং ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ তাহা আমার অগোচর নাই। তোমার এই নির্ভীক সততায় অনেক সময়ে তোমার উপরিতন ও নিম্নতন কর্ম্মচারীরা অসহিষ্ণু হইয়া তোমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয় নাই। তুমি যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে ও সম্মানের সহিত পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ পাইয়াছ জমিদারী সেরেস্তায় এরূপ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ইহা তোমার অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠতার ফল। যে ভগবানের প্রতি তুমি সুখে দুঃখে চিরদিনই নির্ভর করিয়াছ তিনিই নিশ্চয় তোমার এই কর্ম্মজাল হইতে মুক্তিলাভকে তোমার পক্ষে কল্যাণকর করিয়া তুলিবেন—অতএব তুমি তোমার এই বর্ত্তমান ক্ষতি ও অসুবিধাকে তাঁহারই স্বহস্তের দান বলিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। তুমি যে অবস্থায় যেখানে থাক আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি ইহা নিশ্চয়ই জানিবে।

সহসা তোমার কর্ম্মস্থান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা জানাইয়া আবেদন করিলে নিঃসন্দেহই তাহা পূরণের ব্যবস্থা হইবে। এ সম্বন্ধে এষ্টেট্ হইতে তোমাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি—অতএব কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া এই সংক্রান্ত তোমার ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিতে পার।

সরকারী যে জিনিষগুলি তুমি সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিতেছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে—তাহার কোনো মূল্য দিতে হইবে না।

আমাদের সহিত তোমার পূর্ব্বাপর যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ ছিল তাহার লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই ইহা স্থির জানিবে এবং তোমার মঙ্গলসংবাদ পাইলে সুখী হইব ইহাও মনে রাখিবে। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে সহসা বিদায় দেওয়ায় স্নেহশীল জমিদার রবীন্দ্রনাথ অন্তরে যে বেদনা অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহা এই পত্রখানির প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া

রহিয়াছে। প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত এই সান্ত্বনা পত্রখানি যে সে সময় তাঁহার অনুরাগী কর্ম্মচারীর মনে সবিশেষ শান্তি দানে সক্ষম হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানব-মনের মর্ম্মসন্ধানী কবি রবীন্দ্রনাথ বিদায়প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তাহার নিত্য ব্যবহারের সরকারী জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন—যদি তাহাতে তাহার মনের কথঞ্চিৎ শান্তি হয় এই আশায়। বহুদিন ধরিয়া যে স্থানে বাস করিয়া যাহার উপর একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছে সে স্থান ত ত্যাগ করিতে হইল, নিত্যব্যবহার্য্য যে সকল জিনিষপত্রের উপরও মায়া জন্মিয়াছে এখন সে-সব নিকটে পাইলে হয়ত কতকটা শান্তিলাভ ঘটিবে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের এ উদারতার তুলনা নাই।

রায় মহাশয়ের অবসর প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে ভুলেন নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কবির জমিদারীতে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন।

ছোঁওয়া নাহি যায়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

তোমাতে আমাতে গেয়েছি গান
নাহি তা'র আদি,
নাহি নাহি তা'র শেষ—
যত খুঁজি তত কানে আসে তান
ভাঙে না ভাঙে না সুর
হয় না তা অবশেষ।

ওপারে রয়েছ চিরদিন
তবু ত নিয়ত এপারের সাথে
দিয়ে গেছ কোলাকুলি,
সর্ষেক্ষেতের সোনালী আভায়
অমল শীতল পবনের দোলে
রহিয়াছ মাথা তুলি'।

তোমারে তোমার আপনার মাঝে
যত বার গেছি সকালে ও সাঁঝে
জড়ায়ে ধরিতে হাতে,
খলিত তোমার শুধু ছায়াখানি
ক'রে গেছে কিছু বুকে জানাজানি,
তুমি ত ছিলে না সাথে।

তপন তখন ওঠে নি আকাশে,
রাত ভেসে গেছে ভোরের বাতাসে,
জ্যোৎস্না হয়েছে লীন;
শ্যামল পাতার আঁচলের মাঝে
সৌরভে ঘেরা বাসা,
পাখীরা তন্দ্রাহীন।

পিউ পিউ পিউ আকাশের ফাঁকে ফাঁকে
সুরধারা ঢালে নামহারা কোন্ পাখী,
ওঠা শুকতারা ডুবে যাওয়া চাঁদ
আলোকে মায়ার ফাঁদে
জড়ায় বনের শাখী।

তোমাতে আমাতে সহসা বরষে
আধঘুমা আধজাগা
পরশের সুরধার,
তবু যত বার চেতনে তোমারে
ছুঁতে যাই বারে বার
ছিন্ন হয় যে তার।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

৫

অনাদিনাথ অনেক দিন ধরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসা করিয়াছিলেন। এখন শরীর বাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। দুই-পা হাঁটিতে একেবারে হাঁপাইয়া পড়েন—মেদ জমিয়া সমস্ত শরীর এমন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারই অন্তরালে হৃদ্‌যন্ত্র ক্ষীণ স্পন্দনে কোন প্রকারে তাহার কাজ চালাইয়া টিকিয়া আছে। একটু উত্তেজনা হইলে কখন হার্ট ফেল করিবে এমনই অবস্থা।

নদীয়া জেলার পদ্মার তীরে দিকনগরে তাঁহার পৈত্রিক বাড়ী। বাড়ীতে ছোটখাট একটি জমিদারী আছে। আমলা গোমস্তারাই এত দিন ধরিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে অনাদিনাথ তাহা তদারক করিতে যান।

জমিদারী তদারক হউক না-হউক অন্ততঃ পদ্মার হাওয়ায় কিছু দিন শরীরটাকে একটু তাজা করিয়া লইয়া আসা হয়।

এই অনাদিনাথেরই একমাত্র পুত্র নীরেন, তাহারই শিক্ষক নিযুক্ত হইল অবনী। অনাদিনাথ বিপত্নীক, সংসারে একটি কন্যা ও একটি পুত্র মাত্র তাঁহার সম্বল। ইহা লইয়াই তিনি কলিকাতার বাসায় ঠাকুর চাকর দিয়া সংসার চালান। মেয়েটির বয়স ষোল-সতের বৎসর—নাম লতিকা। নীরেন এই বার-তেরয় পড়িয়াছে। আজ তিন দিন হইল অবনী দিকনগরে আসিয়াছে। স্থানটি বড় মনোরম। অবনীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। অনাদিনাথের বাড়ী হইতে পদ্মা দশ মিনিটের পথ। সেদিন বিকালবেলায় অবনী পদ্মার ধারে বসিয়া আছে, অনাদিনাথ নীরেন লতিকা রোজই এই সময় পদ্মার তীরে বেড়াইতে আসেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, এখন পদ্মার নবযৌবন। জল প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে, গ্রীষ্মকালে যে স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসে এখন তাহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। এপার হইতে ওপারে চাহিলে শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শতসহস্র তরঙ্গের মালা চোখে পড়িয়া চোখকে ধাঁধাইয়া দেয়। কে যেন পদ্মার সমস্ত জলে গৈরিক রঙ গুলিয়া দিয়াছে, সে কর্দ্দমাক্ত জল মুখে দিবার উপায় নাই, দাঁতে বালি কিচ্‌কিচ্‌ করিতে থাকে।

এই সময়ই আরম্ভ হয় পদ্মার ভয়ঙ্কর ভাঙন। এই ভাঙন যাহারা চোখে দেখে নাই তাহাদের পক্ষে ইহা ধারণা করা অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে বাড়ী-ঘর গাছ-পালা নিঃশব্দে নীচের দিকে বসিয়া যাইতে থাকে, পদ্মার প্রবল জলস্রোত আসিয়া তাহার উপরে সমাধি রচনা করিয়া দেয়। পদ্মাতীরের অধিবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই ইহার লক্ষণ ঠিক পায়, তাই সময় থাকিতেই তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া সরিয়া পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জোর বাতাস ছিল না, কাজেই পদ্মা ছিল শান্ত, নিকটে কোথায় একটা জলের ঘূর্ণি পড়িয়াছে তাহারই হু-হু শব্দ অনবরত ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে নিকটে শত শত জেলে-নৌকা জাল ফেলিয়া ইলিশ মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে। মাঝে মাঝে দুই-একটা ছোট বড় গাছ আর অসংখ্য জমাট ফেনার মালা ভাসিয়া যাইতেছে। উজানে কোথাও নিশ্চয় পদ্মার ভাঙন-লীলা সুরু হইয়াছে। সূর্য্য একেবারে অস্ত যাইতে বসিয়াছে, তাহারই শেষ রশ্মি জলে পড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে, অবনী একদৃষ্টে এই জলের দিকে তাকাইয়া তীরে বসিয়া আছে। এমন সময় দূরে হঠাৎ একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিতে পাইল। পিছন ফিরিয়া দেখিল নীরেন চীৎকার করিতে করিতে তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। দূরে লতিকা দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অবনী আগাইয়া গেল। নীরেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—মাস্টার মশায় শীগ্‌গির আসুন, দিদিকে সাপে ধরেছে।

ব্যাপার কি অবনী বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল, "সাপে ধরেছে? তার মানে?"

"হাঁ মাস্টার মশায়, মস্ত বড় এক সাপ এসে দিদির পা জড়িয়ে ধরে আছে—দিদি আর একটুও নড়তে পারছে না।" অবনী নীরেনের সহিত দৌড়াইয়া লতিকার নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইল সত্যই একটি প্রকাণ্ড সাপ লতিকার একখানি পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত দুই-তিন পাক জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া আছে।

লতিকা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। অবনী কি করিবে ভাবিতেছে—এমন সময় তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া সাপটি আস্তে আস্তে লতিকার পা ছাড়িয়া দিয়া নদীর মধ্যে নামিয়া গেল। সাপটি বিষাক্ত নয়। পদ্মার তীরে অসংখ্য গর্ত্ত, তাহারই মধ্যে গাংশালিকেরা বাসা করিয়া ডিম পাড়ে—ছানা তৈরি করে— সাপটি হয়ত শালিকের ছানার লোভে এখানে আসিয়াছিল। তবু ভাগ্য ভাল, লতিকাকে কামড়ায় নাই।

অনাদিনাথও নিকটেই ছিলেন। নীরেনের চীৎকারে তিনি ছুটিয়া আসিলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া কপালে চোখ তুলিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একাকার হইয়া গেলেন। "এই জন্যেই ত বাড়ীতে আমি আসতে চাই না, বুঝলে না বাবা অবনী। তা লতার যে জেদ—ওর জন্যেই ত এবার এখানে আসা। নইলে আমার কি আস্‌বার ইচ্ছা ছিল?"

লতিকা এতক্ষণে ভয় ও বিস্ময়ে কোন কথা বলে নাই,—"যাক্ সাপ ত গেছে—তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না বাবা—একটু চুপ ক'রে এখানটায় ব'স—যা হাঁপাচ্ছ।"

"না, আর এখানে বসা নয়—চল সব বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক, অন্ধকার হয়ে এসেছে। এ কি তোমার কলকাতা শহর যে পার্কে যত রাত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও।"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "তোমার ভাব বুঝা আমাদের অসাধ্য বাবা, কলকাতা গেলে করো পাড়াগাঁয়ের প্রশংসা, আর কলকাতা ছাড়লেই তোমার কাছে কলকাতা হয়ে উঠে ভাল। নদীর ধার, এমন খোলা হাওয়া, এমন সুন্দর নিরিবিলি—এ কি তোমার কলকাতায় পাওয়া যায় বাবা? এই কয় দিনে দেখ ত তোমার বেতো শরীরও কতটা তাজা হয়েছে—রোজ কতটা হাঁটতে পারছ।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন—সে ত বুঝি সব, কিন্তু ঐ সাপটা—

অবনী এবার কথায় যোগ দিল, বলিল—জ্যাঠামশায় ফুলটি চান, কিন্তু কাঁটার ভয় করেন আবার ষোল আনা।

—সে ত ঠিক বাপু, সাধ ক'রে আর কে কাঁটার খোঁচা খেতে চায় বল্?

লতিকা বলিল—আমি কিন্তু আর একটু হ'লেই কাঁটার খোঁচা খেয়েছিলাম আর কি। আচ্ছা সাপটি যদি আমাকে কামড়ে দিত তা হ'লে তুমি যে কি কাণ্ডটা করতে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। হয়ত উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে, কেমন বাবা!

অনাদিনাথ রাগিয়া বলিলেন—তোর মুখে কিছু আটকায় না—নে এখন চুপ ক'রে ফিরে চল্, ও কথায় আর কাজ নেই।

নীরেন বলিয়া উঠিল, "ইস্ কামড়ালেই হ'ল—না দিদি? মাস্টার-মশায়কে আমি ডেকে এনেছিলেম কি জন্য—উনি সাপটাকে ত আর একটু হ'লেই শেষ ক'রে দিতেন।"

—ইস্ কি বীরপুরুষ—কে? তুই, না তোর মাস্টার মশায়?

অবনী হাসিয়া বলিল—না মাস্টার মশায় মোটেই নয়। নীরেন একাই মস্ত বড় বীর। কেমন নীরু?

নীরেন লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অবনী এই পরিবারের মধ্যে মিশিয়া গেল। অনাদিনাথ তাহাকে প্রথম হইতেই বাপু, বাবা সম্বোধন সুরু করিয়া দিয়াছেন। অবনীও অনাদিনাথকে জ্যাঠামশায় বলিয়া ডাকিতেছে। লতিকা এইবার ম্যাট্রিক দিবে। অনাদিনাথ নিজেই তাহাকে পড়ান। কিন্তু মাসের মধ্যে দশ-বার দিন বাতের বেদনায় বিছানায় পড়িয়া থাকেন, কাজেই অবনীর ডাক পড়ে। তা ছাড়া আজ এই আঁকটি মিলিতেছে না, ডাক অবনীকে—ইংরেজী এই প্যাসেজটা অবনী হইলেই হয়ত ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিত—অতএব ডাক তাহাকে, এমনি করিয়া কার্য্যতঃ অবনীই পড়াইতে আরম্ভ করিল লতিকাকে—অনাদিনাথ থাকিতেন উপলক্ষ্য মাত্র।

সেদিন বৈকালে অবনী লতিকার একটা শক্ত অঙ্ক লইয়া পড়িল। কোথায় কেমন করিয়া হয়ত একটু ভুল হইয়া গিয়াছে, কাজেই অঙ্ক আর মিলিতে চায় না। অনাদিনাথ আর নীরেন বেড়াইতে যাইবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু কখন যে অঙ্ক মিলিবে তাহার ঠিক নাই—কাজেই অনাদিনাথ নীরেনকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সম্মুখের জানালাটি খোলা ছিল—দক্ষিণা বাতাস তাহার মধ্য দিয়া একটানা ঘরের মধ্যে বহিয়া আসিতেছিল। অবনীর সম্মুখে বসিয়া লতিকা—সে আজ যেন কি একটা সুগন্ধ তেল মাখিয়াছে, তাহারই মনোরম গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া অবনীর নাকে, মুখে, চোখে সর্ব্বত্র যেন জড়াইয়া যাইতেছিল। তাহার খোলা চুলের দুই-একটা গুচ্ছ হয়ত বা কখনও একেবারে উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছিল অবনীর মাথায় ও পিঠে। এদিকে অঙ্ক যতই গরমিল হইতেছিল অবনীর উৎসাহ ও ধৈর্য্য যাইতেছিল ততই বাড়িয়া। অবশেষে সামান্য

একটা ভুল বাহির হইল--দেখা গেল সে-ই এতক্ষণ ধরিয়া করিতেছিল এত গোলমালের সৃষ্টি। অঙ্ক মিলিল, কিন্তু বেলা তখন আর বেশী নাই। অনাদিনাথ হয়ত এখনই বেড়াইয়া ফিরিবেন, কাজেই সেদিন আর তাহাদের বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

সেদিন অবনীর ভাল ঘুম হইল না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে কত বার উঠিল জাগিয়া—কত বার মনে হইল বিকালবেলার সেই গন্ধটা এখনও ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হয় লতিকা বুঝি পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে—অবনী নিজের ভুল বুঝিতে পারে না, দুই-এক বার পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখে। সারাটা রাত্রি তাহার কাটিল—সে এক মধুর আবেশে। এ আবেশ অবনীর জীবনে এই প্রথম—এ অনুভূতি তাহার অনাস্বাদিত। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক। বসন্ত যখন আসে তখন জড় প্রাণীও সাড়া দিয়া উঠে—বৃক্ষ উঠে পল্লবে পল্লবে সজ্জিত হইয়া—লতায় লতায় ফুটিয়া উঠে বিচিত্র পুষ্পসম্ভার—বর্ণে গন্ধে তাহারা উঠে কথা কহিয়া। আর মানুষ—যে সর্ব্বাপেক্ষা চেতনাশীল—সক্রিয়, সে কি তাহার জীবনের মধুমাসে আপনার মাঝে লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? যৌবনে মানুষ চায় বিস্তৃতি—প্রসার—ভালবাসা, ভালবাসিয়া নিজের হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দিতে। অবনীর সে ছোঁয়াচ লাগিয়াছে—তাহার অন্তরাত্মা উঠিয়াছে জাগিয়া। তাহার যৌবন আজ ভালবাসিতে চায়, নিজেকে আর নিজের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে চায় না।

৬

নীল চশমা চোখে দিলে সারা জগৎ নীল হইয়া যায়। ভালবাসা এই নীল চশমার মত। মানুষ এক বার এক জনকে ভালবাসিতে শিখিলে—ক্রমে ক্রমে সে জগৎকেও ভালবাসিতে পারে—ছোট হইতেই হয় বড়র উৎপত্তি। অবনীর চোখে কয় দিনের মধ্যেই এই নীল চশমার ছায়া পড়িয়াছে। অনাদিবাবু, নীরেন তাহা ছাড়া—এই মাঠ ঘাট বালুর চর পদ্মা সকলকেই সে সাগ্রহে মনে মনে লইয়াছে একেবারে আপন করিয়া। এই আকাশ বাতাস, অনাদিনাথের এই সেকেলে পুরাতন বাড়ীখানি ইহাদের আবেষ্টনীর মধ্যে নীরেন ও অনাদিনাথের সান্নিধ্যে সে ভালবাসিয়াছে লতিকাকে। তাই এ সবই তাহার প্রাণে সুন্দর হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ আনন্দও তাহার নিষ্প্রভ হইয়া যায়—যখন মনে পড়ে নিজের বাড়ীর কথা—তাহার মা, আর বয়স্থা ভগিনী। তাহাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা ত দূরের কথা, ইতিপূর্ব্বে কখনও একসঙ্গে দশটি টাকাও সে বাড়ীতে পাঠাইতে পারে নাই, দেশে সামান্য যে জমিজমা আছে তাহাতেই কিছু ধান হয় বলিয়া কোন প্রকারে দিন তাহাদের চলিয়া যায়। আবার এদিকে বিবাহযোগ্যা ভগ্নী হইয়াছে আরও দুশ্চিন্তার কারণ, অনাদিনাথ ছোটখাট জমিদার—তা ছাড়া নিজে ওকালতী করিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এদিকে আবার থাকেন কলিকাতায়, বড় বড় সমাজের সহিত তাঁহাদের আলাপ ব্যবহার—কাজেই লতিকা একেবারে তাহার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে—তাহাকে যে সে কোনদিন পাইতে পারে এ কল্পনাও সে করিতে সাহস করে না। কিন্তু এই সব ভাবিতেও সারা মন তাহার বেদনায় ভাঙিয়া পড়ে। দুনিয়ায় কি আছে তাহার? বিদ্যা নাই—অর্থ নাই—প্রতিষ্ঠা নাই। সে কি না করিতে পারিত! টাকা থাকিলে হয়ত সেও পারিত বিলাত যাইয়া মস্ত বড় এঞ্জিনীয়ার, কিংবা বড় ডাক্তার বা ব্যারিষ্টার হইতে। হয়ত বা জগতের কোন একটা বড় কিছুর আবিষ্কারই সে এক দিন করিয়া ফেলিত।

হায় রে ব্যর্থ কল্পনা! কিন্তু সব চেয়ে এইটাই অসহনীয় যে প্রাণশক্তি আছে তাহার প্রচুর—কাজ করিবার ক্ষমতা আছে অসীম—অথচ কোন কাজ নাই। কাজ—কাজ—কাজ! সমস্ত জগৎ কাজে মাতিয়া আছে, কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীব আছে এই নেশায় মশগুল হইয়া। আর মানুষের ত কথাই নাই, কাজের তাড়নায় কেহ মরিতেছে যুদ্ধ করিয়া—কেহ হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে করিতেছে ছুটাছুটি—কেহ খনিতে নামিয়া কয়লা তুলিতেছে, কেহ সমুদ্রে ডুবিয়া মুক্তা তুলিতেছে—এমনি আরও কত। আর সে—এই কর্ম্মচঞ্চল জগতে আছে দর্শকের মত বসিয়া। তাহার কিছু করিবার নাই। সে এমনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া জড়ত্বে পরিণত হইবে—তার পর এক দিন একান্ত অপরিচিতের মত এ পৃথিবী হইতে লইবে বিদায়। তাহার এতটুকু দাগও আর সে পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য অনাদিনাথ ছেলে-মেয়ে লইয়া বসিতেন গল্পগুজব করিতে। আজকাল অবনীকেও দিতে হইত ইহাতে যোগ। সেদিন সন্ধ্যার সময় অনাদিনাথ দৈনিক কাগজখানা হাতে লইয়া ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়াছিলেন—একে একে নীরেন লতিকা ও অবনী আসিয়া আসর জমাইল।

অনাদিনাথ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "উঃ কি সাংঘাতিক—দেখেছ অবনী! দেশের হ'ল কি?" অবনী ও লতিকা উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইল। তিনি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, "বেকার যুবকের আত্মহত্যা।"—তার পর তিন মাস ধরিয়া চাকুরী হারাইয়া একটি বেকার যুবক কেমন করিয়া তিনতলা ছাদের উপর হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার মস্তকটি হইয়া গিয়াছে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ, পকেটে খোঁজ করিয়া পাওয়া গিয়াছে একখানা চিঠি, তাহাতে সে লিখিয়া গিয়াছে "কর্ম্মহীন দারিদ্র্য জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করাই সে শ্রেয় মনে করিয়াছে—তাই করিতে যাইতেছে আত্মহত্যা।" পড়িতে পড়িতে অনাদিনাথের গলা ধরিয়া আসিল, চক্ষু হইল বাষ্পাকুল। আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অবনী নিজের বেকারজীবনের কথাই ভাবিয়াছে, তাই মনও ছিল অত্যন্ত খারাপ হইয়া। সংবাদটি শেষ করিয়া অনাদিনাথ অবনীর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু অবনী কখন তাঁহার অজ্ঞাতে উঠিয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

অবনী তাহার ঘরে আসিয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের প্রান্তরের দিকে রহিল চাহিয়া। জমাট অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন—তাহারই ভিতর হইতে একটানা ঝিঁঝিঁ-পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। অবনীর মনে হইল—সেই যুবকটির অতৃপ্ত আত্মা হয়ত এখনও আকাশে বাতাসে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। কাগজে কতটুকুই বা প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা ছাড়া তাহার ব্যর্থ জীবনের কত করুণ কাহিনীই হয়ত আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে—যাহার তাড়নায় অবশেষে সে এই শেষপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কর্ম্মহীন বেকার-জীবন! উঃ সে কি দুঃসহ! দুই দিন পরে যখন অনাদিনাথের ছেলেকে আর পড়াইতে হইবে না তখন আবার পথে পথে তাহাকে টিউশনীর খোঁজ করিয়া ফিরিতে হইবে। দুই মাস ছয় মাস পরে হয়ত একটা মিলিবে, নয়ত মিলিবে না।

—মাস্টার মশায়! অবনী ফিরিয়া দেখে লতিকা আসিয়া তাহারই পাশে দাঁড়াইয়াছে।

—আজ পড়াবেন না?

—হাঁ, চল যাই।

—কিন্তু আপনাকে অমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? শরীর কি ভাল নেই।

—শরীর ত ভাল আছে—তবে মনটা তেমন ভাল নেই।

—বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন সব ঘটনাও পড়িয়ে শুনাতে পারেন যা শুনলেই মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। আর কোথায় কে আত্মহত্যা করেছে এ শুনে আপনারই বা এত মন খারাপ হয় কেন?

—আমার মন খারাপ হয় কেন? আমিও যে ওদেরই দলে—বেকার না হ'লে বেকার-জীবনের দুঃখ ঠিক ষোল আনা বোঝা যায় না। সংসারে বেকার-জীবনের দুঃখ তারাই বুঝতে পারে যারা বেকার—যারা দরিদ্র।

—আপনি বেকার? এ আপনার ভুল মাস্টার মশায়, আপনি নিজেকে ছোট ক'রে ভাববেন না। আপনি হয়ত ইচ্ছা করলে সংসারে অনেক কিছু করতে পারেন এ বিশ্বাস আমার আছে। আজ না হোক এক দিন না এক দিন আপনিও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। আমার এ বিশ্বাস হয়ত একেবারে ব্যর্থ হবে না।

—এ বিশ্বাস আমারও এক দিন ছিল লতিকা, কিন্তু আজ আর তা নাই। এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। বেঁচে থাকার জন্যে এখানে সব সময় সঙ্গীন খাড়া রাখতে হয়। তুমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের মারামারি তোমার চোখে পড়ে নি, কাজেই সে অভিজ্ঞতা তোমার নেই; যদি তা কখনও দেখতে, তবে সে বীভৎসতায় তুমি ঘৃণায় শিউরে উঠতে।

—কিন্তু আমি ধনকে ঘৃণা করি—আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না মাস্টার মশায়—আমার বিশ্বাস দরিদ্রেরাই সংসারে প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে! আর অর্থে মানুষের সুখ হয়? তা কখনও হয় না। আমি দরিদ্রই হ'তে চাই।

অবনী কিছুক্ষণ লতিকার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—হয়ত এ তোমার প্রাণের কথাই লতা; কিন্তু পরে এক দিন হয়ত এ ভুল বুঝতে পারবে। যাক্ রাত হ'য়ে যাচ্ছে—এখন পড়তে চল। (ক্রমশঃ)

মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব্ব

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

"তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম
কোথা হ'তে প্রাণ কেড়ে আন তাহা
তুমিই জান হে তুমিই জান…
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে মনমোহন।
চাহিলে মুখ পানে কী গাহিলে নীরবে, কি সে মোহিলে মন প্রাণ—

…ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিও না—ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসা মাত্র মুছে ফেল। এই বিচিত্র সংসারের বৈচিত্র্য হাসিমুখে দূরের থেকে দেখো। ঘটনাস্রোত কিছুই আমার হাতে নেই শুধু আমিই আমার হাতে আছি। আমাকেই আমার সৃষ্টি করতে হয়—দুঃখকে মধুর করে তুলে বেদনাকে অমৃত করে নিজেকেই উপহার দিতে হবে। অসীম কালের মধ্যে বুদ্‌বুদের মত ফুটে ওঠা ক্ষণিক এই জীবন, কিন্তু তারও গভীর মূল্য আছে। নিজেকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত প্রতিহত ক'রে সে মূল্য হারান অনুচিত, সে নিজেরই পরাজয়।…

…তা ছাড়া যে ছোট ছোট সুখদুঃখগুলো প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধরে বুকের উপর লাফালাফি সুরু করে দেয় বিশ্বসংসারের বিরাট পটভূমির উপর একবার তাদের ফেলে দেখো এক মুহূর্ত্তে ছায়াবাজির মত সব মিলিয়ে যাবে। এই মাত্র মনমোহন চীনের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়ে গেলেন তাই বসে বসে ভাবছিলুম এই বিরাট দুঃখের হোমানলের পাশে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ছোট ছোট চিন্তা দুঃখ বেদনা কি অকিঞ্চিৎকর কি তুচ্ছ! তাকে কোন মতেই স্থান দেওয়া চলে না। তবু আমরা পদে পদে তাদেরই বাড়িয়ে তুলি। কুসুমাস্তীর্ণ পথ কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু কণ্টকিত পথেও হাসিমুখে চলতে হবে আপন মহিমায় আপন ভাগ্যকেও অতিক্রম ক'রে। মানুষ যা পাবে তা এতটুকু যা চাইবে তার শেষ নেই। সেই অশেষের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় কিছুই হ'ল না—কিছুই পেলুম না। কিন্তু সে 'না'টাই বড় হ'য়ে উঠে 'হাঁ' যেটুকু আছে তার মূল্য কমিয়ে দেবে? নিজেকে খুসী করা নিজের হাতে। যা পেয়েছি এই ভাল—হাসিমুখে আনন্দিত মনে পার হ'য়ে যেতে হবে পথ। মন খুঁৎখুঁৎ ক'রে উঠলেই মনকে দিয়ে বলিয়ে নিও আনন্দং পরমানন্দং পরমসুখং পরমাতৃপ্তি! আমি যে এ সব কথা বলছি এ শুধু উপদেশ দেবার জন্য নয়, আমি ইচ্ছে করি তোমাদের আনন্দিত অনুদ্বিগ্ন দেখতে। যাদের সঙ্গে আমার স্নেহের যোগ আছে তাদের কাছে আশা করি নিজের বন্ধন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে তারা। আমি যে প্রভাব বিস্তার করি তার মধ্যে পথ্য আছে আরোগ্য আছে একথা জানতে পারলে সার্থক মনে হয় নিজেকে।…"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"একটু আগে শুনতে পেলুম আপনি গাইছেন, আমি আসতে আসতেই শেষ হয়ে গেছে আমার ভাগ্য ঐ রকমই, ভাল জিনিসের আভাস পাই কিন্তু অদৃষ্টে স্থায়ী হয় না।"

"মাতৃষসা, কথাগুলো বড় বেশী করুণ শোনাচ্ছে। কবির হৃদয়ে আঘাত লাগছে ইচ্ছে করছে সমস্ত গীতবিতান তোমায় গেয়ে শোনাই। তা ছাড়া তোমার ভাগ্নীকে এতক্ষণ এত বড় বড় তত্ত্বকথা বলেছি যে ওর মুখ দেখে মায়া হচ্ছে! মনে হচ্ছে গান গেয়ে এ compensate করা কর্ত্তব্য! আলো জ্বালো তাহ'লে।

পিতা-পুত্র

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল
মোর আনন্দে সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

নাঃ এ আমার মনে নেই—আচ্ছা শোন, এ গানটা শুনেছ আগে ? আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব।

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব
রূপে তোমায় ভোলাব না…"

সেদিন অনেকগুলো গান করেছিলেন। ইদানীং তাঁর মুখে এত গান শোনা কম আশ্চর্য্য ঘটনা নয়, কারণ পূর্ব্বের গলার সঙ্গে তুলনা ক'রে ইদানীং তিনি গান গাওয়া এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতেন, "দন্তাপহারক একদিন সুর দিয়েছিলেন ফিরিয়ে নিয়েছেন, এত দেরি না ক'রে সময় মত এলে আর এত অনুরোধ করতে হ'ত না।" তবু এখানে প্রায়ই গান হ'ত। এক এক দিন নিজেই বলতেন, "আজ গলাটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে আজ গান চলবে।"

সেদিন শেষ হ'ল—
"ওই মধুর মুখ জাগে মনে
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে।
তুমি জান, বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।"

সেদিনকার উপদেশ আজ বেশী করে মনে পড়ছে। মানুষ কতই চায় কিন্তু পাওয়াটা সীমাবদ্ধ। আজ এক বৎসর তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন আর কখনও তাঁকে পাব না। কিন্তু সেই না-এর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই। এক দিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, আশী বছরের প্রত্যেকটি দিন যে এক-একটি নূতন ঐশ্বর্য্যের মত সঞ্চিত হয়ে রইল ভবিষ্যৎ মানুষের জীবনে, সেই দুর্লভ আনন্দময় সত্যই আজ মনে প্রধান হয়ে উঠুক। জীবনে যে মাধুর্য্য ঢেলে ছিলেন বিরহেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে। তুমি জান বা না জান সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে…

"আচ্ছা গৃহকর্ত্তা যে এমন ক'রে জ্বরে পড়লেন এ ত ভাবনার কথা হ'য়ে উঠল!" "এতে আর ভাবনার কি আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে সেরে যাবে।" "সে ত বটেই সেরে গেলে তখন আর ভাবনাও থাকবে না—কিন্তু যতক্ষণ না সারছে ততক্ষণ ডাক্তারের ভাবনা হচ্ছে কি করে সারাব। আমি যে ডাক্তার, তাই তোমার চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশী। ও তোমাদের ইউনিভার্সিটির ডাক্তার নয়, চিকিৎসক, তা তুমি বিশ্বাস কর না ? সত্যি হোমিওপ্যাথি নিয়ে কম সময় দিই নি। ভাল ভাল হোমিওপ্যাথির বই ছিল আমার, তন্ন তন্ন ক'রে পড়েছি। রামগড়ে যখন ছিলুম তখন সব এসে কেঁদে পড়ত যে ওষুধের জন্য, ফেরাতে পারতুম না। কিন্তু কি জান ওতে বড় পরিশ্রম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিম্‌টম মেলান, বায়োকেমিক খুব সোজা, আর কম efficient নয়! হয় কি এতখানি এতখানি করে ওষুধ ঢোকালেই ফল হয় না, শরীর গ্রহণ করে না ফিরিয়ে দেয়—এই ধর না গাদা গাদা যে ক্যালসিয়াম খাওয়ায় এলোপ্যাথিতে সে কোনই কাজে লাগে না। এক এক সময় মনে হয় চেষ্টা করলে আমি ডাক্তার হ'তে পারতুম, ডাক্তারের একটা ডাক্তারী instinct থাকা চাই, শুধু জানা আর অভিজ্ঞতা নয়, instinct। কারু অসুখ করেছে শুনলে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে।"

"ওগো সুনয়নি! কমললোচনে! একটু বাড়িয়ে বলচি বেশী রিয়ালিষ্টিক্ বর্ণনা কিছু নয়, কি বল ? কিন্তু তুমি যে অনবরত অনাবশ্যক রকম এদিক আর ওদিক করছ ওষুধটা ঠিক মত পড়ছে ত ? ওর একটা নিয়ম আছে এক

ঘণ্টা অন্তর চালাতে হবে, তোমাদের এই বড় দোষ যে একটা নিয়ম মেনে চলবার আবশ্যকতা বোধ কর না।" "আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন, সব ঠিক আছে, তার চেয়ে বলুন আজ কি পড়বেন।" "আজ আর পড়া হবে না, আজ আমি ওই টিনি মেডিসিন আর ছোট মেটিরিয়া মেডিকা পড়ব। অনেকদিন দেখি নি, দরকার হয় মাঝে মাঝে। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করগে যাও। মিছে আমার খাবার কাছে বসে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে প্রায় সাবালক বললেও চলে!"

ভৃত্যবর্গের সঙ্গে অধিকাংশ কথাই ইসারায় বলতেন—সেই জন্যে তাঁর কাছে কোন সম্পূর্ণ নূতন লোকের কাজ করার অসুবিধা ছিল। ইসারা, অর্থাৎ খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কথা বলতেন, অথচ তাদের সঙ্গে রহস্য-কৌতুকও কম করতেন না। কিন্তু হয়ত কোন সামান্য কথা, যেমন, চাদরটা এনে দিতে হবে, কলমটা চাই বা এই জাতীয় একটা কিছু কখনই পুরোপুরি বলতেন না। সামান্য একটু ইসারা, বুঝে করে দিলে ভাল, নইলে হবে না এবং না হ'লেও কোন অনুযোগ নেই, বুঝতেই পারা যাবে না যে কোন অসুবিধা হয়েছে। আমাদের সঙ্গেও অনেক সময় এমনি করতেন, বিশেষ ক'রে অসুখের সময় এই অভ্যাস আরও বেড়ে গিয়েছিল। শুনেছি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও এই রকম অভ্যাস ছিল, তাঁর এক পুরাতন ভৃত্য ছাড়া অন্য কেউ বুঝে উঠতে পারত না। কেন যে এমন করতেন তা জানি না, বোধ হয় সর্ব্বদা একটা চিন্তার ধারা বয়ে চলত ভিতরে। যখন ইচ্ছে করে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন পরিপূর্ণ ভাবেই করতেন, অন্য সময় ছোটখাট বাজে কথায় সে স্রোতধারাকে ব্যাহত করতে চাইতেন না। সেটা ইচ্ছাকৃত নয়, মননশীল মনের মানসিক অভ্যাস, অন্ততঃ আমার তাই মনে হ'ত। একটা ঘটনা বলি—এক দিন খেতে বসেছেন আলুবাবু হন্তদন্ত হয়ে এলেন, "সামনের পাহাড়ে আলোর সিগন্যালিং হচ্ছে, কোডের খাতা শীঘ্র দিন।" "হবে পরে।" "না না, তুমি যাও, ওরা কতক্ষণ আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি বেশ আরামে খাব।" অগত্যা উঠতে হ'ল। মিনিট দুই পরেই দেখি বারান্দায় এসে বসলেন।" "ওকি চলে এলেন কেন? খাওয়া হয়ে গেল?" চুপ করে আছেন। তিন চার বার প্রশ্নের পর—"আরে খাব কি, মহাদেব লুচির পাত্রটা এনে রাখলে ভাবছি অস্বাদিত মধুর কৌট তোমার আজ খুলব এমন সময় শ্রীহরিপদ—তোমাদের সাধের হরিপদ

রবীন্দ্রনাথ ও লেখিকা

তীর বেগে এসে ফস্‌ ক'রে পাত্রটা তুলে নিয়ে গেল। ভাবলে হয় ত খাওয়া উচিত হবে না।" "সে কি? কি আশ্চর্য্য! কেন?" "কেন তা কি ক'রে জানব? আমি ত আর ওর মনোবিকলন করি নি। সাইকোএনালিসিসের বাংলা প্রতিশব্দ মনোবিকলন, তা জান?" অন্য যে কেউ হ'লে বলত কেন নিয়ে যাচ্ছিস বা ঐ জাতীয় একটা কিছু, কিন্তু অনর্থক কথার হাঙ্গামার মধ্যে উনি ত যাবেন না। আর একটা ঘটনা বলি, স্নানের জল ঠিক ক'রে এসে খবর দিলুম। "দেখ মহাদেব আর বনমালীতে কত তফাৎ তাই চিন্তা করছি, খুব মনোনিবেশ করে চিন্তা করছি। ওরও বুদ্ধি ছিল ক্রমেই কমছে। আজ পাঁচ দিন হ'ল তোয়ালেটা রাখছি চৌকির উপরে, ওতেই আমার সুবিধে হয়, কিন্তু ও রোজ সেটাকে সরিয়ে রাখবে, ভারি মুস্কিল, ভাবছি স্নান করা ছেড়ে দেব।" "তা বললেই ত চুকে যায়।" "বলব কেন? রোজ রোজ দেখে দেখে বুঝবে না কেন। দেখি কত দিনে বোঝে। না এখন আর হবে না তোমায় বলা হয়ে গেল। এমনি করেই ত ওদের বুদ্ধির পরীক্ষা করি, স্পষ্ট বোঝা যায় সেটার গতি কোন্ দিকে।" "আচ্ছা কেন এমন করেন? যখন যা অসুবিধা, দরকার, স্পষ্ট করে না বলে কত কষ্ট পান।" "আরে তুমিও যেমন, কতই বা বলব কতই বা ভাবব, 'আর ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা' সেই যে বই বাজিয়ে গাইত তার নাম যেন কী? বিপিনবাবু! আজ বৈকুণ্ঠের খাতা তোমাদের শোনাতে হবে!"

রবীন্দ্রনাথ ও লেখিকা

তাগদা থেকে মা এসে পৌঁছেচেন কাল। আজ সারা সকাল রান্না করছেন। "তাই ত আজ যে ধুমধাম ব্যাপার বেশ একটু বিশেষ আয়োজন দেখছি। এইটে ত তিক্তরস এইখান থেকেই সুরু? বাঙাল দেশের রান্নার খ্যাতি আছে—ওদিকে চৈ পাওয়া যায় চৈ দিয়ে কই মাছের ঝোল অতি উপাদেয় খাদ্য। সে জানো তো আমার চাকরের গল্প—তখন অনেক দিন আমি নিরিমিষ খাই, মাছ মাংস একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলুম—আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়েছি তিনি আমায় মাছ খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করলেন আমি দেখলুম এটা তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। মাছ খাওয়া না-খাওয়ায় এমন কিছু এসে যায় না তাই বললুম তাঁকে যে আমি মাছ খেলে যদি তুমি আন্তরিক খুসি হও তা হ'লে না হয় খাব মাছের ঝোল। চৈ দিয়ে কই মাছ খাওয়া গেল। আমার চাকর উমাচরণ (?) বাড়ী এসে বললে—বাবা-মশায়কে আমরা যত বলি মাছ খেতে কিছুতে খান না আর যেই শাশুড়ী বললেন অমনি দিব্যি খেলেন।" "একথা বললে আপনার চাকর?" "তা বললে বৈকি। তার বলা বন্ধ করব কি ক'রে? সে রাঁধত ভাল তবে তার কথাবার্ত্তাও ছিল ভাল! নাঃ আজ রান্নাটা বিশুদ্ধ স্বদেশী হয়েছে তা মানতেই হবে। আমি এই রকম নিরিমিষ তরকারী আর দিশি রান্না পছন্দ করি।" মা বললেন, "তোরা যে কি হয়েছিস। নিজে রেঁধে খাওয়াতে পারিস নে এই ওদের দিয়ে রাঁধাস?" "হ্যাঁ আমি রেঁধে খাওয়াব, তা হ'লেই হয়েছে। উনি খাওয়াই ছেড়ে দেবেন তাহলে, তুলে দিলেই খান না রেঁধে দিলে আর রক্ষে নেই।" "ভালই হয়েছে সে, দুর্ম্মতি হয় নি, কন্যেকে আর সৎ শিক্ষা দিও না গো, আমায় আর রান্নার এক্সপেরিমেণ্টের ভিকটিম্‌ করে কাজ নেই।" হরিপদ বললে "দিদিমণি ত প্রায়ই রাঁধেন ভয়ে বলেন না।" উনি কাঁটা চামচ রেখে মুখ তুলে তাকালেন "এ অন্যায় এ unfair, অসতর্ক আক্রমণ বলা চলে একে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে খাই ভালমন্দ সব সমান হয়ে যায়। কখন কি বলে ফেলি ঠিক নেই। ছি ছি লজ্জায় ফেললে আমাকে। তা ছাড়া আমার পরামর্শ নাও না কেন—অনেক নতুন পথ বলতে পারতুম। এক সময়ে রান্নার অনেক পরীক্ষা করেছি ফল মন্দ হ'ত না।"

দুপুর বেলা হঠাৎ রথীদার টেলিগ্রাম এল শীঘ্র ফিরতে হবে। টেলিগ্রামখানা নিয়ে দাঁড়ালুম। একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বই পড়ছিলেন, মুড়ে কোলের ওপর ফেললেন, "কী সংবাদ?" পড়া হ'ল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "তুমি পড়েছ ত? এ খবর শীঘ্রই আসবে জানতুম তাই যখন তুমি বিবর্ণ মুখে নীরবে এসে দাঁড়ালে ভাবলুম যাবার খবর নিশ্চয়ই। সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। কাজ আছে যে কাজ-কর্ম্মক্ষেত্র ডাক দিলে কি এড়ান যায়? সুখময় নীড় পড়ে রবে তার! মন খারাপ ক'রে কি হবে বল? বলেছি আবার আসব যাওয়া না হ'লে ত আসা হয় না। তার চেয়ে হাসিমুখে অনুমতি কর।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর পড়া হয় নি, বারান্দার মাঝখানে চৌকি টেনে এনে বসেছিলেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল, বৃষ্টি থেমে কুয়াশার বন্ধন মোচন ক'রে পাইন গাছের আড়ালে হ'ল চন্দ্রোদয়। মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনের পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা সীমান্তরেখা ফুটে উঠেছে, নিবিড় নৈস্তব্ধ্যের মাঝখানে বিরামহীন ঝিঁঝিঁর ডাক। "না, মানতেই হয় এ জায়গাটা বড় নির্জ্জন, তোমাদের বয়সের পক্ষে বড় বেশী নির্জ্জন।" "একটা গান করুন।" "কি গান করব বল?" "প্রভু আমার প্রিয় আমার।" সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ঐ গানটি করেছিলেন—

'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে—'

সুরকে ত ধ'রে রাখা যায় না, ধ'রে রাখা যায় না

সেই পরম মায়ালোক যা সুর সৃষ্টি করে। সে যে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি! নির্জ্জন বনচ্ছায়ায় অস্ফুট চন্দ্রালোক আগেও ত ছিল কিন্তু সেই সুরধ্বনিতে যেন নিয়ে গেল অন্য লোকে। ক্রমে ধীরে ধীরে সকলে এসে পিছনে বসলেন—

'ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা যে তোমার জনম মরণ হে—
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর
মুক্তি আমার বন্ধন ডোর
দুঃখ-সুখের চরম আমার জনম মরণ হে।'

আজও কানে আসে সেই আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর—সকল গতি মাঝে আমার পরম গতি হে, নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে। অনির্দ্দিষ্ট বেদনায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে!

"ডাক্তার একটা সুপরামর্শ শোন—আমাদের সঙ্গে সবাই চল বেশ কয়েক দিন বেড়িয়ে আসবে, তা নয় তোমরা মন খারাপ ক'রে বসে থাকবে সে কি ভাল লাগে? কি বল?" ওঁর কাছে নিতান্ত নম্র ভাবে রাজী হয়ে ডাক্তার বাইরে এসে অন্যরূপ। কাজ আছে যে কাজ—অন্য দুই কর্ত্তা তখন পরম উৎসাহিত, "আরে মশাই কাজ! রাখুন কাজ!" ঘোরতর আলোচনা চলল, কে কে যাবে কি উপায়ে যাওয়া হবে, ইত্যাদি। এ ঘরে আসতেই গুরুদেব বললেন, "কি তোমাদের কলধ্বনি ত তিস্তাকে হার মানাল, ব্যাপার কি? জান ত তোমরাও যাচ্ছ? আমি ডাক্তারকে বলে সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি।" "এখনও স্থির হয় নি, উনি বলছেন কাজ আছে।" "তাই ত সবাই বলে কাজ আছে, কাজ, মাঝ থেকে তোমার হয় বিপদ। কিন্তু একবার যখন দক্ষিণাচরণ সেন হয়েই গেল তখন আবার আলোচনা কেন? দক্ষিণাচরণ সেন কে জানত? যাকে বলে D. C. Sen অর্থাৎ কিনা Decision একবার যখন হয়ে গেছে তখন আর পরিবর্ত্তন ঠিক নয়।"

"বিদায়ের দিনে মংপু ত প্রসন্ন হাসি হেসেছে, এতটা আশা করি নি। সিন্‌কোনা-কাননের ভিতর দিয়ে মনোরম এই পথটি।"

সাত মাইল দূরে মংপু পাহাড়ের পদপ্রান্তে ছোট্ট একটি স্টেশন। সে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। একেই ত ট্রেনটি একটি খেলনার গাড়ী, তদুপযুক্ত লাইন এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছোট্ট একটি কাঠের ঘরের মধ্যে তদুপযুক্ত আস্তানা স্টেশন মাস্টারের। সজনে গাছের নীচে পাহাড়িয়াদের চায়ের দোকান এর

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

প্রধান বিপণি-সম্পদ। ট্রেন আসতে তখন কিছুক্ষণ দেরি ছিল। কোন রকমে একটা ভদ্রগোছের হাতাওয়ালা চৌকি জোগাড় ক'রে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর তাঁকে বসান হ'ল। সামনে প্রকাণ্ড উদ্ধত পাহাড় গভীর অরণ্য বুকে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—নীচে স্রোতস্বিনী কলভাষিণী নদী—মাঝখানে বসে আছেন জগতের কবি মহিমান্বিত মুর্ত্তি। ধূসর রঙের জোব্বা পরা, মাথায় কালো টুপি, পথে সংগৃহীত একগোছা সিন্‌কোনা ফুল হাতে। দূরের দিকে তাকিয়ে স্থির বসেছিলেন। সর্ব্বদা দেখেছি পথে বা গাড়ীতে খুব কম কথা ধীরে ধীরে বলতেন। হিমালয়ের এক প্রান্তে এই নগণ্য জনবিরল গ্রামের অতি ক্ষুদ্র স্টেশনের ধূলিমলিন প্ল্যাটফর্মের উপর জরাজীর্ণ চৌকিতে বিশ্বআদৃত মনীষী বসে আছেন—এ একটা দেখবার মত ঘটনা। ক্রমে ক্রমে যে কয়জন সম্ভব দর্শক জমে গেল—স্টেশন মাস্টার ও কেরানী প্রভৃতি যে দু-চার জন বাঙালী এখানে আছেন তাঁদের অন্তঃপুরচারিণীরা সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃত হয়ে একে একে এসে প্রণাম করলেন। মনে পড়ে সেবারে গাড়ীতে আমরা কি আনন্দ-কোলাহলে কাটিয়েছিলাম—তিনি বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলেন—আর আমরা মহাসমারোহে এক পাশে ভোজন-পর্ব্ব চালাচ্ছিলাম—সব চেয়ে উৎসাহী সভ্য ছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়। তখন বর্ষা সুরু হয়েছে, স্রোতস্বিনী তিস্তার

রবীন্দ্রনাথ ও লেখিকা

ঘোলা মেটে জল বড় বড় পাথরের চার দিকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। খুকু বললে, "দাদু দাদু, জল যায় ভেসে।" দাদু বললেন, "এই ত বেশ হয়েছে মিঠুয়া, এখন আর একটা লাইন বল, এ ত প্রায় হয়ে এল।" কিন্তু মিঠুর দৌড় ঐ ভেসে পর্য্যন্তই আর অগ্রসর হ'ল না। অগত্যা দাদুই বললেন, "বল না জানি নে কোন্ দেশে।" মাসী ব্যাগ খুলে কাগজ-পেন্‌সিল বের করলে। "হাঁ লিখে ফেল তুই কবির ডুয়েট।" প্রায় সমস্ত পথই দেখছিলেন চুপচাপ—"ঐ যে দেখলে না ফুল ওকেই বলে lily of the valley, না, এ পথটা দর্শনীয় বটে।"

শিলিগুড়ি পৌঁছতে পৌঁছতেই খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম্মে আর জায়গা রইল না। সারি সারি ছেলের দল খাতা-পেন্‌সিল নিয়ে তার মধ্যেই অটোগ্রাফের জন্য তৈরি। ইস্কুলের মেয়ের দল, নানা শ্রেণীর শিশু যুবা বৃদ্ধ এমন কি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতীরাও ঠেলাঠেলি ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনমতে গাড়ীতে তোলা গেল—ছোট্ট একটা 'কুপে'। আমাদের কামরা তার পাশেই। কয়েক জন বিজ্ঞগোছের স্থূলকায় ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানা রকম সাহায্য করবার জন্য। শ্রীযুক্ত চন্দ বিনম্রভাবে তাঁদের সে সৎ চেষ্টা থেকে বিরত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে খাওয়া সেরে নিয়েই গুরুদেব বললেন, "দরজা জানালা খুলে আলো জেলে দাও।" দলে দলে লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে নেমে যেতে লাগল। দু-একটি ছেলে সই করিয়ে নিলে তাদের খাতায়। নানা শ্রেণীর ছেলেমেয়ে বয়স্ক শিশু সবাই এল। তিনি স্থির স্তব্ধ হয়ে নীচের দিকে চেয়ে বসে আছেন হাত জোড় ক'রে সকলকে প্রতিনমস্কার করছেন। আমরা এক কোণে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম, দেখে দেখে মন ভ'রে ওঠে। সব লোক চলে যাবার পরও তেমনি স্থির ব'সে রইলেন।

সেবারে কলকাতা পৌঁছে ষ্টেশনে নেমেও তাঁকে কিছু অন্যমনস্ক দেখলুম। পরে জোড়াসাঁকোয় ডেকে পাঠালেন দুপুরবেলা। একটা পাতলা সাদা জামা প'রে বসে আছেন—আমাদের শীতের দেশের পোষাক বদল ক'রে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। পাশে এক বোঝা রজনীগন্ধা। "দেখ আজ সকালে তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত বিদায় নেওয়া হয় নি। এত অন্যমনস্ক ছিলুম কখন তোমরা চলে গেলে দেখতে পাই নি। কাল সন্ধ্যে থেকে ভাবছি। যখন ভীড় ক'রে দাঁড়াল সব গাড়ীর সামনে আমার কি আশ্চর্য্য লাগছিল বলতে পারি নে। কেন সবাই আমাকে এমন ক'রে দেখতে চায়? এই দেখতে চাওয়ার মধ্যে একটা অকথিত উপদেশ আছে। সে বলে, আমরা তোমাকে যে সম্মান দিচ্ছি তোমার জন্য যে ভক্তির উপহার এনেছি তুমি তার যোগ্য হও। মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। জীবনে কতবার এমন ঘটেছে, মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-নিবেদন অজস্রধারায় পেয়েছি, ভাবছিলুম ব'সে ব'সে সত্যি আমার পাওনা কতটুকু তার মধ্যে। যখন দলে দলে এসে প্রণাম করতে লাগল বলব কি মুখে কথা সরে না, এ ত প্রণাম নয় এ আশীর্ব্বাদ, এ বলে তুমি এই প্রণামের যোগ্য হও, যোগ্য হও। তাই ত বললুম তোমাদের, দরজা খুলে দাও, যদি আমার ভিতরে এমন কিছু থাকে যা তারা দেখতে চায়, তবে আড়াল করবার অধিকার ত নেই আমার।"

সমাপ্ত

চিঠি

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে মনটা ছিল আয়নার মতন; পৃথিবীর যা-কিছুর ওপর আনন্দের আলো পড়ত, তাকেই গভীর ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলো দুস্তর ঘটনা চার দিক থেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল যে বাইরের জ্যোতির্ময় জীবনের সঙ্গে আর সম্পর্কই রইল না। দাদার ব্যবসায়ে হঠাৎ মন্দা পড়ায় অত দিনের যত্নে-গড়া দোকানটা তুলে দিতে হ'ল। তার কিছু দিন বাদেই বাড়ীওয়ালা ব'লে বসল, "দিনকাল বেজায় খারাপ পড়েছে মশায়, মাসের ভাড়া বাকী পড়লে আমি ত পেরে উঠি না।" তা ছাড়া যার ওপর প্রধান নির্ভর সেই জমিই উপরি উপরি তিন সন শত্রুতা করলে—নোনা জল ঢুকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘের ধান জ্বলে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল। তখন শহরের বাসা ছেড়ে বাড়ীসুদ্ধ লোককে দেশের ভিটেতে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। সেখানে জমিদারের সেরেস্তায় দাদা অবশ্য বরাতক্রমে একটা কাজ পেয়ে গেলেন, কিন্তু অত অল্প মাইনেতে সংসার চলে না। কাজেই চাকরির চেষ্টায় শহরের এক সস্তার মেসে নিজেকে গিয়ে উঠতে হ'ল।

তার পর থেকে বছরগুলো যেন গরুর গাড়ীর মতন টিকিয়ে টিকিয়ে শুক্‌নো মেঠো পথের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। একে পদে পদে পথের প্রতিবাদ, তার ওপর অজস্র ধুলো। ধুলোয় পেছন দিকটা অন্ধকার হ'য়ে এল—যৌবনের যে-আকাশে আলো আর রঙ খেলা করত তা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হ'তে থাকল। এদিকে সামনেও যে কোথাও কোনও আশ্রয় আছে, তারও আশ্বাস পাওয়া গেল না।

গত ছ-সাত বছর ধ'রে কল্যাণের শুধু ছুটোছুটি ক'রে কেটেছে—আজ সওদাগরী আপিস, কাল ইন্সিওরেন্সের দালালীর খোঁজে, পরশু টিউশনির আশায়। কত বার কত শত লোককে সামনাসামনি কিম্বা চিঠিতে আবেদন জানিয়েছে, নির্লজ্জের মতন নিজের বিদ্যেবুদ্ধি দরখাস্তের পাতায় পণ্যদ্রব্যের মতন সাজিয়ে ধরেছে, কিন্তু কিছু হয় নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোনও উত্তর আসে নি; আর যে ক'খানা এসেছে তারা না এলেই ছিল ভাল। কয়েক বার কয়েক জন হৃদয়হীন লোক তার পৌনঃপুনিক বিফলতার কথা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ ক'রে তার কাছে পাঠিয়েছিল। তখন থেকে অপরিচিত হাতের লেখা চিঠি দেখলেই তার ভয় হয়।...

ভয়ে ভয়ে কল্যাণ তার সামনে-রেখে-যাওয়া চিঠিটার দিকে চাইলে—বুক কেঁপে উঠল অনিশ্চয়তায়। এইমাত্র ওটা চাকর দিয়ে গেল। চিঠিখানা বাড়ীর কারও নয়। তা হাতের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু আর কোথা থেকে আসতে পারে? তাড়াতাড়ি যে খুলে দেখবে এমন মনের জোর ও উৎসাহ নেই। পোষ্টকার্ড হ'লে যেমন ক'রে হোক একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু খাম দেখলেই মনে হয় যেন তার মধ্যে রহস্য আছে—কিছু আশা, কিছু শঙ্কা। অবশ্য শঙ্কারই দাপট বেশী। আশা তার কাছে আমল পায় না, থাকে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে কিন্তু সুযোগ পেলে সেও এক একবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, এই জীবনে হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন আসতেও ত পারে।

—এ কি, চুপচাপ ব'সে যে? কার চিঠি?

মেসের রতন। বয়স কম, কিন্তু ভারি অন্তরঙ্গ। একজন কথা কইবার লোক পেয়ে কল্যাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বললে—কি জানি ভাই, ঠিক বলতে পারছি নে।

—তার মানে? ও, চিঠিটা ত দেখছি এখনও খোলাই হয় নি। দেখ দেখ, প'ড়ে দেখ কে লিখেছে।

খামটা তুলে নিতে গিয়ে কল্যাণের হাতটা কেমন কেঁপে উঠল। রেখে দিলে। তার পর হঠাৎ রতনের হাত দুটো চেপে ধরে উঠল—তুই পড়ে দিবি রতন?

—বা, তোমার চিঠি আমি পড়তে গেলুম কেন?

আরও একটু চাপ দিয়ে কল্যাণ শুধু বললে—লক্ষ্মীটি।

রতন চিঠিটা ছিঁড়ে দু-এক লাইন পড়েই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠল—'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্। পড়ে দেখ। আমি আপাততঃ চললুম মেসের লোকেদের খবর দিতে। রাত্তিরে তুমি আমাদের 'ফীস্ট' দিচ্ছ, বুঝলে?' ব'লে কল্যাণের কাঁধে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি।

তখনও মনের অবিশ্বাস কাটে নি। রতন বেরিয়ে যেতে ধীরে ধীরে কল্যাণ চিঠিটা পড়লে। শুভ সংবাদ।—কুসুমপুর গ্রামের হাই স্কুলে তার একটি কাজ হয়েছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনে।

* * *

এত দিন পরে। আকাশের এক দিকে মেঘ কেটে গেল—দেখা দিলে আলোর রশ্মি। তার মধ্যে উত্তেজনা ততটা নেই যতটা আছে অবসাদ। দীর্ঘ দিনের অবসাদ। এক বার মনে হ'ল, পঞ্চাশ টাকাতে সংসারের দাবি মিটবে ত? হয়ত মিটবে, কিন্তু সঞ্চয় হবে না। টাকা পাঠাতে হবে মায়ের কাছে, টাকা খরচ করতে হবে নিজের খাওয়া থাকায়। স্কুলে যাবার মতন কাপড়চোপড় কেনাতেও টাকা খরচ। শুধু তাই নয়, ধোপা, চাকর, মণিহারি দোকান, পাড়ার সভাসমিতির সভ্য, জমিদারের গোমস্তা—এদের সকলের নজর গিয়ে পড়বে তার ঐ পাঁচখানি নোটের ওপর। এমন কি, অসম্ভব নয়, মাসের শেষে তার কাছে কোনও দরিদ্র শিক্ষক ধারও চেয়ে বসতে পারে।—কোথায় লুকোবে সে তার সারা যৌবনের তপস্যার ফল?

না না, যা পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশী কেন সে চাইতে যাবে? বেশী মাইনের চাকরি হয় নি ব'লে দুঃখ করবার কিছু নেই। বরং আনন্দ করবার কথা এই ভেবে যে এতদিন বাদে তার জীবনের গতি ফিরেছে। উপার্জ্জন যাই হোক, দিনের খানিকটা অংশ অন্ততঃ সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারবে। অনির্দ্দিষ্টভাবে পথে পথে ঘোরার ক্লান্তি থেকে তার মুক্তি। আর মুক্তি করুণার দীর্ঘশ্বাস থেকে। করুণা তার অসহ্য।...

রতনের গলা পাওয়া গেল। সে একা নয়, সঙ্গে তার বন্ধুর দল। কাছাকাছি যে যেখানে ছিল, সবাই এসেছে ভিড় করে সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

—আঃ, কথাবার্ত্তা ত পরে হ'লেও চলে। তুমি নিজে একবার যাও না বাপু রতন মিষ্টির দোকানে।

—একবার অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করুন—

—ঐ তোমাদের দোষ। কথায়-কথায় তর্ক করা ভাল নয়। দেখছ কোনক্রমে তিরিশটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে মেকী নয়, আসল করকরে পঞ্চাশটি টাকা তোমাদের কল্যাণদার হাতে আসছে; তিনি না খাওয়ালে চলবে কেন? চুপ ক'রে থাকবেন না কল্যাণবাবু। দিন দিকি নি কিছু, চট্ ক'রে মণিব্যাগটা বার ক'রে ফেলুন।

এ অভিজ্ঞতা জীবনে আর হয়ত আসবে না। কাল পর্য্যন্ত সে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। সম্ভ্রম ছিল না, শান্তি ছিল না, তৃপ্তি ছিল না। কাল পর্য্যন্ত এই মেসের বন্ধুরাই তাকে অনুকম্পা দেখিয়েছে—সে যে ঠিক তাদের একজন নয় এই চিন্তাটা বারে বারে তার কাছে প্রখর হয়ে উঠেছে। বন্ধুরা কেন, মেসের বামুন চাকরগুলো পর্য্যন্ত কেমন একভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। পাঁচ বার ডাকলে উত্তর দেয় নি, দুপুরবেলা তার স্নান করবার আগে চৌবাচ্চার জল ছেড়ে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া তর্জ্জনগর্জ্জন ত আছেই।

কিন্তু সে-সব দিন হঠাৎ যেন পেছনে পড়ে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবের এই হাসি-কৌতুকের দীপ্তিতে তাদের ছায়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিশ্বাস হয় না, তাকেই কেন্দ্র ক'রে আজ বন্ধুর দল আনন্দ করছে। তারা আসলে কেমন লোক সে বিচার আজ নাই বা হ'ল। সত্যি ভেবে দেখতে গেলে তাদের দোষ নেই। টাকাকড়ির অসচ্ছলতা, সংসারের ভাবনাচিন্তা সব লোকেরই আছে। এই সব নানা হাঙ্গাম সামলাতে সামলাতে কটা লোকেই বা সময় পায় অপরের দুঃখকষ্টের কথা ভাববার? তা ছাড়া ভেবেও লাভ নেই। সহানুভূতি লোককে খেতে দিতে পারে না।

হাসিমুখে কল্যাণ বললে—মাইনেটা ত আগে পাই, তার পর না হয়—

—উঁহু, শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়,। আপনি বুঝছেন না কল্যাণবাবু যে আজ রবিবার এবং বামুন-ঠাকুরের রান্না শেষ হ'তে আজ দুটোও বাজতে পারে, তিনটেও হ'তে পারে। সকালে উপবাস-ভঙ্গের ব্যবস্থা ত হোক, তার পর রাত্তিরে 'ফীস্টে'র বন্দোবস্ত করা যাবে। নিন্, আর দেরি করবেন না।

উঠে পড়ল কল্যাণ। পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলে ফেললে খাটিয়ার নীচে রাখা বাক্সটা। বাক্সের অর্দ্ধেক খালি। প'ড়ে আছে কয়েকখানা ছেঁড়া ধুতি, একটা বহু দিনের পুরানো সঙ্কুচিত সিল্কের পাঞ্জাবী। তার তলায় একখানা বিছানার চাদর আর একটা ফুল-লতাপাতা-আঁকা মাথার বালিশের ওয়াড়। তার ছোট বোন সুমি এঁটে ক'রে দিয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত ওটা বাক্স থেকে বেরোয় নি। একটা অল্প দামের তোয়ালে বালিশের ওপর পেতে কোনও রকমে কাজ চলেছে।

বাক্সের সব চেয়ে তলায় প'ড়ে আছে দুটো আলতা-মোড়া দূর্ব্বার অর্ঘ্য আর তিনটে চকচকে টাকা। বহু দিনের সঞ্চয় এবং বহুমূল্যের। কল্যাণের এক বার মনে হ'ল বলে, 'দেব না কিছু। কি হবে মিছিমিছি টাকা নষ্ট

ক'রে ?' কিন্তু পারলে না তা—বেশ প্রশান্ত মনে বার ক'রে দিলে দুটো টাকা। মনে মনে বললে, 'এই এক বারই ত।'

দু-টাকায় যা মিষ্টি এল তা সকালবেলার জলখাবারের পক্ষে যথেষ্ট। রবিবার সকালে এমন খাওয়ার আয়োজন বহুকাল মেসের লোকদের হয় নি। রতনকে চাঙারি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লে তিন নম্বরের হরিশবাবু আর একুশ নম্বরের গাঙ্গুলীমশাই তাড়াতাড়ি ধরাধরি ক'রে কল্যাণের খাটিয়া থেকে বিছানাপত্র নামিয়ে একটা বাক্সের ওপর রাখলেন। তার পর খাটিয়ার ওপর দুখানা পুরনো খবরের কাগজ পেতে রতনকে বললেন, 'রাখ ঐখানে। মোধোকে চায়ের জল চাপাতে ব'লে এসেছ ত ?'

—হাঁ, জলের কেট্‌লি, চা, চিনি আর দুধ এইখানে দিতে বলেছি। নিজেরা না করলে চা আর মুখে দেওয়া যাবে না।

—সে কথা ঠিক।...কই, কল্যাণবাবু, আপনি ত দেখছি মশাই নিজেই 'গেষ্ট' ব'নে গিয়েছেন।...না না, তাই ব'লে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। বসুন বসুন, ঐ মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'সে পড়ুন।...দেখ রতন, আমি বলছিলুম কি যে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল। গণ্ডগোল শুনে কে আবার এসে ঢুকে পড়বে, খাওয়াটাই তা হ'লে মাটি।...এই যে মোধো এসে গিয়েছে। ওরে মোধো, গোটাকতক চায়ের ডিস্ আর গেলাস নিয়ে আয় ত।...গেলাস মাজা হয় নি এখনও ? জ্বালিয়ে মারলে! দেখ্ একটা কুঁজো যদি জোগাড় ক'রে আনতে পারিস।...

গাঙ্গুলীমশাই পৃথিবীতে একটি কথা সার বুঝেছেন—'নাল্পে সুখমস্তি'। ভোজনপর্ব্ব শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব'লে উঠলেন, 'জয় হোক্ কল্যাণবাবুর। কিন্তু যাই বলুন, এ যেন ঠিক্ যুৎসই হ'ল না। লুচি মাংস না হ'লে জমে না। কি বলেন আপনারা ?'

সকলে সমস্বরে সায় দিলেন। গাঙ্গুলীমশাই উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'তবে আর কি ? কল্যাণবাবুর অনুমতি নিয়ে বামুনঠাকুরকে ডেকে এই বেলা ব'লে-ক'য়ে দেওয়া যাক্। এখন বন্দোবস্ত না করলে—'

কল্যাণ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে তার ঘরখানার পরিবর্ত্তন দেখছিল। ময়লা কাপড়, ছেঁড়া জুতো আগেকার মতন তেমনি স্তূপাকার হয়ে রয়েছে দেয়ালের কোণে; বেতের র‍্যাক আর সেখানে রাখা বইগুলোর ওপর ধুলোর ঘন স্তর; চূণবালি-ওঠা দেয়ালগুলো তেমনি নির্ম্মমভাবে চেয়ে আছে; কিন্তু কই, তবু ত আজ খারাপ লাগছে না। ঘরখানা চকিতে যেন এক পরম স্নেহের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেড়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে হ'তে পারে, কত দিন কাটালুম এই ঘরে!...

গাঙ্গুলীমশাইয়ের প্রস্তাব কানে যেতে কল্যাণের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বাস্তবিক, কি আবোলতাবোল ভাবছিল সে এতক্ষণ ? ফীস্ট ? না, ফীস্ট আজ হ'তেই পারে না। বাড়ী গিয়ে খবর দেবে না সে ? এতক্ষণ এ-কথায় সে-কথায় মনেই পড়ে নি। এত বড় একটা সুসংবাদ চিঠিতে নিশ্চয়ই দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ তার বাড়ী যখন শহরের এত কাছে। সমস্তই তার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এমন কি, খবরটা পাবার পর মনে মনে মাকে প্রণাম জানাবার কথাটাও সে ভুলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ভুলটা সংশোধন ক'রে নিয়ে কল্যাণ বললে, 'আজকের দিনটি আমাকে মাপ করতে হবে, গাঙ্গুলী-মশাই।'

গাঙ্গুলীমশাই মনে মনে বোধ হয় ফীস্টের মেনু ঠিক করছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কি হ'ল আবার ?

—না হয় নি কিছু। বলছিলুম কি, খাওয়া-দাওয়াটা পরশু দিন করলে হয় না ? আজ আর কাল তা হ'লে বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসতুম। কতকগুলো জিনিসপত্রও ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে নিয়ে আসতে হবে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে! ও কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম। নতুন জায়গায় যাচ্ছেন, জিনিসপত্র সঙ্গে বেশ কিছু না থাকলে অথৈ জলে পড়বেন।...কবে জয়েন করতে হবে আপনাকে ?

—শুক্রবার।

—বেশ, তা হ'লে মঙ্গলবারই ঠিক রইল। আপনি ইতিমধ্যে গিয়ে গিন্নীকে খবর দিয়ে আসুন।

কল্যাণ মৃদু হাসলে।

গাঁয়ের স্টেশনে এসে যখন কল্যাণ ট্রেন থেকে নামল, তখন বেলা পড়ে এসেছে। হেমন্তের বিকেল। স্টেশনের লৌহ-চক্রান্তের পরেই সরু রাস্তা অপরিষ্কার হয়ে প'ড়ে আছে। সারা গায়ে গরুর গাড়ীর চাকার অত্যাচারের দাগ। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এক রকমে সেই পথটুকু পার হয়ে কল্যাণ গাঁয়ের রাস্তা ধরলে। অবারিত মুক্ত মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পথটা সঙ্কীর্ণ হবার সুযোগ পায় নি। দু-পাশে সুদূরপ্রসারী ধানের জমি। তার কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, মতের অমিল নেই। দীর্ঘ, সবুজ জীবন এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। পরিপুষ্ট ধানের

শীষে ধরিত্রীকে প্রণাম জানাবার আকুল আগ্রহ। রাস্তা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দু-একটা শীষ ছিঁড়ে নিলে কেমন হয়?

যেতে যেতে গাঁয়ের খগেন-কাকার সঙ্গে দেখা। হঠাৎ কল্যাণকে দেখে খুশী হলেন।

—থাক্ থাক্, আর প্রণাম করতে হবে না, দীর্ঘজীবী হও। কই, শুনি নি ত কিছু তোমার আসবার কথা। পাঁচটা-দশের ট্রেনে এলে বুঝি? তার পর, খবর সব ভাল ত?

—হাঁ, সব ভাল।

—কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধে—

না, খবরটা বাড়ীতে না জানিয়ে আর কাউকে দেওয়া হবে না। তা ছাড়া নিজের মুখে বলাটা কেমন যেন দেখায়। কাল সকালে বরং—

কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কল্যাণ বললে, 'যে দিনকাল পড়েছে, ভাল কাজকর্ম্ম জোগাড় করা মুশকিল।...আমাদের বাড়ীর সব ভাল আছে ত?

—হাঁ আছেন, তোমার চিঠিপত্র ক'দিন না পেয়ে ভাবছিলেন।

সত্যি, অনেক কাল বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা হয় নি। কুড়ি-বাইশ দিনের কম নয়। তার পর কোনও খবর না দিয়ে এই রকম হঠাৎ তার আসা। সবাই নিশ্চয় তাকে দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

আচ্ছা, বাড়ীর সকলে এখন কি করছে। মা নিশ্চয় রান্নাঘরের দাওয়ায় কুটনোর চুবড়ী নিয়ে বসেছেন। দাদা বোধ হয় সবে কাছারি থেকে ফিরে বৈঠকখানায় তামাক নিয়ে বসেছেন। সুমি এখনও পাড়া বেড়িয়ে ফিরেছে কি না সন্দেহ। আর এক জন—

তাকে যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। স্বপ্নের একটা ছবির মতন ভেসে ওঠে চোখের পাতায়। কাপড় কেচে এসে সে সবে যেন পরেছে লালপেড়ে একখানা শাড়ী। পাড়ের রং অপার স্নেহে বেষ্টন করেছে তার দেহ। তার পর মাথার মাঝামাঝি এসে সিঁথির সিঁদুর দেখে হঠাৎ লজ্জায় থমকে দাঁড়িয়েছে। সে এসে দাঁড়াল সদর পুকুর-ঘাটে। এক হাতে তার শাঁখ, আর এক হাতে মাটির প্রদীপ। তার হাতের তালুর আঘাতে আর মুখস্পর্শে শাঁখ বেজে উঠল, আর তার আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে বহুদূরস্থিত একটা আমবনের মধ্যে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। তখন সে তুলসীমঞ্চের ফোকরে প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে।

প্রণাম ক'রে উঠতে যাবে এমন সময় মা যেন ডেকে বললেন, সদরের ঝাঁপটা অম্‌নি বন্ধ ক'রে দিয়ে এস বৌমা। যে অন্ধকার রাত!

যদি এমন হয় যে ঠিক এই সময়টিতে কল্যাণ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? কি করবে তা হ'লে মালতী? হয়ত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ ক'রে ভেতরে গিয়ে খবর দেবে—বাইরের পাঁচিলের ধারে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীতে সোরগোল প'ড়ে যাবে। দাদা হয়ত লাঠিসোঁটা আর লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসবেন। তার পর—

কিন্তু না, অন্ধকার হোক্, তাই ব'লে মালতী তাকে চিনতেই পারবে না এমন হ'তে পারে না। হাতে ত তার আলো থাকবে। চিনবে ঠিক, কিন্তু অপ্রত্যাশিত আনন্দে মুখ দিয়ে হঠাৎ তার কথা বেরুবে না। তার পর মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলবে 'তুমি?'

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বাড়ী ঢুকতে গিয়ে প্রথম দেখা হ'ল সুমির সঙ্গে। পুকুর-পাড়ে তাদের প্রকাণ্ড পেয়ারা গাছটার তলায় আব্ছা অন্ধকারে এক আঁকসি হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য উঁচু ডালের একটা ডাঁসা পেয়ারা। কল্যাণকে দেখতে পেয়ে আঁকসিটা ফেলে তিন লাফে কাছে ছুটে এল।

—ছোটদা!

ব'লে আর অপেক্ষামাত্র করলে না। কল্যাণের হাতে একটা কাগজের প্যাকেট ছিল, সেইটে ছিনিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—ওমা, দেখ কে এসেছে। ছোটদা গো ছোটদা—

কল্যাণ পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকল। প্রণাম করলে মাকে। মা মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আয়। হাঁ রে এত দিনের মধ্যে একটা খবরও বুঝি দিতে নেই। ক'দিন ভেবে ভেবে কাঠ হয়ে আছি, তার ওপর পোড়ারমুখী মেয়ে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে—

—হুঁ, ভাল খবর দিলুম বলে! কোথায় বলবে তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তা নয়—

মা হেসে ফেলে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। বড়দা ঘরে থাকলে চেঁচানি বেরিয়ে যেত। এখন যা দিকি, বৌমাকে ব'লে আয় চায়ের জল চড়াতে।

ব'লে আসবার আর দরকার ছিল না। কারণ দোরের আড়ালে সন্তর্পণে বেজে উঠল ক'গাছা চুড়ি।

মার কানে গেল, বললেন—ও বৌমা, কালো এসেছে। উনুন কি খালি আছে? তাহলে এক কেটলি জল চাপিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ ওকে কিছু খেতে দিই।...তুই যা

বাবা, ঘাট থেকে চট ক'রে মুখ হাতটা ধুয়ে আয়।...দিন দিন কি যে চেহারা হচ্ছে ছেলের! হাঁ রে, মেসের খাওয়া-দাওয়ার বড্ড অস্থবিধে, না?

—কে বললে? খাওয়া-দাওয়া ত বেশ ভাল। ক'দিন বড্ড ঘোরাঘুরি গিয়েছে কিনা, তাই বোধ হয়। সত্যি মা, এক দিন একটুও সময় পাই নি যে তোমাদের চিঠিপত্র লিখব। তোমরা কেমন আছ বল ত? দাদা কোথায়, দেখছি না যে?

সে কাছারিতে একটু আটকে পড়েছে, এখুনি এসে পড়বে ব'লে—মুহূর্ত্তের জন্যে মা একবার থেমে গেলেন। বছরের পর বছর ছেলের এই ঘোরাঘুরি ক'রে কাটছে, কত দিনে যে ভগবানের দয়া হবে তা তিনিই জানেন।

একটা উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে বললেন—তুই যা, মুখ হাত ধুয়ে আয়। কথাবার্ত্তা পরে হবে। সুমি, গামছা আর হ্যারিকেনটা নিয়ে দাদার সঙ্গে যা। অন্ধকার যেন করছে।

* * *

ইচ্ছে ক'রে কল্যাণ চিঠির কথাটা চেপে গেল। মাকে এই সময় কথাটা কি বলা যেত না? যেত, কিন্তু তার কেমন যেন হ'ল যে আজ পাঁচ বছর ঘোরাঘুরির পর একটা পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি পাওয়া এমন বিশেষ কোনও ঘটনা নয় যা বাড়ীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে লোকজন ডেকে শোনানো চলে। পাঁচ বছর আগে, যখন সে প্রথম পাস ক'রে বেরিয়েছিল, তখন চাকরির খবর এলে লোকে আনন্দ ক'রে শুনত। এখন আর তেমন-ভাবে খবরটা হয়ত কেউ নেবে না। বড়-জোর বলবে, 'আহা, পাঁচ বছর আগে যদি কাজটা জুটত' কিম্বা 'যাক্, এত দিনে তবু একটা গতি হ'ল।' কেউ হয়ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলবে, 'মাইনেটা একটু বেশী হলেই সব দিক দিয়ে মানানসই হ'ত।'

ট্রেনেতে কল্যাণ এই সব ভাবতে ভাবতে এসেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আজ সকাল থেকে সে যেন তার ছেলেবেলা ফিরে পেয়েছে। সংসারের দিক থেকে যাই সে ভাবুক না, আসলে তার মনে হঠাৎ মা-ভাই-বোনকে অবাক্ ক'রে দেবার লোভ জেগেছিল। তাই সে ভেবে রেখেছিল, বাড়ীতে পৌছবার কিছুক্ষণ পরে, সকলে যখন একসঙ্গে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছে, তখন হঠাৎ উঠে সে মাকে আর দাদাকে দ্বিতীয় বার প্রণাম করবে। ওঁরা অবাক্ হয়ে যাবেন, বলবেন, কি রে আবার হঠাৎ প্রণাম করছিস?

সে তখন বলবে, দাঁড়াও, আগে ওঘরে বাবার ছবিকে গড় করে আসি, তার পর বলব।

ওঁরা কিছুই বুঝতে না পেরে তার দিকে চেয়ে থাকবেন। তখন কল্যাণ আস্তে আস্তে বলবে—

ঐ দেখ, কি বলবে এরই মধ্যে সে তার খেই হারিয়ে ফেলেছে।

শেষ পর্য্যন্ত খবরটা যখন সকলের কানে গেল তখন কে যে কি বলবে করবে ভেবে পেলে না। হঠাৎ কারও মুখে কথা জোগাল না। মা নীরবে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। ঠোঁটের পাতা তাঁর এমন কেঁপে উঠল যে তাকে দিয়ে কোনও কাজ পাওয়া গেল না। দাদাকে প্রণাম করতে যেতে তিনি কল্যাণকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মালতী বৌমানুষ, শাশুড়ী ভাসুরের সামনে তাকে দেখতে পাবার আশা করা যায় না। কেবল সুমি উঠল কল্কল্ ক'রে—

—ঐ জন্যে সকালে আমার ডান চোখ নেচেছিল। আমি ঠিক জানি যে—

মা হেসে ফেলে বললেন, দূর পাগলী, মেয়েদের যে বাঁ-চোখ নাচলে ভাল।

—চোখ ত নেচেছে, ডান চোখ বাঁ চোখ অত জানি নে বাপু।—ছোটদা, আমায় কিন্তু নিয়ে যেতে হবে, তোমার ঘরদোর সব গুছিয়ে দিয়ে আসব।

দাদা গলাটাকে গম্ভীর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে বললেন—হ্যাঁ, সব কাজই পার, ঐটে শুধু বাকী আছে। তুই যা দিকি, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে যা—আমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা কই।

মুখটা কাঁচুমাচু ক'রে সুমি আবদার করলে—আজ আমি তোমাদের সঙ্গে খাব বড়দা।

—তাহলে চুপ ক'রে ব'স্।

এদিকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালতী অধীর হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে যে কথাবার্ত্তা শেষ হবে তা কে জানে? কখন এসেছে মানুষ, এতক্ষণে একটা কথাও হয় নি। একবার শুধু ঘোমটা দিয়ে চায়ের কাপটা ঘরের মধ্যে দিয়ে এসেছিল। ঘাটে আলো নিয়ে যাওয়া, তাও সুমি গেল। কেন, সে কি পারত না?

কথায় কথায় রাতও হয়ে গিয়েছে। এখনই সকলে খেতে আসবে। রান্নার অবশ্য দেরি নেই, শুধু ভাতটা হলেই হয়। আর সকলে খেতে এসে বসলে সে গরম গরম ভেজে দেবে গাছের কুমড়োফুল। রান্নাঘরের চালে অজস্র ফুটে আছে, নীচে থেকে হাত বাড়ালে পাওয়া

যায়।···আচ্ছা, কুসুমপুর জায়গাটা কেমন? তাদের গাঁয়ের মতন এমনি?···ঐ দেখ, খাবার জায়গা করা এখনও বাকী। শাড়ীর পাড়ে মোড়া দু-খানা কাটা সতরঞ্চির আসন বাক্সের মধ্যে তোলা রয়েছে, সেগুলো বার করতে হবে।···সেখানেও কি মেসে বোর্ডিঙে থাকতে হবে না কি? কাজ নেই বাপু ওখানে থেকে। ছাইপাঁশ রান্না খেয়ে খেয়ে কি চেহারা যে হচ্ছে। একটা ছোট ঘর ভাড়া পাওয়া গেলে—।···ওমা, সে যে ভাত চড়িয়ে এসেছে উনুনে, ধ'রে গেল না ত?

কতকক্ষণ বাদে কাজকর্ম্ম চুকিয়ে পা টিপে টিপে মালতী তার ঘরের দিকে এল। টেবিলের ওপর একটা কাঁচের আলো জেলে সে কমিয়ে রেখে এসেছিল, সেটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কে পল্‌তে বাড়িয়ে দিলে? ও, এতক্ষণে আসবার সময় হয়েছে নিজের ঘরে! বেশ, কিন্তু এত সহজে যাওয়া হবে না। সেই রাত্তির বেলা, সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে তখন না হয় যাওয়ার কথা ভেবে দেখা যাবে। আর কারও যেন আর অভিমান হ'তে নেই?

মালতী যখন এই সব কথা ভাবছে তখন কল্যাণ ঘরে ব'সে শুনতে পেলে দূর থেকে একটা শব্দ তার দিকে এগিয়ে আসছে। পায়ের ধ্বনি, আর তার সঙ্গে এক একবার বাজছে—ঝম্ ঝম্। চুড়ির আওয়াজ—কাছাকাছি এসে থামল। যখন মালতী মনে মনে একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছে যে ঘরে এখন কিছুতেই যাবে না, তখন হঠাৎ চম্‌কে উঠে আবিষ্কার করলে সে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। মনে মনে সে 'না' বলছিল, কিন্তু তার পা যে প্রতি পদক্ষেপেই সম্মতি জ্ঞাপন ক'রেছিল এ কথা কে জানত? টেরও পায় নি সে—একেবারে এসে দাঁড়িয়েছে কল্যাণের সামনে।

কল্যাণ তাড়াতাড়ি হাত ধ'রে মালতীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

—আঃ, এতক্ষণে তুমি এলে! কতকক্ষণ থেকে মালতী ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, ভাবছি—

—যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। নিজেরই আসবার কথা মনে ছিল না, তাই বল না।

—অথচ তোমার কাছে আসব ব'লে চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। সত্যি পালিয়েছি। দাদা কিছুতেই ছাড়বেন না, বললেন—কি কি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে তার একটা ফর্দ্দ ক'রে দিতে। কালকের মধ্যেই ত গোছগাছ ক'রে নিতে হবে কিনা। কোনক্রমে পাশ কাটিয়েছি।

মালতীর মুখ হঠাৎ ম্লান হয়ে এল।

—কালকেই গোছগাছ ক'রে নিতে হবে? কেন, দেরি আছে ত স্কুল খোলবার। একটা দিন বুঝি আর বাড়ীতে থাকা যায় না? না না, কাল তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

—থাকতে বলছ না যখন তখন আর যেতে না দিয়ে লাভ কি?

—কখন আবার তোমাকে না থাকতে বললুম? ও কথা আমি কক্ষনো বলি নি—সব তোমার দুষ্টুমি।

—তা হ'লে ত আরও বিপদের কথা। দুর্জ্জন লোককে ঘরে থাকতে দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

—সে আমি বুঝব। কিন্তু সারারাত শুধু ঝগড়াই করবে বুঝি?

—কদাপি না। ঝগড়া করতে তোমায় দিচ্ছে কে? আচ্ছা মালতী, হঠাৎ গিয়েছিলে কোথায়? ও-ঘরে ব'সে দেখছিলুম তুমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তার পর কোথায় যে গেলে আর খুঁজে পাই না। রান্না-ঘরে ছিলে বুঝি?

—উঁহু।

—তবে?

মালতী হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বললে—সব কথা তোমায় শুনতে হবে নাকি?

—অবশ্য।

সেও বলবে না, আর কল্যাণও ছাড়বে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর কোনক্রমে মালতী ব'লে ফেললে, ঘাটে গিয়েছিলুম।

—এই অন্ধকারে? জল আনতে বুঝি?

—না।

কল্যাণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মালতী আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে এক দম্‌কায় ব'লে ফেললে, এত দিন বাদে সত্যনারায়ণের দয়া হ'ল, তুলসীতলায় তাঁর নামে পয়সা রাখতে হবে না?

কল্যাণ নির্ব্বাক্। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলে, এখন পয়সা পেলে কোত্থেকে?

—কেন, আগের বারে এসে তুমি যে আমায় চার আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছিলে। তার কিছু খরচ করেছি নাকি?

—সে কি, সে ত তোমায় রুলি কিনতে দিয়েছিলুম। কেনো নি?

—এইবার তুমি কিনে দেবে।

কল্যাণের শরীর যেন অবশ হয়ে এল। কি বলবে সে? এই অপরূপ মুহূর্তে কোনও কথাই খাপ খাবে না। মালতীর কথার স্বর ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। শুধু ঘরে নয়, বুকের ভেতর। পৃথিবীর এত বিস্ময় কোথায় ছিল? কোথায় ছিল এত আনন্দ, এত ভালবাসা?

—চুপ ক'রে গেলে যে?

—চুপ করি নি মালতী, ভাবছিলুম।

—এখন আর তোমাকে ভাবতে হবে না। হাঁ গো, সত্যি তোমায় কাল যেতে হবে?

—নতুন জায়গা, কোথায় গিয়ে উঠব না-উঠব কিছুই জানি না। এক দিন আগে গেলেই ভাল হ'ত। কিন্তু যা হ'বার হবে, কাল আর আমি এখান থেকে নড়ছি না।

এতক্ষণে মালতী খুশী।

—আচ্ছা, কুসুমপুর এখান থেকে কত দূর? শনিবার শনিবার আসতে পারবে ত?

—বোধ হয় পারব। বেশী দূর নয়। শহর থেকে পাঁচ-ছ'টা স্টেশন।

—পাড়াগাঁ?

—হাঁ, কিন্তু কাছাকাছি ছোটখাট একটা শহর আছে। আমি এক বার গিয়েছিলুম যে ওখানে।

—কই শুনি নি ত, কবে?

—সে অনেক দিন আগে, তখন আমি কলেজে পড়ি। এক দিন এক বন্ধু এসে ধ'রে বসল তার বিয়েতে আমাকে বরযাত্রী যেতেই হবে। ঐ কুসুমপুরে তার শ্বশুরবাড়ী।

—জায়গাটা কেমন?

—পাড়াগাঁ যেমন হয় আর কি। বাঁশের ঝাড় আর পানাপুকুর। কিন্তু সেখানে একটা আশ্চর্য্য বটগাছ দেখে এসেছি। কুসুমপুরে ঠিক ঢোকবার মুখেই সে প্রহরীর মতন দেউড়ী আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এক বার যে দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না। এত প্রাচীন গাছ হঠাৎ চোখে পড়ে না। সে আবার একা নয়, তার আশেপাশে এক প্রকাণ্ড যৌথ সংসার গ'ড়ে উঠেছে। কত যে ডালপালা, নীচু ডালের ঝুরি থেকে জন্মান কত যে নূতন গাছ ওখানে জটলা পাকিয়েছে তা গুণে বলে কার সাধ্যি? তার ওপর এদের গতিক-সতিক দেখে অমন যে দুর্দ্দান্ত সূর্য্য সেও বড়-একটা কাছেপিঠে ঘেঁষে না। কাজেই মনের সুখে তারা ঘরকন্না করছে। উৎপাতের মধ্যে পাড়ার কয়েকটা অর্ব্বাচীন ছেলে। সকালবেলা মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে এইখানে এসে তারা জলপান খায় আর চু-কপাটী খেলে। আর মাঝে মাঝে লম্বা ঝুরিগুলোর মুখ দু-হাতে চেপে ধ'রে কিংবা নীচু ডালের উপর চ'ড়ে দোল খায়। তার পর তা'রা চলে গেলেই চার দিক একেবারে নিস্তব্ধ। বড়জোর শুনতে পাবে দু-একটা অধ্যবসায়ী কাঠঠোকরার ঠক্-ঠক্-ঠক্। আর যদি গোলমাল শুনতে চাও তা হ'লে যে-কোনও দিন সন্ধ্যের আগে গাছটার কাছে এসে দাঁড়িও। দেখবে সাঁ-সাঁ আওয়াজ ক'রে চার দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে এসে গাছটার ওপর বসছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখী। তাদের সান্ধ্য আলাপে কান পাতা দায়। এ ওকে ঠুকরে ফেলে দিচ্ছে। ডানার ঝটপটানি আর পাখীর ভাষায় যত রকম গালিগালাজ ধমকানি সম্ভব হয় তাই। জায়গার জন্যে ঝগড়া করতে গিয়ে কারুর হয়ত ডিমসুদ্ধ বাসাটাই নীচে প'ড়ে গেল। কিন্তু কে কার কথা শোনে!...

মালতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে কি বোর্ডিঙে থাকতে হবে?

—গাছটার কথা বুঝি ভাল লাগল না? চিঠিতে ত কিছু লেখে নি, তবে চেষ্টা দেখব একখানা বাড়ী ভাড়া নেবার। পাড়াগাঁ, টাকা পাঁচ-ছয় দিলে কি আর একটা ছোট মেটে বাড়ী পাওয়া যাবে না?

উত্তেজনায় মালতী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—খুব যাবে। একখানা ঘর, রান্নার একটু জায়গা, খানিকটা উঠোন—এই হলেই আমাদের যথেষ্ট হবে। মেসে, বোর্ডিঙে তোমার থাকা হবে না তা ব'লে রাখছি। আর—

ব'লে গলা নামিয়ে খুব ধীরে ধীরে: আমায় নিয়ে যাবে?

দীর্ঘকাল ধরে এই ত কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছে। এত দিন পারে নি, তার হাত-পা বাঁধা ছিল। এখন ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন, যা হোক একটা সংস্থান হয়েছে। মালতীকে না নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, সে ত যাবেই। গিয়ে তারা দু-জনে ঘর বাঁধবে, নতুন করে পাতবে সংসার। হয়ত প্রতি মাসে টাকায় কুলোবে না, কয়েকটা সখ হয়ত মেটানো শক্ত হবে। কিন্তু কি এসে যায় তাতে? তার নিজের বাড়ীতে সে থাকবে, নিজের জোরের ওপর। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক ভাড়ার—মাসের প্রথমেই সে তা চুকিয়ে দেবে। তার পর ঘরে তার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। কারও দয়ার প্রত্যাশা রাখতে হবে না, কারও কাছে গিয়ে হাত পেতে বলতে হবে না, 'আমায় একটা চাকরি ভিক্ষে দিন।' শুধু ঘর কেন, সারা

গাঁয়ের মধ্যে তারা ছড়িয়ে থাকবে কাঁচা ধানের গন্ধের মতন। মালতী আর সে। সে আর—

—কি মশায়, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললুম, সাড়াই পাওয়া যায় না।—ও, তা না-হয় চিঠিই পড়ছিলেন, তাই বলে—

মেসের রসময়বাবু।

জাগরণ! প্রচণ্ড আঘাতে কল্যাণ জেগে উঠল। ঘুম থেকে নয়, স্বপ্ন সে দেখে নি। জাগল কল্পনা থেকে। কুসুমপুরে যাবার তার কিছুই ঠিক হয় নি, মনে মনে যেতে চেয়েছিল মাত্র। মালতী পাশে নেই, ছিল না কোনও দিন। কল্যাণ অবিবাহিত। হয়ত কোনও সময় 'মালতী' নামটা তার কানে মিষ্টি লেগেছিল, তাই তার জীবন্ত মূর্ত্তি কল্পনায় রঙীন হয়ে উঠেছিল। আর খামের চিঠি একটা সত্যিই এসেছে, কিন্তু এখনও খোলা হয় নি। সেই বন্ধ খামটা উপলক্ষ্য ক'রে সে কল্পনা করছিল, ভাবছিল যদি সত্যিই তার মধ্যে সুখবর থাকে তাহলে সে কি করবে, কেমন ভাবে সুরু করবে তার নতুন জীবন।…

রসময়বাবু চলে যেতে কল্যাণ চিঠিটা খুললে। তার দরখাস্তের উত্তরে কলকাতার এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক লিখেছেন—কুড়ি টাকা মাইনে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, দশ টাকায় রাজী থাকলে কল্যাণ বুধবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে। দুটি ছেলেমেয়েকে দু-বেলা পড়াতে হবে। একটি ক্লাস 'টু'তে পড়ে, একটি ক্লাস 'সেভেন'-এ।

কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এ দেহ-বেদিকা মূলে
প্রাণের প্রদীপ কেঁপেছিল কবে
যৌবন উপকূলে।
আঁখি ছলোছলো মুকুতার রাগে,
পরানবঁধুর প্রাণ পুরোভাগে,
ভীরু এ হৃদয় উঠেছিল কেঁপে
আঁখির আড়ালে দুলে,
এ দেহ-মুকুল পূজার আশায়
ঝরেছিল বেদীমূলে।

সেদিন ধ্যানের শেষে
কি ফল লভিনু, কেন বা সঁপিনু
আপনারে নিঃশেষে।
জীবনের দান কী অবহেলায়
লুটালো তোমার পথের ধূলায়,
আঁখি তুলে তবু তোমারে কেবলি
দেখেছি নির্নিমেষে,
এ দীপ জ্বালায়ে তোমারি দুয়ারে
দাঁড়ায়েছি দিনশেষে।

আজো আন্‌মনে জাগি,
কারণ জানি না, বারণ মানি না,
জানি না কাহার লাগি।
মাঝে মাঝে শুধু সে চির-চেনার
চরণের ধ্বনি শুনি বারেবার,
এ দেহ পুলকে কাঁপে থরোথরো
তাহারি দরশ মাগি,
সে তো চলে যায়, জানে নাকো হায়
কেমনে একেলা জাগি।

সমাজ ও এষণা*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, 'সমাজ', 'সমাস', আর 'সমাশ'। প্রথম শব্দটির অর্থ 'একত্র গমন করা' (সম্+অজ—যাওয়া); দ্বিতীয়টির অর্থ 'একত্র বসা'; তৃতীয়টির অর্থ 'একত্র ভোজন করা'। অশোকের শিলালিপিতেও 'সমাজ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন,—"ন চ সমাজো কতব্বো", অর্থাৎ সমাজ করিবে না। পণ্ডিতেরা কল্পনা করিয়াছেন, এখানে 'সমাজ' শব্দের অর্থ 'প্রীতি-সম্মেলন'। "সমাজম্হি বহুকং দোষং পশতি দেবানাম্ পিয়ো পিয়দশী রাজা"—দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ সমাজে বা প্রীতিসম্মিলনে অনেক দোষ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সেকালে এইরূপ প্রীতিসম্মিলনে বিরাট্ ভোজের আয়োজন হইত এবং তাহাতে বহু প্রাণী নিহত হইত। তাহাই নিষেধ করিবার জন্য অশোকের শিলালিপির এই নির্দ্দেশ। ইহা ছাড়া সাধারণ সম্মেলনমাত্রকেই 'সমাজ' বলা হইত। অশোকের প্রথম শিলালিপিতে পুনরায় লিখিত আছে, "অথি চাপি একা সমাজা বহুমতা দেবানাম্ পিয়স পিয়দশিনো রাঞো"—কিন্তু আরও এক প্রকার 'সমাজ' আছে যাহা দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা মানার্হ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সমাজ' শব্দের আরও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সমস্ত স্থলেই 'একত্র হওয়া' অর্থে 'সমাজ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার অর্থ অনেকটা ইংরেজী 'assembly' (য়্যাসেম্‌ব্লি) শব্দের অনুরূপ; যেমন, সুর-সমাজ নরপতি-সমাজ ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সোসাইটি (society) নামক একটি বিশেষপ্রকার গোষ্ঠীকে বুঝাইতে 'সমাজ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সোসাইটি শব্দের যে অর্থ, ঠিক সেই অর্থে সংস্কৃত কোন প্রাচীন শব্দ পাওয়া যায় বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। অনেক সময়ে 'লোক' অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে পীপ্‌ল্ (people)—এই শব্দটি সোসাইটি শব্দের অনুরূপ অর্থে প্রযুক্ত হ'ত; যেমন লোকমর্য্যাদা, লোকযাত্রা, লোকহিত। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলায় ইংরেজী 'সোসাইটি' শব্দের অনুরূপভাবে 'সমাজ' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। এই জন্য 'সোসাইটি' বলতে যা বোঝায় তা বোঝাতে গেলে 'সমাজ' শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

ইংরেজী 'সোসাইটি' শব্দটিরও যথার্থ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ নয়। অনেকগুলি লোক কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একরূপ ভাষা বলে এবং এক সঙ্গে থাকে, পরস্পরের জীবন-সংগ্রামে পরস্পরের সহায় হয়, পরস্পরকে ভালবাসে, বিবাহ ক'রে পরিবার গঠন করে—কেবলমাত্র এইটুকু বল্‌লে 'সমাজ' বা 'সোসাইটি' শব্দের যথার্থ নির্ব্বাচন হয় না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে, অন্ততঃ অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রাণিজাতির মধ্যে, মিলে-মিশে থাকবার একটা চেষ্টা ও স্বভাব দেখা যায়। একটা কাক যেখানে বসে আর পাঁচটা কাকও সেখানেই গিয়ে বসে। অনেক সময় বৈকালে দেখা যায় যে কোনও উচ্চ গৃহের অলিন্দে বহু কাক সভা ক'রে বসেছে, কেহ কেহ বা সেই সভায় আপন মন্তব্যও প্রকাশ করছে। কিন্তু পিঁপড়ে ও মৌমাছির মধ্যে যে রকম একনিবদ্ধ ঐক্য-সমাপন্ন সমাজ দেখা যায় এ রকম বোধ হয় আর কোন প্রাণীর বেলায়ই দেখা যায় না। মৌমাছিরা, মনে হয়, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" কবির এই বাক্য অনুসরণ ক'রেই তাদের চক্র রচনা ক'রে থাকে। প্রত্যেক মৌমাছিই শ্রমিক। তাদের কাজ হচ্ছে মধুচক্র রচনা করা এবং তাতে মধু সঞ্চয় করা। অনেক প্রাণীর মধ্যে পরস্পর একত্র থেকে পরস্পরের প্রাণধারণের উপযোগী কাজ করতে দেখা যায়। অনেক সময় এই পরস্পরো-পযোগিতা এত বেশী হয়ে ওঠে যে সেই সব প্রাণীরা নিজেদের স্বার্থের কথা এক রকম ভুলেই যায়। প্রাণীদের মধ্যে যে এই সহবর্ত্তিতা, সহকারিতা বা সহানুবর্ত্তিতার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা দেখা যায়, ইংরেজীতে একে বলে 'গ্রিগেরিয়স্ ইন্স্‌টিংক্‌ট্' (gregarious instinct)। ইন্স্‌টিংক্‌ট্ (instinct) শব্দটির ঠিক বাংলা মেলা সহজ নয়। শব্দটির তাৎপর্য্য এই যে প্রাণীদের মধ্যে এমন একটা বৃত্তি আছে যার ফলে তা'রা নিজের শরীরকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে বহির্জগতে যে রকম কাজ করলে তাদের জীবনধারণ হ'তে পারে বা সন্তানপ্রসব ও সন্তানপালন

* ইষ্যতেঽভিব্যতে সাধ্যতেঽনয়েত্যেষণা—যা দ্বারা কিছু চাওয়া যায় এবং তার অনুসন্ধান করা যায়, ও সেই চাওয়ার জিনিষকে 'পাওয়া'তে পরিণত করা যায়, অন্তরের সেই ইচ্ছাত্মক বৃত্তিকে "এষণা" বলে।

চলতে পারে ঠিক সে রকম কাজগুলো বিনা শিক্ষায় অত্যন্ত সুচতুর ও নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কোন কোন জাতীয় পতঙ্গ তাদের মাথার শিং দিয়ে কোন জাতীয় পুষ্পের রেণু আহরণ করে এবং সে রেণু সেই জাতীয় স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকোষে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং সেইখানে তার ডিম পেড়ে রাখে। ডিম থেকে পতঙ্গ-শিশু উৎপন্ন হয়ে সেই ফুলের অভ্যন্তরস্থ পাতা খেয়ে প্রাণধারণ করে ও পরে পক্ষোদ্গম হ'লে উড়ে চলে যায়। পতঙ্গের এই একটি ব্যবহারে যেমন ফুলের সাহায্য হয় তেমন তার আপন শিশুরও সাহায্য হয়। এই পতঙ্গ জীবনে একবার মাত্র ডিম দিয়ে থাকে। অতএব এই রকম ব্যাপারে তার কোন রকম শিক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রাণধর্মে কেমন ক'রে এই রকম আত্মরক্ষার বিচিত্র উপায় সংঘটিত হ'য়ে থাকে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। এই জন্য অনেকে প্রাণীর এই স্বাভাবিক বৃত্তিকে ইন্স্‌টিংক্‌ট্ নামে একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি ব'লে কল্পনা করেছেন, কিন্তু অনেক প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় যে এই ইন্স্‌টিংক্‌টের সঙ্গে সঙ্গে চেতনারও কিছু কিছু উন্মেষ হয়েছে। চেতনার উন্মেষ ও বাসনাবৃত্তি (instinct) এই উভয়ের মধ্যে এখানেই পার্থক্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটলে যখন কোন প্রাণী আপনার ব্যবহারের তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করতে পারে তখনই সেখানে কিছু চেতনার উন্মেষ হয়েছে এ কথা বলা যায়। কেবলমাত্র বাসনাবৃত্তি দিয়ে যা ঘটে তা পারিপার্শ্বিক ঘটনার পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য না ক'রেই ঘটে থাকে। একটা হাঁস বা মুরগী যে ডিমে তা দেয় সেটা তাদের বাসনাবৃত্তিরই অনুরোধে। অনেক সময়ে এমন *দেখা গিয়েছে যে ডিম সরিয়ে নিয়ে তার বদলে গোটাকতক* আলু বা নুড়ি রাখলেও মুরগী তা'র ওপরে বসে তা দিতে থাকে। বাহ্য পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করতে পারে না। আলুতে তা দিলে যে শাবক উৎপন্ন হবে না এ বিষয়ে তা'র কোন খেয়ালই নেই। তা'র বাসনাবৃত্তি তাকে প্রেরিত করছে "তা" দিতে, তাই সে "তা" দিয়েই যায়, কোথায় "তা" দিচ্ছে তার খোঁজ রাখে না।

প্রাণিজগতে যে অদ্ভুত "সামাজিক" বাসনাবৃত্তি দেখা যায় তার স্ফূর্ত্তি অতি বিচিত্র হ'লেও তার মধ্যে কোন চেতনা আছে ব'লে মনে করা যায় না। তাই তাদের সামাজিক ব্যবহার চিরন্তনকাল থেকেই এক রকমের। মৌমাছিদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের শ্রমিকেরা অর্থাৎ যারা চক্র রচনা করে এবং মধু আহরণ করে তা'রা, সকলেই স্ত্রীজাতীয়। তা'রা বিশিষ্ট রকম খাদ্য জোগান দিয়ে ডিম থেকে তাদের রাণী তৈরি করে। যে রাণীগুলি তৈরি হয় তাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধে যে রাণী বিজয়িনী হয় সেই হয় চাকের রাণী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাণীর ডিম পাড়ার সামর্থ্য থাকে এবং সেই ডিম থেকে শ্রমিক মৌমাছিরা উৎপন্ন হয় ততক্ষণ রাণীর রাণীত্ব বহাল থাকে। সেই শক্তির লোপ পেলে এবং রাণী বৃদ্ধ হ'লে মৌমাছিরা তাকে বধ ক'রে অন্য রাণী তৈরী করে। শ্রমিক মৌমাছিদের কাজ পুষ্প থেকে মধু আহরণ ক'রে তা চাকের গর্ত্তের মধ্যে উদ্গীরণ করা এবং নব নব চক্ররন্ধ্র উৎপাদন করা। এই চক্রাবাসগুলিরও শ্রেণী-বিভাগ আছে। কোন শ্রেণীর আবাসে ডিম পাড়া হয়, কোনগুলিতে বা মধু রক্ষিত হয়। সমস্ত শ্রমিক মৌমাছিরা রাণীর অনুবর্ত্তন করে এবং রাণী যেখানে যায় তাকে অনুসরণ করে। আদিম কাল থেকে মৌমাছিদের এই সমাজ-রচনা চলে এসেছে। পরস্পরের সাহিত্য, সান্নিধ্য ও সহকারিতা দ্বারা প্রাণী বা পতঙ্গসমাজ চলে এসেছে। কিন্তু তাদের এই সমাজে আদিম কাল থেকে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি।

মানুষের মধ্যেও প্রাণিসুলভ একটা বাসনাবৃত্তি আছে যার ফলে মানুষ একত্র বাস করতে ভালবাসে, পরিবার গঠন করে এবং সমাজের নানা ব্যবস্থার বিধান করে। অনেক সময় এই কথা বলা হয় যে মানুষ সামাজিক প্রাণী—Man is a social animal। কিন্তু প্রাণিসাধারণ সামাজিকতায় মানুষের সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। যদি গড়ত তবে প্রাণিসমাজের মত মনুষ্যসমাজও আদিম কাল থেকে এক রকমই থাকত। মানুষের মধ্যে সামাজিক বাসনাবৃত্তি ত আছেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী এইটুকু আছে যে মানুষের মধ্যে আছে সমত্ববোধ, সম-জাতীয়তাবোধ। মানুষের মধ্যে যে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ ক'রে মানুষ মানুষকে আপন ও সমান ব'লে চিনেছে। এই জন্যেই মানুষের সমাজে বাহ্য ঐক্যটা প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে মানুষের পরস্পরের আত্মীয়তা-বোধ, ঐক্যবোধ। এই বস্তুটি পশুসমাজে বা পতঙ্গসমাজে দেখতে পাওয়া যায় না। বাসনাবৃত্তির প্রেরণায় তা'রা পরস্পরের সহকারিতায় এক জাতীয় কাজ নিষ্পন্ন ক'রে থাকে, কিন্তু সেখানে কোন পরস্পরের আত্মীয়তার চেতনা নেই।

শৈশব থেকে মানুষ যখন বেড়ে উঠতে থাকে তখন প্রথম অবস্থায় সে জগতের অন্য বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক্

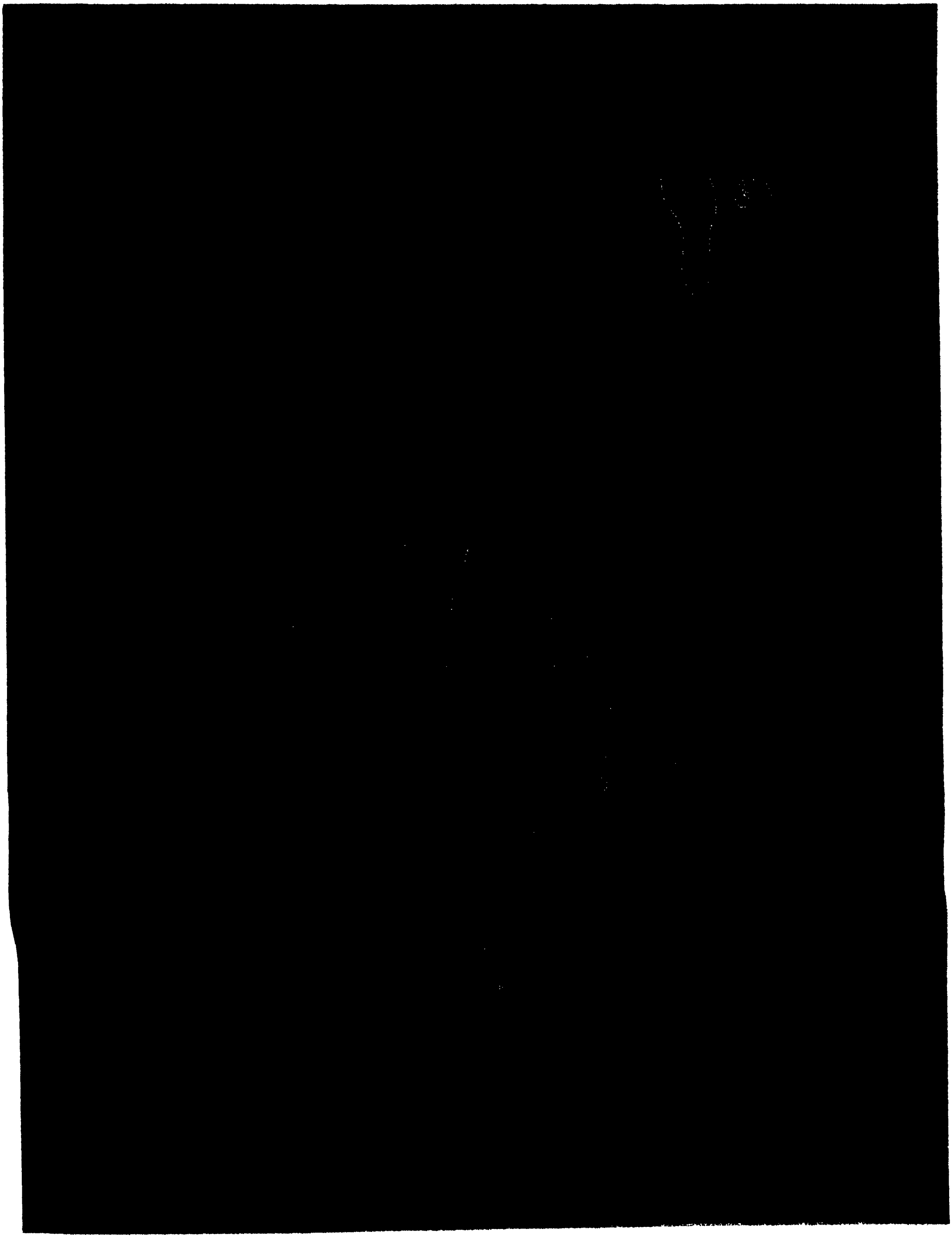

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ক'রে জানতে শেখে না। ক্রমশঃ চেতনার উদ্বোধের সঙ্গে সঙ্গে তার অহংবোধ ও স্বতন্ত্রতাবোধ ফুট হয়ে উঠতে থাকে। তখন সে আপনাকে অপর বস্তু থেকে পৃথক্ ব'লে অনুভব করতে পারে। ক্রমশঃ অন্য মানুষের সঙ্গে, অন্য বস্তুর সঙ্গে সে তার আপন পার্থক্য ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু পরস্পরের আদান-প্রদানে, পরস্পরের ব্যবহারে প্রতিব্যবহারে, অন্য মানুষের সঙ্গে তার যে একটা সমতা আছে সেটা সে অনুভব করে। সে যেমন মানুষ অপর মানুষও তেমনি মানুষ, এই সমতাবোধই সমাজ-বন্ধনের গোড়াকার কথা।

অনেকে প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একান্বয়বর্তী বিবর্তের কথা স্মরণ ক'রে প্রাণিসুলভ সামাজিক বৃত্তির পরিস্ফূর্তিতেই মানুষের সমাজবন্ধন গড়ে উঠেছে, এই কথা স্পষ্টতঃ ব'লে গেছেন। স্পেন্সর (Spencer) এই মতের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। এই ছোট প্রবন্ধে তার মত খণ্ডন করবার কোন অবসর নেই। সেই জন্য আমি কেবলমাত্র আমার নিজের মতেরই উল্লেখ করছি।

যদি একথা স্বীকার করা যায় যে সমবুদ্ধি ও আত্মীয়বুদ্ধি সমাজ-সংগঠনে প্রধান ভাবে উপযোগিতা লাভ করেছে তবে সমাজকে কেবলমাত্র জৈবপ্রকৃতিক বা organic বলা চলে না, তা হ'লে সমাজকে আধ্যাত্মিকই বলতে হয়।

হব্‌স্ (Hobbes) তাঁহার লেবিয়াথান্ (Leviathan) গ্রন্থে সমাজকে প্রাণীর সহিত তুলনা করেছিলেন। কোঁৎ (Comte) সমাজকে প্রাণি-স্বজাতীয় মনে করেছিলেন। 'প্রাণি-স্বজাতীয়' বলতে এই বুঝায় যে প্রাণীর অবয়বের মধ্যে এবং প্রাণধারণ-প্রণালীর মধ্যে যেমন একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব ও পরস্পরের উপর পরস্পরের একটা আশ্রয়াশ্রয়ী ভাব আছে, একটা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেও সেই রূপ একটা পরস্পরাশ্রয়িতা আছে। একেই ইংরেজীতে বলে অর্গ্যানিক রিলেশন (organic relation) বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কিন্তু স্পেন্সর এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে অতি স্পষ্ট ক'রে দেখতে চেয়েছেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন যে মানুষের ক্রমোন্নতি ও সুখ-সম্ভোগ সমাজের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থেকেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমাজের মধ্য দিয়ে যে মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম সার্থকতা প্রকাশ পায় এ কথা স্পেন্সরের লেখায় প্রতীত হয় না। কিন্তু স্পেন্সরের ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ (First principles) এবং অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ একযোগে পাঠ করলে বোঝা যায় যে তিনি সমাজকে প্রাকৃতিক পরিণামের অন্তর্ভুক্ত ক'রেই দেখেছিলেন। শক্তির পরস্পরের সংঘাতে ও বিনিময়ে যেমন পরমাণুপুঞ্জ থেকে অণুপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ গড়ে উঠেছে তেমনি গড়ে উঠেছে প্রাণ ও সমাজ। কিন্তু সমাজ সংগঠনের পশ্চাতে যেমন রয়েছে পার্থিব শক্তির লীলা তেমনি সেখানে রয়েছে চেতনা ও ভাবানুপ্রেরণার ফল। আবার, গ্রোটিয়স্, হব্‌স্, লক্, হিউম্, বেন্থাম, বার্কলি, কাণ্ট এবং হেগেল প্রভৃতিরা সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন পরস্পরের কাজে লাগবার দিক থেকে এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে, কিন্তু মানুষে মানুষে সমচেতনা, মানুষের এষণা, অর্থাৎ ভাবানুপ্রেরিত ইচ্ছাশক্তি, মানুষের বলকামনা, যে সমাজ সংগঠনের মূলে কতখানি ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত অনেকেই দৃষ্টি দেন নি। প্রাণীদের মধ্যে যে সমাজ ছিল একান্তভাবে প্রাকৃতিক, মানুষের মধ্যে পরস্পরের সমচেতনার সহযোগে তার ইচ্ছা-শক্তির অনুপ্রেরণা এবং তার বলকামনা তেমনি ক'রে গড়ে তুলেছে তার সমাজকে। সমাজের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে ও সমাজের মধ্যে "সমাজ পুরুষে"র ইচ্ছা-শক্তির প্রকাশ বা Social life সম্বন্ধে অনেকে অনেক গ্রন্থ লিখে গেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত এষণার দিক থেকে সমাজেরবোঝবার চেষ্টা অতি অল্পই হয়েছে। মানুষের চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে যে বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশের চেষ্টায় সমাজ গড়ে উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা বড় একটা হয় নি। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে তার স্বজাতীয় মনে করে ব'লেই সে তার জন্য যেমন এক দিকে নিজের অনেক সুবিধা-সুযোগ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয় তেমনি অপর দিকে সে চায় যে অপরেও তার জন্য অনেকখানি সুবিধা-সুযোগ ছেড়ে দেবে। মানুষের মধ্যে এমন একটা অনন্ত আছে, এমন একটা অসীম আছে, যে তার চাওয়ার সীমা নাই। অনেকে কেবলমাত্র সমচেতনাই সমাজ গঠনের মূল উপাদান ব'লে মনে করেছেন; গিডিংস (Giddings) বলেন:

> "It is the consciousness of kind and nothing else which distinguishes social conduct as such from purely economic, purely political, or purely religious conduct. . . . . . The working man who, in pursuing his economic interest, would take the best wages that he could get, joins in a strife which he does not understand, or of which he does not approve, rather than cut himself off from his fellows to be a scab among scabs. . . . In a word, it is about the consciousness of kind as a determining principle that all other motives organise themselves in the evolution of social choice, social volition, or social policy."

"কেবলমাত্র সমত্ববোধই সমাজ-জীবনকে যেমন গড়ে' তুলেছে, আর কিছুতেই তেমন করে নি। এইখানেই সমত্ববোধের সঙ্গে ভোগ-

সম্ভোগের প্রবৃত্তি, ধর্মপ্রেরণার প্রবৃত্তি ও রাষ্ট্রশাসন প্রবৃত্তির পার্থক্য। শ্রমিকেরা তাহাদের ভোগসম্ভোগের প্রবৃত্তির তাড়নায়, যত বেশী বেতন পেতে পারে তার দাবীতে যখন কায বন্ধ করে, তখন সেই বন্ধ করার যথার্থ তাৎপর্য্য সে বোঝে না, আর পাঁচ জনে যা করে সেও তাই করে। আর পাঁচ জনের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে অশ্রদ্ধের হ'তে চায় না। সমাজে থেকে যখন কোনও এক রকমে আমরা চলতে চাই বা কোনও একদিকে আমরা ঝুঁকে পড়ি, বা কোনও বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাই তখন আমাদের পরস্পরের সমত্ববোধই থাকে তার মূলে, তারই চার দিকে আমাদের অন্য বৃত্তিগুলি এসে জোটে ও সমাজ-জীবন চালিত করতে আমাদের সহায়তা করে।

সমচেতনার যে সমাজগঠনে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক ব্যাপারে যেমন নানা পার্থিব শক্তির কাজ দেখা যায় তেমনি পারস্পরিক সমচেতনারও নানাবিধ কাজ দেখা যায়। বস্তুতঃ, প্রশস্ত পারস্পরিক সমচেতনার উদার ক্ষেত্র ছাড়া মানুষে মানুষে ব্যবহার চলে না। কিন্তু যে শক্তি সমাজকে গড়ে তুলেছে সেটা কেবলমাত্র সমচেতনা নয়। আর একজন লোক আমার তুল্য—এই হ'ল 'সমচেতনা'র অর্থ। এইরূপ তুল্যতা বোধ বা সমতা বোধ নিশ্চল ও প্রেরণাবিহীন। মাটি না হ'লে বীজ তার ক্ষেত্র পায় না, রস গ্রহণ করতে পারে না, দ্বন্দ্বের মধ্যে লড়াই করতে পারে না, কিন্তু সেই লড়াই করবার শক্তি, রস গ্রহণ করবার শক্তি, মাটিকে আপনার উপযোগী ক'রে তোলবার শক্তি, থাকে বীজের মধ্যে, বীজের মধ্যে আছে সেই প্রেরণা, সেই শক্তি, যার বলে সে মাটিকে ভেদ ক'রে ওপরে ওঠে এবং সমস্ত জড় উপাদানের মধ্য থেকে আপনার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করে। মানুষের দেহের মধ্যে আছে তার বাঁচবার প্রেরণা। সেই প্রেরণা প্রকাশ পায় তার প্রাণৈষণায়। এই প্রাণৈষণার আবেগে মানুষ তার আহার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয় ও বাহিরের আঘাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। এর ফলেই ঘটে আহার সন্ধান (economic activity) এবং আত্মরক্ষাবিধান (political activity)। কি আহার সন্ধান, কি আত্মরক্ষা-বিধান, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মানুষের বলকামনা। মানুষ যে শক্তি দ্বারা আপনাকে ও বহির্লোকে প্রাণী ও অপ্রাণীকে আপনার ইচ্ছা ও প্রয়োজনের অনুরূপে ব্যবহার করতে পারে তাকেই বলি, বল। শিশুর যখন ক্ষুধা পায় তখন তার রোদনের দ্বারা সে সকলকে তার দিকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে এবং আহার আদায় করে—বালানাং রোদনং বলম্। শিশু যখন বলবান হ'য়ে ওঠে তখন সে হয়ত আর একটি দুর্ব্বল শিশুর হাত থেকে বাহুবলে খাবার কেড়ে নেয়। সেই শিশু যখন যুবা হয় তখন নানা উপায়ে আপন দক্ষতা দেখিয়ে সমাজের কাজে আপনাকে লাগিয়ে আর দশজনের নিকট থেকে অর্থ আহরণ করে। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা যায় যে মানুষের দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে সেই প্রাণ তাকে বলকামী ক'রে তোলে। এই বলকামনা দ্বারা সে সংসারকে প্রভাবিত ক'রে সংসারের নিকট থেকে আপনার প্রয়োজন সাধন ক'রে নেয়।

মানুষের প্রয়োজনবোধ কেবলমাত্র তার দৈহিক আহার ও পরিপুষ্টির ওপর নির্ভর করে না। মানুষের "চাওয়া" তার অন্তরের একটি প্রেরণা। জীবনধারণের ক্ষেত্রে যেমন এই চাওয়া ক্ষুধা তৃষ্ণারূপে প্রকাশ পায় তেমনি মানুষের নানাবিধ চেতনায় নানা প্রকারের চাওয়া জেগে ওঠে। এই চাওয়াকে পূর্ণ করতে হ'লে মানুষকে ছুটে যেতে হয় বহির্লোকে নানা প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে। এই চাওয়ার মূলে যে প্রেরণা আছে সেই প্রেরণাই বলকামনা রূপে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমাদের নানা কাজে প্রেরিত করে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রত্যেকগত প্রেরণার যে দ্বন্দ্ব ও মিলন তাই থেকেই গড়ে উঠেছে সমাজ।

আমাদের আত্মার মধ্যে যে নিরন্তর একটা গতি-শীলতার ভাব আছে, একটা ব্যাপ্তি আছে; সে যে নিরন্তর আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, সেইখানেই হ'ল মানুষের অন্তরের প্রেরণা। সেই প্রেরণা প্রাণধারণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'লে মানুষ ক্ষুধায় আহার সঞ্চয় করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে প্রেরণা রয়েছে তার ফলে সে কেবল ক্ষুধার আহার সঞ্চয় করেই নিবৃত্ত হয় না, সে চায় তার সঞ্চয়কে বাড়াতে। সে বাড়তির কোন শেষ নেই। তাই, যে সক্ষম সে কেবল চায় যাতে তার সঞ্চয় ক্রমশঃ স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। এই স্তূপীকৃত বস্তুর মধ্যে যে বলসঞ্চয় হয় তা দ্বারা সে অন্য নানা প্রকার সুখভোগ আহরণ করে। তার নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন অনায়াসেই সিদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু তার অনির্দ্দিষ্ট বিলাসের প্রয়োজন কিছুতেই শেষ হ'তে চায় না। তাই সে চলে নিরন্তর সঞ্চয়ের মুখে। সঞ্চিত বস্তু অন্যের নিকট বিতরণ ক'রে সে নানা প্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে নেয়। যেটুকু ছিল শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন সেটুকু পরিণত হয় অনির্দ্দিষ্ট আহার সঞ্চয়ের উপযোগী বলকামনায়। আমাদের আত্মাকে যখন আমরা এই এক জাতীয় আহরণের মধ্যে নিঃশেষে ব্যাপ্ত করতে চাই তখনই আমাদের জন্মে অর্থতৃষ্ণা। আত্মার শেষ নেই ব'লে তৃষ্ণারও শেষ নেই। এই ভাবে যেদিক দিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, এই চাওয়া ও তদনুরূপ এষণা

প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপ্রেরিত ক'রে রেখেছে। এই অনুপ্রেরণার দিক থেকেই আমাদের বুঝতে হবে, কেমন ক'রে বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে। একদিকে সমচেতনার বোধ থেকে আমাদের মধ্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক নানা সম্বন্ধ, তেমনি বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে যে এষণা বা প্রেরণা আমাদের চিত্তকে ও দেহকে নানা দিকে ধাবিত করছে তারই ফলে গড়ে উঠেছে সমাজ।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৮

কয়েক দিন পরে কালিতারা বেড়াইতে আসিয়া বলিল, আজকাল তোমাদের বাড়িতে খুব মজলিস বসে ভাই আমাদের বাড়ি থেকে হাসির হররা শুনতে পাই কিনা!

যোগমায়া বলিল, পূর্ণিমা ঠাকুর-ঝি বেড়াতে আসেন রোজ। ভারি মিশুক লোক।

ঠোঁট উল্টাইয়া কালিতারা বলিল, ও-রকম গায়ে-পরা-পানা তা ব'লে ভাল নয়। হ'লই বা বাপের বাড়ি, অন্ধকারে হুট্‌হুট্‌ ক'রে আসা—সোমত্ত বয়েস—ভাল নয় ভাই।

ইঙ্গিত যোগমায়ার কাছে তথাপি স্পষ্টতর হইল না। সে কহিল, ওঁরা শহরে রাত দশটা-এগারটা অবধি বেড়াতেন কিনা। আমাদের বলেন, খাঁচার পাখী। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

কালিতারা মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল, মরণ! আমাদের খাঁচার পাখীই ভাল। খিরিষ্টানী আচার-বিচার কিনা, কাজেই বলবে বইকি ওরা ওকথা।

কালিতারার কাল মুখের পানে চাহিয়া যোগমায়া কোন কথা বলিল না। কাল রঙ হইলেও কালিতারার মুখশ্রী ত মন্দ নয়, কিন্তু ওর গম্ভীর মুখে কয়েকটি রেখা ফুটিলে চোখ দুটি যেমন ছোট হইয়া যায়, মুখখানাও কুশ্রী হইয়া উঠে তেমনি।

কালিতারা বলিল, বরটিকে সাবধান ভাই। ওরা কামরূপ-কামিখ্যের ডাইনি—মন্তর-তন্তরে সব করতে পারে।

এবার কালিতারার অন্তর্নিহিত শ্লেষ ও সন্দেহ যোগমায়া বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া তার দুঃখও হইল। কালিদিদির মনে ওসব কুভাব আসেই বা কেন?

কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে অতঃপর কালিতারা অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, যোগমায়াও সহজ ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সংসারের খুঁটিনাটির আলোচনায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিল।

আর একদিন দুপুরবেলায় যোগমায়া কালিতারাদের বাড়ি বেড়াইতে গেল। ঠিক করিল, পূর্ণিমা আসিবার একটু আগেই সে ও-বাড়ি হইতে ফিরিবে। ইদানী কালিতারা ত এ বাড়িতে ঘন ঘন আসা কমাইয়া দিয়াছে। বলে, কাজ সারতে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে বড়ি দেওয়ার লেঠা নাই, একরাশ কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেওয়ার হাঙ্গামাও নাই। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িলে—দাওয়ায় কুড়ের মত পা ছড়াইয়া বসিয়া ছড়া কাটা ছাড়া আর কিই-বা কাজ কালিতারার!

ছেলে কাঁদে না, তবু কালিতারা আকাশে জল ঝরিবার সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া আবৃত্তি করে:

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন আর কন্যে খান,
আর কন্যে না খেতে পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

বৃষ্টি না পড়িলেও খর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে সে দাওয়ায় বসিয়া অনর্গল ছড়া বলিয়া যায়:

ও পারেতে জস্তি গাছটী জস্তি বড় ফলে।
গুয়ো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই গলা করে কাঠ।
কতক্ষণে যাবরে ভাই তিরপুণির মাঠ।
তিরপুণির মাঠেতে ভাই রাঙা রাঙা বালি।
চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।
পান কিনব চূণ কিনব ননদ ভাজে খাব।
আমাকে যদি না দাও ত দাদাকে বলে দেব।
দাদা দাদা ডাক পাড়ি—দাদা নেইকো বাড়ি।

সুবল সুবল ডাক পাড়ি—সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাবে দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে লেগেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি তার ঝাড়তে লেগেছে।
হাতে তার দেব শাঁখা মেপ লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তি মালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তার ডুরে শাড়ী উড়ে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরু ঠাকুর—একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে।
লাল গামছা দিয়ে।
অশ্বথ পাতা ধনে।
গৌরী বেটী কনে।
নথা ব্যাটা বর।
ঢ্যাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙ্গায় ঘর।

সুদীর্ঘ ছড়া—বার বার আবৃত্তি করিয়া কালিতারা অলস মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দেয়—তবু যোগমায়ার কাছে আসিবার সময় তার হয় না!

কালিতারা অভ্যর্থনা করিল, এস এস, ভাই, বস। কি ভাগ্যি আমার—পূবের সুয্যিঠাকুর আজ পশ্চিমে উঠেছেন!

তুমি ত আর যাও না দিদি।

এই দেখ না ভাই, আজকাল এমন অভ্যেস হয়েছে বাবুর ছড়া না শুনলে আর ঘুম হয় না।

তোমার মুখে ছড়া ভারি মিষ্টি শোনায়, দিদি।

হাঁ, ছড়া নাকি আবার মিষ্টি! পুন্নিমে সুন্দরীর মত গান গাইতে তো পারি নে আমরা—যা করেন ওই ছড়া। দুধের সোয়াদ ঘোলে মেটাই, ভাই।

তা অন্তরঙ্গতা বাড়িবার সঙ্গে পূর্ণিমা মৃদু কণ্ঠে গানও গায় আজকাল। সে অস্ফুট গলার স্বর তো এতদূর পৌঁছিবার কথা নহে।

যোগমায়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি শুনতে পাও এতদূর থেকে?

আমি কেন ভাই, সারা কুষ্টেয় ঢি-ঢাক্কার পড়ে গেছে। পোস্টমাস্টার ব'লে কেউ বলে না কিছু।

কালিতারার বক্র ইঙ্গিতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল যোগমায়া। পুরুষ ও নারীর একত্র সম্মিলন মাত্রই যে দোষের—একথা মেয়েরাই যখন তখন বলে। দুর্ব্বল বলিয়াই কি মেয়েদের উপর মেয়েরা এই সন্দেহ পোষণ করে?

কালিতারা বলিল, উনি সেদিন পোস্টাপিসের পাশ দিয়ে আসছিলেন, পুন্নিমে সুন্দরী তখন গাইছেন। নিধু বাবুর সেই—'ভাল বাসি' বলে গানখানা।···তা সত্যিই যদি এত 'প্রেম' 'প্রেম'—তো বিয়ে করুক না কেন? কলকেতায় শুনি তো অনেকেই করছে।

বড় আশা করিয়া যোগমায়া আসিয়াছিল সংসার সম্বন্ধে দুই-একটি উপদেশ লইতে। কালিতারার কথার ধারা শুনিয়া সে উঠি-উঠি করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এইমাত্র আসিয়াছে—এখনই উঠিবে কি করিয়া? অন্তত সন্ধ্যাটা না আসিলে—

বেলা পড়িয়া আসিতেই যোগমায়া উঠিল, যাই দিদি, সন্ধ্যে হ'ল।

—আবার এসো ভাই।

—আসব।

যোগমায়া দুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে—অমনই কালিতারা হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি ভাই,—সাবধান, কর্ত্তাটিকে চোখে চোখে রেখো। যে নজর পড়েছে—!

যোগমায়া উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিল। বাড়ির দুয়ারে আসিতেই পূর্ণিমার মৃদুকণ্ঠের গান ও রামচন্দ্রের তবলার মৃদু আওয়াজ শুনিয়া যোগমায়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছনে কালিতারার কণ্ঠস্বর যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল: সাবধান, কর্ত্তাটিকে চোখে চোখে রেখো। যে নজর পড়েছে!

কই, যোগমায়ার উপস্থিতিতে প্রতিদিন যে মজলিস বসে, সে মজলিসে পূর্ণিমা গান গায় বটে, রামচন্দ্র তো তবলা বাজায় না। এক পাশে আড়ষ্টের মত বসিয়া থাকে রামচন্দ্র। প্রথম দিন পূর্ণিমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত যে অহেতুকী ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে—এত দিনের অন্তরঙ্গতায়ও সে ভয় তাহার কাটিল না! তবে কি ভয় যোগমায়াকে, পূর্ণিমাকে তার ভালই লাগে?

দুয়ারে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন চার মিনিট যোগমায়া এই সব চিন্তা করিল। না, কালিতারা তার মনের সন্দেহ যোগমায়ার মনেও সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। নহিলে যে-রামচন্দ্রকে যোগমায়া দিনের উজ্জ্বল আলোর মতই চিনিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা সে করে কেন? পাছে পূর্ণিমার সঙ্গে গল্প করিতে হয় বলিয়া প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই সে গান বাজনার আখড়ায় যায় নাই; আর সে রাত্রির আদর-প্লাবনে যোগমায়া পর্য্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

ঘোরানো খিলের দুয়ার—বাহির হইতে সে সন্তর্পণেই খুলিল। কিন্তু বাড়ির ভিতরে পা দিতেই তার মনে

হইল পূর্ণিমার খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনির সঙ্গে রামচন্দ্রও যোগ দিয়াছে। পূর্ণিমা বলিতেছে, এবার আপনার গাইবার পালা। যদি না গান—

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিতেছে, আগে হারমোনিয়ম বাজাতে শিখি, কলকাতায় ঘুরে আসি—

হড়াৎ করিয়া যোগমায়া দুয়ারের খিল বন্ধ করিল। ঘরের মধ্যে হাসি-আলাপও অমনি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পূর্ণিমা দ্রুত ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল, অন্তত যোগমায়ার তাই মনে হইল। তারপর গলা ছাড়িয়া বলিল, বউদি বুঝি? ধন্যি পাড়া বেড়াতে শিখেছ যাহোক! এদিকে দাদার মন উড়ু-উড়ু। কত ক'রে গান গেয়ে—

যোগমায়া ঝনাৎ করিয়া রান্নাঘরের শিকলটা খুলিল। ধপাস্ করিয়া দেড়কোটা দাওয়ায় বসাইল, এবং অন্ধকারেই কুপিটা হাতড়াইতে গিয়া সেটি ঠুন্ করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

ওঘর হইতে পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, বউদি—কি হাঁড়ি খাচ্ছ অন্ধকারে?

দিয়াশলাই জ্বালিয়া দুম্ দুম্ শব্দে যোগমায়া এঘর ওঘর করিয়া সন্ধ্যা দেখাইল। তুলসীতলায় আঁচল লুটাইয়া প্রণাম করিতেই খানিকটা চোখের জল উপচাইয়া পড়িয়া সেখানকার মাটি ভিজাইয়া দিল। সেই মাটি মাথায় ঠেকাইয়া যোগমায়ার বুকটা অনেকখানি হাল্কা হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।

এ ঘরে আসিয়া যোগমায়া দেখিল পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগমায়াকে দেখিয়া সে বলিল, বউদি তো বসতেই বললে না আজ!

যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, যিনি বসাবার তিনি তো বসিয়েছেন ভাই, আমরা না বললে কি আসে যায়?

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, না ভাই, কথায় বলে, ভাইয়ের ঘর—বউয়ের হাত। তোমরা আঙুল না নাড়লে—ভাইদের সাধ্যি কি যে ডেকে বসান! বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের পানে চাহিল। প্রতিদিনকার মত ভয় সে মুখে লাগিয়া আছে, কিন্তু আজিকার ভয়ের চিহ্ন আরও একটু নিবিড়। অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার মত মুখভাব রামচন্দ্রের।

যোগমায়া বলিল, নাও ওঠ। মাদুরটা ঝেড়েঝুড়ে গুটিয়ে রাখি। আজ খাবে তো রাত্তিরে?

রামচন্দ্র বলিল, না খাবার কারণটা কি?

যোগমায়া বলিল, গল্প খেলে পেট ভরে না জানি, বন্ধুরাও তো খাওয়াতে পারেন!

—তা পারেন। তবে সেটার কোন বাঁধাধরা বন্দোবস্ত নেই—খেয়াল-খুসির ওপরই নির্ভর করে অনেকটা।

—বাঁধাধরা বন্দোবস্তই একটা করে নাও না, মিছিমিছি রোজ রোজ কতকগুলো তরকারি নষ্ট হয় কেন!

—তুমি তো বল কেষ্টর মাকে তরকারিগুলো দাও, নষ্ট হয় না।

যোগমায়া হাসিবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, তুমি না খেলেই তো নষ্ট—তাই বলছি। এখুনি বেরুচ্ছ তো?

—না, আজ আর যাব না ভাবছি।

—কেন, শরীর খারাপ বুঝি?

কিন্তু আগাইয়া আসিয়া যোগমায়া তাহার কপালে হাত রাখিল না, বা স্বরে কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া এতটুকু ব্যস্তও হইল না।

রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া যোগমায়ার পানে চাহিল। কহিল, তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই, মায়া?

যোগমায়া বলিল, কে বললে? ভালই তো আছি। ভাল না থাকলে কেউ বেড়াতে যায়!

—তা বটে। তবু আজ এমন অনেক কথা বলছ—যা তোমাকে মানায় না মায়া। তুমি তো কোন দিন এমন ক'রে কথা বল না।

—তবে কি করে বলি কথা? উচ্চ হাসিয়া যোগমায়া এক পাক ঘুরিয়া হ্যারিকেনটার দম কমাইয়া মাটির উপর রাখিয়া দিল।

রামচন্দ্র বলিল, হাসই আর যাই কর—তোমার মন আজ ভাল নেই। কেন নেই, মায়া?

হাত ধরিতে গেলে সে পিছাইয়া গেল। কহিল, তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত্তিরের খাওয়া মাটি করি সেদিনকার মত! তা হ'চ্ছে না।

—না হ'লই বা খাওয়া। এস, গল্প করি।

—না গো না। ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল যোগমায়া।

রাত্রিতে খাটের চারিপাশে মশারি গুঁজিতেছে—রামচন্দ্র খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আজ আমার ওপর রাগ করেছ, মায়া?

যোগমায়া প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, উঃ, হাতে লাগে যে!

—লাগুক, কেন রাগ হ'ল তোমার বল তো?

—রাগ হবে না কেন। তুমি আমার সামনে বসে কোন দিন বাজাও না কেন?

—এই! তা তুমি তো কোন দিন আমায় বাজাতে বল নি। বলেছ?

—না, আমি যে গাইতে পারি নে।

—শিখবে গান?

—গান শেখবার ইচ্ছে হ'লেই যেন শেখা যায়! কে শেখাবে?

—যদি বলি পূর্ণিমা।

—পূর্ণিমা তো মাষ্টার নয়, ওর কাছেই বা আমি শিখব কেন?

—যদি আমি শেখাই?

—জান নাকি তুমি? কই, এক দিনও তো গাইতে শুনি নি।

—শুনবে? গাইব?

—খুব হয়েছে! রাত জাগলে শরীর অসুখ করবে না বুঝি? ঘুমোও।

—না, ঘুমুব না।

—তবে বক। পিছন ফিরিয়া যোগমায়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

৫

পূর্ণিমার হাজিরার কামাই নাই। ঘড়ির কাঁটার মত নিত্যনিয়মিত তার আসা-যাওয়া। কি পূর্ণিমা—কি অমাবস্যা—একাই সে আসে, একাই চলিয়া যায়। বলে, পুরুষকে ভয় ক'রে ক'রেই তো আমাদের এই দশা। নিজের গাঁয়ে নিজে চলব—তা আবার অন্যের সাহায্য নেব কেন? ওরা যদি চলতে পারে—আমরাও পারব।

তবলা আজকাল রামচন্দ্র প্রকাশ্যেই বাজায়; একটা হারমোনিয়ম আনাইবার কথাও চলিতেছে। যোগমায়ার চিত্ততলে সেই দিনের সন্দেহ-বীজ একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বুঝি অনুকূল আবহাওয়ায় সে পল্লব মেলিতেছে।

মজলিসে সর্ব্বক্ষণ সে বসিয়া থাকে না, ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। কখনও রান্নাঘরে গিয়া হাঁড়ি ঢুক্ ঢুক্ করিয়া জানাইয়া দেয়—সে কাজ করিতেছে, কান পাতিয়া রাখে এ ঘরের পানে। রামচন্দ্র ক'বার হাসিল ও কি কথা বলিল—ও ঘরে না থাকিয়াও যোগমায়া সব মুখস্থ বলিয়া দিতে পারে। কখনও পা টিপিয়া আর একটু আগাইয়া আসিয়া পালং শাকের ক্ষেতের কাছটায় সামান্যক্ষণ দাঁড়ায়। ঘরে যতক্ষণ হাসি-কথা, গান-বাজনা চলে যোগমায়া ততক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন থাকে, কিন্তু ও-ঘর নিস্তব্ধ হইলেই যোগমায়ার বুকে কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটিতে থাকে। সন্দেহ প্রবল হইয়া গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া দেয়। পা টিপিয়া টিপিয়া যোগমায়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকার মাখা দুয়ারের ও-পিঠে চোখ পাতিয়া রাখে। প্রথমে সামান্যক্ষণ চোখ পাতিয়াই তার মন দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিত—এখন পূর্ণ সাত-আট মিনিটও সে মশক-দংশন নীরবে সহ্য করিয়া ও-ঘরের পানে চাহিয়া থাকে! ও-ঘরেই যে তাহার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। নিজের দুর্ব্বলতা যোগমায়া বুঝিতে পারে, এ যে কতবড় অন্যায়—কত বড় পাপ তাহাও সে মনে মনে স্বীকার করে, কিন্তু কালিতারার দেওয়া বিষের চারা মনের ক্ষেত্র হইতে উপড়াইয়া ফেলিবার সাহস যোগমায়ার নাই। সে চারা দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইতেছে—অনেকগুলি শিকড় নামাইয়াছে যোগমায়ার হৃদয়ে—অনেকখানি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যোগমায়াকে দিনে রাত্রিতে যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে। চিরন্তনী দুর্ব্বল বৃত্তির খেলনা হইয়াছে যোগমায়া। রামচন্দ্রকে সে অবিশ্বাস করে না—অন্তত মনে মনে সে বারবার সেই কথা বলে। কিন্তু দিনে দিনে রামচন্দ্রের নিকট হইতে সে দূরেও সরিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারে। রামচন্দ্রের যে-রহস্য আগে যোগমায়া বুঝিতে পারিত না, এখন সেই রহস্যেরই কদর্থ করিয়া সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। ভাবে, আমার রূপ নাই, গুণ নাই, গান জানি না, হাসিতেও জানি না ভাল করিয়া—রামচন্দ্র আকৃষ্ট হইবে কেন? ভালবাসা হাবভাবে যে মানুষকে কাছে টানে না—সে কথা বুঝিবার বয়স হয় নাই যোগমায়ার। আকাশে উঠেন চাঁদ—নদীতে নামে জোয়ার, ভিতরের আকর্ষণেই একের হাসিতে অন্যের বুককে আবেগে স্ফীত করিয়া তুলে। আজকাল তুলসী তলায় সন্ধ্যা দেখাইবার কালে প্রণামটা বিলম্বিত করে যোগমায়া। ইচ্ছা করিয়াই প্রণাম বিলম্বিত করে। চোখের জল সঙ্গে সঙ্গে অনেক-খানি বাহির হইয়া যায়। যেদিন জল বাহির হয় না—সেদিন বুকখানা ব্যথায় টন্‌টন্ করিতে থাকে। যোগমায়ার সম্মুখেই তার গৃহদাহ আরম্ভ হইয়াছে—হাত-পা বাঁধা যোগমায়ার। ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখা ছাড়া গত্যন্তর কি?

প্রথম প্রথম রামচন্দ্র বিস্মিত হইত, এখন সে বিস্ময় তার কাটিয়া গিয়াছে। বয়সের অনুপাতে যোগমায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন হয়ত সেই জাতীয়। সংসার সংসার করিয়া যোগমায়া ঘুমের ঘোরে

চমকাইয়া উঠে। শীতের প্রত্যুষে রামচন্দ্রের বাহু-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সে আঁচল গায়ে দিয়া বাহিরে আসে; গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পাখা হাতে করিয়া খানিকটা গল্প যে রামচন্দ্রের সঙ্গে করিবে—সে অবসর তার নাই। সংসারে এতও কাজ জমিতেছে দিন দিন!

সেদিনও মজলিস হইতে যোগমায়া উঠিয়া গিয়াছে। গান থামিয়া গিয়াছে, গল্পও এইমাত্র শেষ হইয়া গেল। তবু পূর্ণিমার উঠিবার ত্বরা নাই। রান্নাঘর আহুড় রাখিয়া যোগমায়া আসিয়া এ ঘরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কপাটের ফাঁকে চোখ রাখিল।

পূর্ণিমার মুখে আজ হাসি নাই, কথায় তেমন উচ্ছ্বাসও নাই। সে মৃদু কণ্ঠে বলিতেছে, কালই কলকাতায় যাচ্ছি। একটু থামিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বিধবা বিবাহ ভাল না মন্দ?

রামচন্দ্র বলিল, ওসব বিচার পণ্ডিত লোকেরা করছেন, আমরা কি-ই বা বুঝি!

পূর্ণিমা বলিল, আমাদের কথা আমরা যেমন বুঝবো, তেমন কেউ বুঝতে পারবে না। পণ্ডিতরা শাস্ত্র নিয়ে চুলচেরা বিচার করুন গে।

রামচন্দ্র বলিল, হিন্দু হয়ে শাস্ত্র যখন মানছি—তখন তার ব্যবস্থাটা অস্বীকার করবার শক্তি কোথায় আমাদের।

স্বীকার-অস্বীকারের কথা বলছি না, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি—ভাল না মন্দ?

রামচন্দ্র কোন কথা কহিল না।

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, শাস্ত্র আমার বিচার-বুদ্ধিকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ও-কথা জোর গলাতেও আমরা বলতে পারি না। অথচ শাস্ত্র তৈরি করেছি আমরাই। আমরা যা তৈরি করেছি—আমরা তা বদলাতে পারব না—এ কেমন কথা!

রামচন্দ্র বলিল, ভাল বুঝেই তো আমরা একদিন কতকগুলো বিধান মেনে নিয়েছি, পূর্ণিমা। আজ হঠাৎ সেগুলো ভাঙার কোন মানে হয়?

পূর্ণিমা বলিল, সেদিন যা দরকারী ছিল, আজও তাই দরকারী আছে? এক দিন ছিল—যখন সামাজিক কোন বন্ধনই কেউ মানতেন না। বীর্য্যশুল্কে স্ত্রীলোকের ভাগ্য নিরূপিত হ'ত; আজ তিন রকম বিবাহ উঠে গিয়ে শুধু লৌকিক বিবাহটাই চলিত রয়েছে। এক কালের বিধান চিরকাল থাকতে পারে না। কথা শেষে মনে হইল, রামচন্দ্রের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে তার চোখ দুটি জল্ জল্ করিতেছে।

রামচন্দ্র বলিল, এ কি তোমার মত, পূর্ণিমা?

যদি বলি আমার নয়—তাতেই বা কি। যা সত্য—তা যার মতই হোক—সব সময়েই সত্য।

—তোমরা ব্রাহ্ম বুঝি?

—ব্রাহ্ম কি হিন্দু নয়? যাঁরা এগিয়ে গেলেন মতামতে—তাঁদের ঠেলবার জন্য আপনারা ত অস্পৃশ্য ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা জাত দেন নি, মাত্র মত বদলেছেন—তাই আপনারা তাঁদের দূরে সরিয়েছেন। আজ আমি যদি আবার বিয়ে করি—আপনি কি করবেন, দাদা? এমনি ক'রে বাসায় আসতে দেবেন আমায়? আপনার সামনে গান গাইলে এমনি ক'রে সঙ্গত করবেন আমার সঙ্গে?

রামচন্দ্র শুষ্ক স্বরে বলিল, কিন্তু বিবাহের চেয়ে ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে কল্যাণকর পথ।

কোন্ মানুষের পথ? যিনি আকণ্ঠ ভোগ করে বীতস্পৃহ হ'য়েছেন ভোগে, না দৈববিড়ম্বনায় যাঁর অদৃষ্টে ভোগ্যবস্তু জোটে নি? বলুন? যে-যুগে ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য-পালনীয় ছিল—আমরা কি সেই ঋষি-যুগে বাস করছি এখনও?

রামচন্দ্র উত্তর দিল না। পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, আজ এসব কথা বলছি কেন জানেন? দাদা বৌদি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন এই বৈধব্য থেকে আমায় মুক্তি দেবেন ব'লে। যদি মুক্তিই পাই, আর তো আপনাদের এখানে এসে বসতে পারব না—তাই এত কথা জিজ্ঞাসা করছি আজ। বলুন না, বিয়ে করলে আমায় ঘৃণা করবেন তো?

রামচন্দ্র বলিল, ঘৃণা করব কি না, জানি না, কিন্তু তোমার বিয়ে খুব ভালভাবেও নিতে পারব না, পূর্ণিমা। আমি যে-সমাজের লোক, সে-সমাজের কেউ এ জিনিস ভালভাবে নিতে পারেন না।

—কেউ নয়—অনেকেই। যাই হোক, আপনাকে প্রণাম করে যাই। যদি আসবার মত অবস্থা না হয়, তবু মনে রাখব আপনাকে। শুধু দাদা বলে নয়—। পূর্ণিমা সহসা চুপ করিল।

—তবে কি বলে মনে রাখবে?

—মনে রাখব—কারণ—, পূর্ণিমা পুনরায় চুপ করিল।

—চুপ করলে যে?

যত বেহায়া হই দাদা, সামনে সে কথা বলতে পারব না। যদি দরকার বুঝি এক দিন চিঠি লিখে জানাব আপনাকে। একটু থামিয়া বলিল, ব্রহ্মচর্য্য পালন করার মত মনের বল সবার থাকে না দাদা। আমি এতদিন

নিজেকে যতখানি সবল মনে করতাম, এখন তা করি না। বলিয়া হাসিল।

—উঠছ ?

হাঁ। বউদি কোথায় গো ? বয়সে ছোট না হ'লে তোমারও পায়ের ধুলো নিতাম একটু। বউদি ?

অন্ধকার ঘর হইতে দ্রুত অপস্থত হইয়া যোগমায়া তুলসীতলায় আসিয়া চাপা গলায় বলিল, ডাকছেন ?

—হাঁ। হাসিতে হাসিতে দুয়ার খুলিয়া সে বাহির হইয়া তুলসীতলার সন্নিকটে আসিয়া বলিল, একটু মাটি আমার মাথায় ঠেকাবে ভাই ?

—আপনারা তো মানেন না।

—মানি না, কিন্তু অস্বীকার করতে পারি কি ! ওর একটু মাটির জন্যই তো কলকাতায় চললাম। তোমাদের সংসারটি এত ভাল লাগে কেন, জান ? ওই সন্ধ্যে দেখানো আছে বলে, শাঁক বাজাও বলে, তুলসীতলার মাটি মাথায় নাও বলে। আমরা নিতে পারি নে—তবে নেবার ইচ্ছে করে। হাসিতে হাসিতেই পূর্ণিমা বাহির হইয়া গেল।

যোগমায়া হতবিস্ময়ে তুলসীতলায় দাঁড়াইয়া খোলা দুয়ারটার পানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আজ ওর গলার স্বরটি হাসির মধ্যেও কি অস্বাভাবিক থমথমে। এত দিনেও পূর্ণিমাকে সে বুঝিতে পারিল না ? (ক্রমশঃ)

খাদ্য-সমস্যা ও শাকসব্জীর চাষ

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

কেবল ভাত-ডাল খাইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। ভাত-ডালের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণও চাই। এই সকল উপকরণের মধ্যে শাকসব্জীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। প্রাচীন কাল হইতেই খাদ্য হিসাবে শাকসব্জীর প্রচলন আছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ভিটা জমিতে এমন কি উঠানেও কোন-না-কোন শাকসব্জী রোপণ করা হইত এবং সাধারণতঃ বাড়ীর মহিলারাই নিজ হস্তে বীজ পুঁতিতেন, গাছে জল দিতেন, গাছের পোকা বাছিতেন, গাছে পোকা ধরিলে ছাই দিতেন ইত্যাদি সকল প্রকার পরিচর্য্যা করিতেন। নিজ হস্তে শাকসব্জী তুলিতেন, সকাল সন্ধ্যায় ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া বাগানটিতে ঘুরিতেন, কোন্ সময় কোন্ গাছ রোপণ বা কোন বীজ বপন করিতে হয়—তাহাদিগকে বলিতেন, তাহাদের দেখাইতেন কোন্ গাছে কি ফল হইয়াছে ; ইহাতে বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরও কত আনন্দ হইত, তাহারাও নিজ হস্তে গাছ রোপণ করিত, কাহার গাছে কত বড় ফল হইয়াছে—ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিত। ইহার ফলে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম ত হইতই, শাকসব্জীর চাষবাস সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই তাহাদের একটা অভিজ্ঞতাও জন্মিত এবং শিশুকাল হইতেই টাট্‌কা শাকসব্জী খাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন—এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইত। ইহার আরও একটি সুফল এই ছিল যে, পাড়াপ্রতিবেশীদিগের মধ্যে এই সকল শাকসব্জীর আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির ভাব থাকিত। ছেলে-মেয়েরাও শিখিত যে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে জিনিস দেওয়াতে বেশ আনন্দ আছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অধুনা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পুঁইশাকে যথেষ্ট পরিমাণ 'ভাইটামিন' বিদ্যমান আছে। কিন্তু অতি বাল্যকালে আমাদের ঠাকুর-মার ও প্রাচীন মহিলাদের মুখে শুনিয়াছিলাম "মাছের রাজা রুই, শাকের রাজা পুঁই"। তাঁহারা বিজ্ঞানও পড়েন নাই, কোন খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণের কথাও শুনেন নাই ; কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই প্রত্যেক শাক-সব্জীর গুণাগুণ বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। খুবই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বর্ত্তমান সময়ে কেতাবি শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াও পূর্ব্বের মত শাকসব্জীর উপকারিতা জনসাধারণকে এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও বুঝাইতে পারা যাইতেছে না।

মনে হয় পুঁইশাক, কল্‌মিশাক, লাউশাক, কুমড়াশাক, কাঁচকলা, ঢেঁড়শ ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল শাকসব্জী সাধারণতঃ বাড়ীর দাস-দাসীর জন্য আজকাল রান্না করিতে দেওয়া হয়। যাহা হউক যাঁহারা এই সকল শাকসব্জী বাড়ীতে খাইতে নারাজ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত হোটেলে গিয়া উচ্চ মূল্য দিয়া 'স্যালাড্' খাইয়া থাকেন, কারণ ইহা "সাহেবী শাক"। হয়ত যখন সাহেবেরা পুঁইশাক, কল্‌মিশাক ইত্যাদি স্যালাডের মত আদর করিয়া খাইবেন, আমাদেরও তখন এই সকল শাকের জন্য রুচি আবার বাড়িবে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে টাট্‌কা শাকসব্জীতে (leafy vegetables) কোন-না-কোন প্রকার ভাইটামিন বিদ্যমান আছে।

কতকগুলি শাকসব্জী

ওলকপি

যাহা হউক, বর্ত্তমান খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে এবং বিশেষতঃ সকল জিনিসের দুর্ম্মূল্য হেতু পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বাড়ীতে (অবশ্য যাঁহাদের এই সুযোগ ও সুবিধা আছে) শাকসব্জীর বাগানের (Kitchen Gardening) প্রবর্ত্তন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"র বিবিধ প্রসঙ্গে "পশ্চিম বঙ্গে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার" শীর্ষক প্যারাগ্রাফে লিখিত হইয়াছে যে, "জলাশয়গুলির পাড়ে ফেলা পাঁক উৎকৃষ্ট সারের কাজ করবে ও পাড়ে নানা রকম তরিতরকারী ও ফল মূল উৎপন্ন হ'তে পারবে।" সুতরাং যাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন উপযুক্ত জমি নাই, তাঁহারা পুকুরের পাড়েও শাকসব্জীর বাগান অনায়াসে করিতে পারেন। ইহার দ্বারা গৃহস্থের আর্থিক সাহায্য যে অনেক পরিমাণে হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় বাড়ীর সংলগ্ন ৩০ × ২৫ হাত জমিতে তরিতরকারীর বাগানের একটি খুঁটি-নাটি হিসাব প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, বাড়ীর মালিক ৯।৵০ খরচ করিয়া এবং নিজের অবসরমত কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহার পরিবারের সাত জন লোকের উপযোগী শাকসব্জী (এমন কি আলু পর্য্যন্ত) উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার অবসরও বেশী ছিল না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এমন কি 'শাক-ভাত' খাইয়া জীবন ধারণের জন্যও "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা" বাংলা দেশের অধিবাসীদিগের তরিতরকারীর জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে বাংলা দেশে বিদেশ হইতে কি

পরিমাণে তরিতরকারী আমদানী করিতে হইয়াছে নিম্নের হিসাবে তাহা দেখা যাইবে। এমন কি দেশী তরকারী সীম, করলা, পটল প্রভৃতি যাহা বাড়ীর আনাচে-কানাচে উৎপন্ন হইতে পারে তাহাও বিদেশ হইতে আনিয়া আমাদের উদর পূরণ করিতে হয়।

		১৯৩৯	১৯৪০
		মণ	মণ
(১)	সীম	৩৯৬৬	৪৩৭০
(২)	বাঁধাকপি	৭০	১০৬
(৩)	ফুলকপি	৫৫৮০৩	৯৪৪৯০
(৪)	করলা	১৭১৪	৩৩৮৯
(৫)	মটর	৪৮২৪	৬৫২৩
(৬)	পটল	২৭৭	৫১৮
(৭)	বিলাতী বেগুন	৭৯২৯	৮৯৯৪
(৮)	অন্যান্য শাকসব্জী	৮২৪৩	১৪৫৪০

"আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন করুন" প্রচেষ্টার সহিত শাকসব্জীর চাষও জড়িত আছে; সেই জন্য শীতকালের উপযোগী বিলাতী শাকসব্জীর চাষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বীজ সরাসরি আসল জমিতে বপন করা যায়; আবার কতকগুলির জন্য প্রথমে বীজক্ষেত্রে বা হাপোরে চারা উৎপাদন করিয়া আসল জমিতে উহা রোপণ করিতে হয়। এই সকল শাকসব্জীর চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ, বীজক্ষেত্র প্রস্তুত, চারা উত্তোলন, চারা নাড়িয়া রোপণ প্রভৃতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত করা দরকার; সেই জন্য এই সকল বিষয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা প্রথমেই বলা হইতেছে।

ফুলকপি

(ক) বীজ সংগ্রহ

(১) জানাশোনা ও বিশ্বস্ত বীজবিক্রেতার নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত।

(২) বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীজের প্যাকেট খোলা উচিত নহে; কেননা ভিজা জলবায়ু লাগিলে বীজের জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) একসঙ্গে বীজ না কিনিয়া পর পর ফসলের জন্য যখন যে পরিমাণ বীজ বপনের প্রয়োজন হইবে, তখনই সেই পরিমাণ বীজ কেনাই ভাল। কারণ বাড়ীতে বীজ ফেলিয়া রাখিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

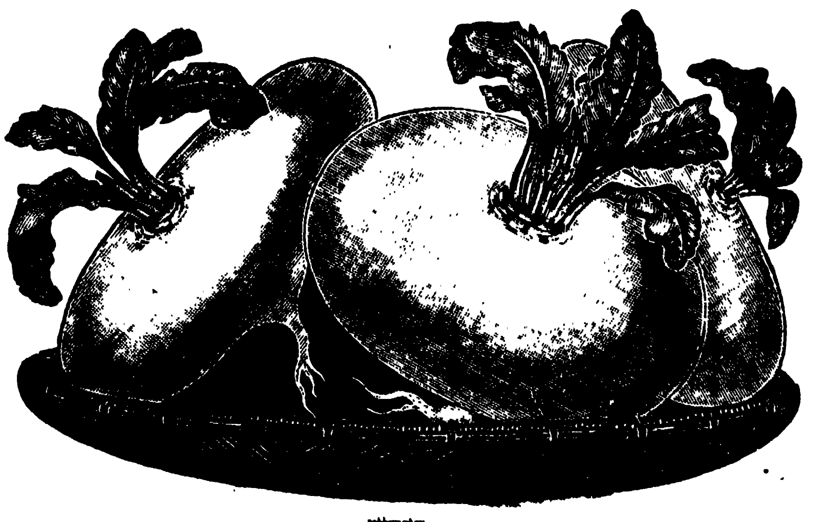

শালগম

(খ) বীজক্ষেত্র বা হাপোর প্রস্তুত

(১) বীজক্ষেত্র বা হাপোর উঁচু হওয়া উচিত, যেন উহার উপর জল দাঁড়াইতে না পারে; বীজক্ষেত্রের উপরিভাগের মাটি ৯ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট গভীর করিয়া খোঁড়া উচিত এবং উহার মাটি যেন খুব গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা

হয়। এই মাটির সহিত যেন ঘাস, জঙ্গল, গাছের শিকড়, কাঠি, পোকা-মাকড় বা তাহাদের ডিম মিশান না থাকে।

বীজক্ষেত্রের তিনটি স্তর হইলে ভাল হয়, প্রথম স্তর—(২" ইঞ্চি গভীর) ভাঙা ইট বা খোয়া; দ্বিতীয় স্তর—(৩" ইঞ্চি গভীর) ½ ভাগ এঁটেল মাটি এবং ½ ভাগ বালি; তৃতীয় স্তর অর্থাৎ উপরিভাগের স্তর (৩" ইঞ্চি গভীর) ⅓ ভাগ এঁটেল মাটি, ⅓ পচা পাতার সার এবং ⅓ ভাগ পচা গোবর।

(২) বীজক্ষেত্রটি লম্বা ১০ ফুট এবং চওড়া ৩ ফুট হইলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে বীজক্ষেত্রের এক ধারে বসিয়া নিড়ানী প্রভৃতি কাজের সুবিধা হয়।

(৩) সাধারণতঃ ১০×৩ ফুট বীজক্ষেত্রের জন্য ২½ তোলা বীজই যথেষ্ট; এবং এই পরিমাণ বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহা দ্বারা এক বিঘা জমি রোপণ করা চলিবে।

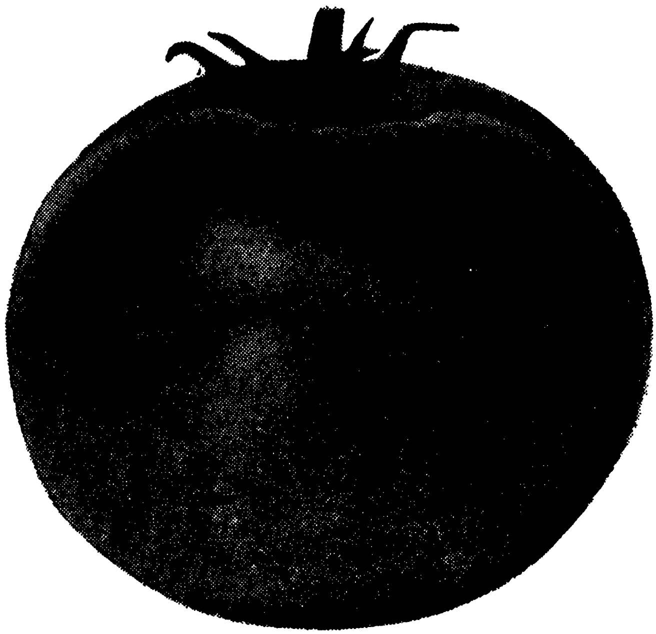

বিলাতী বেগুন

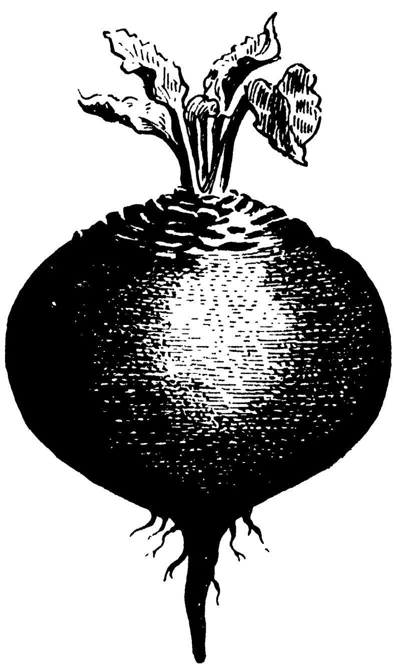

বীট

(গ) বীজক্ষেত্রে বা হাপোরে বীজ বপন

(১) একেবারে সমস্ত বীজ না বুনিয়া প্রয়োজন মত দফায় দফায় বীজ বোনা ভাল।

(২) শক্ত আবরণবিশিষ্ট বীজ হইলে বুনিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত।

(৩) খুব ছোট ছোট বীজ বুনিবার সময় বালি কিংবা ঝুরা মাটির সহিত মিশাইয়া বুনিলে ভাল হয়, কেননা তাহাতে ঠিকমত সমান ভাবে মাটিতে বীজ ছড়াইয়া পড়িবে।

(৪) রৌদ্রের দিনে বীজ বুনিতে হইলে বীজ বোনার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইয়া বীজক্ষেত্রটি ভিজাইয়া দিতে হইবে; আবার যদি বীজক্ষেত্রের উপরের মাটি খুব ভিজা থাকে তাহার সহিত শুকনা গুঁড়া মাটি মিশাইয়া লইতে হইবে।

(৫) পাতলা করিয়া বীজ বপন করা উচিত। কেননা ঘন করিয়া বুনিলে চারাগাছ দুর্ব্বল হয়।

(৬) সন্ধ্যার কিছু আগে বীজ বোনাই উচিত।

(৭) বীজক্ষেত্রের উপর বীজ ছিটাইয়া উহার উপর পাতলা করিয়া মিহি মাটি ছিটাইয়া আস্তে আস্তে হাত দিয়া চাপিয়া দিতে হয়।

(৮) রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বীজক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য উহা চাটাই দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

(৯) বীজক্ষেত্র ভিজা রাখিবার জন্য অল্প পরিমাণ জল ছিটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(১০) বীজক্ষেত্রের চারিদিকে কাঠের ছাইয়ে সামান্য কেরোসিন তৈল মাখাইয়া উহা ছড়াইয়া রাখিলে পোকামাকড় দূরে থাকে এবং গুঁড়া রেড়ির খইল ছিটাইয়া দিলে পিঁপড়ার দ্বারা বীজ সরাইয়া ফেলা বন্ধ হয়।

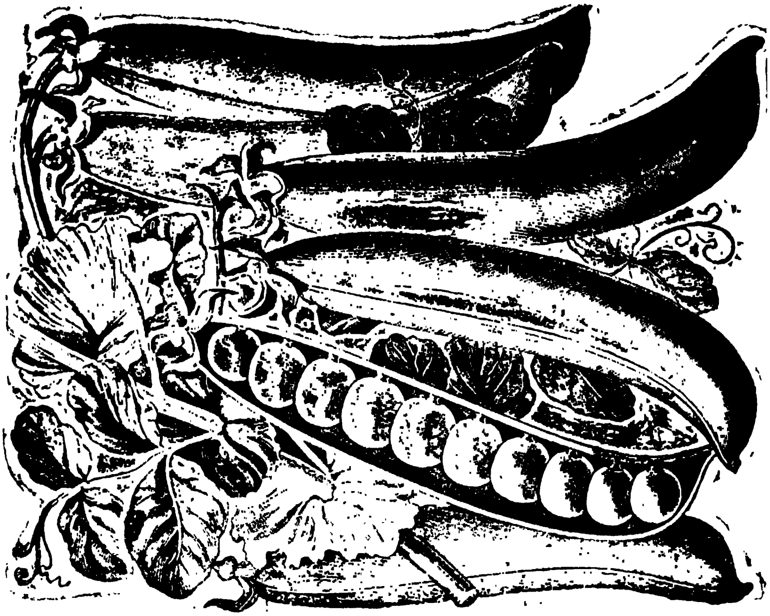

মটরশুঁটি

(ঘ) চারাগাছের যত্ন

(১) বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে রাত্রে যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে, সন্ধ্যার সময়ে বীজক্ষেত্রের ঢাক্‌না খুলিয়া রাখা উচিত এবং পরের দিন সকাল ৮৷৯টার সময় আবার বীজক্ষেত্রের উপর ঢাক্‌না দেওয়া প্রয়োজন।

(২) চারাগাছের বৃদ্ধির পক্ষে রৌদ্র ও বাতাস বিশেষ দরকার। ইহা না পাইলে গাছগুলি সতেজ হইতে পারিবে না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে প্রখর উত্তাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(৩) খুব সাবধানের সহিত চারাগাছগুলিতে জল সেচন করিতে হইবে, যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায়। অল্প অল্প বৃষ্টি চারাগাছের বাড়িবার পক্ষে খুবই ফলপ্রদ। জমির আর্দ্রতার উপরই জল-সেচন নির্ভর করে; প্রত্যেক দিন অল্প করিয়া জল সেচন অপেক্ষা দুই-তিন দিন অন্তর বীজক্ষেত্রকে ভাল করিয়া ভিজাইয়া দিলেই ভাল হয়। জল সেচনের পক্ষে সকাল ও বিকালবেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। মনে রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত জলসেচন চারাগাছের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর।

গাজর

(ঙ) চারাগাছকে এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা

(১) চারাগাছগুলি যখন ১½" ইঞ্চি লম্বা হইবে তখন সেগুলিকে অপর আরেকটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং এক ইঞ্চি অন্তর পুঁতিতে হইবে। পুঁতিবার পূর্ব্বে বীজক্ষেত্রটি ভিজাইয়া লওয়া উচিত। বীজক্ষেত্র হইতে চারাগাছগুলিকে যেন কখনই টানিয়া না তোলা হয়। সকল সময়ে এমন ভাবে তুলিতে হইবে যাহাতে শিকড়ের সঙ্গে খানিকটা মাটি উহাতে লাগিয়া থাকে।

(২) নূতন স্থানান্তরিত চারাগাছগুলিকে সূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

(৩) চারাগাছগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে বিকালবেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

(৪) সপ্তাহে দুই বার কি তিন বার জলসেচন করা প্রয়োজন এবং ইহা অতি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে করা উচিত।

(৫) দশ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে চারাগাছগুলিকে পুনরায় অপর আরেকটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং স্থানান্তরিত করিবার সময় উপরোক্ত যত্ন ও সতর্কতা লইতে হইবে। এই সময়ে উহাদিগকে এক ইঞ্চির বেশী তফাতে পুঁতিতে হইবে, যাহাতে পাতাগুলি বাড়িবার জন্য উপযুক্ত স্থান পায়। ফুলকপির চারাগাছগুলিকে এই ভাবে দুই বার স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক; উত্তম ও পরিপুষ্ট শস্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দরকারী।

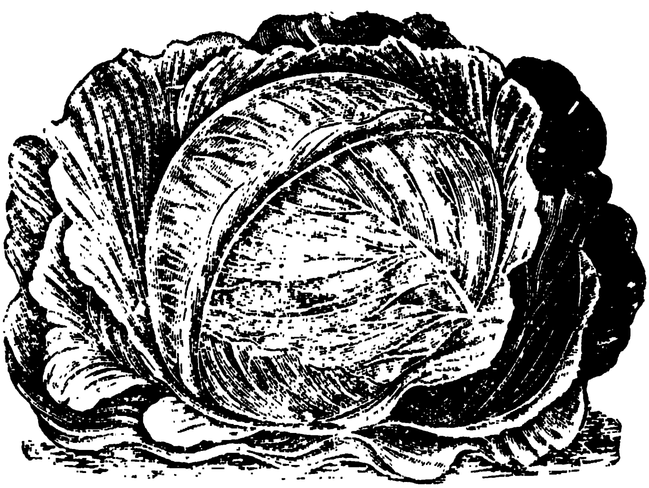

বাঁধা কপি

(৬) পূর্ব্বের ন্যায় জলসেচন করিতে হইবে। তবে এই সময়ে চারাগাছগুলির পক্ষে আরও বেশী সূর্য্যালোক ও বাতাসের প্রয়োজন।

(৭) চারাগাছগুলি যখন চার ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে, তখন যে জমিতে উহারা শস্যাকারে জন্মাইবে সেই জমিতে নাড়িয়া পুঁতিতে হইবে। স্থানান্তরিত করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত রূপ যত্ন লইতে হইবে। চারাগাছের শিকড় ও খানিকটা কাণ্ড প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া সোজা লাইনে চারাগাছগুলিকে পোঁতা দরকার এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব এইরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সহজেই জলসেচনের জন্য নালা তৈয়ারী করিতে পারা যায় এবং শস্য বাড়িবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

(৮) স্থানান্তরিত করিবার পর শিকড়গুলিকে মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবার জন্য জলসেচনের প্রয়োজন এবং জমির আর্দ্রতার উপরই পরবর্ত্তী জলসেচন নির্ভর করে।

(৯) চারাগাছগুলিকে সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহাদিগকে কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

(১০) সর্ব্বদাই দুর্ব্বল চারাগাছ সরাইয়া সেই স্থানে সবল চারাগাছ পোঁতা দরকার।

শাকসব্জীর পক্ষে উপযুক্ত জমি

(১) শাকসব্জীর পক্ষে দোঁয়াশ মাটিই উপযুক্ত। চারাগাছগুলি স্থানান্তরিত করিয়া পুঁতিবার পূর্ব্বে গোবর সার ও অন্যান্য সার দিয়া জমি খুব ভাল করিয়া তৈয়ারী করা উচিত।

(২) সব্জী বাগান জলাশয়ের নিকটে হওয়া উচিত যাহাতে জল-সেচনের সুবিধা হয়। বাগানের আকার অনুযায়ী সব্জীক্ষেত ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া লইলে ভাল হয়।

(৩) সব্জীক্ষেতের মাটি নিড়ানি দিয়া আলগা করিয়া রাখা দরকার। সব্জীক্ষেতে যেন ঘাস, জঙ্গল, আগাছা না থাকে।

(৪) প্রতি বৎসর একই সব্জী একই জমিতে বপন করা উচিত নহে।

(৫) উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন ও সারের উপরই শাকসব্জী চাষের সফলতা নির্ভর করে।

বাড়ীর সংলগ্ন অল্প জমিতে যাঁহারা শাকসব্জীর চাষ করিতে চান তাঁহাদের সুবিধার জন্য নিম্নের তালিকায় কয়েকটি শাকসব্জীর রোপণের সময়, বীজের পরিমাণ, রোপণ প্রণালী ইত্যাদি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল।

নাম	রোপণের সময়	বীজের পরিমাণ	রোপণ প্রণালী
বিলাতী সীম	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	৮০ ফুট লম্বা একলাইনের জন্য, এক পাউণ্ড	সরাসরি জমিতে এক ফুট অন্তর লাইনে ৩″ ইঞ্চি গভীর নালিতে ৯″ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়; গাছ লতাইয়া যাইবার জন্য ঠেক্‌না দিতে হয়। ইহার গাছ ৭।৮ ফুট লম্বা হয়; ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যে ফল ধরে।
বীট	„	৫০ ফুট লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স	সরাসরি জমিতে কিম্বা বীজক্ষেত্রে চারা রোপণ করিয়া ১ ফুট অন্তর বীজ বা চারা রোপণ করিতে হয়।
বাঁধাকপি	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি	৬ বর্গগজ জমির জন্য ১ আউন্স বীজ	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়। কয়েক দিন চারা গাছগুলিকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। মাঝে মাঝে নিড়াইয়া ও মাটি আল্‌গা করিয়া দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোন কাজ নাই। বাঁধিয়া উঠিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।
ফুলকপি	আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	১০০ ফুট লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স	ইহার চাষ ঠিক বাঁধাকপির মত; যখন ফুল বেশ বাঁধিয়া উঠে তখন ইহার চারিদিকের কয়েকটি পাতা ভাঙিয়া উপরে ঢাকিয়া দিলে ফুল নরম থাকে ও বিবর্ণ হয় না।
গাজর	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	১০০ ফুট লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স	সরাসরি জমিতে ১ ফুট অন্তর লাইনে ১ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়।
ওলকপি	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	৬ বর্গ গজের জন্য ২ আউন্স বীজ	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া আসল জমিতে এক ফুট অন্তর লাইন করিয়া এক ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়।
লেটুস বা স্যালাড	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি	১০০ ফুট লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স বীজ	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া আসল জমিতে ১ ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়।
পিঁয়াজ	আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	১০০ ফুট লম্বা এক লাইনের জন্য এক আউন্স বীজ	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া বা সরাসরি জমিতে ৬″ হইতে ৯″ অন্তর চারা বা গেঁড় বপন করিতে হয়।
মটরশুঁটি	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি	১০০ ফুট লম্বা লাইনের জন্য এক পাউণ্ড	সরাসরি জমিতে ৬″ হইতে ৯″ অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। ঠেক্‌না আবশ্যক।
বিলাতী বেগুন	আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মারামাঝি	১০০ গজ লম্বা লাইনের জন্য অর্দ্ধ আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২।০ ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়। প্রথম অবস্থাতেই প্রত্যেক গাছে ঠেক্‌না দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে পাশ হইতে ডাল পালা বাহির হয় এবং তাহাতে ফল ধরিলে তাহার ভারে সমস্ত গাছটি মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ডাঁটা এবং পাতার ডগায় ফেঁক্‌ড়ি বাহির হইলে উহা ভাঙিয়া দেওয়া আবশ্যক।
শালগম	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি	৮ বর্গগজের জন্য এক আউন্স	সরাসরি জমিতে ৯″ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়।

বিঘাপ্রতি এই সকল শাকসব্জীর বীজের পরিমাণ এইরূপ—বিলাতী সীম—৩ পাউণ্ড; বীট্—২ পাউণ্ড; বাঁধাকপি, ফুলকপি ও ওলকপি—৩ হইতে ৪ আউন্স; গাজর ৩ পাউণ্ড; লেটুস—১ আউন্স; পিঁয়াজ—½ পাউণ্ড; মটরশুঁটি—১৬ পাউণ্ড; বিলাতী বেগুন—২ আউন্স; শালগম—১ পাউণ্ড।

[ছবির ব্লকগুলি গ্লোব নার্শারির সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। —লেখক]

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম-এ, এফ সি এস, এম সি এস

ঢাকা শহর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রথযাত্রার পরে ঢাকায় দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম করিলে ঢাকার নবাব-বাহাদুরের চেষ্টায় দাঙ্গা বাধিতে পারে নাই। তিনি শহরের নানা স্থানে সভা-সমিতি করিয়া মহল্লার সর্দ্দারগণকে আপন আপন মহল্লার শান্তি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া ঢাকাবাসিগণকে ঐ সময়ে দাঙ্গার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, দোল-উৎসবের পরে ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তাহাতে ব্যক্তিগত প্রভাব মোটেই কার্য্যকরী হয় নাই। বাহিরের নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা থামাইতে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণকে লইয়া তখন যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, সেই কমিটি দাঙ্গা থামাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দাঙ্গা থামাইতে পারেন নাই। সরকারী প্রচেষ্টাও অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু দাঙ্গা থামে নাই। দীর্ঘ ছয় মাস দাঙ্গা চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শহর শান্ত হইলেও ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঢাকার লোকের ধন প্রাণ কখনও নিরাপদ ছিল না। ঢাকা শহরের লোক ধনে প্রাণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যে লাঞ্ছনা পাইয়াছেন, কোন দাঙ্গায় তাহাদের ভাগ্যে এত লাঞ্ছনা ঘটে নাই।

ঢাকা-দাঙ্গা-তদন্ত-কমিটিতে দাঙ্গার হেতু সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এবং গবর্ণমেণ্ট যে বিবৃতি দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি; তদন্ত-কমিটি দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমরা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, ঢাকার কোন এক পাড়ায় কোন এক হিন্দু এবং কোন এক মুসলমানের মধ্যে যে কোন কারণেই হউক, ঝগড়া বাধে এবং সেই ব্যক্তিগত ঝগড়া সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিয়া সমগ্র শহরে ব্যাপ্ত হয় এবং ঢাকার দাঙ্গার দৃষ্টান্তেই নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুর অঞ্চলের শত শত গ্রামে দাঙ্গা বাধান হয়। ঐ দুইটি লোকের মধ্যে যদি ঝগড়া না হইত, তবে হয়ত ঢাকায় দাঙ্গা বাধিত না; ঢাকায় যদি দাঙ্গা না ঘটিত, তবে হয়ত রায়পুর অঞ্চলের সহস্র সহস্র নরনারীর সর্ব্বনাশ হইত না, ইহা কি আমরা ধরিয়া লইতে পারি না? দাঙ্গার হেতু, অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য কতখানি ব্যাপক ছিল, বাংলার রাজনীতির ভিতরে তাহা শিকড় মেলিয়াছিল কি না, এই বিষয়ের বিচার-বিবেচনার কোন মূল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের মূলদেশে একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে, সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিতে পারিলে চারি দিকে নিদারুণ বাতাস থাকা সত্ত্বেও আর অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে পারে না—ইহা কি আমরা অস্বীকার করিব?

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার মধ্যকালে আমরা কলিকাতার এক দৈনিক পত্রে একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলাম। প্রস্তাবটির মর্ম্ম ছিল এইরূপ:—(১) কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে প্রত্যেক পাড়ায় (এক বা একাধিক লেন, ষ্ট্রীট, রোড, গলি) পাড়ার কয়েক জন বিশিষ্ট লোক লইয়া সাবকমিটি গঠন করিতে হইবে (অবশ্য শহরে কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হইয়াছিল)। পাড়ার যুবকগণ সাবকমিটির সাধারণ সদস্যরূপে সাবকমিটির এলাকায় শান্তিরক্ষার কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের একটা সরকারী মর্য্যাদা থাকিবে এবং তাঁহাদের কার্য্য সরকারীভাবে স্বীকৃত হইবে। পুলিস তাঁহাদিগকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবে। (২) দাঙ্গা থামিয়া গেলেও কমিটিগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হইবে না; কিছু কালের জন্য স্থায়ী রাখিতে হইবে। যদি দুই সম্প্রদায়ের দুইটি লোক কোন স্থানে এরূপ ঝগড়া বাধায় যাহা সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিতে পারে, তবে সেই স্থানের সাবকমিটি তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিবেন। কোন প্রকারেই স্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দিবেন না।

বিগত ২২শে জুন ঢাকায় যে দাঙ্গা বাধে, তাহা দমন করিবার কার্য্যে আমাদের এই প্রস্তাবের প্রথম অংশ ভিন্ন আকারে কার্য্যকর হইতে দেখা গিয়াছে।

ইদানীং শহরে যে এ. আর. পি গঠন করা হইয়াছে, তাহার লোকদিগকে বিগত ২২শে জুনের দাঙ্গায় আহ্বান করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পাড়ার এ. আর. পি-র লোক, তাহাদের ওয়ার্ডেন, তাহাদের এ. আর. পি. অফিসের পরিচালনায় প্রত্যেক পাড়ার শান্তিরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দাঙ্গাকারিগণ শহরের বাহির হইতে আসে না। তাহারা শহরেরই লোক। তাহারা এ পাড়ার, নয় ও পাড়ার।

তাহাদের আত্মীয়, পরিচিত, তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর কেহ যদি তাহাদের পাড়ার শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হন, তবে তাহাদের দুষ্কার্য্যের সুযোগ আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। পুলিসকে ফাঁকি দেওয়া যায় (অধিক সংখ্যায় তাহারা অ-বাঙালী বলিয়া আরও বেশী সুবিধা হয়)। তাহারা পাড়ার কাহাকেও চিনে না, পাড়ার অলিগলি জানে না। কিন্তু ঐ লোককে ফাঁকি দেওয়া যায় কি করিয়া? পাড়ার লোক পাড়ার শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পাড়ার সর্ব্বসাধারণ যাহাতে তাহাদের কার্য্যের সুনাম নষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেই সাহায্য তাঁহারা আন্তরিকভাবেই করেন। বিগত ২২শে জুন পাড়ার এ. আর. পি-র লোকদিগকে যখন পাড়ার শান্তিরক্ষাকার্য্যে আহ্বান করা হইল, তখন পাড়ার আবহাওয়াই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেখা গেল, পাড়ার লোকের মানসিক ভাব মোটামুটি প্রশান্ত। দাঙ্গার আলোচনায়, স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের ক্ষতির আনুপাতিক হিসাব লইয়া আসর জমাইবার কাহারও রুচি নাই। দেখা গেল, পাড়ার এ. আর. পি-র লোকের প্রতি পাড়ার সকলেরই একটা শ্রদ্ধা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের কার্য্যের সুনামে-দুর্নামে সকলেই যেন সতর্ক, তাঁহাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় সকলেই যেন কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠান্বিত। এই অবস্থার ফলে কি হইল? চতুর্থ দিনে দাঙ্গা থামিয়া গেল। পুলিস এবং সৈন্যবাহিনী এ. আর. পি-র লোকদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া তাহাদের যে শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাড়ার এ. আর. পি-র লোকের সহিত পাড়ার লোকের হৃদয়ের যে যোগ আছে, পুলিসের সহিত পাড়ার লোকের সে প্রকার যোগ থাকিতে পারে না। আমরা ইহা বলিবই যে, ২২শে জুনের দাঙ্গায় পাড়ার এ. আর. পি-র লোকই পাড়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার কার্য্য বেশীর ভাগই করিয়াছেন। যখন এ. আর. পি-র লোকদিগকে উঠাইয়া লওয়া হইল, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিস থাকা সত্ত্বেও শহরের লোক স্বচ্ছন্দভাবে রাস্তায় চলিতে সাহস পান নাই, এ. আর. পি-র লোক না দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে পথে চলিয়াছেন, ইহা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সেই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশকে কার্য্যকর করিতে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহাতে দুই সম্প্রদায়ের দুই জনের মধ্যে এরূপ ঝগড়া না বাধে, যাহাতে শহরের শান্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে—ঝগড়া বাধিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার যথাবিহিত প্রতিকার করিতে এ. আর. পি অফিসের ওয়ার্ডেন এবং তাঁহাদের লোকজন সম্পূর্ণ রূপেই সক্ষম। তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের স্ব-স্ব পাড়ার এই কার্য্য এত সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, যাহা পাড়ার বাহিরের লোক দ্বারা হইতে পারে না। চাই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন এবং তাহার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। কিন্তু আসল কথা এই যে, আমরা এ. আর. পি র লোকদের কার্য্য যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিলাম, স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি? কর্ত্তৃপক্ষ এ. আর. পি-র লোকদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা শুধু ভদ্রতা প্রকাশ নয়ত? স্থানীয় লোকদিগকে স্থানীয় শান্তিরক্ষার শিক্ষা ও দায়িত্ব দিলে তাঁহারা যে সেই দায়িত্ব প্রশংসার সহিত পালন করিতে পারেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন কি? পরবর্ত্তী ৪ঠা জুলাই তারিখে ফরাসগঞ্জ এলাকায় যে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই উপলক্ষ্যে এ. আর. পি-র লোকদিগকে আহ্বান করা হয় নাই। ৭২ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন এবং পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছিল। কেহ কেহ এই নির্ম্মম ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আর কি করিতে পারেন, তাহা বলেন নাই। ইহাতেও আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

ঢাকা শহর আপাততঃ শান্ত। ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা যে ঢাকাবাসীদের নাই, তাহা নহে। কিছু দিন পূর্ব্বেও আবার দাঙ্গা বাধিবে বলিয়া এক গুজব উঠিয়াছিল। ঢাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষতি ও লাঞ্ছনা সহ্য করিবার আর ক্ষমতা নাই। আমরা এ. আর. পি-র লোকদের সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, সে-সম্বন্ধে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা সহসা উগ্র হইয়া উঠিতে পারে, নাও উঠিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকিতে হইলে বাঁধাধরা রাস্তায় চিন্তা না করিয়া অপর রাস্তায় কি চিন্তা করা যায় না? একই যন্ত্রকে কত ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে, অন্ততঃ ইহাও একটা চিন্তা করিবার বিষয় নহে কি? ঢাকায় অথবা বাংলার আর কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাই-বা হইল। কিন্তু ২২শে হইতে ২৫শে জুন, এই চারি দিনে ঢাকার দাঙ্গার মধ্য দিয়া যে সত্য প্রকাশ পাইল, তাহাকে মামুলি ভাবে স্বীকার না করিয়া অন্তরের সহিত স্বীকার করিব না কেন?

বেকার

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

বামাচরণ দত্ত বিঘা-পঞ্চাশেক খামার জমি, হাজার-কয়েক টাকার লগ্নি কারবার এবং একমাত্র পুত্র সুকুমারকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকালে খামারে যে ধান হইত তাহাতেই সংসারের খরচ কুলাইয়া আরও উদ্বৃত্ত থাকিত এবং সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া আসল টাকা হু-হু করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে একটা মোটা অঙ্কে গিয়া দাঁড়াইল। বামাচরণ দত্তও ইতিমধ্যে কয়েকটা গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারের ইস্কুলে পড়াশুনা এক প্রকার চলিতেছিল। কিন্তু সেবার কি কারণে হেডমাস্টারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বামাচরণ ছেলেকে থার্ড ক্লাস হইতে পড়া ছাড়াইয়া বাড়ী আনিয়া বসাইলেন। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে বলিতেন—আমার ত ঐ সবেধন নীলমণি—বলি দরকারটা কি মাস্টারদের এত তাঁবেদারী ক'রে লেখাপড়া শিখে—আমার সুদের হিসেব কষার মত বিদ্যে হলেই হল। বামাচরণের এক আত্মীয় চা-বাগানে চাকুরী করিতেন। তিনি একবার তাঁহার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া বলিলেন—ছেলেটাকে না-হয় আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও বামাচরণ—সাহেবকে ধরে বাগানে একটা চাকুরী জুটিয়ে দেব। বামাচরণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন—অবস্থাটা কি সত্যই আমার এত হীন হয়ে পড়েছে যে, সেই বাঘ-ভালুকের দেশে পাঠাব টাকার লোভে। সুকুমার আমার বেঁচে থাক—পরের গোলামী তাকে করতে হবে না কোন দিন।

বৎসর-পাঁচেক হইল বামাচরণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সেদিন আর নাই। খামার জমিগুলা খাল নালা সব মজিয়া যাওয়ায় একেবারে জলা পড়িয়া গিয়াছে—যেখানে ধানচাষ হইত, সেখানে এখন চৈত্র মাসেও এক বুক জল জমিয়া থাকে। লগ্নি কারবার একেবারে সুদ-সমেত অতল জলে তলাইয়া গিয়াছে। খাতকেরা কেহ একটি পয়সাও দিবার নাম করে না—দিবার সামর্থ্যও কাহারও এক প্রকার নাই। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহারা হয় ঋণ-সালিশীতে গিয়াছে, না-হয় দেউলিয়া নাম লিখাইয়াছে। সুকুমারের সিন্দুকের ভিতরে পড়িয়া পচিতেছে শুধু এক তাড়া দলিলপত্র। গ্রামের এক প্রান্তে রেলের জংশন স্টেশন। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যে রেলপথ তাহারই পাশে গ্রামটির অবস্থান। এখান হইতে অন্য একটি শাখা-লাইন বাহির হইয়া একেবারে যশোহর জেলার প্রান্ত সীমানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই ছোট স্টেশন হইলেও স্থানটি অনেক সময়ই জনমুখর থাকে। স্টেশনের এক প্রান্তে একটি চায়ের স্টল। সকাল সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনই একখানা ট্রেন কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দের দিকে যাইবে, কাজেই স্টেশনটি ইহারই মধ্যে বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। সুকুমার এদিক ওদিক চাহিয়া স্টলের ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—এক কাপ চা কর না ভাই হারাধন—যে শীত, একেবারে জমে গেছি।

হারাধন কিন্তু একবার ফিরিয়াও তাকাইল না—টুলের উপরে বসিয়া দূরে মাঠের দিকে তাকাইয়া পা নাচাইতে লাগিল।

পাশের উনুনে জল সিদ্ধ হইতেছিল—সুকুমার একবার সেদিকে, একবার চায়ের কাপের দিকে তাকাইয়া পুনরায় আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—শুনছিস হারাধন? হারাধন এবার মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল—কি শুনবো?

—একটু চায়ের কথা বলছিলাম।

—আমি কি জানি তার, যাও না ঠাকুরদার কাছে, শুনে এস, দিতে বলে দেব—আমার কি?

ঠাকুরদা যিনি, তিনিই স্টলের মালিক—হারাধন মাহিনা-করা চাকর মাত্র। ঠাকুরদা দূরে একটি বড় বাক্সের উপরে কম্বল মুড়ি দিয়া তখনও শুইয়া ছিলেন। কথা শুনিয়া মুখের কম্বল সরাইয়া দুই-এক বার মিট্ মিট্ করিয়া সুকুমারের দিকে তাকাইয়া চেঁচাইয়া জবাব দিলেন—না, আর বাকী দেওয়া হবে না সুকুমার বাবু, আপনার হিসেবে সোয়া সাত আনা বাকী হয়ে গিয়েছে। হারাধন খাতাটা একবার সুকুমারবাবুকে দেখাতো।

হারাধন হিসেবের খাতাখানা বাহির করিতেছিল—সুকুমার বাধা দিয়া বলিল—আর কাজ কি টানাটানিতে—যা হয়েছে সে ত জানিই।

ইতিমধ্যে গাড়ী আসিবার সময় প্রায় হইয়া আসিল। ঠাকুরদা উঠিয়া বসিলেন এবং হারাধন কেৎলীতে করিয়া কয়েক কাপ চা তৈরি করিয়া লইয়া গাড়ীর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। হারাধন বাহির হইয়া গেলে ঠাকুরদা নিজে আসিয়া স্টলে দাঁড়াইলেন। গাড়ীখানি এখানে দশ-বারো মিনিট দাঁড়ায়, সেই অবসরে অনেক যাত্রী নামিয়া চা পান করিয়া যায়। কয়েক জন চা-পিপাসু স্টলের দিকে আগাইয়া আসিতেই সুকুমার একেবারে তৎপর হইয়া উঠিল—এই যে স্যার, আসুন স্যার, ভাল চা, গরম চা। বলিয়া লোহার চেয়ার কয়খানা আগাইয়া দিতে লাগিল। ঠাকুরদা চা তৈরি করিতে লাগিয়া পড়িয়াছেন। আজ একটু ভিড় যেন বেশী।

মাত্র দশ-বারো মিনিটের ব্যাপার, ইহারই মধ্যে এতগুলো লোককে পরিবেশন করিতে হইবে—হিসাব করিয়া পয়সা লইতে হইবে। ঠাকুরদা ডাকিলেন, "সুকুমারবাবু!" সুকুমার একেবারে তৎপরতার সহিত আগাইয়া গেল। "কাপ কয়টা যদি দয়া ক'রে একটু তাড়াতাড়ি ধুয়ে দিতেন— একা একা পাচ্ছি নে ভাই।"

সুকুমার জবাব দিল—এই দিলাম ব'লে—এক মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কয়েক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কোন ভয় নাই স্যার, আরও পাক্কা দশটা মিনিট সময় আছে—নিশ্চিন্ত মনে চা খেয়ে গাড়ীতে যেতে পারবেন।

গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হারাধন ফিরিয়া আসিল। ঠাকুরদা পয়সার হিসাব করিতে করিতে বলিলেন—তোমার কেৎলীতে কিছু আছে নাকি হারাধন? হারাধনের কেৎলীতে তখনও কাপ-দুই চা অবশিষ্ট ছিল। ঠাকুরদা বলিলেন—দাও সুকুমারবাবুকে, বড় দেখে এক কাপ ঢেলে দাও। সুকুমার পরম আরামে চায়ের কাপে চুমুক দিয়া একবার আড়চোখে হারাধনের দিকে তাকাইয়া বলিল—বিস্কুট-টিস্কুট কিছু আছে হারাধন, দিতে পার একখানা? ঠাকুরমশায় একখানা বিস্কুট সুকুমারের প্লেটের উপরে তুলিয়া দিলেন। চা পান করিয়া সুকুমার যখন স্টেশন হইতে বাহির হইল তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছু দূর আসিয়া একটা বড় বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ডাকিল—রমণী কাকা বাড়ী আছেন?

ঘরের ভিতর হইতে জবাব আসিল—কে?

—আজ্ঞে আমি সুকুমার। রমণীমোহন বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—এস ব'স। কিছুক্ষণ ধরিয়া নানা গল্পের পর সুকুমার অতি সন্তর্পণে বলিল—একটা দায়ে পড়ে এসেছি কাকা। রমণীমোহন জিজ্ঞাসু মুখে তাহার দিকে তাকাইলেন। সুকুমার বলিল—গোটা-দশেক টাকা আমায় হাওলাত দিতে হবে, মেয়েটা আজ কয় মাস ধরে কালা-জ্বরে ভুগছে—ডাক্তার বলছে ইনজেকসান দিতে—অথচ হাতে একটা পয়সা নাই। বড় কষ্টে আমার দিন কাটছে কাকা, কিছু রোজগার নাই—একেবারে বেকার ব'সে আছি।

রমণীমোহন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু বামাচরণদা ত কম রেখে যান নি শুনেছি, তাঁর তেজারতি কারবারের কথা ত এ অঞ্চল-প্রসিদ্ধ হে। সুকুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি ত দেশে থাকেন না কাকা, কিছু কি আর আছে তার? তেজারতির এক পয়সা আর আদায় হয় নি—দলিলপত্র সব এখন তামাদি—যে খামার জমিতে সম্বৎসরের খোরাকীর ধান হ'ত, সে সব এখন জলের তলে। রমণীমোহন সহানুভূতির সুরে বলিলেন—তাই নাকি হে—জানতাম না ত—কতকাল দেশছাড়া। কিন্তু নিজে একটা কিছু দেখে শুনে কর না কেন?

—অনেক খুঁজেছি কাকা, একটা পনর-বিশ টাকা মাইনের চাকুরীও যদি পেতাম!

—চাকুরী—চাকুরী! তোমরা কেবল শিখেছ ঐ এক কথা, জান—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—লেগে যাও দেখি। তোমরা সব আজকালকার ছেলে—পরিশ্রমবিমুখ! জান আমি যখন বনগাঁ ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাস্টার হয়ে যাই, তখন তিসির ব্যবসা করেছিলাম। অবশ্য লাভ আমার হয় নাই—আমি ঠিকই বুঝেছিলাম কিন্তু ডোবালে আমাকে ছোট্টলাল ব'লে এক ছাতুখোর। ব্যস লেগে যাও দেখি দুর্গা ব'লে।

—কয়েক বার চেষ্টা যে না করেছি তা নয় কাকা—একবার কিছু পাটের দালালী করলাম, কিছু ধনে চালান দিলাম, কিন্তু অল্প মূলধনে কিছু হবার উপায় নেই—লাভ-আসল সব সংসার খরচেই ফুরিয়ে যায়।

—ঐ ত দোষ বাপু, বাবুগিরি—বিলাসিতা ছাড়—

সুকুমার বলিল—আজ্ঞে বিলাসিতা নয় কাকা—দু-মুঠো যে ভাল ক'রে খেতেই পাই না! রমণীমোহন বলিলেন—কিন্তু তাই ব'লে এমন করে ব'সে থাকবে নাকি?

সুকুমার অনেকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল—বেশ আসুন না আপনি এখন ত দেশেই থাকবেন। আপনি অভিজ্ঞ লোক—মূলধন দেবেন, বুদ্ধি দেবেন—আমি খাটবো।

—আর এই শেষ বয়সে—আবার আমাকে কেন বাপু! এখন কি আর সেদিন আছে—তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা! বলিয়া তিনি এক দম চুপ করিলেন।

তাহার কথাটি নানা আলোচনার নীচে তলাইয়া যায় দেখিয়া সুকুমার পুনরায় কহিল—কিন্তু আমার কথাটি কাকা?

রমণীমোহন পুনরায় না জানার মতো মুখ করিয়া কহিলেন—কিসের?

—আজ্ঞে টাকা কয়টির কথা বলছিলাম।

—তুমি যেমন পাগল সুকুমার—টাকা কি আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি? যা-কিছু আছে সব ব্যাঙ্কের খাতায়! তা হ'লে এখন এস বাবাজী, আমার আবার চট্ ক'রে একটু বেরুতে হবে, বুঝলে না নানা ঝঞ্ঝাট—তারা—তারা—ব্রহ্মময়ী-মা—বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

২

পথে বাহির হইয়া সুকুমারের পা আর চলিতে চাহিল না। সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, মেয়েটির সত্যই কালাজ্বর হয় নাই—তবে ম্যালেরিয়ায় পর পর কয়েক বার ভুগিয়া বেশ কাহিল হইয়া পড়িয়াছে—কোন বারেই এক ফোঁটা ঔষধ জোটে নাই—ভুগিয়া ভুগিয়া আপনিই সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজকালের মধ্যে তাহাকে যে কিছু যোগাড় করা একান্ত প্রয়োজন। একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে তাহারা স্বামী স্ত্রী দুইজন মোট এই পাঁচটি প্রাণীকেই যে আগামী কল্য হইতে উপবাস করিতে হইবে। সুকুমারের বয়স, এই বৎসর ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে—অথচ ইহারই মধ্যে তাহার মাথার চুলের অনেকগুলিতে পাক ধরিয়াছে—মুখের চামড়া উঠিয়াছে শিথিল হইয়া—সে যেন চল্লিশের কাছাকাছি গিয়া পৌছিয়াছে। টাকার অভাবে ছোট ছেলেটির রোজের দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর যাই হোক অন্ততঃ ছেলেটির জন্য আধ সের দুধ না হইলে ত কোনক্রমেই চলিবে না—কিন্তু হাতে তাহার একটি পয়সাও নাই। সুবর্ণ হয়ত তাহার পথ চাহিয়া আছে, সে দুধ লইয়া গেলে ছেলেকে খাওয়াইবে। ভয়ে ভয়ে সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না—শুধু এক পাশে মেয়েটি বসিয়া খেলা করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। সুকুমার মেয়েটিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। মেয়েটি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় গেছলে বাবা? মা বাড়ী নেই, বোসেদের বাড়ী গেছে।

মেয়েটির কোন কথা বড়-একটা তাহার কানে গেল না। রমণীমোহনের নিকট সে যে মিথ্যা করিয়া তাহার অসুখের কথা কহিয়া আসিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সুকুমারের সারা অন্তর বারে বারে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই ত মেয়েটি অত্যন্ত কাহিল হইয়া গিয়াছে—পেটে প্লীহা যকৃৎ বাড়িয়া উঠিয়াছে—রোজই হয়ত একটু একটু জ্বর হয়। এমনি করিয়াই ত ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে শেষে কালাজ্বর হইয়া বসে—যদি তাহাই হয়? বাপ হইয়া এমনি অলক্ষুণে কথা সে কেমন করিয়া বলিল? তাহার দুই চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সুবর্ণের সাড়া পাইয়া সুকুমার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল। ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া হাতে একটি ঘটি লইয়া সুবর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় ছেলেটি কোলে না উঠিতে পারিয়া পিছনে পিছনে কাঁদিতেছিল। হাতের ঘটি নামাইয়া ধুপ করিয়া ছোট ছেলেটিকে সুকুমারের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল—নাও, শুধু মেয়েকে আদর করলেই বুঝি হ'ল। তার পর বড় ছেলেটিকে টানিয়া কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। সুকুমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া বলিল—ওতে কি?

—খোকার জন্যে একটু দুধ নিয়ে এলাম—বোসেদের বাড়ী থেকে চেয়ে। নাও তেল মেখে স্নান করে এস—ভাতে সেদ্ধ ভাত চাপিয়েছি—হ'য়ে গেল ব'লে, আর ব'সে থেকো না।

সুকুমার আহারে বসিলে সুবর্ণ তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—সব কপালে করে। তোমরাও ত স্বদেশী করলে, জেল খাটলে, জরিমানা দিলে। আর দেখ দেখি ও বাড়ীর বোসেদের ভাগনে সুরেনকে? গবরমেণ্ট তাকে আটকে রেখেছে আর তার মা-বউয়ের খরচা বাবদ মাসে মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে সাহায্য করছে। দেখ দেখি কপাল—এ যেন বিদেশে থেকে চাকুরী ক'রে বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছে আর কি?

সুকুমার হাসিয়া বলিল—ওদের যে বিনা-বিচারে আটকে রেখেছে কিনা তাই।

—তা হোক—তবু ত জেল। কথাটি কিন্তু সুকুমারকে পাইয়া বসিল। ইহার আগে সে এমনি করিয়া ভাবে নাই। সত্যই সুরেন বেচারা বাঁচিয়া গিয়াছে—সেও ত বাড়ীতে বেকার বসিয়া ছিল—সংসার ছিল অচল—আর এমনই বা কি গোপনে গোপনে সে দেশের কাজ

করিয়াছে? সেও যদি আজ এমনি করিয়া রাজবন্দী হইতে পারিত তাহা হইলে ত তাহার কোন ভাবনাই থাকিত না। নিজে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্ধ থাকিত—তা থাকিলই বা—বাড়ীতে ছেলেমেয়েগুলা ত সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইতে পাইত—রোগে ঔষধ পাইত। পর পর কয়েকটা দিন তাহার মনের মধ্যে এই চিন্তা অহরহ ঘুরিতে লাগিল।

৩

সুকুমার অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারিল না—এমন কি কাজ সে করিতে পারে যাহাতে সি. আই. ডি. পুলিসের দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ে। কোন নামজাদা বিপ্লবীর সহিতই কি তাহার পরিচয় আছে—সেই কয়েক বৎসর আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হুজুগে পড়িয়া জেলে গিয়াছিল—তার পর মাস দুই জেল খাটিয়া পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়া আর কখনও সে-চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই। তেমন কোন বিপ্লবীর সহিত জানাশুনা থাকিলে না-হয় কয়েকখানা রীতিমত সন্দেহজনক চিঠিপত্র লিখিয়া ফেলিত—হয়ত তাহাতেই কাজ তাহার হাঁসিল হইত।

এ অঞ্চলে এক জন নামজাদা দেশকর্ম্মী ছিলেন—তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ। তিনি অনেক সময় আপদে-বিপদে সুকুমারকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন—তাঁহার প্ররোচনায়ই এ অঞ্চলের এক দল ছেলে তখন স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এক দিন তাঁহার নিকটে গিয়া সুকুমার মনের কথা খুলিয়া বলিল। কথা শুনিয়া উপেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

—তুই বলিস কি সুকুমার—সাধ ক'রে কেউ ডেটিনিউ হ'তে চায়?

সুকুমার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—ছেলেমেয়েগুলো যে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে দাদা? আমি বন্দী থাকলে যদি কিছু কিছু ভাতা মেলে—উপেন্দ্রনাথ তাহাকে থামাইয়া দিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

সেদিন সকালবেলা সুকুমার ষ্টেশনে গিয়া শুনিল আগামী কল্য রাত্রে নাকি গবর্ণর সাহেব এই পথ দিয়া ঢাকা যাইবেন। প্রতি থানায় থানায় খবর গিয়াছে সারা-রাত্রি পুলিসবাহিনী লইয়া সমস্ত লাইন পাহারা দিবার জন্য। কথাটা শুনিবামাত্র সুকুমারের কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল—সারাটা দিন তাহার মনের মধ্যে নানা চিন্তা বারে বারে খেলিয়া যাইতে লাগিল।

*　　*　　*

সেদিন ভোরে একটি যুবক ছুটিয়া আসিয়া উপেন্দ্রনাথকে সংবাদ দিল—শুনেছেন উপেন-দা? রাত্রে সুকুমারকে পুলিসে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। সে নাকি জামার ভিতরে বোমা লুকিয়ে নিয়ে রেল-লাইনের পাশ দিয়ে ঘুরছিল। উদ্দেশ্য ছিল নাকি লাটসাহেবের গাড়ী বোমা মেরে উল্‌টিয়ে দেওয়া। রাত্রেই পুলিস তার বাড়ী ঘেরাও ক'রে রেখেছিল—এখন খানাতল্লাসী করছে। উপেন্দ্রনাথ একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সুকুমারের এই কাণ্ড! এ যে বিশ্বাসই হইতে চাহে না। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের সেই দিনের সেই প্রস্তাব তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু গোবেচারী সুকুমার কোথায় পাইল বোমা—আর এত সাহসই বা তাহার আসিল কোথা হইতে, উপেন্দ্রনাথ ভাবিয়া পাইলেন না।

পুলিসবাহিনী সুকুমারের বাড়ী-ঘর খানাতল্লাসী করিয়া সমস্ত বাক্স বিছানা ঘরময় ছড়াইয়া একাকার করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে—সুকুমারের স্ত্রী ভয়ে বারান্দার এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছে—এমন সময় উপেন্দ্রনাথ গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুকুমারের স্ত্রী দেখিয়া একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উপেন্দ্রনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া সেই দিনই মহকুমায় গেলেন—সুকুমারের কি হয় না-হয় তাহাই জানিতে।

৪

কয়েক দিনের চেষ্টায় উপেন্দ্রনাথ হাজতে গিয়া সুকুমারের সহিত দেখা করিতে সমর্থ হইলেন। সুকুমার তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—আমাকে বাঁচান দাদা—আমার অপরাধের খুব শাস্তি হয়েছে। মিথ্যে ক'রে পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ার জন্যে পটকা তৈরি ক'রে পকেটে ক'রে নিয়ে ঘুরছিলাম। উপেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখেন সুকুমারের শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে—সে ভাল করিয়া হাঁটিতেই পারিতেছে না।

ইহার পরে মাস দুই ধরিয়া জেলায় মোকদ্দমা চলিল। উপেন্দ্রনাথের তদ্বিরের ফলে পুলিস ভাল করিয়া সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না। অবশেষে মামলায় সুকুমার বেকসুর খালাস পাইল। জেল-গেটে উপেন্দ্রনাথ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুকুমার নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেল হইতে বাহির হইল। কিন্তু তাহার এ কি চেহারা হইয়াছে—তাহাকে যে আর চিনিবার উপায় নাই—শরীর শুকাইয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চোখ দুইটি কোটরের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।

ট্রেনের সময় হইয়া গিয়াছিল, কাজেই উপেন্দ্রনাথ সুকুমারকে লইয়া স্টেশনে চলিয়া আসিলেন—পথে একটা কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—জিজ্ঞাসা করিবারও কিছু ছিল না। একখানি ফাঁকা গাড়ী দেখিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুকুমার উদাস ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল—একটা কথা কহিতেও যেন তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। উপেন্দ্রনাথ প্রথমে কথা কহিলেন—তোর শরীর এমন হয়ে গেল কেন সুকুমার—জ্বর হয় নাকি রে? সুকুমার জবাব দিল—হাঁ। উপেন্দ্রনাথ তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—দেখি। এ কি, জ্বর যে তোর এখনও রয়েছে। সব সময়ই থাকে নাকি? সুকুমার বলিল—আজ দিন পনর-কুড়ি ত এই রকমই থাকছে। পরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিল—আমার মেয়েটি কেমন আছে দাদা?

—মেয়েটি বড় ভাল নাই সুকুমার—কিছু দিন ধ'রে জ্বর চলছিল—যতীন ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা ক'রে বলেছে কালাজ্বর—ইন্‌জেক্‌সান্ দেওয়াচ্ছি।

সুকুমার আর কথাটি কহিল না। কিছুক্ষণ পরে উপেন্দ্রনাথ সহসা তাহার দিকে তাকাইয়া দেখেন—সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

—এ কি তুই কাঁদছিস কেন সুকুমার?

—মেয়েটি বাঁচবে ত দাদা!

—বাঁচবে না কেন রে—কালাজ্বর হয়েছে, ইন্‌জেক্‌সান পড়ছে—এমন ত কত জনের হয়। তোর বাড়ীতে আর সব্বাই বেশ ভাল আছে। উপেন্দ্রনাথ পুনরায় কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—তুই উতলা হোস নে সুকুমার, তোর দুঃখ আমি বুঝেছি। কাল কলকাতায় যাচ্ছি—তোর জন্যে যা হোক্ একটা কিছু কাজ কোন রকমে আমাকে জোগাড় করতেই হবে। তোর দুঃখ যে সত্যিই এমন ভয়ানক হয়ে উঠেছে তা ভাবি নি।

সুকুমার চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল—আপনাকে বলার আমার কিছু নাই দাদা—শুধু ভাবছি জেল থেকে যদি আমি আর না বেরুতাম—যদি সেইখানেই আমার মৃত্যু হ'ত তা হ'লেও আমার ছেলেমেয়েদের কোন ক্ষতিই হ'ত না—আপনি তাদের বুকে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু এবার জেলে ব'সে আমি অনেক ভেবেছি দাদা—বুঝেছি দুঃখ শুধু একা আমারই নয়—আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের একটু ভাল অবস্থা যাদের তাদের ছেলেগুলোও এমনি ক'রে উড়ে উড়ে বেড়ায় কেন—বাড়ীতে তাদের বাপ-মায়ের গঞ্জনা—বাইরে বকাটে আড্ডাবাজ ব'লে বদনাম। এর পর যদি কেউ বিয়ে করে তবে তার ত কথাই নাই। নইলে আমাদের সুশীলের মত ছেলে যাত্রাদলে ঘুরে বেড়ায়—নৃপেন বাড়ী-ঘর ছেড়ে কোথায় দু-চার মাস ক'রে উধাও হয়ে থাকে—বিনয়ের বাপ-মা তাকে দিনরাত দূর দূর করে। এ সবের জন্য দায়ী কে—এর কি কোনই প্রতিকার নেই দাদা? উপেন্দ্রনাথ বলিলেন—ও-সব বড় বড় কথা আপাততঃ থাক সুকুমার—আমি কি ভাবি নি মনে করিস্, কিন্তু দু-চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় কেবল অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি ভাই। কিন্তু তুই অত খক্ খক্ ক'রে কাসছিস্ কেন সুকুমার?

সুকুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—কাস হয়েছে যে—জ্বরের সঙ্গে বুকের দুই পাশে এত বেদনা হয়েছিল যে মোটেই কাসতে পারতাম না—তার পর ক'দিন ধ'রে কি একটা ওষুধ মালিশের পর বেদনাটা কমে রইল—এখনও কাসলে টের পাই।

—আচ্ছা বাড়ী চল—যতীন ডাক্তারকে দিয়ে একবার দেখান যাবে।

পরের দিন রাত্রের গাড়ীতেই উপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কয়েক জন বন্ধু-বান্ধবকে ধরিয়া কোন খবরের কাগজের আপিসে সুকুমারের জন্য একটি দপ্তরীর কাজ ঠিক করিলেন। আপাততঃ সে পঁচিশ টাকা করিয়া পাইবে। সেদিন মেল ট্রেনখানা তাঁহাদের স্টেশনে থামিবামাত্র উপেন্দ্রনাথ হৃষ্টমনে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। প্লাটফরমের উপরে তাঁহাদের পাড়ার কয়েকটি ছেলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া ছিল—উপেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আগাইয়া আসিল।

—আপনি কি কলকাতা থেকে এলেন উপেন-দা?

উপেন্দ্রনাথ হাসিমুখে জবাব দিলেন—হাঁ রে এবার সুকুমারের জন্যে একটা চাকুরী ঠিক ক'রে এলাম।

ছেলেটি বিষণ্ণ মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—এ দিকের খবর কিছু তা হ'লে শোনেন নি দেখছি।

উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর?

—সুকুমার-দা যে গত পরশু বেলা ৩টায় মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ, নিউমোনিয়া হয়েছিল, মাত্র তিন দিনের অসুখেই সব শেষ হয়ে গেল। আবার কি আশ্চর্য্য দেখেছেন—মৃতদেহ যখন উঠানে—তখন পুলিস এসেছিল অর্ডিন্যান্সে সুকুমার-দাকে গ্রেপ্তার করতে।

উপেন্দ্রনাথের কানে আর কোন কথাই বুঝি ঢুকিল না। শুধু তাঁহার চোখের দুই কোণ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন?

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:

"আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

এর থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্র আসলে ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক ইংরেজীতে যাকে বলে humanitarian. সর্ব্বলোকে প্রীতিকেই যে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম ব'লে মনে করতেন—এবিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহের স্থান নেই। কোন্ মানুষ সত্যিকারের ধার্ম্মিক এবং কোন্ মানুষ সত্যিকারের ধার্ম্মিক নয় তার বিচার করতেন তিনি প্রেমের কষ্টিপাথরে। যে মানুষের ভালোবাসার ক্ষমতা যত বেশী, মানুষ হিসাবে সে তত বড়ো—এই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। টিকি দিয়ে আর দাড়ি দিয়ে, কণ্ঠী দিয়ে আর নিরামিষ ভোজন দিয়ে মানুষকে বিচার করতে যাওয়ার যে মূঢ়তা—তার আবিলতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদীপ্ত বুদ্ধিকে স্পর্শ করতে পারে নি। প্রকৃত বৈষ্ণবকে তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিবিধ প্রবন্ধে গৌরদাস বাবাজী বলছেন:

"যে খৃষ্টান কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর প্যায়গম্বরের পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠীকুঁড়োজালির নিরামিষের দলে যাহারা তাহা শিখে নাই তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।'

সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই যে বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা এবং সমদর্শিতার আদর্শই যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—এই সত্যের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় একেবারেই বিরল নয়। তিনি এসেছিলেন একটা নূতন আদর্শের জয়ধ্বজা উড়িয়ে আর এই আদর্শ হ'ল জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষকে আপনার মতো ক'রে দেখবার আদর্শ। এই সমদর্শিতার আদর্শকে আসনচ্যুত ক'রে যা-কিছু গৌরবের উপরে অধিকার চেয়েছে তাকে বঙ্কিমচন্দ্র আঘাত করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। বিবিধ প্রবন্ধে গৌরদাস বাবাজী পুনরায় বলছেন:

"দেখ বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়।"

বৈষ্ণবের যে আদর্শ সেই আদর্শকে আড়াল ক'রে বাহিরের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব'লে চালু হ'য়ে আসছিলো তাহাদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র দিলেন নিষ্ঠুর আঘাত। সতেজ লেখনীকে আশ্রয় ক'রে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যা প্রকৃত রূপ তাকে তিনি আবরণ-মুক্ত করলেন। মানুষের জীবনের মূল্য যে বাহিরের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে এই বিপুল সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আলোকে আর একবার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। প্রেমে সমস্ত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ব'লে যিনি ঘোষণা করলেন তিনি কেমন ক'রে মুসলমান-বিদ্বেষী হ'তে পারেন—এ কথা আমি বুঝে উঠতে পারিনে। মুসলমানও তো মানুষ—হিন্দুর মতোই চোখ-কান-হাত-পা-ওয়ালা মানুষ। বাহিরের চেহারাতেও যেমন হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য নেই মনের চেহারাতেও তাই। মুসলমানের মধ্যে মীরজাফর আছে, হিন্দুর মধ্যেও উমিচাঁদ-জয়চাঁদের অভাব নেই। আবুলকালাম আজাদ এবং আবদুল গফুর খাঁর মতো স্বদেশপ্রেমিক মুসলমানের ঘরেই জন্মেছে—পণ্ডিত জওহরলালের এবং গান্ধীর জন্ম হিন্দুর ঘরে। মানুষের মনের চেহারা মোটামুটি একই রকমের। এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা ঐক্য রয়েছে—এই ঐক্যের দিকটাই গভীরতর সত্য। সমস্ত মানুষের সঙ্গে এই ঐক্যের উপলব্ধি যার হয়েছে সে সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে আর এই মুক্তির মধ্যেই তো আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। বিশ্বের সকলকে যে আত্মীয় ব'লে মনে করতে শিখেছে সেই তো আসল বৈষ্ণব আর পরম বৈষ্ণব যে সে কি কখনো হিন্দু থেকে মুসলমানকে আলাদা ক'রে দেখতে পারে? তাই গৌরদাস বাবাজীকে যখন প্রশ্ন করা হ'ল, 'মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে' অমনি তিনি উত্তর দিলেন,

"এ কান দিয়ে শুনিস, ও কান দিয়ে ভুলিস? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।"

রাজসিংহ উপন্যাসের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন :

"হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্য রূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে মুসলমান রাজা সকল হিন্দুরাজা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ, অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ ; অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সে নিকৃষ্ট।"

উপরের কথাগুলি পাঠ করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিমা ছিল প্রকৃত বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গিমা। তিনি সমদর্শিতার আদর্শই প্রচার ক'রে গেছেন।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে যেখানে সপ্তকোটী নরনারীর কথা বলা হয়েছে সেখানে বাঙালী মুসলমানকে বাদ দেওয়া হয় নি। শুধু বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা সাত কোটী হতে পারতো না। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে তবে সাত কোটী। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ যখন জিজ্ঞাসা করলেন—'কবে মা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে দেখা দেবেন,' উত্তর এলো 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে।' বঙ্কিম মুসলমান-বিরোধী হ'লে 'সকল' কথাটার কোন মানে হয় না।

কপালকুণ্ডলায় দেখতে পাই মুসলমান রাজারা প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি একেবারেই উদাসীন ছিলেন না। রাজপথের ধারে ধারে চটির ব্যবস্থা ছিল। এই সব চটিতে পথিকেরা আশ্রয় নিতেন। এইরূপ একটা চটিতেই কপালকুণ্ডলা আশ্রয় নিয়েছিলেন। দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা মতিবিবিও নবকুমারের স্কন্ধে ভর দিয়ে চটিতেই আশ্রয় নিলেন।

ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সর্ব্বলোকে প্রীতিকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম ব'লে ঘোষণা করেছেন সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বেদীমূলেই তিনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পৌঁছে দিয়েছেন। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র যদি বৈষ্ণবই হবেন তবে আনন্দমঠে সন্তানদের হাতে কেমন ক'রে তিনি মারণাস্ত্র তুলে দিলেন ? এর জবাব বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন। 'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন তিনি শক্তিময়।' এই যে শক্তিময় ভগবান 'যিনি ইন্দ্রের বজ্রে এবং মার্জ্জারের নখে তুল্য রূপে বাস করেন'—বিষ্ণুর এই শক্তিময় দিকটাকে স্মরণ করিয়ে দেবার ভারি প্রয়োজন ছিল অধঃপতিত শৃঙ্খলিত জাতির উদ্ধারের জন্য। দুষ্টের দমন ভিন্ন ধরিত্রীর উদ্ধার সম্ভব নয়—সুতরাং দুষ্টের দমন ধর্ম্মেরই অঙ্গ। কিন্তু দুষ্টকে দমন করতে হ'লে শক্তি চাই। তাই ত বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ভগবানকে শক্তিময় মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর হাতে মোহন বাঁশরীর পরিবর্ত্তে তুলে দিলেন উদ্যত বজ্র। সন্তানকে কাপালিক না ক'রে করলেন বৈষ্ণব। বিষ্ণু ত বৃন্দাবনে কদমতলায় বাঁকা হয়ে কেবল বাঁশরী বাজান নি, তিনি রাবণ, কংশ হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিরও বিনাশ হেতু। বাঙালীর হৃদয়কে অধিকার ক'রে ছিল শুধু চৈতন্যের প্রেমময় বিষ্ণু। তাই বঙ্কিমকে বলতে হ'ল: 'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র।' জাতিকে দুষ্টের দমন-কার্য্যে অনুপ্রাণিত করবার জন্য বঙ্কিম নব্য বাংলার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন শক্তিময় বিষ্ণুকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।' সর্ব্বভূতে প্রীতির আদর্শের সঙ্গে দুষ্টকে দমন করবার আদর্শের বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। মানুষকে সত্যি সত্যি যারা ভালবেসেছে তারাই ত তাকে বন্ধনমুক্ত করবার জন্য যুগে যুগে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে করেছে বিদ্রোহ। প্রেমিক যে সেই ত বিপ্লবী হ'তে পারে। পুরাতন জগতকে ভাঙবার উন্মাদনা জাগতে পারে তাদেরই মনে যারা প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা নূতনতর জগতকে সৃষ্টি করবার জন্য বদ্ধপরিকর। রাসিয়ার কোটী কোটী সর্ব্বহারার দুঃখকে নিজেদের দুঃখ ব'লে মনে করবার মত হৃদয়ের বিশালতা ছিল ব'লেই লেনিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীর দল অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে এমন ক'রে লড়াই করতে পেরেছিলেন। ভাল যে বাসবে তার কণ্ঠ ত কখনো অত্যাচারের সামনে মৌন হ'য়ে থাকবে না। সে কণ্ঠ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেই। এই জন্যই যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণু নাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল'—সেই বঙ্কিমই আবার লিখলেন, 'প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন।' এখানে দু'য়ের মধ্যে একটা গভীর মিল রয়েছে। Christian Ideal-এর মধ্যে মার্জ্জনার দিকটাকে একান্ত বড় ক'রে দেখানো হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ দুষ্টকে দমন করবার আদর্শকে আমল দেয় না। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত Christian

Idealকে বরণ ক'রে নিতে পারে নি। Hindu Idealই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আদর্শ এক দিকে যেমন সমস্ত বিশ্বকে আত্মীয় ব'লে মনে করবার শিক্ষা দিয়েছে আর এক দিকে তেমনি দুষ্টকে দমন করবার আদর্শকেও ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতে শিখিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যীশু-চরিত্রও লিখলেন না, বুদ্ধ-চরিত্রও লিখলেন না, তিনি লিখলেন কৃষ্ণ-চরিত্র; কারণ কৃষ্ণ-চরিত্রের মধ্যে তিনি হিন্দু আদর্শের জয়ধ্বজাকে উড্ডীয়মান দেখেছিলেন।

কিন্তু আলোচনা ক্রমশঃ অবান্তরের দিকে গড়িয়ে চলেছে। যে মানবপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রকে humanitarian করেছে সেই মানবপ্রেমই বঙ্কিমকে করেছে Patriot. তাঁর কাছে Humanity আর Fatherland এর মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। এখানে ম্যাজিনিকে এবং বঙ্কিমকে আমরা একই পর্য্যায়ে ফেলতে পারি। মানুষ তখনই Patriot হয় যখন তার চেতনা বহু মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে যায়, যখন সে বলে, 'জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই বাড়ী নাই।' আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা মানুষের কাছে যতক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম ততক্ষণ সে আদর্শ-স্বামী, আদর্শ-পিতা অথবা আদর্শ পুত্র হ'তে পারে কিন্তু দেশভক্ত তাকে বলা যেতে পারে না। দেশরক্ষাকে যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম ব'লে মনে করবে তাকে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে হবে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলছেন:

"পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেইদিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?"

তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশপ্রীতির মধ্যে রয়েছে মানুষের হৃদয়ের বিস্তার। দেশের প্রতি যার মনে অনুরাগ জন্মেছে সে নিজের অথবা নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে একান্ত বড় ক'রে দেখবে না—সে বড় ক'রে দেখবে সমস্ত দেশের মঙ্গলকে। সে তার শুভ বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে পরিষ্কার ক'রে দেখতে পাবে—যতক্ষণ আমরা কেবলমাত্র নিজের নিজের গণ্ডী নিয়ে থাকব ততক্ষণ আমরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারব না আর প্রেমে যতক্ষণ আমরা এক হ'তে না পারছি ততক্ষণ জাতির মুক্তির প্রভাত দূরেই থেকে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন অত্যন্ত দূরদর্শী লোক ছিলেন। এই জন্যই ঐক্যের মধ্যে তিনি শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং শক্তির মধ্যেই মুক্তির উৎসকেও দেখেছিলেন। আমরা সবাই এক জাতির অন্তর্ভুক্ত—এই যে বোধ, এই বোধের নামই হ'ল জাতীয়ত্ববোধ আর এই দেশাত্মবোধকে জাগাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন অমর সঙ্গীত বন্দেমাতরম্। আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই, বাঙালীই হই আর মারাঠীই হই—এই ভারতবর্ষ আমাদের সকলের মা—আমাদের সকলের জন্মভূমি—এই ভাবের অভিব্যক্তিই বন্দেমাতরমের মধ্যে। দেশাত্মবোধের আদর্শকে যিনি বড় ক'রে তুলতে চান তিনি কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না—কারণ সাম্প্রদায়িকতা আমাদের ভেদবুদ্ধিকেই শানিয়ে তোলে। যেখানে ভেদবুদ্ধি উগ্র হ'য়ে উঠেছে সেখানে ঐক্যবোধ ম্লান হ'তে বাধ্য। যেখানে আমি হিন্দু, আমি মুসলমান এই বোধের তীব্রতা—সেখানে আমি ভারতবাসী এই বোধ কখনো প্রবল হ'তে পারে না। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম—এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন সেই হেতুই তিনি ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাস করতেন, এবং যেহেতু তিনি ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাস করতেন সেই হেতুই সম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন না—কারণ সাম্প্রদায়িকতা মেলায় না, বিচ্ছেদ আনে। সাম্প্রদায়িকতা এবং দেশাত্মবোধ একসঙ্গে থাকতে পারে না—যেমন আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে থাকতে পারে না।

দেশের কল্যাণ বলতে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু হিন্দুর কল্যাণও বুঝতেন না, শুধু মুসলমানের কল্যাণও বুঝতেন না—বুঝতেন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কল্যাণ। আর এই হিন্দু-মুসলমানের কল্যাণকে তিনি দেখেছিলেন দেশের সহস্র সহস্র সর্ব্বহারা কৃষকের মঙ্গলের মধ্যে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধে আছে:

"এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরে রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙা পাথরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত লুণ লঙ্কা দিয়া আধ-পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে। উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, কোন জমীদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস! সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা নাকে বাবু! উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?......

আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।

দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ, দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"

সর্ব্বহারা কৃষকদের বর্ণনা করতে গিয়ে যেখানে বঙ্কিমের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হ'য়ে উঠেছে সেখানে যে কেবল হিন্দু রামা কৈবর্ত্তের উল্লেখ আছে তা নয়। রামা কৈবর্ত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান হাসিম শেখকেও স্মরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসলে ছিলেন মানবপ্রেমিক এবং সেই জন্যই দেশপ্রেমিক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সর্ব্বহারাদের কল্যাণ কামনা অধিকার ক'রে ছিল আকাশের মত উদার তাঁর হৃদয়ের বিশালতাকে। সে বিশাল হৃদয়ে কোন রকমেরই সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না।

জাতীয়তার আদর্শকে জয়-যুক্ত করবার জন্য যিনি অক্লান্তভাবে তাঁর লেখনী চালনা করেছিলেন তাঁর কাছে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার মত প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতাও বর্জ্জনীয় ছিল। আমি হিন্দু অথবা আমি মুসলমান—এই বোধের তীব্রতা যেমন 'আমি ভারতবাসী' এই বোধকে ম্লান করে—'আমি বাঙালী অথবা আমি বিহারী' এই বোধের তীব্রতাও তেমনি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে চেতনাকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেবার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের মিলনের পথে প্রাদেশিকতার আতিশয্য একটা মস্তবড় অন্তরায়। অতএব জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতাকে বর্জ্জন করা অপরিহার্য্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি জাতীয়তার আদর্শের পতাকাতলে মিলিত হ'লে অচিরে দুঃখ-নিশার অবসান যে অনিবার্য্য—এ সত্যকে বুঝবার মত দূরদৃষ্টি বঙ্কিমের ছিল এবং সেই জন্যই 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে মহারাষ্ট্রের জাগরণ এবং শিখ জাতির অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছিলেন:—

"যদি কদাচিত কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

যেমন সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা জাতি-প্রতিষ্ঠার পথে ঘোর বাধা তেমনি অস্পৃশ্যতাও জাতি-প্রতিষ্ঠার পথে ঘোর বাধা। অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক শূদ্র—এই পার্থক্যবোধ মানুষে মানুষে আত্মীয়তাকে পরিপুষ্ট হ'তে দেয় না। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব পরিপুষ্ট না হ'লে জাতি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক শূদ্র এই ভাব যত দিন দেশে প্রবল থাকবে তত দিন 'আমরা সবাই ভারতবাসী' এই বোধ কখনো তীব্র হ'য়ে উঠবার সুযোগ পাবে না। সুতরাং দেশসেবায় যে ব্রতী হ'তে চলেছে সে কখনো জাতিভেদ-প্রথাকে মর্য্যাদা দিতে পারে না। এই জন্যই আনন্দমঠে দেখতে পাই সত্যানন্দ কায়স্থ মহেন্দ্র সিংহ এবং অপর একজনকে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা দেবার প্রাক্কালে বলছেন:

'তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।'

এর পরেও কি আমরা বলব, জাতীয়তার পুরোহিত বঙ্কিমের লেখা আমাদের ভেদবুদ্ধিকে শাণিত ক'রে তোলে?

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ডালিমফুলি বসনখানি এম্‌নি ছাঁদে প'রো,
সন্ধ্যাবেলায় আসবে যখন ফিরে';
হাল্কা হাতে কালো চুলের আল্‌গা খোঁপা ক'রো,
অন্য ভূষণ নাই প্রয়োজন শিরে।
পদ্মকরে কি কাজ, বলো, প'রে সোনার বালা?
কম্বুগ্রীবায় নাই-বা দিলে মিথ্যা মোতির মালা!

দেহের রঙে শাড়ীর রঙে এম্‌নি মেশামেশি,—
চোখ দু'টি মোর স্বপন দেখে জেগে';
শরৎ-সাঁঝের মেঘটি যেন দিনের শেষাশেষি,
সূর্য্যালোকের রক্ত আভা লেগে!

সঙ্গে তাজা অপ্‌রাজিতার নীলের সাথে মেশা
কাজল-আঁকা উজল-দিঠি চপল চোখের নেশা!

সহজ বেশে সরল হেসে এম্‌নি এসো তুমি
লজ্জা-রাগের আল্‌তা পরি' পায়ে,
রক্ত অধর ধন্য মানে কুন্দকলি চুমি',
তবু কেন মুক্তি পেতে চাহে?
উষালোকের যাত্রা তোমার জবায় ভরি' থালা,
ফিরিয়ে এনো সন্ধ্যারতির ডালিমফুলি ডালা।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা হিন্দুর সনাতন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। হিন্দু কেবল পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; নিজের এবং পরের ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা হিন্দুই জগতে প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে। অন্য ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর এই অকৃত্রিম ও অত্যধিক উদারতার সুবিধা লইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা একাধিক স্থলে উপকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে প্রাচীন কালে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচার সম্ভব হইত না, যদি না হিন্দু রাজারা ও সমাজের নেতারা সেন্ট জেভিয়ার (St. Xavier) প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণকে অবাধে কাজ করিবার সুবিধা দিতেন। গৌড়দেশ তুর্কী কর্ত্তৃক বিজয়ের পূর্ব্বেই, মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের তথায় আগমন ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঐতিহাসিক সত্য (সেখ শুভোদয়া গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। মোপলাদিগের ইতিহাস, গুজরাটরাজ দাহিরের রাজ্যে আরবগণের বাণিজ্য ইত্যাদি ঘটনা পরধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর উদারতার ঐতিহাসিক প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যে বসিয়া খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তির ইস্‌লাম প্রচারও এই ব্যাপারের অন্যতম প্রমাণ।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের স্থানে স্থানেও এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যে খ্রীষ্টানের কথা নাই; কিন্তু, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম সমান শ্রদ্ধার যোগ্য, ঈশ্বর হিন্দুকে ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রকার উক্তি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই উদারমনা প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছেন। কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে "পাকিস্থানী" ভাব ছিল না—ভাষায়ও না, ভাবেও না।

১। চৈতন্যভাগবত ও ঠাকুর হরিদাস

শ্রীমদ্-বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রসিদ্ধ চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বৈষ্ণব সাধু হরিদাসের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তিনি যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া "যবন হরিদাস" নামে খ্যাত। আবার "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। "প্রেমবিলাসে"র মতে "ঋচিকপুত্র ব্রহ্মা," "বিশ্ব-স্রষ্টা ব্রহ্মা", এবং প্রহ্লাদ—এই তিন জনে শাপভ্রষ্ট হইয়া একত্রে হরিদাসরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, চৈতন্য-ভাগবত অনুসারে, হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমানগণ অভিযোগ করিলেন:—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।

হরিদাসকে ধরিয়া বন্দী করিয়া "মুলুকের পতি" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার কাছে আনা হইল। "মুলুকের পতি" বলিলেন:—

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।

আরও অনেক বুঝাইয়া তিনি হরিদাসকে বলিলেন:—

না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কালিমা উচ্চার।

উত্তরে হরিদাস যাহা বলিলেন তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মে সমভাব অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে:—

* * *

শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে।
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়।
এতেক আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি তেন।
হিন্দু কুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।

হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম।
মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার।

ইহা সত্ত্বেও অবশ্য, হরিদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল! কারণ,

যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে।

১। দ্বিজ-বংশীদাসের পদ্মপুরাণ

হাসান-হোসেনের গল্প প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থেও ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব এক স্থানে পাওয়া যায়। হাসান-হোসেনের নেতৃত্বে মুসলমানগণ রাখালদিগের মনসাপূজা ভাঙিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সকলকে এই অত্যাচার হইতে বিরত হইতে বলিল :—

তার মধ্যে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে উচিত নহে রাখ হিন্দু আন।
এক ঈশ্বর দুই হিন্দু মুসলমানে।
যার যেই কর্ম্ম করে ধর্ম্মের কারণে।
সকল লোকাচার সৃজিল গোঁসাই।
পাষণ্ডি হইলে তাতে কুশল কার নাই।

৩। ভারতচন্দ্রের "মানসিংহ"

এই গ্রন্থেও এক স্থানে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব বর্ণিত আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের পর, মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে ভবানন্দের পুরস্কারের সুপারিশ করেন। কথাবার্ত্তাস্থলে জাহাঙ্গীর ব্রাহ্মণ জাতির তথা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ভবানন্দ যথোচিত উত্তর দিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন :—

মজুমদার কহে জাঁহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।

৪। সমশের গাজির পুঁথি

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কোন লেখকের (হিন্দু কি মুসলমান, জানা যায় নাই) রচিত "সমশের গাজির পুঁথি" নামক গ্রন্থেও সমন্বয়ের কথা আছে। গাজি ত্রিপুরার (হিন্দু) রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় একদিন দেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন—"আমার পূজা দে।" গাজি গ্রাহ্য করিলেন না। পরে আবার এক দিন স্বপ্ন হইল। গ্রন্থের ভাষায় :—

পূর্ব্বমত স্বপ্নে দেবী বলিতে লাগিল।
শুনি বিপরীত বাক্য গাজি উত্তরিল।
আমি হই মুসলমান আপনি ঈশ্বরী।
কেমনে হিন্দুর কাজ বল আমি করি॥
দেবী বলে সকলই বিধাতার হাত।
যখন যাহারে চাহে করেছে নিপাত॥
তাহার নিকটে জান সকলি সমান।
নাহিক প্রভেদ কিছু হিন্দু মুসলমান॥
স্বহস্তে না দেও পূজা ডাকহ ব্রাহ্মণে।
নতুবা জিনিতে তুমি না পারিবে রণে॥

এইরূপ তিন বার স্বপ্নাদেশ হইলে গাজি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া দেবীর পূজা দিলেন এবং ত্রিপুরা রাজার রাজ্য জয় করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিলেন।

৫। হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান কবি

সেকালের অনেক মুসলমান কবি হিন্দু দেবদেবীর কথা (যথা, রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রভৃতি) লইয়া কাব্য কবিতা লিখিতেন। ইহাদের রচনা পড়িলে, রচয়িতার নাম না-জানা পর্য্যন্ত, বুঝিবার উপায় নাই যে লেখক অ-হিন্দু। অথচ ইহারা যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এমন কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই মুসলমান লেখকগণ নিজের ধর্ম্মকে যেমন, হিন্দু-ধর্ম্মকেও তেমনই শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মসমন্বয়ের স্পষ্ট উক্তি না থাকিলেও এই সকল লেখা ধর্ম্মসমন্বয়ের উপযোগী প্রশংসনীয় মনোবৃত্তির ফল। এই জন্য, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রসঙ্গে এই উদারচেতা মুসলমান কবিগণের কথা এই বিষয়ের হিন্দু লেখকগণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে।

এই শ্রেণীর মুসলমান লেখকগণের মধ্যে বিখ্যাত কবি আলওয়ালকে শীর্ষস্থানীয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার "পদ্মাবতী" কাব্যের (যাহা আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল) সমস্ত লেখাই হিন্দুভাবাপন্ন। পদ্মাবতী কাব্যের "ঈশ্বর স্তোত্র" হইতে এই কয় ছত্র উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীব দানে স্থাপিল সংসার॥
* * *
সৃজিলেক পাতালমহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্তমহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥
ইত্যাদি।

"পদ্মাবতী" কাব্যেই একটি মহাদেব স্তোত্র আছে, উহাও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যদিও কাব্যে বর্ণিত রাজা ঐ স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, তথাপি "পদ্মাবতী"র কবি, হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকিলে রাজার মুখ দিয়া এরূপ স্তোত্র বলাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

স্তোত্র

আমরা সকল আগে দেহী হৈব ছার।
যদি আসি বৃষধ্বজ না করে নিস্তার॥
আর প্রভু মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় কায়া।
যদ্যপি পাষাণ তুমি হই তোমা ছায়া॥
শিরে গঙ্গা জটাধারী গলে অস্থিমালা।
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা।
ইত্যাদি।

চিতোর-রাজ রত্নসেনের বর্ণনায়ও অনুরূপ বস্তু দৃষ্ট হয়।

রূপে জিনি পঞ্চবাণ, বিদুর সদৃশজ্ঞান
ধার্ম্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির।
দানে মানে কর্ণ গুরু, বুদ্ধি জিনি সুরগুরু
জম্বুদ্বীপে সেই এক বীর।
* * *
সাহসে বিক্রমাদিত্য, সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্য্যাদায় সিন্ধু রত্নাকার॥
ইত্যাদি।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজন (ইঁহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ১১ জন) মুসলমান আছেন। ইঁহাদের কয়েকজনের লেখা হইতে উদাহরণ দিতেছি :—

* * *
যে শুনে তোমার বংশী
সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরু পদে অলিরাজা কয়॥
(অলিরাজা)

বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদনইন্দু জলদ কাঁতি
চারুচন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভাণরি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায়ে করত গোঠ বিহার
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি॥
(নসীর মামুদ)

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
* * *
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥
(চাঁদ কাজি)

* * *
সৈয়দ মর্ত্তজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়াপায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥
(সৈয়দ মর্ত্তজা)

পূর্ব্বোক্ত অলিরাজা (আলীরাজা) ওরফে "কানুফকির" সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ মুন্সী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় "জ্ঞানসাগর" (আলীরাজা প্রণীত) গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন :—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলীরাজা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সমস্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আছে।......তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান এরূপ করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ফকিরদের মতে মানব দেহই রাধা ও মনই শ্রীকৃষ্ণ। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, আলীরাজা প্রভৃতি কবিগণকে মুসলমান বৈষ্ণব কবি নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না......"

"দেখা যায়, বহু পদেই তিনি আপনাকে 'জন্মে জন্মে ভক্ত রাধ হরির চরণে' বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।...তাঁহার রচিত দুইটি শ্যামা সঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি 'শিশু আলীরাজা ভণে শ্যাম কালিকা দাস' বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অন্য দিকে 'জ্ঞানসাগর' প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয়—এই পরস্পরবিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে..."

"জ্ঞানসাগর" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন (অন্ততঃ, সেরূপ মনে করিবার কারণ আছে) যে এই মুসলমান কবির হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল :—

যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন।
সকল রসের মূল পিরীতি ভজন॥
* * *
এ বুলিআ বড় কৈল প্রেমপন্থ সার।
মোহম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার॥
জন্মে জন্মে ভক্ত হৈল নারায়ণ হরি।
ক্রিয়া কৈল রাধার সঙ্গে নবরূপ ধরি॥
* * *
শচী সঙ্গে ভক্ত হৈল দেবকুল রায়।
সন্ধ্যা নারীর প্রেমে ভক্ত হইল ব্রহ্মাএ॥
* * *
জোলেখা হইল ভক্ত ইছুপ দেখিয়া।
আমীর হোছন ভক্ত জয়নব পাইয়া॥
উড়িয়ার রাজা ছিল অধিক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেইরূপে দাউদ পয়গম্বর॥
* * *

পরম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত্ত কুমারী।
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই সেই নারী॥
* * *
নবী কুলে প্রথমে আদমভক্ত হৈল।
হাবা দেবী সঙ্গে রস কূপে ডুবি ছিল॥
দেব কুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর।
গৌরী দেবী সম্মুখে থাকিত দিগম্বর॥
* * *
গঙ্গা গৌরী যুগনারী রাখি দিগম্বর।
ভক্তযোগে সাধি সিদ্ধা হইল মহেশ্বর॥
আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর।
সেইরূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গম্বর॥
নরনারী পশুপক্ষী কীট তরুবর।
প্রেমরস বিন্দু কার নাই মুক্তিবর॥
ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবি হিন্দু সাধকের পরিচিত প্রেমমার্গেরই সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন এবং হিন্দু দেবদেবী ও পয়গম্বরগণের সন্নিবেশ করিয়া তুলনা করিয়াছেন। মুসলমান কবির এরূপ ভাব ও এরূপ ভাষা আজকাল মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের চক্ষেই বোধ হয় মহাপাপ। কিন্তু ডাঃ এনামুল হক্ ও সাহিত্যসাগর আব্দুল করীম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় "আরাকান রাজ-সভায় বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে মুসলমান-রচিত বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজে অনেক হিন্দু অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল—যথা, রমণীর কপালে সিন্দুর, বিবাহে বর বরণ ও কনে বরণ (ঘৃতের দীপ, ধানদূর্ব্বা, কলাগাছ ইত্যাদি দ্বারা), মঙ্গলঘট, অধিবাস, শুভাশুভ (জলপূর্ণ কুম্ভ, আম্রডাল, দধি) অন্নপ্রাশন, প্রণাম ইত্যাদি।

হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থ হইতে মুসলমান কবি সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে অংশটি উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা যায় না :—

"কবি মোহাম্মদ তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণটি লিখিয়াছেন তাহা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য...কবি তাঁহার বন্দনায় হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাসের মধ্যে কি কি সমান বস্তু আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করিয়াছেন। তাঁহার হাতে ফিরিস্তা (angol) নারদে, আল্লা ঈশ্বরে, পয়গম্বর (Prophet) দেবতায়, আদম অনাদিনরে, হাওয়া (Eve) কালীতে; হজরত মোহাম্মদ চৈতন্যাবতারে খাজা খীজির বাসুদেবে; আসহাবগণ (companions of the Prophet) দ্বাদশ গোপালে, আওলিয়া আম্বিয়া (Muslim saints) মুনিতে, কোরাণ পুরাণে এবং পীর মুরশিদ ও ওস্তাদ গুরুতে পরিণত হইয়া ছিলেন; যথা—

বিনএ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুরিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ॥
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে॥
পএগাম্বর সকল বন্দি করিআ ভকতি।
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইল প্রততি॥
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দুকুলে অনাদিনর প্রচার প্রতাপ॥
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী।
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী॥
হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা॥
খোআজ খিজির বন্দম জলে ত বসতি।
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি॥
* * *
আছহবা সকল বন্দি নবীন সভাএ।
হিন্দুকুলে দোয়াদস গোপাল ধেয়াএ॥
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরাণ।
হিন্দুকুলে মুনিভাব আছয়ে পুরাণ।
পীর মুর্সিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ।
হিন্দুকুলে গুরু যেন করএ পূজন।
(আরাকাণ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য—পৃঃ ৮২)

৬। সত্যপীর সাহিত্য

হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সত্যপীর সাহিত্য। সত্যপীরের পূজা সম্বন্ধীয় একাধিক মুদ্রিত পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় এবং এগুলি বাংলার হিন্দু জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। ইহা ব্যতীত অপ্রকাশিত পুঁথিও অনেক আছে। সবগুলিরই আখ্যান ভাগ মোটামুটি এক রকমের। গল্পের কাঠামোটি এই :—

কোন ব্রাহ্মণ খুব দরিদ্র। এত দরিদ্র যে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়াছে। অকস্মাৎ একদিন এক মুসলমান ফকির ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া বলিলেন :—"আমার পূজা কর। দুঃখ দারিদ্র্য সব দূর হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন :—"আমি হিন্দু, বিশেষ ব্রাহ্মণ। আমি কিরূপে মুসলমান ফকিরের পূজা করিব?" ফকির তখন ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া উপদেশ দিলেন যে ঈশ্বরের কাছে হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নাই। রাম রহিম এক, ইত্যাদি। কোনও গল্পে মুসলমান পোষাক পরিহিত ফকির শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ রূপে দেখা দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের একত্ব বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত সত্যপীর পুঁথিতেই গল্পটি এই রকমের।

কেবল শ্রীকবি বল্লভের (২২৫ বৎসর পূর্ব্বে) রচিত "সত্যনারায়ণের পুঁথি"তে মুসলমান ফকির বলিয়াছিলেন—"আমি শিব।"

যাহা হউক, ইহার পর গল্পের বাকী অংশটুকু এই—

ফকির পূজার বিধান বলিয়া দিলেন। কি কি দ্রব্য পূজায় লাগিবে তাহাও বলিলেন (যথা ময়দা ইত্যাদি)। অতঃপর পূজা ও সিন্নি হইলে ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর হইল এবং এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপরেও সত্যপীরের পূজা দিতে লাগিলেন।

সত্যপীরের পুঁথি সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু-মুসলমান মিলনাত্মক যতগুলি সত্যপীরের (মুদ্রিত ও অমুদ্রিত) পুঁথি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সেগুলি সবই হিন্দুর রচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি ভাণ্ডারে মুসলমান কবির রচিত একখানি সত্যপীরের পুঁথিতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কোন কথা নাই। উহা আমাদের সাধারণ "সত্যনারায়ণের পুঁথি"র মত। অর্থাৎ পীর বিপন্নকে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ভক্তের ত্রুটি হইলে তাহাকে বিপদে না ফেলিয়া ছাড়েন না। আবার কাঁদাকাটি করিলেই উদ্ধার এবং ঐশ্বর্য্য লাভ অথবা অন্য মনোবাঞ্ছা পূরণ। আমি দেখি নাই বলিয়াই হিন্দু-মুসলমান মিলনাত্মক মুসলমান-রচিত পুঁথি থাকিতে পারে না, এ কথা বলিতেছি না। থাকিতে পারে, এবং এ বিষয়ে আমার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিলে, আমি খুব সুখী হইব।

এক্ষণে কয়েকখানি সত্যপীরের পুঁথি হইতে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে দেখাইতেছি :—

(১) খোদায় কহেন যে একীদার কর তুমি।
জার পূজা কর তুমি সেই সিব আমি॥
* * *
হরহরি এক তনু বেদে ইহা কয়।
ফকির কহেন আমি সেই মৃত্যুঞ্জয়॥
(শ্রীকবি বল্লভ)

(২) রাম বলেন রহিমান হিন্দু আর মুসলমান
জার গুণে কোরাণ পুরাণ।
এক আত্মা নহে দুই পরদা কারণ সেই
হুকুমে জামিন আসমান॥
* * *
হাসিয়া হাসিয়া তবে কহেন ফকির।
হাজির নাজির সত্যপীর দস্তগীর॥
জাঁহা জেই মনে করে তাঁহা সত্যপীর।
নাহি তফাউত হিন্দু মোছালমান কাফির॥
(সত্যপীরের পাঁচালী কবি বিদ্যাপতি রচিত,
অপ্রকাশিত পুঁথি)

(৩) ব্রাহ্মণ বলেন দেওয়ান বড়ই অবুঝা।
কি কারণে পীরের করিব আমি পূজা।
পূজা করি বিধি বিষ্ণু সঙ্কর ভবানী।
জবন দেবতা পীর কভু নাই মানি।
* *

পীর বুঝাইলেন :—
জিহোঁ রহমান তিহোঁ রাম গুণধাম।
যে জন (প্রভেদ) করে বিধি তারে বাম॥
* * *
দেবতা দ্বিতীয় নাই জান্ত এক ব্রহ্মা॥
তবে কহে সত্যপীর আমি নারায়ণ।
ধরাছি ফকির বেশ দেখিয়া জবন॥
(কবি গঙ্গারাম-বিরচিত অপ্রকাশিত সত্যপীরের পুস্তক)

(৪) গণেশাদি রূপহর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
* * *
দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥
(সত্যপীরের কথা, ভারতচন্দ্র)

(৫) দেওয়ান কহেন শুনো গেয়ান কি বাত।
রাম রহিম দোর নাম ধরে এক নাথ॥
অভেদ তুমকো কহা শাস্ত্রকি সার।
তুমে ভেদ ভলা নাহি করো ত একত্যার॥
* * *
বিধি বড় ভাই মোর মহেশ অনুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ।
কংশ কেশী মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম॥
(সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য)

সত্যপীর সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, সত্যপীরের আবির্ভাব সম্বন্ধে দুই জন লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া, এ বিষয়ে সেকালের লোকেরা কি ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

ভারতচন্দ্রের "সত্যপীরের কথা"য় সত্যপীরের উৎপত্তির কারণ এই :—

দ্বিজ-ক্ষত্রি-বৈশ্য-শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষ তলে কৈলা স্থান।

রামেশ্বর বলিতেছেন :—
ছয় দরশনে কয় এক ব্রহ্ম দুই নয়
জন্ম জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করিল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম॥

৭। মুসলমান-ভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায়

ঠিক ঠিক সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও, কয়েকটি

মুসলমানভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের গান ও প্রচলিত সাধুক্তি এ ক্ষেত্রে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অক্ষয়কুমার দত্ত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে এক স্থানে লক্ষ্য করিয়াছেন :—

"বাউল, নেড়া ও দরবেশ নামক বৈষ্ণবেরা মোসলমান ফকিরদের দৃষ্টে তস্‌বিমালা ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের এরূপ বচনই আছে যে,

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল্‌জুলকে কর সাঁইজীকা কাম॥"

রামবল্লভী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন। অতএব উৎসবকালে (শিবচতুর্দ্দশী দিবসে পাঁচঘরা গ্রামে প্রতি বৎসর উৎসব হয়) ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়।...শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইঁহারা খেচরান্ন ও গো-মাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইশু খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয়......

ইহাদের গান
কালীকৃষ্ণ গাড্‌ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালীকৃষ্ণ গাড্‌ খোদা বল রে॥"

মুসলমানভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যে মুসলমান গোরস্থান ও পীর পূজার প্রচলন আছে, তাহা মনে পড়িয়া যায়। বাংলার (তথা, ভারতের অন্যত্র) গ্রামে ও শহরে অবস্থিত এই পূজা-স্থানগুলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তকে মেদিনীপুরের মৈনান গ্রামের ও গোপালপুর গ্রামের পীরস্থান, বেলুড় ও সুখচরের শাফকির, হুগলীর সৈদচাঁদ, কলিকাতার শাজুর্ম্ম, ত্রিবেণীর দফ্‌রাগাজি, হাবড়া জেলার ফতেয়ালী গ্রামের ফতে আলী, বারাসতের বালেণ্ডা গ্রামের গোরাচাঁদ ফকির এই সকল মুসলমান পীরস্থান ও মৃত পীর হিন্দুগণের পূজা পাইয়া থাকেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে।* ইহা ব্যতীত পেঁড়ো ও গয়েশপুরের পীর পুষ্করিণী বালীগ্রামের দেওয়ান গাজি নামক পীরের আস্তানা ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা রাজধানীতেই সরকারী মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন ছোট মসজিদটির কাছে সন্ধ্যার সময় অনেক হিন্দু নারীকে মোল্লার "জলপড়া"র প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। পোড়া বাজারের দরগায় (এলগিন রোডের ঠিক উত্তরে, চৌরঙ্গী রোডের উপর), কালীঘাটের বাজারের কাছে সত্যপীরের স্থানে, বহু হিন্দু পয়সা ও দুধ এখনও দিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই হিন্দুর অত্যুদারতার পরিচায়ক।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল হিন্দুই অনেক সময় হিন্দু সম্পর্কীয় কতকগুলি বিষয়ে সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। যথা, অস্পৃশ্যতার সমর্থন করেন, এবং আর্য্য সমাজী ও ব্রাহ্ম সমাজী হিন্দুকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন।

উপসংহার

সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয় প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক অনেক কথাও বলিয়া ফেলিয়াছি। এখন প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যাইতেছে। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত উচ্চশ্রেণীর সমগ্র বঙ্গসাহিত্য অন্বেষণ করিলে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব স্থানে স্থানে যেমন পাওয়া যায় তেমনই অনেক স্থলে তৎকালীন তুর্কী-আরব-মোগল জাতীয় শাসকবর্গের এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও বহু উক্তি দৃষ্ট হয়। এই উক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি কয়েক জন শাসনকর্ত্তার প্রশংসায় পূর্ণ হইলেও, সাহিত্যের অন্য অন্য স্থানে ইহার বিপরীত উক্তিও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের চেষ্টা নিহিত আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে শাসক সম্প্রদায়ের ও তাঁহাদের স্বধর্ম্মীদের প্রতি প্রতিকূল উক্তি তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাবের পরিচায়ক।

---

* মোগল রাজত্বের পতনের পর হইতে ব্রিটিশ শাসকগণ কর্ত্তৃক "সুয়োরাণী" নীতি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দেবদেবী-পূজার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সার মহীউদ্দীন ফারোকীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরাহিতসাধিনী সভার পঞ্চষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি বলেন :—

"আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান ও হিন্দু পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহচর্য্যে স্ব স্ব ধর্ম্মাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঐক্য ও সখ্যের মধ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মমতে ও আচারে অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ বর্ত্তমান যুগের প্রগতিশীল নরনারী হইতে অধিক রক্ষণশীলই ছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান ভূম্যধিকারীরা হিন্দুকে দেবমন্দির প্রস্তুত করিতে এবং দেববিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। অপর পক্ষে, হিন্দু ভূম্যধিকারিগণও মুসলমানদিগের মসজিদ, কবরখোলা প্রভৃতির জন্য স্থান দান করিয়া গিয়াছেন, সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কুমিল্লা শহরের উপর ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-বিখ্যাত শাহুজার মসজিদ যেমন হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে, নারায়ণপুরে মুজা হোসেন আলী-প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-প্রাঙ্গণে কালীমন্দিরও তেমনি প্রীতি ও উদারতার সাক্ষ্য দিতেছে। আখাউরার সন্নিকটে খরমপুর দরগায় যেমন হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত হইয়া সিন্নি দেয়, আরুয়াইল আখড়ায় তেমনই মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ কামনা করিয়া 'মানসা' দেয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ্চ ১৯৩৮)।

এবং শেষোক্ত প্রকারের মন্তব্যই প্রাচীন সাহিত্যে সমধিক, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অধিকন্তু, সত্যপীর সাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক নিম্নে। শেষোক্ত প্রকারের গ্রন্থে শাসকবর্গের অত্যাচারের যথেষ্ট বর্ণনা ও নিন্দা আছে। এই সব বিষয় মনে রাখিয়া "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মিলনাত্মক উক্তি বেশী, না অন্য রূপ উক্তি বেশী" এই প্রশ্নের বিচার করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, অন্ধকারে একটি আলোকরশ্মির মতও ধর্ম্মসমন্বয়ের ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের উক্তিগুলি আমাদের কাছে মূল্যবান।

আলোচনা

"বল ও সমাজ"

শ্রীঅধীররঞ্জন দে

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় "বল ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে কার্ল মার্কস্ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি মারাত্মক অবিচার করেছেন।

কমিউনিজম্ সম্বন্ধে জানতে হ'লে মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Capital' ছাড়াও এঞ্জেল্স্, লেনিন, ষ্টালীন, বুখারিন, জন ষ্ট্রাচী, রেল্প্ ফক্স্, ট্রট্স্কি প্রভৃতির লেখা ভালভাবে পড়া চাই। ডক্টর দাসগুপ্ত শ্রাবণ সংখ্যার ৩৪৯ পৃষ্ঠার প্রথম পাটির দ্বিতীয় প্যারাতে লিখেছেন—"কার্ল মার্কস্ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা কিছুদিন ধ'রে এই কথাই ব'লে আস্‌ছেন যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্ঘাতেই সমাজের ক্রমবিবর্ত্ত হয়ে আসছে। এই অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটেছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব।...কিন্তু অর্থ নৈতিক দ্বন্দ্বের প্রধান কথাই হচ্ছে অর্থ সম্বিভাগের বৈষম্য, অর্থাৎ কেউ বা ধনৈষণার প্রবল তাড়নায় প্রভূততম অর্থ সঞ্চয় করেছে, কেউ বা অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে মরে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা যদি শুধু অর্থ সম্বিভাগের বৈষম্য নিয়েই ঘট্‌ত, তবে তার মীমাংসা কি স্বদেশে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এত দুর্ঘট হ'য়ে উঠত না।......কিন্তু মার্কস্ প্রভৃতিরা এখানে ভুল করেছিলেন। ধনৈষণার সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে বলৈষণা।"

কিন্তু মার্কস্ ভুল করলেন কোথায়? মার্কস্ কি কোথাও অস্বীকার করেছেন যে ধনৈষণার সঙ্গে বলৈষণা জড়িত হ'য়ে নাই? লেখক যদি মার্কসের 'Civil War in France', লেনিনের 'State and Revolution' এবং জি. ডি. এইচ কোলের 'What Marx Really meant' বই কয়খানা পড়ে দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে মার্কস্ অকপটে স্বীকার করেছেন যে ধনীরা (capitalists) ধনের জোরে বলীয়ান হ'য়ে উঠে এবং সর্ব্বহারাদের 'Labour-Power' অন্যায় ভাবে হরণ ক'রে ধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বলও বৃদ্ধি হয়। কাজেই ধনৈষণা ও বলৈষণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এর পর ডক্টর দাসগুপ্ত মহাশয় লিখছেন—"কাজেই সমাজবৈষম্য ও রাষ্ট্রবৈষম্যের গৌণ কারণ ধন সম্বিভাগের অব্যবস্থা, ইহা স্বীকার করলেও তা'র মূল কারণ হচ্ছে বলবৈষম্য ও বলৈষণা"। কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্তের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। মার্কসের 'Capital' ভালভাবে পড়া থাকলে তিনি দেখ্‌তে পেতেন যে সমাজবৈষম্য ও রাষ্ট্রবৈষম্যের মূল কারণ হচ্ছে ধন সম্বিভাগের অব্যবস্থা, আর গৌণ কারণ হচ্ছে বলবৈষম্য ও বলৈষণা। কারণ ধনীরা বলী হয় কিসে? ধনের জোরে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ধনের জোরে বলী হ'য়ে ধনীরা সমাজে ও রাষ্ট্রে বৈষম্য এনে দেয় এবং রাষ্ট্রের উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করে। কাজেই ধনই হচ্ছে প্রধান এবং প্রথম প্রশ্ন, বল নয়। কারণ ধন না হ'লে বলের প্রশ্ন আসতেই পারে না। লেখক কিন্তু নিজেই নিজের উক্তির প্রতিবাদ করেছেন। কারণ তিনি লিখ্‌ছেন—"ধনী হ'লেই লোকে বলী হয়"। আবার "প্রসিদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও দেখা গিয়েছে যে, যা'রা ধনী তা'রা রাষ্ট্রকে তা'দের অনুকূলে সঙ্গোপনে নিয়ন্ত্রিত করে......ধনের দ্বারা বল হয় ব'লেই ধনী হয় অত্যাচারী এবং অবিবেচক।" তা হ'লে লেখক কি নিজেই স্বীকার করছেন না যে সমাজবৈষম্য ও রাষ্ট্রবৈষম্যের মূল কারণ হচ্ছে ধন-সম্বিভাগের অব্যবস্থা এবং গৌণ কারণ হচ্ছে বলৈষণা ও বলবৈষম্য?

তার পর লেখক লিখ্‌ছেন—"ফাসিস্ত, নাৎসী ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নেতারা সমাজের ব্যক্তিবর্গের বল আত্মসাৎ ক'রে তা'দের সমস্ত বল নিজেদের বলৈষণা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করছেন।" এই ভ্রান্ত উক্তির সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই Socialism এবং Communism-এর পার্থক্য বুঝতে হবে। বুখারিনের "A, B, C of Communism" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করলে এ বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। জন ষ্ট্রাচী তাঁর "Theory and Practice of Socialism" গ্রন্থে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে লিখেছেন—

"In Socialism from everybody according to his ability and to everybody according to the quality and quantity of work; and in Communism from everybody according to his ability and to everybody according to his needs."

Socialism হচ্ছে Communism-এর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য Transitional Period. আর Socialism-এ State অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং Socialism-এর প্রধান অঙ্গ হচ্ছে "Dictatorship of Proletariate." তবে গণবিপ্লবের পরে যখন Socialism কায়েম হবে তখন State-এর (রাষ্ট্রের) প্রধান প্রধান থামগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলা হবে—('Must be smashed'—Lenin). 'Dictatorship of Proletariate'-এর একটি প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের অবশিষ্ট ছোট ছোট থামগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া (will wither away)। Socialism অর্থাৎ Transitional Period যখন শেষ হবে তখন আর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে 'Dictatorship of Proletariate' বিলয় প্রাপ্ত হবে ও Communism প্রতিষ্ঠিত হবে। Communism-এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। Communism-এ সমাজ নিজেই নিজের কাজ চালিয়ে নেবে। কাজেই "কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র" লিখে

দাসগুপ্ত মহাশয় ভীষণ ভুল উক্তি করেছেন। বর্ত্তমান পৃথিবীতে কোথাও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নাই এবং কোনকালে হবেও না, কারণ আগেই লিখেছি Communismএ কোন রাষ্ট্রই থাক্‌বে না। বর্ত্তমানে সর্ব্বহারাদের দেশ হচ্ছে "Union of Soviet Socialist Republics"—অর্থাৎ কতকগুলো autonomous Socialist States-এর Union. ডক্টর দাসগুপ্ত যাকে 'কমিউনিষ্ট' রাষ্ট্র ব'লে উল্লেখ করেছেন তা হবে সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র।

শ্রদ্ধেয় দাসগুপ্ত মহাশয় ফাসিস্ত, নাৎসী ও সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে একই পর্য্যায়ে ফেলেছেন। এখন দেখা যাক্ U. S. S. R. কমিউনিজমের আদর্শের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল, না তার নেতারা "সমাজের ব্যক্তিবর্গের বল আত্মসাৎ ক'রছিল।" U. S. S. R.-এর আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা জান্‌তে হ'লে Maurice Hindus-এর লেখা 'Red Bread', 'Great offensive,' 'Humanity up-rooted', 'Under Moscow Skies', এবং Pat Sloan-এর 'Russia without illusion', 'How the Soviet State is run' ইত্যাদি, Anna Louice Strong-এর 'Dictatorship and Democracy in Soviet Russia' এবং সর্ব্বোপরি Sidney and B. Webb-এর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ "Soviet Communism" পড়া উচিত। D. N. Pritt-এর 'Light on Moscow' গ্রন্থখানাও চমৎকার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই সব গ্রন্থকার কেউই কমিউনিষ্ট নন—নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্র। ডক্টর দাসগুপ্ত মহাশয় যদি অনুগ্রহ ক'রে 'Soviet Communism'-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের 'New Constitution of 1936' অধ্যায়টি পাঠ করেন তবেই ফাসিস্ত ও সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের বিরাট্ প্রভেদ বুঝতে পারবেন। 'Soviet Communism' পাঠে লেখক জানতে পারবেন যে সোভিয়েট নেতারা সোভিয়েট দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কমিউনিজমের দিকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। D. N. Pritt তাঁর 'U. S. S. R.—our ally' নামক পুস্তিকার ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"The Soviet Union has no unemployment.
"The Soviet Union has no economic crises.
"Every Soviet citizen has the right to work.
"Every Soviet citizen has the right to an education.
"All citizens of the Soviet Union, irrespective of their nationality or race, are equal in all spheres of the economic, state, cultural, social and political life."

আবার 'Soviet C mmunism' পাঠ ক'রে ডক্টর দাসগুপ্ত জানতে পারবেন যে সোভিয়েটবাসীরা ইচ্ছা করলে ভোট দ্বারা ষ্ট্যালীনকে পদচ্যুত ক'রে অন্য কাউকে তাদের dictator করতে পারেন। এর পরও কি লেখক বলতে চান যে সোভিয়েট নেতারা ফাসিস্ত নেতাদের মত "সমাজের ব্যক্তিবর্গের বল আত্মসাৎ ক'রে তাদের সমস্ত বল নিজেদের বলৈষণা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করেন?"

—

"পল্লী-উন্নয়নে নারায়ণপুর কলোনির আদর্শ"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার স্থানে স্থানে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, "বিশ বৎসর পূর্ব্বে দমদমার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রাম জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।" কিন্তু তিনি অবগত আছেন কিনা জানি যে নারায়ণপুর, কাদিহাটি, গোপালপুর, কৈখালী ইত্যাদি গ্রাম বহুদিন যাবৎ সমৃদ্ধিশালী ছিল ও অনেকগুলি এখনও আছে। বিশেষতঃ কাদিহাটি গ্রাম নারায়ণপুর কলোনির সংলগ্ন। ইহা বাংলা দেশের একটি আদর্শ পল্লী হিসাবে গণ্য হইতে পারে। লেখক মহাশয় যে বিদ্যামন্দিরটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ অঞ্চলের একটি মাত্র বিদ্যালয় নয়। উত্তর দিকে আরও দুই মাইলের মধ্যে তিনটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় বহু দিন হইতে সুনামের সহিত চলিয়া আসিতেছে।

লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "দুর্গাপূজার সময়ে বাংলার সকল পল্লীগ্রামই ঢাকের শব্দে মুখরিত থাকে। কিন্তু ওখানে পূর্ব্বে কোন গ্রামে একখানিও পূজা হইত না।" এই কথাটি সম্পূর্ণ অসত্য। লেখক মহাশয় একটু সন্ধানী দৃষ্টি রাখিলেই জানিতে পারিতেন যে নিকটস্থ গ্রামসমূহে বহুকাল হইতে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে।

মেসার্স মার্টিন কোম্পানীর যে ষ্টেশনটি বর্ত্তমানে রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেও "আটঘরা" নামে সুবিদিত ছিল। সুতরাং একেবারেই যে ছিল না, তাহা নহে।

"এখানে পূর্ব্বে স্থানে স্থানে কাওরা জাতির লোকেরা বাস করিত। তাহাদের জীবন দুর্নীতিপূর্ণ ও ঘৃণিত ছিল। এখন কয় বৎসর ভাল লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া এই কাওরা জাতির আশাতীত উন্নতি হইয়াছে।" আমার চাক্ষুষ দেখা আছে যে ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ মূর্খ জাতিটির অবনতিই হইয়াছে, অনেক বেশী। তবে তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেকের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঐ অঞ্চলের ভদ্র অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া নয়। তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় ও শিক্ষার সৌজন্যে।

গ্রামের মধ্যে ৪০ খানি পাকা ঘর, ২০ খানি কাঁচা ঘর ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ে। যেমন স্থানীয় লোকেদের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি।

—

"দেশী নাম ও পদবীর বিলাতী বিকৃত রূপ"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

ভাদ্র সংখ্যার "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বিবিধ প্রসঙ্গে "দেশী নাম ও পদবীর বিলাতী বিকৃত রূপ" সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। বাংলায় চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে লিখিতে হইলে বিলাতী বিকৃত রূপে চ্যাটার্জ্জি, মুখার্জ্জি বা ব্যানার্জ্জি না লিখিয়া চাটুজ্যে, মুখুজ্যে বা বাঁড়ুজ্যে অথবা চটো, মুখো বা বন্দ্যো লেখাই সমীচীন। বাঙালীর বহু পদবীরই এখন বিলাতী বিকৃত রূপ প্রচলিত, এ সকলের পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

নিজের পদবীকে ইংরেজিতে বিকৃত করিয়া কি যে লাভ বা গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা বুঝিতে পারি না। 'বসু' (Basu) পদবী ইংরেজিতে 'বোস' (Bose) রূপে লিখিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বাংলায় নাম লিখিবার সময় সকলেই 'বসু' লিখেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজিতে নাম লিখিবার সময় 'বোস' (Bose) লিখিয়া থাকেন। গৃহদ্বারের এক পার্শ্বে ইংরেজিতে 'H. Bose' (এইচ্. বোস) এবং অপর পার্শ্বে বাংলায় "এইচ্ বসু" বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। কলিকাতার একটি বিশিষ্ট বসু-পরিবারের সকলে বাংলায় নাম লিখিবার সময় 'বসু' লিখিলেও ইংরেজিতে বিকৃত করিয়া 'Bhose' ('ভোস্') লিখিয়া থাকেন। 'বসু'র এই বিকৃত বিলাতী রূপটি (ভোস্) প্রকৃতই অদ্ভুত।

সম্পাদক মহাশয় যে লিখিয়াছেন, বাংলা 'রাখহরি বসু' ইংরেজি অক্ষরে সংক্ষেপে R. H. Basu বা Boso হইলেও বাংলায় তাহা সংক্ষেপে 'আর. এইচ্. বোস' না লিখিয়া 'র. হ. বসু' লেখা উচিত। ইহা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কথা।

মন্তব্যের সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বোম্বাইয়ের 'ঠাক্‌রে' এবং 'ঠাক্‌রসী' পদবী দুইটির বিকৃত ইংরেজি রূপের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এখানে কলিকাতার দুইটি সুপ্রসিদ্ধ পরিবারের পদবীর বিকৃত বিলাতী রূপের প্রতি তাঁহার ও অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একটি 'ঠাকুর' এবং অপরটি 'লাহা'।

'ঠাকুর' (Thakoor) যে কিরূপে ইংরেজিতে বিকৃত হইয়া 'Tagoro' ('টেগোর' বা 'টেগোরে')-তে পরিণত হইল বুঝা যায় না। এই বিখ্যাত পরিবারের সকলেই বাংলায় নাম লিখিবার সময় 'ঠাকুর' লিখিয়া থাকেন কিন্তু ইংরেজিতে নাম সহি করিবার সময় সকলেই 'Tagoro' (টেগোর), কেহই 'Thakoor' ('ঠাকুর') নহেন। 'লাহা' (Laha) বংশীয়েরাও বাংলায় নাম লিখিবার সময় পদবী ঠিক করিয়া লিখেন। কিন্তু ইংরেজিতে 'লাহা'কে বিকৃত করিয়া 'ল' ('Law') লিখিয়া থাকেন।

—

"বাংলা বানানের নিয়ম" (প্রত্যুত্তর)

শ্রীকুঞ্জলাল দত্ত

এই প্রসঙ্গে ভাদ্রের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিতেছি না। আমি তাঁহারই কথা হইতে দেখাইব যে, রেফের পর 'য'-এর দ্বিত্ব বর্জ্জনীয় নহে।

তিনি লিখিয়াছেন, 'কার্য্য প্রভৃতি শব্দের সাধারণতঃ বাংলায় উচ্চারণ কার্জ্জো, আচার্জ্জো, ধৈর্জ্জো।' ইহা অবশ্যই বাংলা দেশের সার্ব্বত্রিক উচ্চারণ নহে, প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলেই এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে অঞ্চলের যেরূপ উচ্চারণই হউক না কেন, ইহাদের কার্জ্জ, আচার্জ্জ প্রভৃতি উচ্চারণ কোন অঞ্চলেরই নহে। যদি তিনি উহাদের উচ্চারণ ওকারান্ত ভুলিয়া না লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণের ন্যায় 'য'-এর দ্বিত্ব বর্জ্জনও মানিয়া লইতে পারিতাম; আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই ওকার উচ্চারণ য-ফলার জন্যই; আমি আমার মূল প্রবন্ধেই লিখিয়াছি যে, 'য'-এর সংস্কৃত উচ্চারণ 'ইঅ' (প্রায় 'ইও'); সুতরাং এই ওকার-উচ্চারণ এবং বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থলের ইকার-উচ্চারণটুকু বজায় রাখিবার জন্যই য-ফলাটি সংরক্ষণ করা উচিত।

বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানেই য-ফলা-সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব করিয়া সাধারণতঃ তাহার পূর্ব্বে ইকার যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করে। যথা, কার্য্য (=কার্জ্য)=কাইর্জ্জ। আচার্য্য (=আচার্জ্য)=আচাইর্জ্জ। সত্য=সইত্ত। বাদ্য=বাইদ্দ। বাক্য=বাইক্ক। কথ্য ভাষায়, এই ইকারকে অন্তে অর্থাৎ য-ফলার স্থানে উচ্চারণ করারও একটা ঝোঁক দেখা যায়। যথা, আচার্জ্জি, সত্তি, বাক্কি প্রভৃতি।

কার্য্য, আচার্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতিতেও দ্বিত্ব বর্জ্জন করিয়া কার্য, আচার্য প্রভৃতি লিখিলে ইহাদের অন্তে শ্রুত ওকার অথবা উপান্তে শ্রুত ইকার ধ্বনি বিলুপ্ত হইবে। অথচ এই সব স্থানে এই ওকার বা ইকার উচ্চারণ য-ফলারই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ইহাদের অন্তে য-ফলা থাকিলেই অর্থাৎ য-কারের স্থলে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জ্জন না করিলেই ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ (তাহা যে অঞ্চলে যেরূপই হউক না কেন) অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত স্থলেও দ্বিত্ব বর্জ্জনের পক্ষে আর একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। এই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ যাহাদের উচ্চারণ ধর্ম্মো প্রভৃতি তাহাদিগের যদি দ্বিত্ব বর্জ্জন করা যায় তাহা হইলে কার্য্য প্রভৃতি যাহাদের উচ্চারণ কার্জ্জো প্রভৃতি তাহাদিগের দ্বিত্ব বর্জ্জনে আপত্তি কেন?

ইহাতে আমার প্রথম বক্তব্য, উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন স্থলেও দ্বিত্ব বর্জ্জনের পক্ষপাতী আমি নই। তবে নিতান্তই বর্জ্জন করিতে হইলে যে-সব স্থলে বর্জ্জনেও উপলব্ধিযোগ্য বিশেষ কোন উচ্চারণ-পার্থক্য হয় না, সেই সব স্থলেই অর্থাৎ 'র্য্য' ব্যতীত অন্যত্র বর্জ্জন করা যাইতে পারে। ইহাতে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দের ধর্ম্মো প্রভৃতি উচ্চারণ হয় বলিয়া আমার জানা নাই, তবে হইলেও এরূপ বাংলা দেশের খুব কম অঞ্চলেই হয়; (বরং কথ্য ভাষায় রেফশূন্য উচ্চারণে রেফের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ওকারযুক্ত ধম্মো, কম্মো প্রভৃতি শুনিয়াছি।) আবার 'কার্য্য'কে কার্জ্জো বলিলে 'ধর্ম্ম্য' (ধর্ম্মসঙ্গত)কেই ধর্ম্মো বলা উচিত, 'হর্ম্ম্য'কেই হর্ম্মো বলা উচিত। এমতাবস্থায় 'ধর্ম্ম'কে যদি কেহ কেহ 'ধর্ম্মো' বলেনও, তাহা হইলেও তাহা শুদ্ধ উচ্চারণ হইতে পারে না। অথচ, 'ধর্ম্ম', 'ধর্ম্ম্য'তে আমরা মকারের দ্বিত্ব বর্জ্জন করিতে পারি কিন্তু য-ফলা বর্জ্জন করি না, করিতে পারি না। একই কারণে, 'কার্য্য' 'আচার্য্য' প্রভৃতি বানানে যদি দুইটি য (=জ) থাকিত, তবে একটি বর্জ্জন করিতে পারিতাম, কিন্তু য-ফলাটি যাহার উচ্চারণ 'জ' নহে তাহা বর্জ্জন করিতে পারি না। ঐ য-ফলাটির এমন একটি বিশিষ্টতা আছে, যাহা উহার বর্জ্জনে কিছুতেই সংরক্ষিত হইতে পারে না।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী দেব্যানি দেশাই এ বৎসর কার্ভে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বয়স্কা মহিলা। তাঁহার পুত্রও এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীমতী দেশাই একজন নামজাদা কংগ্রেস-কর্ম্মী ও ভিলে-পার্লে মিউনিসিপালিটির সদস্য। গত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে তিনি দুই বার কারাবরণ করিয়াছেন। দেশাই-মহাশয়া পুনরায় ১৯৩৪ সালে শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এবারেও কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে হয়। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোম্বাই শাখায় ভর্ত্তি হন ও রীতিমত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সমাজহিতকর নানা কার্য্যে শ্রীমতী দেশাই একজন উৎসাহী কর্ম্মী।

শ্রীমতী দেব্যানি দেশাই

শ্রীমতী মণিবাঈ দেশাইও ত্রিশ বৎসর বয়সে এবার দামোদর ঠাকুরসি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইটি সন্তানের জননী। বার বৎসর অধ্যয়ন ত্যাগের পর, মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে সাংসারিক নানা কার্য্যের মধ্যেও এই তিন বৎসর তিনি রীতিমত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত উপাধি লাভ করিলেন।

শ্রীমতী মণিবাঈ দেশাই (দক্ষিণে)

কুমারী নীলিমা মজুমদার

কুমারী নীলিমা মজুমদার এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একটি সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এ বৎসরে তিনি বীটন কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা দেন।

পিপীলিকার বুদ্ধি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু অনেকের ধারণা—যতই কৌতূহলোদ্দীপক হউক না কেন, ইহারা প্রত্যেকটি কাজই স্বাভাবিক প্রেরণা বা সংস্কারবশেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু জাতীয় পিপীলিকা দেখা যায়; ইহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে এমন কোন কোন ঘটনা ঘটে, যাহাতে, ইহারা যে প্রত্যেকটি কাজই সংস্কারবশে করিয়া থাকে—এমন কথা বলা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার বাসস্থান নির্ম্মাণ ও সন্তান-প্রতিপালনে কৌশল, শৃঙ্খলারক্ষা ও বিবেচনা শক্তি স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে; কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মরক্ষা এবং খাদ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে সময়ে সময়ে এমন দুই-একটি কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায় যাহা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। এ স্থলে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইহা কি অন্ধ-সংস্কার না স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির ফল তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

কর্ম্মী পিপীলিকা

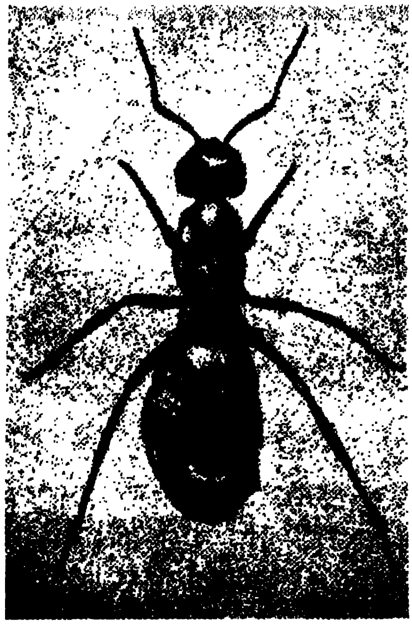

ডানাবিহীন রাণী পিপীলিকা

মাস-তিনেক পূর্ব্বের কথা—সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার সময় পল্লী-অঞ্চলের রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। সকাল হইতেই শিশির-বিন্দুর মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিছু দূর যাইতেই রাস্তার এক পাশে পরিষ্কার স্থানেই একটা সুপারি গাছের উপর নজর পড়িল। কতকগুলি নাল্‌সো (লাল-পিঁপড়ে) সারি বাঁধিয়া গাছটার উপরের দিক হইতে নীচের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। অবশ্য দুই-চারিটা পিপীলিকা উপরের দিকেও উঠিতেছিল। নাল্‌সোরা সাধারণতঃ গাছের উপরেই চলাফেরা করে; নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে মাটিতে বা নিম্ন স্থানে বড় একটা নামিতে চাহে না। তা' ছাড়া সুপারি গাছের উপর ইহাদিগকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য

কৌতূহল হইল। কাছে যাইতেই দেখিলাম—গাছটার এক পাশে, মাটি হইতে প্রায় এক ফুট উপরে, কাল রঙের এক দল ক্ষুদে-পিঁপড়ে ছোট্ট একটা গুব্‌রে পোকাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নীচে নামাইবার জন্য তাহার ঠ্যাং ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে। উপর দিক হইতে আবার পাঁচ ছ'টা নাল্‌সো তাহার সম্মুখের দুইখানি পা ও ঘাড় ধরিয়া এমন ভাবে 'টান্' হইয়া রহিয়াছে যেন আর একটু হইলেই ছিঁড়িয়া যাইবে। গুব্‌রে পোকাটার কাছ হইতে নীচের দিকে গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে আরও অসংখ্য ক্ষুদে পিঁপড়ে ইতস্তত: ঘোরাঘুরি করিতেছিল। সুপারি গাছটা একটা প্রকাণ্ড আমগাছের উপর হেলিয়া পড়িয়াছিল। আমগাছটাতেই ছিল—নাল্‌সোদের বাসা। সেখান হইতে সুপারি গাছ বাহিয়া দুই-একটা টহলদার পিঁপড়ে নীচের অবস্থা তদারক করিতে আসায় হয়ত শিকারটা তাহাদের নজরে পড়িয়া যায়। তাহার ফলেই খুব সম্ভব, উভয় দলে শক্তি পরীক্ষা চলিয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল—ক্ষুদেরাই প্রথম শিকারটাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে অনেকটা কাবু করিয়া আনিয়াছিল—তারপর আসিয়াছে এই নাল্‌সোর দল। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়াই যে এই কাণ্ডটা চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উভয় পক্ষের 'টাগ-অব-ওয়ার'টা চলিতেছে অল্পক্ষণ যাবৎ। কারণ স্থানটায় তখনও অধিক সংখ্যক নাল্‌সো জমায়েৎ হয় নাই। তাহারা এদিকে ওদিকে দুই-চারিটা খাড়া পাহারা মোতায়েন করিয়াছে মাত্র। এই পাহারাদার শান্ত্রীরা শুঁড় উচাইয়া, মুখ হা করিয়া, নিশ্চল ভাবে অপর পক্ষের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। পূর্ব্বের

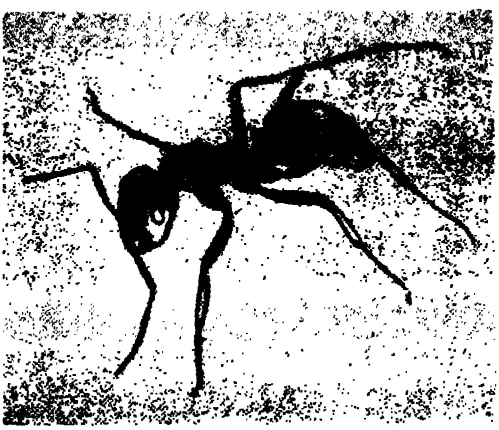

কর্ম্মী পিঁপড়ে

পিঁপড়েদের লড়াই

অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শীঘ্রই একটা গুরুতর 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হইবে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আরও অনেক নাল্‌সো আসিয়া পোকাটাকে ক্ষুদে-পিঁপড়েদের কবল হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং প্রায় এক ইঞ্চি উপরে শিকারটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। শিকার হাতছাড়া হয় দেখিয়া ক্ষুদেরা এবার সার বাঁধিয়া দলে দলে অগ্রসর হইতে লাগিল। সংখ্যাধিক্যের জোরে পরক্ষণেই তাহারা পোকাটাকে প্রায় তিন-চার ইঞ্চি নীচে টানিয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দলের মধ্যে 'হাতাহাতি লড়াই' সুরু হইয়া গেল। সে এক ভীষণ কাণ্ড; এক-একটা লাল-পিঁপড়েকে প্রায় দশ-বারটা ক্ষুদে-পিঁপড়ে এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া কাবু করিতেছিল। পায়ে, শুঁড়ে, চোখে মুখে সর্ব্বত্র এতগুলি পিঁপড়ে একটা লাল-পিঁপড়েকে কামড়াইয়া ধরিলে সে আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? দুই-চারিটা মাত্র কাল-পিঁপড়েকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া এক এক করিয়া লাল-পিঁপড়েরা, পিঠের দিকে উল্টাভাবে ধনুকের মত বাঁকিয়া জীবনলীলা শেষ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এ ভাবে চলিবার পর লাল-পিঁপড়েরা বেগতিক দেখিয়া শিকার ছাড়িয়া দিল; কিন্তু লড়াই থামিল না। গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে তুমুল লড়াই চলিতেছিল। অসংখ্য ক্ষুদে-পিঁপড়ের আক্রমণে লাল-পিঁপড়েগুলির পরাজয় যে আসন্ন এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু অনেক সৈন্যক্ষয়ের পর তাহারা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ ভাবে আর চলিবে না। তাহারা যেন নূতন 'প্ল্যানে' অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। এতক্ষণ নাল্‌সোরা যুদ্ধ করিতেছিল একক ভাবে—এখানে-সেখানে। কাজেই এক একটা নাল্‌সো ক্ষুদে-পিঁপড়ে অপেক্ষা পাঁচ সাত গুণ বড় এবং শক্তিশালী হইলেও দশ-বারটা ক্ষুদের বিষাক্ত দংশনে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করিতেছিল। এবার নাল্‌সোরা আক্রমণ ক্ষান্ত করিয়া দলে দলে সে-স্থানটায় সমবেত হইতে লাগিল। অবশ্য এই সমবেত হওয়াটা খুব সুশৃঙ্খলিত না হইলেও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল নহে। এ অবস্থায় দুই-একটি ক্ষুদে-পিঁপড়ে দল ছাড়িয়া তাহাদের লাইনের নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাদিগকে ধরিয়া ধারাল সাঁড়াশীর সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই নূতন কৌশলে ক্ষুদেরা ক্রমশঃই নীচের দিকে হটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক দল ক্ষুদে শিকারটাকে টানিতে টানিতে অনেক নীচে লইয়া গিয়াছিল এবং বাসার অভ্যন্তরস্থ শ্রমিক পিপীলিকারা গাছের গোড়ার একাংশে চার-পাঁচ ইঞ্চি স্থান জুড়িয়া প্রায় ½ ইঞ্চি খাড়াই একটা মাটির দেওয়াল তুলিয়া ফেলিয়াছিল। এ জাতীয় পিঁপড়েরা কিন্তু সাধারণতঃ মাটির দেওয়াল নির্ম্মাণ করে না। ইহারা মাটির নীচে গর্ত্তের মধ্যে বিভিন্ন কুঠুরি নির্ম্মাণ করিয়াই বসবাস করে। বাহিরে ক্ষুদ্র একটি মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যাহা হউক, লাল-পিঁপড়েদের ধারালো সাঁড়াশী ও বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণে ক্ষুদেরা

ডানাওয়ালা রাণী পিঁপড়ে

পশ্চাদ্দেশ উঁচু করিয়া পিঁপড়ে বিষাক্ত রস ছাড়িতেছে

হটিতে হটিতে অবশেষে সেই নবনির্ম্মিত দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এ দিকে শ্রমিকেরা দেওয়ালটাকে ক্রমশঃ উপরের দিকে গাঁথিয়াই তুলিতেছিল। ভিজা মাটির জন্য দেয়াল গাঁথিয়া তুলিতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা তখন 'ট্রেঞ্চ'-লড়াইয়ের আকার ধারণ করিল। দেওয়াল গাঁথিবার সময় মাঝে মাঝে দুই-চারিটা শ্রমিক পিপীলিকাকে নাল্‌সোরা ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল বটে; কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। বলা বাহুল্য, দেওয়াল গাঁথিয়া অগ্রসর হওয়াতে নাল্‌সোরা শত্রু-পক্ষের আর তেমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আমি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রায় সাড়ে-বারটার সময় তথায় ফিরিয়া গিয়া দেখি—নাল্‌সোরা অনেকেই তখন বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে। যদিও কিছু কিছু লাল-পিঁপড়ে দলছাড়া ভাবে সেখানে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছিল, তথাপি তাহাদের সেই লড়াইয়ের 'মুড্'টা যেন আর নাই। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা ইতিমধ্যে সুপারি গাছের গোড়াটার অনেকটা স্থান জুড়িয়া ছয়-সাত ইঞ্চি উপর অবধি লম্বা দেওয়াল তুলিয়া গুবরে পোকাটাকে সেই দেওয়ালের নীচে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এক বার আঠার শিশির মধ্যে একটা আরশুলা পড়িয়া মরিয়াছিল। দুর্গন্ধ নির্গত হওয়ায় আরশুলাসমেত আঠাগুলিকে এক স্থানে ঢালিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিছুকাল পর দেখিতে পাইলাম আরশুলার মৃতদেহ সংগ্রহের নিমিত্ত লাল রঙের এক প্রকার অসংখ্য ক্ষুদে বিষ-পিঁপড়ে আঠার চতুর্দ্দিক ঘেরাও করিয়াছে। কলিকাতার সর্ব্বত্র এই জাতীয় বিষ-পিঁপড়ে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা গেল, দুই-চারিটা পিপীলিকা আরশুলাটার নিকটে যাইবার চেষ্টা করায় তরল আঠার মধ্যে বন্দী হইয়া তখনও হাবুডুবু খাইতেছে। পাশ কাটাইয়া যাইবার সময় এই দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম—বেশ হইয়াছে, এবার আর আরশুলার দেহ উদরসাৎ করিতে হইবে না! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তখনও তাহারা মৃত আরশুলার দেহ উদরসাৎ করিবার আশা পরিত্যাগ করে নাই—বরং সেস্থানে পিপীলিকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ হইল। একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। পিঁপড়েগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকড় মুখে করিয়া আঠার উপর আনিয়া ফেলিতেছে। আঠার উপর দিয়া এইরূপ কাঁকড়ের পথ প্রস্তুত করিতে তাহাদের প্রায় আরও দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু সময়ের দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন রকমে আরশুলাটা পর্য্যন্ত পথ নির্ম্মিত হইবামাত্রই দলে দলে পিপীলিকারা তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইল। আর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই তাহাদিগকে আরশুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহখণ্ড লইয়া সারি বাঁধিয়া মহোল্লাসে বাসার দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল।

এই ঘটনার পর এক দিন মেঝেতে বসিয়া কাজ করিতেছি। কতকগুলি কালো রঙের সুরসুরে-পিঁপড়ে

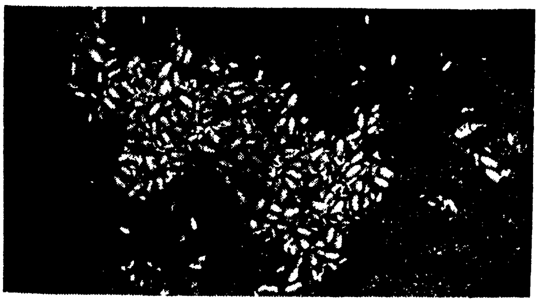

পিঁপড়েদের ডিম

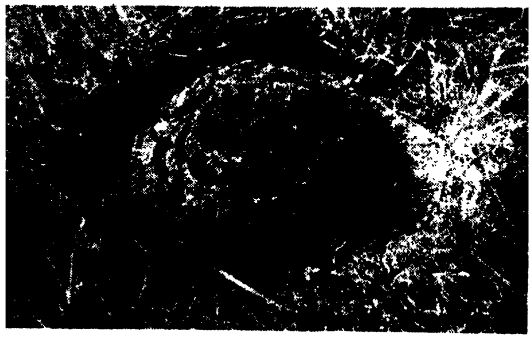

পিঁপড়ের বাসা

এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। মেঝের উপর এক স্থানে অল্প খানিকটা জল পড়িয়াছিল। তিন-চারিটা সুরসুরে-পিঁপড়ে প্রায় একসঙ্গে ঐ জলটার পাশ দিয়া কয়েক বার ছুটিয়া গেল। আবার আসিয়া জলটার পাশেই ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। ইহাদের স্বভাব অদ্ভুত। চলিতে চলিতে খানিকক্ষণ থম্‌কিয়া দাঁড়ায়—কিছুক্ষণ হাত-পা শুঁড় পরিষ্কার করে—পরমুহূর্ত্তেই আবার দ্রুত-গতিতে ছুটিতে থাকে। মেঝের উপর জলটুকুর পাশ দিয়া দুইটি একসঙ্গে ছুটিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ একটা পিঁপড়ে জলের সহিত আট্‌কাইয়া গেল। পিঁপড়েটা জল হইতে দূরে সরিয়া আসিবার জন্য যতই চেষ্টা করে জলটাও সঙ্গে সঙ্গে ততটা ছড়াইয়া পড়ে। মোটের উপর জলটা যেন তরল আঠার মত তাহার দেহের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল। পিঁপড়েদের দলের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে অথবা চলচ্ছক্তিহীন হইলে তাহাকে অন্য পিঁপড়েরা অনেক সময়ই খাদ্য হিসাবে মুখে করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু এরূপ ভাবে বিপন্ন হইলে একে অন্যকে বড় একটা সাহায্য করিতে দেখা যায় না। হয় তাহারা ব্যক্তিগত বিপদ সম্বন্ধে উদাসীন নয়ত ব্যাপারটা বুঝিতেই পারে না। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাই লক্ষ্য করিলাম। অপর পিঁপড়েটা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে জলমগ্ন পিঁপড়েটার শুঁড় ধরিয়া তাহাকে জল হইতে অনেকটা দূরে টানিয়া লইয়া আসিল এবং শুষ্ক স্থানে রাখিয়া এক দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। জলমগ্ন পিঁপড়েটা অনেকক্ষণ-সেই স্থানে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল এবং শরীরের জল শুষ্ক হইবার পর ধীরে ধীরে চাঙ্গা হইয়া পা, চোখ, মুখ পরিষ্কার করিবার পর ছুটিয়া পলায়ন করিল। ঘটনাটা তুচ্ছ হইলেও ইহা যে পিপীলিকার মত নিম্নস্তরের

প্রাণীর পক্ষে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক এ সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই দ্বিমত হইবেন না।

লাল পিঁপড়েদের বাসা নির্ম্মাণ, সন্তানপালন, রাহাজানি এবং খাদ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক কিছু অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু সেগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিব না। কিন্তু যাহাকে নিছক সংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না এরূপ দুই-একটি ঘটনার বিষয় বলিতেছি।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌সে কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করিবার সময় এক দিন দেখিলাম—মাটির উপর কতকগুলি উইয়ের সুরঙ্গ বরাবর প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ি অবধি চলিয়া গিয়াছে। গাছটার লম্বা গুঁড়ির এখানে-সেখানে অনেকগুলি নাল্‌সোকে এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। উহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম—অনেক পিঁপড়ে মাটিতে নামিয়া উইপোকার সুরঙ্গের আশেপাশে প্রায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর উঠিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় একটু দূরে একটা লাল-পিঁপড়ে যেন কিছু খুঁটিয়া খাইতেছে বলিয়া বোধ হইল। কাছে গিয়া দেখি—প্রায় তিনইঞ্চি লম্বা একটা ছোট্ট উইয়ের সুরঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া নাল্‌সোটা সুরঙ্গের মাটি সরাইয়া গর্ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দুই-এক টুকরা মাটী সরাইয়া সুরঙ্গের উপরের দিকে ছোট্ট একটু গর্ত্ত করিতে সমর্থ হইল। গর্ত্ত হইবার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই কর্ত্তিত মুখে একটা উইপোকা দেখিতে পাইলাম। পোকাটা শ্রমিক

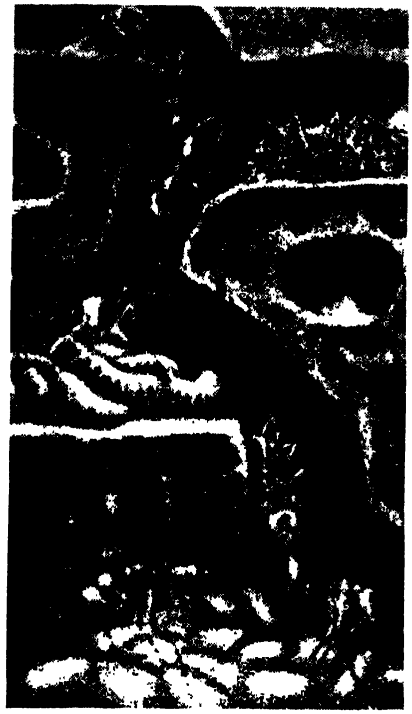

মাটির ভিতরে পিঁপড়েদের বাসা, লম্বালম্বি কাটিয়া দেখান হইয়াছে

ডানাওয়ালা পুরুষ-পিঁপড়ে

শ্রেণীর। গর্ত্ত বুজাইবার জন্যই আসিয়াছিল। এদিকে নাল্‌সোটা শুঁড় উঁচু করিয়া গর্ত্তের মুখে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। উইপোকাটা নজরে পড়িবামাত্রই তাহাকে শক্ত চোয়ালের সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়া গাছের দিকে ছুটিল। এই ঘটনার পর আরও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। উইপোকা নাল্‌সোদের অতি উপাদেয় খাদ্য।

এই ঘটনার কিছু দিন আগে ঐ বাগানেই এক দিন দেখিলাম—একটা ফলসা গাছের কচি ডালের ডগার পাতাগুলি মুড়িয়া নাল্‌সোরা একটা বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। বাসাটাকে আরও বড় করিবার জন্য তাহারা বোধ হয় অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই, কারণ পরস্পর সন্নিহিত পাতাগুলি সবই ইতিপূর্ব্বে মুড়িয়া ফেলিয়াছে। কাছাকাছি হইলেও কতকটা বেয়াড়াভাবে একটা মাত্র পাতা বাকী ছিল। সেটাকে বাসার সঙ্গে জুড়িবার জন্য অনেকগুলি পিঁপড়ে মিলিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। সে পাতাটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—নূতন কিছুই দেখা গেল না। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর দেখা গেল—

পিপঁড়েরা ডালটার নীচের দিকে স্তূপাকারে একত্রিত হইয়া ঝুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। উপরের ডালটার সমান্তরালে নীচের দিকে আর একটা সরু ডাল ছিল। বাসা হইতে তার পাতাগুলির ব্যবধান ছিল প্রায় আট-দশ ইঞ্চির মত। ঐ পাতাগুলিকে কাছে টানিয়া বাসার সঙ্গে জুড়িবার উদ্দেশ্যেই তাহারা শিকল গাঁথিবার মতলব করিতেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই শত শত পিঁপড়ে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া প্রায় ½ ইঞ্চি মোটা ও ফুটখানেক লম্বা একটা শিকল করিয়া নীচের ডাল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাতার প্রান্তভাগ ধরিয়া পুনরায় ক্রমশঃ শিকলের দৈর্ঘ্য কমাইতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে

বড় পিঁপড়ের সঙ্গে ক্ষুদে-পিঁপড়েদের লড়াই

তাহারা নীচের পাতাটাকে বাসার উপর আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। তার পর পাতাটাকে বাসার সঙ্গে আটকাইবার পালা। বয়নকারী শ্রমিক পিপীলিকারা তখন শুককীট বা লার্ভা মুখে করিয়া তাহাদের সাহায্যে বয়নকার্য্য সুরু করিয়া দিল।

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লেবরেটরীতে কৃত্রিমবাসায় লাল-পিঁপড়ে পুষিয়াছিলাম। হলদে রঙের ক্ষুদে-পিঁপড়েরা ইহাদের ভীষণ শত্রু। সুবিধা পাইলেই ইহারা লাল-পিঁপড়ের ডিম, লার্ভা, পুত্তলী, পুরুষ ও রাণী পিঁপড়েগুলিকে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করে। কৃত্রিম বাসার চতুর্দ্দিকে প্রশস্তভাবে জলের বেষ্টনী রাখা হয়। একবার দেখিলাম—ক্ষুদে-পিঁপড়েরা জলের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে হাঁটিয়া হাঁটিয়া লাল-পিঁপড়ের বাসায় যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সাত-আট দিনের চেষ্টায় তাহারা জলের উপর দিয়া লাইন করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই বেষ্টনীর জল সর্ব্বদাই স্থিরভাবে থাকে বলিয়া আর একবার তাহাদিগকে অভিনব

পিঁপড়ের বাচ্চার গুটি

উপায়ে পার হইতে দেখিয়াছিলাম। প্রথম বার জল অতিক্রম করিতে গিয়া কতকগুলি ক্ষুদে-পিঁপড়ে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহাদের মৃতদেহগুলি সেই স্থলেই ভাসিতে থাকে। আবার কতকগুলি অগ্রসর হয়। তাহাদেরও অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বাকী-গুলি ফিরিয়া আসে। এই ভাবে ক্রমশঃ মৃতদেহের একটা লাইন অগ্রসর হইতে থাকে। এই মৃতদেহের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ঘাসের টুকরা আনিয়া তাহারা সুন্দর একটি ভাসমান রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই রাস্তার উপর দিয়া ক্ষুদে-পিঁপড়েরা দলে দলে অগ্রসর হইয়া লাল-পিঁপড়েদের ডিম, বাচ্চা, পুত্তলীগুলিকে অপহরণ ত করিলই, অধিকন্তু পিঁপড়েগুলিকে মারিয়া ফেলিয়া মৃতদেহগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া গেল।

আমাদের দেশের সোলেনপ্‌সিস্‌ জাতীয় লাল-রঙের এক প্রকার ক্ষুদে-পিঁপড়ে মাঠে, ঘাটে মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। সময়ে সময়ে ইহারা গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে বেশ উঁচু মাটির স্তূপ সাজাইয়া রাখে। বর্ষার সময়

কর্ম্মীরা গুটী স্থানান্তরিত করিতেছে

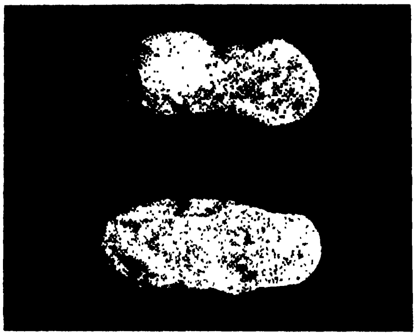

পিঁপড়েদের পুত্তলি

অতি বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট জলে ডুবিয়া গেলে ইহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। দুর্দ্দশা যতই হোক্—জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়াটাই প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাহারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। গর্ত্তে জল ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলিয়া জড়াজড়ি করিয়া এক একটা ডেলা পাকাইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। নীচে যাহারা থাকে তাহারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে পারে—এই জন্য প্রত্যেকে ডেলাটাকে আঁকড়াইয়া উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে। ফলে ডেলাটা জলের উপর ধীরে ধীরে গড়াইতে থাকে। ইহাতে একটি পিঁপড়েরও প্রাণহানি হয় না। জল নামিয়া গেলেই আবার পুরাতন বাসায় ফিরিয়া যায় অথবা স্থানভ্রষ্ট হইলে নূতন বাসার পত্তন করে। উটপাখীরা তাড়া খাইলে যেমন বালিতে মুখ গুঁজিয়া আত্মগোপন করিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করে—আমাদের দেশীয় কাঠ-পিঁপড়েদের মধ্যেও এরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। শত্রুর আগমন টের পাইলেই তাহারা এমন নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে যে, সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু শত্রু অনুসরণ করিলে ইহারা ছুটিতে ছুটিতে কোন কিছুর আড়ালে গিয়া আশ্রয় লয়। শুধু মুখটা আড়ালে পড়িলেই মনে করে—সে যেমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না, শত্রুও বোধ হয় সেরূপ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। কাজেই সেই অবস্থায় সে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। উপরের আবরণটি সরাইয়া লইলেও সে সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কৌশল দুইটি কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও নিঃসন্দেহেই তাহা সংস্কারমূলক। কিন্তু অন্যান্য ঘটনাগুলি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কি না তাহাই বিবেচ্য।

পিপীলিকা-সমাজে খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ কর্ম্মীরাই করিয়া থাকে। উল্লিখিত ঘটনাগুলিতে কর্ম্মীদের কথাই বলা হইয়াছে। আকৃতি, প্রকৃতিতে কর্ম্মীরা পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। স্ত্রী ও পুরুষের ডানা গজায় কিন্তু কর্ম্মীদের ডানা নাই। আবার এমন এক সময় আসে যখন স্ত্রীদেরও ডানা থাকে না। যাঁহারা এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণে আগ্রহান্বিত তাঁহাদের পক্ষে ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ, কর্ম্মী ও ডিম, বাচ্চা, পুত্তলী সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ স্থলে সে সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে। প্রবন্ধের ছবিগুলি হইতে এ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হইতে পারে।

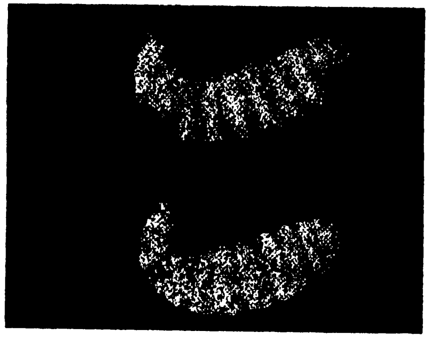

পিঁপড়েদের কীড়া বা বাচ্চা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের অপবাদ রটনা

মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর দেশব্যাপী আন্দোলন ও নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। এই অশান্তি আরম্ভের অল্প কয়েক দিন পরেই নাগপুর থেকে একটা খবর প্রচারিত হয় যে, মধ্যপ্রদেশ গবর্ন্মেণ্টের হাতে এমন সব কাগজপত্র এসেছে যাতে দেখা যায় যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি টেলিগ্রাফের ও টেলিফোনের তার কাটা ইত্যাদির বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। সেই খবরে এ কথা ছিল না যে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি সরকারী কর্মচারী খুন প্রভৃতিরও আয়োজন ক'রে রেখে-ছিলেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ থেকেও জানান হ'য়েছে যে, তাঁদের হাতে এমন কাগজপত্র আছে যাতে প্রমাণ করা যায় যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির গোচরে ও সম্মতি ও অনুমোদনক্রমে নানা রকম উপদ্রবের বন্দোবস্ত অন্ধ্র ও তামিলনাদ প্রস্তুত করেছিলেন। মান্দ্রাজ গবর্ন্মেণ্টের পক্ষের এই জ্ঞাপনীটিতে এ কথা নাই যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি সরকারী কর্মচারী খুন সরকারী ঘরবাড়ী জ্বালান ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। কিন্তু তার পর বড় লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য সর্ ফিরোজ খাঁ নূন আলিগড়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে গবর্ন্মেণ্টের কোন আপোস-মীমাংসা হ'তে পারে না, কেন না গৃহদাহ ও নরহত্যায় কংগ্রেসের হাত এখনও গরম ও রক্তাক্ত রয়েছে। সর্ ফিরোজ খাঁ নূনের এই কথার কোন সরকারী প্রতিবাদ হয় নি, এবং কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের অন্য সদস্যেরাও এখনও (৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) বলেন নি যে তাঁরা সর ফিরোজের সঙ্গে এ বিষয়ে এক মত নন্। সুতরাং তাঁর উক্তির দায়িত্ব পরোক্ষ ভাবে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের উপরও এসে পড়ছে।

দায়িত্ব যার যতটুকুই হোক, ব্যাপারটা বড়ই অশোভন ও অন্যায় যে, কতকগুলি ভদ্রলোককে জেলে আটক ক'রে ও তাঁদের মুখ বন্ধ ক'রে তাঁদের নামে অপবাদ রটান হচ্ছে। আদালতে যখন খুন্যে আসামীর বিচার হয়, তখন তাকেও হাজত থেকে এনে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও নিজের উপর আরোপিত দোষক্ষালনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে যে-মানুষগুলির বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ করা হচ্ছে, তাঁরা প্রতিবাদ করবার সুযোগ পাচ্ছেন না।

গবর্ন্মেণ্ট দুটি কাজ করলে তবে তাঁদের আচরণ ন্যায়-সঙ্গত ও শোভন হয়। তাঁরা যে-যে প্রমাণের বলে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অপবাদ রটাচ্ছেন, সেই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করুন এবং সেগুলি যে খাঁটি, মেকি নয়, তারও প্রমাণ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করুন। গবর্ন্মেণ্টকে খুশি করবার জন্যে মেকি দলিল সৃষ্টি করতে পারে এ রকম গবর্ন্মেণ্ট-ভৃত্য ও বে-সরকারী লোকের অভাব নাই ব'লেই দলিলগুলির খাঁটিত্বের প্রমাণের দাবী করছি।

গবর্ন্মেণ্টের দ্বিতীয় কর্তব্য, মহাত্মা গান্ধীকে এবং কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির কারারুদ্ধ সভ্যদিগকে তাঁদের নামে আরোপিত কলঙ্ক সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য জানাবার সুযোগ দেওয়া।

সরকারের যে কর্তব্য আমরা নির্দেশ করলাম, সেই কর্তব্য সম্পন্ন না হ'লে 'কংগ্রেসের নামে আরোপিত অপবাদে কোন বিবেচক ব্যক্তি বিশ্বাস করবেন না। মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে ও আপাততঃ কাজ-চলা-গোছের জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট (Provisional National Government) গঠন করতে রাজী না-হ'লে কংগ্রেসের যে অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাবার কথা ছিল, তা পরিচালিত হোত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। তিনি ঐকান্তিক অহিংসাবাদী। অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস এরূপ একান্ত ও প্রবল যে, তিনি অহিংসার খাতিরে তাঁর দীর্ঘকালের সহকর্মীদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রেছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ বর্তমানে ডিউক অব উইণ্ডসর) যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন বোম্বাইয়ে খুব উপদ্রব হওয়ায় গান্ধীজী মরণান্ত অনশন আরম্ভ করেন এবং অশান্তি সম্পূর্ণ নিবারিত হয়েছে জেনে তবে তিনি উপবাস ত্যাগ করেন। প্রকৃত বা তথাকথিত কংগ্রেসওআলাদের দ্বারা চৌরিচৌরায় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি তাৎকালিক আইন-অমান্য প্রচেষ্টা বন্ধ ক'রে দেন। অধ্যাপক রাস্‌ব্রুক্ উইলিয়ম্‌স্ তাঁর বার্ষিক ভারতেতিহাসবৎ রিপোর্টে কয়েক বৎসর লিখেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং

তাঁর অহিংসাবাদ প্রচারের ফলে অগণিত সন্ত্রাসনবাদী তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছে এবং সন্ত্রাসনবাদের জোর কমেছে।

মহাত্মা গান্ধী যে কি রকম খাঁটি অহিংসাবাদী তার এই রকম বিস্তর সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

এ হেন গান্ধীজী যে বর্তমান নানা উপদ্রবের মূলীভূত ব'লে কথিত কোন বন্দোবস্তের বা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা কোনক্রমেই বিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু কথা উঠতে পারে যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি তাঁর অজ্ঞাতসারে ঐ সব ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। তাও অবিশ্বাস্য। কারণ, প্রথমতঃ, কমীটির সভ্যেরা জানেন, তিনি কেমন দৃঢ়চিত্ত মানুষ—যে মুহূর্ত্তে তিনি জান্‌তে পারবেন তাঁকে না জানিয়ে ওরূপ কিছু করা হয়েছে সেই মুহূর্ত্তে প্রচেষ্টার নেতৃত্ব ত্যাগ করবেন। দ্বিতীয়তঃ, কমীটির সদস্যদের মধ্যে কয়েক জন আছেন যাঁরা গান্ধী-জীরই মত আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক অহিংসাবাদী, এবং বাকী অন্যেরা ধর্মবিশ্বাসের মত অহিংসায় বিশ্বাসী না হ'লেও, সমীচীন ও বিজ্ঞজনোচিত পলিসি হিসাবে উহাতে বিশ্বাসী। তাঁরা কেউ বর্তমান নানা উপদ্রবের সঙ্গে মধ্য-প্রদেশ গবন্মেণ্ট, মান্দ্রাজ গবন্মেণ্ট, বা সর্ ফিরোজ খাঁ নূনের কথিত প্রকারে সংপৃক্ত থাকতে পারেন না।

—

কংগ্রেসের নামে কলঙ্ক আরোপের সম্ভাবিত কুফল

কংগ্রেসের নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে, আমাদের মতে তা কেন বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা উপরে বলেছি। মধ্যপ্রদেশ গবন্মেণ্ট, মান্দ্রাজ গবন্মেণ্ট ও সর্ ফিরোজ খাঁ নূন্ কিন্তু চান যে, লোকে বিশ্বাস করে যে, বর্তমান নানা উপদ্রব কংগ্রেসের অনুমোদিত ও কংগ্রেসেরই ব্যবস্থা অনুযায়ী।

তাঁরা লোককে যা বিশ্বাস করাতে চান, তা তাঁরা যদি সত্যই বিশ্বাস করে তা হ'লে তার একটা সম্ভাবিত কুফলের কথা কি তাঁরা ভেবে দেখেছেন? সম্ভাবিত কুফলটা কি, তা বলছি।

সরকারপক্ষ থেকেই বার বার বলা হয়েছে যে, ভারত-বর্ষে যত রাজনৈতিক সভা-সমিতি আছে, কংগ্রেস তাদের মধ্যে বৃহত্তম, বলবত্তম এবং সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রভাবশালী। তার থেকে বুঝা যায় যে, যারা কংগ্রেসওআলা নয় এ রকম বিস্তর লোক কংগ্রেসের প্রভাবাধীন এবং কংগ্রেসনেতাগণকে বিশ্বাস করে। এই সব অগণিত লোক যদি বিশ্বাস করে যে, বর্তমানে যত রকম উপদ্রব হচ্ছে তার সমস্তই কংগ্রেসের অনুমোদিত, তা হ'লে তারা সেই রকম গর্হিত উপদ্রবগুলাকে আর গর্হিত মনে না-করতে পারে—বিশেষতঃ উপদ্রবকারী জনতাকে বুঝান কঠিন হবে যে, সেগুলা গর্হিত। কারণ, জনতা কখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা করে না, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, ন্যায্য বা অন্যায্য একটা মতের ঢেউ উঠলে তাতেই ভেসে চলে। জনতার মনে যদি ধারণা জন্মে যে, বর্তমান সব রকম উপদ্রব কংগ্রেসের অনুমোদিত, তা হ'লে উপদ্রব দমন করতে গবন্মেণ্টকে কত বেগ পেতে হবে এবং দমনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও দেশে কিরূপ একটা প্রবল ও তীব্র অসন্তোষ থেকে যাবে, গবন্মেণ্ট তা ভেবে দেখেছেন কি?

কংগ্রেসের অখ্যাতি রটনায় লাভই বা কী? কংগ্রেস যদি অপদস্থ, হেয় এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হয়, তা হ'লেও কংগ্রেসের বাঞ্ছিত যে পূর্ণ স্বরাজ তাতে ত লোকে শ্রদ্ধা হারাবে না। পূর্ণ স্বরাজ হিন্দু মহাসভার লক্ষ্যস্থল। মুসলমান জামিয়ৎ-উল-উলেমা, অর্হর দল ও মোমিন দল, এবং কম্যুনিষ্ট দল, ও অ-দলভুক্ত অন্য অগণিত লোক পূর্ণস্বরাজ চায় এবং এখনই চায়। সুতরাং কংগ্রেসবধ ও পূর্ণস্বরাজবধ সমার্থক নয়, সমার্থক হবে না।

—

উপদ্রব দমনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

বর্তমান সময়ে যে উপদ্রব দেশব্যাপী হয়েছে, কেবল মাত্র দমননীতির প্রয়োগ দ্বারা তার মূল উচ্ছেদ করা যাবে না, এ কথা শুধু ভারতবর্ষের নানা দলের, শ্রেণীর ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতারাই ও ভারতীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরাই যে বলছেন, তা নয়, বিলাতী অনেক কাগজেও—টাইম্‌সে পর্য্যন্ত—লেখা হচ্ছে যে, গঠনমূলক কিছু করতে হবে। তার মানে, ভারতবর্ষের লোকদের হাতে রাষ্ট্রীয় কাজের চূড়ান্ত ক্ষমতা দিতে হবে। তা দিতে হ'লে সব দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক। সর্বোচ্চ রাজ-পুরুষেরাও বার বার বলেছেন, কংগ্রেস এ দেশের বৃহত্তম ও বলবত্তম জনপ্রতিনিধি-সভা। পরামর্শ করতে হ'লে তাকে বাদ দিলে চলবে না। তার নেতাদিগকে এবং মহাত্মা গান্ধীকে খালাস দিয়ে তাঁদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। তা করলে দেশটা আপনা-আপনি ঠাণ্ডা হবে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে যেমন এক সময় সন্ত্রাসনবাদের

প্রভাব কমেছিল, বর্তমান সময়েও তিনি মুক্তি পেলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও উপদেশে উপদ্রবের মূলে ঘা পড়বে, তার মূল উচ্ছেদ হবে।

—

আমেরিকাকে ভ্রমে ফেলবার ক্রিপসের অপচেষ্টা

সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ যে প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তা কংগ্রেস কিম্বা অন্য কোন দলই গ্রহণ না করায় তিনি ভারতীয়দের প্রতি বড়ই বিরূপ হয়েছেন। আমেরিকার উদ্দেশে বেতার বক্তৃতা দ্বারা এবং আমেরিকার কাগজে প্রবন্ধ লিখে তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে সে দেশে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর সমাজতন্ত্রী ও ভারত-বন্ধু ছদ্মবেশটা খসে গিয়ে তাঁর আসল সাম্রাজ্যবাদী মূর্তিটা প্রকট হয়ে পড়েছে। তিনি আমেরিকান্‌দিগকে ঠারেঠোরে কি প্রকারে ভ্রমে ফেলবার চেষ্টা করছেন, তার বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে কোন লাভ নাই। কারণ এ দেশে তাঁর সব উক্তি সম্বন্ধে যা বলা ও লেখা হচ্ছে বা হবে, তা তাঁর কাছে বা আমেরিকান্‌দের কাছে অল্পই পৌছবে—হয়ত মোটেই পৌছবে না। তাই তাঁর অপচেষ্টার একটু মাত্র নমুনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমসে ক্রিপ্‌স্ সাহেব লিখছেন :—

I fully realize and sympathize with the desire of the Indian people for self-government. But they will not attain it by admitting the Japanese or any other Axis powers."

তাৎপর্য্য। "আমি ভারতীয়দের স্বশাসনের অভিলাষ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি ও তার সহিত সহানুভূতি করি। কিন্তু জাপানী বা অন্য কোন চক্রশক্তিকে ভারতে ঢুকতে দিয়ে তারা স্বশাসক হ'তে পারবে না।"

যেন ভারতীয়েরা জাপান বা জার্মেনী বা ইটালীকে ভারতবর্ষে এনে স্বাধীন হ'তে চাচ্ছে! প্রকৃত কথা ঠিক্ এর বিপরীত। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতির নেতারা বার বার বলেছেন যে, তাঁরা ব্রিটিশ-অধীনতার পরিবর্তে স্ববশতাই চান, জাপানের বা অন্য কোন শক্তির অধীন হ'তে চান না। তাঁরা আরো বলেছেন, স্বাধীনতা চান পূর্ণ উৎসাহ ও শক্তির সহিত জাপান ও অন্যান্য আততায়ীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য। অধিকন্তু মহাত্মা গান্ধী জাপানের উদ্দেশে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে জাপানের পরদেশ-অধিকার-চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং জাপানকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দেশের লোকেরা তাদের এ দেশ আগমনে যথাসাধ্য বাধা দেবে—জাপান যেন ভারতীয়দের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহানুভূতির আশা না রাখে।

ক্রিপ্‌স্ আরো লিখেছেন :—

"For the British to walk out of India to-day would mean that India would be left without any constitution or any Government......It would endanger the life and safety of every European, American and Chinese soldier and civilian and would create a wide breach in the United Nations' front."

তাৎপর্য্য। সব ব্রিটনরা এখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার মানে হবে এই যে, ভারতবর্ষের কোন শাসনতন্ত্র বা গবন্মেণ্ট থাকবে না।... তাতে প্রত্যেক সামরিক ও অসামরিক য়ুরোপীয়, আমেরিকান্ ও চৈনিকের জীবন বিপন্ন হবে এবং সম্মিলিত জাতিরা যে একজোট ছত্রবদ্ধ হয়ে লড়ছে, তাদের পংক্তিতে বড় একটা ফাঁক হবে ও তারা ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হবে।

কিন্তু ইংরেজদিগকে কেউ ত তল্পিতল্পা নিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বলে নি। কেবল বলা হয়েছে, যে, চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হোক, আপাততঃ কাজচলা-গোছের একটা জাতীয় গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং তা প্রতিষ্ঠিত হবার পর তবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে। কংগ্রেস-নেতারা ও অন্য যাঁরা ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বলেছেন, তাঁরা "প্রভু ব্রিটেনকেই" ভারত ত্যাগ করতে বলেছেন, বন্ধু ও সহচর ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে বলেন নি। তাঁরা ইংরেজ আমেরিকান ও চীনা সৈন্যদিগকে বন্ধুরূপে ভারতবর্ষে থেকে ভারতবর্ষের পক্ষে যুদ্ধ করতে অনুরোধ করেছেন। ব্রিটেনের ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব ত্যাগের মানে মোটেই অরাজকতা নয়। এই সমস্তই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির বক্তৃতায় ও অন্যান্য নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্রিপ্‌স্ সাহেব যা লিখেছেন, তা কি তাঁর অজ্ঞতাপ্রসূত? না, তিনি জেনেশুনে আমেরিকাকে ভারতবর্ষের প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করবার জন্যে এই সব কথা লিখছেন?

কংগ্রেস-নেতারা যে চক্র-শক্তিপুঞ্জের বিরোধী অনেক দিন থেকেই ছিলেন, পরে ছিলেন এবং এখনও আছেন, তা ক্রিপ্‌স সাহেব জানতেন না বা জানেন না, এ বিশ্বাস করা যায় না। "দি নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান্ এণ্ড্ নেশ্যন" বিলাতের একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক। তার ১১ই এপ্রিলের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখছি,

"From the outbreak of the War Congress has announced its hostility to the Axis."

"যুদ্ধ বাধ্‌বার সময় থেকেই কংগ্রেস চক্রশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুতা জ্ঞাপন করেছে।"

তখন ক্রিপ্‌স্ সাহেব দিল্লীতে কংগ্রেস-নেতা ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবগুলি আলোচনা করছিলেন। চক্রশক্তির প্রতি কংগ্রেসের যে মনোভাব বিলাতের লোক পর্য্যন্ত জেনেছিল, ক্রিপ্‌স দিল্লীতে এসেও তা জান্‌তে পারেন নি, এটা অসম্ভব।

—

ভারত-সচিব ও ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর ভারতীয়-ঐক্য-বাঞ্ছা

কারিগরী জ্ঞানে ভারতবর্ষের এই রকম কতকগুলি যুবককে বিলাতে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতির নানা শিল্পে আরও দক্ষ করা হচ্ছে। বেবিন সাহেব এই রীতি প্রবর্তন করেন বলে, এই সব ভারতীয় যুবককে "বেবিন ছোকরা" (Bevin boys) বলা হয়। পক্ষাধিক পূর্বে ভারতসচিব এমারি সাহেব তাদের কাছে একটা বক্তৃতা করেন। তাতে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ তখনই স্বাধীন হতে পারবে যখন ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে এবং যখন ভারতবর্ষ যে-কোন আততায়ী জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

এই কথাগুলায় নূতনত্ব কিছুই নাই। যারা ব্রিটিশ পলিসির এবং এমারি সাহেবের রীতি প্রকৃতির সহিত পরিচিত নয় এই রকম বক্তৃতা থেকে তাদের মনে হ'তে পারে যে, সমুদয় ব্রিটিশ জাতি ও এমারি সাহেব ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বদেশরক্ষায় সমর্থ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনৈক্যপরিপোষক ও অনৈক্যবর্দ্ধক। ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের অনেক নিয়ম ও প্রথাও ঐ রকম। আত্মরক্ষা সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক সৈন্যদলে ঢুকতে চায়, কিন্তু ব্রিটিশ পলিসি যোদ্ধা জাতি ও অযোদ্ধা জাতি এই রকম একটা শ্রেণী বিভাগ করে, ভারতীয় জনগণের ঐ ইচ্ছা পূরণে একটা বাধা খাড়া ক'রে রেখেছেন।

কোনো জাতি একাই স্বদেশ রক্ষা করতে না পারলে তারা স্বাধীনতার অধিকারী হবে না, এটাই বা কেমন কথা? ইয়োরোপের চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি দেশ আত্মরক্ষা করতে পারে নি, কিন্তু তা হ'লেও তাদের স্বাধীনতার জন্যে ব্রিটেন লড়ছেন এবং যুদ্ধান্তে তারা স্বাধীনতা পাবে বলছেন। তা ছাড়া, পৃথিবীতে কোন্ দেশটা আছে যে, একাই, অন্য কোন জাতির কোনো রকম সাহায্য না নিয়েই, আত্মরক্ষা করতে পারে? গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা না নামলে ব্রিটেন আত্মরক্ষা করতে পারত কি? বর্তমান মহাযুদ্ধে সম্মিলিত জাতিদের (United Nations-এর) মধ্যে কোন্ জাতিটা একাই নিজের দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ?

আমেরিকার প্রসিদ্ধ মাসিক এশিয়ার (*Asia*র) সদ্য-প্রাপ্ত জুন সংখ্যায় ব্রিটিশ মনীষী বেট্রাণ্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধ আছে। তার এক জায়গায় তিনি এই মামুলী সুবিদিত কথাটি লিখেছেন:—

> Nominal complete independence is an isolationist ideal, and is no longer possible for any country. Denmark and Norway, Holland and Belgium, Rumania, Greece and Yugoslavia, each in turn insisted on complete independence until they found themselves conquered by the Nazis. Every country, not excepting the United States, if it insists on isolated independence, will expose itself to foreign conquest."

তাৎপর্য্য। নামে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা একটা নিঃসঙ্গ একাকীত্বের আদর্শ, এবং এখন আর কোন দেশের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। ডেন্মার্ক নরওয়ে হল্যাণ্ড বেলজিয়ম রুমানিয়া গ্রীস যুগোশ্লোভিয়া প্রত্যেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার জেদ ধ'রে ছিল যত দিন পর্য্যন্ত না তারা নাৎসীদের দ্বারা পরাজিত ও পদানত হ'ল। প্রত্যেক দেশ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও—নিঃসঙ্গ স্বাধীনতার জেদ ধ'রে থাকলে নিজেকে বিদেশীর দ্বারা পরাভূত হবার আশঙ্কায় ফেলবে।

তিনি বলেন, স্বাধীন থাকতে হ'লে ভারতবর্ষকেও অন্যের সাহায্য নিতে হবে, এমন কতকগুলি দেশের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হতে হবে যারা নিজে বিজিত হতে চায় না, অন্যকেও পদানত করতে চায় না। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকতে চায় না, এই জন্য তিনি স্বাধীন ভারতকে চীনের মত কতকগুলি প্রাচ্য স্বাধীন দেশের সহিত সন্ধি-বদ্ধ হ'তে বলেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী য়্যাটলি সাহেব এবার্ডীনে এক বক্তৃতায় বলেন,

"আমরা ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে অনেক ভুল করেছি কিন্তু আমরা ভারতবর্ষকে শতাধিক বৎসরব্যাপী আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসন দিয়েছি এবং গত ২৫ বৎসরে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনের দিকে প্রভূত প্রগতি করেছি। আরো প্রগতি আটকে রয়েছে ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের জন্যে, এবং এই কারণে যে, রোল্‌স্ রয়েস মোটর গাড়ীর থেকে গোরুর গাড়ীর স্তর পর্য্যন্ত সভ্যতার নানা স্তরে অবস্থিত ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে গণতন্ত্র প্রবর্তনে নানা বিঘ্ন-বাধা আছে।"

ব্রিটিশ যুগে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসন এবং গত ২৫

বৎসরের প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা অনেক করেছি। সদ্য-সদ্য আর করা দরকার নাই। ভারতীয় ঐক্য ও অনৈক্য সম্বন্ধেও, মিঃ এমারির উক্তি আলোচনা-প্রসঙ্গে, কিছু বলেছি। বহু কোটি লোকের মধ্যে গণতন্ত্র প্রবর্তন চীনে ও সোবিয়েট রাশিয়ায় হয়েছে। চীনের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়েও বেশী। এবং চীনে, বিশেষতঃ সোবিয়েট রাশিয়ায়, সভ্যতার সব স্তরে অবস্থিত লোক আছে—এমন অনেক জা'ত আছে যাদের ভাষার কোন বর্ণমালা ও সাহিত্য এই সেদিন পর্য্যন্ত ছিল না এবং যারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। তবুও ভারতবর্ষের চেয়ে বৃহত্তর এই দুই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চল্‌ছে

—

শান্তিনিকেতনে ২২শে শ্রাবণ

গত বৎসর (সন ১৩৪৮ সাল) ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বর্তমান বৎসরে ঐ দিনে বাংলা দেশের এবং বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এবং তাঁহার পুণ্য-চরিত বর্ণন ও শ্রবণের নিমিত্ত সভার অধিবেশন হয়। শান্তিনিকেতনে তাঁহার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার বর্ণনা সেখানকার একটি ছাত্রীর চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি। চিঠিটি তার এক গুরুজনকে তাঁর অবগতির জন্য লেখা, প্রকাশের জন্য লিখিত হয় নি।

এখানে ২২শে শ্রাবণের অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরের গানে, শ্রাদ্ধ-বাসরে করবার গানে এবং রাত্রে ও সকালে আশ্রম বৈতালিক প্রভৃতির গানে শৈলজা-দা আমার নাম দিয়েছিলেন। এসব গানের জন্য অনেক সময় দিতে হ'তো—অনেকবার ক'রে শেখানো না হ'লে গান ত ভাল হয় না। পড়াশুনার চাপ এবার তা ছাড়া একটু বেশী।......

২২শে শ্রাবণের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ও সুসম্পন্ন হ'য়েছিল। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিও শোক করছিলেন মনে হচ্ছিল। ২১শে শ্রাবণ থেকে ২৪শে শ্রাবণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছিল। তবুও এই বৃষ্টিতেও কোন গোলমাল * বা বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নি।

২২শে শ্রাবণ সকাল বেলা সাড়ে ছয়টায় মন্দিরে উপাসনা হবার আগে সমস্ত আশ্রম ঘুরে ভোর তিনটায় বৈতালিক হয়েছিল "ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়" গান ক'রে। সাড়ে ছয়টায় মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হ'ল। আমাদের সমবেত সঙ্গীত ছিল তিনটি—"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ," "কেন রে এই দুয়ারটুকু," এবং "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে"। শান্তিদেব ঘোষ একলা "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গান ক'রেছিলেন; খুব সুন্দর হ'য়েছিল। ক্ষিতিমোহন বাবুর উপাসনা ও পাঠ খুব ভাল লেগেছে। ওঁর উপাসনার মধ্যে দিয়ে অনেক শেখা যায়।

গুরুদেব গাছপালা, পশুপাখী চিরদিন খুব ভালবাসতেন। তাঁর স্মরণে সেই জন্য ২২শে শ্রাবণ মন্দিরে উপাসনার পর বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। মীরা মাসী ছাতিমতলার মহর্ষির বেদীর কাছে এক জায়গায় একটি আমগাছ রোপণ করেন। শান্তিনিকেতনের এই উৎসবটি অন্যান্য উৎসবের মধ্যে একটি দেখবার মত উৎসব। এখানের মেয়েরা বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে মন্দিরা ও অর্ঘ্যডালা নিয়ে সামনে দিয়ে নেচে নেচে ছাতিমতলায় গিয়েছিল। নাচের দলের পর শিশুবৃক্ষকে চার জন গেরুয়াপরা কলাভবনের ছাত্র চতুর্দোলায় ব'য়ে নিয়ে গেল এবং একজন চতুর্দোলার মাথায় সুন্দর সোলার উঁচু ছাতা ধ'রে নিয়ে গেল। আমরা গানের দলের ছেলেমেয়েরা সবার শেষে গান করতে করতে গিয়েছিলাম।

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও", "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল" এবং "আহ্বান আসিল মহোৎসবে" গান তিনটি বৃক্ষরোপণ উৎসবে ক'রেছিলাম আমরা। ক্ষিতিমোহন বাবু কিছু মন্ত্রপাঠ করলেন এবং অন্যান্য কাজ মীরা মাসী করলেন।

"আগুনের পরশমণি" গান গেয়ে আমরা 'উত্তরায়ণে' ঢুকলাম বৃক্ষ-রোপণের পর। 'উদীচী'তে গুরুদেবের অস্থি রক্ষা করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য জিনিষপত্রও সেই বাড়ীতে আছে। 'উদীচী'তে গিয়ে "দুঃখের তিমিরে" গান করলাম সবাই মিলে। শূন্য চৌকী দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গেল;—গান ভাল জমে নি। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রথী দা গুরুদেবের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান 'উদয়নে' ক'রেছিলেন। আমরা সেখানে "তমীশ্বরাণাং পরমংমহেশ্বরম্", "তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে" এবং "অল্প লইয়া থাকি" গানগুলি ক'রেছিলাম। ইন্দুলেখা ঘোষ "সমুখে শান্তিপারাবার" গানখানি একলা ক'রেছিলেন।

রথী দার পাঠ ও ক্ষিতিমোহন বাবুর উপাসনা ও মন্ত্রপাঠ খুব সুন্দর লেগেছিল। শ্রাদ্ধের স্থান পুপে-দি এবং বুড়ী-দি বৌঠানের সাহায্যে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়েছিলেন, গুরুদেব ছবি রাখা পছন্দ করতেন না। কোথাও তাঁর কোনও ছবি দেখলাম না। সভার সামনে ছোট বেদীর উপর লম্বা পিতলের ফুলদানীতে খুব বড় বড় সুন্দর শ্বেতপদ্ম সাজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। বেদীর দু-পাশে দুটো পিতলের পিলসুজের প্রত্যেকটির উপরে পাঁচটি ও নীচে সাতটি প্রদীপ রাখা ছিল। তার পাশে পাশে ফুল সাজানো ছিল। বেদীর সামনে ধূপধুনা ও ফুল রাখা ছিল। তার সামনে গোল ক'রে বড় ও সুন্দর আলপনা দেওয়া হ'য়েছিল। আলপনার মাঝে বড় প্রদীপদানের উপর সুগন্ধি ধুনার পাত্র ঘিরে প্রদীপ সাজানো ছিল। আলপনা ঘিরেও অনেক প্রদীপ সাজানো ছিল। মাঝে মাঝে রূপার থালায় ফুলের মালা ও ফুল রাখা ছিল। সভার উপর সুন্দর চাঁদোয়া ছিল ও তার থেকে সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা ঝোলানো হ'য়েছিল।

অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই সুন্দর হ'য়েছিল। গুরুদেব নিশ্চয় তৃপ্ত হয়েছিলেন তাঁর ছাত্রছাত্রী আত্মীয় বন্ধুদের কাজে।

বুঝতেই পারছিলাম তিনি সব সময়ে সব জায়গায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ তিনি অনেক দিয়েছেন। তবুও আমরা নেহাৎ সাধারণ মানুষ এসব ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া আমাদের পক্ষে খুব শক্ত।

শান্তিনিকেতনে কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে অথচ গুরুদেব নেই, এটা যে কতটা খারাপ মনে হয় বোঝাতে পারা যায় না।

তা ছাড়া গুরুদেবের আদর্শ রক্ষা করতে হ'লে যেসব গুণ দরকার, সে-সব নিয়ে খুব কম লোকই জন্মান। বিশেষ ক'রে আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছাটা যেন আরও ক্রমশই কমছে।

* গত বৎসর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানও অজস্র বৃষ্টি সত্ত্বেও যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়েছিল।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভারতবর্ষে ত এবার আবার অসম্ভব গোলমাল আরম্ভ হ'ল,—এই সময়ই গুরুদেব নেই,……

—

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর উন্মত্ত প্রলাপ

শেক্সপিয়ার ব'লে গেছেন, "Genius is to madness allied," "প্রতিভার সঙ্গে উন্মাদের সম্পর্ক আছে।" এর অর্থ এ নয় যে, প্রতিভাশালী লোক মাত্রেই পাগল, কিম্বা পাগল মাত্রেই প্রতিভাশালী। এর মানে এই যে, প্রতিভাশালী কারো কারো স্বভাব-চরিত্রে পাগলামি দেখা যায়। অনেক স্থলে তা নির্দোষ পাগলামি—যেমন ছিটওআলা বা খেয়ালী কোন কোন প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর যে উন্মত্ত প্রলাপের কথা বলতে যাচ্ছি, বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতা তাকে কলুষিত করেছে।

গত ১৬ই আগষ্টের সাপ্তাহিক "বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্" কাগজে সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তাতে তাঁর অনেক প্রশংসা আছে, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা আছে। এই সবই সত্যি কথা, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁর চরিতাখ্যায়ক মদনগোপাল নামক জনৈক লেখক কেন যে খাপছাড়া ভাবে বিজ্ঞানী রামনের বাঙালীদের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলবী কেনই বা তা ছেপেছেন বুঝতে পারি না।

> He is a man of strong likes and dislikes. His prejudice against Bengal, for instance, is very deep-set. He sees nothing good in Bengal and sincerely believes that the Bengalees have made no contribution whatsoever to the life of the country. In a mood of half-jest and half-seriousness he said to me: "Don't you think they have, these Bengalees, some taint of Mongoloid blood in them? At least I do. After the war when the provincial boundaries are re-drawn, it would be a very good thing if Bengal could be shunted out of India and joined to Burma. We in India would be a happier family."

শোনা যায়, একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন বন্ধু তাঁকে বলেন, "অমুক লোকটা আপনার খুব নিন্দা করছিল।" তাতে তিনি বলেন, "কই, আমি তার কখনো কোন উপকার ক'রেছিলাম ব'লে ত মনে পড়ছে না; তবে কেন সে আমার নিন্দা করছে?" রামন্ খুব প্রতিভাশালী লোক, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা দেশ ও বাঙালী তাঁকে প্রতিভা বিকাশের ও প্রকাশের সুযোগ ও উপকরণ না দিলে তিনি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী হ'তে পারতেন না। কাজেই তিনি বঙ্গের ও বাঙালীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিষম বাঙালী-বিদ্বেষী হয়েছেন। এতে বাঙালীর কিছু ক্ষতি নাই। এতে কেবল তাঁর ক্ষুদ্রাশয়তা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।

বাংলা দেশ ও বাঙালীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপকারের বোঝা অসহ্য হওয়াতেই যে বিজ্ঞানী রামন্ বাঙালীর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছেন তা নয়;—অন্য কারণও আছে। তিনি কল্‌কাতায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা ও তার পরীক্ষণাগার প্রভৃতি দখল করবার চেষ্টায় ছিলেন। বাঙালীর চেষ্টায় সেখান থেকে তাড়িত হন। বাঙ্গালোরে তিনি জামশেদজী তাতা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানভবনের ডিরেক্টর ছিলেন। সেখানে তাঁর স্বৈরাচার স্বার্থপরতা ও খামখেয়ালি ব্যবহারে তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন এবং অনেকটা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাঙালী সদস্যদের চেষ্টায় ডিরেক্টর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখন একজন বাঙালী—ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ - তার ডিরেক্টর।

রামন্ বলেছেন, বাঙালীদের রক্তে মোঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণও আছে। এটা নূতন কথা নয়। রিজ্‌লী অনেক আগে বলে গেছেন যে, বাঙালীরা কতকটা মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করে গেছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে নৃতত্ত্বের বিচারে কোনো অমিশ্র জা'ত ("Pure race") নাই। তথাকথিত আর্য্যেরাও খাঁটি আর্য্য নয়। আর মোঙ্গোলীয় হওয়াতে ত কোন অপমান নাই। মোঙ্গোলীয় চীনেরা প্রাচীন কালেই মুদ্রণশিল্প ও অন্য নানা শিল্প উদ্ভাবন করে।

কংফুচ লাওৎসে প্রভৃতি চীন উপদেষ্টারা জগদ্বরেণ্য। চা রেশম চিনি সয়া শিম প্রভৃতির উৎপাদন প্রাচীন কাল থেকে চীনে চ'লে আসছে। চৈনিক ও জাপানী চিত্রকরেরা জগতে প্রসিদ্ধ। জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নূতন আবিষ্ক্রিয়া করেছে। বর্তমান সময়ে জাপানের আসুরিক দৌরাত্ম্যে পৃথিবী কম্পমান, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে চীনের শৌর্য্য অনতিক্রান্ত।

সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের উন্মত্ত প্রলাপের সমুচিত জবাব দিয়েছেন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার ২২শে আগস্টের সংখ্যায়। এই কাগজ যোগ্যতার সহিত ৫২ বৎসর চলছে। এর সম্পাদক রামনেরই মত মান্দ্রাজী এবং খুব যোগ্য সাংবাদিক। রিফর্মার লিখেছেন:—

SIR C. V. RAMAN ON BENGALEES

Last week's *Sunday Chronicle* published what purported to be a character sketch of Sir C. V. Raman,

the eminent Indian physicist, by Mr. Madan Gopal. In it, the writer without rhyme or reason introduced a venomous tirade against Bengal and Bengalees, which has no value whatever as a key to the life and work of his subject. The writer described his hero as a man of "strong likes and dislikes," which no scientist should be, and to illustrate this trait in Sir Chandrasekhar, mentioned his antipathy to Bengal and Bengalees. He said:

"His (Raman's) prejudice against Bengal, for instance, is very deep-set. He sees nothing good in Bengal and sincerely believes that the Bengalees have made no contribution whatsoever to the life of the country. In a mood of half-jest and half-seriousness he said to me: "Don't you think they have, these Bengalees, some taint of Mongoloid blood in them? At least I do. After the war when the provincial boundaries are re-drawn, it would be a very good thing if Bengal could be shunted out of India and joined to Burma. We in India would be a happier family." He also believes that the Pakistan cry has been raised and backed up by the vested interests here."

Mr. Madan Gopal himself says that these words were not spoken in entire seriousness. It was quite wrong of him to repeat remarks so wounding to the feelings of over fifty millions of his countrymen, especially as every educated Indian knows that every statement in Sir Chandrasekhar's outburst is untrue, is, indeed, palpably false. Sir C. V. Raman when he speaks of "the taint of Mongoloid blood" in Bengali veins, strays from his proper field of Physics. His opinion on racial mixtures is worthless. He was indulging in a pseudo-scientific assumption solely with a view to invest his prejudice with an air of scientific precision. Why should an admixture of Mongoloid blood be a "taint" any more than an admixture of "Austroloid" blood which some anthropologists suspect in the South Indian? Lovat Fraser who reported a tour of Lord Curzon in East Bengal, wrote of the Pandits who presented an address in Sanskrit to the Viceroy, as resembling, in their ceremonial dress, ancient Romans more than any Indian people.

That the Bengalees have made no contribution to the culture and life of the country is so monstrous a mis-statement that it is incredible that it should have proceeded from any sane Indian. Even in Sir C. V. Raman's own field, Sir Jagadish Chunder Bose achieved a world-wide reputation before anybody heard of Sir C. V. Raman. And Sir Jagadish, unlike Raman, traced his own great discoveries to the inspiration of the ancient wisdom of India. Then in the larger sphere of life, Bengalee thinkers and workers have led the way for the rest of India—Raja Ram Mohan Roy, the Tagores, Iswarchandra Vidyasagar, Ramakrishna Paramahamsa. What province has produced such a fine galaxy of women leaders like Mrs. P. K. Roy, Lady Bose, Mrs. Saraladevi Choudarani and Mrs. Sarojini Naidu? Bengalees are said to be clannish but Bengalee women have married non-Bengalees and set examples of progressive womanhood in whatever part of the country they lived in. Bengalee scholars like Kalidas Nag, Benoy Kumar Sarcar, have taken as their field wide areas which were neglected by most other provincials. Speaking broadly, there have been more Bengalees with a world outlook than natives of other provinces. As for original ideas, it is enough to say that Swami Vivekananda had the largest following in Madras and Arabindo Ghose's Ashram flourishes in South India. But for these and other illustrious Bengalees where would India be today? In religion, in literature, in social reform, in politics, Bengal has been the vanguard of Indian progress. Sir Syed Ahmed said that the Bengalees were the only people of whom Indians might be proud. Gokhale many years later said that what Bengal thinks today, the whole of India thinks tomorrow. There is no province in India which has a prouder and fuller record of contributions to national life than Bengal. Sir C. V. Raman would be glad to see Bengal joined to Burma in the post-war settlement. Then, he thinks, India will be a happy home. Yet he is apparently opposed to Pakistan which rests on the same illusion. India without Bengal would be a nation without eyes and ears.

Sir C. V. Raman would be spending his days in the pensioned obscurity of a retired official but for the far-seeing patriotism and breadth of outlook of the great Bengalee, Sir Asutosh Mukherjee. It was Sir Asutosh who drew to Calcutta, the cream of India's intellect from all parts of the country and gave it the opportunity to make its contributions to world culture. One of the most touching tributes to Sir Asutosh at his death came from an Anglo-Indian. Sir Asutosh who was no ornamental Vice-Chancellor, saw from the young man's college work and examination papers that he had real talent. He provided him with a scholarship to pursue post-graduate studies abroad. Sir Asutosh was not content with that. He saw him off at the Bunder and kept up a correspondence with him about his progress, amidst his heavy engagements as a Judge of the Calcutta High Court and the greatest Vice-Chancellor of the largest Indian University. It is, to say the least, ungracious of Sir C. V. Raman to speak of the people from whom Sir Asutosh sprang and whom Sir Asutosh loved, in the terms in which he is reported to have spoken of them. We have been expecting a repudiation which we hope may yet be forthcoming. It is true that at present Bengal has rather gone into the background. She has not yet recovered from the wounds of the Partition. Communalism has persisted even after the modification of the Partition, and hampered Bengal functioning in the full vigour of her genius. The Gandhian Congress, with its particularist and provincial ideas, added to her difficulties. But she is emerging out of her travail. The Hindu-Muslim question is being solved there on the basis of the common Bengali origin and culture of the two communities. Bengal has played a great part in the evolution of modern India and she has a yet greater part to play in shaping the country's future. It is a Bengali poet who was inspired to compose the beautiful hymn which all India has accepted as the National Anthem.

আমাদের বাঙালীদের দোষত্রুটি অনেক আছে। অন্যান্য জাতিরও তা আছে, ব'লে আমরা আত্মদোষক্ষালন করতে চাই নে। আমাদের নানা দোষত্রুটিসত্ত্বেও যে একজন মান্দ্রাজী সাংবাদিক ভ্রাতা বাঙালীদের কৃতিত্বের কথা লিখেছেন, তার জন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি যা লিখেছেন, তাতে আর একটা কথা যোগ ক'রে দেওয়া যায়। বাংলা সাহিত্য যে বাঙালীর একটা অসাধারণ কৃতিত্ব, তার এই একটা প্রমাণই যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষের অন্য সব আধুনিক প্রাদেশিক সাহিত্যে বাংলা বিস্তর গ্রন্থের অনুবাদ আছে, এবং বাংলা সাহিত্য থেকে অন্যান্য প্রদেশের লেখকেরা অনুপ্রাণনা পেয়েছেন।

—

"বিশ্বভারতী পত্রিকা"

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় "বিশ্বভারতী পত্রিকা" প্রকাশিত হওয়ায় খুশি হয়েছি। এর দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। এটি না বেরলে, রবীন্দ্রনাথের, সম্পাদক মহাশয়ের ও অন্য অনেক প্রতিভাশালী লেখকের যে-সব লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছে ও হবে, সেগুলি বেরত না, কিংবা বিলম্বে বেরত। এই পত্রিকাটি পুরা বা অংশতঃ ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি ও পরিচালিত হবে না ব'লে এটি ঠিক নিজের আদর্শ রক্ষা ক'রে চলতে পারবে—অন্ততঃ ব্যবসা-ঘটিত কোন বাধা একে আদর্শচ্যুত করবে না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যদি এই রকম একটি কাগজ চালাতেন, তা হ'লে তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ছাপ থাকৃত এতে তার আশা করা উচিত হবে না। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ "ব্রতের দীক্ষা" থেকে তার কারণ কিছু বোঝা যাবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও ভাবধারা এতে রক্ষিত হবার আশা পাঠকেরা করবেন। সে-ধারা প্রথম সংখ্যাতেই অংশতঃ রক্ষিত হয়েছে।

—

শান্তিনিকেতনের 'আইডিয়া'

"বিশ্বভারতী পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন :—

"শান্তিনিকেতন একটি চিত্তাকর্ষক idea। এ idea-র জন্ম রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ idea দেহধারণ করেছে। বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। প্রথমেই, চোখে পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে। প্রমাণ, শান্তিনিকেতনের সংগীতভবন ও কলাভবন। সংগীতের চর্চা ও চিত্রকলার চর্চা যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, সে জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল।"

"শান্তিনিকেতনের 'আইডিয়া'" প্রমথবাবু কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, জানি না। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধ্যাত্মিক সাধনার্থীদের ধ্যানধারণাদির সুবিধার নিমিত্ত। রবীন্দ্রনাথ পরে যে এখানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়ে প্রাচীন কালের তপোবনের আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তার মধ্যেও মহর্ষির অনুপ্রাণনা ছিল, এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহর্ষির সম্মতি ও অনুমতি অনুসারে। আমাদের ধারণা এই রকম। তাতে ভুল আছে কি না বলতে পারি না।

যাই হোক, শান্তিনিকেতন শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা না বললে, "এ idea-র জন্ম রবীন্দ্রনাথের মনে," এই বাক্যটি থেকে ভ্রমের উৎপত্তি হ'তে পারে। তবে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় আদি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই যে রূপ পরিগ্রহ করে, সে রূপের জন্মদাতা তিনি।

প্রমথবাবু যদি শান্তিনিকেতন শব্দটি বিশ্বভারতী অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকেন, তা হ'লে তার আইডিয়ার জন্ম যে রবীন্দ্রনাথেরই মনে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। এবং এই আইডিয়াটি জন্মেছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অনেক আগে। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর আমেরিকা থেকে রথীবাবুকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন :—

"আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করচি এই মনে করে যে, বিধাতার বাণী এদের কাছে বহন করবার আদেশ আমার উপরে আছে। তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্ব-জাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল-বৃত্তান্তের অতীত ক'রে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব্বমানবের জয়ধ্বজা ঐখানে প্রথম রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভি-মানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।"

শান্তিনিকেতন শব্দ যদি বিশ্বভারতী অর্থে ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে রবীন্দ্রনাথ যেটি তার প্রধান কাজ ব'লে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে নির্দেশ ক'রেছেন, তার উল্লেখ আবশ্যক ;—একে শুধু বা প্রধানতঃ সঙ্গীত ও চিত্রকলার চর্চার স্থান বললে আংশিক সত্যই বলা হয়। শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতী অর্থে প্রযুক্ত হ'লে, বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনেরও উল্লেখ আবশ্যক হয়। ১৯৩০ সালের ৩১শে অক্টোবর লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রথীবাবুকে লিখেছিলেন :—

"এটা খুব ক'রে বুঝেচি আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কি ক'রে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোট আকারে তারি নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত।"

আর, যদি শান্তিনিকেতন শব্দ শুধু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থে প্রযুক্ত হয়, তা হ'লেও একে কেবল বা প্রধানতঃ সঙ্গীত ও চিত্রকলার চর্চার স্থান বলা চলে না। ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক মন্দির প্রভৃতি অন্য সব আয়োজন ও ব্যবস্থারও উল্লেখ দরকার। কোন্ মহা-

সত্যকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমটিকে গ'ড়ে তুলছিলেন, তার কিছু আভাস ক্ষিতিমোহন বাবুর "ব্রতের দীক্ষা" প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

প্রমথবাবু লিখেছেন :—"বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ।" তার পরেই লিখেছেন, "প্রথমেই চোখে পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে।" উদ্ধৃত বাক্য দুটির পৌর্বাপর্য্য থেকে যদি কোন অনভিজ্ঞ লোকের এরূপ ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বীরবলের উক্তি থেকে উপদেশ পেয়ে তাঁর বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চাকে যথেষ্ট স্থান দিয়েছেন, তা হ'লে তার জন্য প্রমথ বাবু দায়ী নন—সেরূপ কোন ধারণা জন্মান নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত নয়

—

শান্তিনিকেতন কি শুধু ললিতকলা-ভবন

গত মে মাসে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই থেকে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ মহোদয়ের স্মারক ফণ্ডের পাঁচ লাখ টাকার প্রায় সমস্তই সংগ্রহ করেন। সেই সময় (অধুনা স্বর্গত) মহাদেব দেশাই ইংরেজী "হরিজন" কাগজে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে শান্তিনিকেতনের গান্ধীজী কৃত খুব প্রশংসা ছিল। যেমন :—

"I am not exaggerating," he said, "when I say that Santiniketan is worthy of a greater support than the Bangalore Research Institute for which Tata gave Rs. 30 lakhs. I wonder if the Research Institute is known anywhere outside India. But the Santiniketan is known wherever the Poet's name is known, and known as an institution that inspired the Poet's great poetry. . . . The Santiniketan whose school of art and culture attracts students from far and near has produced painters and poets and scholars."

গান্ধীজী যে এই রকম কথা বলেছিলেন, তার কারণ তাঁর একজন বন্ধু তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

"Gandhiji, you are backing the wrong horse."

আর কেউ কেউ আপত্তি তুলেন,

"Our devotion to the Poet will remain as long as we live. But how can we have the same devotion for Santiniketan? How long will it last?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন :—

"The institution which inspired the Poet received in its turn inspiration from the Poet, and you may be sure there are people there who will devote their lifetime to its service. Santiniketan is a romance. *It grew out of the Poet's father's idea to found a home of peace and culture*. . . . The Poet is an asset for India and for the world for all time, and it is the duty of monied men to put his institution on a sound basis."

উপরে গান্ধীজীর যে-বাক্যটি আমরা বাঁকা ইটালিক অক্ষরে ছেপেছি, তা সত্যমূলক।

এ রকম আপত্তিও হয়েছিল যে,

"If Gandhiji appreciates Santiniketan so much as a home of art, why does he himself have *ashrams* of a different character?"

উত্তর—

"For the simple reason that art is the need of quite a fair number of our people, and it must be fulfilled in a clean, wholesome and inexpensive way. Santiniketan with its branch at Sriniketan, does it."

সর্বশেষে গান্ধীজী তাঁর হৃদয়াবেগপূর্ণ আবেদনে বলেন,

"You can never give too much to Santiniketan."

তিনি যে শান্তিনিকেতনকে "হোম অব্ আর্ট" বলেছেন, সাধারণ অর্থে সত্য হ'লেও তা আংশিক সত্য মাত্র। তবে, মানব জাতির জীবনযাত্রানির্বাহ সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন ভাবে করাকেই যদি শ্রেষ্ঠ আর্ট মনে করা হয়, তা হ'লে বিশ্বভারতীকে সেই আর্টের রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত নিকেতন বলা যেতে পারে।

বাংলা দেশের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু গত ১০ই জুলাই শান্তিনিকেতন দেখতে গিয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শের একটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন :—

"A grand synthesis of world culture and civilization was Rabindranath's message to the nations of the world. It is treasured up in this great University as the Poet's legacy. It will survive the ruthless onslaught of forces of aggression, when Santiniketan will be called upon to play its noble part in the cultural reconstruction of a battle-scarred humanity."

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা মধ্যে মধ্যে সংক্ষেপে কিছু লিখেছি বলেছি। আর একবার তার পুনরাবৃত্তি করি।

"অনেক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে, সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের, ভাবের ও সংস্কৃতির নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত ও সম্মিলিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাকবেন এক ও অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চাই এখানে হবে না, শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ সঙ্গীত, চিত্রকলা আদি ললিত কলার অনুশীলনও হবে; আবার বস্ত্রবয়ন আদি কারুশিল্পের ও কৃষির শিক্ষাও দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে আবার স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সংস্কৃতিতে সৌন্দর্য্যে আনন্দের নিলয় করে তুলবার চেষ্টা হবে; ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ অনুসারে অধ্যাপকদের পরিচালনায় গ্রামসেবা করবেন; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হ'বেন না, কর্মী ও স্রষ্টাও হবেন,

বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন; বিদ্যার্থীরা দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে অবহিত হবেন; শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ কারুশিল্প ও গৃহশিল্পের মধ্য দিয়ে বালকবালিকাদের জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা শিক্ষাসত্রে থাকবে;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য এইরূপ।"

—

সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদ-নিবাসী সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু অকালে হয়েছে বলা না চল্‌লেও তিনি যেরূপ কর্মিষ্ঠ ছিলেন তাতে তাঁর দ্বারা সমাজ আরো বহু বৎসর উপকৃত হবে, আশা ছিল। তিনি মুন্সেফী থেকে আরম্ভ ক'রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং তার প্রধান বিচারপতির কাজও অস্থায়ী ভাবে কিছু কাল ক'রেছিলেন। তিনি যখন হাইকোর্টের কাজ থেকে অবসর নেন, তখন সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ হাইকোর্টের আইনজীবীরা তাঁর সুবিচারশক্তির ও আইনের গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর ভদ্রতার প্রশংসাও তাঁরা করেছিলেন। হাইকোর্টের কাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি কিছু কাল কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের বিচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

কানপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং তিনি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ণধার ছিলেন। ডাক্তার সেন, সুখের বিষয়, এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। লাল-গোপালবাবুর মৃত্যুতে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রভূত ক্ষতি হ'ল। তাঁর স্থান নেবার ঠিক লোক এখন কাউকে দেখছি না। বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে তাঁর কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এলাহাবাদে শেষ যেবার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, গোরখপুরে যখন অধিবেশন হয় ও কলিকাতায় যখন হয়, তখন এবং অন্য অনেক উপলক্ষ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হ'য়েছিল। তিনি সব সময়ই এরূপ নম্র, অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করতেন যে, তাতে খুবই সঙ্কোচ বোধ হ'ত। একবার এলাহাবাদে এই রকম সঙ্কোচ প্রকাশ করায় তিনি ব'লে-ছিলেন, "আমার ভাই জয়গোপাল আপনার ছাত্র ছিলেন, আমিও আপনার ছাত্র হ'তে পারতাম।" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাংলা উৎকৃষ্ট পুস্তক-সমূহের অ-বাঙালীদের মধ্যে বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি সেগুলি দেবনাগরী অক্ষরে ছাপবার পক্ষপাতী ছিলেন—যত দূর মনে পড়ছে কল্‌কাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁর অভিভাষণে নাগরীতে বাংলা বই ছাপবার প্রস্তাব ক'রেছিলেন। তিনি একবার একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বই বাংলায় অনুবাদ করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন—কি বই তা এখন মনে পড়ছে না। তিনি অনুবাদ শেষ ক'রে রেখে গিয়ে থাকলে তা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে, আশা করি।

তিনি ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। ভগবদ্গীতার তিনি নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী রমা স্বর্গত বৈজ্ঞানিক শিল্পী শরচ্চন্দ্র দত্তের কন্যা। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী রমাই তাঁর পরিবারের কর্ত্রীত্ব করতেন। চিত্র-কলায় শ্রীমতী রমার দক্ষতার নানা নিদর্শন দেখেছি; তার মধ্যে তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের আলেখ্য একটি। তিনি পুত্র-বধূর চিত্রকলা ও নানাবিধ কারুশিল্পের গুণগ্রাহী ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-লাভের বাধা দূর করবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে-ছিলেন।

—

সর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড

অশীতিপর বৃদ্ধ সর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ডের মৃত্যু হ'য়েছে। তিনি যোদ্ধা, ভৌগোলিক অনুসন্ধাতা, এবং দার্শনিক ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব'লে বিখ্যাত ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। পৃথিবীর সকল ধর্মের সখ্য সংঘের (Congress of the World Fellowship of Faiths-এর) তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। লণ্ডনে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান প্রধান সকল ধর্মের লোক যোগ দিয়েছিলেন ও তাঁদের শাস্ত্র পঠিত হ'য়েছিল।

তাঁর ছবি অনেক বার দেখা থাকায় তাঁকে কল্‌কাতার টাউন হলে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর একটি অধিবেশনে দেখবামাত্র চিনতে পেরেছিলাম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়বার পর আমার ডাক পড়ে। আমি "যত মত তত পথ" সম্বন্ধে ছোট একটি প্রবন্ধ পড়ি। সেটি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত Cultural Heritage of India শীর্ষক বৃহৎ গ্রন্থের এক কোণে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধটি প'ড়ে সর্ ফ্রান্সিসের পাশে

আমার আসনে বসবার পর তিনি সৌজন্যসহকারে আমাকে জানান যে, প্রবন্ধ-লিখিত বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে একমত।

—

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধি লাভ করার পর বিশপ্‌স্ কলেজে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১৫ পর্য্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করেন। তার পর তিনি এক বৎসর বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজে কাজ করেন। অতঃপর তিনি ১৯১৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৪০-এর জুন পর্য্যন্ত স্কটিশ চর্চ কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষের কাজ সুন্দর রূপে নির্বাহ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও তার সীণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। আমি গত শতাব্দীতে যখন সিটি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলাম, নিবারণচন্দ্র তখন সেই কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন থেকে তাঁকে জানতাম। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সার্বজনিক নানা কাজে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল এবং তিনি তাঁর কাজ নিষ্ঠার সহিত যথাসময়ে সুশৃঙ্খল ভাবে করতেন। তিনি প্রায় বিশ বৎসর কলকাতার ভারত-সভার সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন এবং জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের (National Liberal Federation-এর) একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য ছিলেন। অনেক বার তার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হ'য়েছিলেন।

—

"দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা"

গত বৎসর পৌষের প্রবাসীতে "দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা" নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ছাপা হয়। এর উপর লেখা ছিল "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।" বাস্তবিক চিঠিটি প্রবাসীর সম্পাদককে লিখিত হয় নি। সেটি আমাকে লিখিত অন্য অনেক চিঠির সঙ্গে ছিল, তার খামটি ছিল না, এবং কা'কে লিখিত চিঠিটিতেও তা লেখা ছিল না। যখন চিঠিটি ছাপা হয়, তখন তার পাঠ, "বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন," দেখে এবং চিঠিটির বিষয়বস্তু দেখে আমার মনে একটু খট্‌কা লেগেছিল—কবি আমাকে "বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন" কখনও করেন নি। এখন জানা গেছে, কবি চিঠিটি লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দেকে লিখেছিলেন। নির্ম্মলবাবু মধ্যপ্রাচ্যের রেল-রক্ষা বিভাগের হাবিলদার রূপে অজ্ঞাত এক স্থান থেকে আমাকে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

Hav. N. C. Day, No. 120686,
136, Ind. Rly. Maint. Company,
Middle East Forces.
29-7-42.

"ভ্রম-সংশোধন"

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

গত পৌষ ১৩৪৮ এর প্রবাসীতে ২৬৪ পৃষ্ঠায় "দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা" এই শিরোনামে ঋষি-কবির যে চিঠিটি বেরিয়েছে, সেটিকে ভুল করে "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত" লেখা হয়েছে। এক মাঘোৎসবে প্রদত্ত ওঁর উপদেশ "আত্মবোধ" নামে প্রবাসীতে বেরোয় তাতে মানবাত্মার "অনন্ত উন্নতি"র কথা প'ড়ে, ঐ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের "জ্ঞানযোগ"-এ বিরুদ্ধ (ও আমার বিবেচনায় সঙ্গত) মত পড়া থাকার জন্য, ওঁকে, ঐ মতের বিনীত প্রতিবাদ ক'রে লক্ষ্ণৌ থেকে এক চিঠি লিখি। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার মত অখ্যাতনামা অর্ব্বাচীন লোককেও তিনি উপরে উল্লিখিত চিঠিখানি লিখলেন। তার উত্তরে, আমার মত জানিয়ে, আর একটি চিঠি লিখি। তিনি পরম সৌজন্যের সঙ্গে আরও উত্তর দেন। তার উত্তরে, আমি আর তর্ক না বাড়িয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর তাঁকে উত্তর দিতে হবে না লিখি। ৮।১০ বছর আগে, আমি তাঁর এই দুইখানি চিঠি নিজে প্রবাসী আফিসে দিয়ে আসি, ছাপাবার জন্য। ৪।৫ মাস পরে একটি প্রকাশিত হয়। কোনটি মনে নেই।

—

"ভারতের রাষ্ট্রী . ইতিহাসের খসড়া"

"তত্ত্বকৌমুদী" পাক্ষিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া" নাম দিয়ে যে মূল্যবান্ ঐতিহাসিক রচনাটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে প্রভাতবাবু শিক্ষিত সাধারণেরও অজ্ঞাত অনেক তথ্য পুরাতন কাগজপত্র ও নানা পুস্তক থেকে সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করছেন। আশা করি, "ভারত" দৈনিকের সম্পাদকরূপে গ্রেপ্তার হবার আগেই তিনি সমগ্র "খসড়া"টির হস্তলিপি "তত্ত্বকৌমুদী"র সম্পাদক মহাশয়কে দিয়েছিলেন। না দিয়ে থাকলে খালাস পাবার পর দিতে পারবেন। এই ঐতিহাসিক রচনাটি তাঁর দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে ভারতেতিহাসের ব্রিটিশ-যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্য পাঠকদের অধিগম্য হবে।

—

মহাদেব দেশাই

মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত শিষ্য ও সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের জেলে অকালে আকস্মিক মৃত্যুতে সারা ভারতবর্ষ সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি যেরূপ শিক্ষা লাভ ক'রেছিলেন, যে রকম চরিত্র, বুদ্ধি ও

শ্রমশীলতা তাঁর ছিল, তাতে অন্য অনেক শিক্ষিত লোকের মত তিনি যদি উপার্জনে মন দিয়ে সাধারণ গৃহস্থের জীবন-যাপন করতে চাইতেন, তা হ'লে ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করতে পারতেন। তা না ক'রে তিনি গান্ধীজীর আদর্শ ও দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ ক'রে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার জীবনকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। তার আনুষঙ্গিক দুঃখও তিনি সানন্দে বরণ ক'রেছিলেন। তিনি গুজরাটী ভাষায় এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সাংবাদিক ছিলেন। ইংরেজিও তিনি বেশ ভাল লিখতে পারতেন। গান্ধীজীর আত্মচরিতের ইংরেজি তাঁরই লেখা। মহাত্মাজীর দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে তাঁর ইংরেজি লেখা গান্ধীজীরই ব'লে অনেক সময় ভ্রম হ'ত। ইংরেজি "হরিজন" কাগজটির তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলা জানতেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা বা গান শুনতে চাইলে মহাদেব দেশাই গুজরাটীতে অনুবাদ ক'রে শুনাতেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মত স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনচিত্ত মানুষ সর্বদা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশের অপরিমেয় ক্ষতি হ'য়েছে। মহাত্মাজীর ক্ষতি অবর্ণনীয়।

—

মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর

মহারাজা সর্ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ললিত-কলার অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহ ও উদ্যোগে কলকাতার অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টস্ স্থাপিত হয় এবং তার বার্ষিক চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী হয়ে আসছে। তিনি নিজের প্রাসাদে দেশী ও বিদেশী বহু উৎকৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ ক'রেছিলেন। প্রধানতঃ, স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ পালের উদ্যোগে ও ব্যয়ে রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের যে-স্মৃতিমন্দির নির্মিত হ'য়েছিল, তা সম্পূর্ণ ক'রে সংরক্ষণ করবার জন্যে যে কমীটি গঠিত হয়, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর তার সভাপতি ছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তার সম্পাদক।

—

ডক্টর আম্বেদকর কি চান

যেমন সর্ ফিরোজ খাঁ নূন বলেছেন যে, তিনি মুসলিম লীগের লোক হিসাবে বড়লাটের শাসন-পরিষদে আছেন, সেই রকম ডক্টর আম্বেদকরও তফসিলি জা'তদের বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তার সদস্য আছেন, এই মর্মের কথা বলেছেন। অন্য সদস্যেরা কে কোন্ সম্প্রদায় শ্রেণী বা জা'তের জন্যে আছেন, তা তাঁরা বললে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির জন্যে কেউ আছেন কি না, তাহ'লে তা বোঝা যায়।

ডক্টর আম্বেদকর তফসিলি জা'তদের জন্যে ভারত-বর্ষের একটা অংশে তাদের একটা উপনিবেশ-গোছ কিছু একটা চান। এটি মুসলিম লীগের পাকিস্তানের মত ঠিক্ নয়। কারণ, পাকিস্তানে অ-মুসলমানও থাকবে, যদিও অপ্রধান রূপে থাকবে, কিন্তু 'তফসিলি স্থানে' কেবল তফসিলি জা'তরাই থাকবে। ডক্টর আম্বেদকর বলেন যে, ভারতবর্ষে যত পতিত জমি ("waste lands") আছে, তাই নিয়ে এই উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু ভারতের কোথাও কি এক লাটে এক লাগাড়ে এত বড় ভূমিখণ্ড আছে যাতে সব তফসিলির স্থান হ'তে পারে? যদি প্রত্যেক প্রদেশে একটা করে 'তফসিলি স্থান' স্থাপন করতে যাওয়া যায়, তাহ'লে প্রত্যেক প্রদেশের সব তফসিলিদের জায়গা হ'তে পারে এত বড় পতিত ভূমিখণ্ড প্রত্যেক প্রদেশে আছে কি?

থাকলেও তফসিলিরা শুধু পতিত জমি নিয়ে সন্তুষ্ট হবেন কি? তাঁদের অনেকের কি এখন তার চেয়ে ভাল জমি নাই?

এরূপ পরিকল্পনায় তফসিলিদের সম্মতি আছে কি? আছে ব'লে আমরা জানি নে—তার কোন প্রমাণ নাই।

ভারতবর্ষের সব ধর্মসম্প্রদায়ের, সব জা'তের, সব শ্রেণীর লোক নিয়ে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের আদর্শ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নেতারা হৃদয়ে পোষণ ক'রে আসছেন। সেই আদর্শই ঠিক্। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ঠিক্ আদর্শ নয়; "সব ভাই এক ঠাঁই" আদর্শই ঠিক্। সব রকম 'অস্পৃশ্যতা', 'অনাচরণীয়তা' ও অধিকারশূন্যতা দূর ক'রে এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে।

মুসলিম লীগের অর্থাৎ মিঃ জিন্নার মত ডক্টর আম্বেদ-করও ব্যবস্থাপক সভা, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে তফসিলিদের জন্য আলাদা, মার্কামারা, নির্দিষ্ট-সংখ্যক আসন চান, এবং সরকারী সব চাকরীরও একটা ভাগবখরা চান। মিঃ জিন্না মুসলমানদের জন্যে যত চেয়েছেন, ডক্টর আম্বেদকর তফসিলিদের জন্যে ততই চেয়েছেন—যদিও ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে তফসিলিদের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু মুসলমানরা ভারতের মোট লোকসংখ্যার সিকির চেয়েও কম হ'লেও যদি জনাব জিন্না তাদের জন্যে আইনসভা চাকরী

প্রভৃতিতে অর্ধেক বখরা চাইতে পারেন, তা হ'লে তফসিলিরা মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম হ'লেও ডক্টর আম্বেদকর তাদের জন্যে মুসলমানদের সমান বখরা কেন না চাইবেন?

মনে করুন, মুসলমানরা পেলেন অর্ধেক, তফসিলিরা পেলেন অর্ধেক। বাকী রইল শূন্য। এই শূন্যটার কোন্ ও কত অংশ বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান, শিখ, পারসী প্রভৃতি এবং সংখ্যায় অধিকতম সবর্ণ হিন্দুরা পাবে, তা রাষ্ট্রনৈতিক গণিতবিশারদ জনাব জিন্না ও ডক্টর আম্বেদকর বল্‌তে পারবেন। কিম্বা হয়ত তাঁরা এই সব সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও আত্মবিলোপের মহৎ আদর্শ রেখে দিয়ে থাকবেন।

—

ভারতের অসম্মানকর একটা মত

ডক্টর আম্বেদকর এই মত প্রকাশ করেছেন যে,

There is no Indian politician competent to run the technical and military side of the Defence department.

অর্থাৎ দেশরক্ষা বিভাগের যান্ত্রিক-শৈল্পিক ও সামরিক দিকটার কাজ চালাবার যোগ্যতাবিশিষ্ট লোক ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে কেউ নেই।

এত কোটি ভারতীয়ের মধ্যে একজনও ওরূপ লোক নেই, ডক্টর আম্বেদকর কেমন ক'রে তা জানলেন?

বোঝা ও মনে রাখা দরকার যে, সেনাপতির কাজ এবং দেশরক্ষা-বিভাগের কাজ এক নয়। একজন মানুষ এক দিনের জন্যও সাধারণ সিপাহীর কিম্বা নিম্নতম বা উচ্চতম সেনাপতির কাজ না-ক'রে থাকতে পারেন, এক দিনের জন্যও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই না-করে থাকতে পারেন; অথচ তিনি দেশরক্ষা বিভাগের ভার বহন করবার সম্পূর্ণ যোগ্য হ'তে পারেন। এটা শুধু অনুমান নয়। এর জল্‌জ্যান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ব্রিটেনের পক্ষে গত মহাযুদ্ধ যোগ্যতা ও সাফল্যের সহিত চালিয়েছিলেন। সামরিক বিভাগের ভার তাঁর উপর ছিল। তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সৈনিক ছিলেন না, আইন-ব্যবসায়ী সলিসিটর ছিলেন। তাঁর জন্মও কোন বিজেতা যোদ্ধা জা'তের মধ্যে হয় নি। তিনি বিজিত ওয়েল্‌শ জা'তের লোক। বাল্যে তিনি তাঁর সেলাই-জুতিয়া (cobbler) মামার বাড়ীতে মানুষ হ'ন।

গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে রণতরি-বিভাগের প্রধান রাজপুরুষ (First Lord of the Admiralty) ছিলেন সর্ এডবার্ড কার্সন। ১৯১৭ সালে তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি সাতিশয় অজ্ঞতা নিয়ে রণতরি-বিভাগে ঢুকেছিলেন। তিনি যেদিন তাঁর আপিসে গেলেন সেদিন তাঁকে একজন জিজ্ঞাসা করে, তাঁর মনের ভাব কি রকম হ'য়েছিল। তিনি বলেন, "My only qualification is that I am absolutely at sea," "আমার একমাত্র যোগ্যতা এই যে আমি নিতান্তই সমুদ্রে"। "At sea" কথাটার আক্ষরিক মানে ঐ; কিন্তু ঐ ফ্রেজ্‌টি ব্যবহৃত হয় "দিশেহারা" এই অর্থে। কার্সন সাহেব দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দসমষ্টি প্রয়োগ ক'রে, নিজে যে সামুদ্রিক লর্ড তার প্রতি চোখ ঠেরে, পরিহাস ক'রে জানাতে চেয়েছিলেন যে, যে-কাজের ভার তাঁর উপর পড়েছে তার খুঁটিনাটির কোন জ্ঞানই তাঁর নাই বা ছিল না। বর্তমানে যিনি ব্রিটিশ রণতরি-বিভাগের প্রধান রাজপুরুষ, তিনি কোন কালে নাবিক ছিলেন না—ছিলেন কেরাণী।

ভারতবর্ষের দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হ'তে হ'লে সিপাহীর, নাবিকের বা আকাশ-যোদ্ধার খুঁটিনাটি জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে মস্তিষ্কের। মগজ-ওয়ালা লোকের অভাব ভারতবর্ষে নাই।

যদি বড় সেনানায়কের দরকার হয়, ভারতবর্ষ তা-ও যোগাতে পারে। হায়দর আলি সামান্য নায়েক (Naik) মাত্র ছিলেন, কিন্তু বহু যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে রাজ্য স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন। যে ক্ষণজন্মা পুরুষ পরে ছত্রপতি শিবাজী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি যোদ্ধার বংশে জন্মেন নি। গত মহাযুদ্ধে ও বর্তমান মহাযুদ্ধে যে সব ভারতীয় সৈনিক পুরুষ ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পদক পেয়েছিলেন ও পেয়েছেন, সুযোগ পেলে তাঁরা যে খুব বড় সেনানায়ক হ'তে পারতেন না, তা কে বল্‌তে পারে? গত মহাযুদ্ধে বহু ইংরেজ সামরিক অফিসার নিহত হওয়ায় দেশী রাজ্যসমূহের যে-সব অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ করেন, তাঁরা ইংরেজ অফিসারদের চেয়ে একটুও কম যোগ্যতা দেখান নি।

সর্ ফিরোজ খাঁ নূন কিম্বা ডক্টর আম্বেদকর গোপনে গবর্মেণ্টের অনুমোদিত নানা মত প্রকাশ করছেন কি না, জানা নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বড়লাট প্রকাশ্য ভাবে তাঁদের মতগুলার সমর্থন না করছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের মতগুলাকে আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত মত ব'লেই বুঝব। এবং এই ধারণা দৃঢ়তর হবে যদি বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্ততঃ অন্য দুই-এক জন সদস্যও নূন ও আম্বেদকরের মতের বিরোধী মত প্রকাশ করেন। নূন ও আম্বেদকরের যদি নিজ নিজ মত বলবার অধিকার থাকে,

তাহ'লে অন্য সদস্যদেরও নিজ নিজ মত প্রকাশ করবার অধিকার আছে—যদিও প্রথমোক্তদের মতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও রাজপুরুষেরা খুশি হয়ে থাকবেন, শেষোক্তদের মতে খুশি না হ'তে পারেন। রবীন্দ্র প্রশস্তি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কোন কোন জায়গায় যা বলেছেন গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই তাতে খুশি হন নি।

দেশরক্ষা বিভাগের সম্পূর্ণ ভার নেবার যোগ্য কোন ভারতীয়ই নাই, এই মত যদি বড়লাটের শাসনপরিষদের সব ভারতীয় সদস্যদের মত হয়, তা হ'লে তাঁদের চাকরী ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কারণ বর্তমানে দেশরক্ষা বিভাগ সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। অর্থসচিবের, ইণ্ডাষ্ট্রি-সচিবের, সৈন্য ও যুদ্ধের সরঞ্জাম বাহনের সচিবের ও অন্যান্য প্রায় সব সচিবের প্রধান কাজই হচ্ছে দেশরক্ষা-সচিবের কাজের সুবিধা ক'রে দেওয়া। শেষোক্ত ব্যক্তির যদি বিদেশী হওয়াই একান্ত আবশ্যক তা হ'লে প্রথমোক্ত সচিবেরা তাঁর উত্তরসাধক মাত্র। বিদেশীর উত্তরসাধক সমষ্টিকে জাতীয় গবর্মেণ্ট নাম দেওয়া যায় না।

আমরা ভুলে যাচ্ছি না যে, সর্ ফিরোজ খাঁ নূন এখন দেশরক্ষা-সচিব। কিন্তু দেশরক্ষা বিভাগের প্রধান প্রধান কাগজগুলি তাঁর দপ্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে তাঁকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি, ভারতীয় সৈন্যদলে একজন সিপাহীও বাড়াবার ক্ষমতা তাঁর নাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি কোন ভারতীয় দেশরক্ষা-সংপৃক্ত সব কাজের ভার পেতেন, তা হ'লে আজ ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় অধিকতর প্রস্তুত হ'তে পারত।

—

আণে ও সরকারের দ্বারে মহিলাদের ধরণা

দিল্লী থেকে খবর এসেছে কতকগুলি অধিক ও অল্প-বয়স্কা মহিলা মাননীয় শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণে ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বাসভবনে পিকেটিং করেছেন। তাঁদের অনুরোধ এই যে, হয় তাঁরা গান্ধীজী ও কংগ্রেস-নেতাদের খালাস করিয়ে দেন কিম্বা নিজেরা পদত্যাগ করুন।

এই পিকেটিঙের প্রগতি ও পরিণাম লক্ষ্য ক'রে তার ফল জানাবার সুযোগ প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় আমাদের হবে না। কিন্তু বড়লাটের শাসনপরিষদের এত সদস্য থাকতে মহিলারা যে উক্ত দু'জনকেই নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধরেছেন তাতে তাঁদের অসুবিধা হ'লেও তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানই হয়েছে। কারণ, মহিলাদের এই কাজের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, সদস্যদ্বয় দেশভক্ত, দেশের সম্মান রক্ষা ও মঙ্গল যাতে হয়, তা তাঁরা করবেন, এবং গান্ধীজী প্রভৃতি নেতাদের মুক্তি ঘটাবার ক্ষমতা তাঁদের আছে। শেষোক্ত বিষয়ে আমরা অসঙ্কোচে সন্দেহ প্রকাশ করছি। শুনেছি, নেতাদের কয়েদ করার কাজটার গুরুভার বিলাতী ভারতসচিব, বিলাতী বড়লাট এবং বিলাতী হোম মেম্বর মশায়েরাই বহন করেন, অন্য সদস্যেরা "হাঁ-জী"র দল কিম্বা তুষ্ণীম্ভাবের সমীচীনতায় বিশ্বাসী। এটা অবশ্য গুজব, ঘরের খবর আমরা জানি না।

—

বড়লাটের সহিত শ্যামাপ্রসাদবাবুর সাক্ষাৎকার

বড়লাটের সহিত শ্যামাপ্রসাদবাবুর সাক্ষাৎকার এবং একঘণ্টাব্যাপী "পুরাপুরি ও মনখোলা" ("full and frank") কথাবার্তা হয়েছে ব'লে দৈনিক কাগজে খবর বেরিয়েছে। কি কথা হয়েছে তা বেরয় নি। দিল্লীর ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা এই কথাবার্তার কোন ফল শীঘ্র জানা যাবে না।

শ্যামাপ্রসাদবাবু যে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে পেয়েছেন, তাতে আমাদের একটা কথা মনে হয়েছে।

কংগ্রেসের দাবী ও হিন্দু মহাসভার দাবীর মধ্যে সারতঃ কোন তারতম্য নাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবটিতে শেষ দিকে একটি স্পষ্ট "ধমক" ছিল বটে; যথা, যদি গবর্মেণ্ট কংগ্রেসের দাবী মেনে না নেন, তা হ'লে "অহিংস আইন অমান্য প্রচেষ্টা" আরম্ভ হবে। কিন্তু হিন্দু মহা-সভার নির্ধারণে যে ওরূপ কিছুই নাই, এমন বলা যায় না। কেন-না তাতে বলা হয়েছে, গবর্মেণ্ট ঐ নির্ধারণ অনুসারে কাজ না করলে এমন কিছু করা হবে যাতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বুঝতে পারবেন যে, ভারতবর্ষকে বা ভারতীয় মহাজাতিকে আর দাবিয়ে ফেলা ("suppress" করা) চলবে না।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের পর যে দেশব্যাপী অশান্তি ও উপদ্রব চলেছে, তাতে হয়ত গবর্মেণ্টের ধারণা হয়ে থাকবে যে, ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনা করা তাদিকে গ্রেপ্তার করার চেয়ে মন্দ নয়—হয়ত ভাল।

—

দেশব্যাপী অশান্তি ও উপদ্রব

আজ ২৪শে ভাদ্রের কলকাতার দৈনিকগুলিতে দেখছি

দেশে অশান্তি ও উপদ্রব কমে নি—বোম্বাই, ভাগলপুর, বোলপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের সংবাদ বড়ই উদ্বেগজনক।

গবর্ন্মেণ্ট মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস-নেতাদিগকে খালাস দিয়ে এমন কিছু করলে ভাল হয়, যাতে উপদ্রব কমতে পারে।

—

পার্নেলের ও কংগ্রেসের মিথ্যা নরহত্যা-সংস্রব অপবাদ

আইরিশ-নেতা পার্নেলের ও ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে অন্য কোন সাদৃশ্য নির্দেশ করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেবল এই বলতে চাই যে, পার্নেল আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কংগ্রেস-নেতারাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চান, এবং পার্নেলের নামে প্রকাশ্য ভাবে এই কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছিল যে, ডাবলিনের ফীনিক্স পার্ক হত্যাকাণ্ডের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে এই পার্কে আয়ার্ল্যাণ্ডের "ইন্‌ভিন্সিবল্‌" ("অজেয়") নামধারী দলের লোকেরা ঐ দ্বীপের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ইংরেজ সেক্রেটরি লর্ড ফ্রেডারিক ক্যাভেণ্ডিশ ও আণ্ডার সেক্রেটরি মিঃ টমাস বার্ককে খুন করে। পার্নেল এই খুনের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে এই হত্যাকাণ্ডের কোন ভাল ফল হওয়া দূরে থাক্‌, এতে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সমূহ ক্ষতি হবে।

তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিপক্ষেরা তাঁকে কপটাচারী এবং ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে। বিখ্যাত টাইম্‌স্‌ কাগজে এই বিষয়ে ও এই মর্মে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। টাইম্‌স্‌ একটা চিঠির ফোটোগ্রাফিক নকল ছাপে যাতে পার্নেলের মত দস্তখত ছিল এবং যার উদ্দেশ্য ছিল ফীনিক্স পার্কের হত্যাকাণ্ডকে চুণকাম (whitewash) করা। পার্নেল চিঠিটাকে জাল বলেন।

সমস্ত ব্যাপারটার তদন্ত করবার জন্যে তিন জন হাইকোর্ট জজ নিয়ে একটি পার্লেমেণ্টারি কমিশন বসে। তাঁদের রায়ের অন্যান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করব না। যে চিঠিটার ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি টাইম্‌সে বেরিয়েছিল, কমিশন সেটাকে জাল বলেন। এই চিঠি ও অন্য কোন কোন দলিল পিগট (Pigott) নামক একটা লোকের কাছে কেনা হয়। সে ট্রুথ (*Truth*) কাগজের সম্পাদক ল্যাবুশিয়ার সাহেবের কাছে জালিয়াতি স্বীকার করেছিল, কিন্তু তার স্বীকৃতি বিষয়ে জেরার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে মাদ্রিদে পালিয়ে যায় এবং সেখানে নিজের মাথায় গুলি মেরে আত্মহত্যা করে। এটর্নী-জেনারাল টাইম্‌সের পক্ষে চিঠিটা প্রত্যাহার করেন। তার পর পার্নেল টাইম্‌সের নামে, এই জাল চিঠি ছেপে তাঁর মানহানি করা অপরাধে, নালিশ করেন। মোকদ্দমা আপোষে মিটে যায়। টাইম্‌স্‌ পার্নেলকে পঁচাত্তর হাজার টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য হয়।

লাহোরের ট্রিবিউন কাগজে দেখেছি, সেখানকার সিবিল ও মিলিটারি গেজেট কংগ্রেস-নেতাদের নামে সর্‌ ফিরোজ খাঁ নূনের আরোপিত অপবাদ সমর্থন করেছে। অন্য কোন কাগজও যদি তা ক'রে থাকে, তা হ'লে তাদের এবং সর্‌ ফিরোজ খাঁ নূনের মত লোকদের ভেবে দেখা উচিত যে, তাঁরা কোন্‌ প্রমাণের বলে এরূপ গুরুতর অভিযোগ করছেন। বিলাতে প্রবল জনমত সত্ত্বেও এবং টাইম্‌সের মত প্রভাবশালী কাগজকেও ঠকিয়ে যদি টাকা নিয়ে পিগট জাল চিঠি চালিয়ে থাকে, তা হ'লে এদেশেও ও-রকম জাল দলিলের আবির্ভাব ও অস্তিত্ব অসম্ভব মনে করলে ভুল করা হবে।

—

কলেজের ছাত্রবেতন

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু যে-সব ছাত্র কলেজে ভর্তি হবে, তাদিকে বেতন দিতে হবে গত জুন মাস থেকে। এটা ন্যায়সঙ্গত -নয় বটে; কিন্তু অন্য দিকে কলেজ-সমূহের কর্তৃপক্ষেরাও ত অধ্যাপকদের পুরা বেতন জুন থেকে দিতে বাধ্য। ছাত্রেরা বেতন না দিলে তাঁরা অধ্যাপকদের বেতন কিসের থেকে দেবেন? এ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ কলেজগুলির সাহায্য পাবার কিছু ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

—

বেথুন বিদ্যালয়

কল্‌কাতার বেথুন বিদ্যালয় আজকালকার সব বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীনতম। এর নামের সঙ্গে বেথুন (বীটন, Bethune) সাহেবের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নামের স্মৃতি জড়িত। এই বিদ্যালয়টি অনেক দিন থেকে যুদ্ধ-সঙ্কটের ওজুহাতে বন্ধ আছে। এটি গত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে হিন্দুবালিকাদের জন্য অভিপ্রেত। এইটিকে বন্ধ রাখা হয়েছে অথচ মুসলমান বালিকাদের জন্য অভিপ্রেত বিদ্যালয়গুলি খোলা আছে। এর (হিন্দু)

ছাত্রীদের যাতে আর ক্ষতি না হয়, তার ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

—

পাইকারি জরিমানা

কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'লে আগেও সেখানকার লোকদের উপর পাইকারি জরিমানার বোঝা চাপান হোত। আজকাল ত নানা স্থানে উপদ্রব হওয়ায় অনেক জায়গার লোকদের উপরই পাইকারি জরিমানার বোঝা চাপান হচ্ছে। এতে এমন অনেক নিরপরাধ লোকদের শাস্তি হয়, উপদ্রবের সঙ্গে যাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, যারা উপদ্রব হবে ব'লে জানতই না, এবং জানলেও তা নিবারণ করবার তাদের কোন উপায় ও ক্ষমতা ছিল না।

ব্রিটিশ ন্যায়বিচারনীতির একটি নির্দেশ এই যে, বরং দশ জন অপরাধী লোক শাস্তির থেকে বেঁচে যায় তাও ভাল কিন্তু একজন নিরপরাধ লোকেরও দণ্ডিত হওয়া ভাল নয়। পাইকারি জরিমানা এই নীতির বিরুদ্ধ।

গবর্ন্মেণ্টের এ বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।

—

ঢাকা জেলে অনেক "গুণ্ডা" কয়েদীর মৃত্যু

ঢাকা জেলে ৩২ জন "গুণ্ডা" কয়েদী গুলির আঘাতে মারা গেছে ব'লে সংবাদ বেরিয়েছে। আশা করি, প্রধান মন্ত্রীসাহেব এর যথোচিত তদন্ত করাবেন।

যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে কে কোন্ ধর্মাবলম্বী, তার সংখ্যা দু-বার দু-রকম বেরিয়েছে। প্রথম বারে মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশি, দ্বিতীয় বারে হিন্দুর সংখ্যা বেশি হয়েছে। ভুল হ'লে তা সংশোধন করা উচিত বটে; কিন্তু এরূপ সংখ্যার ফর্দ দিলে তার কী সুফল হয়? এতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না কি?

—

মুসলিম লীগে ভাঙন?

জনাব জিন্না এখনও তাঁর পাকিস্তানের জেদ ধ'রে আছেন—আগে থাকতে পাকিস্তানে সম্মতি না দিলে তিনি কোন দলের সঙ্গে কথা কইতে রাজী নন, এমন কি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গেও নয়। তাঁর এই একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হ'য়ে মুসলিম লীগের অনেক বিশিষ্ট সভ্য তাঁর নিন্দা করছেন।

—

সর্বসম্মত বিবৃতি ও দাবী

শ্যামাপ্রসাদবাবু নানা দলের নেতাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সঙ্কট অবস্থা মোচনের জন্যে যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্য, শোনা যাচ্ছে, গবর্ন্মেণ্টের কাছে একটি সর্বসম্মত বিবৃতি ও দাবী উপস্থিত করা। এই চেষ্টা ভাল। কিন্তু যার মধ্যে কংগ্রেস-নেতারা নাই, তাকে কি সর্বসম্মত বলা যায়? অন্ততঃ গবর্ন্মেণ্ট কি তাকে সর্বসম্মত মনে করবেন ও গ্রাহ্য করবেন?

সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ নেতাদের চেষ্টায় যে বে-দল কন্‌ফারেন্সের (Non-party Conference-এর) কয়েকটি অধিবেশন হয়েছিল, তার প্রস্তাবগুলি মন্দ ছিল না, তাতে সদ্য সদ্য স্বাধীনতাও চাওয়া হয় নি। অথচ গবর্ন্মেণ্ট সেই কন্‌ফারেন্সকে কোন আমল দেন নি।

২৪শে ভাদ্র ১৩৪৯।

—

অন্ন-বস্ত্রের কথা

কলিকাতায় মাঝারি চাউল দশ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র এই অনুপাতে চাউলের দর চড়িয়াছে। গত ফসলে ধান্য প্রচুর জন্মিয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে চাউল দুর্ম্মূল্য হইবার কথা নহে। যে সময়ে দর চড়িল তাহাতে কৃষক লাভবান্ হইবে না, কয়েক জন ব্যবসায়ী মোটা টাকা পাইবে, আর যাহারা কিনিয়া খায় এরূপ অগণিত লোকের অসীম কষ্ট হইবে। হঠাৎ বাজার হইতে বহু চাউল চলিয়া না গেলে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল বাংলা-সরকার বহু চাউল ক্রয় করিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের এক বিবৃতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যে জেলায় চাউল প্রয়োজনের অধিক ছিল সেখানে পাছে শত্রু আসিয়া উহা অধিকার করে সেজন্য সরকার উহা কিনিয়া লইবেন এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার যদি এইরূপ করিতে যাইয়া চাউলের দর চড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে; কারণ এক জায়গার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল অন্য জায়গায় ছাড়িয়া দিলে দর সর্ব্বত্র বেশী থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি চাউল কিনিয়া ধরিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবিলম্বে উহার সমস্ত বা অধিকাংশ বাজারে বেচিয়া দেওয়া উচিত। ভারত-সরকার যদি বিদেশে পাঠাইবার জন্য (যাহার কথা সর্ পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস কিছুদিন পূর্ব্বে অন্য খাদ্য প্রসঙ্গে

বলিয়াছিলেন) প্রচুর চাউল কিনিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কারণ এই সময়ে প্রজাকে খাওয়ার কষ্ট দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। জাপান আসামের সীমান্তে অবস্থান করিতেছে। তাহার পক্ষে আসাম ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব একথা কেহই বলিতে পারেন না। ব্রহ্মদেশে শতকরা দশ জন বর্ম্মী জাপানীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল ইহা সেনাপতি অ্যালেকজ্যাণ্ডার বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের নেতারা একবাক্যে বলিতেছেন, নূতন জাতির পরাধীন হওয়া আমাদের আত্মসম্মানের হানিজনক। যাহাতে সাধারণ লোক অবর্ণনীয় কষ্ট পাইয়া ক্রীতদাসসুলভ মনোভাব অবলম্বন না করে তাহা দেখা সরকারের ও দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের কর্ত্তব্য। দেশে প্রচুর ধান্য জন্মাইল অথচ লোক সরকারী কার্য্যের ফলে কষ্ট পাইবে কেন? যে-সরকার এইরূপ কার্য্য করেন তাঁহারা কি নিজেদেরই ক্ষতি করেন না? বিলাতে মন্ত্রী সর্ কিংসলী উড কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, প্রধান খাদ্য-গুলির মূল্য যুদ্ধঘোষণার সময়ের তুলনায় কমিয়াছে ও বাড়ীভাড়া পূর্ব্ববৎ আছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও কি এখানকার সরকার শাসনপ্রণালীর মূল নীতিগুলি উপেক্ষা করিয়া চলিবেন?

মোটা কাপড়ের দর দশ হাত ধুতি সাড়ে চারি টাকার উপর হইয়াছে। এ বিষয়ে সরকার অনেক কিছু করিতে পারিতেন, করিলেন না। তবে কাপড়ের ব্যাপারে আমরা সস্তা দরে তুলা কিনিয়া, চরকা চালাইয়া, তন্তুবায়কে দিয়া কাপড় বুনাইয়া নিজেদের কষ্ট লাঘব করিতে পারি। যেখানে সম্ভব সেখানে স্বাবলম্বনই শ্রেয়ঃ ও জাতির পক্ষে আত্মসম্মানজনক। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯। —শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

—

বর্তমান সঙ্কটে হিন্দু মহাসভার নির্ধারণ

গত ৩১শে আগস্ট নিউ দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার কার্য্য-নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে নিম্নমুদ্রিত নির্ধারণ গৃহীত হয়।

নয়াদিল্লী, ৩১শে আগষ্ট

ভারতের সম্মুখে যে বিপদ দেখা দিয়েছে তাতে ভারতের জনবল সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন, জাতীয় সরকার গঠন ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। গত কয় বৎসরে এই-দেশে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায় যে, অবিলম্বে বর্তমান শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন, উহা জনমত গঠনে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্ম দেশের সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয় নাই। বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য, ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কার জন্ম ও সম্মিলিত জাতিসমূহের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে ভারতবর্ষ রক্ষার জন্ম জাতীয় সরকার গঠনের কথা ব'লে হিন্দু মহাসভার কার্য্য-করী সমিতির প্রস্তাবে নিম্নলিখিত কয়টি দাবী করা হয়েছে:—

(১) ব্রিটেন কর্তৃক অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা।

(২) যে অচল অবস্থার ফলে সমর প্রচেষ্টায় বাধা হচ্ছে এবং যার ফলে ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের বিচ্ছেদ আরও বৃদ্ধি পাবে, সেই অচল অবস্থা দূর করবার জন্ম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করা।

(৩) একটি ভারতীয় জাতীয় সরকার গঠন করা, ব্রিটিশ সরকার সেই সরকারের হস্তে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন।

(৪) দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে এই সরকার গঠিত হবে।

(৫) প্রদেশগুলিতেও অনুরূপ জাতীয় সরকার গঠিত হবে, প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিগণ সেই সরকারে স্থান লাভ করবেন।

(৬) যুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতির জন্ম একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য জাতীয় সরকার কর্তৃক একটি গণপরিষদ গঠিত হউক, যদি কোন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় শাসনতন্ত্রে বর্ণিত রক্ষা-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হ'ন, তা হ'লে সেই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কোন একটি নিরপেক্ষ ট্রিবিউন্যালের নিকট ঐ বিষয় উপস্থাপিত করতে পারবেন। সেই ট্রিবিউন্যালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সকলকেই মেনে নিতে হবে।

(৭) ভারতের জাতীয় সরকার সাধারণের শত্রুর সহিত তাঁর যুদ্ধ করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করবেন। সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধি-গণকে নিয়ে গঠিত সমর-পরিষদ যুদ্ধসম্পর্কে যে নীতি নির্দ্ধারিত করবেন সেই নীতি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য ভারতবর্ষ ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত একযোগে কাজ করবে। ঐ সমর-পরিষদে জাতীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবেন।

(৮) ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য ভারতীয় জাতীয় সরকার দেশের জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষা প্রদান এবং শিল্পের প্রসার সাধনের নীতি অনুসরণ করবেন ও এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সেনাদল গঠন করবেন। যে সমস্যা উত্থাপন করলে ভারতের ঐক্য নষ্ট হবে এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধা হবে এই জাতীয় সঙ্কটের সময় কোন দলের সেইরূপ কোন সমস্যা উত্থাপন করা উচিত নয়। যদি কোন দল বাধা দেবার মনোভাব গ্রহণ করে এবং জাতীয় সরকার গঠনকার্য্যে সহযোগিতা করত না চায় তা হ'লে অন্যান্য দলকে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করা উচিত। মুসলিম লীগ জাতীয়তাবিরোধী। কোন কোন মহলের প্রস্তাব অনুযায়ী যদি কেবলমাত্র মুসলিম লীগকেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে আহ্বান করা হয়, তা হ'লে উহা জাতীয়তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। হিন্দু মহাসভা ঐরূপ সরকার কখনই স্বীকার করবেন না।

মুসলিম লীগ যে জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব অবলম্বন করেছেন এই সমিতি তার নিন্দা করছেন। মুসলিম লীগ এখনও যে নীতির অনুসরণ করছেন তাতে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে সেজন্য এই সমিতি দুঃখ প্রকাশ করছেন। এই সমিতির অভিমত এই যে, ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব এবং ভারতের প্রতিনিধিগণের হস্তে শক্তি প্রদান করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছার জন্য জাতীয়তাবিরোধী এবং হিন্দুবিরোধী লোকেরা উৎসাহ লাভ করছে। এই সমিতির মনে করবার

কারণ আছে যে, যদি ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্ত করেন তা হ'লে প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলির ক্ষমতা থাকবে না এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হবেন এবং আসন্ন বিপদ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবেন। এই সমিতির অভিমত এই যে, স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হবে। সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের মারফৎ ভারতের বিচ্ছেদবাদিগণের নিকট ব্রিটেনের শোচনীয় আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ভারতের হিন্দুগণের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানরূপে হিন্দু মহাসভা সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে আসছেন। এই বিরাট যুদ্ধে ভারতের স্বেচ্ছাপ্রসূত সহযোগিতা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ ব'লে স্বীকার করা এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য ভারতের দাবীতে সাড়া দেওয়া।

ব্রিটিশ সরকার যদি এখনও ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের নীতি পরিত্যাগ না করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার ও জাতীয় সরকার গঠনের এই দাবীতে সাড়া না দেন, তা হ'লে বর্ত্তমান কার্য্যতালিকা সংশোধন এবং ব্রিটিশ সরকার ও তাঁর মিত্রবর্গ যাতে বুঝতে পারেন যে, আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতি হিসাবে ভারতকে আর দাবিয়ে রাখা যেতে পারে না, সেরূপ পন্থা অবলম্বন ব্যতীত হিন্দু মহাসভার আর অন্য উপায় থাকবে না।

হিন্দু মহাসভা মনে করেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটে যখন কংগ্রেস সমিতিগুলি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যখন মুসলিম লীগ নেতিমূলক মনোভাব অবলম্বন করেছেন, তখন বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান, সম্মানজনক সর্ত্তে ব্রিটিশ ভারত মীমাংসা এবং জাতীয় দাবীর সমর্থনে ভারতের সর্ব্বত্র জনমত গঠনের চেষ্টা করা হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার এই কার্য্যকরী সমিতি জাতীয় দাবীর সমর্থনে জনমত গঠনের আন্দোলন এবং সম্ভব হ'লে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা চালাবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি কমীটি নিয়োগ করছেন—

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না, মিঃ জি. দেশপাণ্ডে, সভাপতি সাভারকর ও রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ।

এই কমীটি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কার্য্যকরী সমিতির কাছে রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং হিন্দু মহাসভার কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সুপারিশের জন্য ১লা অক্টোবর নাগপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির এক সভা আহ্বান করা হবে। কার্য্যকরী সমিতির সুপারিশ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর নাগপুরে নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হবে।

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার এই কার্য্যকরী সমিতি ভারত সরকারের দমননীতির নিন্দা করছেন। কার্য্যকরী সমিতি অবিলম্বে জেলে আটক জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করছেন। —এ. পি.

কংগ্রেস-নেতারা এখন জেলে। কংগ্রেস কমীটিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য স্বাজাতিক দলগুলির (Nationalist partyগুলির) এখন কর্ত্তব্য বর্ত্তমান সঙ্কটে পন্থা নির্দেশ। হিন্দু মহাসভা এই কর্ত্তব্যের ভার নিয়ে ঠিকই করেছেন এবং বেশ দায়িত্বপূর্ণ ভাবে এই কর্ত্তব্য পালন করেছেন।

গবন্মেণ্ট বা গবন্মেণ্টের দলভুক্ত প্রপ্যাগ্যাণ্ডাকারীরা এখন বলতে পারবেন না যে, কেবল কংগ্রেসই সদ্য সদ্য স্বাধীনতা ও জাতীয় গবন্মেণ্ট চেয়েছিল, আর সবাই ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট-কৃত বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট। কারণ, মহাসভা দ্ব্যর্থশূন্য স্পষ্ট ভাষায় এখনি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মর্য্যাদার ঘোষণা দাবী করেছেন, এবং দাবী করেছেন যে, যে-বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে তার অবসানের জন্যে গবন্মেণ্ট প্রধান প্রধান দলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দেন, একটি সর্বদলীয় জাতীয় গবন্মেণ্ট গঠিত হোক এবং তার হাতে সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হোক, যুদ্ধান্তে ভারত-শাসনবিধি রচনার্থ যে গণপরিষদ আহূত হবে তার প্রকৃতি নির্দ্ধারণের ভার সেই গবন্মেণ্টের হাতে দেওয়া হোক, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে-সব রক্ষা কবচ গণপরিষদ স্থির করবেন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর তাতে অমত হ'লে নিরপেক্ষ সালিসির ব্যবস্থা রাখা হোক, এবং প্রদেশগুলিতেও সর্বদলীয় জাতীয় গবন্মেণ্ট গঠিত হোক।

হিন্দু মহাসভার পক্ষে বড়লাটের সহিত এবং নানা দলের নেতাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করবার ও কথাবার্ত্তা চালাবার ভার পড়েছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যের উপর। তিনি এই কাজের উপযুক্ত। সভাপতি সাবরকর যে বলেছেন যে, মিঃ জিন্না আহ্বান না-করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া সমীচীন হবে না, এই নির্দেশও ঠিক। মহাত্মা গান্ধীর থেকে আরম্ভ ক'রে অনাহূত কোন নেতার সঙ্গেই তিনি শিষ্ট ব্যবহার করেন নি।

ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ চার্চিলের ভ্রমোৎপাদক বক্তৃতা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বলেন :—

"ভারতের ঘটনাপ্রবাহের গতি ভালোর দিকে যাইতেছে।

[দৈনিক কাগজসমূহে যে-সব খবর বেরুচ্ছে, তাতে আমাদের ধারণা সে-রকম নয়।]

মোটামুটি উহা আশাপ্রদ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষিত যে মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া লর্ড প্রিভিসীল (সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্) ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন—তাহাই ব্রিটিশ সরকার ও পার্লেমেণ্টের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এই নীতি এখনও পূর্ণাঙ্গ অবিভাজ্য রহিয়াছে। উহার সহিত কেহ কোন কিছু যোগ দিতে পারিবেন না কিম্বা কেহ উহার অঙ্গচ্ছেদ করিতেও পারিবেন না।

[এই সিদ্ধান্ত ব্রিটেনের ও ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক।]

ভারতীয় কংগ্রেসী দল সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

[কিন্তু অন্য কোন দলও ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।]

কিন্তু এখানেই ব্যাপার শেষ হ'ল না। ইহা সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে (হর্ষধ্বনি)। ইহা ভারতের অধিকাংশ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে (হর্ষধ্বনি)। জনগণের এমন কি ইহা হিন্দু জনসাধারণেরও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে (হর্ষধ্বনি)।

[কিন্তু কংগ্রেস সকলের চেয়ে বৃহৎ, প্রভাবশালী, সর্ব-সাম্প্রদায়িক ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।]

ইহা ব্যবসাদার ও পুঁজিওয়ালাদের সাহায্যপুষ্ট একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র।

[ভ্রমোৎপাদক উক্তি। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ব্যবসাদার বা পুঁজিওআলা নহে। সভ্যদের মধ্যে বিস্তর শ্রমিক ও কৃষক আছে। চার আনা চাঁদাদাতা সভ্যদের চাঁদা দ্বারাই কংগ্রেসের অধিকাংশ চল্‌তি খরচ চলে।]

ব্রিটিশ ভারতের ৯ কোটী মুসলমান ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। (এই সময় জনৈক সদস্য "নিতান্ত বাজে কথা" বলে চীৎকার করে উঠলে চতুর্দ্দিকে "থামুন থামুন" ধ্বনি উত্থিত হয়।

[কংগ্রেসের বিরোধী মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যার চেয়ে কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যসংখ্যা ঢের বেশী। কংগ্রেসী মুসলমান ছাড়া অন্য মুসলমানদের অধিকাংশ কংগ্রেস-বিরোধী নহে। যথা—মোমিনরা, অহ্‌রররা, জামিয়ৎ-উল-উলেমা, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা। তারা কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে। মুসলিম লীগ কংগ্রেস-বিরোধী বটে, কিন্তু ক্রিপ্স-প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে। মুসলমানদের কোন প্রতিষ্ঠানই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।]

অতঃপর মিঃ চার্চিল বলেন, এই ৯ কোটী মুসলমানের নিজেদের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে।

[অবশ্যই আছে। কিন্তু তাদের কোন প্রতিষ্ঠানই ক্রিপ্স-প্রস্তাব সমর্থন করে নি। অনেকেই কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করেছে।]

তদুপরি পাঁচ কোটী তথাকথিত অস্পৃশ্য অথবা অনুন্নত জাতির লোক যাদের ছায়া দেখলে কিম্বা উপস্থিতির দ্বারা তাঁদের সমধর্ম্মী হিন্দুরা অপবিত্র হয়েছে বলে মনে করে।

[ইহা মিথ্যা কথা যে, ৫ কোটী হিন্দুর ছায়া, উপস্থিতি বা স্পর্শ অন্য হিন্দুদিগকে অপবিত্র করে। সে যাহা হউক, "অস্পৃশ্য"রাও ক্রিপ্স-প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।]

এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের যাহাদের সহিত আমরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ৯ কোটী ৫০ লক্ষ প্রজা কংগ্রেসী দলের সম্পূর্ণ বিরোধী।

[ইহাও মিথ্যা কথা। দেশী রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিস্তর কংগ্রেস-সভ্য আছে। অন্যেরাও পূর্ণস্বাধীনতা চায়।]

ভারতের ৩৯ কোটী লোকের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি ভাগেই মোট ২৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোক রহিয়াছে। তদুপরি ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু লোক কংগ্রেসী দলের বর্ত্তমান নীতির নিন্দাবাদ ক'রে থাকে, তাদিগকে উক্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি।

[কিন্তু হিন্দুদের বৃহত্তম ও বলবত্তম প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের দাবীর সমর্থন করেছেন এবং অগণিত শিখ ও খ্রীষ্টিয়ান তা করেছে; বিস্তর শিখ ও খ্রীষ্টিয়ান কংগ্রেসের সভ্য। অন্য দিকে, কোন হিন্দু, শিখ বা খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্স-প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।]

এখানে কিম্বা অন্যত্র এসব প্রধান-প্রধান বিষয়গুলো উপেক্ষা করলে চলবে না, কারণ এসব মূল বিষয় স্বীকার ক'রে না নিলে ভারতীয় সমস্যা কিম্বা ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্কের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হবে না। মিঃ গান্ধী এত দিন পর্য্যন্ত যে অহিংস নীতি প্রচার ক'রে আসছেন এবং যা বাস্তবে পরিণত হয় নি কংগ্রেসী দল বর্ত্তমানে সে নীতি অনেক বিষয়ে পরিত্যাগ করেছেন।

[কংগ্রেসী দল কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত যুদ্ধ সমর্থন করেন; অন্যান্য বিষয়ে আগেকার মতই অহিংসই আছেন।]

রেল ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিনষ্ট, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, দোকানপাট লুট, ভারতীয় পুলিসের উপর ইতস্ততঃ আক্রমণ চালাবার ও তার সঙ্গে সময় সময় নিষ্ঠুর আচরণ করার উদ্দেশ্যেই এ আন্দোলন পরিকল্পিত হয়েছে।

[বর্ত্তমান আন্দোলন বা উপদ্রবের জন্য কংগ্রেস দায়ী নহে। কংগ্রেস-নেতারা কারারুদ্ধ।]

সমগ্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত-রক্ষার ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটানো।

[বর্ত্তমান উপদ্রবের উদ্দেশ্য কি জানি না। কিন্তু কংগ্রেস কোনকালেই জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটায় নি, ঘটাতে চায় নি; স্বাধীনতার দাবী দ্বারা সেই ব্যবস্থার সাহায্য করতেই চেয়েছিল।]

জাপ-আক্রমণকারীরা আসামের সীমান্তে ও বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হয়েছে।

কংগ্রেসী দলের কার্য্যকলাপ

এও হ'তে পারে যে, কংগ্রেসী দলের এসব কার্য্যকলাপে জাপ পঞ্চম-বাহিনী ব্যাপকভাবে এবং বিশেষতঃ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সম্পর্কে সাহায্য করছে।

["এই সব কার্য্যকলাপ" যে কংগ্রেসীদলের, বা জাপ পঞ্চমবাহিনী যে ভারতবর্ষে কাজ করছে, মিঃ চার্চিল তার কোনো প্রমাণ দেন নি। তাঁর উক্তি বেদবাক্য নয়।]

দৃষ্টান্তস্বরূপ এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আসাম-সীমান্তে বঙ্গদেশ রক্ষার নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে আক্রমণ চালানো হয়। এমতাবস্থায় বড়লাট ও ভারত-সরকার বড়লাটের পরিষদের সর্ব্ববাদিসম্মত অনুমোদনক্রমে (এ পরিষদের বেশীর ভাগ সদস্য ভারতীয় এবং দেশহিতৈষী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি) কংগ্রেসী দলের, উহা বৈরিতা ও অপরাধমূলক পন্থা অবলম্বন করায়, ওর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বে-আইনী ঘোষণা ও দমন করা প্রয়োজন ব'লে

বিবেচনা করেন। মিঃ গান্ধী এবং প্রধান প্রধান নেতাদিগকে সব রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাসহ অন্তরীণ করা হয়েছে এবং গোলমাল না কমা পর্য্যন্ত তাদিগকে সব রকম বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করা হবে।

[কিন্তু বর্তমান উপদ্রব যখন আরম্ভই হয় নি, তখন গান্ধীজী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা ও কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়; উপদ্রবের ফলে গ্রেপ্তার ও বেআইনী ঘোষণা হয় নি।]

এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, সামরিক জাতিসমূহের উপর কংগ্রেসী দলের কোন প্রভাব নেই।

[ভ্রান্ত উক্তি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রধানতঃ যুদ্ধপ্রিয় পাঠানদের দ্বারা অধ্যুষিত। সেখানে অন্য অধিকাংশ প্রদেশের মত কংগ্রেসী মন্ত্রীরাই শাসনকার্য্য চালিয়েছিলেন। "সামরিক জাতি"দের সভা পূর্ণস্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেছেন।]

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ছাড়া এদের উপরই ভারতরক্ষার কাজ প্রধানতঃ নির্ভর ক'রে থাকে। এ সব সামরিক জাতির অনেকগুলি ব্যাপক ধর্ম্মমূলক বিরোধের দরুন হিন্দু কংগ্রেস থেকে বহুদূরে রয়েছে এবং তারা কখনই তাদের দ্বারা শাসিত হ'তে সম্মত হবে না কিম্বা তারা কখনও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐরূপভাবে বশ্যতা স্বীকার করবে না (দীর্ঘকাল ধরে হর্ষধ্বনি)।

অতঃপর মিঃ চার্চ্চিল বলেন, ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির ব্যবস্থা নেই—তথাপি এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্যার্থ দশ লক্ষের উপর ভারতীয় স্বেচ্ছায় সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

[মিঃ চার্চিল এই সব সিপাহীকে ইংরেজীতে ভলেণ্টীয়র শব্দে অভিহিত করায় শ্রোতাদের ভ্রম জন্মে থাকবে। যে-সব দরিদ্র লোক উদরান্নের জন্যে বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করে, তাদিগকে ভলেণ্টীয়র বলে না।]

বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, গত দু-মাস কাল ধরে কংগ্রেস যখন গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে তার শক্তি নির্ণয় করছিলেন, সেই সময় সৈন্যবাহিনীতে ১৪ লক্ষের অধিক ভারতীয় যোগদান ক'রে তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় সম্রাটের সাহায্যার্থ আগুয়ান হয়। বর্তমানে যত দূর দেখা যায় কংগ্রেস ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভুলাতে পারে নি বা আন্দোলন-প্রবাহে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

[কংগ্রেস কখনও গবর্মেণ্টের সৈন্যসংগ্রহে বাধা দেয় নি, দিতে চায়ও নি। বরং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ক্রিপ্স সাহেবের কাছে ১৫ লক্ষ ভলেণ্টীয়র সংগ্রহের প্রস্তাব ক'রেছিলেন; কিন্তু ক্রিপ্স রাজী হন নি।]

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ভারতীয়গণ তাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করে নি বা ভারতের বিরাট জনসাধারণও এ আন্দোলনে সাড়া দেয় নি।

["এই আন্দোলন"টা কংগ্রেসের নয়। কংগ্রেস যদি সত্যাগ্রহ (civil disobedience) করত এবং যদি তাতে জনসাধারণ সাড়া না দিত, তা হ'লে মিঃ চার্চিলের এরূপ উক্তি ন্যায্য হ'ত।]

ভারতবর্ষকে একটি মহাদেশ বলা চলে। এর আয়তন ইউরোপের প্রায় সমান।

[সোভিয়েট রাশিয়া বাদে।]

কিন্তু লোকসংখ্যা ইউরোপ অপেক্ষা বেশী। এখানকার অধিবাসিগণ জাতি এবং ধর্ম্মবিষয়ক পার্থক্যের দরুন পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন। এখানে অনৈক্য যত গভীর, ইউরোপের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয় না।

[অত্যুক্তি।]

ভারতের ৩৯ কোটী লোকের শাসনকার্য্য ভারতবাসীরাই চালিয়ে থাকেন।

[কিন্তু তাঁবেদাররূপে,—মাথায় বিরাজ করেন ইংরেজ।]

পাঁচটি প্রদেশে আইনসভার নিকট দায়ী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কার্য্য চালাচ্ছে। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে অধিবাসিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় অগ্রসর হয়েছে। চলাচল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে আসছে। লুণ্ঠনকারী এবং অগ্নিপ্রদানকারীদের দমন করা এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

[ভালই হচ্ছে। কিন্তু উপদ্রবকারীদের এই সব অপকার্য কংগ্রেসনীতির বিরুদ্ধ।]

এই সকল কার্য্যে প্রাণহানিও যৎসামান্য হয়েছে। এত বড় বিরাট ও লোকবহুল অঞ্চলে এযাবৎ পাঁচ শতেরও কম লোক মারা গিয়েছে। অসামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য মাত্র কয়েক বিগ্রেড ব্রিটিশ সৈন্যকে এ যাবৎ এখানে সেখানে পাঠাতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিসবাহিনীই দাঙ্গাকারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পেরেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কংগ্রেসের হিংস আন্দোলন গণ-আন্দোলন হয় নি বা ভারতবাসীদের শান্তিপূর্ণ জীবনে উহা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে নি।

[কোন হিংস্র আন্দোলন কংগ্রেসের হ'তে পারে না।]

বড়লাট এবং তাঁর শাসনপরিষদ দৃঢ়; কিন্তু প্রয়োজনের অনতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে ভারতের অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করছেন এবং জাপানীদের আক্রমণ হ'তে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখছেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বড়লাটকে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করতে মনস্থ করেছেন।

আমি আরও বলতে পারি যে, ভারতে এখন বহু নূতন সৈন্য পৌঁছেছে। ভারতের আয়তন বিবেচনায় ভারতে অবস্থিত শ্বেতকায় সৈন্যসংখ্যা যৎসামান্য হলেও, পূর্বে কখনও এত অধিকসংখ্যক শ্বেতকায় সৈন্য ভারতের ভূমিতে অবস্থান করে নি। সুতরাং আমি সদস্যদের জানাতে চাই যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় জন্য অহেতুক আতঙ্কিত বা নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

[কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত রাখতে কেউ চাইলে তাঁকে "নিরাশ" হ'তে হ'বে।]

চিত্র-পরিচয়

চিত্রাঙ্গদা, মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা। দ্বাদশবার্ষিক বনবাসকালে অর্জ্জুন নানা তীর্থ দর্শনান্তে মণিপুরে উপস্থিত হইয়া, চিত্রাঙ্গদার দর্শন লাভ করেন এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনায় মহারাজ চিত্রবাহন, অর্জ্জুনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। অর্জ্জুনের ঔরসে এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত একমাসে মহাযুদ্ধের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কোনও নূতন ধারার প্রকাশ পাওয়া যায় নাই। একমাত্র মিশরের যুদ্ধে জেনারেল রোমেল মিত্রপক্ষের ব্যূহের কয়েক অংশে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের শক্তি অনুভব করিয়াছে মাত্র। এই সংঘর্ষ প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই রোমেলের সেনাদল যুদ্ধ স্থগিত করিয়া ফিরিয়া যায়। ইহাতে কোনও পক্ষেরই হার-জিত হয় নাই এবং কাহারও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মিশরে মিত্রপক্ষের উচ্চতম রণনায়কের পদে নূতন জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিয়োগের ফলাফল এখনও বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই এবং তাহা দেখিবার সময়ও আসে নাই। জেনারেল অখিনলেখ কেন স্থানচ্যুত হইলেন তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল জানাইয়াছেন যে, তিনি যুক্তি-পরামর্শের পরে এই পরিবর্ত্তন স্থির করেন।

চার্চ্চিলের বিবৃতিতে রুশরাষ্ট্র সম্পর্কে একটি বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায়। রুশ কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন না যে মিত্রপক্ষ তাঁহাদের যথাসম্ভব সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছে একথা প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভায় বলিয়া ফেলেন। এইরূপ ধারণা করার কারণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া তিনি বলেন যে, মিত্রপক্ষের আন্তরিক ইচ্ছা ও সর্ব্বস্ব পণ চেষ্টার কথা তিনি জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কোনও আভাস তিনি দিয়াছিলেন কি না তাহা প্রকাশিত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের বিবৃতির সময় কমন্স সভায় অধিকাংশ সদস্য উঠিয়া চলিয়া যাওয়ায় সভা বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভোটে যাহাই হউক কমন্স সভায় চার্চ্চিলের বক্তৃতায় উৎসাহের বন্যা বহে নাই। হয়ত এতদিনে সেখানকার যো হুকুম সদস্যদলের মধ্যেও বাহিরের অবস্থার আভাস ক্ষীণভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

বস্তুতঃ এই তিন বৎসর যুদ্ধের পরে মিত্রপক্ষের পরিস্থিতির কোনও বিশেষ উন্নতির লক্ষণ এখন দেখা যাইতেছে না। পশ্চিম-ইয়োরোপে জার্ম্মান অধিকার এখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ়ই আছে। ডিয়েপের খণ্ড আক্রমণে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে বটে যে ফ্রান্সে নাৎসী রক্ষাব্যূহ অভেদ্য নহে কিন্তু স্থায়ী ভাবে সে ব্যূহচ্ছেদ করার এবং পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থাপনের চেষ্টার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। ব্রিটেনের আকাশবাহিনী বিরাট্‌ পরিমাপে জার্ম্মানির বিভিন্ন নগরের উপরে আক্রমণ চালাইতেছে বটে কিন্তু বায়ু অভিযানের ফলে অস্ত্র-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি স্থায়ী ভাবে নষ্ট হয় না তাহার প্রমাণ ইংলণ্ডই দেখাইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের পথে বাধা অশেষ এবং ককেশাস ও ভল্‌গা অঞ্চলের অভিযানের ফলে সে বাধা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাহায্যদানের একমাত্র পথ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের যোজনা এবং তাহা যত দিন না হইতেছে তত দিন রুশ জাতির অগ্নিপরীক্ষা সমানেই চলিবে।

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং মিশরে অক্ষশক্তির অধিকার পূর্ব্ববৎই সুদৃঢ় রহিয়াছে। যত দিন রোমেলের সৈন্যবাহিনী মিশর হইতে বিতাড়িত এবং লিবিয়ার প্রধান কেন্দ্রগুলি মিত্রশক্তি-অধিকৃত না হয় তত দিন ভূমধ্যসাগরে মহাযুদ্ধের নূতন পরিস্থিতির কথা বলা চলে না। সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে নূতন সেনানায়ক নিয়োগ ও পৃথক রণচালন কেন্দ্রের স্থাপনা হইয়াছে। ইহা ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতিকারের সময় উপযোগী উত্তম ব্যবস্থা—যদি যথাযথ ভাবে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান হয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির কোনও আশু পরিবর্ত্তন ইহা হইতে ঘটিতে পারে না।

চীনদেশে, যে কারণেই হউক, যুদ্ধ-পরিস্থিতির সাময়িক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। জাপানী যুদ্ধ-পরিষদ কিছু দিন পূর্ব্বে নূতন অভিযান চালনা করিয়া সমুদ্র-উপকূলস্থ প্রদেশের চীন-রণকেন্দ্র, রেলপথ ও বায়ুযান-কেন্দ্রগুলি অধিকার করিতে মনস্থ করে। এই অভিযানের মুখে প্রতি পদে স্বাধীন চীনা সৈন্য প্রবল বাধা দিতে থাকে। মার্কিন বায়ুসেনার প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে জাপানীদিগের অগ্রগতিতে জাপানী আকাশবাহিনী পূর্ব্বেকার মত সহায়তা করিতে পারে নাই। তাহার পর, যে কারণেই হউক, জাপানী সৈন্য ঐ সকল অঞ্চল হইতে আংশিক ভাবে স্থানান্তরিত হওয়ায় চীনা সমরবাহিনী হস্তান্তরিত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিতে আরম্ভ করে। এখনও ধীরে ধীরে চীন সৈন্যই আক্রমণ চালাইতেছে। তবে এই অভিযানের শেষ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই এবং চীন-ভূমিখণ্ডে জাপানের শক্তি বিশেষ ভাবে প্রতিহত বা বিধ্বস্তও হয় নাই। এখন কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ মাত্র চলিয়াছে। যত দিন প্রচুর পরিমাণে গুরুভার কামান, এরোপ্লেন এবং বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ-শকট চীন সমর-পরিষদে না পৌঁছায় তত দিন চীন দেশে যুদ্ধের প্রবাহ বিপরীত মুখে বহিতে পারে না। এখন এই মাত্র বলা যায় যে, চীনা সৈন্যের পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অবনত নহে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ও মিত্রশক্তির মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে তাহার বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই। সলোমন অঞ্চলে মার্কিন অভিযান আংশিক ভাবে সফল হইয়া এখন বলসঞ্চয়ে ব্যস্ত আছে। নিউগিনি অঞ্চলে জাপানী অভিযান

এখনও চলিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ এখনও ঘটে নাই। তবে এই অঞ্চলের ঘটনাবলীতে দুইটি ব্যাপার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রথম এই যে মার্কিন নৌবহর এখানে জাপানী নৌবহরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিশেষ আঘাত দিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উন্মুক্ত জলরাশিতে জাপানের যুদ্ধজাহাজ-পূর্ব্বেকার মত অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে না। এখন প্রত্যেক নূতন অঞ্চলে যাইবার পথে মার্কিন নৌবহর প্রবল যুদ্ধদানে সমর্থ। প্রশান্ত মহাসাগরের ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপমালাবেষ্টিত জলপথের অবস্থা কিন্তু এখনও পূর্ব্ববৎ। যে সকল অঞ্চল ছয় মাসের বিদ্যুৎ-অভিযানের ফলে জাপানের হস্তগত হয় সে সকল স্থানে জাপানের অধিকার এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আরও যত দিন যাইবে, সে সকল দেশে জাপানের পরিস্থিতি সুদৃঢ় হওয়াই সম্ভব। সে সকল অঞ্চল যুদ্ধ চালনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ, সুতরাং সেখানে স্থায়ীভাবে জাপানের অধিকার বজায় থাকা মিত্রপক্ষের পক্ষে বিপজ্জনক। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের একমাত্র উপায় স্থলে জলে ও আকাশে জাপানের সমরবাহিনীগুলির উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালনা। এখনও তাহার আরম্ভ হয় নাই। অবশ্য এই সুদূর বিস্তৃত অঞ্চলের উপর স্থায়ী সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনায় দীর্ঘকালের অবসরের প্রয়োজন। জাপানের পক্ষে ইতিমধ্যেই স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই ইহা নিশ্চিত। কিন্তু যুদ্ধ অচল থাকা এখন জাপানের পক্ষে অনুকূল সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

জাপানের পক্ষে চীন হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর জলে ও স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। বর্ত্তমানে উহা যে সম্ভব হইয়াছে তাহা বিপক্ষদলের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিভ্রংশের কারণে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় জার্ম্মান সাবমেরিন অভিযানের ফলে। মিত্রপক্ষের এখন শক্তিসঞ্চয় ও বিকাশের প্রধান অন্তরায় জাহাজ চলাচলের নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি। এই সকল বাধা-বিপত্তির মূল কারণ জার্ম্মান সাবমেরিনের আক্রমণ। আটলান্টিক মহাসাগরের যুদ্ধের বিবরণ সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয় না বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার ফলাফল অন্য যে কোনও যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফল অপেক্ষা কম সাংঘাতিক নহে। রুশকে সাহায্যদান, মিশরে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ, চীনদেশে অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ, ভারতে শক্তিসঞ্চয়—এ সকলই এখন সুদূর জলপথে জাহাজের চলাচলের উপর নির্ভর করে। বিগত মহাযুদ্ধেও অল্পদিনের জন্য এইরূপ অবস্থা ঘটে, কিন্তু তখন মিত্রপক্ষের নৌবল ছিল অপরিমিত। বিপক্ষের নৌশক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল জার্ম্মান সমুদ্রতটে। এইবার একটি প্রবল ও দুইটি কার্য্যক্ষম নৌবল মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে, সপক্ষে অবশ্য দুইটি মহাশক্তিশালী নৌবহর। সেবার যুদ্ধ ছিল প্রধানতঃ ইয়োরোপে, এইবারে তাহা জগতের চতুঃসীমান্তে বিস্তৃত। সুতরাং সাবমেরিন আক্রমণের প্রতিরোধ এইবার অতি দুরূহ ব্যাপার। জাপানের ও জার্ম্মানীর সুবিধা এই যে, তাহাদের মাল ও সৈন্য সরবরাহের পথ প্রায় নিষ্কণ্টক এবং সুরক্ষিত।

তবুও জাপানের পক্ষে বিজিত দেশগুলি রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। জাপান এই অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে কেবলমাত্র যদি মিত্রপক্ষে বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত মহাজ্ঞানী-দল পূর্ব্বেকার মত জাপানের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পরোক্ষভাবে সহায়তাদানে ক্ষান্ত না হন।

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ সহায়তা না পাইলে মিত্রপক্ষের এই যুদ্ধে জয়লাভ সুদূর পরাহত। রুশ রণক্ষেত্রে যাহা চলিতেছে তাহার ফলে সোভিয়েটের গণসেনা, অভূতপূর্ব্ব শৌর্য্য ও পৌরুষ প্রদর্শন সত্ত্বেও, কিছুকালের জন্য ক্ষীণবল হইয়া যাইতে পারে। রুশরাষ্ট্রের খনিজ ও লোকবলের আকর অফুরন্ত, সুতরাং পরাজয় এক প্রকার অসম্ভব। ইহার সঙ্গে রুশগণনায়কগণের দৃঢ়সংকল্প ও অদম্য তেজ বর্ত্তমান থাকায় অক্ষশক্তির সম্পূর্ণ জয়লাভ বিবেচনার বাহিরে বলিলেই হয়—যদি না রুশজাতির মিত্রবর্গ আরও অধিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতে থাকেন।

মার্কিন রাষ্ট্রের জনবল ও অর্থবল অতুল, কিন্তু রুশজাতি ক্ষীণবল ও চীন দেশ অস্ত্রাভাবে ও অবরোধে নিস্তেজ থাকিলে ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যও জয়লাভের পক্ষে কোনমতেই পর্য্যাপ্ত নহে। একা মার্কিন দেশ সমস্ত পৃথিবীকে অর্থদান ও সৈন্য দান করিয়া অক্ষশক্তিপুঞ্জের ন্যায় প্রবল শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা পাইলে পরে তাহা কালে সম্ভব হইতে পারে। অন্য দিকে চীনের সহায়তার জন্যও ঠিক এই সম্পূর্ণ সহযোগ—শেষমাত্রা পর্য্যন্ত—অতি অবশ্য প্রয়োজন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এখন একমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষমতাই সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত ও প্রয়োজিত হয় নাই। অন্য সকল অংশই এখন প্রায় শেষ সীমা পর্য্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। তাহাতেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন, চীনকে সাহায্যদান ও মিশর হইতে শত্রুর বহিষ্কার সম্ভব হয় নাই। অতএব মার্কিন রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লোকবল ও শিল্পসম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং যোজনা না হইলে এই যুদ্ধের চরমফল দীর্ঘকালের জন্য অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যাইতে পারে।

পিকিঙের উপকণ্ঠে উচ্চপদস্থ চীনা কর্ম্মচারীর উদ্যান-বাটিকা

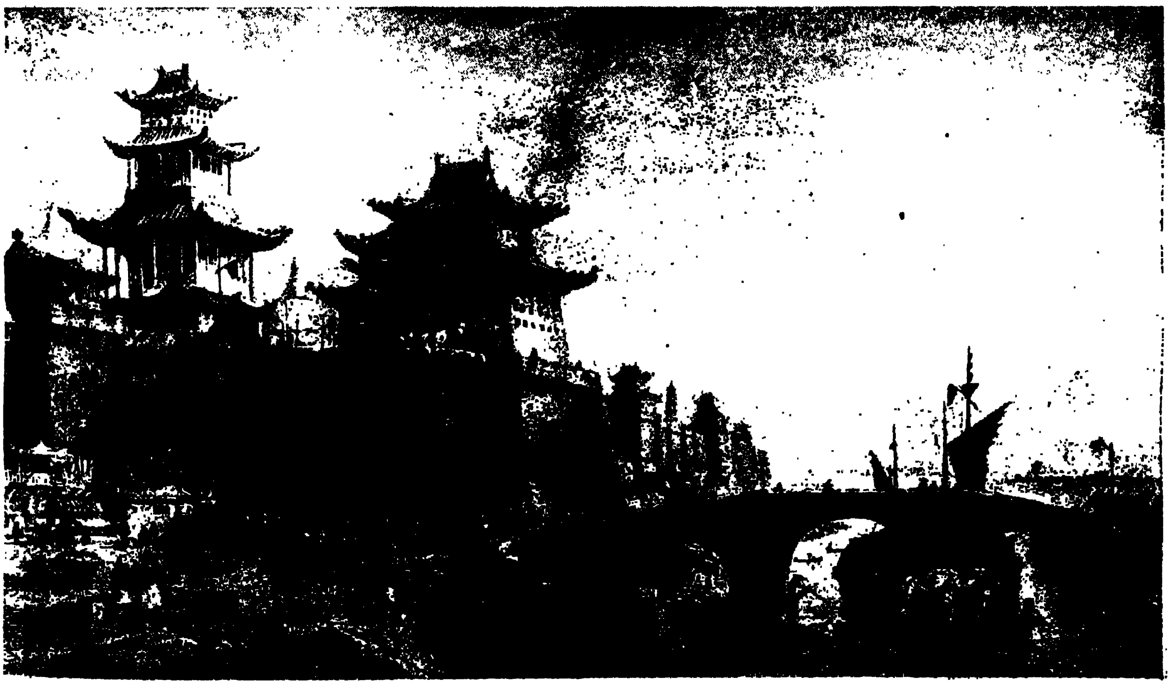

পিকিঙের পশ্চিম দ্বার

পিকিং রাজপ্রাসাদের উদ্যান

চীনের প্রাচীর

নান্‌কিঙে চীনামাটি-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য-চূড়া

নান্‌কিং নগরী

হংকং-বন্দর

তুং-তিং শান

দেশ-বিদেশের কথা

রবীন্দ্র-স্মৃতি-সপ্তাহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শিলং শাখা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শিলং শাখা" কর্তৃক আগষ্ট মাসের ২রা হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত "রবীন্দ্র-স্মৃতি-সপ্তাহ" উদ্‌যাপিত হয়। ইহাও স্থির হয়, এই সময়ে অর্থ সংগ্রহ দ্বারা বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী ক্রয় করা হইবে। ইহাতে পরিষদের পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধি এবং পরোক্ষভাবে "বিশ্বভারতী"র সাহায্য হইবে। এই সাধু উদ্দেশ্যে অনেকেই অর্থ সাহায্য করেন। আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম. এ. (লণ্ডন) মহোদয় কবির সমগ্র গ্রন্থাবলী একখণ্ড দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরিষৎ সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত রায় ইতঃপূর্বে আরও কয়টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কবির গ্রন্থাবলী দান করিয়াছেন।

৯ই আগষ্ট স্থানীয় কুইনটন্ মেমোরিয়াল হলে আসামের এড্‌ভোকেট্-জেনারেল্ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই. মহোদয়ের পৌরোহিত্যে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শিলং শাখা" কবির অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিলঙের প্রাচীনতম নাগরিক রায় বাহাদুর শিবনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রার্থনা ও আসাম পাব্লিক সার্বিস্ কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্. এ. মহাশয়ের এই উপলক্ষ্যে লিখিত কবিতা "শ্রদ্ধাঞ্জলি" বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-স্মৃতি-সভা

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের সম্বৎসরপূর্ত্তির দিনে হুগলি-চুঁচুড়াবাসী সম্মিলিতভাবে যাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবার সুবিধা পান সেজন্য বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদার মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা উষা হালদার উদ্যোগী হইয়া বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক কমিটি গঠন করেন। গত বৎসর কবির মহাপ্রয়াণের পর স্মৃতি-সভায় জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীতে ১০০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়া হয়।

এবারও কমিটি স্থির করেন যে জনসাধারণের হিতকর কোন কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন। প্রথমতঃ প্রস্তাব হয় যে ২০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে এবং তাহার সুদ হইতে স্থানীয় বালিকা বাণী-মন্দির উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম হইবেন তাঁহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যেই ২০০০৲ টাকার অধিক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও সাহায্য পাওয়ার আশা আছে। সে জন্য কমিটি ১৯৪৩ সনের ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থও স্থানীয় শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন এরূপ স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা উষা হালদার ও কমিটির সভ্যগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে অত্যল্পকাল মধ্যে একটি অতি শুভ প্রচেষ্টা সফল হইতে চলিয়াছে।

গত ৭ই আগষ্ট (২২শে শ্রাবণ) উক্ত কমিটির উদ্যোগে মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হুগলী মহসিন কলেজ হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শহরের গণ্যমান্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং গৃহে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ সরস বক্তৃতায় সভাপতি বরণ করেন এবং অধ্যক্ষ মিঃ জ্যাকারায়ার প্রস্তাব ক্রমে সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের একটি মনোরম প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিকৃতিটি স্থানীয় চিত্রকর মিঃ ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। অতঃপর স্থানীয় ছাত্রছাত্রী-গণের মধ্যে কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে পাঠ ও আবৃত্তি করেন এবং কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গীত হয়। অধ্যাপক গিরিজা-শঙ্কর ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করেন এবং নানা ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট বাঙালীর অপরিশোধ্য ঋণের কথা উল্লেখ করেন। যাঁহারা অল্প সময়ের জন্যও কবির সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট যে তাঁহার স্মৃতি কবির অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে চির ভাস্বর হইয়া থাকিবে, এ কথা বিশেষ ভাবেই তিনি বলেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ মাষ্টার খ্যাতনামা কবি গোলাম মোস্তফা বলেন—রবীন্দ্রনাথের বাণী সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের বাণী, এবং তাঁহার ভাষা বাঙালী সর্ব্বসাধারণের গ্রহণীয় ভাষা। তাঁহার স্মরণে এবং তাঁহার কাব্যের মর্ম্মানুসন্ধানে বাঙালী যতই মনোযোগী হইবে ততই তাহার মঙ্গল হইবে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া কবির কথা বলেন।

যখন বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার 'শিক্ষার বাহন' করা হয় তখন কবির নিকট হইতে ডাঃ মুখোপাধ্যায় কত সাহায্য ও সস্নেহ উপদেশ পাইয়াছিলেন চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহার বিবরণ তিনি দেন। সাধারণ পাঠকের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনার কথা যখন উঠে তখন রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া তাহার ভার পাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনাও তিনি করেন। পরিশেষে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও তেজস্বিতা, তাঁহার অশীতিবর্ষপূর্ত্তি দিবসে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণে বর্ত্তমান সঙ্কটময় কালে বাঙালীর অশেষ ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করেন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পরলোকে অজয়কুমার গুপ্ত

অজয়কুমার গুপ্ত, বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের বড় কর্ম্মচারী ছিলেন; ১০ই জুন তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

অজয়কুমার কৃতী কর্ম্মচারী ছিলেন; বাঙালীদের মধ্যে বেঙ্গল আসাম রেলে উচ্চতম পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রেলে অনেক রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছেন। যখন যে কাজ করিতেন প্রাণ মন নিজের কাজে দিতেন। সাধারণের উপকারের জন্য অনেক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; সব পরিকল্পনা কাজে

পরিণত হয় নাই; কিন্তু যে দুই-একটি হইয়াছিল,—যথা তাড়াতাড়ি মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা,—তাহাতে সাধারণের যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

অজয়কুমার শুধু বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্য-রসজ্ঞও ছিলেন। যে-সব কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে যেমন ভাষার লালিত্য সেইরূপ ভাবের গভীরতা। সময় পাইলে তিনি বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছু দিতে পারিতেন।

অজয়কুমারের প্রতি এত লোক আকৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহার চরিত্র-গুণে। গোপনে অন্যের উপকার করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল; মাসের প্রথমে মাহিনার এক অংশ দানের জন্য রাখিয়া দিতেন। ধর্ম্মভীরু ছিলেন আর ধর্ম্মসাহিত্যে পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার আশ্রমের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; ছুটি লইয়া সেখানে মাঝে মাঝে সময় যাপন করিয়াছেন। দৈনিক জীবনের কাজ ধর্ম্ম-নিষ্ঠার বিকাশ বলিয়া মনে করিতেন। সমস্ত দিনের কাজের পর সাধনা ও পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। মৃত্যুর সময় অজয়কুমারের বয়স মাত্র ৪৮ হইয়াছিল।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার

যোধপুর-নরেশ তাঁহার নিজস্ব চিকিৎসক ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ মজুমদারকে স্বর্ণ, তাজিম-সর্দ্দার ও হাতী শিরোপা সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। যোধপুর দরবারের এই শ্রেষ্ঠ সম্মান একমাত্র রাজবংশীয় ছাড়া খুব কম লোকেই পাইয়াছেন। বাঙালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। বিজয়বাবু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

পুস্তক-পরিচয়

মনঃসমীক্ষণ—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, ২৫-২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অধ্যাপক মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও যশস্বী অধ্যাপক। স্বয়ং সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড তাঁহার মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে ডাঃ মিত্রের শাস্ত্রজ্ঞান ও রচনাভঙ্গীর যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থে 'বিজ্ঞান ও শিক্ষা,' 'শিক্ষার অন্তরায়' ও 'মনোবিদ্যার পঁচিশ বৎসর' প্রবন্ধ তিনটিতে কিছু অবান্তর বিষয়ের আলোচনা আছে এবং 'ভালবাসা' শীর্ষক প্রবন্ধটিও ঠিক মনঃসমীক্ষণ দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত হয় নাই। লেখক নানা মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে স্থায়ী রূপ দিতে গিয়া এগুলিকেও এই পুস্তকে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের বিষয়বস্তু সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক। প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধকে পরিচ্ছেদের আকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোথায় বা কবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। বাকীগুলির প্রণয়ন-তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু তাহারা কোথায় প্রকাশিত লেখা নাই। লেখক প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিবার সময় আবশ্যকমত সম্পাদনা না-করায় দু-এক স্থলে অনাবশ্যক অংশ বর্জ্জিত হয় নাই (পৃ. ৩৭, ৬৪ পাদটীকা) এবং পরিবর্ত্তিত ঘটনা, বা অবস্থা পাদটীকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (পৃ. ১৩২, ১৮৪)। 'মনোবিদ্যার পঁচিশ বৎসর' প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেরই নাম আছে, কিন্তু যে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ-শালা গড়িয়া উঠে ও ডাঃ মিত্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যাঁহার ছাত্র, তাঁহার নাম না-থাকা অভিজ্ঞের নিকট একটু অদ্ভুত ঠেকিবে।

ডাঃ মিত্রের পুস্তকখানি মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) শাস্ত্রের মূল তথ্যগুলির একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত বিবরণ। শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধারণ পাঠক উভয়েই এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বাংলা ভাষায় মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে বহু পুস্তকের অবসর আছে—ডাঃ মিত্রের গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, কারণ ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় ইহা ভবিষ্যৎ লেখকদিগের ভাষা সম্বন্ধে অনেক মস্তককণ্ডূয়ন ও স্বৈরাচার বন্ধ করিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মনোবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ডাঃ মিত্রের প্রবন্ধসমষ্টি তাহা বৃদ্ধি করিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বইটিতে ছাপার ভুল বেশী নাই—৩১, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১১২, ১৪১, ১৫৬ ও ১৮২ পৃষ্ঠাস্থিত অশুদ্ধি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। Ether-এর বঙ্গানুবাদ অম্বর (পৃ. ১৫), Iceberg-এর অর্থ বরফের পাহাড় (পৃ. ১৩৬), আপোষের পরিবর্ত্তে আপস (পৃ. ৭৯, ১২৬) ও 'কমিল'কে চলিত ভাষায় 'কমল' (পৃ. ১৬২) বলা একটু নূতন ঠেকিবে। Wundt নামটি এক রূপে বাংলা ভাষায় স্থান পায় নাই (পৃ. ৪০, ৯, ১৩৫)। বেঙ্কট রমণের বদলে ভেঙ্কাটারমণ (পৃ. ৮৬) অচল। ১৪৯ পৃষ্ঠায় বন্ধুটির আকস্মিক আবির্ভাব কোথা হইতে হইল এবং ১৫৬ পৃষ্ঠায় আকাশকুসুমের কিরূপে শিকড় গজাইতে পারে বোঝা গেল না। আলেকজাণ্ডারের স্বপ্ন (পৃ. ৫২), শকুশরাবের গল্প (পৃ. ৫৭), ধূম্রলোচনের উপাখ্যান (পৃ. ৭৫) ও ঈডিপাসের জীবনী ইহার প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু ভুল আছে। সাময়িক পত্রিকার ভুল চাপা পড়িয়া যায়, কিন্তু পুস্তকের ভুল বহুল প্রচারিত হয়—আশা করি এ কথাটি মনে রাখিয়া ডাঃ মিত্র পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত করিবেন।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

কর-নীতি ও ভারতের রাজস্ব-নীতি—শ্রীঅনাথগোপাল সেন। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

লেখক "কর-নীতি" ও "রাজস্ব-নীতি" বিষয়ে প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সুন্দর ও সরল ভাবে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। কিছু দিন হইতে বাংলা ভাষায় সকল পাঠ্যবস্তু বাঙালী ছাত্রদিগের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন মহাশয় এ বিষয়ে একজন অগ্রণী। তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ করুক, ইহাই কামনা করি।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

কবি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ২৭৩, আড়াই টাকা।

এ কথা সত্য যে, এ যুগে আর প্রাচীন মহাকাব্য সৃষ্টির পুনরাবর্ত্তন ঘটিবে না, কিন্তু এ যুগের উপন্যাস সে অভাব অনেকটাই দূর করিতে পারিবে। জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় জাতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে মানবচরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে উপন্যাসে। তারাশঙ্করের আধুনিক উপন্যাস 'কবি'তে আছে বাংলার অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে কাব্য-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই আশ্রয় করিয়া একজন 'কবিওয়ালা'র বিচিত্র জীবনের কাহিনী।

উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণ ডোম সমাজের একজন স্বভাব-কবি। প্রথমে কবির গানে, তার পর ঝুমুরের আসরে তার কবিত্বের ক্রমবিকাশ। জীবনের এই দুই স্তরে তাহার জীবনে আসিল পর পর দুইটি প্রেমময়ী নারী—যৌন-অনুরাগিণী 'ঠাকুরঝি' আর রূপোপজীবিনী বসন্ত। নিতাইচরণ প্রেমের অনুভবের মধ্যে লাভ করিল তার কবি-মনের প্রেরণা। অবশ্য জীবনের যে উত্তুঙ্গ শিখরে কবির কবিস্বপ্ন ও প্রেমস্বপ্ন মিলিত হইয়া কবি 'মহাজনে' রূপায়িত হয় নিতাইচরণ সে শিখরে আরোহণ করিতে পারে নাই। বাঙালীর জীবন-ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা হইতে তারাশঙ্কর নিতাইচরণকে কুড়াইয়া লইয়াছেন সেখানে এণ্টুনি ফিরিঙ্গি ভোলা ময়রাদেরই প্রাধান্য, বড়জোর সেখানে দাশু রায় কিংবা নিধুবাবুকে পাওয়া যাইতে পারে; জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস নয়। নিতাইচরণ দাশু রায়দেরই সমগোত্রীয়। তারাশঙ্করের বাস্তবনিষ্ঠা কবিওয়ালাকে 'মহাজনে' উন্নীত করে নাই বলিয়াই নিতাইচরণ সে যুগের বাঙালী কবি হিসাবে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পয়েন্টসম্যান রাজা মুচি ও তাহার মুখরা স্ত্রী, 'স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল' ঠাকুরঝি,

বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ, ঝুমুর দলের অধিকারিণী প্রৌঢ়া মাসী এবং তার মহিষের মত ভয়ঙ্কর প্রেমিক রক্ষক,—প্রত্যেকটি মানুষ বাংলা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নবাগত। অভিমানিনী ঠাকুরঝির অনুরাগের চিত্রটি বড়ই মনোরম। তবে 'কবি'র সব চাইতে অভিনব চরিত্র বসন্ত। সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত, ঝুমুরের রূপসী নাচনেওয়ালী বসন্ত ছিল রূপোপজীবিনী, কিন্তু প্রেমের অমৃত-স্পর্শ তাহার অন্তরে আনিয়াছিল জীবনের পরম আস্বাদন। যে আস্বাদনে দেহবিলাসিনী হইল প্রিয়ব্রতা প্রেমিকা।

উপন্যাস-রচনায় 'কবি'র প্রথমার্দ্ধে তারাশঙ্কর যে বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিলেন, শেষার্দ্ধে তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয় নাই। উপসংহারে নিতাইচরণের পূর্ণ পরিণতির প্রতিই তিনি বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে তার ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইলেও সে চক্রে আর যাহারা আবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের সকলের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের সব চাইতে বড় নালিশ 'উপন্যাসের উপেক্ষিতা' ঠাকুরঝি সম্পর্কে। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে তারাশঙ্কর তাঁহার ভাগ্যরচনায় অধিকতর দরদের পরিচয় দিবেন। তাহাতে উপন্যাসও সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

বর্ত্তমান জাপান—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত প্রকাশিকা, গুপ্তপাড়া, ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা। পৃ. ১৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

আমরা পুস্তকখানি পাইয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি। ইহা মনোহারী প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। পুস্তকখানির নাম 'বর্ত্তমান জাপান' হইলেও জাপানের পুরাতন ইতিবৃত্তের কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। জাপানের সম্রাট-পরিবার ও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ, ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চীনের নিকট জাপানের ঋণ, খ্রীষ্টপ্রচারকদের প্রতি সন্দেহ-দৃষ্টি, বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে গত শতাব্দীতে তাহার যোগাযোগ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি জাপানীদের সাগ্রহ ঝোঁক, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জাপানের পররাজ্যগ্রহণে লোভ, চীনের উপর জাপানীদের আক্রোশ প্রভৃতি নানা বিষয় লেখক সযত্নে ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। জাপানীদের শিল্প ও ব্যবসায়, বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারসমূহ, রাজনৈতিক দল, সৈন্যতন্ত্র, সেনানায়কদের কথা, সৈন্য বিদ্রোহ, রাষ্ট্রে রণবাহিনীগুলির প্রভাব প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে। জাপানের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা ও বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে জাপানীদের লেখা পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পাঠকের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন। এশিয়া মহাদেশের নানা স্থানে—চীনে ও অন্যত্র জাপানের অভিযান ও জয়-পরাজয়ের কথা দিয়া দিগিন্দ্রবাবু বইখানি শেষ করিয়াছেন। ইহা যেমন সময়োপযোগী তেমনি জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। বইখানিতে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইল, ইহাতে কোন রকম সূচীপত্রও দেওয়া হয় নাই। সামান্য দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি পাঠকের আদরণীয় হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিদ্যাসাগর—"বনফুল" শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার। ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

চারি অঙ্কে সমাপ্ত একটি নাটক। প্রবল প্রতিকূল সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার দুর্নিবার প্রয়াসের মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটির একটি সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় উপাদানের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও নাট্যকার বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে নাট্যরূপ দিয়া যে অপূর্ব্ব সৃজনপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই দুর্লভ। ঘটনাগুলি কুহেলিকাচ্ছন্ন পৌরাণিক বা মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক কাহিনী নহে, বর্ত্তমান যুগেরই সমসাময়িক সেজন্য লেখক কথোপকথন, সাজসজ্জা, পরিপ্রেক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অতি সন্তর্পণে কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নাটকটি লেখকের বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমর অবদান 'শ্রীমধুসূদনে'র অনুরূপ, একমাত্র এই নাটকটির সহিত ইহা সমপর্য্যায়ভুক্ত।

বাল-বিধবার অশেষ দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদের লাঞ্ছনা দূর করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া যখন বিদ্যাসাগরের দৃঢ় হৃদয় ব্যর্থতার পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন একটি বাল-বিধবার সুখময় দাম্পত্য জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে এই তো একটি সবুজ শীষ"। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের এই ছবিটি সমগ্র নাটকটির উপর একটি মাধুর্য্যময় করুণ ছায়াপাত করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত করা হয় নাই, করিতে গেলে ইহা একটি নীরস ইতিহাস হইয়া উঠিত, তাহাতে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না।

শ্রীকালীপদ সিংহ

স্তোত্রগীতা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীশ্রীনারায়ণ আশ্রম, রমানাথ ভবন, মুগা, ময়মনসিংহ।

চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক ভাঙ্গা সংস্কৃতে রচিত চৌত্রিশটি স্তোত্র এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্তোত্রগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মাতৃপর্যায় ও পিতৃপর্যায়। প্রথম শ্রেণীতে পুরুষ-দেবতা ও মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্ত্রী-দেবতার স্তোত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছন্দ ও ভাষার ত্রুটি সত্ত্বেও অনেক স্থলে স্তোত্রগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আদর্শ হিন্দু বিবাহ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। মূল্য ।•।

আলোচ্য পুস্তিকায় গ্রন্থকার বিবাহের মন্ত্র সকল মন্ত্রার্থসহ প্রকাশ করিয়াছেন। সকল মন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে যে স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রী সাহায্যকারিণী এবং স্ত্রীর ধর্ম্মকার্য্যে স্বামী সহায়। হিন্দুর বিবাহ সুসংযত জীবন পালনের নিমিত্ত। দম্পতীর অসংযত কামবৃত্তির চরিতার্থতা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পুস্তকটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

পান্থপাদপ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'বিশ্ববৈতালিক'-প্রণেতার আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পান্থপাদপে' এক শত আটটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা সুন্নিবদ্ধ হইয়াছে। মানব মনের ও সমাজের কতকগুলি তথ্য ও তত্ত্বকে পদ্যাকারে রূপ দিয়া কাব্যধর্ম্ম পালনের চেষ্টা করা হইয়াছে। সেগুলি সোজাসুজিভাবে বলিবার কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়। যেমন—

"সব ছেড়ে স্বার্থ নিয়ে শুধু লাঠালাঠি
কোথা সত্য? মিথ্যা নিয়ে এত কাটাকাটি।"

ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী এইরূপ লিখন-শৈলীর বিদগ্ধতায় 'পান্থপাদপ' পুষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে বহু জ্ঞানগর্ভ পদ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'সর্বতীর্থসার', 'অতীত', 'সুদূরের যাত্রী একা', 'মিলনের মোহানায়' প্রভৃতি সুখপাঠ্য। অক্ষম কবিতাগুলি বর্জ্জন করিলে গ্রন্থখানি আরও সুন্দর হইত।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

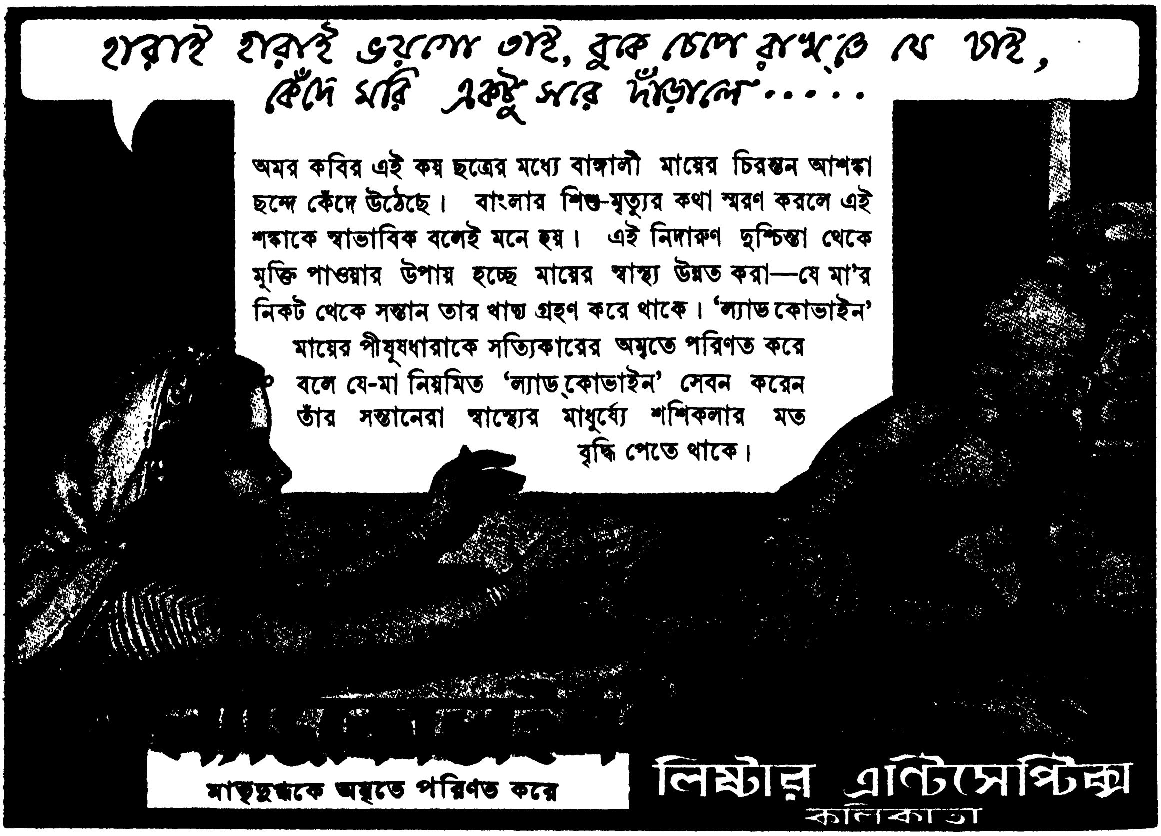

পুরাতন রোগের জলচিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসালয়, ১১৪।২ বি, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। ২১৫ পৃ.। মূল্য:পাঁচ সিকা।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, রক্তসঞ্চালন, চক্ষু, দন্ত, স্নায়ু ও জননেন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিভিন্ন পুরাতন রোগের উৎপত্তি, লক্ষণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনেক স্থলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়সমূহ নির্ভরযোগ্য ও সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এই পুস্তকের সাহায্যে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে বিনা ব্যয়ে নিজেদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেকিমী প্রভৃতি বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতেই ঔষধ-প্রয়োগ ছাড়াও পথ্যাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা অপরিহার্য্য। যাঁহারা জল-চিকিৎসায় বিশ্বাসী নহেন তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে অন্ততঃ আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ যাঁহারা চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া এক পা'ও নড়িতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তকখানি খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সুদূরের পিয়াসী—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। পৃ. ১৮৭।

নূতন লেখকেরা সাধারণত যে কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনা করেন, ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রেমকাহিনী ইহার উপজীব্য হইলেও—ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রসিদ্ধ শহর ও তীর্থক্ষেত্র ইহার পটভূমিকার প্রসার বাড়াইয়াছে। চলিবার পথে যে সব নরনারীর সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে তাহারা আমাদেরও পরিচিত বলিয়া মনে হয়, যেমন—দার্জ্জিলিঙের কমলবাবু ও ভুটিয়া মেয়েটি, বৃন্দাবনের পিয়ারী, মথুরার দিদি তাহার স্বার্থপর স্বামী ও ননদ, হরিদ্বারের রোহিণীবাবু। এঁরা ভিড়ের মধ্যে আসিয়াও অতি শীঘ্র ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া যান না। খণ্ড চিত্রগুলির মধ্যে মূল ঘটনাটি হারাইয়া যায় নাই। চন্দ্রনাথের পাহাড়ে যে ঘটনার আরম্ভ—হরিদ্বারে (ও দেরাদুনে) তাহার পরিসমাপ্তি। তথাপি মনে হয়, সে পথের বা সে কাহিনীর সেইখানেই শেষ নহে।

লেখকের ভাষা ভাল, মন দরদী এবং তীর্থবর্ণনায় মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ছাপ আছে। নবাগত হইলেও উপন্যাসের বহু স্থলে তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দেশেরই মেয়ে—শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশপ্রিয় লাইব্রেরী, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বাংলা দেশের এক জমিদার-দুহিতার কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী লেখক উপন্যাসাকারে বিবৃত করিয়াছেন। যদিও ঐতিহাসিক কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া লেখক 'দেবী' চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই, তথাপি জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মেয়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সগোত্রীয়া। জীবন-চরিত হিসাবে ইহার কিছু সার্থকতা থাকিলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাস্তববাদীর মনে ইহা সামান্য মাত্রই রেখাপাত করিতে পারিবে।

বহু পুরাতন গল্পকে নূতন আকার দিয়া প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব লেখক দেখাইতে পারেন নাই। পারেন নাই দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, রচনা-রীতির উপর অত্যধিক মনোযোগ। উচ্ছ্বাস-বহুল মন্তব্যে ও সহজ কথাটি ঘুরাইয়া বলার প্রচেষ্টায় গল্পের গতি ভারাক্রান্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কথোপকথনের নাটকীয় রীতি।

এই দু'টি পরিহার করিতে পারিলে লেখক ভবিষ্যতে সফলকাম হইতে পারিবেন।

রাজযোটক—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দুই-একটি গল্প কখনও কোন মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখে পড়িয়াছে। আলস্যভরে পাতা উল্টাইতে গিয়া গল্প-বলার সহজ ভঙ্গিতে হয়ত মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু 'রাজযোটক' পড়িয়া লেখিকার ছোট গল্প রচনার নৈপুণ্যকে, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে, প্রশংসা না-করিয়া পারা যায় না। যে ছবিগুলি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা খাঁটি বাঙালী চিত্র। শাশুড়ী, ননদ, জা, দেবর, স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া অতি তুচ্ছ কতকগুলি ঘটনা, যাহা সাধারণের চোখেই পড়ে না, লেখিকার মায়াতুলির স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রঙকে গাঢ় করিবার জন্য কোথাও অস্বাভাবিক চেষ্টা নাই। অত্যন্ত অনায়াসে সাংসারিক সমস্যাগুলিকে গল্পের গতির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। দুই-একটি রেখার টানে বেদনা ঘনীভূত হইয়াছে ও পাঠকের মনে স্থায়ী আসন পাতিয়াছে। পিতৃমাতৃহীনা যে

অ-বিবাহিতা মেয়েটি তেপান্তরের মাঠের স্বপ্ন দেখে, যে আগাছা ছেলে—ছুজ্ঞের মায়া-রহস্যে অবহেলিতা রুগ্না মায়ের শিয়রে দু'টি কমলালেবু রাখিয়া চলিয়া যায়, 'গ্রীধনে'র যে বিধবার সামনে রাশীকৃত কুচানো সুপারী জমা হইয়া উঠে, মাতৃহারা যে ছেলেটি পিতামহীর শ্রাদ্ধবাসরে ষোড়শ উৎসর্গকালে চীৎকার করিয়া উঠে, কিংবা এ কালের যে জাহানারা-জেবউন্নিসারা ময়ূর সিংহাসনের অন্তরালে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহাদের আশা, স্নেহ, সমস্যা বা বেদনাকে আমরা ভুলিতে পারি না। দরদ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পিজনোচিত ক্ষমতা প্রত্যেকটি গল্পকে প্রকৃত ছোট গল্প করিয়াছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে এই গল্পগুলি যে স্বকীয় মর্য্যাদা লাভ করিবে এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মৈনাক। শিবির।—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন। ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ১৲ ও ৷৷০।

বাংলা কাব্যে আজ নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গী ও আঙ্গিকের পরীক্ষা চলছে। কামাক্ষীপ্রসাদও পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর কোমল লাবণ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। তাঁর কাব্যের আকাশ স্নিগ্ধ, স্বপন-মেদুর।

"স্বপ্ন কোমল নীল দিগন্তে সুদূরের ডাক শুনি,
মাটির পৃথিবী কাশফুল হয়ে হাসে,
স্মৃতির আকাশে হঠাৎ দেখেছি ব্যাকুল বেদনারাশি
চামর বুলানো চঞ্চল মেঘে ভাসে।" (শিবির—'যাত্রা'।)

পথের পাশের নানা পরিচিত ছবি সহজ সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে; লঘু ছন্দে ভর ক'রে ভেসে এসেছে কত বিচিত্র অস্ফুট ধ্বনি।

"সারাদিন প্রহরে প্রহরে
ক্লিন্ন সহরে
স্বর্ণরূপা দোকানের রূপহীন ধ্বনি
শুনি।
টুকটাক কাজ। টুকটাক। ঠুকঠাক। ঠকঠক কাজ।
বিবাক্ত বিরক্তি শুধু। তন্দ্রায় পড়ে যেন বাজ।
শেষহীন
সারাদিন
রূপহীন
ধ্বনি
শুনি।

এমন নিপুণ যাঁর হাত, যিনি অবসরক্ষণের হালকা অনুভূতিকে রূপ দিতে পারেন, আবার রঙীন ক'রে আঁকতে পারেন আকাশের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস, তিনি যে কেন দুর্বোধ্যতার কুয়াশা ছড়িয়ে দেন কবিতায়, আর অবাঞ্ছিত শব্দে ভেঙে দেন পাঠকের স্বপ্নাবেশ, তা ভেবে পাই না। তাঁর কোমল কল্পনা আর মধুর ঝঙ্কার দূরে দূরে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মনকে, কিন্তু তার পর ক'রে দেয় দিশেহারা। নবযুগের কল্পনা ও অনুভূতি কেন এমন বোরখা প'রে দেখা দেয়? অকুণ্ঠিত প্রকাশ কি অনাধুনিক?

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। এইচ. চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

লেখক ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন এবং সহজ ভাষায় গল্পের মত করিয়া তাঁহার জীবন-কাহিনী বলিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ছেলেমেয়েদের উপযোগী আর একখানি সুন্দর রবীন্দ্র-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ'। উহাতে কবির কাব্যের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে, কাব্যের কথাও একেবারে বাদ পড়ে নাই। বালক-বালিকারা ইহা হইতে আনন্দ এবং শিক্ষা, উভয়ই লাভ করিতে পারিবে।

চাঁদ ও রাহু—শ্রীপ্রজেশকুমার রায়। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ভূমিকায় দেখিলাম: "মূল সুর অনুযায়ী কবিতাগুলির চারটি বিভাগ করা হ'ল।" কিন্তু বইয়ে তিনটি বিভাগ খুঁজিয়া পাইলাম: 'চাঁদ ও রাহু', 'বৃহন্নলা', এবং 'হে সম্রাট'। কবিতাগুলি গতানুগতিক নহে, অবোধ্য অতিআধুনিকও নহে, অন্তরের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ। প্রথম বিভাগে আছে কয়েকটি সুন্দর, সুকোমল প্রেমের কবিতা। দ্বিতীয় বিভাগে উদ্দীপনাময়ী শক্তির উদ্বোধন-বাণী। তৃতীয় বিভাগে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বন্দনা। মধুর ও রুদ্র উভয়ের আরাধনায় কবি সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

এপারে-ওপারে—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সুন্দর কাহিনী কাব্য। প্রাচীন বাংলা কাব্যের সুপরিচিতা বেহুলাকে নূতন সাজে দেখিলাম। দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। দেশীয় ঐতিহ্য এবং মাতৃভাষার স্বাভাবিক রীতিপদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া যখন কোন কোন নবীন কবি উৎকট নূতনত্ব-সৃষ্টির মোহে আচ্ছন্ন, তখন বর্ত্তমান কবি পুরাতন সাহিত্যের ভাবলোক হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, এবং অতীতের স্বপ্ন আমাদের চোখে আনিয়া দিয়াছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদ-ভাজন। তাঁহার বিষয় পুরাতন হইলেও রচনাভঙ্গী আধুনিক। মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ কাব্যে সুন্দর মানাইয়াছে। ভাষার লালিত্যে, ভাবের আবেগময় প্রকাশে এবং কল্পনার বর্ণচ্ছটায় এ কাব্য মনোরম।

আগামী কাল—শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার। ছায়াপথ পাবলিশিং হাউস, ৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বার আনা।

একাঙ্ক নাটিকা। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত হইলে সমাজে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া এই নাটিকা রচিত। সমস্যামূলক নাটক, কিন্তু ভাবভঙ্গী রোমাণ্টিক। মজলিসী আলোচনায় বা উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় নাটক জমে না; তাহার জন্য নিপুণ ঘটনা-সংস্থানের প্রয়োজন। এই নাটিকায় তাহার অভাব। বাংলা নাটক আজিও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শেখে নাই, এখনও তাহা ভাবালুতায় টলমল, নাটুকেপনায় অধীর। জীবনকে দেখিবার এবং বুঝিবার আগ্রহ অপেক্ষা কথা কহিবার ঝোঁক আমাদের বেশী। জীবনে ও সাহিত্যে শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে আজ ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতার প্রয়োজন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়